বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩৮—আষাঢ়, ১৩৩৯

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা

২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

বার্ষিক মূল্য—৬৷৹

বিষয়-সূচী

(মাঘ, ১৩৩৮—আষাঢ়, ১৩৩৯)

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণপৃষ্ঠ)



কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

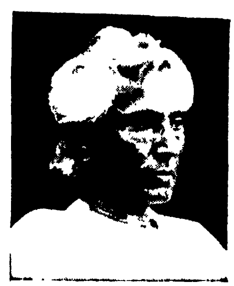
আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে [illegible]

হাতের লেখনী তোমার [illegible] আনন্দ।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারংবার নমস্কার করি।

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮



রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে শরৎচন্দ্রের ভাষায় দেশবাসীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ২য় খণ্ড	মাঘ, ১৩৩৮	১ম সংখ্যা

গান

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাদের দান যশের ডালায়
সব-শেষ সঞ্চয় (আমার)
নিতে মনে লাগে ভয়।
এই রূপলোকে কবে এসেছিনু রাতে,
গেঁথেছিনু মালা ঝরে-পড়া পারিজাতে,
আঁধারে অন্ধ, এ যে গাঁথা তারি হাতে
কী দিল এ পরিচয়॥
এরে পরাবে কি কলালক্ষ্মীর গলে
সাতনরী হারে যেথায় মাণিক জ্বলে?
একদা কখন অমরার উৎসবে
ম্লান ফুলদল খসিয়া পড়িবে কবে,
এ আদর যদি লজ্জার পরাভবে
সেদিন মলিন হয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Society of Oriental Art এর অভিবাদনের উত্তরে কবির গান।

পরিণয়-মঙ্গল

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন উষার নববীণা-ঝঙ্কারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোর-পরপারে
পাখী দুটী উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া-ঢাকা।
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা॥

কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি'
মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোঁহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথী,
কোথাও ছিলনা মানা

৩

দূর হ'তে এই ধরণীর ছবিখানি
দোঁহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি,
পুষ্পিত শ্যামলতা।
চারিদিক হতে বিরাটের মহাবাণী
শুনালো দোঁহারে ভাষার অতীত কথা॥

মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী
বেদনা আনিল কী অনির্ব্বচনীয়!
দোঁহার চিত্তে উচ্ছ্বসি' উঠে ধ্বনি—
"প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।"
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে পাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এলো তা'রি,
এলে নামি' ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিয়ে অকূল শূন্য ছাড়ি'
পরাণে পরাণে গান মিলাইলে গানে॥

দার্জ্জিলিং
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঢাকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার শুভ-পরিণয়োপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ।

শাপমোচন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গন্ধর্ব্ব সৌরসেন সুরলোকের সঙ্গীতসভায় কলানায়কদের মধ্যে অগ্রণী।

সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরু-শিখরে সূর্য্য প্রদক্ষিণে। সৌরসেনের মন ছিল উদাসী।

তাই অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, উর্ব্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।

স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্ব্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল, অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হোলো গান্ধার রাজগৃহে।

মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বল্‌লে, "বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না, দেবী, একই লোকে আমাদের গতি হোক্, একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।"

শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বল্‌লেন, "তথাস্তু, যাও মর্ত্ত্যে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।"

মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে—নাম নিল কমলিকা।

একদিন গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি। সেই ছবি তার দিনের চিন্তা, তার রাত্রের স্বপ্নের পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।

গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে। বিবাহ-প্রস্তাব শুনে রাজা বল্‌লে, "আমার কন্যার দুর্ল্লভ ভাগ্য।"

ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন। রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায় এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অস্ত্রবিহারিণী বীণা। স্তব্ধসঙ্গীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।

যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।

নির্ব্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতিরাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।

কমলিকা বলে, "প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।"

রাজা বলে, "আমার গানেই তুমি আমাকে দেখ।"

অন্ধকারে বীণা বাজে। অন্ধকারে [illegible] নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে। সেই নৃত্যকলা নির্ব্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে তার মর্ত্ত্যদেহে। নৃত্যের বেদনা রাণীর বক্ষে ঘা মারে, নিশীথরাত্রে সমুদ্রের জোয়ার এলে তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে, অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে যখন শুকতারা পূর্বগগনে, কমলিকা তার সুগন্ধী এলোচুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে, বল্‌লে, "আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে তোমাকে প্রথম দেখব।"

রাজা বল্‌লে, "প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না এই মিনতি।"

মহিষী বল্‌লে, "প্রিয়-প্রসাদ থেকে আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে। অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।" অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।

রাজা বল্‌লে, "কাল চৈত্রসংক্রান্তি। নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন। প্রাসাদ-শিখর থেকে চেয়ে দেখো।"

মহিষীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, বল্‌লে, "চিন্‌ব কী করে।"

রাজা বল্‌লে, "যেমন খুসি কল্পনা করে নিয়ো; সেই কল্পনাই হবে সত্য।"

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন। মহিষী বল্‌লে, "দেখলাম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরু-শ্রেণীতে বসন্ত বাতাসের মতো। সকলেই সুন্দর। যেন ওরা চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষের মানুষ। কেবল একজন কুশ্রী কেন রস-ভঙ্গ করলে, ও যেন রাহুর অনুচর। ওখানে কী গুণে সে পেলে প্রবেশের অধিকার।"

রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল। কিছু পরে বললে, "ঐ কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান। কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্য্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, মরুনীরস কালো মর্ত্তের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনই তো শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।"

"না, মহারাজ, না" বলে মহিষী দুইহাতে মুখ ঢাকলে।

রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁওয়া লাগল। বল্‌লে, "যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভরে উঠত তাকে ঘৃণা করে মনকে কেন পাথর করলে"।

"রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে" এই বলে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল।

রাজা তার হাত ধর্‌লে, বল্‌লে, "একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে। কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা"।

ভ্রূকুটিল করে মহিষী বললে, "অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝিনে। ঐ শোন, উষার প্রথম কোকিলের ডাক, অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি। আজ সূর্য্যোদয়-মুহূর্ত্তে তোমারও প্রকাশ হবে আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলাম।"

রাজা বল্‌লে, "তাই হোক্, ভীরুতা যাক্ কেটে।"

দেখা হোলো। টলে উঠল যুগলের সংসার। "কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা,"—বল্‌তে বল্‌তে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

গেল বহুদূরে,—বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জ্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে। কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।

রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধঘুমে সে শুনতে পায় এক বীণাধ্বনির আর্ত্তরাগিণী। স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে, মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।

রাতের পরে রাত যায়। অন্ধকারে তরুতলে যে-মানুষ ছায়ার মতো নাচে তাকে চোখে দেখিনে তার হৃদয় দেখি, যেমন দেখি জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায় দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার।

এ কী হোলো রাজমহিষীর। কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে। মাটির প্রদীপের শিখায় সোনার প্রদীপ জ্ব'লে উঠ্‌ল বুঝি। রাত-জাগা পাখী নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়, তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখীর পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা, বেহাগ, বাজে কালাংড়া।

আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।

রাজমহিষী স্রস্তবেণী নিয়ে বিছানার পরে উঠে বসে। ত্রস্ত তার বক্ষ।

বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ। রাগিণীবিছানো সেই শূন্য পথে তার মন বেরিয়ে পড়ে।

কার দিকে, দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

একদিন নিম ফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্ব্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেচে। মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়াল। নীচে সেই ছায়ামূর্ত্তির নৃত্য, বিরহের সেই ঊর্ম্মিদোলা।

মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত। ঝিল্লীঝঙ্কৃত রাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে। অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইচে। সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে। কখন নাচ আরম্ভ হোলো সে জানে না। এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

গেল আরো দুই রাত। অভিসারের পথ একান্তই শেষ হয়ে আসচে এই জানালারই কাছে।

সেদিন বীণায় পরজের বিহ্বল মীড়। কমলিকা আপন মনে নীরবে বলচে, ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না। আমার আর দেরী নেই।

কিন্তু যাবে কার কাছে। চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো।

কেমন করে হবে। দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দিলে সাতসমুদ্রপারে, রূপকথার দেশে। সেখানকার পথ কোন্ দিকে?

আরো এক রাত যায়। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ অমাবস্যার তলায় ডুবেচে। আঁধারের ডাক কী গভীর। পথ-না-জানা যত সব গুহা গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগালো সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে ঐ যে বাজে বীণায় কানাড়া।

রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ আমি [redacted]আমার চোখকে আমি আর ভয় করিনে।
পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে সে গেল পুরাতন অশথ গাছের তলায়।
বীণা থামল। মহিষী থমকে দাঁড়াল। রাজা বললে, "ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।"
তার গলার স্বর জলে ভরা মেঘের দূর গুরু গুরু ধ্বনির মতো।
"আমার কিছু ভয় নেই, তোমারি জয় হোলো।" এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠ্‌ল, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কী সুন্দর রূপ তোমার।"
কখন দুইজনেরই অগোচরে বিরহবেদনার তাপে ইন্দ্রের শাপ স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে

অভ্যর্থনা

দেব !

দেশের গৌরব জাতির গৌরব
আমারো গৌরব তুমি—
তোমারে পেয়ে যে কৃতার্থা হয়েছে
আমারি মাতৃ-ভূমি।

১১ই পৌষ
রবিবার
১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

প্রণতা—
মানকুমারী।

জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে অভিনন্দন ও কবির উত্তর

কলিকাতা পৌর-সভার অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবি-প্রতিভা সমগ্র সভ্যজগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জনসমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন - তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতা-বাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গ-ভাষাকে অপূর্ব্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙ্গলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, এবং তোমার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারা বাঙ্গালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞান-গুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

বন্দেমাতরম্।

তোমার গুণগর্ব্বিত

কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষে

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

মেয়র

কলিকাতা, ১১ই পৌষ, ১৩৩৮।

কবির উত্তর

একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্ত্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসংবর্দ্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে আরোগ্যে আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহার প্রবর্ত্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি॥

অর্ঘ্যাভিহরণ

অর্ঘ্যদান

এতচ্চন্দনমত্র শীলমিব তে চন্দ্রোজ্জ্বলং শীতলং
দীপোঽয়ং প্রতিভাপ্রভাব ইব তে কান্তঃ স্থিরং দীপ্যতে।
ধূপোঽয়ং তব কীর্ত্তিসঞ্চয় ইবামোদৈর্দিশো ব্যাপ্নুতে
মাল্যং নির্ম্মলকোমলং তব মনস্তুল্যং সমুল্লাসতে॥
কম্বুস্থাপিতমেতদম্বু সরসং কাব্যং ত্বদীয়ং যথা
পুষ্পশ্রেণিরিয়ং গুণালিরিব তে পৌরজনাকর্ষিণী।
অর্ঘ্যং তাবদিদং কৃতং তব কৃতে দূর্ব্বাঙ্কুরান্বিতং
নবেতৎ প্রতিগৃহ্যতাং করুণয়া স্বস্ত্যস্তু তে শাশ্বতম্॥

আপনার শীলের ন্যায় এই চন্দন চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ও শীতল, আপনার রমণীয় প্রতিভাপ্রভাবের ন্যায় এই দীপ স্থির ভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে। আপনার কীর্ত্তিরাশির ন্যায় এই ধূপ সৌরভে সমস্ত দিক্‌কে ব্যাপ্ত করিতেছে। আপনার মনের ন্যায় নির্ম্মল ও কোমল এই মাল্য উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। আপনার কাব্যের ন্যায় সরস এই জল শঙ্খে স্থাপিত করা হইয়াছে, এবং আপনার গুণসমূহের ন্যায় এই কুসুমগুলি দর্শকগণকে আকর্ষণ করিতেছে। দূর্ব্বার অঙ্কুর প্রভৃতির দ্বারা আমরা আপনার জন্য এই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। আপনি করুণা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন। আপনার শাশ্বত কুশল হউক!

প্রশস্তিপাঠ

ভেদো যস্য ন বস্তুতোঽস্তি ভুবনে প্রাচী প্রতীচীতি বা
মিত্রত্বং প্রকটীকৃতং চ সততং যেনাত্মনঃ কর্ম্মণা।
বিশ্বং যস্য পদং প্রসিদ্ধমনিশং সত্যে চ যস্য স্থিতি-
র্ভূয়াৎ তস্য জয়ো রবেরবিরতং তেনাস্তু তৃপ্তং জগৎ॥

যাঁহার প্রাচী ও প্রতীচী বলিয়া ভুবনে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, যিনি সতত নিজের কর্ম্মের দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন যে তিনি মিত্র, বিশ্বই যাঁহার প্রসিদ্ধ স্থান, এবং সত্যেই যিনি নিয়ত অবস্থান করেন, সেই রবির অবিরাম জয় হউক ও তাহাদ্বারা জগৎ তৃপ্তি লাভ করুক!

শান্তিপাঠ

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তি রোষধয়ঃ
শান্তির্বিশ্বে নো দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়ামোঽহং যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তুনঃ॥

পৃথিবী শান্তিময় হউক! অন্তরীক্ষ শান্তিময় হউক! দ্যুলোক শান্তিময় হউক! জল শান্তিময় হউক! ওষধিসমূহ শান্তিময় হউক! বিশ্বদেবগণ আমাদের জন্য শান্তিময় হউন! এখানে যাহা কিছু ভয়ানক, যাহা কিছু ক্রূর, যাহা কিছু পাপ, তাহা আমরা সেই সকল শান্তি দ্বারা, সমস্ত শান্তির দ্বারা উপশমিত করি! তাহা শান্ত হউক! তাহা শিব হউক! সমস্তই আমাদের কল্যাণকর হউক!

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অভিনন্দন

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

হে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে, সাদরে ও সগৌরবে আপনাকে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায়, সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকুণ্ঠ ভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে—দেবী আপনার শিরে অমর-বর বর্ষণ করিয়াছেন—আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাঁহার অমৃত-বীণার অভয় মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। হে বরাভয়মণ্ডিত মনীষী, আপনি শতায়ু হইয়া, এই মোহনিদ্রায় নিষুপ্তজাতির প্রাণে বীর্য্য ও বলের প্রেরণা দ্বারা, তাহার সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন, এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া, মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নব নব সুষমা ও সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঊনচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপিয়া আপনার উপচীয়মান শুভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আপনার বক্তৃতার মন্ত্রে ইহার আদ্য বার্ষিক উৎসব মন্ত্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার আপনার স্মরণীয় ষষ্টিতম জন্মদিনে সংবর্দ্ধনার সম্ভারে সজ্জিত করিয়া, পরিষৎ আপনাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবি-জীবনের সেই সেই সন্ধি-ক্ষণে উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনার কীর্ত্তি-ভাতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আজ সফলতার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। সু-ধন্য আপনি মানবের বিনশ্বর দুঃখ-সুখের মধ্যে সত্যের শাশ্বত স্বরূপকে দর্শন করিয়াছেন, এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া, যুগ-যুগান্ত-লব্ধ ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাগীরথী-ধারার ন্যায় মর্ত্ত্যে আবার অবতীর্ণ করাইয়াছেন। হে সত্যদ্রষ্টা, আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, 'বর্ণ-গন্ধ-গীতময়' এই বিচিত্র বিশ্ব যাঁহার সুরভি-শ্বাস, কবি-কোবিদের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম-প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস, সেই শঙ্কর বিশ্বম্ভর বিশ্বকবি আপনার চির-স্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন ; যদ্ ভদ্রং তদ্ ব আ সুবতু ; আর, স বো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

কলিকাতা সভাপতি।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ই পৌষ।

কবির উত্তর

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আরম্ভ কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল এ কথা তাঁহারা সকলেই জানেন যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তীসভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ত্তমান জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা সভার সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসাবাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে—যাঁহাদের হস্ত অদ্য স্তব্ধ, যাঁহাদের বাণী নীরব।

অদ্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সর্ব্বজনবরণ্যে জননায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন এই পত্রে সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্তকালকে উজ্জ্বল করিলেন এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।

হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিনন্দন

শ্রীকবীন্দ্র শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

মাননীয় মহোদয়,

হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কী ঔর সে আপকী ৭০ বঁী বর্ষ গাঁঠ কে অবসর পর হম আপকা সাদর অভিনন্দন করতে অউর বধাই দেতে হ্যাঁয়।

শ্রীমন্ ভারতবর্ষ মে এক সে এক বঢ়কর অনেক প্রতিভাশালী ঔর প্রভাবশালী কবি হো গয়ে হ্যাঁয়, পুষ্কলধন ঔর যথেষ্ট সম্মান সে পুরস্কৃত হুএ হ্যাঁয়। রাজপুতানে কে চারণ কবিয়োঁনে অপনে সাময়িক কবিত্বপূর্ণ উপদেশ দ্বারা ইতিহাস কা স্বরূপ তক পলট দিয়া হ্যায়, তথা হিন্দী কবিয়োঁনে মুগল সম্রাটোঁ তক কো অপনী কবিতা কা চমৎকার দিখা দিয়া হ্যায়। অউর মহাকবি ভূষণনে তোঁ অপনী কবিতা দ্বারা হিন্দুরাজ্য কে পুনঃ সংস্থাপন মেঁ বড়ী সহায়তা পহুঁচাঈ হ্যাঁয় ঔর আপনে ভী অপনী বিলক্ষণ কবিত্বশক্তিসে স্পৃহনীয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তকর ভারত কা গৌরব বঢ়ায়া হ্যায়।

কবীন্দ্র! আপনে বিশ্বভারতী কী স্থাপনা কর প্রাচ্য ঔর প্রতীচ্য কে সম্মেলন কে লিয়ে জো ক্ষেত্র বনা দিয়া হ্যায় উসসে আপকী কীর্ত্তি-কৌমুদী চারোঁ দিশাওঁমে ফৈল গঈ হ্যাঁয়। হমারা সাংস্কৃতিক দৌত্য স্বীকার কর আপনে জো কাম য়োরোপ ঔর এশিয়া কে দেশোঁ মেঁ কিয়া হ্যায় ঔর জিস প্রকার ভারত কী মহিমা কা বখান কিয়া হ্যায় উসকে লিয়ে হম আপকে কৃতজ্ঞ হ্যায়।

হম পুন: আপকা অভিনন্দন করতে হুএ পরমাত্মাসে প্রার্থনা করতে হ্যাঁয় কি বহ আপকো দীর্ঘজীবন প্রদান করেঁ।

আপকে

অমর কীর্ত্তি কামনার্থী

হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন কা সদস্য

৩ পৌষ, কৃষ্ণাতৃতীয়া,

রবিবার, ১৯৮৮।

কবিভাষণ

আজ হিন্দীভারতী নে অপনী সহোদরা বঙ্গভারতী কো সম্মানিত কিয়া হ্যায়। মৈঁ অপনে কো ধন্য সমঝতা হুঁ কি দৈব কৃপাসে মৈঁ ইস শুভ অনুষ্ঠান কা উপলক্ষ হো সকা হুঁ। কবি কা হৃদয় কভী অপনে জন্মস্থান কী সীমা কে অন্দর বন্দ নহীঁ রহতা হ্যায়, ঔর যদি উসকা যশ ইস সীমাকো পার করে তো বহ সৌভাগ্যবান্ হ্যায়। হিন্দী সাহিত্যকে দূতরূপ আপহী মেরা য়হ সৌভাগ্য বহন কর আয়ে হ্যাঁয়, ইস লিয়ে আপ মেরা সকৃতজ্ঞ নমস্কার স্বীকার করেঁ।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিনন্দন

জয়ন্তী-অর্ঘ্য

হে কবি! জয়ন্তী-অর্ঘ্য নিয়ে হাতে তোমার স্মরণে
সুদূর প্রবাস হ'তে এই পথে, কবিনিবেদনে,
এলো যারা, সেকি তারা বয়সের দাবী শুনে তব?
তা তো নয়, দেখি রূপ, অপরূপ, চির অভিনব;
বয়সের সীমা তব, নিত্য নব নর্ত্তনের কোলে,
সপ্ততি বৎসর বুকে, সাত বৎসরের শিশু দোলে
সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন; সময়ের হিসাব না রাখে,
বিস্মিত বিশ্বের মন তার পানে চেয়ে শুধু থাকে।
কার চোখে এত দীপ্তি? কার বাণী নিত্য বহমান?
কার প্রীতি নিতি নিতি, রচি চলে বিশ্বের কল্যাণ
অফুরন্ত প্রাণ-রসে;—সে যে এই শিশু চিরন্তনী,
যুগে যুগে হে প্রবীণ! গাহ নবীনের জয়ধ্বনি।
বাঙ্গালার বুকের দুলাল! সত্যদ্রষ্টা! হে অমর কবি!
কালজয় করে তুমি জয় গেয়ে যেও সুরের পূরবী॥
চির-সবুজের সমারোহ নিত্য হোক জীবনে তোমার,
প্রবাসের ভালবাসা-ভরা,,লহ এই অর্ঘ্যউপচার।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

সপ্ততিতম-বর্ষ-অর্ঘ্যপত্র

দেশবাসীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

কবিগুরু,

॥ তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

॥ তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি জীবনবিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

॥ বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

॥ আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

॥ হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি, অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

॥ হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি। ইতি—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদপক্ষে
শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু
সভাপতি

কলিকাতা
রবিবার, কৃষ্ণাতৃতীয়া
১১ই পৌষ, ১৩৩৮ সাল বঙ্গাব্দ

কবির উত্তর

বিপুল জনসঙ্ঘের বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে সম্মিলিত একথা আমার মন সহজে ও সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্য্যের আলোক বাষ্পসিক্ত ধূলিবিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ায় ম্লান, কোথাও বা সে অন্ধকারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কোথাও বা সে বাধাহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্পকাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি—কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে অনবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতঃই বাধাবিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু না কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া, আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী-অনুষ্ঠান নিবিড় সংহত-ভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছিল—সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম দেশের প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়কে তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাটরূপে। সেই আশ্চর্য্যরূপ দেখিলাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অদ্যকার এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব্ব তাহা নহে, দেশের নিজের কাছেও। উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠসাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনো বুঝিবা তাঁহার অগোচরেও সুর পৌঁছিয়াছিল তাঁহার অন্তরে; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তখনো হয় ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভালো ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, যখন তাঁহার সেই মালার শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘজীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেই জন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত—"আমি গ্রহণ করিলাম।" সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটী বিস্তর আছে, সাধনায় কোনো অপরাধ ঘটে নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। সেইগুলি বুনিয়া বুনিয়া বিচার করিবার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্ম্মের যে সত্যরূপ, যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশলক্ষ্মী তাঁহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বরদান করিল। আমার জীবনের এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতোই উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অদ্যকার এই দিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

আপনাদের প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও গৌরব আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতেছি। আপনাদের এই আয়োজন সময়োচিত হইয়াছে। জীবনের গতি যখন প্রবল থাকে, তখন সম্মান গ্রহণ ও বহন করিবার দিন নয়। জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছায় তখনই তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে লওয়া যায়। কর্ম্মের গতি-বেগময় জীবনের মধ্যে সম্মান অনেক বিক্ষোভ ও বাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করে। আজিকার দিনে আপনাদের হাত থেকে তাই সবিনয়ে দেশের শেষ সম্মান আমি গ্রহণ করিতেছি ও দেশবাসীকে আমার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের শেষ নমস্কার জানাইয়া যাইতেছি।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে

হে কবি,

তোমার বাঁশির সুর আমাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার তুচ্ছকথা ভুলাইয়া দেয়। ভারতের মর্ম্ম-গাথা, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন-গীতি তোমার বাঁশির চিরন্তনী বাণী; মুগ্ধজগত মূকবিস্ময়ে তোমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়; আমরা তোমাকে অন্তরলোকে বরণ করি।

হে জ্ঞানী,

বিভিন্ন জ্ঞানধারার অপূর্ব্ব সমন্বয় তুমি; আর্য্যের গৌরব তুমি, বাঙ্‌লার গরব তুমি;—জ্ঞানপীঠের সেবক আমরা, তোমাকে আমরা পূজা করি।

হে প্রিয়,

পরম রহস্যের পরম দ্রষ্টা তুমি,—তোমার মাঝে আমাদেরই অন্তরের নিখিল মিলনের সন্ধান পাই; তোমার গানে আমাদেরই সুর বাজে; তুমি আমাদেরই, তোমাকে আমরা অভিবাদন করি।

কলিকাতা,
১৯শে পৌষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটের
শ্রদ্ধানত সভ্যগণ।

কবির উত্তর

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদে প্রাঙ্গণ রচনা করিয়াছে। বিদ্যায়তনের ভিতরের সহিত বাহিরের মিলন এইখানেই, শাস্ত্রিক বিদ্যার সহিত কলাবিদ্যারও মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের, নূতন ছাত্রের সহিত পুরাতন ছাত্রের মিলনের এই ক্ষেত্র। এই মিলনে চিত্ত সরস ও বিদ্যা প্রাণবান হইয়া উঠিবে এই প্রত্যাশা আমার মনে রহিল।

১৯ পৌষ
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-পরিষদের ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে বিশ্ববরেণ্য কবি!

আজিকার এই শুভ-উৎসব-দিবসে বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণ-তলে দাঁড়াইয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করি—তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ কর!

হে ঋষি!

তোমার দিব্য-প্রতিভা-বিচ্ছুরিত আলোকে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি বিশ্বজনের নয়ন সম্মুখে ভাস্বর দীপ্তিতে বিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচীর সভ্যতাকে এক বৃন্তে গ্রথিত করিয়া তুমি এক নব-সভ্যতার শতদল উন্মোচন করিয়াছ। তাই আজ এই জয়ন্তী-উৎসব-উপলক্ষে আমরা তোমাকে বন্দনা করি—তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ধন্য কর

হে মরমী বন্ধু!

নিখিলের আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, আকুতি-মিনতিকে তুমি রূপে, রেখায়, চিত্রে, সঙ্গীতে, কাব্যে, নাটকে শতবিচিত্র অভিব্যক্তি দান করিয়াছ। তুমি আমাদের সখা—পরমবন্ধু—তোমাকে আমরা সম্ভাষণ করি—তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর!

হে মনীষী!

তোমার দৈবী-প্রতিভার মায়াকাঠির স্পর্শে বাংলা সাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে তুমি কত বিচিত্র রসসম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছ,—নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর জন্য রূপ ও রসের নব নব জগতের সন্ধান জানাইয়াছ। আজ এই রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে তোমার বৃহত্তর ভক্তমণ্ডলীর সহিত আমরাও আজ আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার অকিঞ্চন অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য কর।

ইতি।

রবীন্দ্র-পরিষদের সদস্যবৃন্দের পক্ষে
সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রেসিডেন্সী-কলেজ-বঙ্কিম-শরৎ সমিতির ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে ভাস্বর হোমশিখা, হে অন্তহীন রস-পারাবার,
দশদিক্‌ জয়ী হে কবিসম্রাট্
শত চিত্তের ভক্তি-অর্ঘ্য লহো ॥

রসের অপূর্ব্ব পরশে আমাদের চিত্তাকাশ অপরূপ
রঙে রাঙিয়ে গেলে তুমি, ওহে সুন্দর-চিত্ত ;
অন্তর-বাহিরের সকল অন্ধকার অপসারিত করে
দিয়ে গেলে তুমি ওগো শুভ্র-চিত্ত ;
সব-বন্ধন ছিন্ন করে' অবারিত সীমাহীন পথে
টেনে নিয়ে গেলে তুমি আমাদের—
ওগো বন্ধনহীন-চিত্ত—
শত চিত্তের ভক্তি-অর্ঘ্য লহো ॥

ভাষা-জননী দিয়েছেন তোমার ললাটে শুভ্র
চন্দন-রাগ হে ভাষার পুরোধা, দেশ জননী কল্যাণ-হস্তে
কণ্ঠে দিয়েছেন মণি-মাণিক্য-হার হে সন্তান-শ্রেষ্ঠ,
বিশ্বজননী সস্নেহে তোমায় গ্রহণ করেছেন আপন
হৃদয়ের মণি-কোঠায়,
হে প্রাচীর প্রদীপ্ত সূর্য্য —
শত চিত্তের ভক্তি-অর্ঘ্য লহো ॥

আমাদের আকাশের নীলিমাকে আরো গাঢ় করিল কে ?
সে ত তুমি ! আমাদের ধরণীর প্রতি ধূলিকে আরো
মধুর করিল কে ?—সে ত' তুমি ! আমাদের দুঃখ দৈন্য-
ভরা প্রতি হৃদয়কে গানে গানে সুন্দর করে দিয়ে গেল কে ?
সে ত তুমি !
ওগো সুন্দরের পূজার —
শত চিত্তের ভক্তি অর্ঘ্য লহো ॥

আমাদের প্রাণের চিরবসন্ত তুমি, হে স্বপ্নময় প্রাণ ;
আমাদের জাগরণের চিরপ্রভাত তুমি—হে দীপ্তময় প্রাণ ;
আমাদের চিরদিনের মুক্তির দুর্জ্জয়-বাণী তুমি
হে অমৃতময় প্রাণ ;—
শত চিত্তের ভক্তি অর্ঘ্য লহো ॥

তোমার প্রকাশ অন্তহীন কালের মাঝে ওগো সীমাহীন ;
প্রতিদিনের কর্ম্ম-কোলাহলের বহু উর্দ্ধে তোমার আসন,
হে নিত্যকাল শিখা ; তুমি বাণী—শাশ্বত জ্যোতির্ম্ময়,
যুগ-যুগান্তের ; ওগো মৃত্যুহীন—
শত চিত্তের ভক্তি-অর্ঘ্য লহো ॥

হে ঋত্বিক—আজ তোমার জয়ন্তী-উৎসব।
এ উৎসব আজ আকাশের তারায়, ধরণীর ফুলে আর
মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে।
হে মায়াবী কবি, আজ কণ্ঠ আমাদের মূক, অকথিত-
আনন্দে—
ওগো চির-অনির্ব্বচনীয়—
মূক-হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য লহো ॥

ইতি—
প্রেসিডেন্সী কলেজ-বঙ্কিম-শরৎ সমিতির সদস্যবৃন্দের
পক্ষে
সভাপতি—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভাষণ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। সহরের বাইরে সহরতলীর মতো, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘর-বাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট ক'রে বাঁধেনি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্ব্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্ষা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর দালান, তিন চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধ'রে রাখবার মোটা-মোটা জালা সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্ব্বযুগের নানা পালপার্ব্বণের পর্য্যায় নানা কলরবে সাজেসজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল ক'রেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে প'ড়ে গেছি। আমি এসেচি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েচে, নতুন কাল সবে এসে নাম্‌ল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয়নি।

এ বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে, তেমনি পূর্ব্বতন ধনের স্রোতেও প'ড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল, দহন-শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটি মাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণ-সমাকীর্ণ পূর্ব্বকালের আমোদ প্রমোদ বিলাস সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলি-মলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদিবা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

এই নিরালায়, এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,—মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছ-পালা জীব জন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কল্‌কাতার লোক যাকে ইসারা ক'রে ব'লত ঠাকুরবাড়ীর ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চাল-চলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হ'তো ইংরেজী,—চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন কি, মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারেনি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হ'য়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি ক'রেচি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণতঃ বাংলাদেশে ধর্ম্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্ত্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওয়াল্‌টর স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" আর তার পরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর

সফলতা থাকে না, যতটা ক্ষয় ততটা পূরণ হয় না। অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সেই সর্ব্বকালের মোহানার দিকে যাত্রা করতে হবে যেখানে কাল স্তব্ধ। গতির সাধনা শেষ ক'রে তখন স্থিতির সাধনা।

মনু যে-মেয়াদ ঠিক্ ক'রে দিয়েচেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধ'রে খাটানো প্রায় অসাধ্য। মনুর যুগে নিশ্চয়ই জীবনে এত দায় ছিল না, তা'র গ্রন্থি ছিল কম। এখন শিক্ষা বলো, কর্ম্ম বলো, এমন কি আমোদ প্রমোদ খেলা-ধূলা, সমস্তই বহুব্যাপক। তখনকার সম্রাটেরও রথ যত বড়ো জমকালো হোক্, এখনকার রেলগাড়ীর মতো তাতে বহুগাড়ীর এমন দ্বন্দ্বসমাস ছিল না। এই গাড়ীর মাল খালাস ক'রতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটার আপিসে ছুটি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বটে কিন্তু খাতাপত্র বন্ধ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাড়ি-মুখো হবার আগেই বাতি জ্বালতে হয়। আমাদের সেই দশা। তাই পঞ্চাশের মেয়াদ বাড়িয়ে না নিলে ছুটি মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারচি আমার সময় চ'লল আমাকে ছাড়িয়ে —কম ক'রে ধ'রলেও অন্তত দশবছর আগেকার তারিখে আমি ব'সে আছি। দূরের নক্ষত্রের আলোর মতো, অর্থাৎ সে যখনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থাম্‌বার আগে চলার ঝোঁকে অতীতকালের খানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্ত্তমানের উপরে। গান সমস্তটাই শমে এসে পৌঁছলে তার সমাপ্তি; তবু আরো কিছুক্ষণ ফরমাস চলে পালটিয়ে গাবার জন্যে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর পরে বড়ো জোর ছুটো একটা তান লাগানো চলে, কিন্তু চুপ ক'রে গেলেও লোকসান নেই। পুনরাবৃত্তিকে দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা আর রুই মাছটাকে ডাঙায় তুলে মাসখানেক বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরো একটু এগিয়ে নেওয়া যাক। মাছ যতক্ষণ জলে আছে ওকে কিছু কিছু খোরাক জোগানো সৎকর্ম্ম, সেটা মাছের নিজের প্রয়োজনে। পরে যখন তাকে ডাঙায় তোলা হোলো তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপর কোনো জীবের। তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয় ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে ভালোই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজনে। তার পরে তার পূর্ণতায় যখন একটা সমাপ্তির যতি আসে তখন তার সম্বন্ধে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃণ্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গ'ড়ে তোলা হোলো। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় ম'রে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা প'ড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী।

তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তারেই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে, মরুবালুতলে ভূমির মতো।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্ব্বজনসমক্ষে নিজের ব'লে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা ক'রতে চায়। যেদিন তাই করে, সেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেখ্ যদি কোনোভাবে নিজেকে লাভ না ক'রে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ কথায় অহঙ্কারের আশঙ্কা ক'রে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হন তবে তাঁদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। যে-খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয় ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মস্ত হ'য়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হ'য়ে। আতসবাজীর অগ্নিবিলাসক আলোটাই তার নির্ব্বাণের উজ্জ্বল তর্জ্জনী সঙ্কেত।

এ কথায় সন্দেহ নেই যে পুরস্কারের পাত্র নির্ব্বাচনে দেশ ভুল ক'রতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতির মৌনসাধন বারবার দেখা গেছে। তাই আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিশয় উল্লাস যেন না করি এই উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। তেমনি তা নিয়ে এখনি তাড়াতাড়ি বিমর্ষ হবারও আশু কারণ দেখি না। কালে কালে সাহিত্য বিচারের রায় একবার উল্‌টিয়ে আবার পাল্‌টিয়েও থাকে। অব্যবস্থিত-চিত্ত মন্দগতি কালের সব-শেষ বিচারে আমার ভাগ্যে যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনি আগাম শোচনা ক'রতে বসা কিছু নয়। এখনকার মতো এই উপস্থিত অনুষ্ঠানটাই নগদ লাভ। তারপরে চরম জবাবদিহির জন্যে প্রপৌত্রেরা রইলেন। আপাতত বন্ধুদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক, অপর পক্ষে যাঁদের অভিরুচি হয় তাঁরা ফুৎকারে বুদ্‌বুদ বিদীর্ণ করার উৎসাহে আনন্দ ক'রতে পারেন। এই দুই বিপরীত ভাবের কালোয় সাদায় সংসারের আনন্দধারায় যমের কন্যা যমুনা ও শিবজটা-নিঃসৃতা গঙ্গা মিলে থাকে। ময়ুর আপন পুচ্ছগর্ব্বে নৃত্য ক'রে খুসি, আবার শিকারী আপন লক্ষ্যবেধগর্ব্বে তাকে গুলি ক'রে মহা আনন্দিত।

আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে লোকচিত্তের সম্মতি অতি ঘন ঘন বদল হয় এটা দেখা যাচ্চে। বেগ বেড়ে চ'লেচে মানুষের যানে বাহনে, বেগ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্চে মানুষের মন প্রাণকে।

যেখানে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা উগ্র সেখানে এই বেগের মূল্য বেশি। ভাগ্যের হরির লুট নিয়ে হাটের ভিড়ে ধুলার 'পরে যেখানে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি, সেখানে যে-মানুষ বেগে জেতে মালেও তার জিৎ। তৃপ্তিহীন লোভের বাহন বিরামহীন বেগ। সমস্ত পশ্চিম মাতালের মতো টলমল ক'রচে সেই লোভে। সেখানে বেগবৃদ্ধি ক্রমে লাভের উপলক্ষ্য না হ'য়ে স্বয়ং লক্ষ্য হ'য়ে উঠ্‌চে। বেগেরই লোভ আজ জলে স্থলে আকাশে হিস্টীরিয়াগ্রস্ত চীৎকার ক'রতে ক'রতে ছুটে বেরোলো।

কিন্তু প্রাণ পদার্থ তো বাষ্প বিদ্যুতের জুতে তাড়া করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই এক মাত্রা টান সয় তা'র বেশি নয়। মিনিট কয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সাধ্য হতে পারে কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিকলের চাকা নয়, তা'র পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে। গানের লয় মিষ্টি লাগে যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে দুন থেকে চৌদুনে চড়ালে সে কলা-দেহ ছেড়ে কৌশল-দেহ নেবার জন্যই হাঁসফাঁস ক'রতে থাকে। তাগিদ যদি আরো বাড়াও তা'হলে রাগিণীটা পাগলা-গারদের সদর গেটের উপর মাথা ঠুকে মারা যাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভালো ক'রে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘণ্টায় বিশ পঁচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তা'র পক্ষে কুয়াসা দেখা। একদা তীর্থযাত্রা ব'লে সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল। ভ্রমণের পূর্ণস্বাদ নিয়ে সেটা সম্পন্ন হোত। কলের গাড়ির আমলে তীর্থ রইল, যাত্রা রইল না, ভ্রমণ নেই পৌঁছনো আছে, শিক্ষাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাস করা যাকে বলে। রেল কোম্পানীর কারখানায় কলে-ঠাসা তীর্থযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দামের বটিকা সাজানো, গিলে ফেল্‌লেই হোলো—কিন্তু হোলোইনা যে সে কথা বোঝবারও ফুরসুৎ নেই। কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত ক'রে দিয়ে য়েরোপ্লেন-দূতকে অলকায় পাঠাতেন তাহ'লে অমন দুই সর্গভরা মন্দাক্রান্তা ছন্দ ছুচারটে শ্লোক পার না হ'তেই অপঘাতে ম'রত। কলে-ঠাসা বিরহ তো আজ পর্য্যন্ত বাজারে নামেনি।

মেঘদূতের সেই শোকাবহ পরিণামে শোক ক'রবে না এমনতরো বলবান পুরুষ আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্চে। কেউ কেউ ব'ল্‌চেন, এখন কবিতার যে আওয়াজটা শোনা যাচ্চে সে নাভিশ্বাসের আওয়াজ। ওর সময় হ'য়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয় সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে বাঁধা কিন্তু তা'র কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ-ভাঙা।

আঙুরের ক্ষেতে চাষী কাঠি পুঁতে দেয়, তারি উপর আঙুর লতিয়ে উঠে আশ্রয় পায়, ফল ধরায়। তেমনি জীবনযাত্রাকে সবল ও সফল করবার জন্যে কতকগুলি রীতিনীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্জীব নীরস; উপদেশ অনুশাসনের খুঁটি। কিন্তু যেখানে

লাগানো জিয়ল কাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে, তেমনি জীবনযাত্রা যখন প্রাণের ছন্দে শান্ত গমনে চলে তখন শুক্‌নো খুঁটি-গুলো অন্তরের গভীরে পৌঁছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সঞ্জীবনরস। সেই রসে তত্ত্ব ও নীতির মতো পদার্থও হৃদয়ের আপন সামগ্রীরূপে সজীব ও সজ্জিত হ'য়ে ওঠে, মানুষের আনন্দের রং তাতে লাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই চিরন্তনতা। একদিনের নীতিকে আর-একদিন আমরা গ্রহণ নাও ক'র্‌তে পারি কিন্তু সেই নীতি যে-প্রীতিকে যে-সৌন্দর্য্যকে আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ ক'রেচে সে আমাদের কাছে নূতন থাক্‌বে। আজো নূতন আছে মোগল সাম্রাজ্যের শিল্প—সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্য-নীতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি।

কিন্তু যে-যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হ'য়ে নিরেট হ'য়ে যায় সে যুগ প্রয়োজনের, সে যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হ'তে। আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মতোই সাহিত্য-ধারার মধ্যেও ভূরি ভূরি ঢুকে পড়েচে। তা'রা বাস ক'র্‌তে আসে না, সমস্যাসমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলঙ্কৃত হোক্ তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবী মিট্‌লেই তার অন্তর্দ্ধান।

এমন অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়া বদল হয় এবেলা ওবেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না, পিছনটাকে লাথি মেরেই চলে, যাকে উঁচু ক'রে গড়েছিল তাকে ধূলিসাৎ ক'রে তা'র 'পরে অট্টহাসি। আমাদের মেয়েদের পাড়ওয়ালা সাড়ি, তাদের নীলাম্বরী, তাদের বেনারসী চেলি মোটের উপর দীর্ঘকাল বদল হয়নি—কেননা ওরা আমাদের অন্তরের অনুরাগকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের চোখের ক্লান্তি হয় না। হতো ক্লান্তি, মনটা যদি রসিয়ে দেখ্‌বার উপযুক্ত সময় না পেয়ে বে-দরদী ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হ'য়ে উঠ্‌ত। হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশানের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির বদল। বদলটা দৌড়তে দৌড়তে প্রীতি সম্বন্ধের রাখী গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন-তেমন ক'রে পাক্-দেওয়া শণের দড়ি—সেটাকে বলব রিয়ালিজম—এখনকার দুদ্দাড় দৌড়ওয়ালা লোকের ঐটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফেশান হঠাৎ-নবাবের মতো উদ্ধত—তা'র প্রধান অহঙ্কার এই যে সে অধুনাতন, অর্থাৎ তা'র বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর কলটা পশ্চিম দেশের মর্ম্মস্থানে। ওটা এখনো পাকা দলিলে আমাদের নিজস্ব হয়নি। তবু আমাদেরও দৌড় আরম্ভ হোলো। ওদেরি হাওয়া-গাড়ির পায়দানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েচি। আমরাও খর্ব্বকেশিনী খর্ব্ববেশিনী সাহিত্যকীর্ত্তির টেকনিকের হাল্ ফ্যাশান নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্দ্ধা নিয়ে পুরাতনের মানহানি করতে অত্যন্ত খুসি হই।

এই সব চিন্তা করেই ব'লেছিলুম আমার এ বয়সে খ্যাতিকে আমি বিশ্বাস করিনে। এই মায়ামৃগীর শিকারে বনে বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে। কেননা সে-বয়সে মৃগ যদি বা নাও মেলে মৃগয়াটাই যথেষ্ট। ফুল থেকে ফল হতেও পারে, না হতেও পারে, তবু আপন স্বভাবকেই চাঞ্চল্যে সার্থক করতে হয় ফুলকে। সে অশান্ত, বাইরের দিকেই তার বর্ণ গন্ধের নিত্য উদ্যম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রয়োজন অপ্রগল্‌ভ শান্তি। শাখা থেকে মুক্তির জন্যেই তার সাধনা,—সেই মুক্তি নিজেরই আন্তরিক পরিণতির যোগে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেচে, যে-ফল আশু বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটির সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হ'লে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তি স্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি-অখ্যাতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

খ্যাতির কথা থাক্। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিস্ফীত। তার সঙ্কোচন প্রসারণ নিয়ে [illegible]

অতিমাত্র লুব্ধ হতে থাকে সে অভিশপ্ত। ভাগ্যের পরম দান প্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে-মানুষ কাজ দিয়ে থাকে খ্যাতি দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই যার কাজ প্রীতি না হলে তার প্রাপ্য শোধ হয় না।

অনেক কীর্ত্তি আছে যা মানুষকেই উপকরণ ক'রে গড়ে তোলা। যেমন রাষ্ট্র। কর্ম্মের বল সেখানে জনসংখ্যায়—তাই সেখানে মানুষকে দলে টানা নিয়ে কেবলি দ্বন্দ্বে চলে। বিস্তারিত খ্যাতির বেড়াজাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে করো, লয়েড জর্জ। তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে তখনই তাঁর কাজ চলে। বিশ্বাস আলগা হ'লে বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে, মানুষ-উপকরণ পুরোপুরি জোটে না।

অপর পক্ষে কবির সৃষ্টি যদি সত্য হ'য়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজার দরের ক্ষতি হয় কিন্তু সত্যমূল্যের কমতি হয় না।

ফুল ফুটেচে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগ্‌লো সেই জিৎল, ফুলের জিৎ তা'র আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট ক'রেচে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌চে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেচে সে তার সাহিত্য দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হাল্কা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্তধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্য্যবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েচে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে ব'সে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও মানবজীবনেও। দূরকাল ও বহুজনকে যে-সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাটির গাম্‌লায় তো তা'র বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে ব'ল্‌তে পারেন এ সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিল্‌চে না—তা যদি হয় তা'হলে সেই আধুনিক-কালটারই জন্যে পরিতাপ ক'র্‌তে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে সে চিরকালই আধুনিক থাক্‌বে এত আয়ু তা'র নয়।

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিককালে পুরোনো হ'য়ে গেছে তাহ'লে বুঝ্‌বো আধুনিক কালটাই হ'য়েচে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তা'র সহজ অনুরাগের রস পৌঁছচ্চে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পার্‌ল না। যে-কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখ্‌তে পার্‌বে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি ম'রেচে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজ্‌গবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেচে। তাই আশা করি যাঁরা

আমাকে জানবার কিছু চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্ততঃ তাঁরা একথা জেনেচেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হোলো না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন ক'রে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাতে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েচে, মনে হয়েচে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোট শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ-দূতগুলি বিচিত্র-রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্য করিনি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েচি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েচি যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুসিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুসি হ'য়ে উঠ্‌চে— ব'লে উঠ্‌চে কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টান্‌বে, এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ ক'রে বিদ্যমান ব'লেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগ্‌লামি ব'লে হেসে উঠলুম না।

যাঁর লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চ'লেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে।
যাঁর লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক, মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, তুচ্ছের কুৎসার তলে
প্রত্যহের বীভৎসতা।
যাঁর পদে মানী স'পিয়াছে মান,
ধনী স'পিয়াছে ধন, বীর স'পিয়াছে আত্মপ্রাণ,
যাঁহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েচে, বারবার নিজেকে বলেচি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেচে, যা রয়েচে তোমার চারিদিকে, তারি মধ্যে চিরন্তন, লোভ ক'রো না। কাব্য সাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়ষার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ ক'রে দেয়, তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন ক'রে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্য্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেকদিন থেকেই লিখে আসচি, জীবনের নানা পর্ব্বে নানা অবস্থায়। সুরু ক'রেচি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জ্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম ক'রেচি মহৎকে, আমি কামনা ক'রেচি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস ক'রেচি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্ম্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ ক'রেচি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েচি প্রসাদ। আমি এসেচি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে ব'সে আমার

অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম ক'রেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্ত্তে আমি প্রীতি কামনা করি আর কিছু নয়। এ-কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য পেয়েছি, সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেচেন সমস্ত জীবন আমি কী চেয়েছি, কী পেয়েছি, কী দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে, অসমাপ্ত সাধনায় কী ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা প্রীতিই সমগ্র ক'রে দেখে। আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েচেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্র সন্ধান বা ছিদ্র খনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্য্যন্ত অতি বড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মাননি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখ-বিকৃতি করা যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্ত্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেয়েচি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েচি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন ক'রে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেচে আমার ললাটে,—আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক্‌।

আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতি-নিকটের অতি-পরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেচেন, আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহুযত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমিষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা॥
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী॥
যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্‌ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিগত ১৭ই পৌষ সেনেট্‌ হলে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তর।

শান্তিনিকেতন প্রাক্তন ছাত্র-সভায় অভিভাষণ

(৭ই পৌষ ১৩৩৮)

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত (আই-সি-এস্)

আমি এখানে নূতন আগন্তুক। আজকের সভারম্ভে আমাকে president ক'রে আপনারা আমাকে যেমন একটু বিব্রত করেছেন তেমনি নিজেদের দুঃসাহসেরও পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্ট। শান্তিনিকেতনের spirit ব'লতে জিনিসটা যে কি তা আপনারা আমার চেয়ে ভালোই বোঝেন। আমি এ পর্যান্ত এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে এখানে যারা আমার মত বাইরে থেকে কাজ ক'রতে আসে তারা যা দেয় তার চেয়ে পায় ঢের বেশী। আর এই পাওয়াটা পেতে একটু সময় লাগে। কিন্তু আপনারা যারা এখানের শিক্ষা পেয়ে বড় হয়েছেন তাঁরা সহজেই বোঝেন যে এই প্রতিষ্ঠানের মূলে কি ভাব ছিল, আর কিসের জোরে শত ত্রুটী সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাধা বিপত্তিরও অন্ত নেই। যে দেশে যে যুগে আমরা কাজ করছি তার ধারাই এই যে, সহায় কি বন্ধু যদি জোটে একটি, ত নিন্দুক কি শত্রু জোটে দুটি। লোকরঞ্জন কি লোক-গঞ্জনের দিকে দৃকপাত না ক'রে কাজ ক'রে যাও কথাটা শুনতে বেশ। কিন্তু যে অর্থ পরমার্থের দিক থেকে সকল অনর্থের মূল, সেই অর্থই আমাদের পরমার্থ। যে মহাপুরুষ আমাদের ভাবের খোরাক অকাতরে যোগাচ্ছেন তিনিই এতদিন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে এতকাল অর্থ সংগ্রহ ক'রেছেন। আজ সেই ভার অন্যের দিতে হবে। যাঁরা একদিন এখানের ছাত্র ছিলেন এখন দেশ বিদেশে রয়েছেন বা ঘুরছেন তাঁদেরই প্রধানতঃ এই কাজ। এই শান্তিনিকেতন যে একটা স্কুল নয় একটা spirit একটা cult এটা তাঁরাই জগৎকে বোঝাবেন, তাঁরাই নিন্দুকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন যে "খবরদার"। তার পরে ভিতরের কাজ। ক্রমশঃ সেইদিন আসছে যে দিন নূতন লোকের নূতন উদ্যম নিয়ে আচার্য্যদের ও প্রাচীন অধ্যাপক মণ্ডলীর পাশে এসে দাঁড়াতে হবে আর বলতে হবে যে আমাদের ভয় নেই আপনাদের এত সাধের কাজ আমরা মাথায় ক'রে নেব। কে এই সব নূতন লোক? সেও আপনারা যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের alumni—কিন্তু আপনাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে কতকটা কেন্দ্রীভূত করতে হবে, আপনাদের পরস্পরের মধ্যে ও alma-mater এর সঙ্গে একটা যোগ-সূত্র যা'তে থাকে তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে, আর অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে কিন্তু অর্থবল সংগ্রহ ক'রতে হবে। যাঁদের ওরই মধ্যে একটু অবসর বেশি তাঁরা কাজের ভার নেবেন অথবা অন্য সকলে তাঁর সাহায্য ক'রবেন যত রকমে পারেন। একটা জিনিস শুধু দেখবেন যে প্রভাতে মেঘ-ডম্বরের মত আপনাদের প্রচেষ্টা আরম্ভে শুরু হয়ে অন্তে লঘু না হয়। তা যদি হয় ত সেটা শান্তিনিকেতনের spirit হবে না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টেল আর্টের সদস্যগণ দ্বারা

কবি শিল্পী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে

অর্ঘ্য-প্রশস্তি দান

২০শে পৌষ ১৩৩৮ সাল

স্থান :—কবির নিজ ভবন

মন্ত্রগুলি শ্রীক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক অথর্ববেদ প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

কবির অসুস্থতা ও তাঁহার অনিবার্য্য অনুপস্থিতির হেতু ঘোষণা।

১। ঐক্যতান বাদ্য।

২। শঙ্খধ্বনি হইলে গীতবাদ্য সহ শিল্পিদলের প্রবেশ।

(ক) নন্দলাল বসু কর্তৃক শিল্পিগণকে স্বস্থানে বসান।

(খ) ছোট ছেলেমেয়েদের শিল্পিগণকে মাল্য-চন্দন দান—শঙ্খধ্বনি সহ।

শিল্পিগণ সকলে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ—

অনুবাদ

হে ভদ্রগণ, যিনি আজ আমাদের মধ্যে আসিতেছেন তাঁহার সহিত আমাদিগকে সম্যক যুক্ত করুন, আমরাও যেন তাঁহার সহিত সঙ্গত হই। আমরা যেন পরম কল্যাণে ইঁহার সহিত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারি, ইনিও কল্যাণের সহিত সর্ব্বত্র বিচরণ করুন।

সকলে বসিলে—মন্ত্রোচ্চারণ

অনুবাদ

এখানে তোমাদের মধ্যে যাঁহাদের মন বিরুদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন (বিব্রত) তাঁহাদিগকে প্রণয়ের দ্বারা এক সূত্রে এক আদর্শে একভাবে একব্রত ও অবিরোধ করিতেছি, তাঁহাদিগকে সংগত করিয়া ঐক্যপ্রাপ্ত করিতেছি।

প্রত্যুচ্চার মন্ত্র

×

আমাদের সকল চিত্ত এক হউক।

মন্ত্রোচ্চার

(হে বিব্রত মানবগণ) তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীত কর।

প্রত্যুচ্চার

×

আমরা যেন পরস্পরকে প্রীতি করি।

মন্ত্রোচ্চার

×

ভাই যেন ভাইকে দ্বেষ না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। এক সত্যে ও আনন্দে এক শক্তিতে যুক্ত পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বল।

প্রত্যুচ্চার

×

যেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভদ্রবাণী বলি।

মন্ত্রোচ্চার

×

মধুর বিনয় বচনে আমি তোমাদিগের সকলকে সমান উৎসাহে এক ব্রতে অনুপ্রাণিত করিতে চাই। চিত্তে মনে আনন্দে ও ভোগে এক করিতে চাই। পরস্পরে প্রীতিযুক্ত দেবতারা যেমন দিবারাত্রি স্বর্গের অমৃত রক্ষা করেন, তোমরাও তেমনি প্রীতিযুক্ত হও।

প্রত্যুচ্চার

×

যেন আমরাও তেমনি প্রীতিযুক্ত হই।

৩। শঙ্খধ্বনিসহ কন্যাগণের গীতবাদ্যের সঙ্গে কবির প্রতিনিধিরূপে তাঁহার কাব্য ও চিত্রের প্রবেশ।

(ক) কবির চিত্র ও কাব্য স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত।

মন্ত্র

তুমি শোভন গুণসহ এখানে আগমন কর। উদার হৃদয়ে এখানে আগমন কর।

মন্ত্র

×

আমাদের মধ্যে আজ যে তোমার শুভাগমন হইল তাহাতে আমাদের জন্ম সফল হইল, জীবন সফল হইল, সকল সাধনা সফল হইল; বহু তপস্যার ফল যে তুমি আজ আমাদের মধ্যে সমাগত।

মন্ত্র

এতদিন তুমি বাণীতে ও সঙ্গীতেই চিত্র আঁকিতেছিলে। কারণ গান হইল—"চিত্রিতাং পুষ্পিতা বাচং" বৃহ, ধ, পৃঃ ৪৪, ৭৭।

এতদিন যাহা তোমার রাগবর্ণে চিত্রিত ছিল এখন তাহাই রূপবর্ণে চক্ষুগ্রাহ্য হইয়াছে, সকলে তাহা দর্শন করুক—

মন্ত্র

×

নানাবিধ রূপকে পোষণ করিয়া তুমি এইখানেই স্থির থাক, নানা ব্যর্থ চেষ্টার পশ্চাতে যেন তোমাকে গমন করিতে না হয়। আমরা বিবিধ কল্যাণ সংগ্রহ করিয়া আবার প্রভূতভাবে তোমারই সহিত আসিয়া মিলিত হইতে চাই।

মন্ত্র

×

আমাদের সর্ব্ববিধ বন্ধন তুমি মোচন কর, সে বন্ধন উত্তমই হউক আর অধমই হউক। দুঃস্বপ্নের মধ্যে যে ডুবিয়া আছি, এই পাপ আমাদের মধ্য হইতে দূর করিয়া দাও, আমরা যেন শুভ-ব্রতকারীর পুণ্যলোকে প্রবেশ করি।

মন্ত্র

×

পরিপূর্ণ মনন, চেতন, ধী, সঙ্কল্প, চিত্তবৃত্তি, ধ্যান, শ্রুত ও দৃষ্টি লাভের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলিসহ আমরা সকলে আজ নমস্কার করি।

(৪) শঙ্খধ্বনিসহ শিল্পিগণ কর্তৃক কবির কাব্য ও চিত্রের আসন বিনিময়। কবির কাব্য ও চিত্রকে মাল্যাদি উপহার, মেয়েদের দ্বারা বরণ।

শঙ্খধ্বনি বরণ অন্তে কবির উচ্চার্য্য মন্ত্র—

এই পৃথিবীকে নমস্কার করি।

মন্ত্র

×

হে পৃথিবী, তোমার গিরি, তোমার তুষারাবৃত পর্ব্বত, তোমার অরণ্য আমাদের আনন্দময় হউক। দৈব ব্যবস্থায় সুরক্ষিত ধ্রুবা এই পৃথিবী বভ্রুবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণা, অরুণা ও বিচিত্ররূপা।

মন্ত্র

×

হে পৃথিবী, যে গন্ধ তোমার আদিতে, যে গন্ধ তোমার কমলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেই গন্ধে আমাকে সুরভিত কর।

মন্ত্র

×

পৃথিবীর সকল অমৃত ও মৃত্যু এই মানবের মধ্যেই সমাহিত। মানবেরই নাড়ীর মধ্যে সকল পৃথিবীর সকল সমুদ্র অধিসমাহিত।

মন্ত্র

×

আনন্দ, মোদ, প্রমোদ, অভিমোদ, হাস্য, লীলা নৃত্য এই মানবশরীরের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট।

মন্ত্র

×

কে ইহার মধ্যে নিহিত করিল এই অপূর্ব্বরূপ কে নিহিত করিল এই মহিমা ও নাম? কে বা নিহিত করিল ইহাতে গতিময় মুক্ত ছন্দগতি, কে বা নিহিত করিল নানাবিধ রূপের প্রকাশ, কে বা নিহিত করিল সঙ্গীত কে বা নিহিত করিল নৃত্য?

মন্ত্র

×

কোন্ সত্যের মিলনের ব্যাকুলতায় বায়ু সদাই অস্থির, জল সদাই চঞ্চল, মানবের মনেও কিছুতেই নাই সন্তোষ?

মন্ত্র

×

তাঁহাকেই বলা হইয়াছে সনাতন আবার তিনিই নিত্য নব নব রূপে জায়মান। চক্ষু দিয়া সবাই চায় তাঁহাকে দেখিতে কাজেই মন দিয়া আর তাঁহাকে পায় না বুঝিতে।

সেই অপূর্ব্ব রচয়িতার গভীর শিল্পকে অনুভব করিতে পারি শুধু আমাদের রচনা আমাদের শিল্প দিয়া।

শিল্পই যথার্থ সঙ্গীত। মানব শিল্পীর বিচিত্র নানাবিধ শিল্প রচনাই সেই দেবশিল্পীর সত্য স্তবগান।

মন্ত্র

×

এই সব শিল্প রচনাতেই চলিয়াছে সেই দেবশিল্পের যথার্থ স্তবগান। সেই দেবশিল্পের যথার্থ অনুপ্রেরণাতেই এই মানবলোকে এই সব শিল্প হয় অধিগত।

মন্ত্র

×

শিল্পের এই রহস্য যাহার বিদিত শিল্পের যথার্থ মন্ত্রও তাঁহারই অনুগত।

মন্ত্র

×

শিল্পের যে সাধনা তাহার উদ্দেশ্যই আত্মসংস্কৃতি। শিল্প-যজ্ঞের যজমান যে শিল্পী, তিনি ইহার দ্বারা আপন আত্মাকে তোলেন ছন্দোময় করিয়া।

গীতবাদ্যসহ শিশুদের নৃত্য

সোসাইটি কর্তৃক অভিনন্দন প্রদান।

শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক কবির হইয়া "শেষ নমস্কার" গীত—

(গানটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে)

সকলে দাঁড়াইয়া—

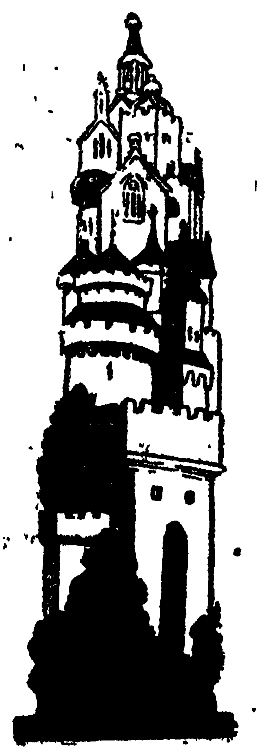
মন্ত্র

×

সকল পথই তোমার কল্যাণকর হউক। সকল মানবই তোমার কল্যাণকর হউক, সকল সঙ্কল্পই তোমার কল্যাণকর হউক, সকল সাধনাই তোমার কল্যাণকর হউক॥

সভাসমাপ্তির শঙ্খধ্বনি।

এই শুভ অনুষ্ঠানকর্ম্ম শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিজের পরিকল্পনায় শোভন ও সুন্দর করিয়া তোলেন। তিনি শিল্পীগণসহ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহা পরিচালনা করেন।



প্রবাসে জয়ন্তী উৎসব

১। গৌহাটি

হে কবি,

তোমার সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আজ আমরা তোমাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিতেছি।

তোমার প্রতিভার ভাস্বর রবি প্রাচ্যের গগনে প্রথম প্রকাশিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া প্রতীচ্যের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত আলোক দান করিয়াছে।

অমৃতের পুত্র তুমি। যুগযুগান্ত সঞ্চিত আর্য্যসভ্যতার অমর-বাণী তোমার কণ্ঠে নব নব ছন্দে বিকাশ লাভ করিয়া বিশ্বময় প্রচারিত হইয়াছে। হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ক্লিষ্ট মানব-সমাজে তাহা মৃত-সঞ্জীবনীর ন্যায় কার্য্য করিবে।

ইংরেজ কবি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভিতরে দুর্ভেদ্যপ্রাচীর দেখিয়াছিলেন; হে কবীন্দ্র, তাহার সে ভ্রান্তি নিরসন করিয়া, ঐক্য সাধনের যে বাণী ভারতেরই বাণী, তাহা তুমি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছ।

এই ভারততীর্থে মহামানবের মিলন-প্রচেষ্টা তোমার,— ইতিহাসে অভিনব। তোমার বিশ্বভারতী সর্ব্বদেশের ভক্তি-বিনম্র পূজারীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে।

বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে গৌরবময় প্রাচীন বৃহত্তর ভারত আত্মগোপন করিয়াছিল। হে ঋষি, তোমার আর্ষদৃষ্টিতে সে আজ ধরা দিয়াছে। আর্য্য সংস্কৃতির যে অপূর্ব্ব অবদান তুমিই নূতন করিয়া বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়াছ।

ছন্দে-গানে-ভাবে-ভাষায় তুমি আমাদের জননী বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছ। সেই অপূর্ব্ব অমর ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলের অখ্যাত বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা আজ বিশ্বের সভায় জয়মাল্য লাভ করিয়াছে।

শত শত বর্ষের বৈদেশিক শাসনে আমাদের মনোবৃত্তি অসাড় পঙ্গু হইয়াছিল, স্বদেশী সমাজের কশাঘাতে তুমিই তাহাকে জাগাইয়াছ। আমাদের জন্মভূমি আজ কঠোর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইতেছে। হে বন্ধু, সে চরম দুঃখ তোমার হৃদয়কে করুণায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তাই তুমি বঙ্গের পল্লীকে শ্রীনিকেতনে পরিণত করিবার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছ।

হে তাপস, মহর্ষিপিতার পুণ্যপ্রভাময় আদর্শে যে সত্যের আভাস লাভ করিয়াছিলে, জীবনের পথে তুমি তাহারই পূর্ণতর বিকাশ সন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিয়াছ।

তোমার কবি-হৃদয় চিরসুন্দরের ধ্যানে শতদলের ন্যায় প্রস্ফুটিত। হে সত্যশিবসুন্দরের পূজারী, তোমার জীবনের অপরাহ্ণ মধুময় হউক; তোমার আশীর্ব্বাণী বিশ্বজনকে জ্ঞানে গরীয়ান্, সত্যে সমুজ্জ্বল ও প্রেমে প্রফুল্ল করুক।

২। মজঃফরপুর

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করকমলেষু

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার সপ্ততিতম জন্মতিথিতে আমরা মজঃফরপুরের বাঙ্গালী অধিবাসিগণ আপনাকে অভিনন্দিত করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি।

প্রবাসে জীবন সংগ্রামের অশেষবিধ অসুবিধার মধ্যেও আমরা বাংলার চিন্তাধারার সহিত যোগরক্ষা করিয়া নিজেদের হৃদয়মনের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। এই যোগরক্ষা বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়াই সহজ হইয়াছে। সুতরাং আপনার সহিত আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন।

বাংলার গৌরবে আমাদেরও গৌরব, ইহা কখনও ভুলিতে পারিনা। প্রবাস-যন্ত্রণার মধ্যেও আমাদের অন্তরের দৃষ্টি বাংলার অভিমুখেই নিরত নিবদ্ধ আছে। সেই দৃষ্টি প্রথমেই পতিত হয় একখানি শুভ্র সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তির উপর, যাহা গভীর জ্ঞানে সমুজ্জ্বল, অসাধারণ প্রতিভায় উদ্ভাসিত এবং জন্মভূমির কল্যাণ কামনায় করুণ।

আপনার কবিতা গান গল্প এবং বহু বিচিত্র রচনাবলীর মধ্য দিয়া যে অমৃত ধারা এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল দেশ বিদেশ প্লাবিত করিয়া আসিতেছে, বাংলার বাহিরে থাকিয়া আমরাও সেই সুধার অংশ হইতে বঞ্চিত হই নাই। সমগ্র মানব জাতির, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন গঠন করিবার যে পন্থা আপনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সকলের সম্মুখে জীবনের যে উচ্চ আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাদ্বারা দেশবাসীর সহিত আমাদের হৃদয়ও আশা এবং উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

আপনার নিকট হইতে আমরা অনেক পাইয়াছি, তথাপি আরও অনেক কিছু পাইবার আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি। তাই আজ এই জন্মতিথিতে অমৃতময়ের সন্নিধানে আপনার দীর্ঘজীবন, অটুট স্বাস্থ্য, এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অক্ষুণ্ণতা কামনা করিতেছি। ইতি।

মজঃফরপুর,
৪ঠা পৌষ ১৩৩৮ সাল।

ভক্তিঅর্ঘ্যপ্রদানকামী—
মজঃফরপুরের বাঙ্গালী অধিবাসিবৃন্দ



রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল এম্-এ

বঞ্চিয়া জীবনকাল সঞ্চিলে যে অনন্ত অমৃত,
উত্তরী অঞ্চল প্রান্তে আনিলে যে মন্দারমঞ্জরী,
গন্ধে তার, রসে তার আনন্দিত উপোষিত চিত ;
চিন্ময় চরণে দেছ সঙ্গীতের মঞ্জুল অঞ্জলি ।

২

হে কবি, তোমার বীণে বাজে নিত্য নব নব সুর
নব ছন্দে, ভাবে ভরা ; ফুটে নিত্য অযুত কুসুম
বর্ণে গন্ধে তরঙ্গিয়া ভাবমুগ্ধ হৃদয় বিধুর,
বিস্তারিয়া চিতে চিতে আনন্দের চন্দন কুঙ্কুম !

৩

বর্ণগন্ধগীতিময়ী ধরণীরে বাসিয়াছ ভালো ;
শুচিস্নাত পূত তুমি নিখিলের লাবণ্য-নির্ঝরে ;
সপ্তাশ্বস্যন্দনে, রবি, যাত্রাপথ করিয়াছ আলো
বিচ্ছুরিয়া দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা কনক অক্ষরে !

৪

"নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে" জাগি' যবে উঠিল 'প্রভাত'
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুধাস্যন্দী সঙ্গীত-ইঙ্গিতে,
কুসুমি উঠিল প্রেম তালে তালে বুঝি তারি সাথ !
অনঙ্গ জাগিল বুঝি "উর্ব্বশীর" বিভোল ভঙ্গিতে !

৫

স্মরশরাহত হর রোষভরে দহিয়া তাহারে
গেছে যথা বিথারিয়া ভস্ম তার নিখিল নিলয়ে,
সঞ্চারিছ, হে কবীন্দ্র, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ পারাবারে
সাজ তব প্রেমমন্ত্র সঙ্গোপনে হৃদয়ে হৃদয়ে !

৬

ফিরিয়া পেয়েছি পুনঃ কবিগুরু লভি' কৃপাকণা
নির্ব্বিন্ধ্যা অবন্তী কাঞ্চী ; মালবিকা মঞ্জুলার দল,
—আরো কত বরনারী বিদ্যুদ্দামচকিতেক্ষণা,
পুষ্পলাবী তরুণীর ত্রাসভরে স্রস্ত কর্ণোৎপল ।

৭

কালিদাসে ফিরায়েছ ; পুরাতনে ক'রেছ নবীন ;
রূপের তুলিকাপাতে রচিয়াছ রসের মূরতি।
বর্ণেরসেগন্ধেগানে বীণা তব গুঞ্জে নিশিদিন,
প্রেমসুধারসে করি' সুন্দরের অনিন্দ্য আরতি !

৮

দেহের অতীত যাহা, ভাষা যারে না পারে স্পর্শিতে,
ইন্দ্রিয়ের অধিকার পারে যার শাশ্বত আসন ;
ব্যথা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, চাহিয়াছ অ-ধরে ধরিতে,
মধুর-মুরলীরবে সাড়া দেছে ব্রজের নন্দন !

৯

অতীন্দ্রিয় সাধনার উগ্রতপা, হে অগ্র পূজারি,
দিয়াছ অনঘ অর্ঘ্য রসঘন "গীতাঞ্জলি"-রূপে ;
দিলে আশা আশাহীনে, উৎসারিয়া অমৃতের ঝারি ;
ধন্য কবি ! বন্দি' তোমা হৃদয়ের পূত পূজাধূপে !

শ্রীবিনায়ক সান্যাল



রবীন্দ্র-প্রশস্তি

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উষার আভা উঠিল ফুটি' রাতের শেষে পূব-গগন 'পরে,
অমনি তুমি রবি,
কাননচূড়ে, সৌধশিরে, তটিনী-নীরে, মেঘের থরে-থরে
আঁকিলে শত ছবি।
আলোক-রেণু আহরি' বুকে হাসিয়া ওঠে ফুলেরা চুপে-চুপে,
শিহরে বনতল,
মানব জাগে ধরণীতলে, জীবন-লীলা ফুটিল রূপে রূপে,
যেন সে শতদল।

* * * *

সরসী-নীরে নাহিয়া ওঠে সোপান বাহি' রমণী ধীরে ধীরে,—
মদন পরাজিত ;
স্বরগ হ'তে মরত-বাসী বাসিল ভালো শ্যামলা ধরণীরে,—
স্বরগে ব্যাকুলিত ;
যৌবনের উন্মাদনা, শৈশবের অর্থহীন হাসি
আঁকিলে কবিতায়,
কতনা কথা, কাহিনী কত, কতনা ধ্যান, স্বপন রাশি রাশি
মানস তব ছায়।

* * * *

অশেষ তব রশ্মিরাজি, অতুল তব কল্পনা-বিভব,
বিরাট্ তব মন,
তোমার আঁখি হেরিছে আজো ভুবন ভরি' লীলা-মহোৎসব
বিচিত্র-বরণ।
যৌবনের তপ্ততপে আত্মহারা ব্যাকুল বাসনায়
জ্বলেছে যেই শিখা,
কঠোর দু'খে আত্মজয়ে নির্ব্বিকার শান্ত সাধনায়
তাহারি আলো লিখা।

* * * *

হেরেছ কবি উর্ব্বশীর শ্যামাঞ্চল লুটায় ধরণীতে,
খসিছে মালা-মণি,
ঊর্ম্মিমালা লুটায়ে পড়ে চরণ ঘিরি' বন্দনা-ভঙ্গীতে,
নম্র কোটি ফণী।
সুন্দরের বন্দী তুমি, মৃত্যুরেও বলেছ সুন্দর,
অসীম সুষমায়
মায়ার রঙে কেমন করি' ভরিয়া দেছ বিশ্ব-চরাচর
অরূপ তুলিকায়।



বিচিত্রা-



চিত্রশালা

শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগিরের
চিত্রাবলী




সুধীর খাস্তগীর









সত্যাসত্য

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৭৫

হোটেলের জীবন বাদলকে প্রমত্ত করল। কোলাহল-বিরল বৃহৎ ভোজনাগার, এক একটি টেবিলের চারিধারে দলে দলে সুসজ্জিত নরনারী। করিডর পদশব্দ মুখর, মেয়েদের জুতোর খট্ খট্, পুরুষদের জুতোর গুম্ গুম্। কোন ঘরে কে থাকে বাদল জানে না, কিন্তু একটু সকাল সকাল উঠ্‌লে দেখ্‌তে পায় বন্ধ দরজার বাইরে জোড়া জোড়া মেয়েলি জুতো, পুরুষালি জুতো কিম্বা বুট। বাদলের দুই পাশের দুই ঘরে থাকেন দু'জন মহিলা, সাম্‌নের ঘরে একজন ভদ্রলোক। একটু দূরে কয়েকটি দম্পতি। ওঁদের কারুকেই বাদল দেখেনি, কিন্তু ওঁদের জুতো দেখেছে। রাত্রে বাদল সকাল সকাল ঘুমতে যায়, ওঁরা দেরি করে ফেরেন। আবার যেদিন বাদল দেরি করে ফেরে সেদিন হয় ত ওঁরা আগেই ফিরেছেন। সন্ধ্যাবেলা ভোজনাগারে বসে বাদল প্রায়ই অনুমান করার খেলা খেলে; অপরিচিত অপরিচিতাদের মধ্য থেকে নিজের প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীদের নিশানা করে। একদিন যাদের নিশানা করে পরদিন তাদের পছন্দ হয় না, অন্যদের নিশানা করে।

হোটেলের ঘরগুলো ছোট ছোট। ঘরে বসে পড়াশুনা করা যায় না। অবশ্য পড়াশুনার জন্য যদি না আলাদা ঘর নেওয়া হয়। চিত্রকরদের জন্য ষ্টুডিওর বন্দোবস্ত এ হোটেলে নেই, কিন্তু এর আশে পাশে ষ্টুডিও ভাড়া পাওয়া যায়। বাদল তার বইপত্র নিয়ে নীচে নেমে এসে লাউঞ্জ-এ বসে। বাদলের শৈত্যবোধ কিছু বেশী। তুলোর এবং পশমের একজোড়া গেঞ্জির উপরে শার্ট এবং পুলোভার এবং তার উপর কোট চাপিয়ে তবু বাদলের গরম বোধ হয় না, সে ঠিক আগুনের কাছটিতে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। আগুনের লক্‌লকে শিখা তার দিকে এগিয়ে আসে, তার ব্রাউন মুখ রাঙা আলোয় দীপ্তিমান দেখায়। ক্রমশ লাউঞ্জ থেকে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ কাজে চলে যায়। বাদলের কাজ থাক্‌লেও কাজে মন নেই। বাইরে বড় ঠাণ্ডা, বিশ্রী টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, আকাশ ঘোলাটে। এই লণ্ডনে দু'হাজার বছর অর্দ্ধসভ্য, সভ্য ও অতি-সভ্য মানুষ বাস করে কাজ করে সৃষ্টি করে আস্‌ছে। তবু এমন ওয়েদার কিছুতেই বাদলের বরদাস্ত হচ্ছে না, যতই কেন সে বলুক, "এই ত আমাদের খাঁটি স্বদেশী শীত, খাঁটি স্বদেশী বৃষ্টি! আহা! কি পুলক জাগ্‌ছে!"

প্রতিদিন নতুন লোক আসে, পুরানো লোক যায়। বাদলের পাশের ঘরের দরজার বাইরে ভৃত্যকর্ত্তৃক সাফ করবার জন্য রাখা জুতোর আকার প্রকার থেকে বোঝা যায় প্রতিবেশী পরিবর্ত্তন হয়েছে। মনটা প্রথমে একটু উদাস হয়ে যায়—আহা কে লোকটা ছিল, তার সঙ্গে একবার চোখের দেখাটাও হল না। পরমুহূর্ত্তে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। কে এসেছে একবার দেখ্‌তে হচ্ছে কিন্তু। কিছুদিন পরে জন্মায় ঔদাসিন্য। শুধু যাওয়া, শুধু আসা। কি হবে কারুর চেহারা দেখে। দেখ্‌লে ত মনে থাক্‌বে না? এই ছ'মাসে বাদল লাখ লাখ মানুষ দেখেছে লণ্ডনের পথে পথে। চোখ বুঁজ্‌লে কারুর চেহারা স্মৃতির নিকষে ফুটে ওঠে না 'ত?

তার কারণ বাদল অন্যমনস্ক মানুষ। দেখেও দেখে না কিছু। তবু তার দেখার সাধটি আছে, সকলের যেমন থাকে। লণ্ডনে আছি, অথচ সেণ্ট্ পল্‌স্ দেখিনি? অমনি চল্ল বাদল সেণ্ট্ পল্‌স্ দেখ্‌তে। কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে তার বাস্ কখন ব্যাঙ্ক পাড়ায় পৌচেছে। যাক্ গে, পরে কোনোদিন দেখা যাবে এখন। সেণ্ট্ পল্‌স্ ত পালিয়ে যাচ্ছে না, আমিও এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দে। আসল কথা, তার চোখের কৌতূহলের চাইতে মনের কৌতূহল বেশী।

মন নিত্য নতুন সত্যের সোপান বেয়ে কোন ঊর্দ্ধে চলেছে। যেটাকে অতিক্রম করছে সেটাকে ভুলে যাচ্ছে, সেটা একটা "না", সেটা একটা অসত্য। অতীত অসত্য, বর্ত্তমান সত্য, ভবিষ্যতে বহুগুণ সত্য।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়া কিম্বা কিছু ভাবা, মাঝে মাঝে হাই তুলে গত রাত্রির অনিদ্রা ঘোষণা করা, হঠাৎ মগজে একটা আইডিয়ার আবির্ভাব হলে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করা, পায়চারি করতে করতে দুই হাত দিয়ে চুলগুলোকে জড়িয়ে ধরা (তাতে মাথা ব্যথা কিছু কমে), এবং পরিশেষে চেয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখ বুঁজে অসাড় হয়ে থাকা, বাদল তার এই সমস্ত মুদ্রাদোষের জন্য অল্পদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ হতে পারত, কিন্তু তার হোটেলে খেয়ালী শিল্পীদের পদার্পণ ঘটত অহরহ। তাদের মুদ্রাদোষের তুলনায় বাদলের ওগুলো অতি সাদাসিধে, অতীব আর্ট শূন্য। তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে দুই একবার পাগলা গারদ ঘুরে এসেছে। কাজেই বাদলের মুদ্রাদোষ তাদের চোখ কাড়ে না।

তবে এই বিদেশী মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে তাদের আগ্রহ জন্মায়। তাদেরি সমধর্ম্মা, যদিও রংটা অন্যরকম বলে দলে টেনে নিতে দ্বিধা বোধ হয়। বাদল চোখ না তুলে বুঝতে পারে অনেকে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। শোনবার জন্য কান পেতে রাখে ওরা তার কথা বলাবলি করছে কি না। কিন্তু ওরা ত মুখে বলে না, চাউনিতে বলে। কখনো কদাচ চোখ তুলে বাদল টের পায় ঘরের লোক বিনি কথায় বলাবলি করছে বিদেশীটি ইংরেজী ভাষার এত বড় বড় দুরূহ বই পড়ে বুঝতে পারে কি করে? পাতার পর পাতা উল্টিয়ে চলেছে দুই তিন মিনিট পর পর। মনোযোগ ও চিন্তাকুলতা থেকে বোঝা যায়, চাল দিচ্ছে না, সত্যিই পড়ছে ও পড়ে বুঝছে। পড়তে পড়তে মুচকে হাসছে এক আধ বার, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে।

বাদলের সঙ্গে আলাপ করতে তাদের ভারি কৌতূহল, কিন্তু ইংরেজ যতই বোহিমিয়ান বা খেয়ালী হোক, গায়ে পড়ে আলাপ করতে জানে না। বাদলও লাজুক মানুষ। বিলেতে আসা অবধি কতক সপ্রতিভ হয়েছে বটে, তবু তুলত হবার ভয়টি তার যায়নি। কারুর সঙ্গে কথা বলার আগে মহলা দেয় কি কি বলবে ও কি ভাবে বলবে। বাক্যের গড়ন শব্দের যোজনা উচ্চারণের ঝোঁক ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে এক কথা আরেক হয়ে দাঁড়ায়, তবু বাদলের জেদ— সে যা বলবে তা distinguished হওয়া চাই। কে বলছে? না, বাদল বলছে। যে সে লোক নয়। বক্তব্যের চেয়ে বক্তার ব্যক্তিত্ব বড়। একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে যাবার পরে বাদল নিজের উক্তির রোমন্থন করতে লেগে যায়। যা বল্ল তাই অন্য কতরকম ভাবে ভঙ্গীতে ও ভাষায় বলতে পারত, বল্লে হয়ত তার যোগ্য হতো। একথা ভাবতে ভাবতে সে সংকল্প করে—যেচে কারুর সঙ্গে কথা কইবে না, গায়ে পড়া প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হলে এমন কিছু বলবে যার থেকে আবার প্রশ্ন না ওঠে। কিন্তু কার্য্যত তা ঘটে না। বাদল তর্কশিরোমণি। সামান্য বিষয়েও তর্কের গন্ধ পেয়ে দ্বন্দ্ব বাধায়।

৭৬

জাহাজে কুবের ভাইয়ের কাছে বাদল দাবা খেলা শিখেছিল। অতি আনাড়ির মত খেলত, চর্চ্চার অভাবে একাগ্রতার অভাবে পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে পারেনি। প্রায় ভুলে গেছল বল্লে চলে।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়ার ফাঁকে বাদল লক্ষ করত কুঁজো মতন একটি যুবক, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে, প্রতিদিন দাবা খেলেন। তাঁর খেলার সাথী কিন্তু প্রতিদিন এক নয়। কোনো দিন প্রৌঢ়া, কোনো দিন কিশোরী, কোনো দিন বৃদ্ধ, কোনো দিন যুবক। পরম নিঃশব্দে খেলা চলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রতিপক্ষকে কাঁচা খেলোয়াড় দেখলে তিনি নিজেই প্রতিপক্ষের চাল বাৎলে দেন। প্রতিপক্ষকে কোনোমতে খেলার আসরে টেনে রাখবার জন্য তিনি সুবিধের পর সুবিধে করে দেন, নিজের ঘুটি গুলিকে একে একে মারতে দেন। তাঁর মত ধৈর্য্য ত সকলের নয়।

বাদল পায়চারি করতে করতে এক একবার খেলার কাছে দাঁড়ায়। মনে মনে উভয় পক্ষের চাল দেয়। অন্যথাচারণ দেখলে বিরক্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়। আকর্ষণ

এড়াতে না পেরে আবার কিছুকাল পরে পা বাড়ায়। ততক্ষণে হয়ত খেলার ছক্ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। যুবকটির এক একটা বোড়ে এক একটা মন্ত্রী (Queen) হয়ে পুনর্জন্ম পেল বলে। প্রতিপক্ষের অন্তরাত্মা খেলায় ইস্তফা দিয়া পলায়নের জন্য উন্মুখ। কিন্তু যুবকটি তা হতে দেবেন না। পলাতককে খোরাক দিয়ে বেঁধে রাখবেন বলে তাঁর অশ্বের আড়াই চালের ঘরে নিজের একটি বোড়েকে নিঃসহায় অবস্থায় এগিয়ে দিলেন।

একদিন বাদল হাতের বইখানাকে মাথার উপর ঘোড় সওয়ার করে চোখ বুঁজে কি একটা ভাবছে, তার সাম্নের চেয়ারে কে একজন এসে ধপ করে বসে পড়্লেন। বাদল চোক চেয়ে দেখ্ল সেই দাবা-খোর যুবক। বাদল ইতিমধ্যে তাঁর নাম জান্তে পেরেছিল। মিষ্টার ওয়েলী।

বাদল একটু ভদ্রতা করে বল্ল, "আজ দাবা খেল্ছেন না যে, মিষ্টার ওয়েলী ?"

মিষ্টার ওয়েলীর চোখ ফিকে নীল, মুখ ফ্যাকাশে। তিনি কখনো হাসেন না। তাঁর মুখের মাংসপেশীগুলো নিথর, ভাবের আবেশে কাঁপে না। অথবা তাঁর মনের ভাব সব সময় একই রকম। তাঁর চোখের পাতা পড়ে, কিন্তু চোখের তারা নড়ে না। তাঁর সেই স্থিরদৃষ্টিকে তিনি বাদলের অভিমুখীন করলেন, যেন তার উপর সার্চ্ লাইটের আলোক ক্ষেপ করলেন।

অতি ধীর ও স্পষ্ট উচ্চারণ। যেন কামানে গোলা দাগ্ছেন।—"আপনি কি আজ আমার খেলার সাথী হবেন ?"

বাদল প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠ্ল।— "অল্ রাইট্।"

সার্চলাইট তার মুখের থেকে অপসৃত হয়ে দাবার ছকের উপর নিবদ্ধ হলে পরে বাদল স্বস্তি বোধ কর্ল। কাঁচা খেলোয়াড়ের যা দোষ, বাদল একধার থেকে যাকে হাতের কাছে পেল তাকে মেরে সাবাড় কর্ল। তবু শেষকালে কাৎমাৎ হয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পার্ল না। ওয়েলী লোকটা যাদুকর। বাদল শ্রদ্ধার সঙ্গে ওয়েলীর করমর্দ্দন কর্ল।

দিন কয়েক পরে ওয়েলীর সঙ্গে বাদলের আলাপ দাবার ছক ডিঙিয়ে দার্শনিক মতবাদে উপনীত হল। ওয়েলী হচ্ছেন বিশুদ্ধ র‍্যাসনালিষ্ট। সব জিনিষের উৎপত্তি উপাদান প্রকৃতি ও পরিণতি অনুসন্ধান করেন। মায়ের কবর খুঁড়ে botanise কর্তে ভয় পান না। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা হয় physicsএর, নয় biologyর, নয় psychologyর অধিকারভুক্ত।

ওয়েলী কোনো জিনিষকে ভাল বা মন্দ বলেন না, কারুর ভাল বা মন্দ চান্ না। তাঁর জিজীবিষা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়া আর অন্য কিছু কর্তে পারেন্ না, কর্বার ইচ্ছা যে নেই। আত্মহত্যা কর্লে যে অস্তিত্ব থাকবে না অথবা আবার বাঁচতে হবে না, এর প্রমাণ কই ? তাঁর মৃত্যু ভয় নেই, মৃত্যু যখন আসে আসুক। মৃত্যু যখন আস্বে তখন বোঝা যাবে যে, মোটর গাড়ীর ড্রাইভার বে-হুঁশিয়ার কিম্বা ব্যাধি বীজরা শরীর যন্ত্রকে অচল করেছে।

"আমরা যে এত 'আমি' 'আমি' করি, এই 'আমি'টা কে বল্তে পার, সেন ? একটা cell অসংখ্য হয়েছে, একত্র রয়েছে। তারা আপন প্রণালীতে কাজ করে যাচ্ছে, যেমন একদল পিপীলিকা করে থাকে। তাদের আশ্রয় করে অসংখ্য ব্যাকটিরিয়া বাস কর্ছে। আমি কিছুই টের পাইনে। আমি প্রত্যক্ষ করিনি যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত ছুটছে। আমি স্বচক্ষে দেখিনি আমার পাকস্থলী কিম্বা যকৃৎ। নিজের ঘর সংসার সম্বন্ধে এই ত আমার জ্ঞান। তবু বল্তে হবে এসব নিজের ?"

বাদল কোনোদিন এদিক থেকে ভাবেনি। ওয়েলীকে সে বিশেষ সমীহ করতে লাগ্ল।

"'ইচ্ছা' কাকে বলবে, সেন ? কার ইচ্ছা ? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা ? cell-সমষ্টির ইচ্ছা ? ইচ্ছার অর্থটা কি ? আরও কিছুকাল জীবন ধারণ ? দুদিন কম বেশীতে কি আসে যায় ? জীবন যদি যায়ও, তবে এমন কি আসে যায় ? cell-গুলো বাড়তে পাবে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত atom-গুলো ত থাক্বে ? personal immortalityর কথা ওঠে না, যেহেতু person

বলে কিছু নেই। আর atomic immortality ত স্বতঃসিদ্ধ।"

বাদল চিন্তা করে। তার মতবাদের থেকে ওয়েলীর মতবাদ উত্তর মেরুর থেকে দক্ষিণ মেরুর মত স্বতন্ত্র। তবু দুই মেরুতে কি যেন সাদৃশ্য আছে। বাদল থেকে থেকে ওয়েলীর কাছে ছুটে যায়। "আচ্ছা, মিষ্টার ওয়েলী, এ বিষয়ে আপনার আইডিয়া কি?" ওয়েলীর উত্তরের উপর কথা বল্‌তে পারে না। অত বড় তার্কিক মূক হয়ে যায়। ওয়েলী যেন যাদু জানেন। ওয়েলীকে বাদল ভয় করে। লোকটা যেন মানুষ নন্। উত্তাপশূন্য, আবেগ-শূন্য, জিতেন্দ্রিয়, রিপুজিৎ। তাঁর সুখের আশা কিম্বা দুঃখের আশঙ্কা নেই। না নিজের জন্য, না পরের জন্য। মানবজাতি থাক্ বা লুপ্ত হয়ে যাক্, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। দেশের গৌরব, জাতির প্রগতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি তাঁকে মাতায় না, ভাবায় না। নিজের আদর্শ অনুসারে সমাজকে ঢেলে সাজবার অভিলাষটি বহু র‍্যাসনালিষ্টের আছে। যদিও তার প্রয়োজন যে কি তা তাঁরা বল্‌তে পার্‌বেন না। পৃথিবীই বা থাক্‌বে কদিন! মানব জাতিই বা থাক্‌বে ক'দিন! ব্যক্তি বিশেষ ত বীজ বপন করে ফল ভোগ কর্‌বার আগে মর্‌বে। তবে কেন বিশুদ্ধ র‍্যাসনালিসম্ ফেলে ফলের পশ্চাদ্ধাবন?

"ভাল মন্দ বলে কিছু নেই। আজ যেটাকে ভাল বলে তার পিছু নিচ্ছি কাল সেটাকে মন্দ বলে নিজের বুদ্ধিকেই বিদ্রূপ কর্‌ব। না, সেন, কোনো কিছুই ভাল কিম্বা মন্দ নয়। Nothing matters in the last analysis."—একটু থেমে বলেন, "তোমাদের একালের ইউটোপিয়া আর কিছু নয়, সেকালের স্বর্গের নামান্তর ও রূপান্তর। তার মূল হচ্ছে বর্ত্তমানের প্রতি অসন্তোষ, বর্ত্তমানে অতৃপ্তি। তার মূল হচ্ছে ভবিষ্যতের সম্পূর্ণতা, কাল-সাপেক্ষ perfection."

ওয়েলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। বাদল তাঁকে নিজের সুখ দুঃখের কথা বল্ল। রাত্রে তার ঘুম হয় না বিশ্বের ভাবনা ভেবে। সুধীদার নাম করে বল্ল সুধীদা ইনটুইশনের ও বাদল ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ অবলম্বন করেছে। সুধীদা রোজ এগিয়ে যাচ্ছে, বাদল পার্‌ছে না। বাদল যেন একটা বৃত্তের চারিদিকে (?) ঘুর্‌ছে, ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় আস্‌ছে। তার একমাত্র আনন্দ সে ইন্‌টেলেক্‌টের লীলাভূমিতে ঘর করেছে, ইউরোপ তার মহাদেশ, ইংলণ্ড তার দেশ।

ওয়েলী অনবরত পাইপ টানেন। টান্‌তে টান্‌তে বাদলের কথা এক মনে শুনে যান। নিজের কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বল্‌তে চান্ না, কিন্তু বাদল যখন পীড়াপীড়ি করে তখন বলেন "আমি নিজে এই মুহূর্ত্তে এই স্থানে আছি কি না তার প্রমাণ পাচ্ছিনে, সেন। আমি একেবারে আছি কি না তুমিই বল্‌তে পার। ওরা বলে, 'I think, therefore I am." কিন্তু সেটা হচ্ছে begging the question, কারণ 'I think', এই বাক্যের যে 'I' শব্দটি সেইটির অস্তিত্ব নিয়ে ত যত প্রশ্ন। না, সেন, আমার নিজের কোনো কথা নেই।"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সে ভগবান মানে না, কিন্তু আত্মা মানে। ওয়েলীর কথা শুনে তার সন্দেহ জন্মায়। তাইত, আত্মা কি নেই? আত্মা যদি না থাকে ত এত চিন্তার কি প্রয়োজন? অকারণ এত অনিদ্রা। অর্থহীন ঐ ইনটুইশন ও ইন্‌টেলেক্‌ট। না, না, এ হতেই পারে না। আত্মা আছে। অন্তত অহং আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বাদল নাস্তিক, অহং সম্বন্ধে আস্তিক।

ওয়েলীকে যেই একথা বলা অমনি উনি বল্লেন, "Illogical".—বাদল মূক হয়ে যায়। দিগ্বিজয়ীর নিঃশব্দ পরাজয়। [ক্রমশঃ]

শ্রীলীলাময় রায়

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম-এ, পি-আর-এস্

(সমালোচনা)

বহুদিন আগে চোখেরবালি, নৌকাডুবি, গোরার লেখক যখন বাঙ্গালী পাঠকের সামনে চতুরঙ্গ এনে উপস্থিত করেছিলেন, তখন আমরা বিস্ময়ে ও আনন্দে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেম ; তারপর যতবার চতুরঙ্গ পড়েচি ততবার এই বিস্ময় ও আনন্দের মাত্রা কেবল বেড়েচে। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের হাতে তাঁরই ভাষার রূপ গেল বদ্‌লে, ভঙ্গিমা হ'লো নতুন ; ঘটনা বস্তুর বিন্যাসে (plot construction), চরিত্রের সূক্ষ্ম জটিলতার সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে, সমস্যার নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় এবং মানসিক ভাবের তরঙ্গলীলায় রসিক চিত্ত উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। বুদ্ধির আলোক ও হৃদয়ের আবেগে চতুরঙ্গ বাঙলা সাহিত্যে এক সার্থক সৃষ্টি হয়ে নতুন রসের জগতে, মনের অপূর্ব্ব ও বিচিত্র লীলার ক্ষেত্রে আমাদের আহ্বান ক'রলো। বাঙলা সাহিত্যে এবং বিশ্ব-সাহিত্যেও শেষের কবিতা-র মূল্য নিরূপিত হতে এখনও কিছুদিন অপেক্ষা ক'রতে হ'বে ; কিন্তু একথা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে, শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথের আর এক অভিনব সৃষ্টি ; এবং তাঁ'র সকল সৃষ্টি হ'তে পৃথক্। কবির লেখনীর উপরে কে যেন হঠাৎ যাদুকরের মায়াকাঠি বুলিয়ে দিয়ে গেল ; চোখের পলকে দেখ্‌লেম ভাষার রূপ গেল বদ্‌লে, ভঙ্গি হলো নতুন। লঘু ছন্দে চঞ্চল চলন, এ চলন যেন রবীন্দ্রনাথের নয়—তবু তারই মধ্যে দৃপ্ত শক্তি ও আভিজাত্যের স্পন্দন ; আশ্চর্য্য লঘু ছন্দে লয়ে আশ্চর্য্য কঠিন সুগম্ভীর কথা। লঘু ভাষার এক নতুন রূপ, এক নতুন ভঙ্গিমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'লো। গল্প উপন্যাসের ভাষায় এমন intellectual terseness অথচ এমন সরস করে বলা—এ যেন রবীন্দ্রনাথের কাছেও নতুন। এ-তো গেল ভাষার কথা, ভঙ্গিমার কথা, style'র কথা। কিন্তু বয়স যাঁহার 'পঞ্চাশোর্দ্ধং', তাঁ'র একি সূক্ষ্ম দৃষ্টির ক্ষমতা! এমন করে বাঙলা দেশের একটা বিশেষ শ্রেণীর তরুণ তরুণীদের অশনে বসনে, চলনে বলনে, গতিতে ও মতিতে কে কবে দেখেছে, আর সেই দেখার প্রকাশ কি সুতীক্ষ্ণ শ্লেষকটাক্ষে কণ্টকিত! অথচ এ-ও তো বাইরের রূপের কথা। চোখের দৃষ্টি যাঁর যুবকের মত উজ্জ্বল, চোখ্ মেলে না-হয় তিনি তা' তন্ন তন্ন করেই দেখেছেন। কিন্তু বাঙলা দেশের বিংশ শতাব্দীর যে-তরুণ একই সঙ্গে একান্ত intellectual ও emotional, অথচ যে তা'র নিজের মনের খবর নিজেই সুস্পষ্ট করে জানে না, জানলেও তা' প্রকাশ করবার ভাষা পায় না, তা'র মনের ভাবপর্য্যায়ের সূক্ষ্মতন্তুজালের মধ্যে এমন করে স্বচ্ছন্দে বিহার করবার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা এ-যে সহজে কল্পনাতেও আসে না। বাঙলা দেশের বর্ত্তমান যুগের বহু অমিত রায়, বহু লাবণ্য, বহু কেতকী মিত্র, বহু শোভনলাল আজ এই বইখানির মধ্যে তাদের ছায়া দেখে নিজেদের চিনতে পেরেছে।

অনেক অমিত রায় হয়তো বুদ্ধির বিলাসে পরের হৃদয়ের তাপে নিজকে গলিয়ে কল্পনার মূর্ত্তি গ'ড়তে ব্যস্ত, কী যে সে চায় নিজেই জানে না। অনেক লাবণ্য হয় তো প্রথম যৌবনে বিদ্যার অহঙ্কারে, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে যে অঙ্কুর বড় হতে পার'তো তাকে দেয় চেপে, বাড়তে দেয় না, ভালবাসাকে দুর্ব্বলতা মনে করে নিজেকেই ধিক্কার দেয়—তারপর ভালবাসা তার শোধ নেয়, অভিমান হয় ধূলিসাৎ। অনেক কেতকী মিত্র হয় ত একজনের মুঠির চাপ হারিয়ে দশজনের মুঠির চাপে হয়ে উঠে কেটি মিটার, দশের মনের মতন করে সাজে। তা'রা সকলে আজ এ বইটিতে মুক্তির সন্ধান পেয়েচে কি না জানি নে, না পেলে একটুও ক্ষতি নেই, কিন্তু একথা সত্য যে তা'রা এতে নিজেদের ছায়া দেখ্‌তে পেয়েচে ; নিজেদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে।

একথা সত্য যে, শেষের কবিতা কোন বিশেষ যুগের

বিশেষ সমাজের কোন শ্রেণী বিশেষের চিত্র; সেই বিশেষ শ্রেণীর কাছে এ'র একটা পৃথক মূল্য আছে। কিন্তু সকল যুগের সকল মানুষের কাছেই এর একটা চিরন্তন মূল্য আছে, সে মূল্য এ'র রসের মূল্য, এ'র সাহিত্যের মূল্য। তা'র পরিচয় আমরা পাই অমিত ও লাবণ্য-র, কেতকী ও শোভন-লালের সূক্ষ্ম মনের বিচিত্র ভাবলীলা-পর্য্যায়ের মধ্যে। এক সময় ছিল যখন মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারের সুখ দুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ সেগুলি এতই বেড়ে উঠেচে যে, কিছুই আর সহজ নেই। বাঙলা দেশের এই নব যুগের নতুন intellect যতই পড়চে, যতই ভাবচে, ততই মন আরো বেশী সূক্ষ্ম হচ্চে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে emotional আবেগেরও কিছু কম্‌তি নেই। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসার আদান প্রদানের সম্বন্ধ নিয়ে মনের মধ্যে ক্রমেই নানান্ সূক্ষ্ম অনুভূতি নতুন করে আমাদের বোধ ও বুদ্ধির কাছে ধরা দিচ্চে, যে সব আলো অদৃশ্য ছিল তারা আজ গোচর হচ্চে, তার সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য যতই বাড়চে, মনের মধ্যে সমস্যা ততই জটিল হয়ে উঠ্‌চে। এর আবার বিপদ-ও আছে। আমাদের ধর্ম্মের, সমাজের, রাষ্ট্রের সমস্যাগুলি আমরা চোখে দেখ্‌তে পাই, বুদ্ধিতে ধরতে পাই —তা নিয়ে আলোচনা করা চলে। কিন্তু মনের জটিল সমস্যাগুলি থাকে গহন তিমিরের তলে, যার সমস্যা সে নিজেই তার খবর জানে না। কবির ও সাহিত্যিকের তীব্র দৃষ্টি যখন সেগুলিকে সূর্য্যালোর মধ্যে টেনে এনে রূপে ও রসে তাকে অভিষিক্ত করে তখন আমরা তার পরিচয় পাই, তখন বুঝি মানবমনের জটিলতা কত সূক্ষ্ম, কত বিচিত্র। অথচ এই আমাদের সংসারটা কখনই এত সূক্ষ্ম জটিলতার উপযুক্ত নয়, তাকে স্বীকার করবার জন্য প্রস্তুতও নয়।

এ কথা জানা সত্ত্বেও আমরা খুঁজি সমস্যার একটা মীমাংসা। শেষের কবিতার মধ্যে মনের ভাব পর্য্যায়ের যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় আত্ম-প্রকাশ করেচে, সে দ্বন্দ্বের, সে সমস্যার—মীমাংসা কিছু আছে কি না, এ প্রশ্ন সাহিত্যের বিচার্য্য নয়। হয় ত আছে, হয় ত নেই। যদি থেকে থাকে, সে-মীমাংসা সকলের মীমাংসা না-ও হ'তে পারে, সকলের মতের সঙ্গে না-ও মিল্‌তে পারে; যদি না থেকে থাকে তা'লে-ও রসোদ্বোধনের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু সে কথা পরে। আমাদের বিচার্য্য হচ্চে, মনের যে-দ্বন্দ্বলীলার পরিচয়, আমরা এ-বইয়ে পাই, তা' রূপে ও রসে অভিষিক্ত হয়ে তার যথার্থ রূপে আমাদের উপলব্ধিতে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা দিল কি না, আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয় বৃত্তির কাছে তার আবেদন এসে পৌঁছলো কি না, এবং ভাবের ও অনুভূতির তরঙ্গ পর্য্যায়, ঘটনাবস্তুর বিন্যাস ও সমাবেশ logical ও consistent কি না।

শেষের কবিতার বিষয়-বিন্যাসের (plot construction) মধ্যে একটু জটিলতা আছে। এ জটিলতার জন্য কতকটা দায়ী বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম তরঙ্গলীলা; কতকটা কবির স্বেচ্ছাকৃত-ও বটে। তার কারণ-ও আছে, প্রধান কারণ উপন্যাসের সমস্ত সমস্যাটাকে ঘোরালো করে তুল্‌বার চেষ্টা—to highten the effect of a most intricate psychological problem। কিন্তু তার ফলে একটু অসুবিধা হয়েচে এই যে, প্রত্যেক চরিত্রের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহারের মধ্যে তাদের মানসিক ভাব পর্য্যায়ের মধ্যে logical consistency'র খেই মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়, ঘটনা বিন্যাসের sequenceটা খুঁজে পেতে দেরী হয়। সেই জন্যেই স্থান ও সময়ের অভাব হলেও একটু বিস্তৃত করে ঘটনা বিন্যাসের sequenceটা, পূর্ব্বাপর সংগতিটা, সাজিয়ে নিতে পারলে চরিত্রগুলির ব্যবহারের মধ্যে consistency টুকু খুঁজে পাওয়া সহজ হয়ে উঠে—তখন অনায়াসেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় এই consistencyর কোথাও অভাব কিছু নেই।

শেষের কবিতা বইখানি গড়ে উঠেচে অমিত ও লাবণ্যর মনের জটিল তন্তুজালকে আশ্রয় করে; তাদের সমস্যাই সমগ্র গল্পটির সমস্যা। এই হিসাবে এরা দুজনেই গল্পের প্রধান চরিত্র। কিন্তু এদের আড়ালে রয়েছে আর দুজন—কেতকী ও শোভনলাল। কেতকীর সঙ্গে অদৃশ্য এক বন্ধনে জড়িয়ে আছে অমিত, যে-অমিত নিজের দিক থেকে সে-বন্ধনকে একেবারে বিস্মৃতির নীচে দিয়েচে চেপে; আর শোভনলালের সঙ্গে হৃদয়ের কোন্ কোণে একটি গ্রন্থি জড়িয়ে আছে লাবণ্যর, যে-লাবণ্য নিজের জ্ঞানের অহঙ্কারে, উদ্ধত

স্বাতন্ত্র্যবোধে নিজকে দিয়েচে একেবারে আচ্ছন্ন করে। এরা দুজনেই নিজের মূঢ়তার কাছে বন্দী; নিজেদের কাছে অপরিচিত। এমন সময় হ'লো এদের পরিচয়, সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের সূত্রপাত। কিন্তু "আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যে বেলায় দীপ জ্বালানোর আগে সকাল বেলায় সল্‌তে পাকানো"।

শিলং-এ মোটরের ধাক্কা খেয়ে উপন্যাসের যেখানে সূত্রপাত, সেই সূত্রপাতের আগের পর্ব্বটির অভিনয়ের স্থান বিলেতে, অক্সফোর্ডে; সময় সাত বৎসর আগে। সেটা একটু ভাল করেই জানা প্রয়োজন। তখন সেখানে এক জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যখন কথা বলে' উঠে, তারার ফুল যখন কণ্ঠ বেড়ে' মালা গেঁথে' দেয়, মাঠে মাঠে ফুলের বৈচিত্র্যে ধরণী যখন তার ধৈর্য্য হারায়, তখন নদীর ধারে বসে' এক বাঙ্গালী তরুণের—অমিত রায়ের—ভাব-বিলাসী চিত্ত পাশে এক আঠারো বছর বয়সের বাঙালী তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে তা'র ধৈর্য্য হারালো। সমস্ত প্রকৃতি যখন তা'র প্রকাশের প্রাচুর্য্যে কম্পিত ও উদ্বেলিত, যখন সমস্ত চিত্ত আকাশ ও পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের তরঙ্গে একসঙ্গে নেচে দুলে উঠ্‌চে, তখন সরলা, হাস্যোজ্জ্বলা, ভাবাবেগারক্তা এক তরুণী সঙ্গিনীর—শ্রীমতী কেতকী মিত্রের—মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত্তে মনে পড়ে, সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ইহার মধ্যে রূপ নিয়েচে। তখন একমুহূর্ত্তে তা'র হাতখানি হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটি চাঁপার মত আঙুলে আংটি পরানো অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হয়ে উঠলো; একথা তা'কে বলা সহজ হ'লো, তোমাকে আমি পেলেম, 'Tender is the night, and haply' the queen moon is on her throne'। সমস্ত প্রকৃতি তখন এই দুইটি ভাবমুগ্ধ হৃদয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেচে। কল্পনায় উদ্দীপ্ত যে-যুবক, প্রত্যেক ভাব তরঙ্গে কম্পিত যে-চিত্ত, সে-চিত্তে একবার-ও একথা মনে পড়েনা, এই বলার মধ্যে এই আংটি পরানোর মধ্যে কোনো দায় আছে, কোনো বাঁধন আছে। চাঁদ যখন ডুবলো, ধরণী যখন তার ফুলের সজ্জা ঘুচালো, চিত্তের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ যখন বিলীন হ'য়ে গেল—তখন আর মনেও রইলো না, কোন্ এক ভাবোদ্বেলিত মুহূর্ত্তে কে কবে কা'র হাতে একটা আংটি পরিয়েছিল। কারণ, যে আংটি পরিয়েছিল সেই অমিত'র কাছে ঐ মুহূর্ত্তটাই সত্য, আংটি পরানোর ব্যাপারটা একান্তই সাধারণ।

কিন্তু আঠারো বছর বয়সের শ্রীমতী কেতকী মিত্র লিলি গাঙ্গুলী নয়। যে-মুহূর্ত্তে অমিত তা'র আঙুলে আংটি পরিয়েছিল, সেই মুহূর্ত্তটি তা'র জীবনে অনন্তকালের জন্য বেঁচে রইলো। অমিতকে সে চিন্‌তে পারেনি, সেই জন্যেই তা'র পরানো আংটি এক মুহূর্ত্ত সে হাত থেকে খুল্‌তে পারলো না, তার দেহের সঙ্গে তা এক হয়ে গেল। তখন সে বেশী কথা ব'ল্‌তে শেখেনি, কিন্তু সেই জ্যোৎস্না রাতে নদীর পারে বসে' অমিত-র আংটি পরানোর মধ্যে সে ভবিষ্যৎ মিলনের সূচনা দেখেছিল। সেই মুহূর্ত্তটিকে সে অনন্ত জীবনের মধ্যে ব্যাপ্ত করে ধরে রাখবে, এই ছিল তার মনের কথা। কিন্তু দুদিন পরে অমিতর কাছে সেই মুহূর্ত্তটি খসে' পড়ে গেল সমুদ্রের জলে, তার কোন হিসেব-ও রইলো না। তখন কেতকী মিত্রের উপর তার মুঠি গেল আল্‌গা হয়ে, সঙ্গে সঙ্গে দশের মুঠির চাপ এসে প'ড়ল তা'র উপর; অমিত-র মন সে হারালো ব'লেই দশের মনের মতন করে তাকে সাজতে হলো। তা'র হৃদয় গেল মরে' কাজেই মূর্ত্তির বদল হ'তে দেরী হ'লোনা। তখন 'দাদার কায়দা কারখানার বকযন্ত্র পরম্পরা শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই করা বিলিতি কৌলীণ্যের ঝাঁঝাঁলো এসেন্স' গায়ে মেখে শ্রীমতী কেতকী মিত্র হ'য়ে উঠ্‌লো কেটি মিটার। কিন্তু একথা বুঝতে পারা শক্ত নয় যে, এই অত্যুগ্র বিলিতি কৌলীণ্য কেতকী মিত্রের সংজাত সৌখীন প্রবৃত্তি নয়—তার বিফল কামনা প্রসূত একটা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসারই প্রকাশ। অমিত-র ব্যবহারে তার মনের ক্ষোভ ও বেদনা, মানুষের উপর সহজ বিশ্বাসের উপর এই নিষ্ঠুর আঘাত তার মনকে এমনি করেই মুচ্‌ড়ে মুষ্‌ড়ে দিলে। কেটি মিটার কেতকী মিত্রের কৃচ্ছ্রসাধনের রূপ, নিষ্ঠুর বেদনার রূপ, জীবনকে ব্যঙ্গ করবার রূপ।

আর এক সল্‌তের জটের পাক লেগে রইলো লাবণ্যের মনে। প্রথম যৌবনে তার মনের নরম জমিটুকু 'গণিতে ইতিহাসে সিমেণ্ট করে গাঁথা হয়েচে—খুব পাকা মন যাকে

বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়েনা।' তা'রই সহপাঠী সুকুমার মুখচোরা শোভনলাল মনের এক প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে লাবণ্যর মূর্ত্তি পূজা ক'রতো। কিন্তু লাবণ্যর দিক থেকে সে-ভালবাসা স্বীকারে বাধা ছিল—সে বাধা তার প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। শোভনের আত্মপ্রকাশের সংকোচ তা'র কাছে দীনতারই নামান্তর, এ দীনতার কাছে লাবণ্য কিছুতেই নিজকে বড় মনে না করে পারেনা। কাজেই তা'র কাছে তিরস্কৃত হয়ে শোভনলাল গেল দূরে। তা'র প্রতি একটা অন্ধবিদ্বেষে লাবণ্যর মন ভরে উঠ্‌লো।

তারপরের পর্ব্বেই অমিত ও লাবণ্যের পরিচয়—শিলং পাহাড়ে। পরিচয়ে ক্রমে জম্‌লো আলাপ। লাবণ্যর হৃদয়ের তাপ লাগ্‌লো অমিত-র মনে ও হৃদয়ে; মনের বরফ গলে ঝরে পড়তে সুরু হলো, এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখে কথার উচ্ছ্বাস ফুটে উঠ্‌লো। প্রকৃতির সকল সৃষ্টি তা'র কাছে বিশেষভাবে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো; সে স্পষ্ট করে জান্‌তে পেলো যে, পাখী আছে, এমন কি তারা গানও গায়। একথা শুনে লাবণ্য একটু হেসেছিল; তার উত্তরে অমিত বল্‌লে, "এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জান্‌চি, নিজকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না।" তারপর দ্রুত তার মন ও আবেগ লাবণ্যকে ঘিরে ফেল্‌লে, অমিত নিজকে নতুন করে আবিষ্কার করলে, তার মনের কথাটি বেরিয়ে পড়লো "For God's sake, hold your tongue and let me love!" তারপর একদিন যোগমায়া-দেবীর কাছে লাবণ্যকে বিয়ে করবার প্রস্তাব উপস্থিত করে বস্‌লো।

অমিতের আহ্বানে লাবণ্যের মন জেগে উঠ্‌লো, বুদ্ধির অহঙ্কারের আচ্ছন্নতা থেকে, উদ্ধতস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে সে মুক্তিলাভ করলো; কিন্তু সে আহ্বানে এত সহজে সে সাড়া দিতে সাহস পেলে না। অমিতকে সে চিন্‌তে পেরেছিল; কী যে অমিত তা'র কাছে চেয়েছিল, তা' সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু এটুকু সে বুঝতে পেরেছিল যে অমিত তার বুদ্ধি, তার রুচিটাকেই বড় করে দেখেছে, সেই বুদ্ধি সেই রুচিটাকেই সে চেয়েছে। সে যেই তার মনকে স্পর্শ করেচে অমনি তার মন অবিরাম অজস্র কথা কয়ে উঠেচে। সেই কথা দিয়েই অমিত লাবণ্যকে গড়ে তুলেচে; সেই হেতুই, যে-লাবণ্যকে সে ভালবেসেচে সে-লাবণ্য লাবণ্যরই এক মনগড়া মূর্ত্তি। যে-লাবণ্য সাধরণ মানুষ, ঘরের মেয়ে সে-লাবণ্যকে অমিত দেখ্‌তে পায়নি। সেইজন্য লাবণ্যর ভয়, একদিন এই বুদ্ধি ও রুচির মধ্যে যে রস অমিত ভোগ করচে, সে রস যখন নিঃশেষ হবে, মন যখন ক্লান্ত হবে, তখন সেই প্রতিদিনের সহজ জীবন-স্রোতের স্তব্ধতার মধ্যে ধরা পড়বে নিতান্ত সাধারণ মেয়ে এই লাবণ্য—সে-লাবণ্য অমিত-র নিজের সৃষ্টি নয়। এই সাধারণত্ব অমিত-র সইবে না—তার স্বভাবই তা নয়। একদিন অমিতর রুচি, অমিত-র বুদ্ধির বিলাস লাবণ্যকে ছাড়িয়ে যাবে, তখন অমিত ফিরেও লাবণ্যকে ডাক্‌বেনা,—এ ভয় লাবণ্যকে পীড়িত করলে। একথা মনে করে সে দুঃখ পেল, অমিত জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতেই ব্যস্ত; কিন্তু সে চায় জীবনের তাপ জীবনের কাজে লাগাতে। অমিত তা পাবেনা; সে তার জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয়ে জীবনকে শুধু রসিয়ে নেয়, বুদ্ধি ও রুচির তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয়, গভীর ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। অমিতচরিত্রের বিশ্লেষণ লাবণ্যর চেয়ে ভাল করে করা বুঝি আর সম্ভব নয়! লাবণ্য তার প্রখর বুদ্ধির আলোকে সমস্তই খুব স্পষ্ট করে দেখতে পেল; সেইজন্যই যখন ধরা পড়বার সময় এলো তখন মনটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। তবু তা'কে বল্‌তেই হ'লো—"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বল্‌বার জোর দিয়েচ। আজ তোমাকে যা বলচি তুমি নিজেও তা' ভিতরে ভিতরে জানো। জানতে চাওনা পাছে যে-রস এখন ভোগ করচো তা'তে একটুও খট্‌কা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফেরো, সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছে-ও সেইজন্যেই তুমি এসেচো।" একথা বল্‌তে লাবণ্যর ভিতরটা কেঁদে উঠ্‌লো। অমিত-র তৃষ্ণার তাপে তার হৃদয়ে প্রেমের পদ্মটি ফুটেচে, সে-ও যে ভালবাস্‌তে পারে এ-সন্ধান সে পেয়েছে। অমিত ক্রত করে নিজেকে

বুঝাতে চেষ্টা করলে, "শুনে লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এলো। তবু একথা মনে না করে থাক্‌তে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটেই ওর জীবনের ফসল; তাতেই ও পায় আনন্দ।" যোগমায়া অনেক করে বুঝালেন; কিন্তু লাবণ্য কিছুতেই একথা মনের মধ্যে স্বীকার করতে পারলে না যে, অমিত তা'কে বিয়ে করে ঘর পেতে সংসারী হয়ে সুখী হতে পারবে। এইটুকুমাত্র সে স্বীকার করে নিলো "যতটুকু আমি তার কাছ থেকে পেলেম, ততটুকুই আমার পরম লাভ।" সে যোগমায়াকে বল্‌লে—"যতদিন পারি, না হয় ওঁর সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাক্‌বো। আর স্বপ্নই বা তাকে বল্‌বো কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েচে।" আর সেটুকু দেখা দিয়েচে বলেই তো লাবণ্য নিজেকে নতুন করে জানবার সুযোগ পেল, জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে। সেইজন্যেই যোগমায়া যখন বল্‌লেন্ "আজ আমার বোধ হচ্চে কোনকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভাল হো'ত।" তখন লাবণ্য সে কথা কিছুতেই স্বীকার করতে পারলো না, বলে উঠলো—"না, না, তা' বলোনা। যা' হয়েচে তা ছাড়া আর কিছু যে হ'তে পারতো এ আমি মনেও করতে পারিনে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুক্‌নো,—কেবল বই পড়বো, আর পাস করবো, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখ্‌লেম, আমিও ভালবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হো'ল এই আমার ঢের হয়েচে। মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েচি। এর চেয়ে আর কী চাই।"

অমিত আশা ছাড়লোনা; দ্বিতীয়বার তার সাধনা সুরু হলো। যোগমায়া তা'তে অমিত-র সহায় হ'লেন। কথায় কবিতায় লাবণ্যর অন্তর-বেদী নৈবেদ্যে ছেয়ে গেল। এ নিবেদনের তরঙ্গ লাবণ্য ঠেকাতে পারলোনা। একদিন যোগমায়া "লাবণ্যকে অমিত'র পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিত-র ডান হাতের উপর রাখ্‌লেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বল্‌লেন তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক্।" সেইদিন অমিত লাবণ্য-র হাতে আংটি পরিয়ে দিয়ে বল্‌লো তোমাকে আমি পেলেম। ঠিক হয়ে গেল দুজনের বিয়ে হ'বে। তারপর লাবণ্যকে নিয়ে অমিত ভবিষ্যতের কত সোনার জালই বুন্‌লে, কত কল্পনার মালাই গাঁথলো! কিন্তু লাবণ্যর মনে একটা সন্দেহ জেগেই রইলো—পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি তো হ'লো, এর পরে বাসরঘর কি আছে?

এমন সময় কেটি তার পূর্ব্বদাবী নিয়ে অমিত-র সামনে এসে দাঁড়ালো, মূর্ত্তিমতী ব্যাঘাতের মতো। তারপর প্রত্যাবর্ত্তন—the Great Return.

অমিতকে ফিরতে হলো কিটির কাছে—সুদীর্ঘ সাতবৎসর যে-কিটি অমিতর জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করেছে, যে-কিটি অমিতকে সাতবৎসরেও ভুলেনি। অমিত-র সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে বল্‌তে কেটি মিত্তিরের গলা ভার হয়ে এলো, অনেক কষ্টে সে চোখের জল সাম্‌লে নিলে; তারপর আংটিটা টেবিলের উপর রেখে চলে যাবার সময় এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো, তখন একমুহূর্ত্তে আমরা কেটি-মিত্তিরকে চিন্‌তে পারলেম, বুঝতে পারলেম তা'র মধ্যে কেতকী মিত্র সাতবৎসর পরেও বেঁচে আছে। একটি মাত্র তুলির রেখায় কেতকীর সত্যকার পরিচয় একমুহূর্ত্তে পেলেম। অমিত-র জীবনে লাবণ্যকে প্রয়োজন ছিল; সে প্রয়োজন শেষ করে দিয়ে লাবণ্য সরে' পড়লো; তার সঙ্গে অমিতর অন্তরের যে-সম্বন্ধ তার লেশ মাত্র দায় অমিতকে বহন করতে দিতে রাজী হলোনা, কোন চিহ্ন রেখে যেতে, নিয়ে যেতে পর্য্যন্ত চাইলোনা। তারপর দেখি অমিত ফিরলো কিটির কাছে। কেতকীর কাছে ফিরে এসে অমিত মনের মতন কাজ পেলে। "এতদিন অমিত মূর্ত্তি গড়বার সখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েচে সজীব মানুষ।"

লাবণ্যকে ফিরতে হলো শোভনলালের কাছে—যে-শোভনলাল প্রথম যৌবনে একদিন তার কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়ে ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকে পড়ে কাপিশ হতে কুমায়ুন, কাশ্মীর হতে কামরূপ ঘুরে' ঘুরে-ও তাকে ভুলতে

পারেনি, যে-শোভনলাল তার কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছে বিস্তর অথচ কী অপরাধ সে করেচে, কোনদিন তা বুঝতে পারেনি। ফিরবার পথে লাবণ্য-র মনে হলো, "যে-অঙ্কুরটা বড় হয়ে উঠ্‌তে পারতো. সেটা সে অযথা একদিন চেপে দিয়েছিল, বাড়তে দেয়নি। এতোদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারতো। সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব্ব; বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা; উদ্ধতস্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন রূপের মুগ্ধতা দেখে ভালবাসাকে দুর্ব্বলতা বলে মনে করে ধিক্কার দিয়েচে। ভালবাসা আজ তার শোধ নিলো, অভিমান হ'লো ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজ হ'তে পার'তো নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মত, আজ কঠিন হয়ে উঠলো;—সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। * * * তারপরে কতদিন গেচে, যুবকেরও সেই প্রত্যাখ্যাত ভালবাসা এতোদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইলো? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।—"সেই মাহাত্ম্যের কাছে নত না হ'য়ে লাবণ্য থাকতে পারলোনা। সুদীর্ঘ বৎসর উৎকণ্ঠিত চিত্তে যে তা'র প্রতীক্ষা করেচে, কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে যে শুক্লপক্ষের রজনীগন্ধ-র বৃন্ত দিয়ে অর্ঘ্যের থালি সাজিয়ে তুলে, যে ভালমন্দ সকল মিলিয়ে অসীম ক্ষমায় তাকে দেখে, তাহারই পূজায় সে নিজকে উৎসর্গ করতে গেলো।

তারপর যা' আছে তা' শুধু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহারের কৈফিয়ৎ? সে-ব্যাখ্যা, সে-কৈফিয়ৎ একান্তই তা'দের নিজেদের, আর কারু নয়। সাহিত্য-রসিকের কাছে তা' অবান্তর। বোধ হয় গল্পের পূর্ণতার জন্যও এ-ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। সর্ব্বশেষের সুন্দর কবিতাটিতে লাবণ্য-র যে-কথাটি আছে, লাবণ্য অমিত-র সঙ্গে তার ব্যবহারে প্রাণ দিয়ে সেই কথাটিকেই ব্যক্ত করেছে। অমিত-র বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখ্‌তে গিয়ে তা'র সমস্ত অন্তর কেঁদে মরেচে, তবু, সে তার প্রতি-দিনের সঙ্গিনী হতে পারেনি। এই একান্ত বেদনার মধ্যে তো এই কথাটিই প্রকাশ পেয়েচে; এবং এই বেদনার মধ্যেই সে শোভনলালের সন্ধানও জেনেচে। অমিতকে অথবা আমাদেরকে নতুন করে এ-কথা বলার কিছু অপেক্ষা ছিল না। তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হয় যে একথাগুলি লাবণ্যর সমস্ত অন্তর মন্থন করে উৎসারিত; এর সঙ্গে লাবণ্যের আগাগোড়া একটা সংগতি রয়েছে। কিন্তু অমিত-র ব্যাখ্যায় এই সংগতিটুকু আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনে। অমিত বল্‌লে, "একদিন আমি সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেচি। কিন্তু আমার আকাশও রইলো।" এই কথারই টীকা করতে হলো রূপক দিয়ে "কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই কিন্তু সে-যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুল্‌বো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে-ভালবাসা সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" বলতে ইচ্ছে হয়, এ ব্যাখ্যায় এ কৈফিয়তে যতটুকু সত্য আছে, সে শুধু ঐ বলার মধ্যেই, একথা যেন অমিতর অন্তর থেকে উৎসারিত নয়. তার চরিত্রের সঙ্গে যেন এ ব্যাখ্যার সংগতি নেই। আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে ইচ্ছে হয়, এ যেন রবীন্দ্রনাথের কথা, অমিত-র কথা নয়। তার কারণ খুঁজতে বেশী দূরে যেতে হয় না। লাবণ্য যে শোভনলালের কাছে ফিরে গেলো, তার মধ্যে একটা logic আছে, সে একটা নিগূঢ় বেদনার মধ্যে নিজের ও শোভনলালের সত্যকার পরিচয় পেয়েছিল, কাজেই তখন তার মন ও হৃদয় শোভনলালকে আশ্রয় না করে পারেনি। তাদের মানসিক ভাব-পর্য্যায়ের বিকাশের মধ্যে সেটা এত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ফুটেচে যে এ-সম্বন্ধে কোন দ্বিধাই আমাদের মনে জাগে না। কিন্তু অমিত যে কিটির কাছে ফিরলো এর মধ্যে কোনো সংগতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিটির জন্য তার মনের মধ্যে কোথাও যে কোনো বেদনা জেগেছিল, তা'র কাছে ফির্‌বার জন্য সে যে অন্তর থেকে কোনো আহ্বান পেয়েছিলো, একথার পরিচয় আমরা কোথাও পাইনে—না তা'র মনে, না তার কাজে। কিটি যেদিন তার-দেওয়া আংটি আঙুল থেকে খুলে' ফেলে' টেবিলের উপর রেখে' এনামেল-করা মুখের উপর চোখের জল নিয়ে চলে' গেলো, সে-দিনও যে তা'র মনে বেদনার

কোনো আহ্বান জেগেছিল তা'র খবর আমরা পাইনে। অনেকেই হয়ত বল্‌বেন লাবণ্য তার চোখ ফুটিয়েছিল, তখন সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু এই ভুল বুঝতে পারবার পরিচয় কোথায়? আমার বল্‌তে ইচ্ছে হয়, অমিত স্বেচ্ছায় অন্তরের আহ্বানে কিটির কাছে ফেরেনি, এমন কি বুদ্ধির প্রেরণাতেও নয়—রবীন্দ্রনাথ অমিত-কে কিটির দিকে ফিরিয়েছেন, এবং তার প্রধান কারণ কিটির প্রতি justice করবার একটা চেষ্টা। এ প্রত্যাবর্ত্তন উপন্যাসের কোনো প্রয়োজনে নয়,—সমাজের অথবা অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজনে।

শেষের কবিতার চরিত্র চিত্রণ অপূর্ব্ব, অদ্ভুত! প্রত্যেকটি চরিত্র সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা, অপূর্ব্ব সেই রেখার লীলা। কী প্রখর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ভিতরের ও বাহিরের প্রত্যেক ভাব ও ভঙ্গী লেখনীর মুখে চিত্রকরের তুলির চাইতে-ও সজীব হ'য়ে ফুটেচে; অমিত-র মনের পরিচয় আমরা পাই তার প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক চলনে বলনে, প্রত্যেক smart epigramatic retort'র মধ্যে—তার বেশে, ভূষায়। এমন সুস্পষ্ট করে একটা মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের আর কোথাও আছে কিনা জানিনে। অমিত রায়—বিকল্পে অমিট্রে'—বাঙ্‌লা দেশের কোনো বিশেষ শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত যুবকত্বের একটা type, সে-type-র মধ্যে অস্পষ্টতা কোথাও নেই। 'মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে সে উদাসীন নয়, বিশেষভাবে কারো প্রতি আসক্তি-ও দেখা যায় না, অথচ সাধারণ ভাবে কোথাও মধুর রসের অভাব ঘটে না। এক কথায় বল্‌তে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে।' এরকম অনেক কথার মধ্যে এই একটি। কিন্তু এই একটি কথায় অমিতর চরিত্রের একদিকের সমস্ত পরিচয়টুকু আছে। তারপর লিলি গাঙ্গুলীর একটি কথার মধ্যে, লাবণ্যর বিশ্লেষণের মধ্যে অমিত-র যে পরিচয় আছে, সে পরিচয় বহু কথা বলে'ও জানাবার সুবিধা ছিল না। অমিত-র আর একদিকের পরিচয় লিলি গাঙ্গুলীর একটি কথায় আছে, "তারপরে সোনার মুহূর্ত্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগ্‌লা জাকরার গড়া এমন তোমার কতো মুহূর্ত্ত খসে পড়ে গেচে, ভুলে গেচো বলে তার হিসেব নেই।" তারপর লাবণ্য, যোগমায়া, কেতকী, শোভনলাল প্রত্যেকেই আপনাপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল! শোভনলালের সঙ্গে দেখা আমাদের খুব বেশী নয়—তার সম্বন্ধে খুব বেশী কথাও কিছু নেই। কিন্তু লাবণ্য যেদিন দুপুর বেলা নির্জ্জন লাইব্রেরী ঘরে এসে শোভনলালকে তিরস্কার করলে, তখন শোভনলাল চোখ নীচু করে শুধু বল্‌লে "আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনি যাচ্চি।" আর কিছু বল্‌লে না, ধীরে ধীরে খাতাপত্রগুলো সংগ্রহ করে নিলে; "হাত তার থর থর করে কাঁপচে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠ্‌তে চায়, রাস্তা পায় না।" সেই মুহূর্ত্তে আমরা শোভনলালের সমস্ত পরিচয়টুকু পেলাম। এর উপর, পরে যখন লাবণ্যের হাতে একটি ছোট্টো চিঠি এলো শোভনের কাছ থেকে, সেই চিঠির দুটি কথায় তার ভিতর ও বাইরের কিছু আর জান্‌তে বাকী রইল না। সবচাইতে নৈপুণ্য ফুটেচে কেতকীর চিত্রণে। তার দেখা তো মাত্র দুটি জায়গায় পেলেম; কিন্তু অক্সফোর্ডের নদীর ধারে দেখা তো কোনো পরিচয় নয়; কেটি মিটারের রূপও তার সত্যিকারের পরিচয় নয়, সে পরিচয় যখন পাই তখন একটা ঘৃণায় আমাদের মন তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে, অথচ সেই যে আংটির বাজী হেরে অমিতকে দায়ী করতে গিয়ে কেটির গলা ভার হয়ে এলো, অনেক কষ্টে চোখের জল সাম্‌লে নিলে; তারপর আংটি খুলে টেবিলের উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেলো, 'এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দর্‌দর্‌ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো'—এই একটি মাত্র রেখায় কেতকীর সাত বৎসরের পরিচয় আমরা এক মুহূর্ত্তে পাই।

ইংরাজীতে যাকে বলে pen-portraiting, তা'র অপূর্ব্ব পরিচয় পাই, অদ্ভুত সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাই যোগমায়া, লাবণ্য, লিসি, নরেন্‌ মিত্তির, কেটি মিত্তিরের বর্ণনায়। বর্ণনার এমন অদ্ভুত নৈপুণ্য, এমন সজীব, সত্য পরিচয়ের কৌশলের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী আছে বলে মনে করতে পারিনে। এতে শুধু তা'দের বাইরের বেশভূষা চালচলনের পরিচয় আমরা পাই না, তা'দের মনের, তা'দের

পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের পরিচয়ও পাই। 'সিসি, লিসি, নরেন মিত্তির—উপন্যাসের প্রয়োজনের মধ্যে এদের কোনো স্থান নেই ; কিন্তু এদের প্রয়োজন হয়েচে অমিত ও লাবণ্যকেই বিশেষ করে, সুস্পষ্ট করে ফুটাবার জন্যে, কেটিকেই ভাল করে বুঝাবার জন্যে। এরা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সৃষ্টির সহায়তা করেচে, যে-আবেষ্টনের পরিচয় না পেলে বিভিন্ন চরিত্রের ভাব-পর্য্যায়ের ও সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্বের সমস্যাটিকে গল্পের রহস্যটিকে, একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধটিকে বুঝতে পারা কিছুতেই সম্ভব হতো না। যা'র যা সত্যকার পরিচয় তা' প্রত্যেকের কথার মধ্যে, ভঙ্গীর মধ্যে এমন সুস্পষ্ট, মনে হয় প্রত্যেকের জীবনের ব্যাখ্যা ও পরিচয় যেন তা'রা নিজেরাই রেখে যাচ্চে তাদের প্রতিমুহূর্ত্তের পদক্ষেপে। তা'র উপর আর টীকার দরকার করে না।

শেষের কবিতাকে বলা হয়েচে—Satire—ব্যঙ্গসাহিত্য। একথাকে আমি স্বীকার করতে পারলেম না। অমিত-র বর্ণনায়, সিসি, লিসি, কিটি নরেনের বেশভূষার ও চলন বলনের বর্ণনায়, তাদের প্রতি সুতীব্র শ্লেষ ও বক্রকটাক্ষে, রবিঠাকুরকে নিয়ে নরেন চক্রবর্ত্তীর বক্র ঈর্ষ্যার খেলায়, অমিতর smart কথায় বার্ত্তায়, তা'র মিলনলীলার স্বপ্ন-কল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। মনে হয় কোনো শ্রেণী বিশেষের ফ্যাসানগ্রস্ত যুবক যুবতীদের বিলিতি উৎকট ফ্যাসনপ্রীতিকে, তা'দের সৌখীন প্রেমবিলাসকে বিদ্রূপ করবার জন্য, সুতীব্র শ্লেষকটাক্ষের কষাঘাতে বিপর্য্যস্ত করবার জন্যই বুঝি শেষের কবিতার রচনা। হয়ত এই শ্লেষ ও কটাক্ষের, সুতীব্র কষাঘাতের প্রয়োজন আছে ; কিন্তু আমি জানিনা শেষের কবিতার সাহিত্য-বিচার এর চেয়ে মিথ্যা আর কি হতে পারে। আমার একান্ত বিশ্বাস, এই শ্লেষ এই বিদ্রূপ-কটাক্ষ শেষের কবিতার একান্তই বাইরের পরিচয় ; এবং এই বাইরের পরিচয়ের জন্য কিছুতেই শেষের কবিতা রচিত হতে পারে না। বইটির সমস্ত শ্লেষ কটাক্ষের আবরণের ভিতর রয়েছে মানব মনের একটি জটিল সুগভীর সমস্যা, যে-সমস্যা উদ্ভূত হয়েচে অমিত লাবণ্য কেতকী শোভনলালের মর্ম্মভেদ করে। মানব মনের বিচিত্র ভাব-পর্য্যায়ের জটিল উৎস থেকে শেষের কবিতা উৎসারিত হয়েচে, এবং তা' আশ্রয় করেচে কয়েকটি বিশেষ মনের বিশেষ ধারাকে। তা'দের মনকে আশ্রয় করেই তা'দের জীবনের জটিল সমস্যা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ একটি গল্পের তন্তুজাল রচনা করেছেন। তাঁর কবিচিত্তকে দোলা দিয়েচে মানব মনের এই বিচিত্র অথচ জটিল সুগভীর সমস্যার লীলা ; এই লীলাই তাঁহাকে শেষের কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত করেছে, ইহাই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। আধুনিক বাঙালী সমাজের বিলাতী আবহাওয়া-পুষ্ট, ফ্যাসনবিলাসী, শ্রেণী-বিশেষের নরনারীর চালচলন জীবনযাত্রা অথবা প্রেম-বিলাস রবীন্দ্রনাথকে এ-গল্পের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করে নি, একথা জোর করেই বলা যেতে পারে। এমন কি নিজকে নিয়ে যে কৌতুক তিনি করেচেন, তা'ও একটা অবান্তর কৌতুক বই আর কিছু নয়, উপন্যাসের সঙ্গে এ-কৌতুকের কোন সম্বন্ধ নেই। আর যে শ্লেষ ও কটাক্ষ শ্রেণী-বিশেষের তরুণ তরুণীর প্রতি তিনি করেছেন, তার দরকার হয়েছে শুধু সেই শ্রেণী বিশেষের 'আব্‌হাওয়া' ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সৃষ্টি করা গল্পের খাতিরে প্রয়োজন হয়েছিল বলেই। কাজেই তা অবান্তর না হলেও একান্তই secondary।

শেষের কবিতা যতবার পড়েছি, ততবারই সকলের শেষে একটি কথা মনে হয়েছে। সেই কথাটির একটু আভাস দিয়েই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবো। আমি আগেই বলেছি, শেষের কবিতা বাঙলা দেশের একান্ত আধুনিক বর্ত্তমানের কোনো শ্রেণী-বিশেষের তরুণ তরুণীর মনের জটিল ভাবপর্য্যায়ের এক অপূর্ব্ব কাব্য। যে-বয়সের তরুণ তরুণীর মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে রূপে রসে ফুটিয়ে তুললেন, সে-বয়স হতে তিনি অনেকদূরে, বহুদিন তিনি তা' অতিক্রম করে গেছেন ; যে-যুগে তিনি যুবক ছিলেন এবং যুবক মনের দ্বন্দ্ব তাঁর জানা সহজ ছিল সে-যুগে এসব সমস্যা ছিলনা, সে-যুগের আবহাওয়া, আবেষ্টন এরকম ছিলনা। কিন্তু শেষের কবিতা পড়ে মনে হয়, একি অদ্ভুত প্রতিভা, অপূর্ব্ব বুদ্ধি ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য, কি সূক্ষ্ম দৃষ্টির ক্ষমতা, যা'র বলে তিনি এক দুস্তর কালসমুদ্র পার হ'য়ে এই একান্ত আধুনিক বর্ত্তমানের, এই অতি-আধুনিক সমাজের তরুণ তরুণীর মন ও হৃদয়ের মধ্যে নিজের বাসা নিয়েচেন, এবং সেখানে প্রত্যেক অলিগলির সন্ধানও তাঁর কাছে এত সহজ হয়ে উঠেচে ; একি চোখের ও বুদ্ধির দীপ্তি যার ফলে অতিসূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্য-ও তা'র দৃষ্টি এড়ায় না, অতি তীক্ষ্ণতম বাক্যও তার অর্থ হারায় না। আমরা যে-সব তরুণ তরুণী বর্ত্তমানে এই অতি-আধুনিক যুগে বাস করি, এমন করে আমরাও দেখিনে, বুঝিনে, জানিনে ; যতটুকু দেখি, বুঝি বা জানি ততটুকু-ও এমন করে বলতে পারিনে। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের তরুণীদের চাইতেও অধিকতর তরুণ? সত্যই তাই—শেষের কবিতার রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভঙ্গী ও ভাষায় দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে, বুদ্ধি ও কল্পনায় তরুণদের মধ্যে তরুণতম, আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ভবানীপুর যুবক-সমিতির কোনো বিশেষ অধিবেশনে লেখক-কর্তৃক পঠিত।

প্রাণ-প্রদীপ

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নামিল সন্ধ্যা ; সূর্য্য ঢলেছে অস্তাচলে,
শেষ রশ্মিটি রচে মায়াজাল জলে স্থলে।
সারা দিবসের নীড়হারা পাখী ব্যাকুল টানে
কুলায় খুঁজিয়া ফিরিছে ক্লান্ত কাতর প্রাণে।
মন্থর বায়ে দূর বন হ'তে বনান্তরে
দীর্ঘ নিশাসে জাগে কোন্ ভাষা কাহার তরে ?
ধূসর গগনে সন্ধ্যা তারকা একেলা জাগে—
ক্ষীণ শিখাটুকু কোন্ বধূ জ্বালে কী অনুরাগে ;
প্রিয় পথ চাহি জাগিয়া অমর লোকের দ্বারে,—
ছায়াম্লান তার আনত আনন, চিনি কি তারে ?
সে ভীরু আলোর করুণ আভাস বক্ষে লাগে,
পরাণ আমার সেও ভীরু বড়, একেলা জাগে।

সেদিনও এমনি সন্ধ্যা নেমেছে ধরার 'পরে,
ছিনু বসি' মোর দীপালোকহীন আঁধার ঘরে।
প্রাণের মহলে দুয়ার রুদ্ধ, নাহিক আলা,
অন্তরতলে পরম অসহ দহন জ্বালা।
ঝিল্লি-ঝাঁঝর-শব্দ-মুখর কানন তলে
মাণিক সমান হাজার জোনাকি নিভে ও জ্বলে।
তাহারি আলোকে চিনি' লয়ে পথ, মোর অঙ্গনে
নীরবে আসিয়া দাঁড়ালে গোপনে আপন মনে।
প্রভাত-কিরণ-পরশ-চকিত কমল সম
শত দল তার বিথারি' জাগিল চিত্ত মম।
দুটি করে ধরি নিয়েছ নিমেষে বাহির করি'
বিপুল ভুবনে, মন্ত্রে তোমার, হে অপ্সরি !
ক্লান্ত পরাণ সযতনে ঢাকি নীলাঞ্চলে
বসিলে মৌন, বিরাট সন্ধ্যা-গগন তলে।

ভাষা যত ছিল স্তব্ধ রহিল দোঁহার বুকে ;
ভাবনা-পীড়িত অবনতশির নিবিড় সুখে
ধরিলে তোমার বক্ষে চাপিয়া কত আদরে ;
স্পন্দন তার আঁখি মুদি গণি পুলক ভরে।

আঁধারে বসিয়া ধরণী কী মহামন্ত্র জপে,
স্তব্ধ বনানী নীরবে নিরত কঠোর তপে।
মাথার উপরে হোথায় লক্ষ প্রদীপ জ্বালা,
কোথাও দীর্ঘ নিশাস, কোথাও সুখের পালা !
নিতল দীঘির শীতল বক্ষে তারার ছায়া
ঊর্ম্মির তালে দুলিয়া রচিছে মোহন মায়া।
দূরে অশথের চিকন পাতার চপলতাতে
সোনালী আলোর ক্ষীণ ধারা যেন নৃত্যে মাতে ;
কোন্ মায়াবিনী যাদুবলে রচে স্বপনপুরী,
পথ সে দেশের কোন্ দিক পানে গিয়াছে ঘুরি' ?
এপারে উদার শ্যাম প্রান্তর আঁধারে ঢাকা ;
আকাশের গায়ে দুটি তাল তরু রয়েছে আঁকা।
কত জনমের পরিচয়, কত নিবিড় স্নেহ
দোঁহারে বাঁধিয়া রেখেছে নিকটে জানে কি কেহ ?
মূলে মূলে বাঁধা কঠোর গ্রন্থি মাটির তলে,
বাহিরে বাতাসে পাতা নাড়ি প্রেম প্রলাপ বলে।

মোরা দুটি প্রাণী, মোরাও বসেছি নিকটে ঘেঁসে ;
ভাবনা দোঁহার পাখা মেলি' চলে নিরুদ্দেশে।
কত অপরূপ, কত বিচিত্র, হিসাব নাহি
মনের গহনে কুসুম ফোটাই সুদূরে চাহি'।

'কভু হতবাক্ অনিমেষ আঁখি মেলিয়া দেখি
স্বরগের শোভা ঢাকিয়া রেখেছে দেবতা, একি !
পল্লব-ঘন সুনিবিড় তব নয়ন পাতে ;
অ-ধর আজি কি ধরা দিল'হুটি ক্ষুদ্র হাতে !

আজিও আঁধার নামে ধীরে ধীরে মাঠের 'পরে,
পবনে ব্যাকুল হাহাকার জাগে কাহার তরে।

শ্রান্ত ধরার বক্ষে শীতল শিশির গলে।
আসিনু বাহিরে অবারিত নীল আকাশ তলে।
শবদ-বিহীন স্তব্ধতা মাঝে দাঁড়ায়ে একা ,
সুদূরে নিকটে কোথাও কাহার' নাহিক দেখা।
ক্লান্ত মনের সান্ত্বনা কোথা, কোথায় তুমি ?
ধূসর উসর তপ্ত হিয়ার কানন ভূমি।
কাতর নয়ন তুলিয়া ধরেছি' উর্দ্ধ পানে,
তারকা আলোকে তব দীপশিখা জ্বালাও প্রাণে।

গগনে পবনে তোমার স্নেহের পরশ খানি
পরম যতনে যাও গো বুলায়ে আজিকে রাণী।
মোর জীবনের ক্ষীণ দীপ জ্বলে কত না ভয়ে,
তোমার প্রেমের অঞ্চলে ঢাকি' চলগো লয়ে।
থর থর থর কাঁপিছে সদাই ; নিবিল বুঝি !
আঁধারে আলোকে সদা মরি তাই তোমারে খুঁজি॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



সত্যিকার হাসি

শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

ছেলেদের মত লোকের নামকরণে পটু এমন কেউ নেই। আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশায়ের কান দু'টি একটু লম্বা ছিল—ছেলেরা তাই পণ্ডিতমশায়ের নতুন নামকরণ করলে—'লম্বকর্ণ'। ঘরে-বাইরে, ক্লাসে-পথে দেখা হ'লেই কারণে অকারণে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতুম, পণ্ডিত-মশাই, আপনি কি 'গড্ডলিকা-প্রবাহ' পড়েচেন? আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সব বই পড়েচেন ব'লে যদিও তিনি খুব গর্ব্ব করতেন এবং নিজেকে অতি আধুনিক ব'লে পরিচয় দিতেন, তবু আমাদের স্কুলে আসবার আগে এ বইখানার নামও তিনি শোনেননি! তাই, আমাদের ইঙ্গিত তিনি বুঝতে পারতেন না। শেষে নীহার একদিন সত্যি-সত্যিই বইখানা খুলে 'লম্ব-কর্ণে'র ইতিহাস শুনিয়ে দিয়েছিল।

কথা কইছিল প্রভাত। "ঠাণ্ডাশালা"র ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ও আজ ছেলেবেলার গল্প ফেঁদেচে। ওর ভিতরে আছে দুটি মানুষ। সহজ মানুষটি পারিপার্শ্বিক জগতকে হাসিতে ভরিয়ে রাখে। তৃপ্তির প্রসন্নতায় তখন ও কথা কয় অজস্র। তখন মনে হয়, ও যেন হাসির মানুষ,—শুধু হাসতেই জানে। কিন্তু এক-একদিন ওর মনের অন্য মানুষটা জেগে ওঠে। সেদিন ওর অন্তর যেন বর্ষার মেঘলা আকাশ। তা'তে কান্নাও নেই, আনন্দও নেই,—শুধু নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ বিমর্ষতা। মনে এই দুই বিভিন্নভাব ছিল ব'লেই প্রভাত যেমন কোন লোকের দুর্ব্বলতায় একদিকে প্রাণভরে হাসতে পারত, তেমনি আর একদিকে দুর্ব্বলতার জন্যেই অনুভব করত সত্যিকার দরদ। তাই, ও যা' বলত, তার মধ্যে ছিল আকর্ষণ। ও ব'লে যায়, "পণ্ডিতমশায়কে নিয়ে কৌতুক করবার আরো একটা উপায় ছিল। তাঁকে দেখলেই আমরা সব হেঁচে উঠতুম। এর একটু ইতিহাস আছে। পণ্ডিত একদিন শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন, এমন সময় কে একজন হেঁচে ফেলেছিল। ঘটনাচক্রে সে দিন রাতে গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে পণ্ডিত মশাই রাগ ক'রে চলে আসেন। এর কিছুদিন পরেই নাকি পণ্ডিত-গিন্নী কলেরায় মারা যান। সেই থেকে আর পাঁচ বৎসর পণ্ডিত মশাই আর কখনো হাঁচেননি পাছে অজান্তে কারো অলক্ষণ করে ফেলেন!"—"তা'হলে পরের উপকারের জন্যেই তিনি হাঁচি চেপে রাখতেন,—নিজের নতুন গিন্নীর সঙ্গে দাম্পত্যকলহের ভয়ে নয়?"

—"তা' ঠিক, পণ্ডিতমশায়ের মনটা ছিল খুব ভাল। কিন্তু ছেলেরা সেটা বুঝতো না। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লেই পেছনে সকলেই হাঁচতে সুরু ক'রে দিত। শেষে রাস্তা দিয়ে চলা তাঁর পক্ষে দুর্ব্বহ হ'য়ে পড়েছিল। সে কথা যাক্। একদিন পণ্ডিতমশায়কে আমরা সত্যি-সত্যিই হাসিয়ে-ছিলুম। তখন আমরা উঁচু ক্লাসে পড়ি। পণ্ডিতমশায়ের একটা গুণ ছিল, ক্লাসে ফাঁকি কখনো দিতেন না। প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি চীৎকার ক'রে পড়িয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁর কথাগুলো এমনি নীরস আর পড়াবার কায়দাটা এমনি রুক্ষ যে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের একবর্ণও বুঝতুম না। তাই, তিনি ক্লাসে এলেই উঠত হট্টগোল—হ'ত দলে-দলে আড্ডা। সেদিন হ'চ্ছিলও তাই। পণ্ডিত-মশাই যতজোরে চেঁচিয়ে আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করচেন, আমরা তত জোরেই গল্প ক'রে হট্টগোল পাকাচ্চি। শেষে নিরুপায় হ'য়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওহে আমি এত ক'রে ব'কে যাচ্ছি, আর তোমরা কেউ শুনচো না? পাশ থেকে নীহার দাঁড়িয়ে উঠল, ওহে

শুনচো, পণ্ডিতমশাই বুড়োবয়সে ব'কে যাচ্ছেন আর তোমরা কেউ দেখ্‌চ না?—পিছন থেকে কে ব'লে উঠ্‌ল, ব'কে যাওয়াইত' স্বাভাবিক। একে পণ্ডিত, তা'তে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা! ক্লাস শুদ্ধ একথা শুনে হেসে উঠ্‌ল,—পণ্ডিতমশাইও না হেসে থাকতে পার্‌লেন না।"

—"কিন্তু যাই বল, প্রভাত, এই মানুষটিকে তুমি কিছুতেই হাসাতে পারলে না। তোমার গল্প শুনে আমরা সকলেই যখন হাস্‌চি, শিশিরদা তখনো মুখ-ভার ক'রে বসে আছেন।" অনাথ শিশিরদাকে চিরদিন খোঁচা মেরে আস্‌চে, ওদের মধ্যে এই সম্বন্ধটাই যেন সম্পূর্ণ সহজ। তাই ও যেমন শিশিরদার ভালোটাকে বেঁকিয়ে কদর্থ ক'রে তোলে, শিশিরদা তেম্‌নি ওর সব কথার প্রতিবাদে বড় বড় কথার অবতারণা ক'রে ফেলেন,—বোধ হয়, পাণ্ডিত্য জাহির ক'রে ওর গর্ব্বকে খর্ব্ব কর্‌তে চান। ওদের ঝগড়া তাই আমাদের কাছে সকল দিক থেকেই উপভোগ্য। শিশিরদা একটু রেগেই উত্তর দিলেন, "শুধু হাসলেই কি হাসি হয়? সত্যিকার হাসি কাকে বলে বল্‌ দেখি, তারপর তোর কথার জবাব দেব।"

—"তা' যদি জিজ্ঞেস কর শিশিরদা, তবে আমি উত্তর দেব যে জগতে সত্যিকার হাসি ব'লে কিছু নেই, কারণ, হাসিটা প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে একটা মায়া। জগতে যদি সত্যিকার কিছু থাকে ত' তা' দুঃখ,—তা' কান্না! দেখ, জন্ম নিয়ে যখন মাটি ছুঁই, তখনো কান্না; আবার মৃত্যু হ'লে যখন মাটি নিই তখনো কান্না। আর সমস্ত জীবনটাত' একটা দীর্ঘ হাহুতাশ। জগতে সত্যিকার সুখ, সত্যিকার আনন্দ যদি কিছু থাকে ত' সে দুঃখের মধ্যে। সত্যিকার সুখ মানুষ কখন পায় জান? যখন বুক-ভরা মূক বেদনাকে সে প্রাণভরে কেঁদে প্রকাশ কর্‌তে পারে, তখন সে যে আনন্দ পায় সেটাই সত্যিকার সুখ"—"থামো, থামো অনাথ। তোমার হাসিত্বের অদ্ভুত আলোচনা একটু থামিয়ে শিশিরদার কথাটার জবাব দাওনা। শিশিরদা বলচেন, জগতে নানারকমের ত' হাসি আছে তার মধ্যে সত্যিকার হাসি কোন্‌টা? ধর, আমরা সাফল্যে বা তৃপ্তিতে বা আনন্দে হাসি, আরামে হাসি, আমোদে হাসি, কৌতুকে হাসি, বিদ্রূপেও হাসি, উপেক্ষায়ও হাসি আবার কেউ কেউ হাসির জন্যেই হাসি, তাদের ব'লে, "দেখন-হাসি'।"

—"সে আবার কি রকম?"—"এও জাননা? একদল লোক আছে, তারা স্থানে-অস্থানে অকারণেই হাসে। পথে দেখা হ'ল, তুমি হ'য়ত জিজ্ঞেস কর্‌লে, কি দাদা ভাল আছেন? ওপক্ষ থেকে উত্তর এল হ্যা-হ্যা-হ্যা। কিংবা হ'য়ত জিজ্ঞেস কর্‌লে, কি দাদা আফিস যাচ্ছেন? এবারও সেই এক উত্তর, হ্যা-হ্যা-হ্যা। হাসি যেন তাদের ভাষা। তোমার প্রশ্ন গুলোও যেমন নিরর্থক, তাদের হাসিও তেমনি নিরর্থক। যাক্‌ এখন কথা হচ্ছে, কোন হাসিটা সত্যিকার? কি বলুন শিশিরদা, আপনার এটাই কি জিজ্ঞাস্য নয়?" শিশিরদা কোন জবাব দেবার আগেই দেবী সজোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "এর উত্তরত' অতি সহজ। ভক্তকবি তুলসীদাস বলেচেন, তুলসী যখন তুমি জন্ম নিলে, জগত হেসেছিল কিন্তু তুমি কেঁদেছিলে। জীবনে এমন কাজ কর যাতে যাবার সময় তুমি হাসতে পার আর সারা জগত কাঁদ্‌তে থাকে। মৃত্যুশয্যায় যার এই হাসি হাস্‌বার সৌভাগ্য ঘটে, সেই হাসিই সত্যিকার হাসি।"

—"অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও, সাফল্যের সান্ত্বনা থেকে বা তৃপ্তির প্রসন্নতা থেকে যে হাসি জাগে, সেইটাই সত্যিকার হাসি!"

কথা-সাহিত্যিক বিজন এবার মুখ খুললে, "প্রভাত তোদের ভিতরটা সত্যি-সত্যিই বড় ক্লাসিক হয়ে পড়্‌চে। স্কুলমাষ্টার হ'লেই কি এম্‌নি হয়? একটা general theory খাড়া ক'রে, সেই মাপকাঠিতে সব particular case গুলো বিচার কর্‌তে চাস্‌ কেন? ক্লাসিক-যুগের লেখকেরা তাই ক'র্‌তেন বটে। কিন্তু এ ত' আধুনিক-মনের পরিচয় নয়। আধুনিক সাহিত্যিক-মন বুঝেচে, জগতটা এতই বিচিত্র যে এখানে একটা general theory দিয়ে সব জিনিষ বিচার কর্‌তে গেলে পদে-পদে বাধা আস্‌বে। তুই যে হাসির শ্রেণী ভাগ কর্‌লি, ওর এক-একটির মধ্যে আবার যথেষ্ট শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। জীবনে সকলের সাফল্য একরকমের নয়। আবার জগতে সকলের কৌতুক, সকলের আরাম এক ধরণের

হ'তে পারে না। একক্ষেত্রে হয়ত সাফল্যের হাসিই যথার্থ হাসি হ'য়ে গেল, আর এক্ক্ষেত্রে দেখ্‌বি তা' নয়। যাক্, সত্যিকার হাসি দেখবার সুযোগ বাস্তবিক আমার জীবনে একদিন ঘটেছিল, সে কাহিনী আজ তোমাদের বলি শোন।

"নায়িকা আমার স্ত্রী। তোমরা সকলেই জান, আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন লিপি বি-এ পাশ করেচে। চাল-চলনে তখনি সে খুব আধুনিক। কিন্তু ব'লে রাখি, কোর্টশিপ ক'রে আমাদের বিয়ে হয় নি, তাই রোমান্সের সূত্র পেয়েচ ব'লে কেউ আনন্দ ক'র না যেন। বিয়ের পর দেখ্‌লুম, লিপির মনে আনন্দের উৎস শুকিয়ে গেচে। সব বিষয়েই ও যেন কলের পুতুলের মত কাজ করে যায়। গতি আছে, প্রাণ নেই। উদ্যম আছে, আগ্রহ নেই। কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে মিষ্টি কথায় তুষ্ট ক'রে প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। মনে ভয় হল, হয় ত ওর অতি-আধুনিক মনের মত ক'রে নিজেকে দিতে পারি নি। ওর মন যা' চায়, আমার মধ্যে হ'য় ত তা' পাচ্ছে না। আমি হ্যাভলক্ এলিসের কথাটা খুবই বিশ্বাস করি যে স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালোবাস্‌তে না পারে, তার জন্যে স্বামীই সবচেয়ে দায়ী। কারণ স্ত্রীর বাইরের দিকে দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে তখনই যখন অল্পবুদ্ধি স্বামী তার মনের চাওয়াকে তৃপ্ত কর্‌তে পারে না। স্ত্রীর চিত্তজয় করা একটা আর্ট, আর তা' ফলাতে হয় দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজের মধ্যে। অন্য উপায় না দেখে লিপির মনের সেই অজানা সঙ্গোপন কামনাকে জান্‌বার জন্যে চেষ্টা করতে লাগ্‌লুম। বাড়ীর লোকে বিদ্রূপ করতে লাগ্‌ল স্ত্রৈণ বলে। মনে-মনে বল্‌লুম, আজ স্ত্রৈণ বলে গালা-গালি দাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু স্ত্রীর চিত্তকে সত্যি ক'রে না পেলে মনের স্ত্রৈণত্ব সত্যিই যে একদিন জেগে উঠ্‌বে'। কিছুদিন পরে বুঝ্‌লুম, সেদিকে ভয়ের কোন কারণ নেই, তখন অন্যদিক থেকে চেষ্টা সুরু করলুম। বিলেতের 'উড্‌হাউস' থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের কেদারবাবু পর্য্যন্ত যত হাস্যরসাত্মক বই সব জড় কর্‌লুম। ভাবলুম যদি লিপির মনের অন্ধকারে অবসাদ আর বিষণ্ণতা নীড় বেঁধে থাকে, তবে এগুলো পড়ে তার চিত্তে সহজ আনন্দ ফিরে আসবে। কিছুদিন লিপি বইগুলো খুব আগ্রহ ভরে পড়্‌লে। কিন্তু তবু তার সেই বিষণ্ণ ভাবটা গেল না। এম্নি ক'রে প্রায় এক বৎসর কেটে গেল। শেষে নিরুপায় হ'য়ে এলিস্‌কে একটা চিঠি লিখে পরামর্শ নেব মনে করচি, এমন সময় একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘট্‌ল। সেদিন রাতে 'ঠাণ্ডা-শালা' থেকে ফিরে গিয়ে দেখি লিপি শোবার ঘরে বসে একখানা চিঠি হাতে নিয়ে খিল্-খিল্ ক'রে খুব হাস্‌চে। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। সে দরজার দিকে পিছন ফিরে ছিল তাই আমাকে দেখ্‌তে পায় নি। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে তার চোখ দুটি নিমেষে চেপে ধ'রে বল্‌লুম, "তোমার মুখে এত হাসি, আজ ব্যাপার কি?" লিপি যেন এই কথার জন্যেই প্রস্তুত হ'য়েছিল, বল্‌লে, "ছাড়ো, ছাড়ো, তোমাকে শোনাবো ব'লেই ত' এতক্ষণ ব'সে আছি। হাস্‌ব না? এতবড় হাসির দিন জীবনে আর কখন কি পাব?"

প্রভাত হেসে ওঠে, "কিহে বৌদি কি এখনো তেম্নি ক'রে হাসেন, তাহ'লে রোজা দেখাতে ভুল না। আমি হলফ ক'রে বলতে পারি নিশ্চয় তাঁকে ভূতে ধরেচে।" বিমল বল্‌লে, "রোজা এখানে পাবে কোথায় বল? তবে তুমি এক স্কুলমাষ্টার আছ বটে, ভূতের বদলে ছেলে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে রোজাগিরি কর, দরকার হ'লে বিজন তোমাকেই ডেকে নিয়ে যাবে'খন্।"

—"সে ভয় এখন আর নেই। লিপি সে-হাসি আর কখন হাসে নি, হাস্‌বে কি না জানি না। তবে সেদিন থেকে তার বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গেচে। সে এখন নিশ্চিন্ত আরামে সহজ-হাসি হাস্‌তে পারে। যাক্ সেকথা, হাসির কারণটা লিপি যা' বল্‌লে, তাই একটু সাহিত্যের গন্ধ দিয়ে তোমাদের সভায় পরিবেষণ করি, শান্ত হ'য়ে উপভোগ কর।

অজিত লিপির সঙ্গে একই কলেজে পড়্‌ত। সেইখানেই ওদের আলাপ হয়। অজিতের দেহ যেম্নি সুন্দর, তেম্নি সুঠাম। সুপুরুষ ব'লে তার বেশ খ্যাতি ছিল—শুধু কলেজে নয়, বাইরেও। লোকের মনের মত ক'রে কথা বল্‌বার ক্ষমতাও বিধাতা তাকে আশ্চর্য্য রকম দিয়েছিলেন। এই পুঁজি নিয়ে চল্‌ত তার কারবার। সকলেই তাকে ভালোবাস্‌ত;—সাহেব

শিক্ষকেরাও। কিন্তু ওর মনটা ছিল খুব অগভীর। ও নিজেকে সুপণ্ডিত ব'লে জাহির করবার খুব চেষ্টা করত বটে, কিন্তু অনেক বেশী পড়লেও কোনটাই ও ভাল করে পড়ে নি। তাই কোনটাতেই ওর গভীর জ্ঞান ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই লিপির মনের সহজ-ভাবটা একটু 'পণ্ডিতি'। তাই অজিতের বন্ধুত্বে ওর রুচির তৃষ্ণা না মিটলেও ওর কথাবার্ত্তার মনোরম মাধুর্য্যে লিপি প্রচুর তৃপ্তি পেত। যাহোক্, বন্ধুত্ব শেষে একদিন অনুরাগে পরিণত হ'ল। কিন্তু লিপি সেদিকে মোটেই ধরাছোঁয়া দিত না। আকারে ইঙ্গিতে অজিত যতই প্রেম-নিবেদন করত, লিপি ততই স্পষ্ট ক'রে নিজের বিরুদ্ধতা জ্ঞাপন করত। শেষে নিরুপায় হ'য়ে সে একদিন স্পষ্ট ক'রেই ইঙ্গিত দিলে, অজিতকে সে একটুও ভালোবাসে না, কখনো ভালোবাসার আশাও রাখে না। এই সময়ে ওদের পরীক্ষা এসে পড়ল। ওদের দেখা হওয়ার পথ বন্ধ হ'ল। অজিত ছিল গরীবের ছেলে। তাই, লিপিদের 'উচ্চ সমাজে' মিশে লিপির সঙ্গ নেবার দুরাশা বোধ হয় সফল হয় নি।"

—"কিহে, না হয় তোমার শ্বশুর সত্যিই মস্ত বড়লোক। তবু এখানে তার ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বকে জাহির করায় না আছে আনন্দ না বা সম্মান।" শীতল মুচ্‌কে হেসে অনুযোগ করলে, "এমন অকারণ ব্যক্তিগত পরিহাস সকল সমিতিরই নিয়ম-বিরুদ্ধ দেবী।"

—"থাক্, থাক্, গল্পটা শেষ করতে দাও। তারপর অনেক দিন আর অজিতের সঙ্গে লিপির দেখা হয় নি। তখন বেথুনে ও বি-এ পড়তে সুরু করে দিয়েচে। সেবছর ওর বাবার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল ব'লে ব্যবসা ফেলেই অসময়ে তিনি দার্জ্জিলিং বাস করছিলেন। মেয়ের বার্ষিক পরীক্ষা খুব কাছে ব'লে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। লিপি কলেজের ছাত্রী-নিবাসে আশ্রয় নিয়েছিল। গৃহের স্নেহময় আবেষ্টনে থাকা যাদের অভ্যাস, ছাত্রীনিবাসের নিঃসঙ্গ কঠোরতার মাঝে তারা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। তবু আসন্ন পরীক্ষার গুরু অধ্যয়নের মধ্যে লিপি নিজের অন্তরের এই ভাবাবেগকে চেপে রাখত। কিন্তু এক একদিন বিদ্রোহী মন কোন বাধা মানত না, এই মমতাহীন আবেষ্টনের সঙ্কীর্ণতায় অশান্ত হ'য়ে উঠত। স্নেহের একটু স্পর্শ পাবার জন্যে তার প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠত। তখন এই আবেগটাকে দমন করবার জন্যে লিপি একলা বেড়াতে বেরুত'। এমনি একদিন অশান্ত চিত্তে যাচ্ছে, হঠাৎ পথের মাঝে অজিতের সঙ্গে দেখা। কোন দ্বিধা না ক'রে অজিত একেবারে অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার করলে। তা'র এই একান্ত আত্মীয়তা আজ আর লিপি উপেক্ষা করতে পারলে না। অজিত যখন বেড়িয়ে আসবার প্রস্তাব করলে, ও সহজেই রাজি হ'ল। ভাবলে এর সঙ্গে একটু ঘুরে এলে মনটা নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে, তা'হলে আজকে রাতে আর পড়া বন্ধ রাখতে হবে না। অজিতের সেদিনের কথাগুলো ওর খুব ভাল লাগছিল। হোষ্টেল-জীবনে মানুষের মন কেমন ক'রে বিষিয়ে ওঠে, অজিত সে কথারই আলোচনা করছিল। ওর ছন্দায়িত কথার মোহ লিপির মনে বেশ পুলকের সাড়া জাগিয়ে দিয়েচে—বালিগঞ্জের লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে তখন ওরা আলাপ করছিল। লিপির মনের সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ পেয়ে অজিত আজ বেশ স্পষ্ট ক'রেই প্রেম-নিবেদন করলে, "লিপি, তুমি কি জান না, তোমার মন আমাদের অজ্ঞাতে যে লিপি দিয়ে আমার মনকে ডাক দিয়েছিল, আমি তা' উপেক্ষা করতে পারি নি? কিন্তু আজ জিজ্ঞেস করি, তোমার জয় করা জিনিষকে গ্রহণ ক'রে কবে তাকে সার্থক ক'রে তুলবে?"—সেদিন সত্যই অজিতের আশা সফল হ'ল। কথার মাধুর্য্য দিয়ে ও আজ তার প্রিয়াকে জয় করলে।

গল্প বলতে বলতে লিপি এখানে একটা খুব সত্যি কথার সন্ধান দিয়েছিল। ও বললে, "দেখো, অজিতকে সত্যিই আমি কখনো ভালোবাসিনি। ওর কথা বলবার কায়দা আমাকে মুগ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু ওকে বিয়ে করবার ভাবনা মনে একদিনের জন্যেও কখন জাগে নি। গোড়া থেকেই বরং ওর' পরে আমার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জেগেছিল। সকলেই ওর কথা শুনে প্রশংসা করত, তাই মনে হ'ত, কথায় ওকে হারাতে পারলে যেন খুব তৃপ্তি পাই। বোধ হয়, বারবার ওর সঙ্গে কথার লড়াইয়ে হেরে যেতুম ব'লে ওকে হারাবার আগ্রহ অত বেশী ক'রে মনে জাগত। তাই যতই

ওকে ভুলতে চাইতুম, তত বেশী করেই ওর কথা মনে পড়্‌ত। যাক্, সেদিন সন্ধ্যায় বিধাতাকে সাক্ষী রেখে ওরা প্রতিজ্ঞা করলে জীবনে দুজনেই আর কারুকে কখন ভালোবাসবে না। যদি অদৃষ্টের পরিহাসে ওদের মিলন না হয়, তবে দুজনেই কৌমার্য্য অবলম্বন ক'রে জীবন কাটিয়ে দেবে।······কয়েকদিন ওদের বেশ আরামেই কাট্‌ল। কিন্তু শেষে একদিন বাধা এল লিপির মন থেকেই। ও নিজেকে ভাল ক'রেই জান্‌ত, তাই অতি অল্প দিনেই ওর স্বপ্ন ছুটে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কথা মনে ক'রে ও শিউরে ওঠে, ভাবে, যে কোন মুহূর্ত্তেই হোক্, প্রতিজ্ঞা যখন করেছি, তাকে রাখ্‌বই। অন্ততঃ এ জীবনটা কুমারী হ'য়েই কাটিয়ে দেব। শেষে সেই কথাই ও অজিতকে লিখে জানালে। অজিত অবশ্য সহজে ছাড়েনি, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার শ্বশুর মশাই লিপিকে ছাত্রী-নিবাস থেকে নিয়ে যাওয়ায় ওর অসুবিধা হয়ে গেল।

* * * *

তারপর মাসছয়েক পরে আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ হয়। অজিত সে কথা জান্‌তে পেরে লিপিকে তিরস্কার করতে ভোলেনি। লিপি কিন্তু তাকে জবাব দিলে, মেয়েরা যত শীগ্‌গির প্রতিজ্ঞা করতে পারে, তত শীগ্‌গির ভাঙ্গেও। জানত, সেই আদিম-নর-নারী ভগবানের কাছে জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খাবার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা' প্রথমে ভাঙ্গলে নারীই। সেই আদিম-দুর্ব্বলতা আমারও চিত্তে রয়েচে, কেননা আমি নারী। সে কথা স্মরণ করে তুমি আমার পাপ মাপ ক'রো। কিন্তু, মিনতি করি, নিজেকে আর বঞ্চিত ক'রে রেখনা। তুমি বিয়ে করো,—ক'রে সুখী হও। অজিত এই চিঠি পেয়ে রেগে লিখ্‌লে সেই আদিমকাল থেকেই মেয়েরা চিরদিন পুরুষকে পাপপথে প্রলোভন দেখিয়ে স্বর্গচ্যুতি ঘটাচ্চে। তুমিও আমায় প্রতিজ্ঞাস্খালনের পাপে অংশ নিতে ডাক দিয়েচ। মনে রেখ, আমার প্রেম এত শিথিল নয়। আমি সেদিন যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলুম বিধাতাকে সাক্ষী রেখে, সেই বিধাতার নামেই আবার নতুন পণ করলুম—সেদিনের প্রতিজ্ঞা চিরজীবন রক্ষা করব। বিদায়ের সময় তোমায় অভিশাপ দিই, আমি যেমন বঞ্চিত হয়েচি, জীবনের দেবতা যেন আজীবন তোমায় তেমিভাবে বঞ্চিত ক'রে রাখেন।······যাহোক্, বিয়েত' আমাদের নির্ব্বিঘ্নে হ'য়ে গেল। কিন্তু অজিতকে ভালো না বাস্‌লেও ওর অভিশাপের কথা লিপি ভুল্‌তে পারেনি। তাই বিয়ের পরে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় অত বিষণ্নভাব। লিপি নিজেই খুলে বল্‌লে, তোমাকে পেয়ে, তোমাকে বুঝে যখন দেখ্‌লুম, এত অফুরন্ত সুখ মানুষের ভাগ্যে খুব কম মেলে, তখন আমার মনটা আরো ব্যথায় ভরে উঠল। কেননা, যখনই একান্ত আগ্রহে নিজেকে এই অসীম আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার কল্পনা করেচি, তখনই চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠেচে, অজিতের আরক্ত মুখ। তার ব্যাকুল দৃষ্টির মধ্যে যেন ক্ষুব্ধ, তীক্ষ্ণ ঘৃণা। অজিতের কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে নিজের পরে ঘৃণা আস্‌ত। মনে পড়্‌ত, এর জন্যে আমিই ত দায়ী। দেখো, জীবনে এর চেয়ে নিষ্ঠুর অভিশাপ আর কি আছে? নিজের মধ্যে বুক-ফাটা তৃষ্ণা, সাম্‌নে স্বচ্ছ নদীর ব্যাকুল ডাক্, তবু তাকে স্পর্শ করবার উপায় নেই।

লিপি যাই বলুক্, আমার মনে হয় ব্যাপারটা তা' নয়। লিপি স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ। তাই নিজের মনকে ও ঠিক বুঝ্‌তে পারেনি। কিন্তু সেকথা যাক্। যেদিনের রাতের কথা বল্‌ছিলুম, সেদিন বিকালে ওর বন্ধুর কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, কিন্তু চাকরটার ভুলে ঠিক সময়ে সেখানা ওর হাতে পড়েনি। রাতে আমার ছোট ভাই দেখ্‌তে পেয়ে কিছুক্ষণ আগে ওকে দিয়ে গেচে। সেই চিঠিই ওর এত হাসির কারণ। তা'তে লেখা ছিল, আজ দেড়বছর বাদে অজিত নিজের কঠোর প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে বিয়ে করেচে। তাই আজ ওর এত আনন্দ। তৃপ্তির অলকানন্দা যেন ওর বুকের মধ্যে কল-কল করছিল।

গল্প শেষ করে লিপি আমায় বল্‌লে, লক্ষীটি, আমায় ভুল বুঝনা। সত্যিই আমি অজিতকে ভালোবাস্‌তে পারিনি। কিন্তু আজ ওর এই সুখে আমার কী যে আনন্দ, কী-যে তৃপ্তি তা' কেমন করে তোমায় জানাবো?—এমন হাসি সত্যি আর কখন আমি হাসিনি। আমি হেসে জবাব দিলুম,

লিপি, নিজের মনকে এখনো তুমি চিন্‌তে পারোনি। অজিতকে যে তুমি ভালোবাসনা, তা ঠিক। কিন্তু আজকে তোমার এই যে আনন্দ, এ অজিতের সুখে নয়, অজিতের পরাজয়ের জন্যেই। সে যে আজ প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে তোমার সঙ্গে সমান স্তরে এসে দাঁড়িয়েচে, তার গর্ব্ব-অহঙ্কার যে আজ খর্ব্ব হ'য়ে গেচে, এতেই তুমি আজ এত খুসী,—তোমার মনের সেই পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজো রয়েচে, তা' থেকেই জাগ্‌চে এই হাসির তৃপ্তি।"—একটু থেমে প্রভাতের দিকে চেয়ে বিজন তার কথা শেষ কর্‌লে, "কিন্তু, যেখান থেকেই হাসি জাগুক, প্রভাত, লিপির সেদিনকার হাসি নির্জ্জলা, সত্যিকার হাসি। ওতে ফাঁকি ছিলনা একটুও।"

—"বৌদির পক্ষে এটা নির্জ্জলা হাসি হ'তে পারে, কিন্তু এটাকে সত্যিকার হাসি বল্‌তে পার্‌বো না, বিজন। এ হাসি বৌদি খুব স্বার্থপরের মত নিজে নিজেই হেসে নিলেন। আমরা এতে ভাগ পেলুম অতি সামান্য। যে হাসি অপরকে হাসাতে পারে না, সে হাসি সত্যিকার হাসি কি রকম? শিশিরদা আপনার মত কি? আমার ত' মনে হয় সত্যিকারের হাসি একমাত্র আমার পিসেমশায়ের খুড়োই, হাসতে জানেন।" শিশিরদা মন্তব্য সুরু কর্‌বার আগেই আমরা চেঁচিয়ে ওঠ্‌লুম্ "সে আবার কিরকম অনাথ? আগে গল্পটাই বল—তবে ত' আলোচনা।"

—"গল্পটা খুবই ছোট্ট, তাই তার মুখবন্ধটা বড় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলুম। বার্ণার্ড শ'য়ের নাটকে যেমন কথাবস্তুর চেয়ে লেখকের টীকাটিপ্পনীই বড়। তাঁকে আমরা দাদামশাই ব'লতুম্। ছেলেবেলা থেকে তাঁকে কেউ প্রাণখুলে হাস্‌তে কখনো দেখেনি—এম্‌নি মানুষ। যেম্‌নি গম্ভীর, তেম্‌নি রাশভারী। কারু সঙ্গে কথা তিনি বল্‌তেন খুব কম, যদিবা কখনো মুখ খুল্‌তেন ত' কথা শেষ কর্‌তে বেশি দেরি হতনা। অবশ্য এর কারণ ছিল যথেষ্ট। চিরকালই তিনি জন্ম-একলা মানুষ শুধু অন্তরে নয়, বাইরেও। জন্মের কয়েক মাস পরেই বাপ-মা দুজনেই মারা যান। আত্মীয় অনাত্মীয়ের মধ্যে এক গরীব মামা ছিলেন। তাঁর কাছেই খুব দুঃখ কষ্ট ভোগ করে মানুষ হন। জীবনে তাঁর উচ্চাশা ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু সত্যিই বরাতের ফেরে একদিন বড় ঘরে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ের মা চাইছিলেন ঘর-জামাই, তাই দাদামশাইকে পছন্দ করতে দেরি হল না। বিশেষতঃ, দাদামশায়ের মামা বিশেষ কিছু পাবার আশায় ছিলেন, তাই ছেলের অমতে জোর ক'রেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। অবশ্য বুঝ্‌তেই পারচো, এই অসমান ঘরের বিয়ের পরিণাম কিছু ভাল হয়নি, আর দাদামশাইও ঘর জামাই হ'তে পারেননি। আমার বাবাকে তিনি খুব ভালবাস্‌তেন। একদিন সুযোগ পেয়ে বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা কাকা, আপনি বিয়ে কর্‌লেন কেন? বাড়ী থেকে পালালেই ত' পার্‌তেন?" দাদামশাই জবাব দিয়েছিলেন, "দেখ ভাই, জীবনের সহজ গতিকে বাধা দিতে নেই। যা' সহজভাবে আস্‌চে, তাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ কর্‌তে হয়। এ যে পারে, তার জীবনে আনন্দের কখন অভাব হয় না। দেখনা, স্রোতের ফুল বাধা কখন দেয় না ব'লেই একদিন সাগরের আনন্দধ্বনি শুনতে পায়। অবশ্য মনের মধ্যে এই বিশ্বাস থাকা চাই যে যা' ঘটচে, সবই আমাদের ভালর জন্যেই।"

শীতল বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠে, "এ যে দেখ্‌চি একেবারে ব্রাউনিং, 'God's in His heaven, All's right with the world."

—"যাই হোক্, শুনে যাও। জীবনে সত্যিকার সুখ দাদামশায় কখনো পাননি। স্ত্রীর সঙ্গে একদিনও তাঁর মনের মিল হয় নি—হতে পারতোও না। কারণ দিদিমার শুধু যে বড়লোকী মন ছিল, তা' নয়, তাঁর মত আত্মম্ভরী, দাম্ভিক, ক্ষমতাপ্রিয় মেয়েমানুষ খুবই কম দেখা যায়। কাজ কর্ম্মে, ভাবনাচিন্তায় সকল রকমে তিনি ছিলেন দাদামশায়ের ঠিক বিপরীত। কিন্তু আশ্চর্য্য তবুও দাদামশাই একে নিয়েই ঘর কর্‌চেন। বোধহয় নিজেকে তিনি নিঃশেষে ভুল্‌তে পার্‌তেন বলেই এ কাজ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছিল। বিজন, আজ তোমরা হ্যাভ্‌লক এলিস্ প'ড়ে কথায় কথায় তত্ত্ব আবিষ্কার কর, দাম্পত্য কলহের একটু সূচনা হ'লেই ভির্মি যাও—কিন্তু দাদামশায়ের একি সাধনা বল দিকিনি, তবুও আমি হলফ্ করে বল্‌তে পারি তিনি একখানিও তোমাদের দাম্পত্য শাস্ত্র পড়েছিলেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রীকে সুখী কর্‌বার সে কি চেষ্টা! সমস্ত দিন

দু' দুটো আপিসে পরিশ্রম ক'রে টাকা রোজগার করতেন, আর দিদিমা বড়লোকী করে' তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। তবু তাঁর নিজের জীবনে না ছিল এইটু আমোদ না বা একটু সখ। বাবা একদিন জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, "কি করবো বল অবিনাশ, স্ত্রীকে মন দিয়ে ত' সুখী করতে পারলুম না, ধন দিয়েই করি। বিয়ের মন্ত্র যখন না বুঝে' পড়েছিলুম, তাতে যে ওকে সারা-জীবন সুখী করবারই প্রতিজ্ঞা ছিল।" যাহোক্ সকল দিকেই দাদামশায়ের চরম সুখ। ছেলেটা ছিল পাকা মাতাল, আর ভয়ানক একগুঁয়ে বদ্‌রাগী। ঠিক দিদিমারই ধাত পেয়েছিল। একদিন মদ খেয়ে বাড়ী এসে টাকা নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে' তাঁকে গুলী করে মেরে ফেললে। সকলেই ভেবেছিল, এবার দাদামশাই ভেঙে পড়্‌বেন। কিন্তু আশ্চর্য্য তিনি যেন একেবারে নির্ব্বিকার। বাড়ী এসে যখন লঙ্কা-কাণ্ড দেখ্‌লেন, কারুকেই কিছুই বল্‌লেন না। পুলিশ আর ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে তখনি-তখনি দিদিমার সৎকার করে' এলেন। চিতায় যখন লাসটাকে শোয়ান হচ্চে, সে কি তাঁর যত্ন, খুঁটিনাটি বিষয়ে সে কি একাগ্রতা। জীবনে যে তাঁকে একদিনের জন্য সুখী করেনি, মরণের পরও তাঁকে সুখী করবার জন্যে সে কি ব্যাকুলতা।......

কিন্তু পরের দিন আবার যে-কে-সে। ঠিক সময়ে খেয়ে দেয়ে আফিস গেলেন। সকলেই অবাক্ হয়ে' গেল। তারপর—আবার সেই হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। সংসারে ছিল কেবল একটি বিধবা মেয়ে। বন্ধুরা সদুপদেশ দিলে, "অত করে' আর খেটোনা হে। বৌদিই যখন চলে গেলেন, তখন কার জন্যে আর অত করে' রোজগার করচ! ঘরে একটি ত শুধু মেয়ে।" দাদামশায় শুধু একটু হাসলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আমার মনে হয় দাদামশায় জীবনকে যথার্থরূপে বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। কাজের মধ্যেই মেলে জীবনকে ভোল্‌বার উন্মাদনা, আবার এই কাজের মধ্যেই মানুষ পায় জীবনের ভোগ-ভাণ্ডার—সত্যিকার আনন্দ। কর্ম্মই ত জীবনের সাধনা। তাই ত জীবনের দ্রষ্টারা বলেচেন, কর্ম্মের মধ্যে দিয়েই কর্ম্মের পারে যাও। আমার বিশ্বাস, এ সত্যটিকে দাদামশায় মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন।...এম্‌নি' করে' দিন যায়, বছর তিনেক কেটে গেল। তারপর একদিন আবার দুর্ঘটনা ঘট্‌ল। আমার পিস্‌তুতো ভাই বিধবা মেয়েটিকে নিয়ে একদিন রাতে সরে' প'ড়্‌লেন। এবার আর দাদামশায় স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না। নির্ম্মম অদৃষ্টের সঙ্গে তিনি অনেক যুদ্ধই করে' এসেচেন- এবার তিনি কাবু হয়ে' পড়লেন। চাকুরি ছেড়ে দিলেন, টাকা-কড়ি সৎকাজে বিলিয়ে দিয়ে কাশীতে আশ্রয় নিলেন। তারপর বছর খানেক আর কোন খবর নেই—সব চুপ-চাপ। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় মহলে তাঁকে নিয়ে অনেক গুজব উঠ্‌ল—কাশী-ফের্‌তা কেউ কেউ বল্‌লে, সে একেবারে পাগল হ'য়ে গেচে। হেসে আর রং তামাসা করে দিন কাটাচ্চে। পাগল হওয়াটা ত' আশ্চর্য্য নয়। ওর জীবনের কথায় পাগল হয়ে' যেতে হয়।......

বাবার লাইব্রেরী থেকে সেদিন একখানা বই নিয়ে এসে পড়্‌ছিলাম—হাসির বই। বইখানা বাবা ক'দিন ধরে' একমনে পড়্‌ছিলেন—তাই আমিও খুব বেশী উৎসুক হয়েছিলুম। বাবা হেসে বল্লেন, "কিরে, ওখানা নিয়ে এসেছিস। বাস্তবিক বইখানা খুবই সুন্দর হয়েচে। জগতের দুঃখপীড়নকে নিয়ে এমন করে' আর কখনো কেউ হাস্‌তে পারেনি। বই-খানার নাম তোমরা সকলেই জান,—'সঞ্চিতা'—যা' আমাদের ঠাণ্ডাশালার লাইব্রেরীতে এলে তোমরা পড়্‌বার আগ্রহে টানাটানি করে' ছিঁড়ে ফেলেছিলে। এর লেখক কে জানো?—আমাদের সেই দাদামশায়! 'সঞ্চিতা'ই বটে!—এতদিন এত বিপুল হাসি ওঁর অন্তরে সঞ্চিত হয়ে'ই ছিল।"

—"আশ্চর্য্য! 'সঞ্চিতা'র মত বইয়ের লেখক—যে এমন করে' লোককে হাসাতে পারে—তার জীবনটাও যে এত ভয়ঙ্কর এ'ত কল্পনাও করা যায় না।

—তাইত বলচি, এই হাসিই সত্যিকার হাসি। ওর একটা কথা আমার খুব ভাল লাগে—, 'জগতে এত দুঃখ, এত কান্না, এত অসামঞ্জস্য রয়েচে যে তা' নিয়ে ভাব্‌তে গেলে শুধু হাসিই পায়, কেঁদে আর কান্না বাড়াতে ইচ্ছে করে না।

—আরে রাখো তোমার—হাসি-কান্না। 'সঞ্চিতা'র লেখক না দক্ষিণের লোক,—বুজ বজের ধারে বাড়ী? আরে

দক্ষিণের লোকেরা ত' জন্ম-রসিক। তাইত' বলি, এত শোচনীয় যার অতীত তার পক্ষে এও কি সম্ভব! ও-পাশের লোকেরা শোকেও হাসে, আমোদেও হাসে!"

"দেবীর এ এক অদ্ভুত বিশ্লেষণ!"—বিভু হো হো করে' হেসে ওঠে। ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা করে। তাই এ-সব বিষয়ে ওর আগ্রহ বেশী। ও বলে' যায়,

—"ব্যাপারটা অত হাল্‌কা নয় হে। জানো, বুড়ো বয়সেই 'হিউমার' উপলব্ধি করবার সত্যিকার সময়। শিশুদের মধ্যে আছে শুধু 'সিরিয়াস্‌নেস্‌'—না বা একটু হাল্কা ভাব, না বা—'হিউমার'। তাই মনে হয়, 'সক্ষিতা'র আবির্ভাব হয়েচে, ওই বয়েস-ধর্ম্ম থেকেই। একটা উদাহরণ দেই। লোকে আক্ষেপ করে, এতদিন বাংলা-সাহিত্যে তেমন হিউমারের প্রতিভা আসেনি। আমার মনে হয়, এই না-আসাটাই ত' স্বাভাবিক। কারণ সে প্রতিভা আসা মানে সাহিত্যের বয়সের লক্ষণ। শিশু বাংলা সাহিত্যে সে প্রতিভার বিকাশ পাবার আশা করাই যে অন্যায়। জানো, ইংরেজী সাহিত্যকে Lamb-এর আবির্ভাবের জন্যে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল—ধর সেই Chaucer-এর যুগ থেকে।"

হিউমার সৃষ্টির নূতন তত্ত্ব নিয়ে আমি বিভুকে দু'কথা শোনাতে যাচ্চি, এমন সময় শিশিরদা মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে সুরু করলেন

"অপরের মধ্যে হাসির উদ্রেক করতে পারে, এইটাই সত্যিকার হাসির চরম প্রমাণ নয়। যে হাসি অপরকে হাসাতে পারে, সেইটাই যে কেবল হাসি, আর সব নিছক অ-হাসি—এ ধারণাটাই ভুল, অনাথ। বরং বোধ যেখানে যত গভীর প্রকাশ সেখানে ততই অল্প। তাই সত্যিকার হাসি যে-লোক মনে প্রাণে অনুভব করে' হাস্‌তে পারে—সেটা অনেক ক্ষেত্রেই তার একান্ত নিজস্ব। এই জন্যেই ত বলি, Lamb লোককে হাসাতে পারলেও, নিজে সত্যিকার হাসি হাস্‌তে পার্‌তেন কিনা সন্দেহ!

—"জিনিষটাকে তোমরা ক্রমেই হেঁয়ালী করে তুলচ। আচ্ছা, আমার এই ছেলের হাসিটাকে কেমন করে ব্যাখ্যা করবে শুনি? এবার কালিবাবু কথা কইলেন। উনি জমীদার। প্রথম জীবনে ছিলেন রাজবন্দী, তারপর পালিয়ে যান সুইস্‌জারল্যাণ্ডে। সেখানে এক ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে ক'রে হ'য়ে পড়েছিলেন একেবারে কে-স্মানিয়াল। কিন্তু দেশের প্রতি ওঁর ছিল সত্যিকার টান্‌। তাই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পর দেশে ফিরে এসে আবার হয়ে পড়্‌লেন যে-কে-সে। বয়সে তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়, তবু মাঝে-মাঝে আমাদের আড্ডায় যোগ দিতে ভোলেন না। তিনি বোলে যান, "সুনীল আমার বড় ছেলে। সে এখন বরদার পশুশালার ভার পেয়েচে, ওর তখন বয়েস আট বা নয়। ছেলেবেলা থেকেই ও জন্তু-জানোয়ার খুব ভালোবাসত। তাই নানারকম জানোয়ার কিনে দিয়েছিলুম। কিন্তু ওর সব চেয়ে প্রিয় ছিল একটা গ্রেহাউণ্ড কুকুর। সেটাকে ও কাছ ছাড়া করতে পার্‌ত না। নিজেই তার দেখাশুনা, খাওয়া দাওয়ার ভার নিয়েছিল। ছোট্ট মানুষ কিন্তু আশা কম নয়। সেই বয়সেই ও জগত-জয়ের স্বপ্ন দেখ্‌ত। কখন বল্‌ত, এই কুকুরটাকে নিয়ে আমি সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আস্‌ব। কখন বা বল্‌ত, টম্‌ একটু বড় হলেই ওকে আমি দেশ বিদেশে পাঠিয়ে দেব। ও world champion হয়ে ফিরে আস্‌বে। আমার বোধ হয়, ওর মনের এই ভাবটা ওর মার রক্ত থেকেই পেয়েছিল,—এটা ব্রিটিশ ইম্পিরিয়েলিজম্‌-এরই অনুরূপ! কি বল্‌চ অনিল, এটা আমার নিছক কল্পনা? যাই বল, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইম্পিরিয়েলিজম্‌ ওদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেচে। যা হোক্‌, আমাদের এই হবু দিগ্বিজয়ীর আব্‌দারের জ্বালায় মাঝে-মাঝে প্রাণান্ত হয়ে উঠ্‌ত। একদিন টম্‌ খোকাকে অকারণে আঁচ্‌ড়ে দিয়েছিল ব'লে আমার স্ত্রী কুকুরটাকে একবেলা খেতে দেন নি। এতে খোকার কী অভিমান! ও দুদিন জলস্পর্শ করলে না, কুকুরটাকে এম্নি ভালবাস্‌ত। জানত, সুইৎজারল্যাণ্ডে কুকুরের খুব রেস হয়। সময়ে সময়ে তা'তে অনেক টাকার পুরস্কার থাকে। কিছুদিন বাদে টম্‌ যখন বেশ একটু বড় হল, একদিন এক সাধারণ প্রতিযোগিতায় সে সত্যি-সত্যিই প্রথম হ'য়ে ফিরে এল। সেদিন খোকার কী আনন্দ! তারপরের দিন পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে ওর মাকে পাঠালে—

সুইজারল্যাণ্ডে যত বড় বড় নামজাদা এইরকম প্রতিযোগিতা ছিল, তাদের নাম আর ঠিকানা আন্‌বার জন্য। কুকুরটী ছিল বাস্তবিকই ভাল জাতের। মাস ছয়েকের মধ্যে প্রায় দশ বারটী প্রতিযোগিতায় ও প্রথম হ'য়ে পুরস্কার নিয়ে এল। আমাদের জেলাময়ত' খুব সোরগোল পড়ে গেল। কাগজে কাগজে খোকা আর টমের ছবি উঠ্‌ল।

কিন্তু এতেও খোকার মন ভর্‌ল না। বলে, "বাবা, টম যেদিন world-champion হয়ে আস্‌বে, সেদিন আমায় কি দেবে বল?' আশা কম নয়। একদিন একগুঁয়ে ছেলেটা কারুর কথা শুন্‌লে না। রাজধানীর এক বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় নাম পাঠালে। স্ত্রীকে ডেকে বল্‌লুম, ওর পেছনে এত টাকা খরচ কর্‌লে চল্‌বে কেন? স্ত্রী বল্‌লেন, ভয় পাচ্ছ কেন? এবার ও নিশ্চয় হেরে আস্‌বে। তখন আর এদিকে ঝোঁক থাক্‌বে না। আমারও তাই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, টম্ এবারও প্রথম হোল। পুরস্কার হিসাবে মোটা কিছু টাকা পাওয়া গেল বটে কিন্তু দৈবক্রমে টমের পা'টা বেশ একটু মুচ্‌কে গেছল। তাই বিস্তর টাকা খরচ হ'য়ে গেল। আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে খোকার সেকি শুশ্রূষা করা! কেঁদে এসে বলে, টম চলে গেলে আমি আর বাঁচ্‌ব না বাবা। যাহোক, সুইস্ চাকরটার পরিচর্য্যার গুণে টম পা'টা ফিরে পেলে বটে কিন্তু ডাক্তার সাবধান ক'রে দিলেন, আর কখনো একে যেন 'রেস' এ পাঠানো না হয়।

তারপর কিছুদিন পরে আমার স্ত্রীর এক বন্ধু ইংলণ্ড থেকে সুইস্‌জারল্যাণ্ডে বেড়াতে এলেন। তিনি একজন বিখ্যাত রেস-খেলোয়াড়। অনেকবার তাঁর ঘোড়ারা বাজী জিতেচে। তাঁর সঙ্গে এসেছিল তাঁর স্ত্রী আর একমাত্র মেয়ে। মেয়েটি আমাদের খোকারই সমবয়সী। প্রথম দিনের আলাপেই ওদের দুজনের খুব ভাব হয়ে গেল। ঐ খুকীরও সঙ্গে একটা কুকুর ছিল। দু তিন দিন বাদে কুকুর নিয়েই ওদের ঝগড়া বাধ্‌লো। ও বলে, যে কোনো সাধারণ ইংরেজ কুকুরের কাছে খোকার কুকুর হেরে যাবে। ইংরেজ কুকুরের কাছে সুইস্ কুকুর কিছুই নয়। খোকা বলে, কখ্‌খনো নয়। ইংরেজ কুকুর দৌড়নর জন্য মোটেই বিখ্যাত নয়। তাছাড়া টম আজ দিগ্বিজয়ী। এর কাছে কেউই পার্‌বে না। শেষে দুপক্ষই একদিন 'রেসে'র আয়োজন কর্‌লে—একদিকে টম্ আর একদিকে খুকীর কুকুর। আমি বারবার বারণ কর্‌লুম—পা' ভাঙ্গার পর আর কি টম্ তেমন দৌড়্‌তে পার্‌বে? খোকা কারো কথা শুন্‌লে না। শেষে একদিন রেস হল। সমস্ত রাত জেগে খোকার সে কি পরিচর্য্যা, পাছে শরীরের কোন গ্লানির জন্য টম হেরে যায়! রেস সুরু হবার আগে টমের কাণে কাণে বলে দিলে,—টম তুমি চিরকাল জিতেই এসেচ, এবারও নিশ্চয় জিত্‌বে।...রেসে টম সত্যিসত্যিই জিতেছিল, কিন্তু তাকে আর ফিরে পাওয়া গেল না। শেষ সীমার কাছাকাছি এসে কেমন হোঁচট খেয়েছিল কিন্তু তবুও টম দমেনি, শেষ পর্য্যন্ত এসে শুয়ে পড়ল। মিনিট দশেক বাদে পিছনের পা দুটো পেছন দিকে একটু ছড়িয়ে দিলে। লেজটা অল্প একটু নাড়্‌ল, তারপর মুখ থেকে এক ঝলক্ রক্ত উঠে মারা গেল। আমার ভয়ানক ভাবনা হল।—কুকুরটাত' গেল, এবার ছেলেকে কেমন করে বাঁচাবো! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ফিরে দেখি, খোকার সে কি আনন্দ! নাচ্‌তে নাচ্‌তে সুনীল বল্‌লে, টম মরে গেচে, তা'তে হ'য়েচে কি বাবা,—দস্তুর মত জিতে, তবেত' মরেচে!"

বিভু ব'লে ওঠে, এ'ত আজ একটা বিশ্ব-সমস্যা কালিবাবু! এতে স্পষ্ট রয়েচে superiority complex এর উগ্রতা। পুরুষ ভাবে নারীর চেয়ে সে সকল অংশে শ্রেষ্ঠ। তাই তার কাছে পরাজয় স্বীকার করা মানে পুরুষত্বের তীব্র অপমান। এ পরাজয়কে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে সে যে-কোনো মূল্য দিতে দ্বিধা করে না—এমন কি প্রিয় হতে প্রিয়তর জিনিষও বিসর্জ্জন দিতে পারে। এই দুর্জ্জয় পুরুষত্বের দম্ভ ছিল ঐ সুনীলের বুকে। তাই, যত বড় ক্ষতি স্বীকার করেই হোক, সেদিন ও যে মেয়েটার কাছে জিত্‌তে পেরেছিল—এতেই ওর অত আনন্দ!"

—"সে কি হে, আমার ছেলের তখন বয়েস আট বা নয়! সেই বয়সেই ওর বুকে জেগে উঠ্‌ল দুর্জ্জয় পুরুষত্ব! এ যে একেবারে নতুন আবিষ্কার দেখ্‌চি!"

"—পাগলের কথা শুন্‌চেন কেন কালিবাবু? পশ্চিমের নতুন নতুন তত্ত্বগুলোর এমন কদর্থ কর্‌তে বিভুর জুড়

আর 'কেউত' পারবে না, কেননা, ওগুলোর এত বদহজম বোধ হয় আর কারো মধ্যে হয়নি। যাহোক, আমার মনে হয়, সুনীল কুকুরটাকে ভালোবাসত কুকুরটার জন্যে , ও যে কথনো কোথাও হেরে আসেনি, ওর এই বিশেষ গুণটার জন্যেই। কুকুরটা যদি সেদিনের দৌড়ে হেরে যেত, কুকুরটা বেঁচে থাকত বটে, কিন্তু সুনীলকে আর ফিরে পেতেন কিনা সন্দেহ। মরুক্ আর বাঁচুক কুকুরটা যে জিতেচে, এতেই ওর আনন্দ। কিন্তু সে যাই হোক্, সুনীলের সেদিনকার হাসিটা যে নিছক সত্যিকার হাসি ছাড়া আর কিছু নয়—একথা বলবার বিশেষ কি কারণ আছে?"—শিশিরদা খুঁত না রেখে কথা বলেন না। ওটা ওঁর স্বভাব।

—"যাই বলুন, শিশিরদা, আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হলেও, বিজনের স্ত্রীর হাসিকে আমি সত্যিকারের হাসি বলতে পারবো না। আমার গল্পটা না-হয় মন দিয়ে শুনে শেষে সমালোচনা করবেন।

আমার ছোট-মামীমা চিরকালই খুব হাসির গল্প করতে পারতেন। ছেলেবয়েসে তিনি নাকি দু'একটা গল্পও মাসিকে ছাপিয়েছিলেন কিন্তু তা' মোটেই রসাল হয়নি। সে যাহোক তাঁর মনটা ছিল বাস্তবিক খুব সূক্ষ্ম আর খুব সাহিত্যরসিক। আর লিথতে না পারলেও তাঁর বলবার বেশ একটু আর্ট ছিল। আমি তাঁর বিশেষ ভক্ত ছিলুম বলেই বোধ হয়, আমার কাছে তাঁর আর্টটা খুলতও খুব ভাল করে। তাঁর একদিনের একটা গল্প ব'লে আমার কথা শেষ করব। সেদিন ছিল বাদলা, সমস্তদিন আকাশটা নিঝুম হয়ে' ছিল—আফিঙখোরের মতন। বিকালটা একলা আর কাটতে চায় না। তাই ছোট মামীর কাছে গিয়ে বললুম,—আজ আর কাজকর্ম্ম রাখো। বরং এই অসময়েই একটা গল্প বলো, শোনা যাক্। ছোটমামী কি জানি কি ভেবে বেশী কিছু ভূমিকা না করেই সুরু করলেন,—অনেকদিনের কথা, তথনো আমরা ছেলেমানুষ। উষা ছিল আমার সই! তার বাপ মারা যাবার পর তারা যেমনি গরীব, তেমনি নিরাত্মীয় হয়ে' পড়েছিল। মা মুড়ি ভেজে যাহোক্ করে' তাকে মানুষ করত। তথনকার দিনে গৌরীদানই প্রথা। তাই সইয়ের যখন বার বছর শেষ হয়ে' গেল, তথন পাড়ার অনেকেই নানা কথা কানাকানি করতে লাগল। উষার মার অক্ষয় স্বর্গ অচিরে ফস্কে যায় দেখে কানা ভটচায্ বেঁটে মুন্সি, মুলো আচায্যি তিন জনেরই ভুঁড়ি আপশোষে ফুটি ফাটবার উপক্রম হল। কিন্তু চুপ করে গঞ্জনা সহ্য করা ছাড়া ত সইয়ের মার উপায় ছিল না, সমাজ পীড়ন করতেই জানে, উপকার করতে ত' পারে না। বিশেষতঃ তথন পাড়াগাঁয়ে এফ্-এ, বি-এ পাশ করা সুরু হয়ে গেচে, তাই পাশ-করা ভদ্রলোকের ছেলেদের দর খুব বেশী। ভদ্র-লোকের ঘরে তথন প্রায় সকলেই দু'এক কলম ইংরেজিও পড়ত শিখেচে, তাই সকলেরই দাম চড়া। উষার মা অনেক খোঁজ করলেন, তবু বিধবার মেয়েকে উদ্ধার করবার পাত্র মোটেই মিলল না। এমনি করে' প্রায় সই যখন পনর বছরের, তথন নিষ্ঠুর প্রজাপতি একদিন মুখ তুলে চাইলেন। একজন দোজপক্ষ পাত্রের সন্ধান মিলল। কিন্তু সেও পাঁচশ টাকার কম পণে বিয়ে করতে রাজী হ'লনা। নিরুপায় হয়ে শেষে সইয়ের মা বাড়িটি বিক্রি করে' বিয়ের সব বন্দোবস্ত ঠিক করলে। বিয়ের পরে জামাই শাশুড়িকে তার বাড়ীতে বাস করতে বললে। কথায় বলে গরু মেরে জুতো দান। কিন্তু অভিমানী নারী সে কথা শুনলে না। হাতে যা'কিছু টাকা ছিল তাই নিয়ে কাশী চলে' গেল। যাবার সময় মেয়েকে যখন আশীর্ব্বাদ করতে এল, তথন সই তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্যি নিলে, মা, আজ যে বিয়ের জন্যে তোমাকে ঘরছাড়া, দেশছাড়া, নিঃসম্বল অনাথ হ'তে হ'ল, আশীর্ব্বাদ কর একথা যেন জীবনে না ভুলি। আমার যদি কথনো ছেলে হয়, তবে তার বিয়েতে যেন কোন পণ না নি—এই শপথ আমি তোমার পা ছুঁয়ে নিলুম। মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

তারপরে অনেক দিন কেটে গেচে। দুঃথকে মানুষ ভুলতে পারে ব'লেই জগতে মানুষ বাঁচতে পারে। মার সেই নিঃসম্বল অবস্থার কথা হয়ত উষা ভুলে গেছ্ল। যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, ওর বিয়ের পর ওর স্বামীর অবস্থা খুব ভাল হয়েছিল। সময়ে একটি ওদের ছেলে হয়েছিল,

যেমনি তার রূপ, তেমনি বিদ্বান। ওকালতী পাশ করবার পর স'ইয়ের স্বামী বড় সাহেবকে ধরে ওদের আফিসের আদালতের কাজে লাগিয়ে দিলে। মানুষের মন অবস্থার সাথী। যখন যেমন, তখন তেমন। কুমারী জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তা ছিল যার একঘেয়ে, আজ জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমোদ, উপেক্ষা, আত্মম্ভরিতা হ'ল তার তেমনি একচেটে। যা হোক একদিন সেই গুণধর ছেলেরই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হল। সে একজন শিক্ষকের মেয়ে। যেমনি রূপসী, তেমনি গুণের। সই গোঁ ধরলে, মেয়ে যেমনিই হোক্—পাঁচ হাজার টাকা নগদ না দিলে ছেলের বিয়ে কিছুতেই আমি দেব না। আমার কি যে-সে ছেলে—রূপে, গুণে, যশে, আয়ে, বাংলা দেশে মেলে ক'টা শুনি। স্বামী এসে বল্‌লে, সে কিগো, একবার অজান্তে পণ নিয়ে এক অনাথা বিধবাকে দেশছাড়া করেছি, সে পাপ জীবনে আর বাড়াতে দেব না। অত টাকা নিয়ে করবে কি শুনি। ভগবান ত' তোমার কিছু অভাব রাখেননি! সই খিঁচিয়ে ওঠে—নেকামি রাখো। আমার এক ছেলে, তা'তে এমন সোনার চাঁদ। তার বিয়েতে ঘটা করে' আমোদ করবে এ'ত মনিষ্যি জন্মের সাধ। স্বামী বল্‌লে, ছেলে নিজেই যদি এতে বাধা দেয়, তবে করবে কি! সই রেগে জবাব দিলে, বাধা দিলেই হ'ল? ছেলেকে পেটে ধরে' মানুষ করলুম কি জন্মে? তার অমতেও আমি দমব না। তোমার কথা ছেড়েই দাও। স্বামী হেসে উত্তর দিলে, তা হ'লে বল, এটা ছেলের বিয়ে হচ্চে না। এবার তোমার নিজের বিয়ে হচ্চে টাকার সঙ্গে। সই বল্‌লে, "যাই বল তুমি, কিন্তু সাবধান করে' দিচ্চি, আমার পথে দাঁড়িও না। ছেলের বিয়েতে দশজনকে নিয়ে আমোদ করা এ'ত সমাজের প্রথা। পণ নেওয়াটা যদি খারাপ হ'ত, তবে শাস্ত্রে আছে কেন? চূড়ামণি ঠাকুর ত' সেই কথাই কালকে বলছিলেন। পরের নিয়েই লোকে আমোদ করে। কে কবে আর ঘরের টাকা খরচ করেচে। অইত আর বছর ঘোষাল দিদির ছেলের বিয়েতে কি ঘটাই না করলে—হাজার টাকা পণ পেয়েছিল বলেইত করতে পারলে। মেয়ের বাপ এসে সইয়ের পা জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু সই জিদ্ ছাড়লে না—বিয়ের রাতে নিজে গিয়ে পাই পয়সা আদায় করে' নিলে।" ছোট মামী এতক্ষণ বেশ গম্ভীর হয়েই কথা কইছিলেন। এবার তাঁর ছদ্মগাম্ভীর্য্য ছেড়ে দিয়ে বেশ হেসেই বল্‌লেন, মানুষের এমনিই মন বাবা। যে কাজে নিজের সর্ব্বনাশ হ'ল, সেই কাজ করে অপরের সর্ব্বনাশ ঘটাতে তার একটুও দ্বিধা হয় না। এতক্ষণ বড় মামীমা চুপ করে' বসে ছিলেন। আমাদের হাসি শেষ না হ'তেই তিনি বলে' উঠ্‌লেন, ওরে বিপিন, সত্যি কথা বলি, এটা ওর সইয়ের গল্প নয়—ওর নিজেরই। আর সব ঘটনাগুলো নিছক সত্যি। সুরেনের বিয়ের সময় ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে ওর কি ঝগড়া! 'থামো থামো' বলতে বলতে ছোট মামী রাগের ভান্ করে' উঠে গেলেন। বল্‌লেন, তোমার যেমন দিদি, সব কথা ফাঁস করে' দিয়ে গল্পের গুরুত্বটা নষ্ট করে' দিলে। আমি অবাক হয়ে' মনে মনে বলি, এতে গল্পের গুরুত্বটা নষ্ট হ'ল না, মামী, বরং সহস্র গুণে বাড়ল।

বিপিন একটু থেমে তার বক্তব্য শেষ করলে, যাই বলুন শিশির দা, ছোট মামীর সেই স্মিত হাসিটাই সত্যিকার হাসি। যে লোক নিজেকে নিয়ে এমন করে' হাস্‌তে পারে, নিজের দুর্ব্বলতাকে হাসির মধ্যে এমন করে' ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে, সেখানেই আছে সত্যিকার হাসি। আপনি বলেচেন, Lamb জীবনে কোনদিন সত্যিকার হাসি হেসেছিল কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয়, জগতে Lambএর মত সত্যিকার হাসি হাসতেও কেউ পারেনি—এমন করে' সত্যি করে' হাসির কাহিনীও কেউ লিখতে পারেনি। Lamb সত্যিকার হাসি হাসতে পারত, তার পরিচয় পাই সেখানেই—যেখানে পড়ি Lamb নিজেকে নির্ম্মম ভাবে রহস্য করচে।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

টুক্‌রি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮

সোনার আলোয় সোনালী কোরেছে
মাথাভরা শাদা চুল ;
বেগুনে রঙের জামাখানা ঢেকে
লুটিয়ে পড়েছে রাঙা
উত্তরীখানি ;
উনসত্তর বছর কাটিল আজি
উদয়াচলের পানে দুই আঁখি মেলি'
ছাদের উপরে পায়চারি করে কবি রবীন্দ্রনাথ।

মাটির পটে

একটি ফোঁটা বৃষ্টির জল
চিকন সবুজ ঘাসে
বাদামী রং ফড়িং তারি তলে—
মাটির পটে কে এঁকেছে হঠাৎ আঁকা ছবি।

পরশমনি

ভাঙা দোয়াত দিলেম ফেলে
বাহির পথে,
সকালবেলায় সূর্য্য তারে
আপন করে।

বুনোগাছ

বুনোগাছ,
চিকন সবুজ পাতা,
ছড়িয়ে গেছে আঁকা বাঁকা বেগুনে রঙের ডাল,
হল্‌দে ফুলের থোকায় থোকায়
কালো কালো একজোড়া মৌমাছি।

বাদলের কবিতা

ঝর ঝরিয়ে বৃষ্টি ঝরে,
মর্ম্মরিয়ে বেজে ওঠে
চাল্‌তা গাছের পাতা,
ভাবি বোসে কলম রেখে
আজ কবিতা থাক্‌।
এমন সময় দুটি বোনে ভিজে চুলে এসে
বল্‌লে হেসে, আজ কবিতা চাই।

সন্ধ্যামণি

পাশের বাড়ির ফুল বাগানে
ফুট্‌লো সন্ধ্যামণি।
আমি যদি না চাই তবু ব্যগ্রতা ওর নেই,
তাই তো ওরে ভালোবাসি সহজ শান্ত মনে।

শিল্পী

সুনীল আকাশে উড়ে উড়ে শেষে
মিলিয়ে যায়;
পাখীটারে আঁকি, হয় না যে আঁকা—
মিলিয়ে যাওয়া।

সাগর

দিগন্ত জোড়া ধানের ক্ষেতের বুকে
আজি দুরন্ত বাতাসে সবুজ সাগরে—
আমার মনের যেন রে—নৌকাডুবি।

কাঁটার বয়স

করমচা গাছে কাঁটা ভরা ডালে ডালে
ছোট বুল্‌বুলি বুক রেখে গান গায়।
দেখি, কাঁটাগুলি নরম সবুজ কচি,
যেন আধো আধো শিশুর রাগের ভাষা।

আপন হারা

বৃষ্টিজলে
বুকের পরে
সাজায় মুক্তোমালা,
ডালে ডালে
ফুলের মুখের বাণী,
লজ্জাবতী লতার লজ্জা আজি
বাদল দিনে কোথায় গেল দূরে।

তিন রঙা ছবি

যত দূর চাই
সরস সবুজ মাঠ;
তারি মাঝে চরে অলস পাটল গরু,
দাঁড়কাক তার পিঠে ব'সে আছে
চিকন কালো।

সাদায় কালোয়

টেলিগ্রাফের তারে
ল্যাজ দুলিয়ে নাচে কালো ফিঙে;
পিছনে তার সকালবেলার পাৎলা সাদা মেঘ।

বাতায়ন

যে বাদলধারা শালের শাখায় ঝরে,
তারি ছাঁট এসে ভেজায় আমার খাতা।
জান্‌লা আমার এমনি থাক্‌না খোলা,
মোর মনে আর শালবনে যাক মিলে।

অধিকারী

যেই ভাবলাম গোলাপটি তুলে নেবো,
উড়ে এল ঐ শাদা ডানা প্রজাপতি
লাল গোলাপের বুকখানি দিল ভ'রে।

গন্ধ

কাঁটার আড়ালে রয়েছে বন্ধ হ'য়ে।
গন্ধে তাহার কাঁটার শাসন নেই।

বিনিময়

রেখে এনু তার গানের খাতার পাশে
বনের খুসিটি জানাবার তরে
দুটি কদম্ব ফুল।

আলোর পোকা

পোকাগুলো—ওদের কি এই
আলোর মদের নেশা,—
তারাগুলো—ওরা কি সব
আঁধার মদে মাতাল?

রক্ত কমল

শুভ্রশাড়ীর কালোপাড় দিয়ে ঘেরা
আল্‌তা-পরানো চরণ দুটির চলা
কোন ঘরে গিয়ে হয়েছিল অবসান
মোর মন তারি ঠিকানা খুঁজিয়া মরে।

নীরব চাওয়া

আমি বলি, এই দেখেছ
কাঁটাবনের ফুল,
তোম্‌রা কি কেউ নেবে?
সতু বলে, আমি নেবো।
রাণু বলে, আমি।
মীনু কিছুই বলে নাকো
ডাগর চোখে চায়।

উপহার

তোড়ার বাঁধন সইবে না ওযে
মালার গাঁথন মান্‌বে না,
কেয়াফুল এই মোর হাত হোতে
হাত তুলে লও তুমি।

উদাসী

ও পাশের বাড়ি ছোটো ছেলেটির অন্নপ্রাশন;
এ পাশের বাড়ি মেজ মেয়েটির বিয়ে;
শিশু ভাই তার দীঘির ঘাটের ধারে
খেলা ভুলে বোসে আছে।

রঙের পরশ

কালী-দীঘির বুকের তলায় সূর্য্য ডুবে যায়
সেই ডোবা রঙ পদ্ম হোয়ে ফোটে।

বিদ্যুৎ

কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো রয়েছে উঠোনের
এক পাশে,
এক পলকেই চলে গেল তার বুকের উপর দিয়ে
একটা হলুদে সাপ – মেঘের উপরে
তন্বী বজ্ররেখা।

পুকুর

পুরোণো পুকুর ; শ্যাওয়া গাছের ছায়া ;
শ্যাওলা ভরানো কালো জলে ঐ
ফুটেছে শালুক ফুল ;
দক্ষিণ পারে দুটো শাদা বক
দাঁড়িয়ে এক পা তোলা।

বড়োবাজার

কত লোকে আসে কত লোকে যায়,
কত গাড়ী ঘোড়া চলে আর চলে—
চলে সারা দিন ধ'রে ;
কত বকা বকি হাসি ও কান্না,
কত যে দোকান পাট ;
আপনারে আর চেনাতে পারিনে
মিশে যাই বার বার
বড়ো বাজারের ভিড়ে।

কর-কমল

রসে ভরা যেন আঙ্গুর তোমার আঙ্গুল কটি !
করতলে কচি গাবের পাতার গোলাপী আভা !
ঐ হাতখানি মোর হাতে তুলে ধ'রে
দিবে কি গণিতে করকোষ্ঠির ফল ?

মিষ্টি মুখ

পল্লীর মেয়ে জল নিয়ে যায়
আমবাগানের পথে।
বিদেশী পথিক বলে—"জল দেবে কী ?"
কিছুখন চেয়ে মেয়ে তারে কয়—
"শুধুমুখে জল খাবে ?
ঐ আমাদের বাড়ি—হোথা চল,
কোরবে মিষ্টি মুখ !"

রক্ত কুণ্ডল

হায়রে অসাবধানী !
কাল্‌কে বিকেলে আমার বাড়ির পথে
পড়ে গেছে দেখি, তোমার কানের
লাল পাথরের দুল।

চোখ

কোনো দিন কোনো কথাই বলে না,
রূপ নেই, নেই গুণ ;
কেবল তাহার আছে যেন দুটি চোখ।

দে পড়েদে আমায় তোরা

"এখনি কি তুই ইস্কুলে যাবি ?
এখনো বাজেনি নটা।
আয়না লক্ষ্মী সন্দেশ দেবো,
আয় ভাই শুনে যা।"
খাতা বই রেখে ছেলেটি বোস্‌লো
ছেঁড়া মাদুরের পাশে।
বৌটি তখন আঁচলের থেকে খুলে ভাঁজ করা চিঠি
ছেলেটিকে বলে—"পড়ো ভাই, ভালো কোরে"।

রেলগাড়ী

রাতের প্রহরে ঢেউ তুলে তুলে
দুলে চলে রেল গাড়ি।
অসীম ঘুমের আকাশে সে যেন
অনিদ্রা ধূমকেতু।

পরাণ কেষ্ট

আষাঢ় চলেছে আঁধার আকাশে
মেঘের ঝুলিটা নিয়ে,
বর্ষণ তার পাড়ায় পাড়ায় দিতে।
ঝুলি নিয়ে কাঁধে ঘন্টি বাজিয়ে
নির্জ্জন পথে ছোটে
পোষ্টাপিসের পরাণ কেষ্ট রাণার।

গোরু গাড়ি

খড়ের বোঝাই
গোরুর গাড়িটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলে।
আমি বলি ডেকে, কোন গাঁয়ে যাবে গাড়ী ?
কোনো উত্তর নেই।
গাড়োয়ান নিজে ঘুমোয় হেলান দিয়ে।
বাঁধা পথে চলে বাঁধা নিয়মের গাড়ি।

বাজার ফের্ত্তা

হাতে ছাতা দোলে, তাতে লণ্ঠন বাঁধা,
আর এক হাতে একটা বাল্‌তি আলুতে পটলে ভরা ;
মুখে তার বিড়ি, কোমরে জড়ানো
পুরোণো কেটের চাদরখানি ;
গায়ে শাদা কালো ডোরা কাটা কাটা কোট ;
ঘন ঘন চায় বুক পকেটের পানে ;
সেখানে রেখেছে একটি প্যাকেট
গ্যাটাপার্চ্চার কাঁটা,
আর এক শিশি জবা কুসুমের তেল।

যদু কামার

হাটে যাবার পথে দেখি, কামার যদু
গোরুর গাড়ীর লাগি গড়ে লোহার চাকা।
ঘরে ফেরার পথে দেখি, কামার যদু
কলু-বৌয়ের লাগি গড়ে হাতের "নোয়া"।

গিন্নি ও ঝি

গিন্নি বলেন—
মাছ পাঁচ-শিকে, আলু আনা ছয়, পটল চার আনা,
দু আনার চাই কলা ;
ওরে মোক্ষদা, টাকা দুই নিয়ে যা ।
মোক্ষদা বলে—
আরো দুটি আনা বেশী দিতে হবে মাগো,
বাড়িতে আমার কুটুম এসেছে আজ ;
দুই পয়সার কিন্‌বো চিংড়ি, তিন পয়সার আলু,
এক পয়সার কচি কচি পুঁই শাক ;
আর দুটো দিয়ে সুপুরি ও পান কেনা ।
ঝন্ ঝন্ কোরে গিন্নি দিলেন ফেলে ;
মাথায় ঠেকিয়ে মোক্ষদাতার আঁচলের কোণে বাঁধে
দুটো টাকা আর দুটো ছোট এক-আনি ।

সাঁওতালী

পরণে রঙীন গামছার মতো কাপড় খানি ;
কপালে উল্কী আঁকা ;
কালো সুতো বাঁধা রূপোর হাসুলি গলায় দোলে;
এক হাতে ওর আঁচলে ঝোলানো
আলুর পুঁটুলি ;
আর একহাতে
কাঁকুড়ে শশায় সাজানো মাটির হাঁড়ি ।
এক পয়সার কিন্‌লো কল্‌মী শাক ;
তারই থেকে দুটো লক্‌লকে কচি পাতা
গুঁজে নিল তার কালো খোঁপাটির চুলে ।

হাটের ফুল

সারাটা হাটেই কেনা বেচা চলে
মাছ শাক তরকারী ।
বেলা প'ড়ে যায়—শেষ হয়ে যায়
সকলের বেচা কেনা,
একজন শুধু বসে থাকে ঐ হাটের একটি কোণে ।
এতক্ষণেও বেচ্‌তে পারেনি কিছু ;
ডালা ভরা তার পদ্ম পাতায়
শুকায় পদ্মফুল ।

দুইদিকে

এইদিকে এই কালী মন্দিরে
ছাগল খুঁটিতে বাঁধা ।
ঐ দিকে ঐ অবারিত মাঠে
কচি ঘাসে ঢেউ খেলে ।

কুমোর বৌ

ছোটো ছেলে তার কেঁদে কেঁদে ওঠে ধূলোয় বসে,
কিছুই খেয়াল নেই ;
একমনে বৌ হাঁড়ি ও কলসী বেচে।
বেচা হয়ে গেলে সাবধানে সেই পয়সা গুণে
আঁচলে বাঁধে।
শেষে ছেলেটারে কোলে তুলে নিয়ে
মুখে খায় তার চুমো।
তার পরে দিল এক পয়সার বাতাসা তার হাতে।

পয়সা

একটি পয়সা কম দিলে বাবু,
দিনমজুরীর পাঁচ গণ্ডায় একটি পয়সা কম।
শুধু একবার তামাক খেয়েছি—এত সাজা
তারি লাগি ?
হায় বাবু, তুমি বুঝ্‌বে কি কোরে,
এক পয়সার শোক !

নেবুর পাতা করমচা

সাঁওতাল ছেলে বাজায় বাঁশি,
কান-ঢাকা তার ঝাঁক্‌ড়া চুলের ফাঁকে
দুলে ওঠে কচি নেবুর পাতা।
সাঁওতালী মেয়ে তারি পাশে পাশে গান কোরে
কোরে চলে,
কালো চুলে তার কচি করমচা দুধে আল্‌তায় রাঙা।

ছিদাম মণ্ডল

ভালো কোরে পরে ফুলপেড়ে ধূতি, ছিটের
পাঞ্জাবিটা।
বুকের বোতামে গোলাপের কুঁড়ি বাঁধে।
পথের ধারেতে পানের দোকানে ফিরে ফিরে পান
কেনে ;
যতবার খায় আয়নার কাছে মুখ দেখে ততবার।
আজকে ছিদাম চলেছে শ্বশুর বাড়ি।

ঝি

মাজা চকচকে কাঁসা পিতলের বাসন গুলি
হাতের তেলোয় তোলা,
আর একহাতে বাঁধা কাপড়ের পুঁটুলি দোলে,
বাঁশবাগানের পাতা ঝরা পথে
চলেছে দীঘির ঘাটে।

আরাম কেদারায়

সবুজ রঙের ক্যানভাসে আঁটা কেদারা হেলান দিয়ে
নলিনবিহারী আজ বেলা বারোটায়
ভাবে আর দেখে পাশের বাড়ির
রেলিঙে ঝোলানো সাড়ী।

সুভাষিণী

পুরোনো সাম্‌লা ছিঁড়ে গেছে একেবারে,
শত তালি দেওয়া ছাতায় জুতায় পাঞ্জাবীতে ;
তবু সুভাষিণী মুখ ভার কোরে থাকে,
চেয়ে পায় নাই হ্যাল ফ্যাসানের ব্রোচ্।

চাকর

কালো হয়ে গেছে হাত কাটা ফতুয়াটা ;
কোমরে রঙীন গামছা বাঁধা ;
গলায় একটা পিতলে গড়ানো তাবিজ ঝোলানো আছে।
ভুলো কুকুরের কাছাকাছি ঐ উঠোনের এক পাশে
উবু হ'য়ে ব'সে বেলা তিনটেয়
ভাত খায় বনমালী।

পথিক বন্ধু

এই যে হারুদা, কত দিন পরে দেখা!
ছেলে ভালো আছে ; মেয়েটা কেমন ?
কী কাজ কোরছো ভাই ?
আহা! তাই নাকি! মেয়ের বিয়েতে বাড়ি বন্ধক দেবে ?
আচ্ছা হারুদা, এবার নমস্কার।

ঘর ছাড়া

গিন্নি বলেন—
আ মোলো! পোড়ারমুখী,
এত রূপ নিয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে
কেন দাসীগিরি করা ?
আঁচলের কোণে চোখ মুছে বলে সুধা—
রূপ নিয়ে আমি ঘর ছাড়ি নাই মাগো,
এই পোড়া রূপ আমারে ছাড়ালে ঘর।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা

শ্রীযুক্ত কৃপানাথ মিশ্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটির আলোচনা করব তার নাম নেই, আছে শুধু নম্বর। "গীতাঞ্জলির" ১৪ পৃষ্ঠায় কবিতাটি আছে; নম্বর ২৯। মাত্র ২২ লাইনের কবিতা এবং কবিতাটি এই।

(১)

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে;
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

(২)

ধূলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারী হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে।
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

(৩)

আজি এ জগৎ মাঝে
কত সুখে কত কাজে
চলে গেল সবে আগে।
সাথী নাই পাই
তোমায় চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

(৪)

চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে
দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

ভাব এবং ভাবপ্রকাশের এ কবিতায় সুন্দর সামঞ্জস্য; ছন্দেরও উৎকর্ষ। ভাবের গতি যেখানে রুদ্ধ, সেখানেই ছন্দে যতি, এবং প্রত্যেক যতিই সঙ্গীতের নীরব প্রতীক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার উচ্ছ্বাসময় স্তুতিগানের আর কোন মূল্য নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ এখন সাহিত্যিক certificate-এর বাইরে। এখন তাঁর কবিতার আলোচনার অর্থ বিশ্লেষণ (analysis)। আমি এ কবিতার সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করব দুই দিক দিয়ে; ভাবের দিক দিয়ে এবং ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে।

ভাব-প্রকাশেরই বিশ্লেষণ করা যাক্ আগে। আমার মতে আর্টের অর্থই হচ্ছে রূপ-সৃষ্টি। এ হেন রূপসৃষ্টির আধার (medium) দুই: শব্দ এবং সঙ্গীত। ছন্দ, ধ্বনি এবং লয়—সবই সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। শব্দের আবার দুই ভাগ: তার অর্থ এবং তার ধ্বনি। অর্থ হিসাবে শব্দ সুবোধ্য বা দুর্বোধ্য হয়ে থাকে। সাধারণতঃ, যদি শব্দ হয় সুবোধ্য, তার অর্থ হয় ততই স্পষ্ট। এ কবিতার শব্দগুলি সুবোধ্য, অধিকাংশ খাঁটী বাংলা, অর্থাৎ দেশী ভাষার প্রচলিত শব্দের বাহুল্য এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃতে সংযুক্তাক্ষরে পূর্ণ শব্দের artistic বহিষ্কার। পরিণাম? রসের উৎস, ভাবের তরল প্রবাহ, ভাষার অনবরুদ্ধ গতি—তার স্পষ্টতা। খাঁটী বাংলার উদাহরণ, যেমন—

'আঁখি'; কবি 'নেত্র' লেখেন নি।
'দেখা'; কবি 'দর্শন' লেখেন নি।

কবি জেনে শুনে এমন শব্দ-চয়ন করে' থাকতে পারেন, কিংবা হয়ত স্বতঃই এমন ভাষার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে ভাব যেখানে প্রবল, সেখানে শব্দ ততই সরল,—ভাব যতই প্রখর শব্দ ততই অতৎসম। ধরা যাক্ একটী লাইন: "চলে গেল সবে আগে।" বাক্যটি কেমন সরল, সুবোধ্য এবং প্রখর। কবি যদি লিখ্‌তেন: "হ'ল সবে অগ্রসর,"—তাহ'লে ভাবপ্রকাশ তত প্রখর হ'ত না; হ'ত না সুন্দর ছন্দের গতি। খাঁটী দেশী শব্দের উপর সব বড় কবিদের একটা টান থাকে। শেক্সপীয়ারেরও ছিল। King Lear-এর শেষের দিকে যখন পিতার কোলে মরণাপন্ন মেয়ে, তখন শেক্সপীয়ার বড় বড় শব্দের অবতারণা করেন নি; লিখেছেন কতকগুলি খাঁটী দেশী শব্দ:

Native English, অর্থাৎ word of Anglo-Saxon origin; যথা—"No, no, she has no life"; কিংবা "And my fool is dead"; কিংবা "Undo this button, thank you, Sir." তেমনি রবীন্দ্রনাথ ভাবের আবেগে নির্ভর করেছেন খাঁটী বাংলা শব্দের উপর: "তোমা লাগি আঁখি জাগে", "দেখা নাই পাই", "সাথী নাই পাই", ইত্যাদি।

একটা কথা মনে রাখা উচিত। সাধারণ অবস্থায় সাধারণ কথার মূল্য সাধারণই। কিন্তু অসাধারণ অবস্থায়, ভাবের আবেগে, সাধারণ কথার মূল্য বেড়ে যায়, কারণ সাধারণ শব্দের নিজস্ব প্রতিভা, স্মৃতি-সৌন্দর্য্য, সবই জাগ্রত হয় ভাবের তাপে। সুন্দর একটা শব্দ 'সাথী'। যদি আমি বলি—"চোরের সাথী চোর" তাহ'লে এ শব্দে কোন স্মৃতি-সৌন্দর্য্য অনুভব করব না, না পাব এর কোন' অসাধারণ অর্থ। কিন্তু কবি যখন বলেন, "আজি এ জগৎ মাঝে··· আগে, সাথী নাই পাই, তখন 'সাথী' সাধারণ শব্দ হলেও এর অর্থ অসাধারণ হয়ে ওঠে স্মৃতির সৌন্দর্য্যে। আমরা ভাবি কত গত দিবসের কথা, কত বিগত বসন্তের কথা, কত বিস্মৃত বন্ধুর কথা, কত ভাবী অভিসারের কথা। সাথীর সঙ্গে যত স্মৃতি-জড়িত, সবই আমরা বোধ করি। যদি কবি লিখতেন 'বন্ধু' তার অর্থ অত ব্যাপক বা বেদনামধুর হ'ত না। তাহ'লে আমরা বলতে পারি যে কবির খাঁটী বাংলা শব্দের এমন প্রয়োগ রসপূর্ণ, হোক্ তা' জেনে অথবা না জেনে।

বাংলা ভাষার এক মস্ত দুর্ব্বলতা: দীর্ঘস্বরের বিরলতা। কবি নিজেই বারবার এ দুর্ব্বলতার উপর জয়ী হয়েছেন সংযুক্তাক্ষরের স্থানবিশেষে প্রচুর প্রয়োগে। [যথা—"উর্ব্বশী"তে, যথা "তাজমহলে", যথা "সাবিত্রী"তে, যথা "আহ্বানে"।] এ কবিতায় কিন্তু কবি জয়ী হয়েছেন খাঁটী বাংলা শব্দের নিজস্ব দীর্ঘস্বরের উপর নির্ভর করে'।

তোমা লাগি আঁখি জাগে; দেখা নাই পাই—
× × × × × × × × ×

আটটি দীর্ঘস্বর এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। পাই, চাই, কাঁদায়—এ গুলোর আবার একটী ধ্বনিজাত সঙ্কেত আছে যে সঙ্কেত নিতান্ত রসপূর্ণ। খাঁটী বাংলায় দীর্ঘস্বর কম, কিন্তু আছে। এর সব চেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি।

প্রত্যেক শব্দেই ধ্বনি আছে। শব্দের সমূহে যে সমূহাত্মক ধ্বনি নিহিত, তারই নাম লয় rhythm। এ কবিতায় যেমন ভাব, তেমনই rhythm: ভগ্ন (broken) দু' একটী ছোট লাইন নিয়ে দেখা যাক্।—

× × × 'পথ চাই' × ×
কিংবা × × × 'দেখা পাই' × ×

এর পরেই যেন ভাবের বিশ্রাম; যেন এক অলসভাবের দ্যোতনা এতে রয়েছে। চাওয়ার যতি—পথ চাওয়ার মুদ্রার যেন সঙ্গীতে প্রকাশ। সেইজন্য সুদীর্ঘ যতি,—সেইজন্য ধ্বনির দোল (swing of sound) এমন লাইনে: "সেও মনে ভাল লাগে।" এ কবিতার সঙ্গীতে ঝর্ণার তীব্র প্রবাহ নেই, আছে সমুদ্রের সংযম। ঝর্ণার তীব্র প্রবাহ শোনা যায় এরূপ লাইনে

তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।

তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথের এ কবিতায় তাঁর রচনাত্মক প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব-প্রকাশ এ কবিতায় অসাধারণ। অতুলনীয় তাঁর শব্দধ্বনির পরিচালনা, রচনা অনবদ্য। পূর্ব্বেই বলেছি রূপ সৃষ্টির উপাদান ত্রিবিধ—শব্দ, ধ্বনি আর লয়। এই ত্রিবিধ গুণের রবীন্দ্রনাথ past master।

ভাবপ্রকাশ অবশ্য ভাবসাপেক্ষ। কিছু বলতে পারি আমি তখনই যখন আছে কিছু বলার। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা' অতি বিশদ। আবার একটু বিশ্লেষণ করা যাক্।

কবিতার কোন বিষয় হয় না। There are no poetical *subjects*. আমার কিংবা আপনার চোখ মুখ-নাক-কান-চুলের উপর কবিতা করা যায়,—করেই অনেকে। কোন বিশেষ বিষয় না থাকলেও কবিতায়—ভাব প্রকাশ

চলে। ভাব আবার বিবিধ। ভাব সুন্দর হ'তে পারে, যেমন—কালিদাসের এই শ্লোকে—

'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥'

ভাব মহত্ত্বপূর্ণ হ'তে পারে, যেমন Shakespeare-এর এ লাইন দুটীর ভাব :

—We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.

ভাবের আরো অনেক রূপ। কিন্তু সব চেয়ে তেজোময় রূপ, তার উচ্চতা—Sublimation. প্রত্যেক ছোট গীতি-কবিতা (lyric) আমাদের মনে জাগায় সেই ভাব যে ভাব জেগেছিল কবির প্রাণে। এ কবিতা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের প্রাণে যে ভাব জেগেছিল, তা যেমন সরল, তেমনি সুগভীর।

প্রথমতঃ এ কবিতায় জীবনের সাধারণ স্মৃতির কোন প্রকাশ নেই। আমরা খাই, গল্প করি, ভালবাসি, হাসি, কাঁদি আর ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম শুধু শরীরেরই হয় না, আত্মারও। আত্মার ঘুমের অর্থ নিজেকে ভুলে যাওয়া। নিজেকে ভুলি তখনই যখন মনে থাকে না সব চেয়ে বড় সত্য কী। জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য এই : আমরা পাই নি সে ধন,—আমরা চাই না কিছু আর। সে ধন আমাদের—ভগবান্। এ কবিতায় আমাদের জাগ্রত আত্মার সেই চাওয়ার প্রকাশ। মানব-আত্মার সেই চাওয়াই একমাত্র সত্য এবং এ সত্য সনাতন। কে-বা আমরা, কীই বা আছে আমাদের? আছেন শুধু একজন—তিনি আমাদের সাথী। তাঁরি অভিসারে আঁখি জাগে আমাদের তৃষিত আত্মার। এমন তৃষাই অমৃত সংসারে।

Nearer, my God, to thee, nearer to thee!
Even though it be a cross that raiseth me
Still all my song shall be—
Nearer my God to thee, nearer to thee!

খুব বড় একজন ফরাসী সমালোচক—Abbé Bremmond in *La Poesie Pure*—বলেছেন যে শ্রেষ্ঠ কাব্য hymn, স্তোত্র। এ স্তোত্র মানবাত্মার প্রার্থনা। প্রার্থনা অন্ন-ধন-পুত্র-বৈভবের জন্য নয়,—এ প্রার্থনা মানবাত্মার চীৎকার—an infant crying in the night, an infant crying for the light : "আঁধার রাতে একা পাগল যায় চলে, বলে শুধু বুঝিয়ে দে।" সাথী এক : এবং নেই সেই সাথী জীবনে মোদের। আমারা পাইনি ত সে ধন; চেয়ে থাকি শুধু। এই চাওয়ার ব্যথা এবং না পাওয়ার সুখ মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। এমন অনুভূতিকে রূপ দিয়েছেন কবি এ কবিতায়। তাপসপূর্ণ এর ভাব, ভাষাও। এইজন্যই কবিতাটি প্রকৃত উচ্চাঙ্গের এবং কবি প্রকৃত স্রষ্টা।*

শ্রীকৃপানাথ মিশ্র

---

* পাটনায় রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে স্যার যদুনাথ সরকারের সভা-পতিত্বে একটি সভায় পঠিত।

লেখক একজন বিহার-বাসী অধ্যাপক; তাঁহার মাতৃভাষা বাংলা নয়। বাংলা ভাষার উপর তিনি যে অধিকার দেখাইয়াছেন,—তাহা বাঙালীর পক্ষে আনন্দের বিষয়। —বিঃ সঃ।

ঝড়

শ্রীযুক্ত বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

১

নরেশ ও ধীরেন দুই বন্ধু। কলিকাতায় থাকিয়া এক-সঙ্গে এম্-এ পড়ে। দু'জনেই ভাল ছেলে, বি-এ খুব ভাল করিয়া পাশ করিয়াছে, এবং এম্-এতেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার চেষ্টায় উভয়েই দেহ পণ করিয়া পড়া মুখস্থ করা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

পরীক্ষার খুব দেরী ছিল না। এমনি সময়েই ছাত্রেরা দলে দলে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে লাগিল। আন্দোলনের ঢেউ সারা কলিকাতা ছাপিয়া বাংলার দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। খবরের কাগজের পৃষ্ঠা এই সকল কাহিনীতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

নরেশ ও ধীরেন তখনও কলেজ ছাড়ে নাই। বীর বন্ধুদের অসংখ্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ শিরে লইয়া তখনও নিয়মিত কলেজে যাতায়াত করিতে লাগিল। যে মেসে তাহারা থাকিত, সেখানেও তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। কিন্তু এই দুই বন্ধু সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নিঃশব্দে হজম করিয়া নিয়মিত লেখা-পড়া করিতে লাগিল। দু'জনে একটি ঘর লইয়া ছিল। ইদানীং মেসের বা বাহিরের কেহ বড় একটা তাহাদের সহিত মিশিত না। সুতরাং যেটুকু সময় গল্পে হাস্যে ব্যয়িত হইত, তাহা পড়ার কাজে লাগিল।

একদিন ধীরেন কোথা হইতে সন্ধ্যার পর আসিয়া বলিল, নরেশ, কাল থেকে আমি কলেজে যাবো না।

নরেশ মোটেই বিস্মিত হইল না। বলিল, বেশ, যেও না।

ধীরেন বলিল, আর তুমি?

নরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, আমি কি?

ধীরেন বলিল, তুমি কলেজে যাবে ত'?

নরেশ বলিল, যাবো বৈ কি!

ধীরেন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল, না, নরেশ, তা হয় না। দু'জনে একসঙ্গে এতদিন পর্য্যন্ত কলেজে টিকে আছি, আজ যখন ছাড়বো, একা ছাড়বো না, তোমাকে নিয়ে ছাড়বো। তুমি এতদিন যে কারণে কলেজ ছাড়ো নি, আমিও সেই কারণে ছাড়ি নি। কিন্তু আজ আমার ভুল ভেঙেছে। সত্যি নরেশ, আমাদের দেশের নেতারা কি এতই বোকা, যে কিছু না ভেবে-চিন্তেই একটা বিধান দিয়ে ব'সেছেন?

নরেশ কোন উত্তর করিল না। পড়িবার জন্য একটা বই খুলিয়া বসিল। ধীরেন তাহা চাপিয়া রহিল, বলিল, একটুকুতে তোমার পড়ার কোন ক্ষতি হবে না। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

নরেশ বলিল, কি কথা, বল?

ধীরেন বলিল, তুমি কলেজ ছাড়বে না কেন?

নরেশ বলিল, দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলে সবাইকে লেখা-পড়া ছাড়তে হবে, তার কোন মানে নেই। এ-সবে আমি বিশ্বাস করি না।

ধীরেন চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর কহিল, তর্ক করে তোমাতে-আমাতে এর কোন মীমাংসা করতে পারবো না। বেশ, চলো কাল্‌কে যাই, গিয়ে এর মীমাংসা করে আসি। যদি তুমি জেতো, আমি তোমার সঙ্গে আছি, কিন্তু যদি হারো, মনে থাকে, কলেজ ছাড়তে হবে।

নরেশ একটু হাসিয়া বলিল, বেশ, তা হবে। কিন্তু কোথায় মীমাংসা করতে যেতে হবে শুনি?

বিদেশ হইতে একজন নেতা আসিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আছেন। তাঁহার নাম দেশ-জোড়া। ধীরেন তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া কহিল, তাঁর কাছ থেকেই আমি আসছি। তুমিও কাল চলো।

নরেশ একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা যাবো। কখন যাবে?

ধীরেন বলিল, কেন, সকালেই যাবো।

পরদিন উক্ত দেশ-নেতার নিকট হইতে ফিরিবার পথে ধীরেন বলিল, কেমন, তোমার সন্দেহ মিটলো ত'?

নরেশ বলিল, না।

ধীরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, না মানে?

নরেশ বলিল, না মানে না। ব্যক্তি মহৎ, সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্যও মহৎ। তর্কেও হেরেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস ভাঙ্গে নি।

ধীরেন বলিল, অর্থাৎ, তুমি আজ কলেজ যাচ্ছো?

নরেশ বলিল, হঁ্যা।

পরদিন নরেশ আবার নেতাটির সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং তৎপরদিনও করিল। তারপর সে কলেজ পরিত্যাগ করিল।

দিন সাতেক বসিয়া থাকার পর নরেশ একদিন বলিল, এমনি হুজুকে মেতে থাকবার জন্যেই কি কলেজ ছেড়োছো, ধীরেন?

কোনটা হুজুগ, ধীরেন ঠিক বুঝিতে পারিল না। কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভীড় বাড়ানো, সভা সমিতিতে কাজ করা, চাঁদার বাক্স লইয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, ইত্যাদি সবকটাকেই সে দেশ-সেবার অঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ইহারই উত্তেজনায় সে অক্লান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। নরেশের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, তবে কি করতে চাও?

নরেশ এ-বিষয়ে অনেক ভাবিয়াছে, বলিল, এমন অকাজের কাজ করার জন্যে লেখা-পড়া ছাড়িনি। যদি কোন কাজ না করতে পারি, তবে আবার কলেজে ঢোকা ভাল। এ-সব কি কাজ? এতে কি উপকার হবে?

ধীরেন অসহিষ্ণুভাবে বলিল, বেশ ত' নরেশ, কোনটা কাজ বল' না? চলো, সেই কাজই করি!

নরেশ বলিল, তবে চলো গ্রামে যাই। মিটিংএ ভোলান্টিয়ারী করার চেয়ে সেখানে ভোলানটিয়ারী করলে ঢের কাজ হবে। অন্ততঃ আমাদেরও দেশ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা হবে। তাই চল' না?

ধীরেনের আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাধা অনেক। কে তাহাদের টাকা দিবে, কোন প্রণালীতে কোনখানে কাজ আরম্ভ করিবে, সঙ্গে আরও লোক দরকার হইবে কিনা ইত্যাদি অনেক ভাবিবার আছে।

নরেশ বলিল, আমি ইতিমধ্যে কথা-বার্ত্তা চালাচ্ছি, আবার কাল যাবো। এবার যারা প্রচার করতে গ্রামে যাবে, আমরা তাদের সঙ্গে যাবো। তারপর দেখি, সেখানে কতদূর কি হয়।

সহরের অপরিসীম উত্তেজনা ছাড়িয়া কোন অজ্ঞাত গ্রামে যাইতে ধীরেনের তত মন সরিল না। কিন্তু বিশেষ আপত্তি করিল না, বলিল, বেশ, আফিসে ব'লে ক'য়ে যদি বন্দোবস্ত করতে পারো, চলো যাই।

গ্রামে যাইয়া কাজ করিবার লোকের একান্তই অভাব। সুতরাং নরেশ ও ধীরেনের প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হইল না। স্থির হইল আগামী সপ্তাহেই ইহারা যাত্রা করিবে। সঙ্গে অন্য লোকও থাকিবে।

নরেশ বলিল, একবার বাড়ীতে দেখা দিয়ে আসবে না, ধীরেন?

ধীরেন শুষ্কমুখে বলিল, না ভাই, তা হয় না।

কেন হয় না, নরেশ তাহা জানিত। ধীরেনের পিতা একজন বড় জমিদার। মফঃস্বলের কোন সহরে থাকেন। নরেশের পিতাও সেইখানেই থাকিয়া চাকুরী করেন। উভয় পরিবারে আলাপ-পরিচয়ও আছে। ছেলে-বেলা হইতেই সে ধীরেনের পিতাকে চেনে। তাঁহার মত রাগী-লোক সে আজ অবধি খুব কমই দেখিয়াছে। প্রতাপও তাঁহার কম নয়। রাজসরকারেও তাঁহার খাতির যথেষ্ট।

ধীরেনের কলেজ ত্যাগের সঙ্কল্প শুনিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, সে যেন সঙ্গে-সঙ্গে গৃহ-ত্যাগের জন্যও প্রস্তুত হয়। ওই একটি আদেশ। কিন্তু ইহার গুরুত্ব কত বেশী, নরেশ ধীরেন উভয়েই জানিত। তারপর ধীরেন পিতাকে না জানাইয়াই কলেজ ছাড়িয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লিখাইয়াছে, সভায় বক্তৃতাও করিয়াছে। এখন অম্বিকবাবু একবার পুত্রকে পাইলে যে কি করিবেন, তাড়াইয়া দিবেন, কি বাঁধিয়া রাখিবেন, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

এই কারণেই নরেশ ইতিপূর্ব্বে বহুবার ধীরেনকে সতর্ক করিয়াছে, কিন্তু সে শুনে নাই। আজও বলিল, ধীরেন, আমার মনে হয় তোমার একবার বাড়ী যাওয়া উচিৎ। বুঝিয়ে কিছু করতে না পারো, বেশ, বাড়ীতে ব'সে থাকো। চলো, আমিও বাড়ীতে ব'সে থাকি। আমাদের দুজনের সেবা না পেলেও দেশের সদগতির অভাব হবে না।

ধীরেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, না নরেশ, আমি প্রস্তুত হয়েই এ-কাজে নেমেছি। আর বাড়ী ফিরবো না। একবার গেলে আর আসতে পারবো না। কিন্তু আমার আসা চাই-ই।

নরেশ চুপ করিয়া রহিল। ধীরেন পুনরায় কহিল, তুমি কি বাড়ী যাবে?

নরেশ বলিল, হ্যাঁ, একবার যেতে হবে। সঙ্গে কিছু টাকা-কড়ি নেওয়া আবশ্যক নয় কি? ওরা ত' বেশী টাকা দেবে না। তা ছাড়া একবার ব'লে আসাও দরকার। কিন্তু তুমি কি কোন রকমে যেতে পারো না ধীরেন?

ধীরেন বলিল, না।

তিনদিন পরে নরেশ পিতার নিকট চলিয়া গেল। স্থির রহিল, ধীরেন এখান হইতেই গ্রামে যাইবে, নরেশ বাড়ী হইয়া যাইবে।

ধীরেন নরেশকে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল। নরেশ বলিল, তোমার বাবাকে কিছু বলবো, ধীরেন?

ধীরেন অন্য একদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, না।

২

নরেশের পিতা সরকারী ব্যাঙ্কের একজন বড় কর্ম্মচারী। সরকার হইতে বড় বাড়ী পাইয়াছেন, এবং বেশ মোটা মাহিনাও পান। সংসারে বেশী লোক নাই, ছেলে, মেয়ে, ও দূর-সম্পর্কের একটি বোন। স্ত্রী বহুদিন স্বর্গগত হইয়াছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া এম-এ পড়ে। মেয়েটি স্থানীয় স্কুল হইতে প্রবেশিকা পাশ করিয়া উপস্থিত কোন এক নারী-মন্দির অনুষ্ঠানে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছে। ইচ্ছা আছে কলিকাতায় যাইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইবে, কিন্তু পিতাকে একা ফেলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া আজও সেটা হইয়া উঠে নাই।

নরেশ এইবার এম্-এ পাশ দিলে তাহার বিবাহ দিয়া ঘরে লক্ষ্মী বাঁধিবেন, পিতার এইরূপ মনোভাব ছিল। নরেশ ভাল করিয়াই পাশ করিবে, ইহাতে তাঁহার কোনই সন্দেহ ছিল না। তিনি শুধু দিন গণিতেছিলেন।

যেদিন নরেশের পত্র পাইলেন, সে কলেজ ছাড়িয়াছে, সেদিন তাঁহার বড় সাধে বাদ পড়িল। কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে বেলা, তোর দাদা কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, আর পড়বে না।

বেলা বিস্মিত হইয়া বলিল, কে ব'লেছে, বাবা?

সুশীলবাবু বলিলেন, এই যে চিঠি লিখেছে।

বেলা চিঠিটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পিতার মনোভাব তাহার অবিদিত ছিল না। তাঁহার মনের দুঃখও তাহার অজ্ঞাত রহিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল, এ হুজুগ বেশীদিন থাকবে না, বাবা। দেখো দু'দিনেই আবার সকলে সুড়সুড় ক'রে কলেজে ঢুকবে। দাদাকে আসতে লিখে দাও না?

সুশীলবাবু বলিলেন, লিখতে হবে না, আপনিই আসবে। কি করবে শুধু শুধু সেখানে ব'সে থেকে?

বেলা বলিল, আমি কিন্তু এবার কলেজে ভর্ত্তি হবো, বাবা!

সুশীলবাবু তাহার পিঠে হাত দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, বেশ ত' মা, যখন ইচ্ছে হ'য়ো।

নরেশের সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। তাহার কলেজত্যাগ করার বিরুদ্ধে কাহাকেও কিছু তিনি বলিলেন না। এমন কি পুত্রকেও যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে আদেশ-উপদেশের বাষ্পও রহিল না।

কিন্তু গোলমালের সৃষ্টি হইল আর একজনকে লইয়া। তিনি স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ। এই কলেজ হইতেই নরেশ বি-এ পাশ করে। লোক-মুখে শুনিয়া এবং খোঁজ লইয়া যখন স্থির জানিলেন নরেশ কলেজ ছাড়িয়াছে, তখন একদিন তিনি সুশীলবাবুর কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

ছুটিয়া আসিবার কারণ ছিল। কলেজে পড়িবার সময় নরেশকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং সে-ভালবাসা

আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যাতায়াতের মধ্য দিয়া নরেশ এক সময়ে তাঁহার বাড়ীর ছেলের মত হইয়া গিয়াছিল। এই ভিত্তিহীন সম্পর্কটাকে পাকা করিয়া লইবার কল্পনা অনেকদিন হইতে তাঁহার ও বাড়ীর সকলের মনে স্থায়ী হইয়া আছে। তাঁহার মেয়েও কোন অংশে নরেশের অযোগ্য নয়। কথাবার্ত্তাও এক প্রকার পাকা। এরূপ অবস্থায় নরেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি বড় কম বিচলিত হইলে না।

সুশীলবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, নরেশ নাকি লেখা-পড়া ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?

সুশীলবাবু তাঁহার উষ্মাপ্রকাশে একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে কেন?

মহেশবাবু লজ্জা পাইয়া কহিলেন, না, তা' বলছি না। শুনলুম, ও নাকি কলেজ ছেড়েছে?

সুশীলবাবু নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, সংবাদটা সত্য।

মহেশবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি নরেশকে কিছু বলেন নি?

সুশীলবাবু বলিলেন, কি আর বলবো, বলুন?

মহেশবাবু বলিলেন, কিন্তু এবার ওর ফার্ষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল, সেটা ও ভেবে দেখেছে কি?

সুশীলবাবু বলিলেন, সে কথা আমি কি ক'রে বলবো মহেশবাবু? তবে আমার বোধ হয়, নরেশ ভেবে-চিন্তেই এ-কাজ করেছে।

মহেশবাবু বলিলেন, ভেবে-চিন্তে? ভেবে-চিন্তে এক পাগল ছাড়া কেউ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে?

সুশীলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মহেশবাবু পুনরায় বলিলেন, না, সুশীলবাবু, আমি নরেশকে চিনি। আপনার আদেশ ও কোনদিন অমান্য করতে পারে না। আপনি ভাল করে বুঝিয়ে লিখুন, নয় ত' ওকে আসতে লিখে দিন, আমি নিজে বুঝিয়ে বলবো।

সুশীলবাবু বলিলেন, শীগগীরই ও এসে পড়বে। বোধ হয় কাল-পরশু আসবে।

অধ্যক্ষ কথাটা এখনকার মত চাপিয়া দিলেন। খানিক পরে মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু তাঁহার মন আশা-ভঙ্গে একেবারে বিরস হইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে অনেক কথাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার রাগ হইল সুশীলবাবুর উপর। কেন, পিতা হইয়া পুত্রকে দু'টো উপদেশ দিতে পারেন না? তা' হইলেই ত' সব গোল মিটিয়া যায়। ইহাতে এত কুণ্ঠিত হইবার কি আছে? ছেলেমানুষ হুজুকে পড়িয়া এক কাজ করিয়াছে, তাই বলিয়া পিতা কি তাহাকে সুপথে পরিচালনা করিতে পারিবে না? ক্রমে তিনি একমাত্র নরেশকে লইয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার মত চিন্তাশীল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবক খুব কমই দেখা যায়! সে কেন এমন উন্মাদনায় মাতিতে গেল? নরেশকে তিনি কত ভালবাসেন, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া তিনি মনে-মনে কত বড় সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, এসকল কোনটাই নরেশের অবিদিত নয়। সব জানিয়া শুনিয়াই একাজ সে করিয়াছে। তাঁহার আশা ও স্নেহের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই সে রাখে না। যদি রাখিত তবে অকস্মাৎ এমন অকাজ করিয়া বসিত না!

ভাবনার মধ্যে তিনি বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পৌছিলেন। মুখ তুলিয়াই দেখিলেন, নরেশ দাঁড়াইয়া আছে। বাকী পথটুকু তিন লাফে শেষ করিয়া নিকটে আসিয়া কহিলেন, কোথা থেকে আসছো, নরেশ? ভাল আছো ত'? এসো, ভেতরে এসো।

ভিতরে লইয়া গিয়া বলিলেন, কলকাতা থেকেই আসছো ত?

নরেশ বলিল, হাঁ, এইমাত্র আসছি। বাড়ী যাচ্ছিলুম, আপনাকে পথে দেখে দাঁড়ালুম।

অধ্যক্ষ বলিলেন, বেশ ক'রেছো। আমিও এই তোমার বাবার কাছ থেকে আসছি।

নরেশ চুপ করিয়া রহিল।

অধ্যক্ষ পুনরায় কহিলেন, তোমার নামে যা' শুনছি, শুনছি কেন—তোমার বাবাই ত' বললেন,—সত্যিই কি লেখা-পড়া ছাড়লে নরেশ?

নরেশ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, লেখা-পড়া ছাড়ি নি, তবে এ বছরে আর কলেজে যাবো না।

মহেশবাবু বলিলেন, তার মানে এ বছরে পরীক্ষা দেবেন না ত' ?

নরেশ বলিল, না।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে মহেশবাবু যেন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া এরূপ কার্য্যের তিনি একান্ত বিরোধী। ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার অনেক তর্ক-বাণ মজুৎ আছে। কিন্তু নরেশকে তিনি চিনিতেন। ইহার সহিত তিনি তর্ক করিলেন না, শুধু বলিলেন কাজটা কি ভাল করলে, নরেশ ?

নরেশ চুপ করিয়া রহিল।

মহেশবাবু আর একবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে কথা দাও, বেশ করে ভেবে দেখবে, নয় আমার সঙ্গে আলোচনা করবে। তারপর যা উচিৎ বিবেচনা করো, ক'রো। যদি কলেজ ছাড়া উচিৎ বিবেচনা করো ক'রো, বারণ করবো না। কিন্তু বুঝে-সুঝে ক'রো।

নরেশ বলিল, আমি ভেবে-চিন্তে খুব স্থির হ'য়েই কলেজ ছেড়েছি।

মহেশবাবু বলিলেন, কেন, ওটা গোলামখানা বলে ? ওখানে শিক্ষা হয় না ব'লে ?

নরেশ বলিল, না, সে-কারণে নয়।

মহেশবাবু বলিলেন, তবে ?

নরেশ চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে মহেশবাবু পুনরায় কহিলেন, তোমার বাবা যদি বলেন, তা হ'লেও তোমার এবারে পরীক্ষা দেওয়া হয় না ?

নরেশ একটু চকিত হইয়া বলিল, কেন, বাবা কিছু বলেছেন ?

মহেশবাবু বলিলেন, না বিশেষ কিছু বলেন নি। কিন্তু ধর, আমিই তাঁর হয়ে বল্‌ছি ?

নরেশ নীরব হইয়া রহিল।

এ-নীরবতার অর্থ অধ্যক্ষ মর্ম্ম দিয়াই বুঝিলেন। আরও কিছুক্ষণ তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর আর কোন কথা না বলিয়া এক সময়ে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ একা বসিয়া থাকিবার পর নরেশও উঠিল। সহসা তাহার অন্তর এই ভাবিয়া পীড়িত হইয়া উঠিল, যে একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গেল। এখানকার সম্বন্ধ চিরদিনের মত রুদ্ধ হইল। আর একটা বিষয়ও তেমনি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এ সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় অধ্যক্ষ যতই দুঃখিত হন্, তাহার দুঃখের তুলনায় সে অতি তুচ্ছ। ইহার মধ্যে এত দুঃখের মাধুর্য্য লুকাইয়া থাকিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে কোনদিন সে এত ভাল করিয়া টের পায় নাই। আজ তাহার মনের মধ্যে নিমেষে যে বিদ্যুৎটি খেলিয়া গেল, তাহার তীব্র আলোকে সেখানকার অন্ধ-রন্ধ্র গুলি পর্য্যন্ত তাহার চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। সেইদিক চাহিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর এক পা' এক পা' করিয়া বাহির হইয়া আসিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়



রবীন্দ্রনাথ ও দুঃখবাদ

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী নহেন ; জগৎটার মূল্য সত্য দুঃখ— দুঃখ হইতে তাহার জন্ম, দুঃখের ভিতর দিয়া তাহার লীলা এবং দুঃখেই তাহার অবসান—এই দর্শন বা এই ধরণের দর্শন রবীন্দ্রনাথের নয়। বরং উপনিষদেরই উপলব্ধি ধরিয়া তিনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন—আনন্দাদ্ধি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি।

তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগতে দুঃখের যে কোন স্থান নাই, তাহা নয় ; দুঃখের আছে একটা বিশেষ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনের, গৌরবের আসন—রবীন্দ্র দর্শনের বৈশিষ্টই ঐ তত্ত্বের মধ্যে। তত্ত্বটি এই—

আনন্দ হইতেছে নিত্য, শুদ্ধ সত্তা, আনন্দ সৃষ্টির বীজ সত্তা ; কিন্তু এই আনন্দেরই একটা নিত্য রূপ, নিত্য প্রকাশ হইতেছে দুঃখ। দুঃখের সহিত, দুঃখের অন্তরে আনন্দ ওতপ্রোত। অতি বড় দুঃখ, তীব্রতম বেদনা আনন্দ হইতেই উৎসারিত, আনন্দেরই একটা সঘনমূর্ত্তি।

উপনিষদিক উপলব্ধিতে, ভারতের গতানুগতিক অধ্যাত্ম দর্শনে দুঃখের এই স্থান নাই। সেখানে দুঃখ অনিত্য, বিকার। দুঃখ হইল বাধা ও বন্ধন—দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতেই আনন্দের স্ফুরণ। অধ্যাত্ম চেতনায়, ব্রহ্মভাবে দুঃখ নাই ; তাহা কেবল আনন্দময়, সেখানে ছায়া নাই কেবল জ্যোতির্ময়; মৃত্যু নাই কেবল অমৃতময়। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য যে দেখেন নাই বা অনুভব করেন নাই, তাহা নয় ; কিন্তু ইহাকে তিনি চাহেন নাই, ইহাকে অর্দ্ধসত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, বৈরাগ্যের নগ্নতা বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন জাগতিক জীবন, প্রকাশের লীলা—সুতরাং দ্বৈতের বৈচিত্র্য। পৃথিবীর আকাশে তিনি চাহেন ইন্দ্রধনু ফলাইয়া তুলিতে—তাই তাঁহার প্রয়োজন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। এই জন্যই তাঁহাতে এতখানি পাই আলোর সাথে সাথে ছায়ারও পূজা, আনন্দের সাথে সাথে দুঃখের অভিনন্দন, অমৃতের সাথে সাথে মৃত্যুর আবাহন।

প্রাকৃত মন দুঃখকে যে দৃষ্টি দিয়া দেখে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সে দৃষ্টি নয়। অধ্যাত্মবাদী দুঃখ—পরমার্থতঃ—আদৌ নাই বলিয়া উড়াইয়া দেন ; অধিভূতবাদী দেখেন কেবল দুঃখের বাহিরের দিকটা, তাহার ভার, তাহার ক্লেশ, তাহার দীনতা। রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে এই একদিকের নাস্তিত্ব হইতে বাঁচাইয়া অন্যদিকের আবার একান্ত প্রাকৃত ভাব হইতে মুক্ত মার্জ্জিত উন্নীত করিয়া তাহাকে একটা লোকোত্তর সৌন্দর্য্যের ও সত্যের আভা পরাইয়া দিয়াছেন।

নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক আনন্দ আর যেখানেই থাকুক—অক্ষর ব্রহ্মের মধ্যে হৌক কি আর কোন প্রকার স্বর্গে হৌক —প্রকাশমান জগতে, দেহ প্রাণ মনের মানুষে তাহার স্থান নাই। তাই বলিয়া জগৎ বা মানুষ যে আবার নিরবচ্ছিন্ন ঐকান্তিক দুঃখেরই আবাস বা আধার তাহাও নয়। লীলা হইতেছে মিশ্রণ, দুই বিপরীত বস্তুর মিলন। তবে এই মিশ্রণের মিলনের আছে একটা কৌশল, একটা গুপ্ত রহস্য —ঐ বিভিন্ন জিনিষ দুটির একটা বিশেষ সম্বন্ধ নির্ণয়, সংযোগ স্থাপন। আমাদের কবির উপলব্ধিতে তাহা এই—

সৃষ্টি আনন্দময়, সৃষ্টির মূল প্রতিষ্ঠা আনন্দময় ; কিন্তু এই আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে, উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, নানা ভাবের মধ্য দিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, দুঃখের অভিঘাতে। দুঃখই এক হিসাবে আনন্দকে সচল সক্রিয় শরীরী করিয়া ধরিতেছে। দুঃখ না থাকিলে আনন্দ হয়ত থাকিত, তবে থাকিত সৃষ্টির বাহিরে, অব্যক্তের মধ্যে—কিন্তু ব্যক্তের মধ্যে, মানুষের প্রাণের মধ্যে আনন্দকে গোচর করিয়া ধরিয়াছে দুঃখই। তেমনি অমৃতত্বও

মৃত্যুরই মধ্যে জীবন পাইতেছে—দেহের তটে আত্মা আসিয়া যেমন ধরা দিয়াছে, যতিরই কল্যাণে ছন্দের গতি যেমন লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই ভাবেই কবি শুনিতেছেন সীমারই মাঝে অসীমের সুর, বন্ধনেরই মাঝে তিনি পাইতেছেন মুক্তির স্বাদ; অরূপের বার্ত্তা রহিয়াছে রূপের মধ্যে—ছায়াহীন "তুমি"কে কায়া দিতেছে "আমি"।

দুঃখ নিত্য সত্য—একান্ত দুঃখ হিসাবে নয়—তাহাতে আনন্দই জমাট অতি তীক্ষ্ণ হইয়া আছে, তাহা বিদীর্ণ করিয়া আনন্দই বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এই দিক দিয়া দুঃখ আনন্দেরই রূপান্তর বা নামান্তর। সেই একই দৃষ্টিতে মৃত্যুও পারমার্থিক সত্য; কারণ মৃত্যু মৃত্যু নয়, তাহা জীবনেরই ভিত্তি, জীবনেরই উৎস—আত্মসংহৃত আত্মসম্বৃত জীবনেরই নাম মৃত্যু। মিলন-বিরহের সম্বন্ধও অনুরূপ। মিলনের রস, মিলনের তীব্রতা দিতেছে বিরহ। বিরহ যে ছেদ টানিয়া টানিয়া চলিয়াছে, মিলন তাহারই মধ্যে নিবিড় গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। বিরহ যদি না থাকিত, মিলনের কোন অর্থই হইত না। আর সত্যকার মিলন হয়ত ঠিক মিলনেরই মধ্যে নয়—সত্য সত্যই মিলন হইলে মিলনেরও বোধ হয় শেষ। নিত্যকার বিরহের মধ্যে যে নিগূঢ় টান, যে সান্দ্র অন্তরঙ্গতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাই ত মিলনের অন্তঃসার।

তাই একধাপ অগ্রসর হইয়া আমরা আরও বলিতে পারি, বাস্তবিক পাওয়ার মধ্যে বস্তুর সত্যকার পাওয়া নাই। ভগবানকে সাক্ষাৎ চোখে দেখা, আলিঙ্গন করিয়া ধরা—লাভকরা, অর্থ ভগবানকে ফুরাইয়া দেওয়া। ভগবানের অনন্ত অনিশ্চিত নিত্য বিলীয়মান সত্তাকে কেবল অনুসরণ করিয়া চলাই মানুষের সাধনা। চলা, নিত্য চলাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; গন্তব্যে পৌছান নয়, পাওয়া নয়,—পাওয়া অর্থ থামা অর্থাৎ শেষ। সিদ্ধি অপেক্ষা সাধনাই বড় সত্য; কারণ সিদ্ধি অর্থ স্থিতি, কিন্তু সাধনা হইতেছে সিদ্ধি হইতে সিদ্ধিতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া চলা। ভগবানের দিকে নিত্য অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, নিত্যই তাঁহার নিকট হইতে নিকটতর হইতেছি অথচ তিনি ক্রমেই দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছেন—জীবে ভগবানে এই লুকোচুরিই হইল লীলা, সৃষ্টির মূল রহস্য। এবং এই লুকোচুরির, এই লীলার দক্ষিণেতর মুখ (negative pole) হইতেছে দুঃখ, মৃত্যু—বিরহ, বন্ধন।

"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" মায়াবাদীর এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের নয়; তুমি নাই আমি নাই, তুমি আমির ওপারে আছে শুধু অনির্ব্বচনীয় এক সৎ, কিম্বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শিবের মধ্যে জীব নিঃশেষ লীন লয় হইয়া গিয়াছে, একান্ত জ্ঞানীর এই উপলব্ধিও রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁহার অনুভব, তাঁহার সিদ্ধান্ত ভক্তের, প্রেমিকের, উন্মুখী মর্ত্ত্য-মানুষের। রবীন্দ্রনাথ জগৎকে জীবনকে লীলাকে সমর্থন করিতেছেন সাঙ্গোপাঙ্গে, কায়মনোবাক্যে; কিন্তু জ্ঞানীরা তত্ত্ববেত্তারা বলিতে পারেন এই ভাবে মায়াকে সমর্থন করিতে গিয়া, মায়ার অন্তর্গত যে সকল নামরূপ বস্তুতঃ হইতেছে বিকৃতি—যাহাকে বলা হয় মায়ার বিদ্যারূপ নয়, কিন্তু অবিদ্যারূপ—তাহাদিগকে পর্যান্ত রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করিয়াছেন, বরণ করিয়া লইয়াছেন।

অবিদ্যা শক্তির নিত্যত্ব, পারমার্থিক অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন। অবিদ্যাকে বিদ্যার সহিত, অপরা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের সহিত দুঃখকে আনন্দের সহিত, মৃত্যুকে অমৃতত্বের সহিত সমান স্তরে তিনি স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-সাধকেরা বলিবেন রবীন্দ্রনাথের এই অনুভব মানসিক ক্ষেত্রের অথবা কল্পনাগত চেতনার—মনের উপরে অধ্যাত্মের বা পরমার্থের স্তরে উঠিলে, এই অনুভব আর পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তুলনা করিয়া অনেক সুধী এমনও কহিতে পারেন, উক্ত তত্ত্বটি আধুনিক মনোভাবের একটি বিশেষ প্রকাশ এবং ইহার উৎপত্তিস্থল হইতেছে ইউরোপ। আত্মা ও অনাত্মার অথবা বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়া একটা মত জর্ম্মণ পণ্ডিতেরা খুব চলিত করিয়া দিয়াছেন—অনাত্মা আছে বলিয়াই আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব হইতেছে, বিষয়ী আপনাকে জানিতেছে, অনুভব করিতেছে বিষয়ের সম্পর্কে সংঘাতে আসিয়া। এই দার্শনিক তত্ত্বটিকেই খৃষ্টীয় ভক্তিরসে সিক্তিত করিয়া, রক্তমাংস পরাইয়া তৎসহায়ে কবি গ্যেটে ভগবান ও শয়তানের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। করুণাময় ভগবানের রাজ্যে শয়তানের আবির্ভাব কেন হইল?

শয়তান হইতেছে ভগবানের হাতের অঙ্কুশ, মানুষ যখন ঘুমাইতে ঝিমাইতে থাকে, তখন তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য ভগবানের ঐ অস্ত্র, এই কথাটির একটা প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাই এই ভাবে—

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলে আগুন ক'রে
আমার যত কালো।

সে যাহা হৌক, ভারতের অধ্যাত্ম দর্শন দুঃখ ও আনন্দ কি অবিদ্যা ও বিদ্যার অথবা মৃত্যু ও অমৃতত্বের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিতেছে অন্য ধরণের কথা। তাহার সিদ্ধান্ত অনুসারে অধ্যাত্ম চেতনায় ঐ যুগ্মের, ঐ দ্বৈতের যুগপৎ স্থান নাই। ঐ যুগলের এক একটি হইতেছে পৃথক পৃথক লোকের বা চেতনার বস্তু—একটি হইতেছে উপরের আর একটি নিম্নের, একটি পরা প্রকৃতির আর একটি অপরা প্রকৃতির। উর্দ্ধতম চেতনায়, অধ্যাত্ম লোকে, ভগবৎ-সান্নিধ্যে উহাদের একটিই আছে, অন্যটি নাই, থাকিতে পারে না। বিদ্যাকে, আনন্দকে, অমৃতকে পাইতে হইলে অবিদ্যাকে, দুঃখকে, মৃত্যুকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করিয়া আসিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ এক শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদীর বৈরাগ্যতন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঐহিকের, পৃথিবীর, জীবনের আপনকার সত্তা, নিত্য সত্তা, পারমার্থিকতা স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য ঐহিকের সকল নাম সকল রূপ সকল গতিই যে পরম সত্য হওয়া প্রয়োজন তাহা না'ও হইতে পারে। ঐহিকের সত্য আছে, সার্থকতা আছে—কিন্তু তাহা যাবতীয় ব্যক্ত প্রাকৃত নামরূপের মধ্যে হয় ত নয়—নেদং যদিদমুপাসতে। দুঃখ বা মৃত্যু বা জরা বা ব্যাধি—পার্থিব জীবনের অনুসঙ্গী যতই হৌক, ইহাদের অভাবে যে পার্থিব জীবন থাকিতে পারে না, পার্থিব জীবনের গভীরতম সত্যতম প্রকাশের সহিত ইহাদের যে অচ্ছেদ্য অনিবার্য্য সম্বন্ধ, এমন বাধ্যবাধকতা নাই। বরং আসল সত্য এই ধরণেরও হইতে পারে যে, জীবন জাগতিক লীলা কেবল আনন্দের অমৃতত্বের সৌন্দর্য্যের চিরযৌবনের বিগ্রহ না হইয়া যদি অন্য রকম হইয়া থাকে তবে তাহার অর্থ জীবনে, মানুষের আধারে অশুদ্ধির জন্য উহারা বিকৃত হইয়া দুঃখ, মৃত্যু, শ্রীহীনতা, জরারূপে দেখা দিয়াছে। এই অশুদ্ধির জন্যই আমাদের আশঙ্কা হয় দ্বৈতকে নষ্ট করিতে গেলে লীলার বৈচিত্র্য তীব্রতা বুঝি লোপ পাইবে।

গভীরতর জ্ঞানের সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে এবং রবীন্দ্রনাথের অনুভবের পশ্চাতে কি তত্ত্ব রহিয়াছে—এই দুই-এর পার্থক্য আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কবির কবিত্বের কথা তাহাতে কিছু উঠে নাই। কবির লক্ষ্য সার্ব্বাঙ্গিক সত্য, অখণ্ড জ্ঞান কিছু নয়; তাঁহার কাজ তাঁহার অনুভবকে উপলব্ধিকে – তাহা যে জগতের হৌক—যতদূর সম্ভব তীব্র করিয়া স্পষ্ট করিয়া জাগ্রত করিয়া দেখান—এবং এই একতানতার জন্য যদি সেই অনুভব উপলব্ধিতে বাস্তবতার দিক দিয়া সত্যাভাস এমন কি অসম্ভব কিছু আসিয়া মিশিয়াছে দেখা যায় তাহাতে কবিত্ব হিসাবে ক্ষতি হয় না, বরং হয় ত ঔৎকর্ষ্যই হয়—কবির কবিত্ব-শক্তির যাদুতে দোষই গুণ হইয়া দাঁড়ায়।

তা ছাড়া জ্ঞান হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি চরম আধ্যাত্মিকতার শিখরে যদি নাই পৌঁছিয়া থাকে, তবুও মানুষের সাধনায় স্থান বা সার্থকতা তাহার কিছু কম হইবে এমন নয়। একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিব রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ ইষ্ট হইতেছে "সমব্রহ্ম—যে অনির্ব্বচনীয় সত্য রহিয়াছে সর্ব্বত্র সমান ভাবে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, জীবনে মৃত্যুতে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে, এ-লোকে ঐ-লোকে এবং যাহার সৌন্দর্য্যের আভায় অতি কুৎসিতও সুন্দর হইয়া দেখা দেয়—যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

এই সম ব্রহ্মের পরে হয়ত আছে সক্রিয় ব্রহ্ম। তাহার সত্য, তাহার রহস্য অন্য প্রকারের; কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠা এই সমব্রহ্ম।

গোড়ায় প্রাকৃত জনের একান্ত রূঢ় দুঃখবোধ, অন্তিমে নিরাবিল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। মাঝখানে হইতেছে আনন্দীভূত দুঃখ যেখানে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই অন্তর্ব্বর্ত্তী জগতের স্রষ্টা। তিনি বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে অমৃতত্ব লাভ করিতে হয় সে রহস্য আমাদিগকে হয় ত দিয়া যান নাই, তিনি দিয়াছেন অবিদ্যাকে ধরিয়া কি প্রকারে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হয় সেই রহস্য। *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

---

* রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য লিখিত।

এপার-ওপার

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম্-এ, বার-এট্-ল

চার

শীত

আজকে এমন শীতের সকাল বেলা
শিশির-ভেজা সরস ঘাসের পরে
দাঁড়িয়ে আছ পুণ্যানদীর কূলে
রূপের আলোয় রঙীন আলো করে,
প্রভাত তাহার সোনার পরশ খানি
ছড়িয়ে দিল তোমার মাঠে আনি।

পুণ্যানদীর ছোট ছোট ঢেউয়ে
মিটি মিটি হাজার তারা জ্বলে,
পরস্পরে করে ঢলাঢলি
কানে কানে কত কী যে বলে,
বারেক শুধু তোমার পানে চায়
আপন লাজে আপনি ভেঙে যায়।

ঘাসে ঘাসে যত রূপের কণা
রাঙা তোমার চরণ দুটি পেয়ে
সোহাগ ভরে উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে
আকুল চোখে তোমার পানে চেয়ে,
প্রভাত আলো তোমারি গান গায়,
তোমার রূপে রূপ মেশাতে চায়।

সদ্য তোমার স্নানের পরে বুঝি
চুল এলিয়ে রঙীন সাড়ী পরা,
যৌবনেতে রং লাগাবে বলে
এমন প্রাতে আপনি দিলে ধরা।
তোমা বিনে যেন রূপের মেলা
মিছে হ'ত এমন সকাল বেলা।

কিংবা বুঝি চুল শুকাবে বলে
এলে তুমি স্নানের পরে একা,
চুল এলিয়ে খানিকক্ষণের তরে
ঐ ওপারে দিলে আমায় দেখা ;
সকাল বেলার রৌদ্রটুকু মেখে
তোমার ছবি দিলে প্রাণে এঁকে।

মোর জীবনে শীতের সকাল বেলা
বারে বারে আস্‌বে আমি ঘুরে,
হয়ত তারা নয়ন দুটোর মাঝে
আকুল হয়ে চাইবে অনেক দূরে,
দেখবে সেথায় স্মৃতির রঙে ভরা
আজ প্রভাতের ছবিখানি গড়া।

* * * *

শীতের সন্ধ্যা উঠছে কেঁপে
আঁধার ঘনায় কালো,
আজকে তুমি বারেক তোমার
প্রদীপখানি জ্বালো ;
পুণ্যানদীর ঐ ওপারে
কলাগাছের সারির ধারে
তোমার বাড়ীর তুলসীতলায়
একটুখানি খালি
বারেক এসে দাঁড়াও তুমি
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালি।

ভুবন ভরা রূপের মেলা
শেষ হয়েছে আজ,
আজকে তুমি বারেক পর
তোমার রঙীন সাজ;
অবশ পরাণ হিমে কাঁপে
অন্ধ আঁখি কালোর চাপে,
তোমার রঙীন্ সাড়ীর আঁচল
দাও উড়িয়ে প্রাণে
তোলো তোমার প্রদীপ শিখা
আমার নয়ন পানে।

হিমে কালো জমাট বাঁধে
পুণ্যা নদীর জল,
ঢেউগুলি সব গা এলিয়ে
অবশ অচঞ্চল;
নদীর পারে মাঠের পরে
যদি বা কেউ যাচ্ছে ঘরে
মরণ যেন দিচ্ছে তাড়া
তড়িৎ পদক্ষেপে,
শীতের পরশ মাটি থেকে
উঠছে দেহে কেঁপে।

কোন সে কালো দৈত্য এলো
শীতের সন্ধ্যাবেলা,
ভুবন জুড়ে বসে খেলে
মৃত্যু নিয়ে খেলা;
লতা পাতা ছোট বড়
সবাই ভয়ে জড়-সড়,

আকাশ বাতাস গভীর ভয়ে
স্তব্ধ হয়ে চায়,
বসুন্ধরার সৃষ্টি যে আজ
ধ্বংস হয়ে যায়।

গাছে গাছে মলিনতায়
সাঁঝের ছোঁয়া লাগে,
আকাশ যেন যুক্ত করে
অভয় ভিক্ষা মাগে,
ঘাসে ঘাসে শিশির ফোটে
কাঁপন লেগে শিউরে ওঠে
সারা ভুবন তোমার তরে
আকুল চোখে চায়
তোমার পরশ পেলে সবাই
আজকে বেঁচে যায়।

তুমি এসো বিজয়িনী
ভুবন করো জয়;
রাজকন্যা! আজকে তোমার
পেলাম পরিচয়;
মুছে ফেলো বিরাট কালো
নয়ন দুটোয় অগ্নি জ্বালো
আকাশ পানে বারেক তাকাও—
সেই সে ছোঁয়া লেগে
হাজার আলোয় গগন ভরে
উঠুক তারা জেগে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত



ভারতবর্ষে বিদেশী ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস্

ভারতবর্ষে মোগল রাজশক্তির পতন এবং ইংরাজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যবর্ত্তী অরাজকতার যুগে অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত শতবর্ষব্যাপী কালের মধ্যে, যখন এদেশের আধিপত্য লইয়া মোগল, পাঠান, মারাঠা, শিখ, ইংরাজ, ফরাসী প্রমুখ বিভিন্ন শক্তির মধ্যে পরস্পর ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, তখন সেই দেশব্যাপী বিপ্লব এবং অরাজকতার সুযোগে এদেশে বহুসংখ্যক বিদেশী স্বার্থানুসন্ধি ভাগ্যান্বেষী সৈনিক পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ইউরোপের বিভিন্ন দেশজাত, কেহ কেহ বা আমেরিকা হইতে আগমন করিয়াছিল; এবং তখনকার দিনে ইংরাজ, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ যে সকল বণিকপ্রতিষ্ঠান এদেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে অথবা রাজ্যবিস্তারের আশায় উপস্থিত ছিল ইহারা তাহাদের সহিত সরাসরিভাবে সকল প্রকার সম্পর্কশূন্য ছিল। ইহারা শুধু লাভের আশায় এদেশে আসিয়া বিপ্লবকালে পরস্পর বিবাদমান রাজন্যবৃন্দের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সেই সুযোগে বহু ধনসম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অশান্ত প্রকৃতিক অনেকে আবার শুধু বিপজ্জনক কার্য্যে আনন্দ পাইবার লোভে এই ভবঘুরে জীবন গ্রহণ করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারাষ্ট্র গঠন করিয়া অল্লাধিক কালের জন্য রাজ্যসুখ উপভোগেও সমর্থ হইয়াছিল। এই শেষোক্তদের মধ্যে ফরাসীসৈনিক ম্যাডেক এবং পেরঁ, জর্ম্মাণ ওয়াল্টার রীণহার্ট বা সমরু এবং আইরিস মাল্লা জর্জ্জ টমাসের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপীয় পদ্ধতির যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সেনানায়কবৃন্দের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় সিপাহী যে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা হইতে পারে এবং ঐরূপ নিতান্ত অল্প সংখ্যক সেনাও যে সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত শিক্ষা-দীক্ষাহীন সেনাদল লইয়া গঠিত বিশাল বাহিনীকে অবহেলায় প্রতিহত করিতে পারে এ তথ্যটি কূটরাজনীতি-বিদ্যাবিশারদ ফরাসীবীর ডুপ্লে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ শুনা যায়। কিন্তু ডুপ্লের আগমনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে বিদ্যাটি ফরাসীদের জানা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা যখন পন্ডিচেরী অবরোধ করে তখন দুর্গরক্ষী সেনাদলের একাংশ ছিল ভারতীয় সিপাহী;— সামরিক পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং শিক্ষার উৎকর্ষে ফরাসীজাতীয় সৈনিকগণের সহিত তাহাদের কোনই পার্থক্য ছিল না বলিলেই হয়। পরবর্ত্তী যুগে গভর্ণর ডুমা এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে অবসর লইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারীকে ফরাসী সেনানীর নেতৃত্বে পরিচালিত সুশিক্ষিত একদল দেশীয় পদাতিক সেনা দিয়া গিয়াছিলেন। ডুপ্লে যখন দক্ষিণাপথে ফরাসীপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজন্যবৃন্দের তথা ইংরাজগণের সহিত সমরে লিপ্ত হয়েন তখন এই সেনাদল তাঁহার যথেষ্ট কাজে লাগিয়াছিল। সান্ থোমের যুদ্ধে ফরাসী সেনাধ্যক্ষ পার্দ্দি এবং এসপ্রেসমেনিল মাত্র ৪৩০জন ইউরোপীয় এবং ৭০০জন সিপাহীসৈন্য সহায়ে কর্ণাটের নবাবের দশ সহস্র সৈন্য লইয়া গঠিত বিরাট বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনায় সমগ্রদেশে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরাজ ফরাসীর নিকট এ বিদ্যা শিখিলেন এবং নবায়ত্তবিদ্যার বলে প্রথমে ফরাসীকে এবং পরে অপরাপর ভারতীয় রাজন্যবৃন্দকে পর্য্যুদস্ত করিয়া কালক্রমে ভারতবর্ষের আধিপত্যলাভ করিলেন। ভারতবর্ষের তাৎকালীন নৃপতিবৃন্দও ক্রমে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহারাও একে একে

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে নিজ নিজ বাহিনী শিক্ষিত ও সজ্জিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। সিন্ধিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সুচতুর মহাদজীই সর্ব্বপ্রথম উহা বুঝিয়াছিলেন। অরাজকতার যুগে এ দেশে যে সকল ভাগ্যান্বেষী-যোদ্ধার আবির্ভাব হইয়াছিল তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কৃতকর্ম্মা ছিলেন সেই ইটালীয় বীর জেনারেল কাউণ্ট দি বইনকে মহাদজী তাঁহার সেনাদল গঠনের ভার দিয়াছিলেন। দি বইন গঠিত এই সেনাবলের সহায়েই উত্তরকালে মহাদজী সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেরই অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অবশ্য মহাদজীর পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় নৃপতি যে ইউরোপ হইতে সমাগত কোন সৈনিক পুরুষের সাহায্যে নিজ সেনাদল গঠনের চেষ্টা করেন নাই এমন কথা বলা চলে না। মহাদজীর পূর্ব্বে মীরকাশিম, সুজাউদ্দৌলা, সাহআলম, প্রমুখ অনেকেরই এ ধরণের ভবঘুরে ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ কর্ত্তৃক গঠিত ও পরিচালিত বাহিনী ছিল। তবে তাঁহাদের কাহারও চেষ্টা তাদৃশ ব্যাপকভাবে হয় নাই অথবা মহাদজীর মত তাঁহাদের কাহারও উদ্যম সাফল্যগৌরবে মণ্ডিত হয় নাই। এ কারণ মহাদজী সিন্ধিয়ার নামই এ বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট।

এই সুযোগে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক এদেশে আসিয়া জুটিল এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সেনাদলকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইতে লাগিল। তাহাদের কর্ম্মভূমি যেমন বিস্তৃত ও বিশাল, জন্মভূমিও তেমনই বিভিন্ন ছিল। ফরাসী, ইটালীয় (তখনকার দিনে ইটালী এক রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই; এ কারণ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত যোদ্ধারা সাভয়ার্ড, নিয়াপোলিটান, টাস্কান ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল), বেলজীয়ম, ওলন্দাজ, স্পানিয়ার্ড, পর্ত্তুগীজ, জর্ম্মণ, পোল, গ্রীক, আর্মেনীয়, স্কচ, আইরিশ, ইংরাজ, আমেরিকান এবং বর্ণসঙ্কর ইউরেশীয় বা আধুনিক পর্য্যায়ভুক্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সকল জাতির লোকের সমাবেশ এ দলে দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের আবহমানকাল হইতে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। ভারতবর্ষের প্রাধান্য লইয়া চিরশত্রু এই দুই জাতির সমরে ফরাসীর আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছিল। তাই ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে যদি ফরাসীদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ভারতবর্ষে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বন্দীবাসের যুদ্ধ এবং পন্দিচেরীর পতনে ব্যর্থ হইবার পর (১৭৬১ খৃষ্টাব্দ) একবার এবং নেপোলিয়নের সমরের অবসানের পর (১৮১৫ খৃষ্টাব্দ) ইউরোপে সামরিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর হইবার ফলে একবার কর্ম্মহীন বহুসংখ্যক ফরাসী বীর ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের জীবন গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাতীয় শত্রু ইংরাজের প্রতিকূলাচরণের উদ্দেশ্য লইয়া, কেহ বা বিপদসঙ্কুল কার্য্যে আনন্দ পাইবার লোভে, কেহ বা শুধুই ধনাকাঙ্ক্ষায় এ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল।

জাতিতে যেমন বিভিন্ন, প্রকৃতিতেও তেমনই উহারা বিভিন্ন ছিল। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে উচ্চ অভিজাত বংশের সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নিম্ন-শ্রেণীর গুণ্ডা পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমাজের সকল স্তরের এবং সকল ধরণের লোকই এ দলে ছিল। কাউণ্ট, ব্যারণ, শেভালিয়ে (Knight) পদবীধারী, অত্যুচ্চ রাজসম্মানে (orders of knighthood) সম্মানিত, ইউরোপীয় যুদ্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীরপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সৈনিক ও মাল্লা, ফেরারী আসামী ও পলাতক সৈনিক, কসাই ও সূপকার এবং ভাড়াটিয়া গুণ্ডা সকল ধরণের লোককেই এ মহাবৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন গ্রহণ করিতে দেখা যায়। উহাদের মধ্যে অনেকেই দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, ধর্ম্মাধর্ম্ম নীতিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ছিল। অর্থের লোভে দেশীয় রাজার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের অন্নদাতা প্রভুর প্রতি কোনই আকর্ষণের কারণ ছিল না। শুধুই স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া লাভের আশাতেই তাহারা এ পথের পথিক হইয়াছিল। সুতরাং নিজ নিজ সুবিধানুসারে পক্ষ পরিবর্ত্তন করা বা বিপদকালে অন্নদাতাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার শত্রুকে আশ্রয় করা অথবা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধন করা, কোন কিছুতেই তাহাদের বাধিত না। অপরাপর ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত যুদ্ধকালে তাহারা বরং কূটকৌশলী

বিশ্বাসের স্থান রাখিয়াছে ; কিন্তু ইংরাজের সহিত যুদ্ধকালে সাধারণতঃ দেখা যায় যে দেশীয় রাজগণের ভৃতিভুক ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষগণ কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হইয়াছে। এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইংরাজের সহিত যুদ্ধকালে কোন ভারতীয় নৃপতির ভৃতিভুক ইংরাজ জাতীয় একজন সৈনিক পুরুষের কর্ত্তব্য কোন পথে? অন্নদাতা দেশীয় রাজার পক্ষাবলম্বন করিয়া লবণের মর্য্যাদারক্ষার্থ স্বদেশীয় কোম্পানীর এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে, না স্বদেশীয় কোম্পানী এবং স্বজাতীয় সৈনিকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে অসম্মত হইয়া বিপদের সময় অন্নদাতা প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কর্ম্মত্যাগ করায়? স্বার্থসাধনোদ্দেশে ভারতবর্ষীয় উচ্চতম সৈনাধ্যক্ষ ইংরাজের বশীভূত হইয়া তাঁহার রাজার প্রতি, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া ইংরাজের বিজয়লাভে সহায়ক হইয়াছেন এ ঘটনা পলাসীর যুদ্ধ হইতে শিখযুদ্ধ পর্য্যন্ত বহুবারই ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটিয়াছে ; কিন্তু সমাজের হেয়তম স্তর হইতে সংগৃহীত হইলেও এই সকল ভৃতিভুক ভাগ্যান্বেষী পূর্ণ বা অর্দ্ধ ইউরোপীয় সৈনিকরা কোনমতেই অপর এক ইউরোপীয় শক্তি ইংরাজের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজাদের পক্ষভুক্ত থাকিয়া অস্ত্রধারণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। প্রাণের মায়াও তাহাদের এ কার্য্যে অগ্রসর করে নাই। এখানে বলা উচিত যে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত যশোবন্তরাও হোলকারের যুদ্ধকালে তাঁহার পক্ষীয় পাঁচজন ব্রিটিশ জাতীয় সেনাধ্যক্ষ স্বজাতীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কোনমতেই সম্মত না হওয়াতে ক্রুদ্ধ হোলকারের আদেশে জল্লাদ হস্তে নিহত হইয়াছিল। বৃটিশজাতীয় সৈনিকরা না হয় ইংরাজ কোম্পানীর স্বজাতি। তাহাদের ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসম্মতির না হয় একটা কারণ পাওয়া যায়। অর্দ্ধ-বৃটিশ বা ইউরেসীয়রাও না হয় নিজেদের ইংরাজের সমকক্ষ জ্ঞান করিল। তাহাদের কথাও বুঝা গেল। কিন্তু ফরাসী, ইটালীয় প্রভৃতি অনেক জাতীয় যোদ্ধৃগণই দেখা যায় যে শেষটায় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বিপদকালে প্রভুশক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে সিন্ধিয়ার একজন বিখ্যাত ফরাসী সেনাধ্যক্ষের কথা বলা যাইতে পারে, যিনি ইংরাজের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার তোপসমূহের lock (অর্থাৎ কামানের অংশবিশেষ যাহা ব্যতিরেকে কামান ছোড়া যায় না) গুলি লইয়া ইংরাজশিবিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ সময়েই গভর্ণর জেনারেল ওয়েলেসলি এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতে তিনি মারাঠা সেনাদলভুক্ত বৃটিশজাতীয় সৈনিকপুরুষদের তাহাদের দেশের রাজা এবং স্বদেশীয়গণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে যাহারা নিজ নিজ কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইবে তাহাদের কোন মতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না ; কোম্পানী তাহাদের প্রাপ্ত বেতনে নিজ সেনাদলে কর্ম্মদান, অথবা তুল্যরূপ পেন্সন দান অথবা অন্য কোন প্রকারে ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই ঘোষণাপত্রের পর আর কি কেহ সিন্ধিয়ার বিপজ্জনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে? শুধু বৃটিশ বা অর্দ্ধ বৃটিশ সৈনিকগণ কেন, ইউরোপের অপরাপর দেশাগত সৈনিকগণও কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংরাজ কোম্পানীর আশ্রয় লইল। তাহাদের আর একটি গুরুতর আশঙ্কার কারণ ছিল ; দেশীয় রাজার কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধৃগণ যে অর্থসঞ্চয় করিয়াছিল তাহা প্রধানতঃ তাহারা কলিকাতার ব্যাঙ্কসমূহে অথবা "কোম্পানীর কাগজ" কিনিয়া গচ্ছিত রাখিত। সুতরাং ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িলে সারাজীবনের সঞ্চয় বিনষ্ট হইবার ভয় যে তাহাদের কর্ত্তব্য পালনের অন্তরায় হইয়াছিল তাহাও বলা চলে।

জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে দেশীয় রাজন্যবৃন্দ বিদেশী ইউরোপীয় সাহায্য না লইলেই ভাল করিতেন। এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। দেশীয় রাজগণের পক্ষে সার্দ্ধশতবর্ষ পূর্ব্বে কি ভাল ছিল এবং কি মন্দ ছিল তাহা এখন বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন ত বটেই ; তদ্ভিন্ন কিছু বলাও সম্ভব নয়। কারণ অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে—উহাঁরা কিছু করুন বা নাই করুন,—কালক্রমে যে সকলেই ইংরাজের কুক্ষিগত হইবেন তাহা একপ্রকার অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। সকলের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর যাহা ছিল সে পথ তখন কেহ দেখে নাই, বুঝে নাই। কাজেই সে বিষয়ে আলোচনা করার

প্রয়োজন নাই। তবে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সেনাদলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা যে শিক্ষা ও শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল তাহার ফলে যে উৎকৃষ্ট বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার সহিত প্রতি-যোগিতায় ইংরাজকেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে ঐ বাহিনী প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃসারশূন্য ছিল। সাহসে, বীরত্বে ভারতবাসী কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। "গায়ে অধিক জোর থাকিলেই কামানের গোলা অধিক জোরে যায় না" "আনন্দমঠে" সত্যানন্দ বলিয়াছেন কথাটি খুবই ঠিক। আধুনিক যুদ্ধে শারীরিক বলের স্থান নাই। উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, উৎকৃষ্ট সেনানী কর্তৃক পরিচালন এই দুইটিই আধুনিক যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। দি বইনের নেতৃত্বে ঐ দুইটি সহায়ে সিন্ধিয়ার বাহিনী দুর্দ্ধর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নিকট অপরাপর সমস্ত ভারতীয় শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সিন্ধিয়ার সেনাধ্যক্ষগণ ছিলেন ইউরোপীয়—ইংরাজবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ-গণের তুলনায় তাঁহারা সমকক্ষ অথবা অপকৃষ্ট ছিলেন তাহা আলোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহাদের সাহায্য সেনাদল লাভ করে নাই। সেনাদলের প্রাণ হইল উৎকৃষ্ট বিশ্বস্ত, কর্ত্তব্যপালনে উন্মুখ সেনানায়কবর্গ (officers)—উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে বিশাল সেনাবাহিনী ত সাধারণ জনতায় পার্থক্য নিতান্ত অল্প। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে সিন্ধিয়ার সেনাদলের পরাজয়ের ইহাই প্রধানতম কারণ। নচেৎ সাধারণ সৈনিকবর্গের শিক্ষায় দীক্ষায় এবং যুদ্ধাস্ত্রের তুলনায় কোম্পানীর সেনাদলে এবং সিন্ধিয়ার সেনাদলে কোনই প্রভেদ লক্ষ্য করিবার মত ছিল না। বিগত সিপাহীবিদ্রোহের যুদ্ধে ইংরাজের হাতে গঠিত এবং ইংরাজের অস্ত্রে সজ্জিত বিশাল সিপাহীবাহিনীর তুলনায় অল্প সংখ্যক ইংরাজসেনার হস্তে দ্রুত পরাজয়ের প্রধানতম কারণও এই একই উপযুক্ত সেনানায়কবৃন্দের অভাব। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষগণ দেশীয় রাজাদের সেনাদল গঠন ও পরিচালন করিয়াছিল বটে কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণের মধ্য হইতে সেনানায়কশ্রেণী (officer-class) গঠনের কোনই চেষ্টা করে নাই। সুতরাং বহিরাকারে দুর্দ্ধর্ষ প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে যে এতাদৃশ বাহিনী অন্তঃসারশূন্য ছিল তাহা বোধ হয় সকলেরই স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে মোগলের পতন এবং ইংরাজের অভ্যুত্থান এতদুভয় কালের মধ্যবর্ত্তী যুগের ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে এই ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধৃবৃন্দই প্রধানতম নায়ক ছিল। কথাটা নিতান্ত অতি রঞ্জিত হইলেও, উঁহাদের ইতিহাস যে যথেষ্টই কৌতূহলো-দ্দীপক, এবং এখনকার পাঠকসমাজে একান্ত অজ্ঞাত, সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া যে একেবারে নিরর্থক হইবে না, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন নাই।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরও স্পষ্টভাবে বলিতে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খৃঃ) হইতে সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭ খৃঃ) পর্য্যন্ত শতবর্ষ কালের মধ্যে ভারতবর্ষে যে সকল বিদেশী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাদের সকলকার সকল কথা সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। প্রসিদ্ধ জনকয়েক ব্যক্তি ব্যতিরেকে অধিকাংশ ব্যক্তিরই শুধু নামটুকু ছাড়া আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন কোন সৈনিকের কোন একটা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—তদ্ভিন্ন তাহার পূর্ব্ব বা পরজীবন সম্বন্ধে আর সকল কথাই অজানা। অনেক সময় একই নামধারী প্রায় সমসাময়িক একাধিক ব্যক্তির বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচয় পাওয়া যায়। উহারা সকলে অভিন্ন অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাও সঠিক বলিবার উপায় নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুল আয়াসে ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধগণের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। জন ল, দি বইন, জর্জ্জ টমাস এবং জেমস স্কিনার এই কয়জন আত্মচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক অনেক ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। আগ্রার পুরাতন সেণ্টস গির্জ্জার এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট গির্জ্জার কবরস্থানে অনেক ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের অথবা তাহাদের আত্মজনের সমাধি অবস্থিত দেখা যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রকাশিত E. A. H. Bluntএর "List of Christian Tombs in the

United Provinces." নামক গ্রন্থে পরিশিষ্টে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু কেহ যদি উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখেন, তবে লক্ষ্য করিবেন যে উক্ত দুই কবরস্থানে এখনও এমন অনেক সৈনিকের সমাধি আছে যাহাদের কথা গ্রন্থে বলা হয় নাই। এইরূপে নানা উপায়ে ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এবং পরে যে সকল কথা বলা যাইবে তাহা প্রধানতঃ এ বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ আছে তদবলম্বনে লিখিত। সিন্ধিয়ার অন্যতম ইংরাজ সেনাপতি মেজর লুইফার্ডিনাণ্ড স্মিথ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম নিজ সহকর্ম্মীবৃন্দের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী লেখকগণ সকলেই বহুলাংশে স্মিথের নিকট ঋণী। নিম্নে গ্রন্থগুলির নাম বলা গেল।

Major L. F. Smith—A sketch of the rise, progress, and termination of the regular corps formed and commanded by Europeans in the service of the native princes of India (1804)

Colonel Francklin—Military memoirs of Mr. George Thomas (1803)

J. Baillie Fraser—Military memoirs of Lt-col. James Skinner (1891)

Emile Barbe—Nabab Rene Madec (1894)

H. Compton—European military adventurers in Hindusthan (1892)

Do—A free lance in a far off land.

Major Hugh Pearce—Colonel Alexander Gardner (1898)

Alfred Martinean—Memoires des Mon Law (edited by)
— Memoires des Conti de Boigne (2nd. ed, 1830)

S. C. Hill—The life of Claud Martin (1901)

H. G. Keene—Hindusthan under free lances (1907)

E. A. H. Blunt—List of Christain Tombs in the United Provinces (1911)

C. Grey—European adventurers of Northern India (1929)

Colonel Melleson—European military adventure in India.

Do.—History of the French in India

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বেগম সমরু।

জন ল বা মুশির ল্যাস

ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে প্রথম স্থান দিতে মসিয় ল বা লাকে অথবা মুসলমান ঐতিহাসিকের মুশির লাস্ সাহেবকে। কারণ ইনিই প্রথম ইউরোপীয় সৈনিক যাঁহাকে উক্ত পর্য্যায়ে ধৃত করা যাইতে পারে। ভবঘুরে এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর তাড়নায় বিড়ম্বিত সৈনিকের গুণাগুণ এবং গ্রহবৈগুণ্য যত কিছু সব ইঁহার জীবনের ঘটনাবলীতেই সুপরিস্ফুটভাবে দেখা যায়।

প্রথমেই গোল ইঁহার নাম লইয়া। প্রায় সকলেই ইঁহাকে "Law" বলিয়া উল্লেখ করিলেও, ব্লকমানের মতে ইঁহার প্রকৃত নাম "Las" *। এ প্রকার গোলের কারণ এই যে ল বংশ আসলে স্কচজাতীয় হইলেও ফরাসী হইয়া গিয়াছিল

* In all English histories of India known to me his name (M. Las) is mis-spelt Mr. Law."—Notes on Sirajuddowlah—J. A. S. B, 1867

এবং ফরাসী ভাষায় "w" অক্ষরটি নাই সুতরাং কালক্রমে ল বংশীয়গণ নিজেদের নামের বানান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

সে কথা যাউক। মসিয় ল'র পিতৃব্য ছিলেন নানারূপ অর্থ-নৈতিক প্রচেষ্টার জন্য বিখ্যাত স্কচজাতীয় 'মিসিসিপি ল' অথবা জন ল অব লরিষ্টন (১৬৭১-১৭২৯)। ডিউক অব অর্লিন্সের রিজেন্সির যুগে ফ্রান্সের ইতিহাসে তাঁহার নাম সমধিক বিখ্যাত। ল পরিবার অতঃপর ফ্রান্সে থাকিয়া ফরাসীতে পরিণত হইয়া পড়ে। ভ্রাতুষ্পুত্র জন ল'র প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। অল্প বয়সেই তিনি সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রেজিমেন্টের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণভারতে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এডমিরাল বস্কাওয়েন কর্তৃক পন্দিচেরী অবরোধকালে ইংরাজসেনার আক্রমণ প্রতিহত করিতে যে সকল ফরাসী যোদ্ধা সবিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিল, জন ল তন্মধ্যে অন্যতম। অনন্তর উভয় জাতির মধ্যে সন্ধির ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে পরে সে একবার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এ শান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। পরস্পর চিরশত্রু এই দুই জাতি আবার অচিরে দ্বন্দ্বে মাতিল। ডুপ্লের ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য হায়দ্রাবাদ এবং আর্কটের সিংহাসনে নিজ অনুগত ব্যক্তিস্থাপনের প্রয়াসই ধূমায়মান সমরানল নূতন করিয়া প্রজ্বালনের কারণ। সে সকল ইতিহাসের কথা এখানে সবিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই। ল ইতিমধ্যে ফ্রান্স হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এ যুগের প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ডুপ্লের এক বিষয়ে মহা অসুবিধা ছিল; তিনি নিজে ছিলেন সুচতুর রাজনৈতিক, চারিদিকের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে ব্যবস্থা করিতে হইত। তাঁহার সেনাদলে ক্লাইভের ন্যায় কোন সুদক্ষ সেনানায়ক ছিল না। ক্লাইভ আর্কট নগর অধিকার করিয়া বসিলে তাঁহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য ডুপ্লে যে সেনাদল প্রেরণ করেন, নিতান্ত অশুভক্ষণেই তাহার নেতৃত্ব ল'কে অর্পিত হয়। এ কার্য্যের তিনি একেবারেই অনুপযুক্ত ছিলেন। নিজে অসমসাহসী বীর হইলেও এবং কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য এক কোম্পানী বা এক ব্যাটালিয়ন সেনার নায়কত্ব করিতে পারিলেও জন ল'য়ের না ছিল সমরনীতিজ্ঞান, না ছিল বড় বাহিনী পরিচালনের ক্ষমতা। তিনি পদে পদে ইংরাজের হস্তে বিড়ম্বিত হইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ৩৫ জন ফরাসী কর্ম্মচারী এবং ৩০০০ জন সাধারণ সৈনিকের সহিত ইংরাজ সেনানী লরেন্স, ক্লাইভ এবং ডাল্টনের করে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

দুই বৎসর পরে সন্ধির ফলে ইংরাজ কারাগার হইতে ল মুক্তিপ্রাপ্ত করিলেন বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাঁহার উন্নতির সকল আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর ল ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিলেন এবং কাশিমবাজারে ফরাসী কুঠির এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকার কালে (১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন) তিনি উক্তপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিরশত্রু ক্লাইভ এখানেও তাঁহাকে শান্তিতে তিষ্ঠিতে দিলেন না। ক্লাইভ এবং ওয়াটসন কর্তৃক চন্দননগর অধিকার কালে জনকয়েক ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারী, পঞ্চাশজন ফরাসী সৈনিক এবং কুড়ি জন সিপাহী দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া কাশিমবাজারে ল'র নিকট আগমন করে। ইহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য ক্লাইভ সিরাজউদ্দৌলাকে বলিয়া পাঠান। শরণাগতকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম বলিয়া নবাব প্রথমটায় তাহাতে অসম্মত হন। মিরজাফরের সহিত গোপনে মিলনহেতু বৰ্দ্ধিতসাহস ক্লাইভ তখন কাশিমবাজার আক্রমণের ভয় দেখাইলে শান্তিপ্রিয় সিরাজ বিবাদে অনিচ্ছুক হইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির অন্যতম প্রধান অন্তরায় ল সাহেবকে সদলবলে তাঁহার রাজ্যসীমার বাহিরে যাইতে আদেশ দেন। ল মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজারে থাকার ফলে তখনকার রাজনৈতিক সকল অবস্থা বুঝিয়াছিলেন। তিনি নবাবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে তাঁহার মন্ত্রিদল এবং অধিকাংশ সেনানায়কগণ ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছে; কেবল কয়জনের ভয়ে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হইতে সাহস

পাইতেছে না। এ অবস্থায় ফরাসীদিগকে মুর্শিদাবাদ হইতে বিদায় দিলেই সমরানল জলিয়া উঠিবে। একথা একেবারে অস্বীকার করিতে সমর্থ না হইলেও. শান্তিপ্রিয় সিরাজ তখন ফরাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়া নিজ প্রজার ক্ষতি করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। এ সকল ইতিহাসের কথা সকলেই জানেন। ইংরাজের সহিত যদি পুনরায় যুদ্ধ বাধে তখন তিনি তাঁহাদিগকে আবার আহ্বান করিবেন, ততকাল অবধি তাঁহারা পাটনা অঞ্চলে থাকুন—একথা সিরাজ তাঁহাকে বলিলে ল' বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে আবার ডাকিয়া পাঠাইবেন? হায় রাজা! আমাদের আর দেখা হইবে না।"

ল ক্লাইভকে চিনিয়াছিলেন। সিরাজ চিনিলেন—কিন্তু তখন নিতান্ত অসময়। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে নবাব ল'কে রাজমহলের পথে মুর্শিদাবাদ আসিয়া আবার তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ যাত্রার উপযোগী অশ্ব এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রদান করিতে বিলম্ব করায় ল সাহেব নবাবের পত্রপ্রাপ্তিমাত্র যাত্রা করিতে পারেন নাই। পলাশীর যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় তখন 'ল' ভাগলপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কাটোয়ায় ২১শে জুন তারিখে যে সমর-সভার বৈঠক করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যতম সুদক্ষ ইংরাজ সেনানী মেজর কূট ল'র আগমন-সম্ভাবনার ভয়ে আর কাল-বিলম্ব ব্যতিরেকে নবাবী সেনাকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ক্লাইভ স্বয়ং তখন যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া মারাঠাদের আগমন প্রত্যাশায় অপেক্ষা করার পক্ষে ছিলেন। মেজর কূট বলেন, "মসিয়ু ল অবসর পাইলেই নবাবের সহিত মিলিত হইবেন,—তখন নবাবের বাহুবল বাড়িবে এবং মন্ত্রণা ও উৎসাহ লাভও হইবে। তাহারা আমাদের পশ্চাতের পথ রুদ্ধ করিয়া কলিকাতা ফিরিবার পথ বন্ধ করিবে।" মেজর কূটের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্লাইভও অগ্রসর হওয়ার পক্ষেই মত দিয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর ভগবানগোলার পথে সিরাজউদ্দৌলা এই ল সাহেবের সহিত যোগদানের এবং তাঁহার সেনাসহায়ে পাটনায় গিয়া আবার নবীন উদ্যমে বল পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সিরাজ যখন রাজমহলের নিকট ধৃত হন তখন ল সাহেব সেখান হইতে মাত্র ৩০ মাইল দূরে ছিলেন।

বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ল এবং তাঁহার সহচরগণ নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে বহুস্থানে পরিভ্রমণ করেন। প্রথমে তাঁহারা রাজা রামনারায়ণের নিকট তরবারী বিক্রয়ের প্রস্তাব করেন। ইতিমধ্যে মিরজাফরের সহায়তায় বঙ্গদেশে ইংরাজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ল এবং তাঁহার ফরাসীরা আবার কি বিভ্রাট বাধায় এই আশঙ্কায় তাঁহাদের ধরিবার জন্য ক্লাইভ কর্ণেল কূটকে বিহারে প্রেরণ করেন। কূট কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া ল অযোধ্যায় নবাবের আশ্রয়ে পলায়ন করিলেন।

অতঃপর ল এবং তাঁহার সহচরগণ তাঁহাদের মতিতই সম-দশাপন্ন সাহজাদা আলি গোহর বা উত্তরকালের সাহ্ আলমের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সাহজাদা মহাগৌরবপূর্ণ কিন্তু নামসর্ব্বস্ব পরিণত মোগল তখ্তের ভবিষ্যৎ অধিকারী। সাম্রাজ্যের অবস্থা যেমন, তাঁহার নিজের অবস্থাও তেমনই শোচনীয়। তিনি বিভীষিকাপূর্ণ দিল্লী নগরী হইতে পলায়ন করিয়া হিন্দুস্থানের সমতলক্ষেত্রে আশ্রয় লাভের জন্য পলাইয়া ফিরিতেছিলেন। হিন্দুস্থানের অবস্থা তখন নিতান্তই শোচনীয়। চারিদিকে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা। "মুৎক্ষরীণ"-কার গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন যে একদিন কথা প্রসঙ্গে মুসিরলাস সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পাটনা ও দিল্লীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে শাসন ও শৃঙ্খলার কোন নিদর্শন দেখা যায় না। যদি সুজাউদ্দৌলার মতন লোকেরা আমাকে বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি সে ক্ষেত্রে শুধু ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইব এরূপ নহে; সাম্রাজ্য শাসনের ভারও আমি লইব।"

সাহ্ আলম হৃত মোগলগৌরব ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। ইংরাজ তাড়াইবার উদ্দেশ্যে ল এবং অপরাপর ফরাসী বীরগণ তাঁহার সহিত চলিলেন। এই দলে ল ব্যতীত ওয়াল্টার রীর্ণহার্ড সমরু,

রিণি ম্যাডেক, কাউণ্ট দি মন্দাত্র, শ্ভেভালিয়ে দি ক্রেসী, সিন্‌ফ্রে এবং কুর্ত্তঁ্যা এই কয়জন ছিলেন বলিয়া জানা যায়। উত্তরকালে বিখ্যাত ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধারূপে প্রথমোক্ত দুই জনের নাম আবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলা যাইবে। শেষোক্ত দুইজন সিন্‌ফ্রে এবং কুর্ত্তঁ্যার কাহিনী আরও চিত্তাকর্ষক। ইঁহারা দুইজনে পলাশীর ক্ষেত্রে ইংরাজের বিপক্ষে লড়িয়াছিলেন। শ্ভেভালিয়ে সিন্‌ফ্রের ফরাসীদল, সংখ্যায় চল্লিশ অথবা পঞ্চাশজন মাত্র গোলন্দাজ সেনা চারিটা কামান সম্বলে, মীরমদনের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যস্থলে মীরমদন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সিন্‌ফ্রে এবং বামপার্শ্বে মোহনলাল মাত্র এই কয়েকজন সিরাজের হইয়া পলাশীর যুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, বাকী সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া যুদ্ধাভিনয় দেখিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অজানা নয়! সিনফ্রের গোলন্দাজ-দলই প্রথম কামানে অগ্নিসংযোগ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথমেই ইংরাজসেনাকে সম্মুখ-আক্রমণ করিতে গিয়া মীরমদন নিহত হইলেন। তাঁহার সহিত নবাবের সকল আশা ভরসা বিলুপ্ত হইল। মীরজাফরের চক্রান্তে নবাবীসেনা নিষ্ক্রিয় থাকিয়া পশ্চাৎপদ হইবার আদেশপ্রাপ্ত হইলেও বাঙ্গালী বীর মোহনলাল এবং ফরাসী-বীর সিনফ্রে রণে ভঙ্গ দিতে অসম্মত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত অসম-সাহসে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে প্রভাত হইতে অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিবার পর মেজর কীলপ্যাট্রিক পরিচালিত ইংরাজসেনার আক্রমণে সিনফ্রে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হন। ইংরাজ ইতিহাস-লেখক সুপ্রসিদ্ধ অর্ম্মি পলাশীর যুদ্ধের কথা বলিতে বসিয়া সিনফ্রে প্রমুখ ফরাসীদের "a handful of vagabond Frenchmen" বলিয়া উল্লেখ করিলেও, তাঁহাদের vagabond বলা উচিত কি না, তাহা বিবেচ্য। যুদ্ধের পর বঙ্গদেশে ইংরাজপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পরে ল সাহেবের সহিত যোগদানের অভিপ্রায়ে সিনফ্রে ও কুর্ত্তঁ্যা পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করেন। লখনৌ যাইবার পথে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে উহাঁরা ইংরাজসেনানী কুটের হস্তে ধৃত হন কিন্তু অচিরকাল পরেই তাঁহারা শত্রু-শিবির হইতে গোপনে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহারা হিন্দুস্থানের সমতলক্ষেত্রে নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে আশ্রয়ের সন্ধানে পরিভ্রমণ করেন। কখনও কোন রাজার অতিথি, কখনও বা বাজারের অখাদ্য-কুখাদ্য এবং অনভ্যস্ত ইউরোপীয় রসনায় অস্বাচ্ছন্দ্যকর ভোজ্য জীবি। একস্থানে দীর্ঘদিন থাকিবার উপায় নাই, পশ্চাতে অনুসরণকারী ইংরাজসেনা। ইহাতেও তাঁহারা দমেন নাই, প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় সুদিনের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া কোনমতে অবশেষে একদিন সকলে দুর্গম বুন্দেল-খণ্ডের আরণ্য অঞ্চলে ছাতারপুর নামক স্থানে তাঁহাদেরই ন্যায় সমদশাপন্ন, তাঁহাদেরই ন্যায় ভাগ্যলক্ষ্মীর তাড়নায় নিষ্পেষিত, ভবঘুরে সাহ্ আলমের পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইলেন।

তাহার পর সাহ আলম বিহার আক্রমণে চলিলেন সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রতিনিধি নাজিম রাজা রাম-নারায়ণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সেনাদল রাজধানী পাটনা অবরোধ করিল। এ সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌছিলে নবাবের এবং কোম্পানীর ফৌজ মেজর কার্ণাকের পরিচালনে সাহ্ আলমের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। তাহারা আসিয়া উপনীত হইবার পূর্ব্বেই পাটনা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে মসিয় ল পাঁচদিন-ব্যাপী ঘোরতর গোলাবর্ষণের পর নগর-প্রাকার ভঙ্গ করিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নগররক্ষী নবাবী সেনাদল অসমসাহসে আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিল। ততক্ষণে মেজর কার্ণাক সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হওয়ায় বাদসাহের জয়াশা সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িল। তিনি বিহারনগরে স্বীয় রাজপাট প্রতিষ্ঠা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন! শোননদের উপর দায়ুদনগরে এবং গয়াতে তাঁহার সেনাদল ছাউনী করিয়া রহিল এবং পাটনা নগরীর প্রায় সমীপবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদ হইতে তাঁহার নামে রাজস্ব সংগৃহীত হইতে লাগিল।

মুসিরলাসের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চ হইতে তাঁহার বিদায়ের কাল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। চারিদিক হইতে ইংরাজ সেনা সমবেত হইতেছিল, সংখ্যায় বলীয়ান হইয়া মেজর কার্ণাক আক্রমণে

অগ্রসর হইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী বিহার নগর হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে মোহানী নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখার তীরে অবস্থিত সোয়ান নামক এক গণ্ডগ্রামের সমীপে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল। মোগল সেনা পরাজিত হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটি কামানের গোলার আঘাতে চঞ্চল হইয়া বাদসাহের হস্তী তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া পলায়ন করিল, হস্তিচালক বহু চেষ্টাতেও আর তাহাকে ফিরাইতে পারিল না। তাহার পর ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আরও সহস্রবার যাহা ঘটিয়াছে এখানেও তাহাই ঘটিল। সেনাপতি বাদসাহ রণেভঙ্গ দিতেছেন ভাবিয়া সেনাদলও "য পলায়তি স জীবতি" এই মহাজনবাক্যের অনুসরণ করিল। কেবল ১৩ জন সামরিক কর্ম্মচারী এবং ৫০ জন পদাতিক সেনা লইয়া ল রণস্থলে অবিচলিতভাবে স্থির রহিলেন। ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর আবর্ত্তনে নিষ্পীড়িত হতভাগ্য সৈনিকের আর জীবনের প্রতি কোনও মায়া ছিল না। তিনি রণস্থলে দেহবিসর্জ্জনের অপেক্ষায় রহিলেন। "মুৎক্ষরীণে"র সুন্দর বর্ণনার একাংশ এখানে দেওয়া গেল। "মুশিরলাস নিজেকে পরিত্যক্ত এবং একাকী দেখিলেও পলায়ন না করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বসিবার মত ভঙ্গী করিয়া একটি কামানের উপর আরোহণ করিয়া উপবেশন করিলেন এবং অচঞ্চলভাবে সেই অবস্থায় মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। মেজর কার্ণাকের নিকট এ সংবাদ পৌছিলে তিনি কাপ্তেন নক্স এবং অপরাপর কয়েকজন সেনানায়কের সমভিব্যাহারে নিজ সেনাদল হইতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং কোন রক্ষীসেনা বা তেলিঙ্গা না লইয়া কামান-পৃষ্ঠে সমাসীন সেই মনুষ্য সমীপে গমন করিলেন। নিকটে আসিয়া তাঁহারা সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নিজ নিজ শিরস্ত্রাণ উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহা শূন্যে সঞ্চালন করিলেন। মুশিরালসও তদ্রূপ করিয়া প্রত্যাভিবাদন করিলে পরে তাঁহাদের মধ্যে নিজেদের ভাষাতে কি কথাবার্ত্তা হইল।"*

ইংরাজেরা ল'কে যুদ্ধে বিরতি দিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি তাহাতে স্বীকৃত আছি যদি তোমরা আমাকে আমার অসি ত্যাগ করিতে না বল। প্রাণ থাকিতে আমি আমার অস্ত্র ত্যাগ করিব না।" মেজর কার্ণাক তাহাতে স্বীকৃত হইলে ল আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদের বন্দীকে পরম সমাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মেজর কার্ণাকের পাল্কীতে করিয়া ল'কে ইংরাজ শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। এইখানেই আমরা এই সাহসী কিন্তু দুরদৃষ্ট বীরসৈনিকের নিকট বিদায় লইলাম।

মসিয় ল'র আত্মচরিত M. Alfred Martineau কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, বিহার এবং বুন্দেলখণ্ডের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য একজন সমসাময়িক লেখক এবং রঙ্গমঞ্চের অন্যতম নায়ক কর্ত্তৃক উক্ত বলিয়া ঐতিহাসিকের নিকট এ গ্রন্থ পরম মূল্যবান।

ইংরাজ ও ফরাসীদের এই সময়ের সমরে ফরাসী সেনাদলে আর একজন মসিয় ল'র পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম জ্যাকুয়েস ফ্রাঙ্কোয়া ল। ইনিও যে পূর্ব্বোক্ত জন ল অব লরিষ্টনের জ্ঞাতি অর্থাৎ আমাদের মসিয় জন ল'র সহিত একবংশজাত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইঁহাকে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বা ভবঘুরে যোদ্ধা বলা চলে না। কারণ ইনি বরাবরই ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সেনাদলভুক্ত ছিলেন এবং উত্তরকালে জেনারেলের পদ পর্য্যন্ত অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় এবং ৬১ বর্ষ বয়সে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পন্দিচেরী নগরে ইঁহার পুত্র জ্যাকুয়েস আলেকজান্দার বার্ণার্ড ল'র জন্ম হয়। এই শেষোক্ত ল নেপোলিয়নের একজন বিখ্যাত মার্শাল ছিলেন এবং মার্কুইস অব লরিষ্টন নামক মহাগৌরবপূর্ণ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন ইঁহার দেহান্ত ঘটে।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ণেল ম্যালিসনই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত সংঘর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার লেখা মোটের উপর বিশ্বাসের যোগ্য

* সিয়র-উল-মুৎক্ষরীণ, Vol. II, p 164

বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইংরাজ ইতিহাসে দেখা যায় যে উভয় পক্ষ বল সম্পর্কে পরস্পরের প্রায় সমকক্ষই ছিল; অনেক সময় আবার ফরাসী পক্ষেই সংখ্যাধিক্য দেওয়া হইয়া থাকে। এ সকল সত্ত্বেও ফরাসীর অসাফল্যের কারণ ইঁহাদের মতে ক্লাইভ, ওয়াটসন, কূট, লরেন্স প্রমুখ ইংরাজ সেনাধ্যক্ষগণের রণপাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠতা। ইঁহাদের কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না, তবে ফরাসীর অসাফল্যের কারণ শুধু তাৎকালীন ইংরেজ সেনাপতিবৃন্দের শ্রেষ্ঠত্বে নহে। উহার কারণ অন্যস্থানে খুঁজিতে হইবে।

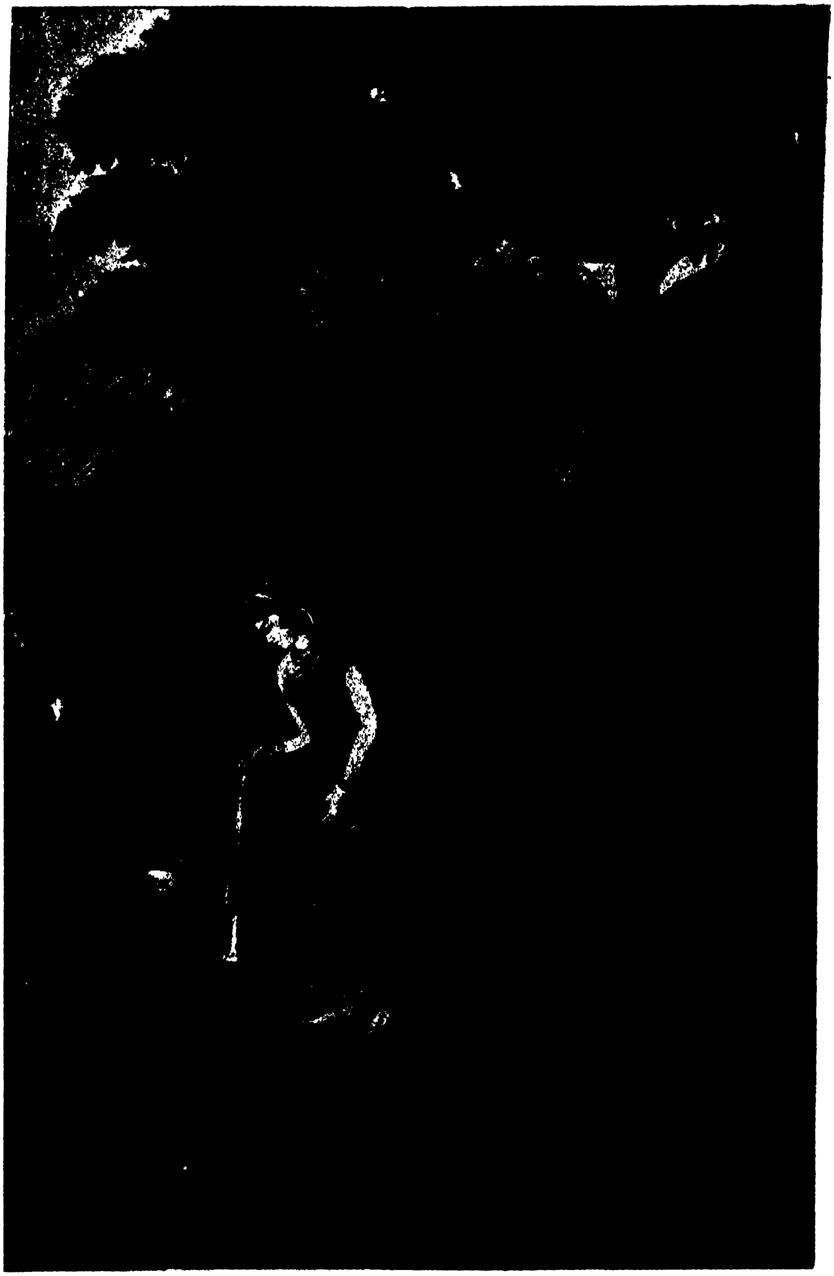
ম্যালিসন সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন যে ইংরাজ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে অনুসৃতব্য একটা স্থিরীকৃত সঙ্কল্পে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা এই, যে করিয়াই হউক ভারতবর্ষে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই অধস্তন কর্ম্মচারিবৃন্দের এ দেশে রাজ্যবিস্তারের সকল চেষ্টার সমর্থন এবং উৎসাহ দান করিতেন। ডিরেক্টরগণ এ কার্য্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ উপযুক্ত সেনাবল এবং অর্থবল তাঁহাদের এতদ্দেশস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দকে সর্ব্বদাই সরবরাহ করিতে তৎপর ছিলেন। এমনকি ইংলণ্ডের অধীশ্বরগণ এবং তত্রত্য জনসাধারণও এ বিষয়ে ইংরাজ কোম্পানীর সকল কার্য্যের সহিত প্রথম হইতেই পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

পক্ষান্তরে ইহাও সমভাবে সুস্পষ্টতঃ দেখা যায় যে ফরাসী ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের এতদ্দেশস্থ এজেণ্টগণের রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না; বরং তাহার বিরোধিতা করিতেন এবং বারম্বার তাহাদের সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া বাণিজ্যব্যাপারে মনঃসংযোগ করিতে আদেশ দিয়া পাঠাইতেন। ডুপ্লে এবং বুসী এদেশে যাহা সাধন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণভাবেই তাঁহাদের নিজেদের দায়ীত্বে এমন কি ফ্রান্স হইতে প্রাপ্ত আদেশের সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করিয়াই করিয়াছিলেন। ফরাসীদেশের জনসাধারণ কোম্পানীর কার্য্যে উদাসীন ছিল। ফরাসীরাজের কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি থাকা ত দূরের কথা, তিনি সুস্পষ্টতঃ কোম্পানীর বিরোধী ছিলেন।

ডুপ্লে যে কি অসাধারণ মনীষি ছিলেন তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার দিগ্বিজয়ী প্রতিষ্ঠাস্থাপন শুধু নিজ অনন্যসাধারণ শক্তির ভরেই ডুপ্লে করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডুপ্লে-ফতেহাবাদের জয়স্তম্ভের প্রত্যেকটি উপলখণ্ড ডুপ্লের নিজ হস্তে আহৃত ও সযত্নে বিন্যস্ত। উহার পরিকল্পনায় এবং নির্ম্মাণে অপর কাহারও অংশ ছিল না। ফরাসীর দুর্ভাগ্য তাহারা ডুপ্লের মর্য্যাদা বুঝিল না। ডুপ্লে, লালী এবং বুসীর প্রতি ফরাসীর ব্যবহার এবং ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতি ইংরাজের ব্যবহার হইতেই উভয় জাতির পার্থক্য এবং সাফল্যের ও ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় হইবে।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়





জলতোলা

বিচিত্রা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

মাঘ, ১৩৩৮

স্বপনপ্রিয়া

জসীম উদ্দীন

আর কতদিন রহিবে সজনি, মোর কল্পনা হয়ে,
স্বপনে স্বপনে আর কতকাল ভাসিবে আমারে লয়ে।
আজি দেখে যাও দেবের দেউলে বনের শৃগাল নাচে,
শ্মশানের ভূত আসিয়া এখন পূজার প্রসূন যাচে।
তোমারে ভাবিয়া জীবনের পথে করিয়াছি নানা ভুল,
যারে তারে আমি স'পিতে গিয়াছি দেবচরণের ফুল।
ধূপের সরায় ছড়ায়েছে তারা ভিজা তুষ আর বালি
সোনার স্বপন ঢাকিছে তা আজ উগারি' ধূঁয়ার কালী।
মোর চন্দনে মিশায়েছে তারা কেউটে সাপের বিষ
তীব্র তাহার দহন জ্বালায় কাঁদে মোর দশদিশ।

আর কতকাল তাহাদের গেহে কাঁচা উনানের তলে
ভিজা কাষ্ঠেতে আগুন জ্বালায়ে তিতিব নয়ন জলে।
লোহার কালাই সিদ্ধ হয় না আশারো নাহিক শেষ,
ভিজা কাষ্ঠেরে ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া ভিজাম্ব বুকের বেশ।
তুমি এসে দেখে দাও
মোর কল্পনা-তটিনীর জলে বাহিয়া সোনার নাও।
জীবনেতে আমি বড় যে ক্লান্ত বড় যে শ্রান্ত দেহ,
বহু দেশ আমি ঘুরিয়া ফিরেছি খুঁজিয়া বুকের স্নেহ।
খুঁজিয়াছি আমি বুক ভরা বুক, ফুল ভরা ফুল হাসি :
মন ভরা মন, সে মনের লাগি মোর মন সন্ন্যাসী।
শুধু মরীচিকা হায়,
যত খুঁজিলাম ধুধু মরু বালু উড়িছে উষ্ণ বায়।
মায়ার জগৎ, ফুলের হাসিতে দাবানল হুতাশন
ঢাকিয়া রেখেছে, ছুঁইতে গেলেই পোড়ায় তনু ও মন।
ফুলের আড়ালে লুকায়ে রেখেছে তীব্র কাঁটার জ্বালা,
চন্দন তরু বেড়িয়া দুলিছে দহন নাগের মালা।

তুমি এসো সই, তোমার জীবন এদের মতন নয়,
তুমি শেখ নাই কথা দিয়ে কথা কেমনে ফিরায়ে লয়।
খেলার পুতুল ক'রে
তুমি খেল নাই ছিনিমিনি খেলা পরের পরাণ ধ'রে।
তুমি এস সই তোমার অঙ্কে রাখিয়া শ্রান্তকায়
বালকের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁচল ভিজাব হায়।
আমার ঘরের দিবস রজনী দুখানি দুখের চাল,
ঘসির * অনল জ্বালায়ে সেথায় কাটায়েছি এতকাল।
সাপের মাথায় রাখিয়া সেথায় আপন বুকের মণি
ফুলের মধুতে পোষণ করেছি কাল অজগর ফণি।
ওরা নাহি বশ মানে
আঁধার ঘরেতে না জানি কখন বিষের কামড় হানে।
আগের দরজা বন্ধ ঘরের, পিছন দরজা খুলি
সুজন বলিয়া ডাকাতেরে আমি এনেছিনু ঘরে তুলি।
হায় নিদারুণ, রতন মাণিক লুণ্ঠন করি মোর
সমুখের দ্বার খুলে চ'লে গেল আমারে করিয়া চোর।
তুমি কভু সই এমন হবে না, তোমার ফুলের প্রাণ
শুধু হাসি জানে আর জানে দিতে ফুলের বুকের ঘ্রাণ।
মোর যত দুখ তোমারে শুনাব, বাঁশীর করুণ সুরে।
বনের হরিণে ডেকে এনে বুকে বিষ বাণ দেয় পুরে,—
ওরা নিষ্ঠুর, আগুন জ্বালায়ে পোড়ায় বনের বুক,
কি দুঃখে বন পুড়ে ছাই হ'ল দেখে না ফিরায়ে মুখ।
তুমি সই কভু এমন হবে না,—যাহার যত না দুখ
ভাষা পাইবারে খুঁজিয়া ফিরিছে তোমার কোমল বুক।
জগতের যত দুঃখ বেদনা যত হাসি আর গান
তোমার মাঝারে ধরিয়া ধরিয়া করিব যে আমি পান।

---

* ঘুঁটে।

তুমি হবে মোর বাজাবার বাঁশী, তোমার করুণ সুরে
আমার মনের যত কথা সখি ফিরিবে ভুবন ঘুরে।
সে সুরের গাঙে ভাসাইয়া দিব আমার আঁখির জল
যারা ব্যথা দেয় তাদের'ও নয়নে নামিবে সেদিন ঢল।

তুমি এসো সই আর কতকাল রহিবে স্বপন হয়ে
আঁধার জমেছে দেবতা বিহীন এ আঁখির দেবালয়ে।
কদম কেয়ার আহ্বান লিপি পাঠায়েছি তব দেশে
তুমি এসো আজ নব আষাঢ়ের কাজল মেঘের বেশে।
আমার পূজার ফুল
মোর অগোচরে হয় ত তোমার চরণে পেয়েছে কূল।
দেবতা জেনেই দিয়েছিনু মালা, তারা যে দেবতা নয়,
অসুর হইয়া দেবতার দান কেমন করিয়া লয়।

আমার হৃদয়ে আছিল তৃষ্ণা, চাহি মোর দেবতারে
পদে পদে তাই ভুল করে সখি ডাকিয়াছি যারে তারে।
স্তবের ভারেতে হৃদয় আকুল, না মানে বাঁধের মানা
সেদিন সজান, পথে পথে তাই ভুল করিয়াছি নানা।
সে-সব হয় ত মোরি অপরাধ, তবু তার গুরুভার
এমন নয়ক তোমারে পাইতে আছে কোন বাধা তার।
দেবতারে আমি চেয়েছিনু সখি, যদি নাহি চিনে থাকি,
অগোচরে মোর পূজার কুসুম দেবতা লয়েছে ডাকি।
যত গান আমি ভাসায়েছিলাম অশ্রুমতীর জলে
আজিকে তাহারা বাসা বাঁধিয়াছে তোমার মেঘের দলে।
সেই মেঘভার অলকে ডুলায়ে এসো গো স্বপন-প্রিয়া
আমার বিজলী হাসিবে তোমারে লতা-বন্ধন দিয়া।

জসীম উদ্দীন

যা' হয় না

শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র

খড়গপুর ষ্টেশন্ পার হইতেই বলিলাম—আর দেরী নয় নিরু, বিছানাটা পাতা যাক্ ; শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাবে। ততক্ষণ তুমি খাবারের বন্দোবস্তটা করে ফেল দিকিনি !

নিরু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা পেটুক বাবা তুমি ; এখুনি এক পেট খেলে, আবার এরই মধ্যে খিদে ? রবারের পেট নাকি ?

বিছানা পাতিতে পাতিতে উত্তর দিলাম—রেলে উঠলে আমার পেট ডব্‌ল্ হয়ে যায় সত্যি, মনে আছে ছোট বেলায় রেলে উঠলে ষ্টেশনে যা' দেখতুম, সব খেতে চাইতুম।—সেই অভ্যেসটা এখনো র'য়ে গেছে আর কি !

খাওয়া সারিয়া বিছানায় লম্বা হইয়া একটা চুরুট ধরাইলাম। মাঝখানের বেঞ্চে নিরু একটি পত্রিকা খুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। সেকেণ্ড্ ক্লাশ কামরা দুইজনে রিজার্ভ করিয়া বম্বে চলিয়াছি। হনিমুন বলিলেও চলে। মাত্র ছ'মাস হইল তো আমাদের বিবাহ হইয়াছে! পূজার ছুটিটি আর অপব্যয় না করিয়া নিরুর সঙ্গে একমাস পুরা কাটাইব স্থির করিয়াছি।

চোখে ঘুম আসিতেছিল।

নিরু হঠাৎ উঠিয়া বলিল—ওকি এরি মধ্যে ঘুম, বাঃ। আজ না বলেছিলে আমরা জেগে কাটাব ?—এই বুঝি তোমার জাগা হচ্ছে ? দাড়াও দেখাচ্ছি ঘুমোনো।

বলিলাম—দোহাই লক্ষীটি—আজকের মত আমাকে রেহাই দাও—এখন থেকে পুরো একমাস তোমার হাতে। তখন হার মেস্কেষ্টি যা' আদেশ করবেন তাই করব ;—এখন ক্ষমাং দেহি—

কথাগুলি চোক বুজিয়া বলিতেছিলাম। ইতিমধ্যে কখন যে নিরু আমার মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া মজা দেখাইতে উঠিয়াছে জানিতে পারি নাই।

হঠাৎ ঠেলিয়া দিয়া বলিল—ইঃ কি গন্ধ মুখে বাপ্ !··· চুরুটের গন্ধে আমার বমি আসে সত্যি। চুরুট না খেলে নয় !···আমার কাকা তো এখনো একটা নেশাও করেননি ; —সাবান দিয়ে মুখ না ধুলে তোমাকে আর—

বলিলাম—জানো না তো এই চুরুট খেতে কত কষ্ট পেতে হয়েছে ! অনেক লাঠি খেয়েছি এই চুরুট খাওয়া প্র্যাকটিশ্ করতে। শোন তবে, বাবা তো ওপরে জামা রেখে আপিসে যাবার আগে নীচেয় খেতে বস্‌তেন—আমি সেই ফাঁকে বাবার পকেট থেকে মণি ব্যাগ খুলে পয়সা চুরি করতুম। তারপর আমাদের দলের চুরুট খাওয়া শেখানোর গুরু গিরীশকে সেই পয়সা দিতুম গিয়ে ; গিরীশ বলেছিল এক হপ্তার মধ্যে যদি সে আমাকে নাক দিয়ে ধেঁায়া ছাড়া না শেখাতে পারে তা' হ'লে সে চুরুট খাওয়া একেবারে ছেড়ে দেবে। তবে তা'র জন্যে খরচ করতে কুণ্ঠা বোধ করলে চল্‌বে না ! তাই বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি রোজ চলতে লাগলো।

নিরু বলিল—ক'দিন এই রকম চল্‌লো ?

বলিলাম—এ কি আর এক দিনের কাজ ; সাধনার দরকার ! দু'তিন মাস এমনিই গেল। ইস্কুল পালিয়ে যেতুম গঙ্গার ধারে এক সাধুর আড্ডা আছে সেইখানে। আবার চারটে বাজলে সোজা বাড়ী ! এমনি করে রইলুম তিনটে বছর পড়ে' থার্ডক্লাশে !···

নিরু হাসিয়া উঠিল—বাঃ খুব মনোযোগী ছাত্র ছিলে তো !···ইস্কুলের মাষ্টাররা তোমার কদর বুঝলে না আর কি !...আর তোমাদের গিরীশ ?

সে তো জীবনে ফোর্থ্ ক্লাশের চৌকাট্ আর ডিঙোতেই পারলে না ;—তা' না পারুক সমস্ত ইস্কুলের ছেলেদের ছিল সে নেতা গোছের ; কোন ছেলের ফাইন্ হয়েছে, ডাক্

গিরীশকে ; কোথায় কোন ছেলে মাইনে দিতে পারছেনা ডাক্ গিরীশকে : হেড মাষ্টার কা'কে বেত মেরেছে, ডাক্ গিরীশকে !···গিরীশ আমাদের চেয়ে বছর চারেকের বড়ো—চোয়াড়ে চেহারা খানা ; তা হোক্—আমায় কিন্তু খুব ভালো বাসতো !

নিরু কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল – আমার চেয়েও বেশী ?

বলিলাম—ঘোড়ার ডিম, তোমার আবার ভালোবাসা নাকি ? আমার লেখা গল্প তুমি পড় না ; যা' লিখি সবই তোমার কাছে 'কিস্যু' নয়। আমি কতবার তোমায় বলেছি তোমার কাকা 'দীপাশ্রিতা'র সম্পাদক, তা'কে বলে' আমার লেখাগুলো সেই কাগজে ছাপিয়ে দাও—তা'তো আর এ পর্য্যন্ত দিলেনা—এই তো তোমার ভালোবাসা ! আর গিরীশ আমার জন্যে হেড মাষ্টারের কাছে দশ ঘা বেত খেয়েছিল—জানো ?

নিরুর দিকে চাহিয়া দেখি কাপড়ে মুখ গুজিয়া রহিয়াছে। রাগ করিল নাকি ? ওর তো কথায় কথায় রাগ করা অভ্যাস আছে। উঠিলাম। ট্রেন হু হু গতিতে চলিয়াছে ; বাহিরে কেবল জমাট অন্ধকার। কাছের গাছপালাগুলি ঘন ঘন উল্টাদিকে বোঁ বোঁ করিয়া সরিয়া যাইতেছে। দূরে দু'একটা আলো জ্বলে আবার নেবে ! কালো মিশ্‌মিশে উঁচু ঢিপির মত ছোট ছোট পাহাড়ের রেঞ্জ চলিয়া গেছে। আকাশে চাঁদ নাই—কৃষ্ণ পক্ষ কি না !

এমন সময়ে এই অবস্থা বেশ লাগে !

কাছে গিয়া নিরুর ঘাড় ধরিয়া তুলিতে পারিলাম না। না, রাগই করিয়াছে বটে ! কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলাম—লক্ষ্মীটি, তুমি আমায় কত ভালোবাসো সে কি আর জানি না ? ওটা বললুম ও একটা কথার কথা ! যেবার সেই 'বাস' থেকে পড়ে' গিয়ে আমার দু'টো হাতে চোট্ লাগে, সেবার তুমি আমায় নিজের হাত দিয়ে খাইয়ে দিতে—সে কি আর মনে নাই ?—আর সেই একবার কবিতা লিখতে লিখতে আঙুলে কলমের নিব্ ফুটে গিয়েছিল তুমি কত যত্ন করে' ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে দিতে—সে কথা কি ভুলে গেছি !··· আমার মেমরি কি অত ডাল্ ! যাক্‌গে গিরীশের কথা আর কখনো বলবো না—স্কাউণ্ড্রেলটা আমায় কম কষ্ট দিয়েছে ?

এইবার নিরু উঠিয়া বসিল। রাগ পড়িয়াছে বোধ হয় !

বলিল—তুমি যে এক্ষুণি বলছিলে আমার কাকার কাগজে তোমার গল্প ছাপতে দিই নি—সে কি করে' দিই বল ! কিছু লেখবার ক্ষমতা নেই, শুধু লেখক হবার সাধ আছে তোমার। কাকা বলে—তোমরা না পড়েই বিদ্বান হ'তে চাও ; অভিমন্যু যেমন পেটের ভেতরে থাকতেই যুদ্ধ করতে শিখেছিল—তোমরাও দু'একখানা বাঙলা উপন্যাস পড়ে' তেমনি নামজাদা হ'তে ইচ্ছে কর—তা' কি হয় ? কাকার কাছে ও রকম লেখা আমি ছাপিয়ে দিতে বলতে পারব না কখ্‌খনও !

বলিলাম—না পারো ভাল কথা—আমিও ছাই গল্প লেখা ছেড়ে দেবো। ও সব কি আমার দ্বারা হয় ? এবার ফোটো-শিল্পী হব। তা' হ'লে কিন্তু কাকার কাগজে সেই ফোটো ছাপিয়ে দিতে হবে। নীচে থাকবে আমার নাম ; পারবে তো ?

নিরু বলিল—তা' পারবো ! ওকি ! অত কাছে সরে' আসছ যে ?···খেয়ে ফেল্‌বে নাকি !···ওই দেখ—একটা ষ্টেশন এল বুঝি !.. যাও সরে' বোস, লোকে কি বলবে ?

কি একটা ষ্টেশন ! লোকজন নামা-ওঠার গোলমাল আরম্ভ হইল। ফেরিওয়ালার চীৎকার ; একটা ভিখারি আসিয়া জানালার নীচে দাড়াইল।...চারিদিকে সঙ্গতির একান্ত অভাব যেন।

কে একজন প্যাসেঞ্জার চীৎকার করিয়া কাহাকে বলিল —নরু দা' শিগ্‌গির এসো—ছেড়ে দিলে গাড়ী, সময় নেই ! ··

নিরু বলিল—দেখ দেখ গলাটা যেন ঠিক আমার কাকার মতন, না ?···অবিকল ! এখানে আর কাকা আসবে কোথায় বল—কিন্তু কথার ধাঁজও একরকম।—দু'জনের এক রকম গলা কখনও দেখেছ—হ্যাঁ ?

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

নিরুর কথার উত্তরে বলিলাম – খুব দেখেছি ! আমার আর গিরীশের গলা ছিল অবিকল এক ! গিরীশ যদি টেলিফোনে আমার হ'য়ে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তো—তুমি একটুও ধরতে পারতে না। হয়ত তা'রই সঙ্গে তুমি প্রেমালাপ করতে বসে যেতে—কি মজা হোত—তা' হ'লে—

নিরু বলিল—হ্যাঁ, আমি তোমার মত বোকা কি না। মেয়েমানুষরা আর যাই হোক—পুরুষদের মতো বোকা নয়।

বলিলাম—তবে শোন, একদিন ক্লাসে মাষ্টার আসতে দেরি হয়েছে—পেছনের বেঞ্চিতে বসে' খুব চেঁচিয়ে গান ধরেছি। লাইব্রেরী থেকে হেড্ মাষ্টার শুনেই খানিক পরে গিরীশকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গিরীশ গেল।

হেড্ মাষ্টার হাতে বেত নিয়ে বসে' ছিলেন। গিরীশ যেতেই প্রশ্ন করলেন—তুমি ক্লাশে গান গাইছিলে?

গিরীশ বললে—আজ্ঞে না সার—আমি গানই জানিনা—গাইব কি! আমাদের বাড়ীর বংশের কেউ গান জানে না।

হেড্ মাষ্টার রাগে লাল হ'য়ে উঠ্‌লেন। আর কোনও রকম উচ্চবাচ্য না করে' সপাং সপাং করে' নাগাড়ে হাতের পাতায় পাঁচ ঘা বেত মারলেন। তারপর আবার বললেন—তুমি গান গেয়েছিলে?

— আজ্ঞে না সার।

—তবে কে গেয়েছিলো বল।

গিরীশ জানতো আমিই ক্লাশে গান গেয়েছিলুম। কিন্তু আমায় খুব ভালোবাসত কি না তাই বললে—কে গেয়েছে আমি জানি না।

মিথ্যা বলার দরুণ হেড মাষ্টার তার হাতে আরও পাঁচ ঘা মেরে ক্লাশে সমস্তক্ষণ দাড়িয়ে থাকার শাস্তি দিলেন। হাত দিয়ে তার রক্ত পড়ছিল;—তা পড়ুক, সেদিন বাবার পকেট থেকে দু'আনা পয়সা এনেছিলুম;—সাধুর আড্ডায় মজাসে সকলে মিলে চুরুট খাওয়া গেল। হেড্ মাষ্টার তো আর জানতেন না যে আমাদের দু'জনের গলাই এক। তিনি গিরীশের গলা চিন্‌তেন। তাই গান শুনে মনে করেছেন—এ গিরীশের গলা না হ'য়ে যায় না। ভাগ্যিস্ সেদিন গিরীশ ছিল তাই বেঁচে গেলুম—নইলে—

নিরু বাধা দিয়া বলিল—আচ্ছা, এখন তোমাদের গিরীশ কোথায়? তোমার বন্ধুরা তো সকলেই কবি দেখতে পাই—কেউ সুশোভন সেন, কেউ ছলনা রায়—এই রকম গিরীশ বলে' তো কেউ নেই।

বলিলাম—সে অনেক দিন হোল পালিয়েছে। সে কি আর থাকবার ছেলে? সব ছেড়ে একদিন হঠাৎ উধাও হ'য়ে গেল। কোথায় আছে কেউ জানে না, আমিও না।

দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। নিরু পত্রিকার পাতায় চোখ দিয়া রহিয়াছে; পড়িতেছে কি না ওই জানে। ওর চোখে আজ ঘুম নাই। আমারও চোখ হইতে ঘুম কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! ছোটবেলার কথা বলিতে বলিতে অনেক কথাই মনে হইতে লাগিল। বাবার সম্পত্তি ছিল বলিয়াই লেখাপড়া না শিখিয়াও আজ রাজার হালে আছি—আর গিরীশ? আমাকে কতই না ভালবাসিত! আপন ভাইকেও বোধ হয় অতটা কেহ ভালবাসে না।

বাহিরে অনন্ত আঁধার। গাড়ী তেমনি সমান তালে চলিয়াছে! ভিতরে আমরা দু'টি প্রাণী যাহার কথা আলোচনা করিতেছি সে আজ বাঁচিয়া আছে কি না কে জানে! সেই চঞ্চল প্রাণটি কোথায় গিয়া আজ পরিণতি লাভ করিয়াছে—দেখিতে ইচ্ছা হয়।

পৃথিবীর কাছে সে এক মস্ত ভুল করিয়াছিল। হ্যাঁ ভুলই তো।—দোষ নয়। পৃথিবী তাহার সে ভুলের কত বড় প্রতিশোধ লইল—কি মোটেই লইল না—তাই দেখিতে আজ মন আকুল হইয়া ওঠে।...কিন্তু যাক্—সে কথা ভাবিতে গেলে এখনও যেন চোখে জল আসে!······

নিরু হো হো করিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল! হাসির গল্প পড়িতেছে বোধ হয়; পরশুরামের লেখা নিশ্চয়ই। আমরাও ওরকম কত হাসিয়াছি, হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়িভুঁড়ি তাল গোল পাকাইয়া গিয়াছে!

হাসি থামিলে নিরু বলিল—বেশ লিখেছে দেখ, একটা সমিতির নাম দিয়েচে—'সুবুদ্ধি প্রচারিণী সভা'! বাঙালীদের আর কাজ নেই তো, যা' তা' একটা সভা করলেই হোল। রবিঠাকুরের 'চিরকুমার সভা' অমৃত বোসের 'চাদর নিবারণী সভা', শেষকালে কোন্‌দিন 'সন্তান নিবারণী সভা' হবে দেখছি!·····

বলিলাম——কত সভা আছে ও রকম। আমরাই তো ছোটবেলায় এক 'বিধবা-বিবাহ-প্রচার-সমিতি' খুলেছিলুম। এখন মনে করলে হাসি পায়!

নিরু বলিল—তুমি যা বিধবা বিয়ে করতে তা' আমার জানা আছে।—সমিতির কাজ বোধহয় কিছু হয়নি—ওই পর্য্যন্ত। না কিছু হয়েছিল ?

বলিলাম—যেখানে গিরীশ প্রেসিডেণ্ট সেখানে কিছু কাজ হবে না ? কি বল ? গিরীশই তো সভার প্রতিষ্ঠাতা !

নিরু বলিল—তোমাদের গিরীশ দেখছি সব দিকে আছে ! নিজে কোনও দিন বিয়ে থা' করেছিল না কি ? শুধু ওই মুখে মুখে সব !

বলিলাম—সে যখন প্রেসিডেণ্ট তখন যদি বিধবা বিয়ে না করে—তো আর লোকে শুনবে কেন ? চারদিকে অনুসন্ধান চল্‌লো। খোঁজ পাওয়া গেল অনেক দূরে এক গ্রামে একজনের এক অন্ধ বিধবা মেয়ে আছে—

নিরু বিস্মিত হইয়া বলিল—অন্ধ ? বল কি ? দু'চোখে দেখতে পায় না ? কে তা'কে বিয়ে করলে ?

অনেক দিনের পুরোণ ঘটনা আবার আজ নিরুর সামনে আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলাম।

"বিয়ে তো করলে গিরীশ, কিন্তু আর বাড়ীতে ত'ার স্থান হোলনা। বাপ বললেন—যেখানে ইচ্ছে যা, এ বাড়ীতে আর ঢুকতে পাবিনি।

অগত্যা সকলে মিলে পরামর্শ হোল ; সমিতির যে কিছু চাঁদা জমা ছিল তাই দিয়ে ঘর ভাড়া করে' সেইখানে দু'জনে থাকতে লাগলো। কিন্তু থাবে কি ? বউ তো অন্ধ কাজ করবার এতটুকু শক্তি নেই ; তা'কে দেখবার জন্যেই বরং একজন ঝিএর দরকার। খরচ দেবে কে ?

এদিকে যা'রা ছিল সমিতির সভ্য—একে একে সকলের গার্জ্জেনরাই এই ব্যাপারটা জেনে গেলেন। প্রথমে যৌবনের নতুন উত্তেজনায় যে দিকটা নজরে পড়েনি—গিরীশের এই দুরবস্থায় পড়াতে তা'দের যেন চোখ ফুটলো। একে একে সবাই সরে' দাঁড়ালো—রইলুম কেবল আমি শেষ পর্য্যন্ত টিকে !

ভেবে দেখো তখন গিরীশের অবস্থাটা ! যখন আমি ওর বাড়ীতে যেতুম ও আপন মনে কি সব বলে' যেত বুঝতুম না।

তখন হাতে একটু একটু পয়সা আসছে ; বাবার কারবারে বসি—তাই যা' কিছু পেতুম সব দিতুম ওর কাছে !

কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো গিরীশ যেন পাগলের মত হ'য়ে যাচ্ছিলো। চেহারা বরাবরই চোয়াড়ে—তার ওপর না খেয়ে না দেয়ে যা' শরীর হয়েছিল—দেখতে আমার ভয় হোত। পিঠটা যেমন ধনুকের মত—তেমনি পেটটা হয়েছিল যেন একটা বেয়ালা !

কথায় কথায় বোকতো বৌদিকে ! যেন সব দোষ তা'রই। কিন্তু কোনদিন তা'র মুখে কথা শুনতে পাই নি। বিছানার উপর রোজ সেই একভাবে থাকতো বসে'—আর রাত হ'লেই গড়িয়ে পড়তো।

বৌদির চেহারা ছিল অতি কুশ্রী ! প্রথম একটা উত্তেজনার বশে গিরীশ ওকে বিয়ে করেছিলো বটে—কিন্তু ক্রমে যেন ওর বিতৃষ্ণা আসতে লাগলো। ইচ্ছে করলে যে সুখে থাকতে পারতো - তা'র এ দুর্ম্মতি কেন ?

গিরীশকে দেখলে সত্যি আমার দুঃখু হোত ! বাড়ীর আত্মীয় স্বজন যা'কে তাড়িয়ে দিলে—আমি ছাড়া সমাজের আর কেউ যা'কে বেঁচে থাকতে সাহায্য করলে না—তা'র জীবন বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি ?

ক্রমে ক্রমে গিরীশ বুঝতে পারলে কত বড় ভুল সে করেছে ! যশের মোহ ওর প্রাণের বিচারশক্তিকে কাণা করে' রেখেছিল—বৃহত্তর বস্তুর লোভে হৃদয়ের ছোট সূক্ষ্ম অনুভূতি আর চেতনাকে ও মুখচাপা দিয়েছিল—তাই যেটা ছিল মস্ত বড় ধর্ম্ম সেটা হ'য়ে গেল ট্র্যাজিডির স্রষ্টা ! যেন ভেল্কির খেলায় এক মুঠো সোনা এক মুঠো ধুলোয় পরিণত হোল।

কিন্তু কি করবে বেচারী ! নিজে ইচ্ছে করে' পুড়ে যেমন কষ্ট পায়—তেমনি গিরীশ সে কষ্ট আপন মনে ভোগ করতে লাগলো ; কারো কাছে অভিযোগ করার কিছু নেই—অনুগ্রহ চাইবার উপায় নেই।—এমনি দারুণ সে কষ্ট।

বৌদিকে দেখে মনে হোত সে যেন সহনশক্তির প্রতীক ! সেই মুখটি বুঝে একভাবে বিছানায় বসে থাকা সমস্ত দিন ধরে'—স্বামীর গালাগালিতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করা—সে যেন একমাত্র ওই মেয়েটিতেই সম্ভব !

শেষে হঠাৎ একদিন শুনলুম গিরীশ পালিয়েচে—কোথায় পালিয়েচে কেউ জানে না ;—ওই যন্ত্রণা থেকে যা' একমাত্র উপায় খোলা ছিল তাই অনুসরণ করেছে !···মনে হোল

যাক্—গিরীশ মুক্ত হোল···বিধাতা যদি থাকেই—তা' হ'লে' তা'র কাছে যা' জবাব দিতে হয় হোক্—মানুষের কাছে আজ ও স্বাধীন হোলত"।

গল্প শেষ হইল।

নিরুর দিকে চাহিয়া দেখি তাহার চোখে তখনও বিস্ময়-ভাবে কাটে নাই। কথা শেষ হইতেই সঙ্গে সঙ্গে বলিল—পালিয়ে গেল?

বলিলাম—না পালিয়ে আর করবে কি? দু'জন মরা'র চাইতে একজন মরা ভাল। আমি হ'লে তো তাই করতুম।

নিরু বলিল—তুমি সব করতে পারো। আজ যদি বসন্ত হ'য়ে আমার রঙ কালো হ'য়ে যায়—চোক অন্ধ হ'য়ে যায়, তুমি তা হ'লে আমায় গুলি করে' মারবে। সে আমি জানি; আমার কাকা ওই জন্যে বিয়েই করেনি—পাছে মেয়েমানুষদের ওপর অবিচার করে ফেলে, তাই—

বলিলাম—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার কাকা সৎ, তোমার কাকা সাধু, তোমার কাকা ধার্ম্মিক, সুপুরুষ, তোমার কাকার সব ভালো যদি আমার ফোটো গুলো "দীপাশ্রিতায়" ছাপিয়ে দেয়—বুঝলে?

নিরু বলিল—বেশ করবো আমার কাকার প্রশংসা করব। হাজারবার কাকার কথা কইবো। কাকা থাকলেই লোকে বলে। তোমার যদি কাকা থাকতো তুমি তা'র কথা পাঁচশোবার বললেও আমি কিছু বলতুম না;—মুখ আছে তাই বলছি—বোবা তো নই!

বলিতে যাইতেছিলাম—তা' হ'লে পদ্যপাঠ তো তোমার মুখস্থ আছে—যখন মুখ আছে আর তুমি বোবা নও—তখন আরম্ভ করে' দাও না গড় গড় করে'···

কিন্তু হঠাৎ মাঠের মধ্যে গাড়ী থামিয়া যাইতে বাধা পড়িল। হঠাৎ এই থামিবার কারণ অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইতেই দেখি অন্যান্য কামরা হইতেও যাত্রীরা ইঞ্জিনের দিকে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সকলের দৃষ্টিরই অর্থ—কী হোল মশাই?

কিছু দেখিবার উপায় নাই। অন্ধকার ঘুরঘুটি। অপ্রান্ত ঝিঁ ঝির শব্দ, উপরন্তু এঞ্জিনের কোঁসফোঁসানি—রুদ্ধ বেদনার অভিব্যক্তির মতই শোনাইতে লাগিল।

নিরু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হোল গো, মানুষ চাপা পড়লো বুঝি?

জানালা হইতে মুখ টানিয়া আনিয়া বলিলাম—না, সে সব কিছু নয়—ব্রিজ্ রিপেয়ার হচ্ছে হয়তো—তাই থামলো—এইটুকুন আস্তে আস্তে যাবে।

খানিক পরেই গাড়ী আবার মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল।···ঝিক্ ঝিক্ ঝক ঝক্—তারপর ঝিকির্ ঝিকির্ ঝকর্ ঝকর্···

নিরু জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, মানুষকে মরতে তুমি সামনে নিজের চোকে দেখেছ? আমি কিন্তু দেখিনি—মরবার সময় মানুষের কি রকম হয় বড় দেখতে ইচ্ছে করে···আমি একবার রেল লাইনের ওপর কাটা মানুষ পড়ে' থাকতে দেখেছিলুম। ...যা' ভয় করে! - তুমি মরা দেখেছ?

বলিলাম—একবার দেখেছি—কিন্তু সে কথা এখন থাক্, তুমি মাঝে মাঝে এমন পিকিউলিয়ার প্রশ্ন করো···

নিরু বলিল—না না বল না, কি দেখেছিলে?

নাছোড়বান্দা! বলিলাম সে কথা এখন থাক—শুনে মন খারাপ হ'বে—অন্য দিন বরং শুনো। গিরীশের কথা আর বলতে ভালো লাগছে না।

কিন্তু নিরু ওজর আপত্তি শোনে না; অগত্যা একটা চুরুট ধরাইয়া আরম্ভ করিয়া দিলাম:—

"গিরীশ পালিয়ে গেল সে তো তোমায় বলেছি। কিন্তু প্রথমে আমি জানতে পারিনি। নিজের কাজে কিছুদিন ব্যস্ত ছিলুম;—একদিন বিকেল বেলা গেলুন ওদের বাড়ীতে; কিন্তু দেখি সাড়া শব্দ কিছু নেই। বাড়ীওয়ালার কাছে শুনলুম—গিরীশ আজ ক'দিন হোল বাড়ীতে আসেনি; কোথায় গেছে কাউকে বলে' যায়নি। তখুনি বুঝলাম তা'র আসার আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

আহা বেচারী! কি করবে সে! তা'র কি দোষ!

বাড়ীর ভেতর ঢুকে যে ঘরে বৌদি থাকতো সেই ঘরে গেলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে বো'দি বলে' উঠলো—কে?

উত্তর দিলাম—আমি।

হটাৎ বৌদি যেন উঠে বসবার চেষ্টা করলে। মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো, যেন বিশ্বাস হয় না এমনি ভাবে বললে—

চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছি। এই ষোলো-সতেরো বছর যাবৎ রবীন্দ্রনাথের ছন্দের চর্চ্চা ক'রে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, শুধু বাংলা দেশে নয়, কোনো দেশে কোনো কালে তাঁর চেয়ে বেশি সহজ ছন্দ-বোধসম্পন্ন কবি জন্মেছেন কি না সন্দেহ। আর বাংলা দেশে শুধু আমি নয়, সমগ্র বাঙালী কবিসমাজই তাঁকে একমাত্র ছন্দের গুরু ব'লে স্বীকার ক'রেছে এবং তাঁর কাছেই ছন্দের দীক্ষা নিয়েছে। আজ বাংলা দেশের কাব্যসাহিত্যে যে অজস্র ছন্দের ব্যবহার চল্‌ছে তার সমস্তগুলিই রবীন্দ্রনাথের রচিত, না-হয় তাঁর দ্বারা পরিমার্জ্জিত। বাংলা কাব্যে প্রচলিত অসংখ্য ছন্দের মধ্যে এমন একটি ছন্দও আছে কিনা সন্দেহ যা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে উজ্জ্বল না হয়েছে। প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগের এমন একটি ছন্দও নেই যা তাঁর স্বাভাবিক ছন্দ-প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে নবতর ও বিচিত্র রূপ ধারণ না করেছে। অল্প বয়স থেকে বাংলা কাব্যের যে ছন্দ-শাস্ত্র গ'ড়ে তোলার বাসনা পোষণ করছি, সে তো এই রবীন্দ্রনাথের ছন্দ অবলম্বন ক'রেই। ন' বছর আগে 'প্রবাসী'তে (১৩২৯, পৌষ—চৈত্র; ১৩৩০, বৈশাখ) বাংলা ছন্দ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলুম; তার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে পরোক্ষে ও সাক্ষাতে যে সস্নেহ প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছিলুম তাকেই আমার সাধনার শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার ব'লে গ্রহণ করেছি। আজ সেই রবীন্দ্রনাথেরই ছন্দ-রচনার 'ফাঁকি' ও 'চাতুরী' আবিষ্কার করেছি—তাঁরই মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উপলক্ষ্য হয়েছি, এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিই আমাকে এমন নিরতিশয় ভাবে লজ্জিত করেছে।

আমার কথা আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পারি নি, এই অক্ষমতার জন্য আজ তাঁর কাছে যে তিরস্কার লাভ করলুম তা সত্ত্বেও তাঁর ছন্দ-প্রতিভার প্রতি আমার বিস্ময়-মুগ্ধ শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণই রয়েছে। যে-কারণে একান্ত ভাবে তিরস্কৃত হ'য়েও একলব্যের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ব্যাহত হয় নি, সেই কারণেই তাঁর প্রতি আমার নিষ্ঠা রেখামাত্রও বিচলিত হয় নি।

এত জোরের সঙ্গে কথা বল্‌ছি এই জন্য যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আমি রবীন্দ্রনাথের ছন্দের (তথা বাংলা ছন্দের) তত্ত্বটি ভুল বুঝি নি। বাজারে রবীন্দ্রনাথের যে ক'খানি কাব্য প্রচলিত আছে, অন্তত' ছন্দের তরফ থেকে সে ক'খানি আমি অধিগত করেছি তো বটেই; রবীন্দ্রনাথের উদীয়মান ছন্দ-প্রতিভার অভিব্যক্তির ধারাটি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে কবির বাল্যরচনা "বনফুল", "কবি-কাহিনী" প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির ছন্দ-বিচারও আমাকে করতে হয়েছে। নদীর উৎপত্তি-স্থানের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রবাণীহির আদি ধারাগুলিও আধুনিকদের পক্ষে দুরধিগম্য। কিন্তু তাঁর ছন্দের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি আবিষ্কারের চেষ্টায় ওই দুর্গম স্থানেও বিচরণ করতে হয়েছে। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ইতিহাস ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি বই প্রকাশ করবার অভিপ্রায় পোষণ করছি। এই উপলক্ষেই ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দের উপর তাঁর যা-কিছু রচনা আছে সে-সমস্তও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আমাকে বুঝ্‌তে হয়েছে। তাই বল্‌ছি তাঁর ছন্দের তত্ত্ব বুঝ্‌তে পারি নি, এ কথা আমার মোটেই মনে হয় না। আমার এ ধারণা ভ্রান্ত কি না, তার বিচার আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত ছন্দের প্রবন্ধগুলি, সদ্যপ্রকাশিত দু'টি রচনা (বিচিত্রা—পৌষ: "বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান"—জয়ন্তী-উৎসর্গ) এবং অচির-প্রকাশিতব্য কয়েকটি রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই করবেন।

রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান আলোচ্য প্রবন্ধটিও আমার কাছে একটুও দুর্বোধ্য হয় নি। বার বার প'ড়ে মনে হ'ল তিনি যা বল্‌তে চান তার সমস্তই আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি। কারণ, তাঁর পূর্ব্ব-প্রকাশিত ছন্দ ও শব্দতত্ত্বের প্রবন্ধ থেকে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনায় বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর যে মতবাদ আমার জানা আছে, তার সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের মতামতের কিছুমাত্র বিরোধ নেই।

কিন্তু তথাপি, তাঁর এই প্রবন্ধের মন্তব্যগুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা সত্ত্বেও, আমাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রায় আমি যে-সমস্ত কথা বল্‌তে চেয়েছি অথচ সম্ভবত' বোঝাতে পারি নি সে-সম্বন্ধে আমার মতামত বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা এখনও বোধ করি নি। কিন্তু আমার কথা আমি তাঁকে বোঝাতে পারিনি সেই অক্ষমতার জন্যই পরম দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের অবতারণা করতে হ'ল। কারণ, আমার

কথা যদি আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পারি তবে তিনি বিনা আপত্তিতে সানন্দে আমার কথা স্বীকার কর্‌বেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার কথা তাঁকে বোঝানো চাই-ই। কেননা, অন্যান্য বিদ্বজ্জনের কথা ছেড়ে দিয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পরিতোষ লাভ না কর্‌বেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার এই প্রয়োগ-বিজ্ঞানকে সাধু ব'লে মনে করব না। আমি জানি, আমার বক্তব্য বিষয়টিকে যদি তিনি সত্য ব'লে গ্রহণ করেন তাহ'লে সে সত্য সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহের অবকাশও থাক্‌বে না। তা ছাড়া এতদিন তাঁর কাছ থেকে ছন্দের যে অজস্র দান গ্রহণ করেছি, যদি আমি তাঁর সে-সব ছন্দের ভিতরকার আসল তত্ত্বগুলিকে আবিষ্কার কর্‌তে পেরে থাকি তবে তাই হবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতিদান। আশা করি, তিনি প্রসন্নচিত্তে আমার সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর্‌বেন।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রবন্ধটিতে সমস্ত বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে নয়, কেবলমাত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র কথার আলোচনা করেছিলুম। আমার বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস খুব দৃঢ় ব'লেই কয়েকটি বিষয়ের উপর ইচ্ছে ক'রেই খুব জোর দিয়েছিলুম। মনে ধারণা ছিল তাহ'লেই ওবিষয়ে কবিদের, বিশেষত' রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। আর তার ফলেই আলোচনার সূত্রপাত হবে ও সে কথাগুলির যথার্থ মূল্য নিরূপিত হবে; আর আমি যদি সত্যই কোথাও ভুল ক'রে থাকি তা সংশোধন ক'রে নেবার সুযোগও আমি পাব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফল হয়েছে তার ঠিক্ উল্টো। কারণ, আমার সেই জোর-দিয়ে বলা কথাগুলোকে রবীন্দ্রনাথ খোঁচা বা ভৎর্সনা ব'লে ধ'রে নিয়েছেন; অথচ আমার আসল বক্তব্যটিই র'য়ে গেল অনালোচিত।

ওই প্রবন্ধটিতে বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমার একটি নালিশ ছিল, সে-কথা সত্য। কিন্তু সে-নালিশ তাঁর বিরুদ্ধে কিংবা আধুনিক বাঙালী কবিদের বিরুদ্ধে নয়; সে-নালিশটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কয়েকটি বিশেষ ব্যবহারের বিরুদ্ধে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নালিশের বিষয়টি আমি ভালো করে' বোঝাতে পারি নি। ভালো বোঝা যে যায় নি, এখন মনে হচ্ছে তার কিছু কারণও আছে। প্রথমত', ন' বছর আগে প্রবাসীতে ছন্দ সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছিলুম সেগুলি পাঠকের জানা আছে ধ'রে নিয়েই নতুন আলোচনাটির উত্থাপন করেছিলুম, নতুবা পুরাতন কথার পুনরুত্থাপন কর্‌তে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বড় হ'য়ে পড়ার ভয় ছিল। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একখানি বই লেখায় হাত দিয়েছি। ওই প্রবন্ধটি তারই একটি অধ্যায়, কিন্তু প্রথম অধ্যায় নয়। সবগুলি প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল না। তাই বেছে এমন একটি অধ্যায় ছাপ্‌তে দিয়েছিলুম যাতে তর্ক বা আলোচনা ওঠার সম্ভাবনা ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, আলোচনায় যদি আরও কোনো তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তা আমার পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতে পার্‌ব। কিন্তু মাঝখান থেকে একটি অধ্যায় প্রকাশের ফল এই হয়েছে, আমি যে নির্দ্দিষ্ট অর্থে সংজ্ঞা বা পরিভাষার ব্যবহার করেছি পাঠকের নিকট সেই নির্দ্দিষ্ট অর্থটি অজ্ঞাত থাকায় মূল বিষয় নিয়েই বিভ্রাট ঘটেছে।

কিন্তু পরিভাষার কথা বলার পূর্ব্বে আরেকটি মৌলিক বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথমে হয় সৃষ্টি, বিজ্ঞান আসে তার পরে; ঠিক্ তেম্‌নি প্রথমে ভাষা, পরে ব্যাকরণ; আগে কাব্য, পরে ছন্দ-শাস্ত্র। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক, এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে এত বিচিত্র ও অজস্র ছন্দ দান করেছেন যে তার ফলেই এখন একটা ছন্দ-শাস্ত্র গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ কর্‌ছি, এটাও তাঁর পক্ষে গৌরবেরই কথা। যাহোক্, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ম আবিষ্কার করা, যে-নিয়ম মেনে চ'লে নিত্য নূতন সৃষ্টির কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায়; সে-নিয়ম কখনও সৃষ্টির পথরোধ ক'রে দাঁড়ায় না। ভাষাসৃষ্টি হয় স্বভাবের প্রবর্ত্তনায়, ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে তার অন্তরে যে-সমস্ত রীতি সক্রিয় আছে তাকে প্রকাশিত করা, পীড়িত করা নয়। কবি আপনার সহজ আনন্দবোধের দ্বারা চালিত হ'য়েই ছন্দ রচনা করেন; ছন্দ-শাস্ত্রের কাজ হচ্ছে কবি স্বভাবতই যে-সব নিয়ম মেনে চলেন সেগুলিকে আবিষ্কৃত ক'রে সুশৃঙ্খল রূপে তাদের সাজিয়ে দেওয়া। কবির শ্রুতিরসবোধের

প্রেরণাকে নিরন্তর অবদমন করাই কখনও ছন্দ-শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। কবি আনন্দ-পিপাসু অন্তরের চিরাভ্যস্ত প্রেরণায়ই ছন্দ-রচনা করেন, একথায় কেউ কখনও সন্দেহ করে নি। কিন্তু কবিদের সেই স্বচ্ছন্দ-রচিত ছন্দের মধ্যে কোনো নিয়ম নেই, এ কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না। যা ইচ্ছে তা-ই লিখ্‌লেই ছন্দ হয় না; শ্রুতিরসবোধের যে-সমস্ত নিয়ম আছে ছন্দ-রচনা করতে গেলে জ্ঞাতসারেই হোক্ অজ্ঞাতসারেই হোক্ স্বাভাবিক আনন্দের প্রেরণাতেই সেগুলিকে মেনে চল্‌তে হয়। কোনো একটি বিশেষ নিয়মের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক তর্ক চল্‌তে পারে; কিন্তু সমস্ত ছন্দের অন্তরেই একটা-না-একটা নিয়ম যে থাক্‌বেই, এ বিষয়ে একেবারেই তর্ক চল্‌তে পারে না। একথা রবীন্দ্রনাথই সব চেয়ে বেশি ক'রে জানেন। অথচ তিনি নিয়মমাত্রেরই বিরুদ্ধে এতটা বিমুখ কেন হলেন তা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। এক জায়গায় তিনি বলছেন, "যদি লেখা যেত—

সথাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়

তাহ'লে নিয়ম বাঁচ্‌ত—"; কিন্তু ছন্দ বাঁচ্‌ত না। কোনো রচনায় ছন্দের নিয়ম ঠিক্ আছে, অথচ ছন্দ ঠিক্ নেই—এরকম উক্তির অর্থ বুঝ্‌তে গেলে সত্যই ধাঁধা লাগে। উদ্ধৃত লাইনটিতে যদি ছন্দের নিয়ম বেঁচে থাকে তবে ছন্দও ঠিক্ আছে, আর যদি ছন্দ ঠিক্ না থাকে তবে নিয়মও বাঁচে নি। এখানে যে ছন্দ ঠিক্ নেই এ বিষয়ে আমি কবির সঙ্গে একমত; কিন্তু নিয়ম বেঁচেছে, একথা যে তিনি কেন বল্‌লেন তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি। অন্তত' এমন কোনো নিয়মের কথা আমি জানিনে, একথা আমি অসঙ্কোচে বল্‌তে পারি।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-প্রবন্ধে তিনি নিয়মের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ এনেছেন সে-প্রবন্ধেই তিনি বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব তথা ছন্দের দুয়েকটি অতি-প্রয়োজনীয় নিয়মের কথাই বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। প্রথমত' এক স্থানে তিনি বল্‌ছেন, "বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় **নিয়ম** আছে। সে হচ্ছে বাংলা হসন্ত শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়।" দ্বিতীয়ত', অন্যত্র আছে, "বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো কমানো যায়"; অর্থাৎ "বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে"। কবির এই উক্তিটি কি বাংলা ধ্বনি তথা ছন্দ-তত্ত্বের একটি নিয়ম নয়? যথাস্থানে দেখাব যে, প্রধানত' এ দুটি নিয়মের উপরই আমি আমার সমস্ত আলোচনাটিকেই দাঁড় করিয়েছিলুম। তৃতীয়ত' অন্যত্র আছে, "চল্‌তি ভাষার কবিতা চল্‌তি ভাষার **নিয়মে** এখন খুবই চলেচে।" তাহ'লে দেখা গেল, ছন্দের নিয়ম থাক্‌বেই, একথা তিনিও স্বীকার করেন।

তাঁর অভিযোগের আসল কথা বোধ করি এই যে, কবিরা নিজেদের প্রকৃতিগত আনন্দের প্রেরণায়ই ছন্দ রচনা ক'রে থাকেন, প্রতিপদেই নিয়মকে সারথি ক'রে অক্ষর বা মাত্রা গু'নে গু'নে রচনা করেন না। একথা আমিও কখনও অস্বীকার করি নি। তবে একথাও মনে রাখা উচিত যে, আর্ট্ যদিও অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ-প্রেরণার সৃষ্টি তথাপি অন্তত' আধুনিকালের আর্টিষ্ট্‌রা আর্টের ভিতরকার বিজ্ঞান সম্বন্ধেও সচেতন থাকেন তা নির্ভয়ে বলা যায়। ওস্তাদ গায়ক যে শুধু ভালো গাইতে পারেন তা নয়; সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিও তিনি জানেন। তেম্‌নি কবিরাও যখন ছন্দ রচনা করেন তখন কি ছন্দ রচনা কর্‌ছেন সে-বিষয়েও তাঁরা সচেতন থাকেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত' রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দ-রচনার সময় এ বিষয়ে খুবই সচেতন থাকেন সে-বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই নেই। স্ব-রচিত ছন্দ সম্বন্ধে যদি সচেতন না থাক্‌তেন তবে তিনি এমন নিখুঁতভাবে নিত্য নূতন ছন্দ রচনা কর্‌তে পার্‌তেন না। এ বিষয়ে এমন সচেতন ব'লেই তো তিনি আজ সমগ্র দেশে ছন্দ-দ্রষ্টা ঋষিরূপে পূজিত ও অভিনন্দিত হচ্ছেন। আমার অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে আমি স্থান-বিশেষে কবিদের এই সচেতনতার কথাই বলেছি। কবিরা আয়াস স্বীকার ক'রে বা ষড়যন্ত্র ক'রে কিংবা প্রতিপদেই সচেষ্টভাবে অক্ষর গুনে গুনে রচনায় অগ্রসর হন, এমন হাস্যকর অবিশ্বাস্য কথা বলা কখনও আমার অভিপ্রায় ছিল না, একথা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে-কয়েকটি কথা বলেছেন তার প্রায় সমস্ত কথাই আমার অনুকূল; তাঁর অধিকাংশ কথার মধ্যেই আমি আমার মতেরই ভালো রকম সমর্থন পেয়েছি। আর বাকি কথাগুলিও আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধ নয়। এমনটি হ'তে পেরেছে, তার কারণ আমার নালিশের বিষয়-বস্তুটিই তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না। কাজেই যে-সব বিষয়ে আমার কোনো নালিশই নেই এবং যে-সব কথা আমি প্রতিবাদের আশঙ্কামাত্রও না ক'রে ব'লে গেছি, তাঁর এই প্রতিবাদের মধ্যে সে-সব কথার চমৎকার সমর্থন পেয়ে আমি সুখী হ'য়েছি। তাঁর এই প্রতিবাদটি আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে। অধিকন্তু আমারই কথা সমর্থিত হয় এমন কয়েকটি নব-রচিত দৃষ্টান্ত পেয়ে আমার সুবিধাই হ'য়ে গেল। যথাস্থানে সে-কথা বলব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার নালিশের উপর কোনো রায় পাওয়া গেল না।

উপমা বা তুলনা কখনও অকাট্য যুক্তি ব'লে গ্রাহ্য হয় নি। উপমা বা তুলনার দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তের চমৎকার ব্যাখ্যা হ'তে পারে, কিন্তু কোনো কিছুই প্রমাণিত হ'য় না। যদি তা-ই হ'ত, তবে উল্টো উপমা দেখিয়ে সব কথাকেই অপ্রমাণিতও করা যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপমার দ্বারা আমার বক্তব্য খণ্ডিত না হ'য়ে অতি আশ্চর্য্য রকমে সমর্থিতই হয়েছে। "বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে বাড়ানো কমানো যায়" অর্থাৎ "বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে"— এ নিয়মটির সমর্থক উপমা হচ্ছে গেঞ্জি জামা; কেননা এ জিনিষটা মধুপুরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় দেহের সঙ্গে সঙ্গে একটু বাড়তেও পারে আবার সহরে এলে একটু কমতেও পারে। কার্য্যত' এ কথারই দ্বিতীয় উপমা হচ্ছে, চিতল মাছ ধরার বেলায় ডাঙায় ব'সে ছিপ ফেলা আর চিংড়ি মাছ ধরার বেলায় কাদায় নামা। একই জিনিষের দু'রকম বিপরীত ব্যবহারের তৃতীয় উপমা হচ্ছে বধূর চুল; কারণ ওই একই চুল পিঠে ছড়িয়ে রোদ পোহানো যায় আর খোঁপা ক'রে বেঁধে নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায়। আশ্চর্য্য এই যে, আমিও ঠিক্ এই কথাই আমার প্রবন্ধে একাধিকবার বলেছি, অবশ্য অন্য ভাষায়। যথাস্থানে তা দেখাব।

বস্তুত' কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ ছাড়া আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের কিছুমাত্র বিরোধ আছে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের অর্থ দু'জনের মনে দু'রকম থাকায় আপাতত' তিনি আমার উক্তিগুলিকে তাঁর মতের বিরোধী ব'লেই মনে করেছেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, দু'পক্ষের মনে একই পারিভাষিক শব্দের দু'রকম মানে থাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে যায়। কিন্তু যখন পরিভাষার মধ্যে অর্থসঙ্গতি ঘটিয়ে দেওয়া যায় তখন দেখা যায় উভয়েরই বক্তব্য বিষয় ঠিক্ একই। অথচ পরিভাষার অর্থবৈষম্যের জন্যই বিরোধ ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে এবং তারই ফলে আমার মূল অভিযোগটিই চাপা প'ড়ে গেছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমার নালিশ রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির বিরুদ্ধে নয়: একটি মাত্র বিশেষছন্দের বিরুদ্ধে। সে ছন্দটি হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত; মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে আমার লেশমাত্রও অভিযোগ নেই। অথচ আমার কথার নিরসন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তই রচনা করেছেন; অক্ষরবৃত্তের যে দুটি দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন তাও অন্য প্রসঙ্গে। কাজেই আমার কথার উত্তর আমি পাই নি। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত আমি কোথাও এতটুকু ত্রুটি পাইনি। তাঁর রচিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কোথাও ত্রুটি পেয়েছি, একথাও আমি বলতে চাইনে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ যে-উপাদানে রচিত হয় সে-উপাদানের মধ্যেই অসম্পূর্ণতা রয়েছে এবং সে অসম্পূর্ণতা আজকালকার নয়; বাংলা কাব্যসাহিত্য যত প্রাচীন এই অসম্পূর্ণতাও বোধ হয় তত প্রাচীন। সুতরাং এর জন্য আমি আধুনিক বা প্রাচীন কোনো কবিকেই দায়ী করছিনে। যে-উপাদান নিয়ে আর্টিষ্ট আর্ট রচনা করেন সে-উপাদানেই যদি ত্রুটি থাকে তবে তার জন্য আর্টিষ্টকে দায়ী করা যায় না। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথেরই দান এবং এছন্দ দুটিকে সম্পূর্ণ

নিখুঁত রূপেই তিনি দান করেছেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাছেই পেয়েছেন। সুতরাং এ ছন্দের মৌলিক ত্রুটির জন্যে তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী নন। সে অভিযোগও আমি কর্‌ছিনে। কিন্তু আমি একমাত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে যাকে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ তাকেই সাধারণ ভাবে সমস্ত বাংলা ছন্দ ও বাঙালী কবিদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন, পারিভাষিক শব্দের অবিরুদ্ধ অর্থসঙ্গতির অভাবে। আর তাতেই এ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাকে বল্‌ছি এবং তার বিরুদ্ধে আমার নালিশ কি সে-দিকে লক্ষ্য থাক্‌লে এত কথা উঠ্‌তে পার্‌ত না।

কিন্তু তর্ক হ'তে পার্‌ত আমি যাকে অক্ষরবৃত্তের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা বলেছি সেটা আসলেই ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা কি না। এমন তর্ক হওয়া অন্যায় তো নয়ই, বরং খুবই সমীচীন। আর আমিও ওরকম তর্ক যাতে হয় তারই ইচ্ছে করেছিলুম। কিন্তু সে-তর্ক উঠ্‌ল না, উঠ্‌ল অন্য তর্ক। তাই সে-তর্কটাকে পুনরুত্থাপিত কর্‌তে চাই। কিন্তু এখানেই বলে রাখা দরকার যে, আমার সমস্ত কথাকে বিশদতর ক'রে সেই প্রসঙ্গেরই বিচার করতে গেলে একটি মাত্র প্রবন্ধে স্থানাভাব ঘটবে। আমি এস্থলে মাত্র আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির উত্থাপন কর্‌ব এবং তৎপরে পারিভাষিক শব্দগুলিকে বিশদতর কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। এস্থলে অনেক কথারই পুনরুক্তি কর্‌তে হবে। কিন্তু সব কথার পুনরুক্তি করা সম্ভব নয়। সুতরাং পাঠক যদি অনুগ্রহ ক'রে এ প্রবন্ধটির সঙ্গে অগ্রহায়ণের প্রবন্ধটি মিলিয়ে পড়েন তবে আশা করি আমার বক্তব্য আর অস্পষ্ট থাক্‌বে না।

আমি বাংলা ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। কেন করেছি এবং কোন্ তত্ত্বের সাহায্যে করেছি, এ কথাটি যদি স্পষ্টরূপে বোঝাতে পারি তাহ'লেই আমার বিশ্বাস এই মতবিরোধের মূলটিই নষ্ট হ'য়ে যাবে। কিন্তু বাংলা ছন্দের এই ত্রিধারার পরিচয় দেবার পূর্ব্বে আমার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সব অভিযোগ এনেছেন সেগুলো ভালো ক'রে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।

১

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলায় স্বরবর্ণ, যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্ব-দীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্চে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়। * * * বাংলায় ধ্বনির এই নিয়ম স্বাভাবিক ব'লেই * * * বাংলা ছন্দে প্রাক্-হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবী দেওয়া হয়েচে। আজ পর্য্যন্ত কোনো বাঙালীর কানে ঠেকে নি—এই প্রথম দেখা গেল নিয়মের বাধায় পড়ে বাঙালী পাঠক কানকে অবিশ্বাস করলেন।" হসন্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর গুরু বা দ্বিমাত্রিক হয়, একথা আমিও স্বীকার করেছি; কাজেই এ বিষয়ে কোনো ধ্বনি-তত্ত্ববিৎ-এর বিধান নেবার প্রয়োজন নেই। শুধু-যে অগ্রহায়ণের প্রবন্ধেই আমি এ নিয়মের উল্লেখ করেছি তা নয়; কয়েক বছর পূর্ব্বেই বাংলা ছন্দের এ নিয়মটির প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়েছিল (প্রবাসী—১৩২৯, পৌষ, ৩০৪-৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আমার জন্মাবার বহু পূর্ব্বেই যে প্রাক্-হসন্ত স্বরকে দু'মাত্রা ব'লে ধরা হয়েছে, আমি তা অবগত আছি। কিন্তু তারও বহু পূর্ব্বে প্রাচীন ছন্দোবিৎরা এ তত্ত্বটি অবগত ছিলেন (পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রম্ ১।৭ দ্রষ্টব্য), কেননা এ নিয়মটি শুধু বাংলার স্বকীয় নয়, সংস্কৃত উচ্চারণের পক্ষেও এ নিয়ম সত্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথিত এ নিয়মটিকে আমি একটু স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ কর্‌তে চাই। যেমন জল, চাঁদ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, এ দুটি শব্দের অ এবং আ-কে "আমরা দীর্ঘ ক'রে টেনে পরবর্ত্তী হসন্তের ক্ষতি পূরণ ক'রে থাকি"। তাই ছন্দে জল এবং চাঁদ কথা দুটি দ্বিমাত্রিক ব'লেই গণ্য হয়। আমি এ কথাটাকেই অন্য ভাবে বল্‌তে চাই। আমার পরিভাষায় জল এবং চাঁদ শব্দের হসন্ত ল্ এবং হসন্ত দ্ একেকটি আশ্রিত ধ্বনি এবং জ এবং চাঁ একেকটি আশ্রেতা ধ্বনি। আশ্রিত এবং আশ্রেতা ধ্বনির যোগে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে আমি **যুগ্মধ্বনি** বলেছি; যেমন জল্ এবং চাঁদ দুটি যুগ্মধ্বনি। আর যুগ্মধ্বনিকে আমি সর্ব্বদাই দ্বিমাত্রিক ব'লে ধরেছি। সুতরাং আমার মতেও জল এবং চাঁদ শব্দে দু'মাত্রাই আছে। কেন একই বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে

প্রকাশ করতে চাই, সে-সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। 'জল' শব্দ 'পাতা' শব্দের চেয়ে মাত্রাকৌলীন্যে কোনো অংশে কম, এমন সংশয় আমি কখনও করি নি, এখনও করি নে। কেননা, পাতা শব্দে দুটি অযুগ্ম ধ্বনি আছে অতএব এ শব্দটি দ্বি-মাত্রিক। আর জল শব্দে একটি যুগ্মধ্বনি, অতএব এ শব্দটিও দ্বিমাত্রিক। সুতরাং উভয় শব্দেরই মাত্রাকৌলীন্য সমান। "জল পড়ে, পাতা নড়ে" এ পংক্তিটির ধ্বনি নির্ণয় করব এ ভাবে।—

॥ । । । । । ।
জল্ পড়ে, পাতা নড়ে

এ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে—এই লাইনটা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কোনো পাঠকের কিছুমাত্র খটকা লেগেছে ব'লে আমি জানি নে, কেননা তারা সবাই কান পেতে পড়েছে, নিয়ম পেতে নয়।" আমি অবশ্য এ লাইনটিকে কান পেতেও পড়েছি, নিয়ম পেতেও পড়েছি। আমি গোড়ায়ই ব'লে রাখ্‌ছি কান পেতে ও-লাইনটিতে কিছুমাত্র ত্রুটি পাইনি এবং নিয়ম পেতেও আমার কিছুমাত্র খটকা লাগেনি। আর এইটেই স্বাভাবিক, কেননা ছন্দের আলোচনায় কানের ভালোলাগার রীতি যার দ্বারা আবিষ্কৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই ছন্দের নিয়ম বলা হয়। কানের ভালোলাগার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য নেই, তাকে কখনই ছন্দের নিয়ম বলব না। কাজেই ছন্দের নিয়ম বজায় থাকলে কানেও ভালো লাগ্‌বে এবং নিয়ম বজায় না থাকলে কানেও ভালো লাগ্‌বে না। যাহোক্, উক্ত লাইনটি সম্বন্ধে আমি আমার প্রবন্ধে যে-আলোচনা করেছি সেটুকু বারবার প'ড়ে দেখ্‌লুম: কিন্তু ওই লাইনটি নিয়ে কোথাও আমার খটকা লেগেছে এমন কথা তো আমি ঘুণাক্ষরেও কোথাও প্রকাশ করিনি। বরং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটি নিখুঁত ও সুন্দর নিদর্শন হিসেবেই আমি অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে ওই লাইনটি উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা কেন হ'ল আমি এখনও তা বুঝ্‌তে পারিনি। এ লাইনটি সম্বন্ধে আমি যা বলেছি এখানে সে কথাই আবার সংক্ষেপে বল্‌ছি।

\+ । + । ।
উদয়্-দিগন্‌তে এ শুভ্‌র শঙ্‌খ বাজে

এ লাইনটিতে যুগ্মধ্বনি আছে পাঁচটি যথা—দয়্, গন্, ঐ (=অই্), শুভ্, শঙ্। তার মধ্যে যোগ-চিহ্নিত দুটি যুগ্মধ্বনি (দয়্ এবং ঐ বা অই্) এখানে দুই unitএর মর্য্যাদা পেয়েছে। কেননা 'দয়্' ধ্বনিটি শব্দের অন্তে অবস্থিত আর 'ঐ' কথাটি একটি একস্বর (monosyllabic) যুগ্মধ্বনি। কিন্তু দণ্ড-চিহ্নিত বাকি তিনটি যুগ্মধ্বনি এক unitএর বেশি মর্য্যাদা পায়নি; কেননা এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত নয়। এইটেই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আসল নিয়ম, একথা বলাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। আর উদ্ধৃত লাইনটিতে এ নিয়মটি সম্পূর্ণ অব্যাহত আছে এবং কাজেই এ লাইনটিকে আমি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিখুঁত আদর্শ হিসেবেই ব্যবহার করেছি। সুতরাং এ লাইনটির ছন্দ-গত নির্দোষতা সম্বন্ধে আমার লেশমাত্রও সংশয় নেই।

২

রবীন্দ্রনাথ "ইচ্ছামত" কোথাও "ঐ" লিখে আবার কোথাও "ওই" লিখে একই উচ্চারণকে জায়গা বুঝে দুই রকমের মূল্য দিয়েছেন, একথা আমি কোথাও বলি নি। তিনি যথেচ্ছভাবে কোথাও 'ঐ' আর কোথাও 'ওই' লেখেন, একথা বলা মোটেই আমার অভিপ্রায় নয়: আমার অভিপ্রায় ঠিক্ তার উল্টো। আমি বল্‌তে চাই তাঁর 'ঐ' এবং 'ওই' শব্দ ব্যবহারের মধ্যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট রীতি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে তিনি 'ঐ' ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তিনি সাধারণতঃ 'ওই' ব্যবহার করেন। তাঁর সমস্ত কবিতা আলোচনা ক'রে তাঁর এই বিশেষ রীতিটি আমার মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর এই রীতিটির একটি মাত্র ব্যতিক্রম আমার চোখে পড়েছিল। সেটি হচ্ছে এই—

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে

এখানে চোদ্দ অক্ষর না থাক্‌লেও 'ঐ' দ্বিমাত্রিক ব'লে ছন্দ ঠিক্‌ই আছে। এ রীতিটির আরেকটি ব্যতিক্রম ইতিমধ্যে দেখ্‌তে পেয়েছি। সেটি হচ্ছে এই—

ঐ নামে একদিন ধন্য হ'লো দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।

—বুদ্ধদেবের প্রতি, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

এখানেও ছন্দ ঠিক্‌ই আছে; কারণ 'ঐ' শব্দ দ্বিমাত্রিক। কিন্তু এ দুটি ব্যতিক্রম মাত্র। তাঁর সাধারণ রীতি হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 'ওই' লেখা। যথা—

এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি

আমার বিবেচনায় অক্ষরবৃত্ত কিংবা অন্য যে-কোনো ছন্দে সর্ব্বত্রই ঐ এবং ওই শব্দ যথেচ্ছ ভাবেই ব্যবহার করা চলে, তাতে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন, "উদয়-দিগন্তে ঐ" "ঐ নামে একদিন" প্রভৃতি শব্দ স্থলে 'ঐ' না লিখে 'ওই' লিখ্‌লেও ক্ষতি হ'ত না। আবার

এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা ওই শশী-রবি।

এখানে 'ওই' না লিখে 'ঐ' লিখ্‌লেও ছন্দ অব্যাহতই থাক্‌ত। আশা করি' এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা বাংলা ছন্দে ঐ এবং ওই সর্ব্বত্রই সমান মর্য্যাদার ধ্বনি। 'ঐ' একমাত্রা এবং 'ওই' দুই মাত্রা একথা কখনও সত্য নয়। যে-ভাবেই লিখি না কেন, এ শব্দটি সর্ব্বদাই দ্বিমাত্রিক; কারণ এটি একটি যুগ্মধ্বনি। কাজেই স্বরবৃত্ত ছন্দে ঐ বা ওই সর্ব্বত্রই এক সিলেব্‌ল্ (মাত্রা নয়); অন্য সব ছন্দেই এটি দ্বিমাত্রিক।

(৩)

আকাশের ওই | আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই | লাগে

১৮. "আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্ব্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে ঐ ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দকে"

ঐ যে তপনের | রশ্মির কম্পন
এই মস্তিষ্কেতে | লাগে

এ ভাবে "রূপান্তরিত করা অপরাধ"।—এ কথা আমি কখনও অস্বীকার করিনে। আর হেমচন্দ্র যদিও "স্বতই কানের ওজন রেখে"ই

হেথা ইন্দ্রালয়ে | নন্দন ভিতর
পতিসহ প্রীতি | সুখে নিরন্তর
দানব-রমণী | করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা | হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে | সুষমাতে ভুলি,
বদনমণ্ডলে | ভাসিছে ব্রীড়া।

প্রভৃতি "ত্রৈমাত্রিক ভূমিকা"র ছন্দ রচনা করেছিলেন, তথাপি এরূপ রচনায় তাঁর ছন্দ-গত "অপরাধ" হয়েছিল, এ কথাও আমি বলেছি। আমি যাকে ষণ্মাত্রিক বা ষণ্মাত্রপর্ব্বিক ছন্দ বলি রবীন্দ্রনাথ তাকেই "ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দ" বলেছেন; অন্যত্র তিনি এ ছন্দকেই 'অসম মাত্রার ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। ষণ্মাত্র-পর্ব্বিক ছন্দে (অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার বা অসম মাত্রার ছন্দে) যুক্তবর্ণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যুগ্মধ্বনিকে এক unit ব'লে গণ্য কর্‌লে অপরাধ হয়, একথা আমি বহু পূর্ব্বেই বলেছি। আমার কয়েক বছর আগেকার একটা রচনা থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত কর্‌ছি।—

"হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
—রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অনেক বিখ্যাত কবিতা লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথমত অক্ষরবৃত্তে এই অসমপদী তালের অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু অক্ষর-বৃত্তে এ তাল ভাল শোনায় না, যেথানে যুক্তবর্ণ উপস্থিত হয় সেখানেই পদে পদে তালভঙ্গ হয়, শ্রুতিকটুতা দোষ হয়। এই তথ্যটি লক্ষ্য ক'রেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় মাত্রাবৃত্তের প্রবর্ত্তন করেছেন; মানসীতে তিনি সর্ব্বপ্রথম যুক্তবর্ণের পূর্ব্বস্বরকে দ্বিমাত্রিক ব'লে ধ'রে এ নতুন ছন্দ ব্যবহার কর্‌তে সুরু করেন। এখন অসম তালের ছন্দ সর্ব্বদাই মাত্রাবৃত্তে রচিত হ'য়ে থাকে; অক্ষরবৃত্তে অসমতাল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হ'য়ে গেছে। আর-একটা উদাহরণ দিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের

প্রভাত-সঙ্গীত থেকে। পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন এ রচনাটা মার্জ্জিত শ্রুতি-রুচির উপর কতখানি অত্যাচার করে।

বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মর মর মৃদু তান,
চারিদিক্ হ'তে কিসের উল্লাসে
পাখীতে গাহিবে গান।

এখানে যুক্তবর্ণগুলো যেন গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের মতো সুর-প্রবাহের গতি রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের ছন্দ-চেতনাও যেন সে গুরুভারে নিপীড়িত হচ্ছে। সুতরাং এ ভারটাকে যদি একটু লঘু ক'রে দেওয়া যায় তবেই ছন্দের স্রোত আবার অবাধগতিতে ব'য়ে চল্‌বে,—

বায়ু হিল্লোলে ধরে পল্লব
মর মর মৃদু তান,
চারিদিক্, হ'তে কি যে উল্লাসে
পাখীরা গাহিছে গান।"
—প্রবাসী, ১৩৩০, চৈত্র, পৃঃ ৭৮৭

আট বছর পূর্ব্বে আমি ওকথাগুলি লিখেছিলুম। এখনও আমি ওই মত পরিবর্ত্তন করি নি। যাহোক, আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

"প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী | কে রয়েছো জাগি,"—
অনাথ-পিণ্ডদ | কহিলা অম্বুদ
নিনাদে।
—শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, কথা, রবীন্দ্রনাথ

এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ "মানসী"তে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রবর্ত্তনের পরেই রচনা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস এ দৃষ্টান্তটিও "ত্রৈমাত্রিক ভূমিকা" বা "অসমমাত্রার" ছন্দেই রচিত, কিন্তু তথাপি হেমচন্দ্রের "হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন ভিতর" প্রভৃতি রচনার মতো এ স্থলেও যুগ্মধ্বনিকে এক unit ব'লেই গণ্য করা হয়েছে। তাতে কোনো "অপরাধ" হয়েছে কিনা সে বিচার কবিরাই করুন।

(৪)

"বৎসর, উৎসব প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথাগুলোকে আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই,—এ রকম চাতুরী সম্ভব হয় যে-হেতু খণ্ড ৎ-কে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে তাকে আধ অক্ষর ব'লে চালাই, প্রবন্ধ লেখক এই অপবাদ দিয়েছেন।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সম্বন্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে আমি কোথাও এ কথা বলি নি, আমার প্রবন্ধটিতে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও এমন কথার আভাস মাত্রও পেলুম না। সুতরাং এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রার প্রায় দেড় পৃষ্ঠা জুড়ে যে-সব কথা বলেছেন তা আমার প্রতি প্রযোজ্য নয়। আমি বরং তার উল্টো কথাই বলেছি। যেমন, "ধ্বনির প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না রেখে সব সময়ই শুধু অক্ষর গোনা হয়, একথা বলা অন্যায় হবে" (বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৫৭৯) আর একথার দৃষ্টান্তস্বরূপ বৎসর, উৎসব প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছি; কেন না, বৎসর প্রভৃতি শব্দে দেখতে চার অক্ষর হ'লেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়মে তিন 'অক্ষর'ই ধরা হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মাত্রাবৃত্তের নিয়মে বৎসর, উৎসব প্রভৃতিকে চার 'মাত্রা' ধরা হয় এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বরবৃত্তের নিয়মে এ শব্দগুলিকে দুই "স্বর" ধরা হয়। আর এইটেই বাংলার তিন রকমের ছন্দের পক্ষে তিনটি স্বাভাবিক নিয়ম; সুতরাং বৎসর প্রভৃতি শব্দকে তিন প্রকার বিভিন্ন ছন্দের তিন রকম মাপ কাঠিতে পরিমাপ করা অন্যায় নয়, এ কথাই আমি বলেছি।

(৫)

রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে "উদয়-দিক্‌প্রান্ত তলে" (পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী) লিখে 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে তিন অক্ষর ধরেছেন। আমি বলেছি "উদয়ের দিক্‌প্রান্ততলে" লিখে 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটিতে চার অক্ষর ধরলেও খারাপ শোনাত না; কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র দিক্‌প্রান্ত কথাটিতে চার অক্ষর ধরেছেন: যথা—দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার (নববধূ, মহুয়া) এবং দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নত্রকলা (প্রত্যাগত, মহুয়া)। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে "শাজিসির ভঙ্গে

কবিদের উপর বরাৎ" দিয়েছেন। আমিও তাঁদের শালিসি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।

(৬)

"তোমারি, যখনি শব্দগুলির ইকারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন ক'রে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন ক'রে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেছেন কিনা জানিনে, যদি ক'রে থাকেন বাঙালী পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না।" রবীন্দ্রনাথের একথার প্রসঙ্গে আমি বল্‌তে পারি যে এমন "অলস কবি"র কথা আমার জানা আছে এবং আমিও তাঁদের শিরোপা দিতে চাই নে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) বীরের স্বর্গ ই যশ, যশই জীবন

—বৃত্রসংহার, ষষ্ঠ সর্গ, হেমচন্দ্র

(২) বীরের একই মাত্র সহায় রমণী

—ঐ, দ্বাদশ সর্গ

(৩) হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও) অতীত।

—ঐ, ত্রয়োদশ সর্গ

খুঁজলে এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখানে যশই, একই শব্দে ই-কে স্বতন্ত্র অক্ষর গণনা ক'রে প্রতি পংক্তিতে চোদ্দ অক্ষর বজায় রাখা হয়েছে (হেমচন্দ্র যশ শব্দের শ-কে অকারান্ত উচ্চারণ করতেন কি না জানি নে)। আবার 'স্বপ্নেরও' শব্দের ও-কে তিনি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ব'লে মনে করতেন: তাই ওপংক্তিতে পনেরো অক্ষর হ'য়ে যাবার ভয়ে ও-কে ব্র্যাকেটস্থ করেছেন।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাগিরি এখন (ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন (ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

—ভারতসঙ্গীত, কবিতাবলী, হেমচন্দ্র

এখানেও ওই একই কারণে 'এখনও' শব্দের ও-কে ব্র্যাকেটে রাখা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিরা এভাবে ব্র্যাকেট ব্যবহার করেন না। কেননা তাঁরা জানেন যে অক্ষরের চাক্ষুষ সংখ্যা ছন্দের পক্ষে অবান্তর, ধ্বনিসাম্যই ছন্দের মূল কথা। আর 'এখনও' শব্দে চার অক্ষর দেখালেও তার ধ্বনি গত unit তিন, তার আসল রূপ হচ্ছে 'এখনো'। সুতরাং ও-কে ব্র্যাকেটস্থ করার প্রয়োজন নেই। বোধ করি রবীন্দ্রনাথই সর্ব্ব প্রথমে কবিদের এ বিষয়ে নিঃশঙ্ক করেছেন। তাই তিনি—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে?

লিখতে অক্ষর সংখ্যার ভয়ে সঙ্কুচিত হন নি: কেননা 'একই' শব্দে অক্ষর তিনটে হলেও তার ধ্বনির unit দুটির বেশি নেই। সেই জন্যে আমি রবীন্দ্রনাথকেই শিরোপা দেবার প্রস্তাব করেছি।

৭

আমি লিখেছি "আজকাল কবিরা 'হইতে', 'লইয়া', 'যাইবে' প্রভৃতি সাধুশব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে বর্জ্জন করার অভিপ্রায়ে হ'তে, ল'য়ে, যাবে প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত চল্‌তি রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক'রে থাকেন।" আমার এ কথায় কবিদের ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণই নেই। কারণ আমি আজকালকার কবিদের 'ভৎসনা' করার উদ্দেশ্যে ওকথা তো লিখিই নি, বরং তাদের ধ্বনি-বোধের তীক্ষ্ণতার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যেই ওকথা বলেছি। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ আমার ব্যবহৃত 'অভিপ্রায়' কথাটিতেই অপ্রশংসার ধারণা করেছেন। আমি বিনীতভাবে এস্থানে জানিয়ে রাখ্‌ছি যে 'অভিপ্রায়' শব্দটিকে আমি সজ্ঞান সচেষ্ট অভিপ্রায়, 'ষড়যন্ত্র', 'ফাঁকি চালাবার বা সঙ্কট এড়াবার মতলব' অর্থে ব্যবহার করি নি। তীক্ষ্ণ ছন্দবোধ-চালিত স্বত-উদ্ভূত অভিপ্রায় অর্থেই আমি ও শব্দটি ব্যবহার করেছি। প্রাচীন কবিদের রচনায়ও হব, রব, যাব, নিতে, জুড়াব প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত আছে, এদিকে রবীন্দ্রনাথ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন; তাতে আমি বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছি। কেননা তার মধ্যে আমি আমার মতের খুব সুন্দর সমর্থন পেলুম।

রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন যে আধুনিক এবং প্রাচীন সকল কবিরাই যে, হইতে, লইয়া, যাইবে প্রভৃতি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার করেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই "কানের কোনো জরুরি হুকুম অথবা ভাষার কোনো স্বতঃপরিণত ইঙ্গিত" রয়েছে। অবিকল এই কথাটি বলাই আমার অভিপ্রায়। তার উপর আমি আর একটু বল্‌তে চাই যে, প্রাচীন কবিদের চেয়ে আধুনিক কবিরা এ সমস্ত সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার করেন অপেক্ষাকৃত বেশি এবং তাতে আমি আধুনিক কবিদের তীক্ষ্ণতর ছন্দ-বোধেরই পরিচয় পাই। তা ছাড়া ওই প্রবন্ধের মধ্যে আমি কবিদের কানের এই "জরুরি হুকুমের" কারণটিও আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি।

বাংলা ছন্দের ভাষা সম্বন্ধে যখন কথা উঠ্‌ল তখন এ বিষয়ে আমার মতটাকে আরেকটু স্পষ্ট ক'রেই বল্‌ছি। ইদানীং বাংলা রচনার রীতি-বিচারের উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ঘোষিত 'সাধু বনাম চল্‌তি ভাষার' যুদ্ধের কথা উত্থাপন ক'রে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, "সকলেই জানেন বাঙ্গলার ক্রিয়াপদ নিয়ে লড়াইটাই ছিল ও-যুদ্ধের একটা প্রধান পর্ব্ব। এর কারণ খুব স্পষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় থেকে বাঙ্গলার সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির যে রূপ চ'লে আসছিল তা যেমন লতানো, তেমনি শিথিল। 'হইয়া,' 'করিয়া,' 'যাইয়া', 'হইতেছিল', 'করিতেছিলাম', 'খাইতেছিলেন'—এ-সব ক্রিয়াপদ বাক্যের মধ্যে আন্‌লে তাকে গাঢ়বন্ধ করা হয় এক রকম অসম্ভব কাজ। সুতরাং বাঙ্গলা গদ্য হ'য়ে পড়ে নিতান্ত শিথিল। এই শিথিলতা থেকে মুক্তির জন্য লেখকেরা অনেক সময় ক্রিয়াপদ প্রায় বর্জ্জন ক'রে বাক্যের পর বাক্য লিখে চল্‌তেন, কিন্তু তাতে প্রায়ই আন্‌তে হ'তো দীর্ঘ-সমাস। অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলির ঠিক ও-রূপ বজায় রেখে বাঙ্গলা গদ্যে শ্লেষ আনা যায় না, এবং শ্লেষ ছিল প্রমথবাবুর লক্ষ্য। সুতরাং তিনি কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের কথার অনুরূপে ক্রিয়াপদগুলিকে কেটে ছোট করলেন। বাঙ্গলার ক্রিয়াপদগুলি ওর দুর্ব্বলতার জায়গা, এই উপায়ে সে দুর্ব্বলতা প্রমথবাবু অনেকটা দূর করেছেন" (পরিচয়, ১৩৩৮, কার্ত্তিক, পৃঃ ১৭৫)। আমি এ বিষয়ে অতুলবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। শুধু তাই নয়, আমি বল্‌তে চাই তাঁর উক্তিগুলি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে যতখানি সত্য, বাংলা ছন্দ, বিশেষত' অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি সত্য। কারণ গদ্যে ধ্বনির শিথিলতা শ্রুতিরুচিকে যতটা পীড়া দেয়, পদ্যে ধ্বনির শিথিলতা তার চেয়ে বেশি পীড়া দেয়। কেননা গদ্যে বক্তব্য বিষয়টাই থাকে মুখ্য, ধ্বনিমাধুর্য্যটা গৌণ; আর ধ্বনিমাধুর্য্যটাই হ'ল পদ্যের অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য। কাজেই পদ্যের রচনা বৈদর্ভী রীতিতে শ্লিষ্ট ও গাঢ়বন্ধ হওয়া গদ্যের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। এই জন্যই আমি বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও শব্দের সংক্ষিপ্ত চল্‌তি রূপের পক্ষে এতটা ওকালতি করতে চাই। আমার বিশ্বাস অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কথিত সাধু ছন্দের ধ্বনিটাকে সম্পূর্ণ অব্যাহত রেখেও ও-ছন্দে শব্দের সংক্ষিপ্ত চল্‌তিরূপ চালানো অসম্ভব নয়। আর এ-কাজ করতে পারেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথই; তিনি যদি না পারেন তবে আর কেউ পারবে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সম্মুখে লড়াইয়ে পড়ে' বীরের সেরা বীর
বীরবাহু চ'লে যখন গেলেন যমের বাড়ী

এ রকম ভাষায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু যথাস্থানে। সাধু-ভাষার ঠাটের মধ্যে এটা চালানো যায় না।" এ দৃষ্টান্তটির দ্বারা আমার উক্তিটি উপহসিত হয়েছে বটে, কিন্তু অপ্রমাণিত হয় নি। কেননা আমি যে-ছন্দের কথা বলেছি এ দৃষ্টান্তটি মোটেই তার অনুরূপ নয়। আমি বল্‌তে চাই, অক্ষরবৃত্ত বা সাধুছন্দে প্রতি পংক্তির অক্ষর-সংখ্যা (চোদ্দ বা আঠারো বা আর যাই হোক্) ঠিক্ রেখে এবং ওছন্দের সুপরিচিত ধ্বনিকেও ঠিক্ রেখে তাতে শব্দের সংক্ষিপ্ত বা চল্‌তি রূপ চালানো অসম্ভব নয়। উক্ত দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তির চোদ্দ অক্ষরের নিয়মই পালিত হয় নি। সুতরাং এ দৃষ্টান্তটির দ্বারা আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যদি ইচ্ছে করেন তবে "বসুন্ধরা", "মানস-সুন্দরী", "এবার ফিরাও মোরে" প্রভৃতির স্বজাতীয় কবিতায় চোদ্দ বা আঠারোর নিয়ম এবং ওসব ছন্দের ধ্বনি অব্যাহত রেখেও শব্দের, বিশেষত ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত চলতি রূপের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করতে পারেন, আমার তাই বিশ্বাস। আমি কবি

নই, ছন্দ রচনা করা আমার অভ্যাস নয়। সুতরাং আমার এ বিশ্বাসের মূল্য কতখানি তা আমি জানি নে।

এ বিষয়ে যথাসময়ে আরও আলোচনা করব। কিন্তু এস্থলেই আরও দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কথিত সাধুছন্দে সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বদাই সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে এমন জেদ আমি করি নে। ধরিব, ধরিত, ধরিয়া প্রভৃতি রূপের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ বেশি নয়, কেননা সাধু বেশধারী এবং কতকটা শিথিল প্রকৃতির হ'লেও এগুলি শ্রুতি-রুচিকে পীড়িত করে না। কিন্তু হইতে, লইয়া, যাইবে, জানাইতে, বাজাইল প্রভৃতি যে-সব শব্দের মধ্যে একটি ক'রে যুগ্মস্বর বা dip-thong আছে অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ সাধুছন্দে সে-সব শব্দের ব্যবহারের বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ সব চেয়ে বেশি। কেননা ওসব শব্দের মধ্যবর্ত্তী ইকারগুলি স্বতন্ত্র নয়, এগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের আশ্রিত। অর্থাৎ লইয়া, যাইবে প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত রূপ হচ্ছে লই্য়া বা লৈয়া, যাই্বে বা যাবে। সুতরাং লইয়া, যাইবে প্রভৃতি শব্দ দ্বিস্বর অর্থাৎ dissyllabic। অতএব অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়মে এসব শব্দে দুই unit ধরা উচিত। অথচ ওছন্দে এসব শব্দের মধ্যবর্ত্তী ই-কে স্বতন্ত্র ব'লে গণ্য ক'রে এসব শব্দকে তিন unit এর মর্য্যাদা দেওয়া হয়। তাতে ছন্দের গাঢ়বন্ধতা নষ্ট হয় এবং ধ্বনিতে শিথিলতা আসে। দৈব বা দই্ব কথাটিকে যদি দ-ই-ব রূপে উচ্চারণ করা যায় তবে ধ্বনিতে শৈথিল্য দেখা দেয়। লওয়া, হাওয়া প্রভৃতি শব্দকে যদি ল-ও-য়া, হা-ও-য়া প্রভৃতি রূপে উচ্চারণ করা যায় অর্থাৎ এসব শব্দের ও-কে যদি স্বতন্ত্র ব'লে স্বীকার করা হয় তবে ধ্বনির গাঢ়তা নষ্ট হয়। তেমনি লই্য়া, যাই্বে অর্থাৎ লৈয়া, যাবে শব্দকে যদি ল-ই-য়া, যা-ই-বে রূপে উচ্চারণ ক'রে এদের তিন unit এর মর্য্যাদা দেওয়া যায় তবে ছন্দে ধ্বনির গাঢ়তা নষ্ট হ'য়ে শৈথিল্য দেখা দেয়। সুতরাং লইয়া, যাইবে প্রভৃতি শব্দকে হয় দৈব, হাওয়া প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দুই unit এর মর্য্যাদা দিতে হবে; নতুবা ল'য়ে, যাবে প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত রূপেরই ব্যবহার করতে হবে। হইতে, লইয়া, খাইয়া প্রভৃতি শব্দে তিন unit গণনা করা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি-বিরোধী এবং কাজেই তাতে তীক্ষ্ণ শ্রুতিবোধও পীড়িত হয়।

এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তিনি বলেছেন, "ওজন বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা ভর্ত্তি কর্‌বার দিকে যাঁদের বেশী ঝোঁক তাঁরাই একদিন একে পয়ারের কাঠগড়ায় পুরে এর চেহারা বিগড়ে দিতে গিয়েছিলেন। মধ্যযুগের ফার্সীনবীশ লিখিয়েরা ফার্সীর দেখাদেখি বাংলার 'যাইবে', 'পাইবে' প্রভৃতি শব্দের অনির্দ্দিষ্ট বা ভাংটা ই-কারগুলিকে গোটা বা পুরো ক'রে বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন। চীনে সুন্দরীদের পায়ের মতন কেতাবী ভাষার ছন্দের গতি, পয়ারের লোহার জুতোর মধ্যে অল্প বয়সে বাঁধা প'ড়ে একেবারে বেঁকেচুরে আড়ষ্ট হ'য়ে এসেছিল। বাংলা ছন্দের এই আড়ষ্ট গতিকে কেউ কেউ শালীনতা বা আভিজাত্যের লক্ষণ বল্‌তেও কুণ্ঠিত হন নি, কিন্তু এ যে অস্বাভাবিক তা অস্বীকার করতে পারেন না" (ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৫, পৃঃ ১২)। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, আমি যাকে বলেছি অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন "কেতাবী ভাষার ছন্দ"।

৮

আমি অগ্রহায়ণ মাসের প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছিলুম যে ভারতবর্ষীয় লিপিপদ্ধতি, বিশেষত' ব্যঞ্জন-সংহতিকে যুক্তাক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করার পদ্ধতি বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তির জন্যে অনেক পরিমাণে দায়ী। এইটেই ছিল আমার ও-প্রবন্ধের একটি বড় প্রতিপাদ্য বিষয়। সে উপলক্ষ্যেই আমি আরও বলেছি যে, কোনো কোনো বিষয়ে যদি আমাদের লিপিপদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন বা সংস্কার-সাধন করা যায় তবে আমাদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপ অনেকটা বদলে যাবে, কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ অব্যাহতই থাকবে। যেমন, আমাদের লিপিপদ্ধতিতে যদি শৈল, মৌন না লিখে শইল, মউন লেখার রীতি থাকত, কিংবা হইল, লউন না লিখে হৈল, লৌন লেখার রীতি থাকত, তবে

আমাদের "অক্ষর-গোনা" ছন্দে অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটত। আমার মনে হয় আমার এ কথা বুঝ্‌তে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোরের সঙ্গেই আমার এ কথার প্রতিবাদ করেছেন; অথচ আমার এ উক্তিকে খণ্ডন করার জন্যে কোনো যুক্তি উপস্থিত করেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, "যতক্ষণ বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি * * সম্পূর্ণ বদল হ'য়ে না যাবে ততক্ষণ যে অক্ষর যেমন ভাবেই সাজাই না কেন বাংলা ছন্দের ধারা আজও যেমন ভাবে চল্‌চে কালও তেমনি ভাবে চল্‌বে।" তাঁর এই উক্তি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ অক্ষরগোনা ছন্দের উপর বাংলা লিপিপদ্ধতির প্রভাব কতখানি, এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। *

৯

অতএব দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের একটি কথাও আমি সত্য ব'লে স্বীকার করতে পারলুম না। তার কারণ আছে; সেটি হচ্ছে এই। আমি অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের শুধু অক্ষরবৃত্ত-শাখার বিরুদ্ধেই কয়েকটা অভিযোগ উপস্থিত করেছিলুম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অভিযোগগুলো সাধারণ ভাবে সমস্ত "বাংলা কবিতার ছন্দে"র বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য, এই কথা ধ'রে নিয়েই প্রতিবাদের ভূমিকা করেছেন। আর এই জন্যই তিনি আমার "নালিশ ঠিক্ স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি।" সুতরাং তাঁর প্রতিবাদের কোনো কথাই যে আমার প্রবন্ধের বিরোধী না হ'য়ে অনেক স্থলেই আমার অনুকূল হয়েছে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

যদি তাঁর প্রতিবাদের মূলেই ওই ভুলটুকু না থাকত তবে তিনি যে আমার সমস্ত কথা না হ'লেও অধিকাংশ কথাই সানন্দে মেনে নিতেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কেননা আমি আধুনিক বাঙালী কবিদের 'ভৎ'সনা' তো করিই নি, বরং অনেক স্থলেই তাঁদের বিশেষত' রবীন্দ্রনাথের, ছন্দ-বোধের প্রশংসাই করেছি। আর স্থানে স্থানে যে-সব অভিযোগ এনেছি তা কোনো কবির বিরুদ্ধেই নয়, তা শুধু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে আমিই প্রথম নালিশ করলুম তা নয়। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথই সে-কাজ করেছেন সকলের আগে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে কি বলেছেন দেখা যাক্। প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার তাঁর কথিত সাধুছন্দ এবং আমার কথিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ একই জিনিষ। তিনি বল্‌ছেন—

"আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেক দিন আমার মনে বাজিয়াছে। * * * সাধু ভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশীর ফাঁকগুলি শিষা দিয়া ভর্ত্তি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুই হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা-বধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে" (সবুজপত্র, ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ)।

এই কথাগুলিকেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক তেজের সঙ্গে অন্য ভাষায় প্রকাশ ক'রে গেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি ছিল তা এস্থলে সংগ্রহ ক'রে দিলুম।—

"এখন আর বাংলা ভাষা ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতর, যুক্ত-অক্ষরের হর্ত্তুকি-বয়ড়া আর হসন্তের জুঁইফুল পচিয়ে মহাসুগন্ধি ত্রিফলার জল তৈরী করছে না। * * যুক্তাক্ষরের চড়ায় ঘেঁষড়াতে ঘেঁষড়াতে, হসন্ত-তকারের কলমীদাম দাঁড়ের আগায় ছেঁচ্‌তে ছেঁচ্‌তে, অন্যান্য হসন্ত-অক্ষরের শুশুক-পৃষ্ঠে লগি লাগাবার দুশ্চেষ্টা করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছিল। * * মাত্রাবিচারশূন্য অক্ষরগোনা

* বাংলা লিপিপদ্ধতি ও অক্ষরবৃত্তের সম্বন্ধের উপর অচিরেই আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করব।

ছন্দ এখন উড়ে কবিরা সযত্নে রক্ষা করুন, বাঙালী কবির দ্বারা আর ওকাজ চলবে না। কারণ উচ্চারণের ধারা তফাৎ হ'য়ে গেছে। উচ্চারণের নিরিখ ক্রমাগতই বল্‌ছে যে, পুরোনো ছন্দ পুরোনা কাপড়ের মতন ভগ্ন হয়েছে; ওতে আর লজ্জা-নিবারণ হবে না। * * * পয়ার ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে। ছন্দ-বিদ্যায় বাঙালী আর পাঠশালার পোড়ো নয়, উঁচু ক্লাশে প্রোমোশন হয়েছে। * * * ছন্দ-ব্যবসায়ীরা এখন থেকে আর হসন্তের বাট্ তোলা, স্বরান্তের আশী এবং সংযুক্তাক্ষরের একশো তোলা—ছন্দেশ্বরীর টাটে ব'সে—তিন রকম বাটখারায় মিশিয়ে ইচ্ছামত ওজন দিয়ে—চুক্তি-ভুক্তন করতে পারবেন না। * * * ওজন বজায় রাখার চেয়ে **সংখ্যা ভর্ত্তি** করবার দিকে যাঁদের বেশী ঝোঁক তাঁরা একে একদিন পয়ারের কাঠগড়ায় পুরে এর চেহারা বিগড়ে দিতে গিয়েছিলেন।......এ যে অস্বাভাবিক তা অস্বীকার করতে পারেন না।" (ভারতী—১৩২৫, বৈশাখ)।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাধু ছন্দের মধ্যে খাঁটি বাংলার "বাঁশীর ফাঁকগুলি শিষা দিয়া ভর্ত্তি" করা হয়েছে। সত্যেন্দ্র নাথ বলেছেন "পুরোনো ছন্দে"র মধ্যে "বঙ্গবাণীর স্বরূপ-মূর্ত্তি"টিই "আকবরের মুন্সীদের তুম্‌পুশ দলনে বা টোলের পণ্ডিতদের গোময়-লেপনে" প্রায় লুপ্ত হ'য়ে গেছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিরুদ্ধে আমার নালিশ কিন্তু এত গুরুতর নয়।

১০

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কি, তা এস্থলে সংক্ষেপে অথচ বিশদ ক'রে বলা প্রয়োজন। তা করতে হ'লে নতুন দৃষ্টান্ত রচনা করতে হয়। কিন্তু আমার গদ্য-রচনার হাত, পদ্য-রচনা করতে স্বভাবতই কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ বোধ করি। তথাপি আমার কথাগুলির যৌক্তিকতা দেখাবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত রচনা করতে হ'ল।

ফাল্গুনের শুক্লরাতে মিত্রদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে
বসেছে বিবাহ-সভা সুমঙ্গল গোধূলি-লগনে।
শিউলি, কুন্দ, জুঁই কিংবা স্নিগ্ধ শান্ত শারদী জোৎসনা—
বৌ যেন ঐ রূপে সবারেই করিছে ভৎর্সনা।
এ হেন কনের সাথে পুত্রের বিবাহ, আজি তাই
সলজ্জ বৌমাকে দেখে বসুজার সুখ-সীমা নাই।
সানন্দ চিত্তেই তিনি জামাতাকে দেছেন যৌতুক,
সহাস্য বদন তাই, নয়নেতে অসীম কৌতুক।
এমন দুর্লভ বৌ পেয়ে তিনি মুক্ত-হস্ত আজি—
মিষ্টান্নবিতরে জনাঃ পাচ্ছে তাই, যাতে যেবা রাজি।
ঐ হোথা কৈ ভাজা পায় নাই নন্দী মহাশয়—
কেউ বলে,—আরও দাও, ছাড়িবার পাত্র সে যে নয়।
"দৈ-ওলা কৈ গেল, শুধু খৈ খাওয়া কভু যায়?"
এই বলি' ক্রুদ্ধ হ'য়ে পাত্র ছাড়ে বুদ্ধদেব রায়।—
আহত মৌচাক সম সকলেই তোলে কলরব,
তার পরে হৈ চৈ,—ভোজ, বিয়ে ভাঙে বুঝি সব।
হেনকালে লাঠি হাতে মুখে করি' ভৈরব গর্জ্জন,
রায়েদের লাঠিয়াল মিত্রদেরে করিল তর্জ্জন।
পাত্র ছেড়ে উঠি' পড়ি' সকলেই পলায় চৌদিকে;
বসুর কনিষ্ঠ পুত্র ছুটে গিয়ে ধরিল বৌদি'কে।
সদ্য-বিবাহিতা বৌ সৈ সাথে চ'লে গেল ঘরে;
বসুপুত্র বই-পড়া বাবু নয় বিধাতার বরে;—
সহসা ছিনায়ে লাঠি শান্তমুখে বলিল, "মাভৈঃ,
একটু ন'ড়ো না কেউ, রায়েদের লাঠিয়াল কই?"
তাহার মাভৈঃ রবে শান্তচিত্তে ফিরিল সবাই;
মৌতাত সময় হ'লো,—তাই শুধু বুদ্ধদেব নাই।
লাঠি ফেলি' বসুপুত্র বলিলেন আনম্র-নয়ন,—
"রহিল বৌভাত-কালে সকলেরে মোর নিমন্ত্রণ।"

বলা বাহুল্য এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এ ছন্দটি সাধারণত' আঠারো "অক্ষর"-এর ছন্দ নামেই পরিচিত; এক হিসেবে একে 'বর্দ্ধিত পয়ার'ও বলা যায়। যাহোক্, এ দৃষ্টান্তটিতে কোথাও ছন্দ-পতন ঘটেছে কিনা সে কথা কবিরাই বলতে পারেন। আপাতত, ছন্দ ঠিক্ আছে ধ'রে নিয়েই আমি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে আমার উক্তি-গুলিকে বিশদ করতে চেষ্টা করছি।

প্রথমেই দেখ্‌তে পাই, যদিও এটা আঠারো "অক্ষর"-এর ছন্দ তথাপি এর প্রতি পংক্তিতে আঠারো "অক্ষর" নেই। দুয়েক পংক্তিতে আঠারো অক্ষরের বেশি আছে; অন্যত্র

আঠারো অক্ষরের কমও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছন্দের ধ্বনি অর্থাৎ কানের ওজন ঠিক্ আছে। কি ক'রে তা হ'লো তাই বল্‌ছি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের যে-নিয়মটির কথা আমি বলেছি সেটি হচ্ছে এই—এছন্দে প্রত্যেক শব্দের (wordএর) শেষ প্রান্তবর্ত্তী যুগ্ম-ধ্বনিকে দুই unit ব'লে গণ্য করা হয়, কিন্তু শব্দের অ-প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি এক unit ব'লেই গণ্য হয়; আর শব্দটি যদি একস্বর (monosyllabic) হয় তবে তার যুগ্মধ্বনিটাও প্রান্তবর্ত্তী অতএব দুই unit ব'লেই গণ্য হয়। এ নিয়মটি যদি ঠিক্ মতো পালিত হয় তবে প্রতি পংক্তির অক্ষর-সংখ্যা বেশি হ'লেও ক্ষতি হয় না, কম হ'লেও ছন্দ ঠিক্‌ই থাকে। উপরের দৃষ্টান্তটিতেও এ নিয়ম বজায় আছে, তাই অক্ষর-সংখ্যা কোথাও বেশি কোথাও কম হওয়া সত্ত্বেও ছন্দের প্রকৃতি ঠিক্ আছে; কিন্তু আকৃতি সর্ব্বত্র সমান নেই।

বিষয়টাকে আরও খুলে বল্‌ছি। 'ফাল্‌গুনের্' এ শব্দটিতে যুগ্মধ্বনি আছে দুটি, ফাল্ এবং নের্; তার মধ্যে ফাল্ ধ্বনিটি এক uuitএর বেশি মর্যাদা পায় নি, কারণ এটি শব্দের শেষ প্রান্তবর্ত্তী নয় ব'লে একে একটু ঠেসে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু নের্ ধ্বনিটি দুই unit ব'লেই গণ্য হয়েছে, কেননা এটি শব্দের প্রান্তবর্ত্তী ব'লে একে একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। এরূপ সর্ব্বত্রই। জ্যোৎসনা এবং ভৎ'সনা শব্দের জ্যোৎ ও ভৎ' এদুটি যুগ্ম-ধ্বনিকে একেক unit ব'লেই ধরা হয়েছে, এরা শব্দের অন্তে অবস্থিত নয় ব'লে; খণ্ড বা হসন্ত ত-কে স্বতন্ত্র 'অক্ষর' ব'লে ধরা হয় নি। 'আরও' শব্দেও তিন 'অক্ষর' ধরা হয় নি, কেননা উচ্চারণে এখানে দুটি মাত্র unit আছে; এ শব্দটির আসল রূপ হচ্ছে 'আরো'। তেমনি 'খাওয়া' শব্দেও দুই unit, যেহেতু 'ওয়া' দুটি স্বতন্ত্র অক্ষরের সাহায্যে লেখা হ'লেও উচ্চারণে এক unit; 'ওয়া'র আসল রূপ হচ্ছে অন্তঃস্থ ব-এ আকার বা wa; অর্থাৎ 'খাওয়া' কথার প্রকৃত উচ্চারণরূপ হচ্ছে খাwa।

উক্ত দৃষ্টান্তটিতে যুগ্মস্বরগুলির আকৃতি ও প্রকৃতিই বেশি লক্ষ্য করার বিষয়। ঐ এবং ঔ, এ দুটি যুগ্ম-ধ্বনির কথাই আগে বল্‌ছি। এ দুটি যুগ্ম-ধ্বনি যখনই শব্দের অন্তে স্থাপিত হয়েছে তখনই দু-মাত্রার মর্য্যাদা পেয়েছে। যেমন —বৌ, দৈ, কৈ, পৈ, হৈ, চৈ, মাভৈঃ, ঐ। কিন্তু যখনই এরা শব্দের শেষ প্রান্তে নয়, তখনই এরা এক unit ব'লে গণ্য হয়েছে। যথা—ভৈরব, কৌতুক, যৌতুক, চৌদিকে, বৌভাত, মৌতাত, মৌচাক ইত্যাদি। 'ঐ' কথাটিও দ্বিমাত্রিক। কিন্তু যদি লেখা হ'তো "ঐরূপে সবারে যেন বৌ আজি করিল ভৎ'সনা" কিংবা "ঐরূপে বৌমাটি যেন সকলেরে করিল ভৎ'সনা" তাহ'লে 'ঐ' এক unitএর বেশি মর্য্যাদা পেত না; কেননা তখন 'ঐরূপ' এক শব্দ ব'লে গণ্য হ'ত, তার অর্থে পরিবর্ত্তন ঘটত এবং 'ঐ' শব্দের অন্তিম ধ্বনি ব'লে গণ্য হ'তো না। বৌ, সৈ এরা দু মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু কনের নাম যদি হ'তো শৈলবালা তাহ'লে শৈ এক মাত্রার বেশি মূল্য পেত না। 'ভৈরব'এর ভৈ এক unit; কিন্তু "মাভৈঃ রব"এর ভৈঃ দুই unit; যেহেতু একটি শব্দের অন্তে অবস্থিত, আরেকটি নয়। 'শিউলি' শব্দেও দুই unitই ধরেছি; কেননা ইউ্ যুগ্মস্বরটি শব্দের অন্তে নয়।

যদি খৈ, দৈ, সৈ প্রভৃতি শব্দকে খই, দই, সই ইত্যাদি রূপে লেখা হ'তো তবে কোনো কোনো পংক্তির আঠারো সংখ্যা পূর্ণ হ'তো। পক্ষান্তরে যদি বউভাত, মউ্চাক, মউ্তাত, ইত্যাদি রূপে লেখা যায় তবে অন্যান্য পংক্তির অক্ষর-সংখ্যা আঠারোকে অতিক্রম ক'রে যাবে। আরও, খাওয়া ইত্যাদিকে যদি আরো, খাবা, ইত্যাদিরূপে লেখা যায় তবে অক্ষর সংখ্যার আরও পরিবর্ত্তন ঘটবে। অই্-কার (ভৈরব, খৈ) এবং অউ্কার (কৌতুক, বৌভাত), এ দুটি সঙ্কেত চিহ্নের মতো যদি আই্কার (তাই্, নাই্), ইউ্-কার (শিউ্লি), উই্-কার (জুঁই্), এই্-কার (সকলেই্) এউ্-কার (কেউ্), আও্-কার (দাও্) ইত্যাদির জন্যও স্বতন্ত্র সঙ্কেত-চিহ্ন থাকৃত, তবে উক্ত দৃষ্টান্তটির আকৃতিতে অর্থাৎ অক্ষর-সংখ্যায় আরও বিপর্য্যয় ঘট্‌ত; কিন্তু ছন্দের প্রকৃতি ঠিকই থাকৃত। সে-জন্যই আমি বলেছি যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষরসংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না। অতএব এ ছন্দে প্রতিপংক্তিতে, অক্ষর সংখ্যা ঠিক রাখার জন্যে কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই; খৈ, দৈ না লিখে খই,

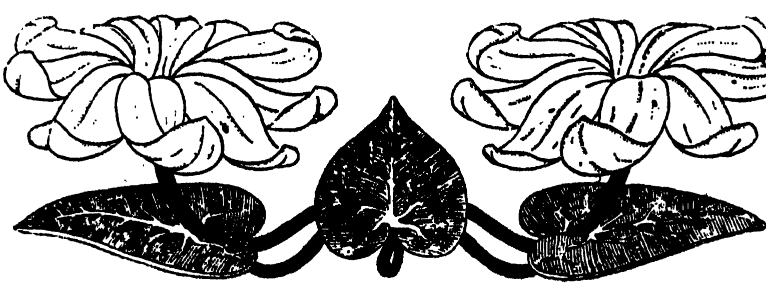
দই লেখার আবশ্যিকতা নেই। 'মাভৈঃ'কে তো "মাভই:" লেখারও উপায় নেই।

এ ছন্দ যখন অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে না তখন এ ছন্দের 'অক্ষরবৃত্ত' নামটিও খুব সুসঙ্গত নয়, একথা আমি স্বীকার করি। আসলে এটি একটি যৌগিক বা মিশ্র ছন্দ। কিন্তু এ ছন্দের নামকরণে একটা মুশকিল আছে। আমি বার বার unit শব্দটি ব্যবহার করেছি। Unit শব্দের দ্বারা আমি ধ্বনি-পরিমাণ বা উচ্চারণকালের unitকেই বুঝেছি, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই unitকে কি একটা বিশেষ নাম দেওয়া যায় তা আমি ভেবে পাই নে। উক্ত দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে সর্ব্বত্রই আঠারোটি ক'রে unit আছে, যদিও প্রতি পংক্তিতে ঠিক আঠারো অক্ষর নেই। কিন্তু তথাপি এ জাতীয় ছন্দ কবিসমাজে অক্ষর-সংখ্যার দ্বারাই পরিচিত, উক্ত দৃষ্টান্তটিকে আঠারো অক্ষরের ছন্দই বলা হ'য়ে থাকে। তাই অগত্যা আমিও একে অক্ষরবৃত্ত নাম দিতে বাধ্য হয়েছি।

এ দৃষ্টান্তটিতে 'করিল', 'করিছে' প্রভৃতি সাধুশব্দ বর্জ্জন ক'রে প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার করতে সাহস পাই নি। তেমনি পাইল, যাইয়া প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও বর্জ্জন করেছি। ওসব শব্দ ব্যবহার করলে ওদের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিটাকে এক unit গণ্য ক'রে এসব শব্দে দুই unitই ধরা উচিত, নতুবা এদের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার করা সঙ্গত। তাই শিউলি শব্দের শিউ-কে আমি এক unit ধরেছি। আর এক-জায়গায় 'পাচ্ছে' এই নিষিদ্ধ প্রাকৃত শব্দটি ব্যবহার করেছি। তাতে ছন্দের ক্ষতি হয়েছে কি না তার বিচার বিশেষজ্ঞরাই করবেন।

১১

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা পারস্পরিক আলোচনার দ্বারাই আমাদের ছন্দগুলির যথার্থ প্রকৃতিটি প্রকাশিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সাহিত্যে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এখনও যথোচিতরূপে আলোচনা হয় নি। তার কারণ হচ্ছে এই যে, ছন্দ জিনিষটাই একটা উভচর পদার্থ; এটা যুগপৎ কাব্য-সাহিত্যের বাহন এবং ধ্বনিতত্ত্ববিদ্যার উপাদান। অথচ আমাদের দেশের কবিরা ধ্বনিতত্ত্বের পারদর্শী নন এবং ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌রাও কাব্য-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নন। তাই ছন্দের আলোচনাটা কারও হাতেই যথোচিত মর্য্যাদা পায় নি। আমি কবিও নই, ধ্বনিতত্ত্ববিৎও নই। তাতে একটা মস্ত সুবিধে এই যে, আমি নিঃসঙ্কোচে উভয়ের এলাকায়ই বিচরণ করতে পারি। কিন্তু তার একটা মস্ত অসুবিধেও এই যে, তাতে উভয়ের হাতেই আমার মার খাবার সম্ভাবনা আছে। সে কথাটিও আমি ভুলি নি।*



* আমার ব্যবহৃত বাংলা ছন্দের পরিভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা আগামী মাসে প্রকাশিত হবে।

মস্কৌএর চিঠি

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রিয়বরেষু,

নূতন দেশের কিছু তথ্য পাঠাই। সময়াভাব, তাই দুটো চারটে কথা ফলিয়ে বলব। ধৈর্য্য রেখো।

সকালে গিয়েছিলেম Museum of the Godless দেখ্তে। বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে ধর্ম্মের অনাচ্ছন্ন মূর্ত্তিকে মনে আন্বার চেষ্টা। নানাদেশী ধর্ম্মানুষঙ্গিক উপকরণ সাজিয়েচে, সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ পণ্যদ্রব্যের ছাঁদে। মানবচিত্তের ধ্যানোত্তমকে মানুষেরের লেবেল্ মেরে দেওয়ালে আল্মারিতে কঙ্কাল গুণে' দেখানো চাই। সার্জ্জিক্যাল টেবিলে শুয়েচে শাস্ত্রবিধি, অস্ত্রোপচারের আয়োজন সম্পূর্ণ। দরকার ছিল কি?—ধর্ম্মের ভূত শাস্ত্রবিধি সে তো ম'রেই আছে? আধমরা মানুষের মস্তিষ্ককোটরে ক'ষে ধুনো দাও। কোণাকুষিকে ডিসেন্‌ফেক্টাণ্ট্ দিয়ে ধোয়াটা বাজে খরচ। সংস্কারান্ধ মনের ঝুল ঝাড়ো দেখি, মন্দিরের চামচিকে ও পাণ্ডাগুলি সঙ্গেই দূর হবে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের বিবর্ত্তমান রূপ দেখাবার জন্তে এরা বাক্স ভর্ত্তি ক'রে মূর্ত্তিবিগ্রহ প্রতীকের খেলনা জমিয়েচে, অনুশাসিত চিত্তের এই আত্মত্রাণ বিধি। চোখে আঙুল দিয়ে কাঠ পাথরের ধার্ম্মিক মহিমা ঘুচিয়েচে। ভালো কথা; কিন্তু কিছু যেন গায়ের-জোরিয়ানার মশলা আছে, ঐখানে মনের ভীরুতা। অতি-পবিত্র কুলাচার এবং ধার্ম্মিক জাতিভেদের সঙ্গে লড়াইয়ে বাঁশের লাঠিটা ত্যাগ করো, কেননা ওটার বাড়ি খুলি পর্য্যন্ত। গির্জ্জের সাধুর পকেটে যে গুপ্ত ধর্ম্মদলন যন্ত্র, মার-মুখো হয়ে ওঠে হীদেনকে তা'র চেয়ে মর্ম্মে মারে তা'র আপন মগজেরই মূঢ়তার মৃত্যুশেল। অতএব উদ্ধত মুষ্টি প্রপাগাণ্ডা এবং আইনের বেয়োনেটের চেয়ে বড়ো অস্ত্র চাই।



মস্কৌ—বেসিল-লে-সেণ্ট ক্যাথিড্রাল। অধুনা একটা মিউজিয়ম

কোথায় প্রাপ্য। জ্ঞান চক্ষুটিকে অন্তরে নিবিষ্ট ক'রে দেখো। অক্ষৌহিনী সেনার আক্রমণে রণজয়ের উপায় পল্টনিবৃদ্ধির কর্ম্ম নয়; জ্ঞানগঙ্গোত্রীধারায় স্নাত মহাবীর্য্যের সন্ধান খোঁজো। আস্তিন-গোটানো সংস্কারকের উদ্দেশে



মস্কৌ এর একটি দৃশ্য

এই হ'ল আমাদের বক্তব্য; বলা বাহুল্য আধুনিক ভারতের আর্য্যসন্তানরূপে খাঁটি ধর্ম্মাত্মিক সাধনার কথা আমাদের মুখে মানায় না, সে ভাবে বলচি না। মাদুলী-মানা আদুরে বাঙালীর চেয়ে বুনো খির্‌গিজ্‌ ভালো, কেননা সে অত্যন্ত বেঁচে আছে, ছুটে চলেচে। প্রবল জীবনের আবেগ আতিশয্যের ফেনা ছড়িয়েও গভীর ধারায় আপনাকে অতিক্রম ক'রে যায়। মুড়ি-খাওয়া সৌখীন টবের মাছের চেয়ে সিন্ধুশকুনকে আমি পছন্দ করি।

ধার্ম্মিক অনুষ্ঠানকে নিয়ে কী হাসিই এরা হেসেচে। ধর্ম্মকে ব'লেচে আফিম, তা'র আওতায় আপনিই মানুষের চক্ষু মুদে আসে। ভেবে দেখো জগৎজুড়ে এর তামাসা কী বিপুল, কী বিচিত্র। মন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায়, গুহাগর্ভে লুকিয়ে মানুষ ধর্ম্মের পুতুল খেলেচে; মূর্ত্তি প্রতীক ক্রশ চন্দ্রাংশ চিহ্নের ছড়াছড়ি, মন্ত্রতন্ত্রের ঘন সম্মোহনে নিবিড় অন্ধকার। নদীর ধারে বেলা প'ড়ে আসে, গ্রামের হাট ভাঙ্‌লো, মানুষের সংসারে আনাগোনা চলেচে—ধর্ম্মের চোখে সমস্তই ধোঁয়া। শিশু কলরব করে উঠ্‌ল, আঙিনায় ঘরের মেয়ের গৃহকাজের 'পরে নীল আকাশ নেমে এসেচে। দেশে দেশে চিরন্তন জীবনের ছন্দ আলো অন্ধকারে লীলায়িত। এর মধ্যে ধর্ম্ম নেই। ঘাসের ডগায় যে আলোক বিন্দু ঝ'ল্‌চে সেটা মায়া। আচারবিধির উচ্চ দেওয়াল গাঁথো, সুরঙ্গ-পথ দিয়ে ঢোকে তার মধ্যে, পরিত্রাণ পাবে। ধার্ম্মিক পাড়ায় বাসা বেঁধে অনুষ্ঠানী খাতায় নাম ভর্ত্তি করো, কপালে চন্দনের উল্কি প'রে জাত-ভাইএর সঙ্গে দলে দলে মোক্ষভোগে ব'সে যাও। রবিবার মানো, নয় লগ্ন দেখে জলে ডুব দাও, গেরুয়া ধরো নয় বুকে ক্রশ-সঙ্কেত ঝোলাও, শিখাতে ফুল বাঁধো কিম্বা ছায়ার শুচিতাভেদ শেখো। স্বর্গের সিনেমায় তোমার লাল কুশন্‌ দেওয়া গদি রিজার্ভ্‌ড্‌ থাক্‌বে। ধর্ম্মের টকী স্পষ্ট শুন্‌তে চাও তো পাণ্ডার পায়ে আরো ঢালো টাকা, নয় মহাধার্ম্মিক ভেজে পাশের লোকটার আত্মাকে যেমন ক'রে পারো তরাও।

সোজা ব্যাপার নয় ধর্ম্মের হেরফের, তুমি আমি কী বুঝব। ধার্ম্মিক পুলিশম্যান্‌, হিন্দুর পঞ্জিকা, ধর্ম্ম মোড়লদের প্রসাদী পাঠাসক্তি। যাজক বিলোচ্ছেন একমাত্র অবতারের

করে নাটকটির অন্তরের রূপটি সর্ব্বোতোভাবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে বিকশিত হয়ে ওঠে—সেইটিই নাট্যজগতের একমাত্র লক্ষ্যস্থল, এবং তা কিছুতেই হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত—অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয়, প্রযোজনা, এবং নাটকখানি এই তিনের মধ্যে একটা নিবিড় যোগ্ সংস্থাপিত না হয়।

অভিনয় জগতের এইটেই প্রথম এবং প্রধান কথা।

* * * *

এরই একটা উদাহরণ পেলাম সেদিন চার্লি চ্যাপ্লিনের "সিটি লাইট্‌স্" দেখ্‌তে দেখ্‌তে।

এটি অবশ্য নাট্যমঞ্চে অভিনয় নয়। কাজেই প্রযোজনা বা অভিনয়ের দিক্ দিয়ে নাট্যমঞ্চের অভিনয়ের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ। কিন্তু তবুও একথা বল্‌তে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে নাট্যজগতে 'সিটিলাইট্‌স্' এর চেয়ে উচ্চ অঙ্গের কিছু খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। বইখানির গল্পাংশ মনোহর এবং চরিত্রসৃষ্টি মনকে একেবারে বিস্ময়ে মুগ্ধ করে দেয়। এবং সর্ব্বোপরি ওই চরিত্রগুলির, বিশেষ করে চার্লির এবং অন্ধ মেয়েটির অভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হয় যে অভিনয় জগতে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু হতে পারে এমন্ কল্পনা করাও কঠিন।

পূর্ব্বেই বলেছি আর্ট, জগতে আজ পর্য্যন্ত নানান্ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু যখনই কোনও উচ্চ অঙ্গের রসসৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় হয় তখনই দেখ্‌তে পাই—যেটা প্রকাশ হলো তার চাইতেও যেটা অপ্রকাশিত রইল সেইটিই অনেক বড় অনেক্ বেশী। যেটা প্রকাশ হলো সেটা শুধু সেই অপ্রকাশিত "বড়"র একটা সাড়া, একটা পরিচয় দিয়ে গেল প্রাণে। সেই "বড়"র একটা ইঙ্গিতেই প্রাণ আকুল হ'য়ে ওঠে।

"সিটিলাইট্‌স্" দেখ্‌তে দেখ্‌তে এরই একটা প্রকাণ্ড উদাহরণ পেলাম্। চার্লির একটু চোখের ইঙ্গিত একটুখানির জন্য একটু চোখের চাহনি, সামান্য একটু অঙ্গুলি-সঞ্চালন যে কতখানি মনকে নাড়া দেয় স্পষ্ট করে ভাব্‌টা বলার চেয়ে যে কত বেশী বলে,—দেখ্‌লে বিস্ময়ে অবাক্ হতে হয়। অন্ধের ভূমিকায় মেয়েটির চোখের চাহনি একবার দেখ্‌লে জীবনে বোধ হয় কখনও ভোলা যায় না। চোখের উপর কোনও পটী লাগান হয়নি, কোনও রকম করে চোক্‌কে এতটুকু বিকৃত করা হয়নি,—কেবলমাত্র চাহনির একটু ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে মেয়েটি দেখ্‌তে পায় না। তারপর তার অভিনয়ে, আঙুলগুলির সামান্য একটু ইতস্তত ভাবের মধ্য দিয়েই বুঝিয়ে দিয়ে গেল—জন্মদুখিনী অন্ধ বালিকার ব্যথা কতখানি করুণ। হাতের কয়েকটি আঙুলের স্পর্শের মধ্য দিয়েই তার জীবনের অনেকখানি অনুভূতির খোরাক্ যোগাতে হয়।

তারপর বইখানির শেষের দৃশ্যে যে অদ্ভুত রসের স্পর্শে প্রাণ বিভোর হয়ে উঠ্‌ল তার পরিচয় আমাদের কাছে বহন করে নিয়ে এলো—চার্লির একটু ছোট্ট সলজ্জ করুণ হাসি এবং চোখের একটুখানি মধুর চাহনি। তার মধ্য দিয়ে কত রস কতখানি ভাবের খেলার ইঙ্গিত আমাদের প্রাণে এসে পৌছল তা বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেওয়া বোধ হয় চার্লি চ্যাপলিনের মত আর্টিষ্টের পক্ষেই সম্ভব।

চার্লি চ্যাপ্লিন জগতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একদিক্ দিয়ে অদ্বিতীয় রূপদক্ষ, তাই তাঁর সৃষ্ট নাট্যজগতে ত্রুটী মেলা ভার। এবং যে কথাটা বল্‌ছিলাম্—'সিটি লাইট্‌স্'-এ শুধু যে বইখানি উচ্চ অঙ্গের রসসৃষ্টি, প্রযোজনা বই খানিরই অনুরূপ, এবং বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়-কৌশল অসামান্য—তা নয়। সমস্ত চরিত্র-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ঘটনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌ল—সেই হতভাগা ভবঘুরে সর্ব্বহারার চরিত্র, যার জন্য জগতে এতটুকু স্থান কোথাও নেই, অথচ যার প্রাণের একটা প্রকাণ্ড মহৎ দিক্ অনবরত উঁকি মেরে আমাদের প্রাণ তার প্রতি ব্যথায় সহানুভূতিতে ভরিয়ে দেয়। তাই বইখানির শেষ দৃশ্যে একটি কোমল প্রাণের একটু মধুর স্পর্শ হাতে হাতে যখন তার প্রাণে গিয়ে পৌছল তখন তার মুখের সেই অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকার পতন হলো। আর যে কিছু জানার প্রয়োজন হলো না।

* * * *

বাংলা নাট্যমঞ্চ থেকে আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্।

সেদিন নাট্যনিকেতনে কয়েকটী বন্ধুর সঙ্গে "ঝড়ের রাতে" অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখে মনে হল অভিনয়টি মোটের উপর মোটেই সার্থক হয়নি।

তবে অবশ্য বইখানির প্রযোজনার জন্য যিনি দায়ী তাঁকে প্রশংসা করতেই হবে। দেখে সত্যই বিস্মিত হয়েছিলাম যে প্রযোজনার দিক্ দিয়ে বাংলা নাট্যমঞ্চে এতখানি উন্নতি সাধিত হয়েছে। দৃশ্যপট এবং নাটকখানির আবহাওয়ার সৃষ্টি সত্যই উৎকৃষ্ট। নাটকের নায়ক অধ্যাপক প্রশান্তর ঘরখানি দৃশ্য হিসাবে ভালো। এবং বাইরে বিকেল থেকে ক্রমে সন্ধ্যা, পরে রাত্র এবং বেশী রাত্রে ঝড় ও বৃষ্টি এবং বিশেষ করে ভোরের আভাষ এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকর ভৈরবের প্রভু প্রশান্তর জন্য চা নিয়ে ঘরে আসা, মোটের উপর অভিনয়ের বাইরের জগৎটাকে সজীব করে তুলেছে। বাংলা নাট্যমঞ্চে এ উন্নতি নিতান্ত সামান্য নয়, একথা যাদের সঙ্গে বাংলা নাট্যমঞ্চের কিছু পরিচয় আছে তাঁরাই স্বীকার করবেন।

তবে প্রযোজনার দিক্ দিয়ে ত্রুটী যে নেই, এমন কথাও বলা চলে না। আর্টকে যদি যথার্থই দুইটী ধারায় বিভক্ত করা চলে তবে এই নাটকখানির প্রযোজনা অবশ্য মোটেই আদর্শপন্থী নয় বাস্তবপন্থী, অর্থাৎ চোক্ ও কান এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের কাছে বাইরের জগৎটা যে রূপ নিয়ে আমাদের ধরা দেয়, নাট্যমঞ্চে ঠিক্ সেই রূপটিকে ধরে সজীব এবং সার্থক করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। এখানে কোনও একটা বড় জগতের ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে আমাদের কল্পনার উপর কিছুই ছেড়ে দেওয়া হয়নি। কাজেই অভিনয় দেখতে দেখতে আমাদের মন বাইরের জগতের নিয়ম কানুনে প্রত্যেকটী বিষয় যাচাই করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু যখন দেখলাম, ঝড় বৃষ্টির রাত্রে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েও ডাক্তার প্রভঞ্জনের পেন্টালুনের ভাঁজটী থেকে আরম্ভ করে পোষাকের প্রত্যেক পরিপাট্য শেষ পর্য্যন্ত বেশ নিখুঁত ভাবেই রইল তখনই আমাদের মন সেটাকে অস্বীকার করলে। সেটা সত্য হলোনা। এবং বাইরে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে এসেও বিজুর সাড়ী সিক্ত হলোনা, এটা বড়ই আশ্চর্য্য বলে মনে হলো।

যাই হোক্ তবুও বইখানির প্রযোজনা বেশ ভালোই হয়েছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত। আর কোনও দিক দিয়ে "ঝড়ের রাতের" প্রশংসা ত করা চলেই না এবং বিস্তারিত সমালোচনা করতে গেলে নিন্দাই করতে হয়। তার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে একটি কথা না বলে পারছি না। এবং সেই কথাটিই বলব। যিনি প্রভঞ্জনের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন তিনি যদি এখন নাট্যমঞ্চ থেকে বিদায় নেন্ তবে, তিনি যে শুধু নাট্যামোদী দর্শকদের প্রতি সুবিচার করবেন তা নয়, নিজের প্রতিও অবিচার করবেন না। তিনি বিলেত-ফেরতের ভূমিকা অভিনয় করেছেন। এবং শুনলাম তিনি নাকি কারো কারো কাছে প্রশংসাও পেয়ে থাকেন। তিনি নিজে কখনও বিলেত গিয়েছিলেন কিনা জানিনা তবে তাঁর প্রশংসাকারীর দল যে কোনও দিন বিলেত যাননি এবং বিলেত-ফেরতের সম্পর্কেও কোনও দিন আসেন্ নি একথা আমি হলপ্ নিয়ে বলতে পারি। তারপর চরিত্র অভিনয়ের দিক্ দিয়েও, অভিনয় কথাটির অর্থ যে শুধু মুখ বাঁকান, পা দোলান, বেঁকিয়ে কথা বলা এবং লাফালাফি নয়, অন্য কিছু, এ ধারণা বোধ হয় উক্ত অভিনেতাটির মস্তিষ্কে প্রবেশ করবার পথ আজও পায়নি।

যাই হোক বইখানির অভিনয় যে সার্থক হলো না তার জন্য দায়ী যদি কাউকে করতে হয় ত করতে হবে কতক পরিমাণে অভিনেতা অভিনেত্রীদের এবং নাট্যকারকেও, বইখানির প্রযোজনার জন্য যিনি দায়ী তাকে দোষ দেওয়া চলে না।

* * * *

আরও একটা কথা বিবেচনা করতে হবে। নাট্যমঞ্চে সাফল্য কোনও একটা দিকের সফলতার উপর নির্ভর করে না—একটা পরিপূর্ণ সমাবেশে প্রত্যেক্ অভিব্যক্তিগুলি নিজ নিজ স্বতন্ত্ররূপে সজীব হয়ে ওঠা দরকার। মনে রাখতে হবে নাট্যমঞ্চের প্রত্যেকটি দিকই বিভিন্ন আর্টেরই অন্তর্ভুক্ত; কী প্রযোজনায় কী অভিনয়ে সর্ব্বত্রই একটা সৃষ্টির লীলা একটা প্রাণের খেলা না থাকলে অভিনয় কখনই মর্ম্মস্পর্শী হতে পারে না। একদিকে যেমন প্রত্যেক চরিত্র অভিনয়ে অভিনেতাকে চরিত্রটি নাট্যমঞ্চে নূতন করে সৃষ্টি করতে হয়, তাকে সজীব করে তুলতে হয় তেমনি প্রযোজনার দিক্ দিয়েও দৃশ্য-পরিচয়ের রূপ সত্য এবং সজীব করে তোলা দরকার। এবং তা কিছুতেই সত্য হয়ে উঠবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিনয়ে কিংবা প্রযোজনায় কেবল বাইরের জগতের অন্ধ অনুকরণ মাত্র নাট্যমঞ্চে দেখান হবে। যেমন বড় চিত্রকর তাঁর চিত্রে তাঁরই প্রাণের রস ঢেলে দিয়ে সেটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন —অভিনয় জগতেও সেই রকম রূপদক্ষদের প্রাণের রসের পরিচয় আমরা চাই। তবেই ত অভিনয়-জগৎটা একটা সৃষ্টি হয়ে উঠবে। কেবল বাইরের ফটোগ্রাফ নিয়ে ছবি টাঙালেই প্রযোজনা সার্থক হবে না, এবং চরিত্র-অভিনয়ে বাইরের জীবনের অন্ধ অনুকরণ করেই অভিনেতার পক্ষে সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব।

এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছে রইল।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

নানা কথা

কলিকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

বিগত বড়দিনের ছুটির সময় সপ্তাহ-কাল-ব্যাপী যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব হ'য়েছিল, তার ভিতরকার অনুপ্রেরণাটি বাংলার জাতীয় জীবনের একটা বড়ো জিনিষ। বাংলাদেশ কবির নিকট অসংখ্য বিষয়ে ঋণী, অতএব কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে আমরা কবিকে সম্মান করে সেই ঋণ কতকটা পরিশোধ করলাম,—রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানটিকে এই দিক দিয়ে যাঁরা দেখেছেন,—তাঁরা এটাকে ছোট করে দেখেছেন। মহাপুরুষের পূজা সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালে হ'য়ে এসেছে, এবং হওয়াটাই উচিত,—কিন্তু সেই পূজার সার্থকতা পূজিতের দিক থেকে ততটা নয়, যতটা পূজারীর দিক থেকে। মহাপুরুষের গুণ আপনার মধ্যে সংক্রামিত করার একটা শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁকে পূজা করা; তাই যে-জাতির সকল মানুষ এক হ'য়ে তার মহাপুরুষকে প্রাণের কৃতজ্ঞতা-ভরা শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে, সেই জাতি ধন্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দে গানে ও অন্যান্য রচনায় ও সকল রকমের শিল্প-চর্চ্চায় এবং তাঁর বিচিত্র কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় বঙালীর আনন্দ-বেদনাকে, বাঙালীর গভীরতম উপলব্ধিকে, বাঙালীর আশা-আকাঙ্খাকে মুখর করে তুলে তাকে যে বিশিষ্ট রূপটি দিয়েছেন, সেইটেই হ'চ্চে আধুনিক যুগের বাংলাদেশ। রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙালী তার দেশোপলব্ধিকে জাগ্রত করে তুলতে পেরেছিল,—দেশের এই দুর্দ্দিনের মধ্যে এটা একটা মস্ত লাভ। সেইজন্যই দেশের রাষ্ট্রীয় আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন, তখনো বিভিন্ন উৎসবের আয়োজনগুলি সম্ভব হ'য়েছিল এবং অশোভনও হয় নি। কি উদ্বোধন সভায়, কি সাহিত্য-সম্মেলনগুলিতে, কি কবি-সম্বর্দ্ধনায়, কি মেলা ও প্রদর্শনীতে, কি গীত-উৎসবে, কি অভিনয়ে, সর্ব্বত্র এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়েছিল, যার মধ্যে দেশের একটা কল্যাণময় মানসরূপ প্রতিজনের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়েছিল। যতবারই প্রদর্শনীতে গিয়েছি ততবারই কবির ও দেশের অন্যান্য শিল্পীর চিত্রাবলী ও শিল্পকার্য্য দেখে যে শুধু মুগ্ধ হ'য়েছি তা নয়,—ততবারই আনন্দ-বেদনা-মিশ্রিত একটা দেশোপলব্ধি প্রাণের মধ্যে জেগে উঠে অন্তরকে একটা অনির্ব্বচনীয় রসে ভরে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের সুরুচি ও আলোকসম্পাতের ব্যবস্থার ভুরি ভুরি প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী কর্ম্ম-জীবন যে তাঁর দেশকে ছাপিয়ে গিয়েছে,—বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক মহামিলনের যে-বাণী তিনি বর্ত্তমান জগৎকে শুনিয়েছেন, তারও একটা সুপরিস্ফুট ইঙ্গিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানগুলির সর্ব্বত্রই ছিল। ইংরেজিতে যে সাহিত্য-সম্মেলন হ'য়েছিল, তার সভাপতি অধ্যাপক স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর প্রাণস্পর্শী অভিভাষণের মধ্যে দেখিয়েছিলেন বিশ্বমানবের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারার বৃহৎ পট-ভূমিকায় ভারতবর্ষ তার প্রাচীন চিন্তাধারা আধুনিককাল পর্য্যন্ত বহন করে নিয়ে এসে আজ রবীন্দ্রনাথের তুলিকায় সাহায্যে কী অপরূপ রঙ ফলিয়েছে! ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন ভারতবর্ষের এই গৌরবের অংশ গ্রহণ করবার জন্য। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কবি-সম্বর্দ্ধনায় আমেরিকার তরফ থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়ম্ আরনেষ্ট হকিঙ্-এর যোগদান।

তিনি কবিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "গুরুদেব! ভারতবর্ষের এই গৌরব আজ আমেরিকাকে স্পর্শ করেছে,—তার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। এক কথায় যদি বলতে হয়, আমেরিকাকে তুমি কি দিয়েছ,—তবে বলা যেতে পারে তুমি দিয়েছ মুক্তির একটা নূতন ধারণা। আমাদের

আধ্যাত্মিক জীবনে কত সহজে মরচে ধরে! আমাদের দৈহিক অভ্যাস ভাঙাই ত ভয়ানক শক্ত, আমাদের আত্মিক অভ্যাস তার চেয়েও মারাত্মক। সর্ব্বত্রই আমরা অভ্যাসের দাস,—আমাদের মানসিক অভ্যাসগুলোকে বলি ফর্ম্মুলা (formula), ব্যবহারিক অভ্যাসগুলোকে বলি কন্‌ভেন্‌সন (convention); তাছাড়া ধর্ম্মেও আমাদের একটা 'অভ্যাস' আছে; এমন-কি খেলাধূলোতেও আমাদের আনন্দে মরচে ধরে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই জীবনটা যেন মিইয়ে যায়। আমাদের ব্যক্তিত্বের সব চেয়ে সার অংশ যেটা সেইটেই হ'য়ে পড়ে প্রাণহীন ও অসার। তখনই প্রাণে জাগে বিদ্রোহ। সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা।

"আমেরিকায় দেখি, আমরা কবিতা লিখি, তার আকার থাকে না, গান গাই তাতে সুর থাকে না; তাই এই সব আধ্যাত্মিক প্রকাশে না পাই কোনো তৃপ্তি। তারা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। এমন সময়ে কবি এলেন আমাদের হারানো সত্য-বোধ আমাদের ফিরিয়ে দিতে; বুঝিয়ে দিতে কেমন করে মুক্ত হ'তে হয়,—রূপের বোঝা থেকেও বটে, অরূপের পীড়ন থেকেও বটে।......চীনঋষি বলেছেন,—মহাপুরুষ তিনিই,—যিনি শিশুর অন্তঃকরণ কখনো হারিয়ে ফেলেন না। শিশুর অন্তঃকরণ সদা-সন্ধানী, অথচ কখনো আশা-বিহীন নয়।...মহাপুরুষ অন্যের মধ্যে এই শিশুর অন্তঃকরণ জাগিয়ে তুলতে পারেন। অনেকের মনে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কাজটিই করেছেন। আমাদের মধ্যে তিনি অমরত্বের বীজ বপন করেছেন, আমরাও প্রতিদানে আমাদের অন্তরে তাঁর অমরত্বের আশ্বাস দিই।"

ত্রুটি স্বীকার

১। পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "জুনিয়র উকিল" গল্পটির লেখকের নাম ভ্রমক্রমে কোথাও "সুশীলকৃষ্ণ," কোথাও "সুনীলকৃষ্ণ" ছাপা হ'য়েছে। লেখকের নাম শ্রীযুক্ত সুনীল-কৃষ্ণ মিত্র।

২। পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "টুক্‌রী" কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি মুদ্রাকরপ্রমাদ রয়ে গিয়েছে। পাঠকেরা অনুগ্রহ ক'রে নিম্নলিখিত সংশোধনগুলি করে নেবেন—

(ক) "পূর্ণিমায়" কবিতাটিতে—"ঘোর গাঙে আজ" এর স্থলে "মোর গাঙে আজ" হ'বে।

(খ) "কেতকী" কবিতায় 'আমি বাদলের' এর স্থলে "আজি বাদলের" হ'বে।

(গ) "দোয়েল" কবিতায় "কালো মেঘের" এর স্থলে "কালো মেয়ের" হ'বে।

(ঘ) 'স্মৃতি' কবিতায় "আলোরান" এর স্থলে "আলোয়ান" হ'বে।

(ঙ) "নিরাশ্রয়" কবিতায় "বেগুন" এর স্থলে "সেগুন" হ'বে।

(চ) "বটফল" কবিতায় "ফুল" এর স্থলে "ফল" হ'বে।



শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত

বিদেশে বাঙ্গালী শিক্ষক

শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশ গুপ্ত এম্‌-এ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত "স্কুল অব ওরিণ্টাল ষ্টাডিজ" (School of Oriental studies) নামক কলেজে বাংলা পড়াবার জন্য সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হ'য়েছেন।

are diagrams showing how the Church squeezed the money out of the people, a model showing the enormous staging used for erecting the immense monoblock granite columns of this building, and portraits of the painters and architects who assisted in the erection, with note of the thousands of roubles that were expended that way....

The demonstration is to show that "Religion is Opium for the people," that the whole performance was designed to keep the people in subjection; and when one has made all allowance for the intention that the building and ceremonies were designed to give an impression of the majesty of God, the colloquial expression fits quite well, that there is only too much truth in the Soviet point of view; one is not prepared to defend the Russian Church"

কেবল রাশিয়ান চর্চ্চ্? তা ছাড়া, ভারতবাসীর যে কোটি কোটি টাকা গেছে এবং যাচ্চে ধর্ম্মব্যবসায়ে এবং অনুষ্ঠানের গর্ত্তে, আমরা ঘরের লোক তা'র কথা বিশেষ জানি। যাক্, কোনো তামাসাই চিরদিন ধ'রে চলে না, ধার্ম্মিক তামাসার আতসবাজি রাত্রিময় ভারতবর্ষের বুকে যখন জ্ব'লে পুড়ে ছাই হবে ধর্ম্মের চিরন্তন মহাকাশে তখন ধ্রুবতারাকে আবার দেখ্তে পাবো। শুভমস্তু—

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিবিধ সংগ্রহ

চিত্রগুপ্ত

আফ্রিকার নতুন খবর

ব্যারণ গর্গড্ (Baron Gourgaud) একজন বিখ্যাত ফরাসী শিকারী। নেপোলিয়ান যখন সেন্ট্ হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন সেই সময় এঁর পিতামহ জেনারেল গর্গড্ তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। যাই হোক্ এই অভিজাত ভদ্রলোক ব্যারণ গর্গড্ আভিজাত্য-সুলভ নানারকম খেয়াল নিয়ে মেতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত রকমের খেয়ালের মধ্যে প্রধান খেয়াল হচ্ছে, আফ্রিকার ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে শিকার করা। এই খেয়ালের ঝোঁকে আজ অবধি তিনি তিনবার আফ্রিকায় গেছেন এবং প্রত্যেকবারই নানা দুঃসাহসিক কাজ তিনি সেখানে করে এসেছেন এবং নানা রকমের ভীষণ জন্তু শিকার করে এনেছেন। এবারে তিনি সেখান থেকে শিকার করে আনা ছাড়া আর একটি দামী মজার জিনিষ নিয়ে এসেছেন। তিনি এবারে সেখান থেকে একখানি ফিল্ম্ তুলে নিয়ে এসেছেন যাতে এই রহস্যময় এবং অজ্ঞাত মহাদেশটি সম্বন্ধে নানা বিস্ময়কর ঘটনা জানা যাবে। আজ পর্য্যন্ত কেউ কি জান্‌ত যে আফ্রিকাতে এমন জাত আছে যাদের মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখলেই তারা মরে যায়? ব্যারণ গর্গড্ এদের মধ্যে অনেক দিন বাস করে এসেছেন। এদের নাম পিগ্‌মী। তিনি ফিল্মে এদের অদ্ভুত জীবন যাত্রার প্রণালী এবং আফ্রিকার আরও অনেক ব্যাপারের ছবি তুলে এনেছেন।

কয়লার খাবার

নামটা শুনলেই খুব হাসি পায় বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল এই খাবার তৈরী করতে মহোৎসাহে লেগে গেছেন। তাঁরা বলছেন কয়লা থেকে শুধু আলকাতরা, রং, এমোনিয়া স্যাকারিন প্রভৃতি জিনিষ তৈরীর কথা শুন্‌লে এখন যেমন কেউ অবিশ্বাস করেন না তেমনি দুদিন পরে তাঁরা যখন এই অতি প্রয়োজনীয় অথচ ঘৃণ্য বস্তুটি থেকে খাবার তৈরী করে সকলকে পরিবেষন করতে সুরু করবেন তখন খুব গম্ভীর ভাবেই সকলে তা খাবেন এবং যথেষ্ট তারিফ্‌ও করবেন। তাঁরা বলছেন যে দেহকে গঠন করবার জন্যে বা জীবন রক্ষার জন্যে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর শাক্‌সব্জী ফলমূল খেয়ে থাকি। এই শাকসব্জী যা আমরা খাই আসলে সেগুলো কি?—সূর্য্যের পুঞ্জীভূত শক্তিকণা, যেগুলো এদের মধ্যে আহরিত হ'য়ে সঞ্চিত হ'য়ে থাকে—এছাড়া আর কিছুই নয়। এখন কয়লা জিনিষটা কি তা' হ'লে দেখা যাক্। এই সমস্ত উদ্ভিদ্‌ই প্রকৃতির লীলায় প্রস্তরে পরিণত হ'য়ে কয়লায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে সূর্য্যের যে রশ্মিজাল তারা নিজেদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত ক'রে রেখেছিল তা তো ক্ষয় হয় নি। তা' যদি হ'ত তা'হলে আজ এতটুকু আগুন কয়লার ভিতর থেকে কেউ বার করতে পারত না। যে আগুন জ্বলে বা যে আলো আমরা কয়লার গ্যাসে পাই তা' সমস্তই সূর্য্যের আলোর সামান্য কণিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক উদ্ভিদের মধ্যে প্রোটিন ব'লে একটা জিনিষ আছে যেটা বাইরে থেকে শক্তি-আহরণ ক'রে থাকে। যদিও কয়লা রাসায়নিক বিকৃতি লাভ করে তবুও এর মধ্যে থেকে সেই শক্তির ভাণ্ডারটুকু নিঃশেষিত হ'য়ে যায় না। যখন কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করা হয় তখনই এই প্রোটিন্ জিনিষটা ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়ে এমোনিয়া প্রভৃতি হাল্‌কা কতকগুলি জিনিষে পরিণত হয়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন যাতে কয়লার প্রোটিন জিনিষটাকে তার প্রাথমিক অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায় এবং যার সাহায্যে মানুষ কয়লা থেকেই যথেষ্ট খাবার পেতে পারে। বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টা সফল হ'লে দেখা যাবে

যে রাণীগঞ্জ, আসানসোল প্রভৃতি কয়লার খনির মালিকরা তখন ময়রায় পরিণত হ'য়েছেন।

এক সেকেণ্ডে ৫০,০০০ হাজার ছবি তোলা

বায়স্কোপ দেখ্‌লেই বোঝা যায় ফটোগ্রাফির কী অসাধারণ উন্নতি আজকাল হ'য়েছে। ক্যামেরা আজ অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলছে। একজন লোক খুব উঁচু থেকে জলে লাফিয়ে পড়লো। শুধু চোখে ব্যাপারটা কত তাড়াতাড়ি ঘটে যায় আমরা তা' দেখি, কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যে, তাড়াতাড়ি ফটো তুলে যখন ছায়াপটে দেখান হয় তখন সেই সময়টুকু কত দীর্ঘ মনে হয়! জলে পড়বার আগে মনে হয় লোকটা যেন অত উঁচু থেকে বাতাসে সাঁতার দিতে দিতে অতি ধীরে জলে অবতরণ করলে। আসলে কিন্তু তা হয় নি। পলক সময়ের মধ্যে হয়তো দশহাজার ছবি উঠে গেছে এবং প্রত্যেকটি সকল অবস্থার খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত ক্যামেরা তুলে নিয়েছে। আবার এর ঠিক উল্টোটিও হ'তে পারে। ছ'ঘণ্টা অন্তর একটি কুঁড়ির পাপ্‌ড়ি বিকশিত হ'ল, তারপর সেটি ফুলে পরিণত হ'ল, কত সময় তাতে লাগে কিন্তু ক্যামেরায় একটু একটু ক'রে ফটো তুলে সেটাকে ২ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবেই দর্শকদের দেখান যেতে পারে। যাই হোক এ সমস্ত দেখে আমরা ক্যামেরার তারিফ করি, কিন্তু খুব শীঘ্রই এমন ক্যামেরার বাজারে আবির্ভাব হবে যার সাহায্যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ছবি তোলা যাবে। ছবির ফিল্‌ম, ক্যামেরার কাচের সাম্‌নে দিয়ে ঘণ্টায় দু'হাজার মাইল গতিতে বেরিয়ে যাবে। অর্থাৎ সকলের চেয়ে দ্রুতগামী ট্রেণের চেয়ে ত্রিশগুণ বেশী দ্রুত ক্যামেরার চাকতি ঘুরবে। এই ক্যামেরার সাহায্যে, উড়োজাহাজের পাখা ঘোরবার সময় কি ভাবে ঘোরে, কতটা কাঁপে, সেই কাঁপার ফলে কতখানি পাখার ক্ষতি হয় তা সব বোঝা যাবে। কারণ শুধু চোখে সে সমস্ত লক্ষ্য করা অসম্ভব, সেকেণ্ডে ৫০০০০ হাজার ছবি উঠ্‌লে পাখাটির ঘোরবার সময় যা যা অবস্থা হয় তা' ধীরে সুস্থে এবার থেকে বোঝা যাবে এবং এর ফলে উড়োজাহাজেরও খুব উন্নতি হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে। বর্ত্তমানে এই ক্যামেরাটি দিয়ে বাতাসের পর্য্যন্ত ফটো নেওয়া গেছে, ঘূর্ণীবায়ুর কি ভাবে উৎপত্তি হয় তাও জানা যাচ্ছে এরই সাহায্যে! দিনে দিনে বিজ্ঞান কি না করছে বা না করবে তার কোন ইয়ত্তা পাওয়া সত্যিই আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

আমেরিকার লিঞ্চিং রেকর্ড

Lynching এর ব্যাপারটি বোধ হয় অনেকেই জানেন। বছর কয়েক আগে এ জিনিষটি আমেরিকাতে খুবই ঘটত। ব্যাপারটা আর কিছুই নয় আমেরিকানরা যাকে খুব ঘৃণা করত সবাই দল বেঁধে তাকে কোন প্রকাশ্য স্থানে আগুনে পুড়িয়ে মারত এবং উত্তেজিত জনতা তাকে ঘিরে খুব চিৎকারাদি করত। এ ব্যাপারটি বেশীর ভাগ স্থলেই আমেরিকানদের গভীর কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষের ফলেই ঘটত—সুতরাং নিগ্রোদের ভাগ্যেই এই ধরণের শাস্তিলাভ হত। অবশ্য সহরের চেয়ে পল্লীগ্রাম অঞ্চলের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিতদের মধ্যেই Lynching এর প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যেত। যাই হোক ব্যাপারটার নৃশংসতা উপলব্ধি করে আমেরিকার শাসক সম্প্রদায় এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন এবং সবিশেষ চেষ্টা করতে থাকেন যা'তে এই নিষ্ঠুর ব্যাপার ওখান থেকে উঠে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এর ফলও আশানুরূপ ভাবেই ফলতে থাকে।

আমেরিকার Tuskegee Industrial Institute এর report অনুসারে আমরা জান্‌তে পারলুম যে ১৯৩১ সালে অর্থাৎ এই বছরে প্রথম ছ' মাসের মধ্যে সেখানে সরশুদ্ধ ৫টা লিঞ্চিং ঘটে গেছে।

১৯২৯ সালে সেখানে প্রথম ছ'মাসের লিঞ্চিং সংখ্যা ছিলো ৪টী এবং ১৯৩০ সালের প্রথম ছ'মাসের ৯টী। তাহলে দেখ্‌ছি যে এ বছরে গত বছরের চেয়ে চারজন কম লোককে এই দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হয়েছে। বর্ত্তমান বছরে যে পাঁচজনকে Lynch করা হয়েছে তার মধ্যে একজন ছিল শ্বেতাঙ্গ, এবং বাকী ৪জন নিগ্রো।

লেজারের অপর পার্শ্বে যে রিপোর্ট লেখা আছে তা থেকে জানা যায়—যে এইরূপ আরো ৩২টি ক্ষেত্রে লিঞ্চিং এর আয়োজন করা হ'য়েছিল কিন্তু সুখের বিষয় যে প্রত্যেক

স্থলেই শান্তিরক্ষক সম্প্রদায় তা ঘট্‌তে দেন নি। এই ৩২টির মধ্যে ৪টি উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশে এবং বাকী ২৮টি দক্ষিণ প্রদেশে ঘটেছিলো। সুখের বিষয় আমেরিকায় লিঞ্চিং-এর সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আস্‌ছে। এবং সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ যেরকম কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন তা'তে আশা করা যায় যে শীঘ্রই সেখান থেকে এজিনিষটা একেবারে উঠে যাবে।

পেট্রোলের নতুন উপাদান

গ্রেট্‌ ব্রিটেনের Imperial Chemical Industries এর কর্ত্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে কয়লাকে Hydrogenation processএ জলীয় ভাবে অর্থাৎ তরল করে ফেলতে পারলে এক রকম পেট্রোল পাওয়া যেতে পারে যা সাধারণ পেট্রোলের চেয়ে ঢের কম খরচে লোকে কিনতে পারবেন। অথচ পেট্রোলের সমস্ত গুণ তাতে বর্ত্তমান থাকবে। এই পেট্রোল বাজারে লাভ রেখে ৶৵০ আনা করে বেচা যেতে পারে। Imperial Chemical Industry জানাচ্ছেন যে বেকার সমস্তার সমাধান অনেকটা এতে হবে এবং হাজার হাজার লোক এই নতুন কারখানায় চাকরি পাবে। তাঁরা কয়লা থেকে পেট্রোল তৈরী করেছেন এবং তা ব্যবহার করবার জন্যে সরকারী উড়োজাহাজ বিভাগকে, নৌ-বিভাগকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা ব্যবহার ক'রে এর ফল খুব সন্তোষজনক ব'লে মনে করছেন। Billingham-এ নতুন ফ্যাক্টরী বসেছে, এবং দু'হাজার কয়লাখনির মালিক সেখানে এসে সমবেত হয়েছেন ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করতে। তাঁরা বলছেন এই নতুন শিল্পকে প্রসারিত করবার জন্যে তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবেন। বিলেতের লোকের ধারণা যে এইভাবে কয়লাকে তরল ক'রে যদি Petrol পাওয়া যায় তাহ'লে তেল বা পেট্রোলের জন্য অপর দেশের মুখ চেয়ে ব্রিটেনবাসীদের আর কোনদিনই বসে থাকতে হবে না। সবই নিজের দেশে সস্তায় পাওয়া যাবে।

স্ত্রীর প্রতীক্ষায় পাগল

লোকে নববিবাহিতদের কিম্বা দোজপক্ষ বা পঞ্চমপক্ষদের ঠাট্টা ক'রে ব'লে থাকে 'স্ত্রীর জন্যে পাগল' কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'তে একটু দেরী হওয়ায় মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে, এরকম খবর শুনেছেন কি? জিরাল্ড্‌ হাইন্‌স্‌ স্ত্রীকে ব'লেছিলেন, 'ওগো আজ সন্ধ্যের পর তুমি অমুক রাস্তার অমুক মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকো আজ একসঙ্গে একটু বেড়াবো।' স্ত্রীও ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালেন কিন্তু জায়গাটা হ'ল একটু ভুল—মাত্র বিশ হাত তফাতে। কর্ত্তা এসে দেখেন স্ত্রী তখনও আসেন নি। একটুখানি প্রতীক্ষা ক'রেই তাঁর মাথা এত গরম হ'য়ে গেল যে একেবারে উন্মাদ বল্‌লেই হয়। রাগের চোটে এক ভদ্রলোকের কাঁচের জানালায় এমন এক ঘুসি মারলেন যে কাঁচ তো চুরমার হ'য়ে গেলই উপরন্তু তাঁকে হাসপাতালে যেতে হ'ল। তারপর গোলমাল শুনে স্ত্রীও সেই জায়গায় ছুটে এলেন। ব্যাপারটা ঘটেছে Colorado ব'লে একটি জায়গায়।

H. G. Wells সাহেবের বেতারে বক্তৃতা

কিছুদিন পূর্ব্বে সুবিখ্যাত গ্রন্থকার ও চিন্তাবীর Mr. H. G. Wells ব্রিটীশ বেতার কোম্পানীর আমন্ত্রণে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। খুব শীঘ্রই ভাবী দুঃখ, দৈন্য ও ধ্বংসের মধ্যে জগতের কি ভাবে পতন হবে এই নিয়ে Wells সাহেব আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে জগতের লোকেরা বর্ত্তমানে যে ভাবে চল্‌ছে তাতে তাদের ভবিষ্যৎ যে চিরঅন্ধকারময় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, এবং প্রত্যেকের স্বার্থ এত বেড়ে চলেছে যে এখনও এ সম্বন্ধে যদি সকল জাতি সতর্ক না হয় তা হ'লে ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে প'ড়ে সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই ধ্বংস থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় একটা আন্তর্জাতিক Bank-এর সৃষ্টি করা, শান্তিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা এবং সাধারণ currencyর প্রতিষ্ঠা করা। Mr. Wells এই বাণী প্রচার করবার পর বিলেতের কতকগুলি বড় বড় সমালোচক তাঁকে ব্যঙ্গ ক'রে সমালোচনা ক'রেছেন এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই মত এই যে Wells সাহেব লিখিয়ে ভাল, চিন্তার দিক দিয়েও বড়, তবে সেদিন বেতারে এ রকম আবল-তাবলটা না ব'কলেই সকলের চেয়ে ভাল হ'ত।

অবয়বাংশ, হোটেলের পাঁউরুটি কিনে; পুরোহিত একজোড়া গামছার ঘুঁষে শ্লোকের উপর কাঁচি চালাচ্চেন বিবাহ-সভায়। মানুষ-মেধযজ্ঞে দ্বীপারণ্যবাসীর হাঁড়ি চ'ড়েচে, চতুর্দ্দিকে ক্ষুধিতের ধর্ম্মনৃত্য। কালীঘাটে জহ্লাদ, গির্জ্জায় কামান-পূজো, গম্বুজতলাশ্রিতের সশস্ত্র সঙ্গীতাতঙ্ক। লামার নামজপচক্র, পবিত্র শালগ্রাম-শিলা, মার্কিন চার্চ্চের ধার্ম্মিক ভোজন কক্ষে খৃষ্ট ও ফোর্ডের যুগলমূর্ত্তি। ভেবে দেখো, পম্প্-সু-পরা কার্ত্তিক ঠাকুর, জর্ডন নদীর জল, ধর্ম্মবণিকের ছারপোকা সেবা। সমাধি-ক্ষেত্রে মৃত শ্বেত খৃষ্টানের স্বতন্ত্র চৌরঙ্গী কোয়াটার্স্, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশের শুদ্ধি দ্বার, য়িহুদী ব্রাহ্মের দলীয় দম্ভ। বারবেলা, টিক্‌টিকির তসক্কে, দেবতার অম্বর নিয়ে সংগ্রাম, দেবদেবীর ঝুলনপ্রমোদ, আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বৈজ্ঞানিক বিষবাষ্প।

হেসেচে ভয়ানক, এ যেন কেশর খাঁর কৌতুকে একশো রাজপুতানীর হাসি—ভয়ানক হাসি। বজ্রের বাহন এই বিদ্যুৎ, আকাশে আকাশে ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠেচে। এর মধ্যে মুক্তিকামনার চেয়ে বিদ্রোহবেগ; স্বাধীন মন নয়, সংহারী। ব'লবে, স্বাভাবিক reaction, অত বেশি তামাসায় ধৈর্য্য রাখে অমানুষ। প্রতিক্রিয়ার অবস্থাটাও সুস্থ অবস্থা নয়, তবে প্রাণ আছে তা'রও তো লক্ষণ।

ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান আজ জগৎজনের চোখে ঠুলি পরিয়েচে। মনে প'ড়চে রলাঁকে কবি ব'লেছিলেন, "অবিশ্বাসের দাবানল হু হু ক'রে দেশে ছড়িয়ে যাক্ ভয় করিনে। পুড়বে জঙ্গল, ঊর্দ্ধে জেগে থাকবে বড়ো বড়ো বনস্পতি।" ভারতবর্ষে এই আগুন লাগুক্ একান্ত মনে এই কামনা করি। চোখের সাম্‌নে পিছনে যে নিয়ত অভ্যাসের জঙ্গল আকাশকে চেপে রেখেচে পুড়ে ছাই হোক্, অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখ্‌তে শিখব।

তরুণ রাশিয়া ভুলেচে, যে-বুদ্ধি দিয়ে আজ আচার অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে মানতে বাধচে সেই বুদ্ধিরও একটা ক্রমপরিণতির ইতিহাস আছে। এ কথাও ভুলেচে, অনুষ্ঠান যেখানে সঙ্গত শোভন, সামাজিক ক্ষেত্রে তা'র প্রভাব মনকে মুক্তি দেয়, আনন্দের বিচিত্র কৃত্যে



ইলিয়াঙ্কার শ্রমিক ও চাষীদের কমিসরিয়েট্

পরস্পরের মঙ্গল সম্বন্ধকে ব্যক্ত ও দৃঢ়তর করে। বলবার কথা এই যে সামাজিক ব্যবহার ধর্ম্মের অঙ্গনে তামাসা হ'য়ে দাঁড়ায়। ঢুটোর জট ছাড়াও।

ওরা যে জট ছাড়াতে সম্পূর্ণ পারেনি তা'র মুগ্ধ পরিচয় নূতন মূর্ত্তি ধ'রেচে। ঘরেদোরে, দেওয়ালে জিনিষে

লেনিনের মূর্ত্তি ছবি অত কেন? সভাস্থলে গির্জ্জায় নিভৃত দৈনিক কর্ম্মসূচনায় তাঁকে নিয়ে অর্চ্চনা অনুষ্ঠান শুধু কি তাঁর মানবকত্তার স্মারক না পূজার প্রতীক? আধুনিক বিজ্ঞানীও কি জনগণের অহিফেন খেলেন? তবু বলতে হবে একমাত্র ঐখানে তো এসে ঠেকেচে। অভ্যাসও খানিকটা পৈতৃক সম্পত্তি, রক্তে মনে থেকে যায়। ক্ষয় হ'তে সময় লাগে। ওদের দেশের পূর্ব্বাবস্থার কথা ভেবে দেখো। অন্য দেশের কথা আগেই হয়েচে।

ওরা ব'লবে আমরা তো গির্জ্জায় ধর্ম্ম করি না, ওখানেও উদার সামাজিক ক্ষেত্রে লেনিন ষ্টালিনের মূর্ত্তি রাখি মানুষের মিলনকে শুভময় ক'রতে। মন সম্পূর্ণ সায় দিল না। আসল কথা মানুষের মনে অভ্যাসের আলস্য র'য়ে গেছে, মূর্ত্তিকে পেলে অনেক কাজ সংক্ষেপ হয়। তীর্থপরিক্রমার প্রয়াস আগুনের তুলসিতলায় গিয়ে মেটে। খানিকটা কাঠ মাটি পাথর সিঁদুর বেলপাতা বা জর্ম্মাণীতে ছাপা সস্তা দেবদেবীর পট দিয়ে মনটাকে শূন্যে বোঝাই ক'রে ভাবি যথেষ্ট পাওয়া গেল। রোমান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জার রাজ্য পরিমাণ পূজোপকরণের মণিহারী দোকানে ঢুকে বাস আর ভাববারই দরকার করে না। নিয়মিত ধার্ম্মিক চাঁদা দিয়ে নাম রাখলেই দল আমার হ'য়ে ভাবে এত আয়াস কোথায় পাবে। কম্যুনিষ্ট হ'লেই কর্ম্মী হতে হবে এমন-তরো বিধিবিপরীত ব্যাপার অভাব্য, মূর্ত্তি পেলে বহু নিরালম্ব চিত্ত বেঁচে যায় সেখানেও এখানেও। ধর্ম্মেই বলো, সমাজ ব্যাপারেই বলো অপরিবর্ত্তনীয় মূর্ত্তি বা রীতি স্বাধীন চিন্তার টুঁটি চেপে ধরে। এই জড় দৈত্যের বিরুদ্ধে এত বড়ো সংঘবদ্ধ আন্দোলন আধুনিক রাশিয়ার বাহিরে কোথাও দেখা দেয় নি।

পাথুরে অভ্যাসের দুর্গ চৌচীর হ'য়ে ফেটে যাক্ না—জয় হোক্ নবীন প্রাণের। সঙ্গে সঙ্গে ভালো জিনিষও ধ্বংস পাবে? কৃত্রিম কঠিন আচারকে আঁকড়ে র'য়েচে মানুষের কত সুকুমার হৃদয়বৃত্তি? এইখানে জোর ক'রেই বলব, লোকে ভিতরের কথাটা বুঝল না। মানুষের মন যে নিকৃষ্ট অবলম্বনকে নিয়েও কুসুমিত হ'য়ে ওঠে এতে অবলম্বনটার স্তুতিযোগ্যতা নয়, মানুষের মনেরই দুর্নিবার আত্মবিকাশের সত্যতা প্রমাণিত। এই আত্মপ্রকাশের বেগ আশ্রয় এবং আবেষ্টনের নিকৃৎকর্ষতাকেও ছাড়িয়ে যায়, বাধা সত্ত্বেও, ব্যাঘাতকে হেলা ক'রে।

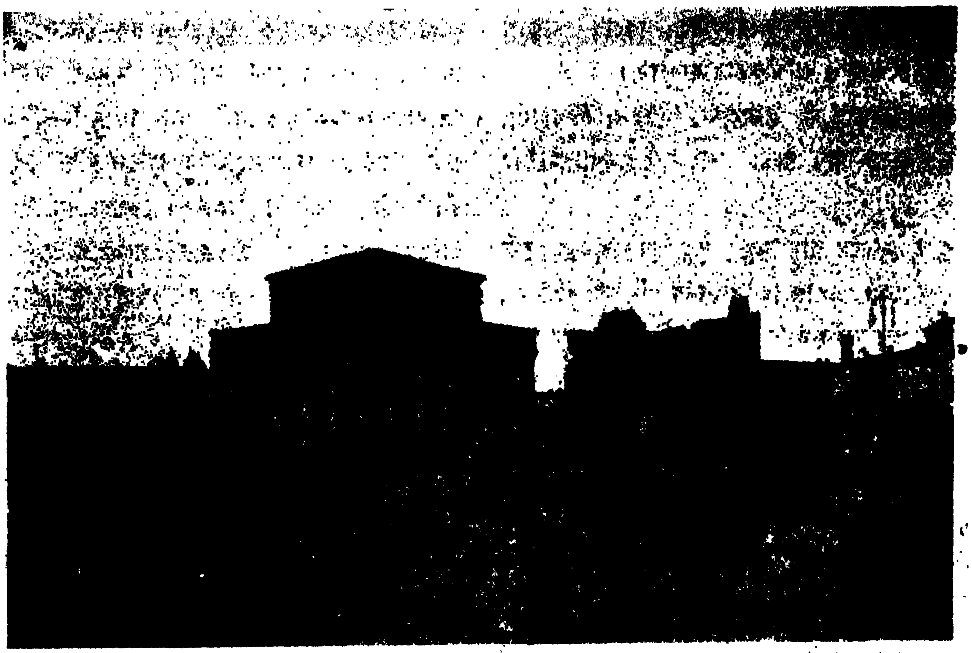
নর-সভ্যতার আদি চেষ্টা মানুষের এই সৃষ্টিবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর অশ্রয় দান করা, একই সঙ্গে এগিয়ে চলেচে প্রেরণাকে ও আধারকে আদর্শানুযায়ী করবার প্রয়াস। দুয়ে মিলে মানুষের আত্মসংস্কৃতির ইতিহাস এই প্রবহমান পূর্ণতাকামী সংসার। এই প্রয়াসের মূল্যেই সমাজ ব্যবস্থার মূল, শিক্ষাসাধনার তাৎপর্য্য। জ্ঞাননির্ম্মেতার কর্ম্মই হচ্চে জীর্ণ পুরানো অবলম্বনকে সরিয়ে নূতন স্থিতি ব্যবস্থার প্রাণময় কেন্দ্র রচনা। ভগ্নাবশেষের ভিত্তিগাত্রে বুনো ফুল ফুটল, নির্ম্মম ধৈর্য্যের সঙ্গে লতার আশ্রয়কে ছিন্ন ক'রতে হয়, উপায় নেই। দেশের বুক জুড়ে পোড়ো বাড়ির শোভা বিস্তার করবে নাকি? এই অতি মায়ার মূলে সকরুণ প্রাণপ্রীতির চেয়ে বেশি আছে, অনাগতের ভীতি, আত্ম-আস্থাহীনতা। ব্যথা লাগে সত্য। সংসারকে সত্যাশ্রয়ী করবার কাজে দরদী এই বেদনা বুক পেতে নেয়। সংক্রান্তি স্নানে একাগ্র মূঢ় আবেগে সংঘ-সম্মোহিত যাত্রীদল ছুটে চলে মেষপালের মতো, বিশেষক্ষণের জলে জীর্ণ দেহ ডুবিয়ে নিতে। হয়তো অনেকের চক্ষে আনন্দের দুর্লভ দীপ্তি ঝলে, মুগ্ধ কৃতার্থতার তৃপ্তি তাদের মনে। তৎসত্ত্বেও। ব্যথা দিয়েও তাদের মুক্ত করতে হবে বড়ো সাধনার দায়ীত্বে। সেখানে নির্দ্ধারিত পথ নেই কিন্তু আবিষ্কারের প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণার দুঃখ মানুষের; বিধিচালিত তীর্থযাত্রীর জন্তুগত সংঘ-সাচ্ছন্দ্যের চেয়ে আত্মগত এই দুঃখের মূল্য গণনাহীন বেশি। ব্যথা যে পায় সেই সত্যকার ব্যথা জাগায়, করুণাশীল পৌরুষের দীক্ষায় সে পুরস্কৃত। বুদ্ধির দীপকে স্তিমিতোন্মুখ ক'রে ছায়াচ্ছন্ন গোধূলি-বিলাসে দিনমণ্ডিত দৃষ্টি নেই, নিষ্প্রভ চেতনায় সেখানে সুখদুঃখ সমান নিরর্থক। পূর্ণ প্রজ্জ্বলিত স্বভাবের অনিবার্য্য জ্ঞানবেগেই মানুষের আত্মপরিচয়, মানুষের ধর্ম্ম;—ধর্ম্ম।

যাঁরা বলেন সমগ্র রাশিয়া আজ অধর্ম্মের তপস্বী তাঁরা ভুল বোঝেন। ঐকান্তিক সমাজ সংস্কারকের কথা ছাড়ো, ওদের দেশেও আছে। হয়তো বেশি আছে। সর্ব্বত্রই

একান্তবাদীর সঙ্গ নমস্করণীয়—দূর হ'তে। রাশিয়ার ভাবকেরা যেখানে ধর্ম্মকে মানচেন না সেখানে তাঁরা পৃথিবী-জোড়া শত সহস্র জ্ঞানীর সমপন্থী। অর্থাৎ তাঁরা ধর্ম্ম ব'লে হাটে বাজারে যে কথাটার চলন তাকে ভেঙে দেখাচ্চেন। মানুষের আন্তর ধর্ম্ম আর লৌকিক ধর্ম্মের ব্যাপক অর্থভেদ নিয়ে সম্যক্

অ। আমার সঙ্গে রিয়ালিটির সজ্ঞান সম্বন্ধ সাধনায় আমার ধর্ম্ম।

ক। য়ুরোপের বাজারে কথাটা চলবে না, হয়তো ভারতীয় হাটেও নয়। তাহলে আমাদের তর্কই বন্ধ হ'ত। রিয়ালিটিকে গ্রহণ এবং ব্যবহার করবার যে চরম সাধনা,



মস্কো—Place Sverdloff
(সম্মুখে থিয়েটার)

আলোচনার পরিসর চিঠিতে নেই। মস্কোএ থাকৃতে তরুণ রুশীয় এক নবপন্থীর সঙ্গে গ্র্যাণ্ড্ হোটেলের ভোজনকক্ষে পরিচয় হয়েছিল। কালো রুটি, চিনি-হীন চা এবং caviarreকে অবলম্বন ক'রে আমাদের যে কথাবার্ত্তা জ'মেছিল তার প্রেস্ রিপোর্ট লিখে দিলে আমাদের বক্তব্যের গতি নির্ণয় করা সহজ হবে। লেথকের নামে অ, এবং আমার বন্ধুর মত-বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপে দিতে হয়, ক। বলা বাহুল্য স্মৃতি কথা কইবে এবং আমার বাংলা ভাষায়।

অ। ধর্ম্মকে তোমরা মানো না ?

ক। ধর্ম্ম বল্লো কা'কে তাই নিয়ে তর্ক।

নির্জ্জনে এবং কর্ম্মের মন্দিরে, তাকে বাদ দেবো কী ক'রে, কেনই বা দেবো ? কম্যুনিজম্ তো রিয়ালিটির সেবা।

অ। তোমাদের খাঁড়া উদ্যত হয়েচে ধার্ম্মিকতার অভ্যাসের 'পরে, যার ভিত্তি হল প্রশ্নহীন বিশ্বাস, মানৎমানা শাস্ত্র পুরোহিত সেবা ? তোমাদের দেশের বুক জুড়ে ছিল Ikon-ধারী গির্জ্জাশ্রয়ী দস্যুর দল, আমাদের আছে মন্দির বোঝাই পাদোদক বিক্রেতা প্রফেশনাল্ পুণ্যের ভাণ্ডারী। তাদের বংশ লোপ ক'রতে চাও।

ক। হাঁ। একেবারে। সমূলে। বিনা দীর্ঘশ্বাসে। ধর্ম্ম কথাটার গহন অরণ্যে আদিম ভয়ে, লোভে, কল্পিত

শঙ্কায় মিলে এমন একটা বিভীষিকা বাসা বেঁধেচে যে তা'র মধ্য দিয়ে পথ পায় কার সাধ্য। বাড়ির চারধারে অতখানি জঙ্গলকে রাত্রিদিন মেনে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলবার অভ্যাসে আমাদের পাকা হতে অর্থাৎ ধার্ম্মিক গৃহস্থ হতে হবে। পুণ্যলাভের এই বিধি। দুর্ব্বল হৃদয়ের 'পরে আগাছার চাষ ক'রে বাস করা যাদের ব্যবসা, সেই সনাতন জংলী বাবাগুলির সঙ্গে পরিচ্ছন্ন জ্ঞানকর্ম্মীর ব্যবধান আকাশ সমুদ্র ব্যাপী, অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতার ব্যবধান।

অ। মানব স্বভাবে যা অনিবার্য্য, চিরন্তন, ঊর্দ্ধগামী, ধ্যান গভীরতা হ'তে যার যাত্রা তাকে তোমরা স্বীকার করচ?

ক। প্রশ্ন ক'রতে পারলে? য়ুরোপীয় শিক্ষায় তুমি ভালো মার্কা পাবে। রাশিয়ায় মানুষের নিয়ম খাটে না, কম্যুনিষ্ট্‌রা বাঘ ভালুকের জাত। না জেনে, বিনা বিচারে তাদের শাপ দেওয়া চলে। যাই হোক, আত্মরক্ষার ওকালতী করব কোন লজ্জায়। তবু কথাটা বলি।

পূর্ণ সত্যকে মানুষ জানবে। একটুও বাষ্প থাকবে না, স্পষ্ট চোখে দেখা। কোথায় এবং কী উপায়ে? বেঁধে ধ'রে বলবার অধিকার কারো নেই। সমাজ দেবে বিচিত্ররূপী জগৎ সত্যের পরিচয়, জ্ঞানের নানান্ অধ্যবসায়ের শিক্ষা। প্রতিদিনের সন্ধানে সংগ্রামে মননে কর্ম্মে মানুষের সজীব সক্রিয় এই শিক্ষা। তা'র মধ্যে আছে অধ্যয়ন অভিনিবেশ চিত্তসংস্থানের নিরন্ত আত্মপরীক্ষা, সমগ্রের মঙ্গল ইচ্ছা তা'র মধ্যে ক্রিয়াবান। এইরূপ শিক্ষার বিশুদ্ধতায় ব্যাপকতায় ব্যক্তিবিশেষের মনে আপনিই যে পথটি সৃজিত হয়ে উঠবে সেই হল তার ধর্ম্মপথ। এখানে আফিস, আদালত, পাদ্রি পুলিশম্যান, শাস্ত্রবচন, পলিটিকস্ এর প্রবেশ নিষেধ— trespassers will be prosecuted। নিষেধ এই অর্থে যে তাদের আদেশ উপদেশ এখানে অবান্তর, বর্জ্জনীয়। ব্যক্তিবিশেষ দাঁড়াক্ পৃথিবীর মাটির উপর, আকাশে তুলুক্ মাথা, আদেশ এবং আশীর্ব্বাণী পড়ুক তা'র সর্ব্বদেহে মনে চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে রিয়ালিটির যে চরম সম্বন্ধ তা'র উপর হস্তক্ষেপ ক'রবে কোন্ মূঢ়, কোন্ সংঘবদ্ধ মূঢ়তার অনুষ্ঠান? সেখানে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াপার্ব্বণ আইকন্ এঞ্জেলের স্থান কোথায়?

সমাজক্ষেত্রে নেমে এসো। আনো ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান এবং সমাজ বিধানগুলিকে। আচার বিচার প্রতীক প্রতিমা বাছাই ক'রে দেখি। ধর্ম্মের অঙ্গন থেকে ঝেঁটিয়ে-ফেলে-দেওয়া মানুষের তৈরী খেলনা খেলাগুলি এখানে মানানসই মতো ব্যবহার হোক্। Clubএ যখন ভোজ, একশো এক মোমবাতি জেলে ঘণ্টা বাজিয়ে নিমন্ত্রণ কর্ত্তার নামমালা কোরাসে জপ ক'রতে রাজি আছি। য়ুনিভর্সিটি স্পোর্টস্-এ শঙ্খ কাঁসরের ধ্বনি সংযোগে পুরোহিতবেশী খেলার বিচারক ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করুন। এরোপ্লেন্-রেসে বরবেশী প্রতিযোগীর দল পুষ্পচর্চ্চিত চন্দ্রাতপ হ'তে গীতমনোহর মুক্ত ভূমিতে উত্তীর্ণ হ'য়ে রৌদ্ররঞ্জিত যন্ত্রগুলিকে মন্ত্রাভয় দিয়ে চলুন ধীরপ্রদক্ষিণে। আকাশবিহারীর জয়নন্দন। বহুদিনাগত সুন্দর প্রথা শোভন অনুষ্ঠানে সঞ্চারিত হোক্ সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে। আন্তর ধর্ম্ম, যার পরিচয় ধ্যানে মননে, দূরনিভৃত আত্ম-সৃজনের গহনে যার উৎস তার সঙ্গে ক্রিয়া পার্ব্বন লোক-সম্মেলনের যোগ আমি মানিনে। সমাজমঙ্গলের আয়তনেই এর সার্থক প্রয়োগ। অর্থাৎ ধর্ম্ম লোকাচারী সামগ্রী নয়: তাকে বিধিবদ্ধ সংস্কার, অভ্যস্ত আয়োজনের নিগড়ে বেঁধে মেরোন।

দেখো, ধর্ম্ম কথাটাকে কিছুকালের মতো ছুটি দাও। মূঢ়মনের মোহমন্ত্র হয়ে উঠে ঐ বাক্যটি চেতনাকে আচ্ছন্ন করতে বসেচে। আমরা তাকে বলেচি, জনসংঘের অহিফেন। কথার নেশা কাটুক, বদলে যা খুসি বলো,— রিয়ালিটির সাধনা, স্বভাবসিদ্ধি। ধর্ম্মকে কিছুদিনের মতো নামের বাসা-বদল করতে দাও। সমাজ কৃতা বহুনামিত হতে বাধা নেই।

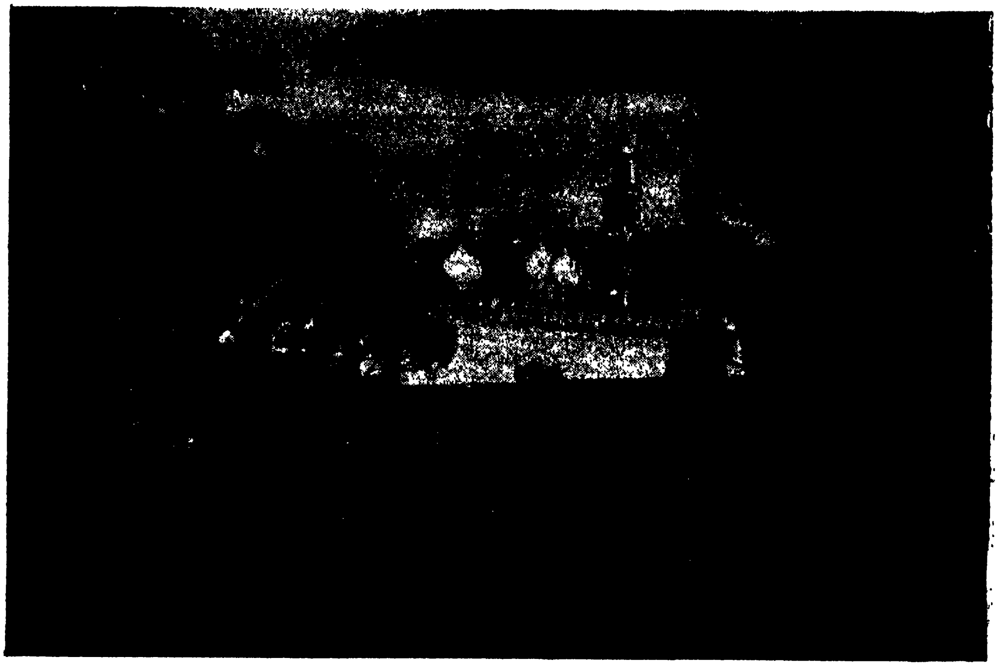
অ। তোমরা নিজেদের anti-religion বলচ বিশেষভাবে ঐ কথাটার প্রতি লক্ষ্য ক'রে?

ক। হাঁ। না, শুধু তাই নয়। ধরো না কেন আমরা সত্যসত্যই ধ্যানধর্ম্ম, আদর্শবাদ, পরমার্থতত্ত্ব কিছুই মানিনে। আমরা কঠিন বৈজ্ঞানিক, বাস্তববিলাসী, দিন মজুরীর কাজে কলের চাকা চালাই। রাস্তার লক্ষ্যস্থল নিয়ে

তর্ক করিনে, যতটা পারি রাস্তা বানাই। বোঝাই ক'রে সুর্‌কি ফেলি, চূনের বস্তা বই, মাটি পেটাই। দোষ কী?

অ। অন্য প্রসঙ্গ এল।

ক। ঠিক তা নয়। দেখো, ধার্ম্মিক দলের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না—আমাদের ধাতে সইবে না। ব্যাপারখানা তো কম নয়। কম্যুনিষ্ট্‌ বিপ্লবের কিছুকাল পূর্ব্বে—মনে হয় যেন প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগে—গির্জ্জার বিশপ নিরন্ন মাঠের ধারে পুরোহিত নতজানুর দলকে ভাবনা হতে স্বস্তি দিতে চললেন, দক্ষিণাও জুটল, খৃষ্টধর্ম্ম ত্রাণ হল। তোমরা এশিয়াটিক, জানা আছে তোমাদের, মারী মড়কের সময় অদৃশ্য দুর্গ্রহ দেবতাদের উদ্দেশে বলি দিয়ে, অতি ভোজনে কিম্বা অনশনে, ক্রমান্বয়ে ঢাক ঢোল সহযোগে রাত্রিযাপন ক'রলেই দায়ীত্ব মোচন হয়—ফলে মারী থামেনা, কিন্তু দলে দলে মরণভাগ্যবানেরা নির্ব্বাণ মুক্তি পায় তো।



Novodevitchy আশ্রমের মিউজিয়ম
(পশ্চিম দিক হইতে)

গ্রামে ধর্ম্মের তাড়নায় উপস্থিত হতেন তাঁর কণ্ঠ হ'তে কেবলি বাণী নির্গত হত—আকাশবাণীর মতো, এত সূক্ষ্ম যে স্থূল মর্ত্তলোকে তার ব্যবহার চলে না। ঘরে নেই ধান, মনে নিরাশ্বাস, রোগের রাজত্ব শরীরে সমাজে, জানলাহীন কুসংস্কারে মলিন আবদ্ধ দিনগুলি শঙ্কায় ক্ষোভে আবর্ত্তিত। ধর্ম্মবীজের এমন অনুকূল ক্ষেত্র কোথায় পাবে। অনাবৃষ্টিতে ক্ষেত গেল জ্ব'লে, জলের ব্যবস্থা নেই, মনের ক্ষেতে দেবদানবের ধার্ম্মিক ফসল ফলানো চ'লল। তাগাতাবিজ নিয়ে

আমরা নির্ব্বাণ মুক্তির ধার ধারিনে। জানি পৃথিবীর বাসাকে, জানি অপূর্ব্ব এই মহাজীবনকে, প্রাণলোকের নিত্য এই জয়ন্তী উৎসব ক্ষেত্র। গ্রামে যখন যাই অন্ধকার-করা গাছ কাটাই, জানলা ফোটাই, ওষুধ ঢালি নালায় পুকুরে, মানুষগুলিকে তাগিদে উদ্যোগে অস্থির ক'রে তুলি। ওরা গির্জ্জার আশীর্ব্বাদ চাইতে জানে ধনধান্যের মঙ্গলার্থে, আমরা আনি নূতন হাল, গ্রামে গ্রামে বসাই বিদ্যুতের যন্ত্র। আলো জলে, ঠাণ্ডা ঘরে আনি উত্তাপ, তেলের গন্ধের,

কাপড়ের বিবিধ ব্যবহার্য্যের কল চালাই। ধর্ম্ম ঢোকে মোটরের চাকায়, বিশুদ্ধ পানীয় জলে, ভালো রাস্তায়, পরিচ্ছন্ন বাড়িতে। অধার্ম্মিকের এই কাণ্ড। অনুশোচনা হল না। যে-মানুষ দৈববাণী চায় তা'র হাতে দিই Statistics—জন্মমৃত্যু শিক্ষা অশিক্ষার তালিকা যাতে দেশের প্রাণস্পন্দন আঁকা পড়ল। উপদেশ হয় কর্ম্মে মূর্ত্ত, বাণী বাঁধা পড়ে ইঁটকাঠ পাথরে। আমরা জানি মাটির পৃথিবীকে, রক্তমাংসের মানুষকে, মানি জ্ঞানকে বিজ্ঞানকে, সংসারকে গোড়া থেকে গ'ড়ে তুলতে চাই। পাকা গাঁথুনি, স্থায়ী এবং সুন্দর হবে তা'র নির্ম্মাণ। কর্ম্মের মধ্যেই পাই চরম সার্থকতা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টির আনন্দস্পর্শ লাগে মনে। অন্ত নেই এই কর্ম্মের, স্বপ্ন নিয়ে থাকবার সময় কোথায়? যদি বলো সবটাই সজীব মূর্ত্তিমান স্বপ্ন তবে আপত্তি করব না। নূতন জীবনের এই জাগ্রত স্বপ্ন, চোখে-দেখা কানে-শোনা হাতে-ছোঁওয়া নিরন্তর বিকাশমান মর্ত্ত্যজীবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগ কর্ম্ম ভাবনায় কঠিন উদ্যত এই অধার্ম্মিকের স্বপ্ন।

অ। চমক লাগে তোমাদের উৎসাহের এই দীপ্তিবেগে। ধর্ম্মবিলাসী যুগজীর্ণ মানুষের দেশ থেকে এসে মনে হল যেন নূতন মর্ত্ত্যলোকের পথ-মোহানায় এসেচি—প্রাণমুখরিত সত্তার প্রবাহ চতুর্দ্দিকে। বলব কী, বুকে ঢেউ লাগাবার জন্যে রাতে নেমে আসি রাস্তার উপরে। কনকনে ঠাণ্ডা, পথগুলো অজানা, অবোঝা কথা কইচে যেন আজগুবি ভাষায়—কিন্তু কিছু মনে থাকে না। পথ হারিয়ে বিপন্ন হয়েচি, সে অনেক কথা কিন্তু আসল কথা এই যে সত্যকার পথ খুঁজে পেয়েচি।

বারম্বার চোখের সামনে মানবলোক অপূর্ব্বরূপ নিয়ে খুলেচে, মস্কৌএর পথে পথে ঘরে ঘরে যে উৎসুক নিবিড় আশার দ্যুতি দেখেচি তাতে জীবন ধন্য হল। যেন ভবিষ্যতের রৌদ্রোজ্জ্বল বাতায়নে দাঁড়িয়ে মানবের মহাযাত্রার ছবি দেখলাম, দেশদেশান্তের ইতিহাস মিলে চলেচে যে তীর্থ-সঙ্গমের দিকে। আজ ভূত পালাবার দিন; ধর্ম্মের, রাষ্ট্রের, সমাজের পৈতৃক অপদেবতাগুলির পিণ্ডদান উৎসব। মানুষের হাত, মানুষের বুদ্ধি বীর্য্যযুত সৃষ্টির কাজে লেগেচে। আর কোনো শক্তিকে তোমরা না মানো যদি তো ক্ষতি নেই, কেননা মানুষের পূর্ণশক্তির মধ্য দিয়েই বিশ্বশক্তিকে তোমরা প্রয়োগ করচ।

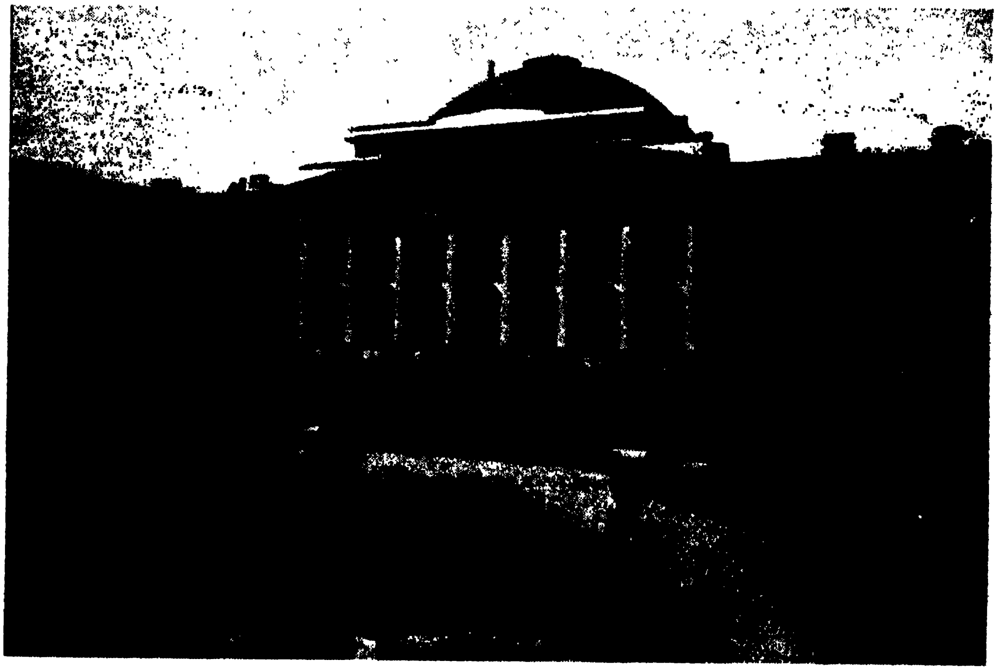
আমাদের কবি যে পথের পরিচয় দিয়ে এসেচেন অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে, তোমাদের কাছে এসে তার মহিমা উপলব্ধি করলাম এই দূরপ্রান্তে প্রবাসীর নবচেতনা দিয়ে। বৈতালিকের দল তোমরা, প্রদোষসঙ্গীত গেয়ে চলেচ নিদ্রিত রাজপুরীর পথে পথে। ঘরে ঘরে জানলা খুলল, বিরামবাসীর ঘুম হেনে' পথের দিকে টানল তোমাদের বিজয়শঙ্খনির্ঘোষ।

বলছিলে পথ তৈরী করচ, বাধার পাথর ভেঙে, চলবার উদ্দেশে। এরই আনন্দে তোমরা মজুরী করচ, পথের শেষের কথা কখনো ভাবো না। তোমাদের কাজ তোমাদের কথার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দিচ্চে। সজীব মনে প্রারম্ভ এবং শেষের চল-ধারার নিরন্ত সম্মেলন, না জেনেও তোমরা দূরকালাশ্রিত ভাবনাকে মূর্ত্তি দিচ্চ, এবং জেনেও। শেষের দিগন্ত ক্রমাগত সাম্নে স'রে যাচ্চে, চেতনার পরিসর কর্ম্মের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে পূর্ণতর পূর্ণতার রাজ্য জিনে নিল। তোমরা বস্তা বইচ, ভিত্তি গাঁথচ, বাড়ির কোনো প্ল্যান্ তোমাদের মনে রূপ নেয় নি এ কথা মান্‌লে মানতে হয় ড্রাইভর নেই, অথচ রেলগাড়ি সমেত এঞ্জিন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটচে গন্তব্যহীন অন্ধ ভরসায়। পাগলের চলা তোমাদের নয়। পুলিশের প্যারেডও নয়। চলার বেগ এবং লক্ষ্য এই দুয়ে মিলে মানুষের স্বাভাবিক চলা—তা'র মধ্যে পূর্ব্বনির্দ্ধারণ এবং পরিবর্ত্তন দুয়েরই মিল। ধর্ম্মপথ কর্ম্মেরই পথ, সত্য কর্ম্মের, অর্থাৎ যে-কর্ম্মে মানুষের সমস্ত স্বভাবের পরিচয়। মানবসভ্যতাকে এই কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাও—কথায় ধর্ম্মকে মানো বা নাই মানো তাতে ভয় পাই নে।

ক। কবে তোমাদের মন্দির-ধর্ম্মের ধ্বজা লুটোবে নিরহঙ্কার ধূলোর 'পরে, ধর্ম্মব্যবসায়ীকে কঠিন কাজে খাটিয়ে নেবে নয়তো পুরবে গারদের মধ্যে, যাতে তা'রা মোহবিষ খাইয়ে মানুষকে না মারতে পারে? জাতিবিচারী পুণ্যবণিককে কোন্ শুভদিনে পৃথিবীর হাটে বাজারে মানুষের মর্য্যাদা শেখাবে? বল্‌তে চাও, গায়ের জোর না হ'লেও তা'রা টল্‌বে?—যারা ব্রাহ্মণ শূদ্র মানে, যারা জন্তুর চেয়ে ঘৃণা করে মানুষকে—এবং জন্তুকেও যারা অত্যাচার করে বিনাদ্বিধায়?

অত লক্ষ অন্ধ মানুষ চাইবে স্বাধীনতা, নিজেদের দেহমনকে অজগর সাপ দিয়ে জড়িয়ে বলবে আমরা মুক্তিপথের যাত্রী, সাম্নে থেকে সরো? মারবে না তোমরা ওদের ভিতরের মার, বাহিরের মার, সমাজ ও ধর্ম্মের ভূত-পোষা যাদের ব্যবসা তারা পথে ঘাটে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবে ?

অ। মারের জন্যে কিছু ভেবোনা—আমাদের দেশে ওটা না চাইলেও জুটবে। দিন এসেচে, এল ব'লে। বড়ো মারেই দেশকে এক করবে, কমোরিন থেকে হিমালয় তলে তলে প্রবাহিত। পরম দুঃখের অগ্নিযোগে আমরা অব্যবহিত কাছে দেখব মানুষের পরম পুরুষকে—সর্ব্বজনের ইতিহাসে যিনি বিকাশমান, এবং সর্ব্বদেশের। তীব্র বেদনায় ভারতচিত্তের উদ্বোধন হচ্চে—দশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশকে চিন্‌তে পারবে না। ব্যক্তিগত বা সংঘবদ্ধ বাহিরের মার মারীর মতো—তাতে নির্ব্বিচার ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা—তাতে নবজীবনের মন্ত্র নেই। জাগরণের বেদনা মানুষের নিত্য সঙ্গী হোক্, এবং জাগরণের আনন্দ—দুয়ের মধ্য দিয়ে



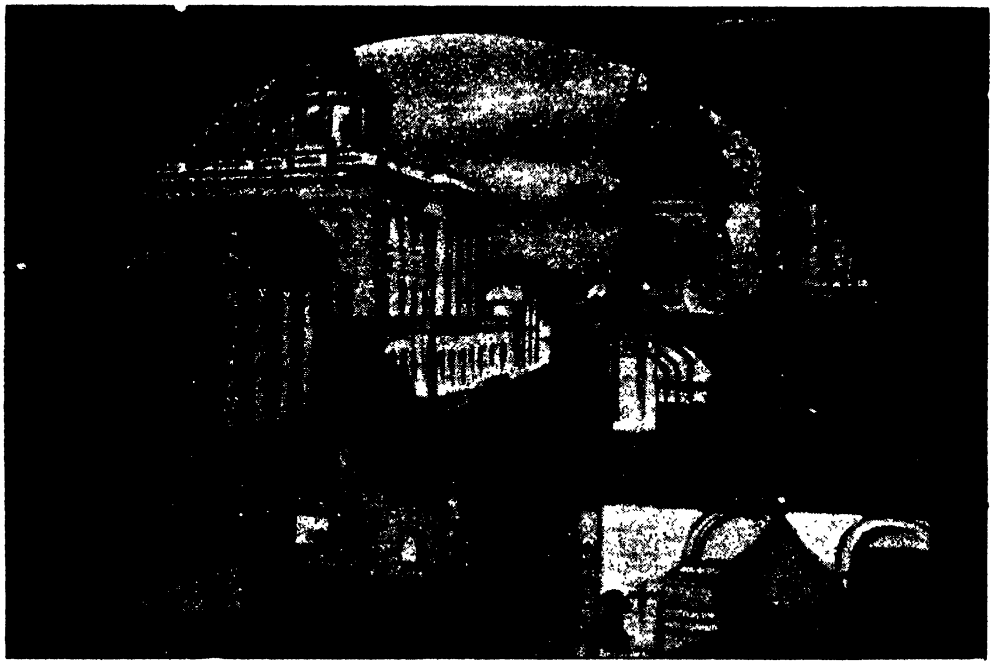
মস্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়

। দুঃখের দেশ-জোড়া আসনে সবাইকে মাটির কাছে টেনে বসাবে, উচ্চ গদী থেকে, মন্দির বেদী হতে, শুচিতার বেড়া ধ্বসিয়ে। কালীবাড়িতে জীববলি পর্য্যন্ত হয়তো বন্ধ হবে, বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা ভেবে অশ্রুজল ফেলো। কিন্তু এও জেনো, যতই খসবে বাহিরের আড়ম্বরের বোঝা, ভারতবর্ষের লোক ততই চিনবে আপন অম্লান আত্মিক ধর্ম্মের মহিমাকে। যে-মহিমা শত বাধা বিরোধ সত্ত্বেও আজও তাঁ'র কাব্যে শিল্পে সমাজ ব্যবহারের মঙ্গল কর্ম্মের প্রবাহ বইয়ে চলা মানুষের ধর্ম্ম। স্বীকার কোরো, তার মধ্যে ধ্যানও আছে। বলা বাহুল্য সে-ধ্যান সমাজে গিয়ে দেড় ঘণ্টা হিতবাক্য বক্তৃতা দেওয়া নয়।

ক। তোমাদের দেশ দুঃখকে মানতে অদ্বিতীয়,—ভয় হয় অহিংস নীতির মত্ততায় তোমরা জেলে ঢুকে তুরীয় মুক্তির আনন্দে ব'লে বসো, জেলই বা মন্দ কি, সমস্ত সৃষ্টিই তো বন্ধন, কারাগার। তাহ'লে তো আর কথাই চলে না।

অ। শ্মশানবিলাসীর দল টেঁকে যখন ভিক্ষে দেয় অন্নে। যখন দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান হবার উপক্রম হবে তখন ক্ষুধার তাড়ায় বৈরাগীকেও চাষ করতে হবে, সংসারেরই ক্ষেতে জল দিয়ে, মাটি কেটে। সে-দিন আসন্ন। এক-দিকে অনিবার্য্য সাংসারিক অভাবের দুঃখ, অন্যদিকে জীর্ণ মনের শাপ-মোচনের বেদনা—এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ জাগবে।

ক। বাহিরে বিপ্লব না করে, ধর্ম্মবাড়ির ছাতগুলো রাতারাতি না ভেঙেও তোমরা দেশকে যদি অন্তরের মুক্তি দিতে পারো তবে জগতে নূতন ব্যাপার ঘটাবে। য়ুরোপে ভিন্ন ওষুধের দরকার—বোধ হয় সব দেশেই। যাই হোক্, নমস্কার তোমাদের, তোমরা যাকে মানুষের মুক্তি ব'লে মানো সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে তাকে জয়ী ক'রে তোলো, দেখ্ব আমরাও। ইতিমধ্যে আমাদের কাজও হুহু ক'রে চলবে, তোমরাও তার ফল পাবে, ভেবোনা।" * * *



লেনিনের নামে সাধারণ গ্রন্থাগার
(পশ্চিম দিক হইতে)

ইত্যাদি। একখানা চিঠির অঞ্জলিতে যতটা পারি নমো নমো ক'রে এদের কিছু কথা দেশে পাঠালেম। শেষ করি পুনর্ব্বার Godless Museumএর কথা দিয়ে, আমার কলমে নয়, ধার্ম্মিক Quakerএর কলম দিয়ে। সেদিন যে কথা তাদের সব চেয়ে বড়ো পত্রিকায় বেরিয়েচে তা প'ড়ে দেখো।

"This building has been closed as a place of worship, not one is told, by order of the Government but by request of the Parishioners. "No church has been closed by the Government" but the Government have fitted it up as a museum—an Anti-God museum.......

There are part tableaux and part pictures of uncivilized religious practices.......There

দোকানদারের বিপদ্

পূজোর সময়, বড়দিনের সময় কলকাতায় অনেক দোকানদার লাল সালুর ওপর সাদা কাপড়ে Sale ব'লে লিখে রাখেন। সস্তায় জিনিষপত্র বিক্রী করবার জন্যে খদ্দের আকর্ষণের এ একটা উপায়। কিন্তু এই রকম সস্তায় জিনিষ বিক্রী করতে গিয়ে নিউ ইয়র্কের এক দোকানদারের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে। May's Speciality Shop নিউ ইয়র্কের খুব একটা বড় দোকান, আমাদের এখানে Hall & Anderson বা Whiteaway Laidlawর চেয়ে বড়। সে দোকানের জিনিষপত্র ভাল বটে কিন্তু দাম বড্ড বেশী। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে দোকানে একটা বিজ্ঞাপন—আধা কড়িতে জিনিষ বিক্রী হবে। খবরটি রটুতেই ১০ হাজার মহিলা দোকানে ঢুকে এমন সোরগোল লাগালেন যে মনে হ'ল সকলে দলবদ্ধ হ'য়ে লুঠ করতে এসেছেন। ব্যাপারটা শেষকালে লুঠের মতই দাঁড়ালো। ৪৫ মিনিট রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ। দোকানের কাঁচের সার্সিগুলো ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। একজন পুলিশের কনুইয়ের দফা চিরকালের মত রফা হ'য়ে গেছে। ৪০ জন পুলিশ, ২ খানা এম্বুলেন্স্, এবং আরও দু'দল অতিরিক্ত পুলিশকে ঘটনাস্থলে এসে জনতার সঙ্গে পাল্লা দিতে হ'য়েছিল। যারা ভিড়ে আহত হয় তাদের হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। দোকান খোলবার আগে রাস্তায় যখন দশহাজার মহিলা এসে জমায়েৎ হলেন তখনই অবশ্য পুলিশ এসে হাজির হয়। তারা এসে দেখে যে দোকানে ঢোকবার জন্যে সকলে ভীষণ গুঁতোগুঁতি আরম্ভ ক'রেছেন। দোকানের মধ্যে প্রলোভন সবচেয়ে বেশি ছিল এই যে—যে-কোন পোষাক ৩৲ টাকায় বিক্রী হবে। এই সস্তায় মাল বেচ্‌তে ও কিন্‌তে এসে দোকানী এবং খরিদ্দার উভয়কেই রীতিমত আক্কেল সেলামী দিতে হ'ল। ভীড়ের চাপে কত ছোট ছোট ছেলে যে তাদের মার কোল থেকে ছট্‌কে গেছে তারও সংখ্যা হয় না। তা' ছাড়া মেয়েদের হ্যাট্, সেফ্‌টিপিন্, লেস্, হার, বোতাম, পকেট বই রাস্তায় ছড়াছড়ি হ'য়েছে। পুলিশ সেগুলিকে কুড়িয়ে থানায় নিয়ে গেছে এবং উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে পারলে সেগুলিকে ফিরিয়েও দিচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে এই রকম একটা ছোটখাট যুদ্ধ হবার পর তবে নারীরা একটু শান্ত হন।

চিত্রগুপ্ত



পাহাড়ী বাঁশী

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত

১

সাধুজির সঙ্গে দেখা কুম্ভমেলায়।

কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন "সাধু-সঙ্ঘের এক গুপ্ত কেন্দ্র আছে হিমাদ্রির এক দুর্গম নিভৃত ক্রোড়ে,—মাঝে মাঝে পর্ব্ব-উপলক্ষে তাঁরা সমতল ভূমিতে নেমে আসেন।"

পথের সন্ধান জানতে চাইলে, তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলেন, 'বাছা, তুমি কি সেখানে যেতে পার্‌বে?'

সেখানে আমি যেতে পারব না জেনেই পথের সন্ধান আমায় দিয়েছিলেন।

তার পর বহুদিন কেটে গেছে। ক্লাসে ভূগোল পড়াতে পড়াতে ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙানো দেখ্‌লেই মনে হোত ওই কাশ্মীর থেকে আরাকান পর্য্যন্ত কালো দাগের ভিতর কী যেন এক রহস্য জড়ানো আছে। মনে হোত কালো দাগটা আমায় হাতছানি দিচ্ছে।

গ্রীষ্মাবকাশে তিন জন বন্ধুমিলে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করা গেল। রেলষ্টেশনে নেমে পাহাড়ের দুর্গমতা দেখে দুটি বন্ধুই ফেরত গাড়ী ধরলেন। বাকী রইলাম আমি। সাধুজির নির্দ্দিষ্ট পথ ধরলাম।

হিমালয়ের পাদদেশে এসে মনে হোল, উচ্চ শৈল-শিখরের মধ্যে কি যেন রহস্য আমাকে আহ্বান করছে। দিগন্ত প্রসারী মেঘপুঞ্জের পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যপটের মধ্যে কি যেন একটা যাদু! পাহাড়ের গায়ে গায়ে সন্ধ্যার মেঘ-ম্লান রূপের মধ্যে কি যেন একটা মায়া! মন বলে, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, ওই দিকে হয়তো পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথ, ওই দিকে সন্ন্যাসীদের গুপ্ত সভা, হয়তো বা জ্ঞানের দীপালি উৎসব, হিমে ঢাকা কুহকলোকে লুকানো আছে।

দূরে দেখ্‌ছি একটা পথ চলে গেছে মেঘবীথির ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে,—যেন অজানা মেঘের রাজ্যের দিকে স্বপ্ন-লোকের দিকে, পরপারের দিকে। জীবনের মত হাসি-কান্নায় ভরা, রৌদ্রছায়া-ভরা, হিম-শীতল বাতাসের আলিঙ্গন ভরা এই পথ। হয়তো আমি চলেছি চির-তারুণ্যের নির্ঝর যেখানে, অমৃতের সন্ধান যেখানে।

গাঢ়নীল মুক্ত আকাশের তারাগুলো হাতছানি দেয়। চাঁদের আলোয় পাহাড়ী বনভূমি উপত্যকা এক ধোঁয়াটে মায়াসৃষ্টির মত জাগে। আবার আসে দল বেঁধে কুয়াসা, খণ্ডমেঘের সারি ঢেকে দেয় চারিধার। এই রূপালি আলোর দেশে, পাহাড়ী ধোঁয়াটে রঙে, কুয়াসা মেঘের মাঝে মন যায় আনমনা হয়ে, ওই নীল আকাশের কোলে ভেসে বেড়ায়। চাঁদের আলো-লাগা খণ্ডমেঘের মত যদি এই জীবনের ভেলা সীমাহারা নিখিলের পাথারে পাথারে ভেসে বেড়াতো!

পরক্ষণেই চারিদিক অন্ধকার করে এলো, ধূসর পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো পেঁজা তুলোর মত মেঘ, বনানীর শীর্ষে শীর্ষে জমে থাকা কুয়াসা, দূর নীলিমা, একটা ধূসর যবনিকায় হারিয়ে গেল। দুর্দ্দিনের ছায়ার মত ঘনায়মান মেঘে চারিধার ঢেকে গেল। এখন আর আকাশে চাঁদ নেই, তারকা নেই, আছে কেবল বিভীষিকাময়ী তিমিরের একটানা পর্দ্দা। তাই ভেদ করে যেতে হবে। চারিদিকে যেন মৃত্যুকরাল প্রেতছায়ার অট্টহাস। সেই জনমানবহীন উপত্যকায় মনটা যেন ছম্ ছম্ করে শিউরে উঠ্‌ল। তখন দেখি সাম্‌নে এক গুহা। সেই গুহা ভেদ করে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়্‌ছে। বড় বড় পাথরের খণ্ড তারি ভিতর ইতস্ততঃ ছড়ানো, আশ্রয় নিলাম তখনকার মত সেই গুহায়। ভাবলাম, নির্জ্জন পার্ব্বত্য গুহার মতোই এই ধরণী জীবনের চলা পথের এক পান্থনিবাস।

২

বসে আছি নড়বার উপায় নেই। চারিদিকে আমার কেবলি মেঘ, কেবলি তুষার। গুহাই আমার সে রাত্রির মুসাফির খানা। গভীরতম নিরাশার বুক চিরে ধর্ম্মের আলো ফুটে উঠে, গভীর ব্যথার মধ্যে কোথাকার এক আনন্দ ধরা দেয়। হিম-গিরির এ নিঃসহায় নির্জ্জন গুহায় মনে হোল, আমি কোথায়? এই প্রশ্ন মানুষের অনাদি কালের,—কোথা হোতে আস্‌ছি, কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি। সেই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এলো আমার কাছে, এই নিঃসঙ্গ নিরালা আঁধার গুহার এক কোণে। টস্ টস্ করে জল পড়্‌ছে গায়ে, যেখানেই সরে যাই সেই খানেই জল। গুহার বাইরে চেয়ে দেখি, অন্ধকার, কেবল অন্ধকার। সেই সাধুজি বলেছিলেন, 'ভয় করোনা, ভয়ই মানুষের মৃত্যু, সাহসই জীবন!' সেই গুহায় বসে তাঁরই এই কথাগুলি মনে পড়ল, মনে সাহসও বাড়্‌ল। যতো রাত্রি গভীর হয়ে আসে দূরের এক ঝরণার ঝর ঝর শব্দ তত স্পষ্টতর হয়ে আসে।

এমনি বসে আছি, হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সেই অন্ধকার গুহা ভেদ করে প্রশ্ন উঠ্‌ল—কে তুমি?

অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। উত্তর করলাম আমি পথিক।

সহসা চকমকি আলো জলে উঠ্‌ল। কাঠে অগ্নিদান, পরে ধুনো জলল। দেখ্‌লাম এক দীর্ঘকায় জটাজুটধারী সাধু। প্রণাম করলাম। সাধুজি বল্লেন, এই দুর্গম হিমগিরির পথে যে যাত্রীরা আসে, তারা এ পারের ভাবনার পুঁটুলি পেছনে রেখে আসে। তুমি কি যেতে পারবে? তুমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছ, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ তোমাদেরই জিনিষে তোমরা নাগাল পাচ্ছ না। তোমরা এতই ছোট হয়ে গেছ।

চুপ করে সাধুর কথা শুন্‌ছি।

সাধুজি বলে যাচ্ছেন,—ভারতের সাধনা মাত্র লোটাকম্বল গেরুয়ার সমারোহ নয়, ভারতের সাধনা অমৃতের দিকে, চির-তারুণ্যের দিকে জয়যাত্রার অভিযান!

* * *

পরদিন প্রভাতে সাধুজি আমায় এগিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে চললেন।

কুয়াসায় হারানো পথ চল্‌তে চল্‌তে পাওয়া যায়, মেঘ-কুজ্ঝটিকায় হারানো আলো ফাঁকে ফাঁকে উপত্যকায় উঁকি মারে, পাখীদের হারানো গান সহসা কোথা থেকে জেগে উঠে, হারানো ঝরণার ঝর ঝর আবার শোনা যায়। এমনি আমাদের পথ। জীবন-যাত্রীর মত কুয়াসার দল, খণ্ড-মেঘগুলো কোন অনির্দ্দিষ্ট পথ ধরে কোথায় মিলিয়ে যায়, তাদেরও পথ আছে, পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকার পাশ দিয়ে দূর দূর সীমান্ত রেখার দিকে।

এদিকে দেখ্‌ছি একটা বহুদিনের শুখ্‌নো ঝরণা,—ভাঙ্গা পাঁজরের মতো—নবীন জলস্রোতের আশায় মুস্‌ড়ে পড়ে আছে। এমনি সারাদিন পাহাড়ে উঠ্‌ছি নাম্‌ছি। ক্রমে দেহ অবসন্ন হয়ে আসে পা আর চলে না।

কাতর হয়ে সাধুজিকে বল্লুম—সাধুজি, এই পর্য্যন্ত, আর চল্‌তে পারি নে।

সাধুজি হেসে বল্লেন,—এ পথ-চলার সাধই তোমাদের আছে, কিন্তু সাধনা কই?

সেইখানেই বসে পড়্‌লাম। জিজ্ঞাসা করলাম—সাধুজি সেখানে আছে কি?

হাস্‌তে হাস্‌তে সাধুজি বল্‌লেন—সেখানে আজ সাধুদের মহাসভা, ধর্ম্মগ্রন্থাগার, লুপ্ত গরিমার গুপ্ত মন্ত্র।···ফিরে চল, সে পথে যেতে পারবে না, সে পথ আরও দুর্গম আরও ভীতি সঙ্কুল!

নিজের অক্ষমতায় লজ্জিত হয়ে নিরাশায় মুস্‌ড়ে পড়্‌লাম। সাধুজি আবার ফিরতে পরামর্শ দিয়ে উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন। উপনিষদে বলেছে এ সৃষ্টিটা একটা যজ্ঞ, দেখ্‌ছনা হিমগিরি শিখরে শিখরে ধূঁয়ার মত তুষার মেঘের আহুতি বর্ষেছে। আমাদের জীবনটাও একটা যজ্ঞ। যজ্ঞের যাজ্ঞিক [illegible], সাধন কর্‌লেই এই পথ তোমার কাছে সরল হয়ে আস্‌বে। দুঃখ করোনা। আবার এসো, আবার চেষ্টা ক'রো। এখনি তুমি যেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছ, তাতে মনে হয় পথেই তুমি মৃত্যুমুখে পড়্‌তে পার। আমার কথা শোন।···সেদিনকার মত সেইখানেই বিশ্রাম করে পরদিন প্রাতে ফেরার পালা।

সাধুজি বল্‌ছেন—দেখ, এই হোল প্রার্থনার সময়। এই জীবন একটা প্রার্থনা। অমৃত সাগরে ঝাঁপ দেবার আগে এই প্রার্থনার মধ্যে নিজেকে তলিয়ে দাও।

ফিরছি এবার। জীবনের উত্থান-পতনের মত তরঙ্গায়িত বন্ধুর পথ, দূরে বহু দূরে, তুষারশৃঙ্গশ্রেণী ঝল মল করছে। নির্জ্জন নিরালা পথ চেয়ে ফেরার পথে চলেছি।

চলা পথ শেষ হয়ে আসে। আবার ধূসর সন্ধ্যার ছায়া পাহাড়ে পাহাড়ে খেলা করে।

দূরের পাহাড়ী পল্লী থেকে কে যেন বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছে। একি মোহ-মদিরা-সিক্ত আত্ম-বিস্মৃতির পথে, হাসি-কান্নায় ভরা জীবন-বীথির পথে ফিরে যাবার কথা, না, কর্ম্ম-কোলাহলের মাঝখানে যে কঠোরতম সাধনার মর্ম্মকথা লুকানো আছে, তারি অকরুণ সুন্দর প্রতিধ্বনি?

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

অভিনয় জগৎ

প্রথম কথা

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম্-এ, বার্-এট্-ল

নট্যমঞ্চে আমরা আর্টের যে রূপ দেখ্‌তে চাই, তা বিভিন্ন আর্টের একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং মনোহর সমাবেশ। যদি তার কোনও দিকে কোনও ত্রুটী ঘটে তাহলেই তা গুণগ্রাহী দর্শকের চিত্তে পরিপূর্ণ রসোপলব্ধিতে বাধা জন্মায় এবং সে ত্রুটী অমার্জ্জনীয়। যেমনতর কোনও ঐক্যতান বাদ্যে কোনও একটি যন্ত্র বেসুরো বাজ্‌লেই তার ফলে শুধু যে সমস্ত ভাবটাই নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায় তা নয়; রসিকের মনে ব্যথা দেয়।

কোনও একটি নাটকের অভিনয় সার্থক করতে হলে কতকগুলি বিভিন্ন আর্টের সমান্ তালে চলা দরকার। যথা, প্রযোজনা (Production), অভিনয় (acting), সঙ্গীত এবং নৃত্য যদি নাটকে তার কোনও স্থান থাকে। অবশ্য সর্ব্বোপরি নাটকখানির মূল্য থাকা দরকার সাহিত্য এবং রসের দিক্ দিয়ে। এবং কেবলমাত্র সমান তালে চল্‌লেই অভিনয় সার্থক হয়ে উঠ্‌বেনা কেননা এই বিভিন্ন আর্টের চলার পথ-ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার। তাদের গতি যদি বিভিন্নমুখী হয়, তবে ফল ত সুখকর হয়ই না বরং সময় সময় নিদারুণ হয়ে ওঠে।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বল্‌বার চেষ্টা করি। জগতে রসের ইতিহাসে দেখ্‌তে পাই, আর্ট নানা পথ দিয়ে নানান্ রূপে, নানান্ ভাবে নিজেকে সার্থক করে তুলেছে এবং আর্টের কোনও একটি ধরা বাঁধা পথ আজও সুনির্দ্দিষ্ট হয়নি এবং হতে পারে বলেও মনে হয় না। জগতের বিভিন্ন প্রতিভা বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে—সার্থক্ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন পথে।

অনেক আর্ট সমালোচক অবশ্য আর্টকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—আদর্শপন্থী এবং বাস্তবপন্থী। উচ্চ অঙ্গের আর্টকে যথার্থই এইরূপ কোনও একটি বিশিষ্ট ধাপায় ফেলা চলে কিনা জানি না; তবে এটা ঠিক নাটকখানি যদি উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য হয় তবে তার অন্তরের একটা বিশিষ্ট রূপ থাক্‌বেই। এবং সেই রূপের সঙ্গে নাট্যজগতের আবহাওয়া দৃশ্যপট সাজসজ্জার একটা নিবিড় সামঞ্জস্য থাকা দরকার। নাটকের প্রযোজনা যদি যথার্থ উচ্চ অঙ্গের রসও সৃষ্টি করে, তবুও তা যদি নাটকখানির অন্তরের রসটির প্রতিকূলে দাঁড়ায় তবে নাট্যমঞ্চে অভিনয়ে বিভ্রাট্ ঘট্‌বেই।

শুধু দৃশ্যপট নয়, অভিনেতাদের অভিনয়ের সঙ্গেও নাটকখানির অন্তরের সুরটির একটা নিবিড় যোগ্ থাকা দরকার। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখা দরকার যে নাটকখানির অন্তরের রূপটি যেন ক্ষুন্ন না হয়। নিজ নিজ ভূমিকার রূপটি পরিস্ফুট করে তুল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে নাটকখানিকে সমগ্রভাবে জীবন্ত এবং সত্য করে তুল্‌বার দায়িত্ব বেশীর ভাগ তাঁদেরই।

এ সব বিষয়ে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম করে দেওয়া চলে না। হয়ত কোনও একটি নাটকের প্রযোজনায় যে দৃশ্যপট দেখ্‌লে আমরা সুখী হই অন্য কোনও একটি নাটকে সেই সব দৃশ্যপটেই আমরা ক্ষুন্ন হব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' বা 'তপতী' অভিনয় যে অতখানি মনোহর হয়ে উঠেছিল তার কতকটা কারণ নিশ্চয়ই নাটকগুলির প্রযোজনা। কোনও একটি রং বা দৃশ্যপটের কোনও একটি ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে আমরা নাটকগুলির প্রাণের অন্তরতম সুরটির আভাষ পেয়েছিলাম। নাটকের গতির সঙ্গে দৃশ্যপটের কোথাও এতটুকু বেমানান্ ত মনে হয়ই নি, পরন্তু অভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হয়েছিল প্রযোজনা, নাটকের দিক দিয়ে এর চাইতে সার্থক বুঝি হ'তে পারে না।

এককথায় নাটকখানিকে সত্য করে তোলাই নাট্যমঞ্চের আদর্শ। কাজেই কী প্রযোজনায় কী অভিনয়ে—যাতে

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত সম্মিলন

গত ৮ই, ৯ই ও ১০ই নভেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সঙ্গীত সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়েচে। এলাহাবাদ Music Association-এর সভাপতি ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য ডি-এস্ সি, পি এইচ-ডি মহোদয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঙ্গীত প্রচারকল্পে বিশেষরূপে চেষ্টা করচেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় এলাহাবাদে এরূপ বিরাট সম্মিলন সম্ভবপর হয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে উচ্চ-সঙ্গীত প্রচার করা। সে বিষয়ে তিনি এ পর্য্যন্ত কতটা সফলতা লাভ করেচেন তাও বিবৃত করেন। তৎপরে মিঃ মেহতা তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। সঙ্গীতের অতীত এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আর্য্যজাতি সঙ্গীতকে পার্থিব এবং ধর্ম্মজীবনের সাথী এবং পারমার্থিক জীবনের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন; সঙ্গীত দ্বারাই পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ দূরীভূত হয় এবং মানবহৃদয়ে একতার বোধ উৎপন্ন হয়।



এলাহাবাদ সঙ্গীত-সম্মিলন
(নিমন্ত্রিত গায়ক ও যন্ত্রীগণ)

৮ই নভেম্বর মিউর কলেজের ভিজিয়ানাগ্রাম হলে সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এলাহাবাদের কমিশনার মিঃ ডি, এন, মেহতা মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্যারম্ভে প্রথমে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। উচ্চ সঙ্গীত প্রচারকল্পে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা চিরস্মরণীয়।

সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভাপতি ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য কমিটির পক্ষ হ'তে সঙ্গীতজ্ঞগণকে এবং সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে বলেন যে এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীতকে জনসাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মধ্যে প্রচারিত ক'রে ধন্য হয়েচে; গুজরাট এবং রাজপুতানার মহিলা সম্প্রদায়ে গান গাইবার রীতি পুরাকালের প্রথানুযায়ী প্রচলিত; সুতরাং তিনি আশা করেন স্ত্রীজাতিই ভবিষ্যৎ যুগে অনুশীলন জীবনের পথ-প্রদর্শক হবেন। সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মিঃ মেহতা বলেন, শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী তৈরি করবার জন্যেও সঙ্গীত বিদ্যালয় চাই—যথার্থ গুণী ওস্তাদের বিশেষ প্রয়োজন।

এই কন্‌ফারেন্স্‌ সম্পর্কে বালক বালিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল।

৮ই ৯ই ও ১০ই নভেম্বর তিন দিন সঙ্গীতজ্ঞগণের গান বাজনা ও বক্তৃতাদি হয়। নিম্নলিখিত সঙ্গীতজ্ঞগণ সম্মিলনে এন, থাকার (খ্যাল)। যন্ত্রী :—বাংলা দেশ হ'তে ইনাইৎ খাঁ সাহেব (সেতার) ও আপ্তাপ উদ্দীন (বাঁশি); গোয়ালিয়র হ'তে হাফেজ আলি খাঁ সাহেব (সরোদ); পাতিয়ালা হ'তে মম্মন খাঁ সাহেব (সরোদ); দ্বারভাঙ্গা হ'তে শ্রীরামেশ্বর



এলাহবাদ সঙ্গীত-সম্মিলন
(বালক-বালিকা ও উদ্যোগীগণ

যোগদান করেন—বাংলা দেশ হ'তে শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (ধ্রুপদ) ও শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (খ্যাল); বোম্বাই হ'তে শ্রীনারায়ণ রাও ব্যাস (খ্যাল ও ঠুমরী); পাতিয়ালা হইতে চাঁদ খাঁ ও ওসমান খাঁ সাহেব (খ্যাল); এলাহাবাদের শ্রী ভি, পাঠক (সেতার); বেনারস হ'তে শ্রীবিরু মিশ্র (তবলা); গোয়ালিয়র হ'তে শ্রীপর্ব্বত সিং (মৃদঙ্গ) ও লাহোর হ'তে শ্রীধুন্ধিরাজ পুলস্কর (বেহালা)।

আমরা এই সম্মিলনের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি কামনা করি।

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.



হরগৌরী

ফাল্গুন, ১৩৩৮

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৩৮ | ২য় সংখ্যা

ছায়া

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনের প্রথম ফাল্গুনী
অকস্মাৎ এসেছিল। তুমি তারি পদধ্বনি শুনি
কম্পিত কৌতুকী
যেমনি খুলিয়া দ্বার, দিলে উঁকি,
আম্রমঞ্জরীর গন্ধে ভরি গেল ঘর,—
নিকুঞ্জের হিল্লোল মর্ম্মর,
মিলে গেল তারি সাথে হৃদয়স্পন্দন।
প্রকাশ ক্রন্দন
নবোন্মুখ অশোক-পল্লবে,
উৎসুক যৌবন তব রাঙাইল রক্তিম উৎসবে।
প্রাণোচ্ছ্বাস নাহি পায় সীমা
তোমার আপনা মাঝে,—
সে প্রাণেরি ছন্দ বাজে
দূরে নীল বনান্তের বিহঙ্গ সঙ্গীতে,
দিগন্তে নির্জ্জন-লীন রাখালের করুণ বংশীতে।

সেদিন তোমার বনচ্ছায়ে
আসিল অতিথি পান্থ, তৃণস্তরে দিল সে বিছায়ে
উত্তরী অংশুকে তা'র সুবর্ণ পূর্ণিমা—
চম্পক বর্ণিমা।
তারি সঙ্গে মিশে
প্রভাতের মৃদু রৌদ্র দিশে দিশে
তোমার বিধুর হিয়া
দিল উদাসিয়া॥

তার পরে কবে তুমি সসঙ্কোচে বন্ধ করি' দিলে দ্বার,—
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণে উদ্দাম কুন্তলভার
লইলে সংযত করি',—
অশান্ত তরুণ প্রেম বসন্তের পন্থ অনুসরি'
স্খলিত কিংশুক সাথে
জীর্ণ হোলো ধূসর ধূলাতে।

তুমি ভাবো, সেই রাত্রিদিন
চিহ্নহীন
মল্লিকা গন্ধের মতো
নির্ব্বিশেষে গত।
জানোনা কি যে-বসন্ত সম্বরিল কায়া
তারি মৃত্যুহীন ছায়া
অহর্নিশি আছে তব সাথে
তোমার অজ্ঞাতে।
কালো চক্ষে ঘনাইল আপনা-বিস্মৃত সেই তারি
স্তিমিত স্তম্ভিত অশ্রুবারি।
অদৃশ্য মঞ্জরী তা'র আপনার রেণুর রেখায়
মেলে তব সীমন্তের সিন্দূর লেখায়।
সুদূর সে ফাল্গুনের স্তব্ধ সুর
তোমার কণ্ঠের স্বর করি' দিল উদাত্ত মধুর।
যে চাঞ্চল্য হয়ে' গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

PASSED BY SUPTD., SURI JAIL

বাংলা প্রতিশব্দ

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিউড়ি জেল

পরমপূজনীয়েষু, ৫।১।৩২

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বাংলায় একখানা গ্রন্থ তৈয়ারি করিতে সুরু করিয়া পরিভাষার খুবই অসুবিধা বোধ করিতেছি। আমাদের এই দীর্ঘকালের কয়েদ অবস্থা বাইরের সহিত মস্ত একটা ব্যবধান ঘটাইয়াছে, তাহাতে এই প্রকার কার্য্যে অসুবিধার মাত্রা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। আপনার কার্য্যবহুল সময়ের উপর এই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে জুলুম করিলাম বলিয়া একান্ত লজ্জিত, তবুও না করিয়া পারিলাম না।

Nationalismকে জাতীয়তা ও nationকে জাতি বলিয়া চালানো কি উচিত? শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয় nationalistকে রাষ্ট্রিক ও nationকে "রাষ্ট্র, জন ও রাষ্ট্রজন" এই তিনটি প্রতিশব্দ দিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন কিন্তু এ বিষয়ে আমার সংশয় রহিয়া গিয়াছে। আশা করি আপনার উপদেশ পাইয়া সংশয়মুক্ত হইব।

আমার অসংখ্য প্রণাম ও অশেষ শ্রদ্ধা আপনি জানিবেন।

একান্ত অনুগত

শ্রীরেবতীমোহন বর্ম্মণ।

রবীন্দ্রনাথের উত্তর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আমার মনে হয় নেশান্, ন্যাশনাল প্রভৃতি শব্দ ইংরেজিতেই রাখা ভালো। যেমন অক্সিজেন হাইড্রোজেন। ওর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। রাষ্ট্রজন কথাটা চালানো যেতে পারে। রাষ্ট্রজনিক এবং রাষ্ট্রজনিকতা শুন্‌তে খারাপ হয় না। আমার মনে হয় রাষ্ট্রজনের চেয়ে রাষ্ট্রজাতি সহজ হয়। কারণ নেশন অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে চ'লে গেছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রজাতি কথাটা কানে অত্যন্ত নতুন ঠেকবে না।

Caste—জাত Nation—রাষ্ট্রজাতি

Race—জাতি People—জনসমূহ

Population—প্রজন।

ইতি ২২ জানুয়ারি ১৯৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুর-শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র এম্-এ

খবরের কাগজে দু'লাইন সংবাদ একদিন চোখে পড়ল, রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার আর ইহজগতে নেই। সাংবাদিকের কাছে দেশবিদেশের কত বড় বড় কথা, কত প্রয়োজনীয় খবরের তুলনায় এই খবরটুকুর তাৎপর্য্য হয় ত সামান্য। কিন্তু আমার মতন যাঁদের সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে



৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

আসার এবং তাঁর গান শোনার সৌভাগ্য ঘটেছিল তাঁদের কাছে এ সংবাদ যে কতদূর মর্ম্মন্তুদ তা বলতে গেলে হয়ত অত্যুক্তির মতন শোনাবে। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ আনন্দের উপকরণ চিরতরে তিরোহিত হল, আমাদের জীবনের একটা দিক অন্ধকার হয়ে গেল।

মনে পড়ে সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা। সঙ্গীতের মায়াপুরীর দ্বার তখন আমাদের কাছে সবেমাত্র খুলেছে। শ্রেষ্ঠ গুণীদের সঙ্গীত শোনার সুযোগ তখনও পাইনি, তাই রুচি তখনও গ'ড়ে ওঠেনি; যা মাঝারি বা চলনসই তাকে যথার্থ ভাল ব'লে ভ্রম হয়েছে। ফলে একমাত্র সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আর্টের যে দান, আনন্দের সেই বিশুদ্ধতা ও গভীরতা তখনও সঙ্গীতে অনুভব করিনি। এমন সময়ে একদিন দু'খানা গ্রামোফোনের রেকর্ড হাতে এসে পড়ল। বাজাবা-মাত্র যেন এক নূতন জগত খুলে গেল। গ্রামোফোন যন্ত্রের বিরুদ্ধে যা কিছু শুনেছি বা বলেছি তা যে মূলতঃ snobbery-প্রণোদিত, তা সেদিন বুঝলাম। সেই পুরোণো বহুবার-বাজানো ঘষা রেকর্ডের তিন মিনিট ঘূর্ণনের ভিতর দিয়ে এক অপরূপ অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ মনে সঞ্চারিত হল। একখানি গান ভৈরবীতে—"বিয়োগ বিধুরা রাজবালা।" সুরেন্দ্রনাথের যাঁরা ভক্ত, গানখানি তাঁদের যেমন পরিচিত তেমনি প্রিয়। প্রেমকে যে জপমালা করেছে অথচ বিধি যার বিবাদী সেই বিরহী হৃদয়ের অসহ জ্বালা সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভৈরবী রাগিণীতে যে কি মধুর, করুণ, বেদনাবিধুর এক জগত সৃজন করেছে তা সে গান না শুনলে বোঝা যায় না। অন্য অনেক প্রসিদ্ধ গায়কের মুখেও ভৈরবী শুনেছি, অনেক সময় তা খুবই ভাল লেগেছে; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেমন করে ও-রাগিণী জগতের যত ব্যথার আকুল প্রকাশ হয়ে উঠত, মানুষের যত ক্ষত ও ক্ষতির দীর্ঘশ্বাস ওতে ধ্বনিত হত, তেমন আর কখনও শুনিনি। সুরেন্দ্রনাথের গান যখনই শুনেছি, লক্ষ্য করেছি, যে-গানের কথায় কোন বেদনার আভাস, বা যে-সুরে করুণ-রস প্রকাশের সুযোগ অধিক, তিনি সেই গান বা সেই সুরই পছন্দ করতেন; এবং কৌশল প্রকাশের বা বাহবা পাবার লোভ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে, নিজের আশপাশ ও সম্মুখের

শ্রোতৃবৃন্দ ভুলে গিয়ে, গাইতে গাইতে যেন কোন্ বেদনার অন্তর্লোকে প্রবেশ করতেন। জয়জয়ন্তীতে তাঁর "শুনরে ননদিয়া," অথবা দেশে "ন যারে পিয়া বরখা ঋতু আয়ী," কিম্বা শাওন-মল্লারে "অব ঘাঁউ ঘাঁউ ঘন গরজে" যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে সুরেন্দ্রনাথেরও sweetest songs ছিল সেইগুলিই যা প্রকাশ করত "saddest thought."

গ্রমোফোনের ভিতর দিয়ে যে পরিচয় সংঘটিত হল পরে সাক্ষাতে তা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বহুবার তাঁর গান শুনেছি, এবং শুধু বড় বড় আসরেই নয়। তিনি স্নেহ করতেন এবং যথার্থ গুণী ছিলেন; তাই অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে নিজেই এসে কতবার গান শুনিয়ে গেছেন। শ্রোতার যোগ্যতা তিনি কোন দিন বিচার করেন নি, শুধু দেখেছেন তার অনুরাগ আছে কি না। যেখানে তার চিহ্নমাত্র দেখেছেন উজোড় করে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সঙ্গীতের সকল সৌন্দর্য্য। তাঁর সেই স্নেহ এবং অকৃপণতার কথা যখন স্মরণ করি তখন হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়, নিজেকে ধন্য বলে মানি।

তাঁর গলা ছিল যেমন জোরালো তেমনি সুমিষ্ট—তাঁর স্বরের সে মাধুর্য্য বোঝানো অসম্ভব। কণ্ঠের স্বাভাবিক লালিত্যকে ফুটিয়ে তুলেছিল তাঁর সাধনালব্ধ সুরের বিশুদ্ধতা। কিন্তু সহজ মিষ্টতা ও শুদ্ধ সুরের যোগেও কণ্ঠস্বরের সে মোহিনী শক্তি পাওয়া যায় না। এ যোগফলের অতিরিক্ত কিছু তাঁর কণ্ঠে ছিল যা শ্রোতাকে অভিভূত করে দিত অথচ যার ব্যাখ্যা হয় না, কারণ তা অনির্ব্বচনীয়। সে জিনিষকে তাঁর দরদ অথবা তাঁর "আপন মনের মাধুরী" বললে হয় ত তার কিছু আভাস দেওয়া যায়।

এতবড় একজন রসস্রষ্টারও বৈশিষ্ট্য ধরা বা বোঝানো সুকঠিন ব্যাপার। বিশেষজ্ঞে হয় ত খানিকটা পারেন, আমি বিশেষজ্ঞ নই। সুগায়ক, সুকুমারচিত্ত বন্ধুবর দিলীপকুমার এ-চেষ্টায় অংশ্ত অনেকটা সফল হয়েছেন। কিন্তু পূর্ণ সাফল্য সম্ভব মনে হয় না। শ্রেষ্ঠকলার কাছে চিরদিনই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হার মেনেছে। একজন কবি আরেকজন কবির থেকে কোথায় স্বতন্ত্র বা কোথায় শ্রেষ্ঠ তা যেমন সম্পূর্ণ ভাবে কোনোদিন বোঝানো যায় না যদি তাঁরা এক শ্রেণীর হন এবং একই জাতীয় কাব্য রচনা ক'রে থাকেন, তেমনি দু'জন বড় গায়কের মধ্যে তুলনা ক'রে প্রত্যেকের মৌলিকতার উপাদানটি সুনিশ্চিত ভাবে নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নয়। অথচ সেই পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য যে আছে সে-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কাব্যজগতে যেমন কবির কাজ নয় নূতন ভাব বা ভাষা সৃজন করা, তিনি যেমন নূতন সৃষ্টি করেন সর্ব্বজনব্যবহৃত ভাষায় চিরন্তন ভাবকেই নূতন রূপ দিয়ে, আমাদের সঙ্গীতের রাজ্যে তেমনি নূতন সুর সৃজন করার আর সুযোগ নেই বললেই হয়, অথচ সনাতন রাগরাগিণীর কাঠামোর মধ্যেই, সপ্তস্বর তিন গ্রামের ভিতরে, নিত্য নূতন সৃষ্টি হচ্ছে বড় গায়কের কণ্ঠে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ সেই গায়কই আদৃত হন যিনি রাগের বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রে তার পূর্ণ বিস্তার কণ্ঠে দেখাতে পারেন। ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী এরূপ আয়ত্ত করা ও প্রকাশ করা অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘসাধনাসাপেক্ষ। সুতরাং কোন গায়কের মধ্যে এই সুর-জ্ঞান ও বিশুদ্ধ প্রকাশের সঙ্গে যদি স্বর-লালিত্য যুক্ত দেখা যায় তাহলে তাঁকে আর প্রথম শ্রেণীর গায়ক বলতে কারও আপত্তি থাকে না। কিন্তু এ-সকল গুণ ছাড়াও আর একটি অনির্দ্দিষ্ট, অবিশ্লিষ্ট গুণের উল্লেখ কোন কোন বিখ্যাত গায়কের প্রসঙ্গে প্রায়ই শোনা যায়। "খেয়াল ত কতলোকে গায়, কিন্তু আব্দুল করিম বা সুরেন্দ্রনাথের গাইবার কি ঢং! ঠুংরী ত অনেকেই গাইছে, কত ভীমাকৃতি পুরুষ বামাবিনিন্দিত কণ্ঠে ও তয়ফা-সুলভ আস্য লাস্য সহযোগে কত মজলিশ ঠুংরীতে গুলজার করছে; কিন্তু ফৈয়াজ খাঁর ঠুংরী! কি তার ঢং!" ইত্যাদি। বড় গায়কের এই যে ঢং, তা অনবদ্য, অননুকরণীয়। এই ঢং বা চাল সুরজ্ঞান ও স্বরশুদ্ধির অতিরিক্ত কিছু। শ্রেষ্ঠ গুণীর ঢং যদি একান্ত বিশিষ্ট ও নিজস্ব না হত, তাহলে গায়কে গায়কে প্রভেদ ঘুচে যেত, এবং এই বিশেষত্বের অভাবে শুদ্ধ রাগ ও মার্জ্জিত কণ্ঠের অধিকারী হয়েও কোন গায়ক গানের মধ্যে সেই প্রাণ-সঞ্চার করতে পারতেন না যা রসবেত্তাকে অসহ পুলকে ব্যাকুল করে তোলে।

সুরেন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ নিজস্ব ও স্বতন্ত্র রীতিতে গান

শুনেছি বলে মনে হয় না। তাঁর রীতির স্বাতন্ত্র্য ছিল এইখানে: তিনি **গান** গাইতেন, শুধু **রাগিণী** গাইতেন না। যে-সুরে যে-গান বাঁধা, শুধু সেই **সুরের** বিস্তার প্রকাশ করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। প্রত্যেকটি গানকে তিনি একটি সুসম্পূর্ণ, সুডৌল, অভিনব সৃষ্টি ক'রে তুলতেন। একই সুরে গান রচিত হতে পারে, সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠত। আমাদের এক একটি বড় রাগিণীর বিপুল কলেবর। তার সবটাই যে একই গানে প্রকাশ করতে হবে এমন কি কথা আছে? রাগ যদি সম্পূর্ণ আয়ত্ত থাকে, যেমন সুরেন্দ্রনাথের ছিল, তাহলে তার অংশমাত্র অবলম্বন ক'রে মনের একটি বিশেষ ভাব বিশেষ একটি গানে ফুটিয়ে তোলা যায়। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি গানকে এই স্বতন্ত্র রূপ দিতে জানতেন; তাই কোন বিশেষ গানে শুধু সেই প্রকারের তান সংযোগ করতেন যা সে গানের বিশেষ ভাবটি পরিস্ফুট করে তুলবে। এ দেশে অন্য কোন বড় গায়কের এমন গান শুনিনি যার মধ্যে অন্ততঃ দুটো চারটে তান অবান্তর মনে হয়নি।

অবান্তর তান বলতে আমি তাই বুঝি যার উদ্দেশ্যে শুধু রাগজ্ঞান বা কণ্ঠ-কৌশল প্রকাশ করা, যা' গানের মূল ভাবের পরিপোষক নয়। গানের মধ্যে বিশুদ্ধ ভাবে রাগ প্রকাশিত হলে শ্রোতা অবশ্যই আনন্দিত হন, কারণ প্রত্যেক রাগেরই একটি স্বকীয় মহিমা আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে সে মহিমার পূর্ণ প্রকাশের ক্ষেত্র হচ্ছে রাগের আলাপ। গানও যদি কথার ছলে শুধু রাগেরই আলাপ আরম্ভ ক'রে দেয়, তাহলে শ্রোতার মনে হয়, ঠকলাম। কেননা আমরা ত সর্ব্বদাই কেবল রাগের বিপুল নৈর্ব্যক্তিকতা চাই না, স্রষ্টার আবেগে অনুরঞ্জিত তার একান্ত human রূপ গানের ভিতর দেখার জন্যও আমরা ব্যাকুল। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ সৃজনী-প্রতিভা আমি দেখেছি এইখানে; অন্যান্য গায়কের ন্যায় তাঁর গান কেবল কতকগুলো সুন্দর-কিন্তু-অসংলগ্ন টুকরোর জোড়াতালি মাত্র ছিল না, তাঁর প্রত্যেক গান হত একটি অখণ্ড, সুঠাম, পরিপূর্ণ, রসসৃষ্টি।

আমার আর কিছু বলবার নেই। সুরেন্দ্রনাথের সরসতা, তাঁর সহৃদয়তার কথা দিলীপকুমার সুন্দর করে "বিচিত্রা"য় লিখেছেন। তাঁর অপূর্ব্ব হাস্যরস তাঁর যে আশ্চর্য্য গল্পগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে নিশ্চয়ই তার কথা কোন কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ পাঠক ভবিষ্যতে লিখবেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ কি হারালো তা' দেশ সম্পূর্ণ বুঝেছে কিনা জানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমরা যা' হারালাম, তা' আর পাবার নয়। মনে ক'রে অধীর বোধ হয়, স্নিগ্ধহাস্যে সমুজ্জ্বল সে প্রতিভাদীপ্ত মুখ আর কখনও দেখব না, সে সুধাকণ্ঠ আজ চিরদিনের মত স্তব্ধ।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

সত্যাসত্য

শ্রীলীলাময় রায়

৭৭

রাত্রে বাদল স্বপ্ন দেখ্‌ল শয্যা শূন্য পড়ে আছে, সে নেই। ঘরে নেই, বাইরে নেই, আকাশে কিম্বা বাতাসে নেই। সে নেই। তার বিছানার উপর এক মুঠো ছাই পড়ে আছে।

বাদল ক'কিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তবু বিশ্বাস হল না যে সে আছে। লাফ দিয়ে উঠে সুইচ্‌ টিপে আলো জ্বালাল। আহ্লাদের বেগ সম্বরণ না কর্‌তে পেরে মিষ্টার ও মিসেস উইল্‌স্‌কে ডেকে তুল্‌বে কিনা ভাবতেই তার মনে পড়্‌ল এটা হোটেল।

বিছানায় ফিরে যেতে তার সাহস হচ্ছিল না, যদি আবার তেমন স্বপ্ন দেখে। তখন ভোর হ'য়ে আস্‌ছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না। বাদল চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বস্‌ল। সাম্‌নের দিকে ঝুলে-পড়া টুপি মাথায় গোঁপওয়ালা ক্ষুদে গাড়োয়ান আপাদবক্ষ চটের থলে মুড়ি দিয়ে পশুবোধ্য ধ্বনি বিশেষ উচ্চারণ কর্‌তে কর্‌তে চলেছে। লোমশপাদ অশ্বের খুর থেকে খট খট আওয়াজ উঠ্‌ছে।

বাদল রাত্রের দুঃস্বপ্ন ভুল্‌ল। নিজের ও অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার সহজ প্রত্যয় তাকে আনন্দে আপ্লুত কর্‌ল। ওয়েলী মানুষটা পাগল। এত বড় একটা স্বতঃসিদ্ধকে কিনা সন্দেহ করেন। ইণ্ডিয়াতে একদল মানুষ আছে, তাদেরকে বলে মায়াবাদী। বাদল তাদের উপর সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত অপ্রসন্ন। তাদের অপরাধ তাদের সঙ্গে বাদল তর্ক কর্‌তে পারে না, তারা আগাগোড়া সব উড়িয়ে দেয়। যার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে পারে না তাকে বাদল নিজের ব্যক্তিগত শত্রু জ্ঞান করে। তার মুখ দর্শন করে না। তার নাম বাদলের অশ্রাব্য। শুধু মায়াবাদী না, যারা কর্ম্মফলবাদী তারাও বাদলের শত্রু। বাদলের ইচ্ছা করে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় মেরে বল্‌তে, "এও তোমাদের কর্ম্মফল।"

ইংলণ্ডে এসে নব্যতন্ত্রের মায়াবাদী দেখে বাদলের বিস্ময় এবং বিতৃষ্ণা জাগ্‌ছিল। ইংলণ্ড এমনতর মানুষের দেশ নয়। এ'কে ইণ্ডিয়ায় চালান দেওয়া আবশ্যক। গিয়ে আলমোড়ায় মঠ করুন কিম্বা পণ্ডিচেরীতে আশ্রম। এখানে বলে রাখা দরকার আলমোড়া কিম্বা পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে বাদলের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। এবং সন্ন্যাসীদেরকে বাদল outlaw জ্ঞান করত বলে তাদের দিক থেকে যে বল্‌বার কিছু থাক্‌তে পারে সে বিষয়ে তার খোঁজ ছিল না, হুঁস ছিল না।

একটু পরে ওয়েলীর সঙ্গে ব্রেকফাষ্টের সময় দেখা হবে। তখন তাঁকে বাদল বল্‌বে কি? মনে মনে একটা বক্তৃতা তৈরী কর্‌তে গিয়ে বাদল সেই ঘোর শীতকালেও ঘেমে উঠ্‌ল। এমন কিছু বলা চাই যার উত্তরে ওয়েলী একটা কথাও বল্‌তে পার্‌বেন না। তেমন যুক্তি কই? ওয়েলী যদি বলেন, স্বতঃসিদ্ধ আবার কি? বর্ব্বরের কাছে বেড়াল যে বাঘের মাসী এও ত একটা স্বতঃসিদ্ধ।

বাদল অবশেষে স্থির কর্‌ল সুধীদার কাছে বুদ্ধি ধার কর্‌বে। যেই চিন্তা সেই কাজ। ছুট্‌ল টেলিফোন কর্‌তে।

"হ্যালো।"

"মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কথা বল্‌তে পারি?"

সুজেৎ সুধীর সন্ধানে সিঁড়ি ভেঙ্গে দৌড়ল। সুধী নেমে এল। "কে?"

"আমি বাদল। ভয়ানক মুস্কিলে পড়েছি।"

"সে কি রে! বাসা ছেড়ে কোথায় চলে গেছিস্‌, মিসেস্‌ উইল্‌স্‌ ঠিকানা দিতে পার্‌লেন না। কি হয়েছে!"

"আত্মা আছে, তার স্বপক্ষে কি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে?"

সুধী অবাক হয়ে রইল।

বাদল বল্ল, "এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে হেরে গেছি। ভীষণ মন খারাপ।"

সুধী বল্ল, "আয় না, তোর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি, উপলব্ধি বিনিময় করা যাক্।"

বাদল বল্ল, "না, সুধীদা। আমার অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন আছে।"

বাদলের প্রশ্নের উত্তরে সুধী বল্ল, "আত্মা আছে, এর স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি—আত্মা আছে। ওর বেশী আমি জানিনে। এবং নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতে আমি লজ্জিত নই, বাদল।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বল্ল, "আমি তোমার মত defeatist হতে পার্‌ব না। আমি হেরেছি বলে লজ্জায় মৃতপ্রায়। তবু জিৎবার জন্য প্রাণপণ করব।"

বাদল ভাবল, নিরামিষ খেয়ে খেয়ে সুধীদাটা একটা vegetable বনে গেছে। আমি কিন্তু বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি দেব না। বাদল টেলিফোনের রিসিভার স্বস্থানে ন্যস্ত করতে যাচ্ছিল, কি ভেবে আবার তুলে নিল। সুধী বল্ল, "বাদল, শোন। একদিন মিউজিয়ামে আয়।"

বাদল বল্ল, "কি দরকার? তোমার ও আমার সাধন মার্গ এক নয়। দু'জনে দুই পথে চল্‌তে চল্‌তে যদি কোনো দিন কোনো এক চৌমাথায় মিলিত হই তবে সেই দিন কাফেতে বসে পথের গল্প করা যাবে। আমাকে নিজের মত চল্‌তে দাও, প্রভাবিত কোরো না।"

সুধী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাক্‌ল। বাদল ডাক্‌ল, "সুধীদা।"

"কি?"

"তোমাকে defeatist বলেছি বলে ক্ষমা চাইছি। আসলে তুমিই সুখী। তোমার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহ নেই, তুমি যা বিশ্বাস কর তার প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হও না, তাকে প্রমাণ কর্‌তে যাওই না।"

সুধী বল্ল, "বাদল, পরের কাছে প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা প্রকারান্তরে নিজের কাছেই প্রমাণ কর্‌বার প্রয়াস। ওটাতে নিজের দুর্ব্বল প্রত্যয়ের পরিচয় দেয়। তা ছা'ড়া ওটাতে পরকে অনাবশ্যক প্রাধান্য অর্পণ করে বিচারকের সিংহাসনে বসিয়ে। যা সাদা চোখে দেখছিস্ তাকে বিশ্বাস করে তার থেকে রস সংগ্রহ কর। সাদাকে সাদা বলে প্রমাণ করে তর্কে জিৎবার নাম commonsense-শূন্যতা।"

বাদল ত ভারি চটে গেল। ফোন ফেলে দিয়ে দিগ্বিদিক ভুলে যে ঘরে ঢুকল সে ঘরে ওয়েলী বসে পাইপ টান্‌ছিলেন। বাদল পালাবার পথ পেল না। ওয়েলীর নিঃশব্দ নিশ্চেষ্ট আকর্ষণ তাকে চলৎশক্তিরহিত কর্‌ল। সে মূঢ়ের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বল্ল, "গুড্ মর্ণিং।" ওয়েলী মাথাটা ঈষৎ নেড়ে গুড্ মর্ণিং জানালেন, বাদল আশ্বস্ত হল। তার কেমন যেন ভয় ওয়েলীর কণ্ঠস্বরকে, স্বল্পসংখ্যক শব্দকে। ওয়েলী যখন একটিও কথা কইলেন না তখন বাদলের শঙ্কা দূর হল। সে ধীরে ধীরে পিছু হট্‌তে হট্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৭৮

অসহ্য। ওয়েলীর সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকা অসহ্য। থাক্‌লে বাদলের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, বাদলকে যেতে হবে পাগলা গারদে। ওয়েলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তার চিন্তার গোলমাল হয়ে যায়—হয়ত ভাবছিল পার্লামেণ্টীয় নির্ব্বাচন-রীতি-সংস্কারের কথা, হঠাৎ ওয়েলীর মুখ দেখে মনে পড়ল, নিজে আছি কিনা তারই ঠিক নেই, কা কস্য পরিবেদনা!

গত সাধারণ নির্ব্বাচনে লিবারল ও লেবার দলের লোক মিলে যত ভোট পেয়েছিল কনসারভেটিভ দলের লোক তার চেয়ে দশ লাখ ভোট কম পায়। তবু তারাই হল পার্লামেণ্টের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল, তাদের সদস্য সংখ্যা অন্য দুই দলের সমবেত সদস্য সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। যে প্রথার দ্বারা এমন অঘটন ঘটে তার পরিবর্ত্তন চাই। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা কার প্রতিনিধি? দেশের বহুতর লোকের নয়, দেশের নানা ভগ্নাংশের। প্রত্যেক ভগ্নাংশের স্বতন্ত্র সমস্যা আছে। ঐ সব স্থানীয় সমস্যার ধ্বজা বয়ে যারা লণ্ডনে আসে তারা দেশের বৃহত্তম সমস্যার কি জানে? আদার ব্যাপারীর দল জাহাজের খবর রাখে না।

তা বলে বাদল মুসোলিনির মত গোড়া ঘেঁষে সংস্কার চায় না। ওটা ত সংস্কার নয়, এক জনের হাতে দেশের সব ক'টা লাগাম ধরিয়ে দেওয়া। পার্লামেণ্ট তাঁর মতে দেশের ভাগ্যবিধাতা হতে পারে না, দেশের মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র (State)। জনসাধারণকে যে যত ভোলাতে কিম্বা ঠকাতে পারে জনসাধারণের সেই তত বড় প্রতিনিধি ও পার্লামেণ্টের তত বড় সদস্য। সাধারণত সে কোনো একটা দলের লোক। কাজেই দলের স্বার্থকে সে দেশের স্বার্থের থেকে বড় করে থাকে। এরূপ মানুষের পার্লামেণ্ট দেশের কর্ত্তৃত্ব করবে মুসলিনীর মতে তা অনুচিত। বিশেষ করে অনুচিত এইজন্য যে অখণ্ড অবিভাজ্য দেশকে এরা নিজের নিজের ছোট ছোট জেলার সমবায় বলে ভাবতে শিখেছে। মুসোলিনি রাজনৈতিক দলাদলি ও জেলা অনুসারে প্রতিনিধিবিভাগ এই উভয় প্রথার উচ্ছেদ চান। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কের কারবার, রেল, ষ্টীমার ইত্যাদিতে যত লোক নিযুক্ত তারা সকলে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ আটশ' জনের নাম পাঠাবে। Grand Council এই আটশ' জনের থেকে কতক ও বাইরে থেকে কতক মিলিয়ে চারশ' জনের নাম গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করবে ও গ্রামের লোককে বলবে, আপনারা এই চারশ' জন মনোনীত ব্যক্তিকে একসঙ্গে নির্ব্বাচন করুন অথবা একসঙ্গে প্রত্যাখ্যান করুন। ভোটে মনোনীত ব্যক্তিগণের পরাজয় ঘটলে অন্য এক জটিল উপায়ে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হবে। মোট কথা রাষ্ট্রবিধাতা যাঁর যাঁর উপর প্রসন্ন সেই সেই ব্যক্তি হবেন পার্লামেণ্টের সদস্য। তবু তাঁদেরি অভিমত যে গবর্ণমেণ্টের গ্রাহ্য হবে কিম্বা তাঁদেরি কথায় যে গবর্ণমেণ্টকে পদত্যাগ করতে হবে তা নৈব নৈব চ।

এই হল মুসোলিনির নির্ব্বাচনরীতিসংস্কার। এর উদ্দেশ্য ডেমক্রেসীর সংহার। এর সঙ্গে সেদিন লর্ড সভায় আর্ল্ গ্রে'র বক্তৃতার তুলনা করে বাদল কন্সারভেটিভ দলের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। কন্সারভেটিভরা মুসোলিনির মত স্পষ্ট করে বলুক কি তারা চায়—ডেমক্রেসী না ফাসিস্‌ম্। সেকেলে নির্ব্বাচনরীতির সুযোগ নিয়ে তারা পার্লামেণ্ট ও রাষ্ট্র হাত করেছে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক ত তাদের ভোট দেয়নি। ডেমক্রেসীকে যদি শ্রদ্ধা করতে হয় তবে অধিকাংশের অভিমত যাতে পার্লামেণ্টের অভিমত হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর পার্লামেণ্টের অভিমত যাতে মন্ত্রীসংসদের অভিমত হয় সেটার ব্যবস্থা ত ইংলণ্ডের মত দেশে দুই শতাব্দীকাল আছে। ইংলণ্ডে ডেমক্রেসী সম্পূর্ণ নিরাপদ হলে ডেমক্রেসীর প্রধান শত্রুরা ইটালী কিম্বা রাশিয়া যেখানেই থাকুক তাদের আদর্শের আক্রমণ থেকে ইংলণ্ড হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এই সব ভাবতে ভাবতে বাদল হঠাৎ দেখতে পায় ওয়েলী দাবার ছক নিয়ে একলা বসে। হয়ত দুই চালে কি তিন চালে কিস্তিমাৎ করার problem তৈরী করছেন। ওয়েলীর তৈরী প্রব্লেম মাঝে মাঝে কাগজে বেরয়। বাদল তার কিছুই বোঝে না। বোঝবার চেষ্টা কয়েকবার করে ছেড়ে দিয়েছে। ও বিষয়ে তার একাগ্রতার অভাব।

ওয়েলীকে দেখে বাদলের মনে পড়ে যায়—Nothing matters in the last analysis. কি হবে অত ভেবে? পার্লামেণ্টীয় নির্ব্বাচনরীতির সংস্কার যদি হয় তাতে কি, যদি না হয় তাতে কি? কার কি লাভ, কার কি ক্ষতি? কে-ই বা আছে? ভগবান নেই, আত্মা নেই, ওয়েলী নেই, আমি নেই।

সান্ধ্য আহারের পর রাস্তায় রাস্তায় বেড়ানর অভ্যাস বাদল হোটেলে এসেও ত্যাগ করে নি। হাতে দস্তানা, দুই হাত ওভারকোটের পকেটে পোরা, পায়ে বুট—বাদল বেড়ায় ফুটপাথে ফুটপাথে। বড় বেশী শীত করে বলে বড় বেশী জোরে পা চালায়, একটু থামলে জমে হিম হয়ে যাবার মত হয়।

এক একটা বিষয় নিয়ে যখন ভাবে তখন উঠে পড়ে ভাবে, এ হচ্ছে বাদলের স্বভাব। নির্ব্বাচনরীতি সংস্কার নিয়ে ভাবনা চলেছে। Proportional Representation চাইই। গত শতাব্দীতে জন ষ্টুয়ার্ট মিল তার চাহিদা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন ছিল মাত্র দুটি দল। কোনো দলের নির্ব্বাচক সংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা কম হলেও মোটের উপর অবিচার হত না। যেখানে মাত্র দুই পক্ষে প্রতিযোগিতা সেখানে একটা না একটা

পক্ষ পরাজিত হবেই। পরাজয়ও স্থায়ীভাবে কোনো এক পক্ষের ছিল না। কাজেই কোনো পক্ষ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যুক্তি গ্রাহ্য করেনি। এখনকার ইংলণ্ডে তিনটি দল, তিন পক্ষ। ছোট ছোট দুটা একটা দলও আসরে নাম্‌ছে। যে দলের ভোটার সংখ্যা যত সে দলের প্রতিনিধি সংখ্যা যদি তদনুপাত না হয় তবে এমনো হতে পারে যে দল-বিশেষের একটিও প্রতিনিধি কোনো কেন্দ্রেই নির্ব্বাচিত হয়ে উঠ্‌বে না, যদিও উক্ত দলের ভোটার সংখ্যা সমগ্র দেশের ভোটার সংখ্যার এক দশমাংশ এবং ন্যায়ত পার্লামেন্টের প্রায় ৬০টি আসন উক্ত দলের প্রাপ্য। কে জানে, বাদলের নিজের দলেরও হয়ত এরূপ দশা হবে।

দুশ্চিন্তায় বাদলের সে রাত্রে বিছানার পাশ ফির্‌তে থাকাই সার, ঘুম আর আসে না।

৭৯

পরদিন সকালবেলা ওয়েলীর মুখ দেখে বাদল ঠিক করে ফেল্ল এ হোটেলে থাকা পোষাবে না। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছে, তবু পালাতেই হবে। তার বয়স অল্প, প্রাণে অনন্ত অভিলাষ, সে যে হতে হতে কি হয়ে উঠ্‌বে কল্পনা কর্‌তে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়, জগতের যত মহাপুরুষ তাদের সকলের সঙ্গে এক সারিতে বস্‌বার যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌বে সে। তার কল্পলোকে পদে পদে যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও করমর্দ্দন তাঁরা কলিন্স মিলফোর্ড দে সরকার নন্, আত্ম অবিশ্বাসী ওয়েলী নন্, তাঁরা দান্তে গ্যেটে শেক্‌সপীয়ার প্লেটো য়্যারিষ্টট্‌ল্ গৌতম বুদ্ধ। তাঁরা অতি পুরাতন হয়েও অতীব নবীন। আপনার উপর তাঁদের অটল বিশ্বাস। আপনাকে তাঁরা যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করেছেন সেই পরিমাণে শ্রদ্ধেয় হয়েছেন। বাদল দুবেলা জপমন্ত্রের মত উচ্চারণ করে—আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করি, আমি নিজেকে আরো শ্রদ্ধা কর্‌তে চাই। আমি শ্রদ্ধেয় বলেই আমি আছি, আমি শ্রদ্ধার যোগ্য না হয়ে থাক্‌লে আমার অস্তিত্ব থাক্‌ত না।

পলায়ন করাতে শক্তির পরিচয় দেয় না, কাজটা শ্রদ্ধা-যোগ্য ত নয়ই। তবু বাদল পালাবে স্থির কর্‌ল। ভেবে চিন্তে স্থির কর্‌ল এমন নয়। হঠাৎ পাগ্‌লা কুকুর কিম্বা ষাঁড় দেখ্‌লে যেমন দৌড় দেওয়া সাব্যস্ত কর্‌তে হয়, মন সাব্যস্ত না করুক পা সাব্যস্ত করে, এক্ষেত্রেও তেমনি। বাদলের মন দ্বিধা কর্‌লেও প্রবৃত্তি অস্থির হল। অতএব বাদল আর দেরী কর্‌ল না। জিনিষগুলো একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে ম্যানেজারকে বল্ল, "টাকা ফেরৎ চাইনে। হোটেলের ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইনি। অন্য কারণে অন্যত্র যাচ্ছি।" ম্যানেজার হাসির ভাণ করে বল্ল, "আশা করি আবার কোনো দিন শুভাগমন কর্‌বেন।"

বাদলের মনটা এক নিমেষে হাল্‌কা হয়ে গেল। অকস্মাৎ তার মনে হল তার কেউ নেই কিছু নেই কোনো ভাবনা নেই কোনো দায়িত্ব নেই। দিনটি পরিষ্কার ছিল। কোনো পার্কের কাছ দিয়ে যখন মোটর চলে যায় রাশি রাশি almond মুকুল বাদলের চোখে অরুণ রঙ্গের নেশা লাগিয়ে দেয়। অকবি বাদল উপমা খোঁজে। অতি মূল্যবান যার সময় সে খানিকটা সময়ের অপব্যয় করে। ভারতবর্ষে এই ত হোলি খেলার দিন। এদেশেও গাছে গাছে ডালে ডালে হোলি খেলা চলেছে।

বাদলের বিশেষ কোনো ঠিকানায় যাবার কথা ছিল না। খুব সম্ভব ওয়াই এম সি এ'তে গিয়ে উঠ্‌ত। কিন্তু সেখানেও তিন চারদিনের বেশী রাখে না, যদি না অনেক আগে থেকে আবেদন করে স্থায়ী বোর্ডার হওয়া যায়।

সোফারকে বল্ল, "ভিক্টোরিয়া।"

যাক্, কিছুদিনের মত লণ্ডনের বাইরে গিয়ে অজ্ঞাতবাস করা যাক্। মন স্বীকার না কর্‌লেও আত্মারাম জানেন কি শীত! কি বৃষ্টি! কি কুয়াশা! কি ধোঁয়া! কুয়াশা আর ধোঁয়া মিলে কি ফগ্! কি অন্ধকার!

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন। একপ্রান্তে ইউরোপ অভিমুখী ও ইউরোপ-আগত ট্রেণের প্ল্যাটফর্ম। অপর প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে দক্ষিণ ইংলণ্ডের ট্রেন সমাবেশ।

যে গতি-হিল্লোল মোটরে আস্‌বার সময় বাদলকে মাতিয়ে রেখেছিল মোটর থেকে নেমেও বাদল তার প্রভাব সর্ব্বাঙ্গে অনুভব কর্‌ছিল। বিলম্ব কর্‌ল না। আইল্ অব ওয়াইটের

গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। বাদলকে কোলে নিয়ে এমন দৌড় দিল যে পোর্টস্‌মাথ্-এ পৌঁছুতে ঘণ্টা দুয়েকও লাগ্‌ল না।

সমস্ত পথ বাদল নিজের দেশকে প্রবল আগ্রহের সহিত চক্ষুসাৎ কর্‌ছিল। লণ্ডনের আশে পাশে ফ্যাক্টরী। লণ্ডনের আওতা অতিক্রম কর্‌লে ছোট ছোট গ্রাম। মাঠে ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। বন্ধুর অনুর্ব্বর ভূমির উপর সবুজ রঙ্গের বার্ণিশ করা। গাছে গাছে নতুন পাতা ও নতুন পাখী। গাছ কিম্বা পাখী কারুর নাম বাদল জানে না, ওদের সম্বন্ধে বাদলের কোনোদিন কৌতূহল বোধ হয় নি।

বাদল কখনো ভাব্‌ছিল, আচ্ছা, গাছের সঙ্গে পাখীর এমন মিতালি কেন ও কবে থেকে? গাছ মাটী ছেড়ে নড়্‌তে পারে না, পাখী আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ায়। স্থিতির সঙ্গে গতির পরিণয় অদ্ভুত নয় কি?

কখনো ভাব্‌ছিল, এখনো ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল? এরা tractor কেনে না কেন? বাণিজ্যে আমাদের দেশ যেমন অগ্রসর কৃষিতে তেমন নয়, এ বড় আফশোষের কথা।

এক একবার ওয়েলীকে মনে পড়ে যাচ্ছিল।

বাদলের সাজান বাগান শুকিয়ে যেত যদি ওয়েলীর 'লু' বাতাস প্রতিদিন তার উপর দিয়ে ছুটে যাবার পথ পেত। ইচ্ছার স্বাধীনতা, উদ্যোগের স্বাধীনতা, স্বাধীন মানুষের উদারমতি গবর্ণমেণ্ট, অবাধ বাণিজ্য, উন্নত শিল্প, জ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার, যানের উৎকর্ষ ও দ্রুতগতি, জাতিতে জাতিতে অক্ষতিকর প্রতিযোগিতা, কচিৎ এক আধটা যুদ্ধ —যা কিছু বাদল সমস্ত জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করে ওয়েলী এক ফুৎকারে নিবিয়ে দেন।

হ্যাঙ্‌ ইওর ওয়েলী, ড্যাম ইওর ওয়েলী। ওয়েলীর কাছ থেকে পালাতে হল, এ লজ্জা বাদল ভুল্‌তে পার্‌ছিল না। নিজের পরাভবের জন্য বাদল ওয়েলীকে দোষ দিল। দিয়ে ভারী আত্মপ্রসাদ বোধ কর্‌ল।

তারপর তার মনে পড়ে গেল সুধীদাকে। কি মজা! সুধীদা টের পাবে না বাদল কোথায়। কেউ জান্‌তে পাবে না সে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। শুধু জান্‌বে তার ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্যাঙ্কের লোক একজনকে অপর জনের ঠিকানা জানায় না। ওটা ওদের নীতিবিরুদ্ধ। কাজেই সুধীদা জব্দ।

ব্যাঙ্কে বাদলের শ'দুই পাউণ্ড জমা রয়েছে। ছ'মাসের মত সে নিশ্চিন্ত। এই ছমাস কাল সে নিভৃত চিন্তা কর্‌বে। মননের মত আনন্দ কিছুতে নেই। দুনিয়ায় এমন কোনো বিষয় থাক্‌বে না যা নিয়ে বাদল মন খাটাবে না। মনের মত দেশ, মনের মত ঋতু, একটু নিরিবিলি একটি কুটীর, দুবেলা লঘুপাক আহার্য্য, সারাবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ান কিম্বা মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা—অবশ্য ওয়েদার যদি আজকের মত প্রসন্ন হয়। কি আনন্দ! কি মুক্তি!

পোর্টস্‌মাথ। খেয়া জাহাজ অপেক্ষা কর্‌ছিল। ওপারে ওয়াইট দ্বীপ। দূর থেকে তার বনবীথি দেখা যায়!

বাদল ভাব্‌ছিল, আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, দাদা নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। আছে নিজের উপর শ্রদ্ধা। তাই থেকে অনুমান হয় নিজে আছি। আমি আছি, আর আছে আমার মন। আমরা দুটি সঙ্গী।

"Come along, Mr Mind"—বাদল তার সঙ্গীকে বল্ল।

শেষ

শ্রীলীলাময় রায়

সাহিত্য ও জাতীয় প্রগতি

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু

সাহিত্যের উৎকর্ষের উপর জাতীয় উদ্বোধন বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। উৎকৃষ্ট সাহিত্য একদিকে যেমন জাতীয় চিত্তের সূক্ষ্মতা ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক, অপরদিকে তেমনই জাতিকে শক্তিশালী ও উন্নত করিবার, নব নব চিন্তা ও কর্ম্মের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার এবং নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্বের সাধনায় প্রেরণা দিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক।

সাহিত্য অধিক লোকে সৃষ্টি করে না,—করিতে পারে না। তাহা হইলেও, যাঁহারা সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁহাদিগকে লোকমনের প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, যে বুদ্ধি, জীবন ও জগতের প্রতি যে মনোভাব, যে কল্পনা এবং যে সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রভৃতি মানসিক গুণাবলী অবিকশিত অবস্থায় থাকে, তাহাই কাহারও কাহারও মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে এবং তাঁহাদের হাতে ভাষায় রূপ পাইয়া বিশিষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি করে।

এই সাহিত্যই আবার লোকমনের উন্নয়নে একমাত্র শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল শক্তি। ইহার মধ্যে জাতি তাহার মনের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহার চিন্তা ও বুদ্ধি অনুকূল ক্ষেত্র ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্ত হয় এবং ইহার সাহায্যেই তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্কের সকল প্রকার গুণ পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়। কাজেই, একদিকে যেমন প্রতি ভাষার সাহিত্য, সেই ভাষাভাষীদের বিশিষ্ট প্রতিভার সৃষ্টি তেমনই অন্যদিকে ইহা তাহাদের মানসিক প্রগতির একমাত্র নিয়ামক। প্রতি বৃহৎ সাহিত্যই যেমন কোনও বৃহৎ সভ্যতার ক্রম-পরিণতির বিভিন্নস্তরে সৃষ্ট হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে, তেমন এমন কোনও বৃহৎ সভ্যতা নাই, যাহা বৃহৎ সাহিত্যের সাহায্য ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারিয়াছে; অথবা এমন কোনও বৃহৎ সাহিত্য নাই যাহা বৃহৎ সভ্যতার জন্মদান না করিয়া নিষ্ফল হইয়াছে। সাহিত্যই সভ্যতা ও জ্ঞানকে সমাজের সর্ব্বস্তরে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়। সমৃদ্ধ সাহিত্য ব্যতীত কোনও জাতির উন্নতি এবং সভ্য জাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ অসম্ভব।

কোনও জাতির সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস পাশাপাশি আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব কত গভীর ও ব্যাপক। যখনই অপ্রত্যাশিত কোনও পরিবর্ত্তন কোনও সমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, পুরাতন সংস্কার ও অবলম্বনকে সমূলে চূর্ণ করিয়া তাহাকে নূতনের অভিসারে আহ্বান করিয়াছে, তখনই দেখা যাইবে, সেই নূতনের আগমনী বাণী সাহিত্যের আসরের পুরোভাগে ধ্বনিত হইয়াছে। ইংরাজী ও ইউরোপের অন্যান্য শক্তিশালী সাহিত্য এবং ঐ সকল দেশের যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সমূহের বিবরণ হইতেই ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

লোকমনের উপর সাহিত্যের প্রভাব যে কত শক্তিশালী এবং সমাজ যে এই প্রভাবে কি অপ্রত্যাশিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসেও একেবারে দুর্লভ নহে। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক একত্ববোধ আমাদের মনে তেমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয়দের মধ্যেও কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। তবুও গোটা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সাধনার মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠে নাই, তাহার প্রধান কারণ সংস্কৃত সাহিত্য। প্রদেশে প্রদেশে দেশভাষায় যে সকল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবেই সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত। এই সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আমাদের ভারতীয়সুলভ মনোভাব, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতার মধ্যে

আত্মবিলুপ্তির অপূর্ব্ব আদর্শবাদ প্রভৃতি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। বহু শত বর্ষ ধরিয়া যদিও ইহা আমাদের স্থবির ও অচল করিয়া রাখিয়াছে, জাগতিক উন্নতি এবং কর্ম্মকুশলতার প্রতি আমাদিগকে কতকটা বীতশ্রদ্ধ করিয়াছে, তবুও, ইহাই যে ভারতীয় প্রকৃতির ঐক্যের ধারাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অন্যদিকে আবার ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত সাহিত্য কোনও দিন লোকসাহিত্য হইয়া উঠিতে না পারায়ও ইহার সমগ্র প্রভাব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় পরোক্ষভাবে ইহা আমাদের অনেক দুর্গতি ও অবনতির কারণ হইয়াছে। সমাজের উচ্চ ও নিম্নস্তরের মধ্যে স্থায়ী এবং সুস্পষ্ট বিয়োগ ঘটাইয়াছে।

বিভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত মুসলমান দেশগুলির মধ্যে যে, চিন্তা এবং মনোবৃত্তির ঐক্য লক্ষিত হয়, একটি সাধারণ ধর্ম্ম সাহিত্যের প্রভাবই তাহার প্রধান কারণ।

সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিগূঢ় ঐক্য বর্ত্তমান থাকায়, এবং বিভিন্ন জাতির মানুষের চিন্তার ধারা ও বুদ্ধির গতির আপাত-বৈষম্যগুলি গভীরতর সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বৈদেশিক সাহিত্যের দ্বারাও লোকে প্রভাবিত হইতে পারে। বিস্তৃতভাবে কোনও দেশে যদি বৈদেশিক সাহিত্যের চর্চ্চা হয়, তবে সেই দেশের লোকের মনের উপর তাহার অনিবার্য্য ক্রিয়া, জীবনের সর্ব্ব বিভাগে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও বৈদেশিক সাহিত্য কোনও জাতির পরিপূর্ণ বিকাশকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে না। তাহার প্রথম কারণ, কোনও জাতির সমগ্র জনসমষ্টি কখনও বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না এবং প্রত্যক্ষতঃ তাহার দ্বারা লাভবানও হইতে পারে না। বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য যখন মানুষের মানসিক পুষ্টির একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে দেশের সমগ্র অতীতের সহিত, নিজস্ব সভ্যতা ও পূর্ব্বাপর সংস্কৃতির সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হয়। এই জন্য ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং অতীত ও পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে অনেকটা শক্তির অপব্যয় করিতে হয়। দেশের সকল লোকে ইহা শিক্ষা করিতে পারে না বলিয়া এবং যাহারা শিক্ষা করে, তাহাদের মধ্যেও সকলে ইহা গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া, সমাজে ইহা নানা বিরোধ ও বৈষম্যের সূত্রপাত করে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী ভাষা যদিও আমাদের মনকে সমৃদ্ধ করিতে ও বুদ্ধি ও কল্পনাকে কতকটা গতি দিতে পারে, তবুও আমাদের মনের সৃষ্টিক্ষমতাকে পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিতে পারে না। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির কথা তাই কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়।

আবার অন্যদিকে, বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারাটিও যেমন সত্য, বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং বিশিষ্টতাও তেমনই তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্ব্বপ্রধান কথা। মানুষ এক বলিয়া সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয় এবং বিদেশী সাহিত্যও আমাদের বিকাশসাধনে সহায়তা করিতে পারে। আবার জাতিতে জাতিতে পার্থক্য আছে বলিয়াই, যখন কোনও জাতিকে মানসিক পুষ্টির জন্য একমাত্র বিদেশী সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, তখন তাহার পক্ষে আংশিক অক্ষমতা এবং তাহার প্রাণশক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণে কতকটা বাধা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

মানুষের মন ও বুদ্ধির আকৃতি ও ক্ষমতা অনেকটা এক, কিন্তু, প্রকৃতি বিভিন্ন। ভারতীয়েরা ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও বুদ্ধির অধিকারী হয়ত সহজেই হইতে পারেন, কিন্তু, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ সম্বন্ধে উভয় দেশের লোকের মনের ঝোঁক কখনও এক হইতে পারে না। মনের এই ঝোঁককে যথোপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য যদি আমাদের নিজস্ব সাহিত্য না থাকে, তবে নানাপ্রকার বিকার এবং অসঙ্গতিকে কখনই এড়াইয়া চলা যাইবে না।

বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব যে কতটা ব্যাপক হইতে পারে এবং সকল প্রকার উদ্যম ও চেষ্টা সত্ত্বেও যে তাহার কতকগুলি অপূর্ণতা কিভাবে অনতিক্রম্য থাকিয়া যায়, আমাদের দেশের ইংরাজীশিক্ষার ইতিহাস তাহার একটি জীবন্ত প্রমাণ। ইংরাজীশিক্ষা নানাদিক দিয়া আমাদের

প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণের এবং সামাজিক বহু সংস্কারের জন্য আমরা প্রধানতঃ ইংরাজীশিক্ষার নিকট ঋণী, ইহা আমাদের মানসিক জড়ত্ব এবং অন্ধসংস্কারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেশের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। ইংরাজীশিক্ষা আমাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়াছে এবং জাতীয়তা সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান ধারণাকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। ইহা আমাদের বুদ্ধি ও মনকে একান্তভাবেই ইউরোপের ছাঁচে ঢালাই করিয়াছে; এমন কি, যে চক্ষু দিয়া আমরা ভবিষ্যৎ ভারতকে দেখিতেছি, তাহাতে ইউরোপই দৃষ্টিদান করিয়াছে।

কিন্তু, ইউরোপ আমাদের দ্বারে যে মঙ্গলের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই বলিয়া কোনও মঙ্গল অনুষ্ঠানই আমাদিগকে পূর্ণ সুফল দিতে পারে নাই। দেশের এক শ্রেণীর লোক যাহাকে মহৎ কল্যাণ বলিয়া আশ্রয় করিয়াছে অন্য শ্রেণীর লোকে তাহাকেই প্রাণপণে বাধা দিয়া নিষ্ফল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার এই প্রকারের অনেক সম্ভাবিত সুফল অন্তর্বিরোধে নষ্ট হইয়াছে; সমাজের উচ্চ ও নিম্নস্তরের মধ্যে ব্যবধান দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোকের সহিত ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। দেশের অতীত ইতিহাস, শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত ইহার কোনও যোগাযোগ না থাকায়, অনেক ক্ষেত্রেই ইহা মাত্র মস্তিষ্কের জিনিস হইয়া রহিয়াছে, জীবনের অংশ হইয়া উঠিতে পারে নাই। তর্ক বা আলোচনার সময় ইহার প্রয়োগ করিতে পারি, জীবনের মধ্যে সত্য করিয়া তুলিতে পারি না। তাহার পর, ইহার আর একটি বিশেষ ত্রুটি এই রহিয়া গিয়াছে যে, ইহা আমাদের মনকে যতটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, সৃষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে তাহাকে ততটা সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ইংরাজীশিক্ষার ফলে, আমরা মাতৃভাষার উপরে কতকটা শ্রদ্ধাহীন বলিয়া, আমাদের মনীষীবৃন্দ অল্প যাহা কিছু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সবই ইংরাজীতে। এজন্য দেশের জনসাধারণ তাঁহাদের শ্রমলব্ধ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং বিদেশী সাহিত্যেও তাহা যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে কি না সন্দেহ। মাতৃভাষায় এই সকল পুস্তক রচিত হইলে, একদিকে যেমন এই সকল পুস্তকের সংখ্যা অনেক বাড়িতে পারিত, এবং দেশের সাধারণ লোক ইহা দ্বারা উপকৃত হইত, অন্যদিকে এই সকল পুস্তকের নিজস্ব প্রতিষ্ঠাভূমি থাকায়, মূল্যও অনেক বাড়িয়া যাইত।

সূক্ষ্ম হইলেও, জাতীয় জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব কতটা শক্তিশালী, আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের মধ্যেও তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের স্বদেশিকতার প্রথম উদ্ভব ইংরাজী শিক্ষার ফলে হইলেও, আমাদের দেশীয় সাহিত্যই তাহাকে বিস্তৃতি ও শক্তিদান করিয়াছে। ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণের প্রথম সূত্রপাত বাংলাদেশে হইয়াছিল এবং বহুদিন ধরিয়া বাঙালীই ইহাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। এখানে বাঙালীর এই প্রাধান্য নিতান্ত আকস্মিক নহে। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগ হইতে অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাংলার একস্থানে বিশেষ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সর্ব্বপ্রকারের শিক্ষার জন্য যখন সারা ভারতবর্ষ একমাত্র ইংরাজীর উপরই নির্ভর করিতেছিল, তখন বাংলাদেশে ইংরাজিশিক্ষার পাশাপাশি বিশিষ্ট একটি সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল। এই সাহিত্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত বাঙালীর মনকে অধিকৃত করিয়াছিল এবং তাহার জীবন ও আদর্শকে নানাদিক দিয়া পুষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। বাঙালীর দেশভক্তির প্রেরণাও এখান হইতে আসিয়াছিল। এই সাহিত্যে ইংরাজীর প্রভাব যথেষ্ট থাকিলেও, বাঙালীর বিশেষ প্রকৃতি ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া ইহাকে একটি বিশিষ্টরূপ দান করিয়াছে। বাঙালী যুবকের যে আদর্শপ্রিয়তা, আত্মত্যাগ, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ তাহাকে নানা দুঃখ বরণ করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সমাজ ও দেশের সেবায় তাহাকে অগ্রণী করিয়াছে, বাংলা সাহিত্যই বিশেষ করিয়া সে সকল গুণের বিকাশ সাধনে সহায়তা করিয়াছে। আবার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলা যে অন্ধভাবে কোনও নেতার আদেশ পালন করিতে চায় না, সর্ব্বত্যাগী আদর্শবাদীও প্রশ্ন করে, তর্ক করে, অসঙ্কোচে সন্দেহ প্রকাশ করে, তাহার মূলেও তাহার নিজস্ব

সাহিত্যের প্রেরণা রহিয়াছে। তাহার এই উদার আদর্শ-প্রিয়তার সহিত সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতার সমাবেশের উপকরণ, তাহার সাহিত্যের মধ্যেই আছে। আবার ভারতের অন্য অনেকস্থানের ন্যায় গণ-আন্দোলন যে বাংলায় আশানুরূপ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই, তাহাও সাহিত্যের প্রভাব এবং ক্ষমতার অন্যতম প্রমাণ। এক বাংলা ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই কোনও বিশেষ নেতা বা কর্ম্মীর চরিত্র, সাধনা এবং কর্ম্মশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বদেশ-প্রীতি জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু, বাংলাদেশে ইহাকে আত্মপুষ্টির জন্য সাহিত্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইয়াছে। সাহিত্যই ইহার প্রধান বাহন হইয়াছে বলিয়া, এখানে একদিকে যেমন ইহার শক্তিমত্তা ও অমোঘতা অপরিসীম, অন্যদিকে ইহার বিস্তৃতির ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের অধিকাংশ লোক এখনও অশিক্ষিত, তাহারা সাহিত্যের প্রভাবের বহির্ভূত।

অশিক্ষা ব্যতীত, আমরা সাহিত্যের প্রচারে এবং ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টায় এতটা উদাসীন যে, আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজের মধ্যেও আজও ইহা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকের হৃদয়গ্রাহী এবং শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে, আমাদের ভাষায় এমন পুস্তক এবং পত্রিকার বিশেষ অভাব রহিয়াছে। আমাদের আসলদেশ আজও পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ, পল্লীগ্রামে সাহিত্য প্রচারের কোনও সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক চেষ্টা আজও হয় নাই। এই জন্য কোনও প্রকারের রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টা বাংলাদেশে জনসাধারণের মধ্যে তাদৃশ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, এবং বাঙালী সমাজের দুই প্রান্তের মধ্যে, এ বিষয়ে বৈষম্য এরূপ আশ্চর্য্য অধিক।

আমাদের সমাজের বহু ত্রুটির প্রতি সাধারণ লোকের অন্ধতা, দেশের-স্বাস্থ্য এবং নানা সহজসাধ্য উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্যের মূলেও ঐ একই কারণ নিহিত রহিয়াছে। সমাজের সর্ব্বস্তরে শিক্ষার বিস্তার না হওয়া, অবশ্য এ সকল অশুভের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। তাহা হইলেও, একথা খুবই সত্য যে, সরল বাংলায় লিখিত এই সব বিষয় সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি হইতে যত লোকে জ্ঞানলাভ করিতে পারিত, এবং এই প্রকারের চর্চ্চার দ্বারা যাহাদের বিদ্যা বর্দ্ধিত হইয়া অধিকতর জ্ঞানলাভের উপযোগী হইতে পারিত, তাহাদের মধ্যেও সাহিত্য প্রচারের কোনও চেষ্টা হয় নাই; হইলে, আমাদের উন্নতিকর প্রচেষ্টাসমূহ নিঃসন্দেহ অনেকটা সফল হইত। আর বর্ত্তমানে যাহারা অল্প লেখাপড়া শিখিবার পর চর্চ্চার অভাবে পুনরায় নিরক্ষর হইয়া পড়ে, তাহারা এই অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া দেশের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতে পারিত।

জাতীয় প্রগতির বিভিন্নক্ষেত্রে নানাভাবে যাঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, সাহিত্যের এই সূক্ষ্ম এবং অমোঘ প্রভাবের কথা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মনে রাখিতে হইবে। জাতির ভবিষ্যৎকে যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে হয়, এবং কোনও সত্যানুষ্ঠানের প্রতি অথবা হীন মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে মানবমনকে সচেতন করিয়া তুলিতে হয়, তবে মাতৃভাষার সাহিত্যের সহায়তা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। দেশের লোকের মনে যদি দেশপ্রীতিকে স্থায়িত্ব দান করিতে হয় এবং স্বল্পমূল্যের আশুফলের মোহ ত্যাগ করিয়া ইহাকে জীবন্ত এবং ক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত করিতে হয়, তবে সাধারণের মধ্যে একদিকে শিক্ষা এবং অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের বহুল প্রচারের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইতে পারিবে। সাহিত্যের ভিত্তির উপর ব্যতীত কোনও স্থায়ী মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

এজন্য অনুকূল সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা ও জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাহিত্যিকের মর্য্যাদা ও দেশসেবায় তাঁহার দানের প্রকৃত মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। অথচ, সাহিত্যের শক্তি সূক্ষ্ম এবং দৃষ্টির অগোচর বলিয়াই হউক বা অন্যকারণেই হউক, এ পর্য্যন্ত আমরা এ বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারি নাই। *

শ্রীসুশীলকুমার বসু

---

* পাঠিজা সারস্বত পরিষদে পঠিত।

গুরু-প্রণাম

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

অনন্ত অতিথি আসে
তব রস-সাগরের তীরে—
আকণ্ঠ করিয়া পান,
অবগাহি' তটহীন নীরে—
মনোপাত্রে ভরি' লয় সেই তীর্থবারি
লক্ষ নরনারী।
ফিরে ফিরে আসে তারা—
যাতায়াত চলে অনিবার—
আকুল অমৃত-তৃষ্ণা
অবিলম্বে নহে মিটিবার—
আপনি ভুঞ্জিয়া ডাকে প্রতিবেশীগণে,
"ভুঞ্জ জনে জনে।"

তোমার ঝঙ্কৃত তন্ত্রী
অন্তরের দেবতারে ঘিরে
বাজিতেছে সুরে সুরে
মানবের হৃদয়-মন্দিরে
নিরলস স্তবগানে হয়েছে মুখর
পূজার আসর।
হেরি আপনার মাঝে
তোমার সে চারু-বিরচন
আপনার মননের
চিন্ময়ের তব রূপায়ন
বিগলিত হৃদয়ের ধারা অবিরল
করে ছল্ ছল্।

সবাক্ বৈকুণ্ঠ রচি',
পদ্মালয়ে জাগা'য়ে প্রভাত—
মূকেরে উত্তরি' ল'য়ে
করাইলে বাণীর সাক্ষাৎ—
দেখাইলে সসাগরা মূর্তিখানি তার
রূপে চমৎকার!
সে শুধু রূপসী নহে,
কেবল সে নহে সালঙ্কারা—
দিকে দিকে উল্লাসিনী,
নাহি তার ছটার কিনারা···
সে বাণীরে নতিচ্ছলে আমি করিলাম
গুরুরে প্রণাম। *

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

* রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত

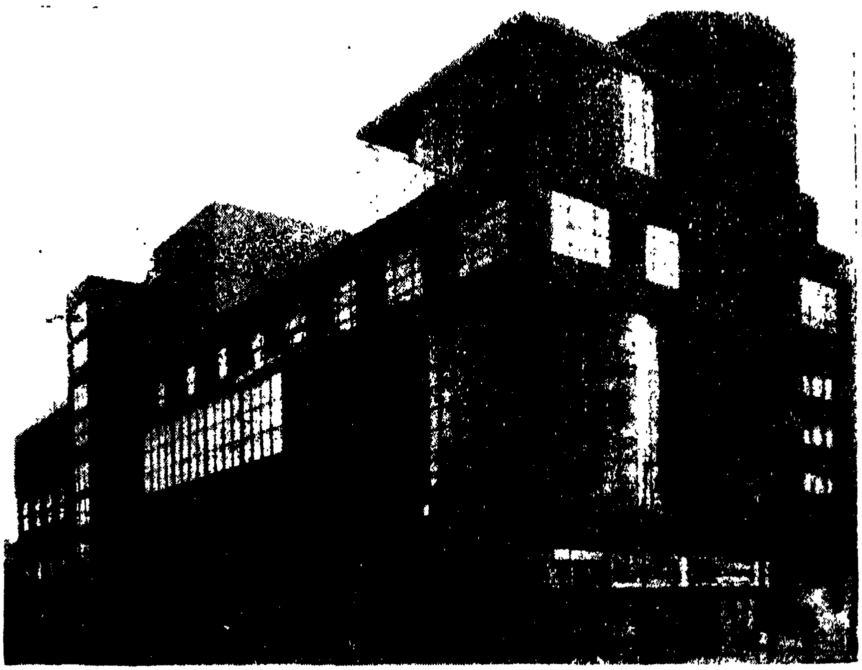
মস্কৌএর চিঠি

(ছেলের কথা)

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উল্টো হরফে নাম লেখা সারি সারি ট্রাম চ'লেচে, ভিতরে প্রায় কলকাতার বাস্-এর মতো অশোভন ভিড়; ধুলো-ওড়ানো ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তর-বিকীর্ণ অসম্পূর্ণ পথের উপর দিয়ে সশব্দে গতিমান। দরিদ্র দোকানে কঠিন কালো রুটি এবং ড্যালা চিনির মলিন মিষ্টান্ন কিন্‌তে বস্তির হৃষ্টপুষ্ট ছেলের জটলা। রাস্তার দুপাশে পুরাতনী গম্বুজ মিনারেট চর্চ্চ-চূড়ার সঙ্গে উগ্র নূতন কারখানা চিম্‌নির পাঁচমিশেলি ভিড়। তা'র মধ্যে দিয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে চল্‌ল আমাদের মোটর গাড়ি। দুপুরে চলেচি মস্কৌএর খিদিরপুর অঞ্চলে জেল-খানা দেখ্‌তে। ভরসা আছে ফেরবার পথে দেরি হবে না।



মস্কৌ—জুয়েফের নামে ক্লাব
১৯২৮ সালে স্থাপিত শ্রীযুক্ত ই-গলোসেভের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত

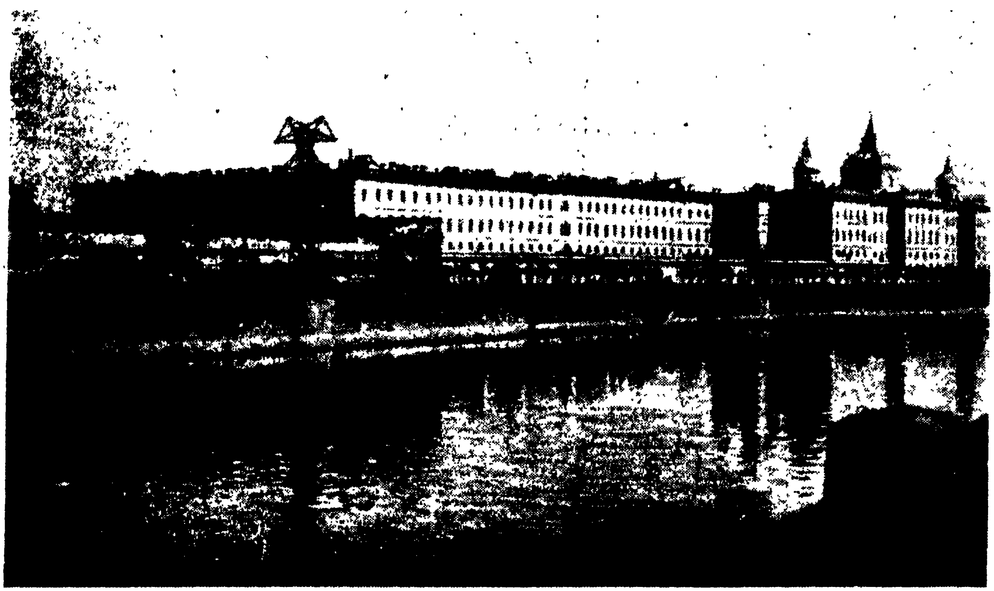
কিন্তু চোখের চমক অতিক্রম ক'রে দেখে মনের নিগূঢ় পরিচয়। কে বল্‌বে বিশ্বের অপর প্রান্তে এসেচি রাশিয়ায় — সমুদ্রবেষ্টিত ভারতভূমি দূর আকাশতলে তার লীলা বহন ক'রে চলেচে; অচিন্ লোকালয়ে আমি দৈবের পথিক।

অদ্ভুত লাগে মনে ক'র্‌তে যে বিদেশে আছি, অথচ নেই। এ ভাব আর ঘুচল না। য়ুরোপে পা দেবা পর্য্যন্ত এই আশ্চর্য্য মনে লেগে আছে। ছন্দ আলাদা, সুর সংমিশ্রণ ভিন্ন, কিন্তু চেনা গান-ভাঙা। ছবির ছাঁদ নূতন প্রবলতম নূতনও আছে, ভূষায়, ভাষায়, রীতিতে; অথচ আমারই মানবসংসার, সেই ইচ্ছা সংগ্রাম বেদনা; প্রয়োজনের, সুন্দরের সেই মিশ্রিত আবর্ত্তন। পথে চেয়ে, মানুষের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আমারই জন্মভূমিকে দেখ্‌চি স্বপ্নের

মধ্যে দিয়ে। অনাদি যুগের ছায়া অদৃশ্যে লুটিয়ে পড়েচে মানব-মহাযাত্রার দুরগামী বাণী বহন ক'রে।

চোখে পড়ল পথের আলোকস্তম্ভে, রঙীন্ নিশানে, দোকানের নাম-ফলকে সর্ব্বত্র লেখা যেন ইংরেজি অক্ষরে—কমীন্নাপ্—কেবলি কমীন্নাপ্। ভাব্লেম রুশীয় ডি গুপ্ত বা বস্তু রিল্ লোকগুলিকে পেয়ে বসেচে। পেটেণ্ট্ ওষুধের সার্ব্বভৌমিক জয়-লাঞ্ছন।—বাবু হেসে বল্লেন,—আমাদের পেটেণ্ট্ ওষুধ লাগে না, সমস্ত দেশের বুকে আজ রাশিয়ান্ হাওয়ায় হাওয়ায় ভাবের সংক্রামকতায়, কর্ম্মের নিবিড় ব্যবহারে। সাধ্য কার আরোগ্য এড়ায়।

কম্যুনিস্ম্ শুনে আতঙ্কিত হোয়ো না। বাঘ ভালুকের বিধি নয়, তুমি আমি যার মধ্যে আছি তাই, ওরা বেশি দূর পর্য্যন্ত এগিয়েচে। দুর্ব্বার ধ্বংসতাণ্ডবে অর্থের স্থায়ী ভিত্তিকে ধূলিসাৎ করা নয়, ক্ষুধিত পদাতিকের হাতে যথেচ্ছাচারী রাজ্যভার দেয়নি। কম বেশি পরিমাণে সকল সভ্য দেশই কম্যুনিষ্টিক্—এরা বাধা ভেঙে চলেচে দৃপ্ত

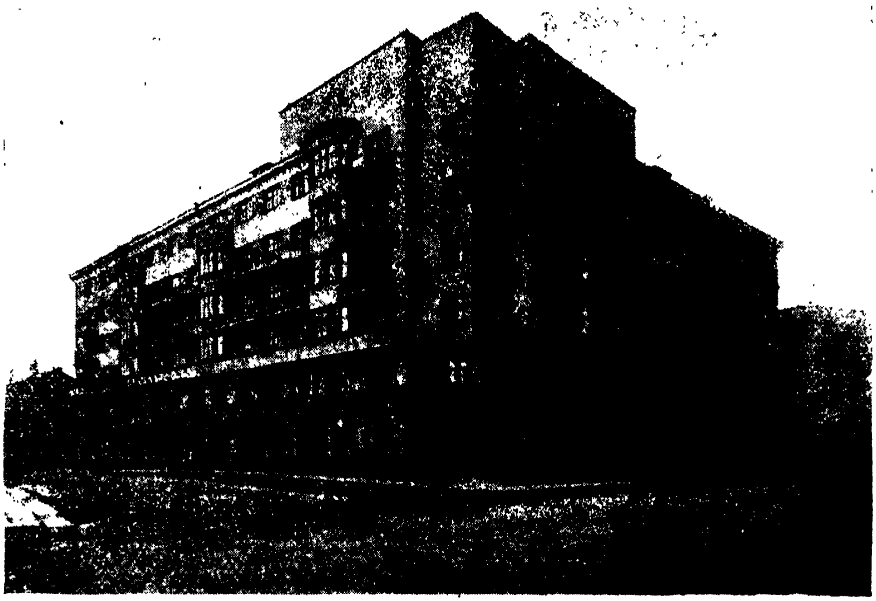


একটি অফিস-গৃহ—সল্জানকা

অক্ষরে দেগেচে ঐ এক সত্য—কম্যুনাল্—জাতীয় শক্তির মন্ত্র, মানুষকে সভ্য করবার মন্ত্র। কম্যুনাল্ খাবারের দোকান, কম্যুনাল হাটবাজার, কম্যুনাল ব্যাঙ্ক, কম্যুনাল শস্যভাণ্ডার। বৃহৎ রাষ্ট্রীয় কম্যুনের এই সাধারণ সম্পত্তি, সমবায় প্রণালীতে রক্ষণ ও পরিবেষণ চলে। মালিক হল পুরবাসী, গ্রামবাসী। গবর্ণমেণ্ট হল বড়ো আপিস যেখান থেকে পরিচালনা এবং ব্যবস্থাবিধি। অর্থাৎ কম্যুনাল পদ্ধতিতে যে-চিকিৎসা চলেচে তা'র বীজ বোতলে নয়, বেগে। কলকাতায় কলের জল সরবরাহ হচ্চে জনসাধারণের তরফ থেকে, দাসী কলতলায় বাসন মাজে, টালার ট্যাঙ্কের কথা ভাবে না, এমন কি সময় মতো কল বন্ধ করবার কথাও। তুমি আমি, গোকুল দে, বা সাতকড়ি দত্ত রেলগাড়িতে চেপে বসি, ভিড় হ'লে দোষ দেবো কিন্তু আয়োজনের কোনো দায়িত্বই আমাদের নয়। পোষ্টাপিস চিঠি নিচ্চে এবং দিচ্চে প্রত্যেকের হ'য়ে। বিদ্যুৎ-পাখা ও দীপের বার্ত্তাও তাই। আমাদের দেশে হয়তো সবগুলিতেই

ব্যবসাগিরির ঘুণে ধ'রেচে কিন্তু তত্ত্বটা একই। ধরো যদি কর্পোরেশন্ থেকে পানীয় জলের মতো ঘরে ঘরে ডাল ভাতের সাধারণ গোছের আয়োজন হোতো, দুধ এবং রুটির, তুমি কি আপত্তি ক'রতে? ধুতি জামা শীতকালের কম্বল এবং বারোমাসের বাড়ি যদি পেতে সামান্য ট্যাক্সো দিয়ে, এমন কি বিনা ট্যাক্সে, তোমার শরীর মনের সার্থক সীমাবদ্ধ পরিশ্রমের বদলে, বিদ্রোহ ক'রতে? এরা গ্রামে গ্রামে ঐকত্রিক কৃষি চালাচ্চে—ক্ষেত সকলেরই, আলের স্বার্থচিহ্ন নেই অথচ শস্যের ভাগ আছে। ব'লবে, এতে চাড় ক'মে স্ফীতি চলবে না। কেউ বা বিলাসের অট্টালিকায় অমানুষ জমিদার, কারো জঠরে ক্ষুধার যন্ত্রণা, দুর্গতির হীন জন্মদাস হ'য়ে মোটরের চাকা এড়িয়ে ভবলীলা যাপন—এমনতরো সাংঘাতিক প্রহসনে যবনিকা ফেলা চাই। লোভের চোর-কাঁটায় নিড়নি চালালে বড়ো ইচ্ছার ফসল ফলবে।

মনুষ্যযোগ্য আহার বিহার স্বাস্থ্যের বসবাসের জীবনবীমা কোম্পানি হোক্ দেশরাষ্ট্র। বেশির দায়িত্ব তোমার। দাবী রইল তোমার 'পরে অকুণ্ঠিত বিশ্বাসের, অক্লান্ত সেবার, স্বার্থবন্ধনঘাতী বীর্য্যের। মানুষের সংসারকে সাম্যের ভিত্তিতে পাকা ক'রে গাঁথো, ব্যক্তি-বিশেষের আত্মপ্রকাশের অবসর হবে বহুগুণিত।



মস্কোএর একটি অফিস।
১৯২৮ সালে স্থপতি শ্রীযুক্ত এ-মেস্‌কফের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত

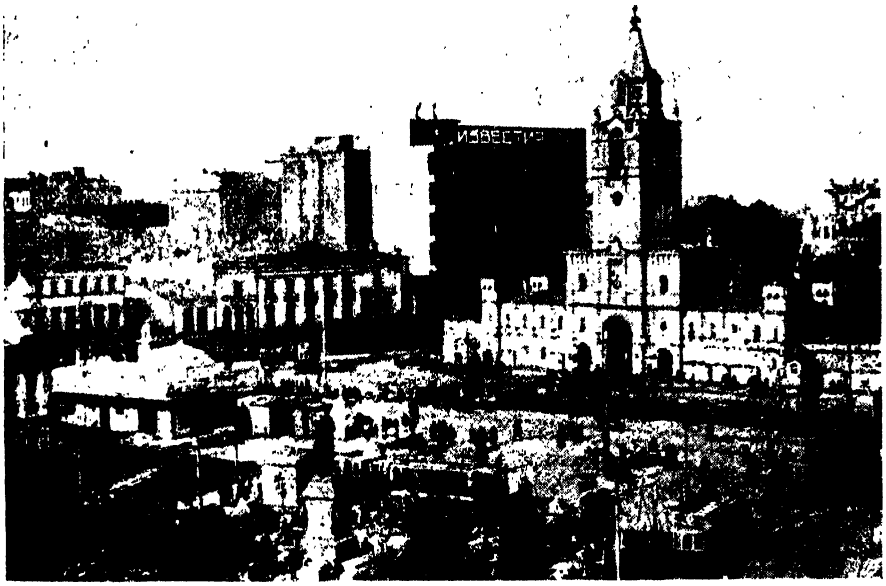
কোন্‌খানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমারেখা টান্‌বে তাই নিয়ে তর্ক। ভয় পাবার কিছু নেই। সীমার লাইন ওঠা-নামা ক'রে সামঞ্জস্যে এসে থাম্‌বে। ইতিহাসের মহত্তম ঘটনা এই যে এরা মানুষকে পূর্ণমর্য্যাদার সমদৃষ্টিতে দেখ্‌ল, তা'র দাবীকে স্বীকার করল। যেমন তেমন ক'রে মানুষকে অবস্থার আবর্ত্তে পাক খাওয়ানোকে মনুর বিধান বা Eugenics বা কোনো অর্থনৈতিক সমর্থন দিয়ে নির্লজ্জ রাষ্ট্রীয় অক্ষমতাকে জাহির করে নি। নবজাত শিশুমাত্রকেই এরা ব'লেচে, তোমার অধিকার কারো চেয়ে কম নয়, তোমাকে আমরা স্বীকার ক'রে নিলেম। নূতন ব্যবস্থা এখনো পাকা হয় নি কিন্তু এই স্বীকৃতির মূল্য উজ্জ্বল দিগন্তের মূল্য, তা'র মধ্যে আনন্দিত দূর পথের নিমন্ত্রণ। কম্যুনালের জয়ধ্বজা শাশ্বত সার্ব্বজনীন আদর্শের

যায়—কথাটা কি সত্য? নিজের অংশ বাড়ানোতেই মানুষের উদ্যমের মূল? মান্‌লেম; কিন্তু শিক্ষাবিমুক্ত মানুষের স্বার্থ-বুদ্ধিকে আরো উপরে নিয়ে দেখো, দেখ্‌বে আহার বিহার বস্ত্রের, শিশুরক্ষা রোগশুশ্রূষার ভার ষ্টেট্ বহুল পরিমাণে বহন ক'রলেও সূক্ষ্মতর আত্ম-সমৃদ্ধির তৃষা মানুষের থাক্‌বেই। বরঞ্চ, বাড়বে। কথাটা হচ্চে মনুষ্যযোগ্য মোটামুটি প্রয়োজনের কথা। সেইটে আসুক্ রাষ্ট্র-কম্যুনের হাতে। অবশ্য সেটা সম্ভব ক'রতে হ'লে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অতি

মহাকাশে উড়চে—উপস্থিতের নানান্ অসঙ্গতি যেন তাকে চোখের আড়াল না করে।

বেশিক্ষণ কম্যুনিজম্ ক'রলে জেল থেকে ফিরতে বিলম্ব হবে।

রোদ্দুরে বিদেশী গাছপালা জ্বলচে; সহরের প্রান্তে শ্যামলচ্ছায়ায় পথ বেঁকে দাঁড়ালো প্রকাণ্ড প্রাচীন বাড়ির তোরণের কাছে। নীল-খাকী কস্যাকীয় বেশ প'রে পুলিশ ঘুরচে—অতিথির কামরায় নিয়ে বসালো। আমাদের রাশিয়ান্ সঙ্গী V. O. K. S. এর ছাড়পত্র দেখাতেই



মস্কৌ—Place Strastnaia

ভিতরে প্রকাণ্ড লোহার দরজা খুল্ল। ভিতরে খানিকটা খোলা জায়গা, সংহত কর্ম্মের স্তব্ধতা। চারদিকে পথ গেছে—যন্ত্রনির্ম্মাণশালায়; কাঠের কাপড়ের চামড়ার কয়েদী-চালিত কারখানায়। প্রথমে ঢুকলেম কয়েদীর বাসগৃহে—তারই মধ্যে ভোজনশালা, লাইব্রেরি, সামাজিক মিলন-কক্ষ।

এই জেলের নাম—The Lefort House of Isolation.

নামের বিশেষ অর্থ আছে। ভাব্লে দেখা যাবে অন্ত-দেশীয় অধিকাংশ জেলের নাম হওয়া উচিত শাস্তির বন্দীশালা, প্রতিহিংসার দুর্গ। হয়তো অনেকস্থানে Chamber of Horrors নামটা বেমানান হবে না। কেননা অপরাধীকে ন্যায়দণ্ড দিয়ে নির্ম্মম আঘাত করা; বড়ো জোর, তর্জ্জিয়ে রাখা; নয়তো তা'র উপর প্রতিশোধবৃত্তি চরিতার্থ করবার লালসা সামাজিক বিধান। প্রতিশোধ, প্রতিরোধের ব্যবস্থা শৃঙ্খলদৃঢ় যান্ত্রিকতায় পাকা হ'লো; পরিশোধন, প্রতিবিধানের চেষ্টা বর্ব্বরতায় বিড়ম্বিত। আশা করি আজকের দিনে বল্বে না শোধ্রানোর উপায় পুলিশের রক্তচক্ষু, অন্ধকার ঘর, অমানুষিক জীবনের অপমান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টন। দেহটাকে আঘাত ক'রে মনকে পাওয়ার প্রণালী গব্য মনস্তত্ত্ব, খোয়াড়ে রেখে আত্মার তারণ। বস্তুত প্রতিহিংসা রয়েচে মূলে, তা'র সঙ্গে আছে দুর্ব্বলকে দুর্ভাগাকে সবে মিলে আক্রমণ করার আদিমতম সংঘজন্তুবৃত্তি। অপরাধীকে সমাজের থেকে কিছু কালের মতো দূরে রাখবার প্রয়োজন আছে, এরা তা ক'রেচে, কিন্তু জেলের ভিতরে সেপাইয়ের যথেচ্ছাচারী খুঁনে বুদ্ধির হাতে তা'রা সমর্পিত নয়।

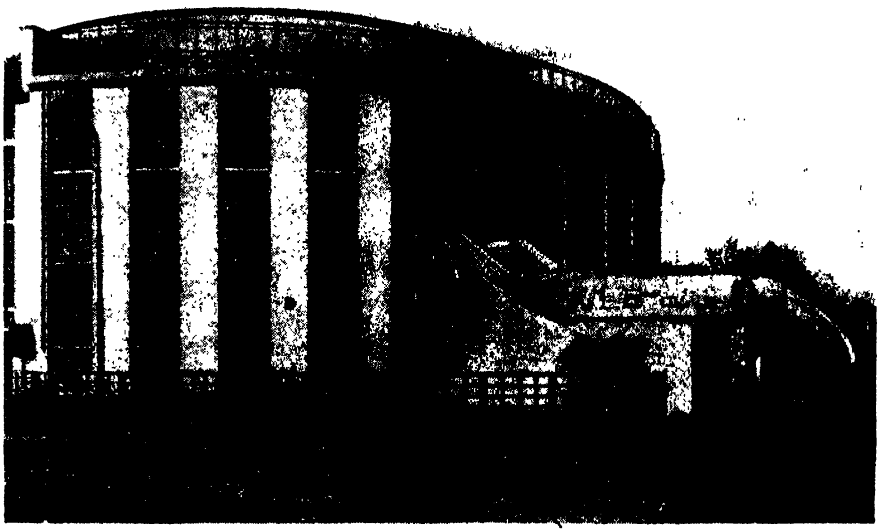
সমাজ অপরাধের শিকড় কাটতে চায় তো তাকে দেখ্তে হবে পূর্ব্বসংস্কারের পথ, চিত্তশুদ্ধির পথ। বিকারের মূলে রয়েচে যে-লোভ, মায়িক অহঙ্কারের তাড়না তাকে সুস্থ করবার জন্যে এরা সামবায়িক চিকিৎসায় যা করচে আভাস দিয়েচি। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"তে এ বিষয়ে শেষ কথা পাবে। জ্ঞানকে ব্যাপকতর প্রয়োগবিধিতে বিষয়ীকৃত

ক'রচে, অবচ্ছিন্ন তত্ত্বাকারে ঝুলিয়ে রাখে নি। এদের সমাজব্যবস্থায় তাই সংস্কারের পারম্পর্য্য রক্ষিত হয়েচে। একদিকে লোভের অন্যায়ের অবহেলাময় অবাধ প্রশ্রয়, অন্যদিকে আদালত, গুপ্তচর, জেলদারোগা, নরঘাতকের পুণ্যহীন সম্মেলন এদের অভিপ্রেত নয়। অন্যায়ের পূর্ব্ব সংস্কারের ব্যবস্থায় এরা সমগ্র সভ্যতাকে নূতন পথে প্রবৃত্ত করচে।

শোধনের কথাটা বলি। হতভাগ্য দোষীর জন্যে জেলখানাকে এরা বানিয়েচে আরোগ্যভবন। অনুকম্পায়ী চিত্তকে আধুনিক বিজ্ঞানের বোধ দিয়ে কর্ম্মশীল ক'রেচে তা'র প্রমাণ পেলেম এই অপরাধীর সংস্কার সত্রে।

লক্ষ্য করলেম বাসকক্ষের পরিচ্ছন্নতা—ঘরে বারান্দায় সম্মার্জ্জনীর অক্লান্ত অধ্যবসায়চিহ্ন—চিহ্নের অভাব। চূণকামকরা ছোটো ছোটো প্রকোষ্ঠ—বেশির ভাগ কয়েদাই পায় স্বতন্ত্র কক্ষ—দেয়ালে দু-চারটে ছবি বহুলত লেনিন্ স্টালিনের, এমন কি টলষ্টয়, গর্কির; নয় প্রসিদ্ধ চিত্রের প্রতিলেখ। লোহার স্প্রিং-দেওয়া খাটে মজবুত বিছানা, ইলেক্ট্রিক বাতি, কাপড় রাখবার আল্‌না, একখানা ছোটো টেবিল। প্রত্যেক ঘরে জান্‌লা, প্রত্যেক ঘরে রেডিয়ো। সন্ধ্যা ছ-টা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত বাহিরের জগতের সঙ্গে এই মুক্তযোগ, গানের মধ্যে দিয়ে, বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে, সাহিত্যপাঠ, সাময়িক সমাচারে। ইচ্ছে করে শোনো, নয়তো কল বন্ধ ক'রে আর যা কিছু করো। কে না শুনবে? বন্দীকে একই সঙ্গে মুক্ত জগতের আনন্দ, এবং অবরোধের বেদনা দেওয়া কম কথা নয়। সংস্কারের এত বড়ো প্রেরণা আর কী হ'তে পারে। এ ছাড়া দৈনিক কাগজ এরা পড়তে পায়, এবং বই। কোনোটাই অবশ্যকর্ত্তব্যের অঙ্গ নয় ব'লেই তা'র জোর। এই প্রসঙ্গে আরো কথা পরে লিখব।

কাজের সময়; বেশির ভাগ ঘর শূন্য। যেখানে লোক উপস্থিত, গম্ভীরভাবে অভিবাদন ক'রে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। শুভ ইচ্ছা জানিয়ে অন্যত্র চললেম। কর্ম্মচারী দেখলেম মর্য্যাদা দিতে জানে, আত্ম-সম্মান জাগানোর এই বিধি। সংযত ভদ্রতার সম্বন্ধ অনুভব করলেম। আমেরিকার জেলে যে ক্রুদ্ধ অবজ্ঞা দেখেচি তা নয়। আসামীর মার খাওয়া চাপা বিদ্রোহ কারো চোখে দেখিনি।



মস্কো—"Caoutchoug" কারখানার ক্লাব
১৯২৯ সালে স্থপতি শ্রীযুক্ত কে-মেল্‌নিকফের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত

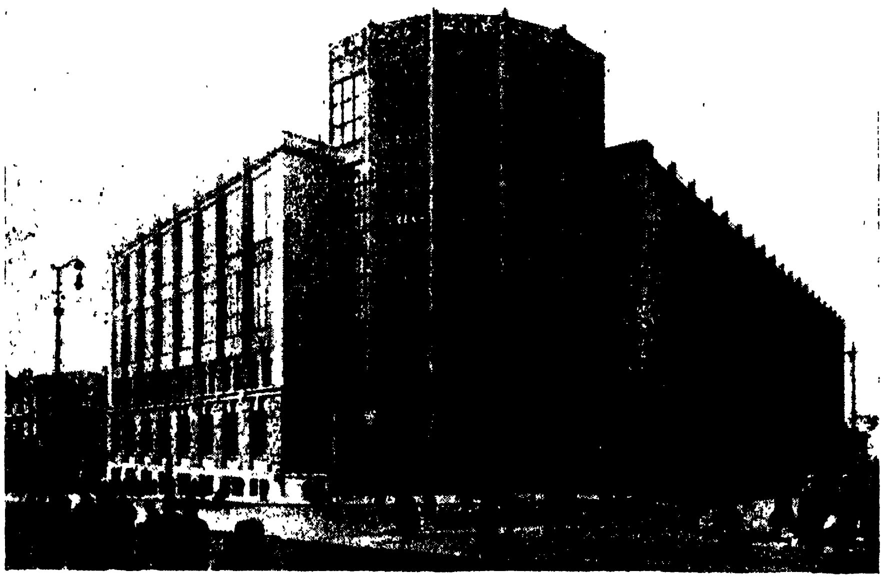
নিয়ে চল্‌ল দোকানে। জেলেরই ভিতরে। দোকানীও অপরাধীর একজন। মধ্যে মধ্যে বাহিরে গিয়ে জিনিষপত্র কিনে আনতে পায়, বড়ো ব্যবসার চিঠিপত্র চালাতে হয়। সব দায়িত্ব তা'র এবং সহকর্ম্মীদের। কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তা

সর্ব্বদাই পেতে পারে। জবাবদিহী অবশ্যই আছে কিন্তু জবরদস্তি নেই। দোকানে কাগজ কলম কাপড় সুতো মিষ্টান্ন, বই, নানা রকম আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য রক্ষিত। চেক্ জাল করেচে, তহশিল তছ্‌রূপের আসামী বেছে নিয়ে টাকা পয়সার দায়ীত্ব দেওয়া হয়।

এ সম্বন্ধে ওদের বুলেটিনের মন্তব্য শোনো।

"It is hard for modern civilized people in Europe to realize that a thrice convicted thief, with many years of imprisonment behind him, convicted again for a fresh crime and sentenced to four years' imprisonment, that such a socially dangerous individual should be in charge of a Co-operative store, having on his hands as much as 6,000 roubles of public money, and enjoying the confidence of various institutions, so as to be able to put his signature under bills of exchange drawn for large sums.............."

প্রত্যেক কারাগৃহীকে কিছু মাসিক বৃত্তি দিয়ে অত্যাবশ্যিক আহার পরিচ্ছদ ব্যতীত জিনিষপত্র কেনবার সঙ্গতি দানের ব্যবস্থা আছে,—ঐ অর্থ সম্বন্ধে তা'র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, জমাতে চায় ব্যাঙ্ক আছে, খাটাতে চায় সমবায় ভাণ্ডারের শেয়ার কিনতে পারে, পছন্দ মতো বই কিনুক, কিম্বা ছবি আঁকবার সরঞ্জাম। প্রতি কোপেকের হিসাব রাখা চাই।



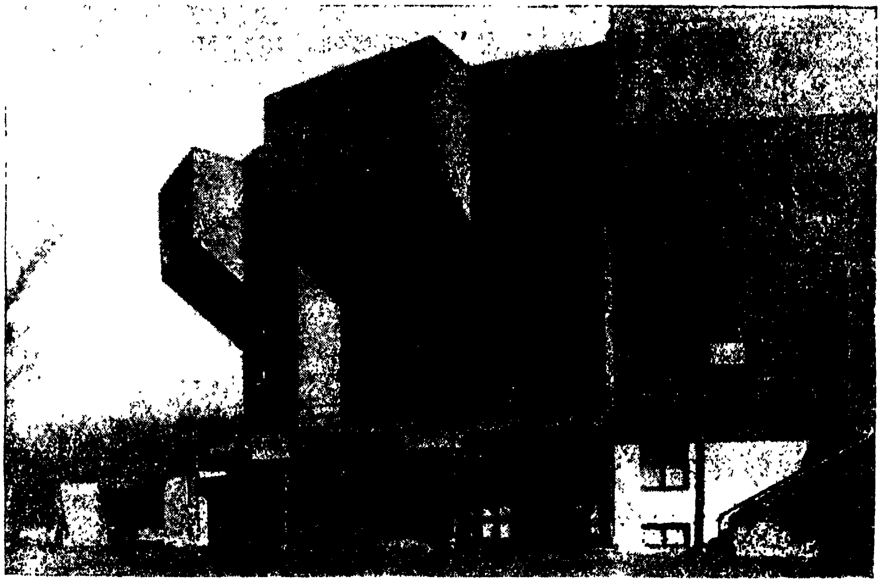
মস্কৌ—পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস।
১৯২৭ সনে স্থপতি শ্রীযুক্ত রায়বর্গের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত

কারাগৃহী অবরোধকালে এমন বিদ্যা আয়ত্ত করতে বাধ্য বাহিরে গিয়ে যা দিয়ে সে সংসার খরচ চালাতে পারে। বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শিতা অনুসারে অবরোধের কাল নিয়ন্ত্রিত —শিখ্‌তে দেরি হওয়া স্বাধীনতার বিঘ্ন।

শিক্ষার কোনো সসেজ্-তৈরির কল নেই যার মধ্যে যেমন তেমন ক'রে পুরলেই ছাপ-মারা মাপ-সই মানুষ বেরিয়ে আসবে—এ বিষয়ে ওরা জেলের মধ্যে যা করচে বহুতর বিশ্ববিদ্যালয়ে তা ঘটে না। ব্যক্তিবিশেষকে

মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে যান, তা'র মনোবৃত্তি এবং শারীরিক ছন্দ অনুসারে কর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা চলে। শিল্পকাজে যার স্বভাবের প্রবর্ত্তনা সেলাই, বই বাঁধাই, কাঠের গালার চামড়ার জিনিষ তৈরি প্রভৃতি নানান্ কারু-বিদ্যায় তাকে লাগানো হল। কেউ ঢুকল কল-বানানোর সাক্‌রেদি ক'র্‌তে। তা ছাড়া মোটা রকমের বিবিধ ব্যবসায় কর্ম্ম রয়েচে। বাগানের কেয়ারি করা, ফল, ফুল সব্‌জি শস্যের চাষ শিখতে লোকের অভাব নেই। কাজ না শিখে বাহিরে পালাবার সমস্যা এখানকার নয়। যাদের মনে চাঞ্চল্য বেশি, অলক্ষ্যে তাদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বার ব্যবস্থা।

আবার মনে পড়চে নিউ হেভেনে য়িএল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে বড়ো কয়েদশালার কথা। খাঁচায় মানুষ পুরেচে মাটির তিনতলা নীচে, বিশেষ আসামী সেখানে লোহার শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো দিয়ে ক্রমাগত অন্ধকারকে ঠেল্‌তে চেষ্টা ক'রচে। ঘরে নেই একখণ্ড আসবাব, শয্যা হিমশীতল



মস্কো—রুসাকফের নামে ক্লাব
১৯২৮ সনে স্থপতি শ্রীযুক্ত কে-মেল্‌নিকফের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত

ব্যাবহারিক বিদ্যায় হাত পাকিয়ে ভদ্র উপায়ে অর্থার্জ্জন করবার অভ্যাস তৈরি হলে এই বিদ্যায়তনের ছাত্র বাহিরে বেরোবে।

বড়ো বড়ো ঘরে এবং বারান্দা-পথে মাইল দুয়েক ঘুরে এবং সিঁড়ি ভেঙে অনেক কিছু দেখলেম। বিরাট কর্ম্মের উপনিবেশে এসেচি। এখানে বিদ্যার্থী উৎসাহিত, উদ্যোগী; বহুমুখী প্রচেষ্টার স্রোত ত্বরবেগে বইচে। পুলিশ পাহারা-ওয়ালার ছায়া বিশেষ চোখে পড়ল না, বরঞ্চ তা'র বিরলতাই দ্রষ্টব্য। অত বড়ো একটি বিচিত্র সমাজে বিপ্লব বাধলে সামলাবার উপায় কী প্রশ্ন জাগে, উত্তরে জান্‌লেম সিমেন্টের মেঝে। কলাই-করা একটা পাত্র প'ড়ে আছে গরাদের পাশে, খাদ্যের উচ্ছিষ্ট বহন ক'রে। রক্তচক্ষু প্রহরী স্পর্দ্ধাকণ্ঠে বোঝালেন ঐ লোকটি তাঁর আজ্ঞা মানে নি, ফিরে কথা ক'য়েছিল। শ্লেষ ক'রে বললেন এখন ভায়ার স্বাধীন মেজাজ ক-ডিগ্রী উঠেচে, ব্যারোমিটার কী বলে? গণতান্ত্রিক অতি-সভ্য স্বাধীন দেশের কথা বলচি; অবশ্য আমাদেরও কারো বুঝ্‌তে বাধ্‌বে না।

এগিয়ে চল্‌লেম। প্রকাণ্ড লেক্‌চার হল্— বাহির থেকে অধ্যাপক এসে নিয়মিত বক্তৃতা দিয়ে যান, ধর্ম্মোপদেশ নয়,

জ্ঞানের নানান্ বিষয়ে। দেয়ালে নানা দেশের মানচিত্র, Statisticsএর আঁকজোখ কাটা নক্সা; এক পাশে মস্ত একটা Globe, পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ; আরেক প্রান্তে সৌর-লোকের আয়তন এবং প্রদক্ষিণকক্ষ অনুসারে সাজানো গ্রহ-তারকার অনীয়ান্ বৃত্তমণ্ডলী। পাশের ঘরে সারে সারে বই, খোলা আল্মারির সেল্ফে। টেবিলে খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের তথ্য ও তত্ত্বাবলী। Turksib রেলোয়ে কী বিপুল বেগে মধ্য-এশিয়া, কাজাক্‌ষ্টান্, সাইবেরিয়ার মর্ম্মে মর্ম্মে সভ্যতার ধারা বইয়ে চলেচে, দূরবিক্ষিপ্ত মানবসমাজকে ঐকত্রিক রাষ্ট্রের যোগে বাঁধচে—তা'র আশ্চর্য্য কাহিনী ছবিতে কথায় অবরুদ্ধের কাছে উপস্থিত। Dnieprostroi এবং Volga—Don Canalএর জগদ্বিখ্যাত নির্ম্মাণ-কাজের বিবরণ হতে এরা বঞ্চিত হয় নি। কোথায় কারাচাইএর প্রাদেশিক সাহিত্য, সেমিপালাটিন্‌স্কের নূতন গ্রাম্য-শিল্প এবং tractor বানাবার মার্কিন দেশীয় কল; য়ুক্রেন এবং ককেসাসের গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো এবং কর্ম্মশালার প্রবর্ত্তনা, Volga-র জলপথে নূতন সমবায় ষ্টীমার ব্যবসায়; পামীরে জার্ম্মাণ ও সোভিয়েট্ বৈজ্ঞানিকদলের অভিযান; কাজানের নূতন আরোগ্যভবন ও গ্রন্থাগার; খির্‌গিজ ও টারটার্‌দের পৌরাণিক সংস্কারের তুলনামূলক সমালোচনা—কোনো বিষয়েই এদের পুঁথি-পত্রের অভাব নেই। ক্ষণকালের মধ্যে এইটুকু বুঝলেম, তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত দেশের তথ্য এরা দেশবাসীকে জানাচ্চে, মনকে হৃদয়কে বাঁধচে জ্ঞানের গ্রন্থিতে। কারাগারের প্রাচীরেও আড়াল পড়েনি। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিচিত্র বিবিধমুখী প্রগতির ইতিহাস এদের কর্ম্মের মানসিক পটভূমি রচনা ক'রচে।

তা'র পর শুনলেম জেলে ব'সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেবার ব্যবস্থার বর্ণনা, নিয়মিত পত্রযোগে। ডিগ্রি ব'লে নয়, শিক্ষার সহজ উপায় সকলের হাতে। ঔৎসুক্যের তাগিদ কারারুদ্ধকে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের কাছে টান্‌বে—পথ খোলা রয়েচে। ওদের বুলেটিনে লিখেচে—

"The essential feature of correspondence tuition for prison inmates consists in that it is carried on in precisely the same manner as it is for other citizens of the Soviet Republic, without any modification in the curriculum or in the method and forms of instruction. The correspondence courses are conducted from headquarters connected with the higher Schools and Universities, under the advice and guidance of professors and specialists in various branches,............"

অপরাধীর দুর্ভাগ্যের গুরুত্ব অনুসারে ঘরের অন্ধকার এবং নির্ম্মম ব্যবহারের মাত্রা বাড়ায়নি। এরা সভ্যদেশীয় solitary confinementএর অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে শেখেনি, বিদ্যাদানের পথ দিয়ে বিকারগ্রস্থকে স্বাভাবিক জনসমাজে ফিরিয়ে আনতে চেয়েচে।

"The advantages of correspondence tuition are extended to all categories of convicts......

Correspondence tuition connects the inmates with the outside world, with the normal world beyond the prison walls, with schools, scientific establishments, and individual scientists.......

This intercourse, combined with the facilities for acquiring special knowledge to be utilised after regaining liberty, considerably increases the industrious inclination among the inmates,.........imbues them with hope and desire for a better life."

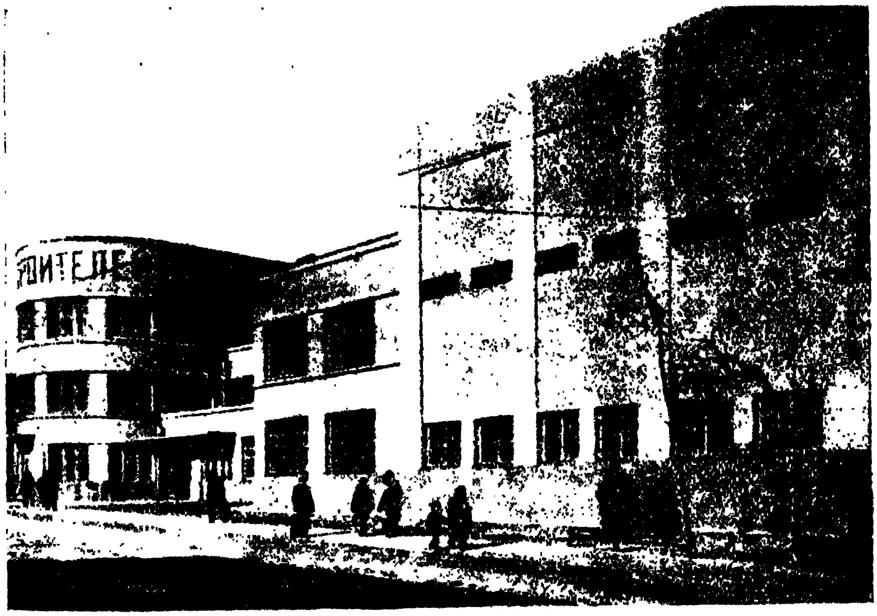
খবর পেলেম পত্রযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা অবরোধভবন-গুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্চে, এরি মধ্যে ছ-হাজারের উপর কারাবাসী চিঠিতে পড়াশোনা চালাচ্চে, প্রতিদিন নূতন দরখাস্তের ভিড় জমচে।

বিশেষ-শিক্ষিতদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, সাধারণের জন্যে স্তরে স্তরে জ্ঞানের সরবরাহ।

"The programmes comprise courses of elementary and secondary school subjects, technical training in various crafts, such as mechanics, electricians, chemists etc.;

commercial knowledge, such as book-keeping, accountancy, statistics etc.; courses in agriculture, in the pictorial arts, and so forth........."

"Each group of subjects has elementary, intermediate, and advanced courses, including even a course of Soviet Law conformably to the programme of the First Moscow State University. This correspondence is conducted directly by the University."



মস্কৌ—স্থপতি-সংসদের ক্লাবগৃহ
১৯২৮ সনে ইঞ্জিনীয়র শ্রীযুক্ত ফেড্রকের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ম্মিত

একবার ভেবে দেখো অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্থালয় প্রেষ্টিজের মাথা খেয়ে জেলখানার কয়েদীদের ডিগ্রি দিচ্চে, ধরো কম্যুনিজ্‌ম-চর্চ্চার অপরাধে বন্দী সোভিয়েট আসামীর সঙ্গে খ্যাতনামা ইংরেজ বিচারক পত্রযোগে ব্রিটিশ আইনের আলোচনা চালাচ্চেন। ঘরের কাছে নাই এলেম।

"The Chief Board for Occupational Training, jointly with the Chief Administration of the Houses of Detention, has published a book which explains to the inmates the method of correspondence tuition and contains detailed programmes of the various courses and methodical suggestions......."

মনের খাদ্য হতে রান্নাঘরে আসা যাক্। পথে ব্যায়াম-ঘরে আধুনিকতম শরীর-চর্চ্চার সামগ্রী সাজানো দেখলেম। আমেরিকার সমুদ্র-পথে ব্রেমেন জাহাজে পরে এই রকম বিপুল আয়োজন দেখেচি কিন্তু ভেবে দেখো দেশকালপাত্রের প্রভেদ! এবং অর্থশক্তির; অথচ ব্যবস্থার উৎকর্ষে ভেদ নেই। ব্যায়াম-ঘরে এবং পাকশালায় এদের সতর্ক দৃষ্টি কেননা ওরা জানে অপরাধের মূল স্নায়ুতে, দেহ মনের মর্ম্মস্থানে; উপযুক্ত খাদ্যের পুষ্টি ঠিক মতো পৌঁছিয়ে দিতে পারলে আরোগ্য সত্তার গভীরে কাজ করে। খাদ্য সম্বন্ধে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে যথা প্রয়োজন জনে জনে বিশেষ বিধান। স্বাভাবিক ছন্দ ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে চতুর্দ্দিক হতে এরা শরীর মনকে সঞ্জীবিত করচে—শীতের সময় গরম জলের পাইপ বা গরম হাওয়ার উত্তাপ ঘরে ঘরে সঞ্চালন এবং যথাপ্রাপ্য সূর্য্যালোক ঘরে দোরে ডেকে আনার ব্যবস্থায় এই শুভবুদ্ধিরই প্রয়োগ দেখতে পাই। বাকি কাজ করচে রেডিয়ো সঙ্গীত, শিক্ষার বহুব্যাপক ব্যবস্থা, দায়ীত্ব বিশ্বাসের আব্‌হাওয়া, ব্যবহারের সৌজন্য।

উন্মাদের জন্যেও সভ্য দেশে যে ব্যবস্থা তাতে দেশকর্ত্তৃপক্ষের মানসিক সাম্যের পরিচয় নেই, হয়তো সম্প্রতি জর্ম্মানী ও আমেরিকার প্ররোচনায় অন্য দেশেও সংস্কারের

দুটো চারটে ঢেউ এসেচে। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে গ্রহের কৃপায় এই ঢেউ দূরদেশেও পৌঁছবে পুনর্জন্মে দেখব অপেক্ষা ক'রে আছি। জেলের ব্যবস্থার মনুষ্যোচিত সংস্কার দেখবার জন্যে জাতকমালা মেনে আরো কতবার আসতে হবে?

বিজ্ঞান জানে crime এবং insanityর যোগ মূলগত এবং দুয়ের চিকিৎসা একই পথে। এই চিকিৎসা শরীর মন নিয়ে সমগ্র ব্যক্তিকে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখচে। তত্ত্বরূপে এ সব কথা সকলেরই সুপরিচিত—মনস্তত্ত্বের পুঁথি ভারতবাসী আমরাও মুখস্থ ক'রে থাকি এবং পাশ করি; কয়েদী ও উন্মাদের সংখ্যাও নিয়তির লীলা জমিয়ে রেখেচে। তবু আমাদের হিন্দুর আত্মা রক্ষা পাচ্চে কেননা সাধু সন্ন্যাসী শিকড় স্বস্ত্যয়ন, ঘেঁটু মনসা, গঙ্গাস্নান, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, টিকি উপবীতের অভাব নেই। বিবাহে জাত এবং পণের ব্যবসায়ে বাজার সরগরম, আহারে পংক্তি রাখি, ট্রামে যেতে কালীবাড়ী দেখ্‌লে সীটে ব'সেই গম্ভীর ভাবে নমস্কার ঠুকে দিই। যথা লাভ। আমাদের মারবে কে, নিয়তি ছাড়া। য়ুরোপেও প্রায় একই কথা, আত্মার ভয় নেই, কেননা নবজাতককে ব্যাপটাইজ ক'রে ড্যাম্‌নেশন হ'তে ত্রাণ করা চলচে। সোভিয়েট রাশিয়া ওলাবিবি মান্‌ল না ব্যাপটাইজও করল না, আত্মার দফা নিকেষ হ'ল, আতঙ্কে আমাদেরই ঘুম হয় না। ইতিমধ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্যের দৌড়ে যদি হু হু ক'রে এগিয়ে থাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাবে কোথা—ভেবে দেখো চিত্রগুপ্তের কথা, ডুম্‌স-ডের সেই ভয়ঙ্কর দিন। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, এমন কি, মন্ত্রের জাদুতে। ওদের অধর্ম্মের কল, জ্ঞান বিজ্ঞান না হ'লে চলে না, এমনই কপাল।

ঝক্‌মক্ করচে পিতলের ডেক্‌চি, বাসন, সুপ চড়েচে কটাহে গ্যাসের ধোঁয়া-হীন চুলোয়। আহারের ব্যবস্থায় এরা সবাইকে হার মানিয়েচে। দুষ্প্রাপ্য ট্রপিকাল ফলের স্যালাড্ এবং সৌখীন অসুস্থ পক্ষীর যকৃৎ ভোজনবিলাসীর ব্যসন জোগাচ্চে না, অসময়ের দুর্ম্মূল্য অয়ষ্টার বা মশ্‌রুম্ পাকযন্ত্রকে চমৎকৃত করবে ব্যবস্থা নেই অতএব ভোজ্যের বিবরণ রোমাঞ্চপ্রদ হবে না। বৈষ্ণব শাস্ত্রোপযুক্ত আহার্য্যের বর্ণনা ডিস্‌পেপটিক বাঙালীর কণ্ঠস্থ—তা'র বেশি নয় কেননা কলিযুগে ঔদার্য্যের বাজারদর সাংঘাতিক। ষাট রকমের ব্যঞ্জন কেন পান মশলাতেই আমরা পৃথিবীশুদ্ধ জাতিকে হারিয়ে বসে আছি, যেমন জব্দ করেচি ঘরের গৃহিণীকে,—কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব এদের খাদ্যের ব্যবস্থা অন্তঃপুর-লালিত বঙ্গবাসী বা হোটেলবিলাসী য়ুরোপীয়ের চেয়ে উত্তম। তাজা সব্‌জি, টাট্‌কা মাংস, মাছ, ডিম, গম এবং দুধ এবং পরিজ্; মোটা রকমের রান্না, সুসিদ্ধ; সস্ বা ঝাল-মশলার অভিশাপ হতে মুক্ত—বন্দীর জন্যে এই ব্যবস্থা। খাদ্যের বিষয়ে এরা বৈজ্ঞানিকের শাসনে চলেচে, নিয়মিত ডাক্তারের আনাগোনা। পাচক এবং মশাল্‌চি এবং পরিজনবর্গ সবাই কারাবাসীর ভোটে তাদেরই মধ্য হতে নির্ব্বাচিত। পালা বদল হয়, রন্ধন-শিল্পে বিশেষজ্ঞের নির্দ্দেশে শিক্ষালাভ কম সৌভাগ্য নয়—এর বাজারদরও যথেষ্ট। আহারের ব্যবস্থা বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের বিশেষ ক'রে বোঝালেন—তাঁদের গর্ব্বের কারণ আছে।

লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ল—আমরাও বেরোলেম। নিউহেভেনের জেল থেকে বেরিয়ে মনে হয়েছিল দান্তের নরকলোক হ'তে নরলোকে এসেচি, এখানে বাহিরে ভিতরে ভেদ অনুভব ক'রলেম না। আজ মনে হল সোভিয়েট নীতির মণিকোঠায় প্রবেশ করেচি—এতদিন বাহির অঙ্গনে ঘুরছিলেম। যে-আলো জ্বলচে সম্প্রীতির তা'র জ্যোতিতে আছে সমগ্র দেশের নিরন্তর কল্যাণের ধ্যান, অক্লান্ত মঙ্গলের ব্যগ্রতা। যারা অপরাধীর, অত্যাচরিতের হিতার্থে, সর্ব্বজনের মুক্তির জন্যে অমন ক'রে ভাবচে কর্ম্মে তাদের ত্রুটি স্খলন, মতামতের কোণ-ঠেসা আতিশয্য যতই থাকুক্ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের নমস্কার জানালেম।

দুয়ে চারে সার বেঁধে কর্ম্মীরা ভোজনকক্ষে আসচেন—তাঁদের মধ্যে সহসা ভারতবাসী অতিথিকে দেখে সকলের মুখে বিস্মিত আনন্দ প্রকাশ পেল। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়ে অভিবাদন জানালেন। আমি ভারতবর্ষীয়, জেলের মধ্য হতে বেরিয়ে স্বাধীন ক্ষেত্রে চলেচি—কথাটার যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেক দূর পর্য্যন্ত চিন্তা করলেম। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—০—

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মতো। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। কাশীর ফেরৎ ট্রেনের মধ্যে বসিয়া বারবার করিয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমার ভাগ্যেই বা পুনঃ পুনঃ এমন ঘটে কেন? আমরণ নিজের বলিয়া কি কোনদিন কিছুই পাইব না? এম্‌নি করিয়াই কি চির-জীবন কাটিবে? ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকেই দিল শুধু কৈশোর হইতে যৌবনে আগাইয়া কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন্ রসাতলের পানে খেদাইয়া। আজ অনেক ডাকা-ডাকিতেও সেই বিদায়-দেওয়া-মনের সাড়া মিলে না, যদি বা কোন ক্ষীণ কণ্ঠের অনুরণন কদাচিৎ কাণে আসিয়া লাগে, আপন বলিয়া নিঃসংশয়ে চিনিতে পারি না,—বিশ্বাস করিতে ভয় পাই।

এটা বুঝিয়া আসিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার জীবনে আজ মৃত। বিসর্জ্জিত প্রতিমার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নদী-তীরে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ফিরিয়াছি,—আশা করিবার, কল্পনা করিবার, আপনাকে ঠকাইবার কোথাও কোন সূত্র আর অবশিষ্ট রাখিয়া আসি নাই। ও-দিক্‌টা নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই শেষ যে কতখানি শেষ তাহা বলিবই বা কাহাকে, আর বলিবই বা কেন?

কিন্তু এই তো সেদিন। কুমার সাহেবের সঙ্গে শীকারে যাওয়া,—দৈবাৎ পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপরিসীম। নিজের গুণে পাই নাই, নিজের দোষেও হারাই নাই, তথাপি হারটাকেই আজ স্বীকার করিতে হইল, ক্ষতিটাই আমার বিশ্ব জুড়িয়া রহিল। চলিয়াছি কলিকাতায়, বাসনা একদিন আবার বর্ম্মায় পৌছিব। কিন্তু এ যেন জুয়াড়ীর ঘরে ফেরা। ঘরের ছবি অস্পষ্ট, অপ্রকৃত,—শুধু পথটাই সত্য। মনে হয়, এই পথের-চলাটা যেন আর না ফুরায়।

অ্যাঁ! এ কি শ্রীকান্ত যে!

এ যে একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামিয়াছে সে খেয়ালও করি নাই। দেখি, আমার দেশের ঠাকুর্দ্দা ও রাঙাদিদি ও একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে ঘাড়ে মাথায় ও কাঁখে একরাশ মোট-ঘাট লইয়া প্লাটফর্ম্মে ছুটাছুটি করিয়া অকস্মাৎ আমার জানালার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছেন।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, উঃ কি ভিড়! একটা ছুঁচ গলাবার যায়গা নেই এ তো তিন্‌-তিনটে মানুষ! তোমার গাড়ীটি তো দিব্যি খালি,—উঠ্‌বো?

উঠুন, বলিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা তিন্‌-তিন্‌টে মানুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া যাবতীয় বস্তু নামাইয়া রাখিলেন, ঠাকুর্দ্দা কহিলেন, এ বুঝি বেশি ভাড়ার গাড়ী, আবার দণ্ড লাগ্‌বে না তো?

বলিলাম, না, আমি গার্ড সাহেবকে বলে দিয়ে আস্‌চি।

গার্ডকে বলিয়া যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন তাঁহারা আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া

বসিয়াছেন। গাড়ী ছাড়িলে রাঙাদিদি আমার দিকে নজর দিলেন, চম্‌কাইয়া বলিলেন, তোর এ কি শ্রী হয়েছে শ্রীকান্ত! এ যে মুখ শুখিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গেছে! কোথায় ছিলি এতদিন? ভ্যালা ছেলে যাহোক্! সেই যে গেলি একটা চিঠি'ও কি দিতে নেই? বাড়ী শুদ্ধ সবাই ভেবে মরি।

এ সকল প্রশ্নের কেহ জবাব প্রত্যাশা করে না, না পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে না।

ঠাকুর্দ্দা জানাইলেন তিনি সস্ত্রীক গয়াধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন, এবং এই মেয়েটি তাঁর বড় শ্যালিকার নাত্‌নী,—বাপ হাজার টাকা গুণে দিতে চায় তবু এতদিনে মনোমত একটি পাত্র জুটলো না। ছাড়লে না তাই সঙ্গে করে আন্‌তে হোলো। পুঁটু, প্যাড়ার হাঁড়িটা খোল ত। গিন্নী, নলি, দইয়ের কড়াটা ফেলে আসা হয় নি ত? দাও, শালপাতায় কোরে গুছিয়ে দাও দিকি,—গোটা দুই প্যাড়া, এক থাবা দই—এমন দই কখনো মুখে দাওনি ভায়া, তা দিব্বি কোরে বল্‌তে পারি। নানা—না—ঘটির জলে হাতটা আগে ধুয়ে ফেলো পুঁটু,—যাকে তাকে তো নয়,—এসব মানুষকে কি কোরে দিতে থুতে হয় শেখো।

পুঁটু যথা-আদেশ সযত্নে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিল। অতএব, অসময়ে ট্রেনের মধ্যে অযাচিত প্যাড়া ও দধি জুটিল। খাইতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমার ভাগ্যে যত অঘটন ঘটে। এইবার পুঁটুর জন্য হাজার টাকা দামের পাত্র না মনোনীত হইয়া উঠি। বর্ম্মায় ভালো চাকুরি করি এ খবরটা তাঁহারা আগের বারেই পাইয়াছিলেন।

রাঙাদিদি অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং আত্মীয় জ্ঞানে পুঁটু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কারণ, আমি ত আর পর নই।

বেশ মেয়েটি। সাধারণ ভদ্র-গৃহস্থ ঘরের, ফর্সা না হোক্, দেখিতে ভালোই। ঠাকুর্দ্দা তাহার গুণের বিবরণ দিয়া শেষ করিতে পারেন না এম্‌নি অবস্থা ঘটিল। লেখা-পড়ার কথায় রাঙাদিদি বলিলেন, ও এম্‌নি গুছিয়ে চিঠি লিখ্‌তে পারে যে তোদের আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। ও-বাড়ীর নন্দরাণীকে এম্‌নি একখানি চিঠি লিখে দিয়েছিল যে সাতদিনের দিন জামাই পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়লো।

রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ কেহ ইঙ্গিতেও করিলেন না। সেরূপ ব্যাপার যে একটা ঘটিয়াছিল তাহা কাহারও মনেই নাই।

পরদিন দেশের ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে আমাকে নামিতেই হইল। তখন বেলা বোধকরি দশটার কাছাকাছি। সময়ে স্নানাহার না করিলে পিত্ত পড়িবার আশঙ্কায় দুজনেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীতে আনিয়া আদর-যত্নের আর অবধি রহিল না। পুঁটুর বর যে আমিই পাঁচ-সাত দিনে এ সম্বন্ধে গ্রামের মধ্যে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। এমন কি পুঁটুরও না।

ঠাকুর্দ্দার ইচ্ছা আগামী বৈশাখেই শুভকর্ম্ম সমাধা হইয়া যায়। পুঁটুর যে-যেখানে আছে আনিয়া ফেলিবারও একটা কথা উঠিল। রাঙাদিদি পুলকিত চিত্তে কহিলেন, মজা দেখেচো, কে যে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেচে আগে থাক্‌তে কারও বলবার যো নেই।

আমি প্রথমটা উদাসীন, পরে ভীত, তারপরে চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। সায় দিয়াছি কি দিই নাই—ক্রমশঃ নিজেরই সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। ব্যাপার এম্‌নি দাঁড়াইল যে না বলিতে সাহস হয়না পাছে বিশ্রী কিছু একটা ঘটে। পুঁটুর মা এখানেই ছিলেন, একটা রবিবারে হঠাৎ বাপও দেখা দিয়া গেলেন। আমাকে কেহ যাইতেও দেয় না, আমোদ আহ্লাদ ঠাট্টা-তামাসাও চলে,—পুঁটু যে ঘাড়ে চাপিবেই—শুধু দিনক্ষণের অপেক্ষা—উত্তরোত্তর এমনি লক্ষণই চারিদিক দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। জালে জড়াইতেছি—মনে শান্তিও পাই না,—জাল কাটিয়া বাহির হইতেও পারি না। এম্‌নি সময়ে হঠাৎ একটা সুযোগ ঘটিল। ঠাকুর্দ্দা জিজ্ঞাসা করিলেন আমার কোন কোষ্ঠী আছে কি না। সেটা তো দরকার?

জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা কি পুঁটুর সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া সত্যিই স্থির করেছেন?

ঠাকুর্দ্দা কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, সত্যিই ? শোন কথা একবার !

কিন্তু আমি তো এখনো স্থির করিনি।

করোনি ? তা'হলে করো। মেয়ের বয়েস বারো-তেরোই বলি আর যাই করি, আসলে ওর বয়েস হলো সতেরো আঠারো। এর পরে ও-মেয়ের বিয়ে দেবো আমরা কেমন করে ?

কিন্তু সে দোষ ত আমার নয়।

দোষ তবে কার ? আমার বোধ হয় ?

ইহার পরে মেয়ের মা ও রাঙাদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী মেয়েরা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল। কান্না-কাটি অনুযোগ অভিযোগের আর অন্ত রহিল না। পাড়ার পুরুষেরা কহিল এতবড় শয়তান আর দেখা যায় না, উহার রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া এক কথা, মেয়ের বিবাহ দেওয়া আর এক কথা। সুতরাং, ঠাকুর্দ্দা চাপিয়া গেলেন। তার পরে সুরু হইল অনুনয়-বিনয়ের পালা। পুঁটুকে আর দেখি না, সে-বেচারা লজ্জায় বোধ করি কোথাও মুখ লুকাইয়া আছে। ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। কি দুর্ভাগ্য লইয়াই উহারা আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। শুনিতে পাইলাম ঠিক এই কথাই উহার মা বলিতেছে,—ও হতভাগী আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে যাবে। ওর এমনি কপাল যে ও চাইলে সমুদ্দুর পর্য্যন্ত শুকিয়ে যায়,—পোড়া শোল মাছ জলে পালায়। এমন ওর হবেনা তো হবে কার !

কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর্দ্দাকে ডাকিয়া বাসার ঠিকানা দিলাম, বলিলাম, আমার একজনের মত নেওয়া দরকার, তিনি বল্‌লেই আমি সম্মত হবো।

ঠাকুর্দ্দা গদ্‌গদকণ্ঠে আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, দেখো ভাই, মেয়েটাকে মেরো না। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বোলো যেন অমত না করেন।

বলিলাম, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না, বরঞ্চ খুসি হয়েই সম্মতি দেবেন।

ঠাকুর্দ্দা আশীর্ব্বাদ করিলেন,—কবে তোমার বাসায় যাবো দাদা ?

পাঁচ ছ'দিন পরেই যাবেন।

পুঁটুর-মা, রাঙাদিদি রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া চোখের জলের সঙ্গে আমাকে বিদায় দিলেন।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট ! কিন্তু এ ভালোই হইল যে একপ্রকার কথা দিয়া আসিলাম। রাজলক্ষ্মী এ বিবাহে যে লেশমাত্র আপত্তি করিবে না এ কথা আমি নিঃসংশয়ে জানিতাম। এটুকু তাহাকে চিনি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তীর্থচ্ছায়া

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেবালয়, বাঁধা ঘাট, বেলগাছে পথ ছায়া-ঢাকা,
নিভৃত গঙ্গার তীর, একা সাধু গাহিছে দেউলে,
মধ্যাহ্ন আকাশে চিল সঞ্চারি' বেড়ায় মেলি' পাখা,
শীতল প্রবাহে নৌকা দুচারিটি ভাসে পাল তুলে ;—
অদূরে রেলের সাঁকো, কলের উঠেছে ধূম্র-চূড়া,
হাটের কল্লোল পশে, ধূলি ওড়ে উতলা হাওয়ায়—
একান্তে এ-ছবি দেখি' ক্ষণিকের পাত্র হল পূরা,
সহরের পলাতকা মোরা যবে দাঁড়ানু সেথায়।
সহস্রের ভিড় ত্যজি' পূর্ণমাঝে দোঁহে সঙ্গকামী
পথে পথে ঘুরে সেথা গিয়েছিনু তুমি আর আমি।
সেদিন লভিনু দৃষ্টি, রূপ দেখি কোন্ ধ্যান দিয়ে,
অনন্ত বিশ্বের চলা দাঁড়ালো মোদের কাছে, প্রিয়ে॥

যে-মন্ত্রে দিগন্তযাত্রী ঊর্ম্মিমালা নিয়ত-রঙ্গিণী
এক হ'য়ে সমুদ্রের শান্ত ছবি বিরচে অন্তরে,
বিচিত্রের সমাবেশ নিগূঢ় চেতনা লয় জিনি'
সন্ধানে তাহারি আজ এনু হেথা বহুদিন পরে।
গঙ্গাতীর, দূরাকাশ, নির্জ্জন প্রহর চেয়ে আছে,
সেই আমি আসিয়াছি, দেশে দেশে ঘুরে নানা বেশে,
দেবালয়, বাঁধা ঘাট, ঐ পথ ছায়া-করা গাছে,
অপরাহ্ন আলো-তলে নদী চলে কোন্ নিরুদ্দেশে।
আজ শুনি সর্ব্বমাঝে দূর-স্মৃত প্রদোষের ভাষা,
মর্ম্মরিত বেদনায়, স্বজনের নিত্য যাওয়া-আসা।
স্তব্ধ চিত্ত কালহীন পূর্ণ করি' ব্যথার আগ্রহে
যে-নাই তাহারি খোঁজে মোর পানে বিশ্ব চেয়ে রহে॥

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

ছেলেদের সনে কণ্ঠ মিলায়ে গাই—
মরাল-আসনা এস দেবী বীণা করে ;
বয়স হয়েছে সে কথা যে ভুলে যাই,
ভক্তি অশ্রু নয়ন ছাপায়ে পড়ে :
বছরের মাঝে প্রতি পূজা উৎসবে
মনে পড়ে যায় ছোটবেলাকার কথা—
কেটেছে যে দিন শুধু হাসি কলরবে
সে দিনের স্মৃতি বুকে আনে ব্যাকুলতা !

কত কাণাকাণি মৃদু গঞ্জনা শুনি—
তবু আপনারে রাখিতে পারি না দূরে,
সকলি এড়ায়ে কল্পনা জাল বুনি
মন ছুটে যায় কোন্ সে অতীত পুরে ;
শিশুদের সনে খেলি শিশুদেরি মত
ওরা দেখে হাসে চায় নয়নের কোণে—
বোঝে নাক' হায়—তৃপ্তি যে পাই কত
আপন অতীত জাগে যে আপন মনে।

মনে পড়ে সেই প্রভাত না হতে ভালো
উঠি তাড়াতাড়ি নয়ন নিদ্রাহীন,
আকাশের গায়ে তখনো রাতের কালো
কুলায় কুলায় পাখীর কূজন ক্ষীণ ;
মাঘের শেষের শিশির-সিক্ত হাওয়া
কাঁপন লাগায় ভোরের পুষ্প বনে
ঘাটের পথটি—আধো আলো আধো ছাওয়া
আজও ছবি সম মনে পড়ে—পড়ে মনে।

পঞ্চমী এল—পঞ্চমী এল ওরে—
এল বুঝি সেই আশাপথ চাওয়া দিন,
শুনিস্ নে তাই ঘুম ভেঙে সেই ভোরে
হাওয়াতে যেন রে ধ্বনিল কার সে বীণ্,
আমের শাখা যে মুকুলে মুকুলে ভরা
কার আঁচলের সুবাস তাহাতে ভাসে !
বাসন্তী রঙে রঙীন হয়েছে ধরা
পায়ে পায়ে ঐ বসন্ত নেমে আসে।

কল কলরবে ওরা কারা চলে ছুটে
রঙীন বসনে ছোট দেহলতা ঘেরি,
সূর্য্যমুখী কি থরে থরে আজ ফুটে ?
কচি মুখে যেন তাহারি সুষমা হেরি !
প্রভাত আলোয় এ কি শোভা অনুপম
কালো কেশ যেন কালো কেশরের দল !
হাসি উচ্ছ্বাসে বিকশিত ফুল সম
পীত সজ্জায় করে যেন ঝলমল !

ওরে এ যে এল শৈশবেরি সে ধরা
সুখে আনন্দে অন্তর ভরি' উঠে,
ছোট দুটী হাতে ফুল অঞ্জলি ভরা
ওরা কারা—মা'র চরণে পড়েছে লুটে ?
সাধ যায় মনে বর্ত্তমানেরে ভুলি'
ওদেরি মাঝারে আবার আসন পাতি
অতীত হইতে হারাণো কুসুম তুলি
ছিন্ন মালিকা নূতন করিয়া গাঁথি।

পঞ্চমী এল পঞ্চমী এল ওরে
পঞ্চমী এল দিকে আনন্দ ছেয়ে
আমি দূরে বল্ থাকি যে কেমন করে
ওযে এল সেই আমারি অতীত বেয়ে !
ঘরে ঘরে ওই কাঁসরের ঝণ্ ঝণা
শঙ্খের রোলে কবেকার পরিচয় !
ফুলের গন্ধে মন যেন আন্‌মনা
ধূপ-সৌরবে বাতাস সুরভিময়।

ওগো চেয়োনাক নয়নে ভ্রূকুটি ভরে,
ছুটে যেতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে ফিরে আসি,
কঠিন শাসনে মন যে কেমন করে
ব্যর্থ প্রয়াসে শুধু আঁখি জলে ভাসি ;
একি ক্রন্দনে বক্ষ গুমরি উঠে
এ যে দুঃসহ—নাই আশা, শুধু ভয় !
যে ফুল ঝরিয়া ধূলায় পড়েছে লুটে
সে কি বাঁচিবে না ?—জাগে মনে সংশয় !

এরা কেন হাসে—কেন কাণাকাণি করে
এরা কি করেনি শৈশবমধু পান ?
স্মৃতি-পল্লব এখনি কি গেল ঝরে—
এও কি সত্য—অথবা মিথ্যাভাণ !
সে কি ভোলা যায় ? পরতে পরতে সে যে
আঁকা হয়ে গেছে মর্ম্মের মাঝখানে,
একটু পরশে উঠিবে উঠিবে বেজে
সে রবে না চাপা জানে ওরে সবে জানে।

ওরে নয়, নয়—কোন আশঙ্কা নয়,
পঞ্চমী এল নিয়ে মুক্তির হাওয়া,
দিকে দিকে দেখ ধ্বনিছে তাহারি জয়
হারাণো যা কিছু যাবে আজ যাবে পাওয়া ;
পুষ্পের দলে একি রঙ্ আজ লাগে—
শুষ্ক শাখায় এ কি শ্যামলিমা মাখা !
কার আগমনী পাখীর কণ্ঠে জাগে—
দখিন বাতাসে কার কম্পিত পাখা ?

ওগো ভোল, ভোল—বাধা বিপত্তি ভোল
আজ আর মনে রেখোনা রেখোনা দ্বেষ
স্মরণ-বধূর অবগুণ্ঠন খোল—
পেলে পেতে পার অতীতের উদ্দেশ ;
দূরে রাখ আজ যত জাল-জঞ্জাল
আজ যেন বাধা বাজে না বাজে না পায়,
শাসন বাঁধন—সে তো রবে চিরকাল
শুভ মুহূর্ত্ত নিমেষে ফুরায়ে যায়।

শ্রীকল্পনা দেবী

শিল্পী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্রশালায় শিল্পী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদারের সাতখানি চিত্র প্রকাশিত হইল।

নলিনীকান্তের নিবাস ত্রিপুরা জেলায়। কলিকাতায় আসিয়া তিনি শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তাঁহার শিল্পানুশীলনের অভিলাষ ব্যক্ত করেন, এবং তাঁহাদেরই উপদেশ ক্রমে এবং সহায়তায় তাঁহার শিল্পী-জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ সাল হইতে ভারতীয় প্রাচ্য-কলা সমিতিতে অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য শিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের শিক্ষকতায় তিনি শিল্প সাধনা আরম্ভ করেন।

এই অল্পকালের ভিতরেই নলিনীকান্তের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সালে দিল্লী প্রদর্শনীতে তিনি একটী পুরস্কার লাভ করেন; তৎপরে ১৯৩০ সালের কলিকাতা প্রাচ্য-কলা সমিতির প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহার প্রদর্শিত একটি ছবির জন্য সমিতির একটি মেডেল ও আর একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

চিত্রাঙ্কন বিষয়ে নলিনীকান্ত একটী স্বকীয় ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় কারণ তাঁহার চিত্রগুলিতে কোনো শিল্পী বিশেষের ছাপ লক্ষিত হয় না। কোনো একটা বিশেষ অঙ্কন পদ্ধতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই—নানাবিধ পদ্ধতি হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সে বিদ্যা তিনি নিজের চিত্রাঙ্কনে প্রয়োগ করেন—অথচ তদ্দ্বারা তাঁহার স্বকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় না।

জেন ফু কাড নামে একজন চীনা চিত্রশিল্পী (President of the College of Art—Canton) নলিনীবাবুর অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া উচ্চ প্রশংসা করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার সহিত চীন লইয়া যাইবার জন্য ভারতীয় চিত্রকলা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পথ-ব্যয় বহন করিতেও স্বীকৃত ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক কারণে আপাততঃ তাঁহার চীন যাওয়া স্থগিত রহিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন কাহিনী জড়িত ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই ভ্রমণে বাহির হইবেন।

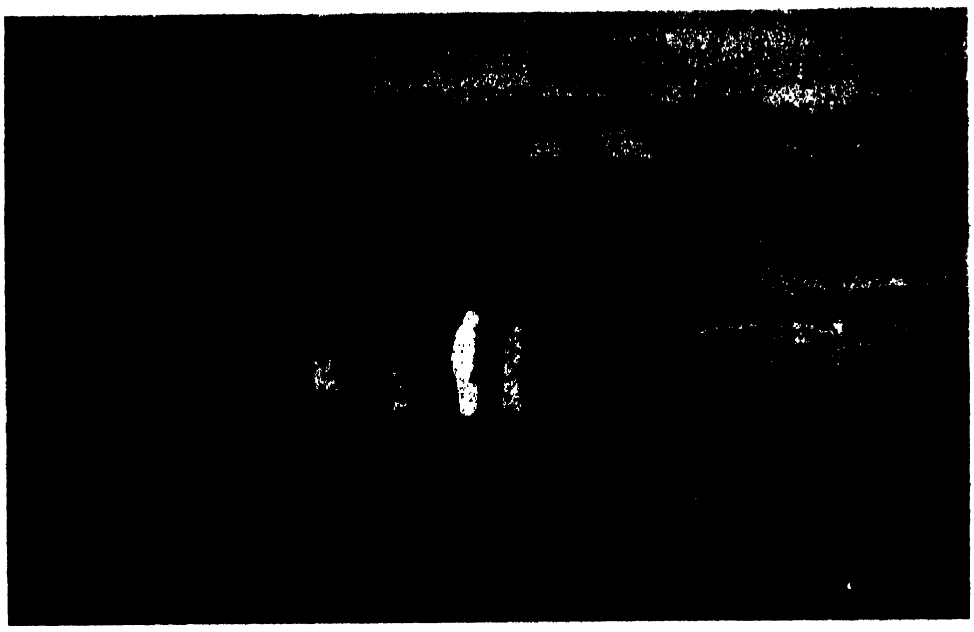
নলিনীবাবুর শিল্পীজনোচিত শান্ত অথচ অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতি তাঁহার শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে উৎকর্ষ বিধান করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে স্থৈর্য্যের পরিচয় আছে, লঘু চপলতার স্থান নাই। আমরা এই তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীর সর্ব্বতোভাবে উন্নতি কামনা করি।

সম্পাদক

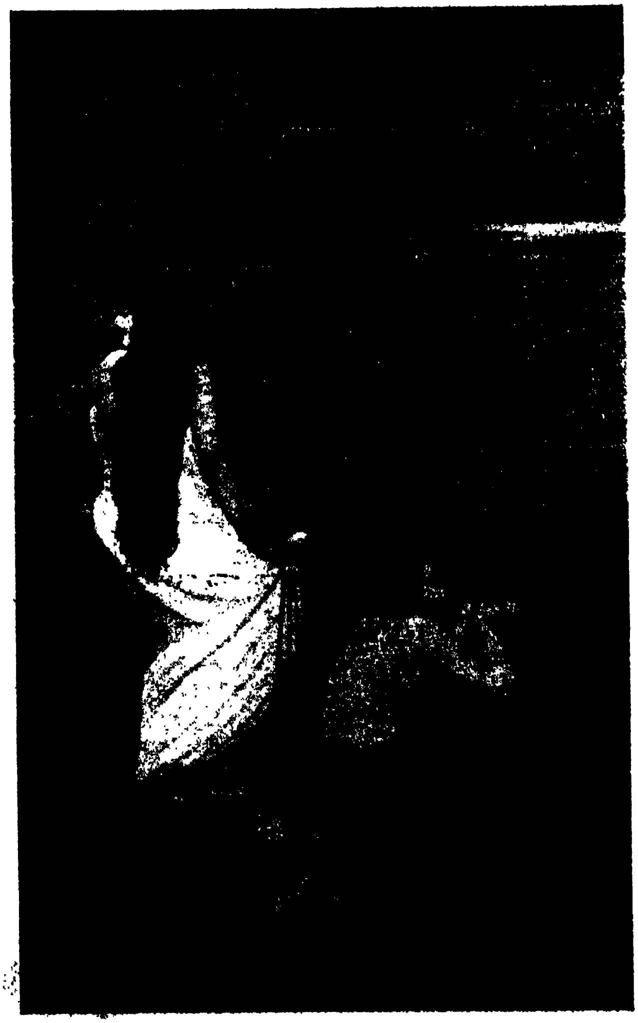




শ্রীকৃষ্ণ ও সখাগণ



বিদায় কাল



জীবন-সৈকত

কাঠের উপর আঁকা
কাঠের আঁষগুলি দেখা যাইতেছে

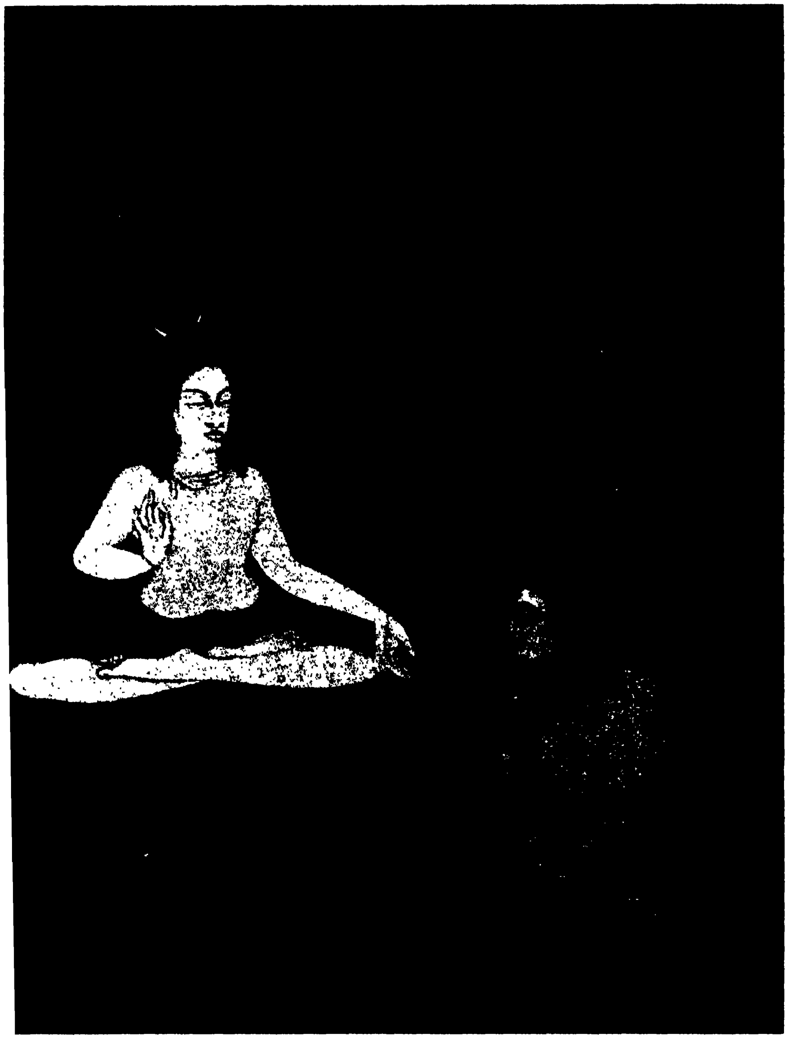


ঊষা

মোটা কাপড়ের উপর আঁকা



পল্লী-ঘাট



শিবের ভাগবত পাঠ



উমার তপস্যা

রবীন্দ্রনাথের "তপতী"

শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

"তপতী" "রাজা ও রাণী"র নূতন রূপ। পূর্ব্বে যে অপ্রাসঙ্গিকতা নাট্যের বিষয়-বস্তুটিকে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা বিভক্ত ক'রে তুলেছিল, তাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখন আখ্যান-ধারার গতিকে সহজ ও সম্পূর্ণ রূপ দিয়েচেন। নূতন নাটকে পুরাতনের কায়া নেই, ছায়া আছে বটে,—তা'-ও অতি ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট। "তপতী"র technique, কথা ও ব্যাখ্যান-ভঙ্গি "রাজা ও রাণী"র technique, কথা ও ব্যাখ্যান-ভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নূতনের কলানৈপুণ্যও ঢের উঁচু ধরণের। তাই "তপতী"কে সম্পূর্ণ নূতন নাটক ব'লে গণ্য করা যেতে পারে।

"তপতী"র আখ্যান-বস্তুর প্রথম কথা এই যে সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে সৃষ্টি হ'য়েছিল একটি বিরোধ,—আঘাত ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে তা ক্রমে ঘনিয়ে উঠেচে। এই বিরোধ তাদের সম্বন্ধকে সহজ ও সুন্দর হ'তে দেয়নি, তাদের মিলনকে নিবিড় ও সম্পূর্ণ করে তোলেনি। এই বিরোধের মধ্যে দিয়েই তা'দের সম্বন্ধের আরম্ভ। এবং এর শেষও এই বিরোধের মধ্যে দিয়েই। এই বিরোধের সত্যরূপটি কি?—তার সন্ধান পেলেই নাটকের মূল কথা সহজ হ'য়ে পড়্‌বে।

অপমান ও মহাদুঃখের মধ্যেই তাদের সম্বন্ধের আরম্ভ। মহারাজ বিক্রম কাশ্মীর জয় ক'রে রাজসিংহাসনের পরিবর্ত্তে চেয়ে বস্‌লেন রাজকুমারীকে। অনুপম তাঁর রূপ, অপরূপ তাঁর জ্যোতির্মূর্ত্তি। এই চাওয়ার মধ্যেই ট্রাজিডির বীজ। গোড়ার গলদ সুরু হ'ল এইখানেই। বিক্রম নিজেই স্বীকার করেচেন, যশের লোভে দেশ জয় করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়,—কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন প্রেমের সাধনায়,—সুমিত্রার আশায়। কিন্তু প্রেম-সাধনায় তিনি অবলম্বন ক'রলেন ভুল পথ। দম্ভ, অত্যাচার পশুবলের দ্বারা নারীর হৃদয় জয় করা যায় না, তা' বরং কোমল চিত্তকে ক'রে তোলে কুলিশ-কঠোর। এক্ষেত্রে হ'ল-ও তাই। বিজয়ীর চরণে প্রেমহীন, চিত্তহীন আত্মসমর্পণের পরিবর্ত্তে রাজকুমারী চিতার লেলিহান শিখায় নিজেকে উৎসর্গ করবার আয়োজন করলেন। কিন্তু সঙ্কল্প তাঁর সিদ্ধ হ'ল না। পুরবৃদ্ধরা এসে ব'ললে, "মা, রক্ষা করো, যে-পাণি মৃত্যু বর্ষণ করচে তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো, শান্তি হোক্‌।" প্রজাদের অনুনয় করুণাময়ী সুমিত্রাকে নিরস্ত ক'রল। তিনি মার্ত্তণ্ড দেবের মন্দিরে তিনদিন তপস্যা ক'রে sublimate করলেন নিজের selfকে। তাই এই হীন বিবাহ তাঁর মধ্যে সহজ (natural) ও সুন্দর হ'য়ে গেল। তিনি দেবতার চরণে প্রার্থনা করলেন, "রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনদিন কিছুর জন্যই যেন লোভ না করি; তবেই আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।" পরিণামে এই হ'ল যে যিনি রাজবধূরূপে আসতেন, আজ তিনি জালন্ধরে এলেন লোকমাতারূপে।

বিজয়ী বিক্রমের গর্ব্বিত প্রস্তাবের কোন গ্লানি বিবাহের পর সুমিত্রার sublimated চিত্তের প্রসন্ন মহিমাকে দগ্ধ করেনি। সেদিনকার অসহ্য অপমানের স্মৃতির মধ্যে এঁদের এই বিরোধের জন্ম নয়। এ বিরোধ ঢের উঁচুস্তরের। তাই এ যেমনি দুর্নিবার, তেমনি অসহ্য। প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধের ভিত্তি তাঁদের জীবন-আদর্শের একান্ত পার্থক্য,—পরস্পরের প্রেমের স্তরবৈষম্যে। সুমিত্রা যখন দেব-মন্দিরে তপস্যার দ্বারা আত্মশুদ্ধি ক'রে (Self-sublimation) নিজেকে জীবনের সাধারণ স্তর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্নস্তরে নিয়ে যান, তখনি সকলের অজ্ঞাতে এই বিরোধের সৃষ্টি হয়।

* * * *

বিবাহিত জীবনে দুজনেই দুজনকে চেয়েচে একান্ত নিবিড়তার মধ্যে। কিন্তু কেউই কারুকে মনের মত ক'রে পায়নি। তাই সুমিত্রা যখন রাজাকে বললেন, "যা' চেয়েছিলে, সে তো পেয়েচো তখন কঠোর সত্যটুকু বিক্রমের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বললেন, "পেয়েচি বীণাটিকে। সঙ্গীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শুভক্ষণে? সুর মেলাতে পারচিনে, পেয়েও হার হ'চ্ছে পদে পদে।"

"সুমিত্রা—আমিও তোমাকে ঐ কথাই ব'লচি। তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্চিনে—তোমার শক্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে। তুমি জাগোনি। তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেচো কাশ্মীর থেকে—সেই অপমান আমার ঘুচিয়ে দাও—আমাকে রাণীর পদ দিতে হবে।

বিক্রম—আচ্ছা, আচ্ছা, আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্চি—তুমি প্রজাদের দান করতে চাও, করো দান যত খুসি। তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন ব'য়ে যাক্ এ রাজ্যে।

সুমিত্রা—ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার কোষ তোমারি থাক্। আমার দেহের অলঙ্কার থাক্ আমার প্রজার জন্যে। অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে, তবে এ সব তো বন্দিনীর বেশভূষা—এ বইতে পারবো না। মহিষীকে যদি গ্রহণ করো সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী। সে আমি নই।"

এ থেকে বোঝা যায়, দুজনের বিবাহিত জীবনের আদর্শের মধ্যে রয়েচে বিরাট ব্যবধান। একজন চায় ভোগ। আর একজন ত্যাগ। একজনের অন্তর আসক্তির তৃষ্ণায় উদ্দাম। আর একজনের sublimated চিত্ত ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। একজন 'বিক্রম', আর একজন 'তপতী'। রাজা চান, মহিষীকে নয়—সুধাময়ী রমণীকে। রাণী চান, পুরুষকে নয়—রাজ্যেশ্বর রাজাকে। এই চাওয়ার মধ্যে উঠেচে তাঁদের বিরোধের মথিত হলাহল। চিত্তের অসীম দূরত্বের মধ্যে তাঁদের সুরু হ'ল জীবনের দুর্বিবহ দ্বন্দ্ব। দুজনেই আপন মনোমত দিকে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু ওদের জীবন-তারের সুর দু'টি এতই বিভিন্ন যে দুয়ের একান্ত মিলনে সঙ্গীতের কল্যাণী বাণী ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্ল না। রাণী মনে করেছিলেন, রাজাকে আপনার সবটুকুই দিয়েচেন কোন বাধা না রেখে। কিন্তু বিক্রম রাজ্যেশ্বররূপে তাঁর সেই অবাধ দান গ্রহণ করেননি, তিনি পুরুষরূপে চেয়েছিলেন নারীর চিত্তসুধা পান ক'রতে। তাই তপতীর নিরাসক্ত চিত্ত আপনার অজ্ঞাতেই সুকঠোর হ'য়ে বিক্রমকে বাধা দিয়েচে। নারায়ণী সুমিত্রাকে সত্যকথাই বলেছিলেন, "দাওনি বাধা? ঐ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি? কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, এ কী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি! তুমি রাজহংসীর মতো, রাজার তরঙ্গিত কামনা-সাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হ'তে চায় না, রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটুও বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী।..

এদিকে আবার রাজা নিজের রাজ্য, মান, চিত্ত—সর্ব্বস্ব দিয়েও সুমিত্রাকে তৃপ্ত করতে পারেন নি। "রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায় তোমাকে বিস্মিত ক'রে দেবেন। তখনো তোমাকে চেনেন নি। কিন্তু কত বড় দুর্ভাগা—রাজসিংহাসনের উপরে ব'সে ছটফট্ ক'রে ম'রচে; দিতে চায় দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যোগ্যতা নেই।" কারণ সুমিত্রা যা' চাইছিলেন, তা' তিনি দিতে পারেন নি। রমণীকে মহিষীর উচ্চাসনে বসাতে পারেন নি। তাই রাজার চিত্ত থেকেও এসেচে নির্ম্মম বাধা,—নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা।

তাঁদের এই আদর্শের বিরোধের ফল,—প্রেমের সুর-বৈষম্য। দুজনেরই প্রেম নিবিড়। কিন্তু তপতীর প্রেম অন্তস্তরের। বিক্রমের প্রেম ঐহিক। শরীর ও মনের মধ্যে প্রেমাস্পদকে নিবিড়রূপে গ্রহণ করে তিনি ইহজীবনের মধু আকণ্ঠ পান ক'রতে চান। তাঁর প্রেমে রয়েচে আসক্তি। তাই তা' যেমন সকাম, তেম্নি প্রচণ্ড। তাঁর প্রেমে 'বিলাসের আবিলতা' নেই সত্য কিন্তু আছে 'উল্লাসের উদ্দামতা।' 'যে আদি-শক্তির বন্যার উপরে ফেনিয়ে চলেচে সৃষ্টির বুদ্বুদ, সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ তাঁর প্রেমে।

কিন্তু তপতীর জীবন যেমন ভিন্ন স্তরের তাঁর প্রেম-ও তেমনি। এ প্রেম অতীন্দ্রিয়। রূপ, কাল, পাত্রের অতীত। এ প্রেম তাঁর জীবন-ব্রতের অনুগামী। জীবন তাঁর প্রেমের অনুগামী

নয়। এ প্রেমে ভোগ নেই, দুর্জ্জয় আসক্তি নেই—আহুতি আছে। এতে আছে আত্ম-বিসর্জ্জন; বিক্রমের প্রেমে আছে আত্মবিস্মৃতি। তাই, এই অতীন্দ্রিয় প্রেম যেম্‌নি গভীর, তেম্‌নি শান্ত। কবি তপতীর মুখেই এ প্রেমের ব্যাখ্যা করেচেন:

"বিপাশা—সত্যই কি তুমি মহারাজকে ভালবাসো? বলতেই হবে আমাকে।

সুমিত্রা—হাঁ, ভালোবাসি। উত্তর শুনে চুপ ক'রে রইলি যে?

*   *   *   *

বিপাশা—ব্রত যেন রাখ্‌লে মহারাণী—কিন্তু ভালোবাসো!

সুমিত্রা—কী বলিস্, বিপাশা! এই ব্রতই তো আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেচে—নইলে ধিক্কারের মধ্যে তলিয়ে যেতো সে। প্রেম যদি লজ্জার বিষয় হয় তবে তা'র চেয়ে তার বিনাশ কী হ'তে পারে! আমার প্রেমকে বাঁচিয়েচেন তপস্বী মৃত্যুঞ্জয়। বিবাহের হোমাগ্নি থেকে আমার এ প্রেম গ্রহণ ক'রেচি—আহুতির আর অন্ত নেই।"

সুমিত্রা মহারাজকে কখনো অবজ্ঞা করেননি। কিন্তু তাঁর প্রেম মহারাজের মধ্যে দিয়ে আপন আদর্শের পাদপীঠেই পৌছত। প্রশ্ন হ'তে পারে, তপতীর অন্তরে কি প্রাণশক্তি (Life-force) একেবারে নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেছল? তিনি কি পাষাণী? বিক্রমের আসক্তির দুর্জ্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়ে তাঁর চিত্ত কি কখনো চঞ্চল হ'য়ে ওঠেনি?···সহস্রবার তাঁর চিত্ত বিচলিত হয়েচে কিন্তু তপতী আত্ম-বিস্মৃত হননি। অকৃপণ প্রেমের অজস্রতা প্রতিবার সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রত্যাখান কর্‌বার মত বিপুল শক্তি তাঁর বিভ্রান্তচিত্তে সঞ্চার করেচে। তাই, অন্তরে-বাহিরে তাঁর দ্বন্দ্ব দুর্ব্বিষহ হ'য়ে পড়েছিল।

কিন্তু তিনি যে আলোকের দূতী—ভোগের ভাণ্ডারে তাঁর আশ্রয় নেই,—আসক্তির উদ্দামতায় তাঁর স্থান নেই। তাঁর চিত্ত মুক্ত, পার্ব্বত্য-নির্ঝরের মত। জীবনের ব্রত উপেক্ষা ক'রে কর্দ্দমের আবিলতায় তিনি আপনাকে ভুলে যান্‌নি। বিক্রম চেয়েছিলেন মাটীর বাঁধ দিয়ে নদীর স্রোতকে বাঁধ্‌তে। নিষ্কাম প্রেমকে সকাম প্রেমের সঙ্কীর্ণতায় সঙ্কুচিত ক'র্‌তে। তাই ব্যর্থ হ'ল তাঁর প্রেম, নিষ্ফল হ'ল তাঁর চেষ্টা।

কিন্তু তপতীকেও শেষে বঞ্চিত হ'তে হ'ল। তাঁর ব্রতও ব্যর্থ হ'ল। মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে রাজকুমারী নিয়েছিলেন প্রজার কল্যাণ-সাধনের ব্রত। বিক্রমের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধকে সহজ, সুন্দর ও নিবিড় ক'রে তুলে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর শুভ চেষ্টা সার্থক হ'ল না। প্রজাদের নিদারুণ দুঃখ, মর্ম্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি বেড়েই চল্‌ল। স্বপ্ন তার ভেঙে গেল। নিরুপায় হ'য়ে তিনি 'বেশ পরিবর্ত্তন' ক'রলেন। রাজরাণী হ'লেন ভিখারিণী। 'সুমিত্রা' হলেন 'তপতী'। যিনি রাজার জীবন-সঙ্গিনী হ'য়ে রাজ্যের মিত্র হ'তে চেয়েছিলেন, তিনি দেবতার চরণে আপনাকে উৎসর্গ ক'রে হ'লেন তপস্বিনী।

সুমিত্রা ঠিকই বুঝেছিলেন। বিক্রমের দুর্নিবার আসক্তিই ওঁদের মিলনের বাধা,—বিরোধের উৎস! সেই আসক্তির গুরু-বন্ধন থেকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি আসক্তিকে নিঃশেষে লুপ্ত ক'রে দিতে চাইলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর অদর্শনে বিক্রমের অন্তরে এই আসক্তির চিতাগ্নি অচিরে নিবে যাবে। রাজার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেই তাঁর মোহ দূর হয়ে যাবে। অন্ধ দৃষ্টি আবার তিনি ফিরে পাবেন। জালন্ধর ত্যাগ কর্‌বার সময় তাই তিনি বিক্রমকে অনুনয় ক'রে লিখ্‌লেন, "আমাকে কামনা করোনা, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন।" কিন্তু তখনো তিনি জীবনের নির্দ্দিষ্ট ব্রতকে ত্যাগ করেননি। ইহ জীবনে শুভকামনা ও শুভচেষ্টা দিয়ে যা' সফল হ'ল না, কঠোর তপস্যায় দেবতাকে প্রসন্ন ক'রে তা' সার্থক কর্‌বেন—এই হ'ল এখন তাঁর সঙ্কল্প।

কিন্তু তবুও তিনি নির্ব্বিঘ্ন হ'তে পার্‌লেন না। দুর্জ্জয় বাধা নির্ম্মম মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়াল তাঁর সাধনার পথে। অন্ধ বিক্রম তপতীকে এবারও ভুল বুঝ্‌লেন। রাণীর এই কল্যাণ চেষ্টাকে তিনি মনে ক'র্‌লেন দর্পিণীর উপেক্ষা। তাই রাজার অন্তরের পৌরুষ ধিক্কৃত হ'ল। বিক্রমের প্রেম সকাম। তাই তার মধ্যে ছিল দুর্জ্জয় অহঙ্কার,

প্রচণ্ড আত্মাভিমান। বিচ্ছেদের ব্যথা এখন সেই আত্মাভিমানকে প্রচণ্ডতর ক'রে তুল্‌লে। অন্ধমোহ আরো জমাট হ'য়ে উঠ্‌ল। তাঁর জ্ঞান হ'ল না, অন্তরের পৌরুষ জাগ্‌ল না। রাজ্য, সিংহাসন, আত্মমর্য্যাদা সমস্ত উপেক্ষা ক'রে উন্মত্ত তিনি বিপুল উদ্যমে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌লেন,—মহারাণীকে বন্দী ক'রে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত কর্‌বার জন্যে। "যে-উন্মত্ততায় এতদিন আপনাকে বিস্মৃত হ'তে লজ্জা পান্‌নি এ-ও সেই উন্মাদনারই রূপান্তর। কোনো-আকারে মোহ-মাদকতা চাই, নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি।"

ক্রমে রুদ্রের প্রলয় নাচন আরম্ভ হ'ল। নগরে নগরে অগ্নিকাণ্ড, রক্তপাত, নারীনির্য্যাতন কাশ্মীরবাসীর জীবন অসহ্য করে তুল্‌লে। আত্মবিস্মৃত রাজা আপন অন্তরের দুর্ব্বিসহ দ্বন্দ্বকে মূর্ত্তি দিলেন বীভৎস বর্ব্বরতার মধ্যে। দেবদত্ত পুণ্যতীর্থে এসে তপতীর কাছে প্রজাদের সেই নিদারুণ দুঃখ নিঃশেষে নিবেদন ক'রে মহারাণীকে আহ্বান ক'র্‌লেন,—যেমন একদিন পুরবৃদ্ধেরা করেছিল,—"মহারাণী, আজ মহারাজকে কেউ নিষেধ কর্‌তে পার্‌বে না একমাত্র তুমি ছাড়া।" কিন্তু সুমিত্রা জান্‌তেন, সে সম্ভাবনা আর নেই। রাজার কাছে বাধা দিয়ে রাজাকে জয় কর্‌বার মত অবস্থা আজকের নয়। তাঁদের দুজনের মিলন হওয়া অসম্ভব—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিক্রম তাঁর জীবনকে sublimate ক'রে তুল্‌তে পারচেন। বর্ত্তমান অবস্থায় যা' অনিবার্য্য, তা'কে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা আর তিনি ক'র্‌লেন না।

কিন্তু সংশয়ের অন্ধকারে জ্ব'লে উঠ্‌ল সত্যের অচপল আলো। সেই আলোকে তপতী তাঁর পথ সন্ধান ক'রে নিলেন। মহারাজের সঙ্গে সম্বন্ধের চরম পরিণামের জন্যে তিনি প্রস্তুত হ'য়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। আজ তিনি মান-অপমান, সুখদুঃখের বহু ঊর্দ্ধে, পাপপুণ্যের অতীত। কঠোর তপস্যার দ্বারা নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করেচেন। তাঁর দিব্য-দৃষ্টিতে আজ তিনি দেখ্‌লেন, sublimated self এর দিকে বিক্রমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে একমাত্র তখনি—যখন বিক্রমের আসক্তির প্রধান উৎসকে চিরতরে অপসারিত করা হবে। তাই আলোকের দূতী আপন মহিমার তেজে অগ্নিশয্যায় নিজেকে বিসর্জ্জন দিলেন। এই বিসর্জ্জনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠার বীজ। বিক্রমের আসক্তির প্রধান উৎস ছিল—সুমিত্রার কায়াকে কেন্দ্র ক'রে। সেই কায়ার বিসর্জ্জনে দুর্ব্বৃত্তের দুর্নিবার আসক্তির অবসান হবার অবসর এল। তার আত্ম-বিস্মৃতি ঘুচে গেল। নিজের অন্তরে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার পরম শান্তিতে সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি তার পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো। নাট্যের এই শেষ কথাটি কবি অব্যক্তের আবছায়ায় রেখে দিয়েচেন। শেষদৃশ্যে বিক্রমের মুখে কথা দিয়ে যা'কে ব্যক্ত করা চল্‌ত কবি তার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েই যবনিকা ফেলেচেন। আর্ট-এর দিক থেকে, তপতীর অগ্নিশয্যার solemnityর মধ্যে বিক্রমের মুখে স্বগতোক্তি দিলে দৃশ্যের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্যের হানি হ'ত, তাই শেষকথাটি খুলে বলা সম্ভব হয়নি।

*   *   *   *

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, তপতীর জীবন কি তবে ব্যর্থ হ'ল? সাধারণতঃ, আমরা বুঝি মৃত্যুকে বরণ করা মানে দুঃখের সার্থকতাকে এড়িয়ে যাওয়া,—জীবনের সত্য-উপলব্ধিকে ক্ষুণ্ণ করা। কিন্তু তপতীর এই যে মৃত্যুবরণ তা' সাধারণ নয়। এই আত্মবিসর্জ্জন নির্ম্মম অদৃষ্টের লীলাখেলা নয়। এ' জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে সভয়ে পলায়ন নয়। নিজের ধর্ম্মকে—নিজের ব্রতকে—প্রাণপণে আঁকড়ে থেকে যে পরম দুঃখ তিনি বিবাহের পর আজীবন সহ্য করেচেন, তার চরম সার্থকতা মিল্‌ল এই আত্মবিসর্জ্জনে। তপতীর মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের যে সংশয়, সত্যব্রত-স্বামীর মৃত্যুতে স্বামী-হারা শিখরিণীর অন্তরও সেই সংশয়ে পীড়িত হ'য়েছিল। সে সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, "দেবি, আমি কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছিনে, আমাকে বুঝিয়ে বলো, সংসারে যাঁরা ধর্ম্মকে প্রাণপণে মানেন, ধর্ম্ম কেন তাঁদেরই এত দুঃখ দিয়ে মারেন। কবি সুমিত্রার মুখে উত্তর দিয়েছেন, "যাঁরা মর্‌তে পেরেচেন তাঁরাই একথার তত্ত্ব জানেন। মৃত্যু দিয়ে যাঁরা সত্যকে পান তাঁদের জন্য শোক করোনা।" মৃত্যু দিয়েই তপতী জীবনের সত্যকে পেয়েছিলেন। আত্ম-

বিসর্জ্জনেই তাঁর সাধনার সিদ্ধি। তাছাড়া, যে আত্মঘাতী, দুর্ব্বৃত্ত বিক্রম তাঁর মৃত্যুর কারণ, তা'কে মৃত্যুর দ্বারা জয় ক'র্‌বেন,—তার আসক্তির বন্ধন ভেঙে তাকে দিয়ে আত্মস্থ ক'র্‌বেন—প্রজার কল্যাণ-রক্ষায় রাজাকে আবার জাগাবেন, —এই ছিল সুমিত্রার আশা। শেষদৃশ্যে কবির ইঙ্গিত, সে আশা তাঁর নিষ্ফল হয়নি। সুতরাং মৃত্যুতেই তপতীর ব্রতের উদ্‌যাপন,—জীবনের চরম সার্থকতা।

এখন দেখা যাক্, কোন ভাবটাকে কেন্দ্র ক'রে নাটকের গতি ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেচে। "তপতী"র মূল কথা কি ?

পূর্ব্বেই বলা হয়েচে sublimation of self এর দ্বারা তপতী জীবনধারার খুব উঁচু স্তরে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন। কিন্তু বিক্রম ছিলেন জীবনের সাধারণ (normal) স্তরে। পরস্পরের স্তর থেকে বিচার ক'র্‌লে দেখা যায়, তাঁদের চিত্তে অসম্পূর্ণতা বা অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। আপন আপন ক্ষেত্রে দুজনেরই প্রেম সহজ ও সম্পূর্ণ। কিন্তু জীবনধারার এই স্তর-বৈষম্যের জন্যই বিরোধ জাগ্‌ল। এই দুই স্তরের ব্যবধানের জন্যে তাঁদের দুজনের চিত্তের বিকশিত স্বাতন্ত্র্য এতই বিভিন্ন যে এদের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ একান্ত মিলনে সহজ ও সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌তে কোন কালেই এবং কোন কারণেই পারে না,—যদি না একজন নিম্নস্তরে নিজেকে পতিত করে অথবা আর একজন উচ্চস্তরে আপনাকে উন্নীত করে। এইটাই নাটকের মূল কথা।* নাটকে তপতীর চিত্ত যে উচ্চস্তরে উঠেচে, সেই sublimated রাজ্য থেকে normal physical রাজ্যে নেমে আসা মানে Life-principle এর বিরুদ্ধে ভীষণ রাহাজানি। এ' কল্পনা করা যায় না। নেমে আসা সম্ভব কিনা তাও সুমিত্রার কোমলচিত্ত দু-এক বার ভেবেচে। কবি বেশ কৌশলে সে ইঙ্গিত আমাদের দিয়েচেন। বিপাশার প্রশ্নে তপতী উত্তর দিচ্চেন, প্রত্যহ হয়েচে, হাজারবার তার চিত্ত বিচলিত হয়েচে রাজার এই অজস্রদানকে সহজভাবে গ্রহণ করবার আশায়। তাই "এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে (বিক্রমের প্রেম) প্রত্যাখান করার জন্যে নিজের সঙ্গে তাঁর এমন দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব।" কিন্তু তা'তে তিনি পথভ্রষ্ট হন নি। এখানে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে "তপতী" নাটক স্বর্গের দেবী ও মাটীর মানুষের প্রেম উপাখ্যান নয়। সুমিত্রা দেবী নন্,—মনুরই দুহিতা যিনি জীবনের চরম আদর্শের খুব নিকটবর্ত্তী স্তরে নিজের আত্মাকে উন্নীত করেছিলেন। তাই মনে হয়, অন্তরের এই দুর্বিষহ দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত থাকায় তাঁর চরিত্রে স্বাভাবিকতার সূক্ষ্ম ছাপ পড়েচে। এ' ছাপ চরিত্র-বিশ্লেষণে কবির উচ্চপ্রতিভার লক্ষণ। Sublimation of self, অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি কথাগুলো সাধারণতঃ আমরা যে অর্থে বুঝি, রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাদের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তপতী-চরিত্র ঠিক-ঠিক বুঝ্‌তে হ'লে সেই কথাটি ভুল্‌লে চল্‌বে না। রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনের চরম আদর্শ সংসারকে পরিত্যাগ করে নয়। তপতী কর্ম্মদাসী।† নিরাসক্তভাবে সংসারের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থেকে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করাই তাঁর একমাত্র কামনা ছিল।...

অনিবার্য্য ট্রাজেডিকে এড়িয়ে যাবার একমাত্র উপায় ছিল—বিক্রমের sublimation of self এর দ্বারা নিজেকে উন্নীত করা। কিন্তু তপতীকে তিনি ভুল বুঝেছিলেন। তপতীর অন্তরের সত্যরূপ কি তা' তিনি জান্‌তেন না। তিনি মনে করেছিলেন, কাশ্মীর জয়ের গ্লানি সুমিত্রার অন্তর পাষাণ করে রেখেচে, তাই রাজাকে তিনি বারবার প্রত্যাখান ক'রচেন। এই জন্যেই বিক্রম সমস্ত বাধা উপেক্ষা ক'রে আপন রাজ্যলক্ষ্মীকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিলেন কাশ্মীরী দুর্ব্বৃত্তদের হীনতার আশ্রয়ে। ভাব্‌লেন,

* এখানে "শেষের কবিতা"র লাবণ্যের কথা মনে পড়ে, "সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতোই পড়্‌লেম ততোই এই কথাটা বারবার আমার মনে হয়েচে ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেই খানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারেনি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম্ যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদ্‌লিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করবো।" বিক্রম তপতীর সত্যরূপটি না বুঝ্‌তে পেরে নিজের চিত্তের আকাঙ্ক্ষাকে ওর-ও চিত্তের আকাঙ্ক্ষা ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা ক'রেছিলেন তাই ট্রাজেডি হ'য়ে পড়্‌ল অনিবার্য্য।

† "ধর্ম্মশাস্ত্র প'ড়েচো তুমি, ধর্ম্মভীরু,—কর্ম্মদাসের কাঁধের উপর কর্ত্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ ব'লে গণ্য করা তোমার গুরুর শিক্ষা।"

রাণীকেই দেওয়া হল ; এতেই দূর হবে তাঁর অন্তরের গ্লানি। আসক্তি বিক্রমের দৃষ্টিকে অন্ধ করে রেখেছিল। দুজনের একান্ত মিলনের জন্যে বিধাতা পুরুষ তাঁর কাছ থেকে যে sublimation of self চাইছিলেন, তা' তিনি বুঝ্‌তেও পারেননি, দিতেও পারেন নি। তাই ট্রাজেডি হ'য়ে পড়্‌ল অনিবার্য্য। এর জন্য দায়ী বিক্রমই। কথা উঠ্‌তে পারে, সুমিত্রা গোড়ায় ভুল করেছিলেন। তাঁর সেই sublimated চিত্তের নিষ্ঠুর নিরাসক্তি নিয়ে বিক্রমের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াই গোড়ার গলদ। তিনি প্রথমে বুঝ্‌তে পারেননি যে তপস্যার দ্বারা তিনি যে স্তরে পৌঁচেছেন, সেখান থেকে বিক্রমের সঙ্গে সহজভাবে মিলন তাঁর কঠোর নিরাসক্ত প্রকৃতির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সুমিত্রার এই ভুলের জন্যে (যদি একে ভুল ব'লেই গণ্য করা যায়) যথার্থ দায়ী কে ? বিক্রমের অন্ধ মোহের প্রচণ্ডতা ও তীব্র অহঙ্কার সদম্ভে কাশ্মীর রাজ্য ধ্বংস করেছিল প্রেমাস্পদের প্রেমকে নিজের পশুবলের দ্বারা জয় কর্‌বার অভিলাষে। প্রেমলাভের এই ভুল apporachই নিরুপায় সুমিত্রাকে মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে তপস্যা করতে বাধ্য করেছিল। বিক্রম যদি প্রেমলাভের শ্রেয় পথ অবলম্বন ক'র্‌তেন, হয়ত তা'হলে সুমিত্রার সাধারণ সত্তাকে পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত না। সুতরাং এর জন্যেও একমাত্র দায়ী বিক্রম।

* * * *

সাহিত্যে রূপক খোঁজা সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। একায সমালোচকের পক্ষে অনিবার্য্যও নয়। সাহিত্যের সব জিনিষে রূপক খোঁজা মনে হয় অতিপুরাকালের মনোবৃত্তি,—হোমারের যুগের পরিচায়ক। যেখানে লেখক রূপক ব'লে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেখানকার কথা ভিন্ন। "The Blue Bird" এর ভিতরকার রূপকটি যদি সন্ধান করা না হয় ত' ওর ভিতরের সত্যটিকে হারানো হবে। কিন্তু যে নাটকে লেখক রূপকের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি, বরং চরিত্রগুলি স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত এবং সুবিকশিত, সেখানে আখ্যান-বস্তুকে উপেক্ষা ক'রে রূপক সন্ধান ক'র্‌তে যাওয়া মানে কায়াকে বাদ দিয়ে ছায়ার সন্ধান করা। "তপতী"তে রূপকের সন্ধান করা যে একান্ত অন্যায়, তা' বলিনা ; কিন্তু এটা একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেই চেষ্টা করলে একটা-না-একটা রূপক মিল্‌তে পারে কিন্তু তা'তে গ্রন্থের সাহিত্য-সৌন্দর্য্য কিছু বাড়েনা। বরং সমালোচনা হয় অকারণ ভারগ্রস্ত এবং অপ্রাসঙ্গিক। হয়ত' অনেক সন্ধানী সমালোচক "তপতী"তে রূপক দেখ্‌তে পেয়ে ব'ল্‌বেন,—বিক্রম দম্ভোন্মত্ত 'ব্রিটীশ ইম্‌পিরিয়ালিজিম্‌' ; আর তপতী ভারতের সনাতন আত্মা। অথবা বিক্রম পাশ্চাত্যের 'মেটিরিয়ালিজিম্‌'— আসক্তি যার উদ্দাম, ভোগ যার একমাত্র আদর্শ ; আর তপতী প্রাচ্যের স্পিরিচুয়ালিজিম্‌'—ত্যাগ যার ব্রত, নিরাসক্তি যার মহিমা। কিন্তু কবির যখন এখানে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নেই, তখন এরকম অনেক সমপর্য্যায়ভুক্ত রূপকই ত' মিলে যেতে পারে। সেক্সপিয়রের "The Tempest" এর কথা মনে পড়ে। নাটকখানিকে যখন বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখে বিভিন্ন সমালোচক অসংখ্য রূপকসৃষ্টি করতে লাগ্‌লেন তখন দেখা গেল, সবগুলি রূপকই মিলে যাচ্ছে অথচ যথার্থরূপে ঘটনা পরম্পরার details এর সঙ্গে কোনটাই মেলে না। মনে হয়, এখানেও সেই অবস্থা হবে। অনাবশ্যকরূপে রূপকের সন্ধান করতে গিয়ে আমরা নাট্যের মূল কথাকে হয়ত' হারিয়ে ফেল্‌ব। কবি যে রসসৃষ্টি করেছেন তা' একান্তভাবে উপভোগ করা তা'হলে অসম্ভব হ'য়ে পড়্‌বে। এতে বরং নাট্যের সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের হানি হবে।

শ্রীকানন বিহারী মুখোপাধ্যায়

দ্বিধা

শ্রীমতী ইলা দেবী

অস্তোন্মুখ মেঘমুক্ত সূর্য্যের সোনালি হাসি বৃষ্টিধোয়া ফুলে পাতায় ছড়িয়ে পড়ে বিদায় জানিয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ীর চারিপাশে পরিপাটি বাগান। রুচিরা একটা বেতের সাজি হাতে ফুল কেটে ভরছে তাতে। ডালপালা হতে টুপটাপ করে দুএকটি বৃষ্টিকণা কেশে কবরীতে ঝরে পড়ে হীরের মত জ্বলছে; মাথা হেলানর সাথে গাল পর্য্যন্ত নামা কর্ণাভরণ তার ঝলমল করছে মাঝে মাঝে।

কয়েক গুচ্ছ পুষ্প চয়নের পর লনে একটু ঘুরে রুচিরা নদীর পথে অগ্রসর হল। এটা বাড়ীর পশ্চাত দিকে, বড় বড় গাছে ঢাকা পথ। গাছের তলায় তলায় রজনীগন্ধার দীর্ঘ পুষ্পশীর্ষ, ঘন বন গন্ধে উদাস হয়ে আছে, উপরে নীড়ে ফেরা পাখীর দল কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে তখন। পত্রবহুল বৃক্ষের ঘনচ্ছায়ে সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য এরই মাঝে ঘনিয়ে আসছে।

লাল কাঁকর-ঢালা পথ সাদা পাথরের দুটি বেদীর পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা কুটস্ত রজনীগন্ধার গুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে রুচিরা গেট খুলে বাইরে তাকালে। মাঠের বাবলা বন নিস্তব্ধ হয়ে আছে; পত্রহীন আঁকা বাঁকা ডালের ফাঁকে ফাঁকে গলিত রজত-ধারার মত নদী দেখা যাচ্ছে। ওপার ঝাপসা হয়ে গেছে; এপারে মেঘের স্তূপে মাণিক জ্বালিয়ে সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে;—নদীর পরে ঝুয়ে পড়া পশ্চিমাকাশ বৃন্দাবনের কোন্ এক হোলির স্মৃতিতে লালে লাল হয়ে উঠেছে।

রুচিরা প্রাচীরে হেলে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল; —দিনের পরে রাত, রাতের পর দিন দিয়ে অদৃশ্য শিল্পী যে বিনিসূতার মুক্তাহার গেঁথে চলেন, তার মাঝে দিন রাত্রির রঙীন মিলনক্ষণের অপূর্ব্ব এই মুহূর্ত্তগুলি মধ্যমণির মত জ্বলে ওঠে,—কতটুকু সময়ের জন্যে? স্বল্প এই সময়টুকুকে এত শুভ মনে হয় কেন; শতদলবাসিনী সরস্বতী কি এমনই কোনও স্নিগ্ধক্ষণে কবিকে বাণী দান করেছিলেন;—পদ্মাসনা ইন্দিরা তাঁর মঙ্গল কলস হতে জগতে সুধা ধারা ঢেলেছেন কি এই শুভ মুহূর্ত্তে? সেই মাঙ্গলিকের স্মৃতিতেই সুন্দর বুঝি আজও এ গোধূলিলগ্ন!

পদশব্দে রুচিরার দিবা স্বপ্ন টুটে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখলে একজন যুবক বাড়ীর দিক হতে গেটের পানে আসছে। অপরিচিতের অপ্রত্যাশিত আগমনে অবাক হয়ে বিশাল নয়ন দুটি পূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখে স্থাপন করলে; যুবকের বিস্ময়-প্রশংসাভরা চাহনিতে অপ্রতিভ হয়ে রুচিরা দৃষ্টি ফিরিয়ে রজনীগন্ধার গুচ্ছটা আনমনে অধরে চেপে ধরলে,—তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর পানে ফিরে চল্ল। মনের মাঝে গুনগুনিয়ে কেবলই প্রশ্নটা ঘুরে ফিরতে লাগল,—"কে এ, এ কে!"

যদি সে ফিরে তাকাত, একজোড়া মুগ্ধ উজ্জ্বল চোখে ওই প্রশ্নই ফুটে উঠেছে দেখতে পেত।

যুবক রুচিরার চলে যাওয়ার পানে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে মাঠে নেমে পড়ল একমনে ভাবতে ভাবতে,—মূর্ত্তিমতী সান্ধ্যশ্রীর মত ও কে? বাতাস-লাগা রজনীগন্ধার ফুল্লশীর্ষের মত লীলায়িত গতিভঙ্গী ও-কার? মেঘচ্ছায়ার মত মেদুর দৃষ্টি কার ও? কতযুগ আগে মৃগয়ান্বেষী রাজা নাম-না-জানা তপোবন-পালিতার কথা এমনি করেই ভেবেছেন হয়ত; চিত্রশালায় চঞ্চলনেত্রার চকিত চাহনিতে তরুণের মন সেদিনও এমনি প্রশংসমান হয়ে উঠেছিল,—অগুরুবাসিত ধূপধূসর তপোবনের যুগে জল সেচিকার বল্লরীর মত বঙ্কিম-ভঙ্গী, পুষ্পচায়িকার শারদমেঘের মত সাবলীল তনুর সহজ তনিমা তরুণের মনকে তখনও মুগ্ধ কৌতূহলে ভরিয়ে দিয়েছে। কালের স্রোতে কূলে কূলে পলি পড়ে চলে

বহির্জগতে,—কিন্তু অন্তরের অলকানন্দা সেই আদি গঙ্গোত্রী হতে একইভাবে উৎসারিত হয় বোধহয় চিরদিন।

যোগানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে রুচিরা এসেছে প্রায় ছমাস হবে। যোগানন্দ সারাজীবনের নিরলস পরিশ্রমে ব্যারিষ্টারিতে উপার্জ্জন করেছেন বিস্তর। তাঁর পত্নী বহুদিন হল গত হয়েছেন; কোনও সন্তানাদিও নেই। যোগানন্দ অক্ষুণ্ণ অবসরটা কর্ম্মের ভিড়ে এমনই ভরিয়ে রেখেছেন যে সমস্ত জীবনে একটিও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তাঁর গড়ে ওঠেনি। সেজন্য বিশেষ ক্ষোভ তাঁর ছিল না কখনও,—নিজের কাজ কর্ম্মে নিমগ্ন থাকাটাই তাঁর গম্ভীর প্রকৃতির অনুকূল ছিল। অধিক মেলামেশা আলাপ অপ্যায়নের ঝঞ্ঝাট তাঁর একেবারে অসহ্য। নির্জনতাপ্রিয় স্বভাব বলে নিস্তব্ধ নদীতীরে মনোমত ভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা আর ঘটে ওঠে নি। একান্ত এই করণীয় কার্য্যটি করার জন্যে তাড়া দেবার মত যোগানন্দের গৃহে কেহই ছিল না, অত্যন্ত রাশভারি স্বল্পবাক্ স্বভাবের জন্যে বাহিরের লোকও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেত না। যোগানন্দের নিজের দিক হতে বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; সমস্ত জীবনটা ধরা বাঁধা নিয়মের মাঝে এমন গুছিয়ে বেঁধে নিয়েছিলেন যে পত্নীর অভাব অনুভব করার যথেষ্ট অবকাশ তাঁর মিলত না। অনবরত পরিশ্রমনিরত থাকলেও পঞ্চাশ-ঊর্দ্ধ বয়সের পক্ষে যোগানন্দের দেহ যথেষ্ট সবল,—এখনও ঋজু। তাঁর ঈষৎ শুভ্র কেশ, বলিরেখাহীন মুখ, বলিষ্ঠ দেহ দেখলে বোঝা যায় একসময় তিনি সুপুরুষ ছিলেন।

দিন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটছিল। বিপদ বাধালেন যোগানন্দের অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা। বয়সের আধিক্যহেতু বৃদ্ধার সংসারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না; জপের মালা ও লাঠিটি নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এঘর ওঘর, আর দিনের মাঝে বারকয়েক উঁকি মেরে দেখে নিতেন তাঁর ছেলেটি হারিয়ে গেছে কি না। একদিন সহসা পক্ষাঘাতের আক্রমণ তাঁকে অচল করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিভ্রংশও হতে লাগল। যোগানন্দ জ্বরে তখন শয্যাগত। বৃদ্ধার পরিচর্য্যার কেউ নেই দেখে ডাক্তার একজন নার্সের বন্দোবস্ত করলেন, কিন্তু বৃদ্ধা যে আর উঠতে পারবেন না ও বারো মাসই পরিচর্য্যার প্রয়োজন হবে একথাও জানিয়ে দিলেন। বিব্রত যোগানন্দ ডাক্তারকে একজন স্থায়ী সেবিকার অনুসন্ধানের অনুরোধ জানালেন। ডাক্তার রুচিরাকে নিয়ে এলেন তখন।

রুচিরার পিতা ছিলেন মহামহা পণ্ডিত ও মহামহা অমিতব্যয়ী। উপার্জ্জনের সাথে ব্যয়ে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। রুচিরা তাঁর বড় আদরের প্রথম সন্তান; তাকে দূরে বোর্ডিংএ রাখতে পারবেন না বলে প্রচুর ডিগ্রীধারী ও প্রচুর বেতন-ভোগী কয়েকজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে দিলেন; পশ্চিম হতে প্রসিদ্ধ দুজন ওস্তাদ আনিয়েছিলেন রুচিরার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার জন্যে। শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও নিজে অতি যত্নে কন্যাকে ফরাসী ল্যাটিন ও সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হলে দেখা গেল সঞ্চয়ের খাতা সম্পূর্ণ শূন্য, ঋণের বোঝা ভারী হয়ে আছে। বিধবা মাতা ও অসহায় ভাই বোনের একটা উপায়ের জন্যে রুচিরাকে কর্ম্মের সন্ধান করতে হল। রুচিরার পিতার অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব ছিল, ডাক্তারও তার মাঝে একজন। তাঁর কাছ হতে সন্ধান পেয়ে রুচিরা সাগ্রহে যোগানন্দের গৃহের কর্ম্ম গ্রহণ করল।

সম্ভ্রান্ত গৃহের আদরে পালিতা এই তরুণীকে সাধারণ সেবিকারূপে নিয়োজিত করতে যোগানন্দের সঙ্কোচ লেগেছিল অনেকখানি। রুচিরার সকল রকম সুবিধার ব্যবস্থা তিনি আগ্রহের সাথে করে দিলেন। যোগানন্দের মত রাশভারি লোকের রুচিরার প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার দেখে সকলে তাকে বেতনভোগী সেবিকার অনেক উচ্চেই স্থান দিলে। শোক ও ভাবনার ঝড় ঝাপটা হতে নবপ্রাপ্ত কর্ম্মের আশ্রয়ে এসে রুচিরার দিনগুলো কতকটা স্বস্তির মাঝে কেটে যেতে লাগল।

যোগানন্দের একলা-চলা জীবনে রুচিরার আবির্ভাব অনেকখানি নূতনত্ব আনলে। তার কমনীয় মধুরভাব অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া গৃহলক্ষ্মীর অভাব তাঁর মনে জাগিয়ে দিলে সহসা। জটিল বৈষয়িক কর্ম্ম ও ব্রীফের স্তূপ হতে একটি তরুণীর সরস সঙ্গ যে অধিক তৃপ্তিদায়ক একথা অত্যন্ত অস্বস্তির সাথে স্বীকার করতে হল তাঁকে। কর্ম্মে সমাহিত জীবনের নূতন এ বিক্ষোভে চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—

জীবনে যখন ভাঁটার টান, অন্তরে জোয়ার কেন আর! কিন্তু যুক্তি জুটল ক্রমে। বয়স তাঁর অধিক হলেও এখনও ত সবল কর্ম্মক্ষম রয়েছেন। অর্থের অভাব তাঁর নেই। রুচিরার অমিতব্যয়ী পিতার অবর্ত্তমানে রুচিরাকে পথে বসতে হয়েছে, যোগানন্দের অবর্ত্তমানে তাকে পথে বসতে হবে না। আর যোগানন্দ না হয় পঞ্চাশ পেরিয়েছেন, রুচিরাও ত শিশু নয়।···

ভাবনা চিন্তার পর একদিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় রুচিরা যখন চা ঢেলে দিচ্ছিল, যোগানন্দ গম্ভীরমুখে বিবাহের প্রস্তাবটা জানিয়ে দিলেন! প্রবল বিস্ময়ের ঢেউয়ে রুচিরার হাত হতে ছল্‌কে পড়ে সোনালি চা শুভ্র আবরণকে মলিন করে দিলে খানিকটা। এই বয়সে উচ্ছ্বাস প্রকাশে নিজেকে হাস্যাস্পদ না করে তোলার জ্ঞান যোগানন্দের ছিল, তিনি তাই সংক্ষেপে নিজের মনের যুক্তিগুলো প্রকাশ করলেন, প্রস্তাবটা রুচিরাকে ভাল করে বিবেচনা করে উত্তর দিতে বলে নীরব হয়ে গেলেন। রুচিরা হিমে জমে যাওয়া মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে বসে রইল,—আলো পড়ে যোগানন্দের রূপালি কেশ ঝিকমিক করছিল যেখানটায় সেইদিক পানে চেয়ে।

যোগানন্দকে উত্তর দিতে হবে,—রুচিরা দিনের কর্ম্ম ভুলে চিন্তায় তলিয়ে যায়। রাতের নিদ্রা হারিয়ে ভাবনার ভরে ভেঙে পড়ে। বিবাহে সম্মতি দেবার সপক্ষে কোনও সাড়া সে নিজের মাঝে খুঁজে পায় না, যোগানন্দের যুক্তিগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকে। এতদিন তার কেটেছে পুস্তকের স্তূপে,—কাব্য ইতিহাসের পাতায় লুপ্ত নগরীর মাঝে মাঝে,—ধ্বংস রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া রাজার সন্ধানে; কত না-জানা না চেনা দেশের দেখা পেয়েছে, চন্দ্রের উদয়ারম্ভে চঞ্চল সমুদ্রের ঢেউ লেগেছে তার মনে,—কত তুষারভরা মেরুপথের হরিণ-টানা রথ, কত জলন্ত তপ্ত মরু বালুতে উটের শ্রেণী, কত নীল নদতটে দ্রাক্ষালতায় ছাওয়া মর্ম্মর হর্ম্ম্যে মিশরনন্দিনীর সন্ধানে,—কৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ শিখরে ভারতের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি, গ্রীসের গৌরব যুগ;—আরো আগে সেই প্রাণীহীন, বাণীহীন বসুন্ধরা,—একটি বৃক্ষ একা যখন মাথা জাগিয়েছে,—তার পর হতে কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, কত জয় পরাজয়, দিনের পর রাতও কেটেছে কত রুচিরার প্রদীপ জ্বালান অধ্যয়নে।······

এখন তাকে আত্মনির্ভর হতে হয়েছে; অল্প এ কদিনে সে যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে মনে হয়। এরই মাঝে বহুদিনের দেখা স্বপ্নের মত ভেসে আসে সে সব দিনের স্মৃতি। যোগানন্দের বয়স তার তুলনায় এমনই কি আর অশোভন এখন। যোগানন্দের যৌবনের চাঞ্চল্যহীন মূর্ত্তিরও এক ধরণের গৌরব আছে অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছেন অর্থের অভাবে তাকে পড়তে হবে না কখনও। ঘা খেয়ে রুচিরা দেখেছে বাস্তব জগতে অর্থের প্রয়োজন নেহাৎ অল্প নয়। রুচিরা কার প্রতীক্ষাতেই বা অপেক্ষা করবে?—সেত কাউকে চেনে নি। ··কিন্তু কর্ম্মহীন দ্বিপ্রহরে যখন জানালা দিয়ে দেখা যায় নদীর জল জ্বলে উঠেছে হীরের মত,· পাল-তোলা নৌকার সার মন্থর গতিতে বেয়ে চলেছে, নিস্তব্ধতার মাঝে টিটিভের তীক্ষ্ণধ্বনি করুণ হয়ে ভেসে আসে, তখন সেই না-দেখা অচেনার চিন্তা মনকে আন্‌মনা করে দেয় কেন? ওই আকাশছোঁয়া মাঠে বাব্‌লা ডালের ফাঁকে দুয়োরাণীর দুলালের দেখা কি মেলে না? বক্রোচ্ছল নদী বেয়ে রাজপুত্রের সোনার ময়ূরপঙ্খী এ ঘাটে কি লাগে না?······

যোগানন্দের মাতার আর্ত্তনাদে স্বপ্ন ভেঙে যায়, মনে পড়ে সে রূপকথার রাজকন্যা নয়, তাকে জীবিকার্জ্জন করতে হয়।

মীমাংসার কোনও কূল আর মেলে না;—ক্লান্ত হতাশ হয়ে সে যোগানন্দকে সম্মতি জানিয়ে দিলে,—আর ত অনিবার ভাবতে পারা যায় না। যোগানন্দ প্রসন্ন হলেন, বিবাহ কয়েক মাস পরে স্থির হল। বিবাহের সংবাদে কেউ হাসলে, কেউ বা অনুতাপ করলে। রুচিরা এখনও সেবিকারূপে রইলেও গৃহে বাহিরে সকলে তাকে যোগানন্দের ভাবী পত্নীরূপেই দেখতে লাগল।

* * * *

চাঁদের আলোর শুভ্র ধারাটি আলাপনকক্ষের বাতায়নপথ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে,—বাতায়নের কাছে একটা ডাইভানে হেলে বসা রুচিরার চরণে বসন লুটচ্ছে। অন্ধকারে বসে

আলোভরা আকাশের পানে চেয়ে আনমনে সে কি ভাবছিল। এ সময় রুচিরার অবসর বিশেষ থাকে না; যোগানন্দের মাতার ধারণা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিনি যে আহার সমাপন করেছেন সেটি দাসীদের রচা কথা,—তারাই আহার্য্যটা পরিপাক করে তাঁর নামে দোষারোপ করছে। এই নিয়ে নিত্য তিনি ঘোরতর গোলোযোগ বাঁধিয়ে তোলেন, রুচিরা গিয়ে তাঁকে শান্ত করে। আজ তিনি নিদ্রামগ্ন হওয়ায় সে ছাড়া পেয়েছে। চাঁদের দিকে চেয়ে চোখ জ্বালা করে, তবু রুচিরা দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না; ও যেন এক মায়াদর্পণ, কতদিনের কত প্রিয়মুখ ওতে আভাসে জেগে ওঠে, কত হারিয়ে যাওয়া ফিরে পাওয়া বন্ধু আবার মিলিয়ে যায়। জগতে সবই ত অমনি মিলিয়ে যায়, মুছে যায়!···বৈজ্ঞানিক বলেন তবু নাকি হারায় না কিছুই! তুচ্ছ একটি বাণী, ক্ষুদ্র একটি কাজ এরাও যদি অক্ষয় হয়ে বাজছে অনন্তে অনাগত, তবে হারিয়ে যাওয়ার কেন এ অনিবার্য্য হাহাকার। ভাণ্ডার ভরাই আছে, তবু তাহতে বিযুক্ত থাকার আনন্দ,—মহারাজর্ষির ব্রতের এ নিত্য দীক্ষা মানবমন কি গ্রহণ করতে পারচে? যোগানন্দের কথার সাড়ায় রুচিরা একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ ঘরে ঢুকলেন।

"একি অন্ধকার যে" বলে সুইচ টিপে দিলেন। রুচিরাকে দেখে বল্লেন—"এই ধ্রুব এসেছে", সাথের আগন্তুকের পানে ফিরে বল্লেন—"ইনি রুচিরা।"

রুচিরার মন একটা প্রশ্নের উত্তরে ও অনেকখানি বিস্ময়ে ভরে উঠল; ঈষৎ হেসে সে প্রতিনমস্কার জানালে। ধ্রুবর আগমন সংবাদ শুনেছিল সে; কিন্তু কেমন করে জানবে রুক্ষ গাত্রের ছবির ওই ডিগডিগে রোগা কিশোরটি ইস্পাতের তরোয়ারের মত তেজোদৃপ্ত এই দীর্ঘকায় যুবা।

ধ্রুবর দিক হতেও বিস্ময়ের শেষ ছিল না। তার জ্যেষ্ঠতাতের আগামী বিবাহের সংবাদে সে ভেবেছিল শুষ্ক বেতের মত নীরস কোনও শিক্ষয়িত্রী অথবা আইডোফর্মের গন্ধে আকুল এক লেডীডাক্তারকে দেখবে যেয়ে; কিন্তু বসন্তে বিকশিত মালতী-মঞ্জরীর মত এই তরুণী!

নিজেকে সংবরণ করে ধ্রুব বল্লে, "বাগানে আপনাকে দেখে মোটেই চিনতে পারিনি, আমি ভাবিনি কি না—" কী যে ভাবে নি সেটা আর বলা হল না।

রুচিরা বল্লে, "আপনি ত অনেকদিন বাদে এখানে এলেন, না? দিনকতক থাকতে পারবেন বোধ হয়?"

"ইচ্ছে ত আছে। জ্যাঠামশায়ের এ জায়গাটা ভারি ভাল লাগে আমার।" আরও দুএকটা কথার পর রুচিরা যোগানন্দের মাতার কাছে চলে গেল। যোগানন্দও কাগজ-পত্র দেখতে উঠে গেলেন। মঞ্জরিত হাস্নাহানার একটা শাখা জানালা পর্য্যন্ত উঠে এসে জ্যোৎস্নার পটে আঁধার রেখা টেনে দিয়েছে। ধ্রুব জানালার ধারে যেয়ে সেইদিকে তাকিয়ে খানিক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর রুচিরার পরিত্যক্ত আসনটায় বসে পড়ে দীর্ঘকেশ গুলাকে টানতে টানতে ভাবতে লাগল।

যোগানন্দের শূন্য অন্তরে এই ভ্রাতুষ্পুত্রটি প্রতি কতকটা মমতা জমা দিল; ধ্রুবও সে স্নেহ উপেক্ষা করতে পারে নি। যোগানন্দের নিরালা গৃহে প্রায়ই তাকে আসতে হতো। জ্যেষ্ঠতাতের সম্পত্তির প্রার্থী সে ছিল না কোনকালে; নিজের পৈতৃক বিষয় যথেষ্ট ছিল; পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি আলস্যে ভোগ করার তার একটা আন্তরিক ঘৃণা থাকায় ধ্রুব বার্মিংহামে প্রবাসী হয়ে কয়েক বছর এঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করে সম্প্রতি ফিরেছে; উপার্জ্জনও মন্দ করছেনা।

শিশুকাল হতে আনাগোনায় নিঃসঙ্গ যোগানন্দের প্রতি ধ্রুবর অনেকখানি শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ তরুণী ও বৃদ্ধের সংযুক্ত ছবি তার মনে কী এক বিপ্লব জাগিয়ে কিছুতেই পূর্ব্বের সহজ সম্বন্ধটি বজায় রাখতে দিচ্ছিল না; একহাতে কপালটা চেপে নতমস্তকে বহুক্ষণ সে ভাবলে বসে;—নিঃশেষিত-আয়ু প্রাচীন বৃক্ষের হেলেপড়া কর্কশ কাণ্ডে জড়িয়ে যাবে নববর্ষার বনবেলার ব্রততী!···

*   *   *   *

একপক্ষ কেটে গেছে। রুচিরা অত্যন্ত আনমনা আজকাল, ঘনবক্রপক্ষ্মতলে তার বিশাল দুটি চোখ সর্ব্বদা ক্লান্ত সকরুণ। যোগানন্দ আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর, অকারণ কর্ম্মে ব্যস্ত। গাম্ভীর্য্যের হাওয়া ধ্রুবরও লেগেছে বোধ হয়, তাকেও

অধিকাংশ সময় চিন্তামগ্ন দেখায়। গৃহের এ ভারাক্রান্ত আবহাওয়া,—শুধু যোগানন্দের মাতার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি, তিনি পূর্ব্বের মতই আহারের সময় আব্দার, নিদ্রার সময় রোদন এবং সকল সময়ই আহার নিয়ে তুমুল গোলো-যোগে ব্যস্ত থাকেন। তাতে ভারাক্রান্ত নিস্তব্ধতা আরও ভয়াকুল হয়।

নির্জ্জন মধ্যাহ্নে আলাপন কক্ষে বসে বসে রুচিরা সবুজ একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ধ্রুব কক্ষে প্রবেশ করলে; রুচিরা অন্তরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল; ধ্রুবর প্রতি প্রথম দিনের সহজ ভাব কেমন ক'রে কবে সে হারিয়ে ফেলেছে।

ললাটের স্বেদ রুমালে মুছে ধ্রুব বল্লে "কী গরম।"

"বেড়াতে গেছলেন ?"

বেতের চেয়ার একটা রুচিরার কাছে টেনে নিয়ে বসে ধ্রুব বল্লে, "হাঁ, কিন্তু যা রোদ। কি পড়ছেন এটা ? কালকের বইখানা শেষ হয়ে গেছে ?"

"Babbit ? হাঁ, সেটা শেষ হয়ে গেল।"

"কেমন লাগল Sinclair Lewis-এর লেখা ?"

"অন্যায়কে অগ্রাহ্য করার একটা সহজ ভঙ্গী মনের ওপর ছায়া না ফেলেই যায় না। কিন্তু Sinclair Lewis যেন অত্যধিক cynic, অতটা আপনার সহ্য হয় ?"

ধ্রুব একবার রুচিরার পানে চাইলে, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে বল্লে, "যার অনুভব করার শক্তি অধিক, তার cynic হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অতিরিক্ত। অন্যায়কে অনুভব করলে তাকে পরিপাক করা আরো যে অশোভন।"

রুচিরা চমকে উঠে ধ্রুবর দিকে তাকালে। তার মনে উচিত অনুচিতের যে দ্বন্দ্ব অহর্নিশি চলছে, ধ্রুব কি তারই সার কথাটি বলে দিচ্ছে ? হাতের বইটা নামিয়ে রেখে সে একটু সরে বসল।

রুচিরাকে নীরব দেখে বইটা তুলে নিয়ে ধ্রুব জিজ্ঞেস করলে, "কতটা পড়লেন এ বইটার ? ভাল লেগেছে 'Farsyte saga' ?"

রুচিরাকে উত্তর দিতে হল। বল্লে, "এটা আমি অনেক-বার পড়েছি। ভালমন্দ লাগার বাইরে ও বইটা, মনে হয়।"

আশ্চর্য্য হয়ে ধ্রুব বল্লে, "এতবড় ভাবেন এটাকে ?"

"বড় ত ভাবি না। ও যেন চিরন্তন মনের দ্বন্দ্ব দুঃখ দিয়ে তৈরী, একান্ত অন্তরের কথা। দেখুন—যে ভাবে, সে দরদীও হতে পারে।"

নিরন্তর সংঘর্ষে রুচিরার মনের দুয়ার কতটা আলগা হয়ে গেছে কিছুই সে জানে নি—কথাগুলো কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে এল।

ধ্রুবের মনে চাঞ্চল্যের বিদ্যুৎ খেলে গেল—দরদের অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করবে কি ! ব্যগ্র পুলকে কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, একজন দাসী এসে রুচিরাকে বৃদ্ধার কাছে ডেকে নিয়ে চলে গেল। অধর দংশন করে ধ্রুব নীরব হয়ে রইল।

মৃদু বৈকালী আলোয় বেদীতে বসে রুচিরা দেখছিল করবীর একটা নুয়ে পড়া শাখে দুটো শালিক স্ফীতপক্ষ হয়ে আলাপে ব্যস্ত; কয়েকটা কাঠবেরালি ঝরাপাতার মাঝে চঞ্চলচরণে নেচে বেড়াচ্ছে। ওপারের নৌকা হতে মাঝিদের ভাটিয়ালি সুরের মধুর মূর্চ্ছনা—কত দূরের পাখীডাকা ছায়াঢাকা বটমূল, কাকচক্ষু দীঘির জল, জ্যোৎস্নাধোয়া মাঠের ক্ষীণ পথশেষে ঘন তালবন, পল্লীবালার প্রদীপ-প্রজ্জ্বলিত গ্রামের শান্তশ্রীর স্বপ্ন মনে জাগিয়ে দিচ্ছে। পাশে কতকগুলা ফুল পড়ে, হাতে একটা সেলাই নিয়ে রুচিরা অলসভাবে মাঝে মাঝে বুনছে। এ কয়দিন রুচিরার অন্তরে যে সাড়া জেগেছে, তাকে স্বীকার করতে নিজেই সে সাহস পায় না। ধ্রুবকে সে প্রাণপণে পরিহার করে চলতে চেষ্টা করে। রুচিরার পানে চাইলে ধ্রুবর নক্ষত্রের মত স্বচ্ছোজ্জ্বল নয়নে যে আলো ঝলসে ওঠে—তা দেখে আঘাতলাগা সেতারের তারের মত রুচিরার চিত্ত কেঁপে ওঠে ;—সমস্ত শক্তিকে সংহত করে সে আকর্ষণ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যোগানন্দের বাগ্দত্তা বধূ সে,—এতই কি লঘু চিত্ত তার ?

"কতক্ষণ এলেন এখানে "? মাঠের পথ দিয়ে ধ্রুব এসে উদ্যানদ্বারে প্রবেশ করলে।

প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে রুচিরা বল্লে—"নদীর ধারটা ভারি সুন্দর, না ?" বেদীর একপ্রান্তে বসে পড়ে ধ্রুব বল্লে, "হাঁ, তাই একবার ভাল করে ঘুরে এলাম, কাল সকালে চলে যাচ্ছি কি না।"

রুচিরার হাত হতে সেলাইটা খসে পড়ল। দুজনে খানিক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

নদীর গা ঘেঁসে একদল হাঁস উড়ে চলে গেল কোন্ দূরতম প্রবাসে। ধ্রুব সেই দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে ছিল। আপন মনে বল্লে, "এখানে আমার আসা আর হবে না কখন।"

"কেন?"—অতর্কিতে কথাটা বেরিয়ে এল। এসব প্রশ্ন করবার সাহস রুচিরার কিছুমাত্র ছিল না।

দৃষ্টি ফিরিয়ে ধ্রুব অচঞ্চল চোখে রুচিরার দিকে চাইলে, তারপর বল্লে, "আর দেখা আপনার নাও পেতে পারি; একটা কথা তাই জিজ্ঞেস করতে সাহস করছি, ক্ষমা করবেন।" একটু থেমে বল্লে, "আচ্ছা, জেঠামশায়কে বিয়ে করতে সত্যই আপনি সম্মত?"

যে চিন্তাটাকে সে সর্ব্বদা চেপে রাখতে চায়, ঠিক এই লোকটি তাকে জাগিয়ে দিলে চিত্ত যে তার উদ্বেল হয়ে ওঠে! যে উৎস পাথর চাপা দিয়ে আপনাকে লুকিয়ে রাখতে চায়, পাথরে ঘা পড়লে সে যে শত সহস্র ধারায় ধরণীর বুক ফেটে বেরিয়ে আসে।

স্বপ্নালস দৃষ্টি সুদূরে মেলে কোনও মতে রুচিরা বল্লে—"ওঁর কাছে আমার অনেক ঋণ; অকৃতজ্ঞ হতে ত পারি না।"

ধ্রুবর চোখ জলে উঠল—সোজা হয়ে বল্লে, "আপনি কি বলতে চান জীবনটা কৃতজ্ঞতার দেনা শুধতে শুধু? অন্য সব অনুভূতিকে মুছে ফেলে কৃতজ্ঞতাকে আঁকড়ে থাকাই জীবনের চরম লক্ষ্য?"

"সেও একটা কাজ করা।" ও প্রশ্ন কেন আর, সংশয়ের কি শেষ হয় নি? দ্বন্দ্ব কি মিটবে না এ জীবনে?

"এ কাজে জয় হবে অন্যায়ের। মনকে দাবিয়ে দেনা পাওনাকে বড় করেছেন,—সুদ লাগবে যে সারা জীবনটির!"

কথার আঘাতে বাতাসে বাঁশপাতার মত কাঁপন জাগে রুচিরার যুক্তি সংকল্পে; কী বলবে সে?

তাকে নীরব দেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে ধ্রুব বল্লে, "জিনিষের একদিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে চোখে এমন ধাঁধা লাগে,—সে দিকটাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায়; এর মাঝে ভ্রান্তিও ত থাকতে পারে।"

"আমি ত অনেক ভাবলাম;—এ সঙ্কল্প আমার কেবলই কি ভ্রান্তি?"—দীর্ঘ চিন্তাপথ পারে, এতক্ষণে কি দেখতে হবে ভ্রান্তির নেশায় তার দিন কেটেছে।

অনুনয়-নম্র কণ্ঠে ধ্রুব বল্লে, "নির্ভুল আমরা ত কেউ নই—কৃতজ্ঞতার খাতির ছেড়ে অন্য দিক হতেও একবার দেখুন,—অন্যায়ের স্বপক্ষে আর যুক্তি খুঁজে পান কি?"

দূরের পানে চেয়ে রুচিরা নীরব হয়ে রইল। কি উত্তর আছে তার?

খানিক অপেক্ষা করে ধ্রুব বল্লে, "কৃতজ্ঞতার খাতিরে অনেক কাজ করা চলে কিন্তু বিয়ে করতে, সংসার চালাতে ওর চেয়ে ঢের বেশী আরো চাই যে।" রুচিরার দিকে প্রদীপ্ত নয়নে চেয়ে বল্লে, "ন্যায়ের দিকে চেয়ে ভালবাসাটাকে ভুলছেন আপনি,—কিন্তু দেখবেন ওটাই সব থেকে বড় সত্য জগতে,—ওর অভাবে সবই ফাঁকি।"

রুচিরার শুভ্র মুখ আরো সাদা হয়ে গেছল। তুলে ওঠা ডাল হতে বৃষ্টি ফোঁটার মত অনেক বিনিদ্র রজনীর গড়ে-তোলা সঙ্কল্প তার নিঃশেষে ঝরে পড়ল এবার, কিন্তু বাঁধন যে সে গ্রহণ করেছে—উপায় কোথায়,—হতাশকরুণ সুরে সে বল্লে, "কী আমার করবার আছে আর এখন?"

—"সবই ত রয়েছে"—ঝুঁকে পড়ে আগ্রহ-নিরুদ্ধ স্বরে ধ্রুব বল্লে,—"ও ভুল পথ ছেড়ে দাও রুচিরা,—আসতে পারবে আমার সঙ্গে? ভুলকে ভেঙে দিয়ে চলে আসতে পারবে কি?"

দীর্ঘ নীরবতার পর রুচিরা একটা করবীর পাপ্‌ড়ি খসিয়ে ছিন্ন করতে করতে অতি ধীরে বল্লে,—"পারব বোধহয়…" তার পর বল্লে, "জেঠা মশায় আপনার ভারি রাগ করবেন কিন্তু আপনার উপর।"

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ধ্রুব সহাস্যে বল্লে, "তা করুন। সমস্ত জগৎটার রক্ত চোখ উপেক্ষা করা যায় যার গুণে সেই মাণিকের সন্ধান যে আজ পেয়েছি।"

শ্রীইলা দেবী

'রবীন্দ্রজয়ন্তী'র সার্থকতা

মজঃফরপুর উৎসবে পঠিত

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, বি-এল

আমরা আজ যে এখানে একত্র হয়েছি, তার উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ দেখা গেছে। 'রবীন্দ্রজয়ন্তী'র কোনও সার্থকতা আছে কিনা এ নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এ সন্দেহ এ মতভেদ অনেকটা উপলব্ধির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের জন্য কি করেছেন এ প্রশ্ন না উঠলেও বিষয়টির আলোচনায় লাভ আছে।

কবি আজ ৭০ বৎসর পূর্ণ করে জীবনের সায়াহ্নে উপনীত। যাঁরা তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে এই অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধরে রবীন্দ্রনাথ একান্তমনে বাংলা দেশকেই ভালোবেসে এসেছেন; বাঙালীর দৈন্য দুর্দশায় তাঁর করুণ হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। বাঙালীমাত্রই বাংলাকে ভালোবাসে, কিন্তু আমাদের দশজনের ভালোবাসা যেন জননীর প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কর্ত্তব্যের নিদর্শন মাত্র। কিন্তু যাঁরা দেশপ্রেমিক তাঁদের ভালোবাসা ভিন্ন রকমের;—সে যেন অধম সন্তানের প্রতি জননীর কল্যাণময় হৃদয়ের অপরিমিত স্নেহ।

বাংলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা যে কি গভীর তার পরিচয় পেয়েছি ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের লেখা একটি কবিতায়। অনেকটা আমাদেরই মত হতভাগ্য এক বাঙালীর গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষ্য করে লিখেছিলেন,—

নমোনমোনমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধসমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধুলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা গেহ;
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল, নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু, বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌, চোখে আসে জল ভরে।

বাংলাকে এত নিবিড় ভাবে ভালো না বাসলে এমন সুললিত এমন প্রাণস্পর্শী বর্ণনা শুধু কলমের মুখে বের হতে পারে না। এই ভালোবাসা আরও পরিস্ফুট হয়েছিল, যখন বঙ্গবিভাগের প্রথম দুর্দ্দিনে কবি গেয়েছিলেন,—

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে, বাজায় বাঁশী।
আর সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।

তখন তাঁর হৃদয়দেবতার নিকট নিবেদন করে লিখেছিলেন,—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হো'ক, পুণ্য হো'ক, পুণ্য হো'ক হে ভগবন্‌
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হো'ক, সত্য হো'ক, সত্য হো'ক হে ভগবন্‌।

এই গভীর দেশপ্রেমের সম্মুখে সকলেরই মাথা সম্ভ্রমে নত হয়ে আসে। এই প্রেমে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ, তাই তিনি চিরকাল বিশুদ্ধ বাঙ্গালী জীবন যাপন করে এসেছেন। পত্র ব্যবহারে বাংলা ভাষা, বাক্য ব্যবহারে বিজাতীয় ভাষার পরিহার, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের বিশেষত্ব। বাংলার কল্যাণ চিন্তা তাঁকে অনুক্ষণ নানাকর্ম্মে চালনা করে এসেছে। সে কর্ম্মপদ্ধতি হয়ত আর পাঁচজনের কর্ম্মপদ্ধতি

হ'তে ভিন্ন ; কিন্তু, দেশের কল্যাণ চেষ্টা হ'তে একদিনের জন্যও তিনি বিরত হননি। তাঁর প্রতিষ্ঠান শান্তি নিকেতন একটা উচ্চ আদর্শে বাঙালী জীবন গঠন করবার বিরাট প্রচেষ্টা।

কিন্তু তিনি কি বাংলাদেশকে শুধু ভালোই বেসে এসেচেন, বাঙালীর জন্য শুধুমাত্র বেদনা বোধ করেই এসেচেন ? তিনি কি আমাদের কিছুই দান করেন নি যার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হতে পারি ?

দান জিনিষটা দৃশ্যমান না হ'লে আমরা সহজে ওর উপলব্ধি করতে পারি না। জল, বায়ু, সূর্য্য হ'তে যে দান আমরা নিয়ত পেয়ে আস্‌চি, তার যথার্থ উপলব্ধি অনুভূতি-সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের দানও কতকটা ঐ জাতীয়। এ যেন প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হ'তে স্বতঃনিস্থত সুধা-স্রোত। এর মধ্যে একমাত্র কল্যাণকামনা ব্যতীত দ্বিতীয় মনোবৃত্তির অবকাশ নেই। এই দানের বিপুলতা কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বোধশক্তির সাহায্যে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

আমাদের তিনি কি দেবেন তার সামান্য আভাস দিয়েছিলেন যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন,—

ওইযে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার,—
বহি' চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তা'র পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি',
নাহি ভৎ'সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,'
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দু'টি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে,
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,—এই সব শ্রান্ত শুষ্ক-ভগ্ন বুকে,
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

আজ ৩৭ বৎসর পরে দেখ্‌তে পাচ্চি কবি তাঁর কর্ত্তব্য পালন করেছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত, নৈরাশ্যস্তব্ধ বাঙ্গালীর মুখে ভাষা তিনি দিয়েছেন ; এবং আমাদের ভাঙা বুকেও তিনি আশা জাগিয়েছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালীর মন যখন পশ্চিমের দিকেই ঝুঁকে পড়ছিল তখন তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষের প্রচার করে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের ধারা গৃহাভিমুখে ফিরিয়ে আন্‌তে সক্ষম হয়েছিলেন। কেবল এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর লেখনী হ'তে গদ্যে ও পদ্যে যে অপূর্ব্ব রচনাবলী প্রচারিত হয়েছে সবগুলির উল্লেখ করবার স্থান ও সময় নেই, আমি শুধু একটি মাত্র কবিতা হ'তে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে আপনাদের শোনাচ্ছি। পশ্চিমাভিমুখী দেশবাসীর মনকে বল্‌ছেন্‌

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিকবিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্য মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

বাঙালীর মনকে ঘরের দিকে ফিরিয়ে এনে তিনি ভারতবর্ষের সাধনালব্ধ যে উচ্চ আদর্শ আমাদের চোখের সাম্‌নে দাঁড় করিয়েছেন তা আরও অপরূপ,—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ, শিখায়েছ বীরে,
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে,
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্যে করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,

শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

প্রথমে 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদন ভার নিজহস্তে গ্রহণ করে, তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের লুপ্ত 'বঙ্গদর্শন' পুনর্জ্জীবিত করে এই আদর্শ প্রচার কার্য্যে যখন তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তখন তাঁর প্রতিভা পরিণতি লাভ করেছে। যৌবনের অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ, নিজের গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ রচনাশক্তি সমস্তই তিনি তখন দেশবাসীর মধ্যে একটা সাধনার ক্ষেত্র, একটা অনুশীলনের আবহ তৈরী করতে উৎসর্গ করেছিলেন।

এই আদর্শ সম্মুখে রেখে তিনি বাঙালীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠনের পন্থা নির্দ্দেশ করার উদ্দেশ্যে যে সকল কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা' সংখ্যাতীত। যা সত্য, যা শুভ, যা'কিছু সুন্দর তিনি দেখেছেন বা পেয়েছেন সমস্তই তিনি অভিনব আকারে অতি সুললিত ভাষায় আমাদের দান করে এসেছেন। আমাদের আচার-বিচারে, ধর্ম্মেকর্ম্মে যেখানে দেখেছেন ওগুলি অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে দেখেছেন অন্ধ-বিশ্বাস বিচারবুদ্ধিকে একেবারে অভিভূত করে আমাদের মনুষ্যত্বের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত সেখানে তিনি নির্ম্মমভাবে আঘাত করেছেন। এবং বাঙালীর মনকে সর্ব্ব কর্ম্মে ও সর্ব্ব চিন্তায় সত্যের পথে একমাত্র বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করবার জন্য নিজের প্রতিভা নিয়োগ করেছেন। ঐ যে তিনি প্রথমেই বলেছিলেন,—

সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।

সেই বেদনা তাঁকে নিয়ত পথ নির্দ্দেশ করে এসেছে। বাঙালীর মনকে মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর কি প্রচণ্ড প্রয়াস, কি আকুল আকাঙ্ক্ষা! 'নৈবেদ্য'তে তাই লিখেছিলেন,—

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজাখেলা
মুগ্ধ ভাবাবেগে, সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল।
তোমারে আপন সাথে করিয়া সমান
যে খর্ব্ব মানবগণ করে অবমান
কে তাদের দিবে মান? নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্দ্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ? তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্য ধারা?

বাঙালীর চরিত্রকে মনুষ্যত্বের মুক্ত বায়ুতে পুষ্ট হ'তে দেবার জন্য তাঁর যে সাধনা ছিল, আজ তা সিদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কি রাষ্ট্রীয়, কি সামাজিক সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হ'তে মুক্ত হবার দুর্জ্জয় সংকল্প নিয়ে বাঙালী আজ কাজে নেমেছে। বাংলার যে সকল নেতৃবৃন্দ বাঙালীকে এই মুক্তিপথে চালিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের আসন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চে। যদিও বাংলার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সাক্ষাৎভাবে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, তথাচ ঐ আন্দোলনের অন্তরের সম্পদ্ অনেকখানি তিনিই আমাদের দিয়েছেন। সেই সম্পদ্ হচ্ছে মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ। তাঁর রচিত জাতীয় সঙ্গীত ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ সমূহ এই দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। সেই দেশাত্মবোধই আজ বাঙালীকে চালনা করছে, শক্তি দিয়েছে, আশা দিয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে সিদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর করে দিতে পেরেছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব এতদিন কেবলমাত্র কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ লোকেরই প্রাপ্য বস্তু ছিল। ধর্ম্ম জিনিষটাকে আমরা এতদিন অতিশয় দুর্ব্বোধ, জটিল ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু বলেই ধারণা করে এসেছি। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও মূল মর্ম্মকথা রবীন্দ্রনাথ এমন প্রাঞ্জল করে প্রবন্ধে, কবিতায়, গানে আমাদের এতদূর অনায়াসলভ্য করে দিয়েছেন যে সত্যই মনে দ্বিধা হয় তাঁকে কবি বলব, না ঋষি বলব। শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীর নিকট প্রত্যহ যে সহজ, সরল ধর্ম্ম কথা শুনিয়ে এসেচেন, আজ তা পুস্তকাকারে সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এসেচে। সেগুলি পাঠ করলে আমাদের চিত্ত অনেক পরিমাণে দ্বিধা-শূন্য হয়ে যায়, এবং একটা বিমল আনন্দ ও শান্তিরসে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বৈরাগ্য সাধন দ্বারা তিনি মুক্তি চান নি; এই জীবনটাকে কল্যাণে, কর্ম্মে, আনন্দে, সহজ

সরল ক'রে ভোগ করবার আদর্শই তিনি প্রচার করেছেন। মৃত্যুকেও তিনি অমৃতময় করে আমাদের সংস্কারজনিত ভীতিকে অপসারিত করবার চেষ্টা করেছেন।

মানুষের জীবন শুধুমাত্র একটা উচ্চ আদর্শ ও সত্য সন্ধানের নীরস সাধনায় পর্য্যবসিত হয় না। এতে নির্ম্মল আনন্দেরও প্রয়োজন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দরসে আমাদের ডুবিয়ে রেখেছেন। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি যদি সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তবে শুধুমাত্র এই জন্যই কবিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে। শব্দ রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত। সুললিত শব্দের ঝঙ্কার, অভিনব বিচিত্র ছন্দের অপরূপ নৃত্য, নব নব ভাবসমষ্টির অপূর্ব্ব সমাবেশে তাঁর কবিতাগুলি সহজেই আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করেছে। এই শ্রেণীর অসংখ্য কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে ইচ্ছা হয় 'উর্ব্বশী' কবিতাটিকে। এই কবিতাটির একটিমাত্র চরণ এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।—

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী ?
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত —
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত,
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র, নগ্নকান্তি, সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

কি সুন্দর কল্পনা এই কয়টিমাত্র কথার মধ্যে। আর সেই কল্পনাটিকে ব্যক্ত করবার কি অপরূপ ভঙ্গি। প্রত্যেকটি শব্দ যেন কবি-হৃদয়ের নীরব নৃত্যের সঙ্গে নূপুর-নিক্কণে তালে তালে নেচে চলেছে।

তারপরে, কবিবরের মনোমুগ্ধকর গানগুলির কথা। তিনি নিয়ত যে আনন্দরসে নিজেই ডুবে থাকেন, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে যে সুর নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে, অপূর্ব্ব আকার ধারণ করে তাই আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের দেশে এতদিন নানা বিষয়ক যে সব গানের প্রচলন ছিল রবীন্দ্রনাথ তার ধারা একেবারে বদলে দিয়েছেন। ভগবদ্ভক্ত কি সাহিত্যরস-পিয়াসী কি রূপপিয়াসী সকলেই নিজ নিজ প্রাণের খাদ্য ঐ গানগুলির মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন।

তাঁর ঋষি তুল্য দৃষ্টিতে প্রকৃতির মধ্যেই তিনি সত্যের প্রকাশ নিয়ত উপলব্ধি করতে পেরেছেন। প্রকৃতিই তাঁকে অনুক্ষণ আনন্দরসে আপ্লুত করে রেখেছে। তাই তিনি গেয়েছেন,—

কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবারাত্র নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ।

সেই আনন্দ, সেই সৌন্দর্য্য তিনি বিচিত্র সুরে ও ছন্দে গ্রথিত করে আমাদের দান করেছেন। তাঁর দৃষ্টি এত গভীর, উপলব্ধি এত নিবিড়, অনুভূতি এত ব্যাপক না হ'লে তাঁর কবিতা গানের এই অপরূপ মাধুর্য্য সম্ভব হ'ত না। এই যে শরৎ-বসন্ত-বর্ষার বিচিত্র বর্ণনা, পৃথিবীর কোনও কবির কোনও রচনায় ভাষার এত মাধুর্য্য, ভাবের এতদূর গভীরতা, ছন্দের এমন সহজ নৃত্য আছে বলে আমি জানি না। শরতের অরুণ আলো, শেফালি পুষ্পের সম্ভার, সবুজ তৃণের আস্তরণ, বসন্তের মলয়ানিল, নবোদগত কিশলয় ও মুকুলিত আম্র-মঞ্জরী বর্ষা-সমাগমে আকাশের সজল ঘনের অপূর্ব্ব খেলা ও আষাঢ় শ্রাবণের বারিধারা আমরা ত নিত্যই দেখ্‌ছি। কিন্তু কবি ওরই মধ্যে কিসের প্রকাশ, কার আকুল আহ্বান, কার আনন্দ-নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, আজ তা আমরা বুঝতে পেরেছি। আজ আমাদের ব্যথিত-প্রাণেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার একটা সাড়া এসেছে। তিনিই আমাদের চোখের পরদা সরিয়ে দিয়ে প্রকৃতিদেবীর শ্যামল শোভার মধ্যে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

কথা-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা অসাধারণ। আজ যে বাংলা মাসিকপত্রের কলেবর গল্পপ্লাবিত হয়ে নিরীহ পাঠককুলের ত্রাসের হেতু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, এত অধিক পরিমাণে তাঁরই ছোট গল্পগুলির ব্যর্থ ও অব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অবলম্বন করে তিনি গল্পের মধ্যে যে রস-সঞ্চার করেছেন, তার তুলনা নেই। আর্ট

জিনিষটা আমরা সকলে ঠিক বুঝিনা, তবে রস উপভোগ করবার সহজ শক্তি কম বেশী আমাদের সকলেরই আছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে বাঙালী আজ নিজেদের দেখতে পেয়েছে। ওরই মধ্যে আমরা আমাদের সুখ দুঃখ, স্নেহ-ভালবাসা, আমাদের শক্তি, আমাদের দুর্ব্বলতা, আমাদের চরিত্রের দোষ গুণ সবারই নিখুঁত ছবি দেখতে পেয়েছি। নির্ম্মল শুভ্র হাস্য, করুণা, সমবেদনা, অনুভূতি ঐ গল্পগুলির প্রাণ। উপন্যাস ৬।৭ খানি মাত্র লিখেছেন, তাতেই ঐ বিভাগে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করেছেন। বঙ্কিমের যুগেও বাংলা উপন্যাস গল্পাংশবহুল উপাখ্যানমাত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে উপন্যাসের মধ্য দিয়া মানুষের মনস্তত্ত্ব ও চরিত্র বিশ্লেষণের পথ দেখিয়েছেন। যা কিছু ঘটছে যা কিছু ঘটতে পারে তারই নিখুঁত ছবি আমাদের কাছে এঁকে দিয়েছেন। আজ যে বাস্তব বাস্তব বলে একটা কলরব শুনছি, বিভীষিকা বর্জ্জিত হয়ে ও বস্তুটি সহজেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করছে।

তাঁর চিন্তাধারা কোনও দিন সীমাদ্বারা আবদ্ধ হয় নি। দেশবাসীর কল্যাণ কামনার অবশ্যম্ভাবী বিবর্ত্তন তাঁকে মানবজাতির কল্যাণ চিন্তায় প্রেরিত করেছে। যে মহাপ্রাণ সত্যকে হৃদয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, মানুষের কল্যাণ চিন্তার প্রেরণা যাঁকে নানা কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেছে, তাঁর চিন্তাধারা কোনও ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ব্যতীত বিশ্বের একাংশের অধিবাসীর প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন এই মহাপুরুষদের নিকট অসম্ভব বলে মনে হয়। তাই ইঁহারা অত্যুগ্র স্বদেশ প্রীতিকে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বলে মনে করেন। যতদুর বুঝতে পারি তিনি যে 'বিশ্বভারতীর' স্থাপনা করে বিশ্বের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন তার পরিকল্পনা ঐ যুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এজন্য একশ্রেণীর দেশবাসীর নিকট হ'তে অপ্রিয় সমালোচনাও তাঁকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু সত্যকে যিনি লাভ করেছেন তুচ্ছ নিন্দা প্রশংসা তাঁকে কর্ত্তব্য হতে বিচলিত করতে পারে না। তাঁর "বিশ্বভারতীতে" বিশ্বের চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতের চিন্তাধারার আদানপ্রদানের সার্থকতা উপলব্ধি করে তিনি এই বিরাট কল্পনাকে বাস্তবের মধ্যে এনেছেন। একে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য তাঁর আগ্রহ ও যত্নের অন্ত নাই। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সমস্ত অর্থ, তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলীর সমস্ত উপস্বত্ব ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টির জন্য অর্পণ করেছেন।

আজ তাঁর বাণী ভারতবর্ষের বাণী বলে বিশ্বের চিন্তাশীল সমাজে প্রচারিত হয়েছে; এবং মনে হচ্ছে তাঁদের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে। তাই পৃথিবীর মনীষীদের মধ্যে তিনি নিজের আসন সহজেই প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। আজ তাঁর এই গৌরবে বাঙালী গৌরবান্বিত।

এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের দিনে তাঁর কৃতজ্ঞদেশবাসী তাঁকে অভিনন্দিত করবার যে আয়োজন করেছেন তা সার্থক হয়েছে। বাঙালী আজ কবিবরকে হৃদয়ের অর্ঘ্য প্রদান করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন

মীরকাসিম ও তাঁহার বিদেশী সেনানীবৃন্দ

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস্

মসিয় ল'র সহিত যে সকল ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় সৈনিক সাহ আলমের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, তন্মধ্যে ওয়াল্টার রীণহার্ড ওরফে নবাব সমরু অন্যতম সে কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। নানা কারণে সমরুর নাম এদেশের ইতিহাসে সুপরিচিত। পরবর্ত্তী জীবনে নবাব মীরকাসিমের পাটনার ইংরাজ বন্দীদিগের হত্যাকাণ্ডের নায়করূপে এই ব্যক্তি ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সমরু ব্যতীত মীরকাসিমের সেনাদলে আরও কয়েকজন ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় এবং আর্ম্মেণীয় সৈনিক ছিল। ইহাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে মীরকাসিমের সেনাদল সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

মীরকাসিম নবাব হইবার পর হইতেই খুব ভালভাবেই শাসনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনদাতা ইংরাজ শক্তিও প্রথম কয়েক বর্ষ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। মীরজাফরের অনুগৃহীত অপদার্থ স্তাবক ও খোসামুদের দলকে তিনি পদচ্যুত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অন্যায়লব্ধ অগাধ-ধনরাশির কতকাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্রোহী সৈনিকদলের প্রাপ্য বাকী বেতন পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইল, তদ্ভিন্ন তাহাদের এবং এমন কি কোম্পানীর সেনাদলকেও প্রচুর অর্থ পুরস্কারস্বরূপে প্রদত্ত হইল। মীরকাসিম প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে ইংরাজগণ মান্দ্রাজ প্রদেশে ফরাসীদের যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। শাসন কার্য্যের প্রতি বিভাগেই উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্য্য সাধিত হইল। ফলতঃ মীরকাসিমের নবাবীর প্রথম দুই বৎসরে রাজস্বলব্ধ অর্থ প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য যেভাবে অকাতরে ব্যয়িত হইত এবং ন্যায়ধর্ম্মানুসারে যেভাবে বিচার কার্য্য সাধিত হইত, জগতের ইতিহাসে সেরূপ খুব কমই দেখা গিয়া থাকে। একথা স্বয়ং ইংরাজ লেখকের কথা। * সৈয়দ গোলাম হোসেন স্বরচিত ইতিহাসে মীরকাশিমের বহু নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার লেখা গ্রন্থ স্বজাতির কলঙ্কক্ষালনার্থে রচিত এ কথা কোনমতেই বলা চলে না। তিনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন "ঐতিহাসিক সত্য কথা বলিতে বাধ্য। আমি মীরকাসিমের অনেক কু-কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার ভাল কাজগুলিরও উল্লেখ করা আমার উচিত। তিনি তাঁহার সেনানী ও সৈনিকদিগের প্রভুভক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া অনেক সময় সামান্য অপরাধেও অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে দ্বিধা করেন নাই বটে, কিন্তু দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচারকার্য্যে, কিম্বা সেনাবাহিনী সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে অথবা শাসনকার্য্যে এবং বিদ্বজ্জনের মর্য্যাদা রক্ষায় তিনি যে প্রকার ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে তদীয়যুগের আদর্শতম নৃপতি বলিলেও বেশী কথা বলা হয় না। তিনি সপ্তাহে দুইদিন যথাপদ্ধতি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অধস্তন বিচারপতিগণের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন। তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাদী ও প্রতিবাদীর এবং তাহাদের সাক্ষীগণের বক্তব্য বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিচারকার্য্য সমাধা করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া "হাঁ" কে "না" করা সম্ভব ছিল না। জমীদারগণের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করা তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য্য ছিল।" †

কিন্তু এ সুদিন দীর্ঘস্থায়ী হইল না। মীরকাসিম নবাবী পাইবার পর হইতেই জানিতেন যে, যে ইংরাজশক্তি তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল, কালক্রমে একদিন তাহারই সহিত তাঁহার বল পরীক্ষার দিন আসিবে। তিনি মীরজাফরের ন্যায় সুখী

* Warren Hastings—Sir W. W. Hunter—P. 27

† Scott—Vol. II P. 411.

ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। প্রজার সুখে দুঃখে উদাসীন হইয়া ইংরাজ কোম্পানীর হস্তের ক্রীড়াপুত্তল, নামসর্ব্বস্ব নবাবে পরিণত হইতে তাঁহার অভিরুচি ছিল না। তিনি প্রজারঞ্জক, বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি—সত্যকার রাজা—হইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সকল কার্য্য প্রথম হইতেই এই আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়। ফলতঃ মীরকাসিমই স্বাধীন বাংলার শেষ বীর।

তখনকার দিনে বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু ইউরোপীয় প্রণালীর বৈজ্ঞানিক সমরকৌশলবিৎ উপযুক্ত সেনানায়কবৃন্দের। ভারতীয় সেনা বহুবার সংখ্যায় ন্যূন ইউরোপীয় সেনা বা ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত স্বদেশীয় সেনার হস্তে পরাজিত হইলেও, শৌর্য্যবীর্য্যে পরাস্ত হয় নাই। তাহাদের শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই তাহারা পরাভূত হইত। সেনাদলের না ছিল উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র বা পরিচ্ছদ, না পাইত তাহারা উপযুক্ত সময়ে পরিমিত বেতন, না ছিল যুদ্ধকালে তাহাদের পরিচালন করিবার জন্য উপযুক্ত রণবিদ্যানিপুণ সেনাপতি। তাহাদের অধিনায়ক মনসবদারগণ পদগৌরব এবং রাজদরবারে প্রতিপত্তি ও মুরুব্বী অনুসারে সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন। সমগ্র সেনাদল একদল বলিয়াই গণ্য হইত। সমরক্ষেত্রে বহুসংখ্যক সেনা সমবেত হইলেও একজন মাত্র নায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পতন হইলে বা তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। তাঁহার শূন্য স্থান অধিকার করিয়া বাহিনী পরিচালনের যোগ্য অপর কেহ না থাকায় সেনাপতির সহিতই যুদ্ধেরও সমাধা হইয়া যাইত। তখনকার দিনে সেনাপতিরাই যুদ্ধ করিতেন। সৈনিকেরা শুধু তাঁহাকেই চিনিত। রাজার বা দেশের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ বলিয়া কোন জিনিস তখন ছিল না। সেনাপতিই সৈন্যদলের বেতন দিতেন। সুতরাং রণক্ষেত্রে তাঁহার দেহান্ত ঘটিলে সে যুদ্ধে সৈন্যদলের আর কোন আকর্ষণ থাকিত না। এই সকল কারণে যে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদল ইউরোপীয় সৈনিকদলের নিকট পরাভূত হইত মীরকাসিম তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইংরাজের সমরকৌশলের উৎকর্ষই যে তাহার প্রতিষ্ঠার কারণ তাহা তিনি জানিতেন। উপযুক্ত শিক্ষক কর্ত্তৃক শিক্ষিত এবং উপযুক্ত নায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত এতদ্দেশীয় সিপাহী যে অতি অল্পকাল মধ্যেই ইউরোপীয় সৈনিকের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন মীরকাসিম দেখিয়াছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষক ও রণসম্ভার পাইলে তাঁহার সেনাদল ইংরাজের বাহুবল বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবে বলিয়া মীরকাসিম বিশ্বাস করিতেন।

শিক্ষকের অভাব হইল না, কারণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে তখনকার দিনে এদেশে ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে সৈনিকপুরুষের অভাব ছিল না। আর্ম্মেণীয়, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, জর্ম্মণ অনেক ইউরোপীয় যোদ্ধা মীরকাসিমের কর্ম্মগ্রহণ করিয়া সেনাদল সুশিক্ষিত করার ভার লইল। পদাতিক এবং গোলন্দাজ-বাহিনীর পরিচালন ভার প্রধানতঃ ইহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল, অশ্বারোহী সেনা মোগল বা দেশীয় সেনানায়কগণ পরিচালন করিতেন। পরবর্ত্তী যুগের নৃপতিবৃন্দের এমন কি মহাদজী সিন্দিয়ার সেনাদলেও এই প্রথা অনুসৃত হইত। মীরকাসিমের বিদেশী সেনানায়কবর্গের মধ্যে অধিকাংশের নামই কালক্রমে অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে, শুধু অল্প কয়েকজনের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আরাটুন গ্রেগরী, মার্কার, কর্ণেল জির্যা, ব্যাপটিষ্ট জোসেফ, জেন্টিল এবং ওয়াল্টার রীণহার্ড বা সমরু এই কয়জনের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

গ্রেগরী ও মার্কার দুজনেই জাতিতে আর্ম্মাণী। তখনকার দিনে এদেশে অনেক আর্ম্মাণীর সমাগম ছিল। তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজকার্য্য উভয়বিধ কারণেই নবাব দরবারে তুল্যরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। খোজা পিক্রু নামক একজন প্রসিদ্ধ আর্ম্মাণী বণিক কলিকাতায় বাস করিতেন। ইংরাজ সরকার এবং নবাব দরবার উভয় স্থানেই তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সিংহাসনলাভের পূর্ব্বে সেনাপতি অবস্থায় মীরকাসিমের তাঁহার সহিত সাতিশয় সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। এই খোজা পিক্রুর ভ্রাতা আরাটুন গ্রেগরী ছিলেন মীরকাসিমের প্রধান সেনাপতি।

* শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—মীরকাসিম।

সাহিত্যসম্রাট ৺ বঙ্কিমচন্দ্রের অমর "চন্দ্রশেখরে"র কল্যাণে ইনি "গুর্গিণ খাঁ" রূপে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সুপরিচিত। তোপখানার সকল ভার ইহাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল। নবাব আরাটুনকে খুবই বিশ্বাস করিতেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মীরকাসিম নেপাল জয়ের চেষ্টা করেন। উক্ত দেশ আক্রমণে প্রেরিত নবাব সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া চলিলেন গুর্গিণ খাঁ। মকবানপুরের নিকট উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে এবং অপর একটী খণ্ডযুদ্ধে নবাবের সেনাদল বিজয়লাভ করিলেও নবাব বুঝিলেন যে নেপালজয় বহু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রভূত অর্থ ও সেনাক্ষয়ে পরিশেষে নেপাল অধিকার করিতে সমর্থ হইলেও তাহা হইতে অনুরূপ লাভের সম্ভাবনা নাই। অগত্যা তিনি তখন স্বীয় সেনাদলকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন।

গ্রেগরীর অধীনে মার্কার নামক আর একজন আর্ম্মাণী সেনাপতি ছিলেন। শৌর্য্যবীর্য্য, সমরবিদ্যার জ্ঞানে মার্কার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জাতিতে আর্ম্মাণী হইলেও তিনি ইউরোপের সামরিক স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং হল্যাণ্ডের যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া সামরিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কর্ণেল জেন্টিলের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। মীর কাসিমের অন্যতম বিদেশী সেনাপতি সুইস ওয়াল্টার রাঁণহার্ড ওরফে সমরু সাহেবের কথা স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে বলা যাইবে।

কালক্রমে ইংরাজের সহিত নবাব মীরকাসিমের অপরিহার্য্য বল-পরীক্ষার দিন সমাগত হইল। সে সকল ইতিহাসের কথা—যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে পাটনার ইংরাজ কুঠিয়াল এলিস সাহেবের হঠকারিতার জন্যই যুদ্ধ শীঘ্র বাধিয়া উঠিলেও এ যুদ্ধের জন্য সকলেই প্রস্তুত ছিলেন এবং কলিকাতার কাউন্সিল অনেক দিন হইতেই যুদ্ধ চাহিতে ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস পাটনার কুঠিয়ালের পদত্যাগ করিয়া কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য হইয়া গেলে তাঁহার স্থানে এলিস সাহেব নিযুক্ত হন। উক্ত দায়ীত্বপূর্ণ পদে এরূপ নিকৃষ্টতম নির্ব্বাচন করা কলিকাতার কর্তৃপক্ষের উচিত হয় নাই। হঠকারী, একগুঁয়ে, কোপনস্বভাব, দুর্দ্দান্ত এবং নীতিজ্ঞানহীন এলিস নবাবের কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং কোম্পানীর লোকজনদের মধ্যে বিবাদ বাধাইতে আনন্দ অনুভব করিতেন। * কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অর্থগৃধ্নুতা এবং দাম্ভিকতার জন্য শীঘ্রই উভয় পক্ষে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল।

কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রাতারাতি বড় মানুষ হইবার আশায় বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইত। কোম্পানীর যৎসামান্য বেতনে কাহারও অভাব দূর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অভাব মোচনের জন্য তাহারা অন্য উপায়ে অর্থার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইত। তাহা কতদূর ন্যায় সঙ্গত বা তাহাতে অপরের অনিষ্ট হইতে পারে কিনা সে বিবেচনা করিবার তাহাদের অবকাশ ছিল না। কোম্পানীর "চার্টার" অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়া বাণিজ্য করার অধিকার শুধু কোম্পানীর ছিল। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করা সম্ভব নহে দেখিয়া অর্থলাভাকাঙ্ক্ষায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দ জলে ও স্থলে এদেশে অবাধ বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। কোম্পানীকে প্রদত্ত পূর্ব্বতন "ফরমাণ" সমূহ অনুসারে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার কোম্পানীর ছিল। ইংরাজ গভর্ণরের সাক্ষরিত দস্তক বা পাশের বলে কোম্পানীর মাল দেশের সর্ব্বত্র অবাধে প্রেরিত হইতে পারিত—কোথাও শুল্ক, কর, বা চুঙ্গী লাগিত না। বলা বাহুল্য কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য বা তাহাদের অনুগৃহীত ও আশ্রিত নবাবের প্রজার বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং ঐ শ্রেণীর লোকেরাও যদি কোম্পানীর দোহাই দিয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহা কোম্পানীর দস্তকের একান্ত অপব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। কোম্পানীর দস্তকের এবং ইংরাজ পতাকার অপব্যবহারের ফলে যে প্রচুর রাজস্বের ক্ষতি হইত এবং দেশীয় বণিকগণ ইংরাজ বণিকের নিকট অন্যায় প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত, মীরকাসিমের ন্যায় স্বাধীনচেতা, সমদর্শী, প্রজা-পালন নৃপতি তাহা সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না। শুনা যায় যে কোম্পানীর নিতান্ত অধস্তন

* Sir W. W. Hunter—Warren Hastings, p. 27.

কর্ম্মচারী ও দেশীয় গোমস্তাগণকে শুধু জাল দস্তক বিক্রয় করিয়াই মাসে দুই তিন হাজার টাকা অর্জ্জন করিত।

নবাবের অসন্তোষের কারণ যে শুধু ইহাই ছিল তাহা নহে। তখনকার দিনের ইংরাজরা লাভের লোভে অন্ধ হইয়া পড়িয়া এ দেশ যে তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের শাসনাধীন হয় নাই সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে উৎপীড়নে জর্জ্জরিত বঙ্গীয় প্রজাকুলের নীরবে রোদন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। নবাবের ফৌজদারগণ তাহাদের রক্ষার কোনই উপায় বিধান করিতে পারিতেন না। গভর্ণর ভান্সিটার্টকে লিখিত এক পত্রে স্বয়ং মীরকাসিম উদ্ধত ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন—"ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এবং তাঁহাদের গোমস্তাবৃন্দ, কর্ম্মচারীসমূহ এবং দালালগণ দেশের প্রত্যেক জেলাতেই রাজস্ব সংগ্রাহক এবং শাসনকর্ত্তারূপে আচরণ করিতেছে এবং কোম্পানীর পতাকার আবরণের বলে আমার কর্ম্মচারীবৃন্দের হস্ত হইতে রাষ্ট্র শাসনভার ক্রমেই কাড়িয়া লইতেছে। এতদ্ভিন্ন গোমস্তা এবং অপরাপর ভৃত্যবৃন্দ প্রত্যেক জেলাতেই, প্রত্যেক গ্রামেই এবং প্রত্যেক বাজারেই তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, ধান্য, সুপারি এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা করিতেছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই কোম্পানীর এক এক দস্তক হাতে লইয়া নিজেকে কোম্পানী হইতে কোনমতেই হীন ভাবিতেছে না।"* গর্ব্বান্ধ এই সকল ইংরাজ কেরাণী-বণিকের বিরুদ্ধে নবাবের রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ দরবারে অভিযোগ পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সকল সাহেবেরা নিজেদের নির্দ্দিষ্ট দরে দেশের অধিবাসীবৃন্দকে তাহাদের নিকট কেনাবেচা করিতে বাধ্য করিত, যাহারা এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইত না তাহাদের কষাঘাতে জর্জ্জরিত করিত এবং দেশের আইন-আদালতের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ব্যতিরেকে নিজেদের কৃত কার্য্যসমূহজনিত ব্যাপারের বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিত।† যে মহাপ্রাণ প্রজাবৎসল নরপতি স্বদেশীয় জমিদারবৃন্দের কৃত-অত্যাচার হইতে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহার পক্ষে স্বদেশের বাণিজ্য নাশ এবং বিদেশী বণিক কর্ত্তৃক তাঁহার নিরীহ প্রজাকুলের প্রতি অত্যাচার নির্ব্বিকারচিত্তে দর্শন এবং তাহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা যে একেবারেই সম্ভব ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাতেই বন্ধু-বিচ্ছেদের সূত্রপাৎ এবং মীরকাসিমের সর্ব্বনাশ হইল।

ভান্সিটার্ট এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস ভিন্ন আর সকলেই ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিদিগের অবাধ বাণিজ্যের স্বপক্ষে ছিলেন। কারণ ইহাতে সকলকারই লাভের সংশ্রব ছিল। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ বারম্বার নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াও তাঁহাদের কর্ম্মচারিদের এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। মীরকাসিম দেশের রাজা। তিনি তাঁহার প্রজাপুঞ্জের হাহাকার এবং অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বাহুবলে ইংরাজদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেন, উৎপীড়নকারিদিগকে কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। কিন্তু এ সকল কিছু না করিয়া প্রতিকারলাভের আশায় তিনি প্রথমটায় কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হইলেন। গভর্ণর ভান্সিটার্ট অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ভার বিখ্যাত ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের প্রতি অর্পণ করিলেন। নানা স্থানে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া হেষ্টিংস যে রিপোর্ট দিলেন তাহাতে সকল কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাটনা যাইবার পথে হেষ্টিংস স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন গভর্ণরকে জানাইলেন। হেষ্টিংস দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে গঙ্গায় যত নৌকা সকল হইতেই কোম্পানীর পতাকা উড়িতেছে। তীরেও নানাস্থানে, যেখানেই গ্রাম, হাট বা গুদাম আছে, সেখানেই কোম্পানীর পতাকা বাতাসে উড্ডীয়মান রহিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই তিনি দেখিলেন দোকানপসার বন্ধ এবং ইংরাজ বণিককুল এবং তাহাদের অনুচরবর্গের হস্তে নূতন নূতন আদায়ের ভয়ে অধিবাসিগণ পলাতক। হেষ্টিংস নিজ পরিদর্শন-লব্ধ জ্ঞানের বলে বুঝিলেন যে তাঁহার স্বদেশবাসিগণের অনুষ্ঠিত বে-আইনি কার্য্যাবলী "নবাবের রাজস্ব, দেশের শান্তি অথবা আমাদের জাতির সম্মান ও সুনাম এ সকলই নষ্ট করিতেছে।"

Mill—British India Bk IV, Ch. V.
Hunter—Hastings, p. 29.

* Gleig—Warren Hastings, Vol. I.

হেষ্টিংসকে পাঠাবার ভান্সিটার্টের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। পাটনার ইংরাজ কুঠিয়াল বদমেজাজী এলিস সাহেবের আত্মম্ভরিতার জন্য নবাবের সহিত ইংরাজদের যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বিদূরিত করাই তাঁহার অন্য অভিপ্রায় ছিল। এই অবস্থাসৃষ্টির জন্য এলিসই সর্ব্বাংশে দায়ী। কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য হে সাহেবের চালানী আফিং বিনাশুল্কে যাইতে না দিয়া আটক করা অপরাধে মনসারাম নামক নবাবের একজন কর্ম্মচারীকে বন্দী করিবার ও শাস্তি দিবার তিনি চেষ্টা করেন। অতঃপর খোজা আণ্টুন নামক নবাবের আর একজন কর্ম্মচারী ইংরাজ কোম্পানার অনুমতি না লইয়া সেনাদলের প্রয়োজনীয় বারুদ প্রস্তুতের অন্যতম উপাদান সোরা ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অজুহাতে এলিস তাঁহাকে বন্দী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ইহার পর ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মুঙ্গেরে দুইজন ইংরাজ পলাতক সেনার সন্ধানে তিনি এক সেনাদল প্রেরণ করিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ ইংরাজসেনাদলকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না দিলেও যথেষ্ট ভদ্রতার সহিতই দুইজন সামরিক কর্ম্মচারীকে তাঁহার সহিত আসিয়া দুর্গমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে আমন্ত্রণ করিলেন। ইহাতে এলিসের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। তিনি নিজেকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। মুঙ্গেরে অবস্থিত সেনাদলের নিকট দুর্গ অবরোধের আদেশ গেল! মীরকাসিম ইহাতেও অধীর হইলেন না। তিনি নিজে প্রতিকারের উপায় হস্তে না লইয়া কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষকে সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে এলিসও কলিকাতায় সকল কথা জানাইয়াছিলেন। ভান্সিটার্টের অনুরোধে হেষ্টিংস আবার রওনা হইলেন। সাসারামে আসিয়া তিনি নবাবের সাক্ষাৎ পাইলেন। নবাব হেষ্টিংসের সমভিব্যাহারী ইংরাজ সেনানীবৃন্দকে মুঙ্গের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পলাতক সৈনিকদের অনুসন্ধান করিবার অনুমতি দিলেন। মুঙ্গের হইতে এলিসপ্রেরিত সেনাদল পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

হেষ্টিংস কলিকাতার দরবারে লিখিলেন যে নবাবের ক্ষমতা এবং ইংরাজ কোম্পানীর অধিকার এতদুভয়ের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা স্থাপন একান্ত আবশ্যক; নচেৎ ভবিষ্যতে আবার বিরোধ আরম্ভ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। হেষ্টিংস এতদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যে বিধিব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন, নবাব সানন্দে তাহাতে তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের সহকর্ম্মীবর্গ তাহাতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা সুস্পষ্টই বলিলেন যে ইংরাজ জাতির পক্ষে এরূপ সর্ত্ত স্থাপন যে শুধুই অসম্মানকর এরূপ নহে, উহাতে কোম্পানীরও সমূহ আর্থিক লোকসান। অগত্যা তিনমাস কাল বৃথা চেষ্টার পর হেষ্টিংস কলিকাতায় ফিরিলেন। এই অসাফল্যের জন্য ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস কোনমতেই দায়ী নহেন। কলিকাতার কাউন্সিল তখন সুস্পষ্টই যুদ্ধ চাহিতেছিলেন। নবেম্বর মাসে আর একবার মীমাংসার চেষ্টার জন্য গভর্ণর ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস মীরকাসিমের সহিত সাক্ষাৎমানসে মুঙ্গেরে আগমন করিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গভর্ণর প্রস্তাব করিলেন কোম্পানী ব্যতীত অপর কাহারও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার থাকিবে না; যাহাতে জাল দস্তক বা এক দস্তকই পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত না হয় তজ্জন্য ইংরাজ গোমস্তা ও নবাবের কর্ম্মচারী উভয়ের স্বাক্ষর ব্যতিরেকে কোন দস্তক গৃহীত হইবে না; এবং সাধারণ ইংরাজ বণিক মাল খরিদের স্থানে কেনা দামের উপর শতকরা নয় টাকা হারে শুল্ক দিবেন। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য এই সামান্য ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হইল না। সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এই সামান্য আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিবার প্রস্তাবে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস নবাবের নিকট যে যে সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন ঘোরতর বাগবিতণ্ডা কোলাহলের মধ্যে কলিকাতা কাউন্সিল তাহা নামঞ্জুর করিলেন।

"তখন মীরকাসিম দেশীয় বাণিজ্য রক্ষার্থ সকল প্রকার প্রভেদ উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য শুল্ক আপাততঃ দুই বৎসরের জন্য রহিত করিয়া দিলেন। এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্র ৫ই মার্চ্চ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। ঐতিহাসিক

প্রবর ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সত্যই বলিয়াছেন "ইহার প্রতি ছত্রে কাসিম আলির প্রকৃত চরিত্র পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজের সহিত কলহে লিপ্ত হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইবার আশঙ্কা আছে; এখনও প্রকাশ্য কলহে লিপ্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই:—এই বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন।"* যে অন্যায় বাণিজ্যনীতি সকল প্রকার জালজুয়াচুরী, অন্যায় অত্যাচার প্রশ্রয় দিত এবং নবাবের ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিত এবং একদল স্বার্থলোলুপ, অর্থগৃধ্নু বিদেশীর কল্যাণকল্পে দেশের লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল, দেশের রাজা তাহার প্রতিবিধানের জন্য যখন তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিলেন এবং নিজের প্রজাদের তাহাদের সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিযোগিদের সহিত সমপর্য্যায়ে স্থাপন করিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরাজ মহলে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর আন্দোলন আরম্ভ হইল। বৃথাই ভান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস তাহাদিগকে দেশের অধিবাসিদের নিজদেশে সুদূর পশ্চিম হইতে সমাগত বিদেশীদের নির্দ্ধারিত সর্ত্তে বাণিজ্য করিবার অযৌক্তিকতা বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। কলিকাতার কাউন্সিল মীরকাশিমকে তাঁহার ভাগ্যনির্দ্ধাতাদের বিরোধাচরণের পূর্ণফল প্রদানে সমুদ্যত হইলেন। ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কাউন্সিলের দুইজন সদস্য হে এবং আমিয়াট সাহেব নবাবকে তাঁহার ঘোষণাপত্র প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। এ দিকে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। সমস্ত কুঠির কর্ত্তাদের এবং সেনাদলের অধ্যক্ষদের নিকট যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার আদেশ গেল। কোন্ সেনাপতি কোন্ পথে যাত্রা করিবেন, কোথায় সেনাদল সমবেত হইবে এ সকল ব্যাপারও এই সময়, অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার বহুপূর্ব্বে এমন কি হে ও আমিয়টের দৌত্যকার্য্য সমাধা হইবার পূর্ব্বেই, স্থির হইয়া গেল।

মীরকাসিম বিপদের গুরুত্ব বুঝিলেন। তথাপি তিনি ইংরাজ দূতদ্বয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি যদি দেশের সর্ব্বনাশে উদাসীন হইয়া নিজ সিংহাসন ও নিজ প্রাণরক্ষায় ব্যাকুল হইতেন তাহা হইলে এ সময়েও তিনি ইংরাজের সহিত বিবাদে লিপ্ত না হইয়া তাহাদের অপছন্দকর ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করিতেন। কিন্তু মীরকাশিম মীরজাফর ছিলেন না। তিনি দেশের মঙ্গল চাহিতেন। কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া নিজ প্রাণ এবং সিংহাসন রক্ষা করিতে তিনি চাহিলেন না। এলিস সাহেবের ঔদ্ধত্য দিন দিন সীমা অতিক্রম করিতেছিল। তাহাতেও তিনি অবিচল রহিলেন। দুর্দ্দান্ত ইংরাজ কুঠিয়ালকে নিজে শাস্তি না দিয়া তিনি কলিকাতার দরবারের নিকট প্রতীকারপ্রার্থী হইলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসেও তিনি গভর্ণর ভান্সিটার্টকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন,—আমি কিরূপে আপনাদের সহিত প্রতারণা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি? মীরজাফর খাঁর রাজকোষের দুই বা তিন ক্রোর টাকা আমি গ্রাস করি নাই। কলিকাতার এক বিঘা জমিও আমি আত্মসাৎ করি নাই; অথবা আপনাদের গোমস্তাদের আমি কারারুদ্ধ করি নাই। মীরজাফর খাঁর কৃত ঋণসমূহ কি আমি পরিশোধ করি নাই? তাঁহার সেনাদলের বক্রীবেতন পরিশোধ কি আমি আপনাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া করিয়াছি, অথবা কোম্পানীর ফৌজের ব্যয়নির্ব্বাহভার আপনাদিগের প্রতি অর্পণ করিয়াছি? আমি আপনাদিগকে যে জনপদ প্রদান করিয়াছি তাহার আয় প্রায় এক ক্রোর হইবে। নিজামতের মসনদে দুই তিন মাস পরে অপর একজনকে আপনারা বসাইবেন বলিয়াই কি এতসব আমি করিলাম?"

বাস্তবিক ইংরাজের সহিত ব্যবহারে মীরকাশিম যে স্বদেশ ও স্বজাতি হিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন, যে রাজোচিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। নিরপেক্ষভাবে বিচারে বসিয়া ইংরাজ লেখকরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে নবাবের কোন অপরাধ ছিল না, তদানীন্তন ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষরাই প্রধান অপরাধী এবং যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল এলিস্ সাহেবের হঠকারিতা এবং অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই। এ যুগের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া জেমস্ মিল্ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "The conduct of the Company's servants upon

* মীরকাশিম—১২৭

this occasion furnishes one of the most remarkable instances upon record of the power of interest to extinguish all sense of justice and even of shame. They had hitherto insisted contrary to all right and all precedent that the Government of the country should except their goods from duty. They now insisted that it should impose duties upon the goods of all other traders, and assumed it as guilty of a breach of peace towards the English nation, because it proposed to remit them."—History of British India, vol III, p. 337

আর একজন বিখ্যাত লেখক, কর্ণেল ম্যালিসন, যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা গেল। "In a short time Mirkasim came to hate the English with all the intensity of a bitter and brooding hatred. He had full reason to do so; for the annals of no nation contain records of conduct more unworthy, more mean, and more disgraceful than that which characterised the English Government of Calcutta during the three years which followed the removal of Mirjaffar."

মীরকাশিমের জীবনের গুরুতর কলঙ্ক পাটনার নিরস্ত্র ইংরাজ বন্দীগণের হত্যাকাণ্ড। তদ্ভিন্ন তাঁহার দোষের আর কিছু নাই। কিন্তু কি অবস্থায় তিনি বন্দীগণকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন এ প্রসঙ্গে সে কথাও বিচার করা প্রয়োজন। চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া মর্ম্মাহত, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বারম্বার রণক্ষেত্রে পরাজিত, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাজধানী শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতে দেখিয়া ব্যথিত, ক্ষিপ্তপ্রায় নবাব তাঁহার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রিবর্গ ও ওমরাহমণ্ডলীর এবং বন্দী ইংরাজগণের হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন। মীরকাসিম যে যুগের লোক তখনকার দিনে এরূপ আদেশ নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া নিরস্ত্র বন্দীগণের হত্যাকাণ্ড কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। পাটনার হত্যাকাণ্ডের জন্যই সুধু মহাপ্রাণ মীরকাসিমের বীরচরিত্র কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এলিস্ সাহেবের হঠকারিতার জন্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলেও তজ্জন্য এলিস্ একা দায়ী নহেন। তিনি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া পাটনার দুর্গ আক্রমণের সুযোগে রহিলেন। পাটনার দুর্গে অধিক সৈন্য ছিলনা। অবস্থা বুঝিয়া মীরকাসিম পাটনায় তাঁহার সেনাবল বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে মার্কারকে তথায় প্রেরণ করিলেন। মার্কারের সেনাদল আসিয়া পঁহুছিলে দুর্গ হস্তগত করা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া এলিস্ সাহেব তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই পাটনা অধিকারের চেষ্টা করিয়া প্রথম যুদ্ধ বাধাইলেন। ২৪শে জুন নৈশযুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণে তিনি নগর অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইলেও দুর্গ অধিকারে সক্ষম হইলেন না। নবাবীসেনার অধিনায়ক লালসিংহ বীরবিক্রমে দুর্গরক্ষা করিয়া এলিসের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এদিকে মার্কারের সেনাদল আসিয়া পঁহুছিল। তখন নবাবীসেনা পাটনা পুনরুদ্ধার করিয়া ইংরাজগণকে বন্দী করিল। মার্কার ইংরাজকুঠি অবরোধ করিলে ২৯শে জুন রাত্রিকালে অন্ধকারে অনেক ইংরাজ গঙ্গাপার হইয়া ছাপরার দিকে পলায়ন করিয়াছিল। মার্কার ইহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য তাঁহার সহকারী সেনানী ওয়াল্টার রীর্ণহার্ড বা সমরুকে প্রেরণ করেন। ১লা জুলাই ছাপরার অদূরে মাঁঝি নামক স্থানে সমরু পলাতক ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। কয়েকজন ইংরাজ নিহত হইলে পরে অবশিষ্ট যাহারা থাকে আত্মসমর্পণ করে এবং বন্দীভাবে মুঙ্গেরে প্রেরিত হয়।

অতঃপর সমরানল ভীষণভাবেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে মীরকাসিমের সর্ব্বনাশ হইল, আবার মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব হইলেন। মীরকাসিমের পতন সিরাজের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই ঘটিয়াছিল। সেই ইংরাজ, সেই মীরজাফর, সেই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, সেনাপতি এবং

ওমরাহমণ্ডলী। কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালায় পলাশীর মতই যুদ্ধের অভিনয় হইয়াছিল। পলাশীতে মীরমদন এবং কাটোয়ায় (১৯শে জুলাই ১৭৬৩) মহম্মদ তকী—উভয়ের একমাত্র কর্ম্মঠ, প্রভুভক্ত, সেনাপতি উঁহাদেরই দুর্ভাগ্যক্রমে অদৃষ্টবৈগুণ্যে যুদ্ধের প্রারম্ভে নিহত হইয়াছিলেন। তাহার পর গিরিয়ায় আবার যুদ্ধ হইল (২রা আগষ্ট ১৭৬৩)। এই যুদ্ধে নবাবের মুসলমান সেনাপতিগণ যে প্রকার বীরত্ব ও সমরকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, মার্কার ও সমরু তদনুরূপ কিছুই করেন নাই। আসাদউদ্দৌলা, বদরুদ্দীন, মীর নসীর প্রমুখ বীরগণ যখন অমিতবিক্রম আক্রমণে ইংরাজসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন তখন মার্কার ও সমরু রণক্ষেত্রের অন্য প্রান্তে তাঁহাদের সম্মুখীন শত্রুসেনাকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলে যুদ্ধের ফলাফল হয়ত অন্যভাবে লিখিত হইত।

তাহার পর উধুয়ানালার যুদ্ধ। একজন বিশ্বাসঘাতক নবাবী সেনা গুপ্তপথের সন্ধান দেওয়াতেই যে অতর্কিত আক্রমণে ইংরাজ সেনাপতি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সে কথা তাঁহার স্বদেশীয় ঐতিহাসিকই লিখিয়া গিয়াছেন (Scott's History of Bengal)। গ্রেগরী ও মার্কারের ষড়যন্ত্রেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। উক্ত দুই আর্ম্মানী সেনাপতিদ্বয় মীরজাফর প্রদত্ত অর্থে বশীভূত হইয়া প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অতর্কিত নৈশআক্রমণে সুপ্তোত্থিত নবাবীসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া দুর্গের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া যখন পলায়ন করিতেছিল তখন এই দুই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি নিজ অধীনস্থ সেনাদের উহাদের উপর গোলাবর্ষণের আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এইরূপে স্বপক্ষের বলক্ষয় করিয়া এবং শত্রুর করে দুর্গসমর্পণ করিয়া গ্রেগরী ও মার্কার উধুয়ানালা হইতে পশ্চাৎপদ হইলেন।

মীরকাসিমের সেনাবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা, নবাবের সাতিশয় বিশ্বাসের পাত্র আরাটুন গ্রেগরী যে সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই তাহা নানারূপে জানা গিয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা, ইংরাজের পরমশুভানুধ্যায়ী খোজা পিক্রর সাহায্যে ইংরাজ সেনাপতি মেজর এডামস্ গ্রেগরী ও মার্কারকে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এই কারণেই গ্রেগরী মীরকাসিমের অনুচর হইয়াও কর্ত্তব্যপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিশেষে মীরকাসিম তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন এবং এ কারণ তাঁহার আদেশে নিজ দেহরক্ষী সৈন্যদলের হস্তে গ্রেগরী বা গুর্গিণ খাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে। গ্রেগরীর মৃত্যুর পর খোজা পিক্রু ইংরাজ দরবারে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে জানা যায় যে উধুয়ানালা যুদ্ধের প্রাক্কালে মেজর এডামসের আদেশে তিনি গ্রেগরী ও মার্কারকে স্বতন্ত্র দুই পত্র লিখিয়াছিলেন। স্বয়ং মেজর এডামস কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষকে গ্রেগরীর হত্যাসংবাদ দিয়া যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতেও ইংরাজের সহিত সৌহার্দ্দ্যসম্পন্ন বলিয়া মীরকাসিমের আদেশে যে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। পাটনার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকেই মনে ভাবিয়াছিলেন যে গ্রেগরী জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ তাহা বন্ধ করিতে পারিতেন।*

এবার শ্বেভালিয়ে কর্ণেল জিয়ঁ বাপতিস্ত জোসেফ জেন্টিলের (১৭২৬—১৭৯৯) কথা বলা যাইতেছে। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে ইঁহার জন্ম হয়। নিতান্ত অল্পবয়সে ফরাসী নৌবিভাগে প্রবেশ করিয়া কয়েক বৎসর পরে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই যুগের ইঙ্গ-ফরাসী সমরের অনেক যুদ্ধেই বুসী ও লালীর অধীনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। লালীর পর দক্ষিণ ভারতে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশা বিলুপ্ত দেখিয়া যে সকল ফরাসী ভাগ্যান্বেষী বঙ্গদেশে আগমন করে, জেন্টিল তাহাদের অন্যতম। কিছুকাল উজীর গাজিউদ্দীন এবং তৎপরে কিছুকাল মারাঠাদের অধীনে কর্ম্ম করিবার পর জেন্টিল ইংরাজের প্রতিপক্ষতা করিতে পাইবার উদ্দেশ্যে মীরকাসিমের সেনাদলে প্রবেশ করেন। মীরকাসিমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় লন। বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলার পরাজয়ের পর কিছু কালের জন্য তিনি সাহ আলমের সেনাদলে প্রবেশ করেন। কিন্তু পর

* Long—Selections from Documents Vol. I. Pp 333, 339.

বৎসর আবার তিনি সুজাউদ্দৌলার দরবারে ফরাসী কোম্পানীর রেসিডেন্ট বা প্রতিনিধিরূপে আগমন করেন। নামে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হইলেও কার্য্যতঃ তিনি ছিলেন অযোধ্যার নবাবের সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শদাতা; এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, রাজনীতিজ্ঞান এবং সামরিক অভিজ্ঞতার বলে তিনি উক্তরাজ্যের আয়ুষ্কাল অনেকটাই বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিবার পর জেন্টিল স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাৎকালীন ফরাসীরাজ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হন। লুই তাঁহাকে শ্যেভালিয়ে বা নাইট শ্রেণীভুক্ত করেন এবং ফরাসী-সেনাবিভাগে কর্ণেল পদ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত জেন্টিলের জন্য তিনি একটি বিশেষ পেন্সনেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফরাসীবিপ্লব কালে ঐ পেন্সন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শেষজীবনে জেন্টিলকে বড় কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল এবং একরূপ নিঃস্ব অবস্থাতেই ঘোর অনটনের মধ্যে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

সাধারণ ভবঘুরে সৈনিকগণ অপেক্ষা জেন্টিল শিক্ষাদীক্ষায় অনেকটাই উন্নত এবং মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার লেখাপড়ার চর্চ্চা বেশ ছিল এবং সৈনিকজীবনের কর্ম্মাবসরে তিনি ভারতবর্ষের একটী ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত উক্ত গ্রন্থের নাম "Abrégé Historique des Souverains de l' Indosthan, on Empire Mougol" অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সম্রাটগণের বা মোগল সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ফারসী ভাষায় মোগল সম্রাটগণ সম্বন্ধে রচিত যে সকল ইতিবৃত্ত দেখা যায় তদবলম্বনে, প্রধানতঃ ফেরিস্তার গ্রন্থ এবং মুন্সী সুজনরায় লিখিত ইতিহাসের সারসঙ্কলন, জেন্টিল নিজ ফারসী ও উর্দ্দু ভাষাবিৎ মুন্সীর সাহায্যে করিয়াছিলেন। বইখানি তিনি ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লুইকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি কিন্তু পুস্তকাকারে মুদ্রিত বা সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। পারী নগরীর জাতীয় গ্রন্থাগারের হস্তলিখিত পুঁথি-বিভাগে ইহার মূল পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে—উহার তালিকা সংখ্যা এক্ষণে Francais 24219 বলিয়া জানা গিয়াছে।

জেন্টিলের চিত্র সংগ্রহেরও বাতিক ছিল। এদেশে বাসকালে তিনি বহু সংখ্যক রাজপুত এবং মোগলচিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের চিত্রসংগ্রহ ও স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সেগুলি যথাস্থানে সমাবেশ দ্বারা জেন্টিল তাঁহার পাণ্ডুলিপিটী সচিত্র করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধের মোগলচিত্রের ঐগুলি সুন্দর নিদর্শন। জেন্টিলের সংগৃহীত চিত্রগুলি এক্ষণে পারীনগরীর উক্ত গ্রন্থাগারের চিত্রকলাবিভাগে সংরক্ষিত। Mon. E. Blochet-এর গ্রন্থমধ্যে এগুলির পরিচয় এবং কয়েকটী চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক উক্ত লেখকের গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বসন্ত-বিদায়

শ্রীযুক্ত অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

নদীটি এঁকে বেঁকে চ'লে গেচে। নদীর সবটা ভরাই বালি, শুধু একধার দিয়ে একটি ক্ষীণ স্বচ্ছ অগভীর স্রোত ব'য়ে চ'লেচে—একটা লাজুক মেয়ের মত। নদীর মাঝে মাঝে পাথর দাঁড়িয়ে আছে যেন ওরি পথ আগ্‌লে। নিঃশব্দে সন্তর্পণে সে ব'য়ে চ'লেচে, জায়গায় জায়গায় পাথর দলের স্পর্শে এসে একটু আবেশ-চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে, সেখানে ওর মৃদু গুঞ্জরণ শোনা যায়।

ওপারে শালের বন। গাছগুলির পাতা ঝরার অবস্থা। বনের ওপারে দূরে ছোট পাহাড়ের একটি সারি। প্রত্যহ তারি পাশ দিয়ে দিনের শেষ রশ্মিটুকু নিভে যায়।

এপারে লাল মাটির পরে ছোট সুন্দর সাজানো সহর—একখানা ছবির মতন্। সহরের ঘন সন্নিবেশ আরো দূরে, একেবারে নদীর তীরে ফাঁকা ফাঁকা কয়েকখানা ছোট বাড়ী, মাঝে মাঝে দু'চারটা গাছ একখানিকে আরেকখানির কতকটা আড়াল ক'রে রাখে।

সব শেষের বাড়ীখানা।

কতকগুলি ইউক্যালিপ্‌টাসের পাতা দু'হাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে আশা বল্‌ল, আচ্ছা মা, রমেশদা'দের আস্‌বার দিন কবে? পরশুই তো বুঝি, না?

মা বিছানা ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে উত্তর ক'রলেন, হঁ্যা, তাই তো লিখেচে চিঠিতে।

আশা জিজ্ঞেস করল, মাত্র এক মাসের ছুটিতে আস্‌চেন রমেশ-দা, না মা?

মা বল্‌লেন, হঁ্যা।

আচ্ছা, দিলীপও বুঝি রমেশদার মতন্‌ই দেখ্‌তে হ'য়েচে? আচ্ছা, বৌদি কেমন লোক?

দিলীপ বাপের মতন্‌ই হ'য়েচে বটে। ইন্দু? তা' ক'দিনই বা ওকে দেখ্‌লুম, মন্দ নয় হয় তো।

কিছুকাল আগেকার কথা। এই সহরেই হাওয়া পরিবর্ত্তন ক'রতে এসে দুটি পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে পড়ে। আশা ছিল ঢাকায় ইডেন্ স্কুলের ছাত্রী আর রমেশ কল্‌কাতায় বি, এ, পড়্‌তো।

এ বাড়ীতে আলোচনা হ'ত, রমেশ ছেলেটী বেশ, সুশ্রী বুদ্ধিমান্—

ও বাড়ীতে আলোচনা হ'ত—আশা মেয়েটী বেশ, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী—

এম্নি ক'রতে ক'রতে দুটী পরিবারেরই একটা গোপন মনোভাব একটা আগ্রহে পরিণত হ'ল—রমেশের সাথে আশার বিয়ে দিতে হবে। এবং এ সব কথা রমেশ ও আশারও অজানা ছিল না।

যখন চোখচোখি হ'ত, রমেশ আশার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কে হাস্‌ত, আশাও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিত একটু দুষ্টু হাসি।

রমেশের ঘরে ঢুকে পেছন থেকে তার চোখ্ দুটি চেপে ধ'রে আশা বল্‌ত, বলুন্ তো রমেশদা, আমি কে? হাত ছেড়ে দিয়ে আবার বল্‌ত, সেই ছবিটা এঁকে দিতে হবে—মনে আছে তো?

রমেশ চট্ ক'রে ওর হাত ধ'রে বল্‌ত, আছে, আছে।

হঁ্যা, আরেকটী কথা, আজ কিন্তু রাত্রে ঐ গানটা দু'বার বাজাতে হবে—"রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে…"

বাঃ, এস্রাজটা তো তুমিই নিয়ে রেখেচ! কেমন ক'রে বাজাবো?

আচ্ছা, গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আশা ঘাড়টা বাঁকিয়ে হাসিমুখে চ'লে যেত। রমেশ মুগ্ধচোখে চেয়ে রইত ওর যাওয়ার সুন্দর লীলায়িত ভঙ্গীটির দিকে।

তা'র পরের কথা।

আশার মাঝে মাঝে হচ্ছিল একটু একটু জর, সামান্য রোগাও হ'য়ে গিয়েছিল—কখনো কখনো একটু কাশীও হ'ত। কেউ গ্রাহ্যও করেনি। নিজেও সে কিছু বুঝ্‌তো না। মহানন্দে সমস্ত ছুটিটা ওখানে কাটিয়ে ফিরে এসে আবার স্কুলের চক্রে নিজেকে বেঁধে ফেল্‌লে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই একটু বাড়াবাড়ি এবং হঠাৎ একদিন থুতুর সাথে রক্তের ছিট্ হ'য়ে উঠ্‌ল ডাক্তারকে দিয়ে ওকে পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে ব'ল্লেন, কোনো স্যানাটোরিয়ামে সময় থাক্‌তে নিয়ে যান্, এখনো তত্‌দূর এগোয়নি।

আশা সিম্‌লা পাহাড়ে একটা স্যানাটোরিয়ামে চ'লে গেল।

রমেশ ওকে লিখ্‌তো, লক্ষীটি, মন খারাপ ক'রোনা, শীগ্‌গিরই সেরে যাবে। আর চিঠি লিখ্‌তে দেরী ক'রলে এমন শাস্তি পাবে···

আশা উত্তর দিত, আচ্ছা মশাই, আমি এত মন খারাপ করি না। দেব দেরি ক'রে চিঠি, বেশ ক'র্‌বো। কি শাস্তি পাবো শুনি ?···

মায়া ছিল আশারই সমবয়সী, পাশের কটেজের পেসেণ্ট। দুটীতে ভারি বন্ধুত্ব হ'য়ে উঠেছিল। মায়া দুটো চিঠিই কেড়ে নিয়ে প'ড়্‌তো।

আঃ কি যে জালাতন করিস্ আশা রুখে উঠ্‌তো।

মায়া ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ত, ইস্ একেবারে যে···

ছাখ্, ফের ইয়ারকি ক'র্‌বিত······আশা ওর হাতে জোরে একটা চিম্‌টি লাগিয়ে দিত।

সর্ব্ব শেষ ঘটনা।

আশার অসুখের কথা প্রচার হ'য়ে গেল খুব। বন্ধুজনে ব'ল্‌লেন, কঠিন ব্যাধি···সারে না······

রমেশের বুকে কিছুদিন আন্দোলন চ'ল্‌ল। রমেশের মা ব'ল্লেন, বিভূতিবাবুর সাথে ওঁর কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, আর ইন্দু মেয়েটিও···

তরুণ মন, যৌবনের আবেগে উচ্ছল। কল্পনায় নিত্য নূতন স্বপ্ন গ'ড়ে ওঠে। একটা কিছুকেই বিশেষভাবে মিছে আঁক্‌ড়ে ধ'রে প'ড়ে থাক্‌তে চায় না।

ইন্দুর বাবা ডাক্তার বিভূতিবাবুকে কথা দেয়া হ'ল। রমেশের সাথে ইন্দুর বিয়ে হ'য়ে গেল।

স্যানাটোরিয়ামেই আশা এ খবর পেল, কিন্তু নীরবে এই দুঃখ ও অপমান সে সহ্য ক'রে নিলে।

দূর ছায়ার মতন্ আগেকার দিনগুলি চোখের সাম্নে ভেসে আসে। একটা সুন্দর, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। লেখা-পড়ায় ভালো, স্বভাবে ব্যবহারে ভদ্র, নম্র। শিক্ষয়িত্রীরা প্রশংসা ক'রে ব'ল্‌তেন, আশা মানুষ হবে। অন্যের প্রশংসা দিয়ে নিজেকে বেশী উঁচুতে দেখায় ওর ছিল একটা গোপন সঙ্কোচ, কিন্তু নিজেকে বেশী ছোট ক'রেও ও যেন ভাব্‌তে পার্‌তো না। হ'তেই তো হবে মানুষ! সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, একঘেয়ে জীবন-যাত্রার মাঝখান থেকে ওর সুদূরের পিয়াসী মন চ'লে যেত মুক্ত আকাশ বেয়ে কোন এক নূতন আলোকের সন্ধানে।

রমণার মাঠে দল ধ'রে বেড়াতে বার হ'ত। সঙ্গিনীদের ভেতরে কারো সাধ মস্ত ডাক্তার হবে, কারো সাধ বড় একজন প্রফেসার হবে, কেউ হ'তে চাইত বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ শিল্পী। কেউ ব'ল্‌ত—নাঃ বিলেতটা একবার ঘুরে আস্‌তেই হবে যে ক'রেই হোক্—কেউ ব'লত দেশের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেব!

সবাই চায় দশের মাঝে বিশিষ্ট হ'তে, যা'র যা'র নিজের নতুন জীবনের মধুর স্বপ্নে সবাই বিভোর!

তাদের কেউ কেউ ওকে চিঠিপত্র লেখে, ও মনের ভেতর কোথায় যেন একটা তীব্র বেদনা অনুভব করে। ডাক্তার ব'লেছে কয়েক বছর সাবধানে থাক্‌লেই ভালো হ'য়ে যাবে। মন তা'তে সায় দিতে চায় না। ওর জীবনের কতটুকু ভরসা! এই তো সেদিন মায়া লিখেচে তা'র অসুখ বড় বেড়ে প'ড়েচে, নড়াচড়া ক'র্‌তেও কষ্ট হয়! ওদের ঘরের কিছুদূরেই একটি ওয়ার্ডের একটি ছেলের মৃত্যুর কথা লিখেচে, স্যানাটোরিয়ামেই মারা গেচে। হৃষ্টপুষ্ট, ফর্সা সুন্দর চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল···ওদের ঘরের সাম্নে দিয়েই রোজ সকালে বেড়াতে বে'র হ'ত······

আশা!

আশা চ'ম্‌কে পেছন ফিরে চাইল।

ভালো আছো তো!······

একটু সাম্‌লে নিয়ে আশা বল্‌লে, আসুন রমেশদা, সকালের গাড়ীতেই এলেন বুঝি? আসুন, মা ওঘরে আছে।

তুমি কেমন আছো, তা' তো বল্‌লে না? রমেশ একটু হেসে জিজ্ঞেস করলে।

আশা উত্তর দিলে, আমি? ভালোই আছি আজকাল। আপনি?

রমেশের গলার স্বর পেয়ে মা নিজেই আসছিলেন। কাছে এলে রমেশ প্রণাম ক'রল। মা কুশল জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, কথাবার্ত্তার পরে বললেন, সব সময়ে এসো কিন্তু। ইন্দু এলোনা?

বাসার সমস্ত অগোছাল, রমেশ বেশীক্ষণ থাকতে পার্‌লো না, অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ব'লে চ'লে গেল।

পরদিন ইন্দু আস্‌তেই আশা তা'র হাত ধ'রে বলল, কি ভাই বৌদি, কা'ল যে এলে না বড়? এই বুঝি দিলু?

দিলুকে কাছে টেনে বলল, পালাচ্ছো যে মায়ের পেছনে? এসো শীগ্‌গীর আমার কাছে।

আশার মুখটা ক্ষণেকের জন্যে একটু আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। মা ব'ল্লেন, একেবারে রমেশের চেহারা পেয়েছে।

ইন্দু জিজ্ঞেস্ করলে, আপনি কেমন আছেন?

ওমা, আপনি! কথাটাকে 'তুমি' দিয়ে ঘুরিয়ে বল, তবে উত্তর দেবো।

ইন্দু হেসে ফেল্‌ল। আচ্ছা ভাই, কেমন আছ বল।

যাবার সময়ে আশা দিলুকে কিছু খাওয়ানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু ইন্দু বারবার বাধা দিয়ে বলল, না ভাই, আর ওকে এখন কিছু দিও না, বাড়ী থেকে এই মাত্তর খেয়ে আস্‌চে······

দিলুর গাল দুটী টিপে ধ'রে আশা বল্‌লে, আস্‌বে ত আবার কা'লকে?

ঘাড় নেড়ে দিলীপ জানাল হ্যাঁ, আস্‌বে।

রমেশ ও আশা বেড়াতে বে'র হয়েছিল।

এত পাশাপাশি, এমন কাছাকাছি, তবুও আজকে কত দূরে! আশার মুখখানা চলতে চলতে বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে।

রমেশ বল্‌লে, আচ্ছা আশা, ডাক্তার তোমার অসুখ সম্বন্ধে কি ব'লেছেন?

আশা রাগের স্বরে উত্তর দেয়, কিছুই বলেন্ নি। খালি অসুখ, অসুখ, অসুখ। আমার অসুখ টসুখ কিছু নেই—যান্।

রমেশ হেসে আশার অত্যন্ত কাছে সরে আসে, —একেবারে গা ঘেসে চ'ল্‌তে থাকে। আস্তে আস্তে এক খানা হাত ধ'রে বলে, বেশ, না থাক্‌লো অসুখ। আচ্ছা, আশা, তোমাকে যদি ধাক্কা দিয়ে পাথরের ওপর ফেলে দি এখন ····

রমেশের স্পর্শে ওর বুকের রক্ত যেন সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। কিছুই ব'ল্‌তে পারে না, শুধু হেসে মুখের দিকে তাকায়। হাতখানা সরিয়ে নেবার ক্ষমতা যেন লুপ্ত হয়ে যায়!

ফের্‌বার পথে আশা বলে, রমেশদা, আজকাল বুঝি আর এস্রাজ টেস্রাজ বাজান্ না? সত্যিই সেই গানটা যে বাজাতেন আমার বড্ড ভালো লাগ্‌তো—'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার······'

তোমার সে কথা মনে আছে এখনো? রমেশ হাসে। বাড়ীর কাছে পৌছে আশা মনে করিয়ে দেয়—দিলুকে নিয়ে কা'ল সকাল সকাল আসবেন কিন্তু··· ···

পরদিন রমেশ দিলীপকে নিয়ে দুপুরের পরেই এলো। সামনেই মা দাঁড়িয়ে ছিলেন, রমেশ তাঁর সাথে কথা ব'লতে লাগ্‌লো আর সেই সুযোগে দিলু আশার ঘরে ঢুকে ডাক দিল, আশা!

আশা শুয়ে শুয়ে একখানা ইংরাজী নভেল পড়্‌ছিল। যে জায়গাটা পড়্‌ছিল সেখানটায় ছিল একটী মেয়ের কথা। তা'র শিশুসন্তানকে চক্রান্ত ক'রে সরিয়ে রাখা হ'য়েচে—তা'কেই পাবার জন্যে বন্দিনী মায়ের কি ব্যাকুলতা, কাতরতা! তারপরে ঘর থেকে দুর্ব্বল, রুগ্ন শরীর নিয়ে পালিয়ে যেখানে তা'র শিশুটীকে রাখা হ'য়েছিল—সেখানে কেমন ক'রে এলো—কেমন ক'রে সন্ধান ক'র্‌তে ক'র্‌তে শিশুটীকে পেয়ে পাগলিনীর মত বুকে চেপে ধ'রে চুমুতে চুমুতে তা'র রাঙা ঠোঁট দুটি ভ'রে দিলে—কেমন হ'য়ে শিশুটীর কচিমুখে ফুটে

উঠ্‌ল শরৎকালের ভোরের আলোর মতন্ একটু সুন্দর স্নিগ্ধ মধুর হাসি……

আশার চোখ জ'লে ভ'রে এলো। ওরো বুকের কোন্ গহন অন্তরালে একটী লুকানো আকাঙ্ক্ষা……

খোলা বইখানা পাশে সরিয়ে রেখে ভেবে সুখ পায়!

দিলুর গলার আওয়াজ শুনে আশা ধড়মড়িয়ে উঠে ব'স্‌লো। কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে, ওমা, এতটুকুন্ ছেলে আমায় নাম ধ'রে ডাকে!

হঠাৎ দিলীপের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সংযত হ'য়ে বল্‌ল, আমাকে আশা ব'লে ডাক্‌বে নাকি' দিলু?

বাঃ, তুমি তো আশাই!

আচ্ছা, তাই-ই ব'লো! দিলুর হাত ধ'রে ঘরের বাইরে এলো—মা যেখানে রমেশের সাথে কথা বল্‌ছিলেন। রমেশ হেসে বল্‌লো, ভারি ভাব হয়ে গেচে দেখ্‌চি!

সেদিন আশা মান্‌লোনা। মা জলখাবার ক'র্‌লেন, রমেশ ও দিলুকে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

কিন্তু ফিরে আস্‌তেই ইন্দু গম্ভীর ভাবে বল্‌লো, দ্যাখো, বাবার কাছে শুনিচি এ অতি বিশ্রী অসুখ—নিঃশেষে বিষ চলে। এতটা মেশামিশি ভালো না। আর তুমি কি ব'লে যে দিলুকে ও বাড়ী খেতে দিলে, ভেবে অবাক্ হচ্চি। একটা কিছু হ'লে তখন চোক্ ফুটবে।

এ অসুখ কেমন হতে পারে তা রমেশের জানা না থাক্‌লেও ইন্দুর এই রূঢ়তা সে পছন্দ ক'র্‌লো না। সে বল্‌লে, যাক্, খাওয়াটা দোষের হ'য়েচে কি কি হ'য়েচে ব'ল্‌তে পারি নে, তবে ওর কাছে একটু গেলেই অম্নি কিছু হ'য়ে প'ড়্‌বে—যত বাজে তোমার কথা।

রমেশ সেদিন কোথায় অন্যদিকে বেড়াতে গিয়েচিল। আশা এসে ডাক্ দিল, বৌদি!

ইন্দু আশাকে ডেকে নিল, কিন্তু মনে মনে যেন তেমন খুসী হ'য়ে উঠ্‌লো না।

অনেকক্ষণ কাটিয়ে, যাবার সময়ে আশা বল্‌লে, ওঃ হ্যাঁ, রমেশদার সাথে ত' দেখা হ'ল না, এই জিনিষটা রমেশদা এলে দিয়ো, ব'ল্‌বে যে আশা তৈরি ক'রেচে—তোমাকে এসে দিয়ে গেল।

কাপড়ের ভাঁজ থেকে সুন্দর দু'খানা এম্‌ব্রয়ডারি করা রুমাল ইন্দুর হাতে দিলে।

রমেশ দিলুকে নিয়ে আশাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল। রমেশ ব'ল্লে, আশা, আরো দুটী ছেলের নদীর ধারে আসবার কথা আছে, ওই পাহাড়ে একটু বেড়াতে যাবো। দিলুকে তোমার কাছে রেখে দাও, যাবার সময়ে নিয়ে যাবো। তুমি কি কোনোদিকে যাবে বেড়াতে?

আশা উত্তর দিলে, না রমেশদা, আজ্‌কে আর কোথাও যাবোনা। শরীরটা তেমন ভালো বোধ হ'চ্চে না।

রমেশ চ'লে যেতেই আশা দিলুকে নিয়ে ঘরের বারাণ্ডায় এসে ব'স্‌ল। ওর সাথে নানান্ গল্প জুড়ে দিল। ওকে আদর ক'রে যেন কিছুতেই ওর তৃপ্তি হয় না! কতগুলি ম্যাগাজিন নিয়ে এসে ছবি দেখাতে লাগ্‌লো, কখনো বা গল্প বল্‌ল—জানো দিলু, ও—ই যে শালবনের ওধারে পাহাড়, ওখানে একদিন একটা বাঘ ·

ভারি বাধ্য হ'য়ে প'ড়্‌ল দিলু ওর।

আশা জিজ্ঞেস কর্‌ল, দিলু, খাবে কিছু? ক্ষিদে পেয়েচে?

দিলু বল্‌লে, না, ক্ষিদে পায়নি। একটু পরেই আস্তে আস্তে বল্‌লে, মা রাগ কর্‌বে।

অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে আশা ব'ল্‌লে, মা রাগ ক'রবে? সেদিন যে খেয়েছিলে, তা'তে, মা কিছু ব'লেছিলো?

হ্যাঁ মা বড্ড ব'কেছিল। আচ্ছা আশা, তোমার কি অসুখ হয়েচে?

আশা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। এই সন্দেহ, ভয় যে তারো একটু একটু না হ'য়েছিল তা' নয় ·· কিন্তু···

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আশা বল্‌লে, আচ্ছা দিলু, সেদিন যে তোমার মায়ের কাছে দু'খানা রুমাল দিয়ে এসেছিলুম, তা' পেয়ে তোমার বাবা কি ব'ল্লেন?

বা'রে, বাবা আবার তা' পেল কোথায়? মা তা' তক্ষুণি পুড়িয়ে ফেলে দিল। আমি চাইলুম, তা···

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশা পাথরের মতন্ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল।

রমেশ এলে জলভরা চোকে আশা বল্লে, রমেশদা, একটা কথা বলি, কিছু মনে কর্‌বেন না। দিলুকে আমরা সেদিন খেতে দিয়েছিলুম, তার জন্যে কি বৌদি ওকে ব'কেচেন? আমার অসুখ তো এখন ভালোই আছে—তা' ছাড়া আপনাকে ত' লিখ তুম আমার স্পিউটাম্ বরাবর নেগেটীভ্, ডাক্তার ব'লেচেন আমার থেকে কারো কোনো···

বাধা দিয়ে রমেশ বল্লে, ধোৎ, তোমার ওসবে কান দেবার কিছু তো নেই···

রমেশ দা, আমারো কাণ্ড জ্ঞান আছে, আপনি কি ভাবেন্···আশা কেঁদে ফেল্‌লে।

ছি—কি ছেলেমানুষ তুমি ··

রমেশ দা, দিলুকে আর এ বাড়ীতে আন্‌তে পার্‌বেন্ না। দৃঢ়স্বরে কথাটী ব'লে আশা ঘরে চ'লে গেল।

সুন্দর জোস্না রাত্রি। সমস্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে চাঁদের হাসি উছ্‌লে প'ড়চে। চৈত্র শেষের একটা উদাস ঝির্‌ঝিরে হাওয়া।

আশা ধীরে ধীরে ছাতের ওপর এসে ব'স্‌লো। ও যেন একটু অবাক্ হ'য়ে ভাবে, চারিদিকে এত পূর্ণতার মাঝখানে ওর অন্তরটা হঠাৎ এমন শূন্য হ'য়ে উঠ্‌লো কেমন ক'রে? সুখী মানুষের কথা শুনেচে, দুঃখী মানুষের কথা শুনেচে, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে—আমি কোন্ দলের?

অতীত দিনগুলির স্মৃতি অত্যন্ত রঙীন হ'য়ে ওঠে। সব চেয়ে বেশী একদিন যা'কে ভালো বেসেছিল, সেই সব চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর হ'য়ে তা'কে সেই ভালোবাসার পুরস্কার দিলে। আজ আর তা'র পরে তো কোনো অধিকারই নেই। তবুও ও তাকে মনে মনে ক্ষমা করে, তারি কল্যাণ কামনায় ওর সমস্ত অন্তর করুণ হ'য়ে ওঠে! জোর ক'রে ভাব্‌তে চেষ্টা করে এই-ই তো বেশ ভালো! অভিমান মুছে ফেলে দিয়ে মনে একটা অহঙ্কার আন্‌তে চায়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন বেদনায় হৃদয় এলিয়ে পড়ে!

পাতাঝরা শালবনের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গুণ গুণ ক'রতে লাগ্‌লো—

"রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে।
আপন রাগে, গোপন রাগে॥
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে,
রঙ্ যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে··

রমেশ দিলুকে নিয়ে আরেকদিন এসেছিল, কিন্তু আশা কঠিন ভাবে ব'লে দিয়েছিল, রমেশদা, আপনিও আর আমাদের বাসায় বেড়াতে আস্‌তে পার্‌বেন্ না।

ইন্দুও অসন্তুষ্টির সুরে ব'ল্‌ত, ছোট ছেলেপিলেকে কক্ষণো ওসব রোগীর কাছে মিশ্‌তে দিতে নেই, এই রকম শুনিচি।

কয়েক দিন দিলু আসেনি। কিন্তু ওর যেন ভালো লাগেনা। একটু দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়। হঠাৎ একদিনের কথা আশার মনে পড়্‌ল, দিলু ওর কোলে মুখ লুকিয়ে রেখে ব'লেছিল, আচ্ছা আশা, আমি তো তোমার কাছে কত আসি, তুমি যাওনা কেন রোজ রোজ আমাদের বাড়ীতে?...

চোখের সাম্নে দিলুর সরল সুন্দর মুখখানা ফুটে ওঠে।

আশা আস্তে আস্তে বিকেলের দিকে বেরিয়ে প'ড়্‌ল রমেশের বাসার দিকেই। কাছাকাছি এসে দেখ্‌ল বাসার সাম্নেই রাস্তার ধারে একটী ছোট গাছে প্রজাপতি এসে ব'সেচে, দিলু তাই ধ'রতে চেষ্টা ক'রচে।

মুখ ফিরিয়ে আশাকে দেখ্‌তে পেয়েই দিলু চীৎকার করে লাফিয়ে এলো—আশা, আশা ··

কিন্তু রাস্তার মোড় দিয়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ী তখন বেগে ছুটে আস্‌ছিল, বারণ ক'রতে ক'রতে দিলু রাস্তায় উঠে এলো। গাড়ীখানাও ঘড়্ ঘড়্ ক'রে এসে প'ড়্‌লো একেবারে সাম্নে!

কি সর্ব্বনাশ··· ওই দুধের ছেলে····· গাড়ী তো আর কিছুতেই সাম্‌লাতে পার্‌বে না......ওই তেজী ঘোড়ার পায়ের নীচে······আশার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো, সে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটে দিলুকে কোলে তুলে রাস্তার ওপর চ'লে এলো, দু'এক·

হাতের জন্যে দিলুর প্রাণ বেঁচে গেল! বুকে চেপে ধ'রে দিলুকে নিয়ে উত্তেজনায় আশা থর থর ক'রে কাঁপছিল। বল্‌লে, দুষ্টু, ছেলে, অমন ক'রে গাড়ীর সাম্‌নে দৌড়ে আসে! দিলু শক্ত ক'রে আশার গলা আঁক্‌ড়ে ধ'র্‌লে।

কি যে ঘটে গেল, সহসা যেন আশার সমস্ত সংযম এক নিমেষে টুটে গেল, দিলুর মুখখানা জোর ক'রে তুলে তৃষিত ওষ্ঠাধর চেপে ধরল ওর কোমল ঠোঁট দুটীর ওপর······

এর মধ্যে শোনা গেল ইন্দুর গলার স্বর,--দিলুটা এমন দুষ্টু, হ'য়েচে, আবার কোথায় বেরিয়ে গেল—দিলু···দিলু···

বাইরে এসেই দেখে আশার কোলে! কোনো কথা না ব'লে ইন্দু একটু গম্ভীর ভাবে ব'ল্‌লে, এসো ভাই আশা!

এই অবস্থায় ইন্দুকে দেখে আশার মুখখানা বেদনায় লজ্জায় ক্ষোভে কালী হ'য়ে গিয়েছিল। কি যেন গুরু অপরাধ ক'রে ফেলেচে সে! তাড়াতাড়ি দিলুকে নামিয়ে দিয়ে বল্‌ল, না ভাই বৌদি, দিলুকে একটু দেখার জন্যে এসেছিলুম। বুকের মধ্যে আবার যেন হঠাৎ কেমন ক'র্‌চে, আমি যাই চ'লে, কা'ল আস্‌বো।

পরের দিনকার কথা। ইন্দু বল্‌ছিল, স্থাখো, তখনি আমি বলিনি যে এসব রোগকে বিশ্বাস ক'র্‌তে নেই! এখন বাপু আর এখানে থেকে কাজ নেই, এখন ভালোয় ভালোয় চল······

রমেশ অসহিষ্ণু ভাবে বল্‌ল, ওর আবার এইরকম এতটা রক্ত মুখ দিয়ে উঠ্‌লো, বিপদের সময়, তুমি তো বেশ স'রে পড়্‌তে বল্‌চো! আর ছুটীর এখনো তো কদিন আছে··· ···

ইন্দু চ'টে বল্লে, যার ভাগ্যে যা' আছে, নিজেদেরও তো জীবন! থাকবে থাকো, কিন্তু ওবাড়ী আর যেতে পার্‌বে না —তা বল্‌চি।

অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লেও রমেশ মুখে আর কোনো কথা বল্‌ল না।

নদীর ওপারে ছোট পাহাড়টীর পাশ দিয়ে শ্রান্ত দিবস ফিরে চ'লেছিল। তারি একটু ম্লান রাঙা আলো জানালার ফাঁক দিয়ে এসে প'ড়েছিল আশার কাতর, ঘর্ম্মাক্ত কপালের ওপর।

মা ধীরে ধীরে ওর অবসন্ন মাথাটীতে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস ক'রলেন, মণি, এখন কি একটু ভালো বোধ হ'চ্চে?

হঠাৎ একটা উদ্গত কাশিকে আশা রোধ ক'র্‌বার বৃথা চেষ্টা কর্‌ল। মায়ের কথার উত্তর হ'য়ে বেরিয়ে এলো ওরি ভাঙা বুকের এক ঝলক তপ্ত রক্ত!

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

'Mon-Ami'র প্রতি

বিদায়! বিদায়! সাহারা হিয়ায় ফোটেনা ফোটেনা ফুল,
বাজে শুধু প্রিয় মরম বীণায় বেদন মেশান ভুল।
যদি কোন দিন আষাঢ়ের সাঁঝে জেগে থাকি তব মনে
ভুলে যেও তবে, রেখো মোরে শুধু অতীতের ছায়া সনে।
বালুচর'পরে ছায়া আসে নেমে দূরে সরে যায় কূল,
বিদায়, বিদায়, সন্ধ্যা ঘনায় মনে শুধু ভাঙে ভুল।

৺অচ্যুত ঘোষ



বিচিত্রা
ফাল্গুন, ১৩৩৮

হর-পার্ব্বতী

শিল্পী — শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শুভলগ্ন

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

শুভ দিনে ভক্ত যত গেল দেবালয়ে
নত নেত্রে মুগ্ধ হাতে অর্ঘ্য থালা লয়ে,
বিকশিত পুষ্পদলে দিল অবিরাম
অসংখ্য অঞ্জলি আর অসংখ্য প্রণাম।
অনন্ত এ নিখিলের কাল অগণন
একটী মুহূর্ত্ত আসে পরম শোভন।
শুষ্ক বৃক্ষ শাখা হতে ঝরে পুষ্পরাজি,
দিকে দিকে সে মুহূর্ত্তে শঙ্খ ওঠে বাজি ;
ত্রিলোকের মর্ম্মে মর্ম্মে বাজে ধ্বনি তার,
অনন্ত আকাশ হতে কলস সুধার
ঝরে নিখিলের পাত্রে। তারি মাধুরিমা
উদয় আলোতে আনে অপার মহিমা।
সেদিন এ ধরণীর প্রাঙ্গণ কোণায়
নীরব অর্ঘ্যের থালা ভরেছে সোনায়,
তোমার চরণ প্রান্তে পূজার অঞ্জলি
সেদিন হয়েছে ঢালা, তাই এ সকলি
গৃহকোণে অক্ষমের যত আয়োজন
মিথ্যা হ'ল। তোমার কী আছে প্রয়োজন
তুচ্ছ মোহে ? ইহাদের মিথ্যা অভিমান
তোমারে কভু কী পারে সঁপিতে সম্মান ?
লক্ষ চিত্ততটে জাগে অরুণ আভাষ
অবরুদ্ধ জীবনের তুমি কি আকাশ ?
তুমি কি জীবন-জ্যোৎস্না ধেয়ানে মগন
মানস-গগন তীরে ? এ শুভলগন
বেহাগে ধ্বনিত হ'ল ; ওঠে মুগ্ধ স্বর
তোমার তোরণ-দ্বার জনতামুখর,
অসংখ্য চরণধ্বনি নৈবেদ্যের থালা
প্রজ্জ্বলিত ধূপ-শিখা পুষ্পগন্ধ ঢালা,
উচ্ছ্বসিত উৎসবের আনন্দ উছল
সেথা মোর প্রবেশিতে নাহি ছিল বল ;
সেই মুক্ত দ্বার প্রান্তে চির জীবনের
করুণ অঞ্জলি ছিল অশক্ত ভক্তের।
চির চরিতার্থতার মুগ্ধ দীপ্তি লিখা
নিরুদ্ধ হৃদয়তলে সে নিষ্কম্প শিখা,
সেই তুচ্ছ দীপরশ্মি হে মহিমাময়,
বুঝি এই পথপ্রান্তে উছলিত হয়।
মেঘমুক্ত জীবনের জ্যোৎস্নাময় শশী
পশ্চাতে ফেলেছে মোর আঁধার তমসী।
আজ এই আলোকেতে নাহি দৈন্য লেশ,
যা কিছু চেয়েছি বেশী তাহা হোক শেষ।
তোমার প্রাঙ্গণ-দ্বারে পরিপূর্ণ চিত
সহসা পেয়েছি আজ অশেষ অমৃত।
তবু এ অক্ষম চিত্তে স্তব্ধ নীরবতা,
নিঃশব্দ প্রণতি মম খোঁজে সার্থকতা,
উত্তোলিত সিন্ধুতটে খোঁজে নিজ দাম,
হে কবি চিত্তের বন্ধু লবে সে প্রণাম ?

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

মনের আকস্মিক পরিবর্ত্তন *

ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্‌-এ

আমি এই প্রবন্ধে মনের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনের একটি ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে চাই। ডাঃ ফ্রয়েডের কতকগুলি আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্যের সহায়তায় আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে অচেতন (unconscious) মনের কার্য্যকলাপের সহিত এইরূপ মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন যোগ আছে কি না।

গিরিশবাবু বাংলা ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পিতামাতার অষ্টম সন্তান। হিন্দুর সংস্কারানুযায়ী অষ্টম গর্ভের সন্তান অত্যন্ত ভাগ্যবান বলিয়া গণ্য এবং পরবর্ত্তীকালে সেই সন্তান কোন দৈবী-শক্তি প্রদর্শন করিবে ইহা অনেকে বিশ্বাস করে। গিরিশবাবুর জন্মের পর তাঁহার জননী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং একজন নীচ জাতীয়া দাসী তাঁহাকে শৈশবকালে স্তন্যদুগ্ধ দিয়া লালন করে। শৈশবকালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার কঠিন-প্রকৃতি জননীর নিকট স্নেহ অপেক্ষা তিরস্কারই লাভ করিতেন। জননীর স্নেহ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় যখনই গিরিশচন্দ্র মাতৃ সকাশে গমন করিতেন — তখনই তাঁহার মাতা তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে দূরে ঠেলিয়া দিতেন। যদি তাঁহার মাতা শুনিতেন যে গিরিশচন্দ্র কাহারও প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহা হইলে তিনি শাস্তি-স্বরূপ তাঁহার মুখে গোময় পুরিয়া দিতেন। শৈশবকালে গিরিশচন্দ্র একগুঁয়ে ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন - এই স্বভাবের জন্য তিনি প্রায়ই জননীর নিকট কঠোর শাস্তি লাভ করিতেন।

* এই প্রবন্ধটি 'The International Journal of Psycho Analysis পত্রিকায় বাহির হয়। প্রবন্ধটির নাম--'A Conversion phenomenon is the life of Dramatic Girish Chandra Ghose'

Conversion সম্বন্ধে অনেক psychologyর গ্রন্থে আলোচনা আছে। William James এর Variety of Religious Experience' নামক গ্রন্থে Conversion সম্বন্ধে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো আছে—তাহার মধ্যে একটি এইরূপ। একজন ধনী ইহুদী—দেশভ্রমণোপলক্ষে প্যারিসে আসিয়া উপস্থিত হন। সেইখানে একজন ধার্ম্মিক পাদ্রির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পাদ্রি পূর্ব্বে ইহুদি ভদ্রলোকটির ভাই যখন প্যারিসে আসেন---তখন তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই পাদরি ইঁহাকেও দীক্ষিত করিবার জন্য অনেক সদুপদেশ দিতেন—কিন্তু ইহুদি ভদ্রলোক তাহাতে মনোযোগ দিতেন না। পাদরি Virgin Maryর মূর্ত্তি অঙ্কিত একটি পদক ইহুদিকে দিয়াছিলেন, ইহা তিনি ঘড়ির সহিত ব্যবহার করিতেন এবং রসিকতা করিয়া বলিতেন যে ইহা বেশ সুন্দর 'মেডেল' হইয়াছে। একদিন তিনি মোটরে প্যারিসের দিকে আসিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে সেই পাদরি রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। পাদরিও প্যারিসে যাইবেন বলিয়া তাঁহাকে মোটরে তুলিয়া লইলেন এবং দুইজনে প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই উপলক্ষে সেই ইহুদি তাঁহার ডায়রিতে এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন—"যদি কেউ সেদিন আমাকে বলিতেন যে আজ আমি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিব—তাহা হইলে তাঁহাকে পাগল বলিতাম—যদিও যথার্থ ই তাহা ঘটিল। পাদরি একস্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন—তাঁহার সেইখানে কাজ আছে—ইচ্ছা হইলে আমিও নামিয়া আসিতে পারি। আমি তাঁহার সঙ্গে যাই। তিনি একটি ভাঙ্গা বাড়ীতে মজুরদের সম্মুখে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই বাড়ীতে Wall paper ছিল না এবং একটি কুকুর বসিয়া ছিল। তারপর সহসা যেন কি হইল। আমি দেখিলাম—সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। আমি মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাদ্রি আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন। আমি সেই দিনই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম।"

এইরূপ আমাদের দেশেও লোকের মনের ভাবের উদয়, জ্যোতিদর্শন, দেবীদর্শন, হঠাৎ বৈরাগ্য প্রভৃতির ঘটনা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এইরূপ ঘটনাকেই 'Conversion phenomenon' বলা যাইতে পারে।

শৈশবের একটি ঘটনাতেই জানা যায় গিরিশচন্দ্রের জননীর কঠোর বহিরাবরণের অভ্যন্তরে পুত্র বাৎসল্যের কি স্নিগ্ধ ফল্গুধারা প্রবাহিত হইত। গিরিশচন্দ্রের নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন তাঁহার মাতা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন এবং যখন তিনি জ্বরের প্রকোপে প্রায় হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন গিরিশচন্দ্র শুনিতে পান যে তাঁহার জননী তাঁহার পিতার নিকট শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। গিরিশ-চন্দ্রের পিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার ব্যবহার দেখিয়া তো মনে হয় না তুমি উহাকে ভালবাস—তাহা হইলে কেন তুমি সন্তানের জন্য এত উতলা হইতেছ?"

অশ্রুপূর্ণস্বরে গিরিশচন্দ্রের জননী উত্তর করিলেন—"আমি ডাইনী। আমার প্রথম সন্তানকে আমি খাইয়াছি। গিরিশ আমার অষ্টম সন্তান। এমন ভাগ্যবান শিশুর অতি সহজেই অনিষ্ট হয়। পাছে আমার কুদৃষ্টিতে তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয়—এইজন্য আমি তাহাকে কোনওদিন কাছে আসিতে দিই নাই, কোনও দিন তাহাকে কোলে লই নাই, এমন কি কোনও দিন একটা মিষ্ট কথা বলি নাই।—সন্তানের প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করিয়াছি মনে করিতেই আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

গিরিশবাবুর মনে এই দৃশ্য গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। গোবরা নামে তাঁহার একটি ছোট গল্পে গোবরার মা শুধু যে সে কোনওদিন তাহার পুত্রকে স্তন্য দুগ্ধ দিয়া পালন করে নাই—এই কথা বলিয়াই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা নয়, উপরন্তু গিরিশচন্দ্রের জননী সন্তানের জন্য যেমন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন—গোবরার মার মুখ দিয়াও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন।

গিরিশবাবুর ১১ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ এবং ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন এবং তাহার পর 'দি গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটারের' ম্যানেজার হন্।

যে ঘটনাটি এই আলোচনার বিষয়বস্তু তাহা বাংলা ১২৯০ সালে তাঁহার ষ্টার থিয়েটারে যোগ দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা উদ্বোধনে (২০০—২০১ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল মহাশয়ের 'গিরিশচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে এই ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার 'গিরিশচন্দ্র' নামক পুস্তকেও উদ্ধৃত করিয়াছেন।—সংক্ষেপে ঘটনাটি এইরূপ—

গিরিশবাবু অভিনেতা হিসাবে অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন। অভিনয়কালে তাঁহার সমস্ত সত্তা অভিনয়ের বিষয়-বস্তুতে নিমগ্ন থাকিত—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইত। —একদিন তাঁহার মনোমত অভিনয়ান্তে গিরিশচন্দ্র যখন বিহ্বলভাবে বসিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হইল যেন কালী-মাতা সেই কক্ষে অদৃশ্য ভাবে আগমন করিয়াছেন এবং তাহার সম্মুখে শরীরী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে অভিলাষ করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের মনে শঙ্কার ভাব উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন—কালীমূর্ত্তি তাঁহার চোখের সম্মুখে আবির্ভূত হইলে তাঁহার মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক প্রেরণার উদয় হইবে যে তিনি আর নর-দেহ ধারণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারিবেন না এবং তাঁহার মৃত্যু তাঁহার পরিবার পরিজনের পক্ষে অত্যন্ত শোকের ব্যাপার হইবে। সেইজন্য তিনি দেবীকে শরীরী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত না হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবী ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এমন কিছু তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে আদেশ করিলেন যাহা তিনি তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাঁহার ক্রোধের উপশম করিতে পারেন। যে অভিনয়-কুশলতা গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ছিল—তিনি তাহাই দেবীকে উৎসর্গ করিলেন এবং দেখিলেন যেন ইহা দেবীর অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর অভিনয় কালে গিরিশচন্দ্রের বাহ্যজ্ঞান-শূন্য ভাবের অপনোদন হইল। তিনি ক্রমশঃ নাটক রচনায় শক্তি নিয়োগ করিলেন। তাঁহার লিখিত অনেক নাটক সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি স্বহস্তে কোনও দিন নাটক লেখেন নাই। তিনি কোনও সময়ে নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা অভিনয় করিয়া যাইতেন অথবা নিজকে অভিনেতার ভাবে অভিভূত করিয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। তিনি মা কালীর ক্রোধে ভীত হন নাই—কারণ তিনি

জানিতেন ক্রোধের ব্যপদেশে তিনি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। তাঁহার নাটক রচনা অভিনয়কুশলতারই পরিণতি। তাঁহার প্রথম নাটক দক্ষ-যজ্ঞের কাহিনী লইয়া লিখিত। এই নাটক রঙ্গালয়ে অভিনয়ের পূর্ব্বে কালীঘাটের কালী-মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রথম অভিনয় করেন যাহাতে মা কালী অভিনয় দেখিতে পান।

কেমন করিয়া এই নব পরিণতি ঘটিল? জগন্মাতা গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং জননীবৎ ব্যবহার করিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্রের অভিনয়রূপ তুচ্ছ বিষয়ে আশক্তি লক্ষ্য করিলেন। মাতা যেমন সন্তানের উন্নতি ও বিকাশের জন্য তুচ্ছ ক্রীড়া-মত্ততাকে দূর করিতে চান—সেইরূপ জগন্মাতা গিরিশচন্দ্রের অভিনয়াসক্তি হরণ করিয়া লইলেন। গিরিশবাবুও তাঁহার অভিনয়ের আসক্তি দূরীভূত হইলে অন্য কোনও (নাটক রচনার) গুরুতর কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। জগন্মাতার সম্মুখে ভয় ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিরিশচন্দ্র দেখাইলেন—তিনি জগন্মাতার সন্তান।

নিম্নে ১৯২৮ সালের 'International Journal of Psycho Analysis' এ প্রকাশিত ডাঃ ফ্রয়েডের 'Humour' (রসতত্ত্ব) নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে দেখা যাইবে—কালীমাতা সম্পর্কিত ঘটনাটি* Super Ego (মহৎ অহং) হইতে উদ্ভূত এবং ইহাকে অবচেতন মনের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

"একথার কি কোনও অর্থ হয় যে কোনও ব্যক্তি নিজকে শিশু বলিয়া ভাবিতেছে এবং সেই একই সময়ে নিজেকেই শিশুর বয়স্ক অভিভাবকরূপে পরিকল্পনা করিতেছে? এই ভাবটি খুব যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু আমার মতে যদি মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মন বিশ্লেষণ দ্বারা 'অহং'এর গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে—সেই সম্বন্ধে বিবেচনা করি তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তের প্রবল সমর্থন পাই। আমরা যাহাকে অহং বলি—তাহা একমাত্র আসল বস্তু নহে। ইহার অভ্যন্তরে—ইহার অন্তরতম প্রদেশে 'মহৎ অহং' (Super Ego) নামে একটি ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব রহিয়াছে। কখনও কখনও ইহা 'অহং'এর সহিত মিশ্রিত থাকে—তখন একটি অপর হইতে পৃথক করা যায় না। আবার কোনও কোনও অবস্থায় দুইটিকে বেশ পৃথক ভাবে চিনিতে পারা যায়। মন জগতের বিকাশের সঙ্গে যে পৃথক পৃথক সত্তা উদ্ভূত হয়—তাহার মধ্যে 'মহৎ অহং' পিতা মাতার স্থান অধিকার করে। ইহা প্রায়শই অহংকে কঠোর অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং পিতামাতা যেমন শৈশবকালে সন্তানের সহিত ব্যবহার করেন—ইহারা (মহৎ অহং) অহংয়ের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা মনোজগতের রসবস্তুর শক্তির ব্যাখ্যা এই দিক দিয়াই পাইব,—যদি আমরা এমন সিদ্ধান্ত করি যে যে ঝোঁকটা অহংয়ের

* এই প্রবন্ধটি বুঝিতে হইলে ডাঃ ফ্রয়েড—Super Ego এই কথাটি দ্বারা কি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা বোঝা দরকার। Super Ego ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে একটি বড় প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এইখানে ঐ কথার মধ্যে নিহিত ভাবের অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন—একটি শিশু জন্মিয়াছে—তখন তাহার মনের মধ্যে কতকগুলি জন্মগত সংস্কার এবং কতকগুলি প্রবৃত্তি রহিয়াছে মাত্র।—শিশুর তখন অহং জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই। তখনকার শিশুর মনের অবস্থাকে ডাঃ ফ্রয়েড, id (অর্থাৎ ইদম্) বলিয়াছেন। ক্রমশঃ শিশুর মনোবৃত্তির বিকাশ হয়—সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার অহং জ্ঞানেরও বিকাশ হয়—অর্থাৎ এই idএর একটি অংশ পৃথক হইয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে থাকে—বহির্জ্জগত কি এবং তাহার সহিত কি সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধের বাস্তবতা মানিয়া জীবনযাত্রা কি ভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে। কিন্তু তখনও ইদের অবিকশিত অংশ অর্থাৎ যাহা অহংয়ের মধ্যে বিকশিত হইতেছে না—তাহা হইতে সহজাত সংস্কার ও প্রবৃত্তির ঢেউ আসিয়া এই অহংয়ের উপর ঘাত প্রতিঘাত করে। এই সব কার্য্য—প্রধানতঃ অবচেতন মনের মধ্যে ঘটিতে থাকে। সেই সময় অহংএর একটি অংশ আবার 'Super Ego' ভাবে বিকশিত হয়। তাহার কার্য্য অহংকে ইদের প্রবৃত্তি ও সংস্কারের তরঙ্গের মধ্য দিয়া ঠিক ভাবে চালানো। এই Super Ego শৈশব জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরে পিতামাতার প্রভাবে বিকশিত হয়। ইহা যে পিতামাতার সোজাসুজি উপদেশে ঘটিয়া থাকে তাহা নয়—ইহা পিতামাতা ও সন্তানের ভাবের সম্বন্ধ হইতেই বিকশিত হইয়া থাকে।

উপর নিবদ্ধ ছিল—তাহা অহং হইতে অপসৃত হইয়া 'মহৎ অহং'এর উপর আরোপিত হইয়াছে। মহৎ অহং এইরূপে স্ফীত (inflated) হইয়া উঠিলে তাহার কাছে 'অহং' ক্ষুদ্র এবং ইহার ক্ষমতা তুচ্ছ বলিয়া প্রকাশ হওয়াও অসম্ভব নয়।"

এইখানে ডাঃ ফ্রয়েড বলিয়াছেন—মনোজগতে 'মহৎ অহং' পিতামাতার স্থান অধিকার করে। গিরিশচন্দ্র স্বপ্নে যে কালীমাতাকে দেখিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার পার্থিব মাতারই প্রতীক। ইঁহারা দুইজনই বাহিরে কঠোর ও নিষ্ঠুর—কিন্তু অন্তরে কোমল এবং এই ভাবটি সন্তানের মঙ্গলের জন্যই কাজ করিয়া থাকে। 'বিল্বমঙ্গল' নামক নাটকে কালীমাতার উদ্দেশে একটি গান আছে ;—

"ওমা কেমন মাতা কে জানে,
মা মা বলে ডাকছি কত
বাজে নাকি তোর প্রাণে।"

এই কথাগুলি তাঁহার গর্ভধারিণী জননীর উদ্দেশ্যেও বলা যাইতে পারে। এইখানে তিনি কালীমাতাকে নিজের জননীর সহিত অভিন্নভাবে দেখিতেছেন।

এইরূপে যদি আমরা 'মহৎ অহং'এর অবচেতন মনের দিক দিয়া গবেষণা করি তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জগতের অনেক ঘটনা বুঝিবার জন্য অন্তদৃষ্টি লাভ করিতে পারি।

অনুবাদক—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

মূলগন্ধকুটী বিহার

শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

যে প্রদীপ জ্বেলেছিলে ভুবনমণ্ডলে
বসি' মূলগন্ধকুটী—বিহার অঙ্গনে
আজো তা' অম্লানদীপ্তি নিখিল ভুবনে,—
আজো তার অনির্ব্বাণ শিখারশ্মি জ্বলে।
সে প্রদীপ করে ধরি' এই বিশ্বতলে
অমিতাভ, বাহিরিলে মঙ্গল লগনে,
আলোকের বার্ত্তা বিঘোষিলে জনে জনে,—
সত্যপথ দেখাইলে বিশ্বের সকলে।
মাতৃমন্দিরের তলে ফিরিয়াছ আজি
অষ্টশতাব্দীর পরে ভারত-সন্তান,
মহিমামুকুটশীর্ষে স্বগৌরবে সাজি'।
অষ্টভাষা গাহে তব আগমনী গান।
তোমারে ধরিয়া বক্ষে আজিকে নৃমণি,
আনন্দে গৌরবে পূর্ণ ভারত-জননী।

মহাকবি গ্যয়টে

হে বিশ্বপ্রেমিক কবি, কবি কালিদাস
ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ—তব সহচর
তোমার জীবনকালে ; মরণের পর
তারি সঙ্গে লভিয়াছ কবিস্বর্গে বাস।
স্বর্গ-সৌন্দর্য্যের তোমা অর্পিল আভাস
নারী-রাণী শকুন্তলা সতীর অন্তর।
প্রেমের আদর্শ তোমা দিল কবিবর,
নারীর নিঃস্বার্থ প্রেম—পবিত্র, উদাস।
নারীচিত্তপুষ্পমধু করি' আহরণ
রচি' গেলে মধুচক্র কাব্যের কাননে।
যে আলোক করিয়াছ চির অন্বেষণ
সে আলোক লভিয়াছ অমর জীবনে—
স্নিগ্ধ ও অপাপবিদ্ধ শুভ্রতার মাঝে
যে শুভ্রতা অনন্তের হৃদয়ে বিরাজে।

বেঞ্চের হাকিম

শ্রীযুক্ত কুড়নচন্দ্র সাহা

১

গ্রামের নাম মঠ্‌মুড়া,—নামের সহিত গ্রামের প্রাচীন ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা জানিনা, তবে গ্রামখানি যে বেশ প্রাচীন—তা' গ্রামের দ্রুত-ধ্বংসশীল একটি বিরাট অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি পড়িলেই বেশ উপলব্ধি হয়। একটি বর্দ্ধিষ্ণু বনিয়াদী বংশ ইহার বুকে বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছে। বংশানুগত আভিজাত্যের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিরীহ প্রজাদের শুধু পেষণই তা'রা করে নাই,—কল্যাণও যথেষ্ট করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে এ প্রতাপশালী বংশের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না,…একটি অস্পষ্ট স্মৃতি ঐ জীর্ণ অট্টালিকার অভ্যন্তর হইতে সকলের চক্ষুতে শুধু মরীচিকার মতই মায়া বাড়ায়।

এই জীর্ণ অট্টালিকার কাছারী-বাড়ীটি একদিন কিন্তু পরিত্যক্ত রহিল না। গ্রামবাসীরা একদিন প্রত্যুষে আসিয়া দেখিল, অট্টালিকার সিং-দরজার সম্মুখে সোলার হাটপরা একজন বাঙালী-সাহেবের সহিত কতকগুলি লোক আসিয়া জড় হইয়াছে। কৌতূহলী গ্রামবাসীরা পরস্পর প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া এ অভিনব ব্যাপারের কোন হেতু খুঁজিয়া পাইল না,—ব্যর্থমনোরথ হইয়া তা'রা ঘরে ফিরিয়া গেল। পরদিন আসিয়া দেখিল,…পরিত্যক্ত কাছারী বাটীটির রীতিমত সংস্কার কার্য্য সুরু হইয়াছে;…দেওয়াল-গাত্রস্থিত স্বভাব-সম্ভূত অশ্বত্থ-চারাগুলি সমূলে উৎপাটিত হইতেছে,… এবং ভগ্নবিধ্বস্ত দরজা জানালাগুলির স্থলে নূতন নূতন দরজা জানালা বসিতেছে। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের নিকট ভিতরের ব্যাপারটি সেদিন অজ্ঞাত রহিল না,—তাহারা বেশ সহজেই আবিষ্কার করিল…ইউনিয়ান-বোর্ড নামক একটি অত্যাশ্চর্য্য বিচারালয় এইখানেই না-কি স্থাপিত হইল,—পল্লীর পথঘাট সংস্কার…শান্তিস্থাপন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যগুলি ইহারই সাহায্যে সম্পন্ন হইবে এবং কিছুদিন পরে সরকার বাহাদুর এটির উপর বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিলে, তাহাদের অনর্থক আর মহকুমা-হাকিমের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই… সুবিচার তখন এইখানেই মিলিবে।

সেই হইতে মঠ্‌মুড়া গ্রামে 'ইউনিয়ন-বোর্ডের' প্রতিষ্ঠা। বোর্ডটি তিন বৎসরের মধ্যে বেঞ্চের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং দেখিতে দেখিতে ইহার বয়সও আজ ছয়টি বৎসর পূর্ণ হইল। এই দীর্ঘ ছয় বৎসর নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে যিনি হাকিমী করিয়া আসিতেছেন,—নাম তাঁ'র গিরিধর। গিরিধরের বয়স অনুমান পঞ্চাশ—শ্যাম-চিক্কন অনতিথর্ব্ব কলেবর—মাথার মধ্যস্থলে বিরাট একটি টাক্…ঠিক্ সেটি যেন ভারত সাগরের বক্ষে আন্দামান্ দ্বীপ।—চক্ষু দুইটি কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র—অর্দ্ধ মুদ্রিত এবং অর্দ্ধ উন্মীলিত। গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালাটি সর্পের মত বেষ্টন করিয়া বিদ্যমান। বোর্ডের হাকিমি প্রাপ্তির পর উদরের পরিধিটি গিরিধর বাবুর আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া গেছে। নাভির ঊর্দ্ধদেশে এখন কাপড় আঁটিবার উপায় নাই, গিরিধর বাবু অগত্যা নাভি নিম্নে কাপড় পরেন। অনাবৃত স্ফীত উদরটি সর্ব্বদা রবারের মত তুল্ তুল্ করে। মহকুমা হইতে কচিৎ কখনও ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংবা সার্কেল-অফিসারের আবির্ভাব হইলে গিরিধর বাবু গায়ে সখ্ করিয়া ফতুয়া চড়ান্—আর স্কন্ধদেশে ফেলিয়া দেন—ফরাশডাঙার কীটদষ্ট এক চাদর।

হাকিমির গুণে স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী তিন চারিখানি গ্রামের ভিতর গিরিধর বাবুর একাধিপত্য। পথে বাহির হইলে নিরক্ষর লোকেরা তাঁহাকে গড়্ হইয়া প্রণাম করে। গিরিধর বাবুর মুখখানি অম্‌নি আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়—ভাবেন হাকিম না হইলে আজ এতখানি সম্মান তাঁহার থাকিত কোথায়?

কিন্তু এ হেন হাকিমি পদটি লাভ করিবার মূলে গিরিধর বাবুর যে চেষ্টা নিহিত ছিল,—তাহার একটি ইতিহাস আছে।

সর্ব্বপ্রথম বোর্ডের 'মেম্বার' নির্ব্বাচনের দিন আসন্ন হইলে—যাঁহারা 'মেম্বার শিপের' প্রার্থী হইলেন—গিরিধর ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু প্রার্থী হইলেই ত' আর মেম্বার হওয়া যায় না। জনসাধারণের ভোটের উপরেই এ পদটি নির্ভর করে। অথচ সকলেই ভোটের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যদি ভোটের সংখ্যা তাঁহার লঘিষ্ঠ হয়,—তাহা হইলে আর 'মেম্বার' হওয়ার আশা কোথায়? গিরিধর বাবু গ্রামের লোকের তখন সালাম পাইতেন না—আর বংশ মর্য্যাদা এবং প্রতিপত্তির দিক্ দিয়াও এমন কিছু ছিল না, যাহাতে অন্য প্রার্থীদের মত তিনি সহজে সফলকাম হইবার আশা রাখেন। গিরিধর বাবু বেজায় মুস্কিলে পড়িলেন,—ভাবিতে লাগিলেন পথ কোন দিকে? হঠাৎ তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে এক বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন—নিরক্ষর ভোটারগণকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিয়া পরম পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইবেন,—তা'রপর পৈতা দিয়া একে একে তাহাদের হাত জড়াইয়া ধরিলে তখন কি আর পিছাইতে পারিবে? সত্যসত্যই গিরিধর বাবুর এ হেন উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হইল না,—তিনি ভোট পাইলেন, এবং নির্ব্বাচিত মেম্বারগণের মধ্যে একজন মেম্বার বলিয়া গণ্য হইলেন। অতঃপর বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বা হাকিম হইবার জন্য গিরিধর বাবুকে তেমন মাথা ঘামাইতে হইল না। নূতন বোর্ড গঠনের পূর্ব্বদিন গিরিধর বাবু আর একটি ভোজের আয়োজন করিলেন। এবারের আয়োজনটি নেহাৎ ছোট খাটো নয়,—একেবারে কালিয়া কোর্ম্মা পর্য্যন্ত,—এবং সাদরে যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইলেন,—তাঁহারা 'মেম্বার' ছাড়া আর অন্য কেহ নন।

আহারের পর গিরিধর বাবু তাঁহার তাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠপুটে একটি হাসি ফুটাইয়া বলিলেন ···'বোর্ড ত হ'ল, ···দেশের লোকের সুখ শান্তির দিকে এখন আমাদেরই ত' তাকাতে হবে···, 'গরমেণ্ট' যাতে কাজে আমাদের খুঁত ধরতে না পারে···আবার লোকেরও মনোকষ্ট না হয়,—এম্নি ভাবেই কাজ করতে হবে···আর এ জন্যে 'প্রেসিডেণ্টো' হাকিম যিনি হবেন··· মাথাটাও তাঁর বেশ একটু পাকা হওয়ার দরকার, কি বলেন আপনারা?'

মেম্বারপদপ্রাপ্ত ভদ্রলোক কয়টি সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন —'নিশ্চয়ই···তা' আর একবার···'

কথাটা খুবই 'লাগ সই' হইয়াছিল,—নিজের সাফল্যাগর্ব্বে গিরিধর বাবু মাথা দোলাইয়া বেশ একটু হাসিলেন, এবং বাম হস্তস্থিত খানিকটা মসীবর্ণের দোক্তা স্বীয় মুখ গহ্বরের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু মুদিলেন।

জমাদ্দিন বাবু মেম্বারদের মধ্যে একটু 'মুখোড়'—তিনি ঝাঁ করিয়া বলিলেন— 'প্রেসিডেণ্ট তা'হ'লে আপনাকেই হ'তে হবে গিরিধর বাবু··, আপনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, তা' ছাড়া বিচক্ষণ···'

গিরিধর বাবুর 'টনিক' যে এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে, তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। একটি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসিয়া বলিলেন—'তা' আপনাদের যদি মতই হয়,···তা' হ'লে কি আর আমি পিছুতে পারি?' সত্যসত্যই গিরিধর বাবু এত নির্ব্বোধ নন।

পরদিনই তিনি সুস্থশরীরে বোর্ডের নূতন হাকিমের পদটি অলঙ্কৃত করিলেন, এবং শীঘ্রই এই খোশ খবর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ব্যাপ্ত হইল।

২

হাকিম হইয়াও গিরিধর বাবু পূর্ব্বের ন্যায় ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করেন। কপালের মাঝখানে শ্বেতচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটাটি সর্ব্বদা জল্ জল্ করে। আমিষ আহার বহুদিন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, হাকিমি প্রাপ্তির পর গিরিধর বাবু হঠাৎ এ নেশাটির একদিন পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ইহার একটি ইতিহাস আছে।

শীতকাল। বেলা অনুমান আটটা। দালানে গিরিধর বাবু কুশাসনে সমাসীন। সম্মুখে একটি তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল, —কাছে কোশাকুশী, একটু দূরে একটি কাংস্যপাত্রে কিছু ফুল্‌কো লুচি, তদুপরি একটি পানতুয়া। স্ত্রী জলদবরণী প্রত্যূষে স্বামীর এই প্রাতরাশের ব্যবস্থা করেন, প্রভাতী

আহ্নিক-অন্তে গিরিধর বাবুর এটির বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ তিনি চক্ষু অন্ধকার দেখেন।

আচমন সারিয়া গিরিধর বাবু আহ্নিকে বসিবেন, এমন সময়ে দেখিলেন একটি পুষ্টাঙ্গ মার্জ্জার ফুল্‌কো লুচি পূর্ণ কাংস পাত্রটির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। গিরিধর বাবু ধ্যানস্থ হইতে পারিলেন না। দৃষ্টিটি তাঁ'র কাংসপাত্রস্থ পান্তুয়াটির উপর—, একবার চক্ষু মুদিলেই এর তিরোধান অবশ্যম্ভাবী! গিরিধর বাবু তাড়াতাড়ি একবার প্রাঙ্গণের দিকে তাকাইলেন···তা'রপর ঘরের ভিতর···, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা···মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া অসমাপ্ত আহ্নিক ক্রিয়ার মাঝখানেই পাত্র হইতে পান্তুয়াটি টপ্ করিয়া তুলিয়া লইয়া একেবারে গপ্ করিয়া গলাধঃকরণ করিলেন।··· এই সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে সহসা জলদবরণী আসিয়া উপস্থিত, —কিন্ত গিরিধর বাবু তখন রীতিমত ধ্যানস্থ।

আহ্নিকান্তে চক্ষু খুলিতেই জলদবরণী একটু মুখ টিপিয়া হাসিল,—গিরিধর বাবু কাংস পাত্রের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আঁৎকিয়া উঠিলেন— '...ঐঃ যা···আমার পান্তুয়া···'

জলদবরণী সহাস্যে বলিল— '···হতচ্ছাড়া···হুলোটা নিয়ে সটকেছে আর কি···, আজই আমি দেখাচ্ছি ওটাকে···, হ্যাঁ······বাইরের ঘরে শ্যাম হাল্‌দার এসে ব'সে আছে······ তোমাকে না কি দরকার···'

সৌভাগ্যক্রমে জলদবরণী এই কথা পাড়িয়াছিল –, নইলে গিরিধরের অবস্থা কি হইত কে জানে!

গিরিধর বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন 'শ্যাম হালদার ·, তোমার সঙ্গে কোন কথা টথা হ'ল না কি···, কি দরকার জান···?

জলদবরণী ভ্রূকুটি করিয়া বলিল '···সঙ্গে ক'রে একটা পাঁচ সেরে রুই এনেছে ··, কি দরকার তুমিই জান···'

'হুঁ' বলিয়া গিরিধর বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফুল্‌কো লুচি পড়িয়া রহিল। খড়মের খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে প্রাঙ্গণ দিয়া তিনি বরাবর বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইলেন,—গবাক্ষের নিকট আসিয়া দেখিলেন শ্যাম হালদারই বটে,—বাহিরের দরজাটি একরকম বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে বেচারা বসিয়া আছে। মুখখানি গম্ভীর করিয়া গিরিধর বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন—শ্যাম হালদার সঙ্গে সঙ্গে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

গিরিধর বাবু প্রশ্ন করিলেন— '···কি খবর শ্যাম···?'

শ্যাম হাল্‌দার একমুখ হাসিয়া বলিল—'···আজ্ঞে··· 'কর্ত্তা'বাবু···খবর একরকম ভালই, ক'দিন ধ'রে আস্‌ব আস্‌ব ক'রে আসা হয় নি তাই আজ একবার ·'

'···আরে···ওটা···কি শ্যাম···?'

'···একটা মাছ 'কর্ত্তা' বাবু···, শুধু আস্‌ব···তাই···'

গিরিধর বাবু অম্‌নি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উঠিলেন— 'আরে রাম···রাম, আমার কি ও চলে হ[illegible]···, আজ ছাব্বিশ বছর মাছ মাংস কেমন চ'খে দেখিনি···, আতপ-অন্ন আর ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক ··, এ কি জানিস্‌নে শ্যাম···?'

শ্যাম হাল্‌দার জিভ্ কাটিয়া বলিল— '···তাইতো কর্ত্তা বাবু, বড্ড ভুল ক'রে ফেলেছি তো, তা' হ'লে···!'

গিরিধর বাবুর দৃষ্টিটি তখন টাট্‌কা রোহিতের দিকে··· লাল টকটকে মাছ···মাথাটা এঁ্যা ··, সৃষ্টিধরের মনটি সহসা কেমন নিস্‌পিস্ করিয়া উঠিল।

'···আচ্ছা···এনেছিস্ যখন···রেখেই যা,···বামুনের নাম ক'রে এনেছিস্ নইলে ফিরিয়ে দিতে বাধা ছিলনা···তা' এটা আমি যোগেনদের দিয়ে দিচ্ছি···ওরাই থাক্···।'

'···সেই ভাল বাবু······আমি দিয়ে আস্‌ব ?'

'···থাক্···থাক্···আমিই ওদের খবর দিচ্ছি···, তোকে আর কষ্ট ক'রে কাজ নেই বাপু।'

শ্যাম হালদারের এখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ছাড়া আর উপায় কি ? কিন্তু বেচারা কি এম্‌নি এম্‌নিই আসিয়াছিল ? গতকল্য সামান্য একটি ব্যাপার লইয়া ফটিক সেখের সহিত তাহার মারামারি হয়, বেঞ্চে আসিয়া ফটিক কালই তা'র নামে নালিশ করিয়াছে। শ্যাম সন্ধান লইয়া জানে,— আর এক 'হপ্তা' পরেই তা'র বিচার হইবে – এবং বিচারে যে তাহার জরিমানা নিশ্চিত ইহাতেও কোন ভুল নাই— তাই হাকিমকে একটু প্রসন্ন করিবার জন্যই শ্যাম হালদারের আজ রোহিত হস্তে আবির্ভাব!···কিন্তু রোহিত দর্শনে হাকিম যে একেবারে নাক্ সিট্‌কাইলেন!

'···আচ্ছা···তা'হ'লে আসি শ্যাম···'—গিরিধর বাবু খড়মের খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে কয়েক পা অগ্রসর হইলেন। সহসা কি ভাবিয়া পিছন ফিরিয়া চাইতেই দেখিলেন—···শ্যাম হালদার তখনও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে!

শ্যাম হালদার এবার কিঞ্চিৎ ভরসা পাইয়া গিরিধর বাবুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল,—এবং ছাঁটা গোঁফের পাশে এক ঝিলিক হাসি ফুটাইয়া বলিল—'···আমার ওপর একটু সদয় থাক্‌বেন কর্ত্তা বাবু···জানেন ত সবই।'

গিরিধর বাবু শ্যাম হালদারের এ ইঙ্গিতটি বহুপূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন—এবার একেবারে খোলসা করিয়া বলিলেন—'আচ্ছা···আচ্ছা···কোন ভাব্‌না নেই হালদার···কল্‌কাটি ত আমার হাতেই···।'

শ্যাম হালদার কোন কথা না বলিয়া গিরিধর বাবুর পায়ের ধূলা লইয়া জিহ্বায় ও মাথায় ঠেকাইল,···তা'রপর চ'খে মুখে হাসি ফুটাইয়া হন্ হন্ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

শ্যাম হালদার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে গিরিধর বাবু মেঝে-শায়িত রোহিতটির দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন;—অলক্ষ্যে কয়েক বিন্দু জল তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া সঞ্চিত হইল।···মৎস্যটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া গিরিধর বাবু ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন। দালানের উপর বসিয়া বসিয়া জলদবরণী একমনে আনাজ কুটিতেছিল,—নিরামিষভোজী স্বামীকে সহসা আজ মৎস্য হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া আকাশ হইতে পড়িল,—তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'এ···কি···ব্যাপার···?'

'··ব্যাপার ভালই, শোন তবে···কিছুদিন থেকে চ'খে কম দেখ্‌ছি,··কানেও শুন্‌ছি কম,··কথাটা কাল অকিঞ্চন কব্‌রেজকে বলি,· অকিঞ্চন 'চরক' প'ড়ে টাট্‌কা রুইয়ের মুড়ো খাবার ব্যবস্থা দিলে···তা' এখন ডাক্তার বদ্যির কথা ত আর এড়াবার যো নেই,···নইলে সাধ ক'রে আর কে খায় বল···?'

—বলিয়াই হস্তস্থিত রোহিতটি মেঝের উপর ঝপ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া গিরিধর বাবু গম্ভীর দৃষ্টিতে জলদবরণীর দিকে চাহিলেন।

প্রত্যুত্তরে জলদবরণী শুধু একটু মুখ টিপিয়া হাসিল,—কোন কথা বলিল না।

···সেইদিন হইতে গিরিধর বাবু রোহিত মৎস্যের ভক্ত হইলেন,—এবং মাসের মধ্যে কমপক্ষে আটদশ দিন এখন এক একটি 'আস্ত' রোহিত তাঁহার অন্দর মহলে প্রবেশ করে।

হাকিমীর গুণে গিরিধর বাবুর আরও অনেক সুযোগ ঘটিয়াছে। গ্রামের কাড়ু ঘোষাণী ওরফে কাদম্বিনী মাঝে মাঝে টাট্‌কা ঘি আনিয়া গিরিধর বাবুকে ভেট্ দিয়া যায়। কাদম্বিনীর ইহাতে ফলও যে কিছু না হইয়াছে—এমত নয়। ইউনিউন বোর্ডের কল্যাণে তাহার বাড়ীর রাস্তাটি আজ শুখ্‌নো এবং খট্‌খটে;—এক হাত উঁচু করিয়া মাটি পড়ায় বর্ষার জল সেখানে জমিতে পারে না—কাড়ু সেই পথ দিয়া থম্ থম্ করিয়া হাঁটিয়া যায়।

সে বৎসর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে মঠ্‌মুড়া গ্রামে একটি টিউব-ওয়েল বসানর কথা পাকা হইয়া গেল। স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে হাকিম ও মেম্বারগণের মধ্যে নানা জল্পনা সুরু হইল।

ভজহরি বাবু বলিলেন—'কলটা আমাদের পাড়াতে বস্‌লেই ভাল হয়···পাঁচটা ভদ্দর শুদ্দুর সবাই এখানে···'

জনার্দ্দন বাবু প্রতিবাদ করিলেন—'···পাগল আর কি···ভদ্দর শুদ্দুর যেমন আছে···তেম্‌নি বাড়ীতে তা'দের এক একটা 'কূও' আছে, কিন্তু চাষা পাড়াটায় কি আছে শুনি·· যদি বসাতে হয় ত' ঐখানেই।'

কিন্তু খোদ্ হাকিম গিরিধর বাবু এরপর যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন;—তাহাতে কাহারও আর স্হুঁচ ফুটাইবার উপায় রহিল না···!···গিরিধর বাবুর পদমর্য্যাদার গুণে নলকূপটি তাঁতি পাড়াতেই বসিল;—এবং কূপ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বাড়ীটি যাহার নিকটে,—নাম তা'র হরিমতী···কিন্তু যাক্, সে কথা বলিয়া লাভ নাই।

দিন কয়েক পরে জলদবরণী একদিন হাসিয়া বলিল—'জলকলটা যে ওখানে বস্‌বে তা' আগেই জানি···।'

গিরিধর বাবুর চক্ষু দু'টি সহসা শুষ্ক হইয়া উঠিল,—তিনি ধরা গলায় শুধাইলেন—'কেমন ক'রে… ?'

জলদবরণী ইহাতে নিরুত্তর,—গিরিধর বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া…সজোরে সে শুধু একবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গলার রুদ্রাক্ষের মালাটিতে হাত দিয়া গিরিধর বাবু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিলেন—'…রাম…রাম…কি যে বল ছাই… !'

৩

মহকুমা হইতে নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসিবেন 'বেঞ্চ' দেখিতে,—গিরিধর বাবু সকাল সকাল স্নানাহার সারিয়া 'ইউনিয়ানে' আসিয়া বসিয়াছেন। পেস্কার যদুনাথ কর কিছু তরস্ত,—নাকের ডগায় চশমা চড়াইয়া নথীপত্র সাম্লাইতেছে। ভৃত্য অবিনাশ ঘোষ সম্মার্জ্জনী সহযোগে বিচার-গৃহের আবর্জ্জনা নিষ্কাশন করিতেছে।…মেম্বার জনার্দ্দন বাবু প্রমুখ বিচারকগণ এক একখানি হাতলশূন্য চেয়ারে বসিয়া ধ্যানস্থ!

গিরিধর বাবু গায়ের ফতুয়ার উপর হইতে কীটদষ্ট চাদরখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া শ্যেনদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তা'রপর একটি আকর্ণ-বিস্তৃত হাই তুলিয়া বলিলেন—'অবি,…তুই ঐ আম্তলায় গিয়ে বস্‌গে দেখি,‥ সড়কের ওপর হাকিমকে দেখ্‌তে পেলেই—দৌড়ে এসে খবর দিবি…।'

সম্মার্জ্জনীহস্তে অবিনাশ ঘোষ তীরের মত সোজা দাঁড়াইয়া গিরিধর বাবুর মুখের দিকে চাহিল, তা'রপর বিজ্ঞের মত বলিল—'হাকিম বুঝি…গরুর গাড়ীতে আস্‌বে…না…বাবু ?'

গিরিধর বাবুর মেজাজ চড়িয়া উঠিল,—তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন…'হাকিম বুঝি তোর মধু ঘোষ…তাই টিং টিং ক'রে গরুর গাড়ীতে আস্‌বে… ? না-বালক আর সাধে বলি…,—হাকিম আস্‌বে সাইকেলে,…দু-চাকার গাড়ীতে,…হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে…আবার… ?'

'‥ যাই,…হাকিম কিছু বক্‌শিস্ দিয়ে যাবে ত বাবু…?'

অবিনাশ ঘোষ দাঁত বাহির করিয়া একটু হাসিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গিরিধর বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটি তাহার মুখের ওপর আসিয়া পড়িতেই…বেচারা আর তিষ্ঠিতে পারিল না,—সম্মার্জ্জনী হাতে করিয়াই একেবারে আমতলার দিকে অগ্রসর হইল।

গিরিধর বাবু এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া পেস্কার যদুনাথের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন,—বলিলেন—' 'কেস্' তাহ'লে আজ একটা আছে…না…যদু ?'

যদুনাথ চশমার উপর দিয়া ঘোলাটে চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'…আজ্ঞে…হ্যাঁ…,রহিম সেখের সেই ৩৫২।'

'…আর দরখাস্ত ?'

'দরখাস্ত নেই—'

'…আচ্ছা—' গিরিধর বাবু একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন,…কাজ যত আজ কম থাকে ততই মঙ্গল! —'…হুঁ…আইন খানা একবার দাও ত যদু…'

আমকাঠের বিবর্ণ আলমারীর কোণ হইতে পেস্কার যদুনাথ তাড়াতাড়ি পীনালকোড বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। কিনিয়া অবধি বইখানি আলমারীতেই পড়িয়া ছিল—…তাই উই আর ইঁদুর নির্ব্বিঘ্নে ইহার উপর শোষণ-নীতি চালাইয়া আসিয়াছে।

গিরিধর বাবু পীনালকোডের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে জনার্দ্দন বাবুকে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কারণ বইখানি যে ভাষাতে লেখা, তাহার বর্ণপরিচয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও—পড়িয়া অর্থ উদ্ধার করার জন্য ক্ষমতা গিরিধর বাবুর আজও আয়ত্ত হয় নাই। গিরিধর বাবু বলিতেন,—তাঁহার সময়ে মঠ্‌মুড়া গ্রামে এই বিট্‌কেল ভাষাটির রেওয়াজ হয় নাই,—হইলে আজ তিনি মহকুমারই হাকিম হইতেন।…কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, গিরিধর বাবু এখনও হাল ছাড়েন নাই। অবসর সময়ে কোন কোন দিন জনার্দ্দনকে তিনি গৃহে ডাকিয়া আনিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে এই রাজভাষা শিক্ষা করেন। উদ্দেশ্য এ ভাষাটি একদিন তিনি শিখিবেনই,—এবং মহকুমার হাকিমদের সহিত ইংরাজীতে সমানতালে কথা বলিয়া তাঁহাদের তাক্

লাগাইয়া তবে ছাড়িবেন! বহুকষ্টে পীনালকোডের ৩৫২ ধারাটি খুলিয়া গিরিধর বাবু বলিলেন—'পড় ত জনার্দ্দন, বলা যায় কি,···ব্যাটা এসে যদি আবার আইন নিয়েই লেগে পড়ে,···বেশ ভাল ক'রে···বাংলা কর দেখি···কি··· হু-এ-ভর্···,

জনার্দ্দন বাবু একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বইখানি কাছে টানিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে পড়িলেন :—

···Whoever assaults or uses criminal force to any person, otherwise than on grave and sudden provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.···

গিরিধরবাবু সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন —ধারা বটে জনার্দ্দন,···কি বিট্‌কেলে ধারাই না ক'রেছে ব্যাটারা,···পড়্‌তে পড়্‌তে একেবারে দম্ ঠেকে যায় বাবা··· হুঁ তা' হ'লে 'মানেডা' হ'ল গিয়ে···'

কিন্তু 'মানেডা' আর হইল না,—গিরিধর বাবু ঘাড় উঁচাইয়া দেখিলেন,—অবিনাশ ঘোষ দৌড়িতে দৌড়িতে তাহাদেরই দিকে অগ্রসর হইতেছে। গিরিধর বাবুর বুঝিতে বিলম্ব ঘটিলনা যে এবার স্বয়ং প্রভু আসিতেছেন। তিনি পীনালকোড খানি তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দ্রুতগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জনার্দ্দনের কানের ভিতর মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন—'ইংরাজী বুকনিটা তুমি চালিও জনার্দ্দন,···বেশ ভাল ক'রে চালিও,···নূতন হাকিম,···'গ্যাড্-ম্যাড্' ছাড়া কথা বল্‌বেনা·· তুমিও পিছোবে কেন,···বেশ ক'রে তাক্ লাগিয়ে তবে আর কাজ, ···হ্যাঁ···ঐ যে টুপি দেখা যাচ্ছে,···ব্যাটা একেবারে বাচ্চা জনার্দ্দন···!'

জনার্দ্দন বাবু বহুকষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া বলিলেন— 'হ্যাঁ···তাড়াতাড়ি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে ফেলুন দিকি,··· বাইরে বেরিয়ে 'শেক-হ্যাণ্ড' কর্‌তে হবে,···আসুন্ চট্‌পট্।'

আগে জনার্দ্দন আর পিছনে গিরিধর। হ্যাট্‌কোট-পরিহিত মহকুমার হাকিম ততক্ষণে সাইকেল হইতে নামিয়াছেন। পিছনের সাইকেলে ছিল তাঁর 'আরদালী', আরদালীর গায়ে চাপ্‌কান্···মাথায় পাগ্‌ড়ী। আরদালী সাইকেল হইতে নামিয়া হাকিমের হাত হইতে তাড়াতাড়ি সাইকেল লইল। জনার্দ্দনবাবু আসিয়া হাকিমের সহিত 'শেক্‌হ্যাণ্ড' করিতে করিতে উচ্চারণ করিলেন···গুড্ মর্ণিং গুড্ মর্ণিং।

গিরিধর বাবুও পিছাইবেন কেন? ··সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হাকিমের সহিত 'শেকহ্যাণ্ড' করিয়া বিশুদ্ধ রাজভাষায় উচ্চারণ করিলেন'···গুড্ মর্ডিং···গুড্ মর্ডিং···'

বর্ষার পাঁকে ভরা দশমাইল পথ বাইক করিয়া আসার দরুন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চ'খ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল,— কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছিল। তিনি পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বিচারকক্ষের একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন তার'পর কুপিতকণ্ঠে বলিলেন 'রাস্তা এমন বিশ্রী···তা আমাকে আগে 'ইন্‌ফরম' করলেন না কেন?'

উত্তরটি সহসা গিরিধর বাবুর মাথা হইতে গজাইল না —জনার্দ্দন বাবু বলিলেন'···স্যার,···রাস্তা যে এত বিশ্রী হবে···তা' প্রেসিডেণ্ট সাহেব আগে ধারণা কর্‌তে পারেননি, ···বর্ষাকাল,···রাস্তা তবুও···ভাল ছিল,—কিন্তু কাল্‌কের জলেই···'

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জনার্দ্দন বাবুকেই বেঞ্চের হাকিম ঠাওরাইয়াছিলেন;—কিন্তু এবার বুঝিলেন অনুমান তাঁহার ভুল।

সাহেবের মুখে 'গ্যাড্' 'ম্যাডের' বালাই নাই দেখিয়া গিরিধর বাবুর কিঞ্চিৎ ভরষা হইল। তিনি হাকিমি মেজাজে বলিলেন 'রাস্তার ব্যবস্থা এবার ক'রেই তবে আর কাজ'!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কথাটিতে কর্ণপাত করিলেন না;— ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি আর একবার ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন;—বলিলেন ···Unbearable heat! I feel almost suffocated ···উঃ···!'

গিরিধর বাবু ভাবে বুঝিয়া লইলেন,—সাহেব কি বলিতেছেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল হাকিমি করায় এ বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও তাঁ'র হইয়াছিল। পুরু ঠোঁট দুটিতে এক ঝিলিক হাসি ফুটাইয়া বলিলেন—'হুজুর···তা'হ'লে দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে যদি একটু বিশ্রাম করেন ··, বড় ভাল হয়,···শরীর সুস্থ হ'লে পর···'

'···All right '—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বৈঠকখানা গৃহে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সুপরিচ্ছন্ন শয্যা রচনা করিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থার জন্য গিরিধর বাবু অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন।—কাছে বসিয়া রহিলেন। জনার্দ্দন বাবু।

গিরিধর বাবু অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—স্ত্রী জলদবরণী রন্ধনশালার পার্শ্বে দুই হাত দিয়া গোময়স্তূপের ব্যবস্থা করিতেছে। গিরিধর বাবু নিকটে আসিতেই জলদবরণী একটি ভ্রূকুটি করিয়া মাথার নামিয়া-পড়া কাপড়টা বাঁ হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মাথার উপর তুলিয়া দিল।

গিরিধর বাবু একটি অসহায় দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন '—শিগ্‌গির হাত ধুয়ে ওঠ দিকি,...হাকিম এসেছেন,··· জলখাবারের যোগাড় ক'রে দিতে হবে।'

'·· কেন এত কেন···? দাসী বাঁদী জোটেনা তোমার···? হাকিম এল আর না এল ত ভারী ব'য়েই গেল,—চ'খে মুখে আগুন ছুটাইয়া জলদবরণী গোময় মাখিতে লাগিল।

গিরিধর বাবুর চ'খে জল,—কণ্ঠে মিনতি! বলিলেন—'···এবারকার মত ক'রে দাও গো···, বিপদে ফেলোনা···, আমি ডাব আর খাবার নিয়ে আসি..., তুমি চট্‌পট্ চায়ের জল চড়িয়ে দাও···, ওঠ···!'

জলদবরণী মুখখানি কালো করিয়া গোময়লিপ্ত হাত দুইখানি কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জলখাবারের যোগাড় হইয়া গেল। চা-সন্দেশ আর তিনটি ডাব খাইয়া হাকিমের মেজাজ সরস হইল।

গিরিধর বাবু একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন '—আমাদের এ পাড়াগাঁ'য়ে হুজুর এমন কিছু মেলেনা··· নইলে আর···'

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খুসী হইয়া বলিলেন—'···না···না··· চমৎকার tiffin হ'য়েছে···ডাবের জলটা খুবই... refreshing।'

'—হে—হে···' করিয়া গিরিধর বাবু খানিকটা মাথা দোলাইয়া হাসিলেন;—তার'পর কচি ডাবের কি গুণ,... আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চরক এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন,—তাহারই একটি সুচারু ব্যাখ্যা সুরু করিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মন অত কাঁচা নয়,—গিরিধর বাবুর ব্যাখ্যা শুনিবার মত ধৈর্য্যও তাঁ'র নাই। তিনি পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই-এর কাঠি সংযোগে ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন—'...However···এখানে fowl খুব available...না গিরিধর বাবু?'

গিরিধর বাবু fowl কথার অর্থ বোঝেন। মনে মনে আঁত্‌কিয়া উঠিলেও প্রকাশ্যে বলিলেন— 'খুব মেলে হুজুর..., বলুন ত রাত্তিরে...'

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অমনি খুসী হইয়া বলিলেন '...Yes, you may...'

গ্রামে গিরিধর বাবু একাই একশো। তারপর আবার মহকুমা হইতে হাকিম আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জুব্বার সেখ গিরিধর বাবুর বৈঠকখানায় কয়েকটি 'সুপুষ্ট' মুর্গী-শিশুর কাঁচা মাংস আনিয়া হাজির করিল। আরদালী জাতিতে মুসলমান্—মাংস রান্নায় ওস্তাদ্। কাজের ভারটি সেই লইল।

রাত্রের 'ডিস্' তৈয়ারী হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহারার্থ আহূত হইলেন। সাহেব ডিসে হাত দিয়া বলিলেন '·· কি মিষ্টার ··গিরিধর..., আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে···?'

পার্শ্বে গিরিধর বাবু প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন,—হয়ত মনে মনে এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তের কথাই তিনি বার বার করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মুখে 'মিষ্টার' কথাটির উচ্চারণ শুনিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থার এক আশ্চর্য্য বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল।

গিরিধরবাবু মোলায়েম কণ্ঠে সাড়া দিলেন 'হুজুর···'

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বলিলেন '···আপনি বসুন···!' গিরিধর বাবু পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনার্দ্দন বাবুর দিকে একটি অসহায় দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, জনার্দ্দন বাবু সহজকণ্ঠে বলিলেন '··যান্ দেরী কর্‌ছেন কেন···, হাকিম ব'সে রইলেন যে···!'

'···আপনি···?' গিরিধর বাবু মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন। জনার্দ্দন বাবু সঙ্গে সঙ্গে উদরের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে গিরিধর বাবুর দিকে চাহিয়া নীরবে একটু চক্ষু টিপিলেন,·· বক্তব্য—তাঁহার পেট ফাঁপিয়াছে, নইলে হুজুরের সহিত বসিতে তাঁহার আপত্তি নাই।

গিরিধর বাবু অগত্যা হাকিমের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। জলদবরণী ভিতর হইতে পাছে এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ টের পায়, এই ভয়ে দরজাটি তিনি তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিলেন।

সাহেব খাইতে খাইতে বলিলেন—'Dishটা বেশ savoury হ'য়েছে, না গিরিধর বাবু?'

গিরিধর বাবু তখন কচি রামপক্ষীর মাংস চুষিতেছিলেন—হাকিমের মুখের দিকে চাহিয়া সোল্লাসে উত্তর দিলেন—'···তা' আর হবেনা?···রান্না যে হুজুরের আর্দালীর···হে-হে ···হে-হে···!'

'বেঞ্চ' পরিদর্শন করিয়া পরদিবস ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,...তাহার মর্ম্ম এই :—

মঠ্‌মুড়া ইউনিয়নে বেঞ্চের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। প্রেসিডেণ্ট গিরিধর রায় একজন দূরদর্শী ও ও বিচক্ষণ লোক। এরূপ লোকের হস্তে 'বেঞ্চ' থাকিলে সরকার ও দেশবাসী উভয়েরই কল্যাণ।

মন্তব্য শুনিয়া গিরিধর বাবু আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি সেই দিনই একটি বিরাট্ ভোজের আয়োজন করিলেন। আপামর সাধারণ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় হইতে বঞ্চিত হইল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গিরিধর বাবু একদিন ইউ-নিয়নে বসিয়া বিচার করিতেছেন,—এমন সময়ে এক পত্র পাইলেন। পত্রখানি মহকুমা হইতে আসিতেছে :-- মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব লিখিতেছেন :—

গিরিধর বাবু, আপনার সুবিচার ও কার্য্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুর আপনাকে 'রায়-সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। অদ্য গেজেট দেখিয়া আপনাকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

এই অতর্কিত শুভ সংবাদে গিরিধর বাবুর আনন্দ যে কতখানি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিল, তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না,—তবে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত আর একবার নূতন করিয়া 'শেক্-হাণ্ড' করার জন্য একটি বহুমূল্য ডালি লইয়া গিরিধর বাবু যে সেইদিনই মহকুমা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন,··· একথা কাহারও অজ্ঞাত নাই।

মঠ্‌মুড়া বেঞ্চে আজ সুবিচার চলিতেছে,- রায় সাহেবের কল্যাণে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনের মহিমা অক্ষয় হউক।

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা



হে আমার কল্পনা-সুন্দর

শ্রীযুক্ত বিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কিশোর জীবন-প্রাতে হে আমার কল্পনা-সুন্দর,
এসেছিলে মর্ম্ম-পটে রহস্যের রম্য রূপ নিয়া ;
এসেছিলে দীক্ষা দিতে ভরে দিতে অন্তর-কন্দর,
অক্ষয় আলোক আর প্রেমবাহী-গীতা-মন্ত্র দিয়া।

সেদিন সে শৈশবের আঁখি-কলি চঞ্চল চেতনা,
ছাখেনি,—দুর্ল্লভ দ্বারে, অনন্তের পায়নি উদ্দেশ ;
বিষণ্ণ কৈশোর শেষে অনুভূতি জাগালো বেদনা
অন্তর-চুম্বন-চিহ্ন রেখে গেছে বঁধুর নির্দ্দেশ।

তার পর যৌবনের মত্তলীলা জীবন-বৈশাখী,—
শেষ হ'ল কামনার রাজসূয় যজ্ঞ সর্ব্বনেশে ;
সেদিনেও প্রেম লয়ে এসেছিলে হে মোর বিবাগী,
অশ্রদ্ধার অন্ধকার বুকে নিয়ে ফিরে গেলে হেসে।

আজি মোর দৃষ্টি-পাখী হে বঁধুয়া ভেঙ্গেছে আগল,
ছাখ প্রিয়, কি কল্লোল উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রপাতে ;
চেতনা কামনা আজ অরূপের পরশ-পাগল,
কাঙাল নয়ন দু'টী খুঁজিছে কি নিখিল সভাতে !
জীবন জাহ্নবী নীরে শুচিশুদ্ধ এ দেহ-দেউল,
আজ প্রেম-স্পর্শ চায় হে আমার বিগ্রহ অতুল !

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-সাধনা

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সুন্দর ছিল, আজও আছে। কিন্তু এই অতি সহজ সত্যটিকেও মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন হয়—বিশেষ করিয়া আজকার এই অন্ধ যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে। কবি মাত্রেই সুন্দরের দূত, কিন্তু সেই দৌত্যের কাজ জগতে অন্য কোনও কবি রবীন্দ্রনাথের মত নিপুণতা ও সার্থকতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া জানি না। কেবল মাত্র বিরলে বসিয়া মধুর কাব্য রচনাই রবীন্দ্রনাথ করেন নাই, আমাদের মাঝখানে আসিয়া আপনার অনিন্দ্য-সুন্দর জীবনের প্রভাব সংখ্যাতীতরূপে বিস্তার করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর জীবনটিকে পলে পলে সুন্দরের অভিমুখে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সুরুচিপূর্ণ মার্জ্জিত জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া আজ বাঙালীর রুচি ও রসবোধ শোভন ও মার্জ্জিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে বিরাট বা অতি নূতন কোনও তথ্য প্রকাশ করিবার শক্তি অথবা ধৃষ্টতা না রাখিলেও এ'কথাটী আজ নম্রচিত্তে স্মরণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে চাই যে কবিগুরুর জীবিতকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং চিরসুন্দরের অঙ্গনতলে সাধারণের জন্য যে আমন্ত্রণী তিনি নানা সময়ে নানা ভাবে পাঠাইয়াছেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হই নাই। তাঁহারি প্রসাদে সুন্দরী প্রকৃতিকে নিজে সুন্দরী বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছি। জন্মিয়া অবধিই ত' প্রকৃতির চিত্রভবনে লালিত হইতেছি, তাহার সৌরভ-সোহাগের প্রলেপ সুপ্ত অবস্থায় অঙ্গে গ্রহণ করিতেছি, জাগিয়া তাহারি কানন-অঙ্গনে খেলিতেছি, কিন্তু সমস্ত জীবনে সেই বিচিত্রার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছি মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য। জীবনের সেই কয়টি অমূল্য মুহূর্ত্তের জন্য ঋণী রহিলাম কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট। বহু সময় বন্ধুরা মিলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোকে বাঁচিয়া ছিল কি করিয়া। অধিক করিয়া ধরিলেও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের রসপ্রাচুর্য্যময় জীবনের তুলনায় রসের কি নিদারুণ উপবাসের মধ্যেই না বাঙালীর জীবন কাটিয়াছে। কবির প্রতিভার কৃপায় আজ আমাদের জীবন নিত্য কত নূতনতর রসে, সৌরভে, সৌন্দর্য্যে, আনন্দে পরিপূরিত হইয়া উঠিতেছে।

শারদোৎসবের ভূমিকায় কবিশেখর বলিতেছেন "আমার মস্ত দোষ এই যে আমি কেবল স্মরণ করাই; এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।" ইহাই ত আমাদের কবিরও কথা। অমৃতের শোধ অমৃত দিয়াই করিতে হয়, ভালবাসার অমৃত দিয়া। সুন্দরের অমৃত উৎসবে কি করিয়া ভালবাসার-আনন্দের অমৃত অকৃপণভাবে প্রচুর বিলাইয়া তবে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হয় কবি আপনার জীবন ভরিয়া তাহাই দেখাইতেছেন; নটরাজের নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপের সহিত নিজের জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনটিকে কিরূপে একতালে মিলাইয়া বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয় তাহারি ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি যে কবি,—বিচিত্রের লীলাকে কেবল মাত্র নিজের অন্তরে গ্রহণ করাই ত তাঁহার কাজ নয়, সেই লীলাকে বাহিরে বিচিত্র ভঙ্গিতে যে তাঁহাকেই লীলায়িত করিয়া তুলিতে হইবে। মানবকে গন্তব্যস্থানে চালাইয়া লইবার দাবী কবির নিকট করা চলিবে না সত্য কিন্তু কণ্ঠে সঙ্গীত লইয়া ক্লান্ত পথিকের চলার পথের সাথী তিনি না হইলে কে হইবে? কেজো লোকেরা কাজকে যখন পদে পদেই বেসুরো করিয়া ফেলিতে সুরু করে, নিজেদের জীবন হইতে রসের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে চায়, তখন নূতন করিয়া সুর বাঁধিয়া তুলিবার জন্য, শুষ্ক প্রাণে রসের সঞ্চার করিবার জন্য কবিদেরই বারে

বারে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহার তাগিদেই ত রবীন্দ্রনাথের অন্তরের চিরনবীনটি এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহাকে ঘন ঘন ঘরের বাহির করিয়া আনে। অর্থের অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখে বীভৎসভাবে ঝুঁকিয়া পড়া অন্ধপ্রায় নগরীর রুদ্ধ দ্বারে বর্ষায় বসন্তে আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে হয় :—

"ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগ্ল যে দোল্।"

নাচিয়া গান গাহিয়া তাহার অসাড় চিত্তে প্রাণের প্রচণ্ড দোলা জাগাইয়া তাহাকে আপনার জীবন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে হয়। ইহার জন্যই রবীন্দ্রনাথের ঋতুতে ঋতুতে ঋতু-উৎসবের এত আয়োজন। সমগ্র জাতিকে সৌন্দর্য্যানুভূতি ও বিপুল প্রাণস্পন্দনের মধ্যে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও জাগাইয়া তুলিবার এত চেষ্টা।

বাহিরে প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণতলে রূপে, রসে, বর্ণে ও নৃত্যে, গীতে, হিল্লোলে জীবনের যে অখণ্ড মহোৎসব দিনের পর দিন নব নব ভঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে মানবের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন, নহিলে সে বিশ্বলীলা যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কাননে পুষ্পের সৌরভোচ্ছ্বাসের সহিত আমাদের প্রাণের সৌরভ যদি সহজ ভাবে মিলাইতে না পারি তবে সুন্দরের সকল পূজা-আয়োজন যে সৌরভশূন্য রহিয়া যাইবে ;—

"ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।"

রসরাজের এই আহ্বানই ত কবি আপনার জীবনে বহিয়া আনিয়াছেন আপনার সকল কর্ম্মের, সকল আনন্দের, সকল গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া। তাঁহার সপ্ততিতম জন্মদিনের অভিভাষণেও দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই বার বার করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন—

"বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্য স্থানে চালাবার দাবী রাখিনে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য্য, যে ফুলপাতা, যে পাখীর গান, সেই রসের রসদে যোগান দিতেই আমরা আছি। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখ দুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার ওপর, এই-ই আমার একমাত্র পরিচয়। * * * এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলা সহচর।" (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

'ফাল্গুনী', 'শারদোৎসব', 'বর্ষামঙ্গল', 'ঋতুরঙ্গ', 'নবীন' 'গীতোৎসব' প্রভৃতি অভিনব ঋতুউৎসবগুলির অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির বিচিত্র রসধারা হইতে বঞ্চিত হওয়া যে কতবড় ক্ষতি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে তিনিই পারিবেন যিনি একবারের জন্যও ইহাদের কোনও একটিমাত্র অনুষ্ঠানেও যোগদান করিয়াছেন। জগতে কয়জন কবি এই ভাবে আপনার সকল শক্তি ও প্রচেষ্টার সহযোগে সাধারণের জন্য সত্যকার আনন্দ উপভোগের এমন অপূর্ব্ব আয়োজন করিয়াছেন? যে পরম নৃত্যের প্রাণ-বেদনায় যুগে যুগে, কালে কালে বিবশ বিশ্ব চেতনলোকের মধ্যে জাগিয়া প্রকাশ পাইতেছে, বিশ্বতনুর প্রতি অনুকণায় নৃত্যের যে মায়া দেখিয়া বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েই সর্ব্বকালে মুগ্ধ হইতেছেন তাহারি পরমাছন্দ সর্ব্বসাধারণের চিত্তে অন্তত আভাসেও জাগাইয়া তুলিবার এই নূতন পন্থা রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখাইলেন। নৃত্য ও সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সমাবেশে দৃষ্টি ও শ্রবণ, বোধশক্তির এই দুই পথ উন্মুক্ত পাইয়া সুন্দরের প্রকাশ মানসপটে প্রতিফলিত হইবার অধিক সুযোগ পাইল। কবিতা-আবৃত্তি নৃত্যের সহযোগিতা পাইয়া যেন নূতন সুরে কলধ্বনি করিয়া উঠিল, কবিতার সত্য ও গোপন রূপটিকে নৃত্য যেন সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। অবরুদ্ধ মানবমন নূতন করিয়া সুন্দর লোকে মুক্তি পাইল।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছন্দ-জিজ্ঞাসা

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম-এ

১

বাংলা ছন্দের পরিভাষা

পারিভাষিক শব্দের অর্থ এবং ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ থাক্‌তে পারে এবং এ রকম মতভেদ থাকা অন্যায়ও নয়। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ আলোচনায় যিনি সংজ্ঞা-শব্দগুলিকে যে অর্থে প্রয়োগ করেন তাঁকে আলোচনার আগাগোড়া সেই অর্থকে অপরিবর্ত্তিত রাখ্‌তে হবে এবং সে আলোচনার যথার্থ বিচার কর্‌তে হ'লে পাঠককেও 'আপাতত' সে অর্থগুলি স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। ছন্দের আলোচনায় আমি পারিভাষিক শব্দগুলিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছি সে সম্বন্ধে কারও মতান্তর থাক্‌তেও পারে এবং তিনি তা বল্‌তেও অধিকারী। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয়ে আমার বক্তব্যকে যদি বুঝ্‌তে হয় তবে 'আপাতত' তৎকালের জন্য আমার প্রযুক্ত অর্থকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে, নতুবা আমার কথা অপরের পক্ষে বোঝাই অসম্ভব হবে এবং ফলে অনেক স্থলে আমার বক্তব্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হবে। আমার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনাটি সম্বন্ধেও এই বিভ্রাটই ঘটেছে। ওই প্রবন্ধে যদিও পারিভাষিক শব্দগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা করি নি তথাপি সর্ব্বত্রই এগুলিকে স্পষ্টার্থ কর্‌তে চেষ্টা করেছিলুম। তবু নিষ্কৃতি পাই নি। তাই এখানে স্বতন্ত্র ভাবে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের আমার প্রযুক্ত বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট অর্থের আলোচনা কর্‌তে হ'ল। আশা করি আমার ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হ'লে আমার বক্তব্য বিষয়টি আর অস্পষ্ট থাক্‌বে না।

১। সিলেব্‌ল্, ধ্বনি বা **স্বর**—সিলেব্‌ল্ কথাটি আমি অবিকল ইংরেজি অর্থেই ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের একটি মাত্র প্রয়াসের দ্বারা একসঙ্গে যে ধ্বনিটুকু উচ্চারিত হয় তাকেই আমি **সিলেব্‌ল্** বলেছি। আর ইংরেজিতে 'সিলেব্‌ল্' যে-অর্থে ব্যবহৃত হয় আমি বাংলায় **ধ্বনি** কথাটিকেই ঠিক্ সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ অ, আ, অই, আউ, অন্, আল্ প্রভৃতিকে এক-একটি সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনি বলেছি। আবার প্রত্যেকটি সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনির অন্তরের তত্ত্ব হচ্ছে একটি ক'রে স্বর; প্রত্যেক সিলেব্‌ল্‌এর অন্তরে অনধিক একটি স্বরধ্বনি থাক্‌বেই। তাই স্থল বিশেষে **স্বর** কথাটিকেও সিলেব্‌ল্‌এর প্রতি-শব্দরূপে ব্যবহার করেছি। যথা—যখন ধ্বনিসংখ্যা বা স্বরসংখ্যার উল্লেখ করেছি তখন সর্ব্বত্রই সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যাই বুঝিয়েছে। আর সিলেব্‌ল্-বৃত্ত যে ছন্দ, তাকেই বলেছি স্বরবৃত্ত ছন্দ; যথাস্থানে তা বিশদ করা যাবে।

ছন্দের বিচারে ধ্বনি বা স্বরের অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-এরও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সব ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্ এক রকম নয়, তারও প্রকারভেদ আছে। একদিক্ থেকে বিচার কর্‌লে সব ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্‌কেই **অমিশ্র** ও **মিশ্র** এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। অ, আ, প্রভৃতি ব্যাকরণের বর্ণমালার সমস্ত স্বরবর্ণই অমিশ্র ধ্বনি; কারণ স্বরবর্ণই ধ্বনির বিশুদ্ধ রূপ। আর স্বরান্ত ব্যঞ্জন বর্ণমাত্রকেই মিশ্র ধ্বনি বল্‌তে পারি, কারণ তাতে বিশুদ্ধ ধ্বনি অর্থাৎ স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনের মিশাল থাকে। সুতরাং ক, কা, চি, চৌ প্রভৃতিকে মিশ্র ধ্বনি বল্‌ব। স্বরান্ত ব্যঞ্জনটি সংযুক্ত বা অসংযুক্ত দু-ই হ'তে পারে। অর্থাৎ ক, ক্র, শ্যা, শ্রী ইত্যাদি সমস্তই মিশ্র ধ্বনি।

আর-এক দিক্ থেকে বিচার করলে ধ্বনিকে **অযুগ্ম** ও **যুগ্ম** এ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। অযুগ্ম ও যুগ্ম ধ্বনি,

এই সংজ্ঞা দুটি পূর্ব্বে কেউ ব্যবহার করেছেন কি না জানি নে। আমি কি অর্থে এ শব্দ দুটির প্রয়োগ করেছি তাই বুঝিয়ে বল্‌ছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যুগ্মধ্বনি শব্দটার পরিবর্ত্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার কর্‌লে অনেকের পক্ষে সহজ হবে। আমি তাই করব।" আমি গোড়ায়ই ব'লে রাখ্‌ছি আমার প্রযুক্ত যুগ্মধ্বনি কথাটার পরিবর্ত্তে সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার করলে আমার সমস্ত আলোচনাটাই দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে উঠ্‌বে। কারণ আমি যুগ্মধ্বনি বল্‌তে শুধু সিলেব্‌ল্ বুঝি নে, বোঝা উচিতও নয়। যুগ্মধ্বনি বল্‌তে আমি বিশেষ এক প্রকার সিলেব্‌ল্ বুঝি; অযুগ্ম ধ্বনি বল্‌তে বিশেষ আরেক প্রকার সিলেব্‌ল বুঝি। পার্থক্যটা কি দেখানো দরকার। ইংরেজিতে সিলেব্‌ল্ কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় আমি ধ্বনি শব্দটিকে ঠিক্ সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। অনেক সময় দেখা যায় দু'টি স্বতন্ত্র সিলেব্‌ল-এর যোগে একটি নতুন সিলেব্‌ল্এর উৎপত্তি হয়। এ রকম যুক্ত-সিলেব্‌ল্‌কেই আমি যুগ্মধ্বনি নাম দিয়েছি। যেমন, 'জ' একটি সিলেব্‌ল্, আর 'ল' একটি সিলেব্‌ল্; এ দুটো মিলে যখন 'জল' হয় তখন 'ল' এর অকার লুপ্ত হ'য়ে একটি নতুন যুক্ত-সিলেব্‌ল্এর সৃষ্টি হয়। অতএব 'জল' কথাটিকে ছন্দের তরফ থেকে একটি যুগ্মধ্বনি বল্‌ব। আর যে সিলেব্‌ল্টি দুটি স্বতন্ত্র সিলেব্‌ল্এর যোগে উৎপন্ন নয় অর্থাৎ যে সিলেব্‌ল্টি স্বভাবতই অযুক্ত তাকেই আমি অযুগ্ম ধ্বনি বলেছি। 'পা' কথাটিকে বল্‌ব একটি অযুগ্ম ধ্বনি; কিন্তু 'পান' কথাটিকে বল্‌ব একটি যুগ্মধ্বনি; কেননা 'পা' এবং 'ন'—এ দুটি অযুগ্ম ধ্বনি যুক্ত হ'য়ে 'পান' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। দুটি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণের যোগেও একটি যুগ্মধ্বনি উৎপন্ন হ'তে পারে। যেমন, 'উ' একটি স্বর, আর 'ই' একটি স্বর; কিন্তু এ দুটিতে মিলে গিয়ে 'উই' এই নতুন স্বরটির উৎপত্তি হয়েছে। এ রকম দু'টি স্বতন্ত্র অর্থাৎ অযুক্ত স্বরের যোগে যে নতুন যুক্ত-স্বরের উৎপত্তি হয় তাকে **যুগ্মস্বর** বলা যায়, যথা—অই, আই, অউ, আউ, অও, আও, ইউ ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে যুগ্মস্বর যুগ্মধ্বনিরই প্রকারভেদ মাত্র, স্বতন্ত্র কিছু নয়।

লক্ষ্য করার বিষয়, 'জ' এবং 'ল' এ দুটি স্বতন্ত্র অযুগ্ম ধ্বনির মধ্যে পরবর্ত্তী 'ল' ধ্বনিটি আপন অকার লুপ্ত ক'রে দিয়ে অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী 'জ' ধ্বনিটির আশ্রয় নিয়েছে ব'লেই 'জল' এই যুগ্ম-ধ্বনিটির উৎপত্তি হ'তে পেরেছে। 'পান' কথাটির মধ্যেও 'ন'-এর অকার লুপ্ত হওয়ায় 'ন' আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে 'পা'-এর আশ্রয় নিয়েছে। তেমনি 'উই' কথাটির মধ্যেও 'ই' নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়ে 'উ'-এর আশ্রয় নিয়েছে বলেই এই যুগ্ম-স্বরটির উৎপত্তির হয়েছে। এরকম সর্ব্বত্রই। সুতরাং দেখা গেল প্রত্যেক যুগ্মধ্বনির মধ্যেই দু'টি ক'রে অংশ আছে; প্রথম অংশটি স্বতন্ত্র, দ্বিতীয় অংশটি স্বাতন্ত্র্যহীন। জল, পান, উই প্রভৃতি যুগ্মধ্বনিগুলির মধ্যে জ, পা এবং উ স্বতন্ত্র; এরা নিজের শক্তিতে বর্ত্তমান। শুধু তাই নয়, ল, ন এবং ই এই তিনটি স্বাতন্ত্র্যহীন ধ্বনিকে এরা আশ্রয় দিয়ে রক্ষাও করছে। সুতরাং প্রত্যেক যুগ্মধ্বনির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বতন্ত্র অংশটিকে **আশ্রেতা ধ্বনি** এবং পরবর্ত্তী স্বাতন্ত্র্যহীন অংশটিকে **আশ্রিত ধ্বনি** বল্‌তে পারি। জল, পান এবং উই, এই তিনটি যুগ্মধ্বনির মধ্যে জ, পা এবং উ আশ্রেতা; আর ল, ন এবং ই আশ্রিত। যুগ্মধ্বনির আশ্রিত অংশটি ব্যঞ্জনবর্ণও হ'তে পারে, স্বরবর্ণও হ'তে পারে। সুতরাং যুগ্মধ্বনিকে **ব্যঞ্জনান্তিক** ও **স্বরান্তিক,** এই দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন, জল, পান, গাছ, সাত প্রভৃতি ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনি। আর দুই, তুই, লাউ, ঝাউ প্রভৃতি স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনি। আশ্রিত ব্যঞ্জনকে হসন্ত চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দেশ করার প্রথা আছে। কিন্তু আশ্রিত স্বরকে নির্দ্দেশ করার কোনো চিহ্ন প্রচলিত নেই। আমার আলোচনায় আমি আশ্রিত স্বরকেও হসন্ত চিহ্নের দ্বারাই নির্দ্দেশ করেছি। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথও তাই করেছিলেন। কিন্তু হসন্ত স্বর, কথাটাতে স্বভাবতই আপত্তি হ'তে পারে। তাই আমার আলোচনায় আমি হসন্ত চিহ্নকেই **আশ্রয় চিহ্ন** নামে অভিহিত করেছি। এ নামটিতেই আমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়; সুতরাং এ নামে আপত্তি হবার আশঙ্কা নেই। ছন্দের বিচারে যুগ্ম-ধ্বনির আশ্রিত অংশটিকে নির্দ্দেশ করার অভিপ্রায়ে

পূর্ব্বোক্ত যুগ্মধ্বনিগুলিকে জল্, পান্, গাছ্, সাত্, দুই্, তুই্, লাউ্, ঝাউ্ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ করেছি।

পূর্ব্বেই বলেছি প্রত্যেক সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনির অন্তরে একটি ক'রে স্বর থাক্‌বেই। কিন্তু স্বর বলতে স্বরধ্বনি বোঝাচ্ছে, স্বরবর্ণ নয়। এ কথা বলার সার্থকতা এই যে সব সময় একটিমাত্র স্বরবর্ণের দ্বারা একটি স্বরধ্বনিকে প্রকাশ করা যায় না, একাধিক বর্ণের প্রয়োজন হয়। যথা দুই; তুই, লাউ, ঝাউ প্রভৃতি শব্দে দুটি ক'রে স্বর বর্ণের যোগে একটিমাত্র স্বরধ্বনিকে প্রকাশ করা হয়েছে। ইংরেজিতেও এরকম হয়, যথা—you, thou। কেউ বল্‌তে পারেন, দুই, তুই প্রভৃতি শব্দে দু'টি স্বরবর্ণের যোগে যুগ্মস্বরকে প্রকাশ করাই তো সঙ্গত। আমিও তাতে আপত্তি করিনে যদি সর্ব্বত্রই এ নিয়মটি বহাল থাকত। কিন্তু দেখা যায় বউ, মউ, দই, সই, হইল প্রভৃতি শব্দের যুগ্ম-স্বরটিকে দুটি বর্ণের পরিবর্ত্তে একটি বর্ণের সাহায্যেও লেখা হয়; যথা—বৌ, মৌ, দৈ, সৈ, হৈল। তাতে ছন্দ-রচনায় কখনও কখনও দ্বৈরাচার হ'তে পারে। যেমন—

হবে বা দয়ার্দ্র চিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচী কারাবাসে ?
× × ×
সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ হাসে দেবগণ,
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে।
— বৃত্রসংহার, দ্বাদশ সর্গ

এখানে দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে 'হৈলা' এবং চতুর্থ পংক্তিতে আছে 'হইলা'। একই শব্দের ওজন দু জায়গায় দু রকমের হয়েছে। তাতে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয়েছে, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী কবিরা কখনও 'হৈল' লেখেন ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুবর্ত্তী কবিরা স্বতই কানের ওজনের উপর নির্ভর ক'রে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পংক্তিতে "হ'ল" এবং চতুর্থ পংক্তিতে "হ'লেন" লিখ্‌বেন এবং তাতে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য্য না ক'মে বরং বাড়্‌বে ব'লেই আমার বিশ্বাস। প্রাকৃত বাংলার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশতই এ কথা বলছিনে; ছন্দ যদি মধুর হয় তবে প্রাকৃত বা সংস্কৃত কোনো বাংলাতেই আমার আপত্তি নেই। আমি আমার কানের মাধুর্য্য-বৃদ্ধি থেকেই এ প্রশ্ন তুল্‌ছি।

"আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে" এবং
"আপনি হ'লেন বন্দী আপন সংশয়ে"—

এ দুটি লাইনের মধ্যে দ্বিতীয়টিই আমার কানে বেশি ভালো শোনায়। কিন্তু কেন বেশি ভালো শোনায়, এই হচ্ছে আমার জিজ্ঞাসা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের কাছে আমার এই জিজ্ঞাসারই উত্তর প্রত্যাশা কর্‌ছি। অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে আমি এই জিজ্ঞাসার পথেই অগ্রসর হয়েছিলুম এবং নিজেই তার একটি সমাধান ক'রে সে-বিষয়ে কবি ও ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মতামতের প্রতীক্ষা করেছিলুম।

যুগ্মধ্বনির আলোচনায় ফিরে আসা যাক্। আমরা দেখেছি ঐ আর ঔ, এ দুটি যুগ্মধ্বনিকে কোনো কোনো স্থলে দু' রকমে লেখা যায়,—কখনও একটি বর্ণের সাহায্যে আর কখন ও দুটি বর্ণের সাহায্যে। অর্থাৎ ঔ=অউ্, যথা —বৌ, বউ্; এবং ঐ=অই বা ওই্, যথা- খৈ, খই্। এই দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া আর সর্ব্বত্রই যুগ্মস্বর দুটি স্বরবর্ণের সাহায্যেই লিপিবদ্ধ হয়। যথা—লাউ্, ঝাউ্, দাও্, দুই্ ইত্যাদি। কিন্তু দুটি স্বরবর্ণ একত্র লিপিবদ্ধ হ'লেই যুগ্মস্বর হয় না। দাও যুগ্ম বটে; কিন্তু 'দিও' 'করিও' ইত্যাদি যুগ্ম নয়, বিযুক্ত। কারণ দাও=দাও্; আর দিও, করিও =দিয়ো, করিয়ো।

ঐ এবং ঔ ছাড়া আর সমস্ত যুগ্মধ্বনি প্রকাশ করতেই দুটি অক্ষরের প্রয়োজন হয়। আর অযুগ্ম ধ্বনিকে লিপিবদ্ধ করতে স্বভাবতই একটি অক্ষরের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ নিয়মটিরও ব্যতিক্রম বাংলায় আছে। অর্থাৎ দুটি অক্ষরের সাহায্যে একটি অযুগ্ম ধ্বনিকে প্রকাশ করতে হয় এমন দৃষ্টান্ত ও বাংলায় পাওয়া যায়। যথা—

শাল বনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠ্‌তো কেঁপে। (স্বরবৃত্ত)
—মাটির ডাক, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে। (মাত্রাবৃত্ত)
—লীলা-সঙ্গিনী, ঐ

নীড়ে-ধাওয়া পাখীর ডানায়—
সায়াহ্ন-গগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়। (অক্ষরবৃত্ত)
—মুক্তি ঐ

দৃষ্টান্ত তিনটি তিনটি স্বতন্ত্র ছন্দ থেকে আহরণ করেছি। হাওয়া, ধাওয়া প্রভৃতি শব্দের 'ওয়া' অংশটিতে প্রত্যক্ষত দুটি ক'রে স্বতন্ত্র ধ্বনি রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের তিনটি ছন্দেই হাওয়া প্রভৃতি শব্দের ওয়া-কে এক ব'লে ধরা হয়েছে, দুই বলে ধরা হয়নি। অথচ ছন্দ যে সর্ব্বত্রই নির্খুত আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং প্রশ্ন হ'তে পারে প্রত্যক্ষত' যা দুই, ছন্দে তা এক হ'ল কিরূপে? এর উত্তর হচ্ছে যে চোখের কাছে যা প্রত্যক্ষ তা নিয়ে ছন্দ কারবার করে না, কানের কাছে যা প্রত্যক্ষ তা নিয়েই ছন্দের কারবার। আর ওয়া কথাটা চোখের কাছে দুই হ'লেও কানের কাছে একই। কারণ উক্ত শব্দগুলিতে ওয়া কথাটার আসল রূপ হচ্ছে ওআ অর্থাৎ ওা। অন্য কথায় অন্তঃস্থ ব-য়ে আকার দিলে যে ধ্বনি হয় হাওয়া প্রভৃতি-শব্দের ওয়া কথার ধ্বনি অবিকল তাই। ইংরেজি wa এবং বাংলা ওয়া কথার ধ্বনি অভিন্ন। সুতরাং দু'টি অক্ষরের যোগে লেখা হ'লেও ওয়া কথাটিতে ধ্বনি আছে একটিই এবং সে জন্যই ছন্দে ওয়া-কে এক ব'লেই গণ্য করা হয়। আর ওয়া বা wa ধ্বনিটি যে অযুগ্ম তা বলাই নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই ধ্বনিটির পরে কোনো আশ্রিত ধ্বনির অস্তিত্ব নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এস্থলে বাংলায় একটি অযুগ্ম ধ্বনি প্রকাশের জন্য দুটি স্বর-বর্ণের ব্যবহার হয়েছে। এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড হ'তে পেরেছে, কারণ বাংলা বর্ণমালা থেকে অন্তঃস্থ ব-য়ের উচ্চারণ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে অথচ বাংলা ভাষা থেকে তা লুপ্ত হয়নি। এটাকে বাংলা বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতির একটা অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি ব'লে মনে করি। যা হোক্, আরেকটু লক্ষ্য করা দরকার যে হাওয়া প্রভৃতি-শব্দের শেষাংশস্থিত ওয়া-ই একটি অযুগ্ম ধ্বনির সমান। কিন্তু ওয়াকিফ্, ওয়ারিশ প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বাংশস্থিত ওয়া-কে দু'টি অযুগ্ম ধ্বনি ব'লে গণ্য করাই বাংলা ধ্বনিবিচারের রীতি।

একটি অযুগ্ম ধ্বনিকে দুটি স্বতন্ত্র বর্ণের দ্বারা প্রকাশ করার আরেক প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। যথা—

কেউ্ যে কারে | চিনি নাক | সেটা মস্ত | বাঁচন্।
তা না হ'লে | নাচিয়ে দিত | বিষম্ তুর্কি- | নাচন্।
—অচেনা, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এটা স্বরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। এর প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে সিলেব্‌ল্ বা স্বর-ধ্বনি আছে, অন্তিম পর্ব্বে দুটি ক'রে। সুতরাং এটিকে চতুঃস্বর-পর্ব্বিক ছন্দ বল্‌তে পারি। লক্ষ্য করার বিষয়, এর সব পর্ব্বেই চারটি স্বরধ্বনি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে; কেবল দ্বিতীয় পংক্তির দ্বিতীয় পর্ব্বে আপাতত দেখ্‌তে পাঁচটি সিলেব্‌ল্ দেখা গেলেও শুন্‌তে কিন্তু চার সিলেবল্ এর মতোই শোনাচ্ছে। অর্থাৎ এই পর্ব্বটিকে পাঁচটি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণের যোগে লেখা হ'লেও আসলে এতে চারটির বেশি স্বরধ্বনি নেই। তার কারণ 'নাচিয়ে' কথাটির 'ইয়ে' অংশটি প্রকৃত পক্ষে দুটি স্বতন্ত্র বর্ণের দ্বারা প্রকাশিত একটি স্বরধ্বনি বা সিলেব্‌ল্ মাত্র। কেননা, এখানে ইয়ে কথাটার আসল রূপ হচ্ছে ই্এ অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালার অন্তঃস্থ য-য়ে একার দিলে যে ধ্বনি হয় এখানে ইয়ে কথাটার ধ্বনি অবিকল তাই। ইংরেজি ye এবং নাচিয়ে-র ইয়ে অংশটি উচ্চারণ হিসেবে একই। সুতরাং এস্থলে নাচিয়ে শব্দটির উচ্চারণগত প্রকৃত রূপ হচ্ছে নাচ্য়ে অথবা নাচ্ye। সুতরাং দুটি অক্ষরের যোগে লেখা হ'লেও এখানে ইয়ে কথাটিতে ধ্বনি আছে একটি মাত্র এবং সে জন্যই ছন্দে এটি এক ব'লেই গণ্য হয়েছে। আর য়ে বা ye ধ্বনিটি যে অযুগ্ম তা বলাই বাহুল্য, কেননা এই ধ্বনিটির পরে কোনো আশ্রিত ধ্বনি বর্ত্তমান নেই। সুতরাং দেখা গেল এখানেও একটি অযুগ্ম ধ্বনি প্রকাশের জন্য দুটি স্বতন্ত্র বর্ণের প্রয়োগ হয়েছে।

এস্থলে ব'লে রাখা দরকার যে বাংলা ছন্দে সর্ব্বত্রই ইয়ে একটি মাত্র অযুগ্মধ্বনি রূপে গৃহীত হয় না। অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ইয়ে কথাটি সর্ব্বদাই দুটি অযুগ্মধ্বনি

(ই আর য়ে) ব'লে গণ্য হয়, এবং ওদুই ছন্দে ওরকম হওয়াই সঙ্গত। শুধু স্বরবৃত্ত ছন্দেই স্থল বিশেষে ইয়ে এক ধ্বনি হিসেবে গৃহীত হয়: আবার স্বরবৃত্ত ছন্দেও অন্যস্থলে ইয়ে দুটি পৃথক্ ধ্বনি ব'লে ব্যবহৃত হ'তে পারে। কিন্তু 'ইয়ে'র এই দু'রকম বিপরীত ব্যবহার একটি নিয়ম-বহির্ভূত ব্যাপার নয়, এরকম ব্যবহারেরও একটি নিয়ম আছে। সে নিয়মটি হচ্ছে এই যে, যেখানে দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন হয় সেখানে ই এবং য়ে ধ্বনি দুটি সংহত বা সংশ্লিষ্ট হ'য়ে একটি ধ্বনিতে পরিণত হয়। আবার যেখানে দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন নেই সেখানে এরা দুটি স্বতন্ত্র ও বিশ্লিষ্ট ধ্বনি ব'লেই গ্রাহ্য হয়। সংস্কৃত ভাষায়ও এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যথা—'বরেণ্যম্' কথাটি স্থান বিশেষে 'বরেণ্‌ইয়ম্' রূপেও উচ্চারিত হয়। যদি তা না হ'ত তবে গায়ত্রী ছন্দও ঠিক্ থাক্‌ত না। যাহোক্ ইয়ে-র উচ্চারণ কোথায় দ্রুত হবে, কোথায় হবে না তারও একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। তাও দেখানো দরকার। প্রথমত, প্রতি ছন্দ-পর্ব্বের পরেই একটুখানি যতি বা বিরাম থাকে ব'লে ছন্দ-পর্ব্বের শেষ প্রান্তস্থিত ইয়ে কথাটি দ্রুত উচ্চারিত হয় না সুতরাং একটি ধ্বনি ব'লে গণ্য হবার প্রয়োজনও হয় না। যথা—

ত্রিভুবনের | গোপন কথা- | থানি
কে জাগিয়ে | তুলবে তাহার মনে
আমি যদি | আমার মুক্তি | নিয়ে
যুক্তি করি | আপন গৃহ- | কোণে?
—কবির বয়স, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

মাথার দিব্য | উঠো না কেউ | আগ্‌ বাড়িয়ে | দিতে আমায়,
চল্‌চে যেমন | চলুক তেমন | হঠাৎ যেন | গান না থামায়।
—বিদায়, ঐ

এখানে জাগিয়ে, এবং বাড়িয়ে কথা দুটি ছন্দ-পর্ব্বের শেষ দিকে আছে এবং তার পরেই যতি; সুতরাং দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। তাই ওদুটি কথায় ইয়ে দুটি স্বতন্ত্র অযুগ্মধ্বনি ব'লেই গৃহীত হয়েছে। যদি ছন্দ-পর্ব্বের শেষ প্রান্তস্থিত ইয়ে-কে দ্রুত উচ্চারণ ক'রে একটি সিলেব্‌ল্ ধরা যায় তবে স্বভাবতই উচ্চারণটা অস্বাভাবিক আর ছন্দটাও বিকৃত হ'য়ে যায়। "তা না হ'লে নাচিয়ে দিত বিষম তুকি-নাচন", এ পংক্তিটির দ্বিতীয় পর্ব্বটিকে যদি "দিত নাচিয়ে" করা যায় তা হ'লেই আমার এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। ইয়ে-র বিযুক্ত ব্যবহারের দ্বিতীয় নিয়মটি হ'চ্ছে এই;—দিয়ে, নিয়ে প্রভৃতি যে সব শব্দ দুটি মাত্র অক্ষরের যোগে লেখা হয়, সে সব শব্দের ইয়ে সব সময়ই বিযুক্ত থাকে, কারণ এসব স্থলে ইয়ে-র দ্রুত উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না। উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তের 'নিয়ে' কথাটিই তার প্রমাণ। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

যাহার লাগি | চক্ষু বুজে | বহিয়ে দিলাম | অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ | দিয়েও দেখি | বিশ্বভুবন | মস্ত ডাগর।
—বোঝাপড়া, ঐ

মন নিয়ে কেউ | বাঁচে নাক, | মন ব'লে যা | পায় রে
কোনো জন্মে | মন সেটা নয় | জানে না কেউ | হায় রে!
—অচেনা, ঐ

এখানে দিয়ে এবং নিয়ে শব্দেও দুটি ক'রে সিলেব্‌ল্, আর বহিয়ে শব্দটিতেও দুটি সিলেব্‌ল্। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় বহিয়ে শব্দে ইয়ে এক সিলেব্‌ল্ হওয়াতে পূর্ব্ববর্ত্তী ব-টি প্রত্যক্ষত অযুগ্ম হ'লেও এস্থলে আশ্রিত হ্ বর্ণটির যোগে যুগ্মতা লাভ কর্‌ল। কারণ এখানে বহিয়ে কথাটির আসল রূপ হচ্ছে বহ্‌য়ে, তাই বহিয়ে শব্দের ইয়ে-কে অযুগ্ম এবং বহ্-কে যুগ্ম ব'লে গণনা কর্‌তে হবে। কিন্তু "দেয় বহিয়ে" লেখা হ'লে বহিয়ে কথাটিকে তিনটি স্বতন্ত্র অযুগ্ম ধ্বনি ব'লে গ্রহণ কর্‌তে হবে।

অযুগ্ম ও যুগ্ম ধ্বনির বিস্তৃত আলোচনা কর্‌তে হ'ল; কারণ আমি সমস্ত বাংলা ছন্দকেই এদুটি পারিভাষিক শব্দের সাহায্যেই আলোচনা করেছি। সুতরাং এ দুটি সংজ্ঞা-শব্দ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না হ'লে আমার সমস্ত আলোচনাই অস্পষ্ট বোধ হবে।

২। মাত্রা—সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে মাত্রা কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় আমি এ শব্দটিকে ঠিক্ সেই অর্থেই ব্যবহার করেছি। একটি হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে ওশাস্ত্রে তাকেই এক মাত্রা বলে একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বঃ (শ্রুতবোধ)। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে

দীর্ঘস্বরের উচ্চারণে হ্রস্বস্বরের দ্বিগুণ সময় লাগে। তাই দীর্ঘ-স্বরকে স্বভাবতই দ্বিমাত্রিক বলা হয়—দ্বিমাত্রো দীর্ঘ-উচ্যতে (ঐ)। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে মাত্রা শব্দের প্রতি-শব্দ হিসাবে 'কলা' কথাটিও ব্যবহৃত হয়। 'মাত্রা'কে ইংরাজিতে বলা যায় metrical moment আর 'কলা'কে বল্‌তে পারি metrical digit।

সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে সমস্ত ধ্বনিকেই লঘু এবং গুরু, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। হ্রস্ব স্বর এবং হ্রস্ব স্বরান্ত সমস্ত (অযুক্ত বা যুক্ত) ব্যঞ্জনের ধ্বনিকেই **লঘু** ব'লে গণ্য করা হয়। আর দীর্ঘ স্বর এবং দীর্ঘ-স্বরান্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে গুরু ব'লে গ্রহণ করা হয়; তা ছাড়া, সংযুক্তাক্ষর, অনুস্বার এবং বিসর্গের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব ধ্বনিকেও **গুরু** বলা হয়। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি; সুতরাং এস্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় লঘু ধ্বনিকে একমাত্রা এবং গুরু ধ্বনিকে দু'মাত্রা ধরা হয়। যথা—ছন্দ শব্দের দ-য়ের অকারকে লঘু অর্থাৎ এক-মাত্রিক অথচ ছ-য়ের অকারকে গুরু এবং কাজেই দ্বিমাত্রিক ধরা হয়; কেননা ছ-য়ের পরেই ন্দ এই যুক্ত বর্ণটি আছে। অতএব ছন্দ শব্দে সব শুদ্ধ তিন মাত্রা।

পূর্ব্বেই বলেছি বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমি সমস্ত ধ্বনিকেই অযুগ্ম ও যুগ্ম, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে যেসব ধ্বনিকে দীর্ঘ বলা হয়েছে বাংলায় সে-সব ধ্বনি দীর্ঘতা হারিয়ে হ্রস্বত্ব লাভ করেছে। বাংলা 'ধনী' শব্দের ঈকারের দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না। অথচ বাংলায়ও এক স্বতন্ত্র রকমের দীর্ঘস্বরের ব্যবহার চলে; কিন্তু বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে সে দীর্ঘতার মূল্য প্রায় নেই বল্‌লেই হয়; কারণ বাংলা ছন্দ ধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। তথাপি কদাচিৎ দু'য়েক জায়গায় বাংলায়ও দীর্ঘতার খুব সুন্দর প্রয়োগ হ'তে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

"চলি চলি | পা পা" | টলি টলি | যায়,
গরবিনী | হেসে হেসে | আড়ে আড়ে | চায়।
—হাসিরাশি, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ

পা কথাটি যদিও বাংলায় প্রায় সর্ব্বত্রই লঘু, তথাপি এস্থলে দুটি পা শব্দেরই দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু এ রকম প্রয়োগ বাংলা ছন্দে খুব কমই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করা যাবে।

একটু পূর্ব্বেই আমি বলেছি, বাংলা ছন্দ ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। সাধারণ ভাবে দেখ্‌তে গেলে এ উক্তিটি অত্যন্ত ভ্রান্ত ব'লেই মনে হবে এবং মনে হওয়া অসঙ্গতও নয়। কিন্তু আমি হ্রস্ব দীর্ঘ কথা দুটি অত্যন্ত সংকীর্ণ বৈয়াকরণিক অর্থে ব্যবহার করেছি, সাধারণ অর্থে ব্যবহার করি নি। নতুবা দীর্ঘ ও গুরু, এ দুটি পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে বিরোধ ঘট্‌বার সম্ভাবনা আছে। ছন্দ শব্দের ছ-য়ের অ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে হ্রস্ব বটে, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র অনুসারে গুরু, দীর্ঘ নয়। সংস্কৃত ছন্দের পরিভাষায় লঘু-গুরু এ সংজ্ঞা দুটিরই প্রয়োগ আছে, হ্রস্ব-দীর্ঘ-শব্দের ব্যবহার নেই। আমিও সর্ব্বত্রই হ্রস্ব-দীর্ঘ শব্দ দুটিকে ব্যাকরণের প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করেছি, ছন্দ-পরিভাষার লঘু-গুরু অর্থে ব্যবহার করি নি। যেমন, জল শব্দের অ এবং চাঁদ শব্দের আ-কে আমি গুরু বল্‌ব, দীর্ঘ বল্‌ব না। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রকাররাও তা-ই কর্‌তেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রের লঘু-গুরুতার বিধানও বাংলা ছন্দের আলোচনায় পুরোপুরি খাটে না। কারণ সংস্কৃত ভাষায় ঐ (অই্) এবং ঔ (অউ্) ছাড়া যুগ্মস্বরের অস্তিত্ব নেই; অথচ বাংলায় অও্, আও্, ইউ্, উই্, এই্, এউ্, এও্, ওই্ প্রভৃতি বহু যুগ্মস্বরের প্রয়োগ আছে। আবার সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘস্বরের বহুল প্রয়োগ আছে; অথচ বাংলায় অন্তত ছন্দের তরফ থেকে দীর্ঘস্বরের (ব্যাকরণের অর্থে) ব্যবহার প্রায় নেই বল্‌লেই হয়। যাহোক্, এ কথা বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, আমি অযুগ্ম ধ্বনিকেই লঘু অর্থাৎ একমাত্রিক আর যুগ্মধ্বনিকেই গুরু এবং কাজেই দ্বিমাত্রিক ব'লে গ্রহণ করেছি। যথা জল শব্দটার অ-কে দীর্ঘও বল্‌ব না, গুরুও বল্‌ব না; আমি সমস্ত 'জল্' শব্দটাকেই একটি যুগ্ম অতএব গুরু ধ্বনি বল্‌ব। কাজেই জল শব্দে দু'মাত্রাই ধর্‌ব। তেমনি, রাম শব্দটিও যুগ্ম অতএব দ্বিমাত্রিক। আবার পাতা এবং কাশী, এ দুটি শব্দে দুটি করে অযুগ্ম বা লঘু ধ্বনি আছে; সুতরাং এ দুটি শব্দও দ্বিমাত্রিক।

ছন্দ বা ছন্‌দ শব্দে একটি যুগ্ম (ছন্) এবং একটি অযুগ্ম ধ্বনি আছে ; সুতরাং এ শব্দে মাত্রা আছে তিনটি।

৩। **অক্ষর**—সিলেব্‌ল্ কথাটি ব্যবহার করেছি ঠিক্ ইংরেজি অর্থে; মাত্রা শব্দটি ব্যবহার করেছি সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের প্রচলিত অর্থে। তেম্‌নি অক্ষর শব্দটিকে আমি বাংলা ভাষার প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ লিপিবদ্ধ ভাষার প্রত্যেকটি হরফকেই আমি একেকটি অক্ষর নামে অভিহিত করেছি।

অক্ষর শব্দটি ব্যবহার কর্‌তে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ স্থলবিশেষে এ শব্দটির তিনটি স্বতন্ত্র অর্থ আছে। প্রথমত ব্যাকরণের অর্থ। যেমন অস্ত্যান্তরস্থাম্। ব্যাকরণের বর্ণ-বিশ্লেষণের নিয়ম অনুসারে এ কথাটিতে চোদ্দটি বর্ণ বা অক্ষর (অর্থাৎ letter) আছে, এ কথা যে-কোনো পাঠশালার ছাত্রও জানে। দ্বিতীয়ত সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের প্রযুক্ত অর্থ। ব্যাকরণের অক্ষর এবং ছন্দ-শাস্ত্রের অক্ষর এক জিনিষ নয়। ছন্দ-শাস্ত্রের মতে যে বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি এক সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে সিলেব্‌ল্ সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে তারই নাম অক্ষর। যেমন, পূর্বোক্ত অস্ত্যান্তরস্থাম্ কথাটিতে ব্যাকরণের মতে চোদ্দটি অক্ষর হ'লেও সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রমতে এখানে পাঁচটি মাত্র অক্ষর আছে, কেননা অ-স্ত্যা-ন্ত-র-স্থাম্ বাগ্‌যন্ত্রের এই পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রয়াস থেকে এই সমগ্র কথাটা উচ্চারিত হচ্ছে। অক্ষর শব্দের তৃতীয় অর্থ বাংলা ভাষার প্রচলিত অর্থ। বাংলায় সাধারণত' অক্ষর বল্‌তে একেকটি লিখিত হরফকেই বোঝায়। দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। যেমন, পুণ্যবান্। এ কথাটিতে ব্যাকরণের মতে অক্ষর বা letter আছে আটটি ; সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের মতে অক্ষর বা syllable আছে তিনটি। কিন্তু বাংলায় প্রচলিত অর্থে এখানে অক্ষর বা হরফ আছে চারটি কেননা হসন্ত ন্-কেও একটি অক্ষর ব'লে ধরাই বাংলা রীতি। আর বাংলা ছন্দের অক্ষরও এই তৃতীয় অর্থেই গণনা করা হয়। নতুবা—

কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান্

এই পংক্তিটিতে চোদ্দ অক্ষর গণনা করা সম্ভব হ'ত না। আমিও সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে প্রযুক্ত অর্থ বর্জন ক'রে বাংলায় প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করেছি। কেননা রাম, দাস, জল শব্দের ম, স এবং ল-এর হসন্ত উচ্চারণের কথা স্মরণ রেখে যদি সংস্কৃত প্রথা অনুসারে রাম, দাস, জল প্রভৃতি শব্দকে একেকটি 'অক্ষর' (অর্থাৎ সিলেব্‌ল্) ধরি তবে কাশীরাম বা তার স্বজাতীয় কেউ আমার উপর প্রসন্ন হবেন না। সুতরাং রাম কথাটিতে সংস্কৃত প্রথায় একটি অক্ষর না ধ'রে বাংলা প্রথায় দুটি অক্ষর ধরাই সমীচীন মনে করেছি। আর এই জন্যই উদ্ধৃত পংক্তিটিতে চোদ্দটি 'অক্ষর' ধর্‌তে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এভাবে বাংলা প্রথায় হরফকে অক্ষর ধ'রে ছন্দ রচনা কর্‌লেও ছন্দ প্রায়ই অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু তাতে ছন্দ-শাস্ত্রকারের মুশ্‌কিল হয় ; একটু পরেই তা দেখাতে চেষ্টা কর্‌ব।

২

বাংলা ছন্দের ত্রিধারা

ধ্বনি (বা স্বর), মাত্রা ও অক্ষর, আমার ব্যবহৃত এই তিনটি সংজ্ঞা-শব্দের পারিভাষিক পরিচয় দেওয়া গেল। এখন একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এদের প্রয়োগ-প্রণালীটা দেখা যাক্। বাংলা 'চন্দন' শব্দটা নিয়ে বিচার করা যাক্। বলা বাহুল্য এ শব্দটির অন্তিম ন-টি বাংলায় হসন্ত ন্-এর মতো উচ্চারিত হয়। ধ্বনি বা স্বর হিসেবে এখানে দুটিমাত্র ধ্বনি আছে—যথা চন্ এবং দন্ ; দুটিই যুগ্ম ধ্বনি। মাত্রা হিসেবে এ শব্দটিতে মাত্রা আছে চারটি, কেননা প্রত্যেকটি যুগ্ম ধ্বনিতেই দুটি ক'রে মাত্রা রয়েছে। আর অক্ষর হিসেবে 'চন্দন' শব্দটিতে অক্ষর রয়েছে তিনটি ; হসন্তোচ্চারিত ন-টিও একটি অক্ষর ব'লে গণ্য হবে। তেম্‌নি পুণ্যবান্ শব্দে ধ্বনি বা স্বর আছে তিনটি, মাত্রা পাঁচটি এবং অক্ষর চারটি।

ধ্বনির এই তিনটি প্রয়োগ-প্রণালীর উপরেই আমি বাংলা ছন্দের তিনটি শ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। রবীন্দ্রনাথ উপমাযোগে একই জিনিষের অবস্থাবিশেষে "দুরকম বিপরীত ব্যবহারের" কথা বলেছেন। আমি একথার সমর্থন ক'রেই

বলি যে একই ধ্বনি অবস্থাবিশেষে তিন রকম ভাবে ব্যবহৃত হয়। কবি যখন যেরকম ইচ্ছে সে রকম ব্যবহারই করতে পারেন; কিন্তু কবিদের এ ইচ্ছা কখনও একেবারে স্বেচ্ছাচার নয়। তাঁদের ইচ্ছাও শ্রুতি-মাধুর্য্যের কতগুলি নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়ম নির্ণয় করাই আমার উদ্দেশ্য। যাহোক্, ধ্বনির এই বিভিন্ন ব্যবহারের উপর নির্ভর ক'রেই আমি ছন্দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। ছন্দের এই তিন ধারার থিওরিটাকেই অস্বীকার করলে আমার কোনো বক্তব্যই বোধগম্য হবে না। তাই স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এই তিনটি নামেরও পারিভাষিক পরিচয় দেওয়া দরকার।

১। স্বরবৃত্ত—স্বর বা ধ্বনির সংখ্যার উপর ভিত্তি ক'রে যে ছন্দ রচিত হয় তাকেই আমি স্বরবৃত্ত ছন্দ বলেছি। এ ছন্দে মাত্রা-পরিমাণ বা অক্ষর-সংখ্যা স্থির থাকা আবশ্যিক নয়। পৌষের বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের নব রচিত দৃষ্টান্ত থেকেই দেখাচ্ছি।—

(১) এই্ যে এল | সেই্ আমারি | স্বপ্নে দেখা | রূপ্,
কই্ দেউলে | দেউ্টি দিলি, | কই্ জ্বালালি | ধূপ্।
যায়্ যদি রে | যাক্ না ফিরে | চাই্ নে তারে | রাখি
সব্ গেলেও | হায়্ রে তবু | স্বপ্ন রবে | বাকি।

(২) দুই্ জনে জুঁই্ | তুল্তে যখন্ | গেলেম্ বনের্ | ধারে,
সন্ধ্যা আলোর্ | মেঘের্ ঝালর্ | ঢাক্ল অন্ধ- | কারে।
কুঞ্জে গোপন্ | গন্ধ বাজায়্ | নিরুদ্দেশের্ | বাঁশি,
দোঁহার্ নয়ন | খুঁজে বেড়ায়্ | দোঁহার্ মুখের্ | হাসি।

এ দুটি দৃষ্টান্তই স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। দুটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পর্ব্বে সিলেব্ল্, ধ্বনি বা স্বর আছে চারটি ক'রে। সুতরাং এটি চতুঃস্বরপর্ব্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ। এখানে এই্, সেই্, দুই্, জুঁই্, যায়্, যাক্, খন্, লেম্, নের্ প্রভৃতি সমস্ত যুগ্মধ্বনিই এক unit ব'লে গৃহীত হয়েছে। ধ্বনি-পরিমাণের বিচারে যুগ্মধ্বনিগুলিকে দু'মাত্রা হিসেবে ধরা হয়নি। স্বরবৃত্ত ছন্দের নিয়মই এই। দৃষ্টান্ত দুটিতেই আশ্রয়চিহ্নের যোগে যুগ্মধ্বনিগুলিকে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। এ ছন্দের পর্ব্বগুলিতে মাত্রা-সংখ্যা স্থির থাকে না।

২। মাত্রাবৃত্ত—ধ্বনির পরিমাণ বা quantityর উপর ভিত্তি ক'রে যে ছন্দ রচিত হয় তারই নাম মাত্রাবৃত্ত; কারণ মাত্রাসংখ্যা স্থির রাখাই হচ্ছে ধ্বনি-পরিমাণ স্থির রাখার উপায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ থেকেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) মনে পড়ে | দুই্ জনে | জুঁই্ তুলে | বাল্যে
নিরালায়্ | বনছায়্ | গেঁথেছিনু | মাল্যে।
দোঁহার্ ত- | রুণ্ প্রাণ্ | বেঁধে দিল | গন্ধে
আলোয়্ আঁ- | ধারে মেশা | নিভৃত আ- | নন্দে।

(২) কাঁধে মই্, | বলে, "কই্ | ভুঁই্ চাঁপা | গাছ্।"
দই্-ভাঁড়ে | ছিপ্ ছাড়ে, | খোঁজে কই্ মাছ্।
খুঁটে ছাই্ | মেখে লাউ্ | রাঁধে ঝাউ্- | পাতা,
কী খেতাব্ | দেব তারে | ঘুরে যায়্ | মাথা।

(৩) সখাসনে | উৎ সবে | বৎ সর | যায়্
শেষে মরি | বিরহের্ | ক্ষুৎ পিপা- | সায়্।
ফাগুনের্ | দিন্ শেষে | মউ্ মাছি | ও যে
মধুহীন্ | বনে বৃথা | মাধবীরে | খোঁজে।

এ তিনটি দৃষ্টান্তই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। আর তিনটি দৃষ্টান্তেরই প্রতিপর্ব্বে চার মাত্রা ক'রে আছে। সুতরাং এগুলিকে চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত বলব। এখানে দুই্, জুঁই্, বৎ, উৎ, প্রাণ্, দিন্ প্রভৃতি যুগ্ম ধ্বনিগুলি দ্বিমাত্রিক ব'লেই গণ্য হয়েছে; একেকটি syllabic unit ব'লে গণ্য হয় নি। এইটেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিয়ম।

৩। অক্ষরবৃত্ত—যে ছন্দে সাধারণত' প্রতি পর্ব্বের (বাংলায় প্রচলিত অর্থে) 'অক্ষরে'র সংখ্যা স্থির রেখে রচিত হয় তাকেই অক্ষরবৃত্ত বলেছি। এ ছন্দে ধ্বনির অর্থাৎ সিলেব্ল্-এর সংখ্যাও স্থির থাকে না, ধ্বনির মাত্রা-পরিমাণ বা quantity ও স্থির থাকে না। স্থির থাকে অক্ষরের সংখ্যা। যথা—

সাত্ কোটি | সন্তানেরে, | হে মুগ্ধ জ- | ননী,
রেখেছ বা- | ঙালী ক'রে | মানুষ্ ক- | রনি।
—বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

এখানে পর্ব্বগুলিতে ধ্বনি বা সিলেব্‌ল্ এর সংখ্যা স্থির নেই; কেননা প্রথম পংক্তির প্রথম পর্ব্ব এবং দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় পর্ব্বে তিনটি ক'রে সিলেব্‌ল্ আছে কিন্তু অন্যত্র আছে চারটি ক'রে। প্রতি পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যাও স্থির নেই; কেননা প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব্বে মাত্রা আছে পাঁচটি ক'রে, কিন্তু অন্যত্র আছে চারটি ক'রে। সুতরাং এ ছন্দকে স্বরবৃত্তও বলা যায় না, মাত্রাবৃত্তও বলা যায় না। কিন্তু প্রতি পর্ব্বের 'অক্ষর'-সংখ্যা স্থির আছে; কেননা সবগুলি পর্ব্বে চারটি ক'রে অক্ষর আছে। সুতরাং এ ছন্দকে চতুরক্ষরপর্ব্বিক অক্ষরবৃত্ত বল্‌ব।

কিন্তু বাংলায় প্রচলিত অর্থের অক্ষর বা হরফ ঠিক্ থাক্‌লেই ধ্বনিও স্থির থাকবে এমন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং শুধু অক্ষর সাজিয়ে ছন্দ রচনা করা অর্থাৎ ধ্বনিসাম্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কেবল অক্ষর সাজিয়ে অচল রীতিকে ছন্দে চালানো যদি সম্ভব হ'ত তাহ'লে খোকাবাবুকে কেবল লম্বা টুপি পরিয়ে দাদামশায় ব'লে চালানো অসাধ্য হ'ত না"; কেননা, "অক্ষরের আড়ালে ধ্বনি চুরি করা" কথনোই সম্ভব নয়। তাঁর এই উক্তির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত এবং এই কথাটাই ছিল আমার অগ্রহায়ণের প্রবন্ধের প্রধানতম বক্তব্য।

সুতরাং "সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী," প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অক্ষরসংখ্যার সমতা আছে, শুধু এ কথা বল্‌লেই শেষ কথা বলা হ'ল না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি-সাম্য রক্ষার নিয়মটি কি, সেটুকু না জানা পর্য্যন্ত এ ছন্দের মূল তত্ত্ব জানা হবে না। আমার মতে সে নিয়মটি হচ্ছে এই —অক্ষরবৃত্ত ছন্দে একস্বর (monosyllabic) শব্দের যুগ্মধ্বনি এবং বহুস্বর শব্দের শেষ প্রান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক বা দুই unit, আর শব্দের অ-প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি এক unit ব'লে গণ্য হয়; অযুগ্ম ধ্বনি সর্ব্বত্রই এক unit। যথা—

।+ । ।+ ।
"চম্পক্-অঙ্গুলি-ঘাতে সঙ্গীত্ ঝঙ্কারে"

প্রথমেই ব'লে রাখ্‌ছি, আমি এ দৃষ্টান্তটিকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অতি সুন্দর ও নিখুঁত নিদর্শন ব'লে মনে করি। এ পংক্তিটির দোষ দেখানো কথনোই আমার উদ্দেশ্য নয়; আমার উদ্দেশ্য এ পংক্তিটিতে ধ্বনি-সঙ্গতি কি ভাবে রক্ষিত হয়েছে তাই দেখানো। এখানে চোদ্দটি অক্ষর আছে এবং আটের পর যতি রয়েছে, আমার মতে শুধু একথা বলাই যথেষ্ট নয়। কেননা, শুধু হরফের সংখ্যা ঠিক্ থাক্‌লেই ধ্বনি-সঙ্গতিও থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু তবু উদ্ধৃত পংক্তিটিতে ধ্বনিসমতাও রক্ষিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কি ভাবে সে সমতা রক্ষিত হয়েছে তাই দেখানো আমার উদ্দেশ্য। এখন তাই দেখাচ্ছি।—

উপরের পংক্তিটিতে যুগ্মধ্বনি আছে ছ'টি। তার মধ্যে যোগ-চিহ্নিত দুটি (পক্ এবং গীত্) আছে শব্দের শেষ প্রান্তে; এ যুগ্মধ্বনি দুটিকে কিছু টেনে পড়্‌তে হয়, কাজেই এ দুটি যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের মধ্যেই দু'টি ক'রে unit। আর দণ্ড-চিহ্নিত চারটি যুগ্মধ্বনি (চম্, অঙ্, সঙ্, ঝঙ্) আছে শব্দের মধ্যে; এ চারটিকে টেনে পড়্‌তে হয় না; সুতরাং এগুলিকে একটি মাত্র unit ব'লেই ধর্‌তে হবে। অযুগ্ম ধ্বনিগুলি সর্ব্বত্রই এককে unit।

\+ । + । ।
উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে

এ পংক্তিতে যোগ-চিহ্নিত যুগ্মধ্বনি দুটি দ্বিমাত্রিক কেননা অয়্ শব্দের প্রান্তে অবস্থিত এবং 'ঐ' monosyllabic বা একস্বর; এগুলিকে একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। আবার দণ্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলি (গন্, শুভ্, শঙ্) শব্দের মধ্যে অবস্থিত, আর এদের উচ্চারণও টেনে কর্‌তে হয় না, সুতরাং এরা এককে unit ব'লেই গণ্য হয়েছে। আমার বিবেচনায় এই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিরূপ নির্ণয়ের নিয়ম এবং এ নিয়ম সকলপ্রকার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পক্ষেই সত্য ব'লে আমি মনে করি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যেখানে যেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় সেখানেই ধ্বনি-সঙ্গতিতে ক্রটি ঘটে ব'লে আমার বিশ্বাস। যা হোক্, আমার কথিত নিয়ম অনুসারে অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের ধ্বনি-নির্ণয় করার প্রণালী হচ্ছে এইরূপ।—

। ॥ । । । । । । ।॥ । । ।
চম্পক্-অঙ্গুলি-ঘাতে ॥ সঙ্গীত্ ঝঙ্কারে

। ॥ । । । ॥ । । । । । । ।
উদয়-দিগন্তে ঐ ॥ শুভ্র শঙ্খ বাজে

যেখানে ধ্বনির unit এক সেখানে একটা দণ্ড-চিহ্ন এবং যেখানে ধ্বনির unit দুই সেখানে যুগ্মদণ্ড-চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, শব্দের প্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির উপর যুগ্মদণ্ড স্থাপিত হয়েছে কিন্তু শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উপর যুগ্মদণ্ড স্থাপিত হয়নি, একটি দণ্ড স্থাপিত হয়েছে। আমার মতে এইটেই হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আসল প্রকৃতি এবং কবিরা অক্ষর গুণেই লিখুন কিংবা কানের ওজন রেখেই লিখুন তাঁরাও সহজ ছন্দ-বোধের দ্বারা চালিত হ'য়ে স্বতই এই নিয়মটি মেনেই এ ছন্দ রচনা করেন। অগ্রহায়ণের প্রবন্ধে এই ছিল আমার মূল বক্তব্য এবং এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের অভিমত কি তা জানাই ছিল আমার অভিপ্রায়।

৩

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-পরিভাষা

আমার ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলিকে স্পষ্টার্থ করতে চেষ্টা করলুম। এখন রবীন্দ্রনাথের পারিভাষিক শব্দগুলিরও একটু আলোচনা করা দরকার, কেননা তা'হ'লে বোঝা যাবে আমার বক্তব্য বিষয় তিনি কেন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারেন নি।

বেশ মনে আছে দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাংলা ছন্দের উপর কিছু লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হই তখন রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি গ্রহণ করব কিনা এ বিষয়ে আমাকে ভাব্‌তে হয়েছিল। পরিশেষে তাঁর পরিভাষা গ্রহণ না করাই স্থির করেছিলুম। তার কারণ, তখনই আমার মনে হয়েছিল, তাঁর পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থের স্থিরতা নেই। অর্থাৎ এ শব্দগুলি তিনি সর্ব্বত্র একই অর্থে ব্যবহার করেন না, একই শব্দ দু'জায়গায় দুরকম অর্থে ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এটি বৈজ্ঞানিক প্রথা নয়, কেননা পারিভাষিক শব্দের অর্থ সর্ব্বত্র স্থির না থাক্‌লে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা চালানো সম্ভব নয়। সবুজ পত্রে প্রকাশিত তিনটি (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ; ১৩২৪-চৈত্র) এবং বিচিত্রায় প্রকাশিত একটি (১৩৩৮-পৌষ), বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর এই চারটি প্রবন্ধ থেকেই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ পারিভাষিক শব্দগুলিকে সর্ব্বত্র একই অর্থে ব্যবহার করেন না।

প্রথমেই ধরা যাক্ 'মাত্রা' কথাটি। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "যখন আমাদের সাধু সাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই * * * তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যেমন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান

ইহাতে চৌদ্দটি অক্ষরে চৌদ্দ মাত্রা" (সবুজ পত্র, ১৩২১-জ্যৈষ্ঠ)। প্রসঙ্গক্রমে আমি এস্থলে ব'লে রাখ্‌ছি যে উক্ত কারণেই আমি এ ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছি। লক্ষ্য করার বিষয় রবীন্দ্রনাথও এস্থলে প্রচলিত বাংলা অর্থেই অক্ষর শব্দ ব্যবহার করেছেন, কেননা এখানে হসন্ত র্ এবং হসন্ত ন্-কেও অক্ষর বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে এখানে চোদ্দ অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা নয়। এখানে দশটি অযুগ্ম ধ্বনিতে দশ unit এবং দুটি যুগ্মধ্বনিতে চার unit, সব শুদ্ধ এই চোদ্দ unit আছে। সুতরাং এ পংক্তিটির প্রকৃত রূপ হচ্ছে এ রকম।—

। । । । ॥ । । । । । ॥
মহাভারতের্ কথা অমৃত সমান্

এখানে তের্ এবং মান্ এ'দুটি যুগ্মধ্বনিকে টেনে পড়্‌তে হচ্ছে ব'লে এরা দ্বিমাত্রিক। প্রাচীনকালে তের, মান এরূপ অকারান্ত ক'রে পড়ার পদ্ধতি থাক্‌লেও, আজকাল সে প্রণালী আর চলে না। কিন্তু আজকালকার প্রণালীতে উচ্চারণ কর্‌লেও এ ছন্দ নির্দ্দোষই বল্‌তে হবে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন "কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটি যে বস্তুত একমাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্তবর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনই একমাত্রার হইতে পারে না।

কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্

পুণ্যবান্ শব্দটি কাশিরাম শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে এত ফাঁক থাকে যে, হাল্কা ও ভারি দুই রকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে" (সবুজ পত্র, ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ)। প্রত্যেক অক্ষরই যে একমাত্রার নয়, এ কথা আমিও বলি; কেন না কাশিরাম-দাস শব্দের ম এবং স একেকটি অক্ষর বটে, কিন্তু আজকাল আর কেউ রাম কিংবা দাস শব্দকে উড়ে পদ্ধতিতে

অকারান্ত ক'রে পড়ে না; সুতরাং এস্থলে ম এবং স একমাত্রা তো নয়ই, আধ মাত্রাও নয়। যুক্তবর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনই একমাত্রার হ'তে পারে না, এ কথা আমি স্বীকার করিনে। কেন না, পতি কথার প-ও একমাত্রা, প্রতি কথার প্র-ও একমাত্রা; পাবন কথার পা একমাত্রা, প্লাবন কথার প্লা-ও একমাত্রা। রবীন্দ্রনাথও তাই বল্‌বেন আমি জানি, কেন না, তিনি এস্থলে যুক্তবর্ণ এবং অযুক্তবর্ণ কথা দুটি দ্বারা যুগ্ম ধ্বনি এবং অযুগ্ম ধ্বনির কথাই বুঝেছেন। যুগ্ম ধ্বনি এবং অযুগ্ম ধ্বনি কখনই সমমাত্রিক হ'তে পারে না, এ কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। বস্তুত, যুক্তবর্ণ এবং অযুক্ত-বর্ণ ব্যাকরণেরই কথা; ছন্দ-শাস্ত্রে এ দুটি শব্দ ব্যবহার করা অবৈজ্ঞানিক এবং অসঙ্গত। তাই আমি ছন্দের আলোচনায় এ দুটি শব্দকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রেই চল্‌তে চাই। তৃতীয়ত, উক্ত পংক্তির প্রত্যেকটি বর্ণকেই আমরা টেনে টেনে পড়ি, এ কথাও আমার কাছে সত্য মনে হয় না। কেন না, আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা ম, স এবং ন কে হসন্ত উচ্চারণই করি (বিচিত্রার প্রবন্ধ থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথও তাই করেন), সুতরাং এ তিনটি বর্ণ বা 'অক্ষর'কে টেনে পড়া সম্ভব নয়। তবে আমরা রাম, দাস এবং বান্ এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে টেনে পড়ি, পক্ষান্তরে পুণ্য শব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে (পুণ্) একটু ঠেসে উচ্চারণ করি। এই হচ্ছে এ ছন্দের (অক্ষরবৃত্তের) কায়দা এবং এ জন্যই কানের ওজন ঠিক্ থাকে। সুতরাং এ পংক্তিটার প্রকৃত ধ্বনিরূপ হচ্ছে এরকম।—

। ।॥ ॥ । । । । । । ।॥
কাশিরাম্ দাস্ কহে শুনে পুণ্যবান্

উক্ত প্রবন্ধেই অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের।" ফল শব্দ কখনই এক মাত্রার কথা নয়, এ শব্দটি সর্ব্বত্রই দ্বিমাত্রিক। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই আমার কথা সমর্থন কর্‌বেন। এ শব্দটি দ্বিমাত্রিক ব'লেই মাত্রা-নিয়ন্ত্রিত ছন্দে এ শব্দটি দুই unit ব'লেই গণ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ এস্থলে মাত্রা শব্দটিকে সিলেব্‌ল্ কথার প্রতি-শব্দ রূপে ব্যবহার করেছেন। কেননা, ফল শব্দে একটি সিলেব্‌ল্ আছে, একথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আবার যখন বল্‌ছেন সাধু বাংলার ছন্দে ফল-শব্দকে দুমাত্রা ধরা হয় তখন মাত্রা শব্দ quantitative unit এর প্রতিশব্দ রূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, সিলেব্‌ল্-নিয়ন্ত্রিত ছন্দে ফল শব্দকে ধরা হয় এক unit, আর মাত্রা-নিয়ন্ত্রিত ছন্দে এ শব্দটিকে ধরা হয় দুই unit। "বৎসরে বৎসরে হাঁকে কালের গোমায়ু"— রবীন্দ্রনাথ এখানে "বৎসরে" কথাটিতে তিন 'মাত্রা' ধরেছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় আমার সমর্থন ক'রে বল্‌বেন, "বৎসরে" কথাটিতে 'মাত্রা' আছে চার তিন নয়; কিন্তু 'অক্ষর' আছে তিনটি, কেননা খণ্ড-ৎ এবং স মিলে এক অক্ষর। রবীন্দ্রনাথ এখানে মাত্রা কথাটিকে অক্ষরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং দেখা গেল তিনি মাত্রা শব্দটি কখনও সিলেব্‌ল্ অর্থে, কখনও অক্ষর অর্থে, কখনও তার আসল (অর্থাৎ ধ্বনি-quantityর unit) অর্থে ব্যবহার করেন।

তিনি সিলেব্‌ল্ কথাটিকেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি লিখেছেন, "ইংরেজি মতে 'জল' সর্ব্বত্রই এক সিলেব্‌ল্, 'পাতা' তার ডবল ভারী। কিন্তু জল শব্দটা ইংরেজি নয়।" তার ভাবখানা এই যে, যেহেতু জল শব্দটা বাংলা সেজন্য জল শব্দ বাংলায় কখনও কখনও দুই সিলেব্‌ল্ হ'তে পারে। তাই "মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বালো" এ পংক্তিটিতে দুই এবং জুঁই কথা দুটি "দুই সিলেব্‌লের টিকিট পেয়েচে," একথা বলেছেন। এখানে তিনি সিলেব্‌ল্ কথাটি মাত্রা অর্থাৎ ধ্বনি-quantityর unit অর্থে প্রয়োগ করেছেন। জল, দুই, জুঁই শব্দগুলি ইংরেজি বা বাংলা কোনো মতেই কখনও দুই সিলেব্‌ল্ হ'তে পারে না, এবিষয়ে ধ্বনিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু আমাকে সমর্থন কর্‌বেন সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। আসল কথা হচ্ছে, জল, দুই, জুঁই প্রভৃতি syllabic measureএ অর্থাৎ ধ্বনিসংখ্যার মাপে এক unit আর quantitative measure-এ অর্থাৎ ধ্বনির

মাত্রাপরিমাণের মাপে দুই unit। কাজেই সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনিসংখ্যাত ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দে এগুলি একেক unit ব'লেই গণ্য হয়। আর মাত্রাসংখ্যাত ছন্দে অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এগুলি দুই unit ব'লেই গণ্য হয়।

ছন্দের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেও আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হ'তে পারিনি। তার কারণটা বল্‌ছি। তিনি বাংলা ছন্দকে দুই তরফ থেকে দুরকম ক'রে ভাগ করেছেন। কিন্তু ওই দুরকম বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য নেই। এক দিক্ থেকে তিনি বাংলা ছন্দকে চল্‌তি বা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ এবং সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন; সাধু বাংলার ছন্দকে তিনি কখনও কখনও সাধু-ছন্দ নামেও অভিহিত করেছেন। এক স্থানে (বিচিত্রা-পৌষ) তিনি বলেছেন "তখনকার দিনে বাংলা কবিতায় এক-একটি অক্ষর এক সিলেব্‌ল্ ব'লেই চল্‌ত।" বলা বাহুল্য তিনি এস্থলে অক্ষরগোনা সাধু বাংলার ছন্দের কথাই বল্‌ছেন এবং সিলেব্‌ল্ মানে এস্থলে উক্ত ছন্দের unit। এ রীতির ছন্দ যে শুধু তখনকার দিনেই চল্‌ত তা নয়, এ ধরণের ছন্দ আজকালও চলে। তার পরেই তিনি বল্‌ছেন "অথচ সেদিন কোনো কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক ব'লে গণ্য করার দরকার আছে ব'লে অনুভব ক'রেছিলুম।" আজকের দিনে একথা কারও অজানা নেই যে তাঁর ওই দরকার অনুভব করার ফলে বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক নতুন শ্রেণীর ছন্দের প্রবর্ত্তন হয়েছে, ধ্বনি-ঝঙ্কারে এবং সুর মাধুর্য্যে এ শ্রেণীর ছন্দগুলি বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব্ব; এ শ্রেণীর ছন্দের প্রবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অবদান। যাহোক্, এই যে নতুন সুর ও নতুন রীতির ছন্দ তিনি প্রবর্ত্তন কর্‌লেন, তিনি নিজে সে ছন্দের কি নাম দিয়েছেন এস্থলে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু তিনি এ ছন্দের কোনো বিশেষ নাম দিয়েছেন ব'লে আমার জানা নেই। তবে তাঁর ছন্দের আলোচনাগুলি থেকে মনে হয় যে তিনি এ ছন্দকেও সাধু-ছন্দেরই প্রকার-ভেদ ব'লে মনে করেন। এস্থলে তাঁর যে দুটি বাক্য উদ্ধৃত কর্‌লুম তার থেকেও আমার এ ধারণা সমর্থিত হয়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথও, বাংলা ছন্দকে এক হিসেবে তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত করেন; যথা—প্রাকৃত বাংলা ছন্দের এক ধারা এবং সাধু বাংলা ছন্দের দুই ধারা।

তাঁর এই শ্রেণী বিভাগটি আমি সমর্থন করেছি, কিন্তু এই বিভাগগুলির পরিচয় সূচক নাম ক'টি আমি গ্রহণ করতে পারিনি। কারণ প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলার মধ্যে যে পার্থক্য তা অতি সামান্য, ওই পার্থক্যটি বিশেষ ভাবে কয়েকটি ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের মধ্যেই নিবদ্ধ। এই সামান্য পার্থক্যটির ধ্বনিগত মর্য্যাদা এত বেশি নয় যে তার উপর নির্ভর ক'রে ছন্দ-বিভাগের নামকরণ করা যায়। তা ছাড়া যাকে তিনি সাধু বাংলার ছন্দ বল্‌ছেন তাতেও বহু প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার চ'লে এবং ইচ্ছে কর্‌লে সাধু-ছন্দের ধ্বনিটি অব্যাহত রেখেও এ ছন্দে বহুল পরিমাণে প্রাকৃত শব্দ চালানো সম্ভব। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিলো আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
ল'য়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চ'লে গেলো আমার ক্ষণিকা।
—ক্ষণিকা, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এটি সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এখানে বিশেষভাবে সাধু বাংলার কোনো লক্ষণই নেই; যে কয়টি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে সব ক'টিরই প্রাকৃত রূপ। অথচ এ ছন্দের ধ্বনি সাধু-ছন্দেরই ধ্বনি, তাঁর পরিভাষায় যাকে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলা হয় তার ধ্বনি এখানে নেই। যাহোক, এ ছন্দটির যে একটি ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই এই ধ্বনির ছন্দকে আমিও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী ব'লে গণ্য করেছি। কিন্তু "সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ" এই নামটি আমি গ্রহণ করিনি। কেননা, এ ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার জন্তে সাধু বাংলার ব্যবহার কর্‌তেই হবে, এমন আবশ্যিকতা নেই। আমার বিশ্বাস কোনো

কবি ইচ্ছে করলে এ ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রেও আগাগোড়া শুধু প্রাকৃত বাংলাই চালিয়ে যেতে পারেন। এ রকম কবিতা আমি এখনও দেখিনি। কিন্তু এ রকম লেখাও যে সম্ভব তার প্রমাণ উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি। যাহোক্, আমি "সাধু বা সংস্কৃত বাংলার ছন্দ" এই পরিচয়-সূচক নামটি বর্জ্জন ক'রে এই ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছি, কেননা, অক্ষরসংখ্যার সঙ্গতি রক্ষা করাই এ ছন্দের সাধারণ রীতি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতি আলোচনা পূর্ব্বেই করেছি।

সাধু বাংলারই "কোনো কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক ব'লে গণ্য করার" রীতি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তন করেছেন, এ কথা পুর্ব্বেই বলেছি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি আমি ভিক্ষা মাগিতে
পূরাতে হইবে আশ।
—সুরদাসের প্রার্থনা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(২) "এখনো উঠাতে পারি" কর-যোড়ে যাচে
"যদি দেখাইয়া দাও কোনখানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন "আছে ওই নদীতলে।"
—নিষ্ফল উপহার, ঐ

এ দুটিই রবীন্দ্রনাথের কথিত সাধু বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত। উভয়ত্রই যুগ্মধ্বনির দ্বৈমাত্রিকতা বজায় আছে এবং উভয়ত্রই সাধু বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই দ্বৈমাত্রিক যুগ্মধ্বনি-ওয়ালা সাধু-ছন্দেও সাধু ভাষার ব্যবহার অত্যাজ্য নয়। এ ছন্দেও প্রাকৃত বাংলার প্রচুর ব্যবহার হয় এবং ইচ্ছে করলে এ ছন্দেও সর্ব্বত্রই নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার চালানো যায়। যথা—

(৩) স্পষ্ট বোল্‌তে কষ্ট কি বল্? লজ্জারো কিছু নয়!
সন্ধ্যা না হোতে সন্ধি কোর্‌তে আস্‌বে সে নিশ্চয়।
জিত্‌তে হবেই আজ!
নইলে এ নামে লাজ!
বিদ্রোহী সাথে সন্ধি নেহাৎ সহজ ব্যাপার নাকি?
এ সব নিগূঢ় রণ-নীতি তোর শিখ্‌তে এখনো বাকী!
—সন্ধির সূত্র, বুকের বীণা, অপরাজিতা দেবী

(৪) পথ চেয়ে ব'সে আছি সেই থেকে এই,—
ছ'টা বাজে গ্যাস্ জ্বলে; তবু দেখা নেই!
সবাই তো এ পাড়ার ফিরে এলো ঘরে,
আজ কেন আস্‌তে সে এত দেরী করে?
কাল থেকে বোলে বোলে মান্‌লুম হার।—
কিছুতে কি ফুরসুৎ মিল্‌লো না তার?
—আঁধারে আলো, বুকের বীণা, অপরাজিতা দেবী

এ দুটি ছন্দই প্রাকৃত বাংলায় রচিত। অথচ রবীন্দ্রনাথ যাকে "প্রাকৃত বাংলার ছন্দ" বলেন, এ দুটির ধ্বনি-প্রকৃতি সে রকম নয়; সুতরাং এ দুটি যে তাঁর প্রাকৃত বাংলা ছন্দের দৃষ্টান্ত নয়, এ কথা নিশ্চিত। এখানে প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তের ধ্বনি-প্রকৃতি এক রকম; আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্তের ধ্বনি-প্রকৃতি এক রকম। কাজেই প্রথম দুটি সাধু বাংলায় রচিত এবং দ্বিতীয় দুটি প্রাকৃত বাংলায় রচিত ব'লে, এদের যথাক্রমে সাধু বাংলার ছন্দ ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ নাম দিলেই যথেষ্ট হবে না। আমার পরিভাষায় এ চারটি দৃষ্টান্তই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, কেননা এ চারটি দৃষ্টান্তই ধ্বনিমাত্রার পরিমাপে রচিত। তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি ষণ্মাত্রিক; কেননা এদের প্রতি পর্ব্বেই ছ' মাত্রা ক'রে আছে। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থটি চতুর্মাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত; এখানে প্রতিপর্ব্বে চার মাত্রা আছে।

উপরের চতুর্থ দৃষ্টান্তটি প্রাকৃত বাংলায় রচিত, অথচ রবীন্দ্রনাথের পারিভাষিক অর্থে এছন্দকে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলা যায় না। তা ছাড়া তিনি যাকে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলেন তাতেও সর্ব্বত্রই প্রাকৃত বাংলা কথার ব্যবহার আবশ্যিক নয়। প্রাকৃত বাংলার ছন্দেও সাধু বাংলা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

(১) বালিশতলে বইটি চাপা টানিয়া লয় তারে,—
পাতাগুলিন্ ছেঁড়া-খোঁড়া শিশুর অত্যাচারে।
—যথাস্থান, ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) আমায় যদি মনটি দেবে—রাখিয়া যাও তবে ;
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু ভুলে থাক্‌তে হবে।
—অসাবধান, ঐ

এ দুটি রবীন্দ্রনাথের কথিত প্রাকৃত বাংলার ছন্দ। অথচ এখানে দুটি সাধু শব্দ (টানিয়া এবং রাখিয়া) আছে। আর পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ দৃষ্টান্তটি প্রাকৃত বাংলার ছন্দ নয় ; অথচ তাতে সর্ব্বত্রই প্রাকৃত বাংলা ব্যবহৃত হয়েছে। এ জন্যই সাধু বাংলার ছন্দ, প্রাকৃত বাংলার ছন্দ, ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিনি। কারণ সাধু বাংলা বা প্রাকৃত বাংলা বল্‌লে ভাষার ব্যাকরণগত রূপের কথাই বলা হয়, ধ্বনিগত রূপের কথা বলা হয় না। অথচ ধ্বনির বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ছন্দের নামকরণ কর্‌তে হবে। তাই আমি এ দৃষ্টান্ত দুটির নাম দিয়েছি স্বরবৃত্ত ছন্দ : কেননা এ দৃষ্টান্ত দুটিতে সর্ব্বত্রই সিলেব্‌ল্ বা স্বরের সংখ্যাগত সঙ্গতি আছে।

যাহোক্, দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের সাধু বাংলার দুই ধারা এবং প্রাকৃত বাংলার এক ধারা, ছন্দের এই তিন ধারা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু ওই নামগুলি মেনে নিতে আপত্তি আছে। তাই আমি ছন্দের এই তিন ধারার নাম দিয়েছি যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সচরাচর সাধু বাংলাই ব্যবহৃত হয় ; তবে স্থান বিশেষে প্রাকৃত বাংলা শব্দের ব্যবহারও চলে এবং আমার বিবেচনায় নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃত বাংলায়ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনা করা সম্ভব,—অবশ্য আজ পর্য্যন্ত তেমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়েনি। মাত্রাবৃত্তেও অক্ষরবৃত্তের মতোই সাধু ও প্রাকৃত বাংলার মিশ্রণ চলে ; কিন্তু এ ছন্দে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহারও চালানো যায়,—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর "বুকের বীণায়" তার বেশ সুন্দর নিদর্শন আছে। আর স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রাকৃত বাংলা ব্যবহার করাই সাধারণ নিয়ম ; তবে প্রয়োজন অনুসারে দুয়েক জায়গায় সাধু বাংলা শব্দও চলে—দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে।

ছন্দের যে তিন ধারার কথা উল্লেখ কর্‌লুম রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত' এই তিন ধারার কথা না বল্‌লেও প্রকারান্তরে তিনি বাংলা ছন্দের এই তিন ধারা স্বীকার করেন, তাঁর ছন্দ-বিষয়ক সমস্ত আলোচনা থেকে আমার এ কথাই মনে হয়েছে। আমি কিন্তু ছন্দের এই তিন বিভাগের উপরই আমার সমস্ত আলোচনাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছি। স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দকে স্পষ্টত' তিন ভাগে বিভক্ত না কর্‌লেও তিনি যে ছন্দের এই তিন ধারার কথা স্বীকার কর্‌তেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কারণ এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "বাংলা দেশের মুক্তবেণীর গঙ্গাতীরে, এক জন মাত্র কবির প্রতিভা বলে, আজ ছন্দের **তিন ধারা** বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে যুক্তবেণীর সৃষ্টি করেছে" (ভারতী,—বৈশাখ, ১৩২৫)।

যাহোক্, আরেক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে সমমাত্রিক, অসমমাত্রিক ও বিসমমাত্রিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই বিভাগটী আমি গ্রহণ কর্‌তে পারিনি। তার দুটি কারণ আছে। প্রথমত' এই নাম তিনটিতেও মাত্রা কথাটি এ শব্দের স্বাভাবিক অর্থে অর্থাৎ সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের প্রযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তিনি এই শ্রেণীবিভাগের যেসব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতেই বোঝা যায় তাঁর ব্যবহৃত 'মাত্রা'র মূল্য সব জায়গায় সমান নয় ; স্থল বিশেষে মাত্রা কথাটির মর্য্যাদা ভিন্ন ভিন্ন রকম। যথা—

শারদচন্দ্র | পবন মন্দ | বিপিন ভরল | কুসুম গন্ধ

রবীন্দ্রনাথের মতে এটি অসমমাত্রার ছন্দ ; কেননা এর প্রতিপর্ব্বে তিনের দ্বিগুণ অর্থাৎ ছ'মাত্রা রয়েছে আর তিন হচ্ছে অসম সংখ্যা। এখানে তিনি 'শারদ' শব্দেও তিনমাত্রা ধরেছেন, চন্দ্র কথায় ও তিন মাত্রা ধরেছেন। কেননা এ উভয় শব্দেই ধ্বনি-পরিমাণের তিন unit আছে। এইটেই মাত্রা কথার আসল অর্থ। তাই আমি এ ছন্দকে বল্‌ব মাত্রাবৃত্ত ছন্দ : এটি হচ্ছে তার ষাণ্মাত্রিক উপশাখা।

সঙ্গীত ত- | রঙ্গ রঙ্গ | অঙ্গের উ- | চ্ছ্বাস

এটাকে তিনি বলেন সমমাত্রার ছন্দ ; কেননা এর প্রতি পর্ব্বে আছে দুয়ের দ্বিগুণ অর্থাৎ চার 'মাত্রা'। কিন্তু এখানে মাত্রা শব্দটির অর্থ পরিবর্ত্তন হ'ল। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে

মন্দ, গন্ধ প্রভৃতি শব্দে ধরা হয়েছিল তিন মাত্রা, কিন্তু এখানে রঙ্গ, অঙ্গ প্রভৃতি শব্দে দু মাত্রার বেশি ধরা হয় নি। এটি মাত্রা শব্দের প্রকৃত অর্থ নয়। এখানে আসলে মাত্রা বল্‌তে তিনি 'অক্ষর' ধ'রে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত 'অক্ষর'ই হচ্ছে এ ছন্দের unit। তাই আমি এ ছন্দকে বল্‌ব 'অক্ষরবৃত্ত' এবং এর প্রতি পর্ব্বে চারটি ক'রে অক্ষর থাকাতে একে 'চতুরক্ষর-পর্ব্বিক' এই উপনামে অভিহিত করব।

বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান

রবীন্দ্রনাথ এখানে একেকটি স্বর বা সিলেব্‌লকেই এক-একটি 'মাত্রা' ধরেন। এটিও মাত্রা কথার আসল অর্থ নয়। এখানে সিলেব্‌ল্ বা স্বরই হচ্ছে এ ছন্দের unit। তাই আমার মতে এর নাম স্বরবৃত্ত; এ দৃষ্টান্তটি স্বরবৃত্তের 'চতুঃস্বর-পর্ব্বিক' শাখার অন্তর্গত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, ছন্দের unit মাত্রকেই রবীন্দ্রনাথ মাত্রা নাম দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা ছন্দে তিন রকমের unit ব্যবহৃত হয় এবং এই unit গুলিই ছন্দের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এক শ্রেণীর বাংলা ছন্দের unit হচ্ছে সিলেব্‌ল্ বা স্বর; আরেক শ্রেণীর unit হচ্ছে মাত্রা; তৃতীয় শ্রেণীর unit হচ্ছে 'অক্ষর'। সুতরাং বাংলা ছন্দকে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত এই তিন ধারায় বিভক্ত করাই সঙ্গত।

সমমাত্রা, অসম মাত্রা এবং বিষম মাত্রা, এই তিন ভাগে ভাগ করার দ্বিতীয় দোষ হচ্ছে এই যে, এই নামকরণে ছন্দের unit-এর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ছন্দ-পর্ব্বের পরিমাপের পরিচয়। অথচ ছন্দের unit-ই তার আসল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে; সুতরাং unit-এর পরিচয়ই তার আসল পরিচয়। ছন্দ-পর্ব্বের গঠন-প্রণালী তার বাহ্যরূপকে মাত্র নির্দেশ করে সুতরাং পর্ব্বের পরিচয় ছন্দের আসল পরিচয় নয়, তার গৌণ পরিচয় মাত্র। কাজেই সম মাত্রা, অসম মাত্রা এবং বিষম মাত্রার বিভাগে ছন্দের বাহ্যরূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়, ছন্দের অন্তরের রূপ তাতে প্রকাশিত হয় না।

দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। যেমন—

(১) বরষার | নির্ঝরে | অঙ্কিত | কায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়!
— নিষ্ফল উপহার, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(২) এলায়ে জটিল-বক্র | নির্ঝরের | বেণী
নীলাভ দিগন্তে ধায় নীল গিরিশ্রেণী।
—নিষ্ফল উপহার, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

(৩) কিসের তরে | অশ্রু ঝরে, | কিসের লাগি | দীর্ঘশ্বাস।
হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
—হতভাগ্যের গান, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এ তিনটি দৃষ্টান্তই সম মাত্রার ছন্দ; কেননা তাঁর মতে তিনটি দৃষ্টান্তেই প্রতিপর্ব্বে চারটি ক'রে 'মাত্রা' অর্থাৎ unit আছে। কিন্তু প্রতিপর্ব্বে চারটি ক'রে unit থাকাই বড় কথা নয়, এটা বাহ্য সাদৃশ্যের পরিচয় মাত্র। এ দৃষ্টান্ত-তিনটি পড়্‌লেই বোঝা যাবে যে তিনটি দৃষ্টান্তে তিন রকম unit ব্যবহৃত হয়েছে; তার ফলে তিনটি দৃষ্টান্তে ধ্বনির বৈশিষ্ট্য তিন রকম হয়েছে। সুতরাং এই unit-গুলির পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত এ তিনটি ছন্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না। সে পরিচয় হচ্ছে এই। প্রথম দৃষ্টান্তের unit হচ্ছে মাত্রা, দ্বিতীয়টির অক্ষর এবং তৃতীয়টির স্বর। সুতরাং এখানে যথাক্রমে মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত পেলুম। আর এইটেই হচ্ছে এ ছন্দের আসল রূপ।

কাজেই দেখ্‌তে পেলুম রবীন্দ্রনাথের সম মাত্রার ছন্দও স্বর, মাত্রা ও অক্ষর, এই তিন unit অবলম্বন ক'রে তিন রকম হ'তে পারে। অসম মাত্রার ছন্দেরও এ রকম দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিষম মাত্রার ছন্দের মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত রূপের দৃষ্টান্ত দিতে পারি, অক্ষরবৃত্ত-রূপের দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। কাজেই দেখা গেল মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত এ তিনটিই হচ্ছে ছন্দের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ। আর সম, অসম ও বিষম, এ তিনটি হচ্ছে ছন্দের আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ।

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষার বিস্তৃত আলোচনা করতে হ'ল এই জন্যে যে, আমার ব্যবহৃত পরিভাষার সঙ্গে তাঁর পরিভাষায় অর্থের ও ব্যবহারের পার্থক্য খুবই বেশি এবং তার ফলে আমার আলোচনাটি তাঁর কাছে অনেক সময় অস্পষ্ট বোধ হ'য়ে থাকৃতে পারে। আমাদের পরিভাষার এই পার্থক্যটুকুর প্রতি যদি তিনি লক্ষ্য রাখেন তবে আশা করি তিনি দেখ্‌তে পাবেন যে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তা ছাড়া আমি আমার আলোচনায় যে-সমস্ত নোতুন কথার অবতারণা করেছি সে-সব বিষয়েও আমি তাঁর সমর্থনই পাব, এই আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-পরিভাষার অর্থ ও ব্যবহার সম্বন্ধে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারিনি ব'লে কেউ যেন একথা মনে না করেন যে আমি তাঁর রচিত ছন্দের নির্দ্দোষতা সম্বন্ধেই সন্দিহান। কারণ ছন্দ-কার কবিকে যে ছন্দ-শাস্ত্রকারও হ'তে হবে এমন অবশ্যম্ভাবী বাধ্য-বাধকতা কোনো দেশে কোনো কালে ছিল না, এখনও নেই। ছন্দ-শাস্ত্রকার ছন্দ-কারের ছন্দ-প্রতিভার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিয়েও ছন্দের আলোচনায় তাঁর সঙ্গে একমত না-ও হ'তে পারেন, এ রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বস্তুত' রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রতিভার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা আছে ব'লেই আমি তাঁর ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলুম এবং ছন্দ-শাস্ত্রের আলোচনায় তাঁর মত সমর্থন করতে না পারলেও তাঁর প্রতিভার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও তাঁর ছন্দের প্রতি আমার অনুরাগ অক্ষুণ্ণই আছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

জীর্ণ পুঁথির উড়্‌ছে পাতা

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমে ঝড় ঐ যে আসে পুবে অন্ধকার !
মহাকালের বাজ্‌ছে প্রলয় ভেরী।
বসুন্ধরার কাঁপন বড় ভাঙ্‌ছে তোরণ দ্বার,
তুফান আসার নেইকো বেশী দেরী॥

ধুলোয় নয়ন অন্ধ হোলো আকাশ ডাকে গুরু,
মাথা গুঁজার নাইকো কোথাও ঠাঁই,
কালনাগেরি শতেক ফণায় বক্ষ দুরু দুরু—
পালিয়ে যাবার পথ তো জানা নাই।

জীর্ণ পুঁথির উড়্‌ছে পাতা বহু যুগের পরে !
আপনভোলা সবাই বাঁধন হারা,
কালোয় সাদায় মিশ্‌বে সবে মরা বাঁচার তরে
টুটবে যত লৌহ প্রাচীর কারা।

পাগ্‌লা ভোলার শিঙ্গার মাঝে অনাগত সুর
জেগেই আছে, উঠবে সৃজন প্রাতে—
হাহাকারে ভাসেই যদি মায়ার মধুপুর,
ক্ষতি কিবা আছেই মোদের তাতে !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

টুকরি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

বাঙাল

মেসের ছেলেরা ওকে নিয়ে কত হাসে,
কেউ বলে, "ভাই, খুব চেক্‌নাই ছিটের পাঞ্জাবীটা।"
কেউ বলে, "বুঝি লাট সাহেবের নাপিত ছেঁটেছে চুল?"
মাধব তা শুনে হো হো কোরে হেসে ওঠে।

একদিন ওর গোপনে বাক্স খুলে
যতীন যখন ফটোগ্রাফখানি নিয়ে
চোখ টিপে বলে, "মাধব এ কার ছবি—"
রাঙা হলো মুখ, চোখ দুটো লাল কোরে
মুঠি পাকাইয়া গর্জ্জি উঠিল মাধু।

পক্ষপাত

বড়বাজারের পগেয়াপটীতে
খদ্দের এসে বলে—
"কাপড়ের দাম কত"।
দোকানী বল্লে—"বারো আনা গজ কেনা,
আপনি বোলেই এগারো আনায় দেবো।"

বায়োস্কোপ

ফিরোজা-রঙের শাড়িটা কি হলো?
না না, ওটা থাক, আনারসীটাকে আনো
চুল বেঁধে দিতে দেরী কোরেছিস দিদি,
তবু হলো নাতো ভালো।
রজত বাবুর গাড়ী এলো বুঝি,
যাবো যে বায়োস্কোপে।

কবির দ্বিধা

শচীন খাতায় লেখে—
"অসীম আমার চিত্ত-আকাশে তুমি সে একটি তারা;
আমার মনের গহন কাননে একটি স্বপন-যূথী।"
লেখা শেষ হলে যেতে যেতে পথে শচীন ভাবে,
দুবোনের মাঝে দামিনী ভালো কি অমলা ভালো।

বিচিত্রা

গান শুনে তার আমি বল্লাম, "ওগো বিচিত্রা দেবী,
ঐ সুর শুনে আজ সারা রাত কাটাতে পারি।"
সে বল্‌লে—"আ-হা! সত্যি নাকি?"
আমি বল্লাম, "মায়ার কাজল পরেছ চোখে?"
সে বল্‌লে—"রাখো—কথা!"
—"ওগো সুন্দরী, তোমার রূপের কাছে
উর্ব্বশী হার মানে।"
খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠে বলে, "দেখেছ উর্ব্বশীকে।
"—চিত্রা-চিত্রা! এখনি উঠ্‌লে কেন?
সে বল্‌লে—"তুমি আমাকে বসিয়ে
কার সাথে কথা কও
বুঝ্‌তে পারিনে,
তাই যেতে চাই চলে।

ব্যবসায়ী

শাঁখিনী-সাপের সরু সরু হাড়,
ধনেশ পাখীর ঠোঁট,
কালো বিড়ালের পুরোনো চর্ব্বি,
আকড় গাছের শিকড়ের বাঁধা আঁটি,
একটা ছোট্ট কাঁচের বাটিতে সবুজ রঙের তেল,
একমুঠো বালি, শুক্‌নো কিসের ফুল,
কালো কম্বলে সাজিয়ে রেখে
মাথায় পাগ্‌ড়ী তুলিয়ে পথের ধারে
ভিড় জমিয়েছে বুজ্‌রুক ব্যবসায়ী।

সহরের পথে

সন্ধ্যা বেলায় ভিড় জমে গেল গলির মোড়ে,
রক্তে ভিজিল মাটি।
তখনো বৃদ্ধ বলে
"পকেট-কাটা সে বিষম ঠকেছে,
কোমরেতে বাঁধা নোটের তাড়া,
নিতে পারে নাই, পিঠে মেরে গেছে ছুরি।"

বীরপুরুষ

এ দেখি যুদ্ধ ইংরেজে জার্ম্মানে!
একজন বলে, "বন্দুকে তোর উড়াবো মাথা।"
আর জন বলে, "টের পাবি মজা কামানটা যদি দাগি।"
আম্‌্‌তলার গলিতে দাঁড়িয়ে ন্যাংটো দুজন ছেলে
বাগিয়ে ধরেছে পাট কাঠি আর তল্‌তা বাঁশের চোঙা।

কালিঘাট ও চৌরঙ্গী

কালিঘাট থেকে চৌরঙ্গীর মোড়ে,
কম রাস্তা তো নয়!
তবু দুটি বেলা হেঁটে হেঁটে সারা হোলো।
পায়ে ছেঁড়া চটি,
গায়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবী,
কাঠফাটা রোদে ছাতা জোটে নাকো যার;
বলো দেখি দিদি, কোন স্পর্দ্ধায়
হাঁ কোরে সে চেয়ে থাকে
মোর জানালার পানে।

এদেশ আর ওদেশ

শ্যামবাজারের হল্‌দে বাড়িতে ধুম ধাম হয় কত,
আজ বিয়ে করে বিলেতফের্ত্তা ও বাড়ির বড় ছেলে।
হাজারিবাগের লাল টালি ছাওয়া
বাগান বাড়িতে বোসে
তরুণী কিশোরী কেঁদে ওঠে বার বার।

নন্দিনী সেন

—এই নেও সুভা, তোমার সাধের কাশ্মীরী সাড়িখানা।
—থাক্, ফেলে দাও।
—এনেছি আজকে নতুন রেকর্ড, নতুন নতুন গান।
—আমি শুন্‌বোনা।
—এত অভিমান কেন?
—আচ্ছা বলোতো, বলোতো শপথ কোরে.
বলতো—বলোতো—
—একি—একি! সুভা পাগল হয়েছ নাকি?
—বলো বলো তুমি, এটা কার চিঠি?
নন্দিনী সেন—সে কে?

শিশু ও যুবক

সাঁওতালী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে
বাজারের এক পাশে,
তিনু হালদার আঁখি হানে তার যৌবনভরা বুকে,
সাঁওতালী মেয়ে বুক ঢাকে সঙ্কোচে।
ছোটো ছোটো দুটি গোল মুঠি তুলে
ছেলেটি কেঁদে ওঠে কোলে
সাঁওতালী মেয়ে সবার সাম্‌নে বুক খুলে দেয় শিশুর মুখে।

বোয়ে গেছে

—কাকাবাবু আজ এনেছে আমার
নতুন হার্মোনিয়াম।
—আমার বরাতে নেই বুঝি গান শোনা।
গাড়ী ছেড়ে দেবে তিনটে তেতাল্লিশে।
—ভারি বোয়ে গেছে! কাজ থাকে চ'লে যাও।

ভাঙা কার্ণিশে

তেতলা ছাদের ভাঙা কার্ণিশে উঠেছে অশথ চারা.
তারই কচি ডালে বসে আছে প্রজাপতি,
ঐ টুকুতেই মিটায় বনের আশা।

ছেলের মা

বড় মোক্তার নরেশবাবুর বউ
কহিলেন জ্ঞানদাকে—
"ওরে গেনি, শোন, তোরতো তিন্‌টি ছেলে,
আমাকে একটি দেনা।"
জ্ঞানদা কহিল—"তুমি যদি আমি হতে
আমার ছেলেটি তবেই তোমার হ'তো।"

নরেন বাবু আর যতীন বাবু

সারাটা সকাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে গেল.
—কোন উত্তর দেবো!
যত পড়ি বোসে নরেন বাবুর চিঠি,
তত মনে পড়ে যতীন বাবুর কথা।

আস্তাকুঁড়ের উৎসব

বিয়ের বাড়ীতে চুকে গেছে কাল
ভুরীভোজনের পালা,
এঁটো খুরী আর এঁটো কলাপাতা
পড়ে আছে চারি পাশে।
সেখানে এখন ভোজ লাগিয়েছে কুকুরে ও দাঁড়কাকে;
খোঁড়া কেনারাম তাদেরই মধ্যে বোসে
ভ'রে নেয় তার ফুটো বাটী আর
কানাভাঙ্গা থালাখানি।

আকাশের চাঁদ

মনের ভিতরে রাখাতো সহজ
স্বপ্ন আসন পেতে;
খড়ের চালায় রাখ্‌বো কোথায় ওকে ?
কলেজের ক্লাসে হয়েছিল ছুটো কথা,
সে কথার শেষ গাজনতলায়
এঁদো পুকুরের পাড়ে।

বিদ্যুৎ

রাত্রির বেলা কালো কালো মেঘে মেঘে আকাশ ঢাকা,
বিদ্যুৎ চমকায়
এপাড়ায় যত ঘর বাড়ী আছে থেকে থেকে হয় আলো।
আলো লাগে ঐ বাতাবী লেবুর গাছে,
আর লাগে ঐ দোতলা বাড়ীর খোলা জানালার ধারে
কার বিছানায়,
মনে মনে দেখি ছবি।

নদী

চারি পাশে ঐ শাদা মেঘে যেন
পড়েছে বালির চর;
মাঝখানে তার নীল আকাশের
ক্ষীণ নদীটির রেখা।

প্রবোধ বাবু

সুপ্রভা এসে বলে,—
"সুনীলা, লুকাস কেন,
ঐ বুঝি তোর প্রবোধ বাবুর চিঠি ?"
কেড়ে নিয়ে দেখে শুভ বিবাহের পত্রখানি
আস্‌ছে পঁচিশে তনিমার সাথে
প্রবোধ ঘোষের বিয়ে।

ইলেকট্রিক

চৌরঙ্গীর বড় বাড়িটায় সানাই বাজে,
ব্যারিষ্টারের ছেলের সঙ্গে জজের মেয়ের বিয়ে।
আমি শুধু দেখি বাহিরে দাঁড়িয়ে পথে
ইলেকট্রিকের নিষ্ঠুর আলোগুলো।

টর্চ

তখনো অন্ধকার;
কিসের শব্দ ? বাগানে ঢুকেছে গরু ?
নয়তো বাদুড় এসেছে আমের লোভে।
টর্চের আলো জ্বালিয়ে দেখি,
জামরুল গাছে একটা ছেলে
তলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আঁচল পেতে।

তন্ময়

কলেজের বই খোলাই হলোনা মোটে ;
লজিকের নোট বন্ধ খাতায় বাঁধা।
টেবিলের কোনে ইজি চেয়ারের পাশে
অকারণে আজ পুড়ে যায় মোমবাতি।
বারীণ কোথায় চায়ের নিমন্ত্রণে
কুড়িয়ে পেয়েছে একটি চুলের কাঁটা।

কনে দেখা

ছয় মাস আগে কলেজ ছেড়েছ ?
শেলী পড়েছ তো, কবি ব্রাউনিং ?
ঘরের কোনের হার্ম্মোনিয়াম তোমারি বুঝি,
বাজাতে জানোতো ?
গাও তো একটা নজরুল ইস্‌লাম।

ফণি ও রেবা

ফণি বাবু বলে নবীনা বধূরে ডেকে
"দেখো রেবা, আজ বাইরে যাবনা,
শরীর খারাপ বড়ো।"
রেবা বলে—
"আজ ললিত বাবুর জন্মতিথি,
আমাকে যে গান গাইতে হবে।
চুপ কোরে তুমি শুয়ে থাকো লক্ষ্মীটি,
ফিরতে আমার দেরী হ'তে পারে কিছু।"

উধাও

রাঙা পথখানি ফ্যাকাশে হয়েছে চাঁদের আলোয়,
ধূ ধূ করে খোলা মাঠ ;
একা তাল গাছ শূন্যে তাকায়ে রয়।
থেকে থেকে আজ দম্‌কা হাওয়ায়
আঁচলে পাঞ্জাবীতে
বাধায় হুলুস্থুলু !

মুখাগ্নি

আঃ !
এত রাতে ফের ডাকাডাকি কেন, কে তুমি,
কি চাও ?
সতীশটা বুঝি ?
আবার মরেছে ?
বিশ্রাম নেই, মরেই চলেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়।
এখনি তো বাবা একটাকে নিয়ে নিমতলা ঘাটে
জ্বালিয়ে দিলাম
আবার মরলো কে ?
বাজারের মেয়ে, ফেলবার লোক নেই ?
তা বুঝেছি আমি।
তা না হ'লে—এই লক্ষ্মীছাড়াকে ডাক্‌বে কেন ?
বর্ম্মা চুরোট বুঝি ?
দাও ভাই, আগে নিজেই নিজের মুখাগ্নি সেরে নিই ;
তার পরে গিয়ে ওবেটীর মুখে আগুন দেব।

কাগজের নৌকো

আজ বাদলের জল বহে যায়
সাম্‌নের নালা দিয়ে—
টুক্‌রো কাগজে নৌকো বানিয়ে শিশু
ভাসিয়ে দিয়েছে, তুলে নিয়ে দেখি, লেখা—
"সুলেখাকে মনে রেখো।"

দু বছর পরে

—এই যে মালতী !
—একি ! একি ! তুমি ! আপ্‌নি ! কখন—
—এক্ষুণি এই সাড়ে তিন্‌টের গাড়ীতে এসেছি।
খুব ভয় পেয়ে গেছ ?
—নানা, ভয় কেন ? তবু এত দিন—
এত দিন তুমি কোথায় ছিলে ?
চিঠি তো লেখনি।
সেই কত কাল আগে
মোটে দু'টো চিঠি
—সে চিঠিতে আর কাজ কি এখন,
পুড়িয়ে ফেলো। এই নেও দেশলাই।
কাঁদ্‌ছো কেন ?
মালতী, মালতী,—লতি !
এখন তো তুমি—
থাক তবে আমি যাই।

ড্রইং রুম

ওগো দেখো, দেখো, এই ঘরটাই
কোরবো ড্রইংরুম।
দরজা দু'টোয় পর্দা
ঝোলাবো ফুল্‌কাটা মখ্‌মলে
ওকোনে থাক্‌বে তোমার টেবিল,
একোনে আয়না খানা।
ভালো দেখে দু'টো ফুলদানি কিনো,
কুসন যে কটা পারো।
পাঁচ খানা ছোট কার্পেট চাই,
আর বেছে এনো ভবানী লাহার ছবি।

আমার কথাটি ফুরোলো

আমার কথা ফুরায়, তবু
আবার কথা জমে।
নতুন নটে গজিয়ে ওঠে
নতুন শাকের ক্ষেতে।
গরু চরে মুড়িয়ে দিয়ে,
ভাত দিতে বৌ ভোলে
কেন ভোলে সেই কথাটি
বলা রইলো বাকি।

(সমাপ্ত)

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

আজ্‌মায়েশ্‌

শ্রীযুক্ত তারাপদ রাহা এম্‌-এ

রবিবার।

প্রবাসীর পাতা উল্টাইতে গিয়া সুধীর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া দেখে সাড়ে চা'র। ঘর ফাঁকা।—শান্তিটা ত আচ্ছা পাজী, গ্লোবে হাফ টিকেটে টকী দেখতে গেল—একবার ডাকতে পারলে না। চারুটা বোধ হয় সঙ্গে গিয়েচে, আর না হয় দিদির বাড়ী,—আচ্ছা দিদি পেয়েচে যা হ'ক!—দেখা যাবে এর পরের রবিবারে—

পাশে পাঁচসিকে দামের কেরোসিনের কাঠের টেবিলের এক পাশে এক বাক্‌সো চুরুট ছিল, সুধীর তাহা হইতে একটা লইয়া ধরাইল—কি করা যায়?—

হ্যারিসন রোড থেকে কলেজ ষ্ট্রীট পাঁচ পয়সা,—কলেজ ষ্ট্রীট থেকে বৌ-বাজার পাঁচ—দশ: সেখান থেকে এস্‌প্ল্যানেড্‌—পনের, এস্‌প্লানেড্‌ থেকে ভিক্টোরিয়া মেমো—পাঁচ আনা, ফির্‌তি বেলা না হয় এদিক্‌ ওদিক আর একটু ঘুরে আসা যাবে—

সুধীর চুরুট টানিতে টানিতে সাব্যস্ত করিল আজিকার দিনে ছ'আ৹ দিয়া একখানা 'অল্‌ডে-কন্‌সেসান্‌' কেনাই ঠিক। ইচ্ছামত যেখানে সেখানে উঠিবে নামিবে, আর রাত্রে ফিরিয়া রুম্‌-মেট্‌-দুইটীর আজ্‌গুপী গল্প কহিয়া তাক্‌ লাগাইয়া দিবে।

সিজারের টিকেট্‌ জমাইয়া পাওয়া সোণালী সেফ্‌টী-রেজার-খানায় একখানা নূতন ব্লেড্‌ লাগাইয়া সুধীর ভাল করিয়া কামাইল, সাবান দিয়া মুখ ধুইল, তারপর সাজগোজ করিয়া শিয়ালদা ট্রাম্‌-ডিপোতে চলিল।

ডালহাউসীর ট্রামের আশায় সুধীর একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ বা-দিকে চোখ ফিরাতে দেখে একটী মেয়ে—সার্কুলার রোড পার হইয়া বৌ-বাজারে পড়িল। রঙ্‌টা এমন আর কি?—কালো বলিলেও চলে, গঠন ছিপ্‌ছিপে পায়ে একজোড়া লেডিস্‌-সু। জুতা জোড়াকেই যেন টানিতে পারে না—এমনি দুর্ব্বল দু'খানি পা। সুধীর তবু মেয়েটীকে তাকাইয়া দেখিল—কারণ সে তরুণ, আর মেয়েটী ও হয়ত তেইশ ছাড়ায় নি।

'এই যাঃ—আলোটা ত ভুলে এসেছি, মেরামৎ করে কালই যে সেজদাকে পাঠানোর কথা।'—সামনেই একখানা হাইকোর্টের ট্রাম আসিয়া দাঁড়াইল—Via হ্যারিসন রোড। সুধীর তাড়াতাড়ি ট্রামে চাপিয়া বসিল।

এক ব্যাটারীর এভারেডী ফ্লাশটী পকেটে লইয়া সুধীর আবার ট্রামে চাপিল, তারপর ট্রামের পর ট্রাম বদল করিয়া যখন সে বৌবাজারে তার চেনা দোকানটীতে আসিয়া পৌছিল—তখন সাড়ে ছয়। দোকানী চেনা,—আলোটী মেরামৎ করিতে দিয়া নূতন-আমদানী দু-ব্যাটারীর একটা আলো হাতে লইয়া সুধীর তার শক্তি পরীক্ষা করিতেছিল। আলো কাহারও মুখে পড়িলে অনর্থ ঘটিতে পারে, সুধীর তাই অতি সাবধানে দূরে মাটীতে আলো ফেলিতেছিল। কত রকম পা—ফর্সা, আধ্‌ফর্সা, কালো, নাগরা পরা, জুতামোজা-পরা। ক্রীড়াশীল বালকের মত সুধীর কেবলই আলো ঘুরাইয়া চলিয়াছে। সহসা আলো যাইয়া পড়িল বউবাজারের বাজারের সামনে। আরও দশখানা পায়ের মাঝে সুধীর দেখিল সেই মেয়েটী চলিয়াছে, পায়ে সেই সু-জোড়া,—যেন তাহাকে মাটীর দিকে টানিতেছে। 'ইস্‌!—এতক্ষণে এই পথ এসেছে!'—সুধীর মেয়েটীর সম্বন্ধে আরও কি ভাবিতে যাইতেছিল, এমন সময় দোকানী ডাকিল 'বাবু আপনার আলো হয়ে গেছে—এই নিন।'

তাড়াতাড়ি আলোর দাম মিটাইয়া সুধীর ছুটিল। একবার মনে হইল 'কেনই বা ছোটা?'—কিন্তু সে কতক্ষণ?

আবার তখনই মনে হইল—'ক্ষতি কি ?—দেখাই যা'ক না, —কি-ই বা কাজ আছে ?' মেয়েটী যখন হিদারাম ব্যানার্জ্জির লেন ছাড়াইয়াছে, সুধীর তখন তার পিছনে। সামনে তিন চারিটী ছেলে জটলা করিতে করিতে আসিতেছিল, মেয়েটী লাইট-পোষ্টের কাছে একটু ঘুরিয়া দাড়াইল। সুধীর আলোতে তার মুখখানা দেখিয়া ভাবিল—'বেশ ত! একটু রোগা—এই যা, তা হো'ক, আমি ত আর ওকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না।' সুধীর এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, কিন্তু এবার করিল—দেখিল মেয়েটীর মাথায় ঘোমটা নাই, হাত খালি। তবে কি এ বিধবা ? খৃষ্টান্ ?

—আচ্ছা একবার আলাপ করা যায় না ? কে-ই বা আছে ? চারিদিকে ত লোকারণ্য।

সুধীরের সেদিন কি। সে যেন পাইয়াছিল,—সহসা মেয়েটীর পাশে গিয়া বলিল—'নিভা না ?'

মেয়েটী জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল।

'কোথায় চলেচ এদিকে, আমি তোমায় ট্রাম থেকে দেখে নেমে আস্‌ছি'।

"আমি ত আপনাকে চিন্‌তে পারছি না।"

সুধীর ক্ষণকাল তার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—"দেখুন, মাপ কর্ব্বেন, আমিই ভুল করেচি : আমি ভেবেছিলাম আমার মাস্‌তুতো বোন্ নিভা।"

মেয়েটী হাসিয়া বলিল—'না, এতে আর কি হয়েচে, ভুল ত সকলেরই হ'তে পারে।'

সুধীরের মনে হইল—মেয়েটীর কথায় বেশ মাধুর্য্য আছে, স্বভাবটীও বেশ বিনয়ী ভদ্র। তার আলাপের নেশায় পাইয়া বসিল,—বলিল "আপনার কি অসুখ ?"

"হুঁ।"

"হাঁা, তাই ত দেখচি, প্রায় তিন কোয়ার্টার আগে আপনাকে শিয়ালদার মোড়ে দেখেছি, আমি ভেবেছিলাম নিভা। তারপর মেসে গিয়ে কত জায়গায় ঘুরে এতক্ষণ পরে ট্রামে যেতে দেখি আপনি যাচ্ছেন।"

মেয়েটী একটু হাসিল।

"আপনি কি Student ?"

মেয়েটী তার পাশেই চলিতেছিল, কিছু বুঝিতে না পারিয়া একবার মুখের দিকে তাকাইল। সুধীর আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"আমি বলছি—আপনি কি Student ?"

"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"আপনি কি ছাত্রী ?"

"হাঁ।"

সুধীরের মনে হইল একে Student মনে করিয়াছে—ছিঃ—কি বোকা সে। এ যে ছাত্রীর মত মোটেই না। তবু আলাপ চালাইতে হইবে—বলিল "কলেজে ?"

'হাঁ।'

সুধীর বিস্মিত হইয়া বলিল—"কোন কলেজে ?"

'মেডিক্যাল কলেজে'

'ওঃ—আপনি বুঝি মিড্ওয়াইফ্রি পড়েন ?"

মেয়েটী ত্ব'খানি ঠোটে একটু হাসি মাখাইয়া বলিল, "হুঁ।"

একদল ছেলে আসিতেছিল, সুধীর একটু চুপ করিল, একটু সরিয়া চলিল। ছেলেগুলি চলিয়া গেলে সে আবার মেয়েটীর পাশে পাশে চলিল,—বলিল "আপনার হাটতে বড় কষ্ট হচ্ছে, যদি কিছু মনে না করেন ত, একখানা গাড়ী কি রিক্‌সা করে দি।'

মেয়েটী হয় ত লজ্জা পাইল,—মাটীর দিকে তাকাইয়া বলিল—না, আমি হেটেই যেতে পারব।'

"কোথায় বাসা আপনার ?"

"রিপন ষ্ট্রীট্।"

'কত নম্বর ?

মেয়েটী নম্বর বলিল। কথায় কথায় তখন উহারা ওয়েলেস্‌লীতে আসিয়া পড়িয়াছে। সামনে ঝুন্‌ঝুন্ করিয়া একখানা রিক্‌সাওয়ালা যাইতেছিল, সুধীর হাকিল—'এ রিক্‌সাওয়ালা, এ ধার আও"

মেয়েটী স্বরে মিনতি মাখাইয়া বলিল—"না, না, কি করেন, আমি অমনি পারবো"। তাহাদের দক্ষিণ পাশ দিয়া রিক্‌সা-ওয়ালা তেমনি ঝুন্‌ঝুন্ করিয়া চলিয়া গেল। সুধীর ভাবিল 'আঃ বাচা গেল! রিক্‌সে ওকে উঠিয়ে দিলে আমাকে এখানেই যে ভেগে পড়তে হ'ত।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। জীবনে নারীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সুযোগ পাওয়ার একটা নেশা আছে। একটু লজ্জা যে করিল না, তা' নয়, তবু চোখ কান বুজিয়া সুধীর বলিয়া ফেলিল—

"যদি কিছু মনে না করেন— তা'লে আপনার নামটী জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি ?"

মেয়েটী মুখ নীচু করিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—'রেণুকা দত্ত।'

"আপনার দেশ কি এইখানে ?"

"না, ঢাকায়।"

"কথায় ত কিছু ধরবার উপায় নাই।"

মেয়েটী একটু হাসিল।

"এখানে কে কে আছেন ?"

"আমার ছোট বোন, দিদি আর আমি।"

কথায় কথায় তাহারা রিপন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া পড়িল। মেয়েটী এইখানে আসিয়া সুধীরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—যেন বলিতে চায়—"তা' 'লে আসি নমস্কার।"

সুধীর বুঝিল, বুঝিয়া বলিল—"ওঃ আচ্ছা নমস্কার।" মেয়েটী হাত দু'খানা জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

সুধীর এরূপ অবস্থায় হঠাৎ কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া সিধা সাম্‌নে চলিল, মেয়েটীকে তখনও দেখা যায়, সুধীরের মনে হ'ল হয়ত আরও একটু যাওয়া চলিত, আরও কিছু বলা চলিত, কিংবা আরও কিছু—। ভাবিতেই সুধীরের বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল।—ছিঃ ছিঃ সে কি হয়, মেয়েটী তা' হ'লে কি মনে করবে !"

* * *

সেদিন রাত্রে।

পাশের দুটী তক্তপোষে চারু ও শান্তি লেপ মুড়ি দিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল। শুধু সুধীরের চোখে ঘুম ছিল না। ওর কোথায় যেন কি ত্রুটী হইয়া গিয়াছে, হয় ত আর একটু সাহস, কিম্বা মুখ ফুটিয়া বলা' আমি তোমায়—না,—ভালবাসার কথা না বলিয়া সে ভালই করিয়াছে। সুধীর মনকে বেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ঐ কি তার আদর্শ নারী ?—মানসী ? না, না, না,—তবে ?—'কিছু নয়, শুধু একটু জান্‌তে সাধ হয় নারী কেমন ? তার বন্ধুত্ব কেমন মিঠা, কোন পাপ ইচ্ছা আমার মনে নাই, শুধু ওকে পেতে চাই—অথবা দেখতে চাই ওকে পাওয়া যায় কি না—একটা শুধু experiment'। মনের সঙ্গে অত বোঝা পড়া করিতে সুধীরের বেশীক্ষণ ভালো লাগিল না, ভাবিল, যা হইবার তা'ত হইয়া গিয়াছে, সে সুযোগ আর ফিরিয়া আসিবে না, এখন ওর কাছে মনের কথা খুলিয়া একখানা চিঠি লেখা যা'ক। চারু শান্তি ঘুমাইতেছে, এই সুযোগ। মনকে অন্য চিন্তার অবসর না দিয়া সুধীর ধীরে ধীরে তার রুবী ফাউণ্টেন আর লেখার প্যাডখানা বাহির করিয়া লিখিল—

"হে আমার ক্ষণিকের অতিথি, নাঃ—এটা নিতান্তই কবিত্ব হইয়া গেল, সুধীর উহা কাটিল, কাটিয়া লিখিল—"আমার আদরের রেণু", এমন সময়—চারুটা একবার লেপের মাঝে নড়িয়া উঠিল। "নাঃ—এদের জ্বালায় আমার কিছু করবার জো নেই'—সুধীর ভয়ে ভয়ে প্রদীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

ইহার দশ মিনিট পরে সে ভাবিল, আজ চিঠি না লেখাটা ভালই হইল, এত শীঘ্র ঝোঁকের মাথায় কিছু করা ঠিক নয়। আর তা' ছাড়া ওর ঠিকানাটাও একবার যাচাই করিয়া দেখা দরকার। কাল আফিস ফেরতা সন্ধ্যাকালে সেটা সারিয়া রাত্রিতে না হয় চিঠি লেখা যাইবে।

পরদিন আফিস-ফেরতা সুধীর "স্যাঙ্গো ভেলিতে" এক কাপ চা ও দু'খানা টোষ্ট খাইয়া রিপণষ্ট্রীটের সেই কথিত নম্বরের বাটীর সামনে ঘুরিয়া আসিল। একটী দ্বিতল বাটীর নিম্নতলের একটী ঘরের সম্মুখে লেখা—ধাত্রী ললিতা দত্ত। পাশের ছোট্ট একটা ঘর হইতে ১২।১৩ বছরের একটী মেয়ে বাহির হইল, দেখিতে যেন অনেকটা রেণুর মত। সুধীর বুঝিল—এই বাড়ী, এই বাড়ীতে তার রেণু থাকে। সে এদিক ওদিক আর একটু ঘুরিল, যদি একবার দেখা মেলে। প্রায় এক ঘণ্টা ঘুরিয়া বিড়ী কিনিতে সুধীর একটু দূরে গিয়াছিল যখন ফিরিয়া আসিল

দেখিল রেণুর মতই কে যেন সদর পার হইয়া ভিতরে ঢুকিতেছে।

* * *

সেদিন রাত্রে সকলে ঘুমাইলে ঝোঁকের মাথায় সুধীর লিখিল—

"রেণু, আমার চির-বাঞ্ছিতা,

আমি আজ এ কি করছি জানি না, কিন্তু এ না করে আমার বাচবার উপায় নেই। এখন আমার জীবন মরণ তোমার হাতে। রবিবার সন্ধ্যায় তোমার পিছু পিছু বৌবাজার থেকে ওয়েলেসলী অবধি গিয়েছিলাম, তোমার বোধ হয় মনে আছে, সে শুধু তোমায় দেখব বলে, তোমার মুখের দুটী কথা শুনব বলে। এখন বোধ হয় আমায় চিনতে পেরেছ। আমি তোমার ভালবেসেছি, জানি না এর শেষ কোথায়। আজ দু'রাত্রে আমার চোখে ঘুম নাই, আজই সন্ধ্যায় তোমার বাড়ীর সামনে দু'ঘণ্টা দাড়িয়েও তোমার দেখা পেলাম না, এমন নিষ্ঠুর তুমি। জীবনে এ ব্যাধি আমার প্রথম, ঔষধ তোমারই কাছে। তোমার কাছে ভালবাসা আমি চাইছি না. আমি তোমায় ভালবাসব, প্রাণভরে ভালবাসব, সে ভালবাসা গ্রহণ করে যদি আমায় বাচাতে চাও, তবে একবার দয়া করে এসো। আগামী শুক্রবার রাত্রি ৬॥০ টায় ওয়েলেসলী স্কোয়ারে পূব-দক্ষিণ কোণের বেঞ্চখানায় আমি তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবো, দয়া করে শুধু একবার এসো।

'আপনি' ছেড়ে গোড়া থেকেই আমি 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি,—তুমি ভাববে এটা স্পর্দ্ধা,—কিন্তু জেনো, যে ভালবাসে তার চিরকালই এত বড় স্পর্দ্ধা।

কত কথা আছে, কিছুই ত বলা হ'ল না, যদি দয়া করে এস, বলবো। আমি পথ চেয়ে রইলাম। ইতি—

তোমার পথিক বন্ধু

(দেখা হ'লে পরিচয় হবে)

পাছে দিনের আলোতে মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, তাই সুধীর ধীরে সদর খুলিয়া বাহিরে আসিল। মেসের পাশেই রাস্তায় যে ডাক বাক্সটী রহিয়াছে তাহাতে রাত্রেই চিঠিখানা পোষ্ট করা দরকার। খামের উপর সুধীর বার বার দেখিল,—'রেনুকা দত্ত,—নং রিপন ষ্ট্রীট, অপর দিকে 'প্রাইভেট' তারপর সেখানা পোষ্ট করিল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলেও সুধীর অনেকক্ষণ লেপের মাঝে পড়িয়া রহিল—হাতের ঢিল ছুড়িয়া দিয়া একি ভাবনা। ছি ছি মেয়েটী কি মনে করিবে, যদি সে তার দিদিকে দেখায়?—নাম ঠিকানা না দিয়া সে ভালই করিয়াছে। যদি সে না আসে?—এইরূপ ছাই পাশ ভাবনা আর কতক্ষণ ভাবা যায়, সুধীর হাত বাড়াইয়া একটা চুরুট ধরাইল। চুরুটের ধূঁয়া মাথায় ঢুকিতেই সুধীরের বুদ্ধি একটু খোলসা হইল—সে ভাবিয়া দেখিল ভালবাসা জানাইয়া কোন নারী যদি তার কাছে চিঠি লিখিত, তাহা হইলে সে কি করিত? গর্ব্বে আনন্দে তার বুকখানা দু'হাত ফুলিয়া উঠিত, কোন দাদাকেই সে দেখাইত না,—শুধু কখন সে সুযোগ আসিবে, নীরবে তাহার প্রতীক্ষা করিত। ও চারুর কাছে আসিলে চারুও ইহাই করিত, শান্তিটাও তাই। তবে মেয়েরাই বা তা না করিবে কেন? রেণুই বা জগৎ ছাড়া হইবে কেন?

সুধীরের একটু আশা হইল। সেদিন সন্ধ্যায় সে বায়োস্কোপে গেল, নইলে সময় আর কাটে না।

প্রতি মুহূর্ত্ত যুগ বলিয়া মনে হয়, তবু ও তাহা কাটিয়া যায়। শুক্রবার আসিল। সেদিন সুধীর তার কেডস্ জুতায় দু'বার সাবান লাগাইয়া Quick white দিল, এবং আফিসে যাওয়ার আগে অনেক কাপড় নামাইয়া তার নূতন ইংলিশ কোটটী বাহির করিল।

* * *

সুধীর যখন ওয়েলসলী স্কোয়ারে পৌছিল, তখন ছয়টা বাজিয়া পনের। পূব-দক্ষিণ কোণে সুবিধা মত কোন বেঞ্চ আছে কিনা দেখিবার জন্য সুধীর ধীরে ধীরে সেই দিকে রওনা হইল। দেখিল একখানা বেঞ্চ আছে বটে, কিন্তু সেখানে রেণু নাই, আছে এক আধবয়েসী ট্যাঁশ. ফিরিঙ্গ—ময়লা ছেঁড়া ফ্লানেলের জামা পরে। সুধীর একটু হতাশ হইয়া কোণটা ঘুরিয়া পূবের রাস্তায় পড়িল,

ইচ্ছা—যতক্ষণ সাড়ে ছটা না বাজে, ততক্ষণ বরং দু'একটা রাউণ্ড দেওয়া যা'ক।

দশ সেকেণ্ডও কাটে নাই, সুধীর দেখিল, তাহার সম্মুখে প্রায় হাত পাচেক তফাতে রেণু। বিস্ময়ে আনন্দে সুধীরের যেন কি হইল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল—'এই যে—নমস্কার'।

রেণু মাটী হইতে মুখ তুলিতে পারিল না, দু'খানি হাত উঠাইতে পারিল না, কি বুঝি বলিতে চাহিয়াছিল, তার ঠোট দু'খানি একটু কাঁপিয়া উঠিল, রাত্রে ভালো দেখা যায় না, তবু সুধীরের মনে হইল ওর মুখখানি বুঝি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

সুধীর আত্মবিস্মৃত হইয়া রেণুর হাত ধরিয়া বলিল—"চলুন, ঐখানে গিয়ে বসি।"

রেণু একটুও দাড়াইল না, কথা বলিল না, শুধু সুধীরের সঙ্গে ধীরে আগাইয়া চলিল। সুধীরের নিজের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে, জীবনে এই প্রথম নারীর হৃদয়-বীণার দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিল।

সাহেবটা তখনও বেঞ্চখানার এক পাশে বসিয়াছিল, উহারা গিয়া তার আর এক পাশে বসিল।

প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল, মেয়েটীর কি দোষ, সুধীর নিজেই কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না। সাহেবটা কি ভাবিয়া উঠিয়া গেল। সুধীর অতি কষ্টে মূর্খের মত প্রশ্ন করিল—

"আমার চিঠিখানা পেয়েছিলেন?"

মাটীর দিকে মুখ করিয়া রেণু বলিল—'হুঁ'

একটু পরে সুধীর বলিল—'রাগ করেন নি ত?'

মুখ ফিরাইয়া একটু মিষ্টি হাসিয়া রেণু বলিল—'হাঁ করেচি'

সুধীর হতাশ হইয়া ভয়ে ভয়ে কহিল—সত্যি?—আঃ—কেন?'

"তুমি বলে কথা বলতে চেয়ে আবার 'আপনি' বল্লেন কেন?

সুধীরের মন খুশীতে ভরিয়া গেল, রেণুর বা হাতের আঙুলগুলি সে আবার নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। তার মনে হইল—ঐ শীর্ণ-শ্যামল আঙুলগুলিতে বুঝি কোন মায়া মাখানো আছে।

* * * *

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে সুধীরের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া রেণু কহিল—'কটা বাজে?'

'আটটা দশ'—সুধীর ঘড়ী দেখিয়া বলিল।

'তা হ'লে আজকার মত বিদায় দিতে হবে।'

ব্যথিত কণ্ঠে সুধীর কহিল—'আবার কবে দেখা হবে।'

"আপনি বলুন"

'কাল'

'না'

'পরশু?'

"তাও না"

"তবে, তার পরদিন?

"তা হ'তে পারে, কিন্তু একটু সকাল সকাল বিদায় দিতে হবে, নইলে দিদি—

'বুঝেছি,—কিন্তু তা'হলে ওদিন একটু সকাল সকাল এসো।'

'আচ্ছা'—বলিয়া রেণু একখানা চিঠি সুধীরের হাতের মধ্যে গুজিয়া দিল।

সুধীরের প্রাণে আনন্দের আর একটী নূতন ঢেউ লাগিল। রেণু বিদায় লইবার জন্য নমস্কার করিতে যাইতেছিল, সুধীর তার গালে একটু ঠুনকী মারিয়া কহিল—'ধোৎ, আবার?……ভেবেছ বুঝি এইখানেই তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি, তোমার বাসা পর্য্যন্ত তোমায় এগিয়ে দিয়ে ফিরবো।'

মেসে ফিরিবার পথে সুধীর রেণুর চিঠিখানা অন্ততঃ বিশবার পড়িল। বাঁকা বাঁকা অক্ষরে কাঁচা হাতের লেখা,—তবু কচিমুখের অর্দ্ধস্ফুট কাকলীর মত মিঠা। প্রতি শব্দের তালে তালে সুধীরের প্রাণটা উল্লাসে নাচিয়া উঠিতেছিল। 'রেণু তা' হ'লে আমার?—এত সহজ অথচ এই সাহসটুকু যদি আমার না থাকতো।'

মাতালের মত টলিতে টলিতে সুধীর রাত্রি ৯টায় মেসে ফিরিল।

* * * *

এর একমাস পরে আর এক রবিবারে।

শিবপুর বাগানে কি এক বিদেশী লতার ঝোপের পাশে এক বেঞ্চে সুধীর ও রেণু গায়ে গা লাগাইয়া বসিয়া ছিল।···সুধীর রেণুর পায়ে একটু চাপ দিয়া বলিল—

'তুমি বুঝি তোমার দিদিকে বল্‌লে?'

'হাঁ, আমার বয়ে গেছে বল্‌তে।'

'তবে?'

"তিনি নিজেই টের পেয়েছেন।"

"আমি জানি না—যাও—"

"বলো—বলো শীগ্‌গির্‌"

"উঃ—ছাড়ো ছাড়ো বলছি,···ঐ দেখ কারা আসছে।

'আসুগ গিয়ে'—সুধীর নিজের বাহুপাশ শিথিল করিয়া বলিল—"তা' হ'লে বলবে না—বেশ!"

অদূরে একটা পত্রবর্জ্জিত অচেনা গাছে হরিদ্বর্ণের অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছিল, রেণু সুধীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল—'দেখেছ, কি চমৎকার ফুল ফুটেছে, সমস্ত গাছটা কে যেন বাসন্তী রং ছোপিয়ে দিয়েছে। আমি ছেলে বেলায় বাসন্তী রঙের সাড়ী পরতে ভালবাসতাম।' সুধীরের চোখে ভাসিয়া উঠিল—একটী আট বছরের ছোট্ট মেয়ে যেন ঐ ফুলের রঙের সাড়ী পরিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। সে হঠাৎ উঠিয়া বলিল—'দাঁড়াও আসছি?' তারপর ছুটিয়া গিয়া ঐ পত্রহীন গাছটার শাখা নোয়াইয়া ধরিল।

"এই,—ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না বলছি' বলিয়া রেণু উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তার শ্যামল মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। রেণুর ভয়ে সুধীর কৌতুক অনুভব করিল, সে হাসিয়া বলিল—'কেন?'

রেণু তখন প্রায় সুধীরের হাত ধরিয়া ফেলিয়াছে—"জানো না, মানা আছে?"

সুধীর ফুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল—'কিসের মানা?'

"ফুল ছিঁড়িতে।"

'থাক্‌লই বা, আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, তাই ভয় নাকি?"

রেণু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল—'জানি না—যাও—'

সুধীর জোর করিয়া একরাশি ফুল ওর খোঁপায়, কোমরে গুঁজিয়া দিয়া হাত ধরিয়া কানে কানে কহিল—'পুলিশ যদি জিজ্ঞেস্‌ করে—আমি তোমার কে,—বলবে বর না কি?"

রেণু জোর করিয়া সুধীরের হাত ছাড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল—'যাও'

ইহার পর কেন যেন রেণু আর ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না, শুধু ছায়ার ন্যায় সুধীরের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। সুধীর কিছু না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার পা ব্যথা কর্‌ছে?"

রেণু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না।'

'মাথা ধরেছে?'

"না"।

* * *

প্রায় এক ঘণ্টা পরে অশ্বত্থ-গাছের তলে বসিয়া রেণু যখন বলিল—"দিদি তোমায় একবার দেখা করতে বলেছে," তখন হঠাৎ সুধীরের মাথা যেন খুলিয়া গেল। সে বুঝিল যে কথা সে আজ ঠাট্টায় বলিয়া ফেলিয়াছে, সেই সম্বন্ধেই একটা পাকা বন্দোবস্ত করিতে রেণু এখন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে,—হয়ত তার দিদিও। সুধীরের একটু কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল, সে আগে ত এইটা ভাবিয়া দেখে নাই।

অদূরে একটী যুবতী ইংরাজ মহিলা তার চার পাঁচ বৎসরের খোকাকে লইয়া খেলা করিতেছিল। এক ডাব-ওয়ালা এক ঝুড়ী ডাব আর দা লইয়া বসিয়া ছিল, তাহা দেখাইয়া খোকাকে শুধাইল—'মাম্মী, ওয়াট্‌স্‌ দিস্‌' রেণু সহসা উল্লসিত হইয়া সুধীরের গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—"দেখেছ, কি চমৎকার ছেলেটী!"

রেণুর মুখে আশা আকাঙ্খার ছাপ দেখিয়া সুধীর অবাক্‌ হইয়া গেল।

"কেন, তোমারও একটা চাই না কি?"

"বাবা গো, কি দুষ্টু!" বলিয়া রেণু সুধীরের বুকে মুখ লুকাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জায়গাটা বড় ফাঁকা, তাই পারিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সুধীর ঐ পূর্ণ-

স্বাস্থ্যবতী গৌরাঙ্গী ইংরাজ মহিলার সহিত রেণুর তুলনা করিয়া চলিল।—এই সরু সরু হাত পা, কালো রঙ,—তার হবে অমনি ছেলে, ইস্, সাধ দেখ না! কিন্তু ওর ত চাই, হয় ত ওরও প্রাণের ভিতর মাতৃত্ব কেঁদে ফিরছে। তার এ কথা ভেবে দেখা উচিত ছিল।

সুধীর তার ব্যায়াম-পুষ্ট বাহুর গুলিটা একবার ফুলাইয়া দেখিল। পার্শ্বচারিণী মেম-সাহেবের রঙের সঙ্গে নিজের রঙটা মিলাইয়া লইল—"ওর চাইতে একটু ডার্ক, তা' হ'ক গিয়ে, ও স্ত্রীলোক তাই। স্ত্রী ফর্সা হ'লে অমনি ছেলে হওয়া তার আশ্চর্য্য নয়।—"

বাড়ী ফিরিবার পথে সেদিন তাহাদের আলাপ আর তেমন জমিল না। বীণা বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ যেন কোন তারটা কাটিয়া গিয়াছে। কলিকাতার পথে বিদায় লইবার সময় রেণু হঠাৎ সুধীরের হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল—

"রাগ করো না যেন—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুধীর কি বলিবে না বুঝিয়া বলিল—'পাগল!'

* * *

সে দিন রাত্রে রেণুর চোখে ঘুম আসে না, আসে শুধু জল। এ তার কি হইল? পাঁচ বছর আগে শুধু আর একবার—যা'ক সে কথা। সে আবার কেন ফাঁদে পা দিল। সুধীর আসিলে এবার সে অনর্থ ঘটাইবে—

কিন্তু সুধীর আসিল না। সোম গেল, মঙ্গল গেল, বুধ গেল—সুধীরের দেখা নাই। বৃহস্পতি বারে রেণুর মুখ দেখিয়া দিদি বলিলেন—

"হারে রেণু, সুধীর আসে না?"

"না।"

"কোন অসুখ করেনি ত?"

রেণুর বুকের ভিতর ছ্যাৎ করিয়া উঠিল,—সত্যি যদি তার অসুখ করে থাকে,—বলিল—"কৈ জানি না ত।"

"জানি না কি, একটা খবর ত নিতে হয়, যে লোক রোজ আসত সে এতদিন আসে না কেন? তার ঠিকানা জানিস ত?"

"জানি"

"তবে একখানা চিঠি লিখে দে।"

রেণু বলিল—"আচ্ছা।" বলিল বটে কিন্তু তখনই মনে হইল, সুধীর ত তাহাকে চিঠি লিখিতে বারণ করিয়াছে।

রেণু চিঠি লিখিল না বটে, কিন্তু সে দিন বৈকালে—হ্যারিসন রোডের কথিত নম্বরের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া হাজির হইল। ৫টা বাজিতে তখনও বিশ মিনিট। রেণু দেখিল বাড়ীটার নীচে হারমোনিয়ামের দোকান, উপরে হয়ত মেসই। বাড়ী ঢুকিবার গেটটাও সে চিনিয়া রাখিল, হয়ত আর আধ ঘণ্টা পরে সুধীর এই পথে মেসে ঢুকিবে। রেণু আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল,—দৃষ্টি গেটের দিকে।

পাঁচটা বাজিল,—পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করিয়া বিশ মিনিট হইয়া গেল, সুধীর আসিল না। হয়ত দোকান থেকে চা খাইয়া আসিতেছে, রেণু আরও আধ ঘণ্টা কাটাইল, সুধীর আসিল না। রেণুর হঠাৎ মনে হইল, কৈ আর কেউ ত এ বাড়ীতে ঢুকিতেছে না, মেস হইলে ত আফিস ফেরতা অন্য বাবুরাও ঢুকিত। মরিয়া হইয়া গেটের সামনে আসিয়া সে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—

'এটা মেস?'

দারোয়ান মুখ নিচু করিয়া কি যেন গুণগুন করিতেছিল. মুখ তুলিয়া রেণুর দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল—"না।"

রেণুর পায়ের নীচে ফুটপাথ যেন ঘুরিতে লাগিল। কষ্টে মাথা ঠিক করিয়া সুধীরের ঠিকানার সঙ্গে বাসার ঠিকানা মিলাইয়া দেখিল,—ঠিকানা দেখিতে সে ভুল করে নাই। গেটের দরজা ধরিয়া দারোয়ানকে সে আবার প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা, সুধীর বাবু বলে কেউ এ বাড়ীতে থাকেন?"

দারোয়ান ভজনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া বলিল—"না, না, সুধীর বাবু কোই নেই আছে।"

শুনিয়া সেই শীতের রাত্রেও রেণুর গা ঘামিয়া উঠিল। সুধীর এই জন্যই তবে চিঠি লিখিতে বারণ করিয়াছিল।

* * *

রাত্রি আটটার সময় রেণু মাতালের মত টলিতে টলিতে বাসায় আসিয়া পৌছিল। কাহারও সহিত কথা বলিবার

প্রবৃত্তি তার আদৌ ছিল না, সে ধীরে ধীরে আপনার ছোট ঘরটীতে প্রবেশ করিল। পাশের ঘর হইতে দিদি বলিলেন—

"কে, রেণু না কি রে?"

"হুঁ।"

"ছাখ্ তোর বালিশের নীচে একখানা চিঠি আছে, বোধ হয় সুধীর লিখেছে। আমি আবার এক্ষুণি callএ বেরিয়ে যাচ্ছি,—দেখ দেখি সে ভালো আছে ত?

নোতুন আশার উত্তেজনায় রেণুর গায়ের বল দশগুণ বাড়িয়া গেল—স্ক্রীন টানিয়া খাম খুলিয়া, কম্পিত বক্ষে রেণু পড়িল—

"রেণু,

আমার এ চিঠি তোমায় কতটা আঘাত দেবে তা' জানি, কিন্তু তবু আমায় লিখতে হবে, তোমার মুখ চেয়ে, ধর্ম্মের দিক চেয়ে।

দিদি আমায় কেন ডেকেছেন, তা' আমি জানি, আর মেম সাহেবের ছেলে দেখে কেন অত খুসী হয়েছিলে, তাও আমি বুঝি।……তা' হয় না রেণু, তোমার ও শরীরে মা হওয়া চলে না, কথাটা বেশ করে বুঝে দেখো। তোমার ছেলে যে মেম সাহেবের ছেলের মত হবে না, এ তো তুমিও বোঝ। বিয়ে যদি করতে হয়, তবে একটু দেখে শুনেই করবো, যার ছেলে হ'লে লোকে অমনি করেই তাকিয়ে দেখবে, নইলে নয়। তোমার সঙ্গে কেন যে ভাব করেছিলাম, এটা আমি নিজেই ভালো করে বুঝে উঠতে পারছি না। হয় ত এটা খেয়াল, একটা শুধু 'এক্স্‌পেরিমেণ্ট'। তোমাকে আমি যেমনি করে চেয়েছিলাম, তার চাইতে তুমি অনেক বেশী আশা করে ফেল্‌লে, তাই ত আজ আমার এই অর্দ্ধ পথে ফুলষ্টপ্ দিতে হ'ল। আমার রূঢ়তা মাপ করো।

সুধীর

ললিতা callএ যাইবার আগে রেণুর ঘরের পরদার পাশে দাঁড়াইয়া বলিলেন "কি রে, কি লিখেছে সুধীর? ভাল আছে ত?"

রেণু কোনো সাড়া দিল না। ললিতা পরদা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন—খোলা চিঠিখানা রেণুর বুকের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, ওর দাঁতে হাত দিয়া তখনই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওরে, ও মিনু, শীগ্‌গির স্মেলিং সল্ট্‌টা নিয়ে আয়,—জল, পাখা—

শেষ।

শ্রীতারাপদ রাহা এম্-এ



ভ্রান্ত

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়

মিথ্যার বুকে কান পেতে' রেখে' ওরে উন্মাদ, কিসের লাগি'
চিত্তের কথা শুনিবারে চাস্, সত্যের তরে রহিস্ জাগি' ?
ধূলার ধরায় ধূলিই সত্য, মরুর বুকেতে আলেয়া আলো,
সাচ্চার চেয়ে উজ্জ্বল ঝুটা, বাহির মনের চাইতে ভালো !

হায়রে অন্ধ, হায়রে পাগল, এখনো ধন্দ ঘোচে না তোর—
গন্ধ রহে না বন্ধ কখন, সবুজে সন্দ মাখোনো ঘোর ;
মুঞ্জরি' যবে উঠিয়াছে হিয়া গুঞ্জরি' অলি এসেছে হায়—
বন্ধু টেনে'ছে অঞ্চল তব, গন্ধ ভেসে'ছে ব্যাকুল বায় !

জীবনের পথে মৃত্যুর ছায়া কতবার এসে' পড়ে যে গায়,
কতরূপ মোরা ক্ষণে ক্ষণে ধরি নব-নবীনের চরণ-ঘায় !
শৈশব গে'ছে. কৈশোর গে'ছে, যৌবন এসে' গিয়াছে চলে,'—
ভেঙ্গেছে পুতুল, ভেঙ্গেছে স্বপন,
মিশে গে'ছে ফুল চাকার তলে !

জীবন-পথের মুসাফির মোরা ধরার চটিতে কাজ কি থেমে' ?
সাকী ও পেয়ালা, রঙিন রজনী,
কেন তা ভাবিয়া উঠিব ঘেমে' ?
জোছ্‌নার আলো নিভে' যায় হায় দৃপ্তদিনের কঠিনাঘাতে—
কোথা' সে শয়ন কোথা' সে স্বপন,
কোথায় আঙুর অধর-পাতে !

জগত মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, মিথ্যা আলো ও ছায়ার খেলা,
মাটির ডেলার রাজ্যে বসেছে মহামিথ্যার মোহের মেলা ;
সাধনা মিথ্যা, বেদনা মিথ্যা, কষ্টে কেষ্ট মেলে না হায়,
শাশ্বতে বৃথা ধরিবারে চাই এই ক্ষণিকের কুটির-ছায় !

ওরে উন্মাদ নিরাশ-পান্থ, কিসের আশার স্বপনে জাগি'
পিছনের পথে ফিরে ফিরে চাস্,
পথেতে থামিস্ কাহার লাগি' ?
জগতের পথে আসিয়াছ একা ক্ষণিক-জীবন-তরণী বাহি'—
দোসর স্বপ্ন দেখিয়াছ ভুলে নাহি জানি কার নয়নে চাহি' ।

ওই যে দূরের তরু-ঘনগ্রাম, ধারে তার নীল নিরালা বন
সেখানে কি তুমি বেঁধেছ মঞ্চ,
তারি সাথে কি গো বেঁধেছ মন ?
সেখানে কি তুমি এসেছ রাখিয়া তোমার স্বপ্ন-সাধের মালা ?
প্রাণের হাসিটি রাখিয়া এসেছ, সঙ্গে এনেছ যাতনা-জালা ?

গাঁয়ের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি গো কুন্দবরণ তনুটি দিয়া
তোমারে বেঁধেছে ? হেসেছে ? কেঁদেছে ?
মিলন-বিরহ বক্ষে নিয়া ?
উপরে জেগেছে অলস জোছ্‌না, নিম্নে জেগেছে শীতলধরা—
ফুলের বিছানে জেগেছ তোমরা দুইটি হৃদয় হরষ-ভরা ?

ওই যে দূরের রূপালী নদীতে আজো বুঝি বান ডাকিয়া যায়—
সেখানে কি তুমি বসেছ বন্ধু, বেতস বনের বিমল ছায় ?
গাগরী ডোবান দেখিয়াছ তুমি ? দেখেছ সিক্ত-বসনাদের ?
কাজল-নয়নে দেখেছ কি আলো ?
ভালো কি কাহারে বেসেছ ঢের ?

বাঁকা-বন পথে দেখেছ কি তুমি ঘন কজ্জল-দীঘল কেশ ?
দেখিয়াছ কারো আধ-ভাঙ্গা গতি ; ঈষৎ ত্রস্ত শিথিল বেশ ?
শুনিয়াছ কি গো চাপা হাসি কারো ?
কয়েছ কাহারো সনে কি কথা ?
তোমার বক্ষে হেনেছে কি কেহ একই সঙ্গে হাসি ও ব্যথা ?

মায়াবিনী ধরা তোমারো নয়নে সবুজ কাজল দিয়াছে এঁকে,
তুমিও দেখেছ আকাশ সুনীল, ভুলেছ তুমিও জোছ্না দেখে,
কুসুমের রূপে মুগ্ধ হয়েছ, শিখেছ বাজাতে তুমিও বাঁশী,
তোমারো সমুখে শ্যামল দোব্ড়া পরেছে ধরণী সর্ব্বনাশী !

তুমিও শুনেছ পক্ষী কাকলী, চখা ও চখীর চোখের চাওয়া,
তোমারো অঙ্গে শিহর তুলেছে উতলা পুবালী ফাগুন-হাওয়া,
খুলেছ তুমিও মনের দুয়ার, পরশ করেছ সোনার দেহ,
কাশের বনের সফেন-পরশ-সমান পেয়েছ মায়ার স্নেহ !

কি বল বন্ধু, যৌবন বনে বাজে নাই কভু মিলন-বীণা ?
রমণী তোমারে বরণ করে নি, উলসি' বক্ষে হয়নি লীনা ?
পাংশু হয়েছে শারদ জোছনা ? ফাগুন ধরেছে আগুন জ্বালা ?
মনের বনেতে শুক্‌নো-পত্রে উষ্ণ-নিশাস-শব্দ ঢালা ?

তবে কেন বল উদাস পান্থ, পিছনের পথে ফিরিয়া চাও ?
সমুখের পথে নয়ন রাখিয়া সমুখের স্রোতে ভাসিয়া যাও !
মিছে-উৎসবে হওনি অধীর, মুক্ত বন্ধু, মুক্ত তুমি—
যাবার বেলায় রহিত বেদনা যদি যেতে হেথা পেয়ালা চুমি !

তবুরে নিরাশ, কি বলিতে চাস—বিদায়-বেলার গান কি গাবি?
এদিকে ওদিকে কাহারে দেখিস ? শেষ কথা কারে বলিয়া যাবি
একি, উচ্ছসি' কাঁদিস কেনরে ? তোর কি মরণ মোহন নহে ?
উদাস-পরাণে উদ্দেশ আছে ? কার লাগি চোখে অশ্রু বহে ?

এখনো রয়েছে কৈশোর স্মৃতি ? সবুজ দিনের সোণালী আশা ?
বকুল-বনের কাজল-কিশোরী—
নিমেষেতে ভালো তাহারে বাসা ?
ভীরু-প্রণয়ের ভীরু নিবেদন, কঠিনা কিশোরী পাষাণ-হিয়া,
পেয়েছিলে তুমি পোড়া প্রাণ ফিরে
সবুজ পরাণ তাহারে দিয়া ?

তাহলে পথিক, তুমিও পড়েছ রূপের বনেতে অকালে বাঁধা,
মিথ্যারূপের মায়ায় ভুলিয়া জীবন ভরিয়া কেবলি কাঁদা !
কি বল কৃষ্ণবরণ-কিশোরী সে কি গো রূপসী হইতে পারে ?
কত রূপ ধরে রূপ-যাদুকর জাননা বন্ধু, ধরার দ্বারে !

কুরূপ হেথায় হয় অপরূপ, গন্ধবিহীনা গন্ধময়ী,
অন্ধ যে হয় পদ্মলোচন, ভীরুরা সকলে দিগ্বিজয়ী !
স্নেহের চক্ষে স্নেহের পাত্র মন্দ কি কভু হইতে পারে ?
মায়ার কাজল পরেছি আমরা ভুলে-ভরা এই ধরার দ্বারে !

আজো কি পাগল, তাহারি লাগিয়া বেদনার বনে রয়েছে জাগি,
আজো কি ধাতার রুদ্ধ-দুয়ারে ফিরিছ বৃথাই তাহারে মাগি,
আজো কি রে হায় বাঁধা জানালায় চেয়ে দেখ
তারে দেখার তরে,
আজো কি নিশীথে বালিশ ভিজাও নাম-নাহি-জানা
ব্যথার ভরে ?

ওরে দুর্ব্বল, মিছে ক্রন্দন, পাষাণী প্রেয়সী টলে না তায়— ;
দেবতা শোনে না মানুষের ব্যথা—সময় তাঁহার নাহি যে হায় !
পাষাণ-বেদীর উপরে রহেন পাষাণের চেয়ে কঠিনতর—
তাঁহার কৃপার লাগি উন্মাদ, বৃথাই তোমরা গুমরি মর !

মিথ্যা ধরার বুকে বুক পেতে হৃদয়ের জয় চেয়ো না তুমি,
পিছনের পথে রয়োনা, রয়ো না, অলীক আশার চরণ চুমি !
কিশোরী-বালার কাজল-নয়ন মায়ার বনেতে স্বপন-খেলা—
চেয়োনা, চেয়োনা, পিছনের পানে বন্ধু,
তোমার পড়েছে বেলা !

ওরে উন্মাদ, বাঁধিস নে বাঁধ আপনার ফাঁদে পড়িবি তুই,
ফুলিয়া উঠিবে ফেনিল সলিল, চরণের তলে পাবি না ভুঁই,
সমুখে এসেছে পারের বার্ত্তা, জোয়ার এসেছে খেয়ার সঙ্গে,
তরণী ভিড়েছে ধরণীর কূলে—যাইবার যারা যাইবে চলে !

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

বিবিধ সংগ্রহ

চিত্রগুপ্ত

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

(ক) সকলেই জানেন যে আলোর গতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। এই গতিতে দৌড়তে পারলে এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে "সাত পাক দিয়ে আসা যায়"—এবং এই গতিতে ছুটে প্রতিদিন সকালে সূর্য্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে লাগে আট মিনিট আট সেকেণ্ড। আবার সূর্য্য থেকে আরো দূরে যে সব নক্ষত্র আছে তা' থেকে এখানে আলো এসে পৌছতে আরো বেশী সময় লাগে। Arcturus বলে একটা নক্ষত্র আছে যেখান থেকে সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল গতিতে আসতে আসতে এই পৃথিবীতে এসে পৌছতে আলোর লেগে যা'বে এক চল্লিশ বছর!

এখন আগামী ১৯৩৩ সালের ১লা জুন তারিখে আমেরিকার চিকাগোতে যে বিশ্ব-মেলা বস্‌বে তা'র কর্ত্তৃপক্ষ কি ঠিক করেছেন জানেন? ১৮৯৩ সালে যে বিশ্ব-মেলা বসেছিলো সেই সময় থেকে Arcturus বলে' ঐ তারাটা থেকে যে আলো পৃথিবীর দিকে আস্‌তে আরম্ভ করেছে তাও এখানে এসে পৌছবে ঐ বিশ্ব-মেলা বস্‌বার সময়েই। এখন আগামী বিশ্ব-মেলার কর্ত্তৃপক্ষ ঐ আলোটাকে ধরে সেখানকার Hall of Science-এ—তা'হতে কলকজাচালাবার কাজে লাগাবার কল্পনা করছেন!

তাঁরা আশা করছেন যে ঐ আলোর রশ্মিগুলোকে একটা telescope এর সাহায্যে ধরে'—electrometre লাগানো একটা photometre এর মধ্যে চালিয়ে দেবেন। এখন যন্ত্রপাতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে যে switch গুলো, ঐ electrometre টা তার সঙ্গে লাগানো থাক্‌বে। তা হ'লেই সেই আলোকরশ্মির সাহায্যে অনায়াসে ও বিনা খরচে কলকজা চালানো যেতে পার্‌বে।

জিনিষটা এখন বিশ্বাস করা যাচ্ছেনা বটে কিন্তু সত্যি সত্যি যদি তা' সম্ভব হয়—তা হলে পৃথিবীর লোকের অনেক খানি উপকার হবে এবং অনেক গুলি সমস্যারও সমাধান হ'তে পার্‌বে।

(খ) বেতার-দর্শন-যন্ত্র বা টেলিভিশন যন্ত্রের আবিষ্কার বর্ত্তমানে হ'য়েছে বটে কিন্তু, তা' এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন আর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এই যন্ত্রটীকে সাধারণের কার্য্যোপযোগী ক'রে তোলা বোধহয় সম্ভবপর হবে। বিলেতের জনৈক বৈজ্ঞানিক ডাঃ এচ্‌-হার্টম্যান টেলিভিশন যন্ত্রের যেটুকু উন্নতি হ'য়েছে তারই সাহায্য নিয়ে একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশ অতি সুস্পষ্টভাবে শুধু দেখা যাবে। ইচ্ছে ক'রলে ক্যামেরার সাহায্যে ছায়া-চিত্রপোযোগী চমৎকার ফটোও তুলে নেওয়া যাবে। যন্ত্রটিতে একটা লোহার গোলক সংযুক্ত তার ওপরে বৈদ্যুতিক আলোক সম্পাতের ব্যবস্থা করা আছে। মধ্যে একটি transmitter বা বেতার তরঙ্গোৎপাদক যন্ত্র ও ক্যামেরা সংস্থাপিত। একটি জাহাজের ওপর থেকে গোলকটির সঙ্গে তারের সংযোগ রাখবার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে, জাহাজের কামরার ভিতর গ্রাহক যন্ত্র ও ছবির পর্দা থাকে। সমুদ্রের তলায় কিছু দ্রষ্টব্য থাকলেই জাহাজের ক্যাবিনের পর্দায় তা ফুটে ওঠে এবং সেটিকে যদি রক্ষণযোগ্য ব'লে পরিচালক মহাশয় মনে করেন তথনই ক্যামেরার সাহায্যে তা' তুলে নিতে পারেন। অর্থাৎ জলের ভিতর তীব্র আলো গিয়ে তার চার দিকটা প্রথম আলোকিত ক'রে নেয়, তখন সেই আলোর সাহায্যে যে জিনিষ দেখা যায় তা'

transmitterএর সাহায্যে ওপরকার পর্দায় ফেলা হয় এবং তার থেকে ছবি তুলে নেওয়া তো অতি সহজ কাজ। এই যন্ত্রটি আবিষ্কারের ফলে ডুবো জাহাজগুলিকে খুব সহজে এবার উদ্ধার ক'রতে পারা যাবে এবং সমুদ্রগামী জাহাজগুলির বিপদ অনেক পরিমাণে থাকবে না ব'লে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন।

আলোককে জমাট করা

আলো-কে যে বরফের মত জমিয়ে রাখা যায় এবং ইচ্ছে করলেই তা' ব্যবহার করা চলে এটা ভাবাই শক্ত, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বর্ত্তমানে এটা শুধু বলছেন না রীতিমত পরীক্ষা ক'রে চোখের সামনে দেখিয়ে দিচ্ছেন। কতকগুলি পদার্থ সংসারে আছে যার থেকে আলো পেতে পারা যায় এবং সেই আলো জমিয়ে রাখা যেতে পারে। এই পদার্থগুলিতে যদি রঞ্জন রশ্মি বা X'Ray অথবা Cathode রশ্মি প্রয়োগ করা যায় তা হ'লে এগুলি রীতিমত উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। এই পদার্থের সাহায্যে ভবিষ্যতে যাতে বাইরের বহুশক্তি সঞ্চিত করতে পারা যায় তার বিশেষ চেষ্টা চলছে।

মানসিক শক্তির সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ

এ খবরটা আমাদের কাছে অবশ্য নতুন নয়···কারণ আমরা ভারতবাসীরা বিশ্বাস করি যে সেকালে মুনিঋষিরা তপোবলে বা ধ্যানযোগে বহুদূরের খবরাখবর নিমেষ মধ্যে জানতে পারতেন। কিন্তু এই কলিযুগেও এ জিনিষটা যে অনেক জাতির মধ্যে বর্ত্তমান রয়েছে এবং তারা যে এই নিয়ে রীতিমত চর্চ্চা ক'রে থাকে তা বোধ হয় অনেকে জানেন না। শোনা যায় যে ভারতবর্ষে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হ'য়েছিল সেই সময় নাকি শত শত মাইল দূরের সমস্ত সংবাদও এখানকার অধিবাসীরা নিমেষ মধ্যেই সংগ্রহ করতেন। অনেকের ধারণা—ঢাক ঢোল পিটে, কিম্বা আগুন জেলে তার ধোঁয়ার সাহায্যে কোন রকম ইঙ্গিত ক'রে নাকি পরস্পরকে জানানো হ'ত এবং সেই ভাবেই সকলে খোঁজ পেত। কিন্তু একথাগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না কারণ সর্ব্বত্র তা' সম্ভবপর নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্য জাতিদের মধ্যেও দেখা যায় যে তারা নিমেষ মধ্যে বহুদূর প্রদেশের খবরাখবর জানতে পারে। তারা যে জ্যোতিষ জানে তাও নয় অথচ সব ব্যাপার হুবহু ব'লে লোককে বিস্মিত ক'রে দেয়। জনৈক অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীকে এই রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রে যা জানা গেছে তা ভারি কৌতুকাবহ। সে বলে "আমরা যখন কারুর কোন খবর নিতে চাই তখন মনটাকে খুব শান্ত ক'রে ফেলি এবং একাগ্রমনে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। যার সম্বন্ধে ভাবি সেও তখনি বুঝতে পারে কেউ ডাকছে, অমনি সেও সংযত হয়ে স্থিরচিত্তে ঘুমোয়। আর পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান হ'তে থাকে।" আমরা কিন্তু বহু চেষ্টা করে দিবারাত্রি ঘুমিয়েও এ রহস্যের হদিস্ প ইনি।

মানুষের আদি বাসস্থল

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ডাক্তার (P. W. Laidler) লেড্‌লার দক্ষিণ আফ্রিকার Orange Free State এর অন্তর্গত হেল্‌ব্রন্ বলে জায়গাটির কাছে মাটির তলা থেকে একটি বহু প্রাচীন নগর সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন। এই সহরটি বহুকাল পূর্ব্বে মাটির তলাতে প্রোথিত হয়ে গেছলো। লোকের বিশ্বাস যে মানুষের আদি পূর্ব্বপুরুষরা এইথানেই বাস করতেন।

কেপটাউনে রয়টারের যে সংবাদদাতা আছেন তিনি জানিয়েছেন যে ডাক্তার লেড্‌লারের দলের লোকেরা এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অত্যন্ত গোপনতা অবলম্বন করে চলছেন। তবে এইটুকু মাত্র জানা গেছে, যে মাটির তলায় প্রোথিত এই সহরটির মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্যে অন্ততঃ দু'মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আধ মাইল। এর মধ্যে যে সমস্ত চিহ্ন পাওয়া গেছে তাতে নাকি জানা গেছে যে রোডেশিয়ায় Zimbabwe বলে প্রাচীন সহরটিতে যে ধরণের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে এখানেও অনুরূপ সভ্যতাই বর্ত্তমান ছিল। এই সহরটি কয়েকফিট্ বালির তলায় চাপা পড়ে ছিল এবং এর ওপরে গাছপালাও জন্মে গেছ্‌লো। এর মধ্যে মাটির তৈরী কফিনে রক্ষিত মৃতদেহ এবং অন্যান্য জিনিষ পত্র দেখে অনুমান করা হয় যে এই প্রাগৈতিহাসিক

হেলব্রোনাইট-জাতি প্রস্তর-যুগের লোকের চেয়ে উন্নত ছিল। ডাক্তার লেড্লারের মত হচ্ছে এই যে মানুষের আদি বাসস্থান এশিয়াতে ছিল বলে লোকের যে ধারণা আছে তা' ভুল, তিনি বলেন আফ্রিকাই হচ্ছে মানুষের আদি বাসস্থান।

ভাগ্যহীন ধনী

জার্ম্মানীর এক বিখ্যাত চিত্রকর Lesser Urcকে সম্প্রতি ভিক্ষুকদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন জার্ম্মানীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনী চিত্রশিল্পীদের মধ্যে একজন। তা'ছাড়া শিল্পীসমাজে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তিও বড় কম ছিলনা। বিখ্যাত Prussian academyর তিনি ছিলেন একজন সভ্য, তবুও যে তাঁকে ভিক্ষুকদের গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়েছে তার কারণ এই যে তাঁর মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও কেউ জান্‌তেন না যে তিনি অত টাকা রেখে মারা গেছ্‌লেন। এতে সহজেই মনে হ'তে পারে যে তা'হলে ভদ্রলোক বুঝি অতিরিক্ত রকমের কৃপণ ছিলেন। কিন্তু তাও নয়। সে হ'লে তো ব্যাপারটা কতকটা কৌতুকাবহই হ'তো। এই হতভাগ্য চারুশিল্পীর ঐ রকম অবস্থার কারণটি আসলে অত্যন্ত করুণ। তাঁর জীবনের দারুণ নিঃসঙ্গতা এবং গভীর নৈরাশ্যই তাঁর এতখানি দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। অথচ এই নিঃসঙ্গতাকেই তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে পড়ে থাক্‌তেন। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর সেই যে তিনি তাঁর ষ্টুডিওর ভিতর ঢুকেছিলেন, উত্তর জীবনে যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তার মধ্যে থেকে আর বড় বেরুতেন না। এবং অপর কাউকেও কোন কারণেই সে ঘরের মধ্যে যেতে দিতেন না। এর ফলে সংস্কারের অভাবে তাঁর অমন সুন্দর ষ্টুডিওটিরও অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়্‌লো। একটা গভীর ঔদাস্যের ভাব তাঁকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো যে তিনি শীতগ্রীষ্মের প্রভাবকে পর্য্যন্ত অনায়াসে অবহেলা করতেন।

কাজ কর্ম্ম তিনি তো সব ছেড়েই দিয়েছিলেন। সুতরাং ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে লোকের মনেই রইলো না যে এই যে বেদনাহত শিল্পীটা জীবনব্যাপী দীনতাকে সযত্নে বরণ করে নিয়েছেন এঁরই একখানি ছবি দিয়ে নিজেদের শিল্পসংগ্রহের গৌরব বাড়াবার জন্যে দেশবিদেশের ধনীরা একদিন বিনিময়ে এঁকে অকাতরে প্রভূত অর্থ দান করতে কুণ্ঠিত হয়নি এবং যার ফলে এঁর গৃহে অর্থের অভাব কোন দিনই হয়নি। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সকলেই তাঁকে কপর্দ্দক-হীন বলে ধরে নিয়ে, অতি দীনভাবেই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করল। কিন্তু তাঁকে সমাহিত করবার পর তাঁরা তাঁর ঘরে গিয়ে যা আবিষ্কার করলেন তাতে সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁরা গিয়ে দেখ্‌লেন যে বহুসহস্র টাকার ব্যাঙ্ক নোটে তাঁর মেজে একেবারে ছাওয়া রয়েছে। উপরন্তু বাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়ির মধ্যেও ব্যাঙ্কথেকে যেমনটী এসেছিলো ঠিক তেমনি অবস্থাতেই মোটা এক তাড়া নোট পড়ে রয়েছে। একটা পুরাণো ছবির পিছন থেকে বেরুলো একটা বহুমূল্য মুক্তার মালা। এমনি নানা মূল্যবান বস্তু তাঁর ঘর থেকে বেরুতে লাগ্‌লো যেগুলো উদাসী বেদনাতুর শিল্পীর কাছে নিতান্ত নিরর্থক বলেই মনে হয়েছিলো।

তাঁর এই রকম অবস্থাকে অনেকেই হয়তো দুর্ব্বলতা বা ভাবপ্রবণতা বলে মনে করবেন কিন্তু যে কারণেই হোক শিল্পীদের প্রাণ প্রায়ই এই রকমের হ'তে দেখা যায়। ইটালীর অমরকবি দান্তের জীবনের কথা এই সম্পর্কে মনে করা যেতে পারে। সাধারণের কাছে যা নিতান্ত একটা বাজে ব্যাপার—সেই মানসীকে জীবনে লাভ করতে না পারার দুঃখ আজীবন তিনি কিভাবে বহন করেছিলেন!

আটলাণ্টিক সমুদ্রের সহর

প্যারিসের সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মঁসিয়ে লিউ ফিন্‌কিনোস্ আটলান্টিক্ মহাসাগরের ওপর এক প্রকাণ্ড লৌহ-সহর স্থাপনের প্ল্যান ক'রেছেন। তিনি ব'ল্‌ছেন যে আমার এই প্রস্তাবটি যদি আজ কার্য্যে পরিণত করবার জন্যে পৃথিবীর সকল জাতি সাহায্য ক'রতে আসেন, তা হ'লে বর্ত্তমানে কাজ না-থাকার দরুণ যে দারুণ বেকার সমস্যা সমস্ত

জাতিকেই চঞ্চল ক'রে তুলেছে তা' সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হ'তে পারে। অবশ্য খরচ একটু বেশী পড়বে, তবে পৃথিবীর সকল জাতি সম্মিলিত হ'য়ে যদি সেই খরচ বহন করতে প্রস্তুত হন তবে সেটা কারুর পক্ষেই বড্ড বেশী ব'লে মনে হবে না। তিনি হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন যে সবশুদ্ধ সহরটি গ'ড়ে তুলতে ১০০ কোটী পাউণ্ড খরচ পড়ে মাত্র। সহরের আয়তন প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল হবে, এবং প্রকাণ্ড সহরে যত রকমের আমোদ প্রমোদ ব্যবসায়কেন্দ্র, আফিস, আদালত থাকে, তা' সবই এই সহরে থাকবে এবং সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার লোক প্রতি বৎসর এই সহরটি যাতে দেখতে আসেন সেইরকম ভাবে এটিকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা হবে। মহাসমুদ্রের মধ্যিখানে সহর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করা অনেকের কাছে হাস্যকর বা উন্মাদের খেয়াল ব'লে মনে হ'তে পারে কিন্তু এর দ্বারা যে কতটা উপকার সকল জাতির হ'তে পারে তা' ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা ভাল ভাবেই ব'লতে পারেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মাঝামাঝি এ মহাসমুদ্রে যদি একটা সুবৃহৎ আশ্রয় স্থল থাকে তা' হ'লে এই উড়োজাহাজের যুগে বিমানপোতগুলি যে কতটা নিরাপদ থাকতে পারে তা' একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া ঝড় আসবার পূর্ব্বে আবহাওয়ার রিপোর্ট তাঁরা এইখান থেকে পেতে পারবেন। হাজার হাজার জাহাজ আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হ'তে গিয়ে যে অসুবিধা ভোগ করে তা'ও আর ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে না। তা'ছাড়া প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের মত উঁচু বড় বড় চারটি স্তম্ভ এই সহরের চারিধারে তৈরী করা হবে এবং তার ওপর থেকে এত জোরালো আলো ফেলার বন্দোবস্ত করা হবে যার দ্বারা সুদূরবর্ত্তী কূলহারা জাহাজগুলি পর্য্যন্ত তাদের পথ খুঁজে নিতে পারে। সহরটির আকার হবে ঠিক একটি চাকার মত, বড় বড় লোহার চাকতিই হবে এর জমি, সেই চাকতির সঙ্গে চেন্ লাগিয়ে সমুদ্রের তলায় খুব শক্ত নোঙর লাগাবার বন্দোবস্ত হবে, যা কিছুতেই কখনও উঠে আসবে না। কি কৌশলে সেগুলি লাগাতে হবে তাও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঠিক ক'রে ফেলেছেন। সবশুদ্ধ ৮৬টা বড় রাস্তা এই সহরে থাকবে এবং হোটেল, হাঁসপাতাল, অপেরা হাউস্, সিনেমাগৃহ, আমেরিকা সহরের প্রকাণ্ড আকাশচুম্বী বাড়ীর মত বাড়ী, বাগান, ফোয়ারা প্রভৃতি এতরকম বিচিত্র প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে যার আকর্ষণ কাটিয়ে পৃথিবীর কোন বড় লোকই বেশীদিন থাকতে পারবে না। একবার না একবার তাঁদের এখানে আসতে'ই হবে। অন্ততঃ বিশলক্ষ লোক বাইরে থেকে প্রতি মাসে এখানে আসবেন এরকম আশা করা যেতে পারে এবং এখানে থাকতে গেলে প্রতিদিন এক পাউণ্ড ক'রে তাঁদের দিতে হবে। অতএব খরচাও খুব শিগ্‌গির উঠে যাবে। মঁসিয়ে লি'উয়ের এ প্রস্তাব নিয়ে অবশ্য এখন কোন জাতিই মাথা ঘামাচ্ছেন না কারণ বাজার বড়ই মন্দা!

* * * *

ব্রিটেনে পাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি

জনৈক বিশিষ্ট মানসিক-ব্যাধি-চিকিৎসক ব'লছেন যে ব্রিটেনে পাগলের সংখ্যা এখন খুবই বেড়েছে এবং জায়গার অভাবে তাদের হাঁসপাতালে রাখা যাচ্ছে না। ওখানে যে এত খুন জখম হ'চ্ছে এর কারণই এই যে উন্মাদদের ভাল রকম চিকিৎসা করা হ'চ্ছে না। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে অন্ততঃ ৩০,০০০ হাজার পাগল বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ পাগলদের চিকিৎসালয়ে জায়গা নেই। ডাক্তারদের মত এই, যে আগেকার চেয়ে খাওয়া দাওয়া ভাল পায় ব'লে প্রত্যেক পাগলের আয়ুও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়েছে। সেই জন্তে হাঁসপাতালে একটি জায়গা খালি হ'তে বহুদিন লাগে। এমন অনেক পাগল আছে যাদের কিছুদিন ভাল ক'রে চিকিৎসা ক'রলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র জায়গার অভাবে এরা অনাদৃত থেকে জাতির ভারস্বরূপ হ'য়ে রইলো

* * * *

বিমানপোত রক্ষার নতুন উপায়

ইউ, এস্, আরমি এয়ার কোর্ রিসার্চ (U. S. Army Air Corps Research) বিভাগের বৈজ্ঞানিকেরা বিমানপোত দুর্ঘটনা রহিত করবার জন্ত প্রকাণ্ড প্যারাসুটের

সাহায্য নিচ্ছেন। আকাশপথে বিমানপোত চালিয়ে যাওয়া আজকাল খুব সহজ হ'লেও নিরাপদ নয় একথা সকলেই জানেন। হঠাৎ হয় তো একটা পাখা ভেঙ্গে গেল, কিম্বা কল বিগ্‌ড়ে গেল তখন ওপর থেকে উপায়হীনের মত আছাড় খেয়ে পড়া ছাড়া আর কোন পন্থা থাকে না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য এ পর্য্যন্ত নানা রকম চেষ্টা চল্‌ছিল, এখন এই রিসার্চ্চ বিভাগের কর্তৃপক্ষ একটি মতলব ক'রেছেন যে এরোপ্লেনের সঙ্গে যদি প্রাকাণ্ড প্যারাসুট থাকে তাহ'লে বিমানপোত ও তার চালকবর্গ বোধ হয় অক্ষুন্ন অবস্থায় মাটিতে নামতে পারেন। প্যারাসুটটি বিমানপোতের বসবার ঘরের ছাদে আট্‌কানো থাক্‌বে এবং কল বিগ্‌ড়ে গেলে সেটা ছাতার মত যাতে খুলে যায় তারও ব্যবস্থা করা হচ্চে। এতবড় প্যারাসুট্ নিয়ে ইতিপূর্ব্বে আর কোন পরীক্ষাই হয় নি। এই প্যারাসুট্‌টি সবশুদ্ধ লম্বায় ও চওড়ায় ৮৫ ফিট্। সম্প্রতি একটি উড়োজাহাজ থেকে এই সুবৃহৎ প্যারাসুট্‌টির সঙ্গে ২॥০ হাজার পাউণ্ড আন্দাজের শিষে বেঁধে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়—সে সময়ের এর ভাবগতিক দেখে অনুমান করা যাচ্ছে যে তাঁদের উদ্দেশ্য সফলকাম হ'তে পারে। খুব শিগ্‌গিরই এটিকে উড়োজাহাজে লাগিয়ে পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষা সফল হ'লে ভবিষ্যতে সকলেই যে হাসিমুখে উড়োজাহাজে চ'ড়তে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

* * * *

ফুটবল খেলার বিরুদ্ধে আমেরিকান মহিলাদের অভিযান :—

সারা আমেরিকার মাতৃজাতি ফুটবল খেলার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে প্রবল আন্দোলন সুরু ক'রেছেন। আমেরিকায় ফুটবল খেলার যে নৃশংস নিয়ম আছে এবং তার ওপর খেলার সময়ে যে ভীষণ বর্ব্বরতার লীলা চলতে থাকে তা দেখে অবশ্য কোন মা-ই তাঁর ছেলেকে এরকম খেলায় উৎসাহ দিতে পারেন না। এবারের ফুটবল খেলার সময়ে নিউ ইয়র্কে ২৯জন কলেজ এবং স্কুলের ছেলে প্রথমে ভীষণ আহত হ'য়ে তারপর জন্মের মত ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রেছে। এর ফলে প্রায় প্রত্যেক মা ফুটবল খেলার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন ক'রছেন। ফুটবলের নিন্দা ক'রে তাঁরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে চিঠি লিখছেন, বক্তৃতা ক'রছেন এবং চারিধারে প্রত্যহ মেয়েদের সভা ব'সছে। তাঁরা ব'লছেন যে-খেলা খেলতে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিতে হয় সে রকম খেলাকে তাঁরা কোনমতে ভাল ব'লে স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত নন। তাঁরা বলছেন এরকম রাক্ষুসে খেলায় ছেলেদের আর কিছুতে যোগদান করতে দেবেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় দুটি কলেজ টিমের খেলা হয়, সেই খেলায় একটি কলেজের তিনজন ভাল ছেলে মারা পড়ে। প্রতিপক্ষ অপরপক্ষকে পরাস্ত করবার জন্য গুপ্তভাবে তাদের এমন আঘাত করে যে মাঠ থেকেই তিনটি ছেলেকে আর ফিরে যেতে হ'লনা। এই তিনটি ছেলের এমন শোচনীয় মৃত্যুতে আমেরিকান মহিলরা আরও বিশেষ ভাবে ব্যথিত ও শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছেন।

* *

দুনিয়ার অর্থসংকট

সারা জগতে আজ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছে এবং তা বড়লোক গরীবলোক সকলেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রছেন। ১৯৩২ সালে যদি ব্যবসা বাণিজ্যের ঠিক এই অবস্থা থাকে তা'হ'লে সারা জগতের ইতিহাস একরকম পাল্টে যাবে ব'লে সমস্ত পণ্ডিতদের ধারণা। গত তিন মাসের মধ্যে ব্রিটেনে ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক কাজের অভাবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রেছে। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি প্রত্যেক দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মাসের পর মাস দৈন্যের কবলে গিয়ে প'ড়ছে। এই অবস্থা থেকে কি করে মুক্ত হওয়া যায় তার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য খুব সম্ভবতঃ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে একটি আন্তর্জাতিক অধিবেশন ব'সবে। সমস্ত দেশের জনসাধারণের মত, যুদ্ধের ঋণ পরিশোধ স্থগিত করা এবং সামরিক বিভাগের ব্যয় কমিয়ে দেওয়া। এই সামরিক বিভাগকে পোষণ ক'রতে গিয়ে সমস্ত জাত আজ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। শুধু সৈন্যরক্ষণের ব্যয় ছাড়া, নৌ-জাহাজ নির্ম্মাণ ও তার

সংরক্ষণ বিমানপোত নির্ম্মাণ ও তার রক্ষার জন্য এত টাকা প্রত্যেক জাতকেই প্রতি বছর খরচ ক'রতে হয় যে কহতব্য নয়। বিলেতের সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত লর্ড ওয়েক্ফিল্ড তাই সেদিন এক খবরের কাগজের প্রতিনিধির কাছে বলেছেন, যে যদি আমরা সত্যি সৌভাগ্যের মুখ দেখ্‌তে চাই তা হ'লে একটা আন্তর্জাতিক অধিবেশন ক'রে যুদ্ধের ঋণ নিয়ে একটা মীমাংসা ক'রতে হবে এবং টাকার বিনিময়ের হার সকলের পক্ষে যাতে সুবিধার হয় সেই রকম একটা ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তবে আমার কথা এই যে আমরা সকলে এই দৈন্যের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছি, এখন যদি অপর সমস্ত জাত যুদ্ধের ঋণ এবং প্রচুর সামরিক ব্যয় তুলে দিয়ে যে যার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করেন তা হ'লে বর্ত্তমান সভ্যজগতের সব দিক দিয়েই কল্যাণ হতে পারে।" লর্ড ওয়েক্ফিল্ডের এই মত সর্ব্বলেই সমর্থন ক'রেছেন।

* * *

অভিজাত্যের গর্ব্ব :—

কিছুদিন পূর্ব্বে পারস্যের মন্ত্রণা পরিষদের কর্ত্তাকে আবদুল্লা বেগ্ নামক একটি যুবক অতি আশ্চর্য্য এক খেয়ালের বশে নিহত ক'রেছে। আবদুল্লা বেগ্ আদালতে বলে যে জগতের মধ্যে বংশমর্য্যাদায় তার বংশ শ্রেষ্ঠ এবং সেই বংশের একটি মেয়ে নীচবংশীয় মন্ত্রীকে বিবাহ করায় তাদের মর্য্যাদা ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। তার প্রতিশোধ নেবার বাসনায় সে এই কার্য্য সম্পন্ন করতে বাধ্য হ'য়েছে। আবদুল্লা যখন আদালতে হাজির হয় তখন সে এতটুকুও বিমর্ষ হয় নি দেখা গেল। বহুমূল্য একটি সিল্কের জাব্বা পরিধান ক'রে, উন্নত মস্তকে, রাজপুত্রের মত সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। বিচারপতির নানা প্রশ্নের উত্তরে সে বলে,—"আমি পারস্যের অভিজাত বংশ শ্রেষ্ঠ সুদানবংশীয় যুবক। ৪০০শ' বছর আগে এই ইরাক্ দেশে আমার পূর্ব্বপুরুষরা এসে বসবাস ক'রতে আরম্ভ করেন এবং তাঁরা সকলের থেকে চিরকালই নিজেদের স্বতন্ত্র ক'রে রেখে এসেছেন। আমাদের বংশের নিয়ম এই যে, কোন কন্যা নিজেদের চেয়ে অপকৃষ্ট কোন বংশের বা জাতির লোককে কখনও বিবাহ ক'রবে না। সামাজিক মর্য্যাদায় যারা আমাদের সমকক্ষ, মাত্র তাদের বিবাহ ক'রতে পারা যায়। সেই জন্য আমাদের মেয়েরা চিরকালই একই পরিবারের মধ্যে বিবাহ ক'রে আস্‌ছে। কিন্তু এতদিন পরে তার বৈচ্যুতি ঘটেছে—আমাদেরই বংশের একটি মেয়ে সানা বংশীয় ঐ মন্ত্রীকে বিবাহ ক'রে বংশের মর্য্যাদাকে কলঙ্কিত ক'রলে। সানাবংশীয় লোকেরা জাতি হিসেবে আমাদের চেয়ে ঢের ছোট। তারা মস্ত বড় ধনী হ'তে পারে, বিদ্বান হ'তে পারে কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না আমাদের কাছে একটা ক্রীতদাসের চেয়ে বেশী সম্মান তার নেই। আমাদের বংশের মেয়ে তাকে বিবাহ ক'রে একটা ক্রীতদাসীর সম্মানকে বরণ ক'রে নিয়েছে সেই জন্য আমি তাকে হত্যা ক'রেছি।" এরপর বিচারপতি মহাশয় ইরাকের প্রধান মন্ত্রীকে সাক্ষ্য দিতে বলেন। প্রধান মন্ত্রী সাক্ষ্যে বলেন যে আসামী যে বংশমর্য্যাদার কথা ব'লছে ত' সম্পূর্ণ সত্য এবং এই বিবাহের সময় সাদুন বংশীয় অনেক লোক গুরুতর আপত্তি জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় রাজা সাউদ্ আমাদের বর্ত্তমান রাজা ফইজাল সাহেবকে পর্য্যন্ত অনুরোধ ক'রেছিলেন এ বিবাহ বন্ধ ক'রে দিতে, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি। বিচারপতি এ সমস্ত সাক্ষ্যের ও আসামীর বংশমর্য্যাদার মূল্যের বিনিময়ে তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, আসামী অবিচলিত ভাবে সে দণ্ড গ্রহণ করে।

* * *

ছেলেরা কি চায়

আমেরিকার নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মহতী সভার অধিবেশন ক'রে এ যুগের ফ্যাশন-দোরস্ত মেয়েদের খুব নিন্দা ক'রেছে। পুরোণো যুগের মেয়েদের তারা "আদর্শ রমণী" ব'লে মনে করে এবং তারা বলে যে তাদের ওপর আমাদের সত্যিকারের শ্রদ্ধা আছে। শতকরা ৮০ জন ছেলের মত এই যে একালে যে সমস্ত মেয়ে সিগারেট মুখে দিয়ে, পানদোষে মত্ত হ'য়ে, মুখে রুজ মেখে, ঠোঁটে রং দিয়ে হালফ্যাশানী হ'তে চায় তাদের

আমরা মোটে পছন্দ করি না। মেয়েরা বেঁটে হ'ক, বোঁচা হ'ক, কালো হ'ক ফর্সা হ'ক তাতে কিছু এসে যায় না, তাদের চুল যদি লাল্‌চে হয় তাহ'লেও আপত্তি নেই কিন্তু তারা যদি নারীত্ব বর্জ্জন ক'রে পুরুষ হ'য়ে ওঠে তাহ'লেই আমাদের চক্ষুশূল ব'লে মনে হয়। শ্রী ও বুদ্ধির প্রকাশ যে সমস্ত মেয়ের মধ্যে দেখা যায় তারাই 'আদর্শ মেয়ে' ব'লে আমাদের মত।

* * *

পুসিফুট্ জন্‌সনের অভিযোগ ও তার উত্তর

বিশ্ববিখ্যাত নৈতিক আদর্শবাদী পুসিফুটজন্‌সন্ সাহেব সাহেব সারা জগৎ পরিভ্রমণ ক'রে বর্ত্তমানে আমেরিকার এক সভায় বলেছেন যে লণ্ডনের পথে আধঘণ্টা ঘুরে এসে তিনি এত মাতাল দেখেছেন যে আজ দশবছর ধ'রে সমস্ত আমেরিকায় তিনি অত মাতালের সংখ্যা দেখেন নি। বিলেতে মদ্যপান অত্যন্ত বেশী ব'লে তিনি মনে করেন। তাঁর এই বক্তৃতার প্রতিবাদ ক'রে বিলেতের আবগারী বিভাগের লাইসেন্স্‌দাতা মিঃ জর্জ্জ, এ হটার্ (George A. Hotter) সাহেব ব'লেছেন যে মাসের পর মাস বিলেতের সমস্ত পাড়া ও সহর ঘুরে বেড়ালে তবে একটা কি তুটো মাতালকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাও পাওয়া শক্ত। পুসিফুট জনসন্ সাহেব হয়তো লণ্ডনের ইষ্ট্ এণ্ড (East End) পল্লীতে গিয়ে মাতালের সন্ধান ক'রেছিলেন এবং সেখানে হোটেল বন্ধ হবার পর হয়তো তু'জন কি একজন লোককে সামান্য মত্ত অবস্থায় গৃহগমনোদ্যত দেখতে পারেন। মাতালের সংখ্যা যে কমে গেছে তা তো আমরা প্রত্যক্ষ বিবরণীতে দেখ্‌তে পাচ্ছি। শুধু তাই নয় মদ্যপায়ীর সংখ্যা প্রতিদিন ক'মে চলেছে কারণ মানুষের রুচির পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত ঘট্‌ছে এ ছাড়া সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধূলার আকর্ষণ এযুগে এত প্রবল যে লোকে আর আনন্দের জন্য মাত্র শুঁড়িখানার দিকে ছোটে না। বিলেতের একজন কনষ্টেবল বলে যে কবে যে সে শেষ মাতাল ধ'রেছিল তা তার স্মরণেই আসে না।

* * *

চীনে ডাকাতের প্রতাপ

পিকিং-মুকডেন রেলওয়ের তাহুসান নগরে যাতায়াতের পথে এক প্রবল দস্যুদলের আড্ডা আছে। এই দস্যুদলের দলপতির নাম "পুষ্প সৌরভ।" এই দস্যুর কাছে কর না দিয়ে কোন যাত্রীবাহী বা মালবাহী ট্রেণ এখনও যেতে পারে না। চীনের কোন রাজা মহারাজা আজ পর্য্যন্ত তার এই প্রতাপকে নষ্ট ক'রতে পারেন নি। প্রত্যেক ট্রেণকে থামিয়ে সে যাত্রীদের কাছে কর আদায় করে, কোন বিদেশী যাত্রী বেশী টাকাকড়ি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে সে সব টাকাই ছিনিয়ে নেয়। তার আড্ডার কাছে প্রত্যেক ট্রেণকে একবার ক'রে থামতে হয় তারপর দলপতি ও তাঁর পাঁচশো অনুচর যাত্রী ও ট্রেণকে পরীক্ষা ক'রে ছেড়ে দেয়। সকলকেই কিছু না কিছু তাকে দিতে হয়। তার আদেশ অমান্য ক'রলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

চিত্রগুপ্ত



ভিক্ষুণীর প্রেম

শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্ত

মা-সেইঞ্চি কেন যে হঠাৎ ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করিল, কেহ তাহার কারণ ঠিক্ বুঝিতে পারিল না। বছরখানেক আগেও সে যখন তাহার হুইপেট্-সিডান্ গাড়ীখানি হাঁকাইয়া চাউতালান্ বৌদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে আসিত, তখন কত তরুণ তরুণী দর্শক তাহার রূপে এবং সাজসজ্জার ঠমকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিত। কালো কুচ্‌কুচে মসৃণ টোপর খোঁপাটি বেড়িয়া একগাছা সরু হীরে-বসানো হার, যেন অমাবস্যা রাত্রির ঘন অন্ধকারময় আকাশের বুকে ঝিক্‌ঝিকে তারার মালা। ধব্‌ধবে সাদা, ফুরফুরে পাতলা 'এইঞ্জি'র বুকে ছোট ছোট নীলার বোতামের সার, তারই রঙে রঙ মেলানো গাঢ় নীল রেশমের 'লুঙ্গী'খানা *; সেই রঙেরই মখমলের উপর সাদা পুঁতির কাজ করা 'ফানা' যোড়া পায়ে, গোলগাল ননীর মতন কোমল, শুভ্র হাত দুখানার কবজিতে নীলা এবং হীরে বসানো দু'গাছি ব্রেস্‌লেট্, বাঁ হাতের আঙুলে ছোট ছোট হীরের মাঝখানে বড় একখানি নীলা বসানো আংটী পরা, গলায় বড় বড় মুক্তোর এক ছড়া হার, বুকের উপর হীরের ধুকধুকি জ্বলিতেছে। হাতে তার নীল রেশমের ছাতা, হাতল হইতে এক গোছা মুক্তোর ঝালর ঝুলিতেছে।

প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পর যে রাস্তা দিয়া তাহার গাড়ীখানি নিঃশব্দে পাহাড়ের উপর উঠিত, মুগ্ধ তরুণের দল উৎসুক চিত্তে সেখানে অপেক্ষা করিত। শুধু একটু চোখে দেখার আশায়, শুধু তাহার হাতের ফুলের তোড়াটির মিষ্টি সুরভির নেশায়। মা-সেইঞ্চির দৃষ্টি শান্ত, সে কোনোদিন কোনো ভক্তের দিকে ফিরিয়াও চাহিত না, সুদূর আকাশের পানে কী এক ভাবে বিভোর হইয়া সে চাহিয়া থাকিত! এমন যার রূপ, এতো যার ধন, ঐশ্বর্য্য, তার এতো কিসের দুঃখ—এই আলোচনাই পথের লোকে করিত।

চাউতালান্ ফায়ার * পাথর-বাঁধানো সিঁড়ির সামনে গাড়ী থামিলে, সে ধীর পাদক্ষেপে সিঁড়ির একধার দিয়া উপরে উঠিত, শান বাঁধানো উঠান পার হইয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিত। শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তরের উপর সোণালী জলে কারুকার্য্যকরা সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি, অর্দ্ধশায়িত—তাঁহার সম্মুখে ফুলের তোড়াটি রাখিয়া মাটিতে নতজানু হইয়া বসিয়া একদৃষ্টে বুদ্ধের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিত।

কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইত। কত লোকে কতবার তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার চেষ্টা করিত কিন্তু সে শুধু একটু মিষ্টি হাসি দিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিত, বেশী ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগও দিত না।

তরুণীর দল তাহাকে হিংসা করিত—"আছেই না হয় রূপ, আছেই না হয় হীরের গাদা, এত অহঙ্কার কেন"? তবু তাহাকে একবার না দেখিয়া, একটু কথা বলিবার চেষ্টা না করিয়াও কিন্তু স্থির থাকিতে পারিত না।

* * * *

চাউতালান-ফায়া-সংলগ্ন ফোঙ্গী-চাউঙের শ্রেষ্ঠ ফোঙ্গী বা ভিক্ষুর নাম উ-বা ইন্। তিনি সান্ধ্যভজন শেষ করিয়া মঠের বাহিরে আসিলেন। উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নভূমির দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। স্বল্প-তোয়া ক্ষীণ-কায়া জাইন্ নদী আঁকাবাঁকা একটি রূপালী রেখার মতন জল্ জল্ করিতেছে। নদীর ওপারে শ্যামল পাহাড়-শ্রেণীর উপর ছোট ছোট ফায়ার শুভ্র চূড়ার সোণালী মুকুট ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। পাহাড়ের কোলে কোথাও বা ধানের ক্ষেত, কোথাও বা চীনাদের শাক-শব্‌জীর বাগান, কোথাও বা

* ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রী ও পুরুষদিগের পরিধেয় বস্ত্র

* বৌদ্ধ মন্দির

কৃষকদিগের বস্তি। ভিক্ষু উ-বাইন্ অপলকনেত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতেছিলেন। পশ্চাতে রেশমী কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া ভিক্ষু ফিরিলেন। একটী সুন্দরী রমণী তাঁহার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া কাতরস্বরে বলিল "গুরুদেব, আপনি আমায় দীক্ষা দিন, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমি ধর্ম্ম-প্রচারে অযোগ্যা স্বীকার করি, কিন্তু আমাকে আপনার মঠে শিক্ষার্থিনীরূপে গ্রহণ করুন। আমি আজ আর ঘরে ফিরে যাব না।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, দুই চোখে জলধারা বহিল। প্রবীণ ভিক্ষু মেয়েটীর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন "মা, শান্ত হও। তুমি একটি বৎসর ধরিয়া তোমার প্রার্থনা জানাইতেছ, আমি উদাসীনের মতন তোমার কথায় কর্ণপাত করিতেছি না, তোমার মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি উদাসীন নহি, তোমার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছি, তোমার মন পরীক্ষা করিয়াছি কিন্তু আমার এখনও সন্দেহ হয়, ভিক্ষুণীর কঠোর জীবন তোমার মতন কোমলা নারীর সহিবে কি না। এ যে মহান্ ত্যাগের জীবন! ধন-সম্পত্তি, পার্থিব আরাম, বিলাসিতা, সুখলালসা জন্মের মতন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এ সকল ত্যাগ হয় ত তোমার পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে কিন্তু আজীবন কৌমার-ব্রত অবলম্বন বড় সহজ ব্যাপার নয়। তুমি হৃদয়ে কঠোর আঘাত পাইয়াছ, প্রণয়ীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় তোমার মন সংসার-বিমুখ হইয়াছে, কিন্তু মনের এইরূপ অবস্থা চিরদিন থাকিবে কি? তুমি তোমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, অতুল সম্পদের উত্তরাধিকারিণী। তোমার বয়স, তোমার রূপ, তোমার অর্থ, সর্ব্বোপরি তোমার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় তোমার ভিক্ষুণী-জীবনের অন্তরায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তুমি সংসারে থাকিয়াও তো মঠের সেবা করিতে পার, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পার।" রমণী বলিল "গুরুদেব আমি আমার মনকে অনেক দিন ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছি, আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, ত্যাগের দ্বারাই প্রকৃত ভোগ সম্ভব হয়। সংসারে আমার আর কোন বাসনা নাই,—সুখ, সম্পদ, বিলাসিতা, আরাম আমার কাছে বিষময় বোধ হইতেছে। আমার জীবন যৌবন আমি ফায়ার চরণে সমর্পণ করিয়া আমি শান্তিলাভ করিতে চাই। আপনি প্রসন্ন চিত্তে আমাকে গ্রহণ করুন। এমন কোন প্রিয় জিনিস আমার নাই যাহা ত্যাগ করিতে আমার ক্লেশ হইবে।" ভিক্ষু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "বেশ, তবে কাল প্রত্যূষে তুমি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইও। ভিক্ষুণী মা-তিন্ তোমাকে এ বিষয়ে কর্ত্তব্য বলিয়া দিবে। আজ রাত্রে তুমি তাঁহার গৃহে আশ্রয় লও। ভগবান্ বুদ্ধের আশীর্ব্বাদে তুমি শান্তিলাভ কর।"

পরদিন চাউত্তালান্ ফায়ার পূর্ণিমার উৎসব। প্রভাত হইতে ফায়ার বৃহৎ ঘণ্টা গম্ভীর নিনাদে পূজার্থীদের আহ্বান করিতেছে। নানান্ রঙ বেরঙের রেশমী লুঙ্গী পরা নর-নারী মোমবাতী, ফুল, চন্দন, ফল, খাদ্যদ্রব্য লইয়া দলে দলে অফুরন্ত সোপানশ্রেণী বাহিয়া মন্দিরে চলিয়াছে, ক্লান্তি নাই, বিরতি নাই। তানাখা*-মাখা গোল মুখগুলি হাসিতে ভরা, প্রাণে বিশ্বাসের আবেগ। মর্ম্মর প্রস্তরে বাঁধানো চাতালে ভিক্ষুণীদের সভা বসিয়াছে। মুণ্ডিত-মস্তক, পীত-বসন-পরিহিতা সুন্দরী তরুণী মা-সেইঞ্চিকে সেই দলে দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অবাক হইয়া গেল। তরুণীর দল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "এও আবার আর এক ঢং, কত অপরূপ রূপেই মনোহরণের প্রয়াস, হায় রে।" তরুণের দল নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত মা-সেইঞ্চির গাড়ীর অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইয়া মন্দিরের ঘরে ঘরে উঁকি মারিয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। অবশেষে ভিক্ষুণীর বেশে তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। একজন যুবক বলিল "মেয়েমানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা ভার।"

* * * *

জাইন্ নদীর ওপারে পাহাড়ের উপর একটী ছোট ফায়া—প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পর একটি টিনের কিন্ লণ্ঠন ধীরে ধীরে মঠের চূড়ার উপরে নিবিড় অন্ধকার রাত্রিতে ধ্রুবতারার মতন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বলিয়া উঠে, সুদূরের অধিবাসীদিগেরও এই ক্ষুদ্র মঠের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়।

মা-সেইঞ্চি এপার হইতে প্রতি সন্ধ্যায় এই দীপটীকে লক্ষ্য করে, আর কত কথা ভাবে, আর কত কল্পনা করে।

* (চন্দনের মতন)

সে থাকে অন্ধকারে, দীপের মালিক থাকে তীব্র আলোক হাতে। মা-সেইঞ্চি তাহাকে দেখিতে পায়। তাহার গতিবিধি ক্রমশঃ পরিচিত হইয়া গেল। দীর্ঘ, সুঠাম দেহ, পরিধানে ভিক্ষুর বেশ। তাহার মতন সেও ফায়ার সেবক। সন্ধ্যা-দীপ ফায়ার মুকুটে পরাইয়া সে ধীরে ধীরে নদীতীরে নামিয়া আসে—পাষাণ-শ্রেণী বাহিয়া জলে অবগাহন করে। তারপর আর্দ্র বস্ত্র ছাড়িয়া সিঁড়িতে বসিয়া থাকে। মঠে ফিরিবার কোনো তাড়া নাই, যেন রাত্রির অন্ধকারই তাহার পরম বন্ধু—সে যেন তাহারই কোলে লুকাইয়া থাকিতে চায়।

দিনের পর দিন একই সময়ে, একই নিয়মে সন্ধ্যা আসে,—ক্রমশঃ রাত্রির নিবিড় অন্ধকার তাহাকে আলিঙ্গন করে। মা-সেইঞ্চি স্তব্ধ, নিশ্চল প্রতিমার মতন একই স্থানে বসিয়া একই দৃশ্য দেখে।

নদীর ওপারের ভিক্ষুটির সম্বন্ধে কত প্রশ্ন জাগে তাহার মনে—সেও কি তাহারই মতন সংসার-বিরাগী? সেও হয়ত কাহাকেও ভালোবাসিয়াছিল, প্রতিদান পায় নাই! যাহাকে তাহার সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিল, সে হয়ত নিষ্ঠুর ভাবে তাহার হৃদয়কে দলন করিয়াছে। কেন সে সংসারের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া গৈরিক সাজ পরিল? ওর মনে না জানি কত দুঃখ! ওর ব্যথার ব্যথী কি কেউ নেই? আচ্ছা, ও কি আমায় দেখিতে পায়? কি করিয়াই বা দেখিবে? আমি যে অন্ধকারে বসিয়া আছি! ওকে যে এমনি করিয়া আমি দেখিতেছি, ওর কথা যে এতো ভাবিতেছি, তাহা যদি সে জানিতে পারিত, আহা! নিশ্চয়ই সে একটু সুখী হইত! মা-সেইঞ্চি ধীরে ধীরে ঘরে গেল। বাক্স হইতে একটী টর্চ্চ লইয়া আবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিল। অপর পারের ভিক্ষুটি তখনো আনমনে বসিয়া আছে। সে একটী পাথরের উপর বসিয়া টর্চ্চের আলো ওপারে সিঁড়ির উপর ফেলিল। যুবক চম্‌কাইয়া চারদিকে চাহিল, আবার টর্চ্চ জ্বলিল, আলোর দিক্যে লক্ষ্য করিয়া বুঝিল এ কাহারও সঙ্কেত। সে একটু যেন ভীত হইয়া ঘরে চলিয়া গেল! মা-সেইঞ্চি অনেকবার টর্চ্চ জ্বালাইয়াও আর ভিক্ষুকে দেখিতে পাইল না। সেদিন সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম হইল না।

ভোরের বেলা নিয়মিত সময়ে সে প্রার্থনা করিতে বসিল, কিন্তু কোথায় তাহার মন? দেবতার চরণে যে অর্ঘ্য প্রতিদিন সে দিত, সে অর্ঘ্য আজ অলক্ষিতে কোন্ মানব-দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইল, কল্পনা করিয়া তাহার দেহ মন শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত দিনের সাধন, ভজন, অধ্যয়ন, সকল চিন্তা ছাপাইয়া কোন্ এক অপরিচিতের ধ্যান-মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। প্রতি মুহূর্ত্তে সে নিজেকে পাপী ভ্রষ্টা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল, কিন্তু জয়ী হইতে পারিল না। অস্তগামী সূর্য্যের মলিন আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের বলও নিস্তেজ হইয়া আসিল—অনিচ্ছায়, অতর্কিতে তাহার চরণ দুটি অলস পদক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তখন নদীর ওপারের ফায়ার বাতি জ্বলিয়াছে—ভিক্ষু যথাস্থানে নাই। ক্ষণকালের জন্য মা-সেইঞ্চির মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। কেন মিছে ওর জন্যে এতো ভাবি? সে তো আমায় চাহে নাই? তবু টর্চ্চ টিপিল, বিদ্যুৎপ্রকাশের মতন আলোর ঝলক্ ঝল্‌সিয়া উঠিল, ভিক্ষুর হৃদয়ের প্রতি ধমনীতে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। মা-সেইঞ্চি দেখিল ভিক্ষু নদীতীরে পায়চারি করিতেছে সেদিন তাহারও হাতে টর্চ্চ, সেও তাহার সাহায্যে ভিক্ষুণীটীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

দুটী তরুণ তরুণীর মাঝখানের ব্যবধান, শুধু ঐ ক্ষীণ-কায়া নদীর রূপালী স্রোত—অন্ধকারের বুক চিরিয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

গভীর রাত্রি। এপারের চাউঙের বাতি একটি একটি করিয়া নিভিয়া গেল। ভিক্ষু ভিক্ষুণীর দল বিশ্রাম লাভ করিল। কেবল একটী ভিক্ষুণী সেই নিবিড় অন্ধকারকে সাথী করিয়া নীরবে জাগিয়া রহিল।

গভীর রাত্রে যখন দ্বাদশীর চাঁদ ম্লান আলোয় আকাশ ভরিয়া দিয়াছে, ধরণী নিস্তব্ধ, ভিক্ষু তান-পে তখন ধীরে ধীরে পাহাড় বহিয়া উঠিয়া মা-সেইঞ্চির পাশে আসিয়া বসিল। মা-সেইঞ্চি তাহার সলিল-সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলখানি নিংড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, "এতো ভিজে গায়ে

বেশীক্ষণ থাকলে তোমার যে অসুখ করবে ;" নিজের গায়ের চাদরখানি খুলিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বসাইল। যেন কত দিনের পরিচয় তাহাদের! নদীর বুকে সাঁতার দিয়া, পাহাড় বাহিয়া উঠিয়া কাছে আসা—এ যেন কতো সহজ, কতো স্বাভাবিক! পরস্পরের চোখের ভাষায় যেন তাহারা বলিতেছিল "ভুলে গেছি কবে থেকে আস্‌ছি তোমায় চেয়ে' সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।" এমনি করিয়া প্রতি রাত্রিতে এই দুইটী বন্ধুর মিলন হয়-সাক্ষী থাকে চাঁদ ও তারা আর নিবিড় অন্ধকার!

সেদিন বর্ষার কাজল মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। দূরে পাহাড়ের ঘন শ্যামল বুকের উপর ধোঁয়াটে রঙের পাত্‌লা মেঘ স্তরে স্তরে জমা হইয়া ক্রমশঃ সবুজকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কালো আকাশের গায়ে এক ঝাঁক বলাকা সাদা ধব্‌ধবে ডানা দুইখানি বিস্তার করিয়া বাতাসের তাড়নায় কখনও একটু উপরে কখনও একটু নীচে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। এলো মেলো ঝোড়ো হাওয়া পাগলের মতন ছুটাছুটি করিতেছে। কখনো বা কালো মেঘখণ্ডকে খানিক ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতেছে, তাহার ফাঁক দিয়া নীল আকাশ উঁকি দিয়া মেঘদূতকে অভ্যর্থনা করিতেছে।

মা-সেইঙ্কি অধ্যাপক উ-বাইনের প্রকোষ্ঠে বসিয়া সঙ্ঘের শীল ব্যাখ্যা শুনিতেছিল। মন আজ তার বড়ই উন্মনা—নিজের অজ্ঞাতে বার বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অধ্যাপকের অধ্যাপনার ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল। উ-বাইন্‌ বলিলেন "ভিক্ষুণীর ব্রত পালনের প্রথম সহায়—তৎগত-চিত্ততা। তোমার মন এখনও একাগ্রতাসাধনে সিদ্ধ হয় নাই। তুমি যাও, নিজের ঘরে গিয়া নির্জ্জনে সাধন কর,—মনের চাঞ্চল্য ভিক্ষু জীবনের মহাপাপ।"

মা-সেইঙ্কি লজ্জিত হইয়া কিছুক্ষণ আধোবদনে বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। তখন চারদিক কালোয় কালো, মাঝে মাঝে আকাশের কালো গায়ে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা খেলিয়া বেড়াইতেছে। সে নিজের ঘরে না যাইয়া ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ বাহিয়া মঠের বাহিরে আসিল এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাথরের উপর বসিল। নদীর ওপারের ফায়ার তখনও বাতি দেখা যায় না।

মা-সেইঙ্কি ভাবিল, "এই দুর্যোগে সে কি আসিবে?" নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা কূল ছাপাইয়া মাঠের উপর দিয়া জল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সে শুনিয়াছিল বর্ষার সময় এই জাইন্‌ নদীর ভীষণ স্রোত! সারাবছর এই নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া লোক চলাচল করে। বর্ষার দিনে তার কী প্রচণ্ড মূর্ত্তি! আজকের নদীতে সাঁতরাইয়া আসার চেষ্টা আর স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ একই কথা। কি করিয়া সে তাহার বন্ধুকে জানাইবে যেন সে এমন বিপদের মুখে ঝাঁপ না দেয়। সে অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, আজ টর্চ্চ জ্বালিবে না। তাহার বাতির ইঙ্গিত না পাইলে, সে কখনই আসিতে চেষ্টা করিবে না।

বৃষ্টি নামিল, অঝোর ধারায়। মা সেইঙ্কির ভ্রূক্ষেপ নাই। সর্ব্ব শরীর জলের ধারায় ভিজিয়া গেল—সে অপর পারে অনিমেষে চাহিয়া রহিল। ঐ তো লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়াছে! লণ্ঠনটী দড়ির সাহায্যে ফায়ার মুকুটে তুলিল; তারপর বাঁধানো ঘাটের সোপানগুলি পার হইয়া জলে ঝাঁপ দিল। মা-সেইঙ্কির বুক কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠ হইতে বেদনা-ব্যঞ্জক অস্ফুট কাতর ধ্বনি বাহির হইল। সে ঘন ঘন সুইচ টিপিয়া টর্চ্চের আলো নদীর জলে ফেলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল। এক একবার সে পাগলের মতন জলে ঝাঁপ দিতে চায় আবার ভাবে বন্ধু এসে যদি তাহাকে না পায়।

কড়্‌ কড়্‌ শব্দে বজ্র আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘন ঘন বাতি জ্বালে, যদি বন্ধু তাহার সাঙ্কেত-দীপটী দেখিতে পায়, একটু বল পায় প্রাণে!

কোথায়—নদীর খরস্রোত বহিয়া চলিয়াছে—বন্ধুর চিহ্ন কোথাও নাই। একটু শব্দ হয়, আর সে ভাবে এই বুঝি এলো সে!

বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে নীল আকাশের কোলে দুই চারিটী তারা ফুটিল।

মা-সেইঙ্কি সেই আলোতে পাহাড়ের গা বাহিয়া সন্তর্পণে নদীর তীরে নামিয়া আসিল। কতবার পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, কোনরকমে পাথরগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া উঠিল। জলের ধারে গিয়া কাতর স্বরে ডাকিল—"তান্‌পে! তুমি কোথায়?"

বাকী রাতটুকু সে বন্ধুর প্রতীক্ষায় অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সেইখানেই কাটাইয়া দিল।

প্রভাতের প্রথম সূর্য্যরশ্মির স্পর্শে মা-সেইঙ্কির চেতনা হইল। কাহার গম্ভীর রূঢ় কণ্ঠস্বর তাহার কাণে প্রবেশ করিল—"ভিক্ষুণীর এ কি আচার!" চোখ মেলিয়া দেখিল ভিক্ষু উ বাইন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সে উঠিয়া বসিল—নিজের দেহ হইতে আর্দ্র পীত বস্ত্রখানি খুলিয়া ভিক্ষুর চরণে রাখিয়া নতজানু হইয়া বলিল "এই নিন্‌ ভিক্ষুণীর ছদ্মবেশ। এই বস্ত্রের আবরণে আমার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে ঢাকিতে পারি নাই"।

শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

পশারিণী ঃ— মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা দি মুসলমান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড, ১১।৫ কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালী মুসলমানেরা এখন পরম উৎসাহ সহকারে বাঙলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন দেখে বড়ই আনন্দ হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে পর্যান্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাঙলাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করতে আপত্তি উত্থাপন করছিলেন। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থ সে ভ্রান্ত ধারণা যে সমূলে নির্ব্বংশ হয়েছে তাই প্রমাণ করে। গ্রন্থকর্ত্রী পর্দ্দানশীন বুনিয়াদী ঘরের মেয়ে। সুতরাং তাঁর এই সাহিত্য সাধনা একটা বিশেষ পরিবর্ত্তিত মনোভাবকে সূচনা করছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য তাঁর বহুপূর্ব্বে জনৈক মুসলিম মহিলা "উদাসী" নামক একখানা কবিতার ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর পরে এ পর্য্যান্ত আর কোন বাঙ্গালী মুসলিম মহিলা গ্রন্থাকারে কবিতা সংগ্রহ করেন নি।

পশারিণী কবিতার বই, ৮৪টা কবিতা এই বইএ স্থান পেয়েছে। কবি নিবেদনে বলেছেন, "বাল্য হইতে এ পর্য্যন্তের কবিতা ইহাতে রহিল।"

লেখিকার লিখবার বেশ ক্ষমতা আছে। অনেকগুলো কবিতা বেশ ভাল লাগল। তাঁর প্রকাশভঙ্গী প্রশংসনীয়। ছন্দের ওপর তাঁর চমৎকার দখল আছে।

তাঁর লেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। অবশ্য এতে তাঁর কবিতা ব্যর্থ অনুকরণে পরিণত হয় নি। গ্রন্থখানি লাইব্রেরীতে স্থান লাভ করার যোগ্য।

আব্দুল্লাহ ঃ—উপন্যাস—খানবাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক বি-এ, বি-টি প্রণীত। দি মুসলমান লিমিটেড, ১১।৫ কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা মূল্য দুই টাকা মাত্র।

আব্দুল্লাহ যখন (অধুনা লুপ্ত) "মোসলেম ভারতে" বের হ'ত তখন আমরা পরম আগ্রহ সহকারে মাসের পর মাস পড়তুম। এখন ইহা পুস্তক আকারে পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।

গ্রন্থকার এ বইখানাতে মুসলমান বুনীয়াদি ঘরের চিত্র এঁকেছেন। এবং সে চিত্রাঙ্কন অতীব দক্ষতা এবং প্রশংসার সহিত সমাধান করেছেন। লেখক চিন্তাশীল, শক্তিশালী এবং সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী। মুসলমান সমাজের দোষ ও গুণ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন্ত ;—মনে হয় এদের সঙ্গে যেন অনেকবার দেখা হ'য়েছে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাপারে এদের নিয়েই কারবার করছি।

মুসলমান সমাজে কতগুলো কুরীতি কচুরীপানার ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে দেখা দিয়েছে,—অতি-পরদানশীনতা এবং পীর-ভজনা ও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সুদ গ্রহণ তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমস্যা। সুদ নিয়ে মুসলমান সমাজ বড়ই বিব্রত। সুদে টাকা কর্জ্জ নিয়ে মুসলমানেরা কি রকম বেপরোয়া এবং বেহিসেবী ভাবে আমোদ আহ্লাদে, সাদীগমীতে খরচ করে তার একটা জলন্ত, করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী ছবির সাক্ষাৎ এতে পাওয়া যাবে।

আজকালকার মেদমজ্জাহীন মনস্তত্ত্বপূর্ণ উপন্যাসের মধ্যে এই সরল এবং সুন্দর উপন্যাসখানি পাঠকের মনে যথার্থ আনন্দদান করতে পারবে।

এই অনিন্দ্যসুন্দর বইখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

ত্রিস্রোতা ঃ – শ্রীকুমুদনাথ দাস, মূল্য দেড় টাকা—বসাক চৌধুরী এণ্ড কোং নওগাঁ, রাজসাহী।

লেখক ইতিপূর্ব্বে দুইখানি বই রচনা করেছেন। এবং তাতে বেশ খানিকটা নামও পেয়েছেন। বর্ত্তমান বইখানা গদ্য ও পদ্যে পূর্ণ। কবিতাগুলি গ্রাম্য জীবনের সুখ দুঃখের কথায় পূর্ণ, কোথাও কোথাও কবির ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ দৈন্যও ছন্দে ধরা পড়েছে। কবিতাগুলি অনাড়ম্বর এবং

সরল। গ্রন্থের কোথাও আত্মম্ভরিতার ছাপ নেই, একটা নিরীহ প্রকাশব্যগ্র কবিপ্রাণের সাক্ষাৎ পরিচয় সমস্ত লেখাগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা গ্রন্থ হিসেবে গ্রন্থকারের এই প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। প্রথম প্রচেষ্টায় নিপুণশিল্পীর সৌকুমার্য্য ও সৌষ্ঠব আশা করা যায় না। গ্রন্থকার সাধনা করলে ভবিষ্যতে তাঁর স্নিগ্ধ সাধনায় বাঙ্গলা সাহিত্য মন্দিরে একটী পূজার উপকরণ রেখে যেতে পারবেন বলে মনে হয়।

বইখানির মুদ্রাঙ্কণ ভাল নয়, বাঁধাইও আধুনিক রুচিসঙ্গত নয়, একেবারে সেকেলে। অনেক মুদ্রা দোষ রয়ে গেছে। বইখানির মূল্য একটু বেশী হ'য়েছে।

গ্রন্থকার দীর্ঘজীবি হ'য়ে বাংলাসাহিত্যে আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করুন, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

জরীন কলম

চিত্র ও চিত্তঃ—গাথা-কাব্য; শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য এক টাকা। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্।

সুকবি বসন্তকুমার বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরিচিত নন। ইতিমধ্যে গদ্যে ও পদ্যে অনেকগুলি বই লিখে তিনি নিজের রচনাশক্তিকে প্রমাণিত করেছেন। সুতরাং তাঁর কোন বইএর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর লেখা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দু'চার কথা বল্‌লে সেটা বোধ হয় খুব অন্যায় হবে না।

দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলির মারফত যে সমস্ত কবির রচিত নব নব রচনার স্রোত দেশের সাহিত্য-প্রগতির ধারাটীকে অখণ্ড করে রাখে তার মধ্যে দু'একজনের রচনা কেবলমাত্র পত্রিকার পাতার মধ্যেই নিজের আয়ুকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে না। সেই সব রচনার কবিরা কালজয়ী শ্রদ্ধা অর্জ্জন না করলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের অপরিহার্য্যতাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এঁদের পরস্পরের রচনার মধ্যে তুলনায় কার রচনাগুলি ভালো, সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে নিয়ে তার বিচার করতে বসাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে না। এঁদের লেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে লেখক-নির্ব্বিশেষে যদি বলা যায় যে তাঁদের রচনা আমার ভাল লাগে তা হলেই যথেষ্ট সত্যবাদিতার পরিচয় দেওয়া হয়। তা'র বেশী বল্‌তে গেলে কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

বসন্তকুমার এই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজের একটী বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন কারণ তাঁর রচনাকে এঁদের কারও রচনার চেয়েই সৌন্দর্য্য গৌরবে অপকৃষ্ট বলা চলে না। সুতরাং যাঁদের কবিতাকে সাধারণে গ্রহণ ক'রে থাকেন বসন্তকুমারের রচনার আদর তাঁদের কারো রচনার চেয়ে কম হবে না। উপরন্তু বর্ত্তমান বই সম্বন্ধে তাঁদের তুলনায় বসন্তকুমারের সাফল্য-লাভের আশা বেশী আছে এই কারণে যে এ বইটী হচ্ছে গাথা-কাব্য। এবং যেহেতু বাংলা ভাষায় অসংখ্য কাব্য রচিত হলেও ভালো গাথা-কাব্যের সংখ্যা সে অনুপাতে খুব বেশী নেই—এবং অপর পক্ষে তরুণ-মহলে আবৃত্তির ঝোঁকের আতিশয্য রীতিমতই আছে, অতএব তারই তাগিদে তাঁর বইয়ের কদর তুলনায় বেশী হবে বলেই মনে করি। অনেকগুলি সুনির্ব্বাচিত মনোরম কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে যে কাব্য-হার তিনি গেঁথেছেন সেই কাহিনীর নিজস্ব সৌরভই প্রথমতঃ তাঁকে অনেকখানি অভিনন্দন এনে দেবে। তাঁর পরে রচনা-নৈপুণ্যের যে গৌরব—তাঁর প্রাপ্য তাতো তিনি পাবেনই। কারণ সত্যই তিনি যে একজন সুকবি, তার পরিচয় আলোচ্য বইখানির প্রতিটী কবিতায় সুপরিস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীচিত্রগুপ্ত

পত্রাবলীঃ ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—শ্রীদিলীপকুমার রায়, বীরবল ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশক—এচ্-ডি ঘোষ,—উইক্‌লি নোট্‌স্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা,—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত মুখপত্র, ১৪৪ পৃষ্ঠা দাম ১৲।

এই নাতিদীর্ঘ পুস্তকখানি কতকগুলি চিঠির সমষ্টি,—চিঠিগুলি 'উত্তরা,' ভারতবর্ষ' ও 'বিচিত্রায়' বিভিন্ন সময়ে বেরিয়েছিল। চিঠিগুলির বিষয়বস্তুর উল্লেখ বইখানির নামাকরণের মধ্যেই রয়েছে; গতশতাব্দীর ও বর্ত্তমান কালের য়ুরোপের চিন্তার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁদের পক্ষে আলোচনার ধারাটিও আন্দাজ করে নেওয়া শক্ত নয়।

আর এও আলোচনা করা হ'য়েছে ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়ে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধের যে সমস্যা তা অতীব চিত্তাকর্ষক। তিনটি বিভিন্ন গঠনের বাঙালী মন চিঠির আকারে এই সমস্যার যে আলোচনা করেছেন, তা বড়ই মনোগ্রাহী হ'য়েছে। এমন বইএর প্রয়োজন ত আছেই,—শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে দাবীও যে আছে,—তার সাক্ষ্য আমরা দিতে পারি। প্রায়ই 'বিচিত্রা'র যে যে সংখ্যায় চিঠিগুলি বেরিয়েছে, সেই সংখ্যাগুলি পাঠাবার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ আসে। চিঠিগুলি একত্র গ্রথিত করে একখানি পুস্তক প্রকাশ করে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী শিক্ষিত বাঙালীর একটা অভাব দূর করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। (নানা কথা দ্রষ্টব্য)

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

পূর্ব্বাপর—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—২৩সি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে নাথ ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১৪৬ পৃষ্ঠা—দাম পাঁচ সিকা।

এটি গল্পের বই,—'পূর্ব্বাপর,' 'অপরাজিতা,' 'পূর্ব্বরাগ' ও 'চিরাচরিত,' এই চারটি গল্প বইখানিতে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। গ্রন্থকার একজন তরুণ লেখক,—তার পরিচয় বইখানির মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, তবে তাঁর রচনা-শক্তি যে আছে, তার প্রমাণও তিনি ভূরি ভূরি দিয়েছেন। সব কটি গল্পই বেশ মনোগ্রাহী, রচনা যেমন সরস, চরিত্রগুলিও তেমনি মধুর। গল্পের ধারাও কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। 'বিচিত্রা'র পাঠক-পাঠিকারা এই তরুণ লেখকের রচনার সঙ্গে সুপরিচিত, তাই বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বইখানি সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

গান*

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

ত্যাগে, ধর্ম্মে,
সব শুভ-কর্ম্মে
  নিঃশেষি আপনায় করিলে দান,
জীবনে শ্রেয় যাহা
বরিয়া নিলে তাহা
  মরণে পেলে তাই অমর প্রাণ;
যে আলো অভিনব
ভাতিল পথে তব
  দীপ্তি কভু তার হবে না ম্লান,

সে আলো পথ বাহি'
যাত্রী যাবে গাহি'
  পুণ্য গাথা তব বিজয় গান;
অমরা হ'তে জানি
তোমার শুভ-বাণী
  তোমারি অফুরানো হৃদয় দান
শক্তি নব-প্রাণে
স্মরণে বহি' আনে
  মরণভীতি হ'তে করিয়া ত্রাণ॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

* বেহালার অন্তর্গত রবি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতি সভায় গীত

নানা কথা

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে-খোলাচিঠিগুলি একত্র করে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন,—তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। সেটা হ'চ্চে এই যে, যে-সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের অন্তরের গভীরে গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে ভিতর থেকে আমাদের জীবনের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং অগোচরে আমাদের জীবন-ধারার দিক নির্ণয় করে দেয়,—সেই সব বিষয়ের আলোচনা আপাত-দৃষ্টিতে যতই একাডেমিক মনে হো'ক না কেন,—তার মধ্যেও যে একটা living interest আছে,—এবং সেই living interest যে আজকাল শিক্ষিত বাঙালীর মনের মধ্যেও প্রবেশ করেছে,—সেই দিকে এই পত্রাবলী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মানুষের জীবনে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান,—দুইএরই বেশ বড়ো স্থান আছে,—তাই তাদের সীমারেখাটা পাকাপাকি দলিল দিয়ে নির্ণয় করে রাখা দরকার। আর এই চৌহদ্দি নির্ণয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বেধে গিয়েছে মারামারি। অনেক ধুলোই যে নিরর্থক উড়েছে এবং বারবার আমাদের চোখ ঝাপ্‌সা করে দিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আল্‌ফ্রেড্‌ ফুইয়ে (Alfred Fouillée) ঠিকই বলেছেন,—"Dans tout ce débat, où il s'aggissait de savoir si la science aura la direction finale de l'humanité, on n'avait négligé qu'une chose: définir la science"—অর্থাৎ এই সব তর্কাতর্কিতে, যেখানে আসল কথাটা হ'চ্ছে যে মনুষ্যত্বের চরম পরিচালনার ভার বিজ্ঞানকে দেওয়া হবে কি-না,—সেখানে একটিমাত্র জিনিষের উপরই দৃষ্টি দিতে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল—বিজ্ঞান যে কী জিনিস তারই একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা নির্ণয় করা। আর এই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে ফুইয়ে বলেছেন,,—"ce qui est scientifique, c'est ce que personne ne conteste plus, ce qui fait désormais partie de l'expérience collective et de la raison collective"—অর্থাৎ তাকেই বল্‌ব বৈজ্ঞানিক সত্য যা' কেউ আর অস্বীকার করতে চাইবে না,—যা' এবার থেকে সমগ্র মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও বোধশক্তির অংশীভূত হ'য়ে যাবে। বিজ্ঞানকে যদি এই দিক দিয়ে দেখা যায়,—তবে আর বৈজ্ঞানিক সত্য ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যে দাঙ্গা বাধ্‌বার কোনই কারণ থাকে না। দুঃখের বিষয় তবুও বাধে,—যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধে, কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও।

তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই,—বারে বারে দাঙ্গা বাধলেও। ভরসা এই যে সৃষ্টি যে-রহস্যের মধ্যে আপনাকে আবরণ ক'রে আছে,—সেটা দ্রৌপদীর সাড়িরই মত,—কখনো ফুরোয় না। বিজ্ঞানের 'স্থির শীতল যুক্তি' তাতে যতই টান মারুক না কেন, বিশ্বাস চিরদিনই তার আড়ালে নিশ্চিন্ত মনে আপনার লজ্জা রক্ষা করতে পারবে। কার্য্যকারণ পরম্পরা গবেষণা করে বিজ্ঞান দেখাচ্চে কেমন ক'রে কোন্‌ জিনিষটা উৎপন্ন হয়. কিন্তু এই "কেমন ক'রে-রও আবার "কেমন করে" আছে; সেটা যদিই বা আবিষ্কৃত, হয় ত তারও আবার "কেমন ক'রে" আছে,—এমনি করে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হ'তে থাক্‌বে, সৃষ্টির রহস্য ততই ঘনীভূত ও নিবিড়তর হ'তে থাকবে। এটম থেকে ইলেক্ট্রনে এসে পৌঁছেও সে রহস্যের কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্চে না। এবং এই উত্তরোত্তর ঘনীভূত রহস্যের নিবিড় থেকে নিবিড়তর উপলব্ধির আনন্দ থেকে বিজ্ঞান বঞ্চিত হ'তে পারে না: আর সেই আনন্দ বিশ্বাসের আনন্দেরই সমধর্ম্মী। তাই শেষ পর্য্যন্ত মিতালি অবশ্যম্ভাবী; আজকালকার

বৈজ্ঞানিক দর্শনের মধ্যে তার সূত্রপাত দেখা যায়।

ধর্ম্মের সঙ্গে লড়াই বেধেছিল ঠিক, বিজ্ঞানের নয়, বৈজ্ঞানিক দর্শনের,—একথা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর চিঠিগুলিতে পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন। আর তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা দিয়ে যেমন সরস তেমনি পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন,—এ লড়াইয়ের কোনো সঙ্গত কারণ নেই। "এডিংটন প্রভৃতির ধর্ম্মপ্রাণতা ও আধ্যাত্মিকতার কারণ" "বিজ্ঞানের non-rational ভিত্তি" নয়, "মনের একদিকের প্রেরণায় তাঁরা হ'য়েছেন বৈজ্ঞানিক, অন্যদিকের প্রেরণা তাঁদের ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রদ্ধাশীল করেছে। এবং যেহেতু তাঁরা প্রথমে বৈজ্ঞানিক ও পরে আধ্যাত্মিক সেইজন্য তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'এপলজিয়া' রচনা করে দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এবং কথনো কথনো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর নব বিজ্ঞানের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার সমর্থন খুঁজেছেন। তাঁদের এই শেষ শ্রেণীর চেষ্টাগুলিকে বেশী চেপে ধরা কিছু নয়। কারণ একটু চাপাচাপি করলে এ চেষ্টার মূলে এই মনোভাব বেরিয়ে পড়ে যে জড় সূক্ষ্ম ও জটিল হ'লেই চৈতন্যের কাছাকাছি আসে"। অতুলবাবুর চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে এই ধরণের শান্ত ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি সমস্ত আলোচনটার উপর যে আলোক-সম্পাত করেছে,—তা যেমনই উপভোগ্য তেমনই চিন্তা-উদ্দীপক। তাঁর দৃষ্টি অপক্ষপাত বিচারকের দৃষ্টি; শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের চোথা চোথা 'কোটেশন-বাণে'র অবিশ্রান্ত বর্ষণেও সে দৃষ্টি কোথাও একটুও তার স্বচ্ছতা হারায় নি।

আলোচনা সুরু করেন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার ধর্ম্মের পক্ষ নিয়ে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করে। এবং তাঁর চিঠি থেকেই এমন একখানি অতীব মনোগ্রাহী পুস্তকের উৎপত্তি। এজন্য তিনি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। যে-সমস্ত চিন্তাধারা বর্ত্তমান জগৎকে আলোড়িত করছে,—শিক্ষিত বাঙালীর মন যে তার প্রতি উদাসীন নয়, বরং চিন্তা-জগতের প্রগতির সঙ্গে সেই মন যে সমান তালে পা ফেলে চলছে,—এবং চিন্তা-জগতের সমস্যাগুলির উপর আপনার শিক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী আলোক-সম্পাতের চেষ্টা করছে,—এর প্রভূত পরিচয় বইখানির পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। দিলীপকুমারের চিঠিগুলিতে শিক্ষিত তরুণ বাংলার মনের উৎসাহ, আগ্রহ ও ব্যগ্রতা দেখে আমরা প্রীত হ'য়েছি।

বীরবলের নাম করছি সব শেষে, কিন্তু তাঁর চিঠিগুলি যে বইখানির সরসতা ও মাধুর্য্য কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, তা' বইখানির সুরসিক পাঠকমাত্রই সহজেই কল্পনা করে নিতে পারবেন। বীরবলের দৃষ্টি গভীর ও ব্যাপক, সমস্ত জিনিষের প্রতিই তাঁর প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৌতূহল অনির্ব্বচনীয় কৌতুকের মধ্যে উপ্‌ছে পড়ছে। এমন পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, চিন্তা-গভীর, বেদনা-করুণ কৌতুক,—বাংলা সাহিত্যে বীরবলের এই অমূল্য দান থেকে এ বইখানি বঞ্চিত হয় নি।

লেখক-ত্রয়ের মনের গঠন এবং চিন্তা করবার ধরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তা সত্ত্বেও তাঁদের চিঠিগুলি একত্র গেঁথে যে বইখানি দাঁড়িয়েছে, তার ভিতরকার ঐক্য-সূত্রটি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে শ্রেষ্ঠ লেখকদেরও দীর্ঘ গবেষণার মধ্যে চিন্তা-ভঙ্গির বৈচিত্র্যের অভাবে মধ্যে মধ্যে যে-একঘেয়েমি দোষ এসে পড়বার আশঙ্কা থাকে, এ বইখানি তা থেকে সহজেই মুক্তি পেয়েছে।

বিচিত্রায় শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব

বর্ত্তমান সংখ্যা হ'তে বিচিত্রায় বাংলার স্বনাম-ধন্য ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশ ছাড়িয়ে, ভারতবর্ষ অতিক্রম ক'রে যাঁর যশ সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রসারিত হয়েছে, যাঁর লেখার অমৃতবর্ষী প্রভাব পাঠক-চিত্তকে বিস্ময়ে মুগ্ধ এবং আনন্দে উল্লসিত করে, সেই শরৎচন্দ্রের লেখার বিষয়ে কোন ভূমিকার প্রয়োজন আছে ব'লে আমরা মনে করি নে। আমাদের বক্তব্য শুধু শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব্ব।

অনেক রসজ্ঞের মতে শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শ্রীকান্তের প্রতি পাঠক-সমাজের পরিতৃপ্তি এবং কৌতূহলের

অন্ত নেই ; এবং সেই শ্রীকান্তের মধ্যে অভয়া এখনো অনুদ্ঘাটিতা। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্বে রহস্যের বৃন্তে মুকুলিতা অভয়াকে প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপে পাওয়া যাবে—আমরা শুধু এই আনন্দের সংবাদটুকু বিচিত্রার পাঠকবর্গকে জানিয়ে দিলাম। বর্ষার বিচিত্র আবেষ্টনের মধ্যে অভয়ার বিচিত্র কাহিনী অপরূপ রূপে দেখা দেবে।

কুমারী প্রভা বসু

কুমারী প্রভা বসু রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেছেন। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে একমাত্র ইনিই রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ। ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত বসুর ইনি ভ্রাতুষ্পুত্রী। সম্প্রতি ইনি ওকালতী করবার উদ্দেশ্যে বি-এল্ অধ্যয়ন করছেন।



কুমারী প্রভা বসু

জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষে ওকালতী ব্যবসা অবলম্বন নারীগণের পক্ষে কতটা সমীচীন সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও বিদ্যা অর্জ্জনের পক্ষে কোনও বাধা নেই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কুমারী প্রভার সাফল্য কামনা করি।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের একটা রিপোর্ট সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হ'য়েছে, তাতে দেখ্‌লাম গত ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হ'য়েছে, সেই বৎসরে ব্যাঙ্কের সর্ব্ব সমেত লাভ হ'য়েছে বাইশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকা। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য ঐ লাভের টাকা যে-ভাবে খরচ করা হ'য়েছে, তার একটা তালিকা দিলাম—

ইন্‌কম্‌ট্যাক্স-দায়বিহীন এড্‌ইন্টেরিম ডিভিডেণ্ড—৩০শে জুন ১৯৩১ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বৎসরের জন্য ৬% হিঃ ...	৫,০৪,৩৯৬৲
ইনকম্‌ট্যাক্স-দায় বিহীন ফাইন্যাল ডিভিডেণ্ড—৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩১ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ বৎসরের জন্য—৬% ...	৫,০৪,৩৯৬৲
ইন্‌কম্ ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্সের জন্য দেওয়া	১,০০,০০০৲
জমি ও ঘরবাড়ির জন্য সিংকিং ফণ্ডে দেওয়া	১,৫০,০০০৲
গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য সিকিউরিটির দাম কমে যাওয়ার জন্য রাইট্ অফ্ করে দেওয়া	৩,৯৫,০০০৲
রিজার্ভ ও কণ্টিঞ্জেন্সি ফণ্ড দেওয়া	২,০০,০০০৲
আগামী বৎসরের হিসাবে দেওয়া	৪,০৭,৭৬৯৲
মোট—	২২,৬১,৫৬১৲

এই অঙ্কগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় ;—আজকালকার দুর্দ্দিনে,—ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় কর্ত্তৃক পরিচালিত এই ব্যাঙ্কটি ভারতবর্ষের কতখানি গৌরবের জিনিষ। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাঙ্কটি খোলা হ'য়েছিল, বোম্বে সহরে,—সামান্য মূলধন,—মাত্র বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে। এই বিশ বৎসরের মধ্যে অনেক ঝড় ঝাপ্‌টার মধ্যে ব্যাঙ্কটি যে শুধু টিঁকে আছে তা নয়,—আপনার ও ভারতীয় ব্যাঙ্কিংএর চমকপ্রদ উন্নতিসাধন করেছে।

এখন বোম্বে সহরে ৫টি শাখা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ইহার সর্ব্বসমেত ২১টি শাখা আছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে,—প্রথম স্থাপনের সময় এই ব্যাঙ্কের মাত্র ত্রিশজন কর্ম্মচারী ছিল। এখন সর্ব্বসমেত ইহা একহাজারেরও বেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছে। দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির দিকে এই ব্যাঙ্কের সবিশেষ দৃষ্টি আছে,—তাছাড়া দেশের লোকের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও ব্যাঙ্কিং অভ্যাস প্রচারের জন্য নানা উপায়ে নানা চেষ্টা করছে। সব দিক দিয়েই এই ব্যাঙ্কের উন্নতিবিধানের সহায়তা করা ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

মাঘোৎসব উপহার

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও কর্ত্তৃক প্রস্তুত কয়েকখানি মাঘোৎসব উপহার-লিপি আমরা উপহার পেয়েছি। ক্রীশ্‌মস্ ও নিউ ইয়ার কার্ড যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থে এই উপহার-লিপির সৃষ্টি—অর্থাৎ উৎসব-কালে আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে প্রীতি বিনিময়,—এমন কি সুদূর প্রবাসীদের মধ্যেও ডাকঘরের সহায়তায়। গত মাঘোৎসবের সময়ে এই লিপি প্রকাশিত হয়েছিল।

উপহার-লিপিখানি চিত্তাকর্ষক হয়েচে তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় একখানি রঙিন ছবি, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় শিল্পীবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত একখানি সুদৃশ্য চিত্র, তৃতীয় পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের রচিত চার পংক্তির কবিতায় শুভাশীষ-বাণী এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় উপহারদাতা কর্ত্তৃক ইচ্ছানুযায়ী সম্ভাষণ লেখবার ব্যবস্থা। কার্ডখানি রেশমী সুতায় বাঁধা। আয়োজনের হিসাবে মূল্য দুই আনা সামান্য নিশ্চয়।

আমরা আশা করি বাংলা নববর্ষ এবং শারদীয়া পূজার সময়েও ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও অনুরূপ উপহার লিপি প্রকাশিত করবেন।



Edited by Upendranath Ganguli, printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



বুদ্ধ সমীপে

শ্যামলা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে ধরণী ভালোবাসিয়াছি
তোমারে দেখিয়া ভাবি তুমি তারি আছ কাছাকাছি।
হৃদয়ের বিস্তীর্ণ আকাশে,
উন্মুক্ত বাতাসে
চিত্ত তব স্নিগ্ধ সুগভীর।
হে শ্যামলা, তুমি ধীর,
সেবা তব সহজ সুন্দর,
কর্ম্মেরে বেষ্টিয়া তব আত্ম সমাহিত অবসর॥

মাটির অন্তরে
স্তরে স্তরে
রবি রশ্মি নামে পথ করি,
তারি পরিচয় ফুটে দিবস শর্ব্বরী
তরু লতিকায় ঘাসে,
জীবনের বিচিত্র বিকাশে।
তেমনি প্রচ্ছন্ন তেজ চিত্ত তলে তব
তোমার বিচিত্র চেষ্টা করে নব নব
প্রাণমূর্ত্তিময়।

মনে হয়
প্রতি দিবসের সব কাজে
সৃষ্টির প্রতিভা তব অক্লান্ত বিরাজে।
তাই দেখি তোমার সংসার
চিত্তের সজীব স্পর্শে সর্ব্বত্র তোমার আপনার ॥

আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে
মাটির যে গন্ধ উঠে সিক্ত সমীরণে,
ভাদ্রে যে নদীটি ভরা কূলে কূলে,
মাঘের শেষে যে-শাখা গন্ধ ঘন আমের মুকুলে,
ধানের হিল্লোলে ভরা নবীন যে ক্ষেত,
অশ্বত্থের কম্পিত সঙ্কেত,
আশ্বিনে শিউলিতলে পূজাগন্ধ যে স্নিগ্ধ ছায়ার
— জানিনা এদের সাথে কী মিল তোমার ॥

দেখি বসে জানালার ধারে,
প্রান্তরের পারে
নীলাভ নিবিড় বনে
শীত সমীরণে
চঞ্চল পল্লবে ঘন সবুজের পরে
ঝিলিমিলি করে
জনহীন মধ্যাহ্নের সূর্য্যের কিরণ ;—
তন্দ্রাবিষ্ট আকাশের স্বপ্নের মতন
দিগন্তে মন্থর মেঘ, শঙ্খ চীল উড়ে যায় চলি
ঊর্দ্ধশূন্যে, কত মতো পাখীর কাকলি,
পীতবর্ণ ঘাস
শুষ্ক মাঠে, ধরণীর বনগন্ধী আতপ্ত নিঃশ্বাস
মৃদুমন্দ লাগে গায়ে, তখন সে ক্ষণে
অস্তিত্বের যে ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ভরি উঠে মনে,
প্রাণের যে প্রশান্ত পূর্ণতা, লভি তাই
যখন তোমার কাছে যাই,
যখন তোমারে হেরি
রহিয়াছ আপনারে ঘেরি
গম্ভীর শান্তিতে,
স্নিগ্ধ সুনিস্তব্ধ চিতে,
চক্ষে তব অন্তর্যামী দেবতার উদার প্রসাদ,
সৌম্য আশীর্ব্বাদ ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চল্‌তি ভাষার রূপ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

নানা জেলায় ভাষার নানা রূপ। এক জেলার ভিন্ন অংশেও ভাষার বৈচিত্র্য আছে। এমন অবস্থায় কোথাকার ভাষা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করবে তা কোনো কৃত্রিম শাসনে স্থির হয়না, স্বতই সে আপনার স্থান আপনি করে। কলকাতা সমগ্র বাংলার রাজধানী। এখানে নানা উপলক্ষ্যে সকল জেলার লোকের সমাবেশ ঘটে আসচে। তাই কলকাতার ভাষা কোনো বিশেষ জেলার নয়। স্বভাবতই এই অঞ্চলের ভাষাই সাহিত্য দখল করে বসেচে। যেটাকে লেখ্য ভাষা বলি সেটা কৃত্রিম, তাতে প্রাণপদার্থের অভাব, তার চলৎশক্তি আড়ষ্ট, সে বদ্ধ জলের মতো, সে ধারা জল নয়। তাতে কাজ চলে বটে কিন্তু সাহিত্য শুধু কাজ চল্‌বার জন্যে নয়, তাতে মন আপনার বচিত্র লীলার বাহন চায়। এই লীলা-বৈচিত্র্য বাঁধা ভাষায় সম্ভব হয় না। এই জন্যেই কলকাতা অঞ্চলের চলতি ভাষাই সাহিত্যের আশ্রয় হয়ে উঠেচে। একদা যখন সাধু ভাষার একাধিপত্য ছিল তখনো যে কোনো জেলার লেখক নাটক প্রভৃতিতে কলকাতার কথাবার্ত্তা ব্যবহার করেচেন, কখনোই পূর্ব্ব বা উত্তর বঙ্গের উপভাষা ব্যবহার করেননি—স্বভাবতই কলকাতার চলতি ভাষা তাঁরা গ্রহণ করেচেন। এর থেকে বুঝবে সাহিত্য স্বভাবতই কোন্ প্রণালী অবলম্বন করেচে। ইতি
৬ কার্ত্তিক ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র



আর্টের অর্থ

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী এম্-এ

"Art is called Art because it is not Nature"—*Goethe*.

বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল"--ইহাতে আমরা সকলেই বুঝিলাম সকাল হইয়াছে। কিন্তু "ঐ যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা" কিংবা "পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন" ইহাতে ত সন্ধ্যা হওয়ার কথা সরলভাবে বুঝা যায় না, বরঞ্চ একথা সহজেই মনে হইতেছে যে সকাল সম্বন্ধে বর্ণনাটা যেমন অকৃত্রিম, সন্ধ্যা সম্বন্ধে বর্ণনাগুলি তেমনি কৃত্রিমতায় পূর্ণ।

কথাটা অকাট্য, কেননা নীরেট একতাল সোনা যেখানে অকৃত্রিম, তাহা হইতে অলঙ্কার প্রস্তুত হইলে সেই অলঙ্কার সেখানে কৃত্রিম। কারণ, যাহা ছিল একতাল সোনা, তাহাকে এখন লোকে বলিতেছে একরাশ গহনা।

সন্ধ্যার আকাশ আমরা অনেকেই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। নির্মেঘ অথবা হাল্কা মেঘযুক্ত থাকিলে সূর্য্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশ রক্তিম হইয়া উঠে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যদি বলেন "পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন" অথবা "ঐ যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা" তাহা হইলে সন্ধ্যার রক্ত আকাশের হুবহু বর্ণনা ত হয় না। সন্ধ্যার কূলে যে দিনের চিতা জ্বলে না, অথবা পশ্চিমা দিগ্বধূ যে সোনার স্বপন দেখে না, ইহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। যদি পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া লই যে কবির কাজ হইতেছে যে-জিনিস যাহা, সেই-জিনিস ঠিক তেমনি করিয়া কবিতায় বলিয়া যাওয়া, তাহা হইলে কবিকে নিজের মনের খেয়ালী-কথা শুনাইবার স্পর্দ্ধার জন্য ত কোনোমতেই ক্ষমা করা যায় না।

শুধু সন্ধ্যার আকাশ সম্বন্ধে নহে, মনে করা যাক কবি তাঁহার প্রেয়সীকে বলিতেছেন "তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা।" এখানে কবির খেয়াল চরমে উঠিয়াছে। প্রেয়সীর পরিচয় ত ইহাতে আমরা পাই না। তাহার নাক কত ইঞ্চি লম্বা, মুখের রং কি, চুলের দৈর্ঘ্য কত, বেলা আটটায় রৌদ্রে দাঁড়াইলে কত ফুট ছায়া মাটীতে পড়ে, বেলা তিনটায় দাঁড়াইলে বা কত ফুট ছায়া পড়ে, এ সমস্ত উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যদি কবি কবিতা লিখিতেন, তাহা হইলে ত মানুষের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু কবি প্রেয়সীর মূর্ত্তি গড়িতে গিয়া তাহাকে একেবারে মেঘ বানাইয়া দিয়াছেন! কিন্তু তবু আশ্চর্য্য এই, কেহ কেহ এই বর্ণনা শুনিয়া কবিকে ধন্যবাদ দেয়। কবি যখন সন্ধ্যাকাশের খাঁটি ফোটোগ্রাফ না দেখাইয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতাই জ্বলিতেছে, তখন আমরা এত বড় অপ্রাকৃত ব্যাপারটাকেও ঐ সন্ধ্যারই আর একটা রূপ বলিয়া মানিয়া লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলাম না। একই বিষয়-বস্তু কবির মনে কতরূপে দেখা দেয় তাহার কোনো স্থিরতা নাই। সেই বস্তু বা বস্তু সমষ্টি শিল্পীর মনে এমন একটি আবেগ এবং উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তোলে, যাহা ঐ বস্তু হইতে পৃথক, উহার সঙ্গে তাহার চেহারার মিল নাই, কিন্তু তবু ঐ বস্তু হইতে সঞ্জাত ঐ আবেগময় রূপটিকেও ত মিথ্যা বলা যায় না। এই আবেগের প্রকাশই সঙ্গীত হইয়া ফুটিয়া উঠে। শিল্পী এই সঙ্গীত, শব্দ এবং রেখা উভয়ের সাহায্যেই প্রকাশ করিতে পারেন। আবেগের প্রকাশ কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঠিক রাখিয়া চলে না,—তাহার ছন্দ, তাল, এবং লয় যদি ঠিক থাকে তবে সে ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ঘুরিয়া আসিতে পারে। মন হয়ত কস্তূরী মৃগ হইয়া

বনে বনে ছুটিয়া বেড়ায়, হৃদয় ময়ূর হইয়া নাচিতে থাকে। হংস-বলাকা যখন উড়িয়া যায় তখন তাহার ধ্বনি শব্দময়ী অপ্সর রমণীতে রূপান্তরিত হয়, এবং সে তপস্যারত স্তব্ধতার তপোভঙ্গ ঘটায়। হংস-বলাকার উড়িবার গতির আবেগে নিখিল বিশ্বের যা কিছু নিশ্চল পদার্থ সমস্ত পাখা মেলিয়া উড়িতে থাকে। শিল্পীর এই ছবি ত বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া শিল্প রচনা করিতেই হইবে এই অদ্ভুত মতটি কাব্যের আর্টে আমল না পাইলেও রেখাচিত্রের আর্টে লোকের মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

কোনো জিনিসের ফোটোগ্রাফের সার্থকতা নাই একথা সত্য নহে। ইতিহাস কিংবা বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু বর্ণনা করিতে গেলেই তাহা বাস্তব এবং অবিকৃত ভাবে বর্ণনা করা চাই। কিন্তু যদি এমন আইন করিয়া দেওয়া যায় যে সন্ধ্যাকাশ দেখিয়া যদি তোমার মনে কোনো ভাব জাগিয়া থাকে তবু সে কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না, যদি কিছু প্রকাশ করিতেই হয় তবে তুমি যাহা দেখিলে তাহাই বলিবে, যাহা ভাবিলে তাহা বলিতে গেলেই তোমার নামে মোকদ্দমা আনিব, তাহা হইলে শিল্প স্বষ্টির ক্রিয়া থামিয়া যায়।

অগণিত বিশ্ববস্তুর মধ্যে বিশেষ বস্তুকে দেখা এবং দেখানোও শিল্পীর কাজ। গল্পে উপন্যাসে এবং মহাকাব্যে উপমা এবং অন্যান্য অলঙ্কার বাদ দিয়াও আমরা কতকগুলি বাস্তব ঘটনা বা ঘটনা সমষ্টির মিলন দেখিয়া মুগ্ধ হই। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্র ফুটিয়া উঠে এবং একটি চূড়ান্ত অবস্থায় গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। চিত্রে কোনো চরিত্রকে এইরূপ গতির ভিতর দিয়া, বিচ্ছেদ-মিলনের ভিতর দিয়া টানিয়া লওয়া যায় না। গল্পে উপন্যাসে বাস্তব চরিত্রগুলি পরস্পর মিলিয়া ঘটনার আবর্তে কোনো একটা বিশেষ অবস্থায় পৌঁছিয়া কোনো একটা বিশেষ রস-স্বষ্টি করে। রেখা বা বর্ণ-চিত্রের পূর্বাপর নাই, সে একই স্থানে আবদ্ধ, সুতরাং শিল্পী কোনো বস্তুর ফোটোগ্রাফ মাত্র খাড়া করিয়া তাহাকে আর্ট-স্বষ্টির নিদর্শন হিসাবে প্রচার করিতে পারেন না। তাঁহাকে চূড়ান্ত রস-স্বষ্টি করিতে হইবে। সঙ্গীত যেমন তাল এবং লয়ের আশ্রয়ে সুরের প্রকাশ, কোনো গল্প বা ঘটনার প্রকাশ নহে, রেখা বা বর্ণচিত্র ও তেমনি সামান্য বস্তু-অংশ আশ্রয় করিয়া ছন্দ, তাল, লয়ে একটি সুরের প্রকাশ। এই সুরই রস। এই সুরের মধ্যে বস্তু-অংশ একেবারে না থাকিতে পারে। কেবলি রংএর সঙ্গে রং মিলিয়া অপরূপ একটি বস্তু-তন্ত্রহীন প্রকাশের দ্বারা মনকে নাড়া দিতে পারে। বাঁশীর সুরে বস্তুর চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু তবু সেই সুর যখন মর্মে আসিয়া পৌঁছে তখন বুঝিতে পারি আমার কোনো অজানা সুখ বা দুঃখের সঙ্গে তাহার যেন কোথাও মিল আছে। সুতরাং কোনো বস্তুর সঙ্গে না মিলিলেও তাহা উপভোগ করিতে আমাদের বাধে না।

শরৎকালের মাঠে রাশি রাশি কাশফুল ফুটিয়া আছে। আমি শিল্পী, বাছিয়া বাছিয়া এমন একটি জায়গা আবিষ্কার করিলাম যেখানে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল জলের মধ্যে আপনার ছায়া ফেলিয়া আপনা আপনি একখানি ছবি রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে জলহারা শুভ্র-মেঘ-শোভিত নীল আকাশের পটভূমিতে ফেলিয়া সমগ্র চিত্রখানি আঁকিয়া লইলাম। দেখিবার মত জিনিসকে বর্ণরেখায় ফুটাইয়া তুলিলাম,—যে দেখিল সেই বলিল চমৎকার—ঠিক যেন শরতের মাঠ, কোথাও এতটুকু ভুল নাই।

কিন্তু আর একজন শিল্পী,—শরতের মাঠ দেখিয়া তাঁহার মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে। একটি একটি করিয়া কাশফুল তাঁহার মনে নির্ভুল রূপ লইয়া ধরা পড়িতেছে না। শরতের আনন্দ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে ;—তিনি দেখিতেছেন সীমাহীন সবুজ মাঠ ব্যাপিয়া কাশফুলের ঢেউ উঠিয়াছে। সেই ঢেউএর দোলায় তাঁহার অন্তর দুলিতেছে। তিনিও সেই মাঠের ছবি আঁকিলেন,—সবুজ ক্ষেত্রের উপর অকলঙ্ক শুভ্রতার ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। সে ঢেউ সমুদ্রের ঢেউএর মতই উন্মত্ত,—কোথায় গেল একটি একটি করিয়া পাতা আঁকা, একটি একটি করিয়া ফুল আঁকা,—সমস্ত সেই নীল আকাশের শুভ্র সঙ্গীতের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। সমালোচক মাথা নাড়িয়া কহিলেন কাশফুলের ডীটেল নাই, চেহারা নাই. এটা ছবিই নয়। কথাটি ঠিক তেমনি শুনাইবে যদি কেহ

বলে, 'পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন' ইহাতে সন্ধ্যাকাশের ডীটেল নাই অতএব ইহা কবিতাই নয়

একটি লোক দেখিতে কেমন কিংবা একটি গাছ দেখিতে কেমন, অথবা একদল লোক অথবা একটি অরণ্য দেখিতে কেমন, তাজমহল দেখিতে কেমন অথবা সমুদ্র দেখিতে কেমন, এই প্রশ্নের মীমাংসা করাই যদি শিল্পীর চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বাহ্যরূপটিই চরম বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু শিল্পীর কাজ নকল করা নহে, সৃষ্টি করা। যে শিল্পী তাজমহল গড়িয়াছেন তিনিও এই অপরাধে অপরাধী। কেননা তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা আর কিছুর সঙ্গে মেলে না। সমালোচক কি বলিবেন যে যে-হেতু তাজমহল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনো সৌধ বা ইমারতের মত দেখিতে নয় সেই হেতু উহার কোনো মূল্য নাই? সৃষ্টির ক্ষেত্রে আর কিছুর সঙ্গে মেলানোটাই ত লক্ষ্য নহে।—তাহা হইলে মানুষ-সৃষ্টিটাই ব্যর্থ, কেননা মানুষের স্বকীয় রূপ দেখিয়া কি আমরা এমনি ক্ষুব্ধ যে যতক্ষণ না বলিতে পারিতেছি যে আহা মানুষগুলি ঠিক যেন বাঁদরের মত, ততক্ষণ আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না?

বাঁদরের সঙ্গে মানুষের মিল থাকে ত সে মিল দৈবাৎ হইয়াছে, বাঁদর গড়িতে গিয়া হঠাৎ মানুষ হয় নাই। কিন্তু মানুষের দিকে তাকাইয়া যদি ক্রমাগতই মনে হয় যে বিধাতার অভিপ্রায় ছিল বাঁদর সৃষ্টি—কিন্তু ব্যর্থ হইয়া মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।—অর্থাৎ অক্ষমতার দরুণ হাত চলে নাই, নকল করা সার্থক হয় নাই, তাহা হইলেই কি খাঁটি কথা বলা হইল?

আমাদের মুস্কিল এই কোনো কাব্য পাঠ করিবার সময়, অথবা কোনো ছবি দেখিবার সময় আগে দেখি আমরা বদ্ধ সংস্কারের সঙ্গে তাহার কতখানি মিল। মন এমনি ভাবে প্রস্তুত যে কবি-যে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা জ্বালাইয়া দিয়াছেন, শুদ্ধমাত্র ইহাতে ঐ মন মুগ্ধ হয় না,—সে দেখে সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে উহা মেলে কিনা। কবির ছবির মধ্যে সন্ধ্যাকাশের চেহারা পাই ত ভাল, না পাই যদি তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়? আমি কি ঐ ছবিটি দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে পারি না? পশ্চিম দিগ্বধূ সোনার স্বপন দেখিতেছে—এই চিত্রটির কি নিজস্ব একটা রূপ নাই? ইহার মধ্যে সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার সন্ধান যদি দৈবাৎ পাই সে ত উপরি পাওনা। গানের সুরে আমরা কি কোনো বস্তু পাই? যখন ছন্দ লয় তালে মিলিয়া একটা পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে তখন সেই রূপটিই কি বড় নহে?—ফজলী আমের সঙ্গে সে সুরের হয়ত মিল নাই কিন্তু কেবলমাত্র তাই বলিয়াই তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে? শিল্পের আসল প্রাণ ছন্দ লয় তালের সুষমায় এবং সামঞ্জস্যে। বর্ণ কিংবা রেখা যদি এই ছন্দ লয়ের পথে একটা রূপ গ্রহণ করে, তবে সে রূপ একটা সত্যকার মানুষ, পাখী অথবা বনমানুষে আসিয়া শেষ হইল না কেন ইহা লইয়াই যত মারামারি। যদি কোনো মানুষের আভাস তাহার মধ্যে পাওয়া যায়, যদি একজন নর্ত্তকীর নর্ত্তনের গতি ছন্দ তাহাতে ফুটিয়া উঠে, যদি এক ঝাঁক পাখীর গতির আবেগ তাহাতে রূপ পায়, তাহা হইলে কি শুদ্ধমাত্র সেইটুকুতে আমাদের মন ভরিতে পারে না? আমরা কেন তাহা ফেলিয়া বৃথাই তাহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া মরি? আমরা ঐ নৃত্যের গতিছন্দ ফেলিয়া নর্ত্তকীকে দেখিতে চাই, আরো দেখিতে চাই তাহার নাকে নথ আছে কিনা, এবং তাহার চুলের মধ্যে যদি কোনো ফুল গোঁজা থাকে তাহা হইলে তাহা বকফুল না গন্ধরাজ। পাখীর উড়িবার ছন্দটিকে এড়াইয়া আমরা স্পষ্ট করিয়া একঝাঁক পাখীই দেখিতে চাই, এবং এমন করিয়া দেখিতে চাই যে দেখা মাত্র বলিয়া উঠিতে পারি যে উহা হাঁস না চখা। এবং সেই সঙ্গে যেন ইহাও মনে পড়ে যে আহা, এই রকম পরিপুষ্ট একঝাঁক উড়ন্ত হাঁস আমার ঘরের উপর দিয়া গেলে বন্দুকটির সার্থকতা হয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বর্ণ বা রেখাচিত্রের আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে তাহা কোনো বস্তুকে নকল করিবার চেষ্টা নহে। চিত্র মানে যদি কোনো বস্তুর প্রতিকৃতিকে নির্ভুল নকল করিবার নিপুণতা বুঝায় তাহা হইলে এগুলি যে চিত্র নহে সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশা করি যাঁহারা খুব অমায়িক হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের চিত্র দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে রবীন্দ্রনাথের কারাজীবন প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে

নাই। গাছ দেখিতে কেমন, পাখী দেখিতে কেমন, আকাশ দেখিতে কেমন এ সব চোখের সামনে ধরিয়া সবিস্তার বর্ণনা করিয়া যান নাই। প্রকৃতি তাঁহার চোখে, তাঁহার মনে কেমন লাগিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। বৃক্ষ লতাপাতা পুষ্পকে তিনি প্রাণবন্ত এবং মানুষের আত্মীয়রূপেই দেখিয়াছেন। বর্ষার মেঘ-বৃষ্টিতে, বসন্তের বর্ণে গন্ধে তিনি তাঁহার প্রিয়তমের আবির্ভাব অনুভব করিয়াছেন। বসন্তের শোভাকে তিনি বলিয়াছেন সঙ্গীত। চৈত্রের ঝরা পাতায় উদাসীন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখিয়াছেন। বসন্তের রঙীন ফুলকে যদি ফুল না বলিয়া সঙ্গীত বলা হয়, গাছকে উদ্ভিদ্ না বলিয়া যদি বন্ধু বলিয়া ডাকা যায়, তাহা হইলে ত আমাদের সংস্কারের সঙ্গে তাহার মিল হয় না।

কিন্তু ইহাই ত সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ-সঙ্ঘের শিল্প-রচনার মধ্যে সৃষ্টির এই মূল তত্ত্ব রহিয়াছে। তাঁহারা মানুষ দেখিতে কেমন কিংবা গাছ দেখিতে কেমন, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার ভার গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সাধনা করিয়াছেন কল্পনাকে, আবেগকে রূপ দিতে। তাঁহাদের নিজের স্টাইলও বিভিন্ন। তাঁহাদের প্রকাশের ভাষা, অর্থাৎ রেখা ও বর্ণের যে-ছন্দ ও ব্যঞ্জনার সুষমায় কল্পনা রূপ-গ্রহণ করে তাহাও ভারতীয়। দেশ-বিশেষে যেমন বলিবার ভাষা বিভিন্ন, তেমনি চিত্রাঙ্কণের ভাষাও বিভিন্ন। সাধারণত আমাদের বিশ্বাস চিত্রের ভাষা য়ুনিভার্সাল। ইহা ঠিক নহে। সঙ্গীতের সুর ত কোনো 'ভাষা' দ্বারা রচিত নহে, অথচ ইহা ভিন্ন দেশে ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে esperento ব্যবহার করা চলিতে পারে, কিন্তু আর্টে তাহার স্থান নাই। চিত্রে যে য়ুনিভার্সাল ভাষা আছে তাহা সৃষ্টির ভাষা নহে, নকলের ভাষা। ইতিহাস ভূগোলের ছবি, আসবাবপত্রের ছবি, বিজ্ঞান বিষয়ক ছবি প্রভৃতি আঁকিতে য়ুনিভার্সাল ভাষা প্রয়োজন। ইহা ক্যামেরার সাহায্যেও করা যায়। জ্যামিতিক রেখাঙ্কণের ভাষাও য়ুনিভার্সাল।

শিল্পীর কাজ দুই রকম, এক নকল করা, এক সৃষ্টি করা। প্রকৃতিকে নকল করাতেও কৃতিত্ব আছে, কিন্তু তাহা ক্রিয়েটিব্ আর্টের সীমানায় পড়ে না। কেননা নকল করিতে গিয়া কম্পোজিশানের জন্য মনের যতখানি সক্রিয়তা প্রকাশ পায়, তাহা শুধু মাত্র বাছাই করিবার এবং বস্তু একত্র করিবার কাজেই শেষ হয়—সৃষ্টির কাজে নয়।

সৃষ্টির যোগ চিত্তের সঙ্গে। মন নিজের ভাষায় চিন্তা করে। তাহার প্রকাশের ভঙ্গী ও পৃথক। সন্ধ্যার আকাশে একটুখানি রক্ত রং দেখিয়া সে গভীর রক্তবর্ণে সমস্ত আকাশ রাঙাইয়া তোলে। হয়ত বা সে আকাশের ছবি আদৌ না আঁকিয়া একটি লাল আবেষ্টনীতে দিগ্বধূর রঙীন স্বপ্ন-মাখা মূর্ত্তি আঁকে। আর্টিস্ট খেয়ালী, নকলকারী নহে, সুতরাং সে নিজের খেয়ালকে নিজস্ব ভাষায় রূপদিতে গিয়া কত তুচ্ছ জিনিসকে বাড়াইয়া তোলে, কত বড় জিনিসকে ছাড়িয়া দেয়। নকল করিলে তাহা করা যায় না। যুঁইফুল তাহার নিজের সটাইলে বিকশিত হয়, ক্রিসেন্থিমাম্ তাহার নিজের স্টাইল বজায় রাখিয়া চলে। ইহার জন্য লজ্জিত হইবার কারণ নাই, কেননা কেহ কাহাকেও নকল করেনা বলিয়াই ইহাদের বিশেষত্ব।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি, তাঁহার নিজের কাব্য রচনা পদ্ধতি এবং অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রভৃতির চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইহা এক অপরূপ সৃষ্টি। কাব্য রচনায় ভাবটা আগে, প্রকাশ পরে, কিন্তু তাঁহার চিত্রে প্রকাশটাই আগে। রেখার ছন্দ তাহার আপনার গতি আপনি স্থির করিয়া লইয়াছে। শিল্পীর চেতনা সুপ্ত—তিনি রেখাকে নিজের পথে নিজের ছন্দে চলিবার জন্য বাহির হইতে সাহায্য করিয়াছেন মাত্র। রেখাগুলি চলিবার পথেই আকস্মিক ভাবে একটি করিয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ছায়ায় জন্মিয়া বৃক্ষ শিশু যেমন আলোর ডাকে উন্মুক্ত আকাশের দিকে শির তুলিয়া ধরিবার জন্য দেহকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পথ করিয়া লয়, তেমনি এই রেখাগুলিও কোনো অজানা রূপের ডাকে নিজকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে দাঁড় করাইতে চাহে। চলিতে চলিতেই সে রূপে ফুটিয়া উঠে, আবার হয়ত সেই রূপের মধ্যে স্থায়ী আশ্রয় না লইয়া নূতন কোনো রূপে জাগিয়া উঠিবার জন্য যাত্রা করে। এই রূপ-গুলিতে আমরা কোনো পরিচিত প্রাণী বা বস্তুর সাদৃশ্য দেখিয়াছি, আবার দেখি কতকগুলি সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ

কোনো প্রাণী বা বস্তুর আভাস মাত্র তাহাতে আছে। শিল্পী এইরূপ সৃষ্টির মধ্যে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন। এই জগতে কত অর্থহীন বস্তু বা শব্দ বা রেখা বা বর্ণ কেমন করিয়া আপনা আপনি রূপে ফুটিয়া উঠিয়া আপনা আপনি টুটিয়া যাইতেছে। কিছুর সঙ্গে মিলিল না বলিয়া ত সৃষ্টি ক্ষুব্ধ নহে। বিশ্ব সৃষ্টির মূলেও ত এই কথাই রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্র শিল্পও এই সৃষ্টির কথাই প্রচার করিতেছে। ইহা শিল্পীর একটি আবিষ্কার, তাহার বেশি কিছু নহে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইহা চূড়ান্ত আবিষ্কার, ইহা সমস্ত সংস্কারের মূলে আঘাত করিয়া সমঝদারকে পুলকিত করিয়াছে।

কিন্তু তথাপি আমরা বলিবই যে রবীন্দ্রনাথ দুরন্ত চেষ্টা করিয়াও একটা সত্যকার ফড়িং পর্য্যন্ত আঁকিতে পারিলেন না।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

বসন্ত-প্রলাপ

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এবার বনে ফুল ফোটে বা যদি,
ভুবন ভাসে সুধায় নিরবধি,
রবির আলোয় প্রাণের গীতি বাজে
ছন্দ তারি স্পন্দে বু'কের মাঝে ;
অঙ্গনেতে রঙ্গে মাতে সবে,
আমার ঘরে দুয়ার দেওয়া রবে।

বাইরে যবে বসন্তেরি সুরু
আমার বুকে মেঘের গুরু গুরু।
আলোর বালাই রবে না রাত হলে,
হয়ত আঁখি ভিজবে ঈষৎ জলে।
রাত্রি একা জপবে তারার মালা
তখন খুলে বসব স্মৃতির ডালা।

এমনি তর কত ফাগুন রাতি
ফুলের বনে হয়েছে মোর সাথী।
অমা নিশায় কত না দীপ জ্বালা,
পূর্ণিমাতে জ্যোৎস্না স্বপন ঢালা।
এদুই হাতে, সকল কিছু ভুলি,'
ফুল্ল কমল আননখানি তুলি'

যাপন করি' কতই নিশীথিনী
নূতন করে নিতেম তারে চিনি।
তার নয়নে নয়ন দুটি রেখে,
তার আঁখিজল এ দুই চোখে মেখে
প্রাণের মাঝে পেতাম সুনিশ্চয়
এই ভুবনের নূতন পরিচয়।

ফুলের বনে কেমন করে চলি
চরণতলে কুসুম যে গো দলি!
আমায় সে যে লুকিয়ে গেছে বলে
'হৃদয়খানি রইল কুসুম দলে,
পাপড়িগুলি চোখের জলে ধুয়ে
ঠোঁটের হাসি এই যে গেলাম থুয়ে।'

আজ ফাগুনে বাইরে যাব না গো,
ফুল কি বনে ফুট্‌ছে আজো, হাঁগো?

রবীন্দ্র-সঙ্গমে য়ুরোপ-প্রবাসের স্মৃতি-কথা

[কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পূর্ব্বেকার বিলাত প্রবাসের স্মৃতি]

শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্র দেববর্ম্মণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে বিশ-বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পূজ্যপাদ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্ম-উৎসবোপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলে বিরাট সম্বর্দ্ধনার সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সে দিন বঙ্গ-হৃদয়ে যে আনন্দ-প্রবাহের আলোড়ন উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। জীবিতকালে কোন কবির ভাগ্যে এরূপ সম্মান লাভ হইয়াছিল কিনা জানিনা। মৃত্যুর পরে চিরাচরিত শ্রদ্ধা-নিবেদনের পালা সুরু হইয়া থাকে। স্বদেশবাসী জীবিতকালেই তাঁহাদের প্রিয় কবিকে এরূপ শ্রদ্ধা নিবেদনের শুভ অনুষ্ঠান করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করিলেন। সেই মহতী সভার পুরোহিত ছিলেন বঙ্গগৌরব সার গুরুদাস। মনে আছে তাঁহার আশীর্ব্বচনে তিনি তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেছিলেন:—"শৈশবে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কবিকে বাল্মীকির ভূমিকায় লক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিয়া গাহিতে শুনিয়াছিলাম:—

"মণিময় ধূলিরাশি চাহিনা
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এসনা এসনা এ দীনজন কুটীরে!

সে কণ্ঠ সে রচণার মধ্যে অদ্যকার পূর্ণ বিকশিত রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আজ জীবিত অবস্থায় আমি সে পূর্ণবিকাশ দেখিয়া ধন্য হইলাম।" তারপর বাংলার প্রিয় কবি রবীন্দ্র-শিষ্য স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ মুরজমন্দ্রে গাহিয়া উঠেন:—

জগত-কবি-সভায় করি মোরা তোমার গর্ব্ব
বাঙ্গালী আজ গানের রাজা বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।

কবি সত্যেন্দ্রের এ বাণীর সার্থকতার ইতিহাসের কথাই বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়। জগত-কবি-সভায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিমোহন প্রতিভা-প্রসূত "গীতাঞ্জলি" অচিরেই "বাঙ্গালী আজ গানের রাজা" এ ভবিষ্যৎ বাণী ছত্রে ছত্রে সফল করিয়া তুলিয়াছিল।

১৯১২ খৃঃ মে মাসের ১২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ভগ্ন স্বাস্থ্যের উদ্ধারকল্পে কলিকাতা হইতে য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে কবিভক্তজনগণ-সমাগমে বিদায়মুহূর্ত্ত মুখর হইয়া উঠিল, পুষ্পমাল্য উপহারের ভারে আমাদের ট্রেনের প্রকোষ্ঠ ভরিয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজনের চক্ষু বিদায়বেলায় অশ্রুতে আর্দ্র করিয়া বিরাট লৌহদৈত্য নিমেষেই স্বীয় গতির বেগে ধাবিত হইল। তখন কে জানিত এ যাত্রা কবির জীবনের জয়যাত্রার অভিযান, কে জানিত অদৃষ্ট পুরুষ অন্তরালে থাকিয়া কি রেখাপাত করিতেছিলেন!

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যায় খড়্গপুর আসিয়া পৌছিলাম। লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীমতী প্রতিমাদেবী তাঁহার ভাণ্ডার খুলিয়া বসিলেন। রসনার তৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রী নিমেষেই স্বস্থানে পৌছিল এবং আমার উপর কাঁটা চামচ প্রভৃতির শোধন কার্য্যের ভার পড়িল। দীর্ঘ বিদায়ের যে অবসাদ মনকে স্বভাবতঃ পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, গুরুদেবের হাস্য-রসসিক্ত আলাপ এবং বধূ ঠাকুরাণীর ভাণ্ডারের অবারিত দ্রব্যসম্ভার ক্ষণিকেই সে অবসাদ দূর করিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ অসাবধানতাবশতঃ একটা কাঁটা হস্তচ্যুত হইয়া গাড়ীর দরজার ভিতর দিয়া বাহিরে পড়িয়া গেল; বধূ ঠাকুরাণীর নিকট কাঁটা হারানোর জন্য তিরস্কার ভাগ্যে ঘটিল। কারণ সঙ্গে একটি মাত্র কাঁটাই ছিল; সুদীর্ঘ পথে এ কাঁটার অভাবে গুরুদেবের আহারের কষ্ট হইতে পারে, ইহাই তাঁহার অনুযোগের কারণ ছিল। গুরুদেব বলিলেন—"বৌমা, এর জন্য দুঃখ করো না, বরং সৌমেন্দ্রকে ধন্যবাদ দাও সে আমাদের যাত্রা নিষ্কণ্টক করিল।" এমনি সরস গল্পে আমাদের দীর্ঘ

রেলযাত্রা শেষ হইয়া আমরা বম্বে আসিয়া একটি হোটেলে আশ্রয়লাভ করিলাম।

সন্ধ্যায় বম্বের সমুদ্রপাড়ে ভ্রমণে বাহির হইলাম। শত শত পার্শী, মারাঠী, গুজরাটী নরনারী বিচিত্র সজ্জায় সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অনাবিল আনন্দে নিঃসঙ্কোচে শিশু-সন্ততি লইয়া স্ত্রীপুরুষ চারিদিকে কলকোলাহল করিয়া ছুটিয়াছে। এ দৃশ্য আমার নিকট নিতান্ত নূতন এবং মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হইল। গুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "এ বিষয়ে বাঙ্গালী সমাজ অঙ্গহীন। স্ত্রীশক্তি বাংলায় এখনো সুপ্ত। ভারতের নবযুগে নারীশক্তির আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। না হয় তো জাতীয় জীবন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। সে জন্য এ অঞ্চলে নারী-লাঞ্ছনার অমানুষিক কাহিনী শোনা যায় না,—তাহারা আশৈশব মুক্ত হাওয়ায় মানুষ হইয়া স্বীয় শক্তির দ্বারা সমাজে নিজ স্থান অধিকার করিয়া পুরুষের নিকট প্রাপ্য সম্মান আদায় করিয়া লইতেছে।"

আমরা অলক্ষ্যেই জাহাজে আরোহণ করিলাম। পরিচিত কোন বন্ধু আসিয়া যথাকালে আমাদের শুভইচ্ছা জ্ঞাপন করিল না। সহযাত্রী ইংরাজ রমণী পুরুষ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দ-কোলাহলে জাহাজে উঠিতেছিল। আমাদের মন গৃহের এবং আশ্রমবাসী বন্ধুদের জন্য পীড়িত হইয়া উঠিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা ভারত-ভাগ্য-বিধাতার চরণে প্রণতি জানাইয়া যাত্রা সুরু করিলাম। ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যরসিক স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী এবং বিখ্যাত কলাবিদ্ আনন্দ কুমারস্বামী প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী কবিতার ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া পাশ্চাত্য দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয় সাধনে চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু ঐ সব তর্জ্জমা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত না হওয়ায় কবি স্বয়ং গীতাঞ্জলির কতিপয় কবিতা তর্জ্জমা করিতে আরম্ভ করেন। পথে রেলে, জাহাজে দেখিতাম রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি তর্জ্জমায় তন্ময়। মাতা যেমন শিশুকে নানা ভূষণে সাজাইয়া নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া পড়েন তেমনি স্বীয় কবিতাগুলিকে বিদেশী ভূষণে সাজাইয়া নিজের আনন্দেই তিনি তন্ময় থাকিতেন। কাহাকেও দেখাইতে বা পড়িয়া শুনাইতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন। মাঝে মাঝে আমার যৌবন সুলভ দৌরাত্ম্যে তিনি তাঁহার তর্জ্জমাগুলি আমাদের পাঠ করিয়া শুনাইতেন। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ইংরাজী তর্জ্জমাগুলি যাঁহারাই পড়িয়াছেন তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন—বাংলা গীতাঞ্জলির ভাবধারা রক্ষা করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ দান করিয়াছেন।

জাহাজে একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে তিনি ইংরাজি লেখার উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে উপদেশ করিলে, আমি খেয়াল বশতঃ গোটা দুই গীতাঞ্জলির গানের তর্জ্জমা করিতে প্রয়াসী হই। ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ আমার মত লেখকের কাঁচা হাতে ঐ সব গানের দুর্দ্দশা সাধিত হইতেছে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন, "ইংরাজি ভাষার শ্রাদ্ধ যতদূর পারো তা করিয়ো ; কিন্তু আমার গানের এ বিকৃতি সাধন করিয়া গুরুদক্ষিণার পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়ো না।" কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন "আমি যেন নূতন সৃষ্টির আনন্দের বানে ভাসিয়া চলিয়াছি, কিন্তু এ সব লেখা দ্বারা কাহারো মনস্তুষ্টি হইবে কি না জানি না। বিশেষতঃ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এ ভাবধারা কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারিবে কি না সন্দেহ ; বরং এ ব্যর্থ চেষ্টার এখানেই অবসান হওয়াই ভাল। কিন্তু লেখার বেগে লেখা বাড়িয়াই চলিল। মাঝে মাঝে মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য ভোজনের পর তর্জ্জমাগুলি আমাদের পড়িয়া শুনাইতেন। আমার ন্যায় ইংরাজি সাহিত্যে নিতান্ত আনাড়ির নিকটও ইংরাজি গদ্য তর্জ্জমাগুলি ছন্দোবদ্ধ কবিতার ন্যায় শুনাইত, বাক্য-যোজনার ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিচয় প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হইত। কিন্তু তবুও ইংরাজি ভাষায় এ সব তর্জ্জমার মূল্য-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন সঙ্কোচ-বিমুক্ত ছিল না। নিজ ভাষার উপর বাজিকরের ন্যায় যাঁহার প্রভাব তাঁহার নিকট বিদেশী ভাষা পোষা পাখীর ন্যায় তাঁহার প্রতিভার সম্মোহনে নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। জাহাজে রবীন্দ্র-চরিত্রের একটী বিশেষত্ব নূতন করিয়া দেখিলাম। আমরা ভারতবাসী বলিয়া সহযাত্রী ইংরাজগণ আমাদের হইতে দূরে দূরে থাকিত। যাচিয়া কাহারো সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল। আহার,

বিহার, পরিচ্ছদে স্বাদেশিকতা বজায় রাখিয়া চলিতাম। বোলপুর বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তিনি ইয়োরোপ হইতে কি ভাব এবং আয়োজন সংগ্রহ করিয়া আসিবেন—ইহাই আমাদের দৈনন্দিন আলোচনার বিষয় ছিল। ইহা লইয়াই জল্পনা কল্পনা চলিত। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি জাহাজের পূর্ব্বদিকে গিয়া দাঁড়াইতেন। প্রশান্ত মহাসাগর-বক্ষে অরুণোদয় দেখিবার জন্য নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন এবং নিত্য-নৈমিত্তিক উপাসনায় মগ্ন হইতেন,—ডেকে তখনো ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ গত যামিনীর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ফেনিলোচ্ছল বিলাস বাসনের অবসানে নিদ্রামগ্ন মৃতবৎ পড়িয়া আছে। এ দুই দৃশ্যের তুলনায় আমার মনে ভারতের সাধনার প্রকৃষ্ট দিকটা মূর্ত্ত হইয়া উঠিত। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহর অনুভূতি এ সব শ্রেণীর লোকের মনে কোন সাড়াই দিত না। ডাঙায় যে ভাবে তাহারা জীবন কাটাইত তাহা হইতেও প্রচুর অবসর জাহাজে পাইয়া তাহারা উদ্দাম নৃত্য এবং আমোদে গা ঢালিয়া চলিয়াছে। সামুদ্রিক পীড়া আসিয়া আমাকে প্রথমটা ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। গুরুদেব সকালে উঠিয়া তাড়া দিতেন, ডেকে গিয়া একবার সূর্য্যোদয়ের মহিমা দর্শন করিতে—কিন্তু মস্তিষ্ক অত্যন্ত ভারাক্রান্ত থাকিত বলিয়া পীড়া-বৃদ্ধির আশঙ্কায় বাহির হইতে সাহস হইত না। গুরুদেব বলিতেন—"তোমার ভাগ্যে প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় দর্শন আর হইল না।" আমি দুঃসাহসে ভর করিয়া বলিলাম—"রবির উদয় দেখিবার সৌভাগ্য ত আমার প্রতিদিনই কেবিনেই ঘটিয়া থাকে।" তিনি হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—"তাহা হইলে সন্ধ্যা ব্যতিরেকে সোমের দর্শন পাওয়া ত দুষ্কর হইবে।" এমনি করিয়া নিজেদের মধ্যে আমাদের দিনগুলি আনন্দে কাটিতেছিল। একদিন হঠাৎ মান্দ্রাজের একটি I. C. S. ইংরাজ কর্ম্মচারী, ইংরাজি সামাজিক বাধা অতিক্রম করিয়া কবির সহিত আসিয়া সাগ্রহে আলাপ জমাইয়া তুলিলেন। গুরুদেবের সকালে এবং সন্ধ্যায় নির্জ্জন উপাসনা তিনি লক্ষ্য করিয়া স্বজাতীয় সহযাত্রীদের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবন এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতার বর্ত্তমান গতি-সম্পর্কে বীতস্পৃহা প্রকাশ করিতেন। বোলপুর বিদ্যালয় সম্পর্কে মান্দ্রাজের Indian Review হইতে অনেক কথা তিনি জানিতেন। ভারতবর্ষের অন্তরতম সুর ইয়োরোপে তাঁহার আবির্ভাবে নূতন প্রেরণা দান করিবে ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। এমনি করিয়া তাঁহারি সহযোগে কয়জন সহযাত্রী আসিয়া আমাদের বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

আমরা Overland routeএ মার্সেই নগরীতে ট্রেণে চড়িয়া প্যারিসে আসিয়া পৌছিলাম। Gare du Nord ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক হোটেলে আশ্রয় লইলাম।

ভুবনমোহিনী প্যারির দ্রষ্টব্য স্থানগুলি আমরা দেখিয়া বেড়াইতাম—কিন্তু গুরুদেব তাঁর প্রকোষ্ঠে বসিয়া নূতন নূতন গানের সৃষ্টিতে এবং কবিতা-তর্জ্জমায় নিমগ্ন থাকিতেন। বাহিরে উদ্দাম হাস্যমুখর জনস্রোতের অতি উর্দ্ধে তিনি ধ্যানরত থাকিতেন। য়ুরোপের অন্যান্য কতিপয় সহর দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তিনি বলিলেন—"এখন সখ মিটল ত ?—চল Rothenstien এর কড়া তাগিদ আসিয়া পৌছিয়াছে—লণ্ডনে যাইতে হইবে।" Sir William Rothenstien Royal Academy of Artsএর সর্ব্বময় কর্ত্তা। ১৯১১ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। Rothenstien ভারতবর্ষের অন্তরতম আধ্যাত্মিক পরিচয় লাভের আকাঙ্খা লইয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন—ভগবানের অমোঘ বিধানে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্তরঙ্গ সুরের পরিচয়ে তাঁহার আত্মা সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি কবিকে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসভায় স্বীয় প্রাপ্য আসন অধিকার করিতে আমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তাঁহারি বিশেষ সাগ্রহে কবি স্বীয় কবিতার ইংরাজি তর্জ্জমায় প্রবৃত্ত হন। Calais হইতে ছোট জাহাজে সামুদ্রিক ভীষণ আলোড়ন সহ্য করিয়া আমরা ক্লিষ্ট দেহে Doverএ আসিয়া লণ্ডনগামী ট্রেণে আরোহণ করিলাম। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে একটি ঘটনা বিবৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ট্রেণ-প্রকোষ্ঠে ইংরাজ যাত্রীগণ স্বদেশী সজ্জায় সজ্জিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভামণ্ডিত সৌম্যমূর্ত্তির দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একজন ইংরাজ ধূমকেতুর ন্যায় কবির নিকট আসিয়া ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে

অনর্গল বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই—"আপনি নিশ্চয় কোন ধর্ম্মপ্রচারে এ দেশে আসিয়াছেন,—আপনার চেহারা দেখিয়া মনে হয়, আপনি পাঞ্জাব হইতে আসিতেছেন। পাঞ্জাবীদের আমরা বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা রাজভক্ত এবং ভারতীয় সৈন্যের পুষ্টিসাধনে ইংরাজ-রাজকে তাহারা বিশেষ সাহায্য করিতেছে। ভারতবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালীকে আমি নিতান্ত ঘৃণা করি কারণ তাহারা sedition এর বীজ ছড়াইয়া ইংরাজ রাজত্বে উৎপাত সৃষ্টি করিতেছে।" কবি নীরবেই এ উৎপাত সহ্য করিতেছিলেন। প্রত্যুত্তরে এই মাত্র বলিলেন—"I have the honour to represent the Bengali Race whom you hate most", ইংরাজ ভদ্রলোক হতভম্ব হইয়া নিজ আসনে ফিরিয়া গেল। সৌভাগ্য বশতঃ এরূপ উৎপাত কবিকে আর সহ্য করিতে হয় নাই। লণ্ডনে পৌছামাত্র Rothenstien তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া একেবারে সাহিত্যিক দরবারে পরিচিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক সঙ্কোচে পাশ্চাত্য publicityর বৈদ্যুতিক আলোকোদ্ভাসিত নাট্যশালায় দাঁড়াইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। Hamstead Heath এ একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া পূজনীয়া বধূ ঠাকুরাণী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী সংসার পাতিয়া বসিলেন। একদিন Prof. Rothenstienএর গৃহে তাঁহারি নিমন্ত্রণে সমাগত ইতস্ততঃবিন্যস্ত দীর্ঘকেশ ঋজুদেহ আইরিশ নবযুগের একতমহোতা কবি Yeats, Evelyn Underhill, শিল্পাচার্য্য Dr. Havel প্রভৃতি গুণীজনের সহিত কবির পরিচয় সংঘটিত হইল। সে বৈঠকে গুরুদেব তাঁহার ইংরাজী ভূষণে সজ্জিত গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি পাঠ করিলেন—সকলে নিঃশব্দে সে পাঠ শুনিলেন কিন্তু এতৎ-সম্পর্কে কোন অভিমত না দিয়াই তাঁহারা বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া গৃহে ফিরিলেন। কবিতাগুলির এরূপ সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া কতকটা পরিহাসের ছলেই কবি বলিয়াছিলেন—"এ তর্জ্জমাগুলি ইংরাজী কবিতার গতানুগতিক ছন্দের বাহিরে, মিলনবিহীন এবং ইহাদের ভাবও ইংরাজী সাহিত্যে নিতান্ত অপরিচিত,—সে জন্য হয়তো এ দেশের সাহিত্য রসিকদের মনে সাড়া দেয় নাই। কিন্তু সপ্তাহকাল যাইতে না যাইতেই সমবেত প্রত্যেক সাহিত্যিকের নিকট হইতে অতি উচ্চ প্রসংশার পত্র আসিয়া পৌছিতে লাগিল। কবি Yeats লিখিলেন, "এরূপ মহান্ ভাবধারা বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তন করিবে। তাঁহার জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নূতন আলোক দান করিয়াছে। তিনি বাস্, ট্রাম, রেলে যখন যেখানে থাকেন গীতাঞ্জলি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে—রচনার বিশিষ্টতা তাঁহার সমগ্র চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বসিয়াছে।" ইংরাজ চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এখানে উপলব্ধি করিলাম। মৌখিক প্রসংশার পালা ইংরাজদের ধাতে সহ্য হয় না। সকলেই গভীর ভাবে এ তর্জ্জমাগুলি পাঠ করিয়া মূল্য যাচাই করিয়া তারপর মতামত প্রকাশ করিলেন। ক্ষণিকের sentimentality এ জাতির মনকে ভাসাইয়া নিতে পারে না। লণ্ডনে India Society নামক একটী সভা আছে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের সাহিত্য, ধর্ম্ম এবং সঙ্গীত বিষয়ক বিশিষ্ট পুস্তক ছাপাইয়া এ সভার সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ সভার প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সাহিত্যসমাজে বিশেষ উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত Societyর পক্ষ হইতে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করা স্থির হইল এবং গীতাঞ্জলির বিশেষ সংস্করণ বাহির করিতে তাঁহারা কবির অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগে কবির মনে সঙ্কোচের আবরণ দূর হইয়া গেল। তাঁহাকে ধরা দিতে হইল।

৬ই জুলাই তারিখে Londonএর বিখ্যাত Trocadero Restaurantএ কবি Yeatsএর সভাপতিত্বে India Societyর পক্ষে এক বিরাট সম্বর্দ্ধনা-ভোজের আয়োজন হইল। লণ্ডনের গণ্যমান্য সাহিত্যিক, রাজনৈতিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমবেত হইলেন। সে বিরাট ভোজে আমার ন্যায় অধম ছাত্রেরও স্থান হইয়াছিল। সে রাত্রির বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। সে ভোজে "বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার বায়ু, বাঙ্গলার ফল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান" কবিতা আবৃত্তি করিবার ভার এ অযোগ্য শিষ্যের উপর অর্পিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ

নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় লণ্ডনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে অনুরক্ত ভক্তের দল বাড়িয়া চলিল। Miss Viola Traeর ন্যায় বিখ্যাত অভিনেত্রীর নেতৃত্বে এলবার্টহলে তাঁহার ডালিয়া গল্পের ছায়ানুকরণে Maharani of Arakan নামে একাঙ্ক নাট্য এনায়েত খাঁর ভারতবর্ষীয় ঐক্যতানবাদন সহযোগে অভিনীত হইল। লণ্ডন মহানগরীতে কবির অভ্যুদয় লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকাগুলি মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কবির প্রশংসায় লণ্ডন সহর মুখরিত হইয়া উঠিল। এ সময় দেশ হইতে সংবাদ আসিল—"কবির এ সব তর্জ্জমা স্বকীয় নহে—কারণ কবির ইংরাজী জ্ঞান অতিশয় সঙ্কীর্ণ।" এরূপ উক্তির পিছনে কতিপয় স্বদেশবাসীর নীচ মনের পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহাতে ঐ নীচমনাদের চরিত্র বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, কবির যশঃ-সূর্য্যে কোন কলঙ্কপাত করতে পারে নাই।

ভগ্ন স্বাস্থ্যের উদ্ধারকল্পে কবি লণ্ডনে আসিয়াছিলেন, সাহিত্যসমাজের ফেনিল প্রসংশার বহুদূরে নিরালায় থাকিবার জন্যই Hamstead Heathএ একটি বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ গুণীজন সমাজের আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের বাহুল্যে তাঁহার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা জন্মিল। যথাসময়ে তাঁহার দেহে নির্দ্দিষ্ট অস্ত্রোপচার করা হইল এবং তাঁহাকে দেড় মাসের জন্য একটি Nursing Homeএর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ভগবানের দয়ায় তিনি রোগমুক্ত হইলেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের বাঙ্গালা তর্জ্জমা কবীরের দোঁহাবলীর ইংরাজী তর্জ্জমা করিতে আরম্ভ করিলেন। India Society হইতে প্রকাশিত গীতাঞ্জলি প্রকাশের ভার Macmilan Co. গ্রহণ করিল।

তারপর পুত্রবধূ এবং পুত্রসহ তিনি আমেরিকায় আসিয়া পৌঁছিলেন। মার্কিন রাজ্যে এখনো তাঁহার নাম সুপরিচিত হয় নাই। কেবল মাত্র রথীন্দ্রনাথের Post-gruadate studies এর ব্যবস্থা করিবার জন্যই তিনি আমেরিকা আসিতে রাজি হন। আমি ইতিপূর্ব্বেই আমেরিকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। নব্য মার্কিন সমাজ সকল প্রকার সভ্যতার দানই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা উদগ্রীব। তাহারা প্রাচীন য়ুরোপের ন্যায় আভিজাত্য গৌরবের মিথ্যা মোহে জগতের অন্য সভ্যতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে না। সত্যকে স্বীকার করিয়া নিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। ইহাই মার্কিন জাতির বিশেষত্ব। কবি Urleana Town এর এক পার্শে বাড়ী ভাড়া করিয়া আমাদের লইয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বপরিচিত অধ্যাপকমণ্ডলী রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া তাঁহার ভাণ্ডার ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়া বসিল। প্রায় এক বৎসরকাল কবি Urleana সহরেই রহিয়া গেলেন। Chicago সহরের Poetry Scociety বড়দিন উপলক্ষে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার বিরাট্ আয়োজন করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন সহরে scarlet fever দেখা দেওয়ায় Quarantine এর দয়ায় আমার সে সভায় যোগ দিবার সুযোগ অদৃষ্টে ঘটিল না। Chicago এবং অন্যান্য সহরের কাগজগুলি রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় আগমন জয়ধ্বনি সহকারে ঘোষণা করিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় বিজ্ঞাপিত করিল। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য বিশিষ্ট সহরের Society ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। সে বৎসর এপ্রিল মাসে ইংরাজ কবি Alfred Noyes মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা এবং রচনা পাঠ করিতে আমেরিকায় আগমন করেন। Prof. Brooksএর গৃহে এ দুই কবির সম্মিলন ঘটিল। কবি Noyes রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি ভাষায় দখল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন এবং কবির রচনার রসভোগ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

ক্রমশঃ Chicago, Harvard প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবির আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থাবলীর উপদেশাবলী অবলম্বন করিয়া কবি Sadhana পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। সে সব প্রবন্ধগুলিই তিনি পাঠ করিয়া Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের উচ্চ প্রসংশা লাভ করিলেন। একদিন বক্তৃতান্তে Harvardএর দর্শনের অধ্যাপক Prof. Wood কবিকে বলিয়াছিলেন—আপনার এ অমূল্য গ্রন্থগুলি জগতের সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভাবনীয় দান। Swedish Nobel Society সাহিত্যে Nobel prize

দ্বারা এখনো যে আপনাকে পুরস্কৃত করে নাই ইহা আশ্চর্য্য। কবি ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"Kipling যদি ভারতবর্ষের বিকৃত পরিচয়বিশিষ্ট লেখা দ্বারা Nobel prize পাইয়া থাকেন তবে সে পুরস্কার লাভ করার বিশেষত্ব নাই; ভারতের বরপুত্র বন্ধুবর বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে বহুদিন পূর্ব্বে বিজ্ঞানে এ পুরস্কার দেওয়া সঙ্গত ছিল। আমরা ভারতবাসী বলিয়াই আমাদের কৃতিত্বের কোন দাবী য়ুরোপ স্বীকার করিবে না।"

তারপর আমার আমেরিকায় শিক্ষার ব্যবস্থা পাকা করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে Cosmopolitan ক্লাবে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া কলেজ যাত্রার আয়োজন করিতেছি, এমন সময় আমাদের মাতৃস্বরূপিণী অধ্যাপক-পত্নী Mrs. Seymour এর টেলিফোনে ডাক আসিল। শুনিলাম তিনি আনন্দ উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিতেছেন—"a message for you—Gurudev has been awarded the Nobel Prize for literature this year"। এ আনন্দ সংবাদে কলেজের কথা ভুলিয়া গেলাম। লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক পত্রিকাগুলি গ্রাস করিয়া বসিলাম। রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কাগজগুলির প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আজ আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই। কবির এ সম্মানলাভ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ভারতের বাণী আজ জগতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিল। ভারতবর্ষের এ যশঃ-সৌভাগ্যে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে আনন্দের বার্ত্তা শান্তিনিকেতন আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ করিয়া কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। অদৃষ্ট পুরুষের ইঙ্গিতে জগৎ-কবি-সভায় ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হইল।—

"জগতকবিসভায় করি মোরা তোমার গর্ব্ব
বাঙ্গালী আজ গানের রাজা বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।"

শ্রীসৌম্যেন্দ্র দেববর্ম্মণ

শরৎচন্দ্র

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মধু ও বঙ্কিম উষা উদ্‌ভাসিলা এ বঙ্গ-গগন ;
প্রাচীমূলে অরুণিমা নব প্রাণ করে উদ্বোধন ;—
ঘরে ঘরে খোলে দ্বার, পাখী গায়, বৃক্ষে নাচে পাতা,
তটিনী ছুটিল বেগে, ফুল্ল চোখে জাগে বঙ্গমাতা।

উষা-গর্ভ হ'তে রবি বাহিরিল প্রবল উদ্যম,
সুপ্ত গুপ্ত প্রাণাঙ্কুর নব হর্ষে জাগিল দুর্দ্দম ;
সর্ব্ব গ্লানি আহরিয়া সে রচিল বাষ্পঘন মেঘ,—
সে মেঘ আষাঢ় রূপে ঝরি' ঝরি' দিল প্রাণবেগ।

শরৎ আসিল স্নিগ্ধ স্বর্ণময় শ্যামল মধুর,
প্রান্তরে সঞ্চিত জল, খানা ডোবা বিল পরিপূর,
দীন ক্ষুদ্রতম তৃণ সেও গর্ব্বে তোলে নম্র শির ;
কদম্বের পাশে ঘেঁটু সেও আজ আনন্দে অস্থির।

হে বাংলার সত্য ছেলে, চিত্তে স্বপ্নে হে বাঙালী খাঁটি,
বাঙালীর স্নেহ সুখ দৈন্য প্রেম কথা-কাটাকাটি,
দুষ্ট ছেলে, শান্তা মাতা, তুষ্টা আর রুষ্টা বঙ্গবধূ,
যথার্থ আঁকিলে তুমি বাঙালীর দ্বন্দ্ব আর মধু।

বাংলার বৈষ্ণব বক্ষে বেঁধেছিল জগাই মাধাই,
অপূর্ব্ব সে চিত্তসুধা, তারি স্বাদ তব চিত্তে পাই,
নগণ্য পতিতা ভ্রষ্টা দুষ্টে তুমি দিলে সম প্রেম,
ধূলিতে লভিলে মণি, অকল্যাণে দিলে চিত্তক্ষেম।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

অজ্ঞাতবাস *

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

পূর্ব্বকথা

মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট্ এর সঙ্গে সুধীর পরিচয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে। উক্ত গৃহে দিনের পর দিন পাশাপাশি বস্‌তে বস্‌তে কত পাঠক পাঠিকার মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়ে পরিণয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে, পরিচয় ত সামান্য বিষয়। প্রথমে হয় গুড মর্ণিং বলাবলি। তারপরে দৈবক্রমে একদিন দুজনের লাঞ্চ খাওয়া হয় একই রেস্তোরাঁর একই টেবিলে। তখন একটু আবহ চর্চ্চা হয়। "এ বছর বৃষ্টিটা কিছু বেশী বলে মনে হয়।" "আমি ত আগষ্ট মাস থেকে বৃষ্টির বিরাম দেখ্‌ছিনে।" "ওঃ আপনি গ্রীষ্মকালে এদেশে ছিলেন না! সারা গ্রীষ্মকালটা ভিজে রয়েছিল।" সেদিন ঐ পর্য্যন্ত। পরেও একদিন দৈবাৎ ঐ টেবিলেই দু'জনের সাক্ষাৎ। সুধীকে দেখে মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট্ বল্লেন, "এই যে আপনি আজও এখানে। এখানকার খাওয়া আপনার পছন্দ হয় দেখ্‌ছি।" সুধী বল্ল, "অনেক ঘুরে শেষে এইখানে ভিড়ে গেছি। এরা নিরামিষটা বাস্তবিকই ভাল রাঁধে।" মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট পরিহাস করে বল্লেন, "নিরামিষ যে রাঁধে এইটাই হচ্ছে half the battle. তারপর ভাল রাঁধে সেটা ত রীতিমত দিগ্বিজয়।" সুধী বল্ল, "ভাল রান্নার জন্য আমি একমাইল হাঁটতে রাজি আছি।" মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট এর উত্তরে বল্লেন, "ভাল রান্নার নিশ্চয়তা দিতে পারব না, কিন্তু নিরামিষ যদি ভালবাসেন তবে আমাদের ওখানে একদিন আপনার নিমন্ত্রণ রইল, মিষ্টার—।" সুধী তাঁর অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করে দিল।

রিম্‌লেস্ চশমার পিছনে তাঁর ঈষৎ নিমীলিত চক্ষু পরিহাসকালে প্রায় নিমীলিত দেখায়। বয়স ষাটের এদিকে কিম্বা ওদিকে। চুল এখনো সেকেলে ধরণে বাঁধা, সব পেকে গেছে। গাল বেশ ফুল্‌কো, স্বাস্থ্যের বর্ণচ্ছটায় রঙিন। ভরাট গড়ন, দীর্ঘ ঋজু আকার। সুধী এলেন টেরীর সঙ্গে তুলনা করল। পোষাক মসৃণ কাল সাটিনের। বাম হাতের একটি আঙ্গুলে একটা আংটি, দেখে মনে হয় বাগ্‌দানের।

রবিবারে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ডক্টর মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট সুধীকে দেখে বল্লেন, "One more unfortunate! এলিনর, তুমি এঁকে কবে ভজালে?"

মিস্ মেল্‌বোর্ণ হোয়াইট নিরামিষ turtle soup পরিবেশন করে নিরামিষ lamb cutlets এর ঢাকা খুল্‌তে যাচ্ছিলেন। ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে কনভার্ট করা যেন নিউকস্‌লে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া। আচ্ছা মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, মিসেস বেসাণ্টের সঙ্গে আপনার জানাশুনা আছে?"

সুধী বল্ল, "আমি থিয়সফিষ্ট নই।"

এলিনর বল্লেন, "নন্? তবে কেমন করে নিরামিষাশী হলেন?"

সুধীকে ভারতবর্ষের সাত্ত্বিক আদর্শের প্রসঙ্গ পাড়্‌তে হল। শেষে সুধী বল্ল, "জৈনদের নাম শুনেছেন?"

এলিনর বল্লেন, "শুনেছি বৈ কি। সেই যাদের শব শকুনে খায়। উঃ!" (শিউরে উঠ্‌লেন।)

সুধী হেসে বল্ল, "আপনি যাদের কথা ভাব্‌ছেন তাদের বলে পার্শী।"

"ওঃ পার্শী! How dreadful! শুন্‌লে আর্থার? তোমার গ্রীকদের পরম শত্রু সেই যে পার্শিয়ানরা, তারাই—মানে তাদের বংশধররাই—ওঃ How dreadful!"

* "সত্যাসত্যে"র দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ড "যার যেথা দেশ" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হচ্ছে।

সুধী জানত না যে মিস মেলবোর্ণ হোয়াইটের দুই নম্বর বাতিক ইংলণ্ডে শবদাহ প্রচলিত করা। এজন্য তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা একটি সমিতি করেছেন। যাঁরা চাঁদা দিয়ে সভ্য হবেন তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের শব সমিতি কর্তৃক দাহ করা হবে। শবদাহকার্য্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। সমগ্র দেশের মধ্যে হয়ত একটি কি দুটি Crematorium আছে।

মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট সুধীকে সভ্য হবার জন্য অনুরোধ করলেন। সুধী প্রথমটা আশ্চর্য্য ও পরে কৌতুক বোধ করে বল্ল, "আমি ত পার্শী নই। আমি হিন্দু। আমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে অন্য সকলে তাকে ঘাড়ে করে শ্মশানে নিয়ে যায়, ঝড় বৃষ্টির রাত্রেও; একটি পেনী মজুরি নেয় না।"

ডক্টর মেল্‌বোর্ণ হোয়াইট গম্ভীরভাবে বল্লেন, "প্রাচীন গ্রীকরা শব দাহ করত না শবকে গোর দিত সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।" অন্যমনস্ক অধ্যাপককে দাবড়ি দিয়ে তাঁর ভগিনী বল্লেন, "কিন্তু আধুনিক পার্শীদেরকে আমাদের সমিতির সভ্য করতে হবে, আর্থার।"

মেল্‌বোর্ণ হোয়াইট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে সুধী জানতে পারল এঁর পূর্ব্বপুরুষ কেউ রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেল্‌বোর্ণের আত্মীয় ছিলেন। লর্ড মেল্‌বোর্ণের একখানি প্রতিকৃতি এঁদের বস্‌বার ঘর অলঙ্কৃত করছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট বল্‌ছিলেন, "the Melbourne grit" তাঁদের পরিবারের বিশেষত্ব। সে বিষয়ে সুধীর সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর ভাইটি বড় বেচারা মানুষ। বয়সেও তাঁর বড়। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মস্ত ক্লাসিকাল স্কলার, গিল্‌বার্ট মারের মত প্রখ্যাত না হলেও তেমনি বিদ্বান। ভাইবোন দুজনেই অনূঢ়, তবে ভাইয়ের জীবনে কখনো কোনো রোমান্স ঘটেছিল কিনা তার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁর আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় নেই। আকারে আয়তনে ভাইটি খর্ব্ব ও ক্ষীণ; কিন্তু তাঁর দাড়ির বহর তাঁকে বাড়িয়ে দেখায়। বোনের অতি-সজাগ চক্ষু তাঁর পরিচ্ছদকে মলিন কিম্বা কুঞ্চিত হতে দেয় না। অন্যান্য বিষয়েও তাঁর উপর বোনের অত্যাচার অবিরত লেগে রয়েছে। বোনটি এতটা পটু না হলে ভাইটিও বোধ করি এতটা অপটু হতেন না। আক্ষেপ করে বল্‌ছিলেন, "হতে চেয়েছিলুম ক্লাসিকাল নায়ক, হয়ে দাঁড়ালুম ক্লাসিক্সের অধ্যাপক। কাজের মধ্যে পড়া আর পড়ান।"

সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ছাত্র?"

সুধী উত্তর দিয়েছিল, 'হাঁ সার"। প্রবীণ ব্যক্তিকে সার বলে সম্মান দেখিয়ে সুধী সম্মান বোধ করে। বাদলের মতে সকলেই সমান। সমানে সমানে সহজ ভদ্রতা চলুক, উচ্চতা নীচতার ভাণ কেন?

ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইট বলেছিলেন, "কিসের ছাত্র?"

সুধী বলেছিল, "জীবন শিল্পের।"

"তা হলে প্রাচীন গ্রীকদের দ্বারস্থ হতে হয়।"

"কিন্তু তারা কি বেঁচে আছে?"

"আছে বৈ কি। যে একবার বেঁচেছে সে চিরকাল বেঁচেছে। মরে তারাই যারা জন্ম থেকে মরা। প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতবৎসা, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী।"

সুধী সবিনয়ে বলেছিল, "মৃতের জন্য কি আপনি শোক করেন না, সার? এই যে গত মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বীর—"

"গিল্‌বার্ট তাই নিয়ে খুব লম্ফ ঝম্ফ করে বেড়াচ্ছে শুনি। কি ওটার নাম, লীগ অব্ নেশন্স্—হা হা হা। পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দেবে গিল্‌বার্ট আর তার লীগ্। কেন? যুদ্ধে কি মানুষ এই প্রথম মরল? ট্রয়ের যুদ্ধে বছরের পর বছর কি তখনকার অনুপাতে কম মানুষ মরেছে? যদি বল ট্রয়ের যুদ্ধ অনৈতিহাসিক, তবে Peloponnesian War?"

সুধী গ্রীক ইতিহাস পড়েনি। চুপ করে থাক্‌ল। ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইট সমঝদার শ্রোতা পেয়েছেন ঠাওরে বলতে লাগ্‌লেন, "না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, ও সব ছেলেমানুষী আমাদের মানায় না। গিল্‌বার্ট ভুল করছে। এলিনর ওসব করে বেড়ায়,—মেয়েমানুষ, হাতে কাজ নেই অথচ পয়সা আছে, একটা লীগ অব নেশন্স ইউনিয়ন, একটা ভেজিটারিয়ান ক্লাব, একটা ক্রিমেশন সোসাইটী, Abolition of Vivisection ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার, এই করে তার

জীবনের সার্থকতা। কিন্তু আমরা! We should know better!"

কোন কথা থেকে কোন কথা এসে পড়্ল। সুধী ভাব্ছিল সেদিনকার মত উঠ্বে কি না। ডক্টর মেল্বোর্ণ হোয়াইট বল্লেন, "কি নাম?—বাবগড্ গীটা না, কি যেন বইখানার নাম? আমি পড়েছি।"

সুধী বল্ল, "শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা।"

"ওতে লিখেছে যারা মরে রয়েছে তারাই মরে, কাজেই মারা সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ করা কাপুরুষতা। সংস্কৃত আমি জানিনে, কিন্তু গ্রীকের সঙ্গে তার ভাষার ও ভাবের বহু সাদৃশ্য তারা আবিষ্কার করেছে যারা দুটোই জানে। তুমি দুটোই জান?"

"আমি সংস্কৃত সামান্য জানি। গ্রীক একেবারেই না।"

"একেবারেই না? এ-কে-বা-রেই না?"

সুধী লজ্জিত হয়ে নিঃশব্দ রইল।

ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইট তাকে খানকয়েক বইয়ের তালিকা দিয়ে তারপরে বলেছিলেন, "রবিবার গুলোতে আমার কাছে এসো, সংস্কৃত ও গ্রীক চর্চ্চা করা যাবে।"

ক্রমশ যখন ঘনিষ্ঠতা হল তখন ডক্টর মেল্বোর্ণ হোয়াইট সুধীকে তাঁর জীবনের ব্যর্থতার কথা বল্লেন। তাঁর বোন তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। কোথাও যেতে দেন না। ১৯০৯ সালে Roosevelt যখন আফ্রিকায় শীকার করতে যান তখন তাঁর দলের মধ্যে আমাদের ডক্টরেরও নাম ছিল, কিন্তু এলিনর তাঁকে যেতে দিলেন না। ১৯১২ সালে তিনি স্কটের সঙ্গে দক্ষিণ মেরু যাত্রা করবেন ঠিক হয়ে গেছ্ল, কিন্তু সে বারেও এলিনর দিলেন বাধা। ১৯১৪ সালে তিনি বয়স ভাঁড়িয়ে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিলেন, কিন্তু এলিনর জানতে পেরে পণ্ড করে দিলেন। গ্রীক হবার একটাও সুযোগ তিনি পেলেন না। যে বিদ্যা জীবনে রূপান্তরিত হতে পারে না সে যেন অচল স্বর্ণমুদ্রা, তাকে বাজারে ভাঙ্গান যায় না, লকেট করে সবাইকে দেখিয়ে বেড়ান ছাড়া তার অন্য সদ্ব্যবহার নেই। হিউমেনিটারিয়ান বোনের উৎপাতে তিনি মাংসাহার ত ত্যাগ করেছেন। তাঁর দাড়ি কামানরও হুকুম নেই, পাছে অসাবধান হয়ে মাংস কেটে ফেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

প্রমত্ত-সন্ধ্যায়

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ রায় বি-এ

আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
বসন্তের মর্ম্মর-হিল্লোলে
মনে পড়ে শুধু সেই দিন !
যেদিন আমরা প্রিয়ে
অন্তরে বাহিরে
সমগ্র হৃদয় ডোরে
বেঁধেছিনু দুজনায়
এমনি বিহ্বলা এক
মধুর সন্ধ্যায় !

নিবিড় মিলন সুখে
মুখে-মুখে
যে বারতা ধ্বনি গেল
হৃদয়-কন্দরে !
যে হাসি, যে অশ্রুমালা
ভরেছিল, তুলেছিল
দুজনার চোখে
আজি কি গো মনে পড়ে তাহা ?
আজি কি গো সেই মধু নিশি
স্বপ্ন মাঝে --
দেখা পাও কভু !
মনে কি গো পড়ে সেই
মোর বুকে মুখটি রাখিয়া
জ্যোৎস্নার সব সুধাপান ?

এমনি চাঁদের আলো
দখিনা বাতাস
করেছিল হাসাহাসি।
ফুলদল—
করেছিল কানাকানি !
সেদিনের
সে মধু-যামিনী
মুখরিত হয়েছিলো
অসীম পুলকে !
রূপালী আলোকে
তোমার ও মুখখানি
কী যে রূপ ধরেছিল
কী ব'লে—
জানাবো আজি
ওগো প্রিয়তম

যেন কোন স্বপ্নপুরী মাঝে
আমাদের হোলো অভিযান।
ফুলবাণ ছুড়িল মদন !
তুমি তাহা বক্ষ পাতি
করিলে গ্রহণ !
যে রক্ত ঝরিল তাতে
সুকোমল সুনিবিড়
তব বক্ষ হ'তে
তুমি তাহা দু'হাতে নিঙাড়ি
আমার কপোলখানি
দিলে রাঙাইয়া
ওগো মোর প্রিয়া

আজ শুধু—
শূন্য প্রাণে তাই
শঙ্কা নিয়ে করি আমি খেলা !
মনে শুধু ভয়
বিরহের অমানিশা
শেষ কবে হয় !
আর বুঝি
মিলনের সেই রূপ
দেখা নাহি পাবো

বুঝি তার পর,
ব্যথা শুধু নর্ত্তকীর বেশে,
কটাক্ষ নয়নে হেসে,
চপল নৃত্যের সাথে,
নিয়ে মোরে যায় -
দিগন্ত বিস্তৃত সেই
প্রমত্ত-সন্ধ্যায় !!

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার চিত্রকলা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন

সম্প্রতি কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বিরাট চিত্র-সংগ্রহ উপভোগ করার সুযোগ সাধারণের ঘটেছে *। এদেশের লোক কবিগুরুর এসব চিত্র পশ্চিমে সমাদৃত হয়েছে এ খবর ভালরকমেই জানত। বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত এদেশে এরকম একটা প্রদর্শনীরও যে প্রতীক্ষা করেনি তা নয়। এবার ভাল করে'ই দেশের এই নূতন পরিচয় হয়ে গেল।

এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। রসচর্চ্চা ও রসভোগের গোড়াতেই বলতে হয় মানুষের মনকে কোন নোঙরে আবদ্ধ করলেই মুক্ত আনন্দলাভ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আলাদিনের রত্নগর্ভ গুহার বিরাট সম্পদ সামান্য এক টুকরো পাথরের আবরণে লোকচক্ষুর আড়াল হ'ত। এই বাধাটুকুকে পরমার্থ করে' ভুললে কতবড় সম্পদ হ'তে নিজকে বঞ্চিত করা হয় আফ্রিকার যাদুকর তা' ভাল রকমেই জানতো। সকল দেশে ও কালে রসসৃষ্টির উপর এরকম একটা মায়ার আবরণ ইতরজনকে বার বার বিপ্রলব্ধ করেছে। এজন্যই অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করতে নেই এমন একটা কথা এদেশে চলে এসেছে।

আনন্দলাভ মাত্রই অন্তরের মুক্ত বিহারের উপর নির্ভর করে। চিত্তের হ্লাদিনীবৃত্তিকে নানা নিয়ম, কানুন, বাধা বিপর্য্যয়ের ভিতর আড়ষ্ট করে ফেললে একটা সঙ্কীর্ণ পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমে কিছুকাল পূর্ব্বেও গ্রীক ও রোমান আদর্শ ছাড়া আর কিছু যে সৌন্দর্য্যের দাবী করতে পারে এরকম বিশ্বাস কারও ছিলনা। Byzantine ও medieval সৃষ্টি ও বিদ্রূপের ব্যাপার বলে' গৃহীত হ'ত। পূর্ব্বাঞ্চলের ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা ত নেহাৎ অবজ্ঞার বিষয়ই ছিল।

হকসাই হিরোসিগের চিত্রকলাই পশ্চিমকে প্রথম বিপরীতমন্ত্রে দীক্ষিত করে। পশ্চিম জাপানী শিল্পীদের বর্ণ-বিন্যাস ও সংযোগের কারুতা দেখে' মুগ্ধ হয়ে যায়। এর পর যখন ছায়াপন্থীরা (Impressionist) একে একে প্রাচীন রীতিনীতি তুচ্ছ করে ক্লাসিক আদর্শ ভূমিসাৎ করে সাধারণের কাছে নিজেদের চিত্রসম্পদ উপস্থিত করে, তখন পশ্চিমে যে কতবড় একটা বিপ্লবের সূচনা হয় তা' সম্প্রতি কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

চিত্রশিল্পী Whistlerএর একখানি চিত্র সম্বন্ধে গোঁড়া আলোচক রস্কিন (Ruskin) "Throwing a pot of paint on the public face" বলে' এক মন্তব্য উপস্থিত করেন। এ ব্যাপার নিয়ে Whistler vs. Ruskin নামে এক মামলা উপস্থিত করা হয়। তা'র ফলে Whistlerএর জয়টীকাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কোন নূতন বিধি বা বার্ত্তা উপস্থিত করতে গেলে নানা অসহিষ্ণু বাধা ওসবকে নিষ্পেষিত করতে চায়। অধ্যাত্ম জগতেও মুক্তির মুহূর্ত্তে প্রবল বিভীষিকা 'মারে'র মত এসে সম্বুদ্ধ যোগীকে উন্মার্গগামী করতে চায়। এজন্য হৃদয়ের অটলতা ও দুর্গম সংকল্প না থাকলে রস-প্রকাশের অসীম উপায়কে উদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এযুগে অতটা গোড়ামি সম্ভবতঃ নেই। পশ্চিমে Archipenkoএর 'Sorrowing woman' প্রভৃতি মূর্ত্তি, Kandinskyর আধ্যাত্মিক পটগুলি, Matisseএর 'প্রকৃতি'-বিরুদ্ধ চিত্রাদি সকলেরই সুভোগ্য হয়েছে—এ সমস্তের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের চিত্র-সম্পদ সুবোধ্য ও সুমার্জ্জিত। কাজেই পশ্চিমে কবির চিত্রকলা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হওয়া স্বাভাবিক। কাব্য ও চিত্রকলাদি প্রসঙ্গে একটা কথা ভুললে চলবে না। ভলটেয়ার (Voltaire)

* গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে বলে' তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

বল্‌তেন সব উপায়ই ভাল যদি সে সব রসব্যঞ্জনায় সফল হয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য চিত্রশিল্পীর প্রথা বা প্রকাশের উপায় সম্বন্ধে বিদ্রোহী হ'লে চল্‌বে না। সেটাকে স্বীকার করে' রসসম্বর্দ্ধনা কর্‌তে হবে।

এদেশেও কালিঘাটের পট, প্রাচীন উড়িষ্যার চিত্র প্রভৃতি নানা ধারার ও ধর্ম্মের চিত্রকলা উপভোগ করতে সম্প্রতি একটু উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এসব ঠিক প্রচলিত 'সৌন্দর্য্যের' নিয়মে রচিত হয়নি। এ সমস্তের ভিতরে একটা গূঢ় শ্রীর আবেশ ও অলঙ্করণ আছে—সকলের চোখে তা' পড়ে না। সুন্দরের কোন একটা শৃঙ্খলিত রূপ নেই। যাকে ugly বা অসুন্দর বলা যায় চিত্রকরের অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তি তাকেও অন্তর্গ্রহণ করে' একটা নূতন মহিমা ও সম্পদ্ দান করে যা'তে ক'রে তা' চিরন্তন হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসী চিত্রকর কুর্‌বে (Courbet) কুৎসিৎ চেহারা বেছে নিয়ে আঁক্‌তেন। কিন্তু সে সবের সমীকরণ এমনি একটি নিপুণ ও আশ্চর্য্য প্রথায় হ'ত যে সমসাময়িক সকল চিত্রকলাকে সে সহজে অতিক্রম করে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় মানুষের মুখের অসীম রূপ-ব্যঞ্জনার প্রয়াস দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে সব কোন Beauty Competitionএর চেহারা থেকে ধার করা ব্যাপার নয়। এক একটা চেহারার ভিতর হতে এক একটা সুগুপ্ত বার্ত্তা দর্শককে বিভোর করে' তোলে—মনে হয় মানুষের মুখের কয়েকটা রেখা ও বর্ণের আস্তরণে কি আশ্চর্য্য জগতই না অবগুণ্ঠিত ছিল! কবি কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির অনেক সুগুপ্ত বার্ত্তাকে গুণ্ঠনমুক্ত করেছেন—তবুও সৃষ্টির গোপন কক্ষে অনেক সম্পদ লুকোন ছিল; এবার তিনি তুলিকা হাতে নিয়ে সৃষ্টির সূক্ষ্ম ও গভীরতর অন্তঃপুরে উপনীত হয়ে আরও কত কি কথা উপস্থিত করেছেন তা' হৃদয়বান রসিকের উপলব্ধি হবে।

পশ্চিমের সভ্যতা এদেশের অনেক সহজ সুন্দর সৃষ্টিকে অবজ্ঞায় হতশ্রী করেছে। থিয়েটার দেখ্‌তে অভ্যস্ত ভারতবাসী যাত্রাগানের পটহীন সমারোহকে হাস্যজনক মনে করে, আবৃত্তির অন্তরালে যাত্রার সমবেত সঙ্গীত তা'র দুঃসহ হয়ে পড়ে'—যদিও তা' গ্রীকনাটকের Chorus এরই মত একটা স্থান অধিকার করে' থাকে। এ খবর অনেকেরই জানা নেই। কবিতা লিখা বা ছবি আঁকা সম্বন্ধে কোন বিশেষ ফরমায়েসী মতের মূল্য নেই। য়ুরোপীয় নাট্যকলাও আবার সম্প্রতি ভারতীয় ও চীন নাট্যকলার প্রভাবগ্রস্ত হয়ে একেবারে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কবিতা সম্বন্ধে একথাটি সহজেই সকলের মনে পড়্‌বে। ভারতচন্দ্রের সময়ে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কোন রসবোধ সম্ভব হ'ত কি? মাইকেলকে যতটা পরিহাস সহ্য কর্‌তে হয়েছে এদেশে আজকাল কেউ তা ধারণা কর্‌তে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের কথা'ই ধরা হোক্। গীতিকবিতার ঝঙ্কারে তিনি এযুগে বৈষ্ণব কবিদের জন্মভূমিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে' রেখেছেন—উপর্য্যুপরি নব নব রসসম্পাতে যে ভূমির সৌন্দর্য্যস্পৃহাকে চরিতার্থ করে' জগতের বরেণ্য হয়েছেন—সে গীতি-কবিতার কড়ি ও কোমল সুর যখন তিনি প্রথম উপস্থাপিত করলেন—সে 'সুর' কি প্রথম বিদ্রূপের বিষয় হয় নি? চিত্রকলাক্ষেত্রেও তিনি আর কিছু হোক্ না হোক্ একটা স্বাধীনতার বাণী উপস্থিত করেছেন যা এদেশের পক্ষে নূতন। এজন্যই তিনি আশা করা যায় এদেশে চিরস্মরণীয় হবেন। আর্ট যে শুধু অজান্তার অনুকরণ করা নয়, জাপানী আলো ও ছায়ার পিছনে ছোটা নয় বা চৈনিক ড্রাগনের পুচ্ছ অনুসরণ করা নয়—একথাটি, এদেশে প্রস্ফুটভাবে এ প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ঘোষণা করেছে।

এমন সময় ছিল যখন কবিতায় কেউ অমিত্রাক্ষর প্রথা গ্রহণ কর্‌তে সম্মত হয় নি। এ শ্রেণীর চিত্রকলা কতকটা অমিত্রাক্ষর প্রথারই ধারা গ্রহণ করেছে। সকল কারু-সৃষ্টির ভিতরই একটা ছন্দের ক্রীড়া চাই—সে ছন্দ এ শ্রেণীর কবিতা ও চিত্রে লক্ষ্য কর্‌তে না পার্‌লে রসভোগ সম্ভব হবে না। যে জিনিষটা প্রাচীনকে ভাঙে সে জিনিষের তাল বুঝ্‌তে হবে। গম্ভীরাঞ্জলির নিবিড় ছন্দরণন্ পশ্চিমকে সহজেই মুগ্ধ করেছিল—এজন্য এ শ্রেণীর চিত্রকলার রসভোগ কর্‌তেও য়ুরোপ কুণ্ঠিত হয় নি। নিগ্রো, মেক্সিক্যান্ ও পেরুভীয় কলা ইদানীং য়ুরোপকে এই নূতন ছন্দে দীক্ষিত করেছে। এ ছন্দের স্বাধীন কারুরা

প্রচলিত পথ অনুসরণ করেনা। য়ুরোপ এ ছন্দকে শিরোধার্য্য করেছে—এবং অনেক শিল্পীরা এই ধারায় একটা নব্যকলার সূত্রপাত করেছে। সৌন্দর্য্যের রচনায় জটিল ও সূক্ষ্ম অলঙ্করণের ইহা পক্ষপাতী নয়—সহজ ও বলিষ্ঠ রেখা প্রয়োগে কয়েকটা তুলিকাঘাতের সাহায্যে যে শ্রী প্রকট করা যায়—সহস্র সূক্ষ্মকারুতার চেষ্টাও তা' ঘটিয়ে তুল্‌তে পারে না। Matisse প্রভৃতি শিল্পীরা এজন্য এই শিল্পের আদিম আরণ্য উদ্দীপনার কাছে মাথা নত করেছে এবং নিগ্রো আর্টের আদর্শে একটা শক্তিমান্ সৃষ্টি সম্ভব করে' তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায়ও এরকম একটা প্রখর শক্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একটা দুর্নম্য দৃঢ়তার সঙ্গে কবি তাঁর সহজ স্বপ্ন জড়িত করেছেন। এজন্যই কোন জর্ম্মন আলোচক বল্‌ছেন :—"Tagore has a great and poetically skilled feeling for rhythm and a love for a certain inner monumentality that strange to say brings him quite near to a Northern like Nolde. An inclination to mystery connects the Indian with Nolde. With Rabindranath Tagore it dominates in a few pictures of wonderful tone-scales and gemcoloured light". অন্য এক সমালোচক বল্‌ছেন :—"We are overwhelmed by the newdness and originality of subject and of its expression. His pictures bring to the comprehension of all the world the strange magic of a far off world and he may become yet more a mediator and interpreter between Germany and India. They express the mysticism of the Orient as well as the clear form of occidental art, but they are perfectly independent, nowhere do we find imitation."

য়ুরোপের Expressionist art এ-ও এরকম ব্যঞ্জনা আছে বলে রবীন্দ্রনাথের কলাকে য়ুরোপ খুব মূল্যবান মনে করে। অথচ য়ুরোপ অনুভব করছে রবীন্দ্রনাথের অসীম কল্পনাশক্তি ও অধ্যাত্ম সম্পদ তাঁর চিত্রকলাকে এমন একটা দুর্লভ সম্পদ দান করেছে যা' অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না। এজন্য জর্ম্মন National Galleryতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার নমুনা রাখ্‌তে Mr. L. Thormachten উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু Gallery র আর্থিক অভাব দেখে' রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে Mr. Geheimrat Justiকে লিখেন :—

"I have great pleasure in offering the pictures which you have selected as a gift to the German Nation from which I have received such generous hospitality and for which I have such a profound and sure regard."

ভারতের কবি এমনিভাবে য়ুরোপের সঙ্গে এক নূতন সামাজিকতার সূত্রপাত করেছিলেন—চিত্রকলার ভিতর দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনা নেহাৎ আকস্মিক ব্যাপার নয়। পাঠকেরা জানেন তাঁর প্রাচীন হস্তলিখিত কবিতা হ'তে তিনি কোন লাইন বা শব্দ কেটে সে জিনিষটাকে অসংলগ্ন অবস্থায় রেখে দিতেন না। রেখার লীলায়িত প্রয়োগে একটা কোনরূপ-শ্রী না দিয়ে তিনি থাক্‌তে পারতেন না সেটা কষ্টকর হ'ত। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Cezanne এর একটা কথা মনে পড়ে। তিনি সৃষ্টির সবুজ বিধানের ভিতর, ডালপালার প্রাচুর্য্য বা মেঘলোকের পুঞ্জীভূত স্তর-সঞ্চয়ের ভিতর রেখার বিরুদ্ধ স্থিতি বা বিক্ষিপ্তি দুঃসহ মনে করতেন। তিনি তাই নিজের রচনায় রেখাপুঞ্জের ভিতর একটা ছন্দের সাম্য ও সুষমা সৃষ্টি করতেন এবং সেটাই শিল্পীর চরম কীর্ত্তি মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের ভিতর এই সহজ সংস্কার বহুকাল থেকে কাজ করে' রেখালালিত্য-সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাকে নিপুণ করে' তুলেছিল। কাজেই যখন তিনি ছবি আঁকতে সুরু করলেন তখন তিনি একটা নূতন ও অপরিচিত পথে যাচ্ছেন বলে' কখনও মনে করেন নি। এজন্য তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে ছবি আঁকতে মশ্‌গুল হয়ে আছেন।

একথা ভুল্‌লে চল্‌বে না তিনি কবি। তাঁর চিত্রগুলিকেও কবিতা হিসাবে দেখ্‌তে যাওয়া মন্দ নয়। নানা রসের ব্যঞ্জনা নানাভাবে এসব ছবিতে প্রস্ফুট দেখ্‌তে পাওয়া যায়—অথচ এসব কোন প্রচলিত ধারাকে স্বীকার করে চলে নি। এক একখানি চিত্র এক একটা কবিতার মত হয়েছে—

বর্ণের প্রয়োগ ও রেখার সংযোগে তাদের অপূর্ব্ব প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। Dante-এর স্বপ্নরাজ্যের মত এই চিত্রের আবেষ্টনের ভিতর ঘুরে ফিরে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।

সব জায়গায় সুলভ ও পেটেন্ট-করা তরল সৌন্দর্য্য আশা করলে দুনিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ কলাসৃষ্টিই ত্যাগ করতে হয়। চিত্রের ভিতর দেখতে হবে রেখা ও বর্ণের সুষমাত্মক ছন্দ—যেমন সঙ্গীতের ভিতর দেখতে হয় ধ্বনির ললিত রূপহিল্লোল। কালোয়াতী গান অনেকের দুঃসহ হয়ে পড়ে কারণ তা'তে ক্ষুদ্র তৃপ্তির অবকাশ নেই। অবশ্য একটা ধ্বনির gymnastics মাত্র যে এসব জায়গায় লক্ষ্য করতে হবে তা নয়। তেমনি প্রাচ্য চিত্রকলাতেও তিব্বতীয় জটিলতা বা চৈনিক হেঁয়ালী যে সব সময় আশা করতে হবে তা নয়। রসের পথ ও প্রণালী সীমাহীন।

এ যুগে একটা নব্য সামাজিকতা সৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে—যা'তে করে আধুনিক শিল্পীরা ভৌগোলিক সীমার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করতে উৎসাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার ভিতর সেই ছায়াসম্পাত দেখতে পাওয়া যায়। রসার্থীরা তাই পশ্চিম হ'তেও তাঁর চিত্র উপভোগ করতে পারছে। এযুগে সৌন্দর্য্যের মানমন্দিরে জগতের কারুসৃষ্টির একটা অন্তরঙ্গ বোঝাপড়া হয়েছে—তাই আজকে আমরা মিশরের মূর্ত্তিসঞ্চয় হ'তে আনন্দ লাভ করি—Ziggurat এর প্রগল্‌ভ বার্ত্তাতে আমরা আহত হইনে, পারস্য দেশের রসবার্ত্তা আমাদের হেঁয়ালী মনে হয়না। য়ুরোপ নানাভাবে এসিয়ার রসোৎসচয় হ'তে ভাবধারা গ্রহণ করে নিজকে পুষ্ট করতে ইতস্তত করছে না। পূর্ব্বাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রকলাও বিশ্বের এই নব্য সামাজিকতার ফল।

আমাদিগকেও ভাবের পরিধি বাড়াতে হবে। ক্ষুদ্র-গণ্ডীর ভিতর আনাগোনা করে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তা' অতিক্রম করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা এদেশের পক্ষে বিপ্লবাত্মক বার্ত্তা উপস্থিত করেছে। নূতন সৃষ্টির তাণ্ডব নানাভাবে তা'তে ছায়া নিক্ষেপ করেছে—চিত্রশিল্পীদের নিবিড়ভাবে তা' অধ্যয়ন করা উচিত। নটরাজের মত কবি নূতন ঝড় উপস্থিত করেছেন।

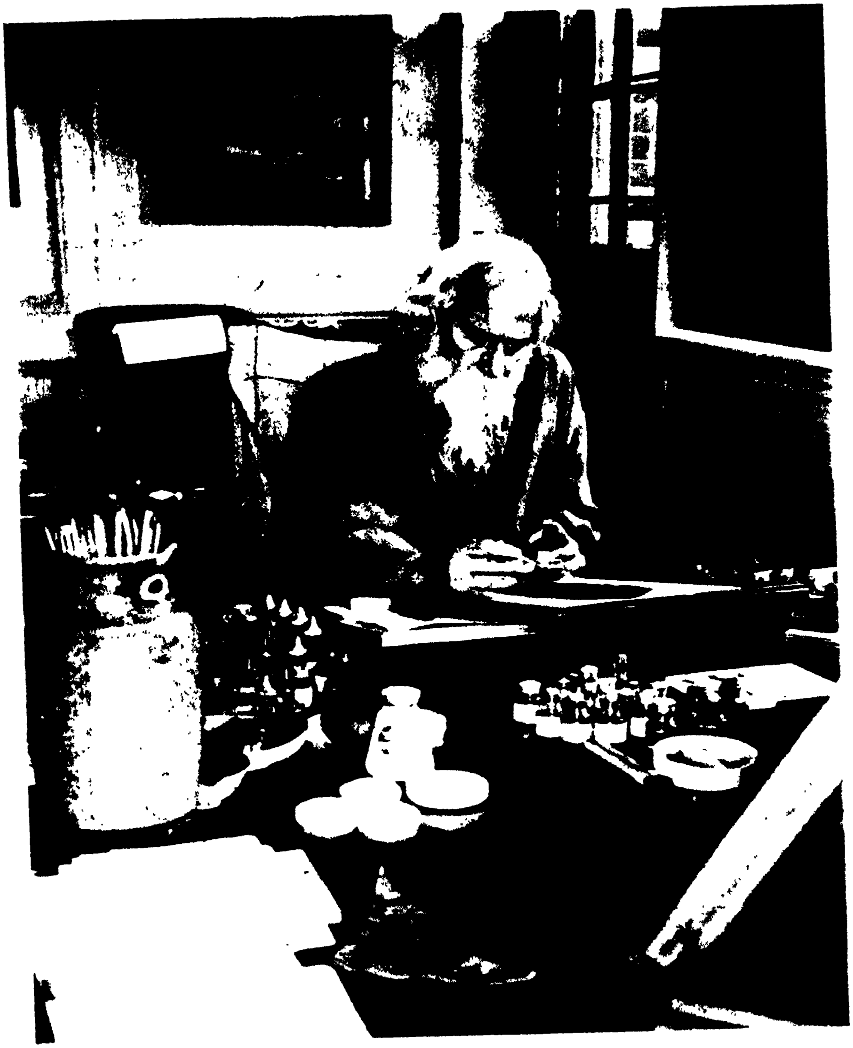
এই চিত্রসঞ্চয়গুলি প্রদক্ষিণ করবার সময় নানা কথা মনে আসে। মিশরের ছায়াচ্ছন্ন মৃত্যুঞ্জয়ী আড়ম্বর, নব্য য়ুরোপের গ্রীক্ গণ্ডী হ'তে নির্ম্মুক্ত রসলিপ্সার বিপ্লব, আফ্রিকার আদিম যুগের বলিষ্ঠ প্রেরণা, জাপানের তরল বর্ণলালিত্য ও এদেশের অধ্যাত্ম আবেশ—এসবের উদ্দীপনা সহজেই মনকে আবিষ্ট করে—অথচ কোন কৃত্রিম বন্ধন অনুসরণ এজন্য প্রয়োজন হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার texture যেমনি অতি অপূর্ব্ব ও নিপুণ ব্যাপার তেমনি চিত্রগুলিও তিনি রেখার তাঁতে যেভাবে বুনেছেন তা'ও লোভনীয় হয়েছে। বর্ণমিশ্রণ ও বিন্যাসের মরীচিকায় তিনি পশ্চিমে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। পারস্য গালিচা, আরব্য নক্সা, ও ভারতীয় কিংখাবের সূক্ষ্মছায়া তা'তে আছে। একথা ভুললে চলবেনা যে কবির প্রথাটি নূতন। কোন জর্ম্মন সমালোচক বলেন "They follow no tradition—and the technique is new" আর একজন সত্যই বলছেন This kind of art cannot be judged by formal characteristics"

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সায়াহ্নে সৃষ্টির এই নূতন আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। তিনি বলেন এতে তাঁর প্রচুর আত্মতৃপ্তি হয়েছে ও হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে তাঁর জীবনধারা অনুসরণ করতে গেলে আজ তাঁকে চিত্রকলার ভিতরই খুঁজতে হবে। তাঁর জীবন কল্পনা ও স্বপ্নের ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ; এ সমস্ত কল্পনা কুহেলিতে তাঁর চিত্রসম্পদও পরিপূর্ণ হয়ে আছে—একথা ভুললে চলবে না। এজন্য বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নানা দেশ কবির এই কলাভবনে প্রবেশ করে তাঁকে অভিনন্দন করতে উৎসাহিত হয়েছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

কবির ছবি



চিত্রাঙ্কননিরত রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে



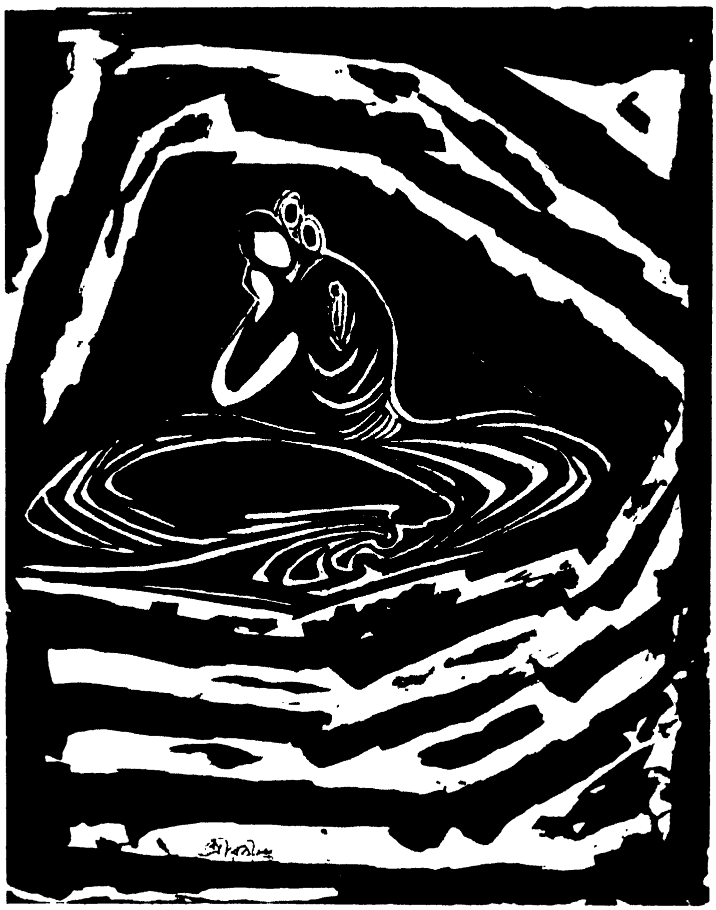
বিচিত্রা

চৈত্র

১৩৩৮



বিচিত্রা
চৈত্র
১৩৩৮



বিচিত্রা

চৈত্র
১৩৩৮



চৈত্র
১৩৩৮



চৈত্র
১·৩৩৮



চৈত্র
১৩৩৮

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২

ষ্টেসনে পদার্পণ মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল; পরেরটা আসিতে ঘণ্টা দুই দেরি,—সময় কাটাইবার পন্থা খুঁজিতেছি,—বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্ত্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত, না?

হাঁ।

আমায় চিন্‌তে পারলে না? আমি গহর—এই বলিয়া সে সবেগে হাত মলিয়া দিল, সশব্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, চল্ আমাদের বাড়ী। কোথা যাওয়া হচ্ছিল, কলকাতায়? আর যেতে হবে না—চল্।

সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বয়সে বছর চারেকের বড়, চিরকাল আধ্-পাগ্‌লা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহার জবরদস্তি পূর্ব্বেও এড়াইবার যো ছিল না, সুতরাং, আজ রাত্রের মতো সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বলা বাহুল্য তাহার উল্লাস ও আত্মীয়তার সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার মত শক্তি আমার নাই। কিন্তু সে নাছোড়বন্দা। আমার ব্যাগটা সে নিজেই তুলিয়া লইল, কুলি ডাকিয়া বিছানাটা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিল, জোর করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়া গাড়ী ভাড়া করিয়া আমাকে কহিল, ওঠ্। পরিত্রাণ নাই,—তর্ক করা বিফল।

বলিয়াছি গহর আমার পাঠশালার বন্ধু। আমাদের গ্রাম হইতে তাহাদের বাড়ী এক ক্রোশ দূরে, একই নদীর তীরে। বাল্যকালে তাহারই কাছে বন্দুক ছুড়িতে শিখি। তাহার বাবার একটা সেকেলে গাদা-বন্দুক ছিল সেই লইয়া নদীর ধারে, আম বাগানে, ঝোপে-ঝাড়ে দুজনে পাখী মারিয়া বেড়াইতাম, ছেলেবেলা কতদিন তাহাদের বাড়ীতে রাত কাটাইয়াছি,—তাহার মা মুড়ি গুড় দুধ কলা দিয়া আমার ফলারের জোগাড় করিয়া দিত। তাহাদের জমি-জমা চাষ-আবাদ অনেক ছিল। গাড়ীতে বসিয়া গহর প্রশ্ন করিল, এতদিন কোথায় ছিলি শ্রীকান্ত?

যেখানে-সেখানে ছিলাম একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কি করো গহর?

কিছুই না।

তোমার মা ভালো আছেন?

মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন,—বাড়ীতে আমি একলা আছি।

বিয়ে করোনি?

সেও মারা গেছে।

মনে মনে অনুমান করিলাম এইজন্যই যাহাকে হোক্ ধরিয়া লইয়া যাইতে তাহার এত আগ্রহ। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সেই গাদা-বন্দুকটা আছে?

গহর হাসিয়া কহিল, তোর মনে আছে দেখ্‌চি। সেটা আছে, আর একটা ভালো বন্দুক কিনেছিলাম, তুই শীকারে যেতে চাস্‌তো সঙ্গে যাবো, কিন্তু আমি আর পাখী মারিনে,—বড় দুঃখ লাগে।

সে কি গহর, তখন যে এই নিয়ে দিন রাত থাক্‌তে।

তা' সত্যি, কিন্তু এখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

গহরের আর একটা পরিচয় আছে,—সে কবি। তখনকার দিনে সে মুখে-মুখে অনর্গল ছড়া কাটিতে পারিত, যে-কোন সময়ে, যে-কোন বিষয়ে। অনেকটা পাঁচালীর ধরণে। ছন্দ, মাত্রা, ধ্বনি ইত্যাদি কাব্য-শাস্ত্র বিধি মানিয়া চলিত কি না সে জ্ঞান আমার তখনও ছিল না এখনও নাই, কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধ, টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী তাহার মুখে ছড়ায় শুনিয়া আমরা সেকালে পুনঃপুনঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। এ আমার মনে আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর, তোমার যে একদিন কৃত্তিবাসের চেয়ে ভালো রামায়ণ রচনার সখ ছিল সে সঙ্কল্প আছে না গেছে?

গেছে? গহর মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সে কি যাবার রে? ঐ নিয়েই তো বেঁচে আছি। যতদিন জীবন থাক্‌বে আমি ততদিন ঐ নিয়েই থাক্‌বো। কত লিখেচি, চল্‌না আজ তোকে সমস্ত রাত্রি শোনাবো। তবু ফুরোবে না।

বল কি গহর?

নয় তো কি তোরে মিথ্যে বল্‌চি?

প্রদীপ্ত কবি-প্রতিভায় তাহার চোখ-মুখ ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। সন্দেহ করি নাই, শুধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলাম মাত্র। তথাপি, পাছে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়, আমাকে ধরিয়া বসাইয়া সে সারা রাত্রি ব্যাপিয়া কাব্য-চর্চ্চা করে এই ভয়ে শঙ্কার সীমা রহিল না। প্রসন্ন করিতে বলিলাম, না গহর, তা' বলিনি, তোমার অদ্ভুত শক্তি আমরা সবাই স্বীকার করি, তবে, ছেলেবেলার কথা মনে আছে কি না তাই শুধু বল্‌ছিলাম। তা' বেশ বেশ,—এ একটা বাঙ্‌লা দেশের কীর্ত্তি হয়ে থাক্‌বে।

কীর্ত্তি? নিজের মুখে কি আর বোল্‌ব ভাই, আগে শোন, তার পরে হবে কথা।

কোন দিক দিয়াই নিস্তার নাই। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিলাম, সকাল থেকেই শরীরটা এমন বিশ্রী ঠেক্‌চে যে মনে হচ্চে একটু ঘুমোতে পেলে—

গহর কানও দিল না, বলিল, পুষ্পক রথে সীতা যেখানে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গয়না ফেলে দিচ্চেন সে জায়গাটা যারা যারা শুনেচে চোখের জল রাখ্‌তে পারেনি শ্রীকান্ত।

চোখের জল যে আমিই রাখিতে পারিব সে সম্ভাবনা কম, বলিলাম, কিন্তু—

গহর কহিল, আমাদের সেই বুড়ো নয়নচাঁদ চক্রবর্ত্তীকে তোর মনে আছে তো, তার জ্বালায় আমি আর পারিনে। যখন-তখন এসে বল্‌বে, গহর, সেইখান্‌টা একবার পড় দেখি শুনি। বলে, বাবা, তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস্,—তোর গায়ে আসল ব্রহ্ম রক্ত স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি।

'নয়নচাঁদ' নামটা খুব সচরাচর মিলে না তাই মনে পড়িল। বাড়ী গহরদের গ্রামেই, জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই চক্কোত্তি বুড়ো তো? যার সঙ্গে তোমার বাবার লাঠালাঠি মালি-মোকদ্দমা চল্‌ছিলো?

গহর বলিল, হাঁ, কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে কেন,—তার জমি, বাগান, পুকুর মায় বাস্তু সমেত বাবা দেনার দায়ে নিলেম করে নিয়েছিল, আমি কিন্তু তার পুকুর আর ভিটেটা ফিরিয়ে দিয়েছি—ভারি গরীব—দিনরাত চোখের জল ফেল্‌তো, সেকি আর ভালো শ্রীকান্ত?

ভালো ত নয়ই। এম্‌নি কিছু একটা আন্দাজ করিতেছিলাম, বলিলাম, এখন চোখের জল ফেলা থেমেচে তো?

গহর কহিল, লোকটি কিন্তু সত্যিই ভালোমানুষ। তোমার জ্বালায় এক সময়ে যা' করেছিল অমন অনেকেই করে। ওর বাড়ীর পাশেই বিঘে দেড়েকের একটা আম বাগান আছে তার প্রত্যেক গাছটি চক্কোত্তির নিজের হাতে পোঁতা। নাতী-নাৎনী অনেকগুলি, কিনে খাবার পয়সা নেই—তা' ছাড়া আমার কে-ই বা আছে, কে-ই বা খাবে।

সে ঠিক। ওটাও ফিরিয়ে দাওগে।

দেওয়াই উচিত শ্রীকান্ত। চোখের সাম্নে আম পাকে, ছেলে-পুলেগুলোর নিশ্বাস পড়ে,—আমার ভারি দুঃখ হয় ভাই। আমের সময় আমার বাগানগুলো তো সব ব্যাপারীদের জমা করেই দিই—ও বাগানটা আর বিক্রী করিনে, বলি চক্কোত্তি মশাই তোমার নাতীরা যেন পেড়ে খায়। কি বলিস্‌রে, ভালো না?

নিশ্চয়ই ভালো। মনে মনে বলিলাম, বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক্‌, তাহার কল্যাণে গরিব নয়নচাঁদ যদি যৎ-কিঞ্চিৎ গুছাইয়া লইতে পারে হানি কি? তা' ছাড়া গহর কবি। কবি-মানুষের অত বিষয়-সম্পত্তি কিসের জন্য যদি রসগ্রাহী রসিক সুহৃদদের ভোগেই না লাগে?

কত কোকিলের গান। এখন জ্যোছ্‌না রাত কিনা, তাই রাত্রিতেও কোকিলের ডাকাডাকি থামে না। বাইরের ঘরের দক্ষিণের জানালাটা যদি খুলে রাখিস্‌ তোর দু'চোখে আর পলক পড়বে না। এবার কিন্তু সহজে ছেড়ে দিচ্চিনে ভাই, তা' আগে থেকে বলে রাখ্‌চি। তা'ছাড়া খাবার ভাব্‌নাও নেই, চক্কোত্তি মশাই একবার খবর পেলে হয়, তোরে গুরুর আদর করবে।

তাহার আমন্ত্রণের অকপট আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলাম। কতকাল পরে দেখা, কিন্তু ঠিক সে দিনের সেই গহর,—এতটুকু বদ্‌লায় নাই—তেম্‌নি ছেলেমানুষ,—তেম্‌নি বন্ধু সম্মিলনে তাহার অকৃত্রিম উল্লাসের ঘটা।

চৈত্রের প্রায় মাঝামাঝি। গাড়ীর কবাটটা গহর অকস্মাৎ শেষ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে মাথা বাড়াইয়া বলিল, দক্ষিণে বাতাসটা টের পাচ্চিস্‌ শ্রীকান্ত?

পাচ্চি।

গহর কহিল, বসন্তকে ডাক্‌ দিয়ে কবি বলেছেন, "আজি দখিণ দুয়ার খোলা—"

কাঁচা মেঠো রাস্তা, এক ঝাপটা মলয়ানিল রাস্তার শুক্‌নো ধুলা আর রাস্তায় রাখিল না সমস্ত মাথায় মুখে মাখাইয়া দিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কবি বসন্তকে ডাকেন নি, তিনি বল্‌চেন এ সময়ে যমের দক্ষিণ দোর খোলা,—সুতরাং গাড়ীর দরজা বন্ধ না করলে হয়ত সে-ই এসে হাজির হবে।

গহর হাসিল, কহিল, গিয়ে একবার দেখবি চল। দুটো বাতাপি লেবুর গাছে ফুল ফুটেছে আধ ক্রোশ থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। সুমুখের জাম গাছটা মাধবী ফুলে ভরে গেছে, তার একটা ডালে মালতীর লতা, ফুল এখনো ফোটেনি, কিন্তু থোপা থোপা কুঁড়ি, আমাদের চারিদিকেই তো আমের বাগান, এবার মৌলে মৌলে গাছ ছেয়ে গেছে, কাল সকালে দেখিস্‌ মৌমাছির মেলা। কত দোয়েল, কত বুলবুলি আর

গহররা মুসলমান-ফকির সম্প্রদায়ের লোক। শুনিয়াছি তাহার পিতামহ বাউল, রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত, তাহার একটা পোষা শালিক-পাখীর অলৌকিক সঙ্গীত-পারদর্শিতার কাহিনী তখনকার দিনে এদিকে প্রসিদ্ধ ছিল। গহরের পিতা কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তেজারতি ও পাটের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ছেলের জন্য সম্পত্তি খরিদ করিয়া রাখিয়া গেছে, অথচ, ছেলে পাইল না বাপের বিষয়-বুদ্ধি,—পাইয়াছে ঠাকুর্দ্দাদার কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগ। সুতরাং, পিতার বহুশ্রমার্জ্জিত জমি-জমা চাষ-আবাদের শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে তাহা শঙ্কা ও সন্দেহের বিষয়।

সে যাই হোক, বাড়ীটা তাহাদের দেখিয়াছিলাম ছেলেবেলায়। ভালো মনে নাই। এখন হয়ত তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে কবির বাণী-সাধনার তপোবনে। আর একবার চোখে দেখিবার আগ্রহ জন্মিল।

তাহাদের গ্রামের পথ আমার পরিচিত, তাহার দুর্গমতার চেহারাও মনে পড়ে, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই জানা গেল শৈশবের সেই মনে-পড়ার সঙ্গে আজকের চোখে দেখার একেবারে কোন তুলনাই হয় না। বাদশাহী আমলের রাজ-বর্ত্ম,—অতিশয় সনাতন। ইট-পাথরের পরিকল্পনা

এ-দিকের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্ব্বে মুছিয়া গেছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ অভিযোগ বিফল,—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই,—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু 'পথ-কর' যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহুল্য।

সেই পথের বহুকাল সঞ্চিত স্তূপীকৃত ধুলা বালির বাধা ঠেলিয়া গাড়ী আমাদের কেবলমাত্র চাবুকের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল, এম্নি সময়ে গহর অকস্মাৎ উচ্চ-কোলাহলে ডাক দিয়া উঠিল, গাড়োয়ান, আর না আর না—থামো থামো,—একদম্ রোকো!

সে এমন করিয়া উঠিল যেন এ পঞ্জাব-মেলের ব্যাপার। সমস্ত ভ্যাকুয়াম-ব্রেক চক্ষের নিমিষে কষিতে না পারিলে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

গাড়ী থামিল। বাঁ-হাতি পথটা তাহাদের গ্রামে ঢুকিবার। নামিয়া পড়িয়া গহর কহিল, নেবে আয় শ্রীকান্ত। আমি ব্যাগটা নিচ্চি, তুই নে বিছানাটা,—চল্।

গাড়ী বুঝি আর যাবে না?

না। দেখ্‌চিস্‌নে পথ নেই।

তা' বটে। দক্ষিণে ও বামে শিয়াকুল ও বেতস-কুঞ্জের ঘন-সম্মিলিত শাখা-প্রশাখায় পল্লী-বীথিকা কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ। গাড়ী ঢোকার প্রশ্নই অবৈধ, মানুষেও একটু সাবধানে কাত হইয়া না ঢুকিলে কাঁটায় জামা-কাপড়ের অপঘাত অনিবার্য্য। অতএব কবির মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনবদ্য। সে ব্যাগটা কাঁধে করিল, আমি বিছানাটা বগলে চাপিয়া গোধূলি-বেলায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম।

কবি-গৃহে আসিয়া যখন পৌছানো গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুমান করিলাম আকাশে বসন্ত-রাত্রির চাঁদও উঠিয়াছে। তিথিটা ছিল বোধ করি পূর্ণিমার কাছাকাছি, অতএব আশা করিয়া রহিলাম গভীর নিশীথে চন্দ্রদেব মাথার উপরে আসিলে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইবে। গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেণু-বন, খুব সম্ভব তাহার কোকিল, দোয়েল ও বুলবুলির দল এর মধ্যেই থাকে এবং অহর্নিশি শিষ দিয়া, গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। পরিপক্ক অসংখ্য বেণুপত্র-রাশি ঝরিয়া ঝরিয়া উঠান আঙ্গিনা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, দৃষ্টি মাত্রই ঝরা পাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠে। চাকর আসিয়া বাহিরের ঘর খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, গহর তক্তপোষটা দেখাইয়া কহিল, তুই এই ঘরেই থাক্‌বি। দেখিস্ কি রকম হাওয়া।

অসম্ভব নয়। দেখিলাম, দখিণা-বায়ে রাজ্যের শুক্‌না লতা-পাতা গবাক্ষ পথে ভিতরে ঢুকিয়া ঘর ভরিয়াছে, তক্তপোষ ভরিয়াছে, মেঝেতে পা ফেলিতে গা ছম্ ছম্ করে। খাটের পায়ার কাছে ইঁদুরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া একরাশ মাটি তুলিয়াছে, দেখাইয়া বলিলাম, গহর এ ঘরে কি তোমরা ঢোকো না?

গহর বলিল, না, দরকারই হয় না। আমি ভেতরেই থাকি। কাল সব পরিষ্কার করিয়ে দেব।

তা' যেন দিলে, কিন্তু গর্ত্তটায় সাপ থাক্‌তে পারে ত?

চাকরটা বলিল, দুটো ছিল, আর নেই। এমন দিনে তারা থাকে না, হাওয়া খেতে বার হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে জান্‌লে মিঞা?

গহর হাসিয়া কহিল, ও মিঞা নয়, ও আমাদের নবীন। বাবার আমলের লোক। গরু-বাছুর, চাষ-বাস দেখে, বাড়ী আগলায়। আমাদের কোথায় কি আছে না আছে সব জানে।

নবীন হিন্দু বাঙালীও বটে, পৈতৃককালের লোকও বটে। এই পরিবারের গরু-বাছুর চাষ-বাস হইতে বাড়ী-ঘর-দোরের অনেক কিছু জানাও তাহার অসম্ভব নয়, তথাপি সাপের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ইহাদের বাড়ীশুদ্ধ সকলকে দখিণা হাওয়ায় পাইয়া বসিয়াছে। ভাবিলাম, হাওয়ার লোভে সর্প-যুগলের বহির্গমন আশ্চর্য্য নয় মানি, কিন্তু প্রত্যাগমন করিতেই বা কতক্ষণ?

গহর বুঝিল আমি বিশেষ ভরসা পাই নাই, কহিল, তুই তো থাক্‌বি খাটে, তোর ভয়টা কিসের? তাছাড়া ওঁরা থাকেন না আর কোথায়? কপালে লেখা থাক্‌লে রাজা পরীক্ষিৎও নিস্তার পান না,—আমরা তো তুচ্ছ। নবীন, ঘরটা ঝাঁটা দিয়ে থালের মুখে একটা ইট চাপা দিয়ে দিস্‌। ভুলিস্‌নে। কিন্তু কি খাবি বল্‌তো শ্রীকান্ত?

বলিলাম, যা জোটে।

নবীন কহিল, দুধ মুড়ি আর ভালো আকের গুড় আছে। আজকের মতো জোগাড়—

বলিলাম, খুব খুব, এ বাড়ীতে ও জিনিসের আমার অভ্যাস আছে। আর কিছু জোগাড়ের দরকার নেই বাবা, তুমি বরঞ্চ আস্তো দেখে একখানা ইট জোগাড় করে আনো। গর্ত্তটা একটু মজবুত ক'রে চাপা দাও,—দখিণে বাতাসে ভরপুর হয়ে ওঁরা যখন ঘরে ফিরবেন তখন হঠাৎ না ঢুকে পড়তে পারেন।

নবীন আলো দিয়া চৌকির তলায় কিছুক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া বলিল, নাঃ—হবে না।

কি হবে না হে?

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হবে না। থালের মুখ কি একটা বাবু? এক পাঁজা ইট চাই যে। ইঁদুরে মেঝেটা একেবারে ঝাঁঝরা করে রেখেচে।

গহর বিশেষ বিচলিত হইল না, শুধু লোক লাগাইয়া কাল নিশ্চয় ঠিক করিয়া ফেলিতে হুকুম করিয়া দিল।

নবীন হাত-পা ধুইবার জল দিয়া ফলারের আয়োজনে ভিতরে চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি খাবে গহর।

আমি? আমার এক বুড়ো মাসি আছেন তিনিই রান্না করেন। সে যাক্‌, খাওয়া-দাওয়া চুক্‌লে লেখাগুলো তোরে প'ড়ে শোনাবো। সে আপন কাব্যের অনুধ্যানেই মগ্ন ছিল, অতিথির সুখ-সুবিধার কথা হয়ত চিন্তাও করে নাই, কহিল, বিছানাটা পেতে ফেলি কি বল্‌? রাত্তিরে দুজনে এক সঙ্গেই থাক্‌বো,—কেমন?

এ আর এক বিপদ। বলিলাম, না ভাই গহর, তুমি তোমার ঘরে শোওগে, আজ আমি বড় ক্লান্ত, বই তোমার কাল সকালে শুন্‌বো।

কাল সকালে? তখন কি সময় হবে?

নিশ্চয় হবে।

গহর চুপ করিয়া একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, কিম্বা একটা কাজ করলে হয় না শ্রীকান্ত, আমি পড়ে যাই তুমি শুয়ে শুয়ে শোনো। ঘুমিয়ে পড়লেই আমি উঠে যাবো। কি বলো? এই বেশ মৎলব,—না?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম, না ভাই গহর, তাতে তোমার বইয়ের মর্য্যাদা নষ্ট হবে। কাল আমি সমস্ত মন দিয়ে শুন্‌বো।

গহর ক্ষুব্ধ-মুখে বিদায় লইল। কিন্তু বিদায় করিয়া নিজের মনটাও প্রসন্ন হইল না।

এই এক পাগল। ইতিপূর্ব্বে ইসারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়া ছিলাম তাহার কাব্যগ্রন্থ সে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে চায়। মনে আশা, সংসারে একটা নূতন সাড়া পড়িবে। সে লেখা-পড়া বেশি করে নাই, পাঠশালায় ও ইস্কুলে সামান্য একটু বাঙলা ও ইংরেজি শিখিয়াছিল মাত্র। মনও ছিল না, বোধ হয় সময়ও পায় নাই। কবে কোন্ শৈশবে সে কবিতা ভালো বাসিয়াছে, হয়ত এ মুগ্ধতা তাহার শিরার রক্তে প্রবহমান, তারপরে জগতের বাকি সব কিছুই তাহার চক্ষে অর্থহীন হইয়া গেছে। নিজের অনেক রচনাই তাহার মুখস্ত, গাড়ীতে বসিয়া গুণ গুণ করিয়া মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেও ছিল, শুনিয়া তখন মনে করিতে পারি নাই বাগ্দেবী তাঁহার স্বর্ণ-পদ্মের একটি পাপড়ি খসাইয়াও এই অক্ষম ভক্তটিকে কোনদিন পুরস্কার দিবেন। কিন্তু অক্লান্ত আরাধনার একাগ্র আত্ম-নিবেদনে এ বেচারার বিরাম নাই বিশ্রাম নাই। বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম বারো বৎসর পরে এই দেখা। এই দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া এ পার্থিব সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কথার পরে কথা গাঁথিয়া শ্লোকের পাহাড় জমা করিয়াছে, কিন্তু এ সব কোন্ কাজে লাগিবে? কাজেও

লাগে নাই জানি। গহর আজ আর নাই। তাহার দুষ্কর তপস্যার অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি, লোক-চক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন, গন্ধহীন কত ফুল ফুটিয়া আপনি শুকায়। বিশ্ব-বিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।

অতি প্রত্যুষেই ডাকাডাকি করিয়া গহর আমার ঘুম ভাঙাইয়া দিল। তখন হয়ত সবে সাতটা বাজিয়াছে কিম্বা বাজেও নাই। তাহার ইচ্ছা বসন্তদিনে বঙ্গের নিভৃত-পল্লীর অপরূপ শোভা-সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হই। তাহার ভাবটা এম্‌নি যেন আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি। তাহার আগ্রহ ক্ষ্যাপার মতো, অনুরোধ এড়াইবার যো নাই, অতএব হাত-মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। প্রাচীরের গায়ে কি-একটা গাছের অর্দ্ধেকটায় মাধবী ও অর্দ্ধেকটায় মালতী লতা। কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অত্যন্ত নির্জ্জীব চেহারা,—তথাপি, একটায় গোটা কয়েক ফুল ফুটিয়াছে অপরটায় সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে। তাহার ইচ্ছা গোটা কয়েক ফুল আমাকে উপহার দেয়, কিন্তু গাছে এত কাট-পিঁপড়া যে ছোঁবার যো নাই। সে এই বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল যে আর একটু বেলা হইলে আঁক্‌সি দিয়া অনায়াসে পাড়াইয়া দিতে পারিবে। আচ্ছা, চলো।

নবীন প্রাতঃক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ সুনির্ব্বাহের উদ্যোগ পর্ব্বে দম্ ভরিয়া তামাক টানিয়া প্রবল বেগে কাশিতেছিল, থুথু ফেলিয়া, ঢোক গিলিয়া অনেকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। বলিল, বনে-বাদড়ে মেলাই যাবেন না বলে দিচ্চি।

গহর বিরক্ত হইয়া উঠিল,—কেন রে

নবীন জবাব দিল, গোটা দুত্তিন শিয়াল ক্ষেপেছে,—গরু-মনিষ্যি একসাই কাম্‌ড়ে বেড়াচ্চে।

আমি সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলাম। কোথায় হে নবীন?

কোথায় সে কি দেখে রেখেচি? আছেই কোন্ ঠাঁই ঝোপে ঝাড়ে। যান্‌তো একটু চোখ রেখে চল্‌বেন।

তা'হলে কাজ নেই ভাই গহর।

বাঃ—রে। এই সময়টায় শিয়াল-কুকুর একটু ক্ষ্যাপেই,—তা'বলে লোকজন রাস্তায় চল্‌বেনা না কি? বেশ তো।

এ-ও দখিণা হাওয়ার ব্যাপার অতএব, প্রকৃতির শোভা দেখিতে সঙ্গে যাইতেই হইল। পথের দু'ধারেই আম বাগান। কাছে আসিতেই অগণিত ছোট ছোট পোকা চড়্-বড়্ পট্ পট্ শব্দে আম্র-মুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, শুক্‌না পাতায় আমের মধু ঝরিয়া চট্‌চটে আটার মত হইয়াছে, সেগুলা জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া বিরাজিত ঘেঁটু গাছের কুঞ্জ, মুকুলিত, বিকশিত পুষ্পসম্ভারে একান্ত নিবিড়,—মনে পড়িয়া গেল নবীনের সতর্ক বাণী। গহরের মতে কালটা ক্ষেপিবার উপযোগী। সুতরাং ঘেঁটু ফুলের শোভা সময় মত আর একদিন না হয় উপভোগ করা যাইবে, আজ গহর ও আমি অর্থাৎ নবীনের 'গরু-মনিষ্যি' একটু দ্রুতপদেই স্থানত্যাগ করিলাম।

বলিয়াছি আমাদেরই গ্রামের নদী ইহাদেরও গ্রামপ্রান্তে প্রবাহিত। বর্ষার পরিস্ফীত জলধারা বসন্ত সমাগমে একান্ত শীর্ণ, সেদিনের স্রোতশ্চালিত অপরিমেয় পানা ও শৈবাল আজ শুষ্ক তটভূমিতে পড়িয়া শিশির ও রৌদ্রে পচিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে নরক-কুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। পরপারে দূরে কয়েকটা শিমুল গাছে অজস্র রাঙা ফুল ফুটিয়া আছে চোখে পড়িল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা কবির কাছেও এখন যেন বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠেকিল। কহিল, চল্ ঘরে ফিরি।

তাই চলো।

আমি ভেবেছিলাম তোর এ সব ভালো লাগ্‌বে।

বলিলাম, লাগ্‌বে ভাই লাগ্‌বে। ভাল ভাল কথা দিয়ে এসব তুমি কবিতায় লিখো, পড়ে আমি খুশিই হবো।

তাই বোধহয় গাঁয়ের লোকে ফিরেও চায় না।

না। দেখে দেখে তাদের অরুচি ধরে গেছে। চোখের রুচি আর কানের রুচি এক নয় ভাই। যারা মনে করে কবির বর্ণনা চোখে দেখতে পেলে লোকে মোহিত হয়ে যায় তারা জানে না। দুনিয়ার সকল ব্যাপারই তাই। চোখে যা' সাধারণ ঘটনা, হয়ত বা সামান্য সাধারণ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন সৃষ্টি। তুমি যে দেখ্‌তে পাও সেও সত্যি, আমি যে দেখ্‌তে পেলাম না সেও সত্যি। এর জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না গহর।

তবুও ফিরিবার পথে সে কত-কি যে আমাকে দেখাইবার চেষ্টা করিল তাহার সংখ্যা নাই। পথের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি লতা-গুল্ম পর্য্যন্ত যেন তাহার চেনা। কি-একটা গাছের অনেকখানি ছাল কেহ বোধহয় ঔষধের প্রয়োজনে চাঁচিয়া লইয়া গেছে, তখনও আটা ঝরিতেছে, গহর হঠাৎ দেখিতে পাইয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার দুই চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিল,—অন্তরে সে যে কি বেদনাই বোধ করিল তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। চক্রবর্ত্তী যে তাঁহার সমুদয় হারানো-বিষয় ফিরিয়া পাইতেছিল সে কেবল কৌশল বিস্তার করিয়া নয়, তাহার হেতু ছিল গহরের নিজেরই স্বভাবের মধ্যে। ব্রাহ্মণের প্রতি অনেকখানি ক্রোধ আমার আপনিই পড়িয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল না, কারণ শোনা গেল তাঁহার গৃহে গুটি দুই নাতীর মায়ের 'অনুগ্রহ' দেখা দিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ওলাউঠা এখনো দেখা দেন নাই,—পচা-পুকুরের জল আর একটু শুকাইবার অপেক্ষায় আছেন।

সে যাই হোক্‌, বাড়ীতে ফিরিয়া গহর তাহার পুঁথি আনিয়া হাজির করিল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া ভয় পায় না সংসারে এমন কেহ যদি থাকেও তাহা অত্যন্ত বিরল। বলিল, না পড়া হলে কিন্তু ছাড়া পাবে না শ্রীকান্ত। সত্যি কোরে তোমাকে মত দিতে হবে।

এ আশঙ্কা ছিলই। স্পষ্ট করিয়া রাজি হইতে পারি এ সাহস ছিল না, তথাপি দিনের পর দিন করিয়া কবির বাটীতে কাব্য আলোচনায় এ-যাত্রায় আমার সাতদিন কাটিল। কাব্যের কথা থাক্‌, কিন্তু নিবিড় সাহচর্য্যে মানুষটির যে পরিচয় পাইলাম তাহা যেমন সুন্দর, তেম্‌নি বিস্ময়কর।

একদিন গহর বলিল, তোর কাজ কি শ্রীকান্ত বর্ম্মায় গিয়ে। আমাদের দুজনেরই আপনার বল্‌তে কেউ নেই, আয় না দু'ভায়ে এখানেই একসঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

হাসিয়া বলিলাম, আমি তো তোমার মতো কবি নই ভাই, গাছ-পালার ভাষাও বুঝিনে, তাদের সঙ্গে কথা কইতেও পারিনে, পারবো কেন এই বনের মধ্যে বাস করতে? দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠ্‌বো যে।

গহর গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, আমি কিন্তু সত্যিই ওদের ভাষা বুঝি, ওরা সত্যিই কথা কয়—তোরা পারিস্‌নে বিশ্বাস করতে?

বলিলাম, বিশ্বাস করা যে শক্ত এটা তুমিও তো বোঝো?

গহর সহজেই স্বীকার করিয়া লইল, কহিল, হাঁ, তাও বুঝি।

একদিন সকালে তাহার রামায়ণের অশোক-বনের অধ্যায়টা কিছুক্ষণ পড়ার পরে সে হঠাৎ বই মুড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা শ্রীকান্ত, তুই কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলি?

কাল অনেক রাত্রি জাগিয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত আমার এই শেষ চিঠিই লিখিয়াছিলাম। ঠাকুর্দার কথা, পুঁটুর কথা, তাহার দুর্ভাগ্যের বিবরণ সমস্তই তাহাতে ছিল। তাঁহাদেরকে কথা দিয়াছিলাম একজনের অনুমতি চাহিয়া

লইব,—সে ভিক্ষাও তাহাতে ছিল। পাঠানো হয় নাই, চিঠিটা তখনও আমার পকেটে পড়িয়া, গহরের প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিলাম, না।

গহর কহিল, যদি কখনো ভালোবাসিস্, যদি কখনো সেদিন আসে আমাকে জানাস্ শ্রীকান্ত।

জেনে তোমার কি হবে ?

কিছুই না। তখন শুধু তোদের মধ্যে গিয়ে দিন কতক কাটিয়ে আস্‌বো।

আচ্ছা।

আর যদি তখন টাকার দরকার হয় আমাকে খবর দিস্। বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে, সে আমার কাজে লাগ লোনা,—কিন্তু তোদের হয়ত কাজে লেগে যাবে।

তাহার বলার ধরণটা এম্‌নি যে শুনিলেও চোখে জল আসিয়া পড়িতে চায়। বলিলাম, আচ্ছা, তাও জানাবো। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করো সে প্রয়োজন যেন না হয়।

আমার যাবার দিনে গহর পুনরায় আমার ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া প্রস্তুত হইল। প্রয়োজন ছিল না, নবীন তো লজ্জায় প্রায় আধ-মরা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কানও দিল না। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া সে মেয়েমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমার মাথার দিব্বি রইলো শ্রীকান্ত চলে যাবার আগে আবার একদিন এসো,—যেন আর একবার দেখা হয়।

আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কথা দিলাম দেখা করিতে আবার আসিব।

কলকাতায় পৌছে কুশল সম্বাদ দেবে বলো ?

এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। যেন, কত দূরেই না চলিয়াছি।

কলিকাতার বাসায় গিয়া যখন পৌছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। চৌকাঠে পা দিয়াই যাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল সে আর কেহ নহে, স্বয়ং রতন।

এ কি রে, তুই যে ?

হাঁ, আমিই। কাল থেকে বসে আছি,—একখানা চিঠি আছে।

বুঝিলাম সেই প্রার্থনার উত্তর। কহিলাম, চিঠি ডাকে দিলেও তো আস্‌তো ?

রতন বলিল, সে ব্যবস্থা চাষা-ভুষো, মুটে-মজুর, গেরস্ত লোকদের জন্যে। মা'র চিঠি একটা লোক না খেয়ে, না ঘুমিয়ে পাঁচশো মাইল ছুটে হাতে ক'রে না আন্‌লে ক্ষোয়া যায়। জানেন তো সব, কেন মিছে জিজ্ঞেসা করচেন।

বুঝিলাম গাড়ীর ভিড়ে ও আহারাদির অব্যবস্থায় রতনের মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া আছে। হাসিয়া কহিলাম, ওপরে আয়। চিঠি পরে হবে, চল্ তোর খাবার জোগাড়টা আগে করে দিইগে।

রতন পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, চলুন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



শিল্পী শ্রীমতী রাণী দে

বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রায় আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত শ্রীমতী রাণী দে কৃত সাতখানি লিনো-কট্ চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করিলাম। বাংলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই তরুণী শিল্পীর তেমন পরিচয় হয় ত' আজ পর্য্যন্ত নাই কিন্তু আমরা সর্ব্বতোভাবে আশা করি তাঁহার রচিত চিত্রগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর একটি সপ্রশংস পরিচয় স্থাপিত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। সম্প্রতি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয় এই শিল্পীর রচিত পঁচিশখানি চিত্রের একটি মনোরম অ্যালবাম্ প্রকাশিত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক বিচিত্রা বিজ্ঞাপনীর মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সে বিষয়ে সমস্ত সংবাদ পাইবেন।

শ্রীমতী রাণী বাংলা দেশের একটি প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী-পরিবারের দুহিতা। বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয় ইঁহার অগ্রজ। গৃহে ভ্রাতার নিকট, এবং বিদ্যালয়ে বিশ্বভারতীর কলাভবনে শিক্ষা লাভ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। ১৯২৮ সাল হইতে ইনি ছবি আঁকিতেছেন এবং মাত্র বৎসর দুই উড্‌কট্ এবং লিনোকট্ আরম্ভ করিয়াছেন। এই নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় প্রতিভার বলে বাংলা দেশের শিল্পী-সমাজে ইনি একটি বিশিষ্ট পদ-মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিচিত্রা-চিত্রশালায় প্রকাশিত সাতখানি ছবি এবং অ্যালবামে প্রকাশিত অপর ছবিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রায় এবং প্রকৃতির বিচিত্র রঙ্গপটে যে অগণিত মূক কাহিনী বিরাজিত, রেখায় তাহার অনির্ব্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা এই নব-পরিচিতা শিল্পী অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীমতী রাণীর চিত্র-সাধনার সিদ্ধি এবং সাফল্য কামনা করি।

লিনোকট্ ছবি সম্বন্ধে অনেকের হয় ত' সম্পূর্ণ ধারণা নাই। লিনো-কট্ উড্‌কটেরই অনুরূপ ছবি প্রস্তুত করিবার একটি প্রণালী, কাঠের পরিবর্ত্তে লিনোনিয়ম নামক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। মসিনার তৈলের সহিত অন্যান্য উপকরণ মিশ্রিত করিয়া সেই পদার্থ ক্যানভাস অথবা অন্য জিনিষের উপর জমাইয়া লিনোনিয়ম প্রস্তুত করে। ইহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, এবং কাঠ হইতে ইহা অনেক নরম বস্তু। লিনোনিয়মের উপর শিল্পী তাঁহার কল্পিত চিত্রটি আঁকিয়া লন, তাহার পর বুলি নামক নরুণের মত অস্ত্রের সাহায্যে শুধু ছবির রেখাগুলি বাঁচাইয়া অনাবশ্যক অংশগুলি খুদিয়া (Engrave করিয়া) বাদ দেন। এইরূপে প্রস্তুত ছবির plateএর উপর কালো রং লাগাইয়া তাহার উপর একপ্রকার পাৎলা কাগজ ফেলিয়া অতি সন্তর্পণে হাতের চাপ দিয়া ছবি মুদ্রিত করিতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে লিনোকটে শুধু ছবি আঁকিবার ক্ষমতারই নয়, engraving এবং printingএর নৈপুণ্যের পরিচয়ও দিতে হয়। বলা বাহুল্য অ্যালবামে প্রকাশিত প্রত্যেকটি ছবির সমস্ত কাজ, drawing হইতে আরম্ভ করিয়া printing পর্য্যন্ত, শ্রীমতী রাণীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। শিল্পীরসিকগণের পক্ষে এমন একটি সংগ্রহ মূল্যবান এবং মনোরম হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্পাদক

বিচিত্রা-



গল্প-গুঞ্জন

চিত্রশালা

শ্রীমতী রাণী দে অঙ্কিত

লিনোকট্ চিত্রাবলী



মাঝ-দরিয়া



শিশু



জানালার ধারে



শরৎকাল



ভিজে চুল



জল-ভরণ

ধাক্কা

শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রয় আজ আশ্রিতাকে আশ্রয় করিয়াছে।

দুইবৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুমতি কম্পিত পদে দুরু দুরু বুকে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ সে সংসারের সর্ব্বত্র মূল বিস্তার করিয়াছে, প্রয়োজনের কল্যাণে এত মূল্য পাইয়াছে নিজের পরগাছা যার স্বপ্নই শুধু ত্যাগে।

আসিয়াছিল দুটি কাজের জন্য—ছেলে রাখা ও রুগ্না গৃহিণীর সেবা করা। আর এখন বাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষ আহার আরাম বিশ্রামের সমস্ত ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারই যেন জন্ম-জন্মান্তরের দায়িত্ব!

অলকার হইয়াছে পক্ষাঘাত। অর্দ্ধাঙ্গ অবশ।

দিবারাত্র বিছানায় শুইয়া থাকে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া, আকাশ পাতাল ভাবে, বিড় বিড় করিয়া নিজের অদৃষ্ট দেবতাকে শাপে আর প্রতিরাত্রে শ্রান্ত স্বামীর সঙ্গে কলহ করে।

বলে, 'তুমি? তুমি ছাইএর ডাক্তার, কচুর ডাক্তার। তুমি নির্ল্লজ্জ। স্ত্রী যার এক বছরের বেশী বিছানায় পড়ে, কোন লজ্জায় সে পরের চিকিৎসা করতে যায় গো!'

উপসংহারটা করুণ।

'একটিবার খোকাকে কোলে নিতে পারিনা, এমনি অদৃষ্ট!'—বলিয়া সছিদ্র হাপরের মত নিশ্বাস নিতে নিশ্বাস ফেলিতে সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া কাঁদে।

এদিকের ঘরখানা সুমতির। তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। খোকাকে বুকে ফেলিয়া গালে গাল রাখিয়া ঘুম পাড়ানোর কায়দাটা অবশ্য অলকার চোখে পড়ে নাই, ঘুমপাড়ানো ছড়াটাই শুধু কানে গিয়াছে। তাহাতেই এত!

আধ ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়া সুমতি ও ঘরে যায়।

'আপনার পাশে খোকাকে একটু শুইয়ে দেব দিদি?'

অলকার শরীর বলিতে শুধু হাড় আর চামড়া। কোটর-গত চোখে অনেকখানি জল জমিলে তবেই গড়াইয়া পড়িতে পারে। চোখ মুছিতে গিয়া তাহার সমস্ত মুখ চোখের জলে মাখা হইয়া যায়।

সে রাগিয়া বলে, 'আড়ি পেতে শোনা হ'ল বুঝি কথা? না হলনা! কচি খুকী কিনা আমি বুঝিনে কিছু। লজ্জা করেনা? বেহায়া!'

তাহার শীর্ণ দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। একটানা দুঃখ শ্রেয় জানিয়া সে যেন সংযম অভ্যাস করে, সুমতি প্রলোভনটা সামনে ধরিয়াছে বলিয়া তাই তার এত রাগ!

দক্ষিণের জানালার কাছে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অক্ষয় মোটা ডাক্তারি বই পড়ে। বারেকের জন্যও সে মুখ তুলিয়া তাকায় না। ঘরে যে বেদনার একটা স্থূল অভিনয় হইয়া গেল সে বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিবার মত অনুভূতিও তাহার যেন নাই।

তা অক্ষয় এমনি বটে।—নির্ব্বিকার, নিস্পৃহ। কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গৃহে শয্যাগত স্ত্রীর আনন্দহীন বৈচিত্র্যহীন বোঝা, বাহিরে কেবল রুগ্ন ও আহত মানুষের সাহচর্য্য এবং মরণের সঙ্গে অন্তহীন বোঝাপড়ার ক্ষুব্ধ স্তিমিত বিষাদ,—সবই যেন তাহার কাছে একান্ত তুচ্ছ। সুপ্রাপ্য বলিয়াই বেদনা যেন মূল্য হারাইয়াছে।

দিনটা এক প্রকার বাহিরে বাহিরেই কাটে।

সকাল সাতটায় ডিসপেন্সারীতে যায়, সেখান হইতে কলে। বাড়ী ফিরতে একটা বাজিয়া যায়। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার আগে সে সুমতিকে জিজ্ঞাসা করে,—'ও খেয়েছে?'

সুমতি বলে, 'হাঁ।'

'তুমি ?'

মুখের দিকে তাকায় না বলিয়া প্রশ্নটা নিছক ভদ্রতাসূচক মনে হয়।

'আপনি তো জানেন আমি শেষবেলায় হবিষ্য করি।'

'ও, ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ বেলায় হবিষ্য করার কি দরকার ? রাত্রে কিছু খাওনা বুঝি সুমতি।'

'খাই।'

'তবে ?'

বলিয়া জবাবের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া অক্ষয় উপরে উঠিয়া যায়।

জবাব যে সুমতি দিতে পারে না এমন নয়, ইচ্ছা করিয়াই দেয় না। রাত্রে সে অবশ্য কিছু জলযোগ করে কিন্তু রাত্রি এগারটার আগে নয়, তার আগে তাহার সময় হয় না। খাওয়ার সময় বিভাগ সম্বন্ধে অক্ষয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে তাহার লজ্জা করে, জবাব না দিবার ইহাই কারণ।

নাওয়া খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য দু'ঘণ্টার বেশী সময় অক্ষয় পায় না। বাহিরে রোগী ডাকাডাকি করে, টেলিফোনের যন্ত্রটা বার বার শব্দিত হইয়া ওঠে ; তিনটা না বাজিতেই সে আবার বাহির হইয়া যায়। ফেরে রাত্রি আটটা নটায়।

তখনো কিন্তু সে নিজেকে বিশ্রামের অবকাশ দেয় না। পড়ার ঘরে বসিয়া মোটা মোটা ডাক্তারি বই পড়িতে আরম্ভ করে। সুমতির মনে হয় শোবার ঘরে ঢুকিবার সময় পিছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছার কাছে তাহার শ্রান্তি হার মানিয়াছে।

এমন খারাপ কথা মনে হয় বলিয়া মনে মনে নিজের উপর সুমতি রাগ করে।

অলকা এদিকে নিত্যকার কলহ ও কান্নার জন্য থাকে ব্যাকুল হইয়া, বেচারীর জীবনে এখন ওইটুকুই বৈচিত্র্য ; অক্ষয় ফিরিয়াছে টের পাইলেই এমন কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দেয় যে ও ঘরে উঠিয়া না গিয়া অক্ষয়ের আর উপায় থাকে না।

অলকা বলে, 'ওঘরে এত কি মধু ? এঘরে বসে পড়।··· ছাখো গো, গালে আমার একটা ব্রণ উঠেছে। বড় ব্যথা।'

চটচটে ঘামে ভেজা অলকার গাল—কে যেন আঠা মাখাইয়া রাখিয়াছে। অক্ষয় আদর করিয়া তাহার গালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুই গালে একটি ব্রণও সে খুঁজিয়া পায় না, সস্নেহে বলে, 'ইস, বড্ড ঘেমেছ যে !'

জীবন্ত পত্নীর শবের মত শীতল ক্লেদাক্ত স্পর্শ আঙুল বাহিয়া উঠিয়া অক্ষয়ের মনে ধাক্কা দেয় কিনা কে জানে ! বোধহয় দেয় না। শব ঘাঁটা অক্ষয়ের বহুদিনের অভ্যাস।

ইহার পর খানিকক্ষণ অলকা চুপ করিয়া থাকে, তারপর প্রথমে ভালভাবেই কথা বলিতে আরম্ভ করে এবং তাহা নালিশ ও কান্নায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অক্ষয় এমনি নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িয়া যায় যে সে একটা কথাও শুনিতেছে না এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে।

অলকা সহসা ক্ষেপিয়া যায়।

'—বকে মরছি, শুনছ না যে ? কেনইবা শুনবে, আমি মরলেই যে তোমার হাড়ে বাতাস লাগে।'

অক্ষয় মুখ তুলিয়া নিদ্রাতুর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। বলে, 'আহা, অলক, এমন করে রাগ ক'রোনা, কিছু না জেনে শুনে। তোমার কথা শুনছি বৈকি, শুনছি।'

'ছাই শুনছ ! পড়া তোমার পালাবেনা গো, আমি কিন্তু পালাব। আমি চিতায় উঠি তারপরেই না হয় ওসব ছাই পাঁশ পোড়ো ? কদিন বাকী আর !'

অক্ষয় শান্তকণ্ঠে বলে 'দেখ দিকি তুমি কি সব বলছ ! এসব বই ছাইপাঁশ মোটেই নয় অলক, সব তোমার অসুখের বই। তোমায় সারিয়ে তুলতে হবে না ?'

'হবে ?'

অলকা যেন স্তম্ভিতা হইয়া যায়। উত্তেজনায় মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিয়া সে বলে, 'হবে ? আমাকে সারিয়ে তুলতে হবে ? এ তুমি কি বলছ গো ! রাত জেগে আমার অসুখের বিষয়ে তুমি বই পড় ! আমায় মাপ কর গো, মাপ কর।'

মাথাটা সে বেশীক্ষণ উঁচু করিয়া রাখিতে পারে না.পপ

করিয়া বালিশে পড়িয়া যায়। বিড় বিড় করিয়া কতবার সে যে 'মাপ কর, মাপ কর' বলে তাহার ঠিকানা নাই।

কিন্তু দেখা যায় তাহার এই কৃতজ্ঞতা অস্থায়ী। চোখের জল ভাল করিয়া শুখাইবার পূর্ব্বেই স্বামীর ভালবাসার এতবড় প্রমাণও তাহার নিকট মর্য্যাদা হারায়।

হতাশ কণ্ঠে সে বলে, 'ছাই! ছাই! তুমি আবার আমায় সারিয়ে দেবে। আমি কি আর বুঝতে পারি না, সব তোমার ছল! আমি বিরক্ত করি বলে আমায় এড়িয়ে চলার জন্য তুমি বই পড়!'

'আমার মরাই ভাল',—এই বলিয়া সাঁ সাঁ করিয়া কাঁদে।

ও ঘরে সুমতির মনে হয়, এতক্ষণে তাহার সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি আসিয়াছে। পৃথিবীর মত খারাপ গ্রহ সৌরজগতে যে আর নাই একথা টের পাইবার পর আর জাগিয়া থাকা চলে না। এবার ঘুমানো দরকার।

কিন্তু সুমতি ঘুমায় না। সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া খোলা বারান্দায় গিয়া দাঁড়ায়। দেখিতে পায়, নীচে অন্ধকার উঠানে নন্দর ঘরের জানালা দিয়া আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

সুমতির ইচ্ছা হয় ওই আলোয় কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ওই আলোর দিকে চাহিয়া না থাকিয়া ওই আলোয় দাঁড়াইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছাখে।

নন্দ—অক্ষয়ের কম্পাউণ্ডার। অক্ষয়ের কম্পাউণ্ডার আছে দু'জন। তিন বছর মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে নন্দর মানও বেশী, মাহিনাও বেশী।

সে অক্ষয়ের বাড়ীতেই থাকে ও খায়। কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ভোর পাঁচটায় উঠিয়া ডিসপেনসারীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ঘরের ভিতর তখন আলো অন্ধকারের মেশামেশি।

খাবার ও খাবার জল পৌঁছাইয়া দিতে ঘরে ঢুকিতে গিয়া সুমতির গা একটু ছম ছম করে। সকলের ঘুমের আড়ালে এই কর্ত্তব্য পালনে কেমন যেন গোপন অভিসারের আমেজ আছে, অনুভূতির মধ্যে সেটুকু ধরা পড়া কোন মতে নিবারণ করা যায় না।

নন্দর যত কাব্যও কি এই ভোরকে নিয়াই!

'কাল ঘুম আসতে একটা বেজে গিয়েছিল, সুমতি। তবু এত ভোরে উঠলাম। হয়ত আজ এখন দোকানে যাব না। তুমি চলে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ব।'—বলিয়া নন্দ হাসে।

সুমতি রাগ করিয়া বলে, 'আজ থেকে রাত্রেই আপনার ঘরে খাবার রেখে যাব। ভোরে ওঠার কষ্ট পেয়ে কাজ নেই।'

নন্দ তথাপি হাসে—'তাতে আমার ঘরের রাত অতিথি ইঁদুরগুলিরই উপকার হবে আর কিছু হবে না। আমি ক্ষুধার্ত্ত হয়েই দোকানে যাব।'

'তাতে আমার ক্ষতিটা কি?'

কথাটা বলিয়াই নিজের বোকামিতে সুমতির মন অনুশোচনায় ভরিয়া যায়, সবটুকু রাগ নিজের উপরে গিয়াই পড়ে। ফাজলামি করিবার এমন সুযোগ অবহেলা করিবে নন্দর কি সে উদারতা আছে? কথাটা বলা তাহার কোন মতেই উচিত হয় নাই।

নন্দর সত্যই উদারতা নাই, সকৌতুকে হাসিয়া সে জবাব দেয়, 'সত্যি কোন ক্ষতি নেই? তবু যদি শেষরাত্রে উঠলেও খাবার হাতে হাজির না হতে!'

'আমি রোজ এমনি সময় উঠি।'

'ওঠই তো! কে তা অস্বীকার করছে? কেন ওঠ তাই নিয়ে প্রশ্ন।'

কথায় নন্দর সঙ্গে পারিবার যো নাই। সুমতি মুখ গোঁজ করিয়া বাহির হইয়া আসে। দুপুরে নন্দ খাইতে আসিলে সামনে বসিয়া খাওয়ায় না। রাত্রে এক ফাঁকে ঘরে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসে। ইঁদুরের কথাটা সে ভোলে না। ঢাকনির উপর একটা দশসেরি শিল চাপাইয়া দেয়। রান্নাঘর হইতে শিলটা নন্দর ঘরে বহিয়া নিয়া যাইতে তাহার যে রীতিমত কষ্ট হয় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাকরকে বলিলে সে অবশ্য কাজটা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু চাকরকে সুমতি বলে না। নন্দর সঙ্গে তাহার কলহ হইয়াছে ইহার মধ্যে চাকরকে টানিতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

পরদিন সকালে খাবারের খবর নিতে গিয়া ভাখে অমন ভারি শিলটা সরাইয়া ঢাকনি উল্টাইয়া ঘরময় খাবার ছড়াইয়া রাতারাতি ইঁদুরে কল্পনাতীত অত্যাচার করিয়া গিয়াছে! ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া সুমতি হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। কি ছেলেমানুষ নন্দ! কি করিয়া রাগের জবাব দিতে হয় আজও তা শেখে নাই। ঘরময় মিনতি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—আমায় প্রশ্রয় দিও করুণাময়ী!

অথচ এ যেন খাপ খায় না, এ যেন অর্থহীন। সুমতির চোখে সহসা জল আসিয়া পড়ে। ঘরের কোণে ওই রঙচটা তোরঙ্গ, দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো আধ ময়লা একটা পাঞ্জাবী, তক্তপোষে পুরাণো তোষকের বিছানা আর বালিশের পাশে ওই এক তাড়া মনিঅর্ডারের রসিদ— ছড়ানো খাবারগুলির সঙ্গে এই সবের সামঞ্জস্য নাই যে একেবারেই। সুমতির মনে হয় বজ্রের মত কঠোর ফুলের মত কোমল এই লোকটি যে তাহার জীবনে পদার্পণ করিয়াছে তার মধ্যে প্রচুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা লুকানো আছে। ইহাকে তাহার ভয় করিয়া চলা উচিত। এ একদিন তাহাকে বিপন্ন করিবে।

নন্দর প্রকৃতির গভীর দিকটার সঙ্গে সুমতির পরিচয় বেশী দিনের নয়।

এক সপ্তাহও হয় নাই একদিন ভোরবেলা খাবারের বাটি ও জলের গ্লাসটা টেবিলের উপর ঠক্ করিয়া নামাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফস করিয়া সুইচ্ টিপিয়া নন্দ আলো জালিল।

সুমতি চমকাইয়া বলিল 'ইস্! এ আবার কি?'

'একটা কথা আছে সুমতি। আলো না জাললে তো তুমি দাঁড়াবে না। অথচ একটা ভয়ানক দরকারী কথা তোমাকে এখন না বললেই নয়।'

এ ভূমিকা সুমতি চিনিত। নন্দর বক্তব্য অনুমান করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে বলিল 'পাঁচটা টাকা চাই, এই ত কথা?'

নন্দ অবাক হইয়া বলিল, 'কি করে জানলে?'

যেন জানাটা সুমতির পক্ষে আশ্চর্য্য ব্যাপার। নন্দর যে দু'টার বেশী জামা নাই, ক্রমাগত তালি লাগাইয়া এক জোড়া জুতাই সে যে আজ একবৎসর ব্যবহার করিতেছে, মাসের দশ দিন না কাটিতে জলখাবারের কটা পয়সাও যে তাহার হাতে থাকে না, এসব যেন সুমতির অজানা।

'যেমন করেই জানি, টাকা চাই কিনা বলুন।'

'চাই।'

'দিচ্ছি এনে। কিন্তু মাইনের টাকাগুলো কি করলেন?'

নন্দর চোখ দুটি সহসা স্তিমিত হইয়া গেল।—'জুয়া খেলেছি।'

'ষাট টাকা জুয়া খেললেন?'

'না, পঞ্চাশ। দশ টাকা একজন ধার নিয়েছে।'

সুমতি গম্ভীর হইয়া বলিল 'শেষটা সত্যি হতে পারে, প্রথমটা খাঁটি মিথ্যা।'

'মিথ্যা নয়। রূপক।'

'রূপক না ছাই!' বলিয়া সুমতি বালিশের তলা হইতে মনিঅর্ডারের রসিদের তাড়াটা টানিয়া বাহির করিল। বলিল 'কেদার মুখুয্যেকে আপনি প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠান। মুখুয্যেটি কে?'

নন্দ সংক্ষেপে জবাব দিল 'ভগ্নীপতি।'

'আমিও ওই রকম একটা কিছু অনুমান করছিলাম। কিন্তু এতো ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার। সীতা থাকে আপনার কাকার কাছে মাসে মাসে মাইনের সব টাকাগুলি আপনি পাঠিয়ে দেন ভগ্নীপতিকে। পণে'র টাকা শোধ হচ্ছে নাকি? শোধ না হলে সীতা স্বামীর ঘর করতে পাবে না?'

'না। সীতাকে যে স্বামীর ঘর করতে হয় না ও তার দাম সুমতি।'

ইহার পর নন্দ সব কথা খোলসা করিয়াই বলিয়াছিল। কেদার মুখুয্যে ছিল নন্দর পিতৃবন্ধু—নেশার বন্ধু;—মদের। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর নন্দর বাবার মাথাটাও বোধ হয় একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আর কোন যোগাযোগ ঘটিয়াছিল কিনা এখন আর জানিবার উপায় নাই, জানিয়া লাভও নাই। কেদারের সঙ্গে হঠাৎ একদিন সীতার বিবাহ হইয়া গেল।

নন্দ কিছুই জানিত না। যে রাত্রে সীতার বিবাহ হয় কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে সে মহানন্দে থিয়েটার দেখিতেছে।

'জানো সুমতি, ওদিকে সীতাহরণ হচ্ছে, আর আমি দেখছি থিয়েটার। থিয়েটার!—শিশির ভাদুড়ীর সীতা প্লে দেখছি।'

কাহিনী শুনিয়া সুমতি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া ছিল। শেষে আস্তে আস্তে একটা অতি ছেলেমানুষী প্রশ্ন করিয়াছিল, 'সীতাকে আপনি খুব ভালবাসেন, না ?

নন্দ সহজ ভাবেই ইহার জবাব দিয়াছিল, বলিয়াছিল 'বাসি। কিন্তু ভালবাসা না বাসার কথা নয়, একটিমাত্র বোনের অমন অবস্থা হলে কোন ভাই তা সইতে পারে না। সিঁথীর লাল ঘায়ের যন্ত্রণায় সীতার ছটফটানি তুমি যদি দেখতে সুমতি!'

সিঁথীর লাল ঘা! কি বর্ণনা! সুমতি আর কথা কহিতে পারে নাই। অথচ তাহার অনেক বক্তব্যই ছিল। স্বামী বৃদ্ধ হোক মাতাল হোক হিন্দু মেয়ের স্বামীর ঘর না করিয়া কেমন করিয়া চলে নন্দকে একথা সে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল। বৃদ্ধ মাতাল স্বামীও যে স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিতে পারে, অন্ততঃ বিবাহের পর কয়েকটা বছর; মাতাল স্বামীর ছেলেমেয়ে নিয়াও যে একটি নারী জীবন এক দিক দিয়া সার্থক হইতে পারে এই ধরণের কয়েকটা কথা নন্দকে বলিবার ইচ্ছাও সুমতির ছিল। বোনের ছোট খাট দুর্ভাগ্যকে ঠেকাইয়া রাখিতে নিজের জীবনটা সব দিক দিয়া নষ্ট করা যে বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয় আভাষে ইঙ্গিতে নন্দকে ইহাও জানাইয়া দিবে কিনা মনে মনে সুমতি নাড়া চাড়া করিয়া দেখিতেছিল।

কিন্তু সীতার সীঁথির বর্ণনা শুনিয়া কিছু বলিতে তাহার ভরসা হয় নাই। নিজের সীঁথি তাহার বড় বেশী সাদা হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালেই সুমিত্রা খাবার দিয়া আসে।

নন্দ সঙ্গে সঙ্গে অভদ্র রকমের খুসী হইয়া ওঠে। হাসিয়া বলে 'আঃ, খাবারে আজ ক্ষমার অমৃত। দোকানে গিয়ে খানিকটা সায়ানাইড্ খেয়ে দেখব মরি কিনা।'

'খাবেন না, মরবেন। এ ক্ষমা নয়। দয়া।'

নন্দর মুখে মেঘ ঘনাইয়া আসে—'দয়া ?'

'তবে কি ভাবেন আপনি ?'

দু'জনের উদ্ধত দৃষ্টি নীরবে খানিকক্ষণ কলহ করে। সহসা বাটিটা তুলিয়া নিয়া নন্দ মেঝের উপর আছড়াইয়া ফ্যালে। আঙুল বাড়াইয়া খোলা দরজাটা দেখাইয়া চাপা গলায় বলে 'যাও। দয়াবতী, দয়া করে যাও।'

ক্ষমা চায় দুপুরে খাইতে আসিয়া। অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল করিয়াই আসে।

হাত জোড় করিয়াই হাসিয়া ফ্যালে। বলে, 'ক্ষমা সুমতি।'

সুমতি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলে 'যান আপনি এখান থেকে, যান।'

ইহাতে নন্দর ক্ষমা চাহিবার সুবিধাই হয়। কারণ সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া সে আর হাসিতে পারে না। তাহার চোখ দুটি ছল ছল করিতে থাকে।

বলে 'এবারকার মত ক্ষমা করে ফেল সুমতি, সত্যি বলছি আর কোনদিন তোমাকে ঠাট্টা করব না।'

ঠাট্টা! সুমতি গম্ভীর মুখে বলে 'আচ্ছা।'

'আর রাগ নেই ত ?'

'না।'

খুসী হইয়া শিস্ দিতে দিতে নন্দ চলিয়া যায়। কি অপরাধে সুমতির কাছে হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল, বাকী দিনটুকুর মধ্যেই সে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

রাত্রে সে যখন ফেরে অক্ষয় হয়ত খাইতে বসিয়াছে, অদূরে বসিয়া সুমতি তাহার আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছে; খাইতে বসিয়া অক্ষয় কথা বলেনা, কখন কি প্রয়োজন খেয়াল রাখিয়া চাহিয়া নিতে পারেনা, সুতরাং তাহার খাওয়ার উপর সুমতিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হয়। উঁকি দিয়া দেখিয়া নন্দ নিজের ঘরে চলিয়া যায়। আহারান্তে আঁচাইয়া অক্ষয় উপরে চলিয়া না গেলে সে খাইতে আসেনা।

আসনে বসিয়া বলে 'ওর সঙ্গে কেন খেত বসিনা জান ?'

নন্দর ছলো ছলো চোখদুটির কথা সুমতির মনে ছিল, সে সদয়ভাবে হাসিয়া বলে 'জানি বৈকি। যতই হোক উনি মনিব তো।'

'ও ভারি মনিব! আর তিনটা বছর পড়লে আমি ওর চেয়ে বড় ডাক্তার হ'তাম এ্যাদ্দিনে, তা জান? বলতে পারলে না।'

সুমতি একটু ভাবিবার ভাণ করিয়া বলে 'তবে ওঁকে দেখতে পারেন না বলে বোধ হয়।'

নন্দ হাসিয়া বলে 'তাও নয়। ভাগের পুজায় আমার রুচি হয়না বলে।'

'ভাগের পূজা! পূজা!' সুমতির যেন চমক ভাঙ্গে। এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ তাহার রাগে লাল হইয়া উঠে।

এমনিভাবে দিন কাটে। মনের জোরে যে দূরত্ব সুমতি বজায় রাখিতে পারেনা, বিষাদ ও বেদনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহার সৃষ্টি হয়। নিজের দুর্ব্বলতার অপরাধটা ধীরে ধীরে নন্দর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাহার উপর একটু বিতৃষ্ণাও সে বোধ করে। নন্দর পরিহাসে আর সে রাগ করেনা, নীরবে উপেক্ষা করিয়া যায়, পরিহাসস্পৃহাও নন্দর সুতরাং আপনা হইতেই কমিয়া আসে।

'জেনে শুনে যত দোষ করেছি সব তুমি ক্ষমা করেছ সুমতি। না জেনে এমন কি দোষ করলাম—'

সুমতি কিছুমাত্র মমতা বোধ করে না। ইহাকে আবার ভাব জমাইবার হীন প্রচেষ্টা মনে করিয়া তাহার গা জলিয়া যায়, রুক্ষ স্বরে সে বলে 'আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি?'

নন্দর মন সরল, সে তথাপি হাল্কা সুরে বলে 'আমার শত্রুর অসুবিধা হচ্ছে। তবে খাওয়ার সময় তুমি উপস্থিত থাকনা বলে অসুবিধাই বল দুঃখই বল একটু হচ্ছে।'

'আমার সময় হয় না।'

শেষ পর্য্যন্ত নন্দ রাগিয়া উঠে, বিশ্রী কথা বলে:

'ভালই, ভালই। আমি শুধু কম্পাউণ্ডার যে!'

ইহার একটা কড়া জবাব নন্দ প্রত্যাশা করে কিন্তু সুমতি নীরবে আপনার কাজ করিয়া যায়, সে রাগ করিয়াছে কিনা তাহা পর্য্যন্ত নন্দ অনুমান করিতে পারেনা।

ইহার পর সেও সাবধান হইয়া যায়, হাসি খুসী কম করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকে। সুমতিকে জানাইয়া দেয়— 'তোমার জন্য নয়, সীতার অসুখ করেছে।'

সুমতি বুঝিয়াও না বোঝার ভাণ করিয়া বলে 'কিসের? কি বলছেন?'

'আমি যে আজকাল গম্ভীর হয়ে থাকি তার কথা বলছি। তোমার জন্য নয়।'

সুমতি ভাবে, বাঁচিয়া গেলাম। ভাবে, ভগবানের অনেক দয়া তাই মনের গায়েও একটা কালির আঁচড় পড়া নিবারণ করা গেল।

আহ্নিকে বসিয়া সে যেন আবার ভুলিয়া যাওয়া স্বামীকে স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারে। জীবন যেন জীবনের সীমা ছাড়াইয়া আলো ও আনন্দ ভরা একটি অভিনব স্বর্গে উঠিয়া যায়।

নন্দ নিজের ঘরে বসিয়া রাত জাগিয়া মণি অর্ডারের রসিদ গোণে আর সীতাকে চিঠি লেখে। লেখে—

'আর ভাবনা নেই দিদি, শীগগিরই একটা বাড়ী ভাড়া করে তোকে আনাচ্ছি। ঘর সংসারের সব কাজ কিন্তু তোকে করতে হবে। তোর দাদা—গরীব মানুষ, ঝি চাকর রাখতে পারবে না। বুঝলি? তবে তুই যদি খুব জোর বায়না নিস্, উঠতে বসতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার 'বৌদি চাই' 'বৌদি চাই' আব্দার করিস তাহলে দেখে শুনে খুব খাটতে পারে এমন একটা বৌদি তোকে এনে দিতে রাজী আছি।

আচ্ছা, তোর বৌদি যদি ধর বিধবাই হয়—'

অর্থাৎ নন্দ লিখিতে চায় যে সে যদি একটি বিধবা মেয়েকে বিবাহ করে, তাহাকে বৌদি হিসাবে পাওয়া বিষয়ে সীতার মতামত কি, বাক্য যোজনার দোষে জিজ্ঞাসাটা নিজের মৃত্যু বিষয়ক হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে আর লেখেনা; অল্প একটু হাসিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

অবশেষে একদিন অলকা মরিয়া গেল। রাত্রি তখন ন'টা।

মরণকে যে কোন সংসারে এমন বিনা আড়ম্বরে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে সুমতির সে অভিজ্ঞতা ছিলনা। শোকের কলরব নাই, বেদনার বাহুল্য নাই, ঘরের

আবহাওয়াটা শুধু অতিমাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মনে হয় এ বাড়ীর কর্ত্রী যেন আজ মহাপ্রস্থান করে নাই, সুদীর্ঘ কালের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র। ঘুম ভাঙ্গিবার ভয়েই সকলের এই নীরবতা, অন্য কোন কারণে নয়।

বার কয়েক উঃ আঃ করিয়া দাসদাসী শোকপ্রকাশের অন্ত করিয়াছে। অক্ষয় গম্ভীর মুখে তাহার আরাম কেদারার দুই বাহুতে কনুই ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে। কয়েকবার অশ্রু মার্জ্জনা করিতে সুমতির নিজের চোখের জলও গিয়াছে ফুরাইয়া। নন্দ কোথায় যেন গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

খাটের উপর চাদর ঢাকা অলকার মৃতদেহ।

নীচে ঝির কাছে খোকা কাঁদিতেছিল, সুমতির মনে হইতেছিল, খোকার কান্নার শব্দটুকু শুধু ভিতরে নিয়া সে কানে ছিপি আঁটিয়া দিয়াছে, ঘরের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কেহ যদি মড়া কান্নাও কাঁদিয়া ওঠে সে শুনিতে পাইবে না।

কিন্তু মড়া কান্না কাঁদিবে কে? সে? সে আর সবই পারে, নিজের কান্নায় শব্দ যোজনা করিতে পারেনা। নন্দর কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। মুখখানা তাহার আজ একটু অতিরিক্ত শুকনো মনে হইতেছে বটে, কিন্তু সুমতি শপথ করিয়া বলিতে পারে তাহার কারণ অলকার উপস্থিত মরণ নয়, অনুপস্থিত আঘাত অথবা দুশ্চিন্তা।

ঘরে ঢুকিবার পর ঠিক কতক্ষণ সময় নন্দ সীতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল জানিবার জন্য সহসা সুমতির মন কেমন করিয়া উঠিল।

মানুষের মরণ বাঁচন যাহার ব্যবসা, ঔষধ ও আশ্বাস নিয়া যাহার দোকানকারী কান্না তাহার একেবারেই সাজেনা। তবু অক্ষয়ের আরামকেদারার সন্নিকটে একটি তেপায়ার উপর রক্ষিত মোটামোটা বইগুলির দিকে চাহিয়া সুমতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বইগুলির নৈকট্য সম্বন্ধে অক্ষয় যে কি করিয়া এমন উদাসীন হইয়া আছে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই সুমতির বার বার মনে পড়িতে লাগিল। অক্ষয় যে বইগুলি দেখিতে পায় নাই সুমতি কোনমতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

অক্ষয় সুমতির দৃষ্টিকে অনুসরণ করিতেছিল। হঠাৎ সে বলিল 'খোকা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে, সুমতি। ওকে নিয়ে এসো।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। খোকাকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া অবাক হইয়া দেখিল তেপায়ার উপর হইতে বইগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে।

নন্দর কাছে সরিয়া গিয়া সুমতি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখান থেকে বই সরালে কে?'

নন্দ বলিল 'আমি। ডাক্তারবাবু ওঘরে রেখে আসতে বললেন।'

সুমতির মুখ পাংশু হইয়া গেল।

'ভয় করছে নাকি সুমতি?'

'ভয়? কিসের ভয়?'—বলিয়া সুমতি সরিয়া গেল। ভয়! অলকার মরণে তাহার ভয়! মৃত্যুর সঙ্গে এ যেন তাহার প্রথম পরিচয়! সর্ব্বাঙ্গে সে যে একজনের মরণের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে নন্দ কি তাহা দেখিতে পায় না?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, না বুঝিয়া সেই অনেকক্ষণ মার মরণের মান রাখিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। অক্ষয় বলিল 'খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে সুমতি ওকে শুইয়ে দিয়ে এসো।'

খোকার উপর আজ যেন তাহার দরদের সীমা নাই।

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিয়া সুমতি দেখিল এবার স্বয়ং নন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে।

'নন্দ লোক ডাকতে গিয়েছে সুমতি।'

সুমতি প্রশ্ন করে নাই, আপনা হইতে বলিল বলিয়া অক্ষয়ের কথাটা একটু যেন কৈফিয়তের মতই শোনাইল।

সুমতি বলিল 'ও।'

'ওকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলতে চাই সুমতি।'

অলকার শবকে শোনাইয়া তাহাকে অক্ষয়ের কি বলিবার থাকিতে পারে সুমতি ভাবিয়া পাইল না। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিল 'কি কথা?'

অক্ষয়ের স্বর অচঞ্চল, মুখের ভাব নির্ব্বিকার। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সে যেন সাক্ষ্য দিতেছে।

'ও যে বাঁচবে না, প্রথম থেকেই আমি তা জানতাম সুমতি।'

'জানতেন! না না, জানতেন না।'

'কিন্তু ওকে বাঁচাবার চেষ্টা যে আমি প্রাণপণেই করেছি, তুমি তার সাক্ষী।'

অক্ষয় এতক্ষণ সোজা হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার আরাম কেদারায় ঠেস দিল।

যত নিঃশব্দেই চুকিয়া গিয়া থাক অলকার মরণ যে তুচ্ছ হইয়া নাই বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না।

সেদিন রাত্রে মুমূর্ষুর ঘরের আবহাওয়ায় যে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দেখা গিয়াছিল সমস্ত বাড়ীতে তাহা যেন ব্যাপ্তি নিয়াছে।

অক্ষয় বাহিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। রোগী অন্য ডাক্তার সংগ্রহ করে, অক্ষয় নিজের ঘরে খোকাকে নিয়া দিন কাটায়। ইজি চেয়ারটা সে এ ঘরে আনাইয়া নিয়াছে। বলে, 'আলস্য নয় সুমতি, এ আমার বিশ্রাম। আর কিছুদিন ওভাবে চললে মারা পড়তাম।'

সুমতি কিছুই বলে না। নীরবে খোকাকে দুধ খাওয়ায়।

এঘরে অলকার স্মৃতির আমেজটুকুও নাই। কবে যে সে এ ঘরে আসিত, আলমারি খুলিয়া গুছানো জামা কাপড়-গুলি মেঝেতে নামাইয়া আবার গুছাইয়া তুলিত, বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধা শেষ হইলে হাই তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিত, অক্ষয়ের বিশ্বাস সে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে।

সুমতি কেন যে ঘরের সর্ব্বত্র অলকার অবলুপ্ত স্মৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে অক্ষয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

বাহিরে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘরের বাতাস ভিজিয়া ভারি, আলো ম্লান। খোকাকে নিতে গিয়া কেমন করিয়া সুমতির হাতশুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চাপিয়া ধরিয়াছিল অক্ষয় জানে না। ইচ্ছা করিয়া যে নয় সুমতি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই অক্ষয়ের অনুমান। তথাপি কয়েক মিনিট পরেই আলমারির উপরের তাকে লুকানো একতাড়া চিঠি সে খুঁজিয়া পাইল।

অলকাকে লেখা অক্ষয়ের প্রেম পত্র। একখানা নয় দু'খানা নয় পঁচিশ ত্রিশখানা! সে যেন রঙীন সূতায় বাঁধা একরাশি পুরাতন, ব্যবহৃত, বিবর্ণ প্রেম!

আজ নিশ্চয় নয়। কবে যেন সুমতি চিঠিগুলি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। নহিলে সোজা আলমারি খুলিয়া ভাঁজ করা শীতের পোষাকগুলির পিছনটা এখন সে হাতড়াইবে কেন?

চিঠির তাড়াটা নিয়া গম্ভীর হইয়া অক্ষয় বলিল, 'মরা মানুষের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য, একথা তুমিও জান আমিও জানি।'

সুমতি কিছুই বলিল না।

'কিন্তু তার অত্যাচারটাও স্বীকার করে নেওয়াও উচিত কিনা সে বিষয়ে আমার রীতিমত সন্দেহ আছে রূপসী।'

এবারেও সুমতি নীরব রইল।

'ওটা ভূতের উপদ্রবেরই সামিল। আত্মীয় পর কোন ভূতের উপদ্রব গ্রাহ্য করা উচিত কি? সে কত বড় ভীরুতার লক্ষণ বলত!'

এ যেন বিশেষ করিয়া তাহাকেই তিরস্কার করা। বড় আয়নার মধ্যে নিজের বিধবা বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া সুমতির চোখে জল আসিল।

মাঝে মাঝে স্থগিত হইতে লাগিল বটে কিন্তু বৃষ্টি একেবারে কমিল না। দিনগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিতে উঠিতে আবার জলে ভিজিয়া যাইতেছে, এ বাদল আশীর্ব্বাদের মত্‌ই। কিন্তু সুমতির ভাল লাগিতেছিল না। দ্বিপ্রহরে খোকাকে কোলে নিয়া নিজের ঘরে সে বসিয়াছিল, সকাল হইতে যে স্তিমিত বেদনা পীড়া দিতেছিল এখন তাহা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। নন্দ আজ সারাদিন খায় নাই। দোকান হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া সেই যে সে শুইয়াছিল আর ওঠে নাই। ডাকিতে গিয়া সুমতি শুনিয়াছিল তাহার শরীর ভাল নয়, সে খাইবে না। শরীরের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব মেলে নাই।

অথচ কোথায় যে তাহার অপরাধ সুমতি ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার বয়স তেইশ সে যুবতী সে সুন্দরী তাহার স্বামী নাই: ইহাই যদি সকলে তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে, এবার তাহার মরাই ভাল। কিন্তু

কিছুই তো সে করে নাই ? প্রাণপণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার চেষ্টায় কবে তাহার ত্রুটি ঘটিয়াছে ? তাহাকে নিয়া নন্দর অনধিকার চর্চ্চায় শুধু ততটুকু রাগই সে করিয়াছে যতটুকু রাগ না হইলে মানায় না, সে রাগের জের টানিয়া চলিবার চেষ্টাও সে করে নাই। সকলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সহজ ও সাধারণ করিয়া রাখিতে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিয়াছে।

অথচ ইহাদের কল্যাণে জীবন তাহার আজ অকথ্য জটিলতায় ভরা। সব বিষয়ে সেই হইয়া উঠিতেছে অপরাধী।

সীতার দুর্ভাগ্য উপলক্ষে ষাট টাকার কম্পাউণ্ডারি করাই যে নন্দ জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছে সে অপরাধ তাহারই। এক সাহেবের প্রকাণ্ড ওষুধের দোকানে একশ দশ টাকার চাকরীটা যে নন্দ পছন্দ করিল না সে জন্য সুমতি ভিন্ন আর কেহ দোষী নয়। স্বাস্থ্য যে নন্দর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সে দায়িত্বও সুমতির।

অলকা যে বাঁচিল না, মরিয়াও স্বামীর দু'ফোঁটা চোখের জলের তর্পণ পাইল না, এ জন্য স্বয়ং ভগবানও হয়ত একদিন সুমতিরই বিচার করিবেন।

এমনি সব কটু চিন্তায় সুমতি ব্যাপৃত ছিল, ও ঘর হইতে অক্ষয় তাহাকে আহ্বান করিল। অনুযোগ করিয়া বলিল 'একা একা দুপুরটা যে কাটে না সুমতি !'

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'খোকাকে রেখে যাব ?'

'খোকার সঙ্গে এক তরফা আলাপ করব কতক্ষণ ? তাছাড়া দুপুর বেলা আর রাত্রিটা তোমার কোল দখল করে থাকা ওর অভ্যাস, আমার কাছে কাঁদবে।'

সুমতি নতমুখে বলিল 'কিন্তু দুপুরে একটু না শুয়ে যে আমি পারব না। কাল একাদশী করেছি।'

অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া বলিল 'ও, অচ্ছা, তবে তুমি যাও, সুমতি, শোবে যাও। কাল তোমার একাদশী গেছে জানতাম না। তুমি বুঝি নির্জ্জলা একাদশী কর ?'

সুমতি নীরবে স্বীকার করিল। অক্ষয়ের আর কিছু বলিবার আছে কিনা ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল নন্দও একদিন নির্জ্জলা একাদশীর কথাটা তুলিয়াছিল। কিন্তু অক্ষয়ের মত এমন ভদ্র ও সংযতভাবে নয়। সে নির্জ্জলা একাদশী করে শুনিবামাত্র একটুকরা কাগজ টানিয়া নিয়া মোটা মোটা হরফে লিখিয়াছিল 'নির্জ্জলা', তারপর কাগজটা সামনে ধরিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল 'হঠাৎ দেখলে কথাটাকে 'নির্লজ্জ' মনে হয় না ? হয়, কি বল ? বলই না ছাই হয় কি না হয়, তাতে আর তোমার এমন কিছু মহাপাপ হবে না !'

বিছানায় শুইয়া সুমতির মনে হইল অক্ষয়ের ভদ্রতার চেয়ে নন্দর সেই অসংযত হাসিতে যেন কুটিলতা কম ছিল। নন্দর বিশ্রী মন্তব্যটার মধ্যেই যেন সহানুভূতি ছিল বেশী।

বিকালের দিকে বৃষ্টি কমিয়া গেল। অনেক ভাবিয়া সুমতি নন্দর খবর নিতে গেল। বলিল 'উপোস করছেন কেন ?'

নন্দ সবগুলি জানালা বন্ধ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটা ভোরবেলার মতই আবছা।

'আমার জ্বর হয়েছে।'

'বেশী জ্বর ?'

'কপালে হাত দিলেই টের পাবে জ্বর বেশী কি কম।'

কপালে হাত দিতে সুমতির সাহস হইল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল 'একটু দুধ খান্।'

নন্দ ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

'সমস্ত বাড়ীতে পচা ঘিয়ের গন্ধ, লুচি ভাজছিলে ?'

'হঁ্যা।'

'নিয়ে এসো খানকত লুচি, লুচিই খাব।'

'জ্বরের মধ্যে লুচি খাওয়া কি ঠিক হবে ?'

নন্দ হাসিল।

'কপালে হাত দিয়ে যে জ্বর দেখতে পারে না তার সে ভাবনা কেন ?'

ইহার জবাব অবশ্য সুমতি দিতে পারিল না, কিন্তু লুচিও সে নন্দকে খাইতে দিল না। এক বাটি গরম দুধ আনিয়া কড়া সুরে বলিল 'খান, ছেলেমানুষী করবেন না।'

কি মনে করিয়া নন্দ আর গোলমাল না করিয়া দুধ খাইল।

রাত্রে আবার দুধ খাইবার পালা। অন্ধকার গাঢ় বলিয়া এখন আর আলো জালিতে কোন বাধা নাই।

আলো জালিয়াই সুমতির চমক লাগিল। নন্দর অভূতপূর্ব্ব ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া সে একটা পা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়াছে, দুই হাতের দশটা আঙুলে টেবিল ঠুকিয়া অত্যন্ত জলদ একটা ধ্বনি তুলিয়া তাহারি তালে তালে মাথা নাড়িতেছে। রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে ঢেউ খেলিয়া যায়, কপালের একটা শ্রীহীন কুঞ্চনের বারংবার লয় ও আবির্ভাব ঘটে, মুখখানি অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

সুমতি ভীত হইয়া উঠিল। 'কি হয়েছে? কি হয়েছে আপনার?'

পা নামাইয়া নন্দ সোজা হইয়া বসিল। চোখ খুলিতেই বোঝা গেল দু'চোখ তাহার জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ কথা সে কহিল রসিকতা করিয়া:

'আমার প্রবল আনন্দ হয়েছে সুমতি!'

আনন্দই বটে! বিবর্ণ মুখে সুমতি বলিল 'কেন? কেন আপনার এমন আনন্দ হ'ল?'

'পড়'—নন্দ একটী দুমড়ানো পত্র সুমতির হাতে গুঁজিয়া দিল। সুমতি পড়িল। নন্দর কাকার পত্র। সংবাদ সংক্ষিপ্ত। বিগত সতরই শ্রাবণ সীতার বৈধব্য ঘটিয়াছে। নৌকা করিয়া কেদার গ্রামান্তরে যাইতেছিল। নৌকাতেই সে প্রাণ ভরিয়া মদ খায়। সুতরাং বর্ষার নদীতে টলিয়া গিয়া আর উঠিতে পারে নাই।

কেমন করিয়া কেদার নদীর মধ্যে টলিয়া পড়িয়াছিল চিঠিতে সে কথা লেখা নাই।

সুমতি বহুক্ষণ মুখ তুলিতে পারিল না। শুষ্ক চোখ দেখিয়া নন্দ কি ভাবিবে কে জানে! নন্দর মধ্যস্থতায় অচেনা সীতার জন্য সুমতি সত্যই একটু একটু মমতা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা দুফোঁটা চোখের জল ফ্যালে। কিন্তু অশ্রু আজ দুর্ল্লভ। জীবনটা সম্প্রতি নানাবিধ নাটকীয় উপাদানে এমনি অভিনব হইয়া উঠিয়াছে যে চোখে জল আনা আর সহজ নয়।

মণিঅর্ডারের রসিদগুলি খাঁচা-ছাড়া পাখীর মত সরসর্ করিয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সুমতির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নন্দ বলিল 'জান সুমতি, উত্তেজনায় আমার যে জ্বর এল সে শুধু মুক্তির আনন্দে নয়। নিজেকে খুনী বলে জানলে—'

'খুনী কি গো?' সুমতি ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল।

'না না, চমকাবার কিছু নেই সুমতি। সে খুনের কথা বলছিনা। তিন বছর ধরে মনে মনে যে কেদারের মারণ যজ্ঞ করেছিলাম সে তো আর অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাই কেবলি মনে হচ্ছে গোলোক যে অপঘাতে মরল তার দায়িত্বটা আমারই। ইবসেনের একটা নাটকে—আচ্ছা, থাক ইব্‌সেনের কথা।'

সুমতি চুপ করিয়া রহিল।

'শরীরটা এমন দুর্ব্বল মনে হচ্ছে। যেন কতকাল রোগে ভুগেছি।'

সুমতি তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

নন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল 'বিশ্বাস করছ না? কিন্তু সত্যি এরকম হয়। A sudden shock to the mind and its subsequent disturbances may result in severe physical sickness. কেন হয় তাও বলছি শোন। আনন্দ ব্যথা ভয় এই সব উত্তেজনা মনে দেখা দিলেই শরীরের অনেকগুলি গ্ল্যাণ্ড থেকে রসস্রাব সুরু হয়। আনন্দ কম আর স্বাভাবিক হলে যে রস বার হয় শরীরের তাতে উপকার হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক প্রবল আনন্দের রস ঠিক বিষের মত কাজ করে, ঠিক—'

'চুপ করুন।'

বলিতে বলিতে নন্দ বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল, থতমত খাইয়া চুপ করিল। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া বলিল 'অক্ষয় বাবুকেই জিজ্ঞাসা কোরো কথাগুলি সত্যি কি মিথ্যা। তিন বছর ওমনি মেডিকেল কলেজে পড়িনি সুমতি, কিছু কিছু সবই জানি।'

'আচ্ছা! দুধটা খেয়ে ফেলুন।'

নন্দ মুখ ভার করিয়া দুধ খাইয়া বলিল 'এবার কি করতে হবে? লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমোব? না ক খ শিখব?'

'আপনার খুসী' বলিয়া সুমতি চলিয়া যাইতেছিল, নন্দ ডাকিয়া ফিরাইল।

'চলে যাও যে? আমায় ঘুম পাড়িয়ে যাও। আমার আনন্দে বৈচিত্র্য দিয়ে যাও ভাল চাও ত', নইলে রাতারাতি হার্টফেল করব।'

সুমতি উদ্ধতভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু যে জবাব সে দিতে চাহিয়াছিল নন্দর মুখ দেখিয়া তাহা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। শান্ত কণ্ঠেই বলিল 'কি করতে হবে বলুন।'

নন্দ আঙুল বাড়াইয়া বিছানাটা দেখাইয়া বলিল, 'বালিশ সরিয়ে বিছানায় বোস, তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি শোব। ব্যস্, আর কিছু না। আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যেও।'

সুমতি বিবেচনা করিয়া দেখিল, নন্দর দাবী যে অসঙ্গত নয় তাহার সপক্ষে যুক্তি আছে। আনন্দে তাহার বৈচিত্র্য না আসিলে রাত্রে সত্যই সে ঘুমাইতে পারিবে না। সমস্ত রাত্রি এই উত্তেজনায় ছটফট করিয়া কাটাইলে আজিকার সামান্য অসুখ কাল বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া এতরাত্রে এই উত্তেজিত মানুষটির মাথা কোলে নিয়া ইহার বিছানায় সে বসে কি করিয়া?

ভাবিয়া চিন্তিতা সুমতি বলিল 'না। বোন বিধবা হয়েছে এই অজুহাতে এতবড় অন্যায় করতে আপনার না বাধুক, আমার বাধবে।'

কথাটার সমস্তটুকুর অর্থ বুঝিতে কয়েক মুহূর্ত্ত সময় নিয়া নন্দ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

'তোমার সঙ্গে আর কোন দিন যদি আমি কথা বলি— আচ্ছা, তুমি যাও। আর এক মিনিট দাঁড়ালে তোমায় আমি সত্যি অপমান করে বসব সুমতি। এক্ষুণি তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। নন্দ অপমান করিবে বলিয়া নয়, আর দাঁড়াইয়া থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া। নন্দকে জানিতে তো তার বাকী ছিল না। নন্দ ছেলেমানুষী করিতে জানে ভাল করিয়াই, অপমান করিতে শেখে নাই আজও।

উপরে উঠিয়া বারান্দায় পা দিতেই অক্ষয় খপ করিয়া সুমতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

'তুমি নন্দর ঘরে ছিলে?'

দুর্বিনীত প্রশ্ন। সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'ছিলাম।'

'কেন ছিলে?'

'নন্দ বাবুর ভগ্নীপতি মারা গেছে খবর এসেছে, খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, তাই—'

অক্ষয় তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল 'কিছু মনে কোরোনা সুমতি।'

সুমতি অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিল 'না।'

অক্ষয় কৈফিয়ৎ দিল:

'মনটা ভাল নেই সুমতি। খোকা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল আর তুমি ওদিকে গল্পে মেতে আছ ভেবে হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল।'

সুমতি বলিল 'খোকা কেঁদেছিল? কই শুনিনি ত।'

'কেঁদেছিল বৈকি। আমি কি তোমায় মিথ্যে বলছি সুমতি!'

অক্ষয় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুমতি ভাবিতে লাগিল সকাল বেলা চিঠির তাড়া খুঁজিয়া পাওয়ার প্রতিক্রিয়াটা যে অক্ষয়ের দিক হইতে প্রতিশোধের রূপ নিয়া আসিবে এ তাহার জানিয়া রাখা উচিত ছিল। নন্দর মত অক্ষয় ছেলেমানুষ নয়। অলকা তাহাকে প্রচুর নারী-অভিজ্ঞতা দিয়া গিয়াছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অক্ষয়কে তাহা কাজে লাগাইতেই হয়।

সে রাত্রির অপমানে রাগ করিয়া থাকার সুযোগ নন্দ পাইল না কারণ সুমতি তাহার উত্তেজনার জোরালো প্রতিষেধক দিয়া গেলেও পরদিন তাহার ভালমতেই জ্বর আসিল। মাথা কোলে তুলিয়া না নিলেও সুমতি সারাদিন তাহার মাথায় বরফ দিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর অক্ষয় নিজেই ওষুধ দিয়া গেল। সুমতির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল 'এর মধ্যে বিষ আছে, বুঝলে?'

সুমতিও বোধ হয় সেই প্রকার কিছু অনুমান করিতেছিল, সভয়ে বলিল 'বিষ ?'

"হ্যাঁ। ভাল করে দাগ দেখে খাইও।"

সুমতি ছল ছল চোখে বলিল 'বিষ কেন ?'

অক্ষয় হঠাৎ হাসিয়া বলিল 'সে তো তোমায় আমি এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পারব না! ওর যা অসুখ একমাত্র বিষেই তা সারে।'

'একদাগের বেশী পড়লে মরে যাবে ?'

'না, বেশীরকম নেশা হবে। শিশির সমস্ত ওষুদ খেলেও মরবে না, দিন তিনেক নেশায় অজ্ঞান হয়ে থাকবে বড় জোর। ডাক্তার অনেক মানুষ মারে, কিন্তু ইচ্ছা করে একজনকেও মারে না সুমতি!'

তা নিশ্চয় মারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি এরূপ মন্তব্য করিবার অধিকার ডাক্তারের জন্মায় ? সুমতির বয়স ত কম হয় নাই যে ইহাকে হেঁয়ালি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, কোন জবাব দিবে না! একান্ত অবিচলিত ভাবেই সুমতি বলিল 'তা বৈকি। কর্ত্তব্যের সঙ্গে সব সময় হৃদয়ের যোগ থাকবে তার তো কোন মানে নেই।'

অক্ষয় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সুমতির মুখখানি খানিকক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "কিন্তু কোনমতে একটা কর্ত্তব্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটে গেলেই আর সব কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়।'

ইহাও হেঁয়ালি নয়। সুমতি বলিল 'তা দেয়, কিন্তু কোন কর্ত্তব্যের সঙ্গে কার হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটেছে অন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা দেখেই সব সময় সেটা ধরা যায় না। কর্ত্তব্যের তো ছোট বড় আছে।'

ওষুধের শিশি হাতে আকাশের সন্ধ্যার নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া আত্মসমর্থন করিতে সুমতির গলা বুজিয়া আসিতেছিল। অথচ এ সমস্ত অক্ষয়কে জানানো প্রয়োজন। হৃদয়ের হিসাব-নিকাশ যে চিরকালের মত সে চুকাইয়া ফেলিয়াছে অক্ষয়কে ইহা বিশ্বাস করাইতে না পারিলে তাহার আর উপায় নাই।

বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা টাকার কাছে হার মানিতে পারে।—একটি মরণাপন্ন শাঁসালো রোগীর জীবন মরণের ভার নিতে অক্ষয় আপত্তি করে নাই।

রাত বারোটা অবধি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষয় বাড়ী ফিরিতেছিল। দরোয়ান প্রভুর প্রতীক্ষায় ঢুলিতে ঢুলিতে রামায়ণ পাঠ করিতেছিল, সেই অক্ষয়কে দরজা খুলিয়া দিল।

নন্দর ঘরের সামনে দিয়া অন্দরে যাইবার পথ। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, দরজা খোলা। জেলখানার আধ ঘুমন্ত শান্ত্রীর মত বুকে চিবুক ঠেকাইয়া নন্দ লম্বালম্বি ঘরটা পরিক্রমণ করিতেছিল, গতি অত্যন্ত মন্থর, যে কোন মুহূর্ত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়া মেঝের উপর ঢলিয়া পড়া যেন আশ্চর্য্য নয়।

মেঝেতে লাঠি ঠুকিয়া অক্ষয় বলিল 'তুমি যে যাওনি হে ?'

নন্দ দাঁড়াইল।

'না, যাইনি।'

'কেন ? যাওনি কেন ?'

'একটু দরকার ছিল তাই যাইনি। কাল যাব।'

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল 'কাল যাবে, কাল!—কাল আমার নতুন কম্পাউণ্ডার আসবে সকালবেলা, সে কোথায় থাকবে শুনি ?'

'সে আসবার আগেই আমি যাব অক্ষয়বাবু।'

অক্ষয় বিরক্ত হইয়া বলিল 'আমার মাইনে করা কম্পাউণ্ডার আমায় অক্ষয়বাবু বলে এ আমি পছন্দ করি না নন্দ। চিরকাল ডাক্তারবাবু বলে এসেছ যাবার আগে আজ অকারণে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি কোরো না। তা তুমি ঘরের মধ্যে এত রাত্রে পাক খাচ্ছ কেন ?'

নন্দ ক্ষীণভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল 'পরিশ্রম করছি। ঘুম আসে না ডাক্তার বাবু।'

'কোথাও যাবার সময় এরকম হয়' বলিয়া অক্ষয় অন্দরের দিকে পা বাড়াইল।

সিঁড়িটা অন্ধকার—নিবিড় জমাট অন্ধকার। অক্ষয়ের চোখ যেন অন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সুইচের অবস্থান জানা সত্ত্বেও আলো সে জ্বালিল না। বরং সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠিয়া অন্ধকারে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দুয়ারের সামনে পুরা পাঁচ মিনিট কাল দাঁড়াইয়া আলোটা চোখে না সহাইয়া সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না। কাল যে আংর্ধ্য আগলাইয়া জাগিয়া বসিয়া থাকে নাই তাহারি কৈফিয়তের মতে খোকাকে বুকের কাছে নিয়া মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া সুমতি জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া আছে।

সিঁড়ি দিয়া নামা, উঠান পার হওয়া এবং নন্দর ঘরের দুয়ারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সংযত ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢোকা এই তিনটি কাজ করিতে সুমতির এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না। অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া সে যে একবারও পড়িয়া যায় নাই এইটুকুই আশ্চর্য্য।

ওপরে খোকার চীৎকার শোনা যাইতেছিল, ঘুমের চোখে সুমতি তাহার হাত মাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। কান পাতিয়া খোকার কান্না শুনিয়া সুমতি অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। অমন করিয়া দিশেহারা হইবার কোন কারণ ছিল না। খোকার হাত যদি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে? এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়া এমন ভাবে খোকার কাছে বিদায় নিতে হইল তাহার!

নন্দ বলিল 'কি সুমতি, শেষ বিদায় নিতে এলে বুঝি?'

জোরবাতাসে যেমন আকাশের মেঘ কাটিয়া যায় নন্দের মুখের কালো ছায়াটা তেমনি ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশে পাশাপাশি দুই টুকরা সাদা মেঘ যেমন সূর্য্যালোকে ঝক-ঝক করে নন্দর চোখ দুটি তাহার সঙ্গে তুলনীয়।

সুমতি ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরময় এত ছেঁড়া কাগজ উড়িতেছে যে মনিঅর্ডারের রসিদগুলি এখনো মেঝেতে ছড়ানো আছে কি না বোঝা যায় না। চৌকীর উপর দড়ি দিয়া বাঁধা বিছানা, জিনিষ বোঝাই তোরঙ্গটা এদিকে হাঁ করিয়া আছে।

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'না, বিদায় নিতে আসি নি। আপনার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম। সকালে লজ্জা করবে, এখনি বেরিয়ে পড়ি চলুন।'

রাত দুপুরে তাহার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে নন্দর চমক লাগার কথা। কিন্তু বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে তাহার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

'সে হয় না সুমতি?'

সুমতি বিহ্বলের মত বলিল 'হয় না?'

নন্দ মাথা নাড়িল 'না। এতবড় অনুচিত কাজে আমার আর প্রবৃত্তি নেই। কি জান আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাছাড়া, আমার সময় নেই।'

ভয় পাইয়াছে! সময় নাই! সুমতি আগাইয়া গিয়া নন্দর চৌকীতে বসিয়া পড়িল। সম্বৎসর সাধনা করিয়া নন্দর আজ সিদ্ধিলাভের সময় নাই!

বহুকষ্টে সুমতি শান্ত হইয়া রহিল। কি ঘটিয়াছে জানা দরকার। কিছু যে ঘটিয়াছে—ভয়ানক একটা কিছু যে না ঘটিয়াই পারে না সুমতির তাহাতে সংশয় ছিল না। এভাবে হঠাৎ মানুষ বদলায়—নিজেকেই সে কি এখন চিনিতে পারিতেছে?—কিন্তু অকারণে বদলায় না।

নন্দ আবার বলিল 'রাগ কোরোনা সুমতি, সত্য আমার সময় নেই। আমার এমন বিপদ হয়েছে বলবার নয়। সকাল বেলাই আমার সীতাকে খুঁজতে যেতে হবে—কতদিনে খুঁজে পাব ভগবানই জানেন।'—বলিয়া সে একটু থামিল, 'কিন্তু আজকের জন্যে তুমি যেন লজ্জিত হয়ো না সুমতি। তোমার এই মাঝরাত্রির দুর্ব্বলতা আমি ভুলে যাব। সত্যি, এ আমার মনেও থাকবে না। সীতাকে যদি খুঁজে পাই, সীতা সাবিত্রীর উপাখ্যানের সঙ্গে তোমার কাহিনীও তাকে আমি শোনাব সুমতি।'

বলিতে বলিতে নন্দ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

'তাতে তুমি আপত্তি করবে? তোমার জীবন কাহিনী শুনবার অধিকার কি সীতার আর নেই? তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না?'

নন্দ পায়চারি আরম্ভ করিল। সীতাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলে তাহার সহিত কথা কহিতে সুমতি যেন অস্বীকার করিয়াছে এমনি ভাবে বলিতে লাগিল 'তুমি কথা না কইলে অভিমানে সে কি করে বসবে কে জানে? ছেলেমানুষতো, তোমার চেয়ে অনেক ছোট,—ভাল মন্দ বোঝে না। ছেলেটাকেও আমি চিনি সুমতি, কচি মেয়ে ভোলাবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। কতকাল ধরে সীতার মন ভাঙ্গছিল কে জানে!

অন্ততঃ আজ রাত্রির কথা মনে করে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারবে না?'

বলিয়া নন্দ করুণ চোখে সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমরু

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্

সমরুর আসল নাম ওয়াণ্টার রীর্ণহার্ড, জাতিতে সুইস-জর্ম্মণ। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে সুইজরলণ্ডের অন্তঃপাতী ট্রিভস-প্রদেশে ওয়াণ্টারের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে রীর্ণহার্ড স্বদেশের এক কসাইখানায় কর্ম্ম করিত। এ পেশা ভাল না লাগায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া অতঃপর সে ফরাসী নৌবিভাগে প্রবেশ করে। তখনকার দিনে এখনকার মত স্বদেশ-প্রেমের ধারণা ছিল না। এক দেশের লোক অপর রাষ্ট্রের সেনাবিভাগে প্রায়ই প্রবেশ করিত, এবং সময় ও সুবিধা অনুসারে পক্ষ পরিবর্ত্তন করা তাদৃশ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এমন কি ভিন্ন রাজার সেনাদলভুক্ত থাকিয়া স্বদেশ ও স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেও অনেকে কুণ্ঠানুভব করিত না। ফরাসী রাজার "আইরিশ ব্রিগেড", "সুইস গার্ড", ইংলণ্ডের অধীশ্বরের "কিংস জর্ম্মণ লিজন", "হেসিয়ান হর্স" নামক সেনাদলের কথা ইতিহাসে সুপরিচিত।

ত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রীর্ণহার্ড নিজ জাহাজের সহিত পন্দিচেরীতে আগমন করিল। তাহার অবশিষ্ট জীবন এতদ্দেশেই অতিবাহিত হয়, আর তাহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয় নাই। জলপথ অপেক্ষা স্থলপথে লাভের সম্ভাবনা বেশী দেখিয়া অতঃপর ওয়াণ্টার জাহাজ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া Somers এই ছদ্মনামে ফরাসী সেনাদলে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহার কঠোর-প্রকৃতি ও রুক্ষ গম্ভীর মুখাকৃতির জন্য তাহার সহকর্ম্মিরা ঠাট্টা করিয়া তাহার নামকরণ করিল Sombre অর্থাৎ গম্ভীর। কালে তাহাই রীর্ণহার্ডের উপনামে দাঁড়াইল এবং এই "সোম্ব্র" কথাটী ভারতীয়মুখে 'সমরু'তে রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর আমরা ওয়াণ্টার রীর্ণহার্ড না বলিয়া সমরু নামেই ইহাকে উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বে মসিয়ল প্রসঙ্গে এই যুগে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘটিত যে সকল যুদ্ধের কথা বলিয়াছি সমরু তাহার কয়েকটীতে উপস্থিত ছিল এবং ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে লয়ের নায়কত্বে যে ফরাসী সেনাদল ত্রিচিন-পল্লীতে ইংরাজ সেনার করে আত্মসমর্পণ করে সমরুও সেই দলের অন্তর্ভূত ছিল। যুদ্ধ বিরতির ফলে মুক্তিলাভ করিয়া ল, মেডেটিল প্রমুখ বহু ফরাসী সৈনিকের মত সমরুও ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন করে। কিন্তু সঙ্গীগণের মত চন্দননগরে না গিয়া সমরু প্রথমটায় ইংরাজ সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ব্যাটালিয়ন সুইস ভৃতিভুক সেনা ছিল। সমরু প্রথমটায় নিজ দেশবাসীগণের দ্বারা গঠিত এই দলে যোগদান করিলেও ইংরাজপক্ষে থাকা তাহার বেশী দিন ঘটিয়া উঠে নাই। মাত্র আঠারো দিনের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট হইল, তাহার পর গোপনে সেনাদল হইতে পলায়ন করিয়া সমরু চন্দননগরে গেল এবং ভূতপূর্ব্ব সঙ্গী ও সহকর্ম্মী লয়ের সেনাদলে সার্জ্জেণ্ট পদে নিযুক্ত হইল। এ কাজও বেশী দিন ভাল লাগিল না। অতঃপর সমরু গোপনে সেনাদল ত্যাগ করিয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে গিয়া সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় সমাগম বা প্রভাব শূন্য ভারতীয় মহলে বসবাস আরম্ভ করিল। সমরুর জীবনের এই সময়ের দুই তিন বৎসরের ইতিহাস সঠিক জানা যায় না। অশান্ত ভবঘুরে জীবন লইয়া সে কোন কোন স্থানে পরিভ্রমণ অথবা কোন কোন রাজা বা সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধের ফলে বঙ্গদেশে ইংরাজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ল প্রমুখ বহু ফরাসীসৈনিক বিতাড়িত হইয়া হিন্দুস্থানে আগমন করে, সমরুও তাহাদের সহিত মিলিত হয় এবং সকলে গিয়া সাহ আলমের আশ্রয়

গ্রহণ করে। সমরু কিন্তু বেশীদিন এ দলে থাকিতে পারে নাই—মুসিরলাসের শেষ যুদ্ধে সে উপস্থিত ছিল না। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী ফৌজদারের সেনাদলের অধিনায়করূপে আবার তাহার দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এ দলেও তাহার বেশীদিন থাকা হইল না। কয়েক মাস পরেই এক যুদ্ধে ফৌজদারের ফৌজ পরাজিত হইল এবং ভাগ্যান্বেষী সুইস সৈনিক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভাগ্যপরীক্ষা করিতে গেল।

এই সময় মীরকাশিম বাঙ্গালার নবাব। তিনি তখন ইংরাজের সহিত তাঁহার অচিরসম্ভাবী বল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আর্ম্মেনিয়ান গ্রেগারী তাঁহার প্রধান সেনাপতি। সমরু আসিয়া গ্রেগরীর সেনাদলে যোগ দিল এবং দুই ব্যাটালিয়ন সেনার নায়কত্ব লাভ করিল। অত্যল্প কাল মধ্যেই সমরু নিজগুণে মীরকাসিমের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল এবং শুনা যায় যে মীরকাশিমকে ইংরাজের বিরুদ্ধে সে যথেষ্ট উৎসাহিত করিত। কিন্তু যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন রণস্থলে সমরুর কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। এলিস সাহেবের হস্ত হইতে পাটনা উদ্ধারে সমাগত মার্কারের সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সমরু ইংরাজ বিপক্ষে লড়িয়াছিল। পাটনা হইতে পলাতক ইংরাজদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছাপরার অদূরে মাঁঝি নামক স্থানে সমরুর তাহাদের বন্দী করার কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। গিরিয়া এবং উধুয়ানালার যুদ্ধক্ষেত্রেও সমরু উপস্থিত ছিল। কিন্তু ঐ দুই যুদ্ধে মীর নসির, আসাদউদ্দৌলা, বদরুদ্দীন প্রমুখ মীরকাসিমের দেশীয় সেনানায়কগণ যে প্রকার বীরত্ব ও সমরকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন সমরু প্রমুখ বৈদেশিক সেনানায়কগণ তাহার অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপর কয়েকজনের নিশ্চেষ্টতার জন্য প্রায়জেতা গিরিয়ার যুদ্ধ (২রা আগষ্ট ১৭৬৩) নবাবকে হারিতে হইল। গিরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে স্বয়ং ইংরাজ লেখকই বলিয়াছেন যে, মোগলেরা এত ভাল যুদ্ধ আর কখনও করে নাই; এক সময়ে তাহাদের প্রতাপে ইংরাজসেনা শত্রুকরে দুইটি কামান ফেলিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সমরুও যে মার্কার এবং গ্রেগরীর ন্যায় গোপনে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল তাহা তাহার পাটনায় ইংরাজবন্দীগণের হত্যাকাণ্ডের নায়কত্ব হইতে সুস্পষ্টই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা-পরিচালনা-জ্ঞানের অভাব এবং ভীরুতাই তাহার রণস্থলে নিশ্চেষ্টতা এবং ব্যর্থতার একমাত্র কারণ। সুদক্ষ সেনানীবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত সুশিক্ষিত ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মত শৌর্য্যবীর্য্য এবং সামরিক জ্ঞান তাহার ছিল বলিয়া মনে হয় না।

চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতা এবং তজ্জনিত ক্রমাগত পরাজয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় মীরকাসিম বন্দী ইংরাজদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলে হিন্দু বা মুসলমান এতদ্দেশীয় কোন সেনানায়কই একার্য্যে অগ্রসর হইল না। তখন সমরু ঐ কার্য্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর প্রত্যূষে বন্দী ইংরাজগণ তখন সবেমাত্র তাহাদের চা-পান-পর্ব্ব সমাধা করিয়াছে এমন সময়ে সমরুর সেনাদল ধীরে ধীরে তাহাদের কারাকক্ষের সমীপে সমাগত হইল। সমরু নিজে গিয়া এলিস প্রমুখ ইংরাজ নেতৃবর্গকে ডাকিয়া আনিল। বাহিরে আসিবামাত্র উহারা নিহত হইল। ক্রমে বন্দীরা জানিতে পারিল যে বাহিরে যাইতেছে তাহাকেই হত্যা করা হইতেছে। তখন আর কেহ বাহিরে যাইতে চাহিল না, যে যাহা হাতের কাছে পাইল তাহা লইয়াই আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। তখন সমরু নিজ সৈনিকগণকে সকলকে বিনাশ করিবার আদেশ দিল। সাধারণ সিপাহীসেনাও এ আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিল "আমরা বাজারের কসাই নহি; অস্ত্রহীনের প্রতি আঘাত করা সিপাহীর কার্য্য নহে, উহা হালালখোরের কার্য্য। বন্দীদিগের হাতে অস্ত্র দেওয়া হউক, আমরা উহাদের সহিত লড়িয়া সকলকে বিনাশ করিব।" কিন্তু এ কথায় সমরু বিচলিত হইল না। মহাক্রোধে সে আপত্তিকারী সৈনিকদের প্রহার করিতে লাগিল এবং তাহাদের উক্ত পৈশাচিক কার্য্য সমাধা করিতে বাধ্য করিল। নীচেকার প্রাঙ্গণে সমবেত বন্দীদিগকে দ্বিতলের চতুষ্পার্শ্বস্থ বারান্দা হইতে গুলিবর্ষণ করিয়া সমরুর সৈন্যগণ হত্যা

করিল। শুনা যায় সমরু নিজহস্তে জনকয়েক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল।

এতগুলি লোককে এ ভাবে হত্যা করার সমরুর মনে পরে কখনও অনুতাপের উদয় হইয়াছিল কিনা অথবা এ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল কিনা তাহা বলিবার উপায় নাই। নিরস্ত্র লোকের হত্যা-কাণ্ড ইতিহাসে কিছু নূতন নহে। সমরুর পূর্ব্বেও অনেক নিষ্ঠুর হত্যাকারীর আবির্ভাব হইয়াছে, এখনকার জগতেও যে এ ধরণের লোকের আবির্ভাব বন্ধ হইয়াছে এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। শান্তিপ্রকৃতিতে অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে বহুসংখ্যক নিরস্ত্র লোকের হত্যাকাণ্ড সাধন করিবার পর তাহার নায়কের মনোভাব কি রকম হয় এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানবিৎ কোন পণ্ডিত যদি আলোচনা করেন তবে তাহা বোধহয় এক নূতন জিনিষ হয়। কিন্তু তাহাতে প্রধান অসুবিধা হইল এই যে ঐ ধরণের হত্যাকাণ্ডের নায়কবর্গের মনোভাব জানিবার কোনই উপায় নাই। সমরুর ন্যায়ই একজন ভবঘুরে ভাগ্যান্বেষী ইংরাজ সৈনিক সিন্ধিয়ার সেনাদলের মেজর লুই ফার্ডিনাণ্ড স্মিথ স্বরচিত ভাগ্যান্বেষীদের ইতিহাসে সমরু সম্বন্ধে লিখিয়াছিল, "পরম আনন্দ ও উৎসাহের সহিত ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেও, আমি শুনিয়াছি যে ঐ দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তই তাহার চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।" স্মিথের কথা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, তাহার গ্রন্থ-রচনার পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সমরু দেহত্যাগ করিয়াছিল। সমরুর সহিত স্মিথের যে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না তাহা উপরিউদ্ধৃত পদেই প্রকাশ।

মীরকাসিমের পতনের কালে সমরু তাঁহার প্রতি নিতান্তই খারাপ ব্যবহার করিয়াছিল। পূর্ব্বে সমরুর যে ইতিহাস দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে তাহার নিকট বিশ্বাসের মূল্য বা প্রভুভক্তি বলিয়া কোন জিনিস ছিল না, সে ছিল বরাবরই সুবিধাবাদী। বাঙ্গালার হতভাগ্য শেষ স্বাধীন নবাবের ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখিয়া বক্সারের যুদ্ধের পূর্ব্বেই সমরু অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আমন্ত্রণে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। মীরকাসিম যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করিবেন বলায় সাহআলম ও সুজাউদ্দৌলা ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। মীরকাসিমের নামে কতকগুলা মিথ্যা রটনা করিয়া সমরু সুজাকে হতভাগ্য নবাবের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিল। এক্ষণে অর্থের জন্য সুজা মীরকাসিমকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। এ দিকে অর্থাভাবে মীরকাসিম সমরুর সেনাদলকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। সমরু আগে থাকিতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। মীরকাসিম তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে সে বলিয়া পাঠাইল, যে রাখিতে জানে না তাহার হাতে ঐ সকল দ্রব্য মানায় না। ইহার পর আর ভদ্রতার কোন প্রয়োজন রহিল না। সমরু সসৈন্য আসিয়া প্রাপ্য বেতনের দাবীতে নবাবের শিবির পরিবেষ্টন করিল। হতভাগ্য নবাবের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া সমরু এবার প্রকাশ্যেই সুজার পক্ষে যোগ দিল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সমরুর সেনাদলে চারি ব্যাটালিয়ন পদাতিক, এক ব্যাটালিয়ন অশ্বারোহী এবং গুটিকয়েক কামানসমেত জনকয়েক গোলন্দাজ সেনা ছিল এবং নবাব দরবারে তাহার যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

বর্ষাপগমে ইংরাজ সেনাপতি মেজর মনরো যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ২২শে অক্টোবর ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা বক্সারে আসিয়া উপনীত হইল। পরদিবস উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। সমরুর ন্যায় রিনি ম্যাডেক নামক আর একজন ভাগ্যান্বেষী ফরাসী সৈনিক সুজাউদ্দৌলার সেনাদলভুক্ত ছিল। বক্সারের যুদ্ধে ইহারা দুইজনে সুজার বাহিনীর দক্ষিণভাগ পরিচালিত করিয়াছিল। ম্যাডেকের ইতিহাসও নিতান্ত অল্প কৌতূহলোদ্দীপক নহে; উধুয়ানালার যুদ্ধে ম্যাডেক ইংরাজ সেনাদলে ছিল, বক্সারে ম্যাডেক সমরুর সহকর্ম্মীরূপে ইংরাজের বিপক্ষে লড়িয়াছিল, আবার দীর্ঘকাল পরে বারসানার যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী এক প্রবন্ধে ম্যাডেকের কথা বলা যাইবে।

বেলা নয় ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন তুমুল যুদ্ধের পর নবাবী-

সেনা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মনে হইয়াছিল বুঝি বা ভাগ্যলক্ষ্মী সুজাকেই বরণ করিবেন। তাঁহার সেনানায়ক ঈশা খাঁ মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে বিচক্ষণতার সহিত সেনা পরিচালন করিতেছিলেন। সুজাউদ্দৌলার চরদৃষ্টক্রমেই যেন তিনি হঠাৎ রণস্থলে নিহত হইলেন। বরাবর যাহা ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সেনাপতির নিধনে হতাশ্বাস হইয়া সৈন্যদল পলায়নপর হইল, সুযোগ বুঝিয়া শত্রুপক্ষও নবীন উদ্যমে ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন সমগ্র সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলা তখন কর্ম্মনাশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে উপনীত হইলেন। যুদ্ধের পর বিজয়ী ইংরাজ সেনা কিন্তু পলায়িত শত্রুর অনুসরণ করিতে পারে নাই। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দুই মাইল দূরে নদীর উপর একটা নৌকার পুল ছিল। সুজাউদ্দৌলা সেনাদলের একাংশ নষ্ট করিয়া অবশিষ্টাংশ রক্ষা করিলেন। সমগ্র সেনাদল নদী পার হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার আদেশে সেতু বিনষ্ট হইল। এই ঘটনায় নদীতে নিমগ্ন হইয়া অথবা শত্রুর হস্তে হতাহত ও বন্দী হইয়া প্রায় দুই সহস্র সৈনিক বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু অপরাপর সকলে রক্ষা পাইল। স্বয়ং মেজর মনরো যুদ্ধের সংবাদ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন, "সুজাউদ্দৌলার ঐ দিনে প্রদর্শিত সেনাপতিত্বের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কারণ সসৈন্যে নদীপার হইতে পারিলে আমি তাঁহার সমস্ত সেনাদল ধৃত করিতে বা কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইয়া মারিতে সমর্থ হইতাম। তাঁহার ও কাশিম আলি খাঁর ধনরত্নাদি সবই আমার হস্তে পড়িত। শুনিয়াছি উহাদের মূল্য কুড়ি হইতে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে।"

এখানে কিন্তু মেজর সাহেব একটু ভুল করিয়াছিলেন। তখন মীরকাসিমের ধনরত্নাদি কিছুই ছিল না। তিনি তখন হৃতসর্ব্বস্ব, আশ্রয়হীন, পথের পথিক। যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন সুজাউদ্দৌলা তাঁহাকে একটি খঞ্জ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে হস্তী আরোহণে এলাহাবাদ যাইবার পথে মীরকাসিম বক্সারের বার্ত্তা পাইয়াছিলেন। ইতিহাসে সাধারণতঃ মীরকাসিম, সুজাউদ্দৌলা ও সাহ আলম এই নৃপতিত্রয়ের সম্মিলিত সেনাদল ইংরাজবীর সার হেক্টর মনরোর নিকট পরাজিত হয় বলিয়া লিখিত হইলেও যুদ্ধটা হইয়াছিল সুধু সুজাউদ্দৌলার সৈন্যদলের সহিত। সাহ আলম দর্শকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং ইংরাজগণ বিজয়লাভ করিবা মাত্র আর কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তিনি তাহাদের কণ্ঠলগ্ন হইলেন। সুজাউদ্দৌলা আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু খাজমৌয়ের যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হইয়া তিনিও ইংরাজের সহিত সন্ধি করিলেন।

বক্সারের যুদ্ধের পূর্ব্বে আরও একবার সাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদের সন্ধির কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তখন ইংরাজরা মীরকাসিম ও সমরুকে না পাইলে সন্ধি কিছুতেই করিবে না বলায় ফল কিছু হয় নাই। মীরকাসিম এখন নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আর পাইবার উপায় ছিল না। এবারকার সন্ধির অন্যতম প্রধান সর্ত্ত হইল যে সমরুকে ইংরাজহস্তে ধরিয়া দিতে হইবে। সুজাউদ্দৌলা জানাইলেন যে সমরুর নিজস্ব বিশ্বস্ত সেনাদল আছে, তাহাকে সমর্পণ করা তাঁহার সাধ্যের বাহিরে। শুনা যায় নবাব নাকি বিষ অথবা গুপ্তঘাতকের ছুরিকার সাহায্য লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজরা সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। এদিকে ব্যাপার বুঝিয়া সমরুও সাবধান হইল। খাজমৌয়ের যুদ্ধের পূর্ব্বে নবাব বেরিলিতে সমরুর রক্ষণাবেক্ষণে নিজ বেগমমণ্ডলী রাখিয়াছিলেন। একদিন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া ভাগ্যান্বেষী সৈনিক অন্যত্র নিজ ভাগ্যপরীক্ষায় প্রস্থান করিল! দুইজন নবাবের ধনরত্ন লুণ্ঠনের ফলে সমরুর অর্থের অভাব ছিল না, তাহার কতকাংশ নিজ সৈন্যগণকে প্রদান করায় তাহারা প্রভুর প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত হইয়াছিল।

মাৎস্য ন্যায় এবং যুদ্ধবিবাদে পরিপূর্ণ এ যুগের হিন্দুস্থানে নূতন কার্য্যক্ষেত্র জুটিতে বিলম্ব হইল না। সমরু প্রথমে রোহিলখণ্ডে গিয়া বিখ্যাত রোহিলাসর্দ্দার হাফিজ রহমৎ আলি খাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু এখানে বেশী দিন থাকিতে তাহার সাহস হইল না; কারণ রোহিলাদের

অধিকারের পার্শ্বেই হইল ইংরাজমিত্র অযোধ্যার নবাবের রাজ্য। সে জানিত যে পাটনার হত্যাকাণ্ডের জন্য ইংরাজগণ এবং বেগমদের লুণ্ঠনের জন্য নবাব তাহাকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। অতঃপর কিছুকাল ইতস্তত: নানাস্থানে সমরু পরিভ্রমণ করে। মধ্যে সে একবার কিছুকালের জন্য রাজপুতনার জয়পুররাজের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহার পর আবার জাঠদের আশ্রয়ে নিজ সৈন্যদলসহ তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এবার সমরুর সেনাদল সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তখনকার দিনে এদেশে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আগত, ধর্ম্মাধর্ম্মনীতিজ্ঞানবর্জ্জিত, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, ইউরোপীয় সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে সংগৃহীত জীবের অভাব ছিল না। এইরূপ জনকয়েক সৈনিকপুরুষ ছিল সমরুর ব্রিগেডের সামরিক কর্ম্মচারী। মীরকাসিমের সেনাদলের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত কয়েক কোম্পানী পদাতিক সেনা এবং কয়েক পল্টন অশ্বারোহী, পূর্ব্ববর্ণিত ইউরোপীয় সৈনিকদের দ্বারা পরিচালিত ছয়টা কামান ইহাই ছিল সমরুর মোট সম্বল। এই ধরণের সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্ত্তিতা বলিয়া যে কিছুই থাকিতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলিবৃষ্টির মধ্যে যদিই বা কিছু দেখা যাইত, কিন্তু অবসর সময়ে শিবির মধ্যে পানোন্মত্ততা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত অপর কিছুই পরিলক্ষিত হইত না। উহাদের যুদ্ধপ্রণালীও খুবই সাধাসিধা ছিল। ভারতীয় যে নৃপতি তাহাদের নিযুক্ত করিতেন যুদ্ধকালে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর সহিত ইহাদের সহযোগিতা করিবার কথা থাকিলেও সে বিষয়ে কিছুই বিবেচনা করা অর্থাৎ তাহারা কিভাবে সৈন্যসমাবেশ করিয়া কি ভাবে যুদ্ধ করিবে এ সকল কথা আলোচনা করা তাহারা প্রয়োজনীয় বোধ করিত না। নিজেদের সুবিধামত যখন, যেভাবে ইচ্ছা ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিত: যতক্ষণ মূলবাহিনী যুদ্ধ করিত, ইহারাও রণস্থলে উপস্থিত থাকিয়া গোলাগুলি চালাইত; এবং মূল সেনাদল যদি পশ্চাৎপদ হইবার লক্ষণ দেখাইত তবে সর্ব্বাগ্রে ইহারাই নিজেদের কামান ঘুরাইয়া লইয়া পদাতিকদলের গুলিবৃষ্টির আবরণের মধ্যে সরিয়া পড়িত! সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর পক্ষপরিবর্ত্তন করিয়া বিজেতার দলে গিয়া যোগ দিতেও ইহাদের বাধিত না! সমরুর সেনাদল সম্বন্ধে উক্ত হইলেও পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা এ যুগের অধিকাংশ সেনাদল সম্বন্ধে সমভাবে প্রযুজ্য। এই সেনাদলকে সমরু কঠোর শাসনে কতকটা সামরিক শৃঙ্খলা ও বশ্যতায় আনিয়াছিল। জাঠদের হইয়া এই যুগের অনেক যুদ্ধেই সমরু উপস্থিত ছিল। কিন্তু সে সকল খণ্ডযুদ্ধ, অবরোধ, জয়পরাজয়ের দীর্ঘ বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ সাহ আলম এলাহাবাদে দীর্ঘ প্রবাসের পর মহাদজী সিন্ধিয়ার চেষ্টায় দিল্লী ফিরিয়া আসিয়া আবার মোগলের মহাগৌরবময় তখ্‌তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার প্রধান সহায় মন্ত্রী নজফ খাঁ মোগলের পূর্ব্বগৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জাঠরা এই সময় আগ্রা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। নজফ খাঁ জাঠহস্ত হইতে আগ্রানগরী উদ্ধার করিলেন। তাঁহার সেনাদল অতঃপর জাঠরাজধানী ভরতপুর অভিমুখে অভিযান করিবার আয়োজন করিতেছে, সংবাদ আসিল চতুর জাঠসেনা অন্যপথে ঘুরিয়া দিল্লী আক্রমণে চলিয়াছে এবং রাজধানী হইতে মাত্র ৩৬ মাইল দূরবর্ত্তী সেকেন্দ্রাবাদ অধিকার করিয়া লইয়াছে। বর্ষারম্ভের জন্য তখনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রহিল, জাঠরা সেকেন্দ্রাবাদেই বর্ষাবাস করিল। হেমন্তের প্রারম্ভে সমরুর ব্রিগেড তাহাদের সহিত যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। মীর্জ্জা নজফ খাঁও এতদিন অলস ছিলেন না। তিনি দশ সহস্র সৈন্য লইয়া জাঠদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধের পর মথুরা জেলার অন্তঃপাতী বারসানা নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। প্রথমে উভয়পক্ষের গোলন্দাজবাহিনী পরস্পরের প্রতি তীব্র গোলাবর্ষণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। জাঠপক্ষের গোলাবর্ষণে কয়েকজন উচ্চপদস্থ মোগল আমীর নিহত এবং স্বয়ং মীর্জ্জা নজফ বাহুদেশে আহত হইলেন। তাঁহার তোপখানা ও পদাতিকদল অসমসাহসে লড়িতেছে দেখিয়া আহত স্থান বাঁধিবার উদ্দেশ্যে নজফ খাঁ শিবির মধ্যে গমন করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনের পর

ভগবানের উদ্দেশ্যে একটী কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিয়া নিজ অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া তিনি শত্রুসেনার ঠিক কেন্দ্র-দেশে প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ভীমবেগে নিপতিত হইলেন। পশ্চাতে আসিল তাঁহার পদাতিকদল। সে বেগ জাঠরা সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। সুধু সমরুর ব্রিগেডই কতকটা শৃঙ্খলার সহিত ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইল। পরদিবস সমরু সসৈন্যে আসিয়া বিজেতার পক্ষে যোগ দিল। বলাবাহুল্য নজফ খাঁ তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে)। সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাহার বেতন নির্দ্ধারিত হইল মাসিক ৬৫০০০৲ টাকা।

বারসানার যুদ্ধে মীর্জ্জার পক্ষেও ফরাসী সেনানী ও তাহাদের গঠিত শিক্ষিত সেনাদল ছিল। অনেকের মতে মীর্জ্জার পারস্যদেশীয় অশ্বসাদিসেনার প্রচণ্ড আক্রমণের পর যে দৃঢ়তা ও উৎসাহের সহিত আক্রমণ করে, প্রধানতঃ তজ্জন্যই যুদ্ধ জয় হয় এবং পদাতিকদলের ঐ উৎকর্ষের জন্য মীর্জ্জার ফরাসী সেনানায়কগণই দায়ী। শ্যেভালিয়র দি ড্যুড্রেনেক, শ্যেভালিয়ে দি ক্রেসী, কাউন্ট দি ময়দাভ্র, ইঁহারা সকলেই অভিজ্ঞ, চরিত্রবান এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয় ছিলেন। এককালে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই মসিয় ল'র দলে সাহ আলমের অধীনে সমরুর সহকর্ম্মী ছিলেন। কিন্তু সকলকার মধ্যে রিণি ম্যাডেকের কৃতিত্বই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এ পর্য্যন্ত সমরু প্রায় দ্বাদশবার প্রভু পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু বাদসাহের কর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর আর সে পক্ষান্তর আশ্রয় করে নাই, তাহার অবশিষ্ট জীবন অতঃপর বিশ্বস্তভাবে সম্রাটের কর্ম্মেই অতিবাহিত হয়। সেনাদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সাহআলম তাহাকে মীরাট অঞ্চলে সার্দ্ধানার বিস্তীর্ণ পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তির আয় ছিল লক্ষ টাকারও উপর। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের দেহত্যাগের পর হইতে প্রায় সপ্ততিবর্ষব্যাপী সার্দ্ধানা অঞ্চলের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিয়া সমরু নিজ জায়গীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিল (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ)। ইহার অনতিকাল পরে বাদসাহ সমরুকে আগ্রার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ এই নগরেই শান্তিতে সমরু অতিবাহিত করে,; আর কোন যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাকে উপস্থিত হইতে হয় নাই।

চন্দননগর ছাড়িবার পর হইতেই সমরু আচার ব্যবহার, সাজপোষাকে তখনকার দিনের সম্ভ্রান্ত মুসলমানী আমীরের চাল গ্রহণ করিয়াছিল এবং তদানীন্তন আমীরদের মত তাহার একটী হারেমও ছিল। এক মুসলমানী স্ত্রীর গর্ভে তাহার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম ছিল এলয়সিয়স ব্যালথাজার রীণহার্ড সমরু (Aloysius Belthazzar Reinhardt Samru)বা নবাব জাফর ইয়াব খাঁ। উন্মাদ-রোগগ্রস্তা সমরুর ঐ স্ত্রীর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় শতবর্ষ বয়সে দেহান্ত হয়। সার্দ্ধানায় ইহার কবর অবস্থিত আছে। সমরুর আর এক বিবাহিতা স্ত্রী বেগম সমরুর নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বেগম সমরুর এবং সমরুর বংশধরদের কথা স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে বলা যাইবে।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে আগ্রা নগরে সমরুর মৃত্যু হয়। প্রথমে নিজ গৃহের উদ্যান মধ্যে তাহার দেহ সমাহিত হয়। তিন বৎসর পরে বেগম সমরু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর উক্ত সমাধি হইতে স্বামীর দেহাবশেষ স্থানান্তরিত করিয়া আগ্রার পাদ্রি সেন্টস চর্চ বা ক্যাথলিক গির্জ্জার কবরস্থানে মহাসমারোহে সমাহিত করেন। কবরের উপর সুন্দর একটি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সমরু সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ছিল। বাল্যকালে কসাইখানায় কাজ করার জন্য তাহার আর লেখাপড়ার সুযোগ হয় নাই। তখনকার দিনে ইউরোপে এখনকার মত শিক্ষার প্রসারও ছিল না। সুদীর্ঘকাল এতদ্দেশীয় সমাজে বাস করার ফলে সে খুব দ্রুত ফারসী ও উর্দ্দু ভাষা বলিতে শিখিয়াছিল। সমরুর গুণের মধ্যে বলিতে গেলে সে কখনও নিজ হীনবংশ হইতে উৎপত্তির জন্য লজ্জানুভব করে নাই সুধু এইটুকু বলিতে হয়। তদ্ভিন্ন তাহার মধ্যে প্রশংসনীয় আর কিছুই দেখা যায় না। কতকটা নীচ ও দুষ্টবুদ্ধির বিকাশ তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া গেলেও, শৌর্য্যবীর্য্য বা সামরিককৌশলের কণামাত্রও তাহার মধ্যে ছিল না। উদ্যম, উৎসাহ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার একেবারেই ছিল না। কে কখন ইংরাজহস্তে তাহাকে ধরাইয়া দেয় এই ভয়ে সমরু সর্ব্বদাই নিজের কাছে বিষ রাখিত বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু এ কথার যাথার্থ্য নিরূপণের উপায় নাই।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এপার-ওপার

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ, বার-এট-ল

পাঁচ

বসন্ত

(গান)

ঋতুরাজ !
তোমার ঘুমের মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে ফেল
নয়ন মেল নয়ন মেল।
দখিন হাওয়ায় ফাগুন এসে
তোমার ঘরে উঠ্‌ল ভেসে,
প্রণাম করি' চরণ তলে লুটিয়ে গেল,
নয়ন মেল নয়ন মেল।

গন্ধ তোমার দাও ছড়িয়ে,
আশীষ তোমার দাও ভরিয়ে
দখিন হাওয়ায়—

রূপের ছবি রঙে মাখা
তোমার চোখে আছে ঢাকা,
বনে বনে রং ছড়াবার সময় এল,
নয়ন মেল নয়ন মেল।

* * * * *

এসেছে আজ দুয়ারে মোর ঋতুর রাজা,
ওরে অবুঝ ! নানান্ রঙে পরাণ সাজা।
কান্না হাসি বুকে ধরে
থাকিস নে আজ ঘরে পড়ে,
আকাশ পানে প্রাণের চাওয়া ঘুরিয়ে দেনা—
বিজয় নিশান উড়িয়ে দেনা।

ঋতুর রাজা বেরিয়েছে আজ পথে পথে
তোর দুয়ারে দাঁড়িয়ে ক্ষণেক সোণার রথে,
রেখে গেল কার বারতা
কার সে মনের গোপন কথা
তোর তরে আজ ছড়িয়ে দিল আকাশে ঐ—
উড়িয়ে দিল বাতাসে ঐ।

তাই ত তার আজ গন্ধটুকু হাওয়ায় ভাসে,
ওপার হতে মোর পানেই ছুটে আসে,
লাগে আমার অঙ্গে অঙ্গে.
বেড়ায় আমার সঙ্গে সঙ্গে,
আমার প্রাণের শিরায় শিরায় কাঁপন লাগে
বড়ই তারে আপন লাগে।

পরাণ আমার আজ ফাগুনে নেশায় দোলে
নয়নে মোর মনের কথা ভাসিয়ে তোলে।
মুক্ত গগন বড়ই উদার
কৃপণ হয়ে রইল না আর,
গাছে গাছে আমের মুকুল ছড়িয়ে দিল
ফুলে ফলে ভরিয়ে দিল।

ভুবন আজি মোদের তরে বাসর সাজায়
মিলন রাগে পাগল হাওয়া সানাই বাজায়।

আজকে যে তার আগমনী
তাইত বাজে নূপুর ধ্বনি
আমার গভীর গোপন কোণে মনের ভিতর
অনেক দূরে বনের ভিতর।

আজকে মোদের মিলন হবে ফাগুন রাতে
আজকে পরশ উঠ্‌বে কেঁপে হাতে হাতে,
রঙিন সাড়ীর ঘোমটা খানি
চাঁদের আলোয় খুলবে জানি,
নত তাহার নয়ন তুলি সরম দিয়ে
চাইবে বারেক মরম দিয়ে।

সেই মিলনের প্রথম আভাস লাগলো প্রাণে
আকাশ বাতাস কইছে কথা কানে কানে,
ফাগুন দিনের সকাল বেলা
ক'রবো না আজ কিছুই হেলা,
প্রাণের দরদ সব খানে আজ ছড়িয়ে দেবো
হাটে মাঠে ভরিয়ে দেবো।

আয়না ছুটে আয়না তোরা ও বিরহী,
আজ আমি চাই সব বেদনা একলা সহি ;
আমার প্রাণের দরদ দিয়ে
সবার প্রাণের পরশ নিয়ে
রূপে রসে করব জীবন কমনীয়
তারই আশায় রমণীয়।

* * * * *

এই যে হাওয়া
পুণ্যা নদীর ওপার হতে আসে
আমায় যেন বড়ই ভালবাসে ;
আজকে আমার কানে কানে
কী যে কী কয় সেই তা জানে,
সোহাগ ছড়ায় আমার সারা গায়ে
লুটিয়ে জড়ায় আমার পায়ে পায়ে।

এই যে হাওয়া
পুণ্যা নদীর দখিন পারের হাওয়া
কার পুলকে করে আসা যাওয়া ;
কার সে প্রাণের পরশ খানি
ওপার হতে এপার আনি
আজ গোধুলির শান্ত ক্লান্ত ছায়া
ভরিয়ে তোলে কার মাধুরীর মায়া।

এই যে হাওয়া
পুণ্যা নদীর ওপার হতে আসা
কার আঁচলে ছিল তাহার বাসা ;
ফাগুন আজি মন্ত্র পড়ে
রঙিন আঁচল শিথিল করে
তাইত সে প্রাণ নিঃশ্বাসেতে বয়
আকুল হয়ে ছোটে বিশ্বময়।

এই যে হাওয়া
জুড়িয়ে দিল আমার সারা প্রাণ
আজ পেয়েছি ঐ ওপারের দান।
আমার বারো মাসের গানে
ওপার হতে আমার প্রাণে
দখিণ হাওয়া ফাগুন এনে তোলে
কত স্মৃতির দোলায় পরাণ দোলে।

এই যে হাওয়া
এত শুধু দখিন হাওয়া নয়
আমি যে পাই অনেক পরিচয় ;
মনে পড়ে বৈশাখে সে
বৈশাখীতে উঠ্‌লে ভেসে

হারিয়ে যাওয়া কত স্মৃতির তরে
পরাণ আজি ওলট্ পালট্ করে।

এই যে হাওয়া
ফাগুন বনের মনের গোপন বাণী
কেন যে বয় আমিত তা জানি ;
আজ গোধুলির পুণ্যখনে
মোদের দোঁহার মনে মনে
কোন সে কালের আদি মন্ত্রটিরে
নিঃশ্বাসিয়া পড়ে ধীরে ধীরে।

এই যে হাওয়া
আজ বসন্ত যার উপরে ভাসে,
কার সে প্রেমের প্রথম দীর্ঘশ্বাসে
কোন্ সে কালের কোন সাগরে
কোন্ সে দূরের দখিন পারে
হঠাৎ তাহার মুক্তি হ'ল সুরু
বিশ্ব ভুবন কাঁপলো দুরু দুরু।

এই যে হাওয়া
যার পরশে সেই সে কাঁপন লেগে
বসুন্ধরা উঠ্ল প্রথম জেগে,
ঘুমে অসাড় অন্ধ ছিল
গভীর প্রেমে ধরা দিল
নয়ন মেলে চাইল ফলে ফুলে
ছলছলিয়ে বাজলো সাগর কুলে।

এই যে হাওয়া
সে দিন হতে যুগে যুগে বয়
সারা ফাগুন ছোটে বিশ্বময় ;
কত কালের কত কথা
কত মনের আকুলতা
স্মৃতি হয়ে প্রাণে গাঁথা আছে
কাঁপিয়ে তোলে আজও গাছে গাছে

এই যে হাওয়া
আজকে নদীর ওপার হতে আসে
মোদের দোঁহার জীবন নিয়ে ভাসে
হয়ত অনেক দিনের পরে
আর এক যুগে আর এক ঘরে
মোদের কথা কইবে বাতায়নে
পাতায় পাতায় গাইবে বনে বনে।

* * *

(গান)

আমার প্রাণে লাগ্‌লো আগুন
আগুন জ্বলে ;
আজকে তোমার লুকিয়ে থাকা চল্‌বে না
আর চল্‌বে না,
সারা ভুবন কেঁপে ওঠে
রূপের অনলে
আগুন জ্বলে।

আজ কোথাও আঁধার আড়াল নাই
আমি তাই ত শুধু চাই
পরাণ ভরে ছড়াই আগুন
জলে স্থলে
আগুন জ্বলে।

আমার নয়ন দুটি
গগন তলে উঠি
আগুন হয়ে রইল চেয়ে তারায় তারায় ফুটি।

আজকে তুমি পড়বে ধরা জানি
তোমার ভাঙ্গবে আড়াল খানি,
দাঁড়াবে আজ অগ্নি শিখার
রক্তদলে
আগুন জ্বলে।

*　　*　　*

আজকে আমার অগ্নিশিখা গগন পানে ওঠে
ফাগুন পূর্ণিমায়
জমাট বেঁধে তাইত আজি পূর্ণ শশী ফোটে
নীল আকাশের গায়।
ঐ যে রূপের পরশমণি ভাসে গগন তলে
মিশিয়ে গিয়ে এক সাথে আজ লক্ষ হীরা জ্বলে
আমার প্রাণে ছিল যে তার বাসা
সৃষ্টিতে তার ছিল শুধু আমার ভালবাসা।

পূর্ণিমায় আজ ভুবন ভরে কী যে মায়া জাগে
অবশ অচঞ্চল
গাছের তলায় আলো ছায়ায় রূপের কাঁপন লাগে
নাচে পরীর দল।
আজকে দেখি বসুন্ধরা আপন বাসর ঘরে
মোহন সাজে লুটিয়ে আছে ফুলের শয্যা পরে।
হাওয়ায় তারি লজ্জাটুকু ভরা
তারই মনের গোপন কথা আজকে দিল ধরা।

খানিক দূরে চেয়ে দেখি পুণ্যানদীর জলে
আকাশ ভেসে যায়
ঢেউগুলি সব রূপের পরশ নাচিয়ে নিয়ে চলে
মেখে আপন গায়।
গগন হতে হাজার মাণিক ঝরণা ধারায় ঝরে
পুণ্যানদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে এসে পড়ে
ঘাটে ঘাটে ছলছলিয়ে লাগে
স্বপ্ন আজি সজাগ হলো গভীর অনুরাগে।

ঘাসে ঘাসে গাছের ডগায় পাতার ফাঁকে ফাঁকে
আলো ছায়ার টানে
এই যে মায়া ছড়িয়ে আছে ইঙ্গিতে আজ ডাকে
কোন অচেনার পানে।
এ যে আমার ছড়িয়ে দেওয়া প্রাণের আবাহন
ভুবন ভরে আজকে তোমায় আমার নিমন্ত্রণ
আকুল হয়ে তোমার পানে চায়
লুটিয়ে আছে, চেয়ে দেখো, তোমার আঙ্গিনায়।

*　　*　　*

গভীর রাতে বাহির হয়ে বন্ধ দ্বার খুলে
একলা আমি গিয়েছিলাম পুণ্যানদী কূলে।
রাত্রি নিঝুম স্তব্ধ আকাশ
স্তব্ধ হলো দখিন বাতাস
সবাই তারা আকুল চোখে আমার পানে চায়
সময় হলো আজকে আমার ফাগুন পূর্ণিমায়।

আজ নিশীথে দেবো পাড়ি পুণ্যানদীখানি,
আজকে মোদের অভিসারে মিলন হবে জানি।
আকাশে ঐ পূর্ণশশী
সজাগ হয়ে আছে বসি
গগন ভরে নয়ন মেলে আমার পানে চায়
আশীর্ব্বাদ ছড়িয়ে দিল আমার সারা গায়।

সম্মুখেই চেয়ে দেখি পুণ্যানদীজলে
এপার হতে পুলকরাশি ওপার ভেসে চলে।
ঊর্দ্ধ বাহু উচ্চ শির
বৃক্ষরাজি শান্ত ধীর
দাঁড়িয়ে আছে কত কালের চির মৌন ধ্যানে
গগন হতে পূর্ণিমায় আজ মন্ত্র টেনে আনে।

গাছে গাছে পাতায় পাতায় চাঁদের পরশ লেগে
হাজার মৃত পরাণ যেন উঠ্‌ল আজি জেগে।
কত যুগের কত কথা
কত ব্যথা ব্যাকুলতা
সজাগ হ'ল আজ নিশীথে আমার আশে পাশে
একলা আমি কেমন যেন শিউরে উঠি ত্রাসে।

আজকে যাবো তোমার দ্বারে বিজয়িনী নারী
বুকের টানে সাঁতার দিয়ে দেবো নদী পাড়ি।
এই যে আমার অভিযানে
মিশিয়ে আজি গেছে প্রাণে
চিরকালের চিরযুগের যত আকুল প্রাণ
জগৎ হতে আজ বিরহ করবো অবসান।

আমি পুরুষ তুমি নারী, মোদের আড়ালখানি
চিরদিনের পুণ্যানদী বইছে আজও জানি।
কোন সে কঠোর পাষাণ গলে
পুণ্যানদী এলো চলে
চিরকালের দুঃখ হয়ে মোদের মাঝে বয়
এই কি শুধু সত্য কথা?—নয় সে কভু নয়,

সারা আকাশ পূর্ণিমায় আজ পুণ্যানদীর জলে
কত কালের অতীত নিয়ে কেবল ভেসে চলে,
তারি মাঝে আছে লেখা
কোন সে যুগে মোদের দেখা
সেই সে প্রথম মিলন ভাসে পুণ্যানদীর গায়
গভীর রাতে প্রকাশ হলো ফাগুন পূর্ণিমায়।

শেষ

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত



রবীন্দ্র-প্রতিভা

শ্রীযুক্ত অপ্রকাশ রায়

Great men ate the earth and
Knew it was sweet---*Emerson.*
A great man is the living
light-fountain—*Carlyle.*

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হচ্চে বহুমুখী। তাঁকে নীট্‌শের Super-man বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ Super-manরা হয় একপেশে মানুষ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা' নন। তিনি সাহিত্য জগৎ ও কর্ম্মজগতে অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েচেন। সেইজন্যে তাঁকে Ultra-superman বলা যেতে পারে। তিনি ভারতের কৃষ্টির দিক্ দিয়েও যা দিয়েচেন তার পরিমাণ করা যায়না। এই প্রবন্ধে আমি সাহিত্য জগতের রবীন্দ্রনাথকে বুঝ্‌তে চেষ্টা কোর্‌ব।

কবি দ্রষ্টা, তবে তার সৃষ্টিটা ভুঁইফোড় একটা কিছু নয়, অব্যক্তকে ব্যক্ত করার মধ্যেই তাঁর সৃষ্টি। মানুষের ভিতর যে বাণীটি বা'র হবার জন্যে গুমরিয়ে মরে, আকুলি বিকুলি করে—অথচ দরজার কপাট থাকে কুলুপমারা, ভাষা বা'র হবার পথ খুঁজে দিশেহারা হয়—কবি সেই কথাটাই দেন প্রকাশ ক'রে, কবি তাকে ছন্দসুষমায় ও সৌন্দর্য্যে মায়াময় ক'রে রূপায়িত করেন। লোক অবাক্ বিস্ময়ে দেখে, সে যে কথাটা প্রকাশ ক'রবার জন্যে মাথা খুঁড়ে ম'রছিল—কবি সেই কথাটাই প্রাণবান্ করে তুলেচেন তাঁর তুলি দিয়ে। তিনি "airy nothing" কে "local habitation and a name" দেননা, তিনি কিছুকে আরো কিছু ক'রে তোলেন। এই জন্যেই ত' কবির প্রতিটি কথাতে আমাদের দেহের অণুপরমাণুগুলি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে —অন্তরে কার উদাস-ছোঁয়া লাগে—বসন্তবাতাস তার মদির চুম্বনে আমাদের বুকে বিলোল-হিল্লোল জাগিয়ে দেয় যেন।

কিন্তু আমাদের এটা ভুল্‌লে চ'লবে না যে কবির আইডিয়ার creation হয় না, হয় emergence। কবির আইডিয়া অমৃত বিলাতে বিলাতে সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে বেরিয়ে আসে। কবি ab nihilo সৃষ্টি করেন না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখের সামনে একটা আধ্যাত্মিক অনুভবের জগৎ খুলে ধরেচেন, অরূপরতনের খোঁজে মানব-চেতনার স্বপনপুরীতে প্রয়াণ করেচেন। আমাদের যে একটা sub-conscious বা অবচেতন জগৎ আছে, তিনি তার মণিকোঠার সন্ধান পেয়েচেন। তাই তাঁর গীতাঞ্জলিতে একজন খ্রীষ্টান মিশনারী David এর Psalms-এর ছায়া দেখেচেন।

কবিতার প্রাণ হচ্চে সঙ্গীত আর সৌন্দর্য্য। Oscar Wildeর মতে যার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনগত কোন সম্বন্ধ নেই তাই সুন্দর। প্রয়োজনের তাড়নায় জন্মে বিজ্ঞান, আনন্দের প্রেরণায় জন্মে আর্ট। প্রাচুর্য্যেই আর্টের আবির্ভাব। সেইজন্যেই মানুষ মাত্রেই সৌন্দর্য্য দেখতে পায় না। সৌন্দর্য্য বুঝতে হ'লে চাই সেই বৃত্তিটা রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেচেন সর্ব্বানুভূতি এবং ব্যর্গস্ যাকে বলেচেন intuition। সাধারণ মানুষ আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ব্যথা করে ফেলে—নীলত্ব ছাড়া তার চোখে আর কিছুই দেখতে পায় না। এর কারণ হচ্চে রসানুভূতির অভাব। দ্রষ্টা-কবি হুইটম্যান বলেচেন,

"When I heard the learned astronomer,
When the proofs, the figures were ranged
in columns before me,
When I was shown the charts,
and diagrams, to add, divide and
measure them,

"When I heard the astronomer where he
lectured with much applause in the
lecture-room,
How soon unaccountably I became tired
and sick,
Till rising and gliding out I wandered off
myself,
In the mystical moist night air, and from
time to time
Looked up in perfect silence at the stars."

প্রকৃতির সংসর্গে থাক্‌তে থাক্‌তে প্রাণে "mute insensate things" এর ছাপ লাগে। কবি বুঝতে পারেন তাঁর সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির নাড়ী চলাচলের নিবিড় যোগ আছে। তাই কোন সময় তাঁর মনে "ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি"র কথা মনে হয়। এই "সর্ব্বানুভূতি" রবীন্দ্র কাব্যের একটি মূল সুর।

রবীন্দ্রনাথ "hidden in the light of thought" থেকে সেই আলো দেখেন যা "was never on sea or land." কীট্‌স্‌ তাঁর প্রসিদ্ধ "Ode on the Grecian Urn"এ বলেছেন,

"Beauty is truth, truth beauty
that is all
Ye know on earth and all ye
need to know."

আর তাঁর Endymion এর প্রথম লাইনটা
"A thing of beauty is a joy for ever."

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত কাব্যগুলিতে এই সৌন্দর্য্যবাদ মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। তিনি পৃথিবীর মধু "to the lees" পান করে ছেড়েছেন। তিনি বলছেন,

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া,"

কবিতাকে তখনই আমরা সেরা আসন দিই যখন দেখি যে ওতে আছে সঙ্গীত, ওতে আছে বৈশিষ্ট্য, ওতে আছে অরূপতা, কল্পনার বিস্তার আর universality বা বিশ্বজনীনতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেখি এই বিশ্বজনীনতা ও সঙ্গীত। যে কবিতাতে সঙ্গীতের দৈন্য আছে—তা' একেবারেই ভূয়ো। কবিতা যাচাই হচ্চে এই সঙ্গীতের কষ্টিপাথরে ঘষে। সঙ্গীতকে সংজ্ঞার গণ্ডীর ভিতরে আনা যায় না। সঙ্গীতকে বুঝতে হলে আমাদের অন্তরের সঙ্গীতের সাহায্য নিতে হবে। Carlyle বলেছেন, "The meaning of song goes deep. Who is there that in logical words, can express the effect music has on us? A kind of inarticulate unfathomable speech, which leads us to edge of the Infinite and lets us for moments gaze into that." রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই সঙ্গীতই তাঁকে উঁচু আসন দিয়েচে। বিদেশীরা যে গীতাঞ্জলির অনুবাদ পড়েই মুগ্ধ হয়ে পড়েচে তার কারণও এই। সঙ্গীত বলতে কথা আসে অসীমতার। এই অসীমের মানে সীমাহীনতা নহে। সীমার ভেতর দিয়েই অসীমের প্রকাশ অনবদ্যতা লাভ করে —তাতেই অসীমের চরিতার্থতা। সীমাই যে অসীমের সঙ্গলাভে উন্মুখ তা নয় অসীমও সীমাতে চায় আত্মপ্রকাশ করতে। একটুখানি ছিদ্র দিয়ে যেমন খণ্ডাকাশ দেখা যায়, সেই রকম ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়ে 'অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌' ভূমার প্রকাশ। এই অসীমতা হচ্চে সঙ্গীতের প্রাণ —অসীমকে কেন্দ্র ক'রে সুরের যে জাল বোনা হয় তাই সঙ্গীত। অসীমতাকে বাদ দিলে রসানুভূতি মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, ধ্বংস হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন,

"The prosody of the stars can be explained in the class-room by diagrams, but the poetry of the stars is in the silent meeting of soul with soul, at the confluence of the light and the dark, where the infinite prints its kiss on the forehead of the finite, where we can hear the music of the Great I Am pealing from the grand organ of creation through its countless reeds in endless harmony."

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির পরতে পরতে

অসীমের এই সুর স্পন্দিত হচ্চে। তা' আমাদের হৃদয়যন্ত্রীর তারে তারে ঝঙ্কার তোলে। অসীমের সুরাভাসই তাঁর কবিতার প্রাণ ব'লে তাঁকে আমরা ভাল করে বুঝতে পারিনে। সেইজন্যেই intellect দিয়ে তাঁর কবিতা বোঝা যাবেনা—আমাদের intuition বা বোধির সাহায্যে তাঁর কবিতা বুঝতে হবে।

কবির অনুভূতি আমাদের সাধারণ অনুভূতির চেয়ে নিবিড়তর। তাই সাধারণ বুদ্ধির কাছে যা অতিশয়োক্তি কবির কাব্যে তাই হয়ে ওঠে মূর্ত্ত সত্য। বিদ্যাপতি বলেচেন,

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।"

আমাদের এমি-বুদ্ধির কাছে এটা হাস্যাস্পদ ঠেক্‌বে কিন্তু কবির চোখ দিয়ে যাঁরা বিচার করবেন তাঁরা এটাকে সত্যি করেই দেখবেন। কবির দৃষ্টি অন্য। নইলে কি Keats চাঁদ দেখে বল্‌তে পার্‌তেন ?

"............thou wast the deep glen—
Thou wast the mountain—top—the sage's pen
The poet's harp—the voice of friends—the sun
Thou wast the river—thou wast glory won
Thou wast my clarion's blast—thou wast my steed—
My goblet full of wine—my topmost deed—
Thou wast the charm of women, lovely Moon !
O what a wild and harmonised tune
My spirit struck from all the beautiful."

রবীন্দ্রনাথের বাণী নিত্যকালের ছন্দে লেখা। তিনি বলেচেন "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" অসীমের সুরসৌন্দর্য্য তাঁর প্রাণে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পেরেচে বলেই তিনি 'life's fitful fever' আর মরণ এই দুটোরই ভয়ের অতীত। সেক্সপীর 'Measure for Measure'এ মৃত্যুর করালতা চিত্রিত করেচেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ খসে গেছে। তিনি বজ্রের আলোতে মহান্ মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হবার সাধ প্রকাশ করেচেন। তিনি মরণকে সম্বোধন করে বলেচেন,

"মরণরে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ মেঘ জটাজুট
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।"

গীতাঞ্জলির একটা কবিতায় তিনি লিখেচেন,

"মরণ যেদিন আসবে তোমার দুয়ারে
কি ধন তুমি দিবে উহারে।
ভরা আমার পরাণখানি
সুমুখে তার দিব আনি
শূন্যবিদায় কোর্‌বনা ত' উহারে।"

এর সঙ্গে তুলনীয় ইংরাজ কবির অমর লাইন কয়েকটি,

"... ... ... for many a time,
I have been half in love with easeful death,
Called him soft names in many a mused rhyme,
To take into the air my quiet breath,
Now more than ever seems it rich to die."

এখন mystic রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করা যাক্। তাঁর বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হচ্চে তিনি mystic—তাঁর বক্তব্য সহজে ধরতে পারা যায় না। তাঁর কথা ধোঁয়াটে, কুহেলী-মাখা।—কিন্তু সত্যই কি রবীন্দ্রনাথ ভাবের প্রকাশকে ধোঁয়ার আড়ালে ঢেকে রাখেন? তিনি মূককে ভাষা দিয়েচেন, স্তব্ধতাকে মুখর করেচেন, সাগরের নীলিমায় সঙ্গীতের অনুরণন শুনেচেন, বিশ্বের heterogeneityতে homogeneity অনুভব করেচেন, তিনি শষ্পশ্যামল আলো-ঝলমল পৃথ্বীর সৌন্দর্যকে ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেচেন। এস্থলে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গীর অনবদ্যতা সম্বন্ধে দু'এক কথা বল্লে বোধ হয় অন্যায় হবে না। আমাদের একথা ভুল্‌লে চলবে না যে রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাবের ভাগীরথীকে বয়ে আনেন নি, ভাষার ভাগীরথীকেও এনেছেন।

বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা কোন কিছুর চেয়ে ন্যূন নয় সত্য কিন্তু প্রকাশের ষ্টাইল বা রীতিও ফেলবার জিনিষ নয়। অর্থের স্পষ্টতার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মদনমোহনের

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।"

আর রবীন্দ্রনাথের

"তখন তরুণরবি প্রভাতকালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীলজল
করিতেছে থলথল
রাঙ্গারেখা জলজল
কিরণমালে
তখন উঠিছে রবি গগনভালে।"

এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গীর দিক দিয়ে দুয়ের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। "Galsworthy বলেছেন, "That aesthete to be sure was right, when he said, 'It is style that makes one believe in a thing ; nothing but style." এবং—"Those fastidious few for whom all art is style and only style"

রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা ছেড়ে দিয়ে যদি গদ্যের কথা ধরা যায় তাহ'লে আমরা দেখ্‌ব যে এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের আসন বিশ্বসাহিত্যিকদের আসরে নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে। তিনি যদি কেবল গদ্যই লিখতেন, তবুও আমরা তাঁর সম্বন্ধে বলতাম, Galsworthy টুর্গেনিভ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, "No greater poet ever wrote in prose."। ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল প্রভৃতি গল্পকে prose-poem বলা যেতে পারে। কেউ যে এরকম ভাবে শব্দের জাল বুনে পাঠকের মনকে নাড়া দিতে পারে তা' এগুলো না পড়লে বিশ্বাস হয় না। রবীন্দ্রনাথের নাটকের একজন পাত্র বল্‌ছে, "মহারাজ, আমার কথা বুঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।" পূর্ব্বে কবিতায় যে সঙ্গীতের কথা বলেচি—গদ্যে যখন সেই সঙ্গীতের সুরঝঙ্কার শুনতে পাওয়া যায়, তখন তা' হ'য়ে ওঠে গদ্য-কবিতা। রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রহাস বল্‌ছে, "সর্দ্দার, তুমি বারেবারেই প্রথম, তুমি ফিরেফিরেই প্রথম"। একটি মাত্র লাইনে এরকম ভাবে চিত্তশতদলের রঙীন সবগুলি পাপড়ি মেলে দিতে কয়জন পারে?

যিনি অপ্রকাশ্য ভাবকেও ছন্দোবদ্ধ করেচেন, যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপরাজ্যের আলোকে সকলের চোখ ঝলসিয়ে দিয়েচেন, যাঁর রচনারীতি অনবদ্য তিনি মিষ্টিক হলেন কেন? তাঁর কাব্যের ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে প্রথম জীবনে তিনি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর প্রেমে পড়েছিলেন। এই কাব্যলক্ষ্মীকেই তিনি বলেচেন, 'জীবনদেবতা,' 'প্রেয়সী' ইত্যাদি। কাব্যলক্ষ্মীই রবীন্দ্র-কাব্যমধুর উৎস। এই কাব্যলক্ষ্মী কবিকে নানাভাবে সঙ্গ দিয়ে এসেছে—জীবনদেবতাকে উদ্দেশ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেচেন,

"একি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।"

এই কাব্যলক্ষ্মীই তাঁর অন্তরতম।

"ওহে অন্তরতম
মিটেচে কি সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম?
দুঃখসুখের লক্ষধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।"

এই কাব্যলক্ষ্মী রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গীনী।

ইনিই কবিকে নানা ফাঁদে ভুলান, নানা ছলে হাসান। শিশুকালে কবির মানসপ্রতিমা ছিলেন খেলার সঙ্গিনী, যৌবনে তিনি হলেন কবির অন্তররাজ্যের সম্রাজ্ঞী।

"বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিন তরে
আমার অন্তর-গৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছ সুখদুঃখ লয়ে
যেখানে আমায় যত লজ্জা আশা ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয়
এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গেহিনী,
অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

এই কাব্যলক্ষ্মীর জন্যেই রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্য লেখা হোলো না। তাই তাঁর কবিতা, "essentially lyrical." রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের দেবীকে উদ্দেশ করে বলচেন,

"আমি নাব্‌ব মহাকাব্যে
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন
কিঙ্কিণীতে।
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।"

এই কাব্যলক্ষ্মীর সাথে বহুদিন বিচ্ছেদের পরও আমরা দেখতে পাই যে কবির মানসপ্রিয়া তাঁর অন্তরে উঁকিঝুঁকি দিচ্চে।

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হ'লো যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী?
কাজে ফেলে মোরে চ'লে গেলে কোন্ দূরে,
মনে প'ড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে,—
বাজাইলে কিঙ্কিণী,
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।"

কাজেই বোঝা যাচ্চে যে কবির জীবনের উপর 'জীবন দেবতা'র প্রভাব কতখানি। এই দেবতাই কবির কাব্যরসের খোরাক জুগিয়েচে। এই দেবতা কবির হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েচে। কিন্তু, মানুষের চিরন্তন 'hunger for the absolute,' বেদান্ত পরিভাষায় যাকে বলে ব্রহ্মক্ষুধা, কবির প্রেমকেও হার মানিয়ে দিলে। প্রেয়সীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরই হচ্চে, মরমী রবীন্দ্রনাথের জন্ম। "অল্পে সুখমস্তি" এবং "যদল্পাং তন্মর্ত্তাম্।" অমৃতের পুত্র রবীন্দ্রনাথ 'তমসঃ পরস্তাৎ' আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে পেতে চাইলেন। বৈজ্ঞানিক এডিসন ম'রবার আগে বলেচেন, 'It is beautiful over there.' গোটে ম'রবার সময়, 'Light, more light' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সুন্দরতম আলোর দেবতাকে খুঁজতে চাইলেন। তাঁকে কে যেন ডাক দিয়ে গেল। তিনি শেষ খেয়ায় যেতে প্রস্তুত হ'লেন। আঁধারের পারে জ্যোতির্ম্ময় দেবতা তাঁকে মুগ্ধ করল।

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্‌টা পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।"

পরে গীতাঞ্জলিতে অতীন্দ্রিয়তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখ্‌তে পাই। রবীন্দ্রনাথ এখানে pantheist। তিনি সব কিছুর ভিতরেই 'divine immanence' অনুভব করেচেন। তিনি গীতাঞ্জলিতে mystic। এই অতীন্দ্রিয়তা প্রকাশের পঙ্গুতা নয়, ভাবকে দুর্ব্বোধ্য ক'রবার ফন্দী নয়, কুহেলীর যবনিকান্তরালে আত্মগোপন করা নয়; অতীন্দ্রিয়তা রূপাতীতকে, অরূপকে, অব্যক্তকে রূপ দিয়ে প্রকাশ ক'রবার একটা বিশেষ পন্থা। ঐ যে সূর্য্য তার চম্পককিরণমালা দিয়ে পৃথিবীর ব্যথা মুছে নেয়, ঐ যে চাঁদ জ্যোছ্‌নার কড়া মদে আমাদের মাতাল করে দেয়, ঐ ফুলের দল আকাশে

নিবিড় নেশা ধরিয়ে দেয় ; আবার তারার দল দুষ্টু চোখের অবাক্ দৃষ্টি মেলে কানাকানি করে, নদী তার গান পাহাড়ে-পাহাড়ে শব্দিত ক'রে ছুটে চলে, বসন্ত পাতায় পাতায় গভীর-ভাবে-ভরা মন্ত্র লিখে রাখে, ঘন-বীথিকা সবুজের অন্নসত্র খুলে দেয়, বনের অন্তর-রসের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। যে রহস্য-দেবতা এদের ঘিরে আছে, তাঁকে ত' প্রকাশ করা যায় না। তাঁকে যায় কেবল অনুভব করা—সে দেবতার যে পা-টিপে-টিপে চলা আমাদের মর্ম্মের মাঝখানে—সেখানকার আনাচে-কানাচে তাঁর গোপন পদসঞ্চার। কথার বাঁধনে নীরবকে বাঁধা যায় না—যিনি আমাদের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে সুখদুঃখের খঞ্জনী বাজিয়ে ঘুম-পাড়ানো সুরে মানস-মধুপের গুঞ্জনধ্বনিকে চিরন্তন করেচেন, তাঁকে তো প্রকাশের শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না, পৃথ্বীর অণুতে অণুতে যে স্পন্দন গানের সুরধুনী ব'য়ে আস্চে সৃষ্টির আদিমকাল থেকে, রবীন্দ্রনাথের চিত্তবীণার তারে তা' তুলেচে প্রাণ-মাতানো ঝঙ্কার। তিনি বিশ্বের আপাত-বিরোধ ও ঐক্যের ভিতর একটা 'unifying principle' দেখতে পেয়েচেন। তিনি এই পৃথিবীকে বাইরের চোখ দিয়ে দেখেন নি—দেখেচেন অন্তরের চোখ দিয়ে—অনুভব করেচেন অন্তরের অন্তর দিয়ে।

এই বিশ্বের কতটুকুনই বা পারি বুঝতে ! 'Nature is preternatural.' ইংরাজ মনীষী বলেচেন,

"This green flowery rock-built earth, the trees, the mountains, rivers, many-sounding seas ;—that great deep sea of azure that swims overhead ; what *is* it ? Ay, what ? Science has done much for us, but it is a poor science that would hide from us the great deep sacred infinitude of Nescience, whither we can never penetrate, on which all science swims as on a mere superficial film. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, *magical* and more, to whosoever will *think* of it"

অসীম এই সীমার ভিতর ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। রবীন্দ্রনাথও রূপাতীতকে মানুষের ভাষায় রূপান্বিত কর্তে পারেন নি। এখানে তিনিও স্তব্ধ—কথা কইবার স্পর্দ্ধা তাঁর নেই। তাই তাঁকে মুসলমান বৈদান্তিক সুফীদের মতন মরমী হতে হয়েচে। তিনি স্বচ্ছ সাবলীল অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি ক্ষুণ্ণ করে বাঁকা পথে গিয়েচেন। তিনি প্রকাশ করেন নি—ইঙ্গিত করেচেন। যাঁকে তিনি প্রকাশ কর্বেন, তাঁর একটা aspect বা বিভাব দিয়েচেন - তার পরেই তিনি চুপ। গোেটে তাঁর ফাউষ্টএ বলেচেন,

> "Who can know Him ?
> Who can express Him ?
> Seeing, feeling
> Who can deny this being ?"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক নাটকগুলিতেও অতীন্দ্রিয়কে অতীন্দ্রিয়তা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেচেন। সেই জন্যেই তাঁর রূপকনাটকে actionএর একান্ত অভাব। উপানন্দ পুঁথি নকল কর্‌চে, সুদর্শনা রাজবেশী সুবর্ণের গলায় মালা দিল, অচলায়তনের প্রাচীর ধ্বসে পড়ল, অমল জান্‌লায় ব'সে থাকে—কব্‌রেজের নিষেধে তার বাইরে যাবার যো নেই—ঘটনা হিসেবে এদের মূল্য কতটুকু । কিন্তু এসব বাজে ঘটনাগুলোকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তা ফুটে উঠেচে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে actionএর দিকে ঝোঁক দেন নি, ঝোঁক দিয়েচেন atmosphere সৃষ্টির দিকে। তিনি 'atmosphere' সৃষ্টি ক'রেই নিজের কাজটুকু সেরেচেন। মেতারলিঙ্কএর নাটকেও আমরা সেইরকম দেখি। 'Intruder' নাটকে মৃত্যুর আগমনী দেখাবার জন্যে মেটারলিঙ্ক 'atmosphere' সৃষ্টি করেচেন। বাতাস বইচে, পাতাগুলি মর্ম্মরিত হচ্চে, কার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্চে—বনবীথিকা ভয়ে কালো হ'য়ে উঠেচে—এরকম 'atmosphere'এর ভেতর মৃত্যুরাজের জয়াগমনী। প'ড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের

> "রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজ মম
> গর্ব্বিত নির্ভর,—
> বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,
> জয় তব জয়।"

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে এই 'atmosphere' এর মনোরম প্রকাশ দেখতে পাই। পুরোণো নাট্যকারেরা

অলৌকিক ভয়ের দৃশ্য দেখিয়ে 'atmosphere' সৃষ্টির প্রয়াস পেতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে Macbeth এর witch বা Hamlet এর প্রেতাত্মার কথা বলা যেতে পারে। আজকালকার যুগে এ সব ছেলেমানুষী কাণ্ডে মন সায় দিতে চায় না—তাই অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়। 'রাজা'তে রাজা কোথায়ও রঙ্গমঞ্চে দেখা দেবেন না—এতে নাটকের মস্ত একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েচে। সুদর্শনা রাজাকে দেখবার জন্যে আকুল—কিন্তু কালো আঁধার ভেদ হ'বে কি দিয়ে? ভক্তের আকুলতার সীমা নেই—কিন্তু আঁধারের যবনিকা দিয়ে যে আলোর দেবতাকে লুকিয়ে রাখা হয়েচে। অধীরতা সেই যবনিকা ছিন্ন করতে পারে না ব'লেই ত' এত ব্যর্থতা। নাটকের রাজা সেই নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ব্রহ্মের রূপক, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এবং যাঁকে 'শ্রুতয়া' পাওয়া যায় না, 'মেধয়া' পাওয়া যায় না। রক্তকরবীতে আমরা রঞ্জনকে কোথায়ও দেখতে পাইনে—অথচ সেই নন্দিনীর আর পাঠকের মন অধিকার ক'রে আছে। ডাকঘরে ডাকহরকরার উদ্দেশ নেই। যেমন মেতারলিঙ্কের তিল্‌তিল মিতিল নীলপাখীর সন্ধানে উন্মত্ত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের অমলও সেই রকম রাজার চিঠির জন্যে পাগল হয়েচে।

রবীন্দ্রনাথ মরমী হ'লেও তাঁর হৃদয় চিরসবুজ। আমাদের সমাজ অচল, অনড়, ভুলে-ভরা। যে সমাজ "Anabolism" ও "Katabolism" প্রাণিদেহের আদান ও বিসর্গ এই দুটো গুণ হারিয়েচে তাকে মরা বল্লে রাগ করার কোন কারণ থাকতে পারে না। বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ এই অচলায়তনের প্রাচীর ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান। তাঁর মনের সক্রিয়তার একটা মস্ত বড় প্রমাণ হচ্ছে তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'। ওটা প'ড়ে মনে হয় যেন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁর মত কিছু বদ্‌লেচে। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জীবনের সংকীর্ণতায় তুষ্ট হ'তে পারেননি। একটা মহত্তর জীবনের রসাস্বাদন করতে তাঁর মন উন্মুখ হয়েছিল। তাই 'মাথায় ছোটো বহরে বড়ো' বাঙ্গালী সন্তানের চেয়ে বেদুইনদের 'adventurous' জীবনই তাঁর নিকট প্রিয়।

"ইহার চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন!
চরণতলে বিশাল-মরু দিগন্তে বিলীন,—
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি' চলেছি নিশিদিন;
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।"

যিনি "দিনের শেষে ঘোমটা-পরা ছায়ায়" মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনিই গতির পুলকে চঞ্চল 'বলাকা' লিখে আশ্চর্য্য ক'রে দিলেন সকলকে। কমল গতি সম্বন্ধে বলেচে, "দ্রুতবেগের ভারী একটা আনন্দ আছে। গাড়ীরই বা কি আর জীবনেরই বা কি! কিন্তু যারা ভীতুলোক তারা পারে না; তারা সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ-হাঁটার দুঃখটা যে বাঁচলো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই খুসী, নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায় না।" বলাকাতে গতির philosophy উদ্ঘাটিত হ'য়েচে। রবীন্দ্রনাথ এতে তাঁর নিত্য নব-প্রাণের পরিচয় দিয়েচেন।

মানুষের জীবন ছেলেখেলা নয়। তার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেই হচ্চে তার fulfilment বা চরিতার্থতা। তাই তাকে Lotos-eaterদের মত হ'লে চলবে না।

"How dull it is to pause, to make an end,
To rust unburnished, not to shine in use,
As tho' to breathe were life" (Tennyson)

মানুষ এসেচে ভগবানের পাদপদ্ম থেকে।

"Not in entire forgetfulness,
And not in utter nackedness,
But trailing clouds of glory do we come,
From God who is our home." (Wordsworth)

কাজেই মানুষকে চ'লতে হবে, তার পথে

"We are such stuff
As dreams are made of, and our little life
Is rounded with a sleep." (Shakespeare)

এই সব pessimism এর স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ "বলাকায়" পথ চলার ছন্দকে রূপ দিয়েচেন,

"মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেচে তরী;
কোথায় পৌছিবে ঘাটে কবে হ'বে পার।

সময় ত নাই শুধাবার
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি'
বাহিয়া চলিতে হ'বে তরী'
টানিয়া রাখিতে হবে হাল,—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।"

কবির কাছে পথই সব। তিনি পড়েচেন পথের প্রেমে—"সহস্র ধারায় জীবন-নির্ঝরিণী মরণের কিঙ্কিনী বাজায়ে" ছুটে চলেচে। হংস-বলাকার মতন তাঁর পাখা "ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত" হয়েচে, তিনি জানেন, তাঁর পথ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" তাই তিনি ব'লচেন,—

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার—
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার;
সে তো নহে সুখ, ওরে সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

* * * *

রূপবিলাসী রবীন্দ্রনাথ যে কোনদিন রেখা-মায়াবী হ'য়ে আবির্ভূত হ'বেন একথা কেউ কখনও ভাবেনি। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে একখানা পত্রে লিখেছিলেন, "র‍্যাফেল তাঁর কবরের ভিতর নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে থাক্‌তে পারেন—আমি তাঁর যশ লাঘব করবোনা।" রবীন্দ্রনাথের কোন ছবি র‍্যাফেলের ম্যাডোনা বা লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির মোনালিসার মত প্রসিদ্ধ হবে কিনা তা' ভবিষ্যৎই জানে। তবে এটা ঠিক যে তিনি চিত্ররাজ্যে নতুন ভাবধারা এনেচেন। তাঁর ছবিগুলি য়ুরোপে অনেক খ্যাতনামা সমালোচকের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা পেয়েচে। বার্লিনে, নিউইয়র্কে যেখানেই ছবিগুলি দেখানো হয়েচে, সেখানেই দলে দলে 'টাগোরে'র আর্ট দেখতে গিয়েচে।

'A true painter paints ideas and not objects.' ফরাসী শিল্পী রোঁদা তাঁর একটা মূর্ত্তিকে অঙ্গহীন করেচেন—মূর্ত্তিটার হাত পা' কিছুই নেই। তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্লেন, "আমি চেয়েচি নিষ্ক্রিয়তার মূর্ত্তি গড়্‌তে—তাতে হাত বা পা'র কি দরকার। সেইজন্য আমি স্বেচ্ছায় মূর্ত্তিটাকে অঙ্গহীন করেচি।" বড় বড় শিল্পীরা জীবনের নিখুঁত চিত্র এঁকে সন্তুষ্ট হ'ন না। তাঁরা চান মানুষের মনের কোন একটা বিশেষ ভাবকে, চিন্তার লীলায়িত ছন্দকে, তুলির রেখায়, বর্ণের উজ্জ্বলতায় রূপায়িত কর্‌তে। রবীন্দ্রনাথের ছবি চোখকে ভুলায় না—অন্তরে গিয়ে নাড়া দেয়। সেইজন্যেই কুমারস্বামী বলেচেন, "Tagore's pictures are verses in lines."। এতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে কোন কিছুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন নি—মনের বিশেষ একটা ভঙ্গীকে সজীব ক'রে তুলেচেন। যে আর্ট নিয়ে "শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাম্" মৃগীকে অঙ্কিত করা হয়, রবীন্দ্রনাথ সে আর্টের পূজারী নন্। তিনি বাইরের কোন কিছুকে আঁকতে যাননি, তিনি ভিতরের বস্তুকে 'symbolise' করেচেন। এই জন্যই তাঁর ছবি mystic হ'য়ে উঠেচে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে প্যারিসের একটা কাগজ লিখেছিল, "Tagore's drawings and aquarelles are by no means abstract intellectually and psychologically. They are dream-forms that lead the soul past barriers to a land illumined by an imaginary light.

য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক Max Geri বলেচেন, "In his rest and hours between his verses, between the songs of beasts and men, of love and longing, he paints a few pictures of error and reconciliation. His life's lamp flickers in the evening wind and throws dancing shadows of those songs on the wall."

উপসংহারে, 'Great Sentinel' রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ ক'রে বলি,—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্বঃ॥
উদ্যতে নম উদায়তে নম উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ স্বরাজে নমঃ সম্রাজে নমঃ॥

শ্রীঅপ্রকাশ রায়

চোর

শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ মিত্র এম্‌-এস্‌-সি, বি-এল্‌

১

একে একে সরমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে সে কোন প্রকারে বশে আনিতে পারিল না। দিনের পর দিন, দুঃখ দৈন্য এবং লাঞ্ছনার গ্লানি ধীরে ধীরে তাহাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অর্থের সহিত অর্থসংগ্রহের সকল প্রকার মিথ্যা ছলনা প্রবঞ্চনা যেমন নিঃশেষ হইয়া আসিল, স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎও তেমনি দুর্লভ হইয়া উঠিল। সাত বৎসর বিবাহ হইয়াছে, সাত মাসও সরমা স্বামীর সহিত ঘর করিতে পারে নাই। পাবার গ্লানি আজ তাহার না পাবার দুঃখটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

অন্নসংস্থানের শেষ সম্বল ধানের জমিটুকু অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়া সুরেশ কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। মাস তিনেক পরে সহসা একদিন গৃহে ফিরিয়া তুচ্ছ একটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তুমুল বিরোধের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বিরোধের বিষয় বস্তুটা অতি পুরাতন এবং ততোধিক লজ্জাজনক।

দক্ষিণ কোঠার কুসুম বৌএর অসুখ করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে সরমার সেদিন একটু রাত হইয়াছিল। খিড়কীর দ্বারে পা দিয়াই সুরেশকে বারাণ্ডার চারিপাশে পায়চারি করিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। ছেলে কোলে করিয়া স্বামীকে পাশ কাটাইয়া ঘরে যাইবার উপক্রম করিতেই সুরেশ একনিমেষে পুত্রকে তাহার কক্ষচ্যুত করিয়া বজ্র মুষ্টিতে সরমার ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিল—বিনোদ মুখুজ্যের বাড়ী যাওয়া হ'য়েছিল বুঝি!—বিনোদ কুসুমের স্বামী। সন্দিগ্ধ স্বামীর কুৎসিৎ ইঙ্গিতে মুহূর্তের মধ্যে তাহার সমস্ত অন্তর মন একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সরমা আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, জোর করিয়া নিজেকে স্বামীর কবল হইতে মুক্ত করিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া তিক্তকণ্ঠে কহিল—নিজের দিকে চেয়ে দেখে তবে পরকে ব'লতে এস।

খোঁচা খাইয়া সুরেশ ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া হিংস্র পশুর ন্যায় সরমার দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সরমা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সুরেশ ক্ষিপ্রহস্তে স্ত্রীর হাতের সোনার রুলী দু-গাছি খুলিয়া লইয়া এক নিমেষে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া খোকন সমস্তই দেখিতেছিল ভয়ে কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল। সুরেশ চলিয়া যাইতে সে একেবারে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া খোকনকে বুকে চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধ অশ্রু তাহার দুই গণ্ড ভাসাইয়া দিল। পত্নীত্ব যখন ক্ষুব্ধ হয় মাতৃত্ব তখন এমনি করিয়াই মুক্ত হইয়া ওঠে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সরমার দুর্ভাবনার অবধি রহিল না। ভোরের আলো না ফুটিতেই পাড়াপড়শীদের অপ্রীতিকর আলোচনা, করুণ সহানুভূতি, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ তাহার সমস্ত অন্তর মন একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিবে।

সরমা ভাবিতেছিল, রাতের অন্ধকার শেষ না হইতেই সে যদি এমন কোন স্থানে আত্মগোপন করিতে পারিত যেখানে পরিচিত আত্মীয় বন্ধু তাহার কেহ নাই তাহা হইলে সে যেন সত্যই শান্তি পাইত। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড়তম, অন্তরের অনুভূতিও সেখানে গভীরতম।

সকাল বেলায় শয্যাত্যাগ করিয়া সরমা দেখিতে পাইল, গতরাত্রে স্বামীর নিষ্ঠুর পীড়ন তাহার প্রতি অঙ্গে গভীর

ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। ডান হাতখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে, চিবুক কাটিয়া গিয়াছে, পায়ে অসহ্য বেদনা সোজা হইয়া চলিতে কষ্ট হয়।

এই পীড়িত পঙ্গু দেহটাকে লোকচক্ষুর সকরুণ দৃষ্টির সম্মুখে বাহির করিতে তাহার কেমনই যেন বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল। পরক্ষণেই নিদ্রিত শিশুপুত্রের নিশ্চিন্ত কচি মুখখানির দিকে চাহিয়া সরমা বুঝিতে পারিল, লাঞ্ছনা তাহার যত বড়ই হউক সহ্য তাহাকে করিতেই হইবে।

দেহের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া সরমা অতি কষ্টে সোজা হইয়া সহজ মানুষের মত চলিবার চেষ্টা করিয়া শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে খিড়কীর পুকুরের দিকে চলিল। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না, দূর হইতেই শুনিতে পাইল তাহারই আলোচনায় ঘাট-টি একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

রায়ের বাড়ীর ন-বৌ বলিতেছে অমন শোয়ামী থাকার চেয়ে না থাকা ঢের ভাল, কথায় বলে, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল—এমন লক্ষ্মি বৌ।—

যদু মুখুয্যের বিধবা মেয়ে আন্না ন'বৌএর কথাগুলি ব্যাখ্যা স্বরূপ আরও একটু পরিষ্কার করিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—ঠিক্ বলেছ ন'পিসি, শাঁখা সিঁদুর বজায় থাক্‌লেই যদি সধবা হ'ত।

মেনা পিসি অদূরে কলমীর ডগা আহরণে ব্যস্ত ছিল, আন্নার কথাগুলি কানে যাইতেই সহসা একটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—শুধু মিন্‌সেকেই দুষলে হয় না, পরিবারের মত পরিবার যদি হয় সাধ্যি কি যে বারমুখো হয়। তেমন মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েনি তাই—নইলে বয়েসকালে তোর পিসেই কি কিছু কম ছেল নাকি, সেজোমামীর কাছে আমার শিক্ষে তাই রক্ষে। সেজোমামা বাড়ী এলে ভয়ে সেজোমামী তক্তপোষের নীচে সেঁদোত, আর সেই সেজোমামা আজ সেজোমামীর কথায় উঠ্‌তে বল্‌লে ওঠে, আর বস্‌তে বল্‌লে বসে।—

সরমার ছোট যা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল—তোমার কথা মানি মেনা পিসি; কিন্তু পরিবার যদি স্বামীর অবাধ্য হয় সে স্বামীর মনে সন্দো হয় কিনা বল। বিনোদ মুখুজ্যেরবাড়ী যাওয়া নিয়েই ত কাল রাত্রে বাধ্‌ল।

ন'বৌ ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে বলিয়া উঠিল—আমাদের অমন বেহায়াপানা দেখ্‌লে, কুচি কুচি করে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিত, মুখ দেখ্‌লে প্রাচিত্তির ক'র্‌ত। সুরোকে ভাল বল্‌তে হবে বৈকি, এত যার সহ্য গুণ, অমন সোয়ামী পাওয়া ভাগ্যের কথা কি বলিস ছোট বৌ?

ছোট বৌ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—সাধে কি আমরা ভেন্ন হ'য়েছি পিসি, লোকে বলে ভাইএর দিকে একবার চেয়ে দেখ্‌লে না, তা বলুক।—

সরমা দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সেস্থানে দাঁড়াইবার মত প্রবৃত্তি আর তাহার রহিল না, শূন্য কলসীটি তুলিয়া ম্লান মুখে পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া প্রাঙ্গণে পা দিতেই সরমা দেখিতে পাইল, খোকন থামের আড়ালে লুকাইয়া কি খানিকটা মুখে ভরিয়া পরম নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া বসিয়া চিবাইতেছে। সম্মুখে একখানা কলার পাতায় পাকা কলা পেঁপে প্রভৃতি খানকয়েক ফলের টুকরা ছড়ান রহিয়াছে। দেখিবামাত্র সরমা বুঝিতে পারিল এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। খোকনের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি খাচ্ছিস্ রে খোকা?—

ভয়ে খোকন একেবারে কাঠ হইয়া গেল, কোনমতে ঢোক গিলিয়া কহিল—সন্দেশ মা, কাকা দিয়েছে।—

—কেন তুই নিতে গেলি, বারণ করেছি না তোকে?—

খোকনের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না, অপরাধীর মত নতদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল।

সরমা তেম্‌নি কঠিন কণ্ঠেই কহিল—ফেলে দে ব'ল্‌ছি।—

খোকন তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল, চোখে মুখে তাহার করুণ কাতরতা ফুটিয়া উঠিল।

ক্রোধের উত্তেজনায় সরমা অবাধ্য খোকনের গণ্ডদেশে ঠাস্ করিয়া একটি চড় বসাইয়া দিয়া তাহার হাত হইতে অর্দ্ধভুক্ত সন্দেশটা ছিনাইয়া লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

খোকন চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সরমার দেবর পরেশ বাড়ীর সীমানার বাঁশের বেড়াটা পার হইয়া ছুটিয়া আসিয়া খোকনকে কোলে তুলিয়া লইয়া বিরক্তির স্বরে কহিল—এ তোমার চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া বৌদি।—

সরমার দু-চোখ দিয়া তখনও আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল, তিক্ত কণ্ঠে কহিল—চোরের ওপর রাগ করি, কি, সাধুর ওপর রাগ করি সে আলোচনা কর্‌তে আমি ত কাউকে ডাকিনি ঠাকুর পো।—

—আলোচনা আমি ক'র্‌তে আসিনি বৌদি, দাদা যদি মানুষ হ'তেন আজ আমাকে আসতেও হ'ত না। বংশের একমাত্র ছেলে তার একটা হিতাহিত ত আমার দেখা উচিত, ঠাকুর দেবতার প্রসাদ মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলে, এটা কি ভাল হ'ল তাই ব'ল্‌তে এলুন।—

মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত সরমা এক মুহূর্ত্তেই নরম হইয়া গেল। এতক্ষণে সে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল? অজানা আশঙ্কায় তাহার প্রাণটা সহসা যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। খোকন তখনও ভাল করিয়া শান্ত হইতে পারে নাই, থাকিয়া থাকিয়া তাহার কচি বুকখানা তখনও ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। পুত্রের মুখের দিকে চাহিতে সরমার কেমন যেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। সহসা সরমার হাতের দিকে পরেশের নজর পড়িতে পরেশ সে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—কাল রাত্রের যত সব কাণ্ড ঐ রুলী দু-গাছার জন্যেই বুঝি।—

কথাটা সরমার অন্তরে গিয়া আঘাত করিল. সে ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছি ঠাকুর পো, অসুখ হ'য়ে ওষুধের দোকানে দেনা হয়েছিল তাই শুধ্‌তে দিতে হ'ল। বলিয়া সরমা নিজের কাছে নিজেই যেন একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। চোখ তুলিয়া পরেশের মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরেশ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—তোমার আস্কারা পেয়েই দাদার আজ এত বাড় বেড়েছে বৌদি; তুমি যদি একটু শক্ত হ'তে তাহ'লে আজ আমাদের সোনার সংসার এম্‌নি করে ছারেখারে যেত না—বোধ হয়!—

সরমা দৃষ্টিনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না।

২

বিকালের দিকে সরমা ঘাটে জল আনিতে গিয়া দেখিল, কুসুম একান্ত নিবিষ্ট মনে জানালায় বসিয়া একখানা চিঠি পড়িতেছে। ফিকা নীল রংএর কাগজ, মাথার দিকে সদ্যফোটা ফুলের ছবি, তাহারই নীচে গোটা গোটা লেখার সারি। কুসুমের গ্রীবা হেলাইয়া বসিবার অভিনয় ভঙ্গী, তাহার চোখের চপল দৃষ্টি, মুখের সলজ্জ হাসি সমস্তই যে তাহার একান্ত পরিচিত!

সরমার মনটা কেমন যেন টন্ টন্ করিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ত্বরিত পদে চলিতে লাগিল। সহাস্যময়ী সরলা পল্লী-বধূটীর সান্নিধ্য তাহাকে যেন অতি নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কুসুমের সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল, সে আজ প্রায় বছর দুই আগের কথা। আজন্ম-পরিচিত স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া বধূটি সেই প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল।

কুসুম সে দিন স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছিল। সরমা অতি সন্তর্পণে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসমাপ্ত চিঠিগুলি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে দিন সেই নব-পরিণীতা, একান্ত অনভিজ্ঞা কিশোরী বধূর প্রথম প্রণয়ের সলজ্জ অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস সরমার চোখে ধরা পড়িয়া গেল। স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে কহিল—বরকে চিঠি লিখ্‌ছ বুঝি?—

বধূটি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া ঘোমটা টানিয়া একান্ত জড়সড় হইয়া সরিয়া বসিল।

সরমা সস্নেহে তাহার মাথায় কাপড় সরাইয়া দিয়া মধুর হাসিয়া কহিল—আমাকে লজ্জা কি-ভাই, মনের মত হ'চ্ছে না বুঝি! প্রথম প্রথম সবারই অমন হয়,—এস আমি লিখে দি' কেমন? বলিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিল।

বধূটির মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল, কোন উত্তর করিল না। সরমা কালিকলম টানিয়া লইয়া বসিল। হাতের আঙুলগুলি তাহার কাঁপিয়া উঠিল, বুকের স্পন্দন দ্রুত হইল, চোখের শিরাগুলি টন্ টন্ করিতে লাগিল। বধূর মুখের উপর সপ্রতিভ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—অনেক দিন অভ্যেস নেই কিনা, সন্তানের মা হ'লে এ সব আর ভাল লাগে না।—

এমনি করিয়া মাতৃত্বের ছলনা দিয়া সরমা সে দিন তাহার পত্নীত্বের দৈন্য আড়াল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

বধূটি লজ্জারক্ত মুখে নতনেত্রে নীরবে বসিয়া রহিল। সরমা অতি পরিপাটি করিয়া পত্রের ছত্রে ছত্রে কিশোর প্রেমের রঙ্গীন ছবি আঁকিয়া চলিল।

অনভিজ্ঞ অপরিচিত পল্লীবধূর দুই চোখ ভরিয়া সলজ্জ কৃতজ্ঞতা যেন ছাপাইয়া উঠিল।

এমনি করিয়াই তাহাদের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিল। কুসুমকে কেন্দ্র করিয়া তুচ্ছ অভিনয়ের অন্তরালে সরমার অতৃপ্ত যৌবনের রুদ্ধ বাসনা গতি পাইল।

কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল, অতিরঞ্জিত হইয়া সরমার স্বামীর কানে আসিয়া ঠেকিল। সরমাকে নীরবে নিগ্রহ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইল। সরমা অতি নির্ম্মমভাবে কুসুমের সহিত সমস্ত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সহসা সে দিন কুসুমের পীড়ার সংবাদ পাইয়া সরমার মনটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে কুসুমকে দেখিতে গেল। তাহার স্নিগ্ধ পরশে কুসুমের দুই চোখ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সরমা কোনমতে উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া সস্নেহে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল—সবই ত বুঝিস্ বোন, সংসারে বাস ক'র্‌তে হ'লে মানুষকে কত শক্ত হ'তে হয়।

কুসুম আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল—এই হতভাগীর জন্যেই তোমার এত শাস্তি দিদিমণি—। সরমার বুকটা সহসা যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত অন্তরমন কুসুমের কথার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, ম্লান হাসিয়া কহিল—নিজের দোষেই মানুষ শাস্তি ভোগ করে কুসুম।—সরমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় কুসুমের সমস্ত মনটা ভরিয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিতে সরমার একটু রাত্রি হইয়া গেল। অদৃষ্টের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস, সরমা সেদিন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীর চোখেই ধরা পড়িয়া গেল, ভিতরে বাহিরে, তাহার রূঢ় লাঞ্ছনার অবধি রহিল না।

রাত্রির অন্ধকার তখনও গাঢ় হয় নাই, সরমা ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছিল, কুসুম ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কাঁদকাঁদ গলায় কহিল—আজ আমাকে কেন দেখ্‌তে যাওনি বুঝ্‌তে পেরেছি দিদিমণি, এই হতভাগিনীর জন্যেই—। কুসুম আর বলিতে পারিল না, চাপা কান্নায় তাহার গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল।

সরমার মুখখানা সহসা কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া একান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরেই কহিল—আমি কাউকে ভয়ও করি না, কারও কথায় তোয়াক্কাও রাখি না।

কুসুম সবিস্ময়ে সরমার মুখের প্রতি চাহিল, কোন কথা কহিল না। সরমা কুসুমের নিকট নিজকে আরও সহজ করিবার জন্য মৃদু হাসিয়া কহিল—রাজপুত্তুরের কোন সন্ধান মিল্‌ল? কুসুমের নিকট তাহার স্বামীর উল্লেখ করিতে হইলে সরমা পরিহাস করিয়া এই নামেই অভিহিত করিত।

চিঠি খানি কুসুম সঙ্গেই আনিয়াছিল, ধীরে ধীরে সেখানা বাহির করিয়া সরমার হাতে দিল।

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে সরমা চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

সুদীর্ঘ চিঠিখানি বিরহকাতর স্বামীর মর্ম্ম-বেদনার প্রলাপ বাণীতে পরিপূর্ণ, স্ত্রীর পীড়ার সংবাদে তীব্র ব্যাকুলতা, স্বহস্তে সেবা করিবার সুযোগে বঞ্চিত হওয়ায় গভীর অনুশোচনা। উপসংহারে নিজের অক্ষমতার জন্য সকাতর ক্ষমা প্রার্থনা।

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে সরমার চোখ দুটী জ্বালা করিতে লাগিল। এই স্বামী সোহাগিনী বধূটীর প্রতি মনটা

তাহার সহসা কেমন যেন বিরূপ হইয়া উঠিল, অন্তরের অন্তস্থলে একটু বিদ্বেষও যেন জমা হইয়া উঠিল।

কোনমতে পড়া শেষ করিয়া মুখে তীব্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল—ন্যাকামী আমি দু-চক্ষে দেখ্‌তে পারি না, পুরুষ গুলো সবই যেন এক ছাঁচে ঢালা—মুখে এক, মনে আর এক—।

কুসুমের রোগ-মলিন মুখখানি এক নিমেষেই ম্লান হইয়া গেল। কথাটা তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না, ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে কহিল—না দিদিমণি, সেবার যখন আমার অসুখ হয় তখন সত্যিই—।

সরমা যেন সহসা ক্ষেপিয়া উঠিল, বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—সাম্‌না সাম্‌নি পড়ে গেলে সবাই অমন করে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম আমারই কি কম ক'রেছে, অম্বলের অসুখটা যেদিন বাড়্‌ত সারারাত ঠায় শিয়রে ব'সে থাক্‌ত।—

সরমার এই অকাট্য প্রমাণ এবং নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার প্রতি কুসুমের মনটা যেন কোন মতে সায় দিতে পারিল না, চোখে মুখে তাহার করুণ কাতরতা ফুটিয়া উঠিল, ব্যথিত স্বরে কহিল—সবাই কি সমান হয় দিদিমণি?

সরমা একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া তিক্ত কণ্ঠে কহিল—হয় না ত কি, কেউ বা লুকিয়ে চুরিয়ে হয়, কেউ বা সাম্‌না সাম্‌নি হয়, এই যা তফাত্‌। দাদাও বৌদিকে ঠিক্‌ এম্‌নি ক'রেই লিখ্‌ত, সেই দাদার জন্যে হতভাগীকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মঘাতী হ'তে হ'ল।

কুসুমকে আঘাত করিবার নিষ্ঠুর আনন্দে সরমার চোখের কোণে কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কুসুম আর কোন কথা কহিল না, মুখখানি চূণ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার দুর্ব্বল, রুগ্ন পা-দুখানা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

সে রাত্রে সরমার পোড়া চোখে ঘুম আসিল না। ক্ষীণ আশার আনন্দে তাহার বুকটা যেন থাকিয়া থাকিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সরমা মনে মনে কামনা করিতে লাগিল—এবার স্বামী বাড়ী ফিরিলে তাহার যেন খুব কঠিন একটা পীড়া হয়। ও পাড়ার ক্ষান্ত মাসীর মেয়েটার সেই শক্ত অম্বলের ব্যামোটা, তিন দিন, তিন রাত্রি, একেবারে অজ্ঞান, অচেতন, জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে পড়িবে না। থাকিয়া থাকিয়া অসহ্য যন্ত্রনায় করুণ আর্ত্তনাদ, তাহার পর আবার তেমনি সংজ্ঞাহীন। 'ও বড় বৌ, বড় বৌ'। স্বামীর আর্ত্তস্বর তাহার কানে পৌছিবে না। পাশের ঘরে খোকনের কান্নার শব্দ, খাবার দিয়া খেলনা দিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য ছোট বৌ এর ব্যর্থ চেষ্টা। লোক জনের আনাগোনা, পুবের ঘরের খোলা দরজায় মেয়েদের ভীড়, মুখে তাহাদের আশঙ্কা ও উদ্বেগের চিহ্ন।

শেষ রাত্রে জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে। চোখ মেলিয়া দেখিবে স্বামী তাহার ঠায় শিয়রে বসিয়া আছে, নিদ্রাহীন চোখ দুটী তাহার কোটরগত, মুখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ, সস্নেহ ব্যগ্র প্রশ্ন—ব্যথাটা কি একটু নরম প'ড়েছে? খোকনকে আন্‌ব? সে মাথা নাড়িয়া নিষেধ জানাইবে, কাঁচা ঘুমে খোকনকে জাগাইলে শান্ত করা কঠিন হইবে।

কিছু খাবে বড় বৌ, একটু আঙ্গুরের রস, দু'টা বেদানার দানা? তাহার পাণ্ডুর মুখে সম্মতিসূচক ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিবে।

দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতেই পাড়া প্রতিবেশী তাহার সংবাদ লইতে আসিবে—রায়ের বাড়ীর ন' গিন্নি, মেনা পিসি, আন্না, কুসুমও বোধ করি নিঃশব্দে সকলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবে।

ন' গিন্নিকে দেখিয়া লজ্জায় সে তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচলটা তুলিয়া দিতে যাইবে, মেনা পিসি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিবে—থাক্‌ না বৌ থাক, ব্যামোর সময় আবার লজ্জা কিসের? ন গিন্নি তাহার স্বামীর মুখের প্রতি একবার প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া মেনা পিসির কানের গোড়ায় মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিবে—এমন সোয়ামী পাওয়া ভাগ্যের কথা। মেনা পিসি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া কহিবে—বৌটা যেন যাদু জানে।

আন্নার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিবে। আহা! মেয়েটাকে দেখিলে বড় কষ্ট হয়, ভাল করিয়া জ্ঞান না হইতেই কপাল পুড়িয়াছে, স্বামী যে কি বস্তু তাহা বুঝিতেই পারিল না।

কুসুমের নিবিড় কাল চোখ দুটীর ছল্ ছল্ দৃষ্টি তাহাকে রোগমুক্ত দেখিবার জন্য অকৃত্রিম শুভ ইচ্ছা জানাইবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিলে, ঠাকুর পো আসিয়া তাহার স্বামীকে জোর করিয়া স্নানাহারের জন্য তুলিয়া দিবে। ছোট বৌ খোকনকে কোলে করিয়া তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। খোকন অভিমান ভরে মুখ ফুলাইয়া তাহার কাকীমাকে আঁকড়াইয়া ধরিবে। ছোট বৌ এর চোখ দুটী সজল হইয়া উঠিবে, সেও চোখ মুছিয়া প্রাঙ্গণের আম গাছটীর দিকে চাহিয়া দেখিবে সীমানায় বাঁশের বেড়াটা যেন আর নাই।

আহা! ছোট বৌ ছেলেমানুষ, ভুলই যদি করিয়া থাকে তাই বলিয়া তাহার উপর ত রাগ করা চলে না।

স্বামী ফিরিয়া আসিলে নিরিবিলিতে বসিয়া একটু কথা বলিবে। এই যদি শেষ দেখা হয়! স্বামীকে বলিবে আমি যদি মরি, আমার খোকনকে যেন অযত্ন ক'রো না।

সরমার মনটা সহসা যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এক নিমেষে তাহার সুখস্বপ্ন শূন্যে মিলাইয়া গেল—স্বামী যদি নিষ্ঠুর পদাঘাতে তাহার সমস্ত আকাশকুসুম ধূলিসাৎ করিয়া চলিয়া যায়!

নিশীথ রাত্রির নিবিড় নিস্তব্ধতা সরমার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি খোকনকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিল, খোকন কাঁচাঘুমে জাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সরমা তাহাকে সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল—স্বামীকে সে একদিন ফিরিয়া পাইবে, তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

৩

কুসুমের প্রাণে নিষ্ঠুর আঘাত করিয়া সরমা কয়েক দিন ধরিয়া মনে মনে কেমনই যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কুসুমের সে রাত্রের সেই ব্যথিত করুণ মুখখানি থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে কেবলই যেন খোঁচা দিতে লাগিল। সহজ হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া পুনরায় কুসুমকে কাছে টানিয়া আনিবার জন্য সরমা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, সুযোগও এক দিন জুটিল।

কুসুমদের প্রাঙ্গণে সেদিন পরেশ পিওনের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরমা আসিয়া মধুর হাসিয়া কহিল—কি গো, রাজপুত্তুরের স্মরণ হ'ল বুঝি!—

কুসুম মনে মনে ঠিক করিয়াছিল সরমাকে সে এড়াইয়া চলিবে, কিন্তু পারিল না।

সরমার স্নিগ্ধ মধুর হাসি, সস্নেহ কোমল কণ্ঠ তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এক নিমেষে তাহার সমস্ত মুখখানি সলজ্জ হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

সরমা, কুসুমের হাতের চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিয়া পুলকিত স্বরে বলিয়া উঠিল—কি খাওয়াবি বল?—

কুসুমের স্বামীর পদোন্নতির সংবাদ, কয়েকদিন পরে বাড়ী আসিয়া কুসুমকে লইয়া যাইবে।

হর্ষে লাজে কুসুম সমস্ত মুখখানা রাঙা করিয়া কহিল—আমি খাওয়াতে যাব কেন? যার উন্নতি হ'ল সেই খাওয়াবে।—সরমার মুখখানা সহসা যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল। কুসুমও কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

সরমা মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া কুসুমের গাল দুটী একটু টিপিয়া দিয়া কহিল—কাগজ কলম নিয়ে আয় তোর মনের মত ক'রে একটা উত্তর লিখে দি, দু-দিন পরে ত চলেই যাবি। কথার শেষ দিকটায় তাহার গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

কুসুম চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম আনিয়া হাজির করিল। অনেক দিন পরে সরমা আবার কলম ধরিল, মুহূর্ত্তের জন্য বুকটা তাহার কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল—

—প্রাণের দেবতা আমার,

কুসুম হাসিয়া একেবারে কুটিপাটি হইল,—এতও তুমি জান দিদিমণি?—

সরমা কোন কথা কহিল না, লিখিয়া চলিল—ভগবান বুঝি এত দিনে তাঁর ভক্ত পূজারিণীর আকুল আহ্বান কানে শুনিলেন। শয়নে স্বপনে সমস্ত কায়মনে শুধু এই কামনাই করিয়াছি। কবে দিনে তোমার ঐ হাসি হাসি মুখখানি দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে পাইব—ইত্যাদি।

নীরবে চিঠি লেখা শেষ করিয়া সরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। লিখিতে বসিয়া আজ সে এতটুকুও হাসিল না, কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া অন্য দিনের মত পরিহাস বিদ্রূপও করিল না।

সরমার স্থির, নিথর গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া কুসুম মনে মনে কেমন যেন একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল, মুখের হাসি তাহার মিশাইয়া গেল। বিস্ময়বিমূঢ়ের মত নীরবে বসিয়া রহিল।

দিন চারেক পরের কথা। সন্ধ্যার পর ছোট বৌ-এর ঘরে পাড়ায় মেয়েদের মজলিস্ বসিয়াছিল। সরমার সহসা মনে পড়িয়া গেল, সকালে খিড়কীর ঘাটে জল আনিতে গিয়া সেখানে, সকলের মুখেই আজ সে যেন কেমন একটা সপ্রতিভ সন্দিগ্ধভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার পর সান্ধ্য-সভার আয়োজন দেখিয়া সরমা এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিল, তাহারই বিরুদ্ধে একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলিতেছে। অজানা আশঙ্কায় তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সরমা অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া ছোট বৌ-এর রুদ্ধ দ্বারের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমেই ছোট বৌ-এর ব্যঙ্গস্বর কানে আসিয়া ঠেকিল—'প্রাণের দেবতা আমার' মরে যাই আর কি!

সঙ্গে সঙ্গে রায়ের বাড়ীর ন'গিন্নি বলিয়া উঠিল—এত ছেনালীও জানে মাগী, কপালপোড়া না হ'লে এতদিন চার পাঁচ ছেলের মা হ'ত। একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে!—

সরমার চোখের উপর সহসা কে যেন একটা কাল পরদা টানিয়া দিল, তাহার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িতেই মেনা পিসির শেষ কথাগুলি তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল—আমার সেজ মামীকে কিন্তু শত্রুতেও কখনও কলঙ্ক দিতে পারেনি, একেবারে পোড় খাওয়া সোনা যাকে বলে তাই, তাঁর কাছেই আমার শিক্ষে।—

ক্ষণকাল পরে সরমা কুসুমের গলারও স্বর শুনিতে পাইল। আমাকে শীগ্‌গীর ক'রে নিয়ে যেতে লিখেছি, আজ রাতের গাড়ীতেই বোধহয় এসে পড়্‌বে। বলা ত যায় না, পুরুষ-মানুষের মন ভাঙ্‌তে কতক্ষণ! কথার শেষ দিক্‌টায় তাহার স্বর যেন একটু ভারী হইয়া উঠিল।

সরমা আর বসিতে পারিল না, মাথাটা তাহার ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। দেওয়াল ধরিয়া কোন মতে টলিতে টলিতে ঘরে ফিরিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জল গড়াইতে লাগিল—ছিঃ ছিঃ হতভাগীর মনে শেষ পর্য্যন্ত এই ছিল!—

পরদিন সকালে উঠিয়া সরমা শুনিতে পাইল, কুসুমের স্বামী কুসুমকে লইতে আসিয়াছে।

ভোর হইতেই যাত্রার আয়োজন চলিয়াছে, বাড়ীর বাহিরে গরুর গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই হইতেছে।

সরমা মনে মনে কেমনই যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, কোন কাজেই মন বসাইতে পারিল না।

আহারাদি শেষ করিয়া সরমা খোকনকে ঘুম পাড়াইতে-ছিল, এমন সময় ছোট বৌ-এর ঘরে কুসুমের গলার স্বর শুনিতে পাইল—আজ তবে আসি দিদি।—

কুসুম বিদায় লইতে আসিয়াছিল।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কুসুম পুনরায় কহিল—দিদিমণির খবরটা মাঝে মাঝে দিতে ভুলো না। একবার দেখা ক'রে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু, ওঁর মত হ'ল না। ভেবে দেখলুম পুরুষমানুষে যা পছন্দ করে না পরিবারের তা করা উচিত না।—

সরমা ধীরে ধীরে ছাতে আসিয়া আলিসার ফাঁকে চোখ রাখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ছোট বৌ কুসুমের হাত ধরিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া গেল। কুসুম গলা বাড়াইয়া একবার নীচের জানালাটার দিকে চাহিয়া দেখিল, বোধ করি চোখ দুটী তাহার সরমাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। সরমার চোখ ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম করিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল সরমা অপলক দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ীখানি সুমুখের রাস্তাটা পার হইয়া, রায়ের বাড়ীর পুকুরপাড় দিয়া আম বাগানটাকে পিছনে ফেলিয়া ধীরে ধীরে বড় রাস্তার বাঁকে আসিয়া ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির অন্তরালে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সরমার বক্ষ ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল—

ভগবান কুসুম যেন সুখী হয়, সে যেন তাহার ভুল বুঝিতে পারে।

৪

কুসুম চলিয়া গেলে সরমা নীচে নামিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া স্বামীর কথা ভাবিতে লাগিল—স্বামী যদি তাহার মানুষ হইত, তাহাকে এম্‌নি করিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না, এম্‌নি করিয়া আজ তাহাকে কলঙ্কের বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হইত না।—ভাবিতে ভাবিতে চোখ দুটী তাহার সজল হইয়া উঠিল, কাপড়ে চোখ মুছিয়া খোকনকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে বার বার করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, স্বামীকে একদিন সে ফিরিয়া পাইবে, খোকন তাহার মানুষ হইয়া উঠিবে, তাহার এ দুঃখের অবসানও একদিন হইবে।

ক্ষণকাল পরে, পরেশ একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি হাতে করিয়া ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—দাদার কীর্ত্তির কথা শুনলে বৌদি।—বলিয়া হাতের চিঠিখানা সরমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। এক নিমিষে সরমার মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন উবিয়া গেল, বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিতে লাগিল, চিঠিখানি তুলিয়া লইবার মত সাহস তাহার হইল না। অতি কষ্টে শুষ্ক ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু উচ্চারণ করিল—কি করেছেন?—

—আমার মাথা আর মুণ্ডু, ভাই ব'লে পরিচয় দেবার মুখ আর রাখলেন না, এইবার নিয়ে চার বার হ'ল, কোন্ বন্ধুর ঘড়ী চুরি ক'রেছেন। তারা লিখেছে, দু-দিনের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা তাদের না দিলে, তাঁকে পুলিশে দেবে।—

সরমার মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইল না। পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল, নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

পরেশ পুনরায় তিক্ত কণ্ঠে কহিল—আমি বলি কি, জেল খেটে একবার শিক্ষে হোক, কিছু ক'রে আর দরকার নেই।—

সরমা বেশ সংযত কণ্ঠেই কহিল—তাই হোক্ ঠাকুর-পো, করারও শক্তি আমার আর নেই।—

পরেশ আর কোন কথা না বলিয়া রুদ্ধ আক্রোশে গস্‌গস্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরে ছোট বৌকে একা পাইয়া, সরমা তাহার হাতের মুঠায় কি একটা বস্তু দিয়া কহিল—তুই ত মেয়েমানুষ ছোট বৌ, সবই বুঝতে পারছিস্।—বলিয়া নিজের হাতের মধ্যে ছোট বৌ-এর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া একেবারে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ছোট বৌ সবিস্ময়ে সরমার মুখের প্রতি চাহিল।

সরমা চোখ মুছিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল—তুই আমাকে ত্যাগ করিস্‌নে ছোট বৌ, তোর মুখ চেয়েই বেঁচে আছি।—

ছোট বৌ-এর চোখ দুটীও ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। কোন মতে উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া, হাত খুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—এ যে খোকনের গলার হার দিদি!—

—বাবা ঐ দিয়ে খোকার মুখ দেখেছিলেন, বাবা আজ নেই—।—সরমা শেষ করিতে পারিল না, কান্নায় তাহার গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

এত আমি নিতে পারব না দিদি।—

সরমা অত্যন্ত হতাশ হইয়া কাতর স্বরে কহিল—এ ছাড়া আর একখানা সোনাও যে ঘরে নেই ছোট বৌ।—

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সরমা সহসা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আছে ছোট বৌ, আছে, সেই বেনারসী সাড়ী জোড়া, একটি দিনের জন্যেও পরিনি, একেবারে নতুন, তুই নিবি ছোট বৌ?—বলিয়া সাড়ী আনিবার জন্য পা বাড়াইতেই ছোট বৌ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—থাক দিদি।—

তাহার পর কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল—ভাসুর ঠাকুরের কোন অমঙ্গল আমি হ'তে দেব না।—বলিয়া সরমার হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সরমার দুই চোখ ভরিয়া সকাতর কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। সরমা ভাবিতে লাগিল—ছোট বৌ-এর বড় মায়া-দয়ার শরীর। ছেলেমানুষ, তাই পাঁচজনের পরামর্শে বাড়ীর মাঝখান দিয়া বাঁশের বেড়াটা দিয়াছে। খোকনকে

ঠিক নিজের পেটেরটীর মতই ভালবাসে। আহা! এতখানি বয়স হ'ল, ভগবান ওর কোলে একটা গুঁড়োও দিলেন না। এবার বাপের বাড়ীর কোন লোকের সন্ধান পাইলে, দ্বারিক ফকিরের একটা মাদুলী আনাইয়া ছোট বৌকে ধারণ করাইয়া দিবে। ঘোষেদের ক্ষেন্তির বেলায় সে স্বচক্ষে মাদুলীর প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াছে। মনে মনে ছোট বৌ-এর সন্তান কামনা করিয়া সরমা দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল।

দিন দুই পরে পরেশ আসিয়া সরমাকে সংবাদ দিল—টাকাটা দিয়ে এলাম বৌদি। এমন বন্ধুও কখন দেখিনি—পাঁচটা টাকাও ছাড়্লে না। পরের গালমন্দ আর সহ্য হয় না। আবার কোথায় উধাও হ'য়েছেন, নইলে ভেবেছিলাম সঙ্গে ক'রে বাড়ী এনে একেবারে বেঁধে রাখ্‌ব।—বলিয়া পরেশ অতি দুঃখে হাসিয়া ফেলিল। লজ্জায়, ঘৃণায়, গ্লানিতে সরমা নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরে সুরেশ একটি টিনের সুটকেস্‌ হাতে করিয়া নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

ছোট বৌ' সরমাকে আসিয়া বলিয়া গেল—ভাসুর ঠাকুরকে এ-বেলা আমাদের ওখানে খেতে বলো দিদি।—

শুনিয়া সরমা মনে মনে পুলকিত হইল।

আহারের ঘন্টা দুই পরে সুরেশের কম্প দিয়া জ্বর আসিল এবং দেখিতে দেখিতে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

সরমা পাশে বসিয়া সুরেশের মাথায় জলপটি দিয়া বাতাস করিতেছিল, সহসা দরজার শিকলটা ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিল। সরমা উঠিয়া বাহিরে আসিতেই, ছোট বৌ অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে কহিল—দিদি, নাইতে যাবার সময় গলার হারটা খুলে বালিশের নীচে রেখেছিলাম, সে কথা মনেই ছিল না, খেয়ে উঠে হারের খোঁজ ক'র্‌তে গিয়ে আর পেলুম না। ঐ ঘরেই ওঁদের খাবার ঠাঁই ক'রেছিলাম, ভাসুর-ঠাকুর খেয়ে আসার পর আর ত কেউ ও-ঘরে পা দেয়নি।—সরমার সমস্ত মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া সহসা অত্যন্ত অপ্রসন্ন-মুখে বলিয়া উঠিল—ভালভাবে না জেনে শুনে কাউকে দুষ্‌তে নেই ছোট বৌ।—

—এর মধ্যে আর জানাজানির কি আছে দিদি? কাল সকালে অধর দাসকে ডেকে বাটী চালা দিলেই সব বেরিয়ে পড়্‌বে, সেবার যেমন ক'রে আমার মাথার চিরুণী বের ক'রে দিয়েছিল।—বলিয়া আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছোট বৌ হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

সরমা ঘরে ফিরিয়া সুরেশের টিনের সুটকেশটা খুলিয়া বিস্ময়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারছড়া বারবার উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার নিজের চোখ দুটীকেই যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। লজ্জায় ধিক্কারে মুহূর্ত্তের মধ্যে সরমার সমস্ত অন্তর মন একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

একবার ভাবিল জানালা গলাইয়া হার ছড়া ফেলিয়া দিবে, কিন্তু পরক্ষণেই কি থানিকটা ভাবিয়া লইয়া, নিজের ক্যাস্‌বাক্সে সেটাকে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া, পুনরায় স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল।

পরদিন সকাল বেলায় সরমার উঠিতে একটু বেলা হইয়াছিল। উঠিয়াই দেখিল ছোট বৌর প্রাঙ্গণে অধর দাস প্রকাণ্ড একটা গোল আঁক কাটিয়া তাহার মাঝখানটিতে ন'গিন্নির ভাসুরপোকে বসাইয়া তাহার হাতের নীচে একটি বাটী রাখিয়া ঘন ঘন মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই চারিদিকে ভীড় পাকাইয়া ব্যাপারটিকে উপভোগ করিতেছে, সকলের মুখেই কৌতূহলের সুস্পষ্ট ছায়া।

ক্ষণকাল পরে ছেলেটীর সহিত বাটিটী দ্রুতগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। অধর দাস সজোরে এবং সোৎসাহে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ছেলেটীকে সঙ্গে করিয়া বাটিটী বাড়ীর সীমানার বাঁশের বেড়াটার পাশ দিয়া সরমাদের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। জনতা অস্ফুট কলরব করিয়া উঠিল। সরমা ছুটিয়া ঘরে আসিয়া একান্ত অসহায় দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া হাঁপাইতে লাগিল। সুরেশের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল, দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল।

একটু পরে বাটিটা সরমার ঘরের মাঝখানটিতে আসিয়া একেবারে থামিয়া গেল।

অধর দাস সগর্ব্বে ছোট বৌকে উদ্দেশ করিয়া কহিল —মাল নিশ্চয়ই এই ঘরে আছে ছোট ঠাকুরুণ।

খোলা দরজা দিয়া, জানালার ফাঁক দিয়া জনতার কৌতূহল-দৃষ্টি সরমাকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। সরমা বিহ্বল দৃষ্টিতে ছোট বৌএর মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত হস্তে আঁচল হইতে চাবির গোছাটা খুলিয়া ঝন্ করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিল।

ছোট বৌ ঘোমটা টানিয়া ঘরে আসিয়া প্রথমেই সুরেশের সুটকেশটা খুলিয়া ফেলিল, কিছুই দেখিতে পাইল না, তাহার মুখখানি একেবারে শুকাইয়া গেল। বাহিরের জনতা আর একবার অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল।

আরও একটু সরিয়া আসিয়া সরমার ক্যাসবাক্সটা খুলিতে ছোট বৌএর মুখখানা একেবারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি হারছড়া তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, নিমেষের মধ্যেই সমস্ত দর্শকবৃন্দ একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

সকলে চলিয়া গেলে সরমা দরজাটা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। একটু পরেই ছোট বৌএর প্রাঙ্গণ হইতে রায়ের বাড়ীর ন' গিন্নির গলা শোনা গেল—যেমন হ'য়েছে মিন্‌সে, ঠিক্ তেমনি হ'য়েছে তার পরিবার।—

কথাটা এক সঙ্গেই স্বামী স্ত্রীর কানে আসিয়া ঠেকিল।

সুরেশ মুখ ফিরাইয়া সবিস্ময়ে ক্ষণকাল সরমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—কেন এ কাজ ক'র্‌তে গেলে বড় বৌ!—

সরমা আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। স্বামীর বুকে মুখ গুঁজিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সুরেশের নিষ্করুণ চক্ষু দুটীও সজল হইয়া উঠিল।

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ মিত্র



মনুষ্যত্বের বিকাশ ও সংগ্রাম

শ্রীমতী সরলাবালা সরকার

গীতায় প্রথমে যুদ্ধের বিষয় অবলম্বন করিয়াই ভগবান অর্জ্জুনকে মনুষ্যত্বের চরম সাধনার কথা বুঝাইয়াছেন। কাজেই এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে "মনুষ্যত্বের সাধনার সহিত যুদ্ধের সম্পর্ক কি? ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন,—কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রকেই বা এই উপদেশ দানের ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করা হইল কেন? যুদ্ধের বিষয় লইয়াই বা এই গ্রন্থ আরম্ভ করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

গীতার এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যেন কৈফিয়ৎ স্বরূপ অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধটাকে রূপক বলিয়াও কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কাহারও মতে এই যুদ্ধটা বাহিরের যুদ্ধ নয়, মনোজগতের যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ বাহিরেরই হউক বা মনেরই হউক মানবের মনুষ্যত্বসাধনার সহিত যুদ্ধ ব্যাপারটি যে সংযুক্ত থাকিবেই ইহা ব্যাখ্যাকারগণকেও একভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছে।—

সংগ্রাম ব্যাপারটা কি? এই কথার একটা উত্তর এই যে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সাহস করিয়া বাধা দূর করিবার যে চেষ্টা তাহাই সংগ্রাম।

সুতরাং যুদ্ধ ব্যাপারটি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রয়োজনের পক্ষে কেবল ধর্ম্ম বা নীতির দিক দিয়া নয়, ইতিহাস জীববিজ্ঞান ও বিবর্ত্তনবাদের দিক দিয়াও কি কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার আলোচনারও ক্ষেত্র আছে।

জীববিজ্ঞানের দিক দিয়া আলোচনা করিলে সৃষ্টিতে যুদ্ধ ব্যাপারের সূচনা কেমন করিয়া হইল, প্রথমে আমাদের মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়।

মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে কামড়াকামড়ি আছে, কিন্তু তাহাকে ঠিক যুদ্ধ বলা যায় না, বরং তাহাকে শিকার করা ও উদর পূরণ করা বলা যাইতে পারে। বাঘ হরিণকে আক্রমণ করে এবং ধরিতে পারিলে খাইয়া ফেলে, ইহাকে বাঘ ও হরিণের যুদ্ধ বলা চলে না। শিকার লইয়া বাঘে বাঘে লড়াই হয় না; যদি কোন বনে দুইটি বাঘ থাকে এবং একটি শিকার জুটে ও অপরটির না জুটে তবে সে শিকারের চেষ্টায় অন্যত্র চলিয়া যায়, শিকার লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করে না।

যখন হইতে সম্পত্তি অধিকার ও সঞ্চয়ের ভাব আরম্ভ হইল, তখন হইতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

নিম্নপ্রাণীতেও যেখানে সম্পত্তি সঞ্চয়ের ভাব আছে সেইখানেই যুদ্ধ আছে, যেমন পিপীলিকা ও মৌমাছিদের মধ্যে যুদ্ধ আছে।

জীবশ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী জীব পুরুষের একরূপ সম্পত্তি বিশেষ, এইজন্য তাহাদের অধিকার লইয়াও মাঝে মাঝে যুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধের আরম্ভ মানব জাতিতেই হইয়াছে, আর সেই আরম্ভ সম্পত্তিসঞ্চয় ও অধিকার বোধ হইতেই সূচিত হইয়াছিল।

মানুষের এই সম্পত্তি-সঞ্চয়-চেষ্টার মধ্য দিয়াও নিম্নপ্রাণী হইতে তাহার যে বিশেষত্ব তাহা বিকশিত হইয়াছে। কোন্‌টি আমাদের প্রয়োজন ও তাহার ভাল মন্দ কি সে বিষয়ে বিবেচনা করিবার শক্তি এবং ভবিষ্যতে আমরা কি ভাবে চলিব তাহা নিদ্ধারণ করিবার ক্ষমতা এই সম্পত্তি-সঞ্চয়-চেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমবিকশিত হইয়াছে। এইখানেই সহজাত সংস্কার ছাড়িয়া আমাদের নিজের বুদ্ধির পরিচালনার এবং স্বাবলম্বন চেষ্টার ভাব আসিয়াছে। ক্রমে তাহা হইতে অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান, ন্যায় অন্যায়ের বোধ ও অন্যায়কে বাধাদানের ভাবেরও বিকাশ হইয়াছে।

যুদ্ধের মধ্যে আরও একটি বিষয় থাকে, সেটি অপরকে পরাধীন দাস স্বরূপ করা এবং তাহার দ্বারা নিজের কার্য্যের

ভার বহন করাইয়া লওয়া ও তাহার উপর প্রভুত্ব করা।

এইরূপ ভাবে নিজের সম্পত্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা ও তাহার জন্য অপরকে সম্পত্তি ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা দোষ মনে না করায় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে যুদ্ধের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

এই ব্যক্তিগত যুদ্ধই দলগত যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। কেননা মানুষ সামাজিক জীব, তাহার একক যুদ্ধ অনেক সময় সফল হয় না, এজন্য তাহাদের দলবদ্ধভাবে নিজেদের সম্পত্তি অধিকারে রাখিবার জন্য ও জীবিকা আহরণের জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং ইহার ফলে একদলের সহিত অন্যদলের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

মানুষকে যুদ্ধ করিয়া অন্নসংস্থান করিতে হয়, * কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা কেবল যে অন্নসংস্থান হয় তাহা নহে, যুদ্ধের ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়,—বুদ্ধি সহায়ে প্রকৃতির নিয়ম অধিগত করিয়া তাহারা নানাভাবে প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

তমঃ অর্থাৎ জড়ত্বের ভাব কাটাইয়া রজঃ বা অহংএর বিকাশের জন্যও যুদ্ধের প্রয়োজন গীতায় ইহা বিশেষভাবে বুঝানো হইয়াছে। অহং বিকাশ হইলে মানুষের মনে স্বাধীনতাবোধ ও শক্তি আসে। সেই শক্তি আমরা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে পারি, অর্থাৎ তাহার দ্বারা ভালও করিতে পারি, মন্দও করিতে পারি, সেইজন্য যুদ্ধের ফল ভালও হয়, মন্দও হয়, এবং ভাল ও মন্দ এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি বিকাশ হয়।

ইতিহাস এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য স্বরূপ। ইতিহাসে জানা যায় মানুষের যে ক্রমিক বিকাশ হইয়াছে, যুদ্ধের ঘটনার মধ্য দিয়াই এই ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, সেইজন্য মানুষের মনে যুদ্ধের প্রবৃত্তি সহজাত-সংস্কাররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানুষ যে এমন শান্তিপ্রিয় হইবে, যে তাহার বিরুদ্ধতা করিবার ও বাধাদান করিবার প্রবৃত্তি একেবারেই লোপ পাইয়া যাইবে, জড়ের মত সর্ব্বসহিষ্ণুতায় সে সকলই সহ্য করিয়া যাইবে ইহা মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম নয়।

বাহিরের দিক দিয়া যেমন যুদ্ধের পথে মানুষের বিকাশ হইতেছে অন্তরের দিক দিয়াও সেইরূপ যুদ্ধেই মানুষের মনের বৃত্তিসমূহ ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছে। বস্তুতঃ মানুষের জীবনই দ্বন্দ্বময়। মানুষের বাহিরের যুদ্ধ অপরের সহিত আর মনের যুদ্ধ নিজেরই সহিত। এক মানুষের মনের মধ্যেই দুটি পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তি থাকে, একটি অগ্রসর হইবার ও অপরটি অগ্রসরের পথে বাধা স্বরূপ। একটি ধন, মান, আরাম, সুখ সৌভাগ্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কিত যাহা কিছু আঁকড়াইয়া রহিবার ভাব ও অপরটি এই সমস্ত ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা। বাধা যত বেশী হয় তাহাকে অতিক্রম করিতে তাহা অপেক্ষা প্রবল চেষ্টার প্রয়োজন. সেইজন্য মানুষের বিকাশের দিক দিয়া সংগ্রামের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই যে, 'বাধাকে অতিক্রম করিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইবার যে চেষ্টা, সংগ্রাম তাহারই ফল।'

মানুষ উদ্ভিদ নয়, মানুষ কীট পতঙ্গের মত সহজাত সংস্কারের সাহায্যে নির্ভুলভাবে প্রয়োজনের পথে চলে না, মানুষ পদে পদে ভুল করে, ভুলের জন্য কষ্ট পায়, তাহার ফলে ভুল সংশোধনের চেষ্টা আসে এবং নিজের চেষ্টায় মানুষকে নিজের ভুল সংশোধন করিতে হয়। ভুলের সঙ্গে চেষ্টার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, যাহার ভুল নাই তাহার চেষ্টাও নাই এবং তাহার জীবনে অধিকতর বিকাশের সম্ভাবনাও নাই।

সুতরাং যুদ্ধের প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবেই ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ক্রমবিকাশে মানব মনের সমস্ত বৃত্তিই যেমন নিম্নস্তর ছাড়িয়া উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মনোবৃত্তিও সেইরূপ ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থের আশ্রয় ছাড়িয়া জাতিগত স্বার্থের জন্য আত্মত্যাগের পথে বিকশিত হইয়াছে। কর্ত্তব্য পালনের যুদ্ধ, অধর্ম্ম নিবারণের

* সাধারণতঃ অন্নসংস্থানের চেষ্টাই কতকটা যুদ্ধের কারণ। প্রাণীগণ যে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন সংগ্রামে কাড়াকাড়ি করিয়া নিজ নিজ স্থায়িত্বের চেষ্টা করিতেছে যুদ্ধ কতকটা সেই সংস্কার জাত। Emil Fisher বলিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিক উপায়ে অ্যালবুমেন প্রস্তুত করিতে পারিলে পৃথিবী হইতে হিংসা ও যুদ্ধ বিগ্রহ অনেক কমিয়া যাইবে।"

যুদ্ধ প্রভৃতি যুদ্ধকেই ভগবদ্গীতায় 'ধর্ম্মযুদ্ধ' নাম দেওয়া হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে,

"ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।

ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বা পি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।

যিনি যুদ্ধে ভয় পাননা, যিনি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, যিনি ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হন, তিনিই ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন।

কবি সিলার তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছেন,—যে তার নিজের জীবন বিপন্ন করে নাই, সে তার নিজের জীবন বিজয়ের ফল স্বরূপ লাভ করিবে না।

একমাত্র যোদ্ধাই মৃত্যুর সম্মুখে মুখোমুখী দাঁড়াইতে পারে এবং একমাত্র যোদ্ধাই স্বাধীন।

যুদ্ধের মধ্যে আবার দুটি দিক আছে, একটি খুনোখুনি রক্তারক্তি আর একটি সাহসিকতা ও বীরত্ব। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আর পররাজ্য জয় লালসায় যুদ্ধ এই দুই যুদ্ধের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যোদ্ধাকে সন্মানদানের উদ্দেশ্য উৎপীড়ক বা রাজ্যলোলুপকে সম্মানদান নয়। এই সমস্ত উৎপীড়ন দমন করিবার জন্য যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন ও সাহসিকতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে রামায়ণ মহাভারত ও হোমরের ইলিয়ড প্রভৃতি কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই সকল কাব্যে অন্যায়ের প্রতিশোধ লওয়ারই গৌরব কীর্ত্তন করা হইয়াছে, খুনোখুনিকে সমর্থন করা হয় নাই।

কিন্তু যুদ্ধ প্রায় অনেকস্থলেই খুনোখুনি, কাজেই যুদ্ধকে সমর্থন করিতে ইতস্ততঃ ভাব হওয়া স্বাভাবিক। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এমন অনেক অভিযোগ আছে যাহাতে যুদ্ধকে মানবতার বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, যেমন :—

মানবসমাজে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃভাবই বাঞ্ছনীয়, একজাতি অপরজাতিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিম্বা পরাধীন ও পদানত করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা মানবতার বিরোধী।

যুদ্ধে মানবসমাজে হিংস্রবৃত্তি ও রক্তপিপাসা প্রভৃতি যে পশুভাবগুলি উলঙ্গ ভাবে প্রকাশ পায় তাহা উন্নতজীব মানুষের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর।

যুদ্ধের ফলে এক এক জাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় অথবা একসঙ্গে বহু প্রাণহানি হয়।

যুদ্ধে বুদ্ধির উৎকর্ষতার দিক হইতে হানাহানির দিকেই মনের বৃত্তিগুলি বিশেষভাবে যায়। উচ্চ চিন্তার দ্বারা ভাব রাজ্যের সম্পদ আহরণ করিয়া মানবমস্তিষ্কের যে উন্নতি সাধিত হইতে পারিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তাহাতে বাধা পড়ে।

যুদ্ধে এক জাতির সহিত আর এক জাতির শত্রুভাব হয়, এজন্য যুদ্ধ মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব—পরস্পর সহানুভূতি ও ভালোবাসা—সেই মহান্ ভাবের স্থলে বিদ্বেষবুদ্ধিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়।

যুদ্ধের জয় ও পরাজয়ের ফলে এক জাতির ক্ষতি ও অপর জাতির সম্পদ বৃদ্ধি হয়, পৃথিবীতে সকল মানুষের সমান অধিকার মানিয়া লইলে এরূপ হওয়া উচিত নয়। বরং যুদ্ধে যে সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয় তাহা সদ্ভাবের দিকে প্রয়োগ করিলে পৃথিবীতে নৈতিক উন্নতি ও সভ্যতা অনেক পরিমাণে বিকাশ লাভ করিত।

যুদ্ধের অর্থ অনেক স্থলেই দুর্ব্বল জাতির উপর সবলের উৎপীড়ন অথবা তাহাকে ধ্বংস করা।

যুদ্ধের ফলে জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কতকগুলি অসমর্থ বলহীন বা শিশুই অবশিষ্ট থাকে, ইহাতে জাতির অবনতি হয়।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু যাঁহারা যুদ্ধকে সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন এ সমস্ত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের আর একটা দিকও আছে, আর সে দিক দিয়া দেখিলে আমরা এই সমস্ত অভিযোগের উত্তর এই ভাবে পাই :—

যুদ্ধ যে মানব সমাজে ভ্রাতৃভাব নষ্টই করে এমন নয় অনেক সময় যুদ্ধের মধ্য দিয়াই ভ্রাতৃভাব বিশেষ করিয়া বিকাশ পায়। যুদ্ধের ট্রেনিংএ স্বভাবতই একত্বের ভাব আসে। রাজপুতানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সর্ব্বদা বিবাদ লাগিয়াই থাকিত, কিন্তু মোগলের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্য যখন 'ওয়েরী' বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা হইয়া গেল তখন যে সকল পরস্পর-বিরোধী গোষ্ঠীগণ একে অন্যের ছায়া স্পর্শ করিতেও অপমান বোধ করিত, তাহারাই ভ্রাতৃভাবে এক

শিবিরে বাস, একত্রে ভোজন ও যুদ্ধের সঙ্কটে প্রাণপণে পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিল।

বিসমার্ক এইরূপে খণ্ড জার্ম্মেণীকে এক করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। রাষিয়ান শ্রমিক আন্দোলনে কি ভাবে সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির শ্রমিকের মধ্যে একটা প্রাণগত ঐক্য আসিয়াছিল তাহার ছবি প্রসিদ্ধ লেখক গোর্কির "মাদার" নামক পুস্তকে আমরা জীবন্তভাবে দেখিতে পাই।

যুদ্ধে হিংসাবৃত্তি বাড়িয়া যায় এইরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু মুখোমুখী যুদ্ধের মধ্যে যে সাহসিকতা ও সহজভাব থাকে গুপ্ত হিংসাবৃত্তি ও রক্তপিপাসা তাহা হইতে আরো অনেক মন্দ। অস্ত্র ত্যাগ করিলেই যদি হিংসাবৃত্তি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইত তাহা হইলে সশস্ত্র জাতিই হিংসাপরায়ণ এবং নিরস্ত্র অহিংসক হইত। কিন্তু হিংসাটা কেবল বাহিরের জিনিস নয়, প্রতিকারে অসমর্থ কাপুরুষই অধিক হিংসাপরায়ণ হয়। আর অন্যায়কে কেবল মনের ও বাক্যের দ্বারা অস্বীকার সব সময় সম্পূর্ণ হয় না কার্য্যের দ্বারাও অস্বীকার করিতে হয়। "যুদ্ধ" এই নাম দিয়া মানুষ মানুষকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতেছে ইহা যত দূর ভীষণ, পলাসীক্ষেত্রে মীরজাফরের যুদ্ধবিমুখতা তাহা অপেক্ষা অনেক ভীষণ। মুখামুখী যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ পক্ষের সৈন্যের প্রতিও অনেকের আশ্চর্য্য সহানুভূতি দেখা গিয়াছে, রাজপুতানার ইতিহাসে যুধ্যমান দুই পরস্পরবিরোধী পক্ষ যুদ্ধ বিশ্রামকালে একে অন্যের শিবিরে গিয়া বন্ধুভাবে আলাপ করিতেছে এরূপ ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিগত মিত্রপক্ষ ও জর্ম্মাণ যুদ্ধের সময় শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সি ফরাসী সৈন্যদলে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন "মুখামুখী দুইটি পরিখার মধ্যে দুইপক্ষের সৈন্যদল গুলির ভয়ে মাথা লুকাইয়া আছে, কিন্তু সেই অবস্থাতেই পরস্পরের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ চালাইতেছে।"

যুদ্ধের বিবরণের মধ্যে এমন অনেক ঘটনার কথা পাওয়া যায় যে-গুলি হিংসা তো নয়ই বরং তাহার বিপরীত।

এইরূপ একটি ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষে রাত্রিকালে যে হতাহত সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে পাশাপাশি শুইয়াছিল একজন জার্ম্মণ ও একজন ইংরাজ সৈনিক। জার্ম্মণ ইংরাজকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই, তোমার কোথায় লাগিয়াছে?" এবং উত্তরে তাহার কেবল হাতে ও পায়ে আঘাত লাগিয়াছে শুনিয়া বলিল "আমার বুকে আঘাত লাগিয়াছে, আমি বাঁচিব না। তুমি হয়তো বাঁচিতে পার। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স আসিবার আগে শীতেই তুমি মারা যাইবে। যদি তুমি একটু কষ্ট করিয়া গড়াইয়া আমার কাছে আসিয়া আমার জামাটিও নিয়া নিজের গায়ে দাও তাহাতে তোমার শীত কম হবে, আমি দু'এক ঘণ্টা পরে মরিতাম না হয় দু'এক ঘণ্টা আগে মরিব, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।" এই বলিয়া সৈনিক তাহার নিজের গায়ের আবরণ বিপক্ষ সৈনিককে দিয়া শীঘ্রই শীতে জমিয়া মারা গেল।"

যুদ্ধের মধ্যে এইরূপ আরও অনেক ভালোবাসা ও মনুষ্যত্বের উদাহরণ আছে। তবে অদম্য জয় পিপাসায় যুদ্ধে অনেক নিষ্ঠুর আচরণও দেখা যায় কিন্তু সেটা যে বিপক্ষের উপর হিংস্রভাব বা রক্তপিপাসা তাহা নয়, তখন যুদ্ধে জয়লাভরূপ লক্ষ্যের দিকে যোদ্ধাগণের মন এমনভাবে নিবিষ্ট থাকে যে নিজের দিকে হোক্ বা অন্যের দিকেই হোক্ মরা বাঁচাটা যেন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরা হয় না।

"যুদ্ধের ফলে বহু প্রাণহানি আর একটি অভিযোগ। যুদ্ধে নরহত্যা হয় বটে, কিন্তু যে সময়কে আমরা শান্তির সময় বলি সেই সময় কত যে নির্দ্দয় হত্যাব্যাপার চোখের উপর সর্ব্বদাই দেখি অথচ অভ্যাসবশতঃ সেগুলিকে 'হত্যা' বলিয়াই মনে হয় না। কোটি কোটি দরিদ্র ধনীর চাপে নিষ্পেষিত হইয়া মারা যাইতেছে, জেতৃজাতির ভার বহন করিতে করিতে বিজিত জাতি দিনে দিনে দুর্ব্বল হইয়া ভারবাহী পশুর মত অসহায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, জনক জননীর দারিদ্র্য অজ্ঞতায় কোটি কোটি সুকুমার শিশু জন্মের অল্পদিনের মধ্যে মরণের পথের পথিক হইতেছে, হয়তো বা জনকের বা জননীর দুশ্চিকিৎসা ব্যাধির উত্তরাধিকারী

হইয়া নিষ্পাপ শিশু কতই না যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে এ সকল আমরা দেখিয়াও দেখি না। যুদ্ধে কামান বন্দুকে লোক মরে কিন্তু মোটরকার রেলওয়ে ও ফ্যাক্টরীতে যন্ত্রে নিষ্পেসিত হইয়া যত লোক মরে তাহার একটা বাৎসরিক হিসাব ধরিলে দেখা যায়, যদি দশ বৎসর অন্তর যুদ্ধ হয় তবে তাহার লোক-মৃত্যু সংখ্যা পাঁচ বৎসরে মোটরকার ফ্যাক্টরী প্রভৃতির মৃত্যু সংখ্যা হইতে অধিক নয়। বিগত মহাযুদ্ধে পাঁচ বৎসরে যত লোক মরিয়াছে, বাংলা দেশে শুধু এক ম্যালেরিয়া রোগে এক বৎসরে তাহার অপেক্ষা বেশীলোক মরিয়াছে ও কঙ্কালসার হইয়াছে। মৃত্যু হিসাবে এ সকল মৃত্যুর কোন সার্থকতা নাই কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যুর একটা সার্থকতা আছে, যুদ্ধের ন্যায় বড় বড় কাজে লোক মরেই আর সেই মৃত্যুর পথ দিয়াই জাতির মধ্যে নূতন নূতন সভ্যতা ও কৃষ্টির আগমন সম্ভব হয়।

বুদ্ধির উৎকর্ষতার দিক দিয়াও যুদ্ধকে হানিকর বলা যায় না। যুদ্ধে কষ্টসহিষ্ণুতা ও পরিশ্রমের ক্ষমতা বাড়ে, কেননা যুদ্ধ করিতে গেলে পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয় সৈন্যদলকেই ঘোড়ায় চড়া ও হাঁটিয়া যাওয়ার পরিশ্রম, জল বায়ুর নানা অবস্থায় অসুবিধা ও কষ্ট, আহার্য্য ও বাসস্থানের কষ্ট এবং আরও অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। ইহাতে শুধু হাত পায়ের ক্ষমতাই বাড়ে না, মস্তিষ্কের শক্তিও বাড়ে। যুদ্ধের ফলে যে সব নূতন নূতন যন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কার হইয়াছে তাহা বুদ্ধির উৎকর্ষেরই পরিচায়ক।

যুদ্ধে অনেক জাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে জাতি যুদ্ধে ধ্বংস হয় তাহারা যে ঠিক যুদ্ধের জন্যই ধ্বংস হয় তাহা নয়; তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত জাতি—ধ্বংস তাহাদের হইতই, যুদ্ধ কেবল একটা উপলক্ষ্য মাত্র। বরং যুদ্ধের প্রতিঘাতে অনেক নির্জীব জাতির মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়। কারণ যুদ্ধ অনেক স্থলে উত্তেজকের কাজ করে। যুদ্ধের মধ্যে এমন একটা আঘাত আছে যাহা দ্বারা জাতির প্রকৃত নৈতিক তেজ আছে কিনা তাহারই পরীক্ষা হয়।

যুদ্ধের একটা নিয়ম সমতালে পা ফেলিয়া চলা। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও এই তালে চলার কথা খাটে। যে সংগ্রাম নিখিল বিশ্বের বিকাশের তালে তাল রাখিয়া চলে সেই সংগ্রামেই দুঃসাধ্য সাধিত হইয়া থাকে, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ। আর সৈন্যবল ও অস্ত্রবলে জয় হইলেও সেই জয়ই শেষ মীমাংসা নয়, যোদ্ধাগণের যদি চরিত্রবল না থাকে তবে উপস্থিত জয়ের বহিরাবরণের মধ্যে পরাজয়ের বীজ রহিয়া যায়; আবার বর্ত্তমান পরাজয়ের অভিজ্ঞতাও অনেক স্থলে ভবিষ্যৎ জয়ের হেতু স্বরূপ হয়।

হ্যানিবল যখন রোম আক্রমণ করেন তখন তাঁহার সৈন্যদল ক্যানেতে (Cannœ) সর্ব্বাপেক্ষা বড় যুদ্ধে জিতিবার পর ক্যাপুয়াতে (Capua) ভোগবিলাস ও লাম্পট্যে শীতকাল কাটাইয়া আসিয়া নোলার যুদ্ধে রোমান জেনারেলের কাছে পরাজিত হইয়াছিল।

প্রথম জার্ম্মণ যুদ্ধের সময় বিসমার্ক যখন ফ্রান্স অধিকার করেন তখন ফরাসীদের নৈতিক অবনতি হইয়াছিল। তিন লক্ষ জার্ম্মণ প্যারিস অবরোধ করিয়াছিল, প্যারিসে পাঁচলক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা অবরোধ হইতে বাহির হইতে পারে নাই।

ইতিহাসে দেখা যায় যে সমস্ত যুদ্ধ 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' তাহাতে যে কেবল সুশিক্ষিত যুদ্ধ ব্যবসায়ী সৈন্যরাই যোগ দিয়াছে তাহা নয়, যাহারা যুদ্ধ যে কি তাহাই জানে না তাহারাও প্রাণের আবেগে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে যাহারা জনসাধারণ তাহারাই প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। আবার তাহারাই যখন সুশিক্ষিত হইয়া সম্রাট নেপোলিয়ানের সুশাণিত অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল, অষ্ট্রিয়ার অশিক্ষিত 'মিলিসিয়া' (দেশরক্ষার জন্য যেমন তেমন ভাবে গঠিত সৈন্য) সেনাদলের নিকট তাহারাই পরাজিত হইয়াছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কুচকাওয়াজ পর্য্যন্ত করে নাই। রাজপুতানার অশিক্ষিত ভীল সৈন্যদল লইয়া প্রতাপসিংহ সুশিক্ষিত বিপুল মোগল বাহিনীকে বার বার প্রতিরোধ করিয়াছেন এবং তাঁহার বংশধর রাণা রাজসিংহ গ্রাম্য রাজপুত যোদ্ধা লইয়া আওরংজেবের ভুবনবিখ্যাত সৈন্যদলকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ফরাসী কবি কপ্পের 'অসির ফসল' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে, তাহার ভাব এইরূপ :—"দুর্দ্দান্ত ইংরাজ সেনাপতি ট্যালবেট আসিয়া নগর ও গ্রাম আক্রমণ করিলেন, দেশে প্রতিরোধ করিবার লোক একজনও নাই। অস্ত্র ধরিতে সক্ষম এমন যে কেহ ছিল সকলেই হত হইয়াছে. গৃহ-সামগ্রী সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়াছে ও শস্যক্ষেত্র শত্রু-সৈন্যের অশ্বপদতলে দলিত হইয়াছে। সমাধিতে সমাধিতে দেশের অর্দ্ধেক ভূমি পরিপূর্ণ, মানুষ যাহারা জীবিত আছে তাহারা শিশু, বৃদ্ধ ও রমণী।

এমন দুর্দ্দিনে দেশ আবার আক্রান্ত হইল। তখন কুমারী জোয়ান তাঁহার শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রতি গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করিলেন, "দেশবাসী এস, শত্রুর অত্যাচারে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হও।" সকলে কাঁদিয়া বলিল, "দেশ আর কে রক্ষা করিবে, শিশু বৃদ্ধ ও রমণী মাত্রই দেশে অবশিষ্ট আছে।" কুমারী বলিলেন, "এস বৃদ্ধ, এস শিশু, এস রমণীগণ, অস্ত্রধারণ কর, যতক্ষণ প্রাণ আছে, নিজের দেশ রক্ষা কর।" সকলে বলিল, "অস্ত্র কই, কি লইয়া যুদ্ধ করিব?" তখন কুমারী সকলকে লইয়া সমাধি ভূমিতে গমন করিলেন, এবং জানু পাতিয়া ভগবানের নিকট অস্ত্র ভিক্ষা করিলেন। তখনই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল, দেখা গেল, প্রতি সমাধির উপরের ক্রুশগুলি শাণিত অস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। অসংখ্য সমাধির উপরের সেই সমস্ত অস্ত্র লাভ করিয়া বৃদ্ধ বালক ও রমণীগণ অষ্টাদশবর্ষীয়া কুমারীর নেতৃত্বে শত্রুকে বাধাদান করিতে অগ্রসর হইল।"

বাস্তবিক অসির ফসল না ফলিলেও অনেক যুদ্ধে এইরূপ ইন্দ্রজালের মতই ঘটনা ঘটিয়াছে। অষ্টাদশবর্ষীয়া কৃষক কন্যার যুদ্ধ নেতৃত্ব গ্রহণই কি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নয়?

"যুদ্ধের অর্থ অনেক স্থলে দুর্ব্বল জাতির উপর সবলের উৎপীড়ন" একথা সত্য বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতাই জাতির পক্ষে একটা বিষম পাপ। সবলের উৎপীড়নে সেই পাপ দূর হইয়া দুর্ব্বল জাতিও আত্মরক্ষার জন্য সবল হইয়া উঠে।

আর একটি কথা এই যে 'যুদ্ধের ফলে জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়' কিন্তু সেই মৃত্যুর মধ্যেই সব জীবনের বীজ নিহিত থাকে। সেই মৃত্যু হইতেই অভিনব শ্রেষ্ঠত্বের উদ্ভব হয়, আত্মোৎসর্গই জাতিকে নববলে বলীয়ান করে।

যুদ্ধ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিগণ আজকাল খুব আলোচনা করিতেছেন, যুদ্ধকে অনেকে গালাগালি দিয়াছেন, কিন্তু সেই গালাগালির সুরের মধ্যেই যেন সমর্থনও রহিয়াছে। যুদ্ধের মন্দদিক আলোচনা করিয়াও পূর্ণভাবে একথা কেহ মন খুলিয়া বলিতে পারেন নাই যে, সৃষ্টি হইতে যুদ্ধ ব্যাপারটা একেবারে পরিত্যক্ত হইলেই মঙ্গল।

যীশুখৃষ্টের জীবনী-লেখক রেনান্ লিখিয়াছিলেন, "ওয়ালহাল্লার দিকে যে দরজা খুলে সে ভগবানের রাজ্যের দিকে দরজা বন্ধ করে" কিন্তু এক বৎসর পরে তিনিই আবার লিখিয়াছেন, "দেশের মূর্খতা, অবহেলা, আলস্য ও পূর্ব্বাপর চিন্তার অভাব যদি ক্রমাগতই পুঞ্জীভূত হইতে থাকিত এবং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যুদ্ধ আনয়ন না করিত তবে মানবজাতি যে কত গভীর অবনতিতে ডুবিয়া যাইত বলা কঠিন। যুদ্ধ যেন একটা চাবুকের তীব্র আঘাত, যে আঘাত জনসাধারণকে কল্পিত আত্ম-সন্তোষস্বরূপ জড়ত্বের নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলে। মানুষ যে বাঁচিয়া থাকে সে কেবল চেষ্টা ও সংগ্রামে। যেদিন মানুষ জাতি একটি বৃহৎ শান্তিপূর্ণ রোমান এম্পায়ার হইবে—যখন কোন বহিঃশত্রুই থাকিবে না, সেই দিন সমস্ত নীতি ও বুদ্ধি দ্রুত ধ্বংশের মুখে অগ্রসর হইবে।"

বিসমার্ক বলিয়াছেন, "যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি" কিন্তু নিজে যে যুদ্ধ করিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিয়াছেন, "অনেক সময় অতীতের ঋণ শোধের জন্য যুদ্ধ না করিয়া উপায় থাকে না।"

বিস্মার্কের সমসাময়িক জার্ম্মন লেখক Von Moltke ভন্ মল্ট্‌কি বলেছেন "চিরকালের শান্তি একটা স্বপ্নমাত্র, কিন্তু স্বপ্ন হিসাবেও খুব সুন্দর স্বপ্ন নয়। ঈশ্বরের বিশ্বজনীন অর্ডিন্যান্সের মধ্যে সংগ্রামই যোগসূত্র স্বরূপ। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ গুণগুলি,—সাহস, আত্মোৎসর্গ,

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সর্ব্ববিধ ত্যাগ, এমন কি প্রাণও যদি ত্যাগ করিতে হয় তাহার জন্য সদাপ্রস্তুত ভাব—যুদ্ধের মধ্য দিয়াই বিকশিত হয়। যুদ্ধ যদি না থাকিত পৃথিবী তাহা হইলে জড়বাদে একেবারে ডুবিয়া যাইত।"

আর একজন জার্ম্মান লেখক (S. R. Steinmatz) বলিয়াছেন, "যুদ্ধটা যেন ঈশ্বরের একটি পাঠশালা, সেখানে তিনি জাতির যোগ্যতা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া দেখিতেছেন। এই পাঠশালার পরীক্ষায় ঈশ্বর যখন একদলের সহিত আর এক দলের ঠোক্কর বাধাইয়া দেন, তখন তাঁহার মহান্ বিচারাসনের সম্মুখে যে জয়গৌরব লাভ হয় তাহা কোন একটি গুণের জন্য নয় বহুগুণের একত্র সমষ্টিবদ্ধতার জন্য। * * * যাহাতে দেশের সমগ্র শক্তি ও সমস্ত চেষ্টা একত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে যুদ্ধ তাহার একটি প্রধান উপায়।"

রুষভেল্ট বলিয়াছেন, "শান্তিপ্রিয়তা ভাল বটে কিন্তু ভীরুর শান্তিপ্রিয়তার কোন অর্থ ই হয় না।"

নিট্‌শে সংগ্রাম ও সাহসিকতাকে প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, "আত্মরক্ষার জন্য ক্রমাগত সৈন্যবল ও অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করাও একরূপ দারুণ ভীরুতা ও অন্যের উপর অবিশ্বাস। আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যবল বৃদ্ধি করার অর্থ কি এই নয় যে, তোমার প্রতিবেশীরা সকলে রাজ্যলোলুপ চোর ও বদ্‌মাইস এবং তুমিই সৎ! এই যে সিদ্ধান্ত ইহা মুখোমুখী যুদ্ধ করা অপেক্ষা অনেক খারাপ। আর এই ভাবটি তলাইয়া বুঝিলে বুঝা যায় যুদ্ধ না করিয়াও ইহাতে সর্ব্বদা যেন বিরোধকে 'উস্‌কাইয়া' রাখা হইয়াছে। এই পৃথিবীতে অপরকে ভয় করা আর ঘৃণা করার অপেক্ষা ধ্বংস হইয়া যাওয়াও ভাল, আর নিজেকে ভীত ও ঘৃণিত করিয়া রাখা হইতে ধ্বংস হইয়া যাওয়া দ্বিগুণ শ্রেয়।"

নিট্‌শে বলিয়াছেন, "যুদ্ধ যেন রোগের ঔষধ, ঔষধ না থাকিলে কি করিয়া রোগ শান্তি হইবে, যুদ্ধ হইতেই শান্তি আসিবে।" কিন্তু এই যুদ্ধ মারামারি কাটাকাটি নয়, নিট্‌শে অন্যত্র বলিয়াছেন "লড়াই করবে কিন্তু কামান বন্দুক দিয়ে নয়। ময়লা দিয়া যেমন ময়লা পরিষ্কার করা যায় না, রক্ত দিয়া সেইরূপ রক্তের দোষ দূর করা যায় না।" অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যে কোন মহান্ ভাব থাকা চাই, হিংসার দ্বারা হিংসাকে পরাভব করা যায় না।"

ক্যাণ্ট যুদ্ধের নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু ফ্রান্সের রাষ্ট্র-বিপ্লবকে অন্তরের সঙ্গে প্রশংসা করিয়াছেন।

মনীষিগণের এই সমস্ত মতামতের সার সঙ্কলন হইতে আমরা ইহাই বুঝি যে যুদ্ধ ব্যাপারটি সৃষ্টিতে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু যুদ্ধের আরও ভালর দিকে বিকাশ হওয়া উচিত, ইহাই অনেকের মত।

সৃষ্টির অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় ক্রমবিকাশে যুদ্ধেরও যে নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আদিম যুগের যুদ্ধে আর আধুনিক যুদ্ধে অনেক তফাৎ হইয়াছে। যদি আমরা প্রাণীসমাজের যুদ্ধের ধারা ধরিয়া চলি তাহা হইলে নিম্ন প্রাণীর মধ্যে দেখি, জীবনের যে প্রধান সুর self-assertion অর্থাৎ নিজের সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই উপলক্ষে আত্মরক্ষা—নিম্নপ্রাণী তাহারই জন্য যুদ্ধের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। প্রাণীদের মধ্যে যে সমস্ত প্রাণী যুদ্ধের পথে নিজের দাবী বজায় ও নিজেকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, বিবর্ত্তনে তাহাদের বংশধরগণ যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, পরান্নভোজী ছলে ও কৌশলে জীবনোপায়সংগ্রহকারী ও আত্মরক্ষাকারী প্রাণীগণের বংশধরগণের সেরূপ উন্নতি হয় নাই। যুদ্ধকারী প্রাণীগণের মধ্যে যে সাহসের বিকাশ হইয়াছে তাহার ফলে তাহাদের কেবল শারীরিক শক্তি নয় মানসিক শক্তিও যেন দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

যুদ্ধে জন্তুগণের মধ্যে যেমন self-assertion ও সাহস বাড়িয়াছে, মানুষের মধ্যেও যুদ্ধেই তাহা বাড়ে, কিন্তু এই উভয় বিকাশ জন্তুদিগের মধ্যে ব্যষ্টির দিক দিয়াই বেশী হয়, তবে সমষ্টির দিক দিয়া বিকাশেরও কিছু কিছু আভাস দেখা যায়। অতি নিম্ন প্রাণী পিপীলিকা ও মৌমাছি নিজ নিজ সমাজের জন্য যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তি সহজাত সংস্কারে লাভ করিয়াছে। তদপেক্ষা উচ্চপ্রাণী জন্তুদের

মধ্যেও হস্তী প্রভৃতি সমাজবদ্ধ যোদ্ধাজন্তু দেখা যায়। ডারউইনের মতে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর ছিলেন এবং তাঁহারাও সমাজবদ্ধ যোদ্ধাজীব ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে বিবর্ত্তনে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে এজন্য মানুষের মধ্যে যুদ্ধের প্রবৃত্তি ও সমাজবদ্ধ থাকিবার প্রবৃত্তি উভয়ই বিশেষ ভাবে ছিল এবং একটির সহিত অপরটি সংযুক্ত ছিল। সেইজন্য আদিম যুগের মানবের সামাজিক বিধির মধ্যে যুদ্ধের পক্ষে যাহা সহায়ক এমন অনেক নিয়ম প্রচলিত ছিল যাহা এখন আমাদের নিকট অদ্ভুত ও নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়। যেমন,—যারা দুর্ব্বল তারা যুদ্ধের কাজে লাগিবে না এজন্য প্রাচীনকালে বৃদ্ধহত্যা প্রচলিত ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা বৃদ্ধদের মারিয়া ফেলিত, কেননা যুদ্ধে তাহারা কোন সাহায্য করিতে পারিবে না, উপরন্তু আত্মরক্ষায় অসামর্থ্যের জন্য শত্রুর নিকট বন্দী হইবে এবং তাহারা কষ্ট দিয়া হত্যা করিবে, তাহার অপেক্ষা তাহাদের মারিয়া ফেলাই ভাল।

অনেক স্থানে শিশুহত্যারও নিয়ম ছিল। Papuan gulfএ যমজ শিশু হইলে একটিকে রাখিত ও অপরটিকে মারিয়া ফেলিত। Araucanianরা দুর্ব্বল শিশুদের হত্যা করিত। স্পার্টায় দুর্ব্বল শিশুদের প্রতিপালন করিত না কেবল বলবান শিশুদেরই প্রতিপালন করিত। কিন্তু আবার মাউরী প্রভৃতি অনেক জাতি নিজেদের লোকসংখ্যা বাড়াইবার জন্য শিশুহত্যা তো করিতই না বরং অন্য শিশু পাইলে পোষ্য স্বরূপে প্রতিপালন করিত। Pelaponnesian যুদ্ধের পর এথেনিয়ানরা অন্য জাতীয়া জননীগর্ভজাত সন্তানকেও প্রতিপালন করিয়াছিল, কেহ কেহ দুটি তিনটি বিবাহ করিয়াছিল।

যুদ্ধের লোকক্ষয় পূরণ করিবার জন্যই অনেক স্থলে বহু বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল এবং নানা প্রকারে স্ত্রীসংগ্রহ করা (ক্রয় করা বা কাড়িয়া লওয়া এবং চুরী করিয়া আনা প্রভৃতি) প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপে ভিন্নদেশীয়া স্ত্রী সংগ্রহের ফলে অনেক জাতির কালচারের উন্নতি হইয়াছিল, কোন কোন কৃষিবিদ্যায় অনভিজ্ঞ জাতির মধ্যে চাষ করার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

দেশত্যাগ করিয়া অন্যদেশে উপনিবেশ স্থাপন, নূতন জাতির সহিত মিশ্রণ ও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি প্রভৃতি যুদ্ধের ফলেই হইয়াছিল। অনেকের মতে বর্ণসঙ্করগণ পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের খারাপ দিকটাই পায়। তবে কয়েক পুরুষ পরে তাহারাও আবার একটা নিজস্ব জাতিতে দাঁড়াইয়া যায়।

Egyptians, Assyrians, Babylonians, Chalebeans, Persiansরা এক এক দেশ জয় করিয়া সেই দেশে বসতি করিয়াছে ও তাহাদের সভ্যতা দান করিয়াছে। বিজিত জাতি আবার কোন কোন স্থলে জেতাদের অপেক্ষাও বেশী উন্নত হইয়াছে।

ফিজিসিয়ানদের সম্বন্ধে টমসন বলিয়াছেন "যুদ্ধের সময় তাহাদের কিছু লোকক্ষয় হইত বটে কিন্তু কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা সে ক্ষতি পরিপূরণ হইয়া যাইত। স্বজাতি প্রেম কর্ম্মোৎসাহ কষ্টসহিষ্ণুতা সাহসিকতা প্রভৃতি গুণগুলি বিপদের আবহাওয়াতেই বাড়িয়া উঠিত।"

যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপন্ন করার চেষ্টা মানুষের বুদ্ধি ও আবিষ্কার ক্ষমতাকেও দ্রুত কার্য্যক্ষম করে। প্রস্তর যুগ হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্যই অস্ত্র প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, পরে আবার শান্তির সময় সেগুলি অন্য প্রয়োজনীয় কাজেও লাগিয়াছে। পাহাড়িয়া জাতিদের দা কাটারি প্রভৃতি যুদ্ধের সময়ই আবিষ্কার হইয়াছিল। যুদ্ধের দ্রব্য প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেই দিয়াশলাই উৎপত্তির প্রথম সূচনা হয়।

যুদ্ধের ফলে সমাজের অনেক পুরাতন সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া সমাজ নূতনভাবে গঠিত হয়। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ হইতেই জার্ম্মণীর মধ্যযুগের রীতি নীতি বিনষ্ট হইয়া সংস্কার-মুক্ত নূতন জার্ম্মণীর অভ্যুদয় হয়।

ক্রুসেডের ব্যাপারকে অনেকে অতি নিরেট মুর্খতার দিকে অযথা উৎসাহ বলিয়া থাকেন। কিন্তু সেই ক্রুসেডের যুদ্ধই ইউরোপের বর্ব্বরতাপূর্ণ তিমিরময় অন্ধযুগ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সামাজিক শক্তিকে বিকাশ করিয়াছিল।

গত মহাযুদ্ধ অর্থাৎ ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যে যে মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাজগতে ও ভাবের জগতে একটা যে বড়রকম পরিবর্ত্তন আনিয়া

দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পরিবর্ত্তনের ফলে মানবসভ্যতা ও কালচার অনেক দিক হইতে নানাপ্রকারে লাভবান হইয়াছে।

"No risk no gain" এই প্রচলিত বচনটির তাৎপর্য্য আমরা এই যুদ্ধের ব্যাপারের মধ্যে অনেকটা খুঁজিয়া পাই। মহাযুদ্ধ পশ্চিমেই আরম্ভ হয় আর তাহার প্রতিঘাত প্রাচ্য আসিয়ার কোন কোন অংশেও পতিত হইয়াছিল। যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ধন ও জন উভয় দিকেই তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী, কিন্তু ক্ষতির মূল্য স্বরূপ যাহা লাভ হইয়াছে তাহাও সামান্য নয়। কারণ রাশিয়ার ন্যায় একটি অতি বৃহৎ দেশ (মহাদেশ বলিলেও অন্যায় হয় না) চির-দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সেটা শুধু রুশ দেশের এবং রাশিয়ান জাতির লাভ নয়, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই এই ব্যাপারটি একটি পরম লাভ। আজ রাশিয়া স্বাধীন হইয়াছে,—কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়, ভাবের দিক দিয়াও সে এমন এক সত্য বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়াছে, যাহা কালে সমস্ত পৃথিবীর বিকাশের পক্ষেই সহায়ক হইবে এইরূপ আশা হয়। বর্ত্তমানে এখন ইহা যে ভাবে প্রকটিত হইয়াছে ক্রমশঃ হয়তো তাহার রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। যেমন বীজ পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ বনস্পতিতে পরিণত হয় হয়তো সেই ভাবেই ইহার রূপের পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে রাশিয়ার বহু সাধনা ও আত্মোৎসর্গের ফলে আজ যাহা লাভ হইয়াছে তাহা কালে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তা প্রণালীতে সত্যের অনুভূতির একটা নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

"No risk no gain" ব্যবসাক্ষেত্রে এই কথার অর্থ এই হয় যে লোকসানের ঝুঁকি ঘাড়ে না নিলে ব্যবসায়ে লাভ হয় না। নীতির দিক দিয়া এই অর্থ হয় যে নৈতিক উন্নতি করিতে হইলে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে, না হইলে নৈতিক উন্নতি হইতে পারে না। যুদ্ধের সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। নব্য তুরস্কে এই যুদ্ধের প্রতিঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ফলে নব্য তুরস্কে স্ত্রীজাতির উন্নতি, ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতা, শিক্ষা বিস্তার, পর্দ্দাপ্রথা নিবারণ এবং মানুষের ধার্ম্মিকতার দিক দিয়া নয়—মনুষ্যত্বের দিক দিয়া—বিকাশের চেষ্টা প্রভৃতি ভাবের বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ যুদ্ধ হইতে অনেক দূরে ছিল, সেখানে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এ ভাব তেমন ভাবে বিস্তৃত হয় নাই।

আমরা আগে বলিয়াছি জন্তুদের মধ্যে যুদ্ধের ফলে যে বিকাশ হয় তাহা প্রধানতঃ ব্যষ্টির দিক দিয়া এবং সমষ্টির দিক দিয়া সামান্য ভাবে হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে ব্যষ্টির দিক দিয়া বিকাশ তো হয়ই তা ছাড়া সমষ্টির যে বিকাশ জন্তুজীবনে অস্ফুট ছিল তাহা পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে আর ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সংযোগ নিবিড়ভাবে হয়। এইখানেই জন্তুদের অপেক্ষা মানুষ সংগ্রামের সার্থকতায় বিশেষভাবে লাভবান। কেননা সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির যে আত্মোৎসর্গ ও আত্মত্যাগের মহত্ত্ব তাহা যুদ্ধের দ্বারাই লাভ হয়। গীতা বলিয়াছেন এইরূপ যুদ্ধলাভ সৌভাগ্যবানের ভাগ্যেই ঘটে।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বার মপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

গীতা ২।৩২।

শ্রীমতী সরলাবালা সরকার



পথিক

শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহ-কোণবাসী বাঙ্গালী গড়িতে জানিনা সে কোনক্ষণে
গৃহহারা এক বেদেরে বিধাতা দিয়াছিল মোর মনে !
যে ত্রুটী সেদিন হয়েছে সে আর গেল নাকো শোধরানো,
সেই হ'তে আমি এমনি হ'য়েছি তোমরা কিছু কি জানো ?
বিশ্রামে মোর রুচি নাই, মোর স্বপনে শান্তি নাই,
অন্তরে শুধু পথিক বলিছে 'চল যাই, চল যাই,'
'চল বহুদূরে, সাগরে শৈলে, মরুভূমে প্রান্তরে,
দুর্গে প্রাসাদে পর্ণকুটিরে বনে ও বনান্তরে,
যেথানে যা কিছু দেখিবার আছে চল দেখে আসি গিয়ে।'
দেশে দেশে মোরে এমনি করে সে ছুটায়ে ফিরিছে নিয়ে।
সারা ভারতের বক্ষে ফিরেছি ভ্রমিয়া পথের সুখে,
সারা বিশ্বের পথ আজও দেখি পড়ে আছে সম্মুখে !
আমি হেরিয়াছি পূর্ণিমা চাঁদ চূর্ণ সাগরজলে,
আমি হেরিয়াছি সন্ধ্যা তপন চিল্কার হৃদতলে,
উদয়ে হেরেছি ভুবনেশ্বর, অস্তে উদয় গিরি,
যমুনার ধারা বহিতে দেখেছি মথুরা গোকুল ঘিরি,
প্রয়াগে হেরেছি নীলধারা মিশে রজত ধারার সনে,
তাম্রলিপ্তে ধুধু জলরাশি ভরা রূপনারায়ণে।
আমি ফিরিয়াছি বিন্ধ্যশিখরে দুর্গম গিরিপথে,
প্রথম জাগিয়া শোন নর্ম্মদা তুঙ্গ পাষাণ হ'তে—
ঝরিছে যেথায় ভীমগর্জ্জনে ; বাঘ হরিণের দেশ
নাচিছে ময়ূর ;—পথে দুপহরে ভালুক চরিছে বেশ।
শ্যামল-অঙ্গ গিরিতরঙ্গ পরশে দিগ্বলয়
শাল হরিতকী আমলকী ভরা ঘোর জঙ্গলময়।
লালমাটি আর তালগাছ ভরা দেখেছি কবির দেশ ;
নয়নে আমার আলো দিয়েছে সে অন্তরে ভাবাবেশ।
অজয়ের তীরে দেখেছি কেঁদুলী শুভ্র বালুকাতটে,
নান্নুরে বসি চণ্ডীদাসেরে হেরেছি মানস পটে।
ফল্গুর জলে বুদ্ধগয়ায় কি শান্তি হেরিলাম !
দেখিয়া ফিরেছি কত না তীর্থ, কত যে নগর গ্রাম।
সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ ;—নিমাইএর পূজাঘর,
সরস্বতীর ক্ষীণধারা বহে তীরে জটিলেশ্বর।

মহানদী জলে দেখেছি প্রথম প্রভাত-অরুণছটা,
নিশীথে হেরেছি পদ্মার জলে আঁধারের ঘোরঘটা।
সন্ধ্যা তারকা জ্বলিতে দেখেছি সুবর্ণরেখা বুকে,
উষার আলোক ফুটিতে দেখেছি হিমগিরি শিরে সুখে।
কুহেলি স্বপ্ন মেঘমালা যত দেখেছি প্রভাতে রাতে,
বনানীর বুক হাসিতে দেখেছি শুভ্র তুষারপাতে।
দেখেছি গোপন নির্ঝর তীরে কল্যাণ ঈশ্বরী।
কয়লা খাদের অতলে দেখেছি অনন্ত বিভাবরী।
রাজগৃহে এলো পাহাড়ী জ্যোৎস্না শান্তির বাণী বয়ে,
নরদেবতার আড়াই হাজার বরষের স্মৃতি লয়ে।
বিপুল বিরাট বিদ্যার পীঠ হেরেছি নালন্দার
ভাগীরথী তীরে বিক্রমশিলা উপমা নাহিক তার।
তাজের শুভ্র মর্ম্মরে যেই বিরহবেদনা ফুটে,
কুতব মিনারে যে রাজদম্ভ আকাশ ফুঁড়িয়া উঠে।
সিক্রীতে জাগে যেই ব্যর্থতা,—কাশীতে যে বিশ্বাস,
জাগিছে দিল্লী পাটলীপুত্রে যে কালের পরিহাস।
সব দেখিয়াছি,—আরো কত কি যে দেখিয়াছি মনে নাই ;
মন কাঁদে আজো মেটেনি পিপাসা আরো দেখিবারে চাই।
দেখার জিনিষ এত দে'ছে ধাতা নিখিল বিশ্ব ভরি,
দেখে দেখে আর মেটে নাকো আশা সারাটা জীবন ধরি।
শুনেছি অনেক বিচিত্রভাষা, বহু বিচিত্রসুর,
সুরূপ পুরুষ, সুরূপা নারীর স্মৃতি আজো সুমধুর।
বহু পল্লীর সুপ্তি দেখেছি, নগরের কোলাহল,
ধুধু মরুভূমি, ধুধু শ্যামলিমা, ধুধু বন্যার জল।
গ্রহতারকার ঘোরার নেশায় পাগল করেছে যেবা
পথের পূজারী আমি দাস তাঁরি পথে ফেরা তাঁরই সেবা।
এই সেবাব্রতে পথিকজীবন হয় হবে অবসান।
অজ্ঞাত পথে রবে মোর সাথে পথিকের ভগবান।
কোন খেদ নাই পথ শেষে থাক পুণ্য বা পাপলোক,
মাথা পাতি লব প্রাপ্য আমার যেথা হোক, যাহা হোক।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধারাপাত

শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ

বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে তাহার কাকা তাহাকে ধারাপাত পড়িয়া রাখিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন এবং পড়া না তৈয়ারী হইলে কি পরিমাণ শাস্তি দেওয়া হইবে তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন। সেইজন্য বেচারী ক্ষুণ্ণমনে জানালার ধারে বই হাতে করিয়া পড়িতেছিল।

পড়িতে পড়িতে সে একবার বাহিরের দিকে তাকাইল। তখন বেলাটা একটু বেশী হইয়া আসিয়াছে। দূরে সহরের নানা শ্রেণীর ও নানা আয়তনের বাড়ীগুলি মাথা তুলিয়া যেন তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে,—কেহ বা যেন অন্যের সহিত পাল্লা দিতে না পারিয়াই তাহার চিল-কোঠাটি উচ্চ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা নারিকেল ও বটগাছ মাথাচাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নির্ম্মল আকাশে কয়েকটা পায়রা ক্রমাগত ডানা নাড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; আরও অনেক উপরে উড্ডীয়মান কাক ও চিলগুলিকে পাতার ন্যায় ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। সামনের পার্কের ওই কোণে গাছের তলায় আধ ছায়ায় আধ রৌদ্রে একটি ছোট ছেলে খেলা করিতেছে,—রৌদ্র লাগিয়া তাহার রঙিন্ পশমের জামা এক একবার চক্‌চক্ করিয়া উঠিতেছে। মথুর-পিওন তাহার চিঠি বিলি সাঙ্গ করিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে। চির-পরিচিত কাণা ফলওয়ালা ঝুড়ি মাথায় তাহার অভ্যাসমত একবার "কমলা লেবু" বলিয়া হাঁকিয়া রাস্তার ওধারে দাঁড়াইয়া ক্রেতার প্রতীক্ষা করিতেছে। পাড়ার গদাই বাবু কোট গায়ে দিয়া র্যাপার কাঁধে ফেলিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বড় রাস্তায় বাস্ ধরিবার জন্য ছুটিতেছেন। রাস্তার ওধারে কাহাদের বাড়ী হইতে এইমাত্র আবর্জ্জনা ফেলা হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটা কাক বসিয়া পড়িয়া এক একবার ডাকিয়া উঠিয়া এদিক্ ওদিক তাকাইতে তাকাইতে খাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

ঠিক এই সময় বাহিরের দিক চাহিলে তাহার মায়ের কথা বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে। যখন পথটা একটু নির্জ্জন হইয়া আসে, শান্ত নীরবতার মধ্যে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র চক্‌চক্ করিতে থাকে, বৈঠকখানার দালানে পায়রাগুলি ডাকিয়া ডাকিয়া ঘুরিতে থাকে ও এক একবার ফটফট করিয়া ডানার আওয়াজ করিয়া বাহিরে উড়িয়া যায়,—আর চারিদিকের বাড়ীগুলি আরামে ঝিমাইতে সুরু করিয়া দেয়, তখন তাহার মনটা উদাস হইয়া যায়, একটা নিঃসঙ্গভাব তাহার মনে জাগিয়া উঠে, তাহার মনে হয় তাহার মা থাকিলে বড় ভাল হইত। তাহা হইলে হয়ত এরূপ নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে কেহ ধারাপাতের কবলে ফেলিয়া চলিয়া যাইত না,—সে হয়ত এতক্ষণে তাহার মায়ের কাছে শুইয়া শুইয়া গল্প শুনিত, আর না হইলে ঘুমাইয়া পড়িত।

তাহার মনে হইল যদি তাহার একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া থাকিত তবে বড় ভাল হইত। তাহা হইলে সে তাহাতে চড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত অনেকদূরে,—ওই বড় রাস্তাটা যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে। তাহার পায়ের তলায় বাড়ীগুলি উপরের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, দূরে ওই বড় নারিকেল গাছটা পাতা নাড়িয়া তাহাকে পথ বলিয়া দিত, আর সে রূপকথার রাজপুত্রের মত নীল আকাশে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া যাইত তাহার মায়ের কাছে থাকিবে বলিয়া স্বর্গের সন্ধানে,—যেখানে তাহার মা এখন আছেন।

এরি' মধ্যে রৌদ্র ভীষণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সে ছোট ছেলেটি মাঠে খেলা করিতেছিল, সে কখন চলিয়া গিয়াছে। সাদা আকাশে একটা চিল তীক্ষ্ণ সুরে কয়েকবার ডাকিয়া উড়িয়া গেল। দক্ষিণের জানালা দিয়া রৌদ্র অজস্র ধারায় ঘরে ঢুকিয়া ঘরটাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। পার্কের বেড়ার ধারের গাছগুলিতে ফোটাফুলগুলি মুষড়াইয়া

রহিয়াছে, এত রৌদ্র তাহারা সহ্য করিতে পারিতেছে না। একটা শালিক ফরর্ করিয়া উড়িয়া আসিয়া কল্কে গাছের ডালে বসিয়া বার দু'য়েক লেজ দোলাইয়া আবার ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া পলাইল: মাঠের প্রকৃতি যেরূপ পরম আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহাদের শান্তি ভঙ্গ করিবার ভয়েই যেন শালিকটি উড়িয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল শালিকটির পিছু পিছু সেও উড়িয়া যায়। আহা, যদি সে এই 'এককড়া পোয়া গণ্ডা' পড়া ফেলিয়া পলাইতে পারিত—তাহা হইলে বাড়ীর বাহির হইয়া সে ওই মাঠের ঘাসের উপর গড়াগড়ি খাইয়া, ওই গাছগুলির ফুল ছিঁড়িয়া, ওই শালিক পাখীটির পিছন পিছন ছুটিয়া সেই দিবসের চুরি করা ছুটিটিকে উপভোগ করিয়া লইত। নাই বা রহিল তাহার খেলার সঙ্গী, তাহাতে তাহার কোনও দুঃখ থাকিত না: ফিরিয়া আসিয়া মার খাইবার ভয়কে সে গ্রাহ্য করিত না।

•

তাহার সে দিনকার ধারাপাতের পড়া হয় নাই। কি করিয়া হইবে? আজ কিসের ছুটি, তিনটার সময়ই তাহার কাকার ফিরিয়া আসিবার কথা, এবং আসিয়াই পড়া ধরিবার কথা। তাহার স্বপ্নজালের মধ্যেই কখন তিনটার সময় কাঁসারী বাসন ফিরি করিয়া চলিয়া গেছে, সে আর পড়িবার সময় পায় নাই। কাকা আসিয়াই পড়া ধরিলেন এবং পড়া না পারিবার জন্য শাস্তিও প্রচুর দিলেন। সে নাকি কোনও দিনই পড়া পারে না, তথাপি তিনি আজকের শাস্তিটা কিছু কম করিয়াই দিলেন, কিন্তু এবার কোনও দিন পড়া না পারিলে তাহাকে যে আস্ত রাখিবেন না সে কথাও জানাইয়া দিলেন।—বেচারী সেই জানলার ধারে গিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার বাবা ফিরিয়া আসিতেই বেচারী আর নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিল না। তাঁহার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে আর তাহার কাকার কাছে পড়িবে না, কক্ষণোও পড়িবে না,—যদি তাহার বাবা পড়ান তবেই পড়িবে, নচেৎ বই হাতেই করিবে না। সে পড়া পারে নাই বলিয়াই কি তাহাকে এত মার খাইতে হইবে? কই, ওবাড়ীর কানু পড়া না পারিলে তাহাকে ত তাহার মা এত' মারেন না? তাহাকে যদি এতই বকুনি ও মার খাইতে হয় তবে সে কোনদিন চুপি চুপি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে, কেহ জানিতে পারিবে না, তখন বেশ হইবে।—

তাহার বাবা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "কি হয়েছে রে, অত কাঁদছিস কেন? অজয় মেরেছে বুঝি? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তাকে বলে দেব'খন, আর তোকে অত মারবে না। আর কাঁদিস নি, চল বেড়াতে যাবি দো'তলা বাসে করে? আয় তাড়াতাড়ি হরুর কাছে মুখ পুঁছে' আয়।"

শেষ বৈকালের মলিন কিরণ বড় বড় বাড়ীর কার্ণিশের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত বিপুল জনতা পথটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়া চলিতেছে;—কাহারও ব্যস্ততা বেশী, সে তাড়াতাড়ি পৌঁছিবার জন্য সকলকে ছাড়াইয়া আগে আগে চলিতেছে; কেহ বা অন্যের সহিত গল্প পরিহাসে ধীরে ধীরে পথটুকু অতিক্রম করিতেছে। রাস্তার দোকান পসার লোকের ভিড়ে ও আলোর মালায় একেবারে সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। ফিরতি ট্রাম ও বাসগুলা মানুষে বোঝাই হইয়া যেন আগন্তুক ট্রাম ও বাসগুলাকে ভেঙচি কাটিয়া ছুটিতেছে। তাহারা ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া হাত তুলিতে একটা চল্‌তি বাস থামিয়া গেল এবং তাহার কণ্ডাক্টর সঙ্কেত-ঘণ্টার দড়ি ধরিয়াই নামিয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে সুরু করিয়া দিল—"হ্যারিসন রোড, এসপ্লানেড্, কালী-ঘা-ট,—আসুন বাবু খালিগাড়ী।" তাহারা তাহাতে লাফাইয়া উঠিতেই বাস্ ছাড়িয়া দিল।

বাহিরের অস্তায়মান সূর্য্যকিরণ তখন ওই দূরের নারিকেল গাছটিকে স্বর্ণশীর্ষ করিয়া তুলিয়াছে। সন্ধ্যার মৃদু আলোকে কলেজের খালি বড় বাড়ীটা একটা রহস্যের ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পথিক ও যানের কোলাহলে রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে,—জীবনের উদ্দাম স্রোতে সেও যেন প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটা পার্কে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বিপুল উল্লাসে ছুটাছুটি করিতেছে,—সযত্ন-রচিত এক টুক্‌রা সবুজের মধ্যে তাহারা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুই পাশের বাড়ীগুলি আসন্ন

সন্ধ্যার রঙ্ লইয়া নিজের মধ্যে ধরিয়া লইয়া মনোহর সাজে নীরবে দাঁড়াইয়া কি একটা জিনিষের পরিচয় দেবার চেষ্টা করিতেছে। একটা বড় বাড়ীর গাড়ীবারান্দায় একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া একমনে নীচের লোকচলাচল দেখিতেছে। চৌমাথায় অসম্ভব ভিড়, লোকের চীৎকারে ও মোটরের হর্ণে কিছু স্পষ্ট শোনা যায় না। সেখানে চারিদিকের রাস্তা আসিয়া মিলিয়া আবার চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে—ঠিক্ রূপকথার পথের মত ইহারাও যেন অচিন্‌দেশে রমায়াপুরীতে যাইয়া শেষ হইয়াছে। ওয়েলিংটনের মোড়ে পৌছিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাস্তার আলো জ্বালা হইয়া গিয়াছে। ছড়ানো আলোর হীরার টুক্‌রার মালাপরা ওয়েলিংটনের বাগানটিকে দেখাইতেছে ঠিক পরীলোকের মত। একটা লোক মোড়ের মাথায় ফুল বিক্রয় করিতেছে। বাস্ এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইল ;—তাহার বাবা তাহাকে বলিলেন—"খোকা একটা ফুলের-থোকো নিবি চাঁপাফুলের ?"

বাসের ভিতরে একবাস্ লোক। ঠিক সাম্‌নের আসনে একটি লোক নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে কি রকম অদ্ভুত ভাবে চাহিয়া আছে, দেখিলে রাগ হয়। তাহার পাশেই একটা গয়লা দুধের বাল্‌তি লইয়া বসিয়া আছে,—বাস্ চলিতে আরম্ভ করিলেই দুধ লাফাইয়া, নাচিয়া, ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ করিয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু করিয়া দেয়। একপাশে কয়েকটী যুবক বসিয়া অশিষ্টভাবে নানাপ্রকার গল্প সুরু করিয়া দিয়াছে ; তাহাদের মধ্যে একজন চুরুট ফুঁকিয়া আগ্নেয়গিরির মত ধোঁয়া ছাড়িতেছে। কোণের সিটে একটি বৃদ্ধা মহিলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সমস্ত জগতের উপর এবং বিশেষ করিয়া যেন তাহাদেরই উপর বিরক্ত হইয়া বসিয়া আছেন। খোকার ঠিক পাশেই এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে মুখ ঢাকিয়া পড়িতেছেন।

"টিকেটস্ প্লিজ !" চেকার ঢুকিতেই সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। যে ভদ্রলোক খবরের কাগজে মুখ ঢাকিয়া পড়িতেছিলেন, তিনি খবরের কাগজ নামাইতেই খোকার বাবাকে দেখিতে পাইলেন।—"আরে ভবতোষবাবু যে ! কি খবর ? বাড়ীর সব খবর ভাল ত ? এটি আপনার ছেলে বুঝি ? আহা পুওর মাদারলেস চাইল্ড ! ওকে কোন স্কুল টুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন নাকি ? এখনও দেননি ? তা' ভাল, যতদিন বাড়ীতে পড়ে পড়ুক, তবে যখন দেবেন তখন ভাল স্কুলেই যেন দেবেন। আজকের কাগজ দেখেছেন মশাই—কি ভীষণ কাণ্ড ? এই দেখুন্ না।—কি চাই, টিকেট ? এই যে, হয়ে গেছে।—হ্যাঁ কি বল্‌ছিলাম, দিনে দিনে কী সব কাণ্ড হতে' চল্‌ল মশাই ?—আচ্ছা আপনার ওখানে একদিন যাব'খন্, বেশ গল্পস্বল্প করা যাবে। তবে উঠি, আমার জায়গা এসে পড়্‌ল, নমস্কার।—এই বাঁধো, বাধো বহুৎ মাল হ্যায়, একদম্ বাধো।" তিনি রাশীকৃত পোঁটলা পুঁটলি লইয়া নামিয়া গেলেন।

আব্‌ছা আলোয় গড়ের মাঠটিকে তেপান্তরের মাঠের মতন দেখাইতেছে। আলোছায়ার মিলনের সঙ্গে মাঠটিও ঠিক খাপ্ খাইয়া মানাইয়া গিয়াছে, একটুও অসঙ্গতি নাই। তেপান্তরের মাঠের মত ইহারও যেন সীমানা নাই, ইহাও যেন রহস্যপূর্ণ। একটা পুকুরে গ্যাসের আলো পড়িয়া ঝিকমিক্ করিতেছে, বিদ্যুৎকে কে যেন হাজার টুক্‌রা করিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। ও ফুটপাথের বাড়ীগুলি একদৃষ্টে পথের এধারের শোভা দেখিতেছে। আলোর মালায় গাছের বীথিতে একটা ছন্দের সুরু হইয়া গিয়াছে। নানাবেশে সজ্জিত পথের চলমান লোকগুলি যেন সেই ছন্দে সুর যোগাইয়া দিতেছে।

খোকা একবার বাসের ভিতর তাকাইল।—ধোৎ, সেই লোকটি এখনও বিশ্রীভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আচ্ছা, ওকি আর কিছু দেখিবার জিনিষ পায় নাই ? অমন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে কেন ? খোকা বিরক্ত হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল যেন এক ছায়াশীতল পথের মধ্য দিয়া বাস নক্ষত্রগতিতে ছুটিতেছে। সে বাসের মধ্যে একা বসিয়া আছে। উপরে পথের দুইধারের গাছের ডালগুলি বাহুতে বাহু বাঁধিয়া পরম শান্তিভরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র আসিয়া মাটির উপর ঝিলিমিলি খেলিতে সুরু করিয়াছে। গাছের ডালে একটা অদ্ভুত ধরণের পাখী বসিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, বাস্‌টা দূরে ছুটিতে থাকিলেও তাহার

দৃষ্টি এড়াইতে পারিতেছে না। দু'ধারে মাঠের ঘাসে শাদা শাদা ফুল ফুটিয়াছে। দূরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ লালফুলে একেবারে ছাইয়া গিয়াছে। গাছের পাশে দাঁড়াইয়া কে যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে—বাস্‌টা তাহারই দিকে ছুটিতেছে। বাস্‌টা নিকটবর্ত্তী হইলে মনে হইল যেন ওমুখ তাহার চিরদিনের চেনা। ঐ গভীর কালো চোখ কানুর মায়ের মত হাসি-হাসি সুন্দর মুখ, সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে কিন্তু কোথায় তাহা মনে করিতে পারিতেছে না। ভাবিতে লাগিল, "এ—কে?"

হঠাৎ একটা ধাক্কায় সে চমকাইয়া উঠিয়া পড়িয়া দেখে বাস্ কখন থামিয়া গিয়াছে, তাহার বাবা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন ও তাহাকে ঠেলিতেছেন।— "আরে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছিলি, কিচ্ছু দেখ্‌তে পেলি না!— ওঠ, ওঠ, আয় নেমে আয়, একটু বেড়িয়ে আসি।"

তাহার পরের দিন আবার দুপুর বেলা সে জানালার ধারে বসিয়া ধারাপাত মুখস্থ করিতেছিল। তাহার এই সময় পড়িতে আদৌ ভাল লাগে না।—এই সময় তাহার শুধু ভাল লাগে বাহিরের সহরের প্রকৃতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে, তাহার সহিত খেলা করিতে। পড়িতে পড়িতে একটুকু সময় চুরী করিয়া বাহিরের দৃশ্যকে সে কাঙালের মত দেখিতে থাকে লুব্ধ দৃষ্টিতে, তাহার মনের পটে ঐ দৃশ্যটুকুকে আঁকিয়া লইতে চেষ্টা করে। রোজই তাহার এইরূপ লুকোচুরী চলিতে থাকে।

কিন্তু আজ আর কেমন সে থাকিতে পারিল না। সহরের মুখর স্বাধীনতা প্রত্যহ তাহাকে ডাক দিয়া ফিরিয়া যায়, আজ সে তাহার ডাক ফিরাইয়া দিতে পারিল না। পড়া ফেলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া নীচে আসিয়া দেখিল কেহ আছে কিনা; তাহার পর ধীরে ধীরে সদর দরজা ভেজাইয়া দিয়া পথের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

একধারের ফুটপাথে ছায়া নামিয়া আসিয়াছে: আর একধারের ফুটপাথে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পথের ধারে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার চালক ইঞ্জিনের ঢাক্‌না খুলিয়া কলকব্জা পরীক্ষা করিতে করিতে কেবলই ধোঁয়া ছাড়িয়া দিতেছে—গন্ধে, শব্দে ও ধোঁয়ায় সে জায়গাটা ভরিয়া উঠিয়াছে। একটা মনোহারী দোকানের দরজার উপর পর্দ্দা নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া দোকানের অজস্র মণিমুক্তা কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। একটা কলেজের ছাত্র খাতা দোলাইতে দোলাইতে চলিয়া যাইতেছে। খোকার মনের ভিতর বড় বড় বাড়ীগুলি, নিস্তব্ধ দোকানগুলি ও পথের চলন্ত জীবন তাহাদের সৌন্দর্য্য লইয়া হুটাপুটি লাগাইয়া দিয়াছে। একটা তেমাথার মোড়ে আসিয়া খোকা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পর পর বাড়ীগুলি খাড়া হইয়া আছে, তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তাগুলি এদিক্ ওদিক্ বাঁকিয়া চলিয়া গিয়া আবার যেন ঠিক সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদের কোনও একটা পথ ধরিয়া চলিয়া গেলে ফিরিয়া আবার ঠিক একই স্থানে হাজির হইতে হইবে, অথচ কি করিয়া হইতে হইবে বুঝা যাইবে না—কেবল বড় রাস্তাটি দুই দিকে অনেক, অনেক দূর গিয়া উধাও হইয়া গিয়াছে— তাহার শেষ আন্দাজ করা যাইতেছে না।

হঠাৎ কাঁধে হাত পড়িতেই তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, পিছন ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাঁড়াইয়া। "হ্যাঁরে খোকা, তুই এখানে কি করে' এ'লি? বাড়ী থেকে চলে এসেছিস্ বুঝি? অজয় বকেছে বুঝি? তাই বলে কি বাড়ী থেকে চলে আসেরে দুষ্টু? ছি, ছি, ভাগ্‌ দেখি যদি হারিয়ে যেতিস্? চল্ চল্, বাড়ী চল্,—আচ্ছা অজয়ের কাছে তোর ধারাপাত পড়্‌তে হবেনা, আমি পড়াব'খন।"

বাড়ীর কাছে পৌছিতেই তাহার কাকার সঙ্গে দেখা। "এই যে, এতক্ষণ কোথায় যাওয়া হয়েছিল? দেখুন দাদা পড়বার নাম নেই, দুপুর বেলা বাড়ী থেকে পালিয়ে টো টো করে রাস্তায় বেড়াচ্ছে। হ্যাঁরে পাজি আর যাবি কখনো?"বলিয়া তিনি অগ্রসর হইতেই খোকার বাবা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্, আমি ওকে খুব বকেছি, এবার থেকে ঠিক পড়বে'খন। কালকে না হয় একটা স্কুলে ভর্ত্তি করে দোব। চলরে খোকা; আমার কাছে ধারাপাত পড়বি চল।"

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

প্রতীক্ষা

শ্রীমতী মানসী দেবী

তব শুভ আগমন প্রতীক্ষার দীপখানি জ্বালি,'
নিদ্রাহীন দুনয়নে অবিরাম অশ্রুনীর ঢালি',
উদার নির্ম্মল করি' এ আমার হৃদয় গগন
আজি হতে তোমা লাগি' চিররাত্রি মোর জাগরণ !

দেহের অতীত ওগো ! তুচ্ছ মম বাহুর বন্ধনে
তোমারে পাইনি কভু,—পাবনা সে জানি এ জীবনে।
তবু তাহে নাহি ক্ষোভ ; অন্তরের নীলাম্বু বেলায়
দেখা দেছ মাঝে মাঝে জানি তুমি স্নিগ্ধ মহিমায় !

আমার কাঠের তরী পদপাতে রাঙ্গা করি' দিয়া
দিগন্তের শেষ প্রান্তে নীলিমায় গেছ লুকাইয়া।
প্রশান্ত করুণ নেত্রে স্মিত হাস্যে চাহি' কতবার
উদ্ভাসি' তুলেছ মোর সব দৈন্য, সব অন্ধকার।

ধন্য তুমি করেছিলে একদিন বাসি' মোরে ভাল,
অন্তরের বাতায়নে তাই আজি জ্বালিলাম আলো।

সাহিত্যিক ও সামাজিক অপবাদ

শ্রীযুক্ত গোপ্পতি ভট্টাচার্য্য

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল সামাজিক censure পাইয়াছিল কি না জানিনা কিন্তু যাঁহারা নীতির কষ্টি-পাথরে সাহিত্যকে যাচাই করিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের কথা ভাবিয়া মনে হয় বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল অন্ততঃ কিছু পরিমাণ সামাজিক অপবাদ সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। তাহার কারণ দুইখানি বইই নূতন। সেইজন্যই আশঙ্কা হয়—আপনার কালে বঙ্কিমচন্দ্র বহুজন-সমাদৃত হইলেও সর্ব্বজন সমাদৃত ছিলেন না। কাশীদাস কৃত্তিবাসও যে দেশে সামাজিক ban হইতে পরিত্রাণ পান নাই, বঙ্কিমচন্দ্রও যে সে দেশে সর্ব্ববাদীসম্মত প্রশংসার অধিকারী হইবেন এরূপ আশা করা যায় না।

সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য রসসৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলে ঔপন্যাসিকের বহুবিধ গৌণ কার্য্যের মধ্যে দেখিতে পাই ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে সাহায্য করা; তাই প্রথমেই উপন্যাসের সহিত হয় সমাজের সংঘর্ষ। সমাজকেই ঔপন্যাসিক তাঁহার বিষয়রূপে গ্রহণ করেন, সামাজিক নরনারীর জীবন কাহিনীই ঔপন্যাসিকের উপাদান যোগায়, সমাজের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষাই ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে বর্ণ বিন্যাস করে। কিন্তু এসকল ছাড়া আর একটা বস্তু আছে সেই বস্তুই ঔপন্যাসিকের চিত্রে প্রাণ সঞ্চার করে, বর্ণনায় সজীবতা আনিয়া দেয়। ইহা হইতেছে ঔপন্যাসিকের প্রতিভা।

সামাজিক উপন্যাসগুলি সমাজের চিত্র, কিন্তু ফোটোগ্রাফের চিত্রের মত নির্জ্জীব নহে, নির্জ্জীব চিত্র হইলে বোধহয় উপন্যাসের সহিত সমাজের কোন কালে সংঘর্ষ হইত না।

কারণ ফোটোগ্রাফিতে বাহিরের সবটুকুই ধড়া পড়ে, পড়েনা কেবল ভিতরের প্রাণটুকু। এই প্রাণটুকু ধরিতে গিয়াই হয় স্রষ্টার বিপদ। ‘বিপদ আর কিছুই নহে—প্রাণের পরিচয় যে অগ্রগতি সেই অগ্রগতি আসিয়া পড়ে শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে। সমাজ আর সব সহিতে পারে কিন্তু এই অগ্রগতির চেষ্টা তাহার পক্ষে অসহ্য, অথচ এই অগ্রগতি না থাকিলে কোন সমাজই টিকিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু অধুনা প্রচলিত realistic art এর কথা হইতেছে ‘যেখানে যেটি যেমন আছে, সেটিকে সেখানে ঠিক তেমনি করিয়া দেখাও।’ তাই যদি হয়, তবে সমাজের সহিত সাহিত্যের সংঘর্ষ হইবার ত কথা থাকে না।

একথার উত্তরে কিছু বলিবার আগে বলিয়া রাখা ভাল যে সংঘর্ষ অর্থে বিরোধ নহে। সাহিত্যের ভিত্তি সমাজে, প্রচার সমাজে, সমাজই সাহিত্যের উপাদান যোগায়; আবার সমাজের কৃষ্টি, সভ্যতা উৎকর্ষ লাভ করে সাহিত্যের উৎকর্ষে: সমাজের আদর্শ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা গড়িয়া উঠে সাহিত্যের ভিতর দিয়া। কাজে কাজেই সাহিত্যের সহিত সমাজের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, কিন্তু বিরোধ থাকিতে পারে না বলিয়াই যে কখনও সংঘর্ষ হইতে পারেনা সে কথা বলা চলে না।

সাহিত্য realistic বলিতে সাধারণতঃ যে অর্থ করা হয় প্রকৃত পক্ষে realisticএর অর্থ ঠিক সেরূপ নহে। realismএর ব্যাখ্যা অনেকে অনেকরূপ দিয়াছেন: সম্প্রতি বর্ষার কবিতা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত realism অর্থে করিয়াছেন যথাস্থিতত্ব বাদ।

প্রকৃত পক্ষে যে জিনিষটি যেখানে আছে তাকে ঠিক সেইখানে সেইরকম ভাবে দেখানই যদি Realism হয় তাহা হইলেও কোন অসুবিধার কথা নাই, কারণ ঔপন্যাসিকের কারবার প্রধানতঃ নরনারী লইয়া, একটা সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে স্থান ও কালের back ground এর উপর পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতের সাহায্যে নরনারীর চিত্র

অঙ্কিত করা। নর নারীর কতটুকুই বা বাহির হইতে জানা যায়। যেটুকু বাহির হইতে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সাহায্যে জানা যায় সেটুকু মানুষের মনের কাছে এত তুচ্ছ এবং সময়ে সময়ে এত মিথ্যা হইয়া পড়ে যে মনের কাছে তাহাদের কোন দামই থাকে না। কাজে কাজেই যেটুকু বাহির হইতে দেখা যায় তাহাকে মন দিয়া বুঝিতে হইলেই তাহার পিছনে যে মনের অস্তিত্ব আছে তাহারই খোঁজ করিয়া ফিরিতে হয়, কিন্তু মন ত আর ইন্দ্রিয়ের বেড়ায় ধরা পড়ে না; সুতরাং উপন্যাসের ক্ষেত্রে realism এর প্রসার বড় বেশীদূর পর্য্যন্ত গড়াইতে পারেনা। এই সহজ কথাটা না বুঝিয়া অনেক সময় আমরা ঝগড়া করিয়া মরি। উপন্যাস যে হিসাবে chronicle বা সংবাদপত্রের সংবাদ হইতে ভিন্ন, সেই হিসাবেই নির্জ্জলা realistic হইতে পারে না। অধ্যাপক হাডসনের কথায় "Realism must be kept within the sphere of art by the presence of the ideal element" কিন্তু এই ideal elementএর অর্থ কি? অনেকে ইহার অর্থ অনেক ভাবেই করিয়াছেন, কবির ভাষায় ইহা হইতেছে "the light that was never on land or sea" আলঙ্কারিকের ভাষায় ইহাই বস্তুর রসরূপ; কিন্তু সহজ কথায় না বলিলে "light" কথাটিও যেরূপ অবোধ্য রসরূপ কথাটিও প্রায় তাই। সহজ কথায় বাহিরের বস্তু বা ব্যক্তি শিল্পীর অন্তরকে যখন আকৃষ্ট করে শিল্পী তখন সমগ্র মনের সহিত সেই বিষয়টি নিজের অন্তরে গ্রহণ করেন, তারপর মনের মণিকোঠায় তাঁর সৃজনীপ্রতিভা খোঁজে সেই বস্তু বা ব্যক্তির অন্তর; ক্রমশঃ অন্তরের সহিত অন্তরের সেই পরিচয় যখন পূর্ণতার চরমে আসিয়া পৌঁছায় তখনই তাহা আবার শিল্পীর অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসে আর এক মূর্ত্তিতে। এ-মূর্ত্তি তাহার পূর্ব্ব মূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন না হইলেও কেমন যেন একটু পৃথক; সে পার্থক্যের কারণ তাহার এই নবমূর্ত্তির উপরে থাকে তাহার স্রষ্টার প্রতিভাশালী মনের উজ্জ্বল ছাপ। এই ছাপের অস্তিত্ব বাইরের জগতে কোথাও নাই, এ ছাপ পুরোপুরি মানস।

সমাজের সহিত ঔপন্যাসিকের সংঘর্ষ বাধে এই মনের ছাপ লইয়া; কারণ প্রতিভার লক্ষণই হইতেছে দূরদৃষ্টি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই দূরদৃষ্টি সাধারণতঃ মানবের বহিঃপ্রকৃতি ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া মানবহৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া সমূহ বাহিরে আনিয়া পাঠকের চক্ষের সম্মুখে এরূপ সুন্দর, সুশৃঙ্খল এবং সুসংলগ্ন ভাবে ধরিয়া দেয় যে তাহা হইতে জীবনে সত্যরূপ সমস্যার উৎপত্তি সম্ভব হয়. তাহা হইতে জীবনে যতটুকু সুখ দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে যতকিছু অপূর্ণতা সম্পূর্ণতা থাকে সবই যেন পরিষ্কার মূর্ত্তিতে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। বর্ত্তমানের প্রতিমুহূর্ত্ত অনাগত ভবিষ্যতের সূচনা করে কিন্তু বর্ত্তমান চায় ভবিষ্যৎটি ঠিক তাহারই আদর্শ মত গড়িয়া উঠুক; উন্নত হউক, উজ্জ্বল হউক, কিন্তু তাহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া সে উন্নতি সে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক। সেই হিসাবে সমাজ চায় তাহার অন্তর্ভুক্ত সকল জীবকে তাহার সামনে রাখিয়া অন্ধ-আনুগত্যে তাহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে, কিন্তু প্রতিভা সে শাসন মানে না। তাহার অতি-মানুষদৃষ্টির সম্মুখে সমাজের অন্তরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যে সহজ কথায়, যুক্তির মাপকাঠিতে সে সকল গোপন তথ্যের বিচার করিতে চায় সে হয় সমাজ সংস্কারক। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হয় সমাজের দোষ সংশোধন করা। কিন্তু যে শুধু বর্ত্তমান সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া শাশ্বত মানবাত্মার খণ্ড অভিব্যক্তির কাহিনীকে রসরূপ দিয়া সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরে সে হয় ঔপন্যাসিক—তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি করা; তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। কিন্তু নগেন্দ্র বা কুন্দনন্দিনীর পার্শ্বে দেবেন্দ্র বা সূর্য্যমুখী বা হিরা ঝি, গোবিন্দলালের সংস্পর্শে ভ্রমর এবং রোহিণীর সংস্পর্শে ভ্রমর ও গোবিন্দলাল এইরূপ পাত্রপাত্রীর সাহায্যে মানবহৃদয়ের অনুরাগ, বিরাগ, শঙ্কা, সংশয়, হর্ষবিষাদ প্রভৃতি চিরন্তন বৃত্তির লীলা-চিত্রণ প্রসঙ্গে, এই সকল বিভিন্ন রুচি প্রবৃত্তি এবং অবস্থার নরনারীর সামাজিক অবস্থান ও তাহাদের সম্বন্ধে সমাজের ব্যবস্থার ফলে যে সকল সমস্যা সমাজের অন্তরে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে সেই সকল সমস্যা তাহাদের সঙ্গীন মূর্ত্তি লইয়া পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। ইহার ফলে সমাজে সাময়িক বিশৃঙ্খলা এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

সমাজ চিররক্ষণশীল; কোন দেশের সমাজ, এমন কি আধুনিক গতিবাদী সোভিয়েট রুষিয়ার সমাজও, একেবারে রক্ষণশীলত্ব ছাড়িয়া দিয়া পথ চলিতে পারে নাই। এই রক্ষণশীলতাটুকু ছাড়িয়া দিলে সমাজের অস্তিত্ব বড় বেশী দিন অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব হয় না। এই জন্যই সাহিত্যের ভিতর দিয়া নূতন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত যেমনই সমাজের নিকট পৌছায় অমনি সমাজ বাঁকিয়া বসে, সে সাহিত্যকে গ্রহণ করিবার পথে যত রকমে পারে বাধা সৃষ্টি করিতে চায়, কিন্তু প্রতিভার সহিত সমাজ পারিয়া ওঠে না। আজ না হয় কাল, একদিনে না হয় পাঁচদিনে, প্রতিভা সমাজের বাধা বিপত্তি পরাজয় করিয়া সমাজের মধ্যেই আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে, তখন সমাজ তাহাকে মানিয়া লয়। বিষবৃক্ষের মধ্যদিয়া বিধবা কুন্দনন্দিনীকে লইয়া এইরূপ একটা সামাজিক সমস্যা গড়িয়া উঠিয়াছে। রোহিণীকে লইয়া সামাজিক সমস্যা তেমন স্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ না করিলেও গোবিন্দলালের অন্তর-ভূমিতে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি, ভ্রমর ও রোহিণীর পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে রূপগুণের চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়া মানব জীবনের অতি পুরাতন সমস্যা নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এইরূপ সামাজিক সমস্যাগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। পল্লীসমাজে রমেশ ও রমা, বড়দিদিতে বড়দিদি, চরিত্রহীনে সাবিত্রী, শ্রীকান্তে অভয়া, শেষ প্রশ্নে কমল ও নীলিমা তাহাদের জীবনে যে সমস্যার ইঙ্গিত লইয়া পাঠকের অন্তরের সম্মুখে দাঁড়ায় সে সমস্যা যেমনই জটিল তেমনই মর্ম্মস্পর্শী, যেমনই করুণ তেমনই পীড়াদায়ক।

বাস্তবতঃ সুশৃঙ্খল সমাজের অন্তরদেশে ডুব দিয়া বাছিয়া বাছিয়া এই সকল তীব্র সমস্যা বাহির করিয়া পাঠক সমাজকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া সামাজিক নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ততার ব্যাঘাত ঘটাইলে সমাজ তাহা সহ্য করিবে কেন? এই জন্যই সমাজের সহিত ঔপন্যাসিকের সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

শ্রীগীষ্পতি ভট্টাচার্য্য

"আমায় ছাড়া"

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে বলেন মাতা রেগে,—
'ওরে দুষ্টু খোকা,
আমি যে তোর পরমপূজ্যা গরীয়সী মাতা,
জানিস্‌না কি বোকা?'
চোখ দু'টিকে নাচিয়ে তখন খোকা হেসে বলে
হাত দু'খানি ধ'রে —
'আমায় ছাড়া 'মা' নামের কি পেতিস্ কোন স্বাদ
বল্‌না গো মা মোরে?'

চিরন্তনী

শ্রীযুক্ত মনোজ গুপ্ত

১

বেলা প্রায় দু'টো। দীপেন আস্তে আস্তে তার ঘরে ঢুকছিল। সারাদিন পরিশ্রমে শরীরটা এত খারাপ বলে মনে হচ্ছিল যে, পথ চলা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার জুতোর শব্দ পেয়ে শিখা চোখ তুলে দেখলে। কি একটা সে পড়ছিল কিন্তু কোন কথা না বলে ঘর থেকে চলে গেল। সে যে কেন ঘরে ঢুকেছিল, তা ভাববার মত অবস্থা দীপেনের একেবারেই ছিল না। সে কোন রকমে জুতোটা খুলে রেখে শুয়ে পড়ল। খেতে একটুও ইচ্ছে ছিল না—আর কেউ যে খাবার জন্যে অনুরোধ করবে সে বালাইও ছিল না। একে বড়লোকের বাড়ী, তায় সে গলগ্রহ—তার খাওয়া হল কি না খোজ নিতে কার বয়ে গেছে? এর জন্যে কিন্তু তার মনে একটুও দুঃখ ছিল না। বেশ স্বাধীনভাবে দিনগুলো তার কেটে যেত। বাড়ী ফিরতে বেলা দু'টো কি তিনটে হলেও কেউ কিছু বলে না—তাতে তার কাজের অনেক সুবিধা হয়। কাজও অনেক, চাঁদা আদায় করা, বই বিক্রী করা, মিটিংএর জোগাড় করা আরও কত কি। এতে সে এমনি মেতে থাকত যে পৃথিবীর অন্য কোন খবরই জানবার অবসর হত না। সাধারণ কোন ছেলে ভাইএর শশুর বাড়ী থাকতে হয় ত' লজ্জাবোধ করত, কিন্তু সে বেশ ছিল।

শিখা গেল তার দিদির কাছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে সে বললে, "আচ্ছা দীপেনবাবু তো অনেকক্ষণ এসেছেন কিন্তু এখনও 'নাইতে' গেলেন না ত!"

"তা কি করব বল্?"

"একবার খোঁজ নেওয়া ত উচিত!"

'তোর এত মাথা ব্যথা হয়ে থাকে তুই নিগে যা।"

"আচ্ছা, তাই যাচ্ছি" বলে শিখা চলে গেল। দীপেনের ঘরে গিয়ে দেখলে সে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ কি মনে হল, গায়ে হাত দিয়ে দেখলে—বেশ জ্বর হয়েছে। ফিরে গিয়ে তার দিদিকে বললে, "দেখ দিদি, দীপেনবাবুর বোধ হয় জ্বর হয়েছে।"

"কি করে জানলি?"

"মুড়ি দিয়ে শুয়েছেন—কিছু খাননি। তুমি গিয়ে একটু বস না।"

"আমার ভারি দায়! কেন ওর আশ্রমের লোক এসে বসুক না।"

"খবর দিলে তারা এসে বসবে বই কি: উপস্থিত তুমি ত চল!"

নীতিকে যেতে হল,—শিখাও সঙ্গে যাচ্ছিল কিন্তু কি মনে হল, আর গেল না। নীতি গিয়ে দেখলে দীপেন ঘুমুচ্ছে—সে ফিরে এল।

সন্ধ্যাবেলা ঘুম ভেঙ্গে যেতে দীপেনের শরীরটা বেশ ভাল বলে মনে হল। ক্ষিদেও পেয়েছিল কিন্তু বাড়ীতে কাকে বলবে? তাই সে পকেট থেকে পয়সা বার করে দোকানে যাবে ভাবছিল, এমন সময় একটা চাকর চা আর খাবার এনে রেখে গেল। দীপেনের ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল। সে চা খায় না তাই তার বিকেলে জলখাবারও আসে না—আজ হঠাৎ হল কি? যাক্ তাকে আর বাইরে যেতে হল না, এইটেই উপস্থিত লাভ। তার খাওয়া শেষ হবার আগেই একটা ছেলে এসে বললে, "দীপেনদা, কমিটীতে ঠিক হল তোমাকেই বাঁকুড়া যেতে হবে। তুমি সেখানকার অনেক কিছু জান, আর কেউ পারবে না!"

"কবে যেতে হবে রে?"

"কবে কি? কালই!"

"শরীরটা একটু খারাপ ছিল! যাক্, কালই যাব বলে দিস্!"

রাত্রে দীপেন তার দাদাকে বল্লে, "কাল আমি বাঁকুড়া যাচ্ছি।"

"কেন?"

"আশ্রম থেকে পাঠাচ্ছে।"

"তোমায় অনেকবার বলেছি ওসব ছাড়। বেশ ত, দেশের উপকার করতে চাও কর না। মিটিং ছাড়া কি অন্য কোন কাজ নেই? দেশে যে জিনিষ তৈরী হয় না, সেইরকম একটা কিছুর ব্যবসা কর—অনেক লোকের উপকার হবে। তাহলে তোমার বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করতে পারি।"

"তোমার ঐ অনুরোধটা কোন দিন রাখতে পারব বলে মনে হয় না দাদা।"

"কেন বিয়ে করলে কি দেশের কাজ করা যায় না? তাহলে মহাত্মা, দেশবন্ধু, মতিলাল, এঁদের ত কর্ম্মী বলা চলে না।"

"তাঁদের কথা বল না দাদা, তাঁরা সাধারণ মানুষের এত ওপরে যে তাদের মধ্যে তাঁদের কথা না তোলাই ভাল।"

"তুমি তা হলে সত্যিই বিয়ে করবে না?"

"না।"

"শিখাকে তাহলে এতদিন শুধুই বসিয়ে রাখলাম! নীতি ঠিকই বলেছিল। এতবড় সম্পত্তির আধখানা বাইরের লোককে ছেড়ে দিতে হবে!"

ঠিক সেই সময় নীতি ঘরে ঢুকে বললে, "তার দরকার কি? তুমি নিজেই না হয়—

"সইতে পারবে?"

"কেন পারব না? তবু ত জানব আমার বোন একটা মানুষের হাতে পড়ল।"

গোপন দংশনটুকু অবলীলাক্রমে পরিপাক ক'রে কোন কথা না বলে দীপেন ঘর থেকে চলে গেল।

২

দীপেন এত কষ্ট করে জবাব দিলেও তার দাদা হয়ত আরো কিছুদিন অপেক্ষা করত কিন্তু নীতি তা করতে দিলে না। কি কুক্ষণেই সে দীপেনকে দেখেছিল! তাকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না, যদিও দোষ তার কিছুই ছিল না। স্বামীকে সে খুব বেশী বিরক্ত করত শিখার বিয়ের জন্যে। বেচারা কোন উপায় না পেয়ে বললে, "শিখাকে জিজ্ঞেস করে তবে বিয়ের চেষ্টা করা উচিত। শেষে সে যদি বিয়ে করতে না চায়?"

"না চাইবে না? তোমার ঐ গুণধর ভাইএর জন্যে বসে থাকবে?"

"যদিই থাকে? সেটা ত জেনে নেওয়া দরকার।"

"তার কোন দরকার হবে না। আমার বোন সে, তাকে আমি যথেষ্ট জানি।"

এরপর আর কথা চলে না, কাজেই তাকে চেষ্টা করতে হল। ভাল ছেলে—অবশ্য লেখাপড়ায়—পাওয়া মোটেই শক্ত নয় কারণ বিয়ের বাজারে দাম মেয়ের নয়—মেয়ের বাপের টাকার। শিখার সেদিকে কোন অভাব ছিল না, তাই তার বরাতে ভাল ছেলেই জুটল।

বিয়ের পরদিন নীতির চোখে জল দেখে তার ভারি রাগ হচ্ছিল। একি অন্যায় কথা? সে তার জীবনের একটা মহাশুভক্ষণে এসে পৌচেছে আর নীতি কি না কাঁদছে? এ নিশ্চয় লোক দেখান, অন্ততঃ দুঃখের ত নয় নিশ্চয়—দুঃখ করবার আছে কি?

যাবার সময় নীতি বললে "কি মেয়ে বাবা! একটু কাঁদলেও না।"

"কাদবো কেন?"

"এতদিনকার চেনা জায়গা ছেড়ে যেতে কি তোর একটুও দুঃখ হচ্ছে না?"

"বরং আনন্দ হচ্ছে নতুন জায়গায় যাচ্ছি ভেবে।"

"মনে কর, যদি তোর সেই দীপেনের সঙ্গে বিয়ে হত, তাহলে কি তুই এত সুখী হতিস?"

"কি জানি।"

"কিন্তু আমি জানি হতিস না।"

নতুন জায়গায় যাওয়ার আনন্দটা কিন্তু খুব উপভোগ্য হবে শিখার মনে হল না। একে বয়সে সে মোটেই ছেলেমানুষ নয়, তার উপর সে বড় লোকের ঘরের মেয়ে,

কাজেই বাড়ীর সকলেই তাকে একটু তফাতে রেখে চলতে চেষ্টা করত। অবশ্য তার জন্য তাকে কোন অসুবিধা ভোগ করতে হ'ত না—এক সঙ্গীর অভাব ছাড়া। এ অভাবটা তার কাছে কিন্তু খুব বড় অভাব নয় কারণ সে কোনদিনই বেশীলোকের সঙ্গে মিশত না। তার মুখে এমন একটা অসাধারণ রকমের গাম্ভীর্য্য ছিল যে, নীতিও তাকে ঠাট্টা করতে সব সময়ে সাহস করত না। বয়সের সঙ্গে এটা এমনি বেমানান যে তার স্বামী বেচারা পড়ল মহা-বিপদে। নিজে সে মোটেই গম্ভীর নয় তাই এই গাম্ভীর্য্যের মুখোসকে দেখে একটু বিব্রত হল। তবু সাহসে ভর করে একদিন বললে, "আচ্ছা, তুমি এত গম্ভীর হয়ে থাক কেন?"

"গম্ভীর? কেন আমি কি খুব গম্ভীর নাকি?"

"লোকে ত এই রকম বলে!"

"কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি না। এই যদি গম্ভীর হওয়া হয়, তাহলে অগম্ভীর হওয়া হচ্ছে কারণে অকারণে হাসা। তাহলে কিন্তু আবার লোকে পাগল বলবে।"

"অকারণে দরকার নেই, কারণে হাসলেই হ'ল। তুমি বোধ হয় তাও হাস না।"

"একজনের কাছে যেটা কারণ, আমার কাছে তো সেটা নাও হতে পারে।"

এদিকে তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই দেখে স্বামী বললে "আমি খুব অল্পদিনের মধ্যে বিলেত যাব।"

"সে তো খুব ভাল কথা।"

"আমার জন্যে তোমার একটুও মন কেমন করবে না?"

"তা কি করে বলব? তবে সম্ভবতঃ করবে না, কারণ আপনার সঙ্গে পরিচয় তো মাত্র এই ক'দিনের।"

এত সোজাসুজি জবাবের পর হৃদয়ের কপাট বন্ধ করতেই হয়। কাজেই তাকে একেবারে বলতে হল, "কিন্তু বা ঠিক ছিল তাতে তো টাকা—"

কথাটা শেষ হতে না দিয়ে শিখা বললে, "দিদির কাছে গেলেই তিনি দিয়ে দেবেন—টাকা তো আমার কাছে নয়।"

শিখা যে তার স্বামীকে আঘাত দেবে বলে এ কথা বলেছিল ঠিক তা কিন্তু ত মনে আঘাত লাগল, কারণ যে স্ত্রীর মন স্বামীর সুদূর প্রবাস-যাত্রার কথা শুনে বিচলিত হয় না তার অর্থে বিলেত যাওয়ার মধ্যে গৌরবের কোনো বস্তু নেই। একবার তার মনে হল বিলেত যাবে না, কিন্তু বেশীক্ষণ এভাব রইল না। বিলেত যাবার মোহ তাকে এমনিই চেপে ধরেছিল।

৩

কার্য্যস্থলে পৌঁছে দীপেন বুঝলে কাজ করা যত সহজ ভেবে সে এসেছিল সেটা ঠিক তত সহজ নয়। দুর্ভিক্ষ বা বন্যার মধ্যে কাজ করা তার পক্ষে নতুন নয় কিন্তু এবার যেন কোথায় একটা বাধা ছিল। কাজের মধ্যে সে এমনি একটা শক্তি পেত যে কাজ যত শক্তই হোক না কেন সে তা করত, কিন্তু এবার সেই শক্তিটাকে সে ঠিক ধরতে পারছিল না—অবশ্য এর জন্যে তার অসুস্থতা অনেকটা দায়ী। কর্ম্মের মধ্যে অবসাদ এলে সে মনে করত সেটা তার দুর্ব্বলতা তাই সেটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করত আরো বেশী কাজ দিয়ে। বিশ্রাম অবসাদের অগ্রদূত: তাই বিশ্রাম সে বর্জ্জন করেছিল। সবাই তার প্রশংসা করত কিন্তু কেউ তাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করত না,—এক দীপ্তি ছাড়া। দীপ্তি তাকে অনুকরণ করত না, করত অনুসরণ। আসল কথা তাদের পথ ছিল একই—কর্ম্মের। দীপেনকে সে চিনত না, হয়ত কোনদিন চেনবার অবসরও হত না যদি না দয়াল ঘোষের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ত। দীপ্তিই তাকে দেখাশুনো করত কিন্তু একদিন তার অসুখটা এত বেশী হয়েছিল যে দীপ্তি ভয় পেয়ে গেল। কোন উপায় না পেয়ে সে গেল দীপেনদের ক্যাম্পে, কারণ তাদের সঙ্গে ডাক্তার ছিল তা সে জানত। এই তার প্রথম দীপেনের সঙ্গে দেখা। তার পর সে দীপেনের কাছে আসে তার সঙ্গে কাজ করবার জন্যে। দীপেনেদের দলে মহিলা কর্ম্মী না থাকায় তাদের যে অসুবিধা ছিল, একা দীপ্তি তা পূরণ করত; কিন্তু সে এমনি অদ্ভুত ভাবে লোকের দিকে চাইত যে কেউ তার সঙ্গে কথা কইতে পারত না। তার চোখের দিকে চাইলেই মনে হ'ত সে যেন নিজের কাছেও নিজেকে ধরা দিতে চায় না।

গেল। আমাদের চায়ে প্রবৃত্তি ছিল না বলে' তাদের সুরে ভুললুম না; তবে সাহেব দু'টী চা-পান করলেন। দেখে আনন্দ হ'ল যে সাহেবিয়ানার ঠাট সত্ত্বেও তাঁরা মাটীর ভাঁড়ের হিন্দুর চা-ই পরম তৃপ্তির সহিত খেলেন।

ছ'টার পরেই আরা পৌঁছে গেলুম। সেখান থেকে মার্টিন কোম্পানীর আরা-সাসারাম লাইট্ রেলওয়ে সুরু। ছোট রেলে চড়া আমাদের দু'জনের মধ্যে কারুরই নতুন নয়, বেহার-বক্তিয়ারপুর রেলওয়েতে নালন্দা, রাজগীর অনেকবার গিয়েছি। তবে এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলুম; ফার্ষ্ট ক্লাসের পরেই ইন্টার ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস নেই। তা'ছাড়া ট্রেণটার গতিবেগ বেহার লাইনের গাড়ীর চেয়ে একটু বেশী মনে হ'ল। গরৌণী কম্প ইত্যাদি শ্রুতিমধুর নামসংযুক্ত ছোট ছোট ষ্টেশন অতিক্রম করে' প্রায় সাড়ে এগারটা বেলায় সাসারাম এসে গাড়ী হাঁফ ছাড়ল, আমরাও হাঁফ ছেড়ে নেমে পড়লুম। নামতেই একটা লুঙ্গিপরিহিত লোক আমাদের মালপত্র ক্ষিপ্রহস্তে তুলে নিয়ে বল্লে, "চলিয়ে বাবু।" একাধো তা'র বিফলমনোরথ প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে দু'চারটী অশ্রাব্য বচন শুনিয়ে দিতে ছাড়লে না। সেও তেমনি ভাষায় জবাব দিয়ে অগ্রসর হ'ল। ষ্টেশন পার হয়ে তা'কে জিজ্ঞেস করলুম সেখানে কোন হোটেল আছে কি না। সে বল্লে, না, ধম্মশালা আছে। অথচ সেই ট্রেণে সম্মাজ্জনীর ন্যায় গুম্ফধারী একব্যক্তি বলেছিলেন, "হাঁ উহাঁ হোটল ভী হ্যায়।" ধম্মশালা কাছেই ছিল। পদব্রজে শনৈঃ শনৈঃ সেদিকে চল্লুম। ধম্মশালার বাহ্যদৃশ্যে কিন্তু আমাদের বিশেষ ভক্তি হ'ল না, তা' ছাড়া তালাচাবি সঙ্গে না থাকা ইত্যাদি কারণে সেখানে ঢুকতে চাইলুম না। কুলী বল্লে, 'নজ্‌দিক্‌মে' ডাকবাংলোও আছে। আমরা বল্লুম, সেইখানেই না হয় চল। গিয়ে হাঁকডাক করতেই জহুর মিঞা দারোয়ান-বাবুর্চি সেলাম করে' দাঁড়াল। বলাবাহুল্য, সাসারাম একটী মুসলমান-বহুল জায়গা। বাংলোর অদ্ধেক ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনীয়ার সাহেবের জন্যে রিজার্ভ করা ছিল, অপর অদ্ধেকের একটী ঘরে আমরা আস্তানা গাড়লুম। ততক্ষণে মাথা এবং শরীর তেতে উঠেছে, বেশ ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে। সয়ীদ নামধারী বাংলোর তির্য্যক্‌চক্ষু খানসামাটীকে গোসলখানায় জল দিতে বলে' জহুর মিঞা কি খাওয়াতে পারে জিজ্ঞেস করা গেল। তিনি গম্ভীরভাবে বল্লেন—অত বেলায় 'কুছ্ হোনা মুস্কিল', বাজার থেকে 'পুরী' মিলতে পারে এবং তিনি শুধু 'আণ্ডা' সরবরাহ করতে পারেন। আমরা দেখলুম বেগতিক। তথাস্তু বলতে হ'ল। সয়ীদ মিঞা জল ভরে' বাজার থেকে কিঞ্চিৎ অখাদ্য তরকারী সমেত 'পুরী' নিয়ে এলেন এবং জহুর মিঞা চারটী অদ্ধদগ্ধ 'অম্‌লেট্' প্রস্তুত করে' দিলেন। জঠরাগ্নি তখন প্রবলভাবে প্রজ্জলিত, সুতরাং স্নানান্তে আর বাক্যব্যয় বা সময়ব্যয় না করে' তাই দিয়েই দগ্ধোদরকে প্রপূরিত করা গেল। আহারের পর বন্ধু বল্লেন, আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করে' দেড়টার সময় শের শা'র



শের সাহের সমাধি—সম্মুখ দৃশ্য (গেট হইতে)

সমাধি দেখতে যাওয়া যাবে। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে পর্য্যটন মোটেই উপভোগ্য নয়, কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম অনুসারে সেইদিন রাত্রেই সাড়ে আটটায় প্রস্থানের কথা, এবং সেই সময়ের মধ্যে নগরভ্রমণ, দ্রষ্টব্যস্থানগুলির দর্শন ও বন্ধু পুলিস সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকরণ—এতগুলি কাজ শেষ করার কথা। তাই স্থির করে' বন্ধু নেয়ারের খাটের ওপর লম্বমান হলেন; আমি ততক্ষণ টেবিলে বসে' একটা জরুরী চিঠি লেখা শেষ করলুম।

দেড়টার পর ক্যামেরা হস্তে বেরিয়ে পড়া গেল। পোষ্ট আফিস খুব নিকটেই ছিল। সেখানে চিঠি ছেড়ে সমাধি যাবার সোজা রাস্তা ধরলুম। দূর থেকে বিরাট গম্বুজটী মনে

বেশ একটু সম্ভ্রমের ভাব এনে দিচ্ছিল। মাঝ রাস্তায় পৌঁছে পকেটে হাত দিতেই মনে পড়ল ক্যামেরার auto-timerটা ফেলে এসেছি। বন্ধু বল্লেন, "আমি ক্যামেরা নিয়ে এগোচ্ছি, তুমি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এস।" দৌড়—দৌড়—দৌড়। তাড়াতাড়ি ডাকবাংলোয় ফিরে স্যুটকেশ খুলে যন্ত্রটা বার করে' ঊর্দ্ধশ্বাসে বন্ধুর সন্ধানে চল্লুন। গিয়ে দেখি বন্ধু পৌঁছে গেটে অপেক্ষা করছেন। বুড়ো দারোয়ান আমাদের খুব খাতির করলে। বিশেষ আগ্রহসহকারে আমাদের সমাধিমন্দির ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইলে। আমরা তা'কে রেহাই দিয়ে বল্লুম,—নিজেরাই দেখে নিতে পারব।

ওপর কে লাল শালু বিছিয়ে ফুল ছড়িয়ে রেখেছিল। আশপাশে আরো অনেক কবর রয়েছে। সব কয়টাই অনাড়ম্বর। একটা খিলানের (arch) গায় আরবী ভাষায় কি সব লেখা। সমস্ত ইমারতটা পাথরে তৈরী; লিপিটুকুও বড় বড় অক্ষরে পাথরে খোদাই করা। একটা প্রবেশদ্বারের পাশে প্রস্তরফলকে ইংরেজীতে শের শা'র মৃত্যু তারিখ (১৫৪৫ সাল) এবং লর্ড রিপনের আমলে কখন সমাধিমন্দিরটার জীর্ণসংস্কার হয়েছিল (১৮৮২ সাল) লেখা আছে। ওপরের গম্বুজ পর্যন্ত ওঠার সিঁড়ি রয়েছে—দু'টো তলার দুটো সিঁড়ি। আমরা ওপর পর্যন্ত উঠেছিলুম, এক এক তলায় এক



শের শাহের সমাধি

সমাধিমন্দির একটা সমচতুষ্কোণ পুকুরের মাঝখানে। গেট থেকে পুকুরের ওপর দিয়ে দু'পাশে খেজুরগাছের সারি বসান পাথরের রাস্তা মন্দির পর্য্যন্ত গিয়ে সোপানশ্রেণীতে পর্য্যবসিত হয়েছে। আগ্রা দিল্লীর স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন দেখা আছে বলে' শেরশা'র সমাধিসৌধ চোখে খুব ভাল লাগল না। অবশ্য আফগান স্থাপত্যে পরবর্ত্তী মোগল স্থাপত্যের কলাকৌশল অনুসন্ধান করা অন্যায়। সৌধটার বিরাট আকারে গাম্ভীর্য্য আছে এবং স্থপতিকর্ম্ম মোটেই নিকৃষ্ট নয়। মধ্যকার বৃহৎ গম্বুজটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শের শা'র কবর কক্ষের ঠিক মাঝখানে। ত'ার

একবার করে' মন্দির পরিক্রম করলুম। খোপে খোপে অনেক পায়রার বাসা।

সমাধি দর্শন করে' ফেরার পথে বুড়ো দারোয়ানটার সঙ্গে দেখা। সে আমাদের আসতে দেরী দেখে আমাদের সাহায্যে আসছিল। দেরী একটু হয়েছিল; তার কারণ ওপরে ওঠার সিঁড়ি আমরা দু' তিনবার খুঁজে পাইনি, তারপর কক্ষের একটা কোণে অন্ধকার গর্ত্তের মত দেখে সিঁড়ি আবিষ্কার করেছিলুম। দারোয়ান মিঞার বোধ হয় বার্দ্ধক্যবশতঃ চাকরী নিয়ে টানাটানি চলছে। সে বেচারী আমাদের কাছ থেকে স্বকর্ম্মপরায়ণতার সার্টিফিকেট

শিখিয়ে নিলে। ফটো তোলা সাঙ্গ করে' বেরিয়ে পড়লুম।

বেলা তখন প্রায় তিনটে। সেখান থেকে অনতিদূরে শের আফগানের পিতা হাসান খাঁ সুরের কবর দেখতে গেলুম। সেটাও একই ছাঁচে গড়া, তবে আকারে ছোট এবং পুকুর-ঘেরা নয়। এখানে যে আগন্তুকসমাগম বেশী হয় না, তা' ফটক এবং কবর কক্ষের দ্বারে তালা দেওয়া থেকে বোঝা গেল। শুনলুম এই সমাধির চারপাশের জমিতেই রাজনৈতিক সভা ইত্যাদি হ'য়ে থাকে। অতঃপর এক্কার সন্ধানে বেরিয়ে পড়া গেল। সময়াভাবে পাঁচ মাইল দূরের মণ্ডিকুণ্ড দেখ্‌তে যাওয়া গেল না. কিন্তু ঠিক করলুম কাছাকাছি চন্দনশাহী পাহাড়ে একবার উঠ্‌তেই হবে। পাহাড়টী মাইল আড়াই দূরে। অলিগলি ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত ডাকবাংলোর কাছেই একটী পুষ্পকরথ পাওয়া গেল। সন্তর্পণে পা গুটিয়ে তার সাম্‌নে উঠে পড়লুম। পথিমধ্যে ছু' পয়সার একসের পানিফল কেনা গিয়েছিল; তাই এবং গাড়ীর ঝাঁকুনি খেতে খেতে সমস্ত পথটা বেশ কেটে গেল।

সওয়া চারটের সময় পাহাড়ের তলায় এসে পৌছোলুম। পাহাড়ের ওপরে একটী দরগা আছে। আমরা একটানা অর্দ্ধেকেরও বেশী চড়েছিলুম, কিন্তু তারপর বন্ধুবরের অবস্থা কিঞ্চিৎ সঙ্গীন হ'য়ে ওঠায় খানিক জিরিয়ে নেমে পড়তে হ'ল। নেমে এসে পাহাড়টার একটা ফটো তোল্‌বার চেষ্টা করলুম। রথ ও সারথিকে সামনে দাঁড় করান হ'ল; বন্ধুও দাঁড়ালেন। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে ঠিক সেই সময় প্রায় দশ মিনিট ধরে' গরু আর মেষের পাল দলে দলে সেই পথ দিয়ে বাড়ী ফিরতে সুরু করলে। চেঁচিয়ে ছু'হাত ছুঁড়ে ক্যামেরা রক্ষা করলুম। তারপর ধূলোর ধোঁয়া কাটতে মিনিট ছুই গেল। Auto-timer লাগিয়ে বন্ধুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। ফটো উঠ্‌ল। কিন্তু বিপদের পর বিপদ! plate বন্ধ করতে গিয়ে slideএর ঢাক্‌নি মধ্য পথে গেল আট্‌কে। কিছুতেই বন্ধ করা গেল না। কি করে' plateটা slideএর ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল; টানাটানির ফলে সেটা আলো লেগে নষ্ট হয়ে' গেল।

যাহোক বিমলের সঙ্গে দেখা করে রাত ৯টার ট্রেনে বিদায় নিলাম। সাসারাম পর্ব্ব শেষ হ'ল।

মোগলসরাই পৌছোলুম রাত সাড়ে এগারটায়। সোজা-সুজি সেকেণ্ডক্লাস ওয়েটিং রুমের দিকে যাওয়া গেল। রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে;—ট্রেণ ভোরে। আসবার সময় ঘণ্টাখানেক ঘুমোনো গিয়েছিল; বাকী রাত ঘুমোনো যা'বে কিনা সন্দেহ ছিল। দেখলুম সেখানে ভিড় তেমন নেই। বন্ধু ইঞ্জিনিয়ারের আশ্রয় নিলেন, আমি টেবিলটার ওপর চিৎ হ'য়ে শুলুম। শোয়া ত গেল, কিন্তু যেমন ছারপোকা, মশার কামড়, তেমনি একটা পচা দুর্গন্ধ থেকে থেকে ভেসে আস্‌ছিল। অগত্যা শীত অগ্রাহ্য করে' ফ্যান চালিয়ে দিলুম। তখন যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারলুম। পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙল। ছ'টায় গাড়ী ছাড়ল। সমস্ত পথ সূর্য্যোদয়ের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাওয়া গেল। অরুণিমায় পূর্ব্বকাশ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে গলিত সুবর্ণবর্ণ তরুণ তপন দিগ্বলয় রেখার ওপর ভেসে উঠ্‌লেন। সে দৃশ্য এমন চমৎকার যে আমরা যতক্ষণ পারলুম সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। পৌনে সাতটায় চুনার এসে গেল। চুনার দুর্গ ষ্টেশন আসবার অনেক আগেই দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছিল।

ষ্টেশনে নাম্‌তেই কোটের গায়ে লাল সুতো দিয়ে Chunar Sanitarium লেখা একটী লোককে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌তে দেখলুম। ঠিক করলুম সেখানে গিয়েই ওঠা যাবে। যান নিয়ে গোল বাধ্‌ল। একটী এক্কাওয়ালা আমাদের মালপত্র কেড়েকুড়ে নিজের শকটে চাপিয়ে দিলে। দক্ষিণা চাইলে চার আনা। একটী অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য টাঙ্গার চালক এক্কাটীর নিন্দে করে' তা'র গাড়ীতে আমাদের নিয়ে যেতে চাইলে। সাসারামের এক্কার ধুপ্‌ধাপ্‌ বিষম ধাক্কা খেয়ে চুনারে বিঘোরে এক্কায় চড়ে' আবার প্রাণকে পঞ্চাছক্কা করতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল না। আমরা ঘাড় নাড়তেই টাঙ্গাওয়ালা এক্কাওয়ালার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে আমাদের জিনিষগুলো টাঙ্গায় তুলে নিলে। ভাড়া জিজ্ঞেস করতেই বল্লে—বারো আনা। আমরা বল্লুম, "দরকার নেই অমন টাঙ্গায়, এক্কাতেই যাব।" টাঙ্গা-

ওয়ালা শিকার ফস্‌কায় দেখে ফস্ করে' একেবারে বারো থেকে চার আনায় নেমে গেল। এক্কাওয়ালা তখন তিন আনা দশ পয়সাতে যেতে রাজী হ'ল। ব্যাপারটা যা'তে আরো হাস্যকর না হ'য়ে ওঠে সেজন্যে আমরা টাঙ্গাতেই চড়ে বসলুম। এক্কাওয়ালার মুখ বেজার দেখে বল্লুম, "আমরা দুপুর দুটোর ট্রেণে ফিরব। সময় মত সেনিটোরিয়মে গেলে তা'র এক্কাতেই ফিরব 'খন।"

সেনিটেরিয়মে চা, টোষ্ট এবং লিলি 'স্কুল' বিস্কুট খেয়ে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। চুনারগড় পাহাড়ে পৌঁছুতে বেশী দেরী লাগ্‌ল না। পাহাড়টা শ' দুই ফিট উঁচু হ'বে। লম্বা পাহাড়; ত'ার সমস্ত মাথাটা জুড়ে' চুনার দুর্গ। দুর্গের প্রবেশদ্বার পৌঁছোতে পাহাড়তলি ঘিরে যে রাস্তা গেছে তাই দিয়ে ঘুরে যেতে হ'ল। দুর্গের মুখে ঢুকে পাথরের খানিকটা ঢালু রাস্তা বেয়ে ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালুম। লাল রঙের মস্ত কাঠের দরজা। গায়ে কতকগুলি ফোকর রয়েছে। তারই ভিতর দিয়ে দারোয়ান লোক দেখে দরজা খুল্‌ছে আর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করছে। আমাদের সামনেই কয়েকটী লোক এবং একপাল গরু ঢুক্‌ল। আমরা আপাততঃ বাইরের প্রস্তর ফলকটীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার লিপি উদ্ধার করতে প্রবৃত্ত হ'লুম। লেখা ছিল :

This tablet is erected in memory of the following rulers of India, whose names are associated with the fort at Chunar :—

Vikramaditya of Ujjain ... 56 B.C.
Prithwiraj Rai Pithora (1141-1191 A D.)
Shahab-ud-din Muhammad Ghori 1194 A.D.
Swami Raja ... 1333 A.D.
Mahmud Shah of Jaunpore ... 1445 A.D.
Sikandar II (Lodi) ... 1512 A.D.
Babar ... ... 1529 A.D.
Sher Shah Sur ... ... 1530 A.D.
Humayun ... ... 1536 A.D.
Sher Shah Sur ... 1538 A.D.
Islam Shah ... ... 1545-52 A.D.
Akbar ... ... 1575 A.D.
Mirza Muqim (Surnamed Mansur Ali Khan, Safdar Jung)
Nawab of Oudh ... 1750 A.D



চুনার স্যানিটোরিয়াম্—গঙ্গাবক্ষ হইতে

The British ... ... 1765 A.D.
Shuja-ud Daulah,
Nawab of Oudh ... 1765 A.D.
The British ... ... 1772 A D.
Warren Hastings ... 1781 A.D.

Erected on the 28th April 1924

BY

W. B. Cotton, Esq. I. C. S.

Collector & Magistrate,

Mirzapur.

লেখা হ'য়ে' গেলে আমরা দারোয়ানকে ফটক খুলতে বল্লুম। খুলতেই আমরা ভিতরে যেতে চাইলুম, কিন্তু সে বাধা দিয়ে বল্লে, "কেয়া সাহেব, পাসতো নিকালিয়ে। বগোর পাস অন্দর জানা মনা হ্যায়।" মহা মুস্কিল! অতগুলো গরু পর্য্যন্ত ঢুকে গেল, কিন্তু আমাদের বেলাই আপত্তি। জিজ্ঞেস করলুম পাস পাওয়া যাবে কোথায়। বল্লে, "তহসিল সে মিলে গা।" ক্ষুব্ধচিত্তে তহশিলের খোঁজে বেরিয়ে আসতে হ'ল। তহসিলের খোঁজ করতে করতে কিছুদূর গিয়ে একটা এক্কাওয়ালার দেখা পেলুম। তা'র কাছে জানলুম তহসিল সেখান থেকে দেড় মাইল দূরে। সে আমাদের নিয়ে যেতে চাইলে এবং সহর ঘুরিয়ে কেল্লায় পৌঁছে দেবে বল্লে।

এক্কা গঙ্গার ধার দিয়ে ছুটল। সেখান থেকে পাহাড়টা এবং গঙ্গার দৃশ্য এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে কী বলব।



চুনার—গঙ্গাবক্ষ (দুর্গ হইতে)

এপারে চুনার পাহাড় যুগের পর যুগ ধরে' দুর্গমুকুট শিরে দৃপ্ত আননে দাঁড়িয়ে আছে। ওপারে বনানীর হরিৎ-শোভা দিগন্তের বিন্ধ্যাচলশ্রেণীর সঙ্গে ধূমায়িত হ'য়ে আকাশের নীলিমায় ধীরে ধীরে মিশিয়ে গেছে। মধ্যে রবিকরঝলকিতা পুলকিতা পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বঙ্কিমগতিতে বারাণসীতটাভিমুখে ছুটে চলেছেন। মনে হ'চ্ছিল কবি

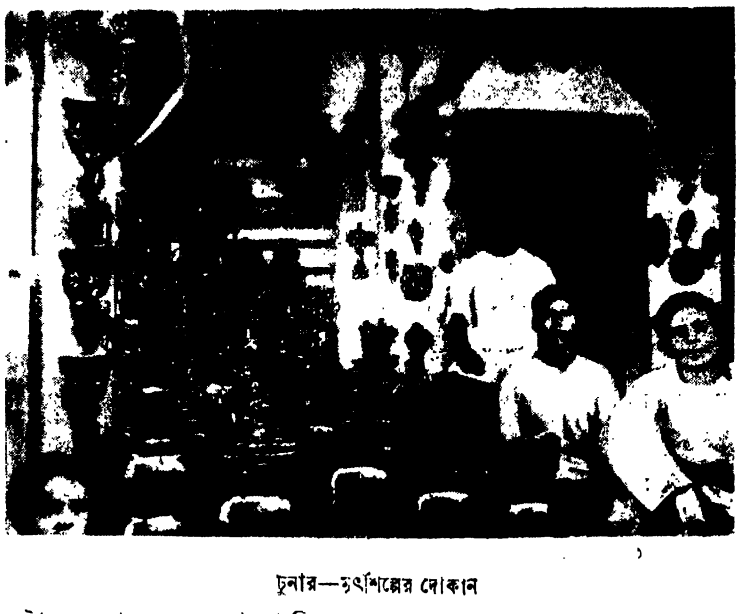
'এই লভিনু সঙ্গ তব
সুন্দর হে সুন্দর'

রামগড়ে না লিখে এখানেও স্বচ্ছন্দে লিখতে পারতেন। আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম সে রাস্তাটা বেশ ভাল। দু'পাশে উন্নত বিটপিরাজি সারি সারি চলেছে। প্রত্যেক গাছের গায় নম্বর দেওয়া। চুনার লাইব্রেরী, হ্যাড্‌লে সাহেবের বাড়ী ইত্যাদি হ'য়ে এক্কা তহসিলের কম্পাউণ্ডে ঢুকল। দেখলুম কাছারির মাথার ওপরে লেখা রয়েছে—Tehsil 1893। এখানে খোঁজ নিতে জানা গেল দশটার আগে তহসিল খুলবে না। তা'হলে উপায়? তখন মোটে সাড়ে আটটা। এক্কাওয়ালা একজন কা'কে জিজ্ঞেস করে' আমাদের উপদেশ দিলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে 'ভেট' করতে। ডাক্তারবাবু অর্থাৎ যিনি অনতিদূরে সেই কম্পাউণ্ড মধ্যস্থ একটা ব্যারাকে স্বকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের তখন বেজায় রাগ ধরছিল। ডাক্তারবাবু যদি আমাদের পাস পাবার কোন উপায় বলে' দিতে পারেন সেই আশায় ব্যারাকের উদ্দেশে অগ্রসর হলুম। গিয়ে দেখি ব্যারাকের অর্দ্ধাংশ সেখানকার হাসপাতাল। ডাক্তারবাবু রোগীপরিবৃত হয়ে' বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন বলে' নিকটবর্ত্তী দু'জন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম ফোর্টে যাবার পাস সে সময় কা'র কাছে পাওয়া সম্ভব। একজন বল্লেন, তহসিলদার ছুটিতে গেছেন, তাঁর নায়েব আজকাল পাস দেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলে' ব্যারাকের অপরার্দ্ধের একটা অংশ দেখিয়ে দিলেন। নায়েব মশায়ের বাসার বারান্দায় গিয়ে উঠলুম। একটা বেঞ্চি, একটা রকিং চেয়ার, একটা পিকদানি এবং দোয়াত কলম ও কতকগুলি উর্দ্দু ভাষায় ছাপা 'ফরম' সম্বলিত একটা ক্ষুদ্র টেবিল ক্ষুদ্র বারান্দাটার কান্তিবৃদ্ধি করছিল। ফরমগুলিই পাস বলে' অনুমান করলুম। অনুমান সত্যি হয়েছিল। আমরা বসেই

রইলুম; একটা চাকরও ছিল না যে ভিতরে খবর দেয়। মাঝে মাঝে অন্দর থেকে মেয়েদের কথাবার্ত্তা এবং শিশুর রোদনধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। আধ ঘণ্টা ধরে' বসে' বসে' বিরক্ত হয়ে' কি করব ভাবছি এমন সময় একটা চাপরাশী এসে সেলাম করলে। মনে হ'ল তহসিলদারের চাপরাশী। তা'কে ভিতরে খবর দিতে বলাতে বল্লে, "থোড়াসা আউর বইঠিয়ে, অভী তুরৎ আওয়েঙ্গে।" আধ ঘণ্টা ছেড়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হ'ল, তবুও মিঞাসাহেবের দর্শন নেই। লোকটাকে যতই খবর পাঠাতে বলি, ততই খালি বলে, "অব্ আ চলে, নৎ ঘব্ড়াইয়ে। ইতিমধ্যে একটা তহশিলের কর্ম্মচারী আমাদের প্রতি করুণাপরবশ হ'য়ে একটা ফর্ম্ ভরে' রেখে গেলেন, শুধু নায়েবনশায়ের দস্তখতটুকু বাকী রইল। প্রায় সাড়ে নটার সময় হুজুর হাফপ্যাণ্ট পরে' পান চিবোতে চিবোতে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন। কার্ড দেখে 'You are coming from Patna' বলে' আপ্যায়িত করলেন। আমাদের মেজাজ তখন আলাপ করার মত নয়। শুধু সই করার অপেক্ষা করছিলুম। সই হ'তেই ছোট্ট একটা 'yes' বলে' ছোট্ট একটা সেলাম ক'রে চ'লে এলুম। বেশ খানিকটা নাকাল হওয়া গেল যা হোক্। দিল্লী আগ্রার কোর্টে যেতেও এরকম হাঙ্গাম নেই।

এক্কা Trinity Church পার হয়ে এ গলি সে গলি দিয়ে চল্ল। সব বাড়ীতেই পাথরের কাজ। চুনারে পাথরের কারখানা আছে। গালা দেওয়া মাটীর খেলনা, ফুলদানি ইত্যাদি এখানকার একটী প্রসিদ্ধ শিল্প। এক্কাওয়ালা আমাদের কথামত একটা খেলনার দোকানের সামনে থামলে। জিনিষ কিন্‌তে কিন্‌তে আমার দোকানটার একটা ফটো তুলতে ইচ্ছে হ'ল। যেই ক্যামেরা রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি অমনি চারধারের লোক এসে ভিড় করে' দাঁড়াল। পথে লোক চলাচল দুষ্কর হয়ে' উঠ্‌ল। একজন তুলো বিক্রী করতে যাচ্ছিল; সে তুলোর বোঝা নিয়ে ক্যামেরার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে গেল। লোকের ঠেলায় দোকানটী গেল ঢেকে। আমি বাধ্য হয়ে' তাদের সরে' যেতে বল্লুম। ক্ষুণ্ণ হয়ে' তারা সরে' গেল। তখন দোকানদার এবং আরো দু' একটী লোক সমেত ফটো তুল্লুম। দোকানদার তা'কে এক কপি 'জরুর' পাঠিয়ে দিতে বারবার অনুরোধ করলে, আমাদের কেনা জিনিসগুলো যে ঝুড়িতে করে' দিলে তা'র দাম পর্য্যন্ত নিলে না। অগত্যা তা'র ঠিকানা নিয়ে সেখান থেকে রওনা হ'লুম। চুনার আসবার সময় বন্ধু গল্প করেন যে কবি হেমচন্দ্র নাকি একবার এস্থান সম্বন্ধে দুঃখ করে' বলেছিলেন—

চুনার নগর পর্ব্বত বিস্তর
রমণীবর্জ্জিত দেশ;
রমণী বিহনে যা'র বুক ফাটে
তাহার দফাটী শেষ।



চুনার—মৃৎশিল্পের দোকান

আমরা কিন্তু সে বাক্য সত্য বলে' প্রমাণ পেলুম না। খাঁদা, টেরা, কৃশা, বিপুলা—নানান্ রূপের গ্রাম্যসুন্দরী আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'তে দেখলুম। পথে একটা হনুমান মন্দির পড়ল। তা'র গায়ে রামায়ণোক্ত স্তোত্রটী লেখা রয়েছে:—

অতুলিতবলধামং স্বর্ণশৈলাভদেহম্।
দনুজবনকৃশাণং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্॥

সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশম্।
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥

আমরা শ্লোকটা চেঁচিয়ে পড়তেই রাস্তার কতকগুলি লোক অং বং চং শুনে হেসে উঠ্‌ল।

এগারটার সময় কেল্লায় পৌছোলুম। এবারে বৃদ্ধ দ্বাররক্ষী খাতির করে' ভেতরে যেতে দিলে। ঢুক্‌তেই বাঁহাতে চুনার দুর্গ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় দেয়ালের গায় ফ্রেমে টাঙান রয়েছে দেখলুম। তার মর্ম্ম এই :--

দুর্গের আদিম ইতিহাস দুজ্ঞেয়। কিংবদন্তী অনুসারে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরিনাথ সন্ন্যাস গ্রহণের পর এই পাহাড়ে এসে নিভৃতবাস করেন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। তিনি চুনারে এসে সংসারত্যাগী ভ্রাতার জন্যে পাহাড়ের ওপর একটী আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করে' দেন। সেটাই এখন দুর্গমধ্যস্থ ভর্ত্তৃহরির মন্দির বলে' খ্যাত। জনপ্রবাদে দ্বিতীয় নাম পাওয়া যায় পৃথ্বীরাজের। শোনা যায় তিনি এ অঞ্চলে এসে বসতি করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন ঘোরী কণৌজের রাজা জয়চাঁদকে পরাজিত করে' এদুর্গে এসেছিলেন। দুর্গতোরণে একটী ভগ্ন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে স্বামীরাজা ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গটার পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। যৌনপুরের মামুদ শা' ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে চুনার অধিকার করেন ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে শেষ শর্কীনৃপতি হুসেন শা'র পরাজয়ের পর দুর্গ সিকন্দর লোদির হস্তগত হয়। বাবর সিকন্দর লোদির পুত্র ইব্রাহিম লোদিকে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথে পরাস্ত করার পর ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে চুনার দুর্গে পদার্পণ করেন। শের খাঁ (পরে শের শা' সূর) আন্দাজ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাজখাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে' দুর্গের অধিকার প্রাপ্ত হন। তাজ খাঁ লোদি বংশের রাজত্ব-কালে চুনারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং ইব্রাহিম লোদির মৃত্যুর পরও এস্থান তাঁর শাসনে ছিল। হুমায়ুন ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গ অবরোধ করেন এবং ছয় মাস চেষ্টার পর দুর্গ জয় করতে সমর্থ হন, কিন্তু দু'বছর পরেই শের শা' দুর্গের পুনরধিকার করেন। ইস্‌লাম শা' (১৫৪৫-৫২) স্বীয় ভ্রাতা আদিল খাঁকে আগ্রায় পরাজিত করে' চুনারের দিকে অগ্রসর হন এবং দুর্গ জয় করে' পিতা শের শা' কর্ত্তৃক এখানে রক্ষিত ধনদৌলত গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম শা' সূর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'বার পর মহম্মদ শা' আদিল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে চুনারে এসে মৃত্যু পর্য্যন্ত এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন। মহম্মদ শা' আদিলের মৃত্যুর পর দুর্গ তাঁর ক্রীতদাস ফত্তুর অধিকারে আসে। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আসিফ খাঁ ও শেখ মহম্মদ ঘাউসের দ্বারা দুর্গ অধিকৃত হয়। মোগলসাম্রাজ্যের পতন হলে' দুর্গটী ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গের অধীনে আসে। ইংরাজের ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম এ দুর্গের অধিকার লাভ করেন এবং এলাহাবাদ দুর্গের পরিবর্ত্তে এটাকে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে দান করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দুর্গ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোম্পানী এখানে কামান ও রসদাদি রাখবার বন্দোবস্ত করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এই দুর্গে এসে সৈন্যসংগ্রহ করে' কাশীরাজ চৈৎসিংহকে নিকটবর্ত্তী দুর্গগুলি থেকে বিতাড়িত করতে কৃতকার্য্য হন।

দুর্গে প্রবেশ করে' সব চেয়ে প্রথমে মুসলমানী আমলের একটী প্রকাণ্ড কুঁয়ো দেখলুম। সেখান থেকে আর একটু দূরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভর্ত্তৃহরির মন্দির দেখতে গেলুম। আসলে অবশ্য সেটী মন্দির নয়,—ভর্ত্তৃহরি সন্ন্যাস অবস্থায় সেখানে থাকতেন। হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন কারু-কার্য্যে কমলের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। পাশেই রিফর্ম্মেটরী স্কুলের অংশবিশেষ। (এস্থলে বলে' রাখা উচিত দুর্গের ভেতরের অধিকাংশ জায়গায়ই একন রিফর্ম্মেটরী স্কুলের দ্বারা অধিকৃত।) আমরা তার ছাদে উঠলুম। সেটী দুর্গের উচ্চতম প্রদেশ না হলেও প্রায় তাই। সেখানে উঠে চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চলের বিশেষতঃ গঙ্গার বক্রগমনভঙ্গির চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল। একটা ফটো নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। এত ভাল লাগছিল যে রোদ্দুরের ঝাঁজ তখন যেন আমাদের গায়েই ঠেক্‌ছিল না। তারপর দুর্গের প্রাকার বেয়ে রিফর্ম্মেটরী স্কুলের অন্যান্য বিভাগ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এগিয়ে চল্লুম। ততক্ষণে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে আমাদের গরম কোট ভিজে উঠেছে।

কিন্তু আমাদের উৎসাহও প্রচণ্ড; দুর্গপ্রদক্ষিণ করা কিছুতেই ছাড়লুম না। রিফর্মেটরী স্কুলের অনেকগুলি ছোট ছোট বাড়ী; সবগুলিতেই লোহার গরাদে দেওয়া। স্কুলের অনেক ছাত্র অর্থাৎ বালক আসামী নজরে পড়ল। তাদের বক্রদৃষ্টি মোটেই সুবিধেজনক ঠেক্‌ল না। একটী ছেলে পয়সা চাইতে চাইতে আমাদের পিছু পিছু খানিকদূর এল; তারপর কাউকে দেখে হঠাৎ দৌড়ে পালিয়ে গেল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ যে বাড়ীতে ছিলেন সেটাও দেখ্‌লুম রিফর্মেটরীতে পরিণত হয়েছে। পাঁচিল ধ'রে ঘুরতে ঘুরতে infectious ward পার হয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে নামছি, এমন সময় মেয়েলী গলায় আওয়াজ এল, "ই'য়ে প্রাইভেট কোয়ার্টার হ্যায়, রাস্তা নেহী হ্যায়।" বাধা পেয়ে উল্টো রাস্তা ধরলুম। খানিক দূরেই আর একটী সিঁড়ি পাওয়া গেল। তাই দিয়ে নীচে নেমে ফটকের দিকে ফিরলুম। সেখানে গিয়ে চুনার দুর্গের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তটুকু দু'জনে মিলে লিখে নিলুম। তার পর বেরিয়ে এলুম Visitors' Bookএ সই করে।

সেনিটেরিয়ামে ফিরতে প্রায় বারোটা আন্দাজ হ'ল। ততক্ষণে সেখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই খেয়ে উঠেছেন। বারান্দার সেই চৌকিটাতে একটা তাসের আড্ডা বসে' গিয়েছিল। আমাদের ক্যামেরা নিয়ে ফিরতে দেখে এক রসিক ভদ্রলোক বুড়ো কর্ত্তাটীকে দেখিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লেন, "আপনারা যাবার আগে এঁর একটী ফটো তুলে নিয়ে যেতে ভুলবেন না। ইনি হলেন সেনিটেরিয়ামের পরের অবস্থা।" আমরা তখন যেমন ক্লান্ত, তেমনি ক্ষুধার্ত্ত। তাঁর কথায় একটু মুচকি হেসে কর্ত্তাকে চান করার কি হতে পারে জিজ্ঞেস করলুম। তিনি একটু ভারিক্কী চালে বল্লেন, "কাছে এমন গঙ্গা থাকতে চানের ভাবনা? শুধু দু' পা যাবেন আর আসবেন।" আমরা সেই কথাই সমীচীন ভেবে গঙ্গা স্নান করে' এলুম। খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে একটার কাছাকাছি হ'ল. খাওয়া মন্দ হ'ল না। ওখানে থাকা এবং খাওয়ার তিনটী শ্রেণী আছে; প্রথম, দ্বিতীয় ও সাধারণ; আমাদের নাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর রান্না দেওয়া হয়েছিল। ভাত, ডাল থেকে আরম্ভ করে' অম্বল, দৈ পর্য্যন্ত ছিল। থাকার বন্দোবস্ত কেমন জানি না, খাওয়াটা মোটের ওপর ভালই দেখলুম। খেয়ে-দেয়েই আমরা ক্যামেরা হাতে গঙ্গার ধারে চল্লুম। উদ্দেশ্য—নৌকোয় নদী পার হয়ে' ওপার থেকে চুনার দুর্গের ফটো নেওয়া। গিয়ে দেখলুম তা' অসম্ভব। কাছাকাছি নৌকা ভাড়া পাওয়া যায় না। যে বজরা ক'টী ঘাটে লাগান ছিল সেগুলি ভাড়া হয় না। একে ত নৌকা পেতে হলে' কম করে' পনের মিনিটের রাস্তা হাঁট্‌তে হবে', তার ওপর ওপার যেতে আস্‌তে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগা সম্ভব। আমাদের হাতে তখন আর সময় নেই। সুতরাং সে আশা পরিত্যাগ করতে হ'ল। এহেন সময় ম্যানেজারবাবু এসে বল্লেন, গঙ্গাবক্ষ থেকে সেনিটেরিয়ামের একটী ফটো তুলে দিতে হ'বে। বিপুল আগ্রহে তিনি কাছাকাছি একটী ডিঙ্গী আবিষ্কার ক'রে একটি ছোকরাকে দিয়ে বাইয়ে নিয়ে এলেন। অল্পদূর সেটা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফটো তোলার চেষ্টা করলুম। সে কি সহজে হয়? focus করে' যতক্ষণে release টিপ্‌ব, ততক্ষণে বাড়ীটী আর পাওয়া যায় না,—নৌকো হয় সরে যায় নয় ঘুরে যায়। অনেক কেরামতির পর যখন ফটো নিতে পারব বলে' ভরসা হ'ল তখন তিনি বল্লেন, গঙ্গাও যেন স্পষ্ট বোঝা যায়। সব পণ্ডশ্রম! আবার focussing ইত্যাদি করতে হ'ল। বেলা দেড়টা বাজে; রোদ্দুরে মাথা পুড়ছে। কোনমতে সব ঠিকঠাক করে' একটা snap নিয়ে ফিরে গেলুম। তারপর যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে' পাওনার কথা জিজ্ঞেস করলুম। ম্যানেজারবাবু বেশ ভদ্র; থাকবার চার্জ কিছু নিলেন না, খাওয়ার খরচ দু'জনের জন্যে একটাকা দিতে বল্লেন। এতক্ষণ নৌকোয় বসে' যে কাণ্ডটা হ'ল, তার জন্যে ছোকরাকে তিনি নিজেই পয়সা দিলেন, আমাদের কিছুতেই দিতে দিলেন না। তাঁকে একটা চুনার দুর্গের ফটো জোগাড় করে' পাঠিয়ে দিতে বল্লুম; ঠিকানার জন্যে আমার কার্ডটা দিলুম। তিনিও ঠিকানাযুক্ত একটী সেনিটেরিয়ামের নিয়মাবলীর পুস্তিকা উপহার দিয়ে তাঁকে এককপি গঙ্গা থেকে তোলা ফটো পাঠাতে অনুরোধ করলেন। নমস্কার করে' বিদায় নিলুম। সকালের এক্কাওয়ালাটা অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছিল।

দু'টোর কিছু আগে ষ্টেশনে পৌছোনো গেল। সেখানে কয়েক ছত্র চিঠি লিখে ছেড়ে দিলুম। ট্রেণ এল দু'টো এগারোয়।

এবার তৃতীয় শ্রেণীতে চাপা গেল। কুলীভাড়া দিতে গিয়ে মুস্কিলে পড়লুম। ট্রেণ ছাড়ছে, অথচ এক পয়সাও খুচরো নেই। কুলীর কাছেও টাকার ভাঙানি ছিল না। সেই কামরার একটী বাঙালী ভদ্রলোক ব্যাপার দেখে দু'আনা পয়সা বার করে' দিতে বাঁচলুম। মোগলসরাইয়ে টাকা ভাঙিয়ে তাঁকে শোধ দেওয়া গেল। সেখানে দুটী মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল ; তারা কলেজের Geographical Societyর tripএ হরিদ্বার, আগ্রা ইত্যাদি ঘুরে বাড়ী ফিরছে। আরা ষ্টেশনে English Mail এর জন্যে আধঘণ্টা দেরী হ'ল। সেখানে থেকে একদল মজুরশ্রেণীর লোক উঠ্‌ল। একজন বেঞ্চির তলায় ঢুকে গা-ঢাকা দিলে। আর একটী গাঁজায় দম দিতে দিতে গান্ধীজীর নিন্দে করতে আরম্ভ করলে। বল্লে, লোকে মামলা মোকদ্দমায় কত শত টাকা খরচ করে, অথচ গান্ধীজীর আক্রোশ যত তা'র মত দু'চার পয়সার নেশা করনেওয়ালার ওপর। একজন লোক আমার পাশে বসে' কথকতা ক'রছিল, সে তা'র ভুল ভাঙাতে চেষ্টা করলে। কিন্তু তাতে তা'র মেজাজ আরো তিরিক্ষি হয়ে' দাঁড়াল। পরের ষ্টেশনে একটী ক্রূরদৃষ্টি 'ক্রু' টিকিট চেক্ করতে উঠলেন। দেখা গেল সেই গঞ্জিকা-সেবীরই টিকিট নেই। 'ক্রু' ক্রমশঃ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করলেন। একটী বুড়ো, যে তা'র সাথেই উঠেছিল, তার হয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলে, পান খাবার পয়সা দিতে চাইলে, শেষ পর্য্যন্ত তিনটাকার জায়গায় একটাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজী হ'ল। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ 'ক্রু' তাতে ভুল্‌লেন না। দানাপুরে গঞ্জিকা-সেবীকে আরো গঞ্জনা দিতে দিতে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। যে লোকটী বুদ্ধি খরচ করে' গা-ঢাকা দিয়েছিল, সে অবশ্যি দিব্যি বেমালুম পার পেলে।

আটটা বাজতে দশ মিনিটে পাটনা জংশন এসে গেল। সেই সুপরিচিত পাটনা। আবার

'সেই মামা, সেই মামী, সেই পুকুর পার ঘর।'

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ



বাংলা ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রা

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ

ছন্দ রচনা একটি ধ্বনিশিল্প। কি কি উপায়ে ধ্বনিকে কাজে লাগানো যায় তার উপরই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। আর ধ্বনির মূল্য-নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি থেকেই ছন্দের বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি হয়। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রেও তাই দেখা যায় প্রথমেই ধ্বনির মূল্য বা পরিণাম নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আমাদের প্রাচীন ছন্দ-শাস্ত্রকাররা ধ্বনির পরিমাণ-নির্ণয় উপলক্ষ্যে শুধু স্বর-ধ্বনিরই পরিমাপ করেছেন, ব্যঞ্জন ধ্বনিকে গণ্য করেন নি। যেমন, নদী শব্দের ঈ-কেই তাঁরা গুরু বা দ্বিমাত্রিক ব'লে গণ্য করেছেন; দ্-কে তাঁরা গ্রাহ্য করেন নি। তাতে ধ্বনি-নির্ণয়ের কোনো ব্যাঘাত হয় না। কেননা দ্ আর ঈ যুগপৎ উচ্চারিত হচ্ছে; সুতরাং ঈ উচ্চারণের যা মূল্য দী উচ্চারণেরও সেই মূল্য। আরেকটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। যেমন দিব্য এবং দীপ। সংস্কৃত শাস্ত্রমতে দিব্য শব্দের ইকার গুরু বা দ্বিমাত্রিক, কেননা ইকারের পরে ব্য এই যুক্তবর্ণটি রয়েছে। আর দীপ শব্দের ঈ তো গুরু বা দ্বিমাত্রিক বটেই, কেননা এটি স্বভাবদীর্ঘ। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রমতে দিব্য শব্দের ই এবং দীপ শব্দের ঈ ধ্বনি পরিমাণের মর্য্যাদায় সমান। কিন্তু এখানে স্বভাবত'ই একটি প্রশ্ন মনে আসে আমরা দিব্য শব্দের ই-কে দীর্ঘ ক'রে অর্থ দীপ শব্দের দীর্ঘ ঈ-র সমান ক'রে উচ্চারণ করি কি না; শিক্ষা এবং দীক্ষা শব্দের ই এবং ঈ উচ্চারণে সমান কি না। যদি দিব্য এবং দীপ শব্দের ই এবং ঈ উচ্চারণে সমান না হয় তবে প্রাচীন ছন্দ-শাস্ত্রকাররা ধ্বনির পরিমাপে এদের সমান মর্য্যাদা দিলেন কিরূপে? এ প্রশ্নের একটি উত্তর এই হ'তে পারে, দিব্য শব্দের ই উচ্চারণের আকারে হ্রস্বই বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী যুক্তবর্ণ ব্য-এর অন্তর্গত হসন্তর ব্যঞ্জনটির ভার পড়াতে ইকারের গুরুত্ব অর্থাৎ ওজন-বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এই উত্তরটিও সন্তোষ-জনক মনে হয় না। কেননা দিব্য শব্দের ইকার উচ্চারণের আকারে হ্রস্বই আছে অথচ আরেকটি ব্যঞ্জনের ভার বহন করতে হচ্ছে ব'লে এর গুরুত্ব বা ওজন-বৃদ্ধি হ'ল কিরূপে, তা স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না। আমি মনে করি দীপ শব্দের ঈ এবং দিব্য শব্দের ই-র মধ্যে তুলনা ঘটানোই ঠিক্ নয়। আমার মনে হয় দীপ শব্দের ঈ এবং দিব্য শব্দের ইব্, এ দুটি ধ্বনির পরিমাণ বা গুরুত্ব সমান অর্থাৎ ঈ এবং ইব্ এ দুটি ধ্বনির উচ্চারণকাল সমান একথা বললেই ঠিক্ হয়। কেননা দুটি এক জাতীয় হ্রস্ব ধ্বনির (হ্রস্ব ই) যোগেই ঈ-র উৎপত্তি, আর ইব্ও হচ্ছে দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনির সমবায়। সুতরাং এদের উচ্চারণ কাল সমান একথা বলা যেতে পারে।

কিন্তু এ স্থলেই বলা সঙ্গত, এই যে উচ্চারণকালের কথা বলা হ'ল সে কাল হচ্ছে একটা conventional বা রূঢ় কাল। কারণ ঈ এবং ইব্ উচ্চারণ করতে বস্তুতই সমান কাল লাগে কি না, এ দুটি ধ্বনির উচ্চারণের আয়তন সকলের মুখেই সমান হবে কি না, এ সব প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে। কিন্তু কাল কথাটিকে conventional বা রূঢ় অর্থে ব্যবহার করলে ওসব প্রশ্ন আর উঠ্‌তেই পারবে না। কেননা কাল কথাটির রূঢ়ার্থ-ই হচ্ছে এই যে, ঈ এবং ইব্-কে যে যে-ভাবেই উচ্চারণ করুক না কেন, ছন্দে ওদুটি ধ্বনির উচ্চারণকাল সমান ব'লেই গ্রাহ্য হ'য়ে থাকে। আর সে কারণেই ছন্দের বিচারে দীপ এবং দীপ্ত শব্দের ঈ এবং ঈপ্-কেও সমমাত্রিক অর্থাৎ সমকালব্যাপী ব'লেই গ্রহণ করা হয়; ঈ এবং ঈপ্-এর উচ্চারণ কালের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করা হয় না।

যাহোক্, আমরা দেখলুম যে সংস্কৃত শাস্ত্রের পদ্ধতিতে নদী শব্দের অ-কে এক মাত্রা এবং ঈ-কে দু'মাত্রা ব'লেই ধরা

হয়। কিন্তু ন-কে একমাত্রা এবং দী-কে দু'মাত্রা ধরলেও ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের আলোচনায় এই দ্বিতীয় প্রণালীই অবলম্বন করব। আর দিব্য শব্দের ই এবং দীপ ও দীপ্ত এই উভয় শব্দের ঈ, এই তিনটি ধ্বনি সংস্কৃত প্রথায় সমমাত্রিক বা সমকালব্যাপী। আমাদের অবলম্বিত প্রণালীতে আমরা বল্‌ব ওই তিনটি শব্দের দিব্, দী এবং দীপ্ এই তিনটি ধ্বনি সমকালব্যাপী বা সমমাত্রিক।

এখন দেখা যাক্ বাংলা ছন্দের ধ্বনি-বিচারে এই প্রণালী কতখানি প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ অর্থাৎ স্বর-ধ্বনি কি কি বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত থাকে সেটাই আগে আলোচনা করা প্রয়োজন। একথা সকলেই জানে যে বাংলায় কায্যত' দীর্ঘস্বর নেই এবং কোনো বাংলা ছন্দই স্বাভাবিক ভাবে স্বরবর্ণের দীর্ঘতাকে স্বীকার করে না; অবশ্য কোনো কোনো অবস্থাবিশেষে বাংলা ছন্দেও স্বরবর্ণ কদাচিৎ দীর্ঘতা লাভ করে; কিন্তু সেটা সাধারণ নিয়ম নয়, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। বাংলায় স্বরবর্ণের স্বাভাবিক দীর্ঘতা না থাকলেও, গুরুতা আছে প্রচুর পরিমাণেই। স্বরবর্ণের দীর্ঘতা ও গুরুতার মধ্যে পার্থক্য কি, তা বোঝা প্রয়োজন। আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘস্বরের স্বরূপ কি, তা সকলেই জানে এবং এসব বর্ণের উচ্চারণ-দীর্ঘতাই সংস্কৃত ছন্দের মাধুর্য্যের একটি মূল কারণ। কিন্তু এই স্বভাব-দীর্ঘ স্বরবর্ণগুলি বাংলায় তাদের প্রকৃতিগত ধ্বনিস্বরূপটিকে বিসর্জন দিয়ে হ্রস্বত্বলাভ করেছে; এই জন্যই বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য্য অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। সংস্কৃত ছন্দে স্বরের দীর্ঘতা যেমন আছে, গুরুতাও তেম্‌নি আছে। দীর্ঘস্বর তো গুরু বলে গণ্য হয়ই; তা ছাড়া পরে যদি অনুস্বার, বিসর্গ এবং সংযুক্ত বর্ণ থাকে তবে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বরটিও গুরুত্ব লাভ করে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

। × × × × । ।
"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ"

এখানে ঢেরা (×) চিহ্নিত স্বরগুলি স্বভাবত'ই দীর্ঘ, তাই গুরুও বটে। কিন্তু দণ্ড (।) চিহ্নিত তিনটি স্বর স্বভাবত' হ্রস্ব হ'লেও এস্থলে যুক্তবর্ণের পূর্ব্বে অবস্থিত আছে ব'লে গুরুত্ব অর্জন করেছে। তেমনি 'প্রমত্তঃ' শব্দের অন্ত্য অকারটিকে পরবর্ত্তী বিসর্গের ভার বহন করতে হচ্ছে ব'লে ওটিও গুরুত্ব লাভ করেছে। 'কান্তা' শব্দের দ্বিতীয় আকারটি স্বভাব-দীর্ঘ, অতএব গুরু; কিন্তু প্রথম আকারটি স্বাভাবত দীর্ঘ তো বটেই, সংযুক্তপূর্ব্বও বটে—অতএব এটি উভয় কারণেই গুরু। তাই ছন্দ'-শাস্ত্রকার নিয়ম করেছেন—

"সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ
বর্ণঃ সংযোগপূর্ব্বশ্চ।"
—গঙ্গাদাস কৃত ছন্দোমঞ্জরী, ১১।১

বাংলায় স্বরবর্ণের গুরুত্বের যথার্থ প্রকৃতি বুঝ্‌তে হ'লে উদ্ধৃত সংস্কৃত বিধানটির আরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েই বোঝাবার চেষ্টা করছি। পূর্ব্বোক্ত "কশ্চিৎ" শব্দের অকারটি "বর্ণঃ সংযোগপূর্ব্বঃ" ব'লে গুরু হয়েছে; কিন্তু উদ্ধৃত বিধানমতে 'চিৎ'-এর ইকারটিকে লঘু ধরব, না গুরু ধরব? শাস্ত্রকার বল্‌বেন পরবর্ত্তী 'কান্তা' শব্দের ক-কারের সঙ্গে খণ্ড ৎ-কে সংযুক্ত ব'লে গণ্য ক'রে ইকারকে গুরু ব'লে ধরতে হবে; সংস্কৃত ভাষায় অসংযুক্ত হসন্ত বর্ণ প্রায় স্বীকৃত হয় না, বিশেষত' বাক্যের মধ্যস্থলে। এটা নাহয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু

×
"দিঙ্‌নাগানাং | পথিপরিহরন্ | স্থূলহস্তাবলেপান্।"
×
"রঘুণামন্বয়ং বক্ষ্যে | তনু বাগ্‌বিভবোহপি সন্।"

এ দু'জায়গায় পরিহরন্-এর অন্ত্য অকার এবং সন্-এর অকারকে লঘু বল্‌ব না গুরু বল্‌ব? উভয় শব্দের পরেই যতি রয়েছে, সুতরাং ন্-কে পরবর্ত্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত করার উপায় নেই। অথচ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উভয় জায়গায়ই ছন্দের নিয়ম অনুসারে অকারকে গুরু ব'লে ধরা হয়েছে। সংস্কৃত কাব্য থেকে এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখা গেল হসন্ত বর্ণ পরে থাকলেও পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্ব স্বর গুরু ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে। ছন্দ-শাস্ত্রকার পিঙ্গলাচার্য্য কিন্তু সংযোগান্ত, সানুস্বার, উষ্মান্ত (অর্থাৎ বিসর্গান্ত) বর্ণের ন্যায় ব্যঞ্জনান্ত বর্ণকেও গুরু সংজ্ঞা দিয়েছেন (ছন্দঃ সূত্রম্, ১।৭)।

কিন্তু আসল কথা এই যে ব্যঞ্জনান্ত স্বরবর্ণকে যদি গুরু ব'লে স্বীকার করা যায় তবে সংযোগ, অনুস্বার ও বিসর্গের যোগে গুরুত্ব বিধানের কোনো প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না, কারণ ওই তিনটি ব্যাপারের মূলেও ওই হসন্ত ব্যঞ্জনের কথাই রয়েছে। যথা—'কশ্চিৎ' এই শব্দের অকারকে যুক্তান্ত আর ইকারকে ব্যঞ্জনান্ত বলার কোনো সার্থকতা নেই। কারণ ওই কথাটি আসলে কশ্‌চিৎ; সুতরাং অকার ও ইকার উভয়ই ব্যঞ্জনান্ত ব'লেই গুরু, এই গুরুত্ব বিধানের জন্য কোনো দুটি ব্যঞ্জনের সংযুক্ত হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ভারতীয় লিপিপদ্ধতিতে সংযুক্তবর্ণের আবির্ভাব একটা আকস্মিক ব্যাপার, আবশ্যিক নয়। ধ্বনির রাজ্যে যুক্তাক্ষর ব'লে কোনো একটা বিশেষ ব্যাপার নেই; আছে শুধু ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনির অস্তিত্ব। ছন্দ-শাস্ত্র ধ্বনি-বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ প্রকাশ; সুতরাং ছন্দের আলোচনা শুধু ধ্বনির দিক্ থেকেই হওয়া উচিত, ধ্বনি-প্রতীক অর্থাৎ বর্ণলিপির চাক্ষুষ রূপের দ্বারা ওই আলোচনাকে বিকল করা সঙ্গত নয়। ধ্বনি-বিজ্ঞান বা ছন্দ'-শাস্ত্রের আলোচনায় সংযুক্তাক্ষর প্রভৃতি সংজ্ঞা অবৈজ্ঞানিক সুতরাং বর্জ্জনীয়। আমরা চিরার্জ্জিত চোখের অভ্যাসবশতই ভ্রম ক'রে ছন্দের আলোচনায় যুক্তবর্ণ প্রভৃতি সংজ্ঞা ব্যবহার ক'রে থাকি। তবেই দেখ্‌তে পাচ্ছি স্বরবর্ণের গুরুত্ব বিষয়ে যুক্তবর্ণের কোনো প্রভাব নেই, আছে যুক্তবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হসন্তবর্ণের প্রভাব। কশ্চিৎ শব্দে অকারের গুরুত্ব হয়েছে শ্চ-এর কৃপায় নয়, শ্‌-এর কৃপায়; তেমনি খণ্ড-তেই ইকারকে গুরুত্ব দান করেছে।

ঠিক এই একই কারণে অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বরকেও গুরু ব'লে গণ্য করা হয়। কারণটি হচ্ছে এই যে অনুস্বার ও বিসর্গ উভয়ই আসলে একেকটি হসন্ত বর্ণের রূপান্তর মাত্র। বিসর্গ তো প্রকৃতপক্ষে হসন্ত হ্‌-এর থেকে অভিন্ন। কাজেই প্রমত্তঃ আর প্রমত্তহ্‌ একই কথা ধ্বনির দিক্ থেকে; সুতরাং এখানেও অন্ত্য অকার ব্যঞ্জনান্ত ব'লেই গুরু। অনুস্বারকেও একটি হসন্ত বর্ণের সমান ব'লেই ধরা উচিত এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলে অনুস্বারকে হসন্ত বর্ণে রূপান্তরিতও করা যায়; যথা পংক্তি ও পঙ্‌ক্তি, সংখ্যা ও সঙ্‌খ্যা একই কথা; বঙ্‌শ, অঙ্‌শু লেখার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়; আর বাংলা ও বাঙ্‌লা তো আমাদের অতি পরিচিত। বিসর্গের রূপান্তরের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। দুষ্‌খই বলা যাক্, আর দুখ্‌খই বলা যাক্, বিসর্গও হসন্ত ব্যঞ্জনের তুল্যমূল্য তাতে সন্দেহ থাকে না; আর সন্ধির সূত্র অনুসারে বিসর্গ যে অবস্থাবিশেষে শ্‌, ষ্‌, বা স্‌ তে পরিণত হ'তে পারে তা পাঠশালার বালকরাও জানে।

সুতরাং ছন্দে স্বরবর্ণের গুরুত্ববিষয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রকারদের বিধানের নিষ্কর্ষ হচ্ছে এই। দীর্ঘস্বর তো গুরু ব'লে গণ্য হবেই, হ্রস্ব স্বরের পরে যদি হসন্ত বর্ণ থাকে তবে সেই হ্রস্ব-স্বরও গুরুত্ব প্রাপ্ত হবে এবং এক্ষেত্রে বিসর্গ আর অনুস্বারকেও হসন্ত বর্ণ ব'লেই গণ্য করতে হবে।

এখানে আরেকটি কথা বুঝে রাখা দরকার। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন কশ্চিৎ, চঞ্চল্, বন্ধন্ প্রভৃতি শব্দে আদি-স্বরের এবং অন্ত্যস্বরের গুরুত্ব কি সম্পূর্ণ সমান, তাদের গুরুত্বের মধ্যে কি কিছুমাত্র তারতম্য নেই? অর্থাৎ এই তিনটি শব্দে স্বরবর্ণের ব্যবধানের অভাবে দুটি ক'রে ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে যে সংঘাত উপস্থিত হয়েছে তার কি কোনো মূল্য নেই? এর উত্তর হচ্ছে এই যে এস্থলে স্বরব্যবধানের অভাবে যে ব্যঞ্জন ধ্বনিসংঘাত উপস্থিত হয়েছে তার যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ ওই সংঘাতের ফলে যথেষ্ট ধ্বনিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে ও তাতেই শ্রুতিমাধুর্য্য উৎপন্ন হয়েছে; কিন্তু এই ধ্বনিসংঘাতের ফলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণ-গুলির গুরুত্ব-লাভের পক্ষে কিছুমাত্র অতিরিক্ত সহয়তা হয় নি। অর্থাৎ চঞ্চল্ শব্দের আদি ও অন্ত্য অকারের গুরুত্ব সম্পূর্ণ সমান; তবে অন্তস্থিত হসন্ত লকার একক থাকাতে ও পরবর্ত্তী কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংহত হতে না পারাতে ঞ্চ-এর মত ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে নি, এই মাত্র পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গেই আরেকটি প্রশ্নের আলোচনা করা

প্রয়োজন। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র মতে লঘু স্বরকে একমাত্রিক এবং গুরু স্বরকে দ্বিমাত্রিক ব'লে ধরা হয়। যথা—

মা কুরু | ধনজন | যৌবন | গর্ব্বম্

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি ক'রে মাত্রা আছে। দ্বিতীয় ছেদে চারটিই লঘু মাত্রা, প্রথম ছেদে একটি স্বভাবগুরু ও দুটি লঘু, চতুর্থ ছেদে দুটি হ্রস্বস্বর ব্যঞ্জনান্ত ব'লে গুরুত্ব অর্থাৎ দ্বিমাত্রিকত্ব লাভ করেছে। তৃতীয় পর্ব্বের ঐকারটিকেও দ্বিমাত্রিক ব'লে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু কেন? ঐকার তো স্বভাব দীর্ঘ স্বর নয়, অর্থাৎ কোনো একটি মৌলিক স্বরকে দ্বিগুণ বা দীর্ঘ ক'রে ঐকার হয় না; কারণ ঐ হচ্ছে আসলে অউ্, অ আর উ এই দুটি বিভিন্ন জাতীয় স্বতন্ত্র স্বরের সংযোগে উৎপন্ন যুগ্মস্বর বা dipthong। দুটি স্বজাতীয় হ্রস্ব স্বরের যোগে তজ্জাতীয় একটি দীর্ঘ স্বর উৎপন্ন হয়। যথা ই+ই=ঈ, উ+উ=ঊ। কিন্তু ঐ=অ+ই, ঔ=অ+উ। দুটি বিভিন্ন জাতীয় স্বরের সংযোগে উৎপন্ন স্বরকে দীর্ঘস্বর বলা যায় না, বলা যায় **যুগ্মস্বর** বা dipthong। কিন্তু 'এ' কিংবা 'ও'-কে যুগ্মস্বর বলা যায় না। কারণ একার অ এবং ই-র যোগে উৎপন্ন দ্বিরুচ্চার-প্রকৃতি-সম্পন্ন স্বর নয়, এটি অ এবং ই-র মিশ্রণে উৎপন্ন একটি সম্পূর্ণ নোতুন স্বর; তেমনি ও-কারও অ এবং উ-র মিশ্রণে উৎপন্ন নোতুন স্বর; এ এবং ও উভয়ই স্বভাব-দীর্ঘ। কিন্তু ঐ এবং ঔ উচ্চারণ করলেই এদের অই্ এবং অউ্, এই যুগ্মত্ব বা দ্বিরুচ্চার-প্রকৃতি ধরা প'ড়ে যায়। অথচ এরা অ-ই কিংবা অ-উ, এরূপ স্বতন্ত্রোচ্চারিত দুটি বিভিন্ন স্বরের একত্র সমাবেশ মাত্রও নয়; তাই ঐ এবং ঔ কে যুগ্মস্বর বা জোড়াস্বর বলে অভিহিত করলুম। কারণ এখানে দুটী স্বতন্ত্র স্বর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংলগ্ন হ'য়ে আছে, অথচ একার এবং ওকারের মতো কেউ কারও মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায় নি।

যাহোক্, দেখ্‌তে পাচ্ছি সংস্কৃত ছন্দে ঐ এবং ঔ দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ গুরু স্বর ব'লে গণ্য হয়েছে। এর ভিতরকার তত্ত্বটা একটু লক্ষ্য করা যাক্। অউ্ এবং অই্ অর্থাৎ ঔ এবং ঐ, এই জোড়াস্বরগুলির অন্তরে যে দুটি ক'রে স্বর আছে তারা স্বতন্ত্র নয়, একটি আরেকটির উপর নির্ভর করছে। এখানে পূর্ব্বস্থিত স্বরটি সম্পূর্ণ উচ্চারিত হচ্ছে, এটি হচ্ছে আশ্রয়দাতা, আর পরস্থিত স্বরটি অর্দ্ধোচ্চারিত মাত্র হচ্ছে, এটি **আশ্রিত** স্বর। এই আশ্রিত স্বরটির উচ্চারণের সমস্তটা ঝুঁকি নিতে হচ্ছে পূর্ব্ববর্ত্তী **আশ্রেতা** স্বরটিকে এবং পরবর্ত্তী স্বরটির সমস্ত ভার বহন করতে হচ্ছে ব'লেই এটির গুরুত্ব। অই্, অউ্, এখানে ই এবং উ্ অকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ব'লেই অকারটির গুরুত্ব হয়েছে।

আমরা পূর্ব্বে দেখেছি হসন্ত ব্যঞ্জন (অনুস্বার-বিসর্গও তারই সামিল) বর্ণকে আশ্রয় দেওয়ার দরুন্ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর স্বভাবত' হ্রস্ব হ'লেও গুরুত্ব অর্জ্জন করে। আর এখন দেখ্‌লুম আশ্রিত বর্ণ স্বর হ'লেও আশ্রয়দাতার গুরুত্ববৃদ্ধি হয়। সুতরাং আমাদের সমস্ত আলোচনার সিদ্ধান্ত এই হ'ল যে, আশ্রিত বর্ণ স্বরই হোক্, অনুস্বার-বিসর্গ ই হোক্, আর হসন্ত বর্ণ ই হোক্, পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রেতা স্বরকে গুরু ব'লে গণ্য করতে হবে। এই সূত্রানুসারে অই্, অউ্, অং, অঃ, অন্, অর্, সর্ব্বত্রই অকারটি গুরুত্বশালী, পরবর্ত্তী আশ্রিত বর্ণের ভার তাকেই বহন করতে হচ্ছে ব'লে। এখানে আরেকটু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, উক্ত ছ'টি কথাই বাগ্‌যন্ত্রের একেকটি প্রয়াসেই উচ্চারিত হচ্ছে, অর্থাৎ উক্ত ছ'টি কথার প্রত্যেকটিই একেকটি সিলেব্‌ল্ বা ধ্বনি। আর প্রত্যেকটি সিলেব্‌ল-এই ধ্বনির যুগ্মতা বা দ্বিরুচ্চাবতা রয়েছে, কাজেই এগুলি প্রত্যেকেই একেকটি **যুগ্মধ্বনি** বা যুক্ত সিলেব্‌ল। সুতরাং আমাদের অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত সূত্রটির অর্থ এই দাঁড়ায়। আশ্রিতবর্ণান্ত যুগ্মধ্বনি মাত্রকেই (আশ্রিত বর্ণটি স্বর বা ব্যঞ্জন যা-ই হোক্ না কেন) গুরু বা দ্বিমাত্রিক ব'লে ধরতে হবে; অযুগ্ম ধ্বনি যদি স্বভাবত' হ্রস্ব হয় তবে একমাত্রিক এবং স্বভাবত' দীর্ঘ হ'লে দ্বিমাত্রিক। এই প্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত পংক্তিটিকে আবার বিচার করা যাক্—

মা কুরু | ধনজন- | যউ্বন- | গর্‌বম্

এখানে তিনটি ধ্বনি (যোগ-চিহ্নিত) যুগ্ম সুতরাং দ্বিমাত্রিক; বাকি ন'টি অযুগ্ম ধ্বনির মধ্যে একটি স্বভাবদীর্ঘ

(দণ্ড-চিহ্নিত) ব'লে দ্বিমাত্রিক এবং আটটি হ্রস্ব অতএব এক-মাত্রিক। সুতরাং উক্ত পংক্তিতে সবসুদ্ধ ৩×২+১×২+৮×১ এই ষোলমাত্রা আছে।

শ্রুতবোধ নামক সুপরিচিত ছন্দ-গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্থাৎ হসন্ত বর্ণকে অর্দ্ধমাত্রিক ব'লে ধরতে হবে—"ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্।" এ কথার কোনো সার্থকতা আছে ব'লে মনে করি নে। গ্র অর্থাৎ গ্‌র, এখানে কি গ্‌-এর আধ মাত্রা ধ'রে মোট দেড় মাত্রা ধরতে হবে? তা হ'তে পারে না, কারণ গ্র বা গ্‌র দুয়ে মিলেও অযুগ্ম ধ্বনি —এখানে ধ্বনির দ্বৈতভাব বা দ্বিরুচ্চারপ্রকৃতি নেই; গ্‌, র্ এবং অ যুগপৎ উচ্চারিত হচ্ছে। সুতরাং এটি একমাত্রিক অযুগ্ম ধ্বনি। শ্রুতবোধকারেরও এখানে একাধিক মাত্রা গণনা করা অভিপ্রেত নয়। কিন্তু গর্, এখানেও দেড় মাত্রা ধরা সঙ্গত নয়; কারণ এখানে অকারকে গুরু ব'লেই ধরি আর সমস্তটাকে একটি যুগ্মধ্বনি ব'লেই গণ্য করি উভয়তই এখানে দু'মাত্রাই গণনা করতে হবে; নতুবা গর্বম্ শব্দে চারমাত্রা ধরা সম্ভব হ'ত না। আসল কথা এই যে অনাশ্রিত হসন্ত বর্ণের উচ্চারণও সম্ভব নয়, তার মাত্রা হিসাব করাও অযৌক্তিক।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় যুগ্মধ্বনি সম্বন্ধে আরও দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ ধ্বনি এবং ঐ, ঔ, অর্, অং, অঃ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনির ব্যবহারগত একটা পার্থক্য আছে যা ছন্দের মাধুর্য্যবিচারে উপেক্ষণীয় নয়। দীর্ঘ ধ্বনিগুলি হচ্ছে ধ্বনির বিশুদ্ধ রূপ; ওদের ভিতরকার কথাটি হচ্ছে দ্বিত্ব, কারণ ই, উ প্রভৃতিকে দ্বিগুণীকৃত ক'রেই ওদের উদ্ভব। কাজেই ঈ, ঊ প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরগুলি উচ্চারণ করলেই ধ্বনির এম্নি একটি বিশুদ্ধরূপের আবির্ভাব হয় যা কানে সঙ্গীতের সুরমাধুর্য্যের আভাস দিতে থাকে; এ জন্যই সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘ স্বরগুলির সাহায্যে প্রতিপদেই আমাদের চিরপরিচিত ও চিরপ্রিয় দরাজ আওয়াজের উদ্ভব হ'তে থাকে। কিন্তু বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বরগুলি দ্বিত্বপ্রকৃতি হারিয়ে ফেলে হ্রস্বত্ব লাভ করেছে ব'লে বাংলা ছন্দে ওই দরাজ আওয়াজের সাক্ষাৎ মেলে না। পক্ষান্তরে যুগ্মধ্বনিগুলি ধ্বনির বিশুদ্ধরূপ নয়, এরা ধ্বনিসংহতি মাত্র; এদের আওয়াজ দরাজ নয়, কিন্তু সে আওয়াজে বৈচিত্র্য আছে এবং এদের শেষাংশস্থিত আলগা ধ্বনিগুলি পরবর্ত্তী ধ্বনির গায়ে আঘাত ক'রে যে ঝঙ্কারের সৃষ্টি করে তার মাধুর্য্য কম নয়। যথা—ফাল্‌গুন্, ফুল্‌বন্, মন্থর্ ইত্যাদি শব্দে হসন্ত বর্ণের ধ্বনি পরবর্ত্তী বর্ণের ধ্বনির উপর আঘাত ক'রে চমৎকার একটি ঝঙ্কারের ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে; তা ছাড়া হসন্ত বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের উপর খুব খানিকটা ঝোঁক পড়ে এবং ওই ঝোঁকের ফলে স্বরধ্বনিটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। এক কথায়, দীর্ঘস্বরের আওয়াজ দীর্ঘায়ত ও দরাজ আর যুগ্মধ্বনির আওয়াজ বিচিত্র, ঝঙ্কৃত ও তরঙ্গিত; ছন্দের ক্ষেত্রে এদের কারও মর্য্যাদা কম নয়।*

সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘ ধ্বনির ব্যবহার প্রচুর, ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনিও যথেষ্ট আছে; কিন্তু ঐ এবং ঔ ব্যতীত স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনি নেই। পক্ষান্তরে বাংলায় দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিগুণীকৃত ধ্বনি প্রায় নেই বল্‌লেই হয়, অন্তত' ছন্দ-ব্যবহারের কাব্যে দীর্ঘধ্বনির প্রয়োগ খুবই কম। বাংলায় হসন্ত বর্ণের বহুল প্রয়োগহেতু ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনিরও খুব প্রাচুর্য্য; এর একটি প্রধান কারণ এই যে, সংস্কৃতে যে সব শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ, বাংলায় সে সব শব্দ হসন্তান্ত হ'য়ে গেছে। যথা—ফল, জল ইত্যাদি। এর, আরেকটি কারণ বাংলায় পদান্তস্থিত হসন্ত বর্ণ পরবর্ত্তী স্বরবর্ণের সঙ্গেও "সংযুক্ত"ই হয়, তাতে বিলীন হয়ে যায় না;—দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

"তার্ রূপ | অ্যাখ্‌ দীন্ | রুদ্রের্ | দক্ষিণ |
মূর্ত্তির্ | কর্ আজ | কর্ জয়্ | গান্।"
—জয়ধ্বান (ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৫), সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে এতগুলি হসন্ত বর্ণের সমাবেশ হয়েছে যা সংস্কৃত ভাষায় কখনও পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে তিনটি মাত্র যুক্তবর্ণ আছে; বাকি সবগুলিই হসন্ত আকারে আছে, পরবর্ত্তী বর্ণে যুক্ত ক'রে দেওয়া হয় নি। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় "কর্ আজ" কথা দুটি; সংস্কৃত আইন অনুসারে এ দুটি কথা দাঁড়াত 'করাজ' এই আকারে। কিন্তু বাংলায় এর প্রকৃত রূপ হচ্ছে

"কর্অাজ" ; স্বরবর্ণের মাথায় রেফ চিহ্ন দেওয়াতে বিস্মিত হবার কারণ নেই ; সংস্কৃতেও তার নজির আছে, যথা—নৈঋ্ত, নৈর্ঋত নয়। বাংলা ছন্দে হসন্ত বর্ণ যে পরবর্ত্তী স্বরবর্ণে বিলীন হয়ে যায় না একটু লক্ষ্য রেখে পড়লেই বাংলা সাহিত্যে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিল্‌বে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

তরুণী আশারে | সঙ্গী কর্।
আজ্ আবার্ | মন্ রে মন্।
—প্রণাম, বেলা শেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানেও তৃতীয় পর্ব্বে হসন্ত জ পরবর্ত্তী আকারের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যায় নি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সব চেয়ে বড় পার্থক্য (অবশ্য ছন্দ'-বিচারের তরফ থেকে) হচ্ছে এই যে, সংস্কৃত ভাষায় ঐ আর ঔ ছাড়া স্বরান্তিক যুগ্মধ্বনি নেই, আর বাংলা ভাষায় যুগ্ম-স্বরের সংখ্যা বহু। যথা—অই্, অউ্, অও্, আই্, আউ্, আও্ ইত্যাদি। তার প্রমাণ বই, বউ, লও, যাই, লাউ, খাও ইত্যাদি। খাঁটি বাংলায় স্বরসন্ধির ব্যবস্থা নেই ব'লে এসব যুগ্মস্বর বাংলা ছন্দে এমন একটি তরঙ্গায়িত লীলার সৃষ্টি করে যার সাক্ষাৎ সংস্কৃত ছন্দে খুব কমই পাওয়া যায়।

জাগিয়া মাগিয়া | লও আশিস্।
গাও নবীন | ছন্দে গান।
—ঐ, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে (লও্ আশিস, গাও্ নবীন্) অও্ এবং আও্ এ দুটি যুগ্মস্বর যে ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে তাল রাখ্‌তে পারে এমন যুগ্মস্বর সংস্কৃতে মাত্র দুটি, ঐ আর ঔ। 'লও্ আশিস্' কথার সঙ্গে তাল রাখ্‌তে পারে 'যৌবনম্' ; কিন্তু সংস্কৃত বিধান অনুসারে যদি 'লও্ আশিস্' কথা দুটির মধ্যে সন্ধি হ'য়ে যেত, তবে বাংলা ভাষা তার একটি বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত হ'ত। বাংলা 'ছন্দ গান্'-এর সঙ্গে সংস্কৃত 'ছন্দ-বিৎ' পাল্লা দিতে পারেন ; কিন্তু বাংলার যুগ্ম-স্বরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে সংস্কৃত ভাষার এমন শক্তি নেই। যুগ্মধ্বনির প্রাচুর্য্য-বিষয়ে বাংলার সঙ্গে ইংরেজির তুলনা চল্‌তে পারে। ইংরেজি উচ্চারণে যে accent বা ঝোঁক থাকে তার সঙ্গে এই যুগ্মধ্বনি-বাহুল্যের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। সন্ধান কর্‌লে প্রাকৃত বা চল্‌তি বাংলায় যুগ্মধ্বনির বাহুল্যের মূলেও ওই accent বা উচ্চারণের ঝোঁকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর এই জন্যই বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ এবং ইংরেজি ছন্দের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন



তার তলে

শ্রীযুক্ত কর্ম্মযোগী রায়

কোন রকমে রেলিংটা ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে, ভবতোষ পড়ে ফেলল, 'vacancy'; বড় অস্পষ্ট আঁচড়! তবু একবার দেখা যাক্। — আপিসের ভিতর ঢুকে পড়ল।

সামনে মার্কামারা চাপরাশিকে একটা স্লিপ দিয়ে বললে, বড়বাবুকে এটা দিয়ে দাও।

চাপরাশি একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি মুখের উপর নিক্ষেপ করে স্লিপটা নিয়ে চলে গেল। ভবতোষের বুকের ভিতর তখন যে কি ভীষণ আলোড়ন সুরু হয়েছে তা বলবার নয়। ঠিক কাল-বোশেখের আকাশ পাতাল তোলপাড় করা ঝড়ের মত।—চাপরাশি এসে বললে, বড়াবাবু আব্ কো সেলাম দিয়া। ভিতর মে আইয়ে।—খুব সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে একটা নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইল। কর্ত্তৃত্বের গর্ব্বে ভরা মাংসল মুখখানা খাতা থেকে তুলে বললে, কি চান? —ভবতোষের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়ে এল, কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, চাকরীর জন্যে!

বড়বাবু বিকৃত মুখে হেসে বললেন, চাকরী! No vacancy, তাছাড়া it requires strong recommendation।

তারপর ঘাড় নামিয়ে নিবিষ্টচিত্তে কাজে মন দিলেন।

ভবতোষ ঘা-খাওয়া বুকখানা দুহাতে চেপে ধরে একদমে চওড়া রাজপথে এসে খাড়া হ'ল।

দুপাশে চেয়ে যেন বোধ হল, রাস্তা সীমাহীন! স্তব্ধ দুপুরটা যেন আরো ভয়াবহ! মাথার উপর অনন্তবিস্তৃত আকাশখানার বুকেও যেন একটু মায়া নেই, খালি নির্ম্মম রুক্ষতা।

ভাবতে লাগল, এক আধ দিন নয়। নাগাড় দুটোমাস ধরে কোন হিল্লে হ'লনা। একি ভীষণ বৈরিতা! সকলেই যেন একজোট হয়ে তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে।

হঠাৎ তার গায় ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে কে বললে,—কি হে ভবতোষ, কি খবর?

এই যে নরেন! তারপর সংক্ষেপে উত্তর দিলে, খবর আর কি ভাই, দাসত্বের জন্যে কলকাতায় চরে বেড়াচ্ছি।

নরেন হেসে উঠ্ল।—বেশ! কত দিন খোঁজা হচ্ছে?

—তা দুটো মাস হ'ল! বলে, একটু হাসল। সে হাসিটি ঠিক বোশেখের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে পাষাণের বুকে চিড় খাওয়া রেখাটার মত।

নরেন রিষ্টওয়াচের দিকে আবার চেয়ে ব্যস্ত ভাবে বললে, আচ্ছা আমি চললুম একবার সুবিধে করে আমার বাড়ীতে যাস্।

ভবতোষ আরো খানিকক্ষণ সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে থেকে, বিরক্ত ভাবে সামনের সোজা পথটা ধরে বাসার দিকে চলতে সুরু করল।

বাসায় তখন জনমনিষ্যির সাড়া নেই। থম্ থমে নির্জ্জনতার ছায়ায় যেন সবটা ঢেকে ফেলেছে! সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিল।

কিন্তু সোয়াস্তি নেই, চারপাশ থেকে বিভিন্ন চিন্তা এসে যেন তাকে কশাঘাত করতে লাগল।

আন্দাজ সাড়ে ছ'টা হবে।

ভবতোষ বিছানা ছেড়ে উঠে, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

তারপর সোজা চলতে লাগল নরেনের বাসার দিকে।

একটা মানুষ যাবার মত গলিটা; শেষের দিকে নরেনের বাড়ী। ৯নং বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা মারতেই, ভিতর থেকে খিল খুলে নরেন বেরিয়ে এসে ভবতোষকে তার সঙ্গে ভিতরে যেতে বললে।

ভিতরটা আরো অন্ধকার স্যাঁত-সেঁতে। একটা বিশ্রী আবহাওয়ায় যেন বাড়ীটার ভিতর বিষিয়ে উঠেছে। স্তূপাকার জঞ্জাল ভরা উঠোনটার বাঁদিকের দুটো ঘর নরেনের। প্রথম খানার ভিতরে ঢুকে ভবতোষ বসল। ঘরটার ভিতরে প্রজ্জ্বলিত লম্পের শিখায় বেশ ঘন কালো রঙের পোঁছ পড়েছে। উঠোনটার ডান দিকের ঘরখানাতে একদল পশ্চিমা আস্তানা পেতেছে। বাঙালীর সঙ্গে পৃথক করবার জন্যে মাঝখানে একটা দরমা বাঁধা।

নরেন একখানা তালপাতার পাখা ভবতোষের হাতে দিয়ে বললে, এই পাশাপাশি ঘরদুটো আমার; ও পাশে বিপিন বাবু থাকেন, তেনার গলির মোড়ে একটা মুদিখানার দোকান আছে। তুই বাসার ভাড়া না দিয়ে ঐ ঘরখানাতে থাক্।

ভবতোষ বেশ প্রফুল্ল ভাবে বললে, বেশ! আমার কোন আপত্তি নেই। এমন সময় একটা লম্বা রোগা লোক সোজা ঘরে ঢুকে বললে, কি হে নরেন কতকক্ষণ এলে?

—এই যে বিপিন বাবু বসুন। এর মধ্যে দোকান ছেড়ে?

চুলগুলোর মধ্যে পাঁচটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করে বললে, আর দোকান! বেচা কেনা কই? তারপর সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দুই পরে।

বিপিন বাবু চড়া গলায় পাশের ঘর থেকে বলে উঠেন, হারামজাদি!

তারপর দুম্ দুম্ আওয়াজ!

পরে বামা কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ।

নরেন তাড়া তাড়ি ছুটে গেল, তারপর ধমকান সুরে বললে, বিপিন বাবু এ আপনার ভারি অন্যায়; মেয়েমানুষের গায় হাত তোলা!

স্বরের উচ্চতা বজায় রেখে বিপিন বাবু বললেন, মেয়ে মানুষ—সন্ধ্যের সময় পড়ে পড়ে ঘুম কি?

তা বলে গায় হাত তোলা!

তুমি চুপ কর।

নরেন আস্তে আস্তে ফিরে এসে ভবতোষের পাশে বসে বললে, বিপিন বাবু দুটী বেলা বৌটাকে ধরে মারেন, দ্বিতীয় পক্ষ কি না!

স্যাঁত-সেঁতে আবহাওয়ার সঙ্গে লোকগুলোর নীচতা সঙ্কীর্ণতা যেন সীমাবদ্ধ।

ভোরের আলো ধরার বুকে পড়তে না পড়তেই ও পাশে পশ্চিমাদের এ পাশে বিপিন বাবুর মুখনিঃসৃত কদর্য্য গালমন্দে নিত্য প্রভাত বন্দনা সুরু হয়।

ভবতোষের পুরো ছটা মাস ঐ খানে কেটে গেল।

নরেনের সৌজন্যে ও হাতের কাজ একটু ভাল জানাতে হোরমিলার কোম্পানিতে একটী চাকরী জুটে গেল। বেতন ষাট টাকা।

সঙ্কীর্ণতার মধ্যে দিনগুলো কাটে মন্দ নয়।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যের মুখে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপিন বাবুর স্ত্রী নিজে উপযাচিকা হয়ে ভবতোষকে নমস্কার করে বললে, কেমন আছেন?

চমকে গিয়ে শিষ্টাচারের সঙ্গে প্রতিনমস্কার করে ভবতোষ বললে, ভাল আছি। তারপর এদিক ওদিক চাইতে লাগল পাছে কেউ দেখতে পায়,·· কি ভাবে।

বিপিন বাবুর স্ত্রী তক্তার একপাশে বসে পড়ল, তারপর বললে, একটা কথা কইবার লোক পর্য্যন্ত এবাড়ীতে নেই, প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠে! নরেন বাবু আর আপনি ছাড়া বাঙালীর ত' নাম গন্ধ নেই, উনি সেই যে সকালে বেরিয়ে যান কখন যে ফেরেন তা কিছু ঠিক নেই। দুপুর বেলাটা নিছক নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটাতে হয়···একটু থেমে আবার বললে, মুখটা বড় শুকনো আপনার, কিছু খান্ নি বুঝি? চা এনে দেব?

ব্যস্ত হয়ে ভবতোষ বলে উঠল, না না দরকার নেই!

কে কথা শোনে?—

বিপিন বাবুর স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, খোকার দুধ গরমের জন্য ষ্টোভ জ্বেলেছিলুম, গাটা ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে—একটু চায়ের জল চাপিয়েছি।

ভবতোষ কিছু ঠিক করতে পারে না! একটু পরে চা নিয়ে হাজির হয়।

তারপর বললে, আপনি খান আমি খোকাকে দুধ খাওয়াতে যাচ্ছি।

এক নিশ্বাসে চাটুকু চুমুক দিয়ে খালি পেয়ালাটা নামিয়ে

রেখে ভবতোষ ভাবতে লাগল, এমন চঞ্চলা হাস্যময়ী লক্ষ্মী স্ত্রীর উপর বিপিন বাবু এত অত্যাচার করে কেন!

একটু পরেই পাশের ঘরে বিপিন বাবু ভারি গলায় চিৎকার করে বলে, দুখানা রুটি করে রাখতে কি আর বড় মানুষের মেয়ের সময় হল না! এ সব নবাবি এখানে খাটবে না, না পোষায় বাড়ী থেকে চলে যেতে পার।

অস্পষ্ট নারী কণ্ঠে কি একটা কথা বেরোল!

তারপরেই বেদম প্রহারের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে চাপা ক্রন্দন।

ভবতোষের মাথার ভিতর রক্তটা টগ্‌বগ্‌ করে উঠল! ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে প্যাঁকাটির মত লোকটাকে দুমড়ে ভেঙে দিয়ে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু পরক্ষণে ভাবে, সে তার স্ত্রীকে মারচে, আমার ত' কোন অধিকার নেই।

আঁধার নিবিড় ভাবে ঘনিয়ে আসে।

পূর্ব্বাকাশে চাঁদের মুখে মুমূর্ষুর মত হাসিটুকু লেগে আছে।

শুয়ে শুয়ে ভবতোষ ভাবছিল, মনোরমার কথা...... সংসারে নারী আসে শুধু দুর্ব্বিহ যন্ত্রণা ভোগ করতে! নারী সহ্য করতেও পারে! ওঃ মনোরমার কি সহ্য।

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় কে আঘাত করতে লাগল। ভবতোষ দরজার কাছে এসে খিল খুলে দিতে বিপিন বাবু ঘরে ঢুকলেন।

অস্থিসার দেহখানা তখন ঘন ঘন কাঁপছে, ঠোঁট দুটো বিবর্ণ হয়ে ঝুলে পড়েছে, মুখখানা অসম্ভব ঘোলাটে।

ভবতোষের হাতখানি ধরে ভাঙা স্বরে বললে, ভবতোষ বাবু আমায় দশটা টাকা দিন না,—মনোরমা কোথায় চলে গেছে একবার খুঁজে দেখি।

মনোরমা চলে গেছে?

মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর মত ক্ষীণ-স্বরে একটা হাঁ বলে, শীর্ণ দেহটা মাতালের মত টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল।

ভোরের বাতাস সবে বইতে সুরু হয়েছে।

ভবতোষ বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেই কানে গেল, বিপিন বাবু মোলায়েম সুরে বলছে, মনোরমা! তোমার জন্যে আমি সংসার ছেড়েছি, বাড়ীর লোকের কাছে অপ্রীতিভাজন হয়েছি, তোমায় আমি কত ভালবাসি তা তুমি জান না!

ভবতোষ আশ্চর্য্য হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। অনন্ত আকাশের বুকে তখন দিনের আলো খরতর হয়ে উঠে।

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়



মৃতের পুনরাগমন

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কেটি ফক্স (Katie Fox) ও মার্গারেটা ফক্স (Margaretta Fox) নাম্নী আমেরিকাবাসী দুইটি কৃষক-বালিকা দ্বারা বর্ত্তমান প্রেততত্ত্ব আন্দোলনের সূচনা হয়। কেটি ও মার্গারেটার বয়স যখন যথাক্রমে ১২ ও ১৫ বৎসর তখন একদিন উহাদের গৃহে ঠক্ ঠক্ করিয়া একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যতবার শব্দ করিতে বলা হইত শব্দ ঠিক ততবারই হইত। সংবাদ পাইয়া শত শত লোক এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিবার জন্য তাহাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করে। শব্দ যে শুধু তাহাদের নিজেদের বাড়ীতেই হইত, এমন নহে। ফক্স ভগিনীরা যেখানে যাইত, সেখানেই শব্দ উৎপাদন করিতে পারিত। এই শব্দের হেতু কি তাহা কিছুদিন পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ফক্স ভগিনীরা ইহাকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিল। কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের বাফেলো সহরে আসিয়া যখন তাহারা তাহাদের এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করে তখন পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে শব্দ তাহাদের নিজেদের জানু-সন্ধির স্থানচ্যুতি সংঘটনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন তাহারা সোফাতে বসিয়া মেজের উপর পা রাখিত, তখন প্রেতের আবির্ভাবে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইত না। কিন্তু যখন তাহাদিগকে চেয়ারে বসাইয়া, মেজের উপর কিম্বা পায়ের উপর পা না রাখিতে দিয়া, কোমল গদির উপর পা রাখিতে দেওয়া হইত, তখন প্রেতের সাড়া পাওয়া যাইত না; কারণ এরূপ অবস্থায় কোন অবলম্বন না পাইয়া, সন্ধির স্থানচ্যুতি সংঘটন অসম্ভব হইয়া পড়িত। উহাদের জানু চাপিয়া ধরিলেও প্রেত সাড়া দিতে অসমর্থ হইত। মোটের উপর, যে অবস্থায় দর্শকের অজ্ঞাতসারে সন্ধির স্থানচ্যুতি সঙ্ঘটন অসম্ভব হইয়া পড়িত, সেই অবস্থায় প্রেতকেও নীরব দেখা যাইত।

ফক্স ভগিনীদের প্রতারণা শুধু যে এইরূপেই ধরা পড়িল তাহা নহে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ কেন্ (বিবাহিতা মার্গারেটা ফক্স) এবং মিসেস্ জেন্‌কেন (বিবাহিতা কেটি ফক্স) নিজেরাই প্রকাশ করিয়া দেন যে শব্দ উৎপাদন বুজরুকি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি, কি উপায়ে শব্দ উৎপাদন করা হইত, মিসেস্ কেন্ নিজেই তাহা সকলকে দেখাইয়া দেন।

এই ফক্স ভগিনীদের দৃষ্টান্তে উত্তরকালে অসংখ্য মিডিয়াম (medium) বা প্রেতবার্ত্তাগ্রাহীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ডি-ডি হোম (D. D. Home), ইউসেপিয়া পেলাডিনো (Eusapia Palladino), ফ্লরি কুক্ (Florrie Cook), ম্যাড্যাম্ ব্লাভাট্‌স্কী (Madame Blavatsky), হেন্‌রী স্লেড্ (Henry Slade), হোসেন খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রত্যেকেই প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকট ইঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

১। **ডি-ডি হোম**—ইনি আমেরিকার অধিবাসী। আমেরিকা ও ইয়োরোপের অভিজাত-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই নানাভাবে সাহায্য করিয়া ইঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন। ইনি অতিশয় চতুর ও মনোরম-চরিত্রের লোক ছিলেন। এই ডি-ডি হোমই একমাত্র প্রেতবার্ত্তাগ্রাহী যাহাকে কখনও ধরা পড়িতে শুনা যায় নাই। ইঁহার ধরা না পড়িবার প্রধান কারণ এই যে, ইঁহার কার্য্যকলাপ সন্দেহের চক্ষে দেখিলে ইনি কখনও ইঁহার শক্তির পরিচয় দিতে রাজি হইতেন না।

২। **ইউসেপিয়া পেলাডিনো**—এই ইটালী-বাসী কৃষক-বালিকার নিকট এত অধিকসংখ্যক বিজ্ঞলোক হার মানিয়াছেন যে ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

কিন্তু ফাঁকি চিরকাল চলিতে পারে না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রফেসার মানষ্টারবার্গ (Prof. Munsterberg) তাহার সমস্ত চাতুরী ধরিয়া ফেলেন। প্রফেসার মানষ্টারবার্গ ও মিঃ কেরিংটন্ একত্রযোগে ইউসেপিয়াকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইউসেপিয়ার বাম দিকে ছিলেন প্রফেসার মানষ্টারবার্গ, এবং ডান দিকে মিঃ কেরিংটন। ইউসেপিয়া তাহার বাম হাত দ্বারা প্রফেসার মানষ্টারবার্গের বাম হাত ধরিয়া রাখিয়াছিল, এবং ইউসেপিয়ার ডান হাত মিঃ কেরিংটন তাঁহার হাত দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। ইউসেপিয়া তাহার বাম পা প্রফেসার মানষ্টারবার্গের পায়ের উপর, এবং ডান পা মিঃ কেরিংটনের পায়ের উপর রাখিয়াছিল। যথাসময়ে ঘর অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইলে, মিঃ কেরিংটন প্রেতকে প্রথমে প্রফেসার মানষ্টারবার্গের বাহু স্পর্শ করিতে, এবং তৎপর তাঁহাদের পশ্চাৎস্থিত একখানা টেবিল শূন্যে উত্তোলন করিতে অনুরোধ করিলেন। মিঃ কেরিংটনের অনুরোধ ব্যর্থ হইল না। সত্যসত্যই মানষ্টারবার্গ তাঁহার বাহুতে স্পর্শ অনুভব করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের তিন ফুট পশ্চাৎস্থিত টেবিলখানাও মেজের উপর আঁচড় কাটিতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিতেছেন, বুঝি বা এইবার টেবিলখানা শূন্যে উঠিয়া দাঁড়াইবে। ঐ সময়ে হঠাৎ একটি চীৎকার শুনা গেল। চীৎকার করিয়াছিল ইউসেপিয়া; কারণ তাহার পাদুকাশূন্য একখানি পায়ে একজন লোক আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। প্রেতের কার্য্যগুলি ইউসেপিয়া পায়ের সাহায্য করিয়া যাইতেছে দেখিয়াই লোকটি তাহার পায়ে এরূপভাবে ধরিয়াছিল। ইউসেপিয়ার কার্য্যকলাপে কোন চাতুরী আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ লোকটিকে প্রফেসার মানষ্টারবার্গ সুকৌশলে পরীক্ষা-গৃহে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পাদুকার ভিতর হইতে পরীক্ষকদের অজ্ঞাতসারে ইউসেপিয়া অতি সাবধানে তাহার একখানি পা বাহির করিয়া লইত এবং সেই পায়ের সাহায্যেই পরীক্ষকদের দেহ স্পর্শ করা, টেবিল শূন্যে উত্তোলন করা, ইত্যাদি কার্য্য অসামান্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিত।

৩। **ফ্লরি কুক্**—ইঁহার প্রভাবে কেটি নাম্নী জনৈকা মৃতা রমণী শরীরিণী হইয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। কুক্-সহ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ্চ তারিখের একটি বৈঠক (Seance) সম্বন্ধে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম ক্রুক্স (Sir William Crookes) লিখিয়াছিলেন,—"কেটিকে কখনও অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করিতে দেখা যায় নাই। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কক্ষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অতি পরিচিত-জনের ন্যায় সকলের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। চলিতে চলিতে বহুবার তিনি আমার বাহু ধারণ করিয়াছেন। তাহাতে আমার মনে হইতেছিল যে আমার সঙ্গিনী জীবিতা নারী, পরলোকগত আগন্তুক নহেন। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আমি তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। দয়া করিয়া তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন, এবং ফলে আমি যাহা করিয়াছিলাম, যে কোন ভদ্রলোকই এমতাবস্থায় তাহা করিতেন।" কিন্তু এই কেটি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন উইলিয়াম হিপ্ নামক এক ব্যক্তির গায়ে জল ছিটাইতেছিলেন, তখন সহসা ঐ ব্যক্তি তাঁহার একখানি হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলেন। পরে আলো জ্বালাইলে দেখা যায় যে ধৃতা কেটি আর কেহ নহেন, স্বয়ং ফ্লরি কুক্।

৪। **ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী**।—সতের বৎসর বয়সে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের তিন মাস পরেই ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কী তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে পলাইয়া যান। কয়েক বৎসর পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল অল্‌কটের সহায়তায় নিউইয়র্কে তিনি থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটী (Theosophical Society) নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। উক্ত সমিতি-গৃহ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ আডিয়ারে স্থানান্তরিত করা হয়। আডিয়ারস্থিত সমিতি-গৃহে নানারূপ অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া প্রায়ই সংবাদ পাওয়া যাইত। সংবাদপত্রে এই সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইতে থাকিলে ভারতবর্ষ ব্যতীত ইয়োরোপেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। লণ্ডনস্থ আধ্যাত্মিক-অনুসন্ধান-সমিতি (Society for Psychical

Research) অনতিবিলম্বে তাঁহাদের অন্ততম সভ্য মিঃ আর্ হজ্‌সনকে (Mr R Hodgson) সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ভারতে প্রেরণ করেন। মিঃ হজ্‌সনের অনুসন্ধানের ফলে ম্যাড্যাম্ ব্লাভাট্স্কী অতি শীঘ্রই ধরা পড়িলেন। এতদ্ব্যতীত ম্যাড্যাম ব্লাভাট্স্কীর সাহায্যকারিণী মিসেস্ কুলম (Mrs Coulomb) নাম্নী জনৈক মহিলা ফাঁকি-সংক্রান্ত-উপদেশপূর্ণ ম্যাড্যাম ব্লাভাট্স্কীর স্বহস্ত-লিখিত বহু পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দেন। ঐ পত্রগুলির হস্তাক্ষর, রচনা-ভঙ্গী, শব্দনির্বাচন, বিরামচিহ্ন-সন্নিবেশ, সমস্তই ম্যাড্যাম ব্লাভাট্স্কীর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। এমন কি, ম্যাড্যাম ব্লাভাট্স্কীর রচনাতে সচরাচর যে সকল ভুল থাকিত, ঐ চিঠিগুলিতেও সেইরূপ অনেক ভুল পাওয়া গিয়াছিল।"*

৫। **হেন্‌রী সেড**—ইঁহার স্লেটে প্রেতেরা আসিয়া লিখিয়া যাইতেন। ইঁহাকেও অবশেষে ধরা পড়িতে হয়। ইনি অতিশয় মদ্যপ ছিলেন। যৌবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও শেষ জীবন ইঁহাকে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

৬। **হোসেন খাঁ**।—ইঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী আমরা "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে † হোসেন খাঁ নামে এক মোছলমান * * * ভয়ানক আড়ম্বরে দেখা দেন—তিনি হজরত-জিনিয়াই সিদ্ধ—যা মনে করেন, সেই জিনিস জিনি দ্বারা আনাতে পারেন। বাক্সর ভিতর থেকে ঘড়ি, আংটী, টাকা উড়িয়ে দেন, নদীজলে চাবির থ'লো ফেলে দিয়ে জিনির দ্বারা তুলে আনান, এই প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কত্তে পারেন।

ক্রমে সহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আন্দোলন কত্তে লাগ্‌লেন—ইংরেজী কেতার বড় দলে হোসেন খাঁর খবর হলো। হোসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্সর ভিতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইল্‌সনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আন্‌লেন, বোতল বোতল শ্যাম্‌পিন, দোনা দোনা গোলাবী খিলি ও দালিম-কিস্‌মিস্ প্রভৃতি হরেক রকম খাবার জিনিস উপস্থিত কল্লেন। কাল—রায় বাহাদুরের বাড়ীতে কমলালেবু, বেলফুলের মালা, বরফ ও আচার আন্‌লেন। যাঁরা পরমেশ্বর মান্‌তেন না, তাঁরাও হোসেন খাঁকে মান্‌তে লাগ্‌লেন। * * * ক্রমে হোসেন খাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগ্‌লেন। অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দ হলো। বুজরুকী দেখ্‌বার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোক আস্‌তে লাগ্‌লো। হোসেন খাঁর "প্রিমিয়ম্" বেড়ে গেল। জুচ্চুরী চিরকাল চলে না। * * * ক্রমে দুই এক জায়গায় হোসেন খাঁ ধরা পড়্‌তে লাগ্‌লেন—কোথাও ঠোনাটা ঠানাটা, কোথাও কানমলা, শেষ প্রহার বাকি রইল না। যাঁরা তারে পূর্ব্বে দেবতা-নির্ব্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও দুএক ঘা দিতে বাকি রাখ্‌লেন না, কিছুদিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের অবস্থায় পড়্‌লেন ; যারা আদর ক'রে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগী ক'রে বাহির ক'রে দেন, শেষে সরকারী অতিথিশালা আশ্রয় কল্লেন —হোসেন খাঁ জেলে গেলেন! তিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন।"

এই সকল প্রেতবার্ত্তা-গ্রাহীদের উপর আস্থা স্থাপন করা কতদূর সঙ্গত, পরলোক-বিশ্বাসীরা তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ?

মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার প্রেতের ফোটো তোলা যাইতে পারে এরূপ গল্প হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন। মিঃ মাম্‌লার নামক এক ব্যক্তি এইরূপ ফোটো তুলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। কিন্তু নিউইয়র্কে আসিয়া তাহার জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া মির হামিদ নামক একজন পাঞ্জাবী প্রেতের ফোটো তুলিতে পারেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছিলেন ; ইঁহার ফাঁদে কেহ পা দিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। প্রকৃত প্রেত-ফোটো (Spirit-Photo) দেখিতে ইচ্ছুক বলিয়া মিঃ ষ্টিউয়ার্ট কাম্বারল্যাণ্ড (Mr. Stuart Cumberland) বহুবার ঘোষণা করিলেও কোন মাম্‌লার বা মির হামিদই

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা Isis Very Much Unveiled এবং The Frauds of Theosophy Exposed নামক পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন।

† কলিকাতা।

সাড়া দেন নাই। পক্ষান্তরে জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের একখানি তথাকথিত প্রেত-ফোটো তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু সেই ফোটোর সহিত মৃতব্যক্তির কোনও সাদৃশ্য নাই; ফোটোখানিতে শুধু পোষাক পরিচ্ছদেরই বাহার দেখান হইয়াছে।

প্রেতের ফোটো বলিয়া পরিচিত যে সকল ফোটো সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই নিম্নলিখিত দুই উপায়ে তোলা হইয়া থাকে।*

১। পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ও মানুষ দুইখানি বিভিন্ন প্লেট হইতে মুদ্রিত করা হয়। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের তুলনায় মানুষকে অতিকায় দেখাইয়া প্রেতের ফোটো বলিয়া ভ্রম জন্মান হয়।

২। কয়েকজন লোকের সম্মুখে ক্যামেরা রাখিয়া, লেন্স (lens) অনাবৃত করা হয়। নিয়মিত সময়ের অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত হইতেই লেন্স ঢাকিয়া দিয়া ক্যামেরার সম্মুখ হইতে যে কোন একজনকে সরাইয়া লওয়া হয়। আবার লেন্স অনাবৃত করিয়া সময়ের অপূর্ণতাটুকু পূরণ করিয়া লইয়া অন্যান্য সকলের ফোটো তোলা হয়। যাহাকে ক্যামেরার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লওয়া হয় তাহার ছবি বাষ্প মূর্ত্তির ন্যায় দেখায় এবং পশ্চাৎস্থিত গাছপালাও তাহার ভিতর দিয়া দৃষ্ট হয়। এরূপ ফোটোও প্রেতের ফোটো বলিয়া ভ্রম হয়।

টেবিল-চালনা (Table-turning) দ্বারা মৃতব্যক্তির প্রেতকে আনিয়া উপস্থিত করা যাইতে পারে এই বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীর সকল দেশেই এক সময়ে টেবিল-চালনার ধুম লাগিয়া গিয়াছিল। টেবিল-চালনা ব্যাপারটা এই। কয়েকজন লোক একখানি গোল টেবিলের চারিদিকে বসিয়া টেবিলের উপর যথাবিধি তাহাদের হাত রাখিয়া একাগ্রচিত্তে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকিলে, কিছুক্ষণ পরে টেবিল্‌খানি নড়িয়া উঠে। এই সময়ে একবার শব্দ করিলে 'না' বুঝিব, তিনবার শব্দ করিলে 'হাঁ' বুঝিব, বা এই ধরণের অন্য কোন সঙ্কেত স্থির করিয়া কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, টেবিলের পায়া উঠিয়া নামিয়া প্রয়োজনমত শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া থাকে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে টেবিলে প্রেতের আবির্ভাব হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যাহারা টেবিলের উপর হাত রাখে, অজ্ঞাতসারে পৈশিক শক্তি প্রয়োগে তাহারা নিজেরাই টেবিলকে নাড়াইয়া থাকে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যখন উপস্থিত ব্যক্তিদের অর্দ্ধেক লোক টেবিল যেদিক্ হইতে ঘুরিবে বলিয়া আশা করে, অন্য অর্দ্ধেক ইহার বিপরীত দিক্ হইতে ঘুরিবে বলিয়া আশা করে, তখন প্রেত টেবিল নাড়াইতে পারে না। টেবিল-চালনায় যাহারা টেবিলের উপর হাত রাখে, তাহারাই যে অজ্ঞাতসারে টেবিলকে নাড়াইয়া থাকে, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে (Prof. Michael Faraday) একটি যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার এই যন্ত্র টেবিলের উপর রাখিয়া, তাহার উপর হাত রাখিয়া বসিলে, টেবিলকে আদৌ নড়িতে দেখা যায় না, অথচ হাত যে অজ্ঞাতসারে যন্ত্রটিকে ঠেলিয়া থাকে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রেত আনয়ন মানসে লেখক তাঁহার ১৩।১৪ বৎসর বয়সে ৩৲ টাকা মূল্যে একটি প্ল্যান্‌শেট্‌, * (Planchette) এবং ২৲ টাকা মূল্যে একখানি "ভৌতিক-আয়না" ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রিজাগরণই সার হইয়াছিল।

ফ্লরেন্স মেরিয়াট্‌ (Florence Marryatt) নাম্নী একটি মহিলার প্রেততত্ত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতার বিবরণ অতিশয় কৌতুকাবহ। একজন প্রেতবার্ত্তাগ্রাহী—যে পূর্ব্বে এক্কা চালাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত—কোন বৈঠকে মেরিয়াটের মৃতা কন্যাকে আনিয়া উপস্থিত করে। আনন্দাতিশয্যে অধীর হইয়া মেরিয়াট্‌ কন্যার মুখখানি চুম্বন করেন। কিন্তু পরক্ষণেই ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিয়া মিঃ রবার্ট হিচেন্সের (Mr. Robert Hichens) নিকট

* The Supernatural?

* কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ। প্রেততত্ত্ববিশ্বাসীদের ধারণা, প্রেত এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বক্তব্য লিখিয়া দিতে পারে।

বলেন যে তাঁহার মনে হইতেছে, তিনি যাহার মুখ চুম্বন করিয়া আসিয়াছেন, সে স্বয়ং ভূতপূর্ব্ব এক্কাচালক। কি ভয়ানক প্রতারণা! †

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এহেন প্রেততত্ত্বে অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিতও আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা যেসকল যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। অদ্যাবধি যেসকল পণ্ডিত প্রেততত্ত্বে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজ্ ই (Sir Oliver Lodge) সমধিক খ্যাতি সম্পন্ন। প্রেততত্ত্বের দিক্‌পাল সার অলিভার লজ প্রেতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া তাঁহার "Raymond, or Life and Death" নামক পুস্তকে কিরূপ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহার একটু নমুনা দিতেছি।

বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে সার অলিভার লজের কনিষ্ঠ পুত্র রেমাণ্ড লজ্ নিহত হন। পুত্রের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই সার অলিভার লজের পত্নী লেডী লজ্ একটি ফরাসী মহিলাকে সঙ্গে নিয়া ইংলণ্ডে যান, এবং সেখানে মিসেস্ কেনেডী নাম্নী একটি মহিলার সাহায্যে মিসেস্ লিয়োনার্ড নাম্নী একজন প্রেতবার্ত্তাগ্রাহীকে নিয়া একটি বৈঠকের বন্দোবস্ত করেন। মিসেস্ লিয়োনার্ডের নিকট তাঁহাদের পরিচয় না দিবার জন্য লেডী লজ্ মিসেস্ কেনেডীকে পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখেন। এই বৈঠকে মিসেস্ লিয়োনার্ড রেমাণ্ডের মত একটি যুবকের বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, তিনি সেই যুবকটির পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড 'R' দেখিতেছেন। তিনি রেমাণ্ড নামের অবশিষ্ট অক্ষরগুলির কোনটি বলিয়া, কোনটি শূন্যে লিখিয়া, কোনটি ইঙ্গিতের সাহায্যে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলেন যে তিনি 'আমাণ্ড' বলিয়া একটি শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন। ইহার তিন দিন পর সার অলিভার লজ একাকী গিয়া মিসেস্ লিয়োনার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি মিসেস্ কেনেডীর একজন বন্ধু এই কথা ভিন্ন মিসেস্ লিয়োনার্ডের নিকট নিজের অন্য পরিচয় দেন নাই। কিন্তু সেই দিনও মিসেস্ লিয়োনার্ড রেমাণ্ডের মত একটি যুবকের বর্ণনা করিয়া যান, এবং বলেন তাহার নিকট একটি 'R' আছে, ইহা একটা মজার নাম, রবার্ট নয় বা রিচার্ড নয়, ইত্যাদি।

সার অলিভার লজ্ বলেন যে তাঁহার নিজের চেহারা হয়ত পরিচিত হইতে পারে, অথবা তাহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সকলের সম্বন্ধে ত আর এরূপ কথা বলা চলিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকপ্রবরের একবারও মনে হয় নাই যে মিসেস্ লিয়োনার্ড, মিসেস্ কেনেডীর নিকট হইতে লেডী লজের সংবাদ অবগত হইতে পারেন। মিসেস্ কেনেডীর যে পত্রখানা সার অলিভার লজ্ তাঁহার "Raymond, or Life and Death" নামক পুস্তকের ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে মিসেস্ কেনেডী মাত্র কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্যত্র সার অলিভার লজ্ লিখিয়াছেন যে মিসেস্ লিয়োনার্ডের যে প্রেত আনয়নের শক্তি আছে তাহা মিসেস্ কেনেডীর নিকট হইতেই তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। মিসেস্ কেনেডীকে মিসেস্ লিয়োনার্ডের সাহায্যকারিণী বলিয়া সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ নাই কি?

সার অলিভার লজ্ যে অতিশয় সরলচিত্ত লোক, সুতরাং কূটবুদ্ধি প্রেতবার্ত্তাগ্রাহীদের রহস্যোদ্ঘাটনের যোগ্যতাবিহীন, তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি।

হার্ ফন্ লিরো (Herr Von Lyro) নামক এক ব্যক্তির দুইটি কন্যার সম্বন্ধে সার অলিভার লজ্ তাঁহার "The Survival of Man" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ইহাদের একটি যুবতী অপরটির হাত ধরিয়া বসিলে নিজে না দেখিয়াও ভগিনীর দৃষ্ট তাসের নাম বলিয়া দিতে পারিত।

এক ভগিনী অপর ভগিনীর হাত ধরিবার সুযোগ পাইলে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কোন ইঙ্গিতের সাহায্যে অতি সহজেই তাহাকে তাসের নাম বুঝাইয়া দিতে পারে। সার অলিভার লজ্ কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন!

† Spiritualism, the Inside Truth

সার অলিভার লজের পরেই আর একজন বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া পরলোক-বিশ্বাসীদিগকে অত্যন্ত আস্ফালন করিতে দেখা যায়। ইনি সার উইলিয়াম্ ক্রুক্স। ইঁহার সম্মুখে প্রেতবার্ত্তাগ্রাহী ফ্লরি কুক্ প্রেতিনী সাজিয়া উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন কিন্তু তবুও তাঁহার প্রেত-যোনি সম্বন্ধে ইঁহার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই! রসায়নশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকিলেও প্রেততত্ত্বের ন্যায় জুয়াচুরিপূর্ণ বিষয়ে ইঁহার মতামতের মূল্য কতটুকু তাহা পাঠক-পাঠিকাগণই বিচার করিবেন।

বড় বড় পণ্ডিতদিগকে প্রায়ই একটু সরল হইতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই স্বভাব-সিদ্ধ সরলতা-বশতঃ যিনি এরূপ করিলে প্রেত আসিবে না, এরূপ করিলে প্রেত আসিবে, ইত্যাদি ছলনায় নির্ব্বিচারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই প্রতারিত হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে অবস্থায় প্রেতেরা আসিতে পছন্দ করে না, জুয়াচুরি নিবারণ করিতে গিয়া যদি আমরা পরীক্ষা-গৃহে সেই অবস্থাই আনয়ন করি তবে তাহাদের আবির্ভাব হইবে না ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু যেরূপ পরীক্ষায় স্বভাবতঃই জুয়াচুরি চলিবার সুযোগ অল্প, সেরূপ পরীক্ষায় প্রেতের অরুচিকর কোন সতর্কতা অবলম্বন না করিলেও যে প্রেতের সাড়া পাওয়া যায় না, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন নহে। পরলোকে গিয়াও ইহকালীন বন্ধুবান্ধবের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করা যায় ইহা অবিসম্বাদীরূপে প্রমাণ করিয়া অবিশ্বাসী-নরনারীর সন্দেহের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন এই ভরসায় প্রেততত্ত্ব-বিশ্বাসীরা নিজেরাই যে সকল অগ্নি-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ফলাফল সহ তাহারই একটি পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

"Human Personality and its Survival of Bodily Death" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত মায়ার্স সাহেব (F. W. H Myers) একটি বিশেষ বার্ত্তা-সম্বলিত একখানি খাম সার অলিভার লজের নিকট রাখিয়াছিলেন। কথা ছিল মৃত্যুর পর মায়ার্স সাহেবের প্রেত খামের ভিতর লিখিত বার্ত্তাটি কোনও একজন প্রেতবার্ত্তাগ্রাহীর সাহায্যে প্রকাশ করিয়া জগদ্বাসীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবেন। ইহার দশ বৎসর পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী মায়ার্স সাহেবের মৃত্যু হয়। পার্থিব-জীবনের বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার প্রেতকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ফেব্রুয়ারী মাসে মিসেস্ টম্পসন্ (Mrs. Thompson) নাম্নী একজন প্রেতবার্ত্তাগ্রাহীর সাহায্যে তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হয়। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি এপ্রিল মাসে আসিয়া আবার সাক্ষাৎ করিবেন বলায় সার অলিভার লজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি কি তখন খামের ভিতর যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া শুনাইবেন?" উত্তরে তিনি বলেন, "কি খাম?" "What envelope?" এই "কি খাম?" কথাটি যে মায়ার্স সাহেবের প্রেতের নহে, মায়ার্স সাহেবের পার্থিব-জীবনই কি তাহার সাক্ষ্য দেয় না?

ইহার প্রায় চারি বৎসর পর প্রেতবার্ত্তাগ্রাহী মিসেস্ ভেরেল (Mrs. Verral) ঘোষণা করেন যে খামের ভিতর লিখিত বার্ত্তাটি বিদেহী মায়ার্স তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। অবিলম্বে লণ্ডনের ২০নং হেনোভার স্কোয়ারস্থিত আধ্যাত্মিক-অনুসন্ধান-সমিতির গৃহে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সার অলিভার লজ মায়ার্স প্রদত্ত খামখানা ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া আনিয়া সভায় উপস্থিত করেন; কি হয় না হয় জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। মিসেস্ ভেরেল এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কত দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ গৃহে, কত কত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে, আশার সঞ্চার হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। অধিকন্তু সন্দেহবাদীদের সন্দেহ অপসারিত হইত, অবিশ্বাসীরা লজ্জায় অধোবদন হইতেন। কিন্তু সার অলিভার লজ্ নিজেই লিখিয়াছেন,—

"খাম খোলা হইলে দেখা গেল, খামের বার্ত্তা বলিয়া মিসেস্ ভেরেল যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, খামের প্রকৃত বার্ত্তার সহিত তাহার কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই।"*

বস্তুতঃ যেরূপ প্রমাণের সাহায্যে পরলোকের অস্তিত্ব অবিসম্বাদীরূপে প্রমাণিত হইতে পারে, সেরূপ প্রমাণ কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই। যে সকল পরীক্ষায় জুয়াচুরি চলিতে পারে, শুধু সেই সকল পরীক্ষাতেই প্রেতের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে সকল পরীক্ষায় জুয়াচুরি চলিতে পারে না, বা জুয়াচুরি চলিবার সুযোগ অল্প, সেই সকল পরীক্ষায় প্রেত যে নাই, বা থাকিলেও তাহার সাড়া দিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

আবহমানকাল হইতে জন্ম-মৃত্যুর রহস্যোদ্ঘাটনের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। মানবজাতির বয়স ব্রহ্মার হিসাবে অল্প হইলেও তাহাদের নিজেদের হিসাবে নিতান্ত অল্প হয় নাই। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে মানব এখনও "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" চার্ব্বাক বলিয়া গিয়াছেন,—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" কে বলিতে পারে যে তাঁহার বাণীই অভ্রান্ত নহে?

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী

* The Survival of Man.

বিবিধ সংগ্রহ

শ্রীচিত্রগুপ্ত

দ্বিতীয় রবিনসন্ ক্রুশো

শ্রীযুক্ত এনড্রু সোয়ান্ তিনবছর আগে অষ্ট্রেলিয়া থেকে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। সমুদ্রে যেতে যেতে হঠাৎ জাহাজে আগুন লেগে গেল, সহস্র চেষ্টাতেও সে আগুন নির্ব্বাপিত হ'ল না, তারপর সমস্ত যাত্রীশুদ্ধ জাহাজটি সমুদ্রের অতলতলে গেল তলিয়ে। অদৃষ্টের জোরে মাত্র পাঁচটি লোক কোনক্রমে বেঁচে গেছলো। দুটি নাবিক, একটি কেবিন-বয়, একটি মিস্ত্রি আর এনড্রু সোয়ান্ নিজে, অজ্ঞান অবস্থায় জাহাজের একটি ভাঙা পাটাতনে শুয়ে ভাস্তে ভাস্তে এক নির্জ্জন দ্বীপে এসে পৌঁছলেন। দ্বীপটির নাম সেণ্ট্ শ্রীষ্টাবেল্। তিন বৎসর এই জনহীন দ্বীপে তাঁদের নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করতে হ'য়েছিল, মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ফরাসী কাপ্তেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় আবার সকলে দেশে ফিরে আসতে পেরেছেন। সোয়ান্ সাহেব তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ত্তমানে অনেক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে জানিয়েছেন। তাঁর বিবরণ যেমনি চমৎকার তেমনি কৌতুহলোদ্দীপক। তিনি বলেন, তিনবৎসর আমাদের যে কি অবস্থায় কেটেছে তা' অতি চমৎকার ক'রে সকলকে ব'ললেও সে অসহ্য দুঃখের অনুভূতি কারুরই হবেনা। জাহাজের আগুন যখন নিবলো না তখন মৃত্যুকেই নিশ্চিত জেনে আমরা কজন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, তারপর আর কারুরই জ্ঞান ছিলনা। জ্ঞান হ'লে দেখলুম আমরা মাত্র পাঁচজন এক জনহীন দ্বীপের বালুচরে শুয়ে। দূরে একটা কাঠের পাটাতন ভাসছে। আমরা যে মরিনি এই আনন্দে ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ জানিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই করুণাময়ের উদ্দেশে প্রার্থনা ক'রতে বসলুম। সে প্রার্থনা যে কী গভীর, কী আকুলতাভরা তা' যারা দুস্তর বিপদ্ সমুদ্রের মাঝে পড়েছে তারাই শুধু অনুভব ক'রতে পারে। তারপর আমরা দ্বীপের খানিকটা দূর ঘুরে এসে দেখলুম কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। গাছগুলি ফলে ভরা—কিন্তু একবিন্দু জল কোথাও পাবার জো নেই। অথচ তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মনে হল তৃষিত চাতকের মতই বোধ হয় বুকফেটে আমাদের মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিতে হবে। সে কী দারুণ কষ্ট! একবিন্দু জলের জন্য ভগবানকে আমরা সারাদিন সারারাত ডেকেছি, কেবল ব'লেছি হে ভগবান্ এইভাবে যদি আমাদের মৃত্যু দেবে তবে করুণা ক'রে আমাদের বাঁচবার সুযোগ দিলে কেন? আমাদের সেই কাতর প্রার্থনা বোধ হয় তাঁর চরণে পৌঁছেছিল, হঠাৎ ভোরের আলো যখন সবেমাত্র ফুটে উঠ্ছে তখন দেখি আমাদের জাহাজের ভাঁড়ার ঘরটি ভাস্তে ভাস্তে কূলের দিকে এগিয়ে আস্ছে। তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে কোনক্রমে সেটিকে আমরা তীরের ওপর নিয়ে এলুম। তার ভিতরে দেখি অনেক গলা বিস্কুট, সোডা লেমনেডের জলভরা বোতল রয়েছে। তাড়াতাড়ি আমরা সেই জল খেয়ে তখনকার মত তৃষ্ণা দূর করলুম। মনে হ'ল ভগবান আমাদের দুঃখের সাথী হ'য়ে রয়েছেন। তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেল। চারিধার থেকে ডালপালা কাঠ কাঠ্‌রা নিয়ে এসে আমরা একটি ছোট্ট কুটীর তৈরী ক'রে অপর জাহাজের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম—কিন্তু একটি জাহাজকেও সেখান থেকে কোনদিন দেখা গেলনা। এদিকে সোডা লেমনেডের জল ফুরিয়ে এল, অথচ মাইলের পর মাইল ঘুরেও তার একবিন্দু জলের সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার সঙ্গীরা জাহাজের খালাসী, তাদের সঙ্গে বাস করাও বড় কষ্টকর, দিবারাত্র অশ্লীল কথা তাদের মুখে, আর আর ছোট্ট কেবিন বয়টিকে বর্ব্বর ভাবে প্রহার করা তাদের ব্যবসায়ের মত হ'য়ে উঠ্‌লো

ছেলেটি ফাই ফরমাস্ খাটতে খাটতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়তো, একদিন আমি সেজন্য তীব্র প্রতিবাদ ক'রে ওঠাতে তারা সাম্‌লে গেল। কারণ আমাকে সকলেই একটু সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতো। এইভাবে দিন কাটে। একদিন আমাদেরই একটি সঙ্গী নাবিক হঠাৎ একটি ঝরণার সন্ধান পেলে। সেখান থেকে ফিরে এসে কি আহ্লাদ! প্রথমে তো সে খানিকটা নাচলে' তারপর কথাবার্ত্তা না ক'য়ে সে ইসারা ক'রে তার পিছু পিছু আমাদের যেতে অনুরোধ ক'রলে—আমরা কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ ঝরণার ঝঙ্কার শুনে আনন্দে তারই সঙ্গে নাচতে আরম্ভ ক'রলুম। সেইখানেই আবার নতুন ক'রে কুটীর তৈরী করা হ'ল। এতদিন ফল খেয়ে কাটানো হ'য়েছে কিন্তু রান্নার ব্যবস্থা না ক'রলে আর চলে না; অথচ আগুন যে কি ভাবে পাওয়া যাবে তাতো আমরা ভেবে উঠ্‌তেই পারলুম না। শেষে অনেক কষ্টে কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানো হ'ল এবং তিন বছর আমরা দিবারাত্র পালা ক'রে সেই আগুনে ইন্ধন দিয়ে এসেচি। আমাদের কুটীর থেকে সেই আগুনের ধোঁয়া উঠতে দেখে এক ফরাসী কাপ্তেন ওখানে যান এবং আমাদের উদ্ধার করেন। আমাদের ময়লা পোষাক, একমুখ গোঁফ দাড়ি, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া চুল দেখে প্রথমে তিনি রাক্ষস ভেবেছিলেন, তারপর আমাদের আসল পরিচয় পেয়ে খুবই যত্ন সহকারে দেশে ফিরিয়ে আনেন। এই নির্জ্জন দ্বীপে বোধ হয় আমাদেরই মত কোন হতভাগ্য ভাস্‌তে ভাস্‌তে একদিন এসেছিল, কারণ আমরা ফিরে আসবার সময় একটি মানুষের কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে দেখতে পাই। তাকে সমাধিস্থ ক'রে যখন ফিরে আসি আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের পিছন পিছন তখন একটা সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি যেন ভেসে আসছে শুন্‌তে পেলুম—জানিনা সেটা মনের ভুল কিনা!—এইভাবে বেঁচে আমার ধারণা হ'য়েছে, যে-মানুষ মৃত্যুকে অতিরিক্ত ভয় করে সে মূঢ় ছাড়া আর কিছু নয়। মৃত্যুকে সমাগত দেখেও সে যেন ভয়ে তার কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত না হয়—তাহ'লেই সেই ভয়ঙ্করকে সে নিশ্চিত পরাজিত ক'রতে পারবে।

এস্কিমোদের কথা ঃ—

কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ জেমস্ পিঙ্কার একটি দল গঠন ক'রে উত্তর মেরু অভিযান ক'রেছিলেন। পিঙ্কার সাহেব বলেন যে বরফের মধ্যে চ'লতে চ'লতে একদিন পথ হারিয়ে ফেললুম—আমার সঙ্গীদের কাউকে কোনদিকে দেখতে পেলুম না, সন্ধ্যা হ'য়ে এল, কুয়াসায় তখন চতুর্দ্দিক আবৃত হ'য়ে গেছে। চারিধারে শুধু বরফ আর বরফ, এই তরু-হীন, আশ্রয়হীন দেশে মৃত্যুর ভয়াবহ মূর্ত্তিই তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। শীতের কন্‌কনে হাওয়ায় গায়ের শিরাগুলো পর্য্যন্ত যেন ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে ব'লে মনে হ'তে লাগলো। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বরফের চাঁই আমার পায়ের ওপর কোথা থেকে ছিটকে এসে প'ড়লো আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে গেলুম। কতক্ষণ অজ্ঞান হ'য়ে ছিলুম জানিনা যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি উপকথার রাজ-কন্যার মত সুন্দরী এক তরুণী আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করছে। গায়ে ভালুকের মত পোষাক, আমার ডবল লম্বা, অতি সুগঠিত অবয়ব কি সুন্দরই না তাকে দেখতে। হঠাৎ সে আমাকে তার কাঁধের ওপর তুলে নিলে, আজও পর্য্যন্ত এরকম শক্তি আমি কারুর দেখিনি, এতটুকু প্রয়াস তার লাগলোনা, স্বচ্ছন্দে আমাকে শিশুর মত কাঁধে ফেলে সেই দুর্গম বরফের রাজ্যের ওপর দিয়ে চ'লতে লাগলো, বিস্ময়ে আমি তখন কথা ব'লতে পারছিলুম না, ভয়ও যে না ক'রছিল তা' নয় তবে আমি অসীম কৌতূহলী হ'য়ে চুপ ক'রেই রইলুম। কিছুদূর গিয়ে একটা কুটীরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সে আমায় তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আগুনের তাপ দিতে লাগলো। ঠিক মা যেমন তার শিশু সন্তানকে সেবা করে ঠিক তেমনি ক'রেই সে আমার সেবা ক'রেছিল—জগতের এই অজ্ঞাত প্রদেশে এমন সেবা-পরায়ণা রমণী যে থাক্‌তে পারে তা আমার পক্ষে কল্পনা করাও অসাধ্য ছিল, সেদিন এই অজ্ঞাতা, অশিক্ষিতা মেয়েটি বিশ্বের সর্ব্বজাতির, সর্ব্বকালের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়ে তুলেছিল। তারপরদিন সকালে আমায় জাহাজের কাছে পৌছে দিয়ে এল—বন্ধুরা আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ ক'রেছিলেন সহসা আমাকে দেখে তাঁরা উল্লসিত

হ'য়ে উঠ্‌লেন। সঙ্গের মেয়েটার পরিচয় পেয়ে তাকে তাঁরা সানন্দে কতকগুলি ভাল জিনিষ উপহার দিতে গেলেন, সে নিলেনা শুধু একটু হেসে ঘাড় নাড়লে। অর্থাৎ যেন উপকারের বিনিময়ে সে পুরস্কারের আশা করে না। এই এস্কিমো জাতির সম্বন্ধে আর একজন অভিযানকারী এক বিবরণ দিয়েছেন এই যে এরা পুরুষ ও নারী উভয়েই ভীষণ সাহসী হয়। শীল শীকার করা এদের পেশা। মেয়েদের সম্মান এরা সকলের চেয়ে বড় মনে করে। যদি কোন বিদেশী পুরুষ এদের সঙ্গে দেখা ক'রতে যায় তাহ'লে প্রথমেই তারা কতকগুলি অনুষ্ঠান করে। পুরুষরা দল বেঁধে পিছনে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকে তাদের সামনে মেয়ের দল ভীষণভাবে ছোরা খেলতে আরম্ভ করে। অতিথিকে তারপর সেইভাবে মেয়েরা প্রদক্ষিণ করে, এইভাবে প্রদক্ষিণ ক'রলে উপদেবতার উপদ্রব থেকে তারা মুক্ত থাকবে—এই তাদের বিশ্বাস। শুধু তারা নয় সমাগত অতিথিরও নাকি তা হ'লে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। এদের জাতিকে প্রকৃতপক্ষে মেয়েরাই শাসন ক'রছে। ঠিক পুরুষদের মত তাদের পোষাক, আর পরিশ্রমসাপেক্ষ যত রকম কঠিন কাজ আছে তা সবই মেয়েরা ক'রে থাকে। অতি বুদ্ধিমান্, ধাৰ্ম্মিক ও শান্ত এই জাতি কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে এদের চেয়ে দুর্দ্দান্ত ও ভয়ঙ্কর জাত বোধহয় বর্ত্তমান পৃথিবীতে নেই। বিশ্বাসঘাতককে তারা কোনমতে ক্ষমা করে না, ক্ষমাহীন অকরুণ নির্ম্মমতা তখন তাদের সাপের মত ক্রূর ক'রে তোলে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে এস্কিমো জাতির একটী সুন্দরী যুবতীকে ওখানকারই আর একটি জাতির যুবক বিবাহ ক'রেছিল। বিবাহিতা সুন্দরীর অক্লান্ত সেবা ও ভালবাসার তুলনা ছিল না। স্বামীকে সত্যকারের নিষ্ঠাসহকারে সে পূজা ক'রতো কিন্তু হতভাগ্য স্বামী গোপনে আর একটি যুবতীর কাছে যাতায়াত সুরু ক'রলে। স্ত্রীর কানে সে কথাটা ঠিক গিয়ে উঠ্‌লো, মুখে কিছুই ব'ললে না—যেন কিছুই জানে না এমনি ভাব। একদিন গভীর নিশীথে সুপ্ত স্বামীকে তার তিনটি বন্ধুর সাহায্যে হাত পা বেঁধে, শয্যা থেকে বরফের মাঠে টেনে নিয়ে এল। সেইখানে তাকে খুঁটি পুঁতে জোর ক'রে বেঁধে নির্ম্মম অত্যাচার সুরু ক'রলে। তিনদিন তিনরাত্রি মৃত্যুর সঙ্গে চ'ল্‌লো তার লড়াই, কত মিনতি, কত কাতর প্রার্থনা—"শুধু ক্রীতদাসের মত বেঁচে থাকবার অধিকারটুকু দাও" ব'লে সকরুণ ক্রন্দন—সমস্ত বৃথা। ব্যর্থতার মধ্যে অভিশপ্ত কুকুরের মত তাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রতে হল, তাদের অট্টহাস্যে সেখানকার আকাশ বাতাস ভ'রে উঠ্‌লো। বহুদিন পরে গ্রামবাসীরা খোঁজ ক'রতে গিয়ে দেখ্‌লে সাদা বরফের ওপর শুধু একটা শ্বেত কঙ্কাল যেন নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় আৰ্ত্ত হ'য়ে মাটিতে লুটোচ্চে।

মেয়েরা বিবাহে অসুখী কেন?

জার্ম্মাণীতে বিবাহ-বিচ্ছেদ-পীড়িতা মেয়েদের রক্ষার জন্য একটি জাতীয় অধিবেশন বসে। তাতে আলোচনা ক'রে দেখা যায় যে শতকরা ৯০জন মেয়ে বিবাহের ফলে অসুখী। সেই আলোচনা বৈঠকে এর কারণও নির্দ্ধারিত হ'য়েছে। সকলের সম্মিলিত মত এই যে মেয়েরা সাধারণতঃ দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে দুৰ্ব্বল এবং তা'র স্নায়বিক দৌৰ্ব্বল্য সাংসারিক কাজের অত্যধিক চাপে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং এই নিয়েই স্বামীদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সামান্য কারণে তারা ঝগড়া করে, ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। যুদ্ধের পর থেকেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা ওদেশে খুব বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু ১৫ বছর আগে সামান্য কারণে বিবাহবিচ্ছেদ করা স্বামী স্ত্রীর সামাজিক মর্য্যাদাকে রীতিমত ক্ষুণ্ণ ক'রতো।

বিমানপোতের অপব্যবহার

উড়োজাহাজ আবিষ্কৃত হ'য়ে যেমন সাধারণের উপকার হ'য়েছে তেমনি এর দ্বারা অপকারও কম হচ্ছে না। যখনই কোন নতুন জিনিষ আবিষ্কৃত হয় তখন সাধু লোকেরা যেমন তাতে সুখী হ'য়ে ওঠেন, তেমনি কিম্বা তার চেয়ে বেশী খুসী হ'য়ে ওঠে, দেশের চোর ডাকাতের দল। মোটরকার আবিষ্কারে যেমন লোকের গতায়াত দ্রুত হ'য়ে উঠ্‌লো, তেমনি চোর ডাকাতেরাও তার সুযোগ নিয়ে চুরি চামারি করে তাড়াতাড়ি পালাবার বেশ বন্দোবস্ত ক'রে নিলে।

এখন উড়োজাহাজ হ'য়েছে, সেই জাহাজে চেপে নানা রকম দুষ্কার্য্যের অসাধারণ সুযোগ এরা প্রতিদিনই নিয়ে চলেছে। সেইজন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড উড়োজাহাজের চোর ধরবার জন্য নতুন ব্যবস্থা ক'রছেন। উড়োজাহাজে চেপে চোর ডাকাতরা কি ভাবে মালপত্র সরায় তার এক কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ খবরের কাগজে বেরিয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলেতের এক প্রকাণ্ড কারখানা থেকে অতি অদ্ভুত ভাবে চুরি যেত। গভীর রাত্রে উড়োজাহাজে চেপে চোরেরা রাত্রে কারখানায় প্যারাসুটের সাহায্যে নেমে প'ড়তো, তারপর ভাল ভাল জিনিষপত্র সরিয়ে একটু দূরের মাঠে উড়োজাহাজে চেপে পালাতো। পুলিশ আসবার বহু পূর্ব্বে এসব কার্য্য তারা সম্পন্ন করে ফেলতো। কারখানার মালিকরা বা পুলিশ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না যে কোন দিক দিয়ে চোরেরা আসে. তারপর ছাদের ওপর থেকে কারখানার একটা ফটো তুলে নিতে গিয়ে পুলিশ দেখলে যে ক্যামেরাতে কতকগুলি আশ্চর্য্য চিহ্ন উঠেছে যেগুলি সাদা চোখে ধরতে পারা যায় না। সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে তারা দেখে যে মাঠের মধ্যে উড়োজাহাজের চাকার দাগ, তখনই বুঝতে বাকী রইল না কি ভাবে চুরিটা হচ্ছে। কিছুদিন লক্ষ্য রেখেই পুলিশ আসামীদের ধ'রে ফেল্লে। আজকাল প্রায়ই ওদেশে এইভাবে চুরি হচ্ছে। শুল্ক বিভাগের লোকদের ফাঁকি দিয়ে চোরেরা বিমানপোতের মধ্যে লুকিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা রকম জিনিষ আমদানি ক'রতে সুরু ক'রেছে এবং কখন যে কোন মাঠে তারা নামে তা' ধরাও পুলিশের পক্ষে মুস্কিল। এতদিন জলপথে পুলিশের ও শুল্কবিভাগের লোকেদের সতর্ক চক্ষু এড়িয়ে যে কার্য্য সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল তা' উড়োজাহাজের কল্যাণে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হচ্ছে। এই কারণেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আকাশপথ পাহারা দেবার জন্য বিপুল আয়োজন কর্চ্ছেন।

নারী জলদস্যু—

চীন সমুদ্রের বুকের ওপর একদল নারী জলদস্যুর উৎপাত সেখানকার লোকের প্রাণে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। এই ভীষণ নারী দস্যুদলের অধিনেত্রীর নাম হচ্ছে ম্যাডাম লী। এর সম্পর্কে যে সব বিবরণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে তা' যেমন ভয়াবহ তেমনি চমকপ্রদ। শোনা যায় যে এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটির চেহারার সৌকুমার্য্যের সঙ্গে এর কার্য্যকলাপের আদৌ মিল নেই। এর সুগঠিত দেহ-যষ্টির অনুপম রূপ-লাবণ্য দেখলে, যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পী একে তাঁর শিল্পের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চাইবেন; অথচ বিধাতার এই অপরূপ দানটির সাহায্যে, লোককে প্রীত করা দূরে থাক, এ দস্যুদলের অধিনেত্রী হয়ে লোকের প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বেড়ানোটাকেই বেশী পছন্দ করে নিয়েছে।

মিস্ মেরিয়ান্ মূর ব'লে একটী ইংরাজ মহিলা সম্প্রতি কোচিন্ চায়নার সমুদ্রোপকূলে এই দস্যুদলের হাতে পড়্তে পড়্তে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি এদের সম্পর্কে যে সব বিবরণ প্রকাশ করেছেন তার সারমর্ম্ম দিলাম। তিনি বলেন যে—"এ মেয়েটি আগে এরকম জলদস্যু ছিলো না। কিন্তু একবার তার ভাবীস্বামী এক জলদস্যুর হাতে পড়েন এবং তিনি মুক্তিপণ দিতে না পারায় সেই দস্যুদল তাঁকে হত্যা করে।" এই ঘটনার পর থেকে ম্যাডাম্ লীর অদ্ভুত মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে। এবং সেই থেকে তার হৃদয় সমস্ত মানুষ জাতির বিরুদ্ধেই কঠোর হ'য়ে ওঠে, তারপরই সে একদল অনুবর্ত্তিনীকে নিয়ে এই দস্যুদল গঠন করে।

এখন তার প্রধান কাজ হচ্ছে সমুদ্রে বিচরণশীল ধনী অভিযাত্রীদের বন্দী করে তাঁদের কাছ থেকে মুক্তি-পণ আদায় করা। কোন নৌকোকে আক্রমণ করবার সময় ম্যাডাম লীকে বহুমূল্য রত্নখচিত এক খোলা তলোয়ার হাতে দৃপ্ত মূর্ত্তিতে সকলের আগে দাঁড়িয়ে থাক্তে দেখা যায়। সে সময় তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে নাকি কেউই নতি স্বীকার না করে পারে না। তার সঙ্গিনীদের মধ্যে অনেকে ব্রিচেশ পরে এবং শীকারীদের লম্বা লম্বা বুট জুতা পায়ে দেয়। হংকংএ এই রকম প্রবাদ যে এই দস্যুদল নাকি বন্দীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে।

এই সম্পর্কে আর একটি গল্পও শোনা যায় যে একবার এদের ধৃত এক আমেরিকান যুবকবন্দীর মুখের সঙ্গে ম্যাডাম লীর নিহত প্রিয়তমের মুখের সৌসাদৃশ্য থাকায় সে

অত্যন্ত সহৃদয় আতিথেয়তার দ্বারা তাঁর আপ্যায়ন ক'রে তাকে মুক্তি দেয়।

এই দুর্দ্ধর্ষ নারী-দস্যুকে কিছুতে আয়ত্বে আন্‌তে না পেরে ওখানকার গভর্ণমেন্ট অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হয় নি। তাকে ধরবার সমস্ত রকম প্রচেষ্টাকেই অবলীলাক্রমে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে সে আজও পর্য্যন্ত সমুদ্রের বুকে তার যথেচ্ছাচারকে অপ্রতিহত রেখেছে।

মেরু অভিযানকারীদের কাহিনী

সুবিখ্যাত হাড্‌সন, বে কোম্পানীর কয়েকজন নাবিক ক্যাপ্টেন কর্ণওয়ালের অধিনায়কত্বে কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর-মেরু অভিযানে রওনা হ'য়েছিলেন। আজ কয়েক সপ্তাহ অতীত হ'য়ে গেল তাঁদের আর কোন উদ্দেশই পাওয়া যাচ্ছে না। উত্তরমেরু সমুদ্রের শেষ সীমানা আল্‌সাকায় এসে তাঁরা কঠিন বরফের মধ্যে আটকা পড়েছেন। ৪ই জানুয়ারী মেরুযাত্রীরা বেতারযোগে সংবাদ দেন যে—উত্তরমেরু সমুদ্রের জল বরফে রূপান্তরিত হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে এবং সমস্ত প্রদেশে এত কন্‌কনে শীতের হাওয়া বইছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অতিরিক্ত ঠাণ্ডা সহ্য করা একরকম অসম্ভব। আমরা জাহাজ থেকে বরফের ওপর নেমে তাঁবু খাটিয়েছি, বেতারের সরঞ্জামও সব আনা হ'য়েছে কিন্তু কিছুদিন থেকে জাহাজটিকে আর আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি না, হয়তো অপর কোন জায়গায় ভেসে গিয়েছে কিম্বা বরফের মধ্যে সমাহিত হ'য়ে গেছে। আমাদের খাবার প্রায় ফুরিয়ে এল, অবিলম্বে সাহায্যদান না ক'রলে আমরা দশজনই বোধহয় মৃত্যুমুখে পড়বো—তাছাড়া আমাদের বেতারের ব্যাটারিগুলির শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে আস্‌ছে, সম্ভবতঃ এই আমাদের শেষ খবর।"

তারপর থেকে আর কোন সংবাদই আসেনি, ফেব্রুয়ারী মাস না কেটে গেলে তাদের কাছে কোন সাহায্য পাঠানো সম্ভব এমন কি উড়োজাহাজেও এই সময় সেখানে যেতে পারবে না। হাড্‌সন বে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ব'লছেন এই ক'মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে যদি তাঁরা জয়ী হ'তে পারেন তবেই আবার তাঁদের ফিরে আসা সম্ভব, তা' না হ'লে এই চির-তুষারের রাজ্যে তাঁরা চিরদিনের মত নীরব হ'য়ে যেতে বাধ্য হবেন। কোন উপায় নেই তাঁদের বাঁচাবার—আমরা বুঝ্‌তে পারছি রাক্ষসীর মত নির্দ্দয়ভাবে বরফের রাণী তাঁদের পিষে ফেল্‌তে চাচ্ছে কিন্তু আমরাও নিরুপায়। জাহাজে দশহাজার পাউণ্ড মূল্যের পশম ছিল,—জন্তু জানোয়ারদের লোম থেকে তাঁরা তা সংগ্রহ ক'রেছেন কিন্তু ভবিষ্যতে তা' যদি না পাওয়া যায় তা'হ'লে কোম্পানীর পক্ষে ক্ষতিও বড় কম হবে না। এই নির্ব্বাসিত মেরুযাত্রীর দল এখন ভগবানের কাছে বসন্তের হাওয়া পাবার জন্য বোধ হয় ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা ক'রছেন—তাদের সামনে পাঁচশো মাইল শুধু ঠাণ্ডা বরফ জমাট হ'য়ে আছে; প্রতিদিন এ যে কী উপায়হীনের মত জীবন যাপন তা' অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া আর কারুর পক্ষে অনুভব করাও অসম্ভব ব'লে মনে হয়।

আইবুড়োদের বিপদ

স্কটল্যাণ্ডের আইবুড়ো ছেলেদের এ বছরটা খুব বিপদের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হবে। প্রায় সাতশো বছর আগে স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট্ একটা আইন পাশ করেন এই যে প্রত্যেক লিপ্ ইয়ারে অর্থাৎ তিনবছর অন্তর যে বছর ফেব্রুয়ারী মাসের ১ দিন বাড়ে সেই বছরের মধ্যে, যে কোন মেয়ে, সে কালো হোক, কাণা হোক্, খোঁড়া হোক, বোঁচা হোক, যদি কোন আইবুড়ো ছেলেকে বিয়ে ক'রতে চায় তাহ'লে তার পাণিগ্রহণ ক'রতেই হবে। না ক'রলে তার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা র'য়েছে। আজ পর্য্যন্ত এই আইনের অদল বদল হয়নি। সেই জন্য স্কটল্যাণ্ডের আইবুড়ো ছেলেরা লিপ্ ইয়ারকে বড্ড ভয় ক'রে এবং প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে অসুন্দর মেয়েদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। শুধু স্কটল্যাণ্ডেই এই প্রথাটি সীমাবদ্ধ নয় ইংলণ্ডের দক্ষিণপ্রান্তের অধিবাসীরাও এখনও এটা কিছু কিছু মানে। ফরাসীদেশে ২৯শে ফেব্রুয়ারী লিপ্ ইয়ার উৎসবের দিন কোন অবিবাহিত যুবকের পক্ষে কোন অবিবাহিতা কন্যার পাণিপ্রত্যাখ্যান করা অতি গর্হিত কার্য্য ব'লে অনেকে মনে ক'রে থাকেন।

আমাদের দেশে এ নিয়মের যে কতখানি প্রয়োজনীয়তা আছে তা' কন্যাদায়গ্রস্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই বোধ হয় বুঝতে পারছেন।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী

(ক) বর্ত্তমানে বিজ্ঞান অঘটন ঘটাচ্ছে; কিন্তু বিশ্বাস হয় কি যে সামান্য সমুদ্রের বালি থেকে সোনা তৈরী করা যাবে? প্যারিসের এক বৈজ্ঞানিক ব'লছেন যে তিনি তাই ক'রেছেন এবং ভবিষ্যতে তিনি সমুদ্রের বালি থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ক'রে দিতে পারবেন। বহুদিন থেকে বহু বৈজ্ঞানিক পরশ পাথরের সন্ধানে ফিরেছেন কিন্তু তাঁদের সারা জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'য়েছে, লোকে তাঁদের পাগল ব'লে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু সেই পাগলের দলই আজ পৃথিবীর যে উপকার ক'রেছেন তার মূল্য কে দেবে? তাঁদেরই দলের একজন আজ সত্যই মাটী থেকে সোনা তৈরী ক'রছেন। ultra-violet-rays বা নবরশ্মির সাহায্যে তিনি এই অঘটন ঘটাতে সক্ষম হ'য়েছেন। জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলেন যে তিনিও এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। প্রথমে এগুলি নিকেলে পরিবর্ত্তিত হ'ল তারপর পারার সাহায্যে সামান্য বালি থেকে প্রায় ১ আউন্স্ সোনার সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য সমস্ত উপায় খুব ভাল ভাবে জানতে পারা যাচ্ছে না তবে এ যে সম্ভব তা' অস্বীকার করা চলে না।

(খ) ব্রিটীশ মেট্রোপলিটন ভাইকার্ কোম্পানী একরকম নতুন ধাতু তৈরী ক'রেছেন যার চেয়ে শক্ত, হাল্কা ও উপযোগী ধাতু এখন দুনিয়ার বাজারে নেই। এলুমিনিয়ামের চেয়ে এই ধাতু হাল্কা অথচ পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে এর দ্বারা জাহাজ তৈরী ক'রতে পারা যাবে। খুব মজবুত এই ধাতু অথচ সুবিধে এই যে একে যেরকম ইচ্ছে বেঁকিয়ে, চুরিয়ে এমন কি সহজ অবস্থায় মাদুরের মত গুটিয়ে রেখে দিতে পারা যায়। মেট্রোপলিটন ভাইকার কোম্পানী এই ধাতু দিয়ে ব্রিটীশ নৌ-সেনা বিভাগের একটি জাহাজ তৈরী ক'রবার অর্ডার পেয়েছেন। এই ধাতুর দাম অপেক্ষাকৃত সকল ধাতুর চেয়ে যাতে কম হয় তারও চেষ্টা চ'লছে তবে বর্ত্তমানে পেতলের দামের চেয়ে এই ধাতু সস্তায় পাওয়া যায়।

প্রাচীন দেশ আবিষ্কার

পারস্যের ইরাক্ প্রদেশে জগতের একটি সুপ্রাচীন নগরী এতদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিমগ্ন ছিল। সম্প্রতি কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতের অক্লান্ত চেষ্টায় এই নগরী স্তূপের গর্ভ থেকে লোকচক্ষুর গোচরে এসেছে। পারস্যের সুপ্রাচীন কিশের ধারে একসময় এই সমস্ত নগরী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে এই জনপদগুলি গ'ড়ে উঠেছিল, পরে কালের প্রভাবে তারা ধ্বংসের কবলে গিয়ে পড়েছে। মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে দেখা গেছে যে দুটি সহর মাটীর স্তরে স্তরে স্থাপিত। তার নীচে খুঁজে প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের কঙ্কাল পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনেক কিছু নতুন ঐতিহাসিক তথ্য পেয়েছেন ব'লে প্রকাশ। মাটীর তলায় এই লুপ্ত নগরীদ্বয়ের প্রাসাদে বহুমূল্য রত্ন, হীরে, জহরৎ ও বিচিত্র আসবাব পত্র পাওয়া গেছে ব'লে শোনা যাচ্ছে।

বিচিত্র প্রশ্ন

আমেরিকার কোন এক সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈক অধ্যাপক সেদিন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি বিচিত্র প্রশ্ন উত্থাপিত ক'রেছিলেন। ক্লাসে অধ্যাপনা ক'রতে ক'রতে তিনি ব'ললেন, যে কেউ যদি তোমাদের ৩ লক্ষ টাকা দেয় সেইটে বেশী পছন্দ কর না সত্যকারের একজন দরদী প্রেমিক বা প্রেমিকাকে জীবনের সাথী করাটা বেশী সৌভাগ্যের বিষয় ব'লে ভাব। এই প্রশ্নের উত্তর তিনি লিখে দিতে বলেন। অধিকাংশ ছেলের কাগজ পরীক্ষা ক'রে তিনি দেখলেন যে সকলেই টাকাকে বেশী পছন্দ করে এবং শতকরা নিরেনব্বইজন মেয়ে টাকার চেয়ে প্রেমকেই মূল্যবান্ ব'লে মনে করে। এই প্রশ্নটির উত্তর বিলেতের জনসাধারণ কি ভাবে দেয় এবং কোনটা তারা বেশী পছন্দ করে তাই নিয়ে বিলেতের জনৈক সুবিখ্যাত খবরের কাগজের প্রতিনিধি অনেক বড় বড় ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা ক'রেছিলেন। আলোচনার ফলে তিনিও ঐ অধ্যাপকের মত সমান অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন।

লেখিকার সম্মান ঃ—

এরিশ মারিয়া রিমার্ক All Quiet on the Western Front লিখে সারা বিশ্বে যেভাবে সম্মানিত হ'য়েছেন "Not so quiet" এর লেখিকা শ্রীমতী হেলেন জেনা স্মিথও তেমনি সকলের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছেন। তাঁর বইটি এরই মধ্যে জার্মান, ফরাসী, স্পেনিস্, সুইডিস্ প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে এবং আমেরিকায় রীতিমত বিক্রী হ'য়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসীজাতি তাঁকে তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরস্কার 'সেভেরিন প্রাইজ' (Severine Prize) দিয়ে সম্মানিত ক'রেছেন। তাঁর বইটি টকির উপোযোগী ক'রে নিয়ে প্যারামাউণ্ট ফিল্ম কোম্পানী শীঘ্রই ছবি তুলবেন। রুথ্ চ্যাটারটন্ প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। আমেরিকায়, লণ্ডনে তাঁর বই নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত ক'রে অভিনয়ও করা হচ্ছে। এই বইটিতে যুদ্ধের অমানুষিকতা ও অসহ্য যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত অতি চমৎকার ভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তারই মাঝে সেবাপরায়ণা মেয়েরা কি ভাবে তাদের অসীম স্নেহ নিয়ে দাঁড়ায় তার যা বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা' সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ফরাসী দেশে এই সেভেরিণ পুরস্কার দেওয়া মাত্র ১৯৩০ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বছর ম্যাডাম্ কেপি 'যারা চলে গেছে' Men who have passed ব'লে একখানি বই লিখে এই সম্মান লাভ ক'রেছিলেন।

মৃতের চলাফেরা ঃ—

ভূতের অস্তিত্বে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করিনা কিন্তু ভূতকে ভয় ক'রে থাকি বোধ হয় শতকরা ৯৯ জন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকেরাই ভূতকে বিশ্বাস করেন এবং পৃথিবীর নানা জাতির লোকের মধ্যে ভূতকে প্রত্যক্ষ দেখেছে এমন লোকেরও সন্ধান অনেক পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের একটি হোটেলে ব'সে, এক আমেরিকান পর্য্যটক—তাঁর নাম মিঃ উইলিয়ম্ সিব্রুক্—এক অদ্ভুত ভৌতিক বিবরণী প্রকাশ করেছেন, যা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি বলেন, যে প্রকাশ্য দিবালোকে ঠিক মানুষেরই মত ভূতকে চলাফেরা ক'রতে আমি দেখেছি। সাহারা মরুভূমির শেষ প্রান্তে টিম্বাক্টু (Timbactoo) ব'লে একটা জায়গায় তিনি বহুদিন ছিলেন। শুধু ছিলেন না, একেবারে সেখানকার অধিবাসী হ'য়ে ৩০ বছর বাস ক'রেছেন এবং পরেও ক'রবেন। তিনি বলেন, দেশটা ভারী অদ্ভুত এবং লোকগুলোর চরিত্র তার চেয়েও বিস্ময়কর। সভ্যজগতের একটুও হাওয়া গিয়ে সেখানে পৌঁছয়নি,—এই দুর্দ্ধর্ষ অসভ্যজাতির সঙ্গে তিনি অনেক কষ্টে মিশে গেছেন। সেখানকারই একটি মেয়েকে তিনি বিয়ে ক'রেছেন এবং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গুটি তিরিশ সন্তানের এখন তিনি পিতা। ওখানকার ভাষাও খুব ভাল জানেন। তিনি বলেন যে ওখানে "হাইতি" ব'লে একটা জায়গায় কতকগুলি ভূত নামাবার ওস্তাদ লোক আছে তারা কবর থেকে মৃতের আত্মাকে তুলে এনে ঠিক মানুষের মত সকলকে দেখাতে পারে। একদিন তিনি দেখেন যে দিনের বেলা একটি লোক চ'লেছে, আর তার পেছনে নিঃশব্দে ছায়ার মত কতকগুলি জীব অনুধাবন ক'রছে—মানুষের মত দেখতে বটে, কিন্তু তারা যেন এ পৃথিবীর নয়; এ যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারতেন। চোখের পাতা একবারও প'ড়ছে না আর মুখগুলো অতি কদর্য্য। তিনি বল্লেন, এরপর অনেক ভূত এরকম ভাবে চলাফেরা ক'রছে দেখেছি এবং এরা কেন ভূত নামায় তাও জানি। এই সমস্ত প্রেতাত্মাদের দিয়ে এরা অনেক কুকার্য্য করিয়ে নেয়। শত্রু ধ্বংস করবার জন্য এদের এরা আহ্বান করে। এরা কথা কইতে পারেনা কিন্তু মুখে কষ্টেরভাব খুবই দেখতে পাওয়া যায়। কবরে গিয়েও যেন তারা শান্তি পায়নি এইটেই আমাদের খুব বেশী ক'রে মনে হয়। ভূতের আশ্চর্য্য বিবরণ ও এই অসভ্যজাতির নানারকম বর্ব্বর প্রথা ও ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ ক'রে তিনি খুব শিগ্‌গিরই ইংরিজিতে একটি বই লিখবেন।

থেকেও নেই

যাঁরা নেই, তাঁরাও যে থাক্‌তে পারেন এই কথাই এতক্ষণ বল্‌লাম। কিন্তু পৃথিবীতে সশরীরে সুস্থভাবে বেঁচে থেকেও যাঁদের কোন অস্তিত্বই নেই এইবার তাঁদের

কথা বল্‌বো। শ্রীমতী ইউজিনী জনৈক প্যারিস সহরের মেয়ে; ভূত নয়, জীবিত মানুষ, সুস্থ সবল, পূর্ণমানবত্বের কোন ক্রুটী তাঁর মধ্যে নেই। বেচারীর জন্মের সময়, বাপ্ মিনসিপ্যালটিতে জন্ম রেজিষ্টারী ক'রতে ভুলে গেছলেন। বয়স যখন যোল হ'ল সেই সময় রেজিষ্টারির একবার খোঁজ পড়ে, কারণ বিয়ের সময় দরকার; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা পাওয়া গেলনা। শ্রীমতীর আত্মীয়েরা গোলেমালে বিয়েটা চালিয়ে দেবার মতলব ক'রেছিলেন কিন্তু পুরুত মশায়রা ব'ল্লেন, আগে সাক্ষী সাবুদ দিয়ে ঠিক জন্মকাল ও স্থান নিরূপণ ক'রে রেজিষ্টারী কর। তারপর বিয়ে ক'রতে এস। তা' না হ'লে আমরা বুঝবো যে তুমি থেকেও নেই।"

ঠিক এই রকমের আর একটি ঘটনা ঐ প্যারিসেই ঘটেছে। ম্যাডাম্ জোলী ব'লে এক বিধবার জন্মকাল রেজিষ্টারী করা নেই তিনি এখন ৬টি সন্তানের জননী। তাঁর বাবা অবশ্য রেজিষ্টারী আফিসে ব'লে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানকার কর্ত্তা তিনি একদম তাঁর নাম লিখে নিতে ভুলে যান। ফলে এখন স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর টাকা কড়ি সব আটকে আছে; যে ভদ্রলোক তখনকার দিনে রেজিষ্টার ছিলেন তিনিও মারা গেছেন অতএব সাক্ষী অভাবে ম্যাডাম জোলী কিছুতেই তাঁর স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করতে পারেন না। কারণ ফরাসীদেশের আইন অনুসারে তিনি "থেকেও নেই।" বিয়ের সময় বোধ হয় কোন রকমে এড়িয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু এখন অবস্থা সঙ্গীন।

মস্কোর প্রধান গির্জ্জার শেষ পরিণতি

মস্কোর সুবিখ্যাত রিডিমার্ ক্যাথিড্রেলটিকে বলশেভিক্ সম্প্রদায় এতদিন পরে উড়িয়ে দিলে। ১৬ লক্ষ পাউণ্ড্ খরচ ক'রে এই সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্দিরটি তৈরী হয়েছিল মাত্র গত শতাব্দীতে। তরল বায়ুর চাপ দিয়ে যখন ক্যাথড্রেলটিকে তচ্‌নচ্ করা হচ্ছিল তখন হাজার হাজার রাশিয়ান দূরে দাঁড়িয়ে ধর্ম্মমন্দিরের শেষ পরিণতি দেখ্‌ছিল। যে সমস্ত বহুমূল্য পাথর এই মন্দিরে সন্নিবিষ্ট ছিল সেগুলিকে মিউজিয়মে রাখা হ'য়েছে। এই জায়গার ওপরেই শ্রমিকদের মন্দির গড়ে তোলা হ'বে বলে সোভিয়েট সরকার সঙ্কল্প ক'রেছেন।

বিয়ের দাম

মস্কোতে একটি সিল্কের মোজার দাম বর্ত্তমানে ৩০৲ কিন্তু বিয়ের দাম ৩৲ টাকা মাত্র। হ্যাট্, জুতো, বা অন্যান্য পোষাকের দর সবই পাউণ্ডের ওপর নির্ভর করে কিন্তু বিয়ে করতে গেলে তিন টাকার বেশী খরচ পড়ে না। ওখানকার রেজিষ্ট্রেশন অপিসে একবার যাওয়া আর দু' একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে ৩৲ টাকা ফেলে দিলেই বিবাহ চুকে যায়। অনেক সময় রেজিষ্ট্রেশন অফিসে না গেলেও চলে। স্বামী স্ত্রী হিসেবে একজন পুরুষ ও একজন নারী থাকলেই ওরা ধ'রে নেয় যে এরা বিবাহিত এবং বিবাহিতের সব সুবিধা ওরা পায়। সকলকেই কাজ ক'রতে হয় ব'লে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ সপ্তাহের মধ্যে খুব কমই হ'য়ে থাকে কারণ, একজনের যে সময় ছুটি অপরের সে সময় নাও ছুটি হ'তে পারে। ওদেশে আজকাল মেয়েরা ইঞ্জিন, ট্রাম চালানো থেকে পুলিশের কাজ অবধি সব কাজই করছেন।

মৃতের চালাকী

লুই ডুরাণ্ড্ প্যারিসের একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার। একদিন হঠাৎ তাঁর চাকরিটি চ'লে গিয়ে তিনি বড়ই কষ্টে পড়লেন। চারিধার থেকে দেনা করার ফলে দলে দলে পাওনাদাররা তাঁর বাড়ীতে হাজির হ'তে লাগলো, বাধ্য হ'য়ে বাড়ীঘরদোর বেচে কোন রকমে দেনা পরিশোধ ক'রলেন। তারপর ভাব্‌লেন এইবার এক অভিনব উপায়ে টাকা সংগ্রহ করা যাক্। তাঁর নিজের নামে এক মোটা টাকার ইন্সিওরেন্স ক'রে এসে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রলেন যে এবার মিছিমিছি মরা যাক্। স্ত্রীকে ব'ল্‌লেন তুমি পাড়া জানিয়ে কেঁদো আর সকলকে জানিয়ে দিও আমি নির্ঘাৎ মরেছি। সত্যি তিনি সেইরকম মরবার আয়োজন করলেন। একহপ্তাধরে ক্রমাগত কুইনাইন খেয়ে শরীরকে নীল ক'রে ফেললেন তারপর ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়ে একটা মরার সার্টিফিকেটও যোগাড় করলেন এবং একটা বাক্সে একটা পুতুল পুরে তাকে সমাধিস্থ ক'রতে পাঠালেন। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী টাকা যা দিলে তাই নিয়ে স্থানান্তরে গিয়ে ছোট্ট একটি কুটীর বেঁধে তাঁরা সুখে ঘরকন্না কর্চ্ছিলেন হঠাৎ দৈবদুর্ব্বিপাকে বর্ত্তমানে ধরা পড়ে গেছেন।

চিত্রগুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

১। সাথী—হুমায়ুন কবির প্রণীত। প্রকাশক—শচীন্দ্রকুমার সেন ৮, ওল্ড কোর্টহাউস কর্ণার, কলিকাতা।

"সাথীর" (কয়েকটি ভাব-বৈচিত্র্যময় ও ভাষার ঝঙ্কারপূর্ণ কবিতার সমষ্টি) প্রত্যেকটি কবিতাই প্রাণের সত্যকার দরদে ভরা। কবি নিজেই বলিয়াছেন "···প্রাণের যেখানেই প্রকাশ, তার হয়তো খানিকটা মূল্য থাকতেও পারে। সত্য চিরদিনই সত্য থাক্‌বে—হয়তো এই এর একমাত্র সার্থকতা।" —প্রাণের বিকাশের দিক দিয়া এই কবিতাগুলির একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদা আছে এবং সে হিসাবে ইহার কোনও কবিতা অন্য কবিতা হইতে ন্যূন নহে, কারণ সবগুলিই সমানভাবে সত্য।

কবিতাগুলি মন দিয়া পড়িলে দুই তিনটি ব্যতীত সকল কবিতাগুলিতেই বেশ একটা পূর্ব্বাপর ভাবের ঐক্য লক্ষিত হয়,—যেন ইহার প্রত্যেকটি ফুলই অপর ফুলগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গাঁথা হইয়াছে। প্রথম কবিতাতেই দেখি—কবি একদা ভাবিয়াছিলেন নিজের জন্য তিনি এই পৃথিবীতে এক নিরালা বিরামকুঞ্জ রচনা করিবেন—যেখানে তিনি সংসার-সংগ্রামের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়টুকুকে একটু বিশ্রাম দিতে পারিবেন। তাঁহার সাথী তাঁহার সহিত সেখানে সুখস্বপ্নে বিভোর থাকিবে, বাহিরের জন-কোলাহল তাঁহাদের শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না।—কিন্তু সে তাঁহার স্বপ্নমাত্র, এই উন্মাদ-জনতা-সংক্ষুব্ধ, তীব্র-নিদাঘ-সন্তপ্ত পৃথিবীতে তাহা কিছুতেই হইবার নহে। তিনি বুঝিয়াছেন তাহার সাথী যে হইবে, তাহাকে কণ্টকিত পথেই নিঃশঙ্ক অন্তরে দিবারাত্র চলিতে হইবে, তাহাকে বেদনা দিনের বন্ধু হইতে হইবে, দুর্ব্বল নিরাশার মাঝে আশ্বাসের বাণী শুনাইতে হইবে। পরে দেখি জীবন-তরণী তিনি একাই বাহিয়া চলিতেছেন,—যদিও চারিপাশে নরনারীদল আপন জীবন-কথা মৃদু কলরোলে গুঞ্জন করিতেছে—তথাপি তিনি একা। তাহারা নিজেদের লইয়া ব্যস্ত, অন্যের সুখদুঃখের দিকে তাহাদের দৃষ্টি রাখিবার সময়ও নাই, ইচ্ছাও নাই। তিনি যাহাকে সাথী করিবেন ভাবিয়াছিলেন, সে তাঁহার সাথী হইতে চাহেনা, বেদনার কাঁটার মুকুটেই তাঁহার প্রেমের সার্থকতা হইয়াছে। তিনি তাহাকে মনে মনে ভাল বাসিয়াই সুখী, তাহাকে যে প্রেম জানাইবার অধিকার তাঁহার নাই!—যদিও তাঁহার নিগূঢ়তম অন্তর হইতে একটি প্রশ্ন নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে—

"এত কাছে, তবু এত দূর?"

কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য তাঁহার কোনও অভিযোগ নাই, কোনও হা হুতাশ নাই। তিনি ভালবাসিয়াই সুখী, প্রতিদানে ভালবাসা না পাইলে তাঁহার দুঃখ নাই।—ভালবাসা আপনা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের উৎস হইতে নিঃসারিত, তাহা ধূপের মত নিজেকে বিলাইয়াই গিয়াছে। তিনি নিজেও জানেন না কেন তিনি ভালবাসেন। অবশ্য তিনি জানেন যদি প্রতিদান তিনি পান, তাহা হইলে

"···জীবনে আমার ঝলিবে আলোক হাসি
ভুবন আমার ভরিয়া উঠিবে গানে।
জীবনের পথে সাথী হবে তুমি মম
নয়নে ধরণী ভাসিবে স্বপন সম।···"

তাই বলিয়া তিনি তাহার প্রত্যাশা করিতেছেন না;—এমন কি, যদি নীরবে ভালবাসিয়া তিনি তাহাকে আঘাত করিয়া থাকেন তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গিয়াছেন, কিন্তু যে প্রেম বেদনার মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা ত' অপরাধ নয়; তাহা যে পরশ-মণি, তাহা অন্যের প্রাণকেও সোনা করিয়া দিয়াছে।

"বন্ধু তোমারে কেবলি আঘাত করিয়াছি বারে বারে
অন্ধ আবেগে মম,

হয়ে বন্যা হ'তে পারত না। ১৭৮৭ সালে একটি প্রবল বন্যা হয়ে ত্রিস্রোতার মুখে পলি প'ড়ে তার গঙ্গার দিকে গতি বন্ধ হয়ে গেল এবং পূর্ব্ব মুখে ধাবিত হয়ে ত্রিস্রোতা ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিলিত হল। এই ঘটনায় সমস্ত বাংলার ভৌগোলিক মূর্ত্তির একটা বিশেষ রকম পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেল। ব্রহ্মপুত্র নব শক্তিতে শক্তিবান হ'য়ে তার দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখ গতি পরিত্যাগ ক'রে সোজা দক্ষিণ দিকে ধাবিত হয়ে গোয়ালন্দর কিছু পূর্ব্বে গঙ্গায় গিয়ে মিলিত হ'ল। এই বিশাল জলরাশির সাহচর্য্য পেয়ে পদ্মা সর্ব্বগ্রাসী নদী হয়ে উঠে চতুর্দ্দিকে ভাঙন ধরিয়ে চলল। রাজনগর শ্রীপুর প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে অনেক কীর্ত্তি নাশ ক'রে চাঁদপুরের কিছুপূর্ব্বে মেঘনায় মিলিত হয়ে কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করলে।

সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে বেশিরকম বৃষ্টিপাত হ'লে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মার জলরাশি স্ফীত হ'য়ে উঠে সমস্ত উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গের বৃষ্টির জলকে ঠেলে রেখে বন্যার সৃষ্টি করে। শুধু একটি পয়ঃপ্রণালী দিয়ে বিশাল জলরাশি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্রে নিষ্ক্রান্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাহা মহাশয় বলেন, বন্যার বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হ'লে মূলে আঘাত করতে হবে—অর্থাৎ উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গের নদ-নদীর অবস্থানকে ১৭৮৭ সালের পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। এ করতে হ'লে যে বিপুল engineering ক্রিয়া করতে হবে তা'তে অর্থব্যয় হবে বিপুল,—কিন্তু এক-একটা বন্যায় যদি দশ কোটি টাকা নষ্ট হয় সেই টাকাটাই কি বিপুল নয়? তদুপরি ম্যালেরিয়া এবং ভাঙনের জন্য অর্থনাশ ত' আছেই।

এ-সব ব্যাপারে গভর্মেণ্টের অগ্রণী হওয়া উচিৎ। গভর্মেণ্টের অবশ্য Bengal Irrigation Department নামে একটি জলসেচন বিভাগ আছে। কিন্তু বাংলা দেশের পক্ষে জল-সেচন ব্যাপার কোনো সমস্যাই নয়, বস্তুতঃ বাংলায় জলাভাব নেই—আছে জলাতিশয্য এবং জলের অসম বিভজন। প্রকৃত পক্ষে বাংলায় জল-সেচন বিভাগের (Irrigation Department) তেমন প্রয়োজন নেই যেমন আছে একটি নদী-নিয়মন সমিতির (River training Organization)।

সাহা মহাশয় বলেন, নদীর গতি পরিবর্ত্তিত করা কিম্বা অনুরূপ কোনও ব্যয়সাপেক্ষ উপায়ে হস্তক্ষেপ করার পূর্ব্বে সমস্ত বিষয়টি সব দিক থেকে গভীর ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। ১৯২২ সালের বন্যার পর গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক যে অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় তার সদস্যরূপে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় ১৮৭০-১৯২২ সালের উত্তর বঙ্গের বৃষ্টিপাত ও বন্যার একটি অতি মূল্যবান বিবরণ প্রস্তুত করেন। ১৯২৬ সালে উক্ত বিবরণটি গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। বন্যা নিবারণের উপায় নিরূপণের জন্য এই অত্যুপকারী বিবরণাটির পর্য্যালোচনা বিশেষ আবশ্যক। তা ছাড়া, বাংলা দেশের নদ-নদীর নিয়মনের সমস্যা বিষয়ে এবং বাংলা দেশের পয়ঃপ্রণালীর গঠন ও অবস্থান সংক্রান্ত গবেষণারও একান্ত প্রয়োজন।

আমরা শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা এফ্-আর্-এস্ মহাশয়ের এই অতি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধটি পড়বার এবং সে বিষয়ে চিন্তা করে দেখবার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আশা করি দেশের জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট না থেকে বন্যা নিবারণের একটা উপায় উদ্ভাবন ক'রে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধন করবেন।

* * * *

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের উদ্যোগে কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের গৃহে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীটি প্রথম খোলা হয় এবং গত ৭ই মার্চ পর্য্যন্ত খোলা ছিল। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রস্তুত সচিত্র ক্যাটালগ্ থেকে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ২৬০ খানি চিত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি শিল্প-সামগ্রী প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছিল। পরে বোধ হয় আরও কতকগুলি চিত্র লক্ষ্ণৌ থেকে আসে যে-গুলি ক্যাটালগের মধ্যে হয় ত স্থান পায় নি।

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ পরিশ্রম এবং সুরুচিসম্পন্নতার জন্যে প্রদর্শনীটি সফল এবং সুন্দর

হয়েছিল। কলিকাতাবাসী শিল্প-রসপিপাসুদের জন্যে তিনি যে এমন উচ্চদরের রসোপভোগের সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন এ জন্যে জন-সাধারণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রত্যেক ছবিটিই বিক্রয়ের জন্যে ছিল,—কতকগুলি বিক্রয় হয়ে গিয়েছে, অনেকগুলিই হয় নি। দেশের আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় না হ'লে হয়ত আরও কতকগুলি বিক্রীত হোত। কিন্তু সে জন্যে আক্ষেপের কথা নেই, আমেরিকা এবং ইয়োরোপের শিল্প-প্রিয় ব্যক্তিরা ক্রমশঃ হয়ত সব ছবিগুলিই কিনে নেবে,—আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের দেশে এমন ধন এবং মন নেই যে, এই ছবিগুলি সংগ্রহ ক'রে একটি জাতীয় চিত্রশালা খোলা যেতে পারে। যার ধন আছে তার মন নেই, যার মন আছে তার ধন নেই। একমাত্র নিকোলাস রোরিকের চিত্রাবলী অবলম্বন ক'রে নিউইয়র্কে অতিকায় রোরিক মিউজিয়েম্ স্থাপিত হ'ল যার শিখরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হ'লে মাথার টুপি চেপে ধরবার প্রয়োজন হয় (গৃহটি পঁচিশ-তলা), আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির জন্যে একটি এক-তলা চিত্রশালাও কি হ'তে পারে না? এই আক্ষেপের জন্যে শুধু ধনের অভাবই দায়ী নয়, মনের অভাবও দায়ী। আশা করি অন্ততঃ শান্তিনিকেতনের কলাভবন এই চিত্রাবলীর কতকগুলিকে বিদেশে চালান হ'তে না দিয়ে আমাদের গ্লানি এবং কলঙ্কের পরিমাণ কথঞ্চিৎ লাঘব করবে।

প্রদর্শনীর অনুষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয় আমাদের একখানি ক্যাটালগ উপহার দিয়েছেন। এই সুদৃশ্য এবং অতি সুন্দর ভাবে রচিত ক্যাটালগটি একটি সযত্নে রাখবার মত সামগ্রী। আগাগোড়া পুরু আর্ট পেপারে ছাপা; সুদৃশ্য কভারের উপর রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত একটি রঙিন ফুলের ছবি; ক্যাটালগের ভিতর প্রতি পাতায় একখানি ক'রে ১৯খানি ছবি;—সমস্ত মিলিয়ে একখানি মূল্যবান ছবির বই। ক্যাটালগের পূর্ব্বভাগে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত দে মহাশয়ের forewordটি সুখ-পাঠ্য এবং বহু জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকবার প্রবৃত্তিটি কেমন ক'রে এবং কতদিন থেকে ক্রমে ক্রমে জেগে উঠ্‌ল তার একটি সুন্দর ইতিহাস দেওয়া আছে।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে রবীন্দ্রনাথের ছ'খানি ছবির প্রতিলিপি উপহার দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সে জন্যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে এবং শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দেকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

* * * * *

এক্স-রে বিষয়ে নূতন আবিষ্কার

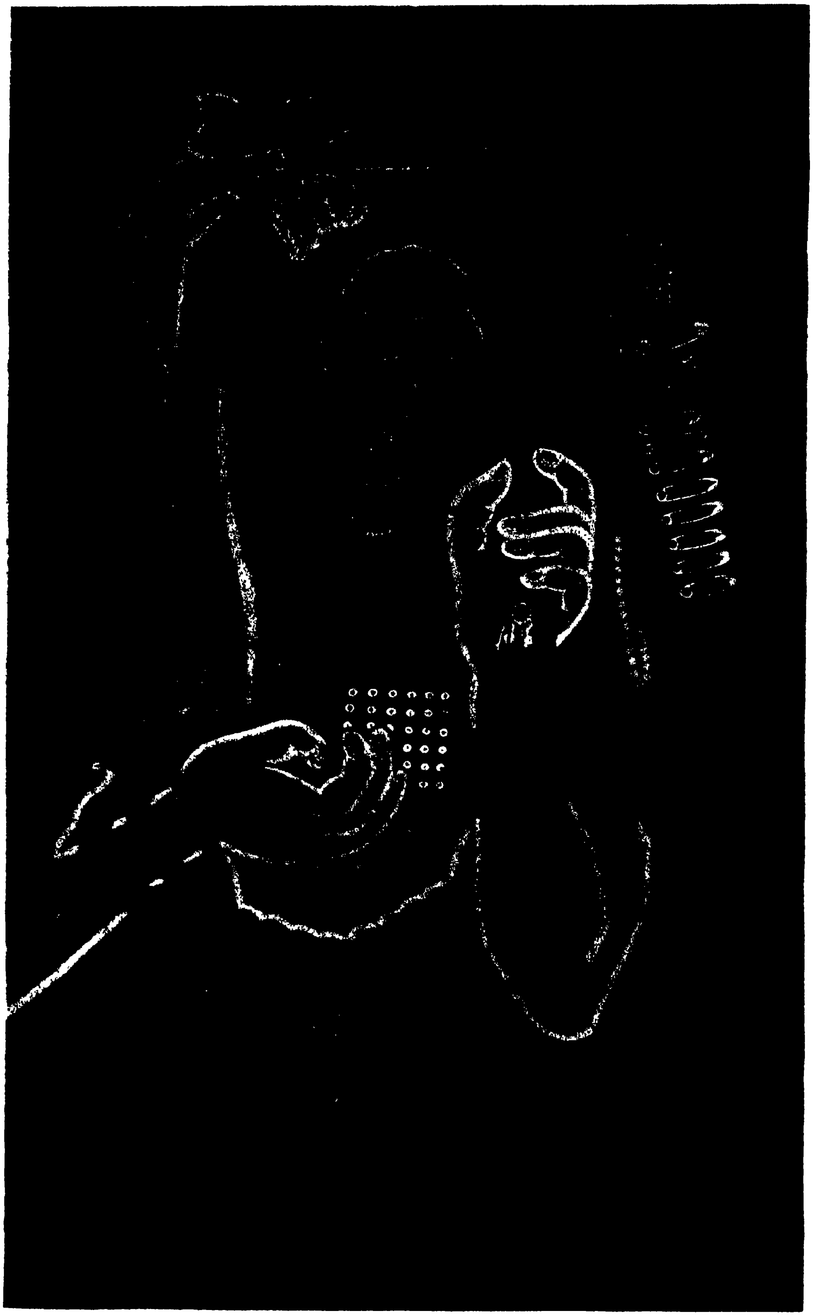
ডাঃ মেঘনাদ সাহা এফ্, আর, এস্, এক্স-রে সম্বন্ধে যে নূতন আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিক জগতে তা আন্দোলন উপস্থিত করেছে। অধ্যাপক সাহার আবিষ্কৃত নূতন 'রে'-র wavelength পদার্থনিচয়ের (elements) সাধারণ K এবং L 'রে'-র অর্দ্ধেক। এই 'রে' এ-পর্য্যন্ত তামা এবং tungsten নামক ধাতুতেই পাওয়া গেছে—কিন্তু সাহা মহাশয় বিশ্বাস করেন সমস্ত পদার্থেই এই 'রে' বর্ত্তমান আছে।

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ বলেন, এই আবিষ্কারটি বহুতর প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হ'লে নিশ্চয়ই খুব কৌতুহলোদ্দীপক হবে। কিন্তু অন্ততঃ আরও ৬।৭টি পদার্থের বিষয়ে আবিষ্কারটি প্রমাণিত না হ'লে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা চলে না। আবিষ্কারটি প্রতিষ্ঠিত হ'লে পরমাণুর গঠন বিষয়ে নূতন তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে, এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনাদি সংঘটিত করবে।

গত ১লা মার্চ এলাহাবাদে Academy of Sciences of the United Provinces-এর প্রতিষ্ঠা-উৎসবের অভিভাষণে যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণর Sir Malcolm Hailey ডাঃ সাহাকে তাঁহার নূতন আবিষ্কারের জন্য অভিনন্দিত করেন। ডাঃ সাহা এই নবগঠিত Academy of Sciencesএর প্রেসিডেন্ট।

আমরা শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয়কে তাঁর নূতন এবং প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করছি। ভগবানের কৃপায় তিনি সমস্ত জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে নব-নব সাফল্যের গৌরবে গৌরবান্বিত হ'ন—এ আমাদের একান্ত কামনা।

Edited by Upendranath Ganguli, printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works
259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1 [illegible]



ফেরিওয়ালী

পুঁতির মালা হাড়ের বোতাম,
সেফটিপিনের পাতা,
চিনে সিঁদুর, ছুঁচ সুতো আর ফিতে
এই দিয়ে তার চুবড়ী ভরা
পরদেশী ঐ ফেরিওয়ালীর।

হাট বাজারে সব সে বেচে
একটি জিনিস ছাড়া—
চকচকে ঐ ছুরিখানি কোমরবন্ধে বাঁধা ॥

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩৯ | ৪র্থ সংখ্যা

ধর্ম্মমূঢ়তা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধর্ম্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্ম্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো॥

বিধর্ম্ম বলি' মারে পরধর্ম্মেরে
নিজ ধর্ম্মের অপমান করি ফেরে;
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা,
দেবতার নামে এ যে সয়তান ভজা॥

ধর্ম্মমূঢ়তা

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্ব্বরতার বিকার বিড়ম্বনা,
ধর্ম্ম বলিয়া তাদের বরিল যারা
আবর্জ্জনায় রচে তারা নিজ কারা।
প্রলয়ের ঐ শুনি শৃঙ্গধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জ্জনী॥

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া ;—
যে আনিবে প্রেম অমৃত উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে,
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে॥

হে ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মবিকার নাশি
ধর্ম্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,
ধর্ম্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্ত উৎসব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ বৎসর দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন পার হয়ে চৈত্রে পৌঁছল। আমের মুকুল নিঃশেষিত, আমবাগানে মৌমাছির ভিড় নেই, পলাশ-ফোটার পালা ফুরোলো, গাছের তলায় শুক্‌নো শিমুল তার শেষ মধু পিঁপড়েদের বিলিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েচে। কাঞ্চনের শাখা প্রায় দেউলে, ঐশ্বর্য্যের অল্প কিছু বাকি। কেবল শালের বীথিকা ভরে উঠেচে মঞ্জরীতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা ঋতুরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলে এই পুষ্পিত শালের বনে, তার বল্কলে আবির মাখিয়ে দিলে, তার ছায়ায় রাখলে মাল্যপ্রদীপের অর্ঘ্য। চতুর্দ্দশীর চাঁদ যখন অস্ত দিগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন অরুণ-আবিরের তিলকরেখা ফুটে উঠল তখন আমি এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত উৎসবের বেদীর জন্য রচনা করেচি।

আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি,
লহ আমাদের নতি।
তুমি এসেছিলে মোদের সবার আগে,
প্রাণের পতাকা রাঙায়ে হরিৎরাগে,
সংগ্রাম তব কত ঝঞ্ঝার সাথে,
কত দুর্দ্দিনে কত দুর্য্যোগরাতে
জয় গৌরবে ঊর্দ্ধে তুলিলে শির
হে বীর, হে গম্ভীর॥

তোমার প্রথম অতিথি বনের পাখী,
শাখায় শাখায় নিলে তাহাদের ডাকি,
স্নিগ্ধ আদরে গানেরে দিয়েছ বাসা,
মৌন তোমার পেয়েছে আপন ভাষা,
সুরে কিশলয়ে মিলন ঘটালে তুমি
মুখরিত হোলো তোমার জন্মভূমি॥

আমরা যেদিন আসন নিলেম আসি
কহিল স্বাগত তব পল্লব রাশি,
তারপর হতে পরিচয় নব নব
দিবসরাত্রি ছায়া-বীথিতলে তব
মিলিল আসিয়া নানা দিগ্‌দেশ হোতে
তরুণ জীবন স্রোতে॥

বৈশাখ তাপ শান্ত শীতল করো,
নব বর্ষারে করি দাও ঘনতর,
শুভ্র শরতে জোৎস্নার রেখাগুলি
ছায়ায় মিলায়ে সাজাও বনের ধূলি,
মধুলক্ষ্মীরে আনিয়াছে আহ্বানি
মঞ্জরীভরা সুন্দর তব বাণী ॥

নীরব বন্ধু, লহ আমাদের প্রীতি,
আজি বসন্তে লহ এ কবির গীতি,
কোকিলকাকলী শিশুদের কলরবে
মিলেছে আজি এ তব জয় উৎসবে,
তোমার গন্ধে মোর আনন্দে আজি
এ পুণ্যদিনে অর্ঘ্য উঠিল সাজি।
গম্ভীর তুমি সুন্দর তুমি, উদার তোমার দান,
লহ আমাদের গান ॥

গান

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভ-ধনে তখন তুমি হে শাল
বসন্তে করো ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি' দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্ত বেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
বন-সভাতলে সবার উর্দ্ধে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য ॥

শান্তিনিকেতন
দোলপূর্ণিমা ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ছবির কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

ছবির কথা কিছুই বুঝিনে। ওগুলো স্বপ্নের ঝাঁক, ওদের ঝোঁক রঙীন নৃত্যে। এই রূপের জগৎ বিধাতার স্বপ্ন—রঙে রেখায় নানাখানা হ'য়ে উঠ্‌চে। বসন্তে পলাশ ফুটে উঠ্‌ল কালোয় রাঙায় একটা রূপ। কিসের গরজ? কে জানে। মানে কী যদি জিজ্ঞাসা করো তার উত্তর কে দেবে? আপনা আপনি সৃষ্টিকর্ত্তার তুলির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েচে। আবার বেল ফুল আর এক মূর্ত্তি ধরে বসল। কেন? অজানার স্বপ্ন-উৎস থেকে বিচিত্র রূপ উৎসারিত— এ সম্বন্ধে বিশ্বকর্ম্মার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। আমার ছবিও তাই, রূপের নিগূঢ় আনন্দ নানা রূপে রূপে লীলা করচে, সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই আনন্দ দর্শকের মনেও যদি সঞ্চারিত হয় তো ভালো। নইলে কারো কোনো ক্ষতি নেই। সৃষ্টি কেন হয় তার ব্যাখ্যা অসম্ভব—সকলের গোড়াকার কথাটা হচ্চে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। ২৬ ফাল্গুন ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকারকে
লিখিত পত্র



বৌদ্ধ জাগরণে রবীন্দ্রনাথ

বৌদ্ধ শ্রমণ শ্রীসরণংকর (সিংহল)

আজকাল বাংলা ও বাংলার বাইরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। ভারতের এই উপেক্ষিত ধর্ম্ম আবার বহুকাল পরে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

ভগবান বুদ্ধদেব এবং তাঁহার মত্ বা বাণী সম্বন্ধে জানিবার এই যে এক নব প্রেরণা ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহার মূলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও যথেষ্ট। তিনি তাঁহার অমর লেখনী মুখে বৌদ্ধ ভারতের বিস্মৃত অতীত যুগের যে সমস্ত গৌরবময় পুণ্য চিত্রকে রূপ দিয়াছেন তাহা একবার পাঠ করিলেই, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ যুগের সম্বন্ধে জানিবার একটা প্রবল প্রেরণা অন্তরে জাগিয়া উঠে। তাঁহার মোহন তুলিকা স্পর্শে অতীত ভারতের সেই মহা-মানব ও তাঁহার অমিয়মাখা বাণী যেন আমাদের কাছে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। যখন আমরা শুনি

> "দুঃখিতের অন্নদান সেবা।
> তোমরা লইবে বল কেবা।"

তখন মনে হয় সুদূর অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখের বাণীই ভাসিয়া আসিতেছে। আবার যখন দেখি

> "ব্যথিত নগরী পরে
> বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
> সন্ধ্যা তারা সম রহে ফুটি।"

তখন সেই সৌম্য, শান্ত ব্যথা-করুণ আঁখি দুটির দিকে চাহিয়া বলিতে ইচ্ছা করে "প্রভু! আর কিছু নহে, চরণের ধূলি এককণা।"

কবিবরের লিখিত "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, মূল্য প্রাপ্তি, অভিসার, পূজারিণী" প্রভৃতি কবিতায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহান আদর্শের কথাই প্রচারিত হইয়াছে। ত্যাগের বাণীই যে বুদ্ধের তথা ভারতের শাশ্বত বাণী তাহা কবিবরের লেখার বহুস্থানেই প্রকাশ পাইয়াছে। কবিবরের রচিত 'বুদ্ধের প্রতি, বুদ্ধের জন্ম দিবস, সারনাথ,' প্রভৃতি কবিতাও ভারতে লুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকাশে সহায়তা করিবে।

তারপর তাঁহার নাটক "নটীর পূজা" এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ভগবান বুদ্ধের মহান বাণীর একটী লিপিচিত্র এই নাটকের মধ্য দিয়াই তিনি জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এই নাটকের মধ্যে আমরা আরো দেখিতে পাই অতীত বৌদ্ধ-সমাজে ত্যাগ ও আদর্শের পরিপূর্ণ রূপ, নরনারীর সমান অধিকার, বৌদ্ধ ধর্ম্ম বা মত প্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধ নারী বা ভিক্ষুণীগণের অপূর্ব্ব দুঃখবরণ। অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন সমস্ত বৌদ্ধ গতে এই নাটক প্রচারিত হইবে; সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এই নাটক হইতে প্রেরণা লাভ করিবে।

কবিবরের রচিত বিসর্জ্জন নাটকেও ভগবান বুদ্ধের বাণী বিঘোষিত হইয়াছে। জীবহিংসা এমন কি ভগবানের নামে উৎসর্গ করিয়া বলি প্রদানও যে অন্যায়, ইহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিসর্জ্জন নাটকে সুন্দর ভাবেই দেখাইয়াছেন। ভগবান বুদ্ধের মহান বাণী তাঁহার এই নাটকের মধ্যেও অমর হইয়া থাকিবে।

সুদূর অতীতে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমস্ত এশিয়াকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। অধঃপতিত ভারত সেই যোগসূত্র রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধের তথা ভারতের বাণী ও শিক্ষা এখনো সুদূর প্রাচ্যের পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হইতেছে। ভারত ও প্রাচ্য দেশ সমূহের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় তাহা দূর হইয়াছে; সমস্ত প্রাচ্য দেশ মিলিয়া আবার এক বিশাল ভারত গঠন করিবার কল্পনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে।

ভারতের যে মহান বাণী ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা দেশে দেশে প্রচার করিয়াছিলেন, আজ সেই পুরাতন বাণীই আবার নবরূপে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বিশ্বে প্রচার করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধদেব ভারতের মহাপুরুষ, এশিয়ার আলো। সমস্ত এশিয়া একদিন ভারতের প্রদর্শিত পথে চলিয়াছিল, ভারতের শিক্ষা সমস্ত এশিয়াকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধিয়াছিল; তাই ভারত আজও সমস্ত এশিয়ার পুণ্যভূমি।

বহুকাল পরে ভারতের অন্ধকার যুগের অবসানের সূচনা দেখা দিয়াছে। আজ আবার সুদূর প্রাচ্যের অনেকে বলিতেছেন ভারত আমাদের দেশ, ভারতবাসী আমাদের ভাই। তাই আবার দুই একটী করিয়া লোক সুদূর প্রাচ্য দেশ হইতে বিশ্বভারতীতে আসিতেছেন। তাই এই বার সারনাথ উৎসবে কবিবর গাহিয়াছেন।

"বোধিদ্রুম তলে তব সেদিনের নব জাগরণ
আবার সার্থক হোক মুক্ত হোক্ মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ, নবপ্রাতে
উঠুক্ কুসুমি' ॥

আজ কবিবরের বিশ্বভারতীতে নানা দেশ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সুদূর তিব্বত হইতে বৌদ্ধদের লুপ্ত ধন আনিয়া আবার ভারতের ক্ষেত্রে দান করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই ভাবে বিশ্বভারতী বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন আলোচনার এক প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে ভগবান বুদ্ধের আদর্শ ও বাণী বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। পাশ্চাত্যের অনেক মনীষিও আজ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আশায় ভারতে আসিতেছেন।

গৌরবময় অতীত ভারতে ভগবান বুদ্ধদেব সমস্ত বিশ্বের কল্যাণবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আজ আবার বহুযুগ পরে রবীন্দ্রনাথ ভারতে তথা সমস্ত বিশ্বে, বুদ্ধের তথা ভারতের মহান বাণী প্রচারের সূচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের যাহা আদর্শ ও শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, শিক্ষা এবং সাধনাও তাহাই।

তাই আজ মনে হয় বিশ্বের এই ঘোর দুর্য্যোগের দিনে, ভগবান বুদ্ধের, রবীন্দ্রনাথের তথা ভারতের মহান বাণীই সমস্ত বিশ্বকে আলোক দান করিবে; শান্তির পথ, মুক্তির পথ দেখাইবে।

শ্রীসরণংকর



রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প *

শ্রীমতী শান্তা দেবী বি-এ

মানব-মনের শৈশবে তাহাকে সকলের চেয়ে বেশী নাড়া দেয় হাস্যরস। এ হাস্যরস অতি মোটা সাদাসিধা রকমের হাস্যরস। ইহার সৃষ্টি করিতে শাণিত ছুরিকা কি সূক্ষ্মাগ্র ছুঁচের প্রয়োজন হয় না। জোরালো ভোঁতা রকমের একটা ঠেলা দিলেই চলে।

তারপর আসে বিস্ময় রস। শাস্ত্রে ইহাকেই বলে অদ্ভুত রস। কিশোর মন সৃষ্টির নব নব বিস্ময়ের মাঝখানে সজাগ হইয়া উঠিয়া বাস্তব ও কল্পনার অনন্ত বিস্ময় ভাণ্ডারের চাবি খুঁজিয়া বেড়ায়। রহস্য যেখানে ঘনাইয়া উঠিয়াছে, মন তাহার উন্মুখ হইয়া সেইখানেই ছুটে। রহস্যের একটি ইসারা মাত্র তাহার সমস্ত মনকে সেই পথে সবেগে টানিয়া লইয়া চলে। যাহা বলা হইয়াছে তাহা ত বিস্ময় জাগাইবেই, কিন্তু যাহা বলা হয় নাই, শুধু যাহার আভাস মাত্র একবার উঁকি দিয়া গিয়াছে, তাহাও কিশোর মনের কল্পনায় রহস্য ও বিস্ময়ের ঐশ্বর্য্যে ঝলকিয়া উঠে। নিপুণ শিল্পী সেই ইসারা ও সঙ্কেতের ভাষা বোঝেন। তিনি সকল কথাই বলিয়া যান না; প্রত্যেক মানুষ তাহার লেখনীসঙ্কেতের সাহায্যে অনেকখানি রহস্য আপনার কল্পনা মিশাইয়া গড়িয়া আপনি নূতন করিয়া উপভোগ করিতে পারে। এই রহস্য-সৃষ্টি হাস্যরস-পরিবেশন অপেক্ষা উন্নত স্তরের জিনিষ, বলাই বাহুল্য।

মনের পরিণতি আরও অগ্রসর হইলে মধুর ও করুণ রস প্রায় একই সময় কখনও বা একেরই দুই অঙ্গরূপে মানুষকে নাড়া দেয়। এই রসসৃষ্টির ভিতর শিল্পীর শিল্প-নিপুণতা স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে না; ইহাতে কোনো কেরামতি বাহাদুরী এমন কি বিস্ময়ও না থাকিতে পারে; কিন্তু তবু এই রসসৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার অগ্রগতির পরিচয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাইবার সম্ভাবনা।

ইহার পর আরও একটা হাসির পালা আছে যাহা কান্নারই রূপান্তর। বেদনার আঘাতে মানুষ যেখানে কাঁদিতে লজ্জা পায়, অথবা বার বার ঘা খাইয়া আঘাতকে স্বীকার করাই পরাজয় মনে করে সেখানে সে হাসে। মানুষের ভাগ্যবিপর্য্যয় যতক্ষণ মানুষের কাছে নূতন এবং একান্ত অপ্রত্যাশিত থাকে ততক্ষণই তাহা আকস্মিক মনে হয়; তাই দৈব বিড়ম্বনায় সে কাঁদে, কিন্তু জীবনে যখন নিয়তির নানা নিষ্ঠুর খেলার সহিত নিবিড় পরিচয় হইয়া যায় তখন হাসি ছাড়া বাঁচিবার উপায় থাকে না। কান্নার ভিতর যে ভিক্ষা আছে, সে ভিক্ষায় তাহার বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে তাই সে নিষ্ঠুর নিয়তিকেও পরিহাস করিয়া হাসে। সৃষ্টির ন্যায়-ধর্ম্মের চেয়ে অন্যায় ধর্ম্মটাই যার কাছে বেশী সম্ভবপর ব্যাপার মনে হয় সে-ই হাসিয়া অন্যায়ের অত্যাচারকে তুচ্ছ করে।

সাহিত্যের রস যে কেবলমাত্র এই কয়টি রূপেই দেখা যায় এবং ঠিক এই পর্য্যায়েই সর্ব্বত্র আসে তাহা বলিতেছি না; তবে মোটামুটি এই রসগুলি এই ভাবেই মানুষের চোখে সচরাচর পড়ে। মানুষের মন একটা রসে উপভোগের বয়স যখন পার হইয়া যায় তখন যে সে আর পূর্ব্ব যুগের আনন্দে ডুব দিতে পারে না এমন কথাও আমি বলি না, কারণ মানুষের মনের বয়স অমন আইন মানিয়া চলে না। বৃদ্ধেরও ফিরিয়া শিশু হইবার ক্ষমতা আসে, প্রৌঢ়ও কিশোর হইতে পারে। তবুও আশে পাশের অভিজ্ঞতায় মানুষ যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহার সাহায্যে কতকগুলি আইন খাড়া করিতে তাহার ইচ্ছা করে।

খুব অল্প বয়সে হিতবাদী কার্য্যালয়ের রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভিতর আমরা সকলের চেয়ে আনন্দ পাইতাম রবীন্দ্রনাথ ও

* জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতন পত্রে এই বিষয়ের আর একটি দিক্ লেখা হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রের একসঙ্গে বাক্সের উপর "নির্দ্দয় ভাবে নৃত্যের" বর্ণনায়; আবার তাহার চেয়েও অল্প বয়সে আমার কন্যা রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় মুগ্ধ হইতেছে সহজ পাঠে "অবিনাশ কাটেঘাস" এবং "দীননাথ রাঁধে ভাত" পড়িয়া।

গল্পগুচ্ছের শিল্পী বালকোচিত হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে কখনও চেষ্টা করেন নাই। তবে তাঁহার মধুর করুণ ও বিস্ময় রসের পসরায় উজ্জ্বল হাসির কণা হীরার টুকরার মত মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠে। গল্পে তাহারা আসন জুড়িয়া বসিবার মত জায়গা পায় না, কিন্তু যেখানেই এক বিন্দু স্থান পাইয়াছে সেখানেই তাহাদের রূপজ্যোতি চারিদিক আলো করিয়াছে।

রহস্য ও বিস্ময়ের খেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পনাকে নানা ভাবে খেলাইয়াছেন। প্রথম গল্পগুচ্ছের সহিত আমাদের পরিচয়ই ইহার ভিতর দিয়া। গল্পগুচ্ছ যখন পড়িতে সুরু করি হয়ত তখন সমস্ত গল্পই পর পর পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু মন আপনার প্রয়োজন মত যাহা ভুলিবার তাহা ভুলিয়া নানা গল্পের কাঠামো হইতে বিস্ময়রস-উদ্দীপক ছবিগুলি যেন তুলিয়া আনিয়া একটি নিজস্ব চিত্রশালা সাজাইয়াছিল। এই ছবিগুলি এত জীবন্ত যে তাহারা শুধু পটে আঁকা ছবির মত মনের এক এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে নাই। তাহারা আপনাদের প্রাণবেগে দৃশ্যপট নানারূপে পরিবর্ত্তন করিয়া নব নব বেশে মনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। শিল্পী যেখানে ঘন রহস্যের যবনিকা টানিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে কুতূহলী মন বার বার সে যবনিকা তুলিয়া দৃশ্যপটে সম্ভব অসম্ভব কত ছবি আঁকিয়া গিয়াছে। স্রষ্টার লেখনী যেখানে থামিয়াছে সেইখান হইতেই যেন আমাদের মানস-যাত্রা সুরু হইয়া যায় আরও অধিক আগ্রহে।

রাজীব "মহামায়ার" অবগুণ্ঠনের আড়াল ঘুচাইয়াছিল বলিয়া মহামায়া চিরবিদায়ের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া গেল। কিন্তু রাজীব ছাড়িয়া দিলেও আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিলাম কই? আমাদের নবীন চোখে মহামায়ার যাত্রা তখন মহাপ্রস্থানের মত। নদ নদী পর্ব্বত কন্দর পার হইয়া অবগুণ্ঠিতা মহামায়ার নীরব মূর্ত্তি দূর হইতে দূরে চলিয়াছে, আর আমরাও সমস্ত পৃথিবীর বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার পিছনে ছুটিয়াছি। সে কোথায় গেল জানিতেই হইবে। সে কোনো সংসারে বসিয়া প্রত্যহ রান্না ও খাওয়া করিতেছে এমন কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সে মৃত্যু জয় করিয়া আসিয়াছিল আবার মৃত্যুর আশ্রয় লইয়াছে তাহার বিষয়ে এমন অপমানজনক কথাও বিশ্বাস করা শক্ত।

'জীবিত না মৃতে' কাদম্বিনী শেষ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল নির্জ্জন শ্মশানের ঘন মেঘাচ্ছন্ন নিবিড় অন্ধকারে। কাদম্বিনীর মত আমাদেরও মনে হইত যমালয় বুঝি অমনই চিরনির্জ্জন চিরান্ধকার মরণের পারে যাহার ঘুম ভাঙিল সেই ত প্রেতাত্মা। তবে সে আপনাকে মানুষ বলিয়া চিনিবে কি করিয়া? কাদম্বিনীর মতই আমাদের শিশু-চিত্ত সংশয়-দোলায় দুলিতে লাগিল। শিল্পী ত বলিলেন, কাদম্বিনী জীবিত, কিন্তু তাহাকে কেবল শ্বশুর গৃহে নয়, আমাদের কাছেও মরিয়া আপনার প্রাণের পরিচয় দিতে হইল। শুধু তাই নয় 'মহামায়া'কে আমরা ইহলোকে মাত্র খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু কাদম্বিনীর বেলা মন ছুটিল পরপারে তাহার সন্ধান লইতে। এবার মরণরাত্রির পরপারে কাদম্বিনী জাগিয়া উঠিল কোথায়? চির অন্ধকারে না অপূর্ব্ব আলোকে? মৃত্যুর যবনিকা টানিয়া ছিঁড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করিত কাদম্বিনী আপনার মরণকে মরণ বলিয়া চিনিল কিনা। এত দুঃখ পাইয়া শেষে কি অনন্ত নিদ্রায় শান্তি পাইল মাত্র, জাগিয়া আপনার দুঃখ-নিশা ভোর হইতে দেখিল না?

'ক্ষুধিত পাষাণের' অশরীরী সুন্দরীদের কেশ বাস-সৌরভ ও অলঙ্কারের শিঞ্জিনী একটা অপূর্ব্ব অসম্ভব স্বপ্নলোকে মনকে টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু এই রূপবতীদের বস্ত্র অলঙ্কার ও অঙ্গের দ্যুতি সানন্দ বিস্ময়ের শিহরণই মনে জাগাইত: ইহাদের ছিন্নকেশ, দীর্ঘশ্বাস কি বুকফাটা কান্না কি ললাটের রক্তধারা কাদম্বিনী কি মহামায়ার ব্যথার মত মনকে আকুল করিয়া তুলিত না। ইহারা যেন ছিল উপকথার রাজকন্যা—যাহাদের হাসি অশ্রু জীবন মরণ সবই আমাদের কল্পনার খেলা যোগাইবার জন্য গড়িয়া তোলা।

ইহাতে শিল্পীর রচনার দিকে চাহিয়া চক্ষু ধাঁধিয়া যাইত কিন্তু মন কাহারও দুঃখে কাঁদিয়া ফিরিত না। বাল্যকালে 'ক্ষুধিত পাষাণ' যতবার পড়িতাম ততবারই তাহার মানুষগুলি মনোলোক হইতে কখন অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িত—বাকি থাকিত রূপে রসে গন্ধে ও শব্দে অপূর্ব্ব একটি রহস্যের অনুভূতি। ইহার সমস্ত নর নারীর মুখ ও সকল আবেষ্টন অপরিচিত ছিল এই কারণে অথবা এই পাষাণের স্তূপে পুঞ্জীভূত প্রেম-বেদনা বুঝিবার বয়স ও ক্ষমতা হয় নাই বলিয়াই হয়ত 'মেহের আলি' ভিন্ন আর কোনো মানুষই আমার মনে বেশীক্ষণ থাকিতে পাইত না। ইহার সতত্ররূপ ও রসের হোরি খেলাই ছিল মনমুগ্ধকর।

হয়ত নিতান্ত ঘরের কাছের মানুষ বলিয়াই "নিশীথের" দক্ষিণারঞ্জনের মৃতা পত্নীকে কোনোদিন ভুলিয়া যাই নাই। "আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া" তাহার যে "অভ্রভেদী হাহাকার" "মর্ম্মভেদী হাসির" রূপ ধরিয়া পদ্মার পারে ধ্বনিয়া উঠিত, যাহা দেশ দেশান্তর লোক লোকান্তর পার হইয়াও দক্ষিণার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিত না, তাহা যেন আমাদেরও বুকের ভিতর অনন্তকাল ধরিয়াই হায় হায় করিত। মনে হইত যে বুকফাটা ক্রন্দন বুকে চাপিয়া সে চিতানলে ভস্ম হইয়াছিল, তাহা যেন ভস্মকণার সহিত আকাশে বাতাসে দেশে দেশান্তে ছড়াইয়া এই তীব্র হাসির ঝড় তুলিয়া দিয়াছিল। স্বামীর প্রেমালাপের সমস্ত চেষ্টা ইহজীবনে যে তাহার সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির আঘাতে ভূমিশায়ী করিত, দেখিতে পাইতাম স্বামীর দ্বিতীয়প্রস্থ প্রেমালাপের দিনে সে যেন সমস্ত আকাশ জুড়িয়া ডানা মেলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া নির্ম্মম পরিহাসের হাসি হাসিতেছে। শিল্পী লিখিয়াছেন এক ঝাঁক পাখীর ওড়ার শব্দে দক্ষিণার হাসির ভ্রম হইত, কিন্তু আমরা দেখিতাম বিদেহী আত্মা পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়া এবার আকাশ হইতে হাসির বাণ ছুঁড়িতেছে। ঘন অন্ধকারে ধীরে ডানা গুটাইয়া সেই প্রেতাত্মাই অবগুণ্ঠন টানিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া দক্ষিণার মশারির চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া "দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি বাড়াইয়া অবরুদ্ধ স্বরে" বলিত, 'ও কে, ও কে, ও কেগো?' সংসারে নিজের ক্ষুদ্র স্থানটুকু মনোরমাকে ছাড়িয়া দিয়া যাইতে হইয়াছিল বলিয়া আজ সে দক্ষিণার বিশ্বের দশদিক্ ব্যাপিয়া আপনাকে বিস্তার করিয়াছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও ফাঁক নাই।

'মণিহারা' গল্পে ফণিভূষণ ও মণিমালার দাম্পত্য জীবন এমনই নিতান্ত আধুনিক এবং সাধারণভাবে সুরু হইয়াছে যে বিস্ময় অর্থাৎ অদ্ভুত রসের কোনো সম্ভাবনা যে তাহাতে আছে অর্দ্ধেকের বেশী পড়িয়া গেলেও কল্পনা করা যায় না। স্বামীর কাছে ঢাকাই শাড়ী ও বাজুবন্ধ অনায়াসে আদায় করিয়া নব্য নায়িকা সুন্দরী মণিমালিকা আপনার "অপরিমিত স্বাস্থ্য অবিচলিত শান্তি এবং সঙ্কীয়মান সম্পদের মধ্যে সবলে বিরাজ করিত।" এই অলঙ্কার-বিলাসিনী নায়িকার জীবনে রহস্য অকস্মাৎ লোকাতীত হইয়া উঠিবে এমন কোনো ফাঁক গল্পের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাড়ীটা 'অভিশাপগ্রস্ত' শুনিয়া অবশ্য মাঝে মাঝে মনে একটু রহস্যময় কৌতূহল জাগিয়া উঠে। কিন্তু ফণিভূষণও মণিমালার মনোরাজ্যের অনুভূতিরাশি নিক্তি করিয়া ওজন করিতে এত মসগুল যে একটা বড় রকম মানভঞ্জনের পালাই অতঃপর শোনা যাইবে আশা করা যায়। কিন্তু দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। 'মণি' গহনা লইয়া বাপের বাড়ী পালাইতেই মণি-হারা ফণির গৃহের লক্ষ্মীশ্রী যেন অকস্মাৎ যাদুস্পর্শে উড়িয়া গেল। আমাদেরও চক্ষে যেন কে নূতন অঞ্জন পরাইয়া দিয়া গেল। পরিপূর্ণ সংসারের লীলাভূমি চক্ষের সম্মুখে মিলাইয়া গেল, জাগিয়া উঠিল সেই 'পোড়ো অভিশাপগ্রস্ত বাড়ীটা'। মণিমালিকার "অক্ষয় যৌবনের অম্লান সৌন্দর্য্য-ধ্যানরত ফণিভূষণ জাগিয়া উঠিল একটা জগদ্ব্যাপী নিরন্ধ্র অন্ধকারে যেন যমালয়ের অভ্রভেদী সিংহদ্বারের সম্মুখে।' ঘনীভূত রহস্যের আগমনী শুনিয়া আমাদের মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার পর শ্রাবণ বর্ষণের মাঝখানে নদীর জল ও রাত্রির অন্ধকারের কালস্রোতের ভিতর হইতে সালঙ্কারা কঙ্কালরূপিণী প্রেয়সীর অভিসার সুরু হইল। মণিমালার মণি-বলয়িত কঙ্কাল-ভুজ দ্বারের উপর ঠক্ ঠক্ ঝম্ ঝম্ করিয়া কঠিন আঘাত করিতে লাগিল। ফণি-ভূষণের সঙ্গে আমাদেরও হৃৎপিণ্ড যেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত স্ফুরিত হইতে লাগিল। করতলে

রতনচক্র প্রকোষ্ঠে বালা, মাথায় সিঁথি—অস্থিতে অস্থিতে হীরা ও সোনার দ্যুতি ছড়াইয়া দুইটি সজীব উজ্জ্বল চক্ষু লইয়া রাতের পর রাত এই কঙ্কালময়ীর নিষ্ঠুর অভিসার চলিতে লাগিল। অবশেষে প্রেমাস্পদকে হীরক-শোভিত কঙ্কাল-অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিয়া লইয়া নদীর সেই রাত্রির মত অন্ধকার ও গভীর জলে দুইজনে মিলাইয়া গেল।

ভৌতিক বিস্ময় চরমে উঠিতেই লেখক এক হাসির ফুৎকারে তাহার সমস্ত ভীতি ও নিস্মমতা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন 'ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম নৃত্যকালী।' মন কিন্তু নৃত্যকালীকে আমল দিল না, বলিল ও একটা সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা মাত্র। 'ঘাটে উপবিষ্ট ভদ্রলোক যতই বলুন তিনি নৃত্যকালীর স্বামী ফণিভূষণ, আমরা স্পষ্ট দেখিতাম নদীগর্ভে কঙ্কালময়ী মণিমালিকার কঠিন বাহুবন্ধনে ফণিভূষণ "অতল-স্পর্শের সুপ্তিতে" নিমগ্ন। অবশ্য পার্থিব মানুষের চোখে 'অতলস্পর্শ' হইলেও তাহার নিদ্রা ভাঙিয়াছিল নিশ্চয় সেই কঙ্কাল বাহুর উপাধান হইতে কঙ্কাল মস্তকটি তুলিয়া। মণিমালার অক্ষয় যৌবনের অম্লান সৌন্দর্য্য "ফণির চোখে সেই নবোদিত দশমীর চন্দ্রলোকে" যে বিভীষিকা জাগাইয়াছিল, জলতলে প্রিয়তমের নবলব্ধ রূপ দেখিয়া মণিমালিকার মনে কি তাহার অপেক্ষা কম বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল? তাহার অভিসার যাত্রা সফল হওয়াতে সে কি পরম তৃপ্তির হাসি হাসিতে পারিয়াছিল? অদ্ভুত সমস্যা নয়? আমাদের মাথায় যেন প্রেতভূমির নেশা চাপিয়া বসিত।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মনে বার বার ভৌতিক বিস্ময় জাগাইয়া তুলিয়া বিস্ময়ের ঘন কুয়াসাকে আপনিই খড়্গাঘাতে কাটিয়া বলিয়াছেন—"ইহা মিথ্যা, ইহা স্বপ্ন, ইহা পাগলের প্রলাপ।" মানুষের মন তাহা মানিয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু এই শাণিত খড়্গের আঘাত কল্পনার চিত্রশালার গায়ে একটুও আঁচড় কাটিতে পারে নাই। তাহাতেই ত শিল্পীর আনন্দ! আপনার শিল্পসৃষ্টিকে অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিলেই সত্যভাষণের এই শেষ আঘাতটুকু সার্থক হয়। না হইলে মোহ-মুদ্গর লিখিলেও চলিত।

পুরাকালে উপকথা কি আরব্য উপন্যাসের যুগে অদ্ভুত রসের খেলা একেবারে কাঁচামনে অনেক বিস্ময় ও রহস্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু সে ছিল কল্পনার পথে কোনো বাধা না মানিয়া সিধা ছুটিয়া যাওয়া। তাহাতে আর্টের প্রয়োজন যথেষ্ট থাকিলেও কোনো বিধি নিষেধ কি সত্যমিথ্যার সুকৌশল ভেজালের কোনো ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখনকার দিনে কল্পনাকে এমন করিয়া পরিবেশন করিতে হয় যেন তাহার মধ্যে কতটুকু খাঁটি ও কতটুকু ভেজাল তাহা চট্ করিয়া ধরা না পড়ে এবং একেবারে শেষে যখন যাদুকর আপনি আপনার খেলার স্বপ্ন-অঞ্জনটি মুছিয়া লন তখনও স্বপ্নের নেশা না টুটিয়া যায়। স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইলেও যেন ইচ্ছা করে সজাগ দৃষ্টিকে বন্ধ করিয়া আবার স্বপ্ন দেখি। মানুষের জীবনের নানা সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার মানুষের যে অসীম আগ্রহ, অদ্ভুত রসসৃষ্টিতে সার্থক আর্টিষ্ট তাহারই ক্ষুধা মিটান।

আধুনিক যুগের অতি-বাস্তব গল্পরচনায় বিস্ময় ও রহস্যসৃষ্টির সার্থক চেষ্টা প্রায় চোখেই পড়ে না। মানুষের মন ও চোখকে পার্থিব ব্যাপারেই কেবল ডুবাইয়া না রাখিয়া কল্পলোকের সন্ধানে ছুটাইতে পারিলে তরুণ শিল্পীরা তারুণ্যেরই পরিচয় দিবেন। তরুণ মন যদি আর্টের পথ-যাত্রায় এই রহস্যনিকেতনকে এড়াইয়া যায় তাহা হইলে বার্দ্ধক্যের দেউড়িতে আসিয়া পড়িতে তাহার বেশী দেরী হয় না। রহস্য লোকের পুঁজি অনন্ত, কিন্তু বাস্তব জগৎ একান্তই সসীম। সুতরাং এ পথ ছাড়িয়া গেলে পথযাত্রার আনন্দ বেশীর ভাগই বাদ পড়িয়া যায়। আমাদের চিরতরুণ শিল্পীর নিকট নবীন শিল্পীরা এই পথের সন্ধান জানিয়া লইলে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী রস-পিপাসুরা ধন্য হইবেন।

শ্রীশান্তা দেবী

রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী কিছুদিন আগে প্রকাশিত হ'য়েছে*। এই বইতে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের একটি 'সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা', আর 'দেবেন্দ্রনাথের সন্তানাদির' একটি তালিকা আছে। তারপরে ১৭ পৃষ্ঠা 'বর্ষপঞ্জী' :—"রবীন্দ্রনাথের জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা ও প্রকাশিত সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা।" সমসাময়িক কোনো কোনো ঘটনার তারিখও প্রভাত বাবু দিয়েছেন।

গোড়াতেই বলা ভালো, যে, তারিখ সম্বন্ধে আমি একটু খুঁটিয়ে আলোচনা ক'রেছি। এতোটা চুল-চেরা বিচার করা আদৌ প্রয়োজন কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। সাহিত্য-আলোচনার জন্য সাধারণতঃ খুব বেশী সূক্ষ্ম হিসাব দরকার হয় না। মোটামুটি কোন্‌টি কোন্ সময়ের লেখা জানা থাকলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু তারিখ যদি উল্লেখ করা হয় তো তা নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ বর্ষপঞ্জীর একমাত্র কাজ হ'চ্ছে তারিখের হিসাব দেওয়া। তাই বর্ষপঞ্জীর তারিখ যাতে নির্ভুল হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ এতো বড়ো একজন লেখক, যে, তাঁর সম্বন্ধে যতোই খুঁটিয়ে আলোচনা করা যাক্ না কেন, 'অধিকন্তু ন দোষায়' এ-কথা বলা চলে।†

১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত প্রধান ঘটনা উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। অনেক জিনিষ বাদ না দিয়ে উপায় নেই। এবং কোন্ ঘটনাটি প্রধান বা কোন্‌টি অপ্রধান তা নিয়ে মতভেদও অবশ্যম্ভাবী। মোটের উপরে প্রভাত বাবুর ঘটনা-নির্ব্বাচন ভালোই হয়েছে বলা যেতে পারে।

প্রভাত বাবুর বইতে নেই, অথচ আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করি এমন ঘটনা অনেক আছে :—রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য সভায় প্রথম বক্তৃতা (বিষয় : 'সঙ্গীত'), ১৮৮১ ; ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য বিলাত যাত্রা ও মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাবর্ত্তন, ১৮৮১ ; রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য পরিষৎ স্থাপনের চেষ্টা, ১৮৮১-৮৩ ; আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, ১৮৮৪-১৯১১ ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সময়ে সাহায্য, ও প্রথম সহঃ সভাপতি, ১৮৯৪ ; বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম সভাপতি, ১৯০৭ ; শেলি-শতবার্ষিকীর সভাপতি, ১৯২২ ; Indian Philosophical Congressএর প্রথম অধিবেশনে সভাপতি, ১৯২৫ ; ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রামমোহন রায় সম্বন্ধে উপদেশ, ১৯২৮, ইত্যাদি।

অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে ছেলেবেলা থেকেই সখ আছে। তিনি ষোলো বছর বয়স থেকে এখনো পর্য্যন্ত অনেক অভিনয়ে যোগ দিয়েছেন ; শুধু তাই নয় বাংলা দেশে নাট্য-কলার উন্নতি সাধনে নানা-রকমে সহায়তা করেছেন। অথচ প্রভাত বাবু এ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই লেখেন নি। এখানে একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলে হয়তো কাজে লাগবে।*

রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ; ষোলো বছর বয়সে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "এমন কর্ম্ম আর করব

* লেখক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ফর্ম্মা, ৪+২+১৭ পৃষ্ঠা। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮।

† যেখানে তারিখ ভুল দেখিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে কেন ভুল মনে করি সংক্ষেপে তার কারণ দেখাতে চেষ্টা করেছি। আমার দেওয়া তারিখ সব্বত্র নির্ভুল না হ'তে পারে ; কিন্তু আমার প্রমাণগুলি হাতের কাছে থাকলে ভুল সংশোধন করার সুবিধা হবে। এইজন্য প্রভাতবাবু বা অন্য কেউ যদি আমার দেওয়া তারিখ ব্যবহার করেন তো তাঁদের কাছে অনুরোধ, যে, তাঁরা যেন সেই সঙ্গে বর্ত্তমান প্রবন্ধের সন্ধানও উল্লেখ করেন।

* যেখানে তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, সেখানে একটি প্রশ্ন (?) চিহ্ন দিয়েছি।

না" প্রহসনে 'অলীকবাবু' সেজেছিলেন। তারপরে, "বাল্মীকি-প্রতিভা"-তে 'বাল্মীকি' (১৮৮১); "কাল-মৃগয়া"-তে 'অন্ধমুনি' (১৮৮২); "মায়ার খেলা"-তে 'মায়া কুমারী' (১৮৮৬?); "রাজা ও রাণী"-তে 'বিক্রমদেব' (১৮৮৮?); "বিসর্জ্জন" নাটকে 'রঘুপতি' (১৮৮৮? আন্দাজ ২৭ বছর বয়সে) আর পরে 'জয়সিংহ' (১৯২৪; ৬৩ বৎসর বয়সে); "বৈকুণ্ঠের খাতা"-য় 'কেদার' (১৮৯৭?); "শারদোৎসব" নাটকে 'সন্ন্যাসী' (১৯০৮): "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' (১৯১০); "রাজা"-তে 'ঠাকুরদাদা' (১৯১১); "অচলায়তন" নাটকে 'আচার্য্য' (১৯১৪?); "ফাল্গুনী"-তে 'কবি' ও 'অন্ধ-বাউল' (১৯১৫, ১৯১৬); "ডাকঘর" নাটকে 'ঠাকুর্দ্দা' (১৯১৭); "তপতী"-তে 'বিক্রম' (১৯২৯); "নটীর পূজা"-য় 'ভিক্ষু উপালি' (১৯৩১) সেজেছেন। উপরের তালিকা প'ড়লেই বোঝা যায়, যে, অভিনয় সম্বন্ধেও কবির প্রতিভা কী রকম সর্ব্বতোমুখী। পুরোপুরি নাটক ছাড়া, 'বর্ষামঙ্গল' (১৯২১, ১৯২২), 'শারদোৎসব' (১৯২২), 'বসন্ত-উৎসব' (১৯২৩), 'সুন্দর' (১৯২৫), 'শেষ-বর্ষণ' (১৯২৫), 'ঋতু-রঙ্গ' (১৯২৭), 'নবীন' (১৯৩১), 'গীত-উৎসব' (১৯৩১), 'শাপ-মোচন' (১৯৩১) প্রভৃতি গীত ও নৃত্য-উৎসবে যোগ দিয়েছেন।

যা হোক্ বর্ষপঞ্জীর আসল বিচার এর তারিখ নিয়ে। প্রভাত বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক, প্রায় কুড়ি বছর রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতনে গ্রন্থাগারিকের কাজ করছেন। তাঁর লেখা সব তারিখ সকলেই প্রামাণ্য ব'লে মেনে নেবে। তাঁর বইতে কোনো ভুল থাক্‌লে সেই ভুল ক্রমে পাকা হয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা। তাই এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার।

সংক্ষিপ্ত বংশলতিকা

প্রভাত বাবু রবীন্দ্রনাথের বংশ-লতিকা আরম্ভ ক'রেছেন কবির উপরিতন ৬ষ্ঠ পুরুষ জয়রামের সময়-থেকে। এর আগেকার কথা সংক্ষেপে একটু ব'লে দিলে ভালো হ'তো।

রবীন্দ্রনাথ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, ভট্টনারায়ণের বংশধর। কুলশাস্ত্রের মতে ঠাকুর-গোষ্ঠি পিঠাভোগের কুশারীবংশীয়। কুশারীরা ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীর বংশজাত। এই বংশের জগন্নাথ কুশারী আদি পিরালী গুড়ী শুকদেব রায়চৌধুরীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে পিরালীদোষযুক্ত হন।* জগন্নাথ কুশারীর পুত্র পুরুষোত্তম হচ্ছেন ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ। পুরুষোত্তম থেকে জয়রাম সাত পুরুষ। জয়রামের পিতা পঞ্চানন সম্ভবতঃ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে দেশ ছেড়ে গোবিন্দপুরে এসে আদি গঙ্গার ধারে (বর্ত্তমান 'টালির নালা'-র কাছে) বসবাস আরম্ভ করেন। সেখানকার ব্যবসায়ীরা তাঁকে 'ঠাকুর মশাই' ব'লে ডাক্‌তে আরম্ভ করে, আর তাই থেকে ক্রমে তাঁর নাম দাঁড়িয়ে যায় 'পঞ্চানন ঠাকুর।' এই থেকে ঠাকুর উপাধির উৎপত্তি। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জরীপ হওয়ার সময়ে পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম আমীন-পদে নিযুক্ত হন। প্রভাত বাবু জয়রামের মৃত্যু তারিখ দিয়েছেন ১৭৬২ খৃঃ। অথচ ব্রা. বি.† ২৮৫ পৃষ্ঠায় পাই :—"১১৬২ সালে (১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে) জয়রাম আমীনের মৃত্যু হয়। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের যে মেরামত উপলক্ষ করিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে মেরামতকালে তাঁর মৃত্যু হইয়াছে।"

এই সম্বন্ধে খোঁজ করার জন্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম (১৮ জানুয়ারি, ১৯৩২)। তিনি বলেন, যে, ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী অনেক পুরানো কাগজপত্র পরীক্ষা ক'রে এই সব তারিখ স্থির ক'রেছিলেন। নগেন্দ্র বাবু আরও বলেন, যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ‡ মহাশয়ও ঠাকুর-গোষ্ঠির ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকদিন ধ'রে আলোচনা ক'র্‌ছেন। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্রবাবুও বলেন, যে, জয়রাম আমীনের মৃত্যু হয় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে।

জয়রামের ৫ সন্তান, ৪ পুত্র ও এক কন্যা :—আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ, গোবিন্দরাম ও সিদ্ধেশ্বরী [ব্রা. বি. ২৮৪]।

* প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর পিরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ বইতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে পিরালী থাকের উৎপত্তি হয় আন্দাজ ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে (ব্রা. বি. ১৭৪)।

† যে সব বই বা প্রবন্ধ থেকে নজীর সংগ্রহ করেছি, প্রবন্ধের শেষে তাদের সংক্ষিপ্ত নামের সঙ্কেত দিয়েছি।

‡ ইনি ৺রামমণি ঠাকুরের দৌহিত্র (ও দ্বারকানাথের ভাগিনেয়) ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক খবর এঁর কাছে পেয়েছি।

অথচ প্রভাতবাবু শুধু দুইজন পুত্রের কথা লিখেছেন।

আবার এই দুজনের মধ্যে প্রভাতবাবু দর্পনারায়ণকে জ্যেষ্ঠ ও নীলমণিকে কনিষ্ঠ ব'লে দেখিয়েছেন। ব্রা. বি. —অনুসারে নীলমণি জ্যেষ্ঠ ও দর্পনারায়ণ কনিষ্ঠ। পাথুরেঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠির আদি বাড়ি প্রতিষ্ঠার সময়ে জমি কেনা হয় নীলমণির নামে, ১১৭১ সালের ১৬ই চৈত্র তারিখের দলিলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ১১৭৬ সালের ২৫ অগ্রহায়ণ তারিখেও আবার জমি কেনা হয় নীলমণির নামে। ১৭৮৩ ও ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সম্পত্তি-বিভাগ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় যে বংশলতা দাখিল করা হয় তাতেও নীলমণিকেই দর্পনারায়ণের বড়ো ভাই ব'লে উল্লেখ করা হয়। [ব্রা. বি. ২৮৬-৮৭, ২৯৫]। খগেন্দ্রবাবুও এই মত সমর্থন করেন।

জয়রাম মারা যাওয়ার পরে অনেক বছর পর্যন্ত নীলমণি ও দর্পনারায়ণ একসঙ্গে পাথুরেঘাটায় বাস করেন। পরে সম্পত্তি-বিভাগ হয়। ১১৯১ সালের আষাঢ় মাসে (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে) নীলমণি জোড়াসাঁকোয় বাস আরম্ভ করেন [ব্রা. বি ৩১৭]। নীলমণির দুই পুত্র, রামলোচন (১৭৫৪—১৮০৭) আর রামমণি (১৭৫৯—১৮৩৩)। প্রভাত বাবু রামলোচনের মৃত্যু-বৎসর দিয়েছেন কিন্তু জন্মকাল দেননি, আর রামমণির জন্ম-বৎসর দিয়েছেন, মৃত্যুর তারিখ দেন নি। রামলোচনের জন্ম-বৎসর আনুমানিক ১৭৫৪ খৃঃ [ব্রা. বি. ৩১৮]। রামমণির মৃত্যু বৎসর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন সেপ্টেম্বর (?) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ [ব্রজেন্দ্র (২), ২১৪ (?)]। মেনকাদেবীর (মৃঃ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ) গর্ভে রামমণির ৪ সন্তান জন্মে: রাধানাথ, জাহ্নবী দেবী, রাসবিলাসী (মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃদেবী), ও দ্বারকানাথ; আর গঙ্গাদেবীর গর্ভে ২ সন্তান, রমানাথ ও দ্রবময়ী। প্রভাতবাবু এঁদের মধ্যে শুধু রাধানাথ, দ্বারকানাথ আর রমানাথের নাম দিয়েছেন, আর রমানাথ যে এঁদের বৈমাত্রের ভাই তাও দেখান নি।

রামমণি ও মেনকাদেবীর দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথকে (জন্ম ১৭৯৪, মৃত্যু ১ আগষ্ট, ১৮৪৬ খৃ.) রামলোচন দত্তক গ্রহণ করেন। প্রভাত বাবুর বইতে রামমণির প্রথম পুত্র রাধানাথকে রামলোচনের দত্তক-পুত্র ব'লে দেখানো হ'য়েছে। এটা সম্ভবতঃ ছাপার ভুল, কারণ দ্বারকানাথই যে রামলোচনের দত্তক-পুত্র এ কথা সকলেই জানে। রাধানাথ দ্বারকানাথের অগ্রজ, রামলোচন মারা যাওয়ার পরে দ্বারকানাথের নাবালক অবস্থায় তিনি দ্বারকানাথের অভিভাবক নিযুক্ত হন। কিন্তু রামলোচনের সম্পত্তিতে তাঁর কোনো অধিকার ছিল না।

প্রভাতবাবু দ্বারকানাথের তিন ছেলের নাম দিয়েছেন, আসলে দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্র:—দেবেন্দ্র নাথ, নরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ [ব্রা বি. ৩৪০]। নরেন্দ্রনাথ শৈশবে, আর ভূপেন্দ্রনাথের ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আন্দাজ তেরো বছর বয়সে মৃত্যু হয়। [ব্রজেন্দ্র, (১), ৬০৮]।

দেবেন্দ্রনাথের সন্তানাদি

প্রভাতবাবুর এই তালিকার মধ্যেও অনেক ভুল আছে।

(১) প্রভাতবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান ব'লে উল্লেখ করেছেন, তা ঠিক নয়। অজিত বাবু দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতে লিখেছেন:—"১৮৩৭ কি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার প্রথমে একটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে এবং জন্মের পরে মারা যায়।" [অজিত. ১১৪]

খগেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে আরো বেশি খবর দিয়েছেন। মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দৈনিক হিসাবের খাতায় তিনি পেয়েছেন, যে, ১২৪৫ সালের আশ্বিন মাসে দেবেন্দ্রনাথের পত্নীর সাধ উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়ার বাবদ খরচ লেখা আছে। এর থেকে আন্দাজ করা যায়, যে, ১২৪৫ সালের আশ্বিন, কার্তিক, বা অগ্রহায়ণ মাসে, অর্থাৎ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মহর্ষির এই কন্যা জন্ম লাভ করে। খগেন্দ্র বাবু বলেন, তিনি রামমণি ঠাকুরের কন্যা (দ্বারকানাথের ভগ্নী) দ্রবময়ীদেবীর জীবদ্দশায় তাঁর কাছেও শুনেছেন, যে, এই কন্যা অল্প বয়সেই, একবছরের মধ্যে, মারা যায়।

(২) দ্বিজেন্দ্রনাথ। প্রভাত বাবু জন্ম বৎসর দিয়েছেন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। খগেন্দ্রবাবুর কাছে পেয়েছি:— ১২৪৬ সাল, ২৭ চৈত্র, বুধবার, বাসন্তী পূজার মহাষ্টমী, অর্থাৎ

৮ এপ্রিল, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। খগেন্দ্র বাবুর তারিখ পুরাণো খাতা থেকে নেওয়া কাজেই একে প্রামাণ্য ব'লে স্বীকার ক'রতে হবে। অজিত বাবু একজায়গায় [অজিত, ১১৪] লিখেছেন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে; প্রভাত বাবু সম্ভবতঃ এইখান থেকেই তারিখ নিয়েছেন। কিন্তু অজিত বাবু আরেক জায়গায় [অজিত, ১২২] লিখেছেন: "১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৭৬১ শকে) দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।" অজিত বাবুর ১৭৬১ শক খগেন্দ্র বাবুর ১২৪৬ সালের সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে। তাতে মনে হয়, যে, অজিত বাবুও ১৭৬১ শকই পেয়েছিলেন, পরে ৭৮ যোগ ক'রে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হিসাব করেন, কিন্তু খেয়াল করেন নি যে ২৭ চৈত্র তারিখ হওয়ার দরুণ, ৭৮ নয়, ৭৯ যোগ করা দরকার।

দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম এপ্রিলমাসে, কাজেই জন্ম-বৎসর ১৭৬১+৭৯=১৮৪০ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যুর তারিখ:—৪ মাঘ ১৩৩২, ইংরাজি, ১৮ জানুয়ারি, ১৯২৬।

(৩) সত্যেন্দ্রনাথ। প্রভাতবাবু জন্ম-বৎসর দিয়েছেন ১৮৪১ খৃঃ। খগেন্দ্রবাবুর মতে:—বুধবার, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১২৪৯, অর্থাৎ ইংরাজি ১ জুন, ১৮৪২। মৃত্যু:—২৪ পৌষ, ১৩২৯, ইংরাজি ৮ জানুয়ারি ১৯২৩।

(৪) হেমেন্দ্রনাথ। প্রভাতবাবু জন্ম-বৎসর লিখেছেন ১৮৪৩ খৃঃ, আর মৃত্যুর তারিখ কিছু দেন নি। খগেন্দ্রবাবু জন্ম-তারিখ দিয়েছেন:—মঙ্গলবার, ১১ মাঘ, ১২৫০, অর্থাৎ ইংরাজি ২৩ জানুয়ারি, ১৮৪৪। মৃত্যুর তারিখ:— ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১, ইংরাজি ৯ জুন ১৮৮৪। (আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কাছে মৃত্যু-তারিখ পেয়েছি)।

(৫) বীরেন্দ্রনাথ। প্রভাতবাবু জন্ম বা মৃত্যু-তারিখ দেন নি। খগেন্দ্রবাবুর মতে, জন্ম:—৯ অগ্রহায়ণ, ১২৫২; ইংরাজি ২৩ নভেম্বর, ১৮৪৫। মৃত্যু:—২৭ বৈশাখ, ১৩২২; ইংরাজি ১০ মে, ১৯১৫। (জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির দৈনিক হিসাবের খাতায় এই তারিখ আছে।)

(৬) সৌদামিনী দেবী। জন্ম বা মৃত্যু তারিখ বংশপঞ্জীতে নেই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৪২ শক, ১৪৬ পৃষ্ঠা) পাই, যে, ১৩২৭ সালের ৩০ শ্রাবণ (১৫ আগষ্ট, ১৯২০) তারিখে এঁর মৃত্যু হয়। খগেন্দ্রবাবুর মতে, জন্মকাল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ।

(৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। প্রভাতবাবু জন্ম তারিখ দেন নি। জন্ম:—২২ বৈশাখ, ১২৫৫, ইংরাজি ৩ মে, ১৮৪৮ খৃঃ। মৃত্যু:—২০ ফাল্গুন, ১৩৩১, ইংরাজি ৪ মার্চ্চ, ১৯২৫ [মন্মথ, ৪]

(৮) সুকুমারী দেবী। প্রভাতবাবু কোনো তারিখ দেন নি। খগেন্দ্রবাবুর মতে, জন্ম ১৮৪৯, মৃত্যু ১৮৬৪ খৃঃ।

(৯) পুণ্যেন্দ্রনাথ। প্রভাতবাবু পূর্ণেন্দু নামে এক পুত্রকে দেবেন্দ্রনাথের ১১শ সন্তান ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। খগেন্দ্রবাবু বলেন, যে, আন্দাজ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এক পুত্র সন্তান জন্মে, যার নাম তিনি দুরকম শুনেছেন, পুণ্যেন্দ্র বা পূর্ণেন্দ্র। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পূর্ণেন্দ্র নাম গ্রহণ করেছেন [আত্ম-জীবনী, ৩১]। রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি (২৩ জানুয়ারি, ১৯৩২), যে, এঁর নাম ছিল পুণ্যেন্দ্রনাথ। সৌদামিনী দেবী ['পিতৃ-স্মৃতি', ৪৭২] পুণ্যেন্দ্র নামই ব্যবহার ক'রেছেন। সৌদামিনী দেবীর প্রবন্ধ থেকেই জানা যায়, যে, সিপাইবিদ্রোহের সময়ে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, পুণ্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

(১০) শরৎকুমারী দেবী। প্রভাতবাবু কোনো তারিখ দেন নি। খগেন্দ্রবাবুর মতে জন্ম সম্ভবতঃ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু:—১০ আষাঢ় ১৩২৭; ২৪ জুন, ১৯২০ [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪২, ১৪৬]।

(১১) স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রভাতবাবু জন্ম-বৎসর দিয়েছেন ১৮৫৭। শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর কাছে তাঁর মায়ের জন্ম তারিখ পেয়েছি:—১৪ ভাদ্র, ১২৬২; ২৮ আগষ্ট, ১৮৫৬ খৃঃ।

(১২) বর্ণকুমারী দেবী। প্রভাতবাবু কোনো তারিখ দেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে (কথাবার্ত্তা, ৩১ মার্চ্চ ১৯৩২) জন্ম-বৎসর পেয়েছি:—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রভাতবাবু এঁকে মৃত ব'লে চিহ্নিত করেছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, আজ (৯ই এপ্রিল, ১৯৩২) তারিখেও ইনি জীবিত আছেন, এবং আমরা আশা করি আরও অনেকদিন জীবিত থাকবেন।

(১৩) সোমেন্দ্রনাথ। প্রভাতবাবু কোনো তারিখ দেন নি। খগেন্দ্রবাবুর মতে জন্ম আন্দাজ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ।

মৃত্যু :—১৬ মাঘ, ১৩২৮, ৩০ জানুয়ারি, ১৯২২। [তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৩, ২৮৯]।

(১৪) রবীন্দ্রনাথ। জন্ম :—২৫ বৈশাখ, ১৭৮৩ শক, বাংলা ১২৬৮, ইংরাজি ৬ মে, ১৮৬১।

(১৫) বুধেন্দ্রনাথ। প্রভাতবাবু কোনো তারিখ দেন নি। খগেন্দ্রবাবুর মতে এই পুত্রের জন্ম হয় আন্দাজ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু আন্দাজ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে।

সমসাময়িক ঘটনা

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের কোনো কোনো সমসাময়িক ঘটনার কথাও প্রভাতবাবু উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ ঘটনার তারিখ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, অথচ প্রভাতবাবু ভুল তারিখ দিয়েছেন।

প্রভাতবাবু লিখেছেন :—১২৭১ সালে "কেশবচন্দ্র মহর্ষিকে ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন।" মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতভেদ এর অনেকদিন আগে আরম্ভ হয়, কিন্তু ১২৭১ সালে কেশবচন্দ্র কলিকাতা- (এখন, আদি-) ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি। এমন কি ১২৭২ সালের শেষের দিকে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) ১১ই মাঘের উৎসবে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণে বেদী গ্রহণ করেন এবং বিবেক ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। [অজিত. ৪১৬। কেশবচন্দ্র. ৬২]

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার তারিখও প্রভাতবাবু ভুল লিখেছেন। নোতুন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয় ১২৭১ সালে নয়, ১২৭৩ সালে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে। [কেশবচন্দ্র. ৮৮]

প্রভাতবাবু লিখেছেন "১২৭৭ (১৮৭০—৭১)—কেশবচন্দ্র প্রবর্ত্তিত বিবাহ আইন।" প্রথম কথা, Civil Marriage Act পাশ হয় ২২শে মার্চ্চ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। Act III of 1872 নামেই এই আইন প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় কথা, কেশবচন্দ্র এই আইন প্রবর্ত্তন করেন নি। তিনি নিজে সিভিল বিবাহের বিরোধী ছিলেন। অনেকদিন অপেক্ষা করার পরে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বাধ্য হ'য়ে এই আইনে মত দিয়েছিলেন। [ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি, ১২]

প্রভাতবাবু রামনারায়ণের 'নব-নাটক' অভিনয়ের তারিখ দিয়েছেন ১২৭৪ সাল। তা ঠিক নয়। নবনাটক অভিনয়ের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্র-নাথকে নবনাটক অভিনয়ের আয়োজন করার জন্য প্রশংসা ক'রে এক চিঠি লেখেন, সেই চিঠির তারিখ ৪ঠা মাঘ, ১৭৮৮ শক, (অর্থাৎ ১৬ই জানুয়ারি, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ) বা ১২৭৩ সাল [অজিত, ৪৭০]। মন্মথবাবু [১৩ পৃষ্ঠা] প্রথম অভিনয়ের তারিখ দিয়েছেন :—৫ জানুয়ারি, ১৮৬৭ খৃঃ, ২২ পৌষ ১২৭৩।

প্রভাতবাবু ১২৮৩ সালকে 'হিন্দুমেলার যুগ' ব'লে লিখেছেন। প্রথম হিন্দুমেলা হয় এর ১০ বছর আগে, ১২৭৩ সালে (১৭৮৮ শক, ১৮৬৭ খৃঃ) চৈত্র মাসে। [রাজনারায়ণ. ২০৮। অজিত ৪৬৯]। ১৮৭৫ সালের মেলা হয় পার্শিবাগানে। সেবার রাজনারায়ণবাবু ছিলেন সভাপতি। [রাজনারায়ণ. ২১৫]। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা পাঠ করেন। ব্রজেন্দ্রবাবু সম্প্রতি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে এই কবিতাটি উদ্ধার করেছেন *। [প্রবাসী ১৩৩৮, মাঘ,৫৮০-৫৮১]।

প্রভাতবাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর বছর লিখেছেন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ। পনেরো বছরের ভুল হ'য়েছে, কারণ, মাইকেলের মৃত্যু হয় ১৭ আষাঢ়, ১২৮০, অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। [সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪, ২৬]।

রবীন্দ্রনাথের লেখা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো লেখকের বর্ষপঞ্জীর প্রধান কাজ কোন্ বই কবে প্রকাশিত হয় তার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা বইগুলিকে † মোটামুটি কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পুস্তক, (২) স্বরলিপি, (৩) পাঠ্য-পুস্তক, (৪) পুস্তিকা। আরও আছে, (৫) যে সব বইতে অন্য লোকের লেখার সঙ্গে কবির লেখা ছাপা হয়েছে, আর (৬) কবি কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ। প্রভাত বাবু

---

* এই কবিতাটির কথা Golden Book of Tagore এর মধ্যে Chronicle অংশে উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার সন্ধান পেয়েছিলাম ব্রজেন্দ্র বাবুর কাছে। প্রবাসী প্রকাশিত হওয়ার আগে তিনি আমাকে এই কবিতাটি দিয়েছিলেন। স্থানাভাববশতঃ Chronicle এ কোনো নজীর দিতে পারা যায়নি, তাই সেখানে ব্রজেন্দ্রবাবুর নাম উল্লেখ করতে পারিনি।

† মাসিক পত্রে যে সব লেখা বেরিয়েছে প্রভাত বাবু সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি। আমিও সে বিষয়ে কিছু বল্‌বো না।

এর কোনোটিকেই বাদ দেন নি কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁর তালিকায় নানা রকম ভুল আছে।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত বাংলা বই বেশি নেই। ২৪ বছর বয়সে ৺ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পদরত্নাবলী' সম্পাদন ক'রেছিলেন (বাংলা ১২৯২ সাল, ১৮৮৫ খৃঃ), প্রভাত বাবু ঠিক তারিখ দিয়েছেন। সম্প্রতি, বর্ষ-পঞ্জী প্রকাশ হওয়ার পরে, বেরিয়েছে 'কুরুপাণ্ডব' (১৩৩৮ সাল; ১৯৩১ খৃঃ)।

অন্য লোকের লেখার সঙ্গে কবির লেখা ছাপা হয়েছে এমন বই আছে অসংখ্য। বাংলা ভাষার পাঠ্য-পুস্তক বোধহয় খুব কমই আছে যাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো লেখা ছাপা হয় নি। তারপরে গানের সংগ্রহ। আদি, নব-বিধান, ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত। শুধু শেষের বই খানাতেই (নোতুন সংস্করণ, ১৩৩৮) বোধ হয় কবির রচিত প্রায় পাঁচ শো গান ছাপা হয়েছে। কিছুদিন থেকে অনেক খৃষ্টীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বাংলা গানের বইতেও কবির গান নেওয়া হ'চ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সাধারণ গানের সংগ্রহ আছে। তারপরে, নানারকম কবিতা-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছড়িয়ে আছে। কবি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন এমন বইয়ের সংখ্যাও বড়ো কম হবে না। নানারকম বই বা ছোটোখাটো অনেক পুস্তিকার মধ্যেও কবির লেখা ছাপা হয়। বিশেষতঃ নানারকম প্রোগ্রামের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা প্রায়ই উদ্ধৃত হ'য়ে থাকে। প্রভাতবাবু এ রকম শুধু দুখানি পুস্তিকার নাম ক'রেছেন। আমাদের মতে দু তিনটি বইয়ের নাম ক'রে বিশেষ লাভ নেই, এগুলি আপাততঃ বাদ দেওয়াই ভালো।

পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে প্রভাতবাবু একটি ভালো তালিকা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আগে কেউ কিছু লেখেন নি, প্রভাতবাবুর তালিকাটি সেই জন্য বিশেষ মূল্যবান। কিছু কিছু অসম্পূর্ণ আছে বটে, কিন্তু প্রভাতবাবু ইচ্ছা ক'র্‌লেই সম্পূর্ণ ক'রে দিতে পারবেন।

'পুস্তক' আর 'পুস্তিকা'র সংজ্ঞা-নির্ণয় করা সহজ নয়। তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে লাভ নেই। মোটের উপর বলা যায়, যে, কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে পঠিত বক্তৃতা বা কবিতা, বা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের পদ্ধতি (প্রোগ্রাম) রূপে ব্যবহার করার জন্য ছাপানো জিনিষকে আমরা 'পুস্তিকা' ব'লে থাকি। তবে যদি বিষয় বস্তু একখানি সম্পূর্ণ কাব্যের মতো হয়, যেমন, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বা 'কাল মৃগয়া', বা সম্পূর্ণ গল্প হয়, যেমন 'কর্ম্মফল', তবে তাকে 'পুস্তক' বলাই বোধহয় ভালো। পুস্তিকার লেখা সাধারণতঃ বারবার আলাদা ক'রে ছাপানো হয় না, প্রায়ই পরে অন্য কোনো পুস্তকের অন্তর্গত হ'য়ে যায়। (এরও ব্যতিক্রম আছে, যেমন, 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' পুস্তিকাকারেই পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছে)।

পুস্তিকার সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করা শক্ত কাজ। কিন্তু প্রভাতবাবু যে তালিকা দিয়েছেন তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। অনেক প্রসিদ্ধ পুস্তিকার নাম তাঁর বইতে বাদ প'ড়েছে। প্রভাতবাবু স্বরলিপি-র যে তালিকা দিয়েছেন,—তাও অসম্পূর্ণ। যাই হোক্, স্বরলিপি বা পুস্তিকা সম্বন্ধে এখানে আর বেশি কিছু ব'ল্‌বো না।

যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ক'র্‌ছেন তাঁদের পক্ষে সব চেয়ে বেশি জানা দরকার, পুস্তক প্রকাশের তারিখ। পুস্তক সম্বন্ধে বর্ষপঞ্জীতে যেসব ভুল চোখে প'ড়েছে তা নীচে লিখ্‌ছি। প্রভাতবাবু শুধু ১ম সংস্করণের কথা উল্লেখ ক'রেছেন, মন্তব্যে আমি ১ম সংস্করণের কথাই আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' কিংবা তাঁর নিজের মুখে যা শোনা যায় তার চেয়ে বেশী বিশেষ কিছু জানা নেই। তাই তাঁর বাল্যকালের ঘটনা সম্বন্ধে ঠিক তারিখ দেওয়া শক্ত। পুরাণো কাগজপত্র ভালো ক'রে খুঁজে দেখলে সম্ভবতঃ অনেক খবর এখনও পাওয়া যেতে পারে।

প্রভাত বাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ স্কুলে প্রথম ভর্ত্তি হন ১২৭৬ সালে, অর্থাৎ ৮ বছর বয়সে। কিন্তু 'জীবন-স্মৃতি'র বর্ণনা প'ড়লে মনে হয় আরও কম বয়স। "একদিন দেখিলাম দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয়

সত্য, ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইস্কুলে যাইবার যোগ বলিয়া গণ্য হইলাম না। উচ্চৈঃস্বরে কান্না ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না।··· কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অকালে ভর্তি হইলাম।" [জীবন-স্মৃতি, পৃঃ ৪—৫]। কবিকে কিছুদিন আগে একথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম (৩০ জানুয়ারি, ১৯৩২)। তিনি বলেন, যে, পাঁচ বছর বয়সে প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হন।

কবি বলেন, যে, স্কুলে ভর্তি হওয়ার অল্পদিন পরেই কবিতা লেখা সুরু হয়, আন্দাজ ৬ বছর বয়সে। জীবন-স্মৃতি প'ড়লে যে ধারণা হয় তার সঙ্গে একথা মিল্‌ছে। প্রভাত বাবুর মতে ৮ বছর বয়সে কবিতা লেখা আরম্ভ হয়। আমাদের মতে, তার বেশ কিছুদিন আগে, আন্দাজ ৬।৭ বছর বয়সে।

১৪ বছর বয়সে (১৮৭৫ খৃঃ) 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় 'বনফুল'* কাব্য প্রকাশের কথা প্রভাতবাবু লিখেছেন। মাসিক-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই প্রথম লেখা বেরুনো সুরু হ'লো, এ সম্বন্ধে আরও দুয়েকটা কথা বলা যেতে পারে। এই পত্রিকার পুরো নাম 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণদাস। ১২৮২, অগ্রহায়ণ মাসে ৪র্থ খণ্ড আরম্ভ হয়। ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৮২, ইংরাজি হিসাবে ১৪ নভেম্বর, ১৮৭৫। কিন্তু বেঙ্গল-লাইব্রেরী-তালিকায় দেখ্‌ছি, যে, অগ্রহায়ণ সংখ্যা জ্ঞানাঙ্কুর প্রকাশের তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬, অর্থাৎ বাংলা ১৪ ফাল্গুন, ১২৮২। এই মাসেই 'প্রলাপ' নামে কবিতা-গুচ্ছও ছাপা আরম্ভ হয়। পত্রাঙ্ক হিসাবে 'বন-ফুল' কাব্যের (১ম সর্গ, ৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা) আগে 'প্রলাপ'-এর (১৫ পৃষ্ঠা) নাম উল্লেখযোগ্য। কবিতা ছাড়া ভুবনমোহিনী-প্রতিভা, অবসর-সরোজিনী, আর দুঃখসঙ্গিনীর গদ্য সমালোচনাও ঐ বছরের জ্ঞানাঙ্কুরে ছাপা হয়।

১৭ বছর বয়সে কবি বিলাত যাত্রা করেন। বোম্বাই থেকে বিলাত রওনা হওয়ার তারিখ ২০শে সেপ্টেম্বর, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', ১ম পত্রের ১ম ছত্রেই এ কথা লেখা আছে। বছর সম্বন্ধে কিন্তু প্রভাত বাবুর ভুল হয়েছে। ১৮৭৮ সালে কবি বিলাতে যান, ১৮৭৯ সালে নয়। তার প্রমাণ এই, যে, ভারতী পত্রিকায় ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে [৪১-৪৮ পৃষ্ঠা] অর্থাৎ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে য়ুরোপ-প্রবাসীর ১ম পত্র বের হয়। (এই সংখ্যা ভারতী প্রকাশের তারিখও পেয়েছি, ১৫ বৈশাখ, ১২৮৬, অর্থাৎ ২৭ এপ্রিল, ১৮৭৯)।

প্রভাত বাবু লিখেছেন :—"বিলাতে 'কবি-কাহিনী' * * কাব্য রচনা সুরু।" তা ঠিক নয়, ভারতী, ১ম খণ্ড, ১২৮৪ সালে, (অর্থাৎ বিলাত রওনা হওয়ার আন্দাজ ৬ মাস আগে) 'কবি-কাহিনী' ধারাবাহিক ভাবে ছাপা শেষ হয়। এমন কি, কবি বিলাত রওনা হওয়ার আগেই এই কাব্যখানি পুস্তকাকারে ছাপা হ'য়ে যায়। [জীবন-স্মৃতি, ১১৮-১১৯]। 'কবিকাহিনী' সম্বন্ধে অনেক দিন আগে প্রবাসীতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। [প্রশান্ত (৩)]। প্রভাতবাবু যে লিখেছেন ১২৮৫ সালের ভারতীতে 'কবি-কাহিনী' প্রকাশ হয়, তাও অবশ্য ভুল।

প্রভাত বাবু লিখেছেন, কবি এক বৎসর বিলাতে ছিলেন। এ কথা ঠিক নয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত রওনা হন্‌। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পুরা বিলাতে ছিলেন। য়ুরোপ প্রবাসীর ১৩শ পত্রে (২৬২ পৃষ্ঠা) প্রমাণ পাই, যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কবি লণ্ডনে র'য়েছেন। কবির কাছে শুনেছি (কথাবার্ত্তা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৩২), যে, জীবন-স্মৃতিতে [১২০-২১ পৃষ্ঠা] এক আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীর বিধবা পত্নীর (Mrs. Wood-এর) নিমন্ত্রণ রক্ষা নিয়ে বিভ্রাটের যে বর্ণনা আছে, সেই ব্যাপার ঘটে বিলাত থেকে চ'লে আসার ঠিক আগে। কবির স্পষ্ট মনে আছে, যে, Mrs. Wood-এর বাড়ী থেকে রাত্রে যখন সরাইতে শুতে যাচ্ছেন, তখন চারদিক বরফে ঢাকা। দেশে ফেরবার পাথেয় বাবদ অনেক টাকা এসে পৌঁছেছে, পকেটে সেই টাকা নিয়ে অপরিচিত সরাইতে রাত কাটাতে বেশ ভয় ক'রছিলো। এর থেকে আন্দাজ করা যায়, যে, এই

* প্রবাসীতে বনফুল সম্বন্ধে আগে আলোচনা করেছি [প্রশান্ত (২)]

ব্যাপার ঘটে ইংরাজি ১৮৮০ সালের জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে। তা হ'লে সম্ভবতঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চ মাসে (১২৮৬ সালের শেষের দিকে), অর্থাৎ বিলাত রওনা হওয়ার আন্দাজ দেড় বছর পরে, কবি দেশে ফিরে আসেন।

প্রভাত বাবু 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার তারিখ দিয়েছেন ১২৮৬। আমাদের মতে ১২৮৭। আগেই বলেছি, যে, কবি দেশে ফিরে আসেন ১২৮৬ সালের একেবারে শেষের দিকে, সম্ভবতঃ ফাল্গুন মাসে। 'জীবন-স্মৃতি'-তে [১৫১-১৫২ পৃষ্ঠা] বাল্মীকি-প্রতিভা রচনা সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তাতে খুব তাড়াতাড়ি এক মাসের মধ্যে রচনা শেষ হয়েছিল ব'লে মনে হয় না। বাল্মীকি-প্রতিভা প্রথম অভিনয় হয় বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষ্যে ; সম্ভবতঃ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে।

প্রভাত বাবু 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশের তারিখ দিয়েছেন ১২৮৮। বইতে এই তারিখ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। বেঙ্গল-লাইব্রেরি-তালিকায় দেখছি, যে, সন্ধ্যা-সঙ্গীত প্রকাশের তারিখ দেওয়া হয়েছে:—৫ জুলাই, ১৮৮২ অর্থাৎ, ২২ আষাঢ়, ১২৮৯। অন্য দিকে, ভারতী, ১২৮৯, বৈশাখ মাসেও সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতা বেরিয়েছে। এই সব দেখে মনে হয়, যে, ১২৮৮ সালে বই ছাপা আরম্ভ হয়, এবং সম্ভবতঃ নাম-পত্র ১২৮৮ সালেই ছাপা হয়ে যায়। কোনো কারণে ছাপা শেষ হ'তে দেরী হওয়ায় বই প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের আষাঢ় মাসে।

প্রভাত বাবু উল্লেখ করেন নি, কিন্তু 'রুদ্রচণ্ড'* আর 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এই দুখানি বইও ১২৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রভাত বাবু লিখেছেন, যে, ১২৮৯ সালে প্রভাত-সঙ্গীতের সূত্রপাত হয়। তা ঠিক নয়। কারণ ভারতী, ১২৮৮ সালে প্রভাত-সঙ্গীতের কবিতা ছাপা হ'য়েছে। [ভারতী, ১২৮৮, ৪৮৩ পৃষ্ঠা]।

প্রভাতবাবু উল্লেখ করেন নি, কিন্তু ১২৮৯ সালেই 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১২৯০ সালের কথায় অনেকগুলি ভুল আছে। প্রভাত বাবু "রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বন্দ্ব" ফেলেছেন ১২৯০ সালে। তা ঠিক নয়। ১২৯১ সালে এঁদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ চ'লেছিলো। প্রভাত বাবুর মতে ১২৯০ সালে "বঙ্কিম বাবুর 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশ।" এ কথা ভুল। 'প্রচার' আরম্ভ হয় শ্রাবণ, ১২৯১ সালে। প্রভাত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ক'রে লিখেছেন, যে, "ভারতী ও প্রচার ১২৯০ দ্রষ্টব্য।" ভারতী, ১২৯০ সাল ভালো ক'রে খুঁজে দেখেছি, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কোনো চিহ্ন নেই, আর আগেই বলেছি, যে, ১২৯০ সালে প্রচারের অস্তিত্ব ছিল না। আসল কথা, ভারতী, ১২৯১, অগ্রহায়ণ মাসে (৩৪০-৩৫০ পৃষ্ঠা) 'একটি পুরাতন কথা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধের নাম উল্লেখ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র ১ম বর্ষ 'প্রচার', ১২৯১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে (১৬৯-১৮৪ পৃষ্ঠা) প্রতিবাদ লেখেন। প্রভাত বাবু লিখেছেন ১২৯০ সালের 'প্রচারে' "রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে।" একথাও অবশ্য ভুল। ১২৯১ সালের প্রচারে কবির লেখা ছাপা হয়েছে,* বঙ্কিম যে প্রবন্ধে কবির লেখার প্রতিবাদ করেছেন ঠিক তার পাশে। প্রভাত বাবু "অক্ষয় সরকারের নবজীবন" প্রকাশের তারিখ দিয়েছেন ১২৯০ সাল। তাও ভুল, 'নবজীবন' আর 'প্রচার' প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হয়, ১২৯১ সালে।

প্রভাতবাবু 'আলোচনা'-র তারিখ দিয়েছেন ১২৯০, তা ঠিক নয়। 'আলোচনা'র প্রবন্ধ ভারতীতে ১২৯১ সালে (১৮, ৯৬, ১৩৭ পৃষ্ঠা) ছাপা হয়েছে। বই বেরুবার তারিখ বেঙ্গল-লাইব্রেরি তালিকায় আছে:— ১৫ এপ্রিল, ১৮৮৫, অর্থাৎ ৩ বৈশাখ, ১২৯২।

১২৯১ সালের কথায় প্রভাতবাবু লিখেছেন:— "পুস্তকাকারে প্রথম ছোটগল্প রচনা।" ১২৯১ সালে ছোটো

* রুদ্রচণ্ড সম্বন্ধে প্রবাসীতে আগে আলোচনা করেছি [প্রশান্ত (৪)]।

* "ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি" নামে কবিতা, ১৬৫—১৬৮ পৃষ্ঠা।

গল্পের কোনো বই বেরয় নি। প্রভাতবাবু যদি মনে করে থাকেন, যে, ১২৯১ সালে প্রথম ছোটো গল্প রচনা হয়, তাও ভুল। কারণ, ১২৮৪ সালে প্রথম ছোটো গল্প ছাপা হয়। তবে এই গল্প পরে কোনো বইতে আর ছাপা হয়নি।

প্রভাতবাবু 'কাল-মৃগয়া'র তারিখ লিখেছেন ১২৯২। এ তারিখ ভুল। বাল্মীকি-প্রতিভা লেখা হয় বিলাত থেকে ফিরে আসার পরে, খুব সম্ভবতঃ ১২৮৭ সালের কোনো সময়ে। আর 'কাল-মৃগয়া' লেখা হয় তার কিছুদিন পরে। [জীবন-স্মৃতি, ১৩৯]। 'কাল-মৃগয়া' প্রথম অভিনয় হয় ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৮২, অর্থাৎ ৯ পৌষ, ১২৮৯। [মন্মথ. ১২০]।

প্রভাতবাবু লিখেছেন "চিঠিপত্র সমাজে প্রকাশিত।" 'চিঠিপত্র' প্রথমে ছাপা হয় "বালক" পত্রিকায় (১২৯২)। প্রভাতবাবুর পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ দিয়েছেন ১২৯৩। তা ঠিক নয়। বেঙ্গল-লাইব্রেরি তালিকা অনুসারে 'চিঠিপত্র' প্রকাশের তারিখ :—২ জুলাই, ১৮৮৭, অর্থাৎ ১৯ আষাঢ়, ১২৯৪।

প্রভাতবাবু উল্লেখ করেন নি, 'মায়ার খেলা' প্রকাশিত হয় ১২৯৫ সালে। মহিলা শিল্প মেলায় অভিনয় উপলক্ষ্যে বই ছাপা হয়। শিল্প-মেলার তারিখ ১৩, ১৪, ১৫ পৌষ। [বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৯৫, পৌষ, ২৮৮ পৃষ্ঠা]

১২৯৫ (১৮৮৮-৮৯) সালের কথায় প্রভাতবাবু লিখেছেন "মহর্ষি অসুস্থ হইয়া বন্দোরায় যান। ১৮৮৯ সালে কবি সেখানে।" কিন্তু অজিতবাবু লিখেছেন [অজিত. ৬১৬-১৭] :—"১৮৮৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ বোম্বাই যাত্রা করেন। * * * বন্দোরায় সমুদ্রের উপরে তাঁহার জন্য এক বাড়ী ভাড়া করা হইল। * * * কিন্তু ছয়মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার মাথা ঘোরার ব্যামো দেখা দিল। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু, * * প্রভৃতি তাঁহার শুশ্রূষার জন্য গেলেন। * * ১৮৮৬ সালের আষাঢ় মাসে তিনি বোম্বাই ছাড়িলেন।" দেখা যাচ্ছে, যে, প্রভাতবাবু এই ঘটনাকে ৩।৪ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন।

প্রভাতবাবু লিখেছেন, ১২৯৮ সালে "চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, ও মালিনী রচিত।" এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার।

কবির কাছে শুনেছি (কথাবার্ত্তা, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩২), যে, 'চিত্রাঙ্গদা' লেখা হয় উড়িষ্যা-ভ্রমণের সময়ে, পাণ্ডুয়াতে। কবি বলেন যে সেবার পাণ্ডুয়া পৌছবার আগে নদী পার হওয়ার কাহিনী ছিন্ন-পত্রে আছে (তিরণ, ১৮৯১, ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠি, ছিন্ন-পত্র, ৬৫—৬৮ পৃষ্ঠা)। তিরণ থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আরেকখানা চিঠি আছে। তারপরেই দেখ্‌ছি, শিলাইদহ, ১৮৯১, ১লা অক্টোবর তারিখের চিঠি। তবেই বোঝা যাচ্ছে, যে, ৭ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে ১৮৯১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা লেখা হ'য়েছিল ; অর্থাৎ বাংলা ১২৯৮, ২২ ভাদ্র থেকে ১৪ আশ্বিনের মধ্যে।

'বিদায়-অভিশাপ'-এর পাণ্ডুলিপি আমি ভালো ক'রে দেখেছি। (এ পাণ্ডুলিপিখানি শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের কাছে ছিল ; তিনি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে দিয়েছেন)। তাতে লেখা আছে ; "কালিগ্রাম, ২৬ শ্রাবণ।" বছর লেখা নেই। ১৩০৩-এর কাব্য-গ্রন্থাবলীতে বইগুলি রচনার তারিখ অনুসারে সাজানো হয়। এই সংস্করণে 'বিদায়-অভিশাপ' স্থান পেয়েছে 'সোনার তরী' আর 'চিত্রাঙ্গদা'-র পরে। তাতে বোঝা যায়, যে, 'বিদায়-অভিশাপ' লেখা হ'য়েছে 'চিত্রাঙ্গদা'র পরে। আগেই বলেছি, 'চিত্রাঙ্গদা' ১২৯৮, ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে লেখা হয়। 'বিদায়-অভিশাপ' যখন শ্রাবণ মাসে লেখা হ'য়েছে তখন ১২৯৮ সালে হ'তেই পারে না। ('বিদায়-অভিশাপ' যে 'চিত্রাঙ্গদা'র পরে লেখা, তার অন্য প্রমাণ এই, যে, 'চিত্রাঙ্গদা'র ২য় সংস্করণের সঙ্গে 'বিদায়-অভিশাপ' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০১, ১৬ শ্রাবণ তারিখে।) 'বিদায়-অভিশাপ' প্রথম ছাপা হয়, সাধনা পত্রিকায় ১৩০০ সালের মাঘ মাসে। তাতে মনে হয়, যে 'বিদায়-অভিশাপ' লেখা শেষ হ'য়েছিল ১২৯৯ কিংবা ১৩০০ সালের ২৬ শে শ্রাবণ।

তারপরে 'মালিনী'-র কথা। ১৩০৩-এর সংগ্রহে 'মালিনী' ছাপা হ'য়েছে 'চিত্রা'র পরে কিন্তু 'চৈতালি-'র

আগে। 'চিত্রা'-র তারিখ ফাল্গুন, ১৩০২। তাতে মনে হয়, যে, 'মালিনী' লেখা হ'য়েছিল, ১৩০২ সালের শেষের দিকে কিংবা ১৩০৩ সালের গোড়ায়। কবি বলেন (কথাবার্ত্তা, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩২), যে, 'মালিনী' লেখা হয় উড়িষ্যায়, 'কথা ও কাহিনী'-র কবিতাগুলি লেখার কিছুদিন আগে। 'কথা ও কাহিনী'-র জন্য গল্প খোঁজবার সময়ে প্রথমে 'মালিনী'-র গল্প হাতে পড়ে।

'কথা ও কাহিনী'র কবিতা লেখা আরম্ভ হয় ১৩০৪ বা তার অল্প আগে। মোটের উপরে বলা যেতে পারে, যে, 'মালিনী' লেখা হয় ১৩০২-এর শেষে কিংবা ১৩০৩-এর গোড়ার দিকে, অর্থাৎ সম্ভবতঃ ইংরাজি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে। যাহোক্ ১২৯৮ সালে 'মালিনী' লেখা হয় নি একথা ঠিক। ১২৯৮ সালে আরেকটি ভুল আছে। এই বছর 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ১ম খণ্ড বাহির হয়, কিন্তু প্রভাতবাবুর তালিকায় নাম নেই।

১২৯৯ থেকে ১৩০২ পর্য্যন্ত অনেকগুলি বই বাদ প'ড়েছে ঃ—'চিত্রাঙ্গদা' আর 'গোড়ায় গলদ' (১২৯৯); 'সোনার তরী', 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, ২য় খণ্ড', 'ছোট গল্প' (১৩০০); 'বিদায়-অভিশাপ' (১৩০১, চিত্রাঙ্গদা'-র ২য় সংস্করণের সঙ্গে), 'বিচিত্র গল্প' দুই ভাগ (একভাগ নয়, ১৩০১); আর 'গল্প-দশক' (১৩০২)।

১৩০৬ সালে প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে প্রভাতবাবু 'কল্পনা'-র নাম দিয়েছেন, তা ঠিক নয়। 'কল্পনা' প্রকাশিত হয় ২৩ বৈশাখ, ১৩০৭ (৫ মে, ১৯০০)। তাছাড়া প্রভাতবাবু 'চিরকুমার সভা' সম্বন্ধেও একটু ভুল ক'রেছেন। এই উপন্যাসখানি ভারতীতে ছাপা হয়, ১৩০৭—০৮ সালে, ১৩০৬—০৭ সালে নয়। প্রভাতবাবু নিশ্চয়ই ভারতী দেখেন্ নি; সম্ভবতঃ 'চিরকুমার সভা'র ১৩৩২ সালের সংস্করণে আমার লেখা পাঠ-পরিচয় থেকে ভুল তারিখ নিয়েছেন।

১৩০৭ থেকে ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত বেশি ভুল নেই। বাদ প'ড়েছে ঃ—'ক্ষণিকা' (১৩০৭), 'কর্ম্মফল' (১৩১০), আর স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে লেখা গানগুলি একত্র ছাপানো 'বাউল' (খুব সম্ভবতঃ ১৩১৩, কিংবা ১৩১২)। 'স্মরণ'-এর কবিতা বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয় ১৩০৯, অগ্রহায়ণ মাসে, পৌষ মাসে নয়। গদ্য গ্রন্থাবলীর বইগুলি সম্বন্ধেও একটু ভুল হ'য়েছে। ১ম থেকে ১০ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে, আর ১১শ থেকে ১৬শ খণ্ড ১৩১৫ সালে।

১৩১৫ সালের বইগুলি প্রায় সবই বাদ প'ড়েছে। 'গল্পগুচ্ছ, ৫ খণ্ড', 'শারদোৎসব,' 'মুকুট,' আর নোতুন সংস্করণ 'গান'। 'শান্তিনিকেতন' বিভিন্ন ভাগের তারিখ সম্বন্ধে প্রভাতবাবু প্রায় কিছুই বলেন নি। প্রকাশের তারিখঃ—১ম থেকে ৪র্থ ভাগ, ১৩১৫; ৫ম—১০ম ভাগ, ১৩১৬; ১১শ—১২শ, ১৩১৭; ১৩শ ভাগ, ১৩১৮; ১৪শ ভাগ, ইংরাজি ১৯১৫; আর ১৬শ—১৭শ, ইংরাজি ১৯১৬।

১৩১৬ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্বন্ধে প্রভাতবাবু তারিখ দিয়েছেন ৩১ বৈশাখ। ভূমিকায় এই তারিখ আছে বটে, কিন্তু গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ বেঙ্গল-লাইব্রেরি-তালিকায় পাই ঃ—১৫ অক্টোবর, ১৯০৯, বাংলা ২৯ আশ্বিন, ১৩১৬। 'ছুটির পড়া'-র তারিখও ঐ খানেই পাই ঃ—১২ অক্টোবর, ১৯০৯, বাংলা ২৬ আশ্বিন, ১৩১৬। ১৩১৮ সালে প্রভাতবাবু লিখেছেন যে, "ডাকঘর নাটক মার্চ্চে প্রকাশিত।" একথা ঠিক নয়। বেঙ্গল-লাইব্রেরি-তালিকায় তারিখ আছে ঃ—১৬ জানুয়ারি, ১৯১২, বাংলা ২ মাঘ, ১৩১৮। বরং 'গল্প চারিটি' প্রকাশিত হয় ১৮ মার্চ্চ, ১৯১২, বাংলা ৫ই চৈত্র, ১৩১৮; প্রভাতবাবু ভুল ক'রে ১৩১৯ তারিখ দিয়েছেন।

১৩২১ থেকে ১৩২৩ সালে বাদ প'ড়েছে ঃ—'উৎসর্গ' (১৩২১), 'চতুরঙ্গ' 'ফাল্গুনী', আর 'সঞ্চয়' (১৩২৩)।

প্রভাতবাবুর মতে ১৩২১ সালে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর উপাধি (১৯১৪)" দেওয়া হয়। Lord Hardinge এর সই করা উপাধি-পত্রের তারিখ, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৩ অর্থাৎ বাংলা ১১ পৌষ, ১৩২০।

প্রভাতবাবু "কলিকাতার বিচিত্রার বৈঠক-যুগ" কে ১৩২৪ সালে ফেলেছেন। কিন্তু বিচিত্রার কাজ আরম্ভ হয় ১৩২১ (ইংরাজি ১৯১৪-১৫) থেকে। এই সময়ের অনেকগুলি ইংরাজি বইয়ের তারিখেও ভুল আছে ঃ—Post Office আর Sadhana প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯১৩, অর্থাৎ

বাংলা ১৩২০ সাল, (১৩২১ নয়)। Stray Birds এর তারিখ ইংরাজি ১৯১৭, (১৯১৬ নয়)। Cycle of Spring বের হয় ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭, অর্থাৎ বাংলা ১৩২৩ (১৩২৪ নয়)।

'শিশু ভোলানাথ' প্রকাশের তারিখ বেঙ্গল-লাইব্রেরি-তালিকায় আছে, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২২, অর্থাৎ ২৯ ভাদ্র, ১৩২৯ ; (১৩২৮ নয়)। 'মুক্ত-ধারা' প্রবাসীতে ১৩২৯, বৈশাখ মাসে ছাপা হয়, আশ্বিন মাসে নয়। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, ২৮ জুন, ১৯২২, অর্থাৎ বাংলা ১৪ আষাঢ় ১৩২৯।

১৩৩০ সালে Visva-bharati Quarterly সম্বন্ধে প্রভাতবাবু একটু ভুল ক'রেছেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ, বৈশাখ মাসে ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে সম্পাদকের নাম ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের। ২য় সংখ্যা থেকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সম্পাদক রূপে দেওয়া হয়। ১৩৩১ সালে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার তারিখে সামান্য ভুল আছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে তারিখে কবি রওনা হন। (আগে ১৭ই তারিখে রওনা হওয়ার কথা ছিল বটে, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৭ই তারিখে রওনা হতে পারেন নি। শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সেবার কবির সঙ্গে যাত্রা করেন, তিনি এই তারিখ দিয়েছেন)। Red Oleanders (রক্ত-করবীর ইংরাজি অনুবাদ) প্রথমে ছাপা হয় Visva-bharati Quarterly তে, ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ; (১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নয়)। আর 'রক্তকরবী' বাংলা পুস্তকাকারে বাহির হয় ১৩৩৩ সালে ; ১৩৩২ সালে নয়।

১৩৩২ সালের পরেও অনেকগুলি বইয়ের তারিখ ভুল হ'য়েছে, বা নাম বাদ গিয়েছে :—'চিরকুমার সভা' (১৩৩২) ; 'শোধ-বোধ' (১৩৩৩, ১৩৩৬ নয়), 'ঋতু-উৎসব' আর 'রক্ত-করবী' (১৩৩৩) ; 'শেষরক্ষা' (১৩৩৫) ; আর 'যাত্রী' (১৩৩৬)। ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত বইয়ের তারিখ ঠিক আছে, বা কিছু বাদ পড়েনি।

১৩৩২ সালে প্রকাশিত 'সঙ্কলন' বইখানা সম্বন্ধে প্রভাতবাবু মন্তব্য ক'রেছেন :—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগষ্টমাসে প্রকাশিত।" সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ক'লকাতা থেকে নভেম্বর মাসে। বইখানি আমি ক'লকাতায় ব'সে সঙ্কলন ক'রেছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোনো যোগ ছিল না।

'লেখন' বইয়ের তারিখ দিয়েছেন ১৩৩১ সাল, আর এর সম্বন্ধে প্রভাতবাবু লিখেছেন :—"বুডাপেষ্টে মুদ্রিত ৭ নভেম্বর, ১৯২৬"। এই বইখানা আমি নিজে Berlinএ ছাপাই, ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে। এই বই ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়নি, ১৩৩৪ সালে বাহির হয়।

প্রভাতবাবুর মতে 'শেষের কবিতা' ১৩৩৪ সালে প্রবাসীতে ছাপা হয়। কিন্তু ১৩৩৪ সালে 'শেষের কবিতা' লেখা হয় নি। লেখা হয় ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে, কলম্বো যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পথে। লেখা শেষ হয় বাঙ্গালোরে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাড়িতে, বইয়ের শেষেই তারিখ দেওয়া আছে :—"ব্যালাক্রুয়ি, বাঙ্গালোর ২৫ জুন, ১৯২৮", অর্থাৎ বাংলা ১১ আষাঢ়, ১৩৩৫। প্রবাসীতে ছাপা আরম্ভ হয় ১৩৩৫ সালে। কলিকাতায় 'নটীর পূজা' প্রথমবার অভিনয়ের তারিখেও প্রভাতবাবু ভুল করেছেন। অভিনয় হয় ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে, ১৩৩৪ সালে নয়।

উপরে যেসব ভুলের কথা ব'লেছি তাদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু তাতে ক'রে একথা মনে করা ঠিক হবে না, যে, প্রভাতবাবুর বই একেবারেই কোনো কাজে লাগ্‌বে না। বড়োরকমের ভুলও আছে বটে, কিন্তু অনেক জায়গায় শুধু দু-এক বছরের গোলমাল হ'য়েছে। সাহিত্য আলোচনার জন্য সব সময়ে খুব সূক্ষ্ম হিসাব দরকার হয় না, তাই দু-এক বছরের ভুলের জন্য সাধারণ পাঠকদের বেশি অসুবিধা হবে না। বরং প্রায় কুড়িখানা বইয়ের নাম বাদ প'ড়েছে ব'লে বেশি ক্ষতি হবে। যা হোক্ ভুলগুলি সংশোধন ক'রে নিলে এরকম বর্ষপঞ্জী রবীন্দ্র-সাহিত্যে আলোচনার সহায়তা ক'রবে। এ বিষয়ে প্রভাতবাবুর চেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীপ্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ

এই প্রবন্ধের সংশ্লিষ্ট "গ্রন্থ নির্দ্দেশের সঙ্কেত" ৫৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।



বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ "নটীর পূজা"য় পূজারিণী কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন।

["খেয়ালা"র সৌজন্যে]

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

সশব্দ উদ্গারে চমকিত করিয়া রতন দেখা দিল।

কি রতন, পেট ভরলো?

আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আপনি যাই বলুন বাবু, আমাদের কলকাতার বাঙ্গালী বামুন-ঠাকুর ছাড়া রান্নার কেউ কিছু জানে না। ওদের ঐ-সব মেড়ুয়া-মহারাজ গুলোকে ত জানোয়ার বল্‌লেই হয়।

উভয় প্রদেশের রান্নার ভালো-মন্দ, অথবা পাচকের শিল্প-নৈপুণ্য লইয়া রতনের সঙ্গে কখনো তর্ক করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। কিন্তু রতনকে যতদূর জানি তাহাতে বুঝিলাম সুস্বাদু ও সুপ্রচুর ভোজনে সে পরিতুষ্ট হইয়াছে। না হইলে পশ্চিমা পাচকদের সম্বন্ধে এমন নিরপেক্ষ সুবিচার করিতে পারিত না। কহিল, গাড়ীর ধকল্‌টা তো সামান্য নয়, একটু আড়ামোড়া ভেঙ্গে গড়িয়ে না নিলে—

বেশ তো রতন, ঘরে হোক্, বারান্দায় হোক্ একটা বিছানা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়োগে। কাল সব কথা হবে।

কি জানি কেন, চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা ছিল না। মনে হইতেছিল সে যাহা লিখিয়াছে তাহা তো জানিই।

রতন ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। আগাগোড়া গালা দিয়া শিল-মোহর করা। বলিল, বারান্দার ঐ দক্ষিণের জানালার ধারে বিছানাটা পেতে ফেলি। মশারি খাটাবার হাঙ্গামা নেই,—কলকাতা ছাড়া এমন সুখ কি আর কোথাও আছে। যাই—

কিন্তু খবর সব ভালো ত রতন?

রতন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, তাই তো দেখায়। গুরুদেবের কৃপায় বাড়ীর বাইরেটা গুলজার, ভেতরে দাস-দাসী, বঙ্কুবাবু, নতুন-বৌমা এসে ঘর-দোর আলো করেছেন, আর সবার ওপরে স্বয়ং মা আছেন যে-বাড়ীর গিন্নী,—এমন সংসারকে নিন্দে করবে কে? আমি কিন্তু অনেক কালের চাকোর, জাতে নাপ্‌তে,—রত্নাকে অত সহজে ভোলানো যায় না বাবু। তাই তো সেদিন ইষ্টিসানে চোখের জল সাম্‌লাতে পারি নি, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিদেশে চাকরের অভাব হলে রতনকে একটা খবর পাঠাবেন। জানি, আপনার সেবা করলেও সেই মায়ের সেবাই করা হবে। ধর্ম্মে পতিত হবো না।

কিছুই বুঝিলাম না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলাম। সে বলিতে লাগিল, বঙ্কুবাবুর বয়সও হোলো, যাহোক একটু বিদ্যে-সিধ্যে শিখে মানুষও হয়েছেন। ভাব্‌চেন বোধ হয় কিসের জন্যে আর পরবশে থাকা? দান-পত্রের জোরে মেরে ত সব নিয়েছেন। মোটা-মুটি

যে বেশ-কিছু মেরেছেন তা' মানি, কিন্তু সে কতক্ষণ বাবু?

স্পষ্ট এখনও হইল না, কিন্তু একটা আব-ছাওয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল।

সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, স্বচক্ষেই তো দেখেছেন মাসে অন্ততঃ ডুবার ক'রে আমার চাকরী যায়। অবস্থা মন্দ নয়, রাগ করে চলে গেলেও পারি, কিন্তু যাই নে কেন? পারি নে। এটুকু জানি, যাঁর দয়ায় হয়েছে তাঁর একটা নিশ্বাসেই আশ্বিনের মেঘের মতো সমস্ত উবে যাবে, চোখের পাতা ফেলবার সময় দেবে না। ওতো মায়ের রাগ নয়, ও আমার দেবতার আশীর্ব্বাদ।

এইখানে পাঠককে একটু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে রতন ছেলেবেলায় কিছুকাল প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়াছিল।

একটু থামিয়া কহিল, মায়ের বারণ তাই কখনো বলি নে। ঘরে যা কিছু ছিল খুড়োরা ঠকিয়ে নিলে, একঘর যজমান পর্য্যন্ত দিলে না। ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে আর তাদের মাকে ফেলে পেটের দায়ে একদিন গাঁ ছেড়ে বার হোলাম, কিন্তু পূর্ব্ব-জন্মের তপিস্যে ছিল, আমার এই মায়ের ঘরেই চাকরি জুটে গেলো। সমস্ত দুঃখই শুনলেন কিন্তু কিছুই তখন বললেন না। বছরখানেক পরে একদিন নিবেদন জানালাম, মা, ছেলে-মেয়ে দুটোকে দেখতে একবার সাধ হয়, যদি দিন কয়েকের ছুটি দেন। হেসে বললেন, আবার আসবি তো? যাবার দিনে হাতে একটা পুঁটুলি গুঁজে দিয়ে বললেন, রতন, খুড়োদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিস্‌নে বাবা, যা' তোর গেছে এই দিয়ে ফিরিয়ে নিগে যা। খুলে দেখি পাঁচশো টাকা। প্রথমে নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস হলো না, ভয় হলো বুঝি বা জেগে-জেগেই স্বপন দেখ্‌চি। আমার সেই মাকেই বঙ্কুবাবু এখন বাঁকা-টারা কথা কয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে গজ্‌ গজ্‌ করে। ভাবি, এর আর বেশি দিন নয়, মা লক্ষ্মী টল্‌লেন বলে!

আমি এ আশঙ্কা করি নাই, নিরুত্তরে শুনিতে লাগিলাম।

মনে হইল রতন কিছু দিন হইতে ক্রোধে ও ক্ষোভে ফুলিতেছে, কহিল, মা যখন দেন দু'হাতে ঢেলে দেন। বঙ্কুকেও দিয়েছেন। তাই ও ভেবেচে নেঙড়ানো-মৌচাকের আর দাম কি, বড়জোর এখন জ্বালানোই চলে। তাই ওর এত অগ্রাহ্য। মুখ্যু জানে না যে আজও মায়ের একখানা গয়না বিক্রী করলে অমন পাঁচখানা বাড়ী তৈরি হয়।

আমিও জানিতাম না। হাসিয়া বলিলাম, তাই না কি? কিন্তু সে-সব আছে কোথায়?

রতনও হাসিল, কহিল, আছে তাঁরই কাছে। মা অত বোকা ন'ন। এক আপনার পায়েই সমস্ত উজোড় করে দিয়ে তিনি ভিখিরী হতে পারেন, কিন্তু আর কারও জন্যে নয়। বঙ্কু জানে না যে আপনি বেঁচে থাক্‌তে মায়ের আশ্রয়ের অভাব নেই, আর রতন বেঁচে থাক্‌তে তাঁর চাকরের ভাবনা ভাবতে হবে না। সেদিন কাশী থেকে আপনার অমনি ক'রে চলে আসা যে মা'র বুকে কি শেল বিঁধেছে বঙ্কুবাবু তার কি খবর রাখে? গুরু ঠাকুরই বা তার সন্ধান পাবে কোথায়?

কিন্তু আমাকে যে তিনি নিজেই বিদায় করেছেন এ খবর তো তুমি জানো রতন?

রতন জিভ্‌ কাটিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। এতটা বিনয় কখনো তাহার পূর্ব্বে দেখি নাই। বলিল, আমরা চাকর-বাকর বাবু, এ সব কথা আমাদের কানেও শুন্‌তে নেই। ও মিথ্যে।

রতন আড়া-মোড়া ভাঙিয়া একটু গড়াইয়া লইতে প্রস্থান করিল। বোধ করি কাল আটটার পূর্ব্বে আর তাহার দেহটা 'ধাতে' আসিবে না।

দু'টা বড় খবর পাওয়া গেল। একটা এই যে বঙ্কু বড় হইয়াছে। পাটনায় যখন তাহাকে প্রথম দেখি

তখন বয়স তাহার ষোল-সতেরো, এখন একুশ বৎসরের যুবক। উপরন্তু এই পাঁচ-ছয় বৎসরের ব্যবধানে সে লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, শৈশবের সেই সকৃতজ্ঞ স্নেহ যদি আজ যৌবনের আত্ম-সম্মান-বোধে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে বিস্ময়ের কি আছে ?

দ্বিতীয় সম্বাদ,—না বন্ধু, না গুরুদেব, রাজলক্ষ্মীর গভীরতম বেদনার কোনও সন্ধান আজও তাঁহাদের জানা নাই।

মনের মধ্যে এই কথা দুটাই বহুক্ষণ ধরিয়া নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সযত্ন-অঙ্কিত শিল-মোহরের গালার ছাপগুলা দেখিয়া লইয়া চিঠি খুলিলাম। তাহার হাতের লেখা বেশি দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু স্মরণ হইল হস্তাক্ষর দুষ্পাঠ্য না হইলেও ভালো নয়। কিন্তু এই পত্রখানি সে অত্যন্ত সাবধানে লিখিয়াছে, বোধ হয় তাহার ভয় বিরক্ত হইয়া আমি না ফেলিয়া রাখি। যেন আগাগোড়া সবটুকুই সহজে পড়িতে পারি।

আচার-আচরণে রাজলক্ষ্মী সে-যুগের মানুষ। প্রণয় নিবেদনের আতিশয্য তো দূরের কথা, 'ভালোবাসি' এমন কথাও কখনো স্বমুখে উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে লিখিয়াছে চিঠি,—আমার প্রার্থনার অনুকূলে অনুমতি দিয়া। তবু, কি জানি কি আছে, পড়িতে কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। তাহার বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সেদিন তাহার পড়া-শুনা সাঙ্গ হইয়াছিল গুরু-মশায়ের পাঠশালায়। পরবর্ত্তী কালে ঘরে বসিয়া হয় ত, সামান্য কিছু বিদ্যা-চর্চ্চা করিয়া থাকিবে। অতএব, ভাষার ইন্দ্রজাল, শব্দের ঝঙ্কার, পদ-বিন্যাসের মাধুরী তাহার পত্রের মধ্যে আশা করা অন্যায়। সর্ব্বদা প্রচলিত সামান্য গোটা কয়েক কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর সে কি করিবে ? একটা অনুমতি দিয়া মামুলি শুভ-কামনা করিয়া দু ছত্র লেখা,—এই তো ? কিন্তু খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের কিছুই আর মনে রহিল না। পত্র দীর্ঘ নয়, কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গী যত সহজ ও সরল ভাবিয়াছিলাম তাহাও নয়। আমার আবেদনের উত্তর সে এইরূপে দিয়াছে,—

৺কাশীধাম।

প্রণামান্তে সেবিকার নিবেদন,

তোমার চিঠিখানা এইবার নিয়ে একশোবার পড়লাম। তবু ভেবে পেলাম না তুমি ক্ষেপেচো না আমি ক্ষেপেচি। ভেবেচো বুঝি হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ? কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি, পেয়েছিলাম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। তাই, বিদায় দেবার কর্ত্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করার মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নেই।

ফুলের বদলে বন থেকে তুলে বঁইচির মালা গেঁথে কোন্ শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলাম সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বয়ে রক্ত ঝরে পড়তো, রাঙা-মালার সে রাঙা-রং তুমি চিন্‌তে পারোনি। বালিকার পূজার অর্ঘ্য সেদিন তোমার গলায়, তোমার বুকের পরে রক্ত-রেখায় যে-লেখা এঁকে দিতো সে তোমার চোখে পড়েনি, কিন্তু যাঁর চোখে সংসারের কিছুই বাদ পড়েনা আমার সে-নিবেদন তাঁর পাদ-পদ্মে গিয়ে পৌঁছেছিল।

তারপরে এলো দুর্য্যোগের রাত, কালো মেঘে দিলে আমার আকাশের জ্যোৎস্না ঢেকে। কিন্তু সে সত্যিই আমি না আর কেউ, এ-জীবনে যথার্থই ও-সব ঘটেছিল, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেচি ভাবতে গিয়ে অনেক সময়ে ভয় হয় বুঝিবা আমি পাগল হয়ে যাবো। তখন সমস্ত ভুলে যাঁকে ধ্যান করতে বসি তাঁর নাম বলা চলে না। কাউকে বল্‌তেও নেই। তাঁর ক্ষমাই আমার জগদীশ্বরের ক্ষমা। এতে ভুল নেই, সন্দেহ নেই, এখানে আমি নির্ভয়।

হাঁ, বল্‌ছিলাম, তারপরে এলো আমার দুর্দ্দিনের রাত্রি, কলঙ্কে দিলে দুচোখের সকল আলো নিবিয়ে। কিন্তু সে-ই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অখণ্ড গ্লানির নিরবকাশ আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকি নেই?

আছে। অব্যাহত অপরাধের মাঝে মাঝে তাকে আমি বার-বার দেখ্‌তে পেয়েচি। তাই যদি না হোতো, বিগত দিনের রাক্ষসটা যদি আমার অনাগতর সমস্ত মঙ্গলকে নিঃশেষে গিলে খেতো, তবে তোমাকে ফিরে পেতাম কি কোরে? আমার হাতে এনে আবার তোমাকে দিয়ে যেতো কে?

আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়, তবু তোমাকে যা মানায় আমাকে তা সাজে না। বাঙালী-ঘরের মেয়ে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার করে দিয়ে আজ যৌবনের দাবী আর করিনে। আমাকে তুমি ভুল বুঝোনা,—যত অধমই হই, ও-কথা যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার মনে আসে তার বাড়া লজ্জা আমার নেই। বঙ্কু বেঁচে থাক্‌, সে বড় হয়েছে, তার বউ এসেছে,—তোমার বিয়ের পরে তাদের সুমুখে বার হবো আমি কোন্ মুখে? এ অসম্মান সইবো কি করে?

যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখ্‌বে কে,—পুঁটু? আর আমি ফিরে আসবো তোমার বাড়ীর বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তারপরেও বেঁচে থাক্‌তে বলো না কি?

হয়ত প্রশ্ন করবে, তবে কি এমনি নিঃসঙ্গ জীবনই চিরদিন কাটাবো? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক্‌, এর জবাব দেবার দায় আমার নয়, তোমার। তবে, নিতান্তই যদি ভেবে না পাও, বুদ্ধি এতই ক্ষয়ে গিয়ে থাকে আমি ধার দিতে পারি, শোধ দিতে হবে না,—কিন্তু ঋণটা অস্বীকার কোরো না যেন।

তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়েছেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েছে পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েছো শুধু ভার বোঝা। এম্‌নিই অন্ধ তোমরা।

জিজ্ঞেসা করি, তোমাকে তো ফিরে পেয়েছিলাম আমার তেইশ বছর বয়সে, কিন্তু তার আগে এঁরা সব ছিলেন কোথায়? তুমি এত ভাব্‌তে পারো আর এটা ভাব্‌তে পারোনা?

আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হবো। এ লোভ কেন জানো? স্বর্গের জন্যে নয়,—সে আমি চাইনে। আমার কামনা মরণের পরে যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। বুঝ্‌তে পারো তার মানে কি?

ভেবেছিলাম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে,—তাকে নির্ম্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে তো থাক্‌লো আমার জপ-তপ পূজা-অর্চ্চনা, থাক্‌লো সুনন্দা, থাক্‌লো আমার গুরুদেব।

স্বেচ্ছায় মরণ আমি চাইনে। কিন্তু আমাকে অপমান করার ফন্দি যদি করে থাকো, সে বুদ্ধি ত্যাগ করো। তুমি দিলে বিষ আমি নেবো, কিন্তু ও নিতে পারবো না। আমাকে জানো বলেই জানিয়ে দিলাম যে-সূর্য্য অস্ত যাবে তার পুনরুদয়ের অপেক্ষায় বসে থাকার আমার আর সময় হবে না। ইতি—

রাজলক্ষ্মী

বাঁচা গেল। সুনিশ্চিত কঠোর অনুশাসনের চরম লিপি পাঠাইয়া একটা দিকে আমাকে সে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। এ জীবনে ও-ব্যাপার লইয়া ভাবিবার আর কিছু রহিল না। কিন্তু কি করিতে পারিব না তাহাই নিঃসংশয়ে জানিলাম, কিন্তু অতঃপর কি আমাকে করিতে হইবে এ সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী একেবারে নির্ব্বাক। হয়ত, উপদেশ দিয়া আর একদিন চিঠি লিখিবে, কিম্বা আমাকেই সশরীরে তলব করিয়া পাঠাইবে, কিন্তু আপাততঃ ব্যবস্থা যাহা হইল তাহা অত্যন্ত চমৎকার। এ-দিকে ঠাকুর্দ্দা মহাশয় সম্ভবতঃ কাল

সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন, ভরসা দিয়া আসিয়াছি চিন্তার হেতু নাই, অনুমতি পাওয়ায় বিঘ্ন ঘটিবে না। কিন্তু আসিয়া যাহা পৌছিল তাহা নির্ব্বিঘ্ন অনুমতিই বটে! রতন-নাপিতের হাতে সে যে চেলি এবং টোপর পাঠায় নাই এই ঢের।

ও-পক্ষে দেশের বাটীতে বিবাহের আয়োজন নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতেছে, পুঁটুর আত্মীয়-স্বজনও কেহ কেহ হয়ত আসিয়া হাজির হইতেছে, এবং প্রাপ্ত-বয়স্কা অপরাধী মেয়েটা হয়ত এতদিনে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পরিবর্ত্তে একটুখানি সমাদরের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। ঠাকুর্দ্দাকে কি বলিব জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সেই কথাটা বলিব ইহাই ভাবিয়া পাইলাম না। তাঁহার নির্ম্মম তাগাদা ও লজ্জাহীন যুক্তি ও ওকালতি মনে মনে আলোচনা করিয়া অন্তরটা একদিকে যেমন তিক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ব্যর্থ প্রত্যাবর্ত্তনে নিরাশায় ক্ষিপ্ত পরিজনগণের ঐ দুর্ভাগা মেয়েটাকে অধিকতর উৎপীড়নের কথা মনে করিয়াও হৃদয় তেমনি ব্যথিত হইয়া আসিল। কিন্তু উপায় কি? বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলাম। পুঁটুর কথা ভুলিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল গঙ্গামাটির কথা। জন-বিরল সেই ক্ষুদ্র পল্লীর স্মৃতি কোনদিন মুছিবার নয়। এ জীবনের গঙ্গা-যমুনা ধারা একদিন এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে, এবং স্বল্পকাল পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া আবার একদিন এইখানেই বিযুক্ত হইয়াছে। একত্রবাসের সেই ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি শ্রদ্ধায় গভীর, স্নেহে মধুর, আনন্দে উজ্জ্বল, আবার তাদের মতই নিঃশব্দ বেদনায় নিরতিশয় স্তব্ধ। প্রবঞ্চনার পরিবাদে কেহ কাহাকেও কলঙ্কলিপ্ত করি নাই, লাভ-ক্ষতির নিষ্ফল বাদপ্রতিবাদে গঙ্গামাটির শান্ত গৃহখানিকে আমরা ধূমাচ্ছন্ন করিয়া আসি নাই। সেখানের সবাই জানে আবার একদিন আমরা ফিরিয়া আসিব, আবার সুরু হইবে আমোদ আহ্লাদ, সুরু হইবে ভূস্বামিনীর দীন-দরিদ্রের সেবা ও সৎকার। কিন্তু সে সম্ভাবনা যে শেষ হইয়াছে, প্রভাতের বিকশিত মল্লিকা দিনান্তের শাসন মানিয়া লইয়া নীরব হইয়াছে এ কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না।

চোখে ঘুম নাই, বিনিদ্র রজনী ভোরের দিকে যতই গড়াইয়া আসিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল এ রাত্রি যেন না পোহায়। এই একটিমাত্র চিন্তাই এমনি করিয়া যেন আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

বিগত কাহিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়ে, বীরভূম জেলার সেই তুচ্ছ কুটিরখানি মনের উপর ভূতের মতো চাপিয়া আসে, অনুক্ষণ গৃহ-কর্ম্মে-নিযুক্তা রাজলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ হাত দুটি চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ জীবনে পরিতৃপ্তির আস্বাদন এমন করিয়া কখনো করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

এতকাল ধরাই পড়িয়াছি, ধরিতে পারি নাই। আজ ধরা পড়িল রাজলক্ষ্মীর সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা কোথায়। সে জানে আমি সুস্থ নই, যে-কোন-দিনই অসুখে পড়িতে পারি, তখন কোথাকার কে-এক-পুঁটু আমাকে ঘিরিয়া শয্যা জুড়িয়া বসিয়াছে, রাজলক্ষ্মীর কোনো কর্ত্তৃত্বই নাই, এতবড় দুর্ঘটনা মনের মধ্যে সে ঠাঁই দিতে পারে না। সংসারের সব-কিছু হইতেই নিজেকে সে বঞ্চিত করিতে পারে কিন্তু এ বস্তু অসম্ভব,—এ তাহার অসাধ্য। মরণ তুচ্ছ, এর কাছে রহিল তাহার গুরুদেব, রহিল তাহার জপ-তপ ব্রত-উপবাস। সে মিথ্যা ভয় আমাকে চিঠির মধ্যে দেখায় নাই।

ভোরের সময় বোধকরি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, রতনের ডাকে যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন বেলা হইয়াছে। সে কহিল, কে একটি বুড়ো ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ী ক'রে এইমাত্র এলেন।

এ ঠাকুর্দ্দা। কিন্তু গাড়ী ভাড়া করিয়া? সন্দেহ জন্মিল।

রতন কহিল, সঙ্গে একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে আছে।

এ পুঁটু। এই নির্লজ্জ মানুষটা তাহাকে কলিকাতার বাসায় পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। সকালের আলো তিক্ততায় ম্লান হইয়া উঠিল, বলিলাম, তাঁদের এই ঘরে এনে বসাও রতন, আমি মুখ-হাত ধুয়ে আস্‌চি। এই বলিয়া নীচের স্নানের ঘরে চলিয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিতে ঠাকুর্দ্দাই আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, যেন আমিই অতিথি,—এসো দাদা এসো। শরীরটা বেশ ভালো ত?

আমি প্রণাম করিলাম। ঠাকুর্দ্দা হাঁকিলেন, পুঁটু গেলি কোথায়?

পুঁটু জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল, কাছে আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল।

ঠাকুর্দ্দা কহিলেন, ওর পিসিমা বিয়ের আগে ওকে একবার দেখতে চায়। পিসেমশাই হাকিম,—পাঁচশো টাকা মাইনে। ডায়মণ্ড হারবারে বদলি হয়ে এসেছে,—ঘর-সংসার ফেলে পিসির বার হবার যো নেই, তাই সঙ্গে নিয়ে এলুম, বল্লুম পরের হাতে তুলে দেবার আগে ওকে একবার দেখিয়ে আনিগে। ওর দিদিমা আশীর্ব্বাদ করে বল্লে, পুঁটি, অম্‌নি অদৃষ্ট যেন তোরও হয়।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বে নিজেই বলিলেন, আমি কিন্তু সহজে ছাড়চিনে ভায়া। হাকিমই হোন্, আর যা-ই হোন্, দাঁড়িয়ে থেকে কাজটি সমাধা করে দিতে হবে,—তবে তাঁর ছুটি। জানোই তো দাদা, শুভকর্ম্মে বহু বিঘ্ন,—শাস্ত্রে কি যে বলে—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—অমন একটা লোক দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কারুর টুঁ শব্দ করবার ভরসা হবে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে তো বিশ্বাস নেই,—ওরা সব পারে। কিন্তু হাকিম কি না, ওদের রাশই আলাদা।

পুঁটুর পিসে মশাই হাকিম। খবরটা অপ্রাসঙ্গিক নয়,—তাৎপর্য্য আছে।

নূতন হুঁকা কিনিয়া আনিয়া রতন সযত্নে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, ঠাকুর্দ্দা ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্চে না?

রতন তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে হাঁ, দেখেছেন বই কি। দেশের বাড়ীতে বাবুর অসুখের সময়ে।

ওঃ—তাই তো বলি। চেনা মুখ।

আজ্ঞে, হাঁ। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।

ঠাকুর্দ্দার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত্ত লোক, বোধ হয় সমস্ত কথাই তাঁহার স্মরণ হইল। নীরবে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেরুবার সময়ে দিনটা দেখিয়ে এসেছিলাম, বেশ ভালো দিন, আমার ইচ্ছে আশীর্ব্বাদের কাজটা অম্‌নি সেরে রেখে যাই। নতুনবাজারে সমস্ত কিন্‌তে পাওয়া যায়, চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না? কি বলো?

কিছুতেই কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কোনমতে শুধু বলিয়া ফেলিলাম, না।

না? কেন? বেলা বারোটা পর্য্যন্ত দিনটা তো বেশ ভালো। পাঁজি আছে?

বলিলাম, পাঁজির দরকার নেই। বিবাহ আমি করতে পারবো না।

ঠাকুর্দ্দা হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন। গলাটা বেশ শান্ত ও সংযত করিয়া কহিলেন, উদ্যোগ-আয়োজন এক রকম সম্পূর্ণ বল্‌লেই হয়। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, ঠাট্টা-তামসার ব্যাপার তো নয়,—কথা দিয়ে এসে এখন না বল্‌লে চল্‌বে কেন?

পুঁটু পিছন ফিরিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে, এবং দ্বারের আড়ালে রতন কান পাতিয়া রাখিয়াছে বেশ জানি।

বলিলাম, কথা দিয়ে যে আসিনি তা' আমিও জানি আপনিও জানেন। বলেছিলাম একজনের অনুমতি পেলে রাজি হতে পারি।

অনুমতি পাওনি?

না।

ঠাকুর্দ্দা এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, পুঁটির বাপ বলে

-সর্ব্বরকমে সে হাজার টাকা দেবে। ধরা-ধরি করলে আরও দু'একশ উঠতে পারে। কি বল্লো হে?

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তামাকটা আর একবার পাল্‌টে দেব কি?

দাও। তোমার নামটি কি বাপু?

রতন।

রতন? বেশ নামটি। থাকো কোথায়?

কাশীতে।

কাশী? ঠাকরুণটি বুঝি আজকাল কাশীতেই থাকেন? কি করচেন সেখানে?

রতন মুখ তুলিয়া বলিল, সে খবরে আপনার দরকার?

ঠাকুর্দ্দা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাগ করো কেন বাপু, রাগের তো কিছু নেই। গাঁয়ের মেয়ে কিনা, তাই খবরটা জান্‌তে ইচ্ছে করে। হয়তো তাঁর কাছে গিয়ে পড়্‌তেই বা হয়। তা' ভালো আছে তো?

রতন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল, এবং মিনিট দুই পরেই কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া হুঁকাটা তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর্দ্দা সবলে কয়েকটা টান্ দিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—দাঁড়াও তো বাপু, পায়খানাটা একবার দেখিয়ে দেবে। ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কিনা! বলিতে বলিতে তিনি রতনের অগ্রেই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

পুঁটু মুখ ফিরিয়া চাহিল, কহিল, দাদামশায়ের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। বাবা হাজার টাকা কোথায় পাবেন যে দেবেন? অমনি জোরে পরের গয়না চেয়ে নিয়ে দিদির বিয়ে,—এখন তারা দিদিকে আর নেয় না। তারা বলে ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

এই মেয়েটি এত কথা আমার সঙ্গে পূর্ব্বে কহে নাই, কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা সত্যিই হাজার টাকা দিতে পারেন না?

পুঁটু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কখ্‌খনো না। বাবা রেলে চল্লিশ টাকা মোটে মাইনে পান, আমার ছোট ভায়ের ইস্কুলের মাইনের জন্যে আর পড়াই হোলো না। সে কত কাঁদে। বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, তোমার কি শুধু টাকার জন্যেই বিয়ে হচ্ছে না?

পুঁটু কহিল, হাঁ, তাইতো। আমাদের গাঁয়ের অমূল্য বাবুর সঙ্গে বাবা সম্বন্ধ করেছিলেন। তার মেয়েরাই আমার চেয়ে অনেক বড়। মা জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন বলেই তো সে বিয়ে বন্ধ হলো। এবারে বাবা বোধ হয় আর কারু কথা শুনবেন না, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন।

বলিলাম, পুঁটু, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

পুঁটু সলজ্জে মুখ নীচু করিয়া একটুখানি মাথা নাড়িল।

কিন্তু আমিও তো তোমার চেয়ে চোদ্দ-পনেরো বছরের বড়?

পুঁটু এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি আর কোথাও কখনো সম্বন্ধ হয়নি?

পুঁটু মুখ তুলিয়া খুশী হইয়া বলিল, হয়েছিল তো। আপনাদের গ্রামের কালিদাস বাবুকে জানেন? তাঁর ছোট ছেলে। বি, এ, পাশ করেছে, বয়স আমার চেয়ে কেবল একটুখানি বড়ো। তার নাম শশধর।

তোমার তাকে পছন্দ হয়?

পুঁটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিলাম, কিন্তু শশধর তোমাকে যদি পছন্দ না করে?

পুঁটু বলিল, তাই বই কি! আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে কেবল আনাগোনা কোরত। রাঙাদিদিমা ঠাট্টা করে বল্‌তেন সে শুধু আমার জন্যেই।

কিন্তু এ বিয়ে হোলো না কেন?

পুঁটুর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, কহিল, তার বাবা হাজার টাকার গয়না আর হাজার টাকা নগদ চাইলে। আর কোন্ না পাঁচশ টাকা খরচ হবে বলুন? এ-তো জমিদারদের ঘরের মেয়ের জন্যেই হয়। সত্যি নয়? ওরা বড়

লোক, অনেক টাকা ওদের, আমার মা তাদের বাড়ী গিয়ে কত হাতে-পায়ে ধরলে, কিন্তু কিছুতে শুনলে না।

শশধরও কিছু বললে না?

না, কিছু না। কিন্তু সেওতো বেশি বড় নয়,—ওর বাপ-মা বেঁচে আছে কিনা।

তা' বটে। শশধরের বিয়ে হয়ে গেছে?

পুঁটু ব্যগ্র হইয়া কহিল, না এখনো হয়নি। শুনচি নাকি শীগ্‌গীর হবে।

আচ্ছা, সেখানে তোমার বিয়ে হলে তারা যদি তোমাকে ভালো না বাসে?

আমাকে? কেন ভালোবাস্‌বে না? আমি যে রাঁধা-বাড়া, সেলাই করা, সংসারের সব কাজ জানি। আমি একলাই তাদের সব কাজ করে দেবো।

এর বেশি বাঙালী-ঘরের মেয়ে কি জানে! কায়িক পরিশ্রম দিয়াই সে সমস্ত অভাব পূরণ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁদের সব কাজ নিশ্চয় করবে তো?

হাঁ, নিশ্চয় কোরব।

তা'হলে তোমার মাকে গিয়ে বোলো শ্রীকান্ত দাদা আড়াই-হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আপনি দেবেন? তা'হলে বিয়ের দিনে যাবেন বলুন?

হাঁ, তাও যাবো।

দ্বার প্রান্তে ঠাকুর্দ্দার সাড়া পাওয়া গেল। কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি প্রবেশ করিলেন, তোফা পায়খানাটি ভায়া! শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। রতন গেলো কোথায়, আর এক কল্‌কে তামাক দিক্‌না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রার চিত্রশালায় আমরা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশীর গঠিত সাতখানি মূর্ত্তির প্রতিলিপি প্রকাশিত করিলাম। বিচিত্রার পাঠক পাঠিকাগণের নিকট এই শিল্পীর ইহাই প্রথম পরিচয় নহে,—১৩৩৮ সালের কার্ত্তিক মাসে ইঁহার অঙ্কিত কয়েকটী উড্-কট ছবির প্রতিলিপি বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের নিবাস রাজসাহী জেলার অন্তর্গত জোয়াড়ী গ্রামে। ইঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিবার জন্য ইনি কলিকাতায় আসেন। সেই সময়ে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায়ের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। চারুবাবু সত্যেন্দ্রনাথের অঙ্কিত ছবি দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেন ও তাঁহার নিকট চিত্রাঙ্কন বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য বলেন। তদনুক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ পাঠ্যাবস্থায় চারুবাবুর নিকট ছবি-আঁকা শিখিতে আরম্ভ করেন।

অল্পকালের মধ্যেই ইঁহার ছবি কলিকাতা লক্ষ্ণৌ মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে প্রদর্শিত হয় এবং 'প্রবাসী' 'মানসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ঐ সময়ে Indian Society of Oriental Arts-এ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়, এবং তাহার ফলে কিছুদিন ধরিয়া অবনীন্দ্রনাথের গৃহে ইনি শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। পরে অবনীন্দ্র ইঁহাকে তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের নিকট চিত্র-বিদ্যা শিক্ষার জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়া দেন।

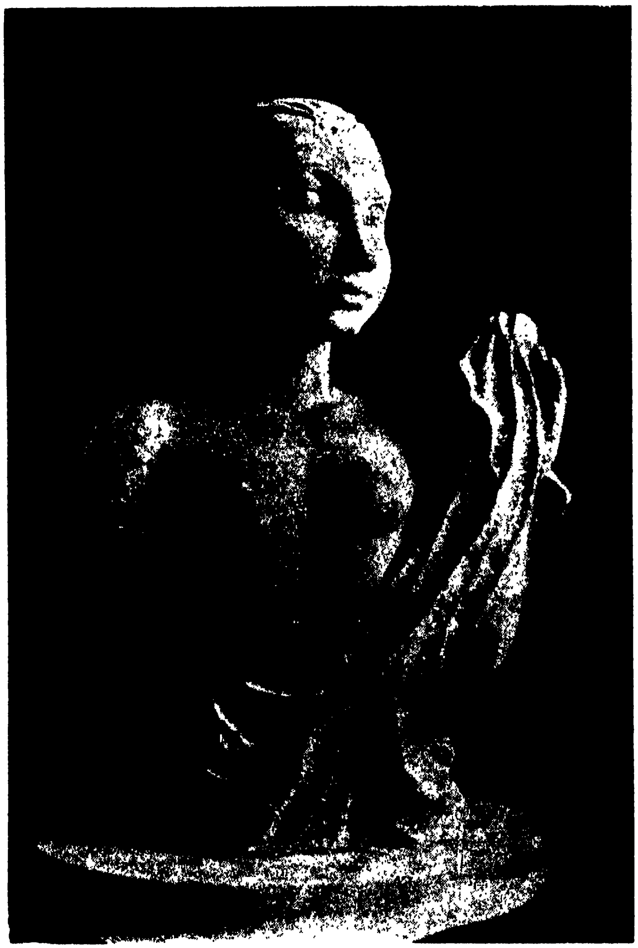
শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের শিষ্য হইবার পরই সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত্তি গঠিত করিবার ইচ্ছা দেখা দেয়—নন্দলালও সে বিষয়ে ইঁহাকে উৎসাহ প্রদান করেন। সেই সময়ে বিশ্বভারতীতে অষ্ট্রিয়া হইতে Miss Von Pott নামে একজন মহিলা ভাস্কর আগমন করেন। নন্দলাল বাবুর উপদেশক্রমে তাঁহার নিকট সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন। তৎপরে Madam Ellowert-এর নিকটও কিছুদিন শিক্ষা লাভ করেন। এই দুজন মহিলাই খুব অল্প সময়ের জন্য বিশ্বভারতীতে ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলালের নিকট শিক্ষা সমাপন করিবার পর সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত ম্হাত্রে, টালিম, ফাড়কে প্রভৃতির শিল্পাগার দেখিতে যান, কিন্তু কোথাও শিষ্য হিসাবে থাকেন নাই। সেই সময়ে ইনি বরোদা, জয়পুর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ এবং Elephanta Caves-এর ভাস্কর্য্য অনুশীলন করিবার সুযোগ লাভ করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সমগ্র গুজরাট, রাজপুতানা, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন শিল্প-কীর্ত্তি দেখিয়া আসেন।

এই তরুণ শিল্পীর শিল্প-রচনার মধ্যে প্রতিভার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা সর্ব্বান্তকরণে ইঁহার সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত স[illegible]ন্দ্রনাথ



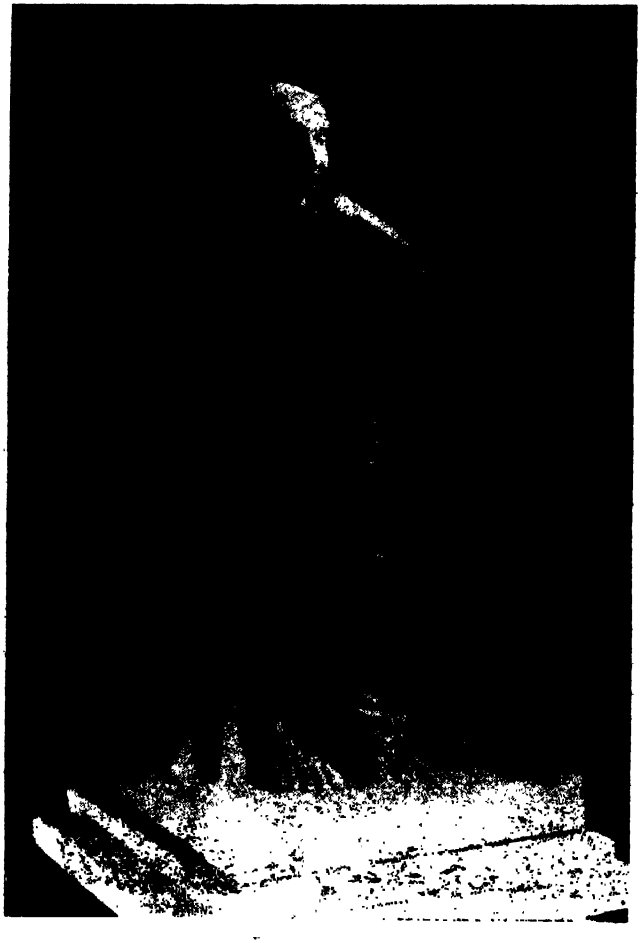
স্নানের পরে

চিত্রশালা

বিশী গঠিত
মূর্ত্তির ছায়ালিপি



জননী



নদী-পথে



শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়



শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন



জনৈক বন্ধু



বিশ্বভারতীর তিব্বতীয় অধ্যাপক



জনৈক বৃদ্ধলোক



গুণটানার সাথী



গুণটানার সাথী
[পশ্চাৎ দৃশ্য]

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

[উত্তর ইউরোপের দেশসমূহে অবস্থান ও পরিভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেইসব দেশীয় সংবাদ পত্রের অনেক লেখা আমার চোখে পড়িয়াছিল। সেরূপ প্রবন্ধাদি আমি সম্ভবমত সংগ্রহ করিতাম এবং আমার বন্ধু বান্ধবেরা সময় সময় আমাকে পাঠাইয়াছেন ও পাঠাইয়া থাকেন। প্যারিসে প্রদর্শিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সুইডেনের বিখ্যাত দৈনিক কাগজে (Svenska Dagblad) সেই দেশের খ্যাতনামা সমালোচকের যে লেখা বাহির হইয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধটি উহারই অনুবাদ। রবীন্দ্র-চিত্রশিল্পের বাহিরেও তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচকের পরিচয় যে কত ঘনিষ্ঠ তাহাও পাঠকেরা অনুমান করিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, সুইডিনরা কবির শিল্পরচনার প্রদর্শনী ষ্টকহলমে দেখিবার জন্য উৎফুল্ল হৃদয়ে আশা পোষণ করিয়াছিল। অনুবাদক]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দুই বৎসরের কাজের ফল স্বরূপ পাঁচশত নিজের আঁকা ছবি লইয়া প্যারিতে আসিয়াছিলেন। এই কাজে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার একটা দিক অপ্রত্যাশিত ও সম্পূর্ণ বিস্ময়কর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই মহান দার্শনিক ও চিন্তাশীল মনীষী, যিনি আপনার লেখনীর সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতির সীমান্তের প্রাচীর অতিক্রম করিয়াছেন—এবার তিনি নিজের রেখার ও রংএর তুলিতে শিল্প-জগতের সীমার সমাধান করিতে উদ্যত। কারণ তাঁহার তুলির টানে তিনি যে সকল ভাব ফুটাইয়াছেন তাহাদের একটা আর একটার সৌষ্ঠব ও ভাবকে রাঙাইয়া তুলে—অধিকতর ফুটাইয়া তুলে, বর্ত্তমান যুগে বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাবে যখন মানুষের মনের কাছে সোনা জিনিষটা আকাশের তারা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমরা দেখি মনীষী রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাণীতে ও লেখায় মানুষ ও মানুষের অন্ত-র্নিহিত দেবত্বের মধ্যে গভীর যোগ স্থাপনের কাজে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছেন।

এইবার চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ রেখা ও রংএর মূর্চ্ছনায় অব্যক্ত ও আধ্যাত্মিকতার রহস্যালোকে আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রশিল্পের সম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া সহজ নহে। কিন্তু আমরা আশা করি ষ্টকহলমে একদিন বিশ্বকবির শিল্পকলার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইবে, হয়ত অনেকেই সে সময়ে ভারতের যে সকল বিচিত্র দৃশ্য ভ্রমণকারিগণকে তৃপ্তি প্রদান করে সেইরূপ ঔৎসুক্য-জনক মনোরম কিছু দেখিবার কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথ আপনার চিত্রকলার ভিতর দিয়া যে ভারতকে ফুটাইয়াছেন সেই ভারত অশরীরী—তাহা মরজগতের বাহিরে অবস্থিত। তিনি যেন চিরসত্য অথচ অদৃশ্য বস্তুর বা অনুভূতির আবরণ উন্মোচন করিয়া উহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিতেছেন। সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গলীলা, জীবন ধারার অসীম প্রবাহ, অনুভূতির অসীমতা, প্রকৃতির বৈচিত্র্য,—এক কথায় বলিতে গেলে চিরপরিবর্ত্তনশীল বিশ্বজগতের সকল রকম খেলার তালের মাঝে যাহার বা যে শক্তির লীলা প্রকাশ পাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ যেন সেই লীলার অসীমতাকে ফুটাইয়া আমাদের কাছে ধরিতে চাহিয়াছেন,—তাঁহার চিত্রকলার অভিনবত্ব ঠিক এইরূপ ভাব দর্শকের মনে জাগাইয়া দেয়।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে তাঁহার কলাসৃষ্টি কি আধুনিক বা অন্য কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত? ইহার উত্তর এই হইতে পারে যে তাহা আধুনিক বা অন্য কোন শ্রেণীভুক্ত নহে। তাঁহার শিল্পকলার ধারা দেশ কাল ও পাত্র বিভেদে নিরপেক্ষ থাকিয়া সর্ব্বকালের বৈচিত্র্যকে ফুটাইয়া তুলিতে উৎসুক। চাঁদের আলো বা প্রকৃতির বিচিত্রতাকে অন্তর দিয়া উপভোগ করা এবং সেই উপভোগের বর্ণনা দেওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে যে তফাৎ, কবি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার ছন্দ

ও তাহাকে বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াসও সেইরূপ বিড়ম্বনা। যদি কেহ তাঁহার চিত্ররচনাকে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার মধ্যে ভাব-অভিব্যক্তির সহজ প্রতিভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন। তাঁহার চিত্রকলার বিশেষ শক্তি রচনার অনাবিল সরলতায় ও সহজ প্রকাশের মধ্যে নিহিত।

অজন্তা ও ইলোরের গুহাভ্যন্তরস্থিত ভারতীয় প্রাচীন চিত্রশিল্পীদের কলার স্থানে স্থানে যে পরিপূর্ণতা, অসীম ভাবব্যঞ্জনা ও আধ্যাত্মিকতার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আধ্যাত্মিক জীবনের বিহ্বলতা, সসীম জগতের বাহিরে অচেনা লোকের সন্ধান ও উহার জন্য আকুলতা কবি-শিল্পীর কাজে সুস্পষ্ট।

চিত্রশিল্পে এমন রচনার সৃষ্টি করা, যাহা মানুষের অন্তরাত্মাকে তৃপ্ত করিবে অথচ ভাস্কর্য্যশিল্পসুলভ গুণের অভাবও তাহাতে থাকিবে না—চিত্রকলায় সেইরূপ ভাব ফুটাইতে চাহিয়া বর্ত্তমান কালের অনেক শিল্পীই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথ অতি সহজভাবে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। সেই সহজ প্রকাশ তাঁহার তুলিতে তেমনি অনয়াসেই ধরা দিয়াছে, যেমন সহজে তিনি কলিকাতার প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে আপন নাটকের ভুমিকায়, পাঠের ও নৃত্যের তালে, রূপ রস নৃত্যের অভিনব সমন্বয়ে নিজের সৃষ্টি শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশের দ্বারা সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন; —যেমন সহজে তিনি আপনার কবিতায় আপনি সুর যোজনা করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন,—যেমন সহজে রাগ রাগিণীর ঝঙ্কার তাঁহার কবিতায় ধরা দিয়াছে।

তাঁহার চিত্রের রং গাঢ় এবং রং মিশ্রণের নিপুণতা দুর্লভ;—আর এখানে-সেখানে রংএর ছিটা-ফোঁটার তীব্রতা, ভারতের স্থানে স্থানে কোন কোন প্রজাপতির গায়ে অপূর্ব্ব নয়নোজ্জ্বল রংএর যে সমাবেশ দেখা যায়, শুধু উহারই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রং সমাবেশের উপমা চলিতে পারে। আর তাঁহার বিশেষ রংএর ছিটা-ফোঁটার যে তীব্রতা—তাহা যেন গোধূলি আকাশের তারায় মাণিকের ঝকমকি।

আজ পর্য্যন্ত যে সকল কলাধারার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের কোনটার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের চিত্র রচনার ধরণের মিল নাই। শুধু কলম, কালী, রং ও সাধারণ কাগজ তাঁহার চিত্ররচনার পক্ষে যথেষ্ট। সকল চিত্রেই তাঁহার আপন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বর্ত্তমান।

প্রদর্শিত চিত্রগুলিতে তিনি কয়েকটি ধারার সৃষ্টি করিয়াছেন। এক ধারায় দেখিতেছি মানুষের মাথা, মাত্র কয়েকটী রেখার টানে অশেষ ভাবের পরিস্ফূর্ত্তি। আবার অন্য এক ধারায় কতকগুলি অতিশয় আলঙ্কারিক চিত্র,—তাহাদের মধ্যে কয়েকটী পাখী ও জীবজন্তুর ছবিতে আশ্চর্য্য রকম রেখার ভঙ্গী। এক জায়গায় দেখিতেছি কতকগুলি মুখসের প্রতিকৃতি—উহাদের কোন কোনটা অতি কদাকার কিন্তু বড় মর্ম্মস্পর্শী। কতকগুলি চিত্রে মানুষের নিপীড়িত অন্তরাত্মার বাহ্য প্রকাশ! ওঃ—সে কি অভাবের, কি দৈন্যের, কি যাতনার অভিব্যক্তি—দেখিলেই দর্শকের মনকে, অন্তরকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। বর্ত্তমানকালে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পীড়নে এবং দুঃখের কঠোর জ্বালায় মানবতা—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের মত দেশে—যে ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে, স্পষ্ট বুঝা যায় কী গভীরতম ভাবে তাহা কবিশিল্পীর প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে!! কতকগুলি নৈসর্গিক প্রকৃতির দৃশ্য :—পর্ব্বত, গহ্বর, উপত্যকা, জলপ্রবাহ—সবই কুয়াশায় আবৃত!! কতকগুলি জমকাল বস্ত্রে আবৃত কাল্পনিক দৈত্য দানবের ছবি ;—তাহাদের বিরাট-গতি যেন গথিক শিল্পকলার অংশ বিশেষকে এবং ভারতীয় পৌরাণিক দৈত্য দানবের বিকটতাকে অতিক্রম করিয়াছে ;—তাহাদের বিশাল বাহু ও পদযুগলের প্রসারণে, গতিভঙ্গীতে মনে হয় যেন বিকট চীৎকারে দিগদিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে। কতকগুলি চিত্র অতীব মনোরম—উহাদের কোন একটায় যেন জোনাকী পোকার আলোর নৃত্য।

কবির কাব্য ও কবিতা পাঠে তাঁহার প্রতিভাকে স্মরণ করা সহজ। কিন্তু এখানে আমরা আর এক রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইতেছি, যিনি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন যেন পূর্ব্বে কখনও তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। মনে হয়, এই রবীন্দ্রনাথ নিজের কাছেও সম্পূর্ণ পরিচিত নহেন। এ যেন ঠিক সেই আদিমকালের সমুদ্র, আবহমানকাল

হইতে সৌর ও চন্দ্র কিরণের প্রতিবিম্ব আপন বক্ষে বহন করিতেছে,—অথচ উহার মহিমা সে নিজেই জানে না। সে আরও জানে না কি পরিমাণ জল সে বহন করে এবং তার গভীরতাই বা কতখানি।

রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত সঙ্কোচ ও ইতঃস্তত করিয়া আপন চিত্ররচনার ফসল কুড়াইয়া লইয়া এখানে আসিয়াছেন। এই ধরণের সঙ্কোচ-সশঙ্ক ভাব প্রতিভাবানদিগকে বিশিষ্টতা দান করে। রবীন্দ্রনাথের আপন চিত্ররচনা লইয়া এখানে আসার উদ্দেশ্য নিজের সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে সে সকল দেখানো —যাহাদের বিচার তিনি নিজের মত অপেক্ষাও বেশী মূল্যবান মনে করেন।

এই মে মাসে প্রকৃতির সজীবতার মধ্যে প্যারি সহরের 'আলট্রমডার্ণ পিগেল' নাট্যশালায় (Ultra-Modern Pigalle) কবি-শিল্পকলার প্রদর্শনী! দর্শকবৃন্দ বিমুগ্ধ নয়নে শুধু পাঁচশত চিত্রই দেখিতেছেন না,—তাঁহারা ইহাদের সংস্রষ্টা চিত্রকরেরও দর্শন সুযোগ লাভ করিতেছেন।

বিশ্বমানবের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত যে সকল প্রতিভাবান মনীষীর জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আপন মহিমায় জ্যোতিষ্মান রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে এক বিশেষ জন।

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

যাত্রা

শ্রীমতী সুলেখা সেন

তুমি কোন্ সন্ধ্যাক্ষণে ডাক্ দাও কী-অপূর্ব্ব সুরে,—
সুদূরের স্বপ্নলোকে যেন পাই অজানা বঁধুরে
নীরব আভাসে ; সে-আহ্বান শুনি মোর মর্ম্মমাঝে,
শুনি যেন দিকে দিকে, আকাশে আলোকে যেন বাজে
সে-গম্ভীর বাণী ; সহসা কর্ম্মের মাঝে পশে তার তান,
আমার বাঁশিটি ল'য়ে আসি ছুটে ; বিস্মিত আহ্বান
নীরবে মানিয়া লই গোপন-সাথীর,—যে-ইঙ্গিতে
বাণী তার ছন্দে ছন্দে শুনিয়াছি কতনা সঙ্গীতে,
সেই গান, সেই ভাষা আজি যেন চিনিনু আভাসে
অচেনা আলোয় ; আপনারে আজি এই সন্ধ্যাকাশে
সমর্পিয়া দিনু তারি তরে ;—চলিয়াছি সেই দেশে
আজো যারে পাই নাই দূরে দূরে তাহারি উদ্দেশে।

প্রথম-পুরুষ

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্

বারান্দায় পায়চারি করতে-করতে সুভা চুল-বাঁধা সাঙ্গ করলে। ঝি ততক্ষণে এসে গেছে। উপরে এসে বারান্দা নিকোল, কাপ্-বাটি কুড়িয়ে নিচে নামলো—উনুনে ধোঁয়া দেখা দিয়েছে। এবার যে কেটলি চাপাতে হ'বে জল গরম করতে, ঝি-কে তা বলে' দিতে হ'বে না।

চুল বেঁধে সাবান বা'র করে' সুভা কলতলায় নেমে গেলো গা ধুতে। মাথাটা বাঁচিয়ে দস্তুরমতো সে স্নান করলো। যা গরম পড়েছে আজ!

স্নান করে' উপরে চলে' এলো। বৃষ্টি পড়ে' মাঠের যেমন শোভা হয় তেমনি শ্যামল ও স্নিগ্ধ তাকে দেখাচ্ছে। আলমারি খুলে সে একখানি নীল সিল্কএর শাড়ি বা'র করলে। শাড়িটা পরতে দেখে যদি ওঁর বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ হয়! একটু কোথাও দূরে যেতে ইচ্ছে করে। আর কোন জায়গা না পেলে নেহাৎ রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্এই না-হয় যাবে—তার বাপের বাড়িতে। আভাটা এত কাছে থাকে, একা-একা দিগ্বিজয় করে' বেড়ায়, অথচ দিদির সঙ্গে একবারটি দেখা করতে আসতে পারে না। আর, উনিই বা এতক্ষণে ফিরছেন না কেন? সাড়ে-পাঁচটা বাজে।

যদি না-ই বা বেরুনো হয়, তবু এই শাড়িটি সে ছাড়বে না। এ দেহসজ্জা একান্ত করে'ই তার স্বামীর জন্য। এ-শাড়িটি পরে'ই সে আজ স্বামীর জন্যে চা করবে, উঠোনে বসে' গল্প করবে—কি না-জানি গল্প করবে আজ—এবং এ-শাড়িটি পরে'ই সে আজ স্বামীর পাশে শোবে, যাই তিনি বলুন।

সিতাংশু তাকে কত দিন বলেছে: দামি শাড়িগুলি বুঝি তোমার বাইরের লোকের মনোরঞ্জন করতে। ফাউন্টেন পেন্এর কালি যেমন লিখতে নীল, শুকোলে কালো, তেমনি পাঁচজনের কাছে তুমি রহস্যময়ী, আর আমারই কাছে নিতান্ত ডাল-ভাত।

অবুঝ ছেলের আবদারের মতোই সুভা স্বামীর এ খেয়ালপণাকে প্রশ্রয় দেয়নি। বল্‌তো:

—সমুদ্রের ঢেউ দেখে তুমি কী করবে? তুমি নেবে মণি-মাণিক।

এবং তার উত্তরে, আবরণটা যে কতো বড়ো আর্ট, তাতে যে কী সুদূরজ্ঞাপক সুন্দর ইসারা—সিতাংশু ঘরের মধ্যেও প্রফেসার হ'য়ে উঠ্‌তো।

কিন্তু স্বামীকে তার এখুনি পাওয়া দরকার।

খবরটা তাঁকে না-জানানো পর্য্যন্ত তার স্বস্তি নেই!

সুভা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনির ডগায় করে' সিঁথিতে সিঁদুর আঁকলে; সিঁদুরের কৌটায় ডান-হাতের কড়ে' আঙুলটা ডুবিয়ে কপালে ছাপ তুললে। নিজের রূপ দেখে নিজেই সে বিভোর। সাঁওতালি ঝুমকো দুটো কানে এবার দুলিয়ে দেবে নাকি?

পাশের ঘর থেকে সিতাংশু চেঁচিয়ে উঠেছে: আমার প্রুফ গেলো কোথায়? কলেজে যাবার সময় এটার ওপর রেখে গেলাম—কোন জিনিস কোথায় যে রাখে তার ঠিক নেই।

আশ্চর্য্য, কখন সিতাংশু এসে গেছে—সিঁড়িতে তার জুতোর আওয়াজ পর্য্যন্ত কানে যায় নি। এত কী নিয়ে সে ব্যস্ত ছিলো? মনে-মনে সে অন্য কোনো শব্দ শুনছিলো নাকি? সিতাংশু সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ত' তাকে এমন বেশে দেখতে পেলো না!

আঁচলটা না সামলেই সুভা ছুটে এলো।

সিতাংশু বললে, তখন যে এক তাড়া প্রুফ রেখে গিয়েছিলাম কী করলে সেগুলো? জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখতে পারো না, করো কী সমস্ত দিন?

সুভা বিস্মিত হ'য়ে বললে,—সেই এক বাণ্ডিল ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজ ?

—হ্যাঁ, কোথায় ?

অপ্রতিভ হ'য়ে সুভা বললে,—বাঃ, আমি কী জানি! আমি ভাবলাম বুঝি কোনো কাজে লাগবে না। ছিঁড়ে-ছুঁড়ে ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি।

—বলো কী! ওগুলো যে আমার বইয়ের প্রুফ—অর্ডার প্রুফ! আমাকে যে এখুনি গিয়ে প্রেসে পৌঁছে' দিতে হ'বে। এটুকু তুমি দেখতে পারো না তবে আছ কী করতে ?

সুভাও মুখ-চোখ যথাসাধ্য কঠিন করে' বললে,—এতই যখন জরুরি তখন নিজে যত্ন করে' রাখতে পারো না? আমার কী দোষ! হাওয়ায় মেঝের উপর উড়তে দেখে জান্‌লা দিয়ে ফেলে দিলাম।

—কোন জানলা দিয়ে ফেলেছ ?

—মনে নেই।

সিতাংশু এবারে বিছানা-বালিশ ওলোট-পালোট করে' জিনিস-পত্র ছরকুট করে' বিষম একটা কাণ্ড বাধালে দেখছি। নিতান্ত আথখুটে ছেলের মতো চ্যাঁচাতে সুরু করেছে: কোন জিনিসটা আমার দরকারী এটুকুই যদি বুঝতে না পারবে তবে এত রাজ্যের মেয়ে থাকতে তোমাকেই বা বিয়ে করলুম কেন? এটুকু যদি তোমার দৃষ্টি না থাকে তবে ও-দুটো ড্যাবডেবে চোখ নিয়ে জন্মেছিলে কেন ?

বলে' অসহায়ের মতো হাত-পা ছুঁড়ে সে পিসিমাকেই ডাক্‌তে লেগে গেল।

সুভা বললে,—থামো। ঢের হয়েছে। এই নাও তোমার প্রুফ। বলে' বিছানার তলা থেকে খবরের কাগজের প্যাকেটে সযত্নে মোড়া এক তাড়া প্রুফ সে বা'র করে' দিল।

এবং বা'র করে'ই তার উচ্ছ্বসিত হাসি। অভিমানে মুখ ভার করে' থাকাই তার উচিত ছিলো, কিন্তু দুপুরে ঐ একটা কাণ্ড ঘটে' যাবার পর তার আজ আর গম্ভীর হ'বার জো নেই।

সিতাংশু বললে,—এতক্ষণ একটু পরিহাস করছিলে বুঝি ?

—তোমারো দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করছিলাম। ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে আমি না-হয় তোমার প্রুফ দেখতে পাইনি, কিন্তু তোমার ঐ মাইনাস্-ফোর চশমা দিয়েই বা তুমি কোন্ দরকারী জিনিসটা দেখলে শুনি? এতক্ষণ ধরে' এত সুন্দর করে' যে সাজলাম মশায়ের একটু চোখে পড়েছে? রাগ খালি তোমারই হ'তে আছে, না ?

সিতাংশুর বুদ্ধিশুদ্ধি এতক্ষণে শানালো যা-হোক্। তাড়াতাড়ি সুভাকে সে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো: চমৎকার সেজেছ। এতক্ষণ আমি কেন দেখি নি ?

তারপরে এক হাতে সুভার চিবুকটি তুলে :

—চা তৈরি ?

—হচ্ছে। তার আগে অন্য জিনিস তৈরি ছিলো। অত্যন্ত দরকারী।

প্রোফেসার-মানুষ, খোলাখুলি না বলে' দিলে সহজে কিছু বুঝতে পারে না; বললে—কি ?

সুভা চোখ নাচিয়ে বললে,—এটুকুই যদি বুঝতে না পারবে তবে এত রাজ্যের কুষ্মাণ্ড থাকতে তোমাকেই বা বিয়ে করলুম কেন ?

ব'লেই সিতাংশুকে অণুমাত্র অগ্রসর হবার সুযোগ না দিয়েই—ছুট। এবং এক ছুটে একেবারে নিচে। রান্নাঘরে।

ফিনফিনে পাত্‌লা সিল্কের নীল ঢেউ শূন্য ঘর জুড়ে তখনো ঝিল্‌মিল্ করছে।

বারান্দার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সিতাংশু বললে,—খাবার দাবার কিছু করতে হ'বে না। শুধু এক কাপ্ চা নিয়ে এস। আমাকে এখুনি আবার বেরুতে হ'বে। মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে আসছি—বোতামের সেট্‌টা বা'র করে' রেখো।

সুভা দ্বিতীয়বার অমলেট্ ভাজতে বসলো। হ্যাঁ, অমলেটই সে ভাজবে।

চা নিয়ে সে হাজির। সিতাংশু আলমারির কাঁচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

টিপয়ের উপর ডিস্ ও কাপ রেখে সুভা বললে,—আমিও যে তোমার সঙ্গে বেরুব।

—আজ নয়। ঢের কাজ আছে—

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুনোটা বুঝি কাজ নয় ?

—আজ হ'য়ে উঠবে না। প্রথম যেতে হ'বে প্রেসে—প্রেস এতক্ষণে নিশ্চয়ই বন্ধ হ'য়ে গেছে—অগত্যা বইয়ের দোকানে। সেখান থেকে—

—সেখান থেকে !

—সেখান থেকে—একটা খুব ভালো টিউশানির অফার এসেছে। সপ্তাহে তিন দিন--দেড় শো টাকা। যদি পাই।

—কিন্তু আমি এত করে' সাজলাম !

—দেখি, দেখি কেমন সেজেছ ! বলে' সিতাংশু সুভার দু'হাত ধরে' কাছে টেনে আনলো, তারপর বুকের উপর।

সুভা মুখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে বললে,—চা তোমার জুড়িয়ে গেল।

—যাক। চা'র চেয়েও ভালো elixir আছে। পরে সুভার গালে হাত বুলুতে-বুলুতে :

—আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আসছি। যদি টিউশানিটা পাই--তুমি শাড়িটা ছেড়ো না কিন্তু। এসে ছাতে গিয়ে দু'জনে খুব গল্প করবো, কেমন ? এসো, অমলেটটা তুমি আধখানা খাও। হ্যাঁ, হাঁ করো বলছি।

সিতাংশু খানিকটা ছিঁড়ে সুভাকে খাইয়ে দিলে।

—মন খারাপ করবে না ত' ?

—না না—এক ঘণ্টার মধ্যে ঠিক ফেরা চাই কিন্তু।

রাগ সুভা করবে না—অন্তত আজকে নয়। স্বামীর সে বাধ্য বটে, কিন্তু সে যে বুদ্ধিমতী, সেইটেই বড়ো কথা।

কিন্তু কথাটা সে কখন পাড়বে ? বাইরে বেরুবার জন্যে সিতাংশু ভীষণ ব্যস্ত—সে-কথা ত' এক নিশ্বাসে বলে' গেলেই ফুরিয়ে যাবে না। সে-কথার আগে ও পরে দুইটি বিস্তৃত অবসর চাই। টিউশানি পাবার মতো খাপছাড়া একটা সংবাদ ত' তা নয়। তার জন্যে একটি অনুকূল আবহাওয়া চাই।

সুভা বললে,—ফিরে এসে ছাতে গিয়ে কিন্তু অনেকক্ষণ বসতে হ'বে। তখন যে আবার একজামিনের কাগজ দেখতে হ'বে বলে' তাড়াতাড়ি নেমে এসে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসবে তা হ'বে না।

—না, না, অনেকক্ষণ বসবো।

কথাটা তা হ'লে সে সেখানেই বলবে।

কিন্তু খোলা ছাত, আকাশ যেখানে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে এসেছে, যেখান থেকে অগণন তারা চোখে পড়ে—সেখানে কথাটা না-জানি কেমন শোনাবে! ভাবতে গিয়ে সুভার বুক কেঁপে উঠলো।

জুতো মসমস করতে-করতে সিতাংশু বেরিয়ে গেলো। তাকেও সুভা দোর-গোড়া পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে দিলে। বললে,—একঘণ্টা মধ্যে ফিরে আসা চাই, মনে থাকে যেন।

রাস্তায় নেমে হাসি-মুখে সিতাংশু বললে,—দেড় ঘণ্টা।

—আচ্ছা দেড় ঘণ্টা। ঠিক !

সিতাংশুও অবশ্যি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো না। সে জানে সুভা নিশ্চয়ই রোয়াকের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি রোজই সে দাঁড়ায়।

কিন্তু এখন সে কী করবে ?

পিসিমা তাঁর ঘরে বসে' রাতের তরকারি কুটছেন। অগত্যা সুভা তাঁরই কাছে এসে বসলো।

ঝি ও ঠাকুর সম্বন্ধে আবশ্যকীয় দু'টো নিন্দা করে' পিসিমা শেষকালে বললেন—বলতে তাঁকে এক সময় হ'তই : সুকুমারের সঙ্গে আমার বোন-ঝি প্রমীলার সম্বন্ধ করলে কেমন হয় ?

সুভা স্বচ্ছন্দে ঘাড় হেলালো : বেশ হয়।

—তুমি প্রমীলাকে দেখেছ ?

লজ্জিত হ'য়ে সুভা বললে,—না।

—তোমাদের মতো ফুট-ফাট অতো ইংরিজি শেখেনি বৌমা,—আর ইংরিজি শিখলেই বা কী, সেই তোমাকেও ত হাঁড়ি ঠেলতে হয়, স্বামিসেবা করতে হয়, ঈশ্বর করুন একটা-কিছু হ'লে তোমাকেই ত' দেখতে-শুনতে হবে। বি-এ, এম্-এ, পাশ করলেও এই ত' মেয়েদের সত্যিকারের কাজ,—কি বলো ?

—নিশ্চয়। এ-বিষয়ে কোনো মেয়ের কিছুমাত্র সন্দেহ আছে নাকি ?

পিসিমা বললেন,—প্রমীলার গায়ের রঙ তোমার চেয়ে কিছু ফর্সাই হ'বে হয় ত'—

সুভা হেসে বললে,—হয় ত' কেন, নিশ্চয়ই।

—তা ছাড়া যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি এক গোছ চুল। নেমন্তন্ন-বাড়ির রান্না সে একাই নামিয়ে দিতে পারে। ওরা টাকা নেবে নাকি ?

—তা আমি কী করে' বলবো ?

—এতদিন পাশাপাশি বাড়িতে ছিলে জানো ত' হালচাল, কি রকম মনে হয় ? ঘরের অবস্থা কেমন ?

সুভা ঢোঁক গিলে বললে,—অবস্থা ওদের কোনো কালেই ভালো নয়। বাপ বাতে অসাড়, মা নেই। সুকুমার কতো কষ্টে মানুষ হয়েছে। তাও, কোনো চাকরি না নিয়ে বসলো কি না উকিল হ'য়ে।

পিসিমা বল্‌লেন,—সে আমি কিছু-কিছু তার মুখেই আজ শুনেছি। নিলে কত টাকা নেবে ?

—কী করে' বলি বলুন। একদম বিয়েই করবে না বলে।

—ও-কথা কোন ছেলেটা না বলে আজকাল ? কিন্তু ছেলেটি কেমন ?

—খুব ভালো। এমন ছেলে হয় না। কথাটা বলে' ফেলে সুভা থমকে গিয়ে ফের শোধরালো : ভালো বলে'ই ত' জানতাম। আমার সঙ্গে অনেকদিন অবশ্যি দেখা হয় নি। দু'বছর বাদে এই তাকে প্রথম দেখলাম। কিছু বদলেছে বলে' ত মনে হ'ল না।

কিন্তু এইখানে সে এই সব কথাই বলতে বসেছে নাকি ? সুভা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। ঘড়িতে এখন ক'টা বেজেছে দেখে রাখতে হ'বে। দেড় ঘণ্টা !

পিসিমা জিগগেস করলেন : তারা এখন কোন ঠিকানায় আছে কিছু বলে' গেল ?

—না ত'।

—জেনে রাখো নি ?

সুভা মনে-মনে হাসলো, বললে,—জিগগেস করেছিলাম, কিন্তু বললে না।

পিসিমা বললেন,—নিজের গরজে ত' আর জিগগেস করো নি। ওগো, আমারই ভুল হ'য়ে গেছে। আর সে আসবেনা নাকি এদিকে ?

আর যে সে আসবে না এ-কথা সুভা ভালো করে'ই জানে। আজো সে আসতো না। নিতান্ত দৈবাৎ এসে পড়েছিলো।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে-যেতে সুভা বললে,—আর এখানে আসবার তার কী দরকার !

—বা, চেনা-শুনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বুঝি মাঝে-মাঝে আসতে নেই। তাকে আরেক দিন আসতে বললেই ত' পারতে। ঠিকানাটা এখন কী করে' পাই ?

যে-কথা সে মনের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায় তাই নিয়ে তাকে কিনা সবিস্তারে আলোচনা করতে হচ্ছে।

পিসিমা বল্‌লেন, সেজে-গুজে রইলে, বেড়াতে বেরুলে না ?

সুভা তখন উপরে উঠে গেছে, চেঁচিয়ে বল্‌লে,—উনি ফিরে এলে তবে বেরুব।

ঘর জুড়ে যে অটল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে হঠাৎ তা কথা কয়ে' উঠলো।

কী যে সুভা এখন করবে, কী করলে যে তাকে মানায় কিছুই তার মাথায় আসে না।

উপরের বারান্দার জানালায় এসে দাঁড়ালো। সামনেই ল্যান্স-ডাউন রোড, পাশেই মার্কেট। টুকরো-টুকরো কোলাহল, অচেনা যতো মুখ। কিন্তু বেশিক্ষণ অমনি দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভালো লাগলো না। কার জানি সে প্রতীক্ষা করছে—দাঁড়াবার ভাবখানা যেন তাই। সিতাংশুর ফিরতে এখনো ঢের দেরি। এখনি তার জন্যে জানালায় দাঁড়াবার দরকার নেই।

বা, জান্‌লায় এমন চমৎকার হাওয়া—সারা দিনের গুমোটের পর একটুখানি এখানে দাঁড়ালে দোষ কী !

না, দোষ কী !

তবু কেবলই সুভার মনে হচ্ছে রাস্তায় সুকুমারের সঙ্গে হঠাৎ তার চোখোচোখি হ'য়ে যাবে। সে যেন তখন থেকেই এই সামনে দিয়ে পাইচারি করছে।

সুভা শোবার ঘরে চলে' এলো। ঘরের আবহাওয়াটা অত্যন্ত গাঢ়, তাতে সন্ধ্যার অন্ধকার জমছে। দেয়াল ঘর বাড়ি অতি মাত্রায় নিস্তব্ধ—সমস্ত শূন্যতা পরিব্যাপ্ত করে' কা'র একটি উপস্থিতি।

ছাতে গেলে কেমন হয়? না, উনি ফিরুন।

কাল সে এই সময় কী করেছিলো? কাল উনি বাড়ি ছিলেন, কতক্ষণ পর বন্ধুরা আড্ডা দিতে এলে নিচে নেমে গেলেন তাস খেলতে। রান্নাঘরে সুভার তখন কতো কাজ—চা করা, নিমকি ভাজা, পরিপাটি করে' প্লেট সাজানো। আজ তার হাতে কি না কোনোই কাজ নেই।

পর্শু—পর্শু সে কী করেছিলো? পর্শু তারা দু'জনে গিয়েছিলো ম্যাডক্স স্কোয়ারে—সেখান থেকে রিচি-রোডে কাকার বাড়ি। আভার সঙ্গে দেখা হ'ল, আভা গান গাইলে।

তার আগের দিন এমন সময়? সিতাংশু ছিলো খাটের উপর শুয়ে ও তার কোল ঘেঁসে বসে' সুভা বাজাচ্ছিলো সেতার।

তার আগের দিন যে কী করেছিলো ঠিক মনে নেই। সিতাংশু যে দিন এমন সময় বেরিয়ে যায় তখন সে কী করে? সাধারণত কী করে? করবার মতো কাজের অভাব সে এর আগে কোনো দিন বোধ করেছে নাকি? কী আবার করে—সন্ধ্যা দেয়, বই পড়ে, ঠাকুরকে দুয়েকটা রান্না দেখিয়ে দেয়—কিছুই হয়ত' করে না।

আজো সে সন্ধ্যা দিলো, ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিলো, টেবিলের কাছে একটা বই নিয়েও বসলো,- কিন্তু কিছুই আজ তার করবার নেই।

খাটের উপর বসে' সেতারটা বাজাবে নাকি?

সে-বাজনা তার কে শুনবে? কাকে শোনাবে?

ভাবতেই সুভার বুক কেঁপে উঠলো।

বা, নিজের জন্যে সে বাজাতে পারে না? নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে?

কিন্তু, কী তার ভাবনা, যা ভোলবার জন্যে তাকে সেতার নিয়ে বসতে হ'বে? কী তার দুঃখ সেতারের সুরে যা'র সান্ত্বনা?

আর সেতার নিয়ে বসলেই মনকে ব্যাপৃত ক'রে রাখতে পারবে কি না কে জানে?

কথাটা তখন সুভা সিতাংশুকে বলে' ফেললেই পারতো। বলে' ফেললেই সে মুক্তি পেতো। এখন যতোই সময় যাচ্ছে ততোই যেন কথাটার অর্থ মনের মধ্যে গভীর হ'য়ে উঠছে।

এখনো তাঁর ফিরবার নাম নেই। আটটা বেজে গেলো।

নিচে গিয়ে পিসিমার সঙ্গে গল্প করতে বসলেও এক ফাঁকে সে-কথা উঠবেই। সমস্ত শূন্যতা পরিব্যাপ্ত করে' তার উপস্থিতি।

পরীক্ষার ছাত্রীর মতো সুভা এ-বইটার কয়েক পৃষ্ঠা অন্তত এখন পড়বেই। যতক্ষণ না সিতাংশু ফেরে।

সিতাংশু যখন ফিরলো, উপরে উঠে এসে দেখে ঘর অন্ধকার, তার খাটের উপর সুভা শুয়ে আছে। যেন রাত্রির আকাশে সুনীল অন্ধকার। বসে' থেকে থেকে অবশেষে ঘুমিয়েই পড়েছে হয় ত'। কিম্বা তাকে বেড়াতে নিয়ে যায় নি বলে' রাগ করেছে। তাদের একটুও ঝগড়া হয় না বলে' সুভা মাঝে-মাঝে অভিযোগ করে। তাই এই বুঝি তার রণসজ্জা!

টুপ্ করে' সুইচ্ টেনে সিতাংশু আলো জ্বালালো।

আর অমনি সুভা দিলো ফিক্ করে' হেসে।

কোথায় বা ঝগড়া, কোথায় বা কী! সুভা ছোট খুকির মতো দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকলে: এসো এসো শিগগির এসো আমার কাছে।

সিতাংশু কাঁধের থেকে চাদরটা খুলে রেখে সুভার পাশে এসে বসলো।

এত দেরি করে' ফিরেছে বলে' সুভা এতটুকুও অভিমান করলে না কিন্তু। বরং স্বামীকে বুকের উপর টেনে এনে গলাটা নিবিড় করে' জড়িয়ে ধরে' তাঁর ঠোঁটে ও গালে অজস্র চুমু খেতে লাগলো।

কথাটা সে এইবার পাড়বে নাকি?

সুভা বললে,—এত রাত করে' ফের আর একা-একা আমার ভীষণ ভয় করে।

ভয় কোথায়,—চোখ ভরে' তার সুন্দর হাসি, সে-হাসি সমস্ত দেহে ঝর্ণার জলের মতো ঝির ঝির করে' বইতে লেগেছে।

ভয়ের কথা বলে' এখনই সে-কথা বলা খাপ খাবে না। কথাটায় অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্য আসবে। অজস্র হাসির স্রোতে

সে-কথাটা সামান্ত একটা কুটোর মতো সে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিম্বা অসংখ্য ঘরোয়া কথার ফাঁকে সে-কথাটা সে ভিড়ের মধ্যে বিনা-টিকিটের প্যাসেঞ্জারের মতো টুপ করে চালিয়ে দেবে যা-হোক।

শোয়া ছেড়ে সুভা চট্ করে' খাটের উপর উঠে বসলো। কাঁটাগুলি খোঁপার মধ্যে গুঁজতে-গুঁজতে বললে,—চলো। ছাতে যাবে না?

এবার সিতাংশু শুয়ে পড়লো—অনেক ঘুরেছে, ট্রাম-রাস্তা থেকে বাড়ি আসতে অনেকটা হাঁটতে হয়। একখানা হাত ধরে' কাছে টানতেই সুভা অনায়াসে বুকের উপর আশ্রয় পেলে। সিতাংশু বললে,—টিউশানিটা হ'ল না, মোটে পঞ্চাশ টাকা দিতে চায়।

—বাঁচলাম। বিকেল বিকেল টিউশানি করতে গেলেই আমার হয়েছিল আর কি। আমার জন্যে তোমার একটুও ভাবনা নেই।

এবারে কথাটা সে পাড়তে পারে।

কিন্তু, ভাবনা নেই বলবার পর ও-কথা তুললে হয় ত' অকারণে তাঁকে ভাবিয়ে তোলা হ'বে।

সিতাংশু বললো,—রান্না হ'য়েছে? ঠাকুরকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা কর না। দারুণ খিদে পেয়েছে।

—চলো, কখন হ'য়ে গেছে। ঠাকুরটা ঘুমিয়েছে নিশ্চয়ই। রাত কত হয়েছে, খেয়াল আছে কিছু?

ঘড়ির দিকে চেয়ে সিতাংশু এক ঝটকায় উঠে পড়লো: চলো, চলো, আর দেরী নয়। আলো নিবিয়ে এসো শিগগির। আরেকবার চান করে' নিলে হয়।

তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেলটা খুঁজে সিতাংশু তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

অতএব ছাতে যাওয়া আজ আর হ'ল না।

না হোক, খেতে বসে'ই কথাটা সে বলবে। এবং আশা করি, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মতো সে-কথাটাও চিবিয়ে হজম করে' ফেলতে দেরী হ'বে না।

কিন্তু মাছের তরকারিটা মুখে দিয়েই সিতাংশু নিদারুণ কণ্ঠে ঠাকুরকে ধমকে উঠ্লো: বাজারের সমস্ত মিষ্টি এনে ঢেলেছ বুঝি এর মধ্যে? মুখে দেয় কার সাধ্য? বলে' মুখের গ্রাসটা সে থুতিয়ে ফেলতে লাগলো। তারপর সুভাকে লক্ষ্য করে' বললে:

—গর্দ্দভটাকে একটু দেখিয়ে দিতে পার না? কী করো সমস্ত ক্ষণ!

সুভা হেসে বললে,—আমি ত' দিব্যি খেতে পাচ্ছি। চমৎকার হয়েছে। আরেকটু দাও দিকি, ঠাকুর।

বাবু তাকে গাল দিলেও গিন্নির কথায় ঠাকুর বিশেষ খুসি হ'য়ে উঠ'লো। সুভাকে অগত্যা বাধ্য হ'য়ে বলতে হ'ল: তোমাদের জন্যে থাকবে ত' তরকারি। দেখো!

কিন্তু উনি অমন চটে' থাকলে কথাটা এখানেই বা কী করে' পাড়া যায়?

কলতলায় আঁচাতে এসে সুভা বললে,—তোমার পেট ভরেনি, না?

কুলকুচো করে' সিতাংশু বললে—আমি তেমনি পাত্র কি না—দুর্দ্দিনের ভাত ফেলে উঠবো! তবে খিদে আমার এখনো আছে বটে। তা অন্য খিদে।

সুভার গা ভরে' সিল্ক্এর নীল শাড়ি অরণ্যচাঞ্চল্যের মতো ঝিলমিল ক'রে উঠলো।

তখনই সে বলবে—রাত যখন অনেক গভীর। যখন সে-কথার কোনো আলাদা অর্থ থাকবে না।

পান নিয়ে সিতাংশু উপরে উঠে যায়, সুভা পিসিমার খাওয়ার কাছে একটু বসে; ফরমাজ-মতো এটা-ওটা এগিয়ে দেয়।

পিসিমাকে শুইয়ে উপরে এসে দেখে সিতাংশু তার খাটে শুয়ে একটা ইংরিজি পত্রিকার পাতা উলটোচ্ছে। সুভা কাঁচের গ্লাসে করে' জল গড়িয়ে এনেছে,—এবার নির্ব্বিঘ্নে সে দরজা বন্ধ করলো। তারপর তার নিজের খাটের থেকে বালিশ দুটো তুলে এনে সিতাংশুর পাশে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কিসের আর পত্রিকা—নীল সিল্ক্ তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে।

সিতাংশু সুভাকে—সুভার পাতলা ছিপছিপে কোমল দেহটিকে—পায়রার বুকের মতো ভীরু তুলতুলে দেহটিকে নিজের সর্ব্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ স্পর্শ দিয়ে আচ্ছন্ন করে' রইলো। বললো,—তোমাকে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে—

সুভা সিতাংশুর চিবুকের তলায় মুখ লুকিয়ে আস্তে বললে,—তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না—

যতো ছেলেমান্‌'স।

আমরা এ ঘর থেকে এখন স্বচ্ছন্দে চলে' যেতে পারি, কিন্তু সুভার মুখে কথাটা শুনে যাবার জন্যেই যা একটু আমাদের দেরি হচ্ছে।

আরো অনেকক্ষণ কাটে—রাতই খালি গভীর হয়। সঙ্গে সঙ্গে সুভার মনে কথার অর্থটাও ততোধিক গভীর হ'তে থাকে।

সিতাংশু সুভার চুলে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে,—তোমার খাটে উঠে যাবে না সুভা?

স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে—দৃঢ়প্রাকার সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে আহত পরাজিত পলাতক বন্দীর মতো আশ্রয় ও খাদ্য পাবার আনন্দে সুভা বললে,—না। আজ তোমার পাশে শোব। ওখানে শুতে আমার ভয় করবে।

—কিসের ভয়?

—না, না, ওখানে শুলে আমার কিছুতেই ঘুম আসবে না। আলোটা হাত বাড়িয়ে এবার নিবিয়ে দাও না।

হাত বাড়িয়ে সিতাংশু আলোটা নিবিয়ে দিলে।

অন্ধকারে তবু আমরা কান পেতে আছি। সুভা এবার নিশ্চয় বলবে।

পূর্ণিমায় নদীর বন্যার মতো প্রচুর প্রবল অন্ধকার ঘর-বাহির, সুভার চক্ষু ও হৃদয় অনুভূতি ও ব্যাকুলতা আচ্ছন্ন, অসাড় করে' দিলো। ঘর ভরে' এতক্ষণ যখন রুক্ষ আলো জলছিলো তখন সে-কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারে নি কেন? আর এখনই কি না তা সে বলবে—এই অন্ধকারে, বিস্মৃতির মতো বিপুল অন্ধকারে!

সুভা সিতাংশুর আরো কাছে সরে' এলো। আরো কাছে।

আমরা আর কতক্ষণ প্রতীক্ষা করবো?

সিতাংশু ঘুমোবার চেষ্টা করছে, তার নিশ্বাস ক্রমে-ক্রমে দীর্ঘ, মন্থর ও সশব্দ হ'য়ে উঠছে।

তবে কখনই বা সে স্বামীকে তা বলবে? বলতে না পারলে তার স্বস্তি নেই, সারারাত ঘুম আসবে না, দুঃসহ দুশ্চিন্তা ভারি পাথরের মতো তার বুক চেপে বসে' থাকবে।

স্বামীর গালে গাল রেখে সে ডাকলে,—শুনছ?

অস্ফুট উত্তর হ'ল: উঁ!

সিতাংশু ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু, তবে—স্বামীকে তা জানিয়েই বা কী দরকার? অন্ধকারের সুভা কূল দেখতে পেলো। সিতাংশু তা না জানলে কী যায়-আসে, তাদের জীবনে কোথায় কী ক্ষতি হ'বে তাতে। কালকেই ত' আবার সেই ভোর, সেই সংসার!

সুভা গভীর তৃপ্তিতে নিশ্বাস ছাড়লো।

সুকুমার ত' কোনদিন আর এ-বাড়িতে আসবে না!

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রদর্শন *

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

ইংরেজ কবি পাগল, প্রেমিক ও কবি—এই তিনটীকেই এক শ্রেণীর জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা কিছু অসাধারণ, তাহাই এই তিনের কৃতি। যাহা কিছু অসম্বন্ধ, তাহাতেই পাগলের অস্তিত্ব; যাহা কিছু অপ্রীতিকর তাহাতেও প্রেমিকের পরিপূর্ণ তৃপ্তি; যাহা কিছু নিষ্প্রয়োজন, তাহাতেই কবির একান্ত প্রয়োজন। এমত অবস্থায় কবিত্ব অতি সহজেই উন্মাদের প্রলাপ—অতএব অবোধ্য, কিম্বা গঞ্জিকাসেবীর কল্পনাচাতুর্য্য—অতএব স্মিতহাস্তে উপেক্ষণীয় বলিয়া গণ্য হয়। সাধারণে যে মৃত্যুর নামে আতঙ্কে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, আমি যদি তাহাকে "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান" বলিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করি, তবে সাধারণে আমাকে বাতুল বলিলে যতই উষ্মা প্রকাশ করি না কেন, সাধারণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর হয় না। প্রায়শঃই অসাধারণত্বের অপর নাম বাতুলতা। তবে যিনি বিজ্ঞ, পণ্ডিত, গুণী বলিয়া সুবিদিত সাধারণ লোকে তাঁহার অসাধারণত্বকে বাতুলতা বলিতে সাহসী হয় না, খাতির করিয়া তাহাকে mysticism ইত্যাদি সুশ্রাব্য ভাষায় আখ্যাত করে। আমরা পূর্ব্বাহ্নেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি যে বুদ্ধির অগ্রাহ্য পদার্থের অস্তিত্বই অসম্ভব, সুতরাং আমাদের বুদ্ধির অতীতের কোন কথা হইলেই তাহা নিরর্থক বিবেচিত হয়। অথচ জগতে যাহা কিছু মহান্ সকলই সাধারণ বোধের অতীত। কলা, বিজ্ঞান, দর্শন সকলের মূলেই এই অসাধারণত্ব। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী আমার হাস্যই উৎপাদন করে, বৈজ্ঞানিকের গ্রহনক্ষত্রের শক্তি বিচার আমার ধাঁধাই জন্মায়, সাধকের দিব্যানুভূতি আমার বিচারে মস্তিষ্কবিকার ছাড়া আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে আমার আচার-ব্যবহারও ইঁহাদের অবোধ্য ও করুণার উদ্দীপক। সাধারণ অসাধারণ নির্ব্বিশেষে সকলেই পরস্পরের দৃষ্টিতে mystic, সমগ্র জগৎটাই যেখানে প্রকাণ্ড একটা mysticism সেখানে একজনকে বিশেষভাবে mystic বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার সার্থকতা কী? একটীমাত্র ফুলকেই আমি একভাবে দেখি, একজন কেমিষ্ট অন্যভাবে দেখেন, একজন বোটানিষ্ট অন্যভাবে দেখেন, একজন ভাবুক আর একভাবে দেখেন—ইহা লইয়া বিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় mystic কথাটাই অর্থহীন। যে কোন পদার্থকে তিন ভাবে দেখা যাইতে পারে—সাধারণ-দৃষ্টি, যৌক্তিক-দৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক-দৃষ্টি। প্রথম দুই প্রকারের দৃষ্টি অপূর্ণ, একাঙ্গ; বস্তুর সত্যিকারের উপলব্ধি তৃতীয় প্রকার দৃষ্টির গম্য—আর ইহাই ভাবুক ও দার্শনিকের দৃষ্টি। এই অখণ্ড দৃষ্টিকে প্রাকৃতজনে কুহেলিকার মত ধূমায়িত মনে করিলেও তাহাই প্রকৃত দর্শন, তাহাই সত্য। সাধারণ-দৃষ্টিতে যাহা একান্ত বিরুদ্ধ, কবি ও দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাহাই অপূর্ব্ব মেলনসুষমামণ্ডিত। এমত স্থলে কবি ও দার্শনিকের উক্তি সাধারণের নিকট হেঁয়ালি হইলেও তাহার মূল্য সব চেয়ে বেশী। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী!"

রবীন্দ্রনাথ কবি; তিনি বহু গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন তথাপি তিনি কবি। তাঁহার নাটক প্রহসন গল্প সমালোচনা, এমন কি বানান সমস্যার অভ্যন্তরেও তাঁহার কবির নিপুণ হস্ত বিশেষভাবেই পরিস্ফুট। বস্তুতঃ কবিত্বই তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনার আত্মা। অনেকে বলেন, কবিত্ব কবিত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহার মধ্যে দর্শন বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম ত নিশ্চয়ই, অমার্জ্জনীয় অপরাধও বটে। এই সিদ্ধান্ত

* পাটনা রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে পঠিত।

মানিয়া লইলে 'রবীন্দ্রের-দর্শন' বলিয়া একটা কিছুর অস্তিত্বই অস্বীকার করিতে হয়। তত্ত্বকে 'প্রমাণ' করাই যদি দর্শনের কাব্য হয়, তবে কবিত্বের মধ্যে দর্শনের অনুসন্ধান নিশ্চয়ই নিরর্থক; কারণ কবিত্ব বস্তুতঃ কিছুই প্রমাণ করে না, এবং প্রমাণ করে না বলিয়াই ইহার অপরূপ মহত্ত্ব। কবিত্ব তত্ত্বকে প্রমাণ করে না সত্য, কিন্তু সেই জন্য কবিত্ব নিস্তাত্ত্বিক বা অবস্তু নহে। তত্ত্বের আবিষ্কার বা বিশ্লেষণ কবিত্বের কার্য্য না হইলেও তত্ত্বের অনুভূতিই প্রকৃত কবিত্ব, তত্ত্ব সম্ভোগের পরমাতৃপ্তির অতিপ্লাবনই কবিতা। পাশ্চাত্যেরা যে অর্থে Philosophy শব্দের ব্যবহার করেন আমরাও সেই অর্থেই 'দর্শন' শব্দের ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতীয় দর্শন কেবল প্রমাণ প্রয়োগেই পর্য্যবসিত নয়। 'দর্শন' শব্দটাই একটী বিশেষার্থের দ্যোতক। "ঠিক ঠিক দেখাকেই" 'দর্শন' নামে অভিহিত করার ইঙ্গিত আমরা বেদান্তাদি দর্শনে পাই। জগৎকে আমিও দেখি, আর পাঁচজনেও দেখে, কিন্তু দেখার মত যিনি দেখেন তিনিই 'দার্শনিক'। এই দেখার মত দেখায় ভারতীয় দার্শনিকগণ বিচারযুক্তি, প্রমাণ-বিশ্লেষণের স্থান অতি নিম্নেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—প্রথমেই দর্শন, তারপরে শ্রবণ, মনন ও অনুচিন্তন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"। "নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া"। সুতরাং যে কবির কবিত্বে 'দর্শন' নাই, তাহা ত নিতান্তই গদ্য, দৈনন্দিন বার্ত্তালাপের সহিত তাহার পার্থক্য কি? তাই ভারতের দর্শনকার ঋষি-দ্রষ্টা। ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি উপনিষৎ, তাহা 'দর্শনেরই' বাণী, প্রমাণের দুর্ব্বিষহ বোঝা নহে। এই 'দর্শন' যাঁহার যত গভীর, যত ব্যাপক, তাঁহার কবিত্বও ততই উদার মহান্, সত্যং শিবং সুন্দরম্। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের বিশেষত্বই তাঁহার 'দর্শনে'। এই 'দর্শনের' গভীরতা ও ব্যাপকতা এত অতলস্পর্শ ও বিপুল যে এই জন্যই তিনি অনেক সময় mystic কবি বলিয়া বিবেচিত হন। রূপের ভিতরে অরূপকে দেখা সাধারণ দৃষ্টির অসাধ্য। পক্ষান্তরে অরূপকে রূপদান করাও অসম্ভব, তা প্রতিভা যত তীক্ষ্ণই হউক না কেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। তাই যিনি রূপের মাঝারে অরূপের দর্শন লাভ করিয়া আপনার পরিপূর্ণ রসসম্ভোগের পরিতৃপ্তির আস্বাদন জগৎবাসীকে বিতরণ করিতে প্রয়াস করেন তাঁহার প্রকাশভঙ্গী রূপকের আকারেই আবির্ভূত হয়। অরূপকে রূপদান অসাধ্য বলিয়াই রূপকের, কল্পনার আশ্রয় অপরিহার্য্য। কবি স্বয়ং যেমনটী অনুভব করেন ঠিক তেমনটী ব্যক্ত করিতে পারেন না বলিয়া একটা অস্বস্তি, একটা অপরিতৃপ্তি বোধ করেন, আর তাহারই ফলে কবিত্ব নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সদাই আকুলি ব্যাকুলি করে—ভাষায়, বর্ণে, গানে, ইঙ্গিতে কত ভাবেই অরূপ রূপ গ্রহণে ব্যস্ত। এই সীমার মাঝে অসীমের চিরন্তন প্রকাশপ্রয়াসই কবিত্ব; সুতরাং সাধারণ-বুদ্ধিতে ইহা একটা হেঁয়ালি ছাড়া আর কি?

রবীন্দ্রদর্শনের মূল উৎস প্রধানভাবে তাঁহার পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যেই অনুসন্ধেয় এ সম্বন্ধে বোধহয় মতদ্বৈধ নাই। যে পরিবারে, যে সমাজে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাহার বৈশিষ্ট্যই হইয়াছে দার্শনিকতা। ঔপনিষদজ্ঞানের চিরন্তনী আলোকধারা এক অভিনব রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব অবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই আলোকসম্পাতে রবীন্দ্র-প্রতিভা উদ্ভাসিত হইয়া এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে। অনেকে বলেন, উপনিষদের জ্ঞান-গরিমা, বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তির সরসতা ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দীনতার সারল্য—এই তিনের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মত গড়িয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ এই সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের মতবাদকেও জুড়িয়া দেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়। অদ্য আমি রবীন্দ্র-দর্শনের মূল তাৎপর্য্য সম্বন্ধে দুটী একটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ঔপনিষদ দর্শনের দুইটী ধারা—একটী শঙ্করাচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, অপরটী মধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া সরস হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় ধারায় অভিষিক্ত। তিনি বলেন,

"The nature of Reality is the variedness of its unity. And the world is like a

game to us—it is the same and yet not the same to us all." কবির মতে নির্গুণ ব্রহ্মের কোন অর্থ নাই, উহা একটা কথার কথামাত্র। "The absolute eternal is timeless and that has no meaning at all—it is merely a word. The reality of the eternal is there, where it contains all times in itself." অসীম আপনাকে সসীমের মধ্যে প্রকাশ করেন বলিয়াই সার্থক। "সংসারের মধ্যেই ব্রহ্মের প্রকাশ"; আবার, "ব্রহ্মের মধ্যেই সংসারের পরিণাম"। প্রকাশরহিত ব্রহ্ম শূন্যমাত্র। "একোহং বহুস্যাম্"—এই বহুভবন, এই বহুরূপগ্রহণ, ইহা সেই একের চিরন্তন লীলা। এই লীলার কোনকালে বিরাম কল্পনা করা যায় না। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—এই সুর অনাদিকাল হইতে বাজিয়া আসিতেছে এবং শাশ্বতকাল বাজিতেই থাকিবে। একত্ব নানাত্বের রূপেই সার্থক, নানাত্বও আবার একত্বের মধ্যেই সফল। বস্তুতঃ একত্বের অস্তিত্বই নানাত্বের আকারে, আবার একত্বকে ছাড়িয়া নানাত্বের অস্তিত্বও অসম্ভব, একত্বই নানাত্বের 'বিধারণ', 'সেতু'। "The infinite and the finite are one as song and singing are one." শব্দ ও ধ্বনির সম্বন্ধ যেমন নিত্য, অবিচ্ছিন্ন, অসীম ও সসীমের, ব্রহ্ম ও সংসারের সম্বন্ধও তেমন নিত্য, অবিচ্ছিন্ন।

সংসারের যাবতীয় পদার্থই চঞ্চল, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বস্তুতঃ একটা অবিশ্রান্ত অনাদি অনন্ত গতি বা পরিবর্ত্তনপ্রবাহই সংসার। জগৎ শব্দের অর্থই যাহা সর্ব্বদা গতিশীল, পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু জগৎসম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নহে। এই অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একটা স্তব্ধ, শান্ত, নিবিড় ঐক্য আছে—যাহা অচল, অটল, ধ্রুব। "The world is movement. All through its changes it has a relationship which is eternal." স্থিতির আদর্শেই গতির পরিচয়, কেবল-গতির কোন অর্থই হয় না। গতির পরিমাপ ও সার্থকতাই স্থিতিতে। পক্ষান্তরে আবার গতির চাঞ্চল্যেই স্থিতির স্থিতিত্ব। নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি অর্থহীন শূন্যমাত্র। সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ে উভয় সাপেক্ষ। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জগৎ, কিম্বা জগৎকে ছাড়িয়া ব্রহ্ম একান্তই অর্থহীন, অসম্ভব। ইহাদের উভয়কে এক করিয়া দেখাই যথার্থ দেখা, পৃথক্ করিয়া দেখাই ভ্রান্তি। ইহাই রবীন্দ্রদর্শনের প্রতিপাদ্য :—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম, সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

এই "একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে ও এককে সম্পূর্ণভাবে" উপলব্ধি করাই সত্যের উপলব্ধি। এই তত্ত্বটাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় নানা বর্ণে, নানা ছন্দে, নানা রসে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ইহাই উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ", ইহাই গীতার "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি", ইহাই শ্রীমতী রাধিকার সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শন।

বহু এবং এক, সসীম এবং অসীম, অপূর্ণ ও পূর্ণ—এই পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয় একই কালে কিরূপে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন,—"অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে, কিন্তু তাহা গানের বিপরীত নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে। রসো বৈ সঃ। সেই রসস্বরূপই প্রতি নিমিষে অপূর্ণকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই ত তিনি রস"। সেই জন্যই জগতের প্রকাশ "আনন্দরূপমমৃতম্", আর সেই জন্যই এই জগৎ অপূর্ণ হইলেও শূন্য নহে, মিথ্যা নহে, পূর্ণেরই অভিব্যক্তি।

"শান্তং শিবমদ্বৈতম্"—ইহাই সত্যের স্বরূপ। অনন্ত বিশ্বে অনন্ত শক্তিপ্রবাহ দশদিক হইতে প্রধাবিত হইতেছে। এই অনন্ত শক্তিসংঘর্ষের অন্তরালে যদি অচল, ধ্রুব, শান্ত কোন মহাশক্তি, স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া, ইহাদের গতি নিয়মিত না করেন, তবে একমুহূর্ত্তে সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

"সমস্ত জীবনের, সমস্ত শক্তির অচলপ্রতিষ্ঠ আধার স্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি"। 'যে শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ইঞ্জিনের চাকার আবর্ত্তন, লৌহ-দণ্ডের আস্ফালন, বাষ্পের উচ্ছ্বাস—কি চঞ্চল, কি অস্থির, কি প্রলয়ঙ্কর এই দানবীয় ব্যাপার—সেই শক্তি যে শান্ত, স্থির অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাহা বুঝিতে পারেন। শান্তির মধ্যেই সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য্য। "সংসারের সব-কিছুকে পৃথক্ করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়"। বাহিরের অনন্ত বৈচিত্র্য অনন্ত বেশে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদিগকে আঘাত করিয়া করিয়া একটা শাশ্বত বিরোধের পীড়নে আমাদিগকে ছিন্নভিন্ন বিপর্য্যস্ত করিতে উদ্যত, তাই আমাদের বুদ্ধিও এই অনন্ত বৈচিত্র্যের তাণ্ডবের মাঝে ঐক্যের বিশ্রান্তি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। "বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। নানার মধ্যে একককে উপলব্ধি না করিলে মনের সুখ শান্তি মঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের অবসান নাই"। বহুর মধ্যে এই একের অনুভূতিতেই জ্ঞানের সার্থকতা। বহুর জ্ঞান মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, বহুর মধ্যে একের জ্ঞান মনকে লঘু করিয়া বিকসিত করে। সুতরাং শক্তিসংঘাতের কলহের মধ্যে শক্তির উপলব্ধিই প্রকৃত জ্ঞান। "সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে"।

সেইরূপ আমাদের কর্ম্ম যখন আপন ক্ষুদ্র গণ্ডির সীমা নির্দ্দেশেই ব্যাপৃত তখন কেবলই বিরোধ, পদে পদে বাধা, পলে পলে অসাফল্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যখন অপরের সীমানার সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া আত্ম-প্রসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সকল সংসারই অনুকূল হইয়া কর্ম্মকে সাফল্য-মণ্ডিত করে। তখনই শিবম্, মঙ্গলম্। পরমার্থ সত্যের "শান্ত-স্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাহার শিব-স্বরূপকে শুভকর্ম্মের দ্বারা" জীবনে মহাসত্যে পরিণত করিতে হইবে। "তার পরে অদ্বৈতম্। এই খানেই সমাপ্তি।" "যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়" তখনই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, নির্ব্বিকার আনন্দ, তাহাই অদ্বৈতম্। "তখন মানব জীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ—কোথাও সে আর অসঙ্গত, অসমাপ্ত, অর্থহীন নহে"। জ্ঞানে, কর্ম্মে ও প্রেমে শান্ত, শিব ও অদ্বৈতের উপলব্ধিই পরমার্থ সত্য।

পাশ্চাত্যেরা এবং এতদ্দেশীয় তাহাদের প্রিয় শিষ্যেরা ভারতীয় দর্শনে একটা অদ্ভুত পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নাকি Pessimism, দুঃখবাদ। সংসারে দুঃখ-কষ্টের প্রাচুর্য্যকে ভারতীয়েরা খুব তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছে সত্য এবং প্রকৃত দুঃখকে সুখ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার নির্ব্বুদ্ধিতাও ভারতীয়েরা কদাপি প্রকাশ করে নাই সত্য, এমন কি সুখকেও দুঃখেরই প্রকার ভেদ বলিয়া ঘোষণা করিতে তাহারা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই। ইহার তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য প্রদর্শন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়। তবে রবীন্দ্রদর্শনে এই তথাকথিত দুঃখবাদের কিরূপ আকৃতি তৎসম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সংসারে অনেক অনর্থ আছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অনর্থের সার্থকতার জন্য মঙ্গল-স্বরূপের পাশা-পাশি সয়তানের পরিকল্পনাও হইয়াছে। কতরকমেই এই অনর্থের ব্যাখ্যা হইয়াছে। আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে সংসার-দুঃখকে গ্রহণ করিয়াছেন।

উপনিষৎ বলেন, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসং-বিশন্তি"। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ?" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানৎ"—ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার"। "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। দিন রজনী অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে—"। "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে"। তিনি বলেন, "সত্য কেবল বিজ্ঞান নহে; তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম (সচ্চিদানন্দ), তাহা পূর্ণ বলিয়াই কেবল বুদ্ধিকে নহে হৃদয়কেও পূর্ণ করে, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, তাহাই প্রেম—আনন্দ—আনন্দরূপমমৃতম্"। ব্রহ্মের এই আনন্দরূপটী রবীন্দ্রনাথের রচনায় 'কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে' যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মনে হয়, এই আনন্দরূপের অনুভূতিতেই তাঁহার কবিত্ব এমন অপূর্ব্ব রসময় রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যদি আনন্দেই, জগৎ যদি আনন্দরূপমমৃতম্, তবে দুঃখের অস্তিত্ব কোথায়? কবি বলেন, "দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব এক। কারণ, অপূর্ণতাই দুঃখ ("যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি") এবং সৃষ্টিই অপূর্ণ"। অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের বিকাশ অসম্ভব, দুঃখের ভিতর দিয়া নহিলে আনন্দের অভিব্যক্তি অসম্ভব। পূর্ণতা ও অপূর্ণতা যেমন একই-বস্তুর এপিঠ এবং ওপিঠ, এককে ছাড়িয়া অপর যেমন অর্থহীন শব্দমাত্র, দুঃখ এবং আনন্দও সেইরূপ একই বস্তুর এপিঠ এবং ওপিঠ। জগতের অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই প্রকাশ, তেমনি এই—অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই উপাদান। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখেই নহে, তাহা আনন্দে। সুতরাং দুঃখও বস্তুতঃ আনন্দরূপমমৃতম্। "মানুষ সত্য পদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে, আমাদের মধ্যে তেমন পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ, সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ, মুক্তি, ঈশ্বর"। এই দুঃখ আছে বলিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব, ইহাই অপূর্ণতার গৌরব। যাহার সমস্ত প্রয়োজন অপরে মিটাইয়া দেয়, কষ্ট করিয়া যাহাকে কিছুই অর্জ্জন করিতে হয় না, তাহার মত হতভাগ্য দীন আর কে আছে? এরূপ একান্ত পরাধীনতা মৃত্যুরই নামান্তর। তাই কবি বলেন, "মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মত এত বড় অভাব আর কিছুই হইতে পারে না"। "দুঃখ ছাড়া আর কোন উপায়েই আমরা আপন শক্তিকে জানিতে পারি না, এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও ততই অগভীর হইয়া থাকে"। আমরা দুঃখকে জীবনের অভিসম্পাত বলিয়া মনে করি বলিয়াই তাহা দুঃখ, অসহনীয়। দুঃখকে যখন আনন্দের সাধনারূপে গ্রহণ করি, তখন দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্। "আনন্দাদ্ধ্যেব খাল্বিমানি—" উপনিষদের এই গভীর সত্য যিনি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন যিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুর মধ্যে এক, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিরহের মধ্যে প্রীতি ও মৃত্যুর মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাইয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহার নিকট দুঃখের অস্তিত্বই নাই।

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে"।

ঈদৃশ ঋষি বুঝিয়াছেন, আনন্দের জন্যই দুঃখ, মুক্তির জন্যই বন্ধন। দুঃখকে, বন্ধনকে, অপূর্ণতাকে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া আনন্দকে, মুক্তিকে, পূর্ণকে পাইবার আশা দুরাশামাত্র। বন্ধন ও মুক্তি উপায় ও উদ্দেশ্য। উপায় অবলম্বন না করিয়া উদ্দেশ্যকে লাভ করা অসম্ভব। উপায়কে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করার নামই বন্ধন, তাহাই বস্তুতঃ দুঃখ। কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই যখন উপায় অবলম্বিত, তখন সে উপায় যতই ক্লেশপ্রদ হউক, তাহা ঘৃণ্য নহে, বরং সাদরে বরণীয়। ফল কাম্য হইলেও বৃক্ষকে উপেক্ষা করা যায় না। বৃক্ষের যথাযোগ্য সৎকারেই সুফলের উদ্ভব। তাই গীতা বলেন, 'যিনি ভগবানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহার কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া বন্ধনমোচনের প্রকৃষ্ট উপায় হয়'।

যাহার হেয় ও উপাদেয় বুদ্ধি অপসৃত হয় নাই, তাহারই দ্বেষ ও রাগ বিদ্যমান, তাহার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতেই সংসারে দুঃখের আতিশয্য, প্রয়াসের অসহনীয় বাহুল্য। যাঁহার দৃষ্টিতে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ," "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি," তাঁহার হেয় বলিয়া কিছুই নাই। সংসারকে ছাড়িয়া ব্রহ্ম নয়, সংসারের মধ্যেই ব্রহ্ম। যথার্থ অনুভূতি, প্রকৃত মুক্তি আবৃতচক্ষু হইয়া সর্ব্বভূতান্তরাত্মার দর্শন নয়, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মানসলোকে তাঁহার স্বপ্নসঙ্গম নয়, কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মে, সর্ব্ববাকে, সর্ব্বচিন্তায় তাঁহারই নিবিড় সঙ্গ। "মানব সংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই ব্রহ্মানুভূতি মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক, কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা,—সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।"

প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কর্ম্মে তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত থাকার নাম ব্রহ্মবিহার, ইহাই ব্রহ্মসংস্থা, ব্রাহ্মীস্থিতি, ইহাই জীবন্মুক্তি। গীতা বলেন,—

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ", তিনিই যথার্থ যোগী। আবার, "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে, ন চ সন্ন্যসাদেব সিদ্ধিং সমাধিগচ্ছতি," অতএব "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্।" উপনিষৎ বলেন, কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" ইহারই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাই আমরা রবীন্দ্রনাথে—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

"দেখিব তোমারে গৃহমাঝারে, জননী স্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে মঙ্গল কাজে প্রতিদিন হেরিব জীবনে।"

যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু মহীয়ান্ তাহা দৃষ্টিমাত্রেই সুদূরের প্রয়াসী কবিকে ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করায়। আবার, যাহা কিছু কুৎসিৎ, যাহা কিছু রুদ্র. যাহা কিছু ক্ষুদ্র তাহাও এক মুহূর্ত্তে তাঁহাকে সেই ব্রহ্মসংস্পর্শ প্রদান করে।

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে;
যেখানে ব্যথা, তোমারে সেথা, নিবিড় করে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে, প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে!
যেমন করে দাওনা দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা যদি কেবল সুন্দরেরই উপাসিকা হইত, তবে তিনি কেবল একদেশী কবিমাত্রই থাকিতেন। অসুন্দরকেও এমন প্রীতির সহিত বরণ করিয়া লইয়াছে বলিয়াই রবীন্দ্র-প্রতিভা কেবল কবিপ্রতিভা নহে, উহা ঋষিপ্রতিভা, দার্শনিক অখণ্ড দৃষ্টি। "গ্রহণ ও বর্জ্জন, বন্ধন ও বৈরাগ্য, এই দুইটাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অন্যটীর বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে।" সংসার ও ব্রহ্ম এই উভয়ই উভয়কে লইয়া সত্য, সার্থক—এই মহান্ সত্য উপনিষদের চরম শিক্ষা, গীতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বৈষ্ণবের প্রেম, ইহাই রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা।

"ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি"—বাহিরে বিশ্ব, আমার অন্তরে বুদ্ধি—এই উভয়ই একই শক্তির বিকাশ। বাহিরের সহিত অন্তরের, অন্তরের সহিত অন্তরতম সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগানুভূতিই রবীন্দ্রের দর্শন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য



দুই বন্ধু

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম্‌-এ, বি-এল

১

স্থান—কলিকাতা, গোলদীঘির উত্তর ধার; কাল—কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা।

একটি ভদ্রলোক—গায়ে আলোয়ান, পায়ে গরম মোজা, গলায় গলাবন্ধ—একাকী একখানি বেঞ্চে বসিয়া আছেন।

ভদ্রলোকটির নাম হরকালী গাঙ্গুলী, বয়স ৭২ বৎসর, একহারা, খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ পুরুষ,—গ্রাম্য উপমায় 'পাকা আমটি'। বৌবাজারে তাঁহার পৈতৃক বাটী; তাহার এক অংশ ভাড়া দিয়া অপর অংশে নিজেরা বাস করেন। কোন একটা বড় সদাগরী অফিসে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল চাকরি করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। অফিসটি খুব ভাল। তাই তাঁহার জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা পেন্সন বরাদ্দ হইয়াছে, তাঁহার দুই পুত্রেরও সেখানে চাকরি হইয়াছে। নাতিদেরও যাহাতে ঐখানেই অন্নজলের ব্যবস্থা হয় এই শুভ-কামনায় তাহাদের প্রায়ই উপদেশ দিয়া থাকেন—"আর কিছু না হ'ক, হাতের লেখাটা—"

হরকালীবাবু খাঁটি কলিকাতার বাসিন্দা। জন্মাবধি তাঁহার কলিকাতায় বাস। কলিকাতার বাহিরে তাঁহাদের যে কোন আত্মীয়-কুটুম্ব নাই, এটা যেন তাঁহার একটা গর্ব্বের বিষয়। কলিকাতার ভিতরেও, বৌবাজার এবং লালদীঘি (অধুনা তাহার পরিবর্ত্তে গোলদীঘি) ইহা ছাড়া অন্য কোন অংশের সহিত তাঁহার তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। কলিকাতার বাহিরে জীবনে তাঁহার একবার মাত্র যাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, বড় নাতিটির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য—মধুপুর। সুতরাং "আমরা যখন পশ্চিমে ছিলাম" বলিয়া তিনি কোন বর্ণনার অবতারণা করিলে বুঝিতে হইবে—পশ্চিম অর্থে মধুপুর।

হরকালীবাবু বসিয়া বসিয়া আবাল-বৃদ্ধ বায়ুসেবী-কুলের বিচিত্র স্রোত-দর্শন করিতেছিলেন। তাহার মধ্যে একজনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। লোকটি তাঁহারই মত প্রাচীন, কিন্তু তাঁহার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, দীর্ঘ-শ্মশ্রুজালমণ্ডিত তেজঃ-ব্যঞ্জক মুখশ্রী এবং দৃঢ় পদক্ষেপ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। ইঁহাকে আরও কয়েকবার গোলদীঘিতে বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তেমন লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আজ মনে হইল যেন পূর্ব্বে ভদ্রলোকটির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন চিনিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ ভাবিয়াও কিছু স্মরণ হইল না। তখন আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া, হরকালীবাবু এই অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে চলিলেন।

ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে এক পাক ঘুরিয়া আসিয়াছেন। হরকালীবাবু একেবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"মশায়কে একটা কথা বল্‌বো? কিছু মনে করবেন না।"

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন।

"আপনার নামটি কি জান্‌তে পারি? আপনাকে যেন চিনি-চিনি কর্‌ছি, অথচ মনে কর্‌তে পারছি না কোথায় যেন দেখেছি।"

ভদ্রলোকটি তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"কই, আমারও ত কিছু মনে পড়্‌ছে না। আমরা কিন্তু কলকাতায় অল্পদিনই এসেছি,—বরাবর পশ্চিমেই থাকা হয়েছে। আচ্ছা, আপনি পশ্চিমে কোথাও গিয়েছেন কি?"

হরকালীবাবু দ্বিধাশূন্য চিত্তে উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, পশ্চিমে গিয়েছি বই কি,—মধুপুরে।"

"মধুপুর? মধুপুরে আমরা কখনও যাইনি। রাওলপিণ্ডি, বুলন্দশহর, মীরাট,—এই সব জায়গায় ছিলাম; তা'র মধ্যে রাওলপিণ্ডিতেই অনেকদিন কেটেছে।"

"রাওলপিণ্ডি? সে মধুপুর থেকে কতদূর?"

"আরে মশায়, কি বলেন তা'র ঠিক নেই। কোথায় আপনার মধুপুর আর কোথায় রাওলপিণ্ডি। মধুপুর এখান থেকে হদ্দ ত'শো মাইল—তাও সন্দেহ; আর রাওলপিণ্ডি গেল গিয়ে আপনার এক হাজার তিনশো উন-আশি মাইল!"

রাওলপিণ্ডির দূরত্বের পরিমাণ শুনিয়া, এবং মধুপুর হইতে সেটা যে কতগুণ বেশী, মোটামুটি তাহার মানসাঙ্ক কষিয়া হরকালীবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

ভদ্রলোকটি তাঁহার অবস্থা বুঝিলেন। কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"অত দূরে যেতে হ'বে কেন,—আপনার নিবাস কোথায় বলুন দেখি।"

"আমাদের মশায়, এই চার পুরুষ কল্‌কাতায় বাস,—বৌবাজার, বাঞ্ছারাম অক্রূরের লেন।"

"ছেলেবেলায় আমিও ত বৌবাজারে ছিলাম হলধর বর্দ্ধনের লেন।···আচ্ছা দাঁড়ান্, আপনি কোন স্কুলে পড়্‌তেন বলুত ত।"

"বৌবাজার ঈষ্টার্ণ একাডেমি।"

'হুঁ', কুলদা বাবু হেড্-মাষ্টার ছিলেন ত—আর হেড্ পণ্ডিত বগলাপ্রসন্ন?—তা' হ'লেই হয়েছে—আপনার নাম?"

"শ্রীহরকালী গাঙ্গুলী।"

ভদ্রলোকটি প্রবল আগ্রহে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আরে তাই কও! হরকালী—ডিক্রুজ মাষ্টার বল্‌তো হারাকেলী। আর গাঙ্গুলী প্রাণান্তেও বল্‌বে না। বলে বামুন হ'ল মুখার্জ্জি, ব্যানার্জ্জি, চ্যাটার্জ্জি,—গ্যাংগিউলি হ'তেই পারে না, যদি বামুন হও ত নিশ্চয়ই গাঙ্গার্জ্জি,—তোমরা ঠিক জান না। সেই হরকালী ত? আমি সদানন্দ—সদানন্দ পাল। চিন্‌তে পার্‌ছোনা? এক ক্লাসেই পড়েছি যে ম্যান!—ভুলে যাচ্ছো? দুজনে সেই একসঙ্গে টেষ্টে ফেল হয়ে······"

"আর বল্‌তে হ'বে না—মনে পড়েছে। টেষ্টে ফেল হয়ে তুমি ত সেই কোথায় উধাও হয়ে গেলে? তোমার কাকারা কত খোঁজাখুঁজি করলেন, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিলেন—কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।···তা'রপর, এই বুঝি ফেরা হল? তা কি হচ্ছিল এতকাল?"

"ওঃ সে অনেক কথা! তা এখানে দাঁড়িয়ে এ ভীড়ের ধাক্কা খেয়ে কি হ'বে,—চল এক জায়গায় বসা যা'ক।"

২

সদানন্দ বলিলেন—"তা'রপর উঃ কতদিন পরে দেখা বল দেখি?—চল্লিশ বছর বে-ওজর হ'বে।"

"চল্লিশ কিহে! বেশী হ'বে। এই ধর না—টেষ্টে ফেল হওয়া গেল, সেটা কোন বছর?—আঠারো শ'······"

"যা'ক—গে', অত সূক্ষ্ম হিসাবের দরকার নেই। এখন এতদিন তোমার কি রকম কাট্‌লো বল।"

"কাটলো অম্‌নি এক রকম। টেষ্টে ফেল হ'তেই বাবা তাঁর অফিসে চাকরি করে দিলেন, মা বিয়ে দিয়ে দিলেন। মা ষষ্ঠীর কৃপায় বছর বছর জমা বাড়্‌তে লাগলো, কিন্তু আর এক 'মায়ের অনুগ্রহ' হয়ে একসঙ্গে অনেকগুলি খরচ হয়ে গেল। উপস্থিত দুই ছেলে দুই মেয়ে, তাদের বিয়ে থা হ'য়ে গিয়েছে, ছেলেপুলেও হ'য়েছে। আমিও রিটায়ার হয়েছি,—এখন বাকী ক'টা দিন···। সে যা'ক্ এখন তোমার নিজের কথা বল শুনি।"

"আমি ত সেই এখান থেকে 'প-য়ে আ-কার' দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে একটা গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। টিকিটও করিনি, কোথায় যা'ব তা'রও ঠিক নেই—গাড়ী যতদূর যায়। গাড়ীও জুটেছিল আমারই মতন—একেবারে টুণ্ডলা জংশন! সেখান থেকে শিকোহাবাদ, ফরক্কাবাদ, সাজাহানপুর, বেরিলী—এই রকম কত জায়গায় ঘোরা গেল, কত রকম কাজ করা গেল। কখন কুলি-সর্দ্দার, কখনও কেরাণী, দোভাষী, কন্‌ট্রাক্টর,—এমন কি সেপাই হয়ে লড়াই পর্য্যন্ত করেছি। শেষে রাওলপিণ্ডিতে গিয়ে স্থিতি হ'ল। অত দূর দেশেও প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থেকে নিস্তার নেই। কোথা থেকে এক বাঙ্গালী স্বজাতির মেয়ে

জুটে গেল—বিয়ে হ'ল। কিন্তু সে বেশীদিন সইল না,—একটি ছেলে রেখে তিনি মারা গেলেন। তা'র পর আর বিয়ে করিনি, দরকারও হয়নি।"

সদানন্দ একটু বক্র হাসি হাসিলেন। কিন্তু হরকালী তাহা লক্ষ্য করিলেন না; তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৃহিনীর ঐকান্তিক সেবা এবং যত্ন তাঁহার বাঁচিয়া থাকার পক্ষে যে কতদূর অপরিহার্য্য তাহা স্মরণ করিয়া বন্ধুবরের এমন দীর্ঘ বিপত্নীক জীবনের প্রতি গভীর সমবেদনায় হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল।

সদানন্দ বলিয়া চলিলেন—"রাওপিণ্ডিতে কনট্রাক্টরি করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা গিয়েছিল। ছেলেকে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়ে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে একটা চাকরি যোগাড় করে দিই। তারও এই বছর খানেক হ'ল পেন্সন হয়েছে। কিন্তু সেখানে আর গতিক সুবিধা নয়। বাঙ্গালীর যে খাতির ছিল তা' ত নেই-ই বরং সকলে ভয় করে, সন্দেহ করে। তাই ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফেরা গেল। এই হ'ল আমার কথা,—সব গুছিয়ে বল্‌তে গেলে একখানা ইংরেজি নবেলের মতন হয়।"

৩

দুই বন্ধুতে প্রায় প্রত্যহই গোলদীঘিতে দেখা হয়। সদানন্দ আসিয়াই দীঘি প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করেন। হরকালী একটু ক্ষীণজীবী মানুষ, বেশী হাঁটিতে কষ্ট হয়, বুক ধড়ফড় করে। সুতরাং সদানন্দের পাল্লায় পড়িয়া কায়ক্লেশে এক চক্কর দিয়াই ক্লান্ত হইয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া সদানন্দের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন।

তারপর গল্প আরম্ভ হয়। উভয়ে আপন আপন জীবনের স্মৃতি বিবৃত করেন, ছাত্র-জীবনের ছোটখাটো কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। প্রথম দিন কতক এইরূপ তুলনামূলক বর্ণনা এবং আলোচনা চলিল, তাহার পর একটু একটু করিয়া সমালোচনাও আরম্ভ হইল।

সদানন্দ তাঁহার মতামত নির্ভয়ে, জোর গলায় ব্যক্ত করেন। সে কথায় প্রতিবাদ করিলে অমনি 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া তুমুল তর্কের জন্য প্রস্তুত। একে তর্কপ্রিয় বঙ্গ-সন্তান, তায় সেপাই হইয়া সত্য সত্যই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তর্ক-যুদ্ধে তাঁহাকে কে আঁটিতে পারে?

হরকালী কিন্তু সাহেবদের অধীনে চাকরি করিয়া তাহাদের কথায় সায় দিতেই শিখিয়াছেন। বাড়ীতেও গৃহিণীর নির্দ্দেশ মত চলিতে হয়। সেজন্য ঘরে বাইরে কোথাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। তাই তর্ক করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ,—যে যাহা বলে তাহা বিনা প্রতিবাদে ঠিক বলিয়া মানিয়া লওয়াই বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং দুই বন্ধুতে গল্প করিতে করিতে যখন কোন মতভেদের সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে, তখন হরকালী যেন নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে একটু ক্ষীণ প্রতিবাদের সুর তুলিয়া পরক্ষণেই হার স্বীকার করিয়া সদানন্দের কথা মানিয়া ল'ন। আর তাহাতে সদানন্দ ভারি খুশী।

কথা হইতেছিল লড়ায়ে গোরাদের সম্বন্ধে। সদানন্দের মুখে তাহাদের গল্প শুনিতে শুনিতে হরকালী এক সময়ে বলিয়া ফেলিলেন—"কিন্তু ওরা ত সব মুখ্যু, অসভ্য, ছোটলোক ক্লাস!"

সদানন্দ রুখিয়া উঠিলেন—"নিজের দেশে ওরা ধোপা, কি মুচি, কি মুদ্দাফেরাস—সে খোঁজে তোমার আমার দরকার কি? এখানে তা'দের কি রকম খাতির-যত্ন সেটা দেখ। যেখানেই গোরা ফৌজ থাকে, দেখ্‌বে তা'দের ছাউনী শহর থেকে তফাতে বেশ ফাঁকা, খোলা জায়গায়,—রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কোন রকম রোগ সেখানে ঘেঁষ্‌তে পায় না; খাবার জিনিষ সকলের সেরা—দর যতই হ'ক না কেন তা'তে আসে-যায় না। আর খাতির?—এ দেশের রাজা-রাজড়াদের চাইতে একটা গোরার খাতির বেশী—বাইরে যাই হ'ক। এই রাওলপিণ্ডিতেই—চন্দনপুরের রাজা মহীপাল সিং—মস্ত বড় রইস্—একদিন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, একটা গোরার গায়ে ধুলো উড়ে পড়ে। সে রাজাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আচ্ছা করে প্রহার দিয়ে ছেড়ে দিলে। মকর্দ্দমা আদালতে উঠ্‌লো। হাকিম সব কথা শুনে, হেসে বল্‌লেন—'ও কিছু নয়, লোক চিন্‌তে পারেনি। তা' না হ'লে অত বড় লোককে অপমান

করতে পারে? ঐ মকদ্দমা ফর্ নাথিং চালিয়ে কি হবে, আপোষে মিটে যা'ক—ভরগিভ এণ্ড ফরগেট।' গোরাটা অমনি শেক্-হ্যাণ্ড্ করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে। রাজা বাহাদুর আর কি করেন—তিনিও হাতটা এগিয়ে দিলেন। তিনি ভাব্লেন—গোরাটাকে ক্ষমা কর্‌লাম; গোরা ভাব্লে লোকটাকে এবার ছেড়ে দিলাম। মিটে গেল। এখন বোঝ!"

হরকালী তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিলেন।—"হাঁ, তা ওদের একটা খাতির আলাদা বই কি। রাজার হ'ক, রাজার জাত, আর এত বড় রাজ্যটা ত ওরাই রেখেছে।"

তর্ক উঠিয়াই মিটিয়া গেল।

কিন্তু হরকালীর মনে ক্রমে একটু বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সদানন্দের এতটা আত্মম্ভরিতা তাঁহার আর ভাল লাগিতেছিল না। প্রথমটা পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে সদানন্দের সকল কথায় সায় দিয়া যাইতেন—পরে একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয় এবং সঙ্কোচের জন্য। কিন্তু এখন সে ভাব যেন একটু একটু করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। আর চাকরি করিতে হয় না, মনিবের ভয় মোটেই নাই। গৃহে গৃহিণীর শাসন-প্রণালী এতদিনের অভ্যাসে—ইংরাজের শাসন-যন্ত্রের মতই—স্বাভাবিক এবং নির্দ্দোষ বলিয়া ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। সুতরাং জীবনে তাঁহার আর ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, কিছুই নাই। এখন এই শেষ বয়সে তাঁহাকে কি সদানন্দের মত গোঁয়ার গোবিন্দকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে। কেন? কিসের জন্য? বিদ্যার দৌড় তাহারও ত সেই টেষ্টে ফেল হওয়া পর্য্যন্ত। বুদ্ধির বহরও যে বেশী তাহারও ত কোন প্রমাণ নাই। একটা বড় চাকরি করিলেও না হয় বোঝা যাইত। তবে তাহাকে এমন ভয় করিয়া চলিতে হইবে কেন?

এমনই পাঁচ রকম ভাবিয়া হরকালী একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া লইলেন।

৪

একদিন প্রসঙ্গক্রমে পশ্চিমের আব-হাওয়ার কথা উঠিল। সদানন্দ বলিলেন, গ্রীষ্মকালে সেখানে এত গরম যে পাহাড় ফাটিয়া যায়, আর শীতকালে তেমনই প্রচণ্ড শীত, হাত-পা অসাড় হইয়া আসে।

হরকালী বলিলেন—"সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তা'র চাইতে এখানে কেমন,—শীতও বেশী নয়, গরমও বেশী নয়।"

"তা' হ'লেও, গরমের সময় কষ্টটা কি বড় কম হয়? ঘামের চোটে অস্থির,—যেন রসগোল্লার রস অনবরতই চোয়াচ্ছে। আর তা'রপর ঘামাচি!—আমাদের পশ্চিমে ওসব উৎপাত নেই।"

"ঘাম হয়, তা'র উপর হাওয়া লাগলেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সেখানে পাহাড় ফাটা রোদের ঝাঁঝে বড় আরাম হয়, নয়?"

"আরাম না হ'ক শরীর কি রকম ভাল থাকে, হজম হয় কেমন! রোজ রাত্রে দিস্তেখানেক রুটি আর এক বাটি মাংস,—বারো মাস, ত্রিশ দিন, কে জানে শীত, কে জানে গ্রীষ্ম। কিন্তু কখনও হজমের ত্রুটি হয়নি। এখানে এসে সে অভ্যাসটা কমাতে হয়েছে, এখন হপ্তায় দু'দিন মাংস খাই। এক ত এখানকার মাংস ভাল নয়, তায় দর বেশী; তাছাড়া এখানকার রেওয়াজ তেমন নয়, আর হজমও বোধ হয় তেমন হয় না।

হরকালী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন—"সে কি! তুমি এখনও অত মাংস খাও? আমি ওসব অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি—দাঁত পড়্তে আরম্ভ থেকে। এখন রাত্রে গোনা চারখানা রুটি খাই—দুধে ভিজিয়ে। তা'র বেশী হজম হয় না।"

"দেখলে ত, ঐ হ'ল জল-হাওয়ার গুণ! আর আমি দেখ, তোমার চেয়ে দু'বছরের বড় ত—"

"হাঁ; মেলা গিল্‌তে পারলেই বড় ভাল!"

"আরে, জীবনের একটা প্রধান সুখই হচ্ছে খাওয়া। তাই যদি গেল, ত সাবু বার্লি খেয়ে শুধু বুকের ভিতর প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করলেই বুঝি বাঁচা সার্থক হ'ল!"

হরকালীর রাগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছিল, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"তা' নয় ত কি? মানব-জীবন কত পুণ্যের জোরে তবে হয়!"

সদানন্দ একটু তীব্র হাস্য করিয়া বলিলেন—"হরকালী তোমার দেখ্‌ছি সত্যিই বাহাত্তুরে ধরেছে,—কি বক্‌ছো তা'র ঠিক নেই !"

"হ্যাঁ ; আর তোমার যে আরো দু বছর—চুয়াত্তর !"

"তা'র মানে বাহাত্তুরে দশা কাটিয়ে উঠেছি।"

হরকালী আর কোন উত্তর করিলেন না। সদানন্দের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া পকেট হইতে এক ফর্দ্দ পুরাতন খবরের কাগজ বাহির করিয়া,—চশমা না পরিয়াই—একমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সদানন্দও ঘুরিয়া বসিলেন এবং সুর করিয়া 'শটকে' পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—সাতের পিঠে দুই বাহাত্তর, সাতের পিঠে দুই……"তাহার পর উঠিয়া দীঘি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

পরদিন সকাল হইতে দু'জনেই ভাবিতে লাগিলেন,—আজ আর গোলদীঘি যাইয়া কাজ নাই, ঝগড়া খেচাখেচি করিয়া না-হক্ মন খারাপ বই ত নয় !

কিন্তু বেড়াইতে যাইবার সময় যখন আসিল তখন দুজনে—কি জানি কেমন করিয়া সেই গোলদীঘিতেই আসিয়া পড়িলেন। উভয়েই মনে ভাবিয়াছিলেন—সে বোধ হয় আজ আর আসিবে না। কিন্তু হরকালী আসিয়া দেখিলেন সদানন্দ আসিয়া বসিয়া আছেন। তিনি পাশ কাটাইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সদানন্দ হাঁক দিলেন—"হরকালী এই যে, এখানে।"

দুই বন্ধুতে আবার মিলিত হইলেন।

৫

আর এক দিনের কথা।

হরকালী বলিলেন—"আজ একটু সকাল ক'রে ফিরতে হ'বে, শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না। আফিমের মাত্রাটা আজ একটু চড়া'তে হ'বে দেখ্‌ছি।"

"হরকালী, তুমি আফিম খাও !"

"হুঁঃ, বলে আফিম খেয়েই এতদিন বেঁচে আছি……"

"বল কি ! লোকে আফিম খেয়ে মরে তাই ত শুনেছি। তুমি আবার……"

"না হে, জানো না,—আফিমের ভারি গুণ। শরীরে কোনও রোগ সহজে ঢুক্‌তে দেয় না। বিশেষ করে এ বয়সে । তুমিও একটু করে আফিম ধর—বুঝেছ সদানন্দ—উপকার হ'বে।"

"হ্যাঃ ! আমি অমন বিষ খেয়ে শরীরটাকে জরিয়ে রাখ্‌তে চাই না। একটু আধটু অসুখ-বিসুখ আমারও যে করে না তা' নয়, তবে সে এক রকম ভালো,—শরীরের বিষ কেটে যায়। আর আমারও একটা ও-রকম ওষুধ আছে,—একেবারে ওষুধের রাজা !" তাহার পরের কথাগুলা মুখে আর না বলিয়া, হাত দু'টি নাড়িয়া একটি হাত মুখে তুলিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

হরকালী শিহরিয়া উঠিয়া একটু সরিয়া বসিলেন। বলিলেন—"তুমি মদ খাও না কি, সদানন্দ ? এঃ, বড় লজ্জার কথা, ছিছি ! আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইব না, যাও !"

"আমিও তোমার সঙ্গে কথা কইব না, যাও ! হরকালী না হাড়কালি,—আফিম খেয়ে খেয়ে হাড় ক'খানা কালি হয়ে গিয়েছে, শুধু বাইরে দেখ্‌তে টুকটুকে,—মাকাল ফলের মতন।"

"সদানন্দ না মদানন্দ ! এবার থেকে আমি মদানন্দ বলে ডাক্‌বো। মদখোর পাঁড় মাতাল কোথাকার।"

সদানন্দ কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিলেন—"হাঁ আমি মাতাল। মাতালরা গুলিখোর আফিমখোর দেখ্‌লেই কামড়ায়, জান ত? আমি তোমায় কাম্‌ড়াবো !"

হরকালী লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"পাহারা-ওয়ালা, এ পাহারা-ওয়ালা ! এ লোকটা পাগ্‌লা হোয় গিয়া, হামকো কাম্‌ড়ানে মাংতা,—জল্‌দি আও, জল্‌দি আও, !"

বিকট মুখ-ব্যাদন করিয়া সদানন্দ তাড়া দিয়া আসিলেন। হরকালী প্রাণপণ ছুটিয়া পলাইলেন,—একবার ফিরিয়া চাহিতেও সাহস হইল না।

এই রকম করিয়া দুই বন্ধুতে কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িতেও পারেন না, অথচ দেখা হইলেই একটা খুঁটিনাটি লইয়া ছেলেমানুষের মত কলহ করিতেও ছাড়েন না। এখন যেন তাঁহারা পরস্পরের দোষ ধরিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আসল কথা, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবকাশ পাইয়া আজ উভয়েরই সকল আশা এবং আকাঙ্খার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, এখন এই ঘনায়িত জীবন-সায়াহ্নে তাঁহারা একটিমাত্র কামনাকে প্রচণ্ড আগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন,—এই সূর্য্যোকরোজ্জল হাস্যময়ী ধরণীর স্নেহময় ক্রোড়ে আরও কয়েকটা দিন কাটাইয়া যাওয়া। তাই ধরিত্রীর এই প্রাচীন শিশু দুটির মধ্যে মায়ের কোল লইয়া মহা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে,—কেহ যেন অপরকে দখল ছাড়িয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাই উভয়ের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একটা প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছে, এবং তাহারই ফলে এমন একটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে যাহা হয়ত তাঁহারা নিজেরাও বুঝিতে পারেন না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দু'জনে এতদিন যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন এইবার যেন তাহাতে উভয়েরই আস্থা ক্রমে কমিতে লাগিল। 'হয় ত আমরই ভুল, অমুক যাহা করিতেছে হয়ত তাহাই ঠিক' এইরূপ একটা সংশয় আসিয়া দেখা দিল।

সদানন্দ ভাবিলেন—"তাই ত, আফিমের কথাটা অনেকেই বল্‌ছে, আর বাস্তবিক হরকালী ত একরকম আফিমের জোরেই টিকে' আছে, নইলে শরীর যা!......আফিমটা ধরে দেখা যাবে নাকি?"

চার আনার আফিম কিনিয়া পরদিন হইতে সদানন্দ একটু করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল– একটা নিশ্চেষ্ট অবসাদের ভাব আসিয়া পড়িল, কিছু ভাল লাগে না, মেজাজ খিট্‌খিটে। "দূর কর ছাই!"—বলিয়া নূতন কৌটা সমেত আফিমটুকু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সদানন্দ আলমারি হইতে বোতল-গেলাস বাহির করিয়া বসিলেন।

হরকালী ভাবিলেন—"মদটা একটু আধটু ওষুধের মতন খেলে উপকার হয় বটে,—কিন্তু না, এ বয়সে আর ও ধরে কাজ নেই—নিজের কাছেই লজ্জা বোধ করে। তবে হাঁ, খাওয়া-দাওয়ার কথা সদানন্দ যা' বলে বড় মিছে নয়; সত্যিই ত......"

গৃহিণীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি একদিন রাত্রে একটু মাংস খাইলেন—বেশ টিপিয়া চট্‌কাইয়া; অসময়ের ইলিস-দুখানা ভাজা মাছ চাহিয়া খাইলেন,—বড় তৃপ্তি হইল। কিন্তু পরদিন হইতে এমন অসুখ করিল যে তিনদিন গোলদীঘি যাওয়া বন্ধ,—সদানন্দ আসিয়া খবর লইয়া গেলেন।

কিন্তু এ-সব কথা কেহ কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না, গোপন রহিয়া গেল।

৬

একদিন সদানন্দ আসিয়া দেখিলেন হরকালী একটা ছাতা লইয়া আসিয়াছেন। বলিলেন—"কি হে, আজ আবার ছাতা ঘাড়ে কেন?

"দেখ্‌ছো না, যে রকম করে রয়েছে,—আজ জল-ঝড় হ'তে পারে।"

"তুমিও যেমন! কোন কালে জল হ'বে কি না হ'বে, সেই ভেবে একটা তাঁবু বয়ে বেড়া'তে হ'বে! গুলিখোর আফিমখোরের ধারাই এই;—জলকে ভারি ভয়।"

"বড় ঠাট্টা করছো সদানন্দ, কিন্তু বৃষ্টি যদি আসে, টের পাবে। তখন ছাতা দেবো না কিন্তু। অগ্রাণ-পৌষ মাসের জল সাংঘাতিক,—ভিজেছ কি মরেছ।"

"হাঃ, তোমার মতন অমন বাতাসার শরীর নয় আমার।"

"রেখে দাও তোমার বাহাদুরী! অমন আশু মুখুজ্যে যে আশু মুখুজ্যে, অতবড় একটা বিরাট-পুরুষ,—কে ভেবেছিল......"

"আচ্ছা, এই বাজি রাখ্‌ছি হরকালী,– তুমি যদি আগে না মরো ত কি বলেছি! তুমি মর্‌বে, তোমার শ্রাদ্ধের ভোজ খেয়ে, তবে আমি মর্‌বো,—এই বলে রাখ্‌লাম, দেখে নিও।"

"কক্‌খনো না! নিজের বয়সটার হিসেব রাখ? আর তোমার মতন লোক অম্‌নি পট্ করেই মরে। তখন দেখা যা'বে, কে কা'র শ্রাদ্ধের ভোজ খায়।"

"এই কথা ত? আচ্ছা বেশ, দেখা যাবে।"

দু'জনে বার-কতক "আচ্ছা, দেখা যা'বে" বলিয়া গুম্ হইয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। সদানন্দ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হরকালী—ছাতা খুলিয়া বলিলেন —"কিহে, এমন যে, পালাচ্ছ বড় !"

"পালা'ব না ত কি কচুপাতা মাথায় দিয়ে বসে থাক্‌বো ?" বলিয়াই সদানন্দ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হরকালী তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে হাঁকিলেন,—"সদানন্দ, দাঁড়াও দাঁড়াও,—আমিও যাচ্ছি। এক ছাতাতে দু'জনকারই হ'বে 'খন।"

"দুত্তোর ছাতা !"

সদানন্দ দ্রুত দৌড়াইয়া গিয়া রাস্তার মোড়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন।

হরকালী সেনেট হলের বারাণ্ডায় গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু তাহার ছাদ প্রায় আকাশেরই সমান উঁচু—জল বড় বেশী আট্‌কায় না। ছাতা খুলিবার যো নাই, খুলিয়াও কোন লাভ নাই। কাজেই নিরুপায়,—দাঁড়াইয়া ভিজিতে হইল। তাহার উপর জোর হাওয়া—বেচারীকে কাঁপাইয়া দিল।

তারপর দুজনেরই নিউমোনিয়া।

বেশীদিন কাহাকেও ভুগিতে হইল না, তিনদিনের আড়াআড়িতে দুই বন্ধুরই ইহলীলা সাঙ্গ হইল।

কেহ কাহারও শ্রাদ্ধের ভোজে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না !

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

বাহু

শ্রীযুক্ত ভবেশ দাশ গুপ্ত

ভালোবাসি তোমার ও দুটী বাহুলতা
শুভ্র নগ্ন সুমসৃণ সুগোল নিটোল—
অরূপ সৌরভময় মদির বিভোল
অন্তরে জাগায় মোর কোন আকুলতা !
ঘেরিয়া আমার কণ্ঠ নিবিড় বেষ্টনে,
ও মৃণাল বাহু দুটি স্বর্গ-সুখ-সুধা
ঢালি দিবে স্পর্শে স্পর্শে শিহরে শিহরে,
পূর্ণ করি যত মোর তৃপ্তিহীন ক্ষুধা !
তব বক্ষোবদ্ধ হ'য়ে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঃশেষে করিব পান নয়নে অধরে
শ্রবণে আঘ্রাণে স্পর্শে—সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া
যে রক্তিম আভাটুকু উঠিবে ফুটিয়া
শ্রান্ত তব বরাঙ্গের প্রতি রোমকূপে—
উষার আভাষ সম অপরূপ রূপে !

আওরংজীব, বাল্যে ও যৌবনে

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বসু এম-এ

১

মুহিউদ্দীন মুহম্মদ আওরংজীব সাহজাহান ও মুমতাজ মহলের ষষ্ঠ সন্তান। পরে ইনিই "আলমগীর ১ম" নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সাহজাহান ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত, আহমদনগরের স্বাধীনতাপ্রয়াসী বীর মালিক অম্বরকে পরাজয় করিয়া ধীরে ধীরে গুর্জ্জর হইতে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় উজ্জয়িনীর পথে অবস্থিত দোহাদ গ্রামে আওরংজীবের জন্ম হয়। (১৬১৮, অক্টোবর)

১৬২২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া পিতার রাজ্যাবসান পর্য্যন্ত সাহজাহান বৃদ্ধ সম্রাটের বিরাগভাজন হ'ন ও আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহ করেন। সাহজাদার সে চেষ্টা কিন্তু ফলবতী হয় নাই : তাঁহাকে শেষে পিতার বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজের দুই পুত্র, দারা ও আওরংজীবকে সম্রাটের নিকট জামিন রাখিতে হয়। এইরূপে দুই ভাই, দারা ও আওরংজীব, লাহোরে অবস্থিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে পৌছিলেন (১৬২৬)। ইহার কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সাহজাহান সিংহাসন আরোহণ করিলেন ও বালক দুইটিকে আসফ খাঁর আশ্রয়ে আগ্রায় লইয়া যাওয়া হইল।

বালক আওরংজীব এতদিন কোথায় থাকিবেন, কি করিবেন কিছুরই স্থিরতা ছিল না। যখন তাঁহার বয়স ১০ বৎসর তখন ইহার একটা নিষ্পত্তি হইল। নিয়মিতভাবে তাঁহার শিক্ষার তখন একটা ব্যবস্থা করা হইল। গিলান দেশবাসী মীর মুহম্মদ হাশিম তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন; কেহ কেহ আবার মুল্লা শালিহকে সাহজাদার পুরাতন শিক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ফারসী ভাষায় লেখা ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

স্বভাবতঃই আওরংজীবের মেধা খুব তীক্ষ্ণ ছিল; নিজের পাঠ তিনি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের লেখা চিঠিপত্র পড়িয়া মনে হয়, কোরাণ বা মহম্মদের বাণী প্রভৃতিতে তাঁহার কম দখল ছিল না; সকল সময়েই এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে যথোপযোগী অংশ তিনি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। পণ্ডিতের মত তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারিতেন। আর, হিন্দুস্থানী (হিন্দি ও উর্দ্দু মিশ্রিত ভাষা) তাঁহার মাতৃভাষা ছিল, কারণ এই ভাষাই মুঘল রাজবংশের পারিবারিক জীবনে প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া, হিন্দিও যে তিনি কিছু না জানিতেন এমন নয় : হিন্দিতে কথাবার্ত্তা বলিতে তাঁহার কোন কষ্ট হইত না। হিন্দি প্রবাদ বাক্যও তিনি বেশ ব্যবহার করিতে পারিতেন।

আওরংজীবের হাতের লেখা পরিষ্কার ও গোটা-গোটা ছিল; এ সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কোন কারন নাই, কারণ ইহার প্রমাণ যে নাই এমন নয়। বাদশাহ নিজের হাতে অনেক চিঠিপত্র লিখিতেন ও প্রত্যেক আবেদন পত্রের উপর নিজে হুকুম দিতেন। এই সব চিঠিপত্র ও দরখাস্ত এখনও পাওয়া যায়। নিজের হাতে কোরাণ শরিফ লেখা তাঁহার একটা অভ্যাসের মধ্যে ছিল। ভাল করিয়া বাঁধাইয়া ও চিত্র সংযোগ করাইয়া নিজের হাতে লেখা দুই খণ্ড কোরাণ তিনি একবার মক্কায় ও মেদিনায় উপহার পাঠান।

নীতিগর্ভ বা শিক্ষাপ্রদ কবিতা ব্যতিরেকে অন্য কোন কবিতা আওরংজীব পছন্দ করিতেন না, আর সুখ্যাতিমূলক

* শ্রদ্ধেয় স্যার যদুনাথ সরকারের অনুমতিক্রমে তাঁহার মূল ইংরাজী গ্রন্থের অবলম্বনে লিখিত।

কবিতার ত' কথাই নাই। তবে, ভাল ভাল উপদেশপূর্ণ কাব্যে তাঁহার অরুচি দেখা যায় না। ধর্ম্মসংক্রান্ত বইগুলিই তাঁহার নিত্য সহচর ছিল।

বাল্যকাল হইতেই চিত্রাঙ্কণের প্রীতি বা গীত-বাদ্যের প্রতি অনুরাগ আওরংজীবের ছিল না। তাঁহার রাজত্বকালে দরবারে গান বাজনা তিনি বন্ধ করিয়া দেন। সুন্দর সুন্দর চিনামাটীর বাসন বাদশাহ ভালবাসিতেন। কিন্তু সাহজাহানের মত তাঁহার আদৌ অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-স্পৃহা ছিল না। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে তৈয়ারী কোন বিশাল বা মনোরম মস্‌জিদ, কোন-প্রকাণ্ড সভা-গৃহ বা কবর দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিষই তিনি তৈয়ারী করাইতেন। যুদ্ধ জয়ের যায়গায় মস্‌জিদ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাইবার জন্য রাজপথের উপর অসংখ্য পান্থনিবাস—বিশেষ করিয়া তাঁহারই কীর্ত্তি।

২

বাল্যকালের এক ঘটনায় তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সম্রাট সাহজাহান সে সময়ে আগ্রায়; ১৬৩৩ সালের মে মাস। সম্রাটের হুকুম হইল, সুধাকর ও সুরতসুন্দর নামে দুইটী প্রকাণ্ড হস্তী দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আগ্রায় ছাড়িয়া দেওয়া হউক। প্রথমে, হস্তী দুইটি খানিকটা ছুটাছুটি করিল। পরে, আগ্রা দুর্গের দেওয়ালে যে বারান্দাটি ছিল, অর্থাৎ যে স্থান হইতে সম্রাট প্রতিদিন সকাল বেলায় প্রজাদের দর্শন দিতেন, ঠিক তাহার নীচে তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। বাদশাহ যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কয়েক পদ আগে ঘোড়ার পিঠে চলিলেন তিন সাহজাদা, দারা, সুজা ও আওরংজীব। ভাল করিয়া যুদ্ধ দেখিবার জন্য আওরংজীব একেবারে হস্তী দুইটির কাছে পৌছিলেন।

কিছু পরে, হস্তী দুইটী পরস্পরকে ছাড়িয়া একটু হটিয়া দাঁড়াইল। সুধাকর যেন হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিল। প্রতিযোগীকে কাছে না পাইয়া সে যেমন ফিরিল, অমনি দেখিল সম্মুখে সাহজাদা আওরংজীব! আর যায় কোথা, তখনি সে সাহজাদাকে আক্রমণ করিল। আওরংজীব চৌদ্দ বছরের বালক হইলে কি হয়, যে সাহস ও ধীরতা তিনি দেখাইলেন তাহা অদ্ভুত। নিজের স্থান হইতে এক পা না নড়িয়া বা নিজের ঘোড়াটিকে পিছু হটিতে না দিয়া হস্তীটির মাথা লক্ষ্য করিয়া তিনি বর্ষা ছুঁড়িলেন। চারিদিকে তখন গোলমাল আরম্ভ হইল; দর্শকেরা ভীত হইয়া পড়িল। কি ওমরাহ, কি সরকারী কর্ম্মচারী সকলেই চীৎকার করিয়া এধার ওধার ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। হস্তীটিকে ভয় দেখাইবার জন্য আতসবাজী, হাউই প্রভৃতি ছোঁড়া হইল। কিন্তু কিছুই ফল হইল না। হস্তীটির শুঁড়ের আঘাতে সাহজাদার ঘোড়া ধরাশায়ী হইল। কি সর্ব্বনাশ! আওরংজীব কিন্তু এক লম্ফে ভূমি হইতে উঠিয়া পড়িয়া, একটি তরোয়াল হাতে লইয়া ক্রুদ্ধ জানোয়ারটির সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ঠিক এমন সময়ে, সুজা চারিদিকের জনতা ও ধুঁয়ার ভিতর দিয়া ঐ হস্তীটির কাছে নিজের ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন ও বর্ষার দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। এবার রাজা জয়সিংয়ের পালা। তিনিও অগ্রসর হইয়া হস্তীটিকে আক্রমণ করিলেন।

ওদিকে, সুরতসুন্দর দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আবার প্রস্তুত হইল। কিন্তু সুধাকর বর্ষার খোঁচা খাইয়াই হউক বা আতসবাজী ছোঁড়ার দরুণ ভয় পাইয়াই হউক রণে ভঙ্গ দিল; আর, সুরতসুন্দর বজ্র-গর্জ্জনে তাহার পিছু লইল। এইরূপে দুই সাহজাদা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

সম্রাট সাহজাহান আওরংজীবকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার সাহসের খুবই প্রশংসা করিলেন ও তাঁহাকে "বাহাদুর" খেতাবে ভূষিত করিলেন। সভাসদ্‌রা বলাবলি করিল, "তাহা না হইবে কেন? বালক ওয়ারিসী স্বত্বে পিতার বেপরোয়া সাহসেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। বাল্যকালে সাহজাহানও ত' একবার তাঁহার পিতার সম্মুখে তরোয়াল হস্তে এক ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।"

আওরংজীব কিরূপ তেজস্বী ছিলেন, এই ঘটনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য পিতার নিকট স্নেহসূচক বাক্যে ভৎর্সিত হইলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "এই যুদ্ধে আমি যদি মারা পড়িতাম, তাহা হইলে অগৌরবের কোনই কারণ হইত না। সম্রাটেরও মৃত্যু নিশ্চিত; ইহাতে লজ্জিত হইবার কি আছে?"

১৬৩৪ সালের মে মাসে আওরংজীব দশ হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। এই ঘটনার ৫ মাস পরে, যুদ্ধবিদ্যা ও লোকনেতৃত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে বুন্দেলা অভিযানে পাঠান হইল।

৩

বীরসিংহদেব উড়ছা প্রদেশের বুন্দেলা অধিপতি। মুঘল সম্রাটের নেকনজর তাঁহার উপর থাকায় তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া উঠেন। জাহাঙ্গীরের আজ্ঞায় তিনি আবুলফজলকে হত্যা করিয়াছিলেন। বীরসিংএর পুত্র ঝুঝহর সাহজাহানের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেন (১৬২৭ সাল) ইনি গন্দজাতির পুরাতন রাজধানী চৌড়াগড় জয় করিলেন ও ইহার রাজা প্রেমনারায়ণকে হত্যা করিয়া তাঁহার দশলক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি দখল করিলেন। মৃতরাজার পুত্র সাহজাহানের নিকট আবেদন করিল (১৬৩৫)।

সম্রাটের আজ্ঞায় তিনটি মুঘল ফৌজ বুন্দেলখন্দ আক্রমণ করিল। উড়ছার রাজপদ পাইবার লোভে বুন্দেলা রাজগোষ্ঠির আর এক শাখার বংশধর দেবীসিং তাহাদের সাহায্য করিল। মুঘল সেনায় নিয়মনিষ্ঠা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বাহাল রাখিবার জন্য সম্রাট আওরংজীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা নিয়োগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন। হুকুম হইল, সাহজাদাকে সৈন্যদলের পিছনে থাকিতে হইবে ও তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে অধীনস্থ সেনাপতিরা কিছুই করিতে পারিবেন না।

দেবীসিংএর লোকজন উড়ছা জয় করিল; ভয় পাইয়া ঝুঝহর পলায়ন করিলেন। মুঘল ফৌজ তাঁহার পিছু লইল। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে ঝুঝহর নিজের জনবল ও আসবাব-পত্র প্রতিপাদক্ষেপে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলেন। শেষে, গোন্দরা পলায়নপর রাজপুত্রদের নিদ্রাবস্থায় বনের মধ্যে হত্যা করিল। তাঁহাদের স্ত্রীকন্যারা অনেকে জৌহর ব্রতে প্রাণ দিল; যাহারা প্রাণত্যাগ করিতে পারিল না তাহাদের মুঘল অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল। ঝুঝহরের দুই শিশুপুত্র ও এক পৌত্রকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল। অপর এক পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া নিজের প্রাণ দিল। বীরসিং উড়ছায় যে প্রকাণ্ড দেবালয়টি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেটিকে মুঘলেরা ভাঙ্গিয়া দিল ও তাহার যায়গায় এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিল। পরে, ঝান্সী ও বীরসিংএর এক কোটী টাকার গুপ্তধন মুঘলেরা হস্তগত করিল।

৪

সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষাশেষি মুঘল সাম্রাজ্য নর্ম্মদার অপর পারে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। খান্দেশ ও পরে বিরার ও আহমদনগর মুঘলদের অধিকারে আসিল। কিন্তু আহমদনগর বেশীদিন তাহাদের ভোগদখলে রহিল না। জাহাঙ্গীরের বীর্য্যহীন শাসনাধীনে, অসাধারণ প্রতিভা ও কার্য্যশক্তি সম্পন্ন আবিসিনিয়া দেশবাসী জনৈক দাস, মালিক অম্বরের নেতৃত্বে, নিজামশাহী রাজগোষ্ঠীর নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল। তাঁহার বিচার-বুদ্ধি প্রসূত রাজস্ব বিভাগের ফলে দেশ উপকৃত হইয়াছিল। প্রজাদের মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও দেশে নিপুণ ব্যবস্থা দেখা দিল। ন্যায়নিষ্ঠা ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য মালিক অম্বর অমর হইয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের রাজাদের মধ্যে সন্ধির দ্বারা মিলন ঘটাইয়া ও দ্রুতগামী মারাঠা অশ্বারোহীর সহায়তায় তিনি মুঘলশক্তির গতিরোধ করেন। মালিক অম্বরের মৃত্যুর ঠিক পরে, সাহজাহান দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়া (১৬২৭ খৃঃ) দাক্ষিণাত্যে চণ্ডনীতি অবলম্বন করিলেন। নিজামশাহী গোষ্ঠীর রাজধানী দৌলতাবাদ মুঘলদের অধিকারে আসিল। ওদিকে আবার বিজাপুরের সুলতান ও গোলকোণ্ডার বাদশাহ লুপ্তপ্রায় আহমদনগর রাজ্যের আশপাশের দেশগুলি দখল করিতে চেষ্টা করিলেন। শিবাজীর পিতা শাহজী, বিজাপুরীদের সাহায্যে নিজামশাহকে সাক্ষীগোপাল করিয়া আহমদনগরের সিংহাসনে বসাইলেন, ও তাঁহার নামে দেশের এক অংশের উপর রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

বীরোচিত উদ্যমের সহিত সাহজাহান নিজের অধিকার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। স্বয়ং সৈন্যচালনা করিবার জন্য সম্রাট দৌলতাবাদ রওনা হইলেন। তিনটি ফৌজ, সংখ্যায় সর্ব্বসমেত ৫০,০০০ সিপাহী, বিজাপুর ও

গোলকোণ্ডার বিরুদ্ধে পাঠাইবার জন্য ঠিক করা হইল। গোলকোণ্ডার রাজা ভয়ে বিচলিত হইয়া মুঘল সম্রাটের বাধ্যতা স্বীকার করিল।

বিজাপুরের শাসনকর্তা কিন্তু নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। মুঘল সৈন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া চাষবাস ও গ্রামগুলি নষ্ট করিল ও সেই সঙ্গে প্রজাদেরও গ্রেপ্তার করিল। শেষে, উভয় পক্ষে যে সন্ধি হইল তাহার সর্ত্ত এইরূপ: নিজামসাহী রাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। এক অংশ বিজাপুরের বাদসাহ পাইলেন ও অন্য অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইল। বিজাপুরের বাদসাহ মুঘল সম্রাটকে উদ্ধতন সম্রাট বলিয়া মানিয়া লইলেন। স্থির হইল, এখন হইতে গোলকোণ্ডার সুলতানের সহিত তিনি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন। আর, খেসারৎ স্বরূপ মুঘল সম্রাটকে তিনি ২০ লক্ষ টাকা দিবেন; ভবিষ্যতে তাঁহাকে আর বাৎসরিক কর দিতে হইবে না।

দাক্ষিণাত্যে হাঙ্গামা মিটিবার পর, আওরংজীবকে দাক্ষিণাত্যের মুঘল রাজধানী আওরঙ্গাবাদে রাখিয়া, সম্রাট সাহজাহান উত্তর ভারতে ফিরিলেন (জুলাই, ১৬৩৬)। সাহজাহান আওরংজীবের নামানুসারে খির্‌কি পল্লীটির "আওরঙ্গাবাদ" নামকরণ করিলেন।

শাহজী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে মুঘল কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য-বিজয় সমাপ্ত হইল। মুঘল সৈন্যের দ্বারা অনেক দিন পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শাহজী শেষে আত্মসমর্পণ করিলেন। শাহজীকে নিজের সম্পত্তি, সাতটি দুর্গ ও তাঁহার ক্রীড়নক বিজাপুরের সুলতানকে মুঘলের হাতে সমর্পণ করিতে হইল।

এছাড়া, মুঘলেরা দেওগড়ের গন্দরাজা এবং অন্যান্য সর্দ্দারদের নিকট হইতে বিস্তর টাকা আদায় করিল। দাক্ষিণাত্য হইতে গুর্জ্জর যাইবার প্রধান রাজপথের উপর অবস্থিত বাগলানা নামে ছোট রাজ্যটি মুঘলদের হস্তগত হইল (জুন, ১৬৩৮)। শাহজীর খুড়তুতো ভাই খেলোজী ভোঁস্‌লে নামে এক তস্কর মুঘলদের হাতে বন্দী ও হত হইল অক্টোবর, ১৬৩৯)।

৫

আওরংজীবের চারিটি মহিষী ছিল:—

(১) দিলরাস বাণু বেগম; ইহার বৃদ্ধ পিতামহ, সা ইস্‌মাইল সফ্‌ভির কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বেগম সাহেবার পিতার নাম সাহ নওয়াজ খাঁ। আগ্রায় আওরংজীবের সহিত দিলরাসের বিবাহ হয় (মে, ১৬৩৭)। আওরঙ্গাবাদে মুহম্মদ আকবর ভূমিষ্ঠ হইলে, প্রসবজনিত পীড়ায় বেগমের মৃত্যু হয় (মে, ১৬৫৭)। সহরের বাহিরে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। ইহার কবরটি জনসাধারণে "দাক্ষিণাত্যের তাজমহল" নামে পরিচিত। পারস্য রাজবংশীয় এই গর্ব্বিতা বেগমটিকে সম্রাট ভয় করিয়াই চলিতেন।

(২) রহমৎউন্নিসা বা নওয়াব বাঈ। ইনি কাশ্মীর প্রদেশের রাজপুত সর্দ্দারের কন্যা ছিলেন। ইঁহার পুত্র বাহাদুর সাহ পরে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হ'ন। দুষ্টমতি পরামর্শদাতার প্ররোচনায় মুহম্মদ সুলতান ও মুঅজ্জম নামে এই বেগম সাহেবার অপর দুই পুত্র সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করায় নওয়াব বাঈর শেষ জীবন দুঃখময় হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই শারীরিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের ভালবাসা হারাইয়া, স্বামী পুত্র হইতে অনেক দিন পৃথক্ বাস করিয়া দিল্লীতে এই বেগমের মৃত্যু ঘটে (১৬৯১)।

(৩) আওরঙ্গাবাদী মহল। আওরঙ্গাবাদ সহরে অবস্থানকালীন ইনি সাহজাদা আওরংজীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন বলিয়া ইঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল। প্লেগ রোগে ইঁহার মৃত্যু হয় (১৬৮৮)।

(৪) উদয়পুরী মহল। ইনি সাহজাদা কামবক্সের জননী ছিলেন। ভেনিসবাসী পরিব্রাজক মানুচির মতে ইনি জিওরজিয়া প্রদেশজাত ছিলেন। সাহজাদা দারার অন্তঃপুরে ইনি প্রথমে দাসীর কাজ করিতেন। পরে, যুদ্ধে দারার পরাজয় ঘটিলে, তাঁহার বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী আওরংজীবের উপপত্নীরূপে ইনি গৃহীত হ'ন। বাদশাহের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বেগম নিজের মোহিনীশক্তি ও আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাটের বৃদ্ধ বয়সের আদরের

ধন ছিলেন। ইঁহার সৌন্দর্য্যের কুহকিনী শক্তির প্রভাবে সম্রাট কামবক্সের বহু অপরাধ ক্ষমা করেন। নিজে ধার্ম্মিক মুসলমান হইয়াও সম্রাট বেগম সাহেবার মদ্যপানজনিত যথেচ্ছাচার উপেক্ষা করেন।

উপরে বর্ণিত চারিটী মহিষী ছাড়া আর এক মহিলারও উল্লেখ আছে। রূপলাবণ্যবতী, গীত-বাদ্য-কুশলা ও চটুল এই রমণী সাহজাদার কঠোর জীবনে বিলাসময়ী প্রেমিকারূপে দেখা দিয়াছিলেন। আওরংজীবের মেসো মীর খলিলের অধীনে হীরাবাঈ ওরফে জইনাবাদী নাম্নী এক অল্পবয়স্কা দাসী ছিল। আওরংজীব কোন এক সময়ে তাঁহার মাসীর সহিত বুরহানপুরে দেখা করিতে যান। সেখানে, তাপ্তি নদীর অপর পারে অবস্থিত জইনাবাদ উদ্যানে ভ্রমণ সময়ে সাহজাদা তাঁহার মাসীর দলবলের মধ্যে হীরাবাঈকে অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় দেখিতে পান। এক মুহূর্ত্তে তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি সাহজাদার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। আওরংজীব তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু বেশী দিন হীরাবাঈ এর কপালে এ সুখ রহিল না; যৌবনেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আওরংজীবের অনেকগুলি সন্তান জন্মে। প্রধানা মহিষী দিলরাস বাণু বেগম ৫টি সন্তান প্রসব করেন।

১। জেবউন্নিসা। (জন্ম, ১৬৩৮: মৃত্যু ১৭০২) পিতার প্রখর বুদ্ধি ও সাহিত্যানুরাগ ইনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হ'ন। নিজ সম্পত্তির মধ্যে ইঁহার পুস্তকাগার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। কাব্যে সম্রাটের রুচি না থাকায়, কবি-দিগের প্রতি পৃষ্ঠ-পোষকতার যে অভাব দেখা দিয়াছিল, শাহজাদীর কবিগণের উপর বদান্যতা তাহারই ক্ষতিপূরণ করিয়াছিল। সমসাময়িক অধিকাংশ কবিই তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। ছদ্মনামে ইনি নিজে পদ্য রচনা করিতেন।

(২) জিন্নৎ-উন্নিসা বা পাদশাহ বেগম। (জন্ম ১৬৪৩; মৃত্যু ১৭২১)। পিতার দাক্ষিণাত্যে বাসকালীন ইনি সংসারের কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং পরবর্ত্তী বাদশাহরা ইঁহাকে একটা প্রসিদ্ধ যুগের অলঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করিয়া খুবই সম্মান করিতেন। ইঁহার ঈশ্বর নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় দয়া দাক্ষিণ্য সম্বন্ধে ইতিহাসকারেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(৩) জুবদৎ-উন্নিসা। (জন্ম ১৬৫১; মৃত্যু ১৭০৭)। সাহজাদা দারার মধ্যম পুত্র সিপির সুকোর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

(৪) মুহম্মদ আজম্। (জন্ম ১৬৫৩; মৃত্যু ১৭০৭); পিতার মৃত্যুর পর, উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন লইয়া ভাই-এ ভাই-এ যুদ্ধের সময় ইনি হত হ'ন।

(৫) মুহম্মদ আকবর। (জন্ম, ১৬৫৭) নির্ব্বাসিত হইয়া ইনি পারস্য দেশে দেহত্যাগ করেন (১৭০৪)।

নবাব বাঈ তিনটি সন্তান প্রসব করেন:—

(৬) মুহম্মদ সুলতান। (জন্ম ১৬৩৯)। কারাগারে ইঁহার মৃত্যু হয় (১৬৭৬)।

(৭) মুহম্মদ মুঅজ্জম। (জন্ম ১৬৪৩; মৃত্যু ১৭১২)। ইনিই "বাহাদুর সাহ ১ম" নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন।

(৮) বদর-উন্নিসা। (জন্ম, ১৬৪৭; মৃত্যু ১৬৭০)।

আওরঙ্গাবাদী মহল ১টি সন্তান প্রসব করেন:—

(৯) মেহের-উন্নিসা। (জন্ম ১৬৬১; মৃত্যু ১৭০৬)। সাহজাদা মোরাদ বক্সের পুত্র ইজিদ বক্সের সহিত ইনি পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হ'ন (১৬৭২)।

উদয়পুরী মহলও এক সন্তান প্রসব করেন:—

(১০) মুহম্মদ কামবক্স। (জন্ম ১৬৬৭; মৃত্যু ১৭০৯।) হায়দ্রাবাদের নিকট সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃবিরোধে ইনিও হত হন।

৬

আওরংজীব দাক্ষিণাত্যে রাজ-প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছিলন, হঠাৎ তাঁহার দুর্নাম ও পদচ্যুতি হইল (১৬৪৪ খৃঃ)। কিন্তু এই সময়ে এক আকস্মিক ঘটনা ঘটিল।

একদিন রাজনন্দিনী জাহানারা আগ্রা দুর্গে পিতার কক্ষ হইতে নিজের প্রকোষ্ঠে যাইতেছিলেন; অসাবধানতা-বশতঃ তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল বারান্দার বাতিতে স্পর্শ করায়,

তিনি ভয়ানক পুড়িয়া যান। (মার্চ্চ, ১৬৪৪ খৃঃ) প্রায় চারিমাস কাল তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া ছিল।

কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তাঁহার জ্বালা নিবারণ করিতে পারিল না। কিন্তু, পরে এক ক্রীতদাসের তৈয়ারী মলমে শাহাজাদীর পোড়া-ঘা ভাল হয়। শাহাজাদীর আরোগ্যলাভ উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা হয় (নভেম্বর, ১৬৪৪ খৃঃ)। এই আনন্দোল্লাসের দিনে ভগিনী জাহানারার অনুরোধে আওরংজীব পিতার অনুগ্রহ এবং তাঁহার নষ্ট মর্য্যাদা ও চাকুরী ফিরিয়া পাইলেন।

ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আওরংজীব আগ্রায় আগমন করিলেন। তিন সপ্তাহ পরে সাহজাদার পুনরায় চাকরী গেল, এবং তিনি মর্য্যাদা ও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। আওরংজীবের হাতে লেখা একখানি চিঠি হইতে জানিতে পারা যায় যে, দারার আওরংজীবের উপর শত্রুতার ও সম্রাটের দারার উপর পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ স্বরূপ আওরংজীব নিজেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

জাহানারা আবার সুপারিশ করায়, সম্রাট আওরংজীবকে গুর্জ্জরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৬৪৫)। প্রায় দুই বৎসর গুর্জ্জর প্রদেশ শাসন করিবার পর, সম্রাটের আজ্ঞায় আওরংজীবকে বাল্‌খ প্রদেশে যাইতে হইয়াছিল। গুর্জ্জর শাসনকালে সাহজাদা নিজের কার্য্যশক্তি ও শাসন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। গুর্জ্জরের বিদ্রোহীদের দমন করিয়া আওরংজীব পিতার নিকট নিজেকে কর্ম্মঠ ও সাহসী বলিয়া পরিচয় দেন। শীঘ্রই বাল্‌খ ও বদক্‌শান প্রদেশ দুইটির জন্য তাঁহারই মত এক বহুগুণবিশিষ্ট শাসনকর্ত্তার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। সুতরাং, সম্রাট আওরংজীবকে ঐ দুই দেশের শাসনকর্ত্তা ও সেনানায়ক নিযুক্ত করিলেন।

৭

কাবুলের উত্তরে চিরতুষারাবৃত হিন্দুকুশ গিরিশ্রেণী; ইহার অপর পারে বাল্‌খ ও বদক্‌শান: এই দেশ দুইটি বোখারা রাজ্যের এলাকার মধ্যে ছিল। এই দেশের দুর্ব্বল-চিত্ত ও অক্ষম রাজার উপর সকল শ্রেণীর প্রজাই বিরক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। সম্রাট সাহজাহানের এই দেশ দুইটি জয় করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতেই ছিল। বাবর উত্তরাধিকারী সূত্রে এই প্রদেশ দুইটি পাইয়াছিলেন; আর, মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ যাইতে হইলে ঐ পথেই যাইতে হয়। সুতরাং, সুযোগ পাইয়া সাহজাহান বাল্‌খ ও বদকশানএর বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠাইলেন।

সাহজাদা মোরাদবক্স এক বিরাট বাহিনী লইয়া বদক্‌শান ও বাল্‌খ অধিকার করিলেন (১৬৪৬)। কিন্তু সাহজাদা ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা বেশীদিন ঐ দেশে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। দেশটি একে ত' শীতপ্রধান ও অনুর্ব্বর—বিলাসপ্রিয় সাহজাদার বাসের উপযোগী; তার উপর দুর্ধর্ষ উজ্‌বক্ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে খুবই সাহসের দরকার। কাজে কাজেই, সম্রাটের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, মুঘলসৈন্যকে নেতৃবিহীন অবস্থায় রাখিয়া মুরাদ বাল্‌খ হইতে শীঘ্রই ফিরিলেন। তখন পূর্ব্বাবস্থা পুনরুদ্ধার করিবার ভার আওরংজীবের উপর পড়িল। তিনি আলীমর্দ্দন খাঁর সহিত কাবুল হইতে রওনা হইয়া বাল্‌খ পৌছিলেন।

ওদিকে আজিজ খাঁর নেতৃত্বে উজ্‌বকেরা মুঘলবাহিনী অবরোধ করিল। শত্রুসৈন্যের গতি রোধ করিবার জন্য আওরংজীব বাল্‌খ হইতে বাহির হওয়া মাত্র উজ্‌বকেরা এই শহরটি আক্রমণ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া আওরংজীবকে নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। দিনের পর দিন, আক্রমণকারী শত্রুপক্ষের সঙ্গিত যুদ্ধ চলিল: মুঘলবাহিনী ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল; খাদ্য ও পানীয় জলের একান্ত অভাব হইল। এই প্রকার কষ্ট ও বিপদের ভিতর, সাহজাদার দৃঢ়তা ও শাসনের জন্য সৈন্যের মধ্যে অব্যবস্থা হইতে পারে নাই। প্রত্যেক ত্রুটিস্থলে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কর্ম্মঠ দেহ সাহায্যার্থ প্রস্তুত ছিল। আওরংজীবের বুদ্ধি ও সাহসের জন্যই মুঘল সৈন্য সে যাত্রা রক্ষা পায়।

আওরংজীবের ভীষণ নাছোড়বান্দা স্বভাবই তাঁহার সাফল্যের কারণ। আবদুল আজিজ সাহজাদার অবিচলিত সাহসের চাক্ষুষ পরিচয় পান। সন্ধ্যা হয় হয়; যুদ্ধ তখনও

প্রবলবেগে চলিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আসন পাতিয়া আওরংজীব হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন ও চারিদিকের যুদ্ধ ও কোলাহল উপেক্ষা করিয়া নেমাজ পড়া শেষ করিলেন! তখন নিজের দেহ রক্ষা করিবার জন্য কোন আবরণ বা অস্ত্র তাঁহার নিকট ছিল না। বিপক্ষের সৈন্যগণ এই দৃশ্যে একেবারে স্তম্ভিত হইল। আবদুল আজিজ সাহজাদার বিস্তর প্রশংসা করিলেন, ও যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, "অদ্ভুত সাহস! এরূপ লোকের সহিত যুদ্ধ করা আর নিজের মৃত্যু বরণ করিয়া লওয়া, একই কথা"!!

উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। বাল্‌খ দুর্গ উজ্‌বকদের ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এবার মুঘল সৈন্যের কাবুল হইতে রওনা হইবার পালা। পথের মধ্যে উজ্‌বক্ ও হাজারা জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মুঘলেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রায় পাঁচ হাজার মুঘল সিপাহী প্রাণ দিল; হত ভারবাহী পশুর সংখ্যাও তদনুরূপ। ইহা ছাড়া মুঘলদের যে রসদ ও জিনিষপত্র নষ্ট হয় তাহার মূল্যও প্রায় লক্ষাধিক টাকা। বাল্‌খ অভিযানের দরুণ মুঘল তহবিল হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকা খরচ হইয়া যায়।

এই অভিযানের পর আওরংজীব মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্ত্তার কাজে নিযুক্ত হইলেন (১৬৪৮ হইতে ১৬৫২ পর্য্যন্ত)। এই দেশে অসভ্য ও অদম্য আফগান ও বেলুচি জাতির বাস ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আওরংজীব নিজের শাসনকৌশল ও ক্ষমতার গুণে তাহাদের সর্দ্দারগণকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। আর, স্থানীয় ব্যবসার উন্নতিকল্পে তিনি নদীমুখে এক পত্তন স্থাপন করিয়া সেইখানে একটি দুর্গ ও একটি বন্দর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

৮

পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারত অভিমুখে ও দক্ষিণ দিক হইতে কাবুল যাইবার পথে কান্দাহার অবস্থিত। মনে হয়, কান্দাহার দুর্গটি এই পথটির উপর পাহারা দিবার জন্যই যেন নির্ম্মিত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়া বা পারস্য হইতে ভারত আক্রমণকারীর যাতায়াতের সুবিধার জন্যই যেন গগনস্পর্শী হিন্দুকুশ গিরিশ্রেণী কান্দাহারের নিকট নত শির হইয়া আছে। এক সময়ে কান্দাহার দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। আর সে সময়ে ইহা ভারতের সুরক্ষিত সীমানার কাজ করিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ নৌবাহিনী ভারত সমুদ্রের উপর নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ভারত হইতে পারস্য যাইবার সমুদ্রপথটি বন্ধ করিয়া দিল। ফলে, পূর্ব্বে যেমন কান্দাহারের একটা বিশিষ্ট সামরিক গুরুত্ব ছিল তেমনিই বাণিজ্যেও ইহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবর্ষ বা স্পাইস দ্বীপপুঞ্জ হইতে সমস্ত মালপত্র স্থলপথে কান্দাহার হইয়া পারস্যে ও পরে ইউরোপে রপ্তানি হইতে লাগিল। মালপত্র কেনা-বেচার উপযোগী স্থান হইয়া উঠায়, কান্দাহার শীঘ্রই সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িল।

কান্দাহার লইয়া পারস্য ও ভারত সম্রাটের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত। এই দেশ বাবর আফগানদের নিকট হইতে কাড়িয়া ল'ন। পারস্যের সাহ বাবরের নিকট হইতে এই দেশ দখল করেন। পরে, আকবর পারস্যের সাহজাদার নিকট হইতে ইহা খরিদ করেন। জাহাঙ্গীরের বৃদ্ধাবস্থায় কান্দাহার পারস্যের সাহের করতলগত হয়। সাহজাহানের আমলে কান্দাহার মুঘলদের হস্তে আসিলেও, শীঘ্রই আবার এই দেশ পারসীকদের হস্তগত হইয়াছিল।

সম্রাট সাহজাহান মনে করিলেন, মুঘলগৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে কান্দাহার পুনরধিকার করা আবশ্যক। সাহজাদারা তিন বার কান্দাহার অবরোধ করিলেন; খরচ বিস্তর হইল, কিন্তু কিছু ফল দেখা দিল না। প্রথম অভিযানে, আওরংজীব উজীর সাদাউল্লা খাঁর সাহচর্য্যে, পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া কান্দাহার আক্রমণ করেন ১৬৪৯)। প্রতিপক্ষের উৎকৃষ্ট কামান, কৌশলী গোলান্দাজ সিপাহী ও পর্য্যাপ্ত রসদ থাকায় সাহজাদার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিফল মনোরথ হইয়া সাহজাদা ফিরিয়া আসিলেন।

এবার আরও বিরাট ভাবে দ্বিতীয় অভিযান পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। আওরংজীব ও সাদাউল্লা খাঁ পুনরায় কান্দাহার আক্রমণ করিলেন (১৬৫২)। দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কামান শ্রেণী বসান হইল; পরিখার দিকে গড়খাই কাটা হইল। মুঘলেরা আক্রমণ করিলে

বিপক্ষ সৈন্য দুর্গপ্রাচীরের গর্ত্ত হইতে অবিরত এমন বন্দুক ছুঁড়িতে থাকিল যে, আক্রমণকারীরা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

অবরোধ কার্য্য আরম্ভ হইবার একমাসের মধ্যে মুঘলদের সরঞ্জাম ফুরাইয়া গেল। প্রায় দুইমাস কাল চেষ্টা করিয়াও দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গা গেল না। শেষে, সম্রাট সাহজাহানের হুকুমে, মুঘল ফৌজ অবরোধ তুলিয়া দিয়া কান্দাহার ছাড়িয়া চলিল।

সাহজাহান আওরংজীবের এই অকৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহার উপর বিশেষ রুষ্ট হইলেন। কিন্তু, কান্দাহার জয় করিতে না পারার জন্য সাহজাদাকে দায়ী করা যায় না। সম্রাট স্বয়ং কাবুলে থাকিয়া সাদাউল্লার খাঁর দ্বারা সৈন্য পরিচালনা করাইতেন। আর, প্রতিপদে সাহজাদাকে পিতার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইত।

পর বৎসর, সাহাজাদা দারার নেতৃত্বে যে বিরাট অভিযান কান্দাহারের বিরুদ্ধে পাঠান হয় তাহার নিগ্রহে আওরংজীবের দোষস্খালন হয়। এই তিন নিষ্ফল অভিযানের ফলে মুঘল পক্ষে তিন কোটী টাকা খরচ হইয়াছিল এবং ইহার বিফলতায় সমগ্র এশিয়ার চক্ষে মুঘল মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে কেবল যে পারস্যের সমর-খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এমন নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর অবশিষ্ট সময় পারসীক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত আক্রমনের জনরব দিল্লীর সম্রাটকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু

গান

জসীম উদ্দীন

(রাখালী গানের সুর)

আজ আমার,
মনে ত না মানেরে সোনার চান
বাতাসে মেলিয়া বুকরে শুনি আকাশের গান রে।
আজ নদীতে উঠিয়া ঢেউরে আমার কুলে আইসা লাগে
রাতের তারার সাথে আমার ঘরের প্রদীপ জাগে রে।
চান্দের উপরে বইসারে যেবা গড়ছে চাঁদের বাসা
আজ দীঘিতে সাপলা ফুটে তারির লয়ে আশা রে।
উইড়া যায় রে হংসরে পাখি যায় রে বহুৎ দূর
আজ তরলা বাঁশের বাঁশীরে আমার টানে সেই সুর রে।
আজ কাখের কলসী ধইরারে কান্দে কালো যমুনার জল
শিমুলের তুলা লয়ে হৈল বাতাস পাগল রে।

কবি প্রশস্তি

(রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে)

শ্রীমতী মানসী দেবী

হে কবি, আজিকে মিলেছি আমরা তোমারে প্রাণের অর্ঘ্য দিতে,
হে রবি, তোমার উদার আলোকে এসেচি হৃদয় ভরিয়া নিতে।
যশোগৌরব-হিমাচল তুমি, আরতি তোমার ভুবন ভরি',
মুগ্ধহৃদয় ভক্ত আমরা ধন্য তোমারে প্রণাম করি'।
প্রতিভা তোমার প্রখর তপন দীপ্তি তাহার বিশ্বময়,
মনীষা তোমার আকাশ উদার অসীমের মাঝে হয়েছে লয়।
সাগরের মত হৃদয় তোমার বিপুল অতল অন্তহীন,
কত রূপ তার, কত তরঙ্গসৃষ্টি তাহার রাত্রিদিন।
কূলে থাকি' মোরা বিস্মিত চোখে চাহি তব পানে হে বিস্ময়,
মন ভরি' উঠে অসীমের রূপে, প্রাণ ভরি' গাহি তোমারি জয়।

আলোকে আঁধারে সুন্দরে তুমি খুঁজেছ মানব জীবন ভরি';
অরূপ তোমার হৃদয়ের পাতে কতবার গেছে পরশ করি'।
কতবার তব নিশীথ গগন ভরিয়া তুলেছে নীরব গানে,
"রাজার দুলাল" কতদিন গেছে তোমারি গৃহের সমুখ পানে।
কতদিন তুমি ফাগুনের বনে শুনেছ তাহার "পায়ের ধ্বনি"
তারি পথ চেয়ে শ্রাবণ রজনী কেটেছে তোমার প্রহর গণি'।
বিশ্ব-বাসনা-রক্ত-কমলে দেখেছ তাহারে জ্যোতির্ম্ময়,
বজ্রে তাহার শুনিয়াছ বাঁশী, ঝঞ্ঝার মুখে গেয়েছ জয়।
সুন্দর শুধু বসন্তদিনে জীবনের রূপে আসেনি দ্বারে,
মরণেরো বেশে এসেছে সে, তুমি বরণ করিয়া নিয়েছ তারে।

এই যে ধরণী, এর কূলে কূলে ভেসেছে তোমার সুরের তরী,
এই যে আকাশ, এ জীবনে তুমি গানে গানে এরে দিয়েছ ভরি'।
মানবমনের গভীর গহনে বাসনা বেদনা ফিরিত কাঁদি,
যাদুকর, তুমি গানের ছন্দে ভাষায় তাদেরে দিয়েছ বাঁধি'।
"অনাদি অতীত অনন্ত রাতে" ছিল অচেতন ঘুমের ঘোরে,
পরশে তোমার কথা কয়েছে সে, জাগিয়া উঠেছে নবীন ভোরে।
"হাজার হাজার বরষ কেটেছে"—প্রকৃতির ভাষা বুঝেনি কেহ,—
"তরুরে ঘিরেছে মাধবী লতিকা", কুমুদ পেয়েছে চাঁদের স্নেহ।
তুমি তাহাদের সুগোপন কথা প্রকাশ করেছ বিশ্বময়,
তৃণে তৃণে আর তরু পল্লবে দেখেছ জীবন, কি বিস্ময়!

পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির খেলা—তরুছায়া আর রবির কর,
তোমার সরল "কোমল হৃদয়ে শত প্রেমপাশে বেঁধেছে ডোর"।
কতবার বনে "ফাগুন লেগেছে পাতায় পাতায়" হাজার ফুলে;
রাতের শেফালি হাসিয়া হাসিয়া ঝরিয়া পড়েছে উষার কূলে।
বরষার বনে ভিজে কেয়াফুল হৃদয়ে তোমার দিয়েছে নাড়া,
গন্ধবিভোর কাননের যূঁই তোমার গানের পেয়েছে সাড়া।
বসন্তে যবে উন্মনা হয়ে উঠেছে বনের হৃদয়খানি,
বাঁশীতে তোমার ভরিয়াছ সুর, কণ্ঠে তোমার ফুটেছে বাণী।
নটরাজ! ঋতুরঙ্গ খেলায় যোগ দেছ তুমি খুলিয়া প্রাণ,
'প্রকৃতির হাতে ফুল ছিল আর তোমার বীণায় ছিল যে গান।'

ধরণীর কোলে মানবের মেলা, কত বিচিত্র দুঃখে সুখে,
বাসনা তোমার বিপুল আবেগে চেয়েছে সবারে বাঁধিতে বুকে
মরুভূমিচারী জিপ্‌সী বেদুইন্, তাদের জীবনে ঝাঁপায়ে পড়ি,
মুক্ত-জীবন-উল্লাস-রসে সাধ গেছে প্রাণ লইতে ভরি'।
তরু-পল্লবে তৃণে শাদ্বলে নদী গিরি জলে বিকীর্ণিয়া,
হে কবি, চেয়েছ ধরণীর মাঝে মিশায়ে লইতে আপন হিয়া।

এই পৃথিবীর সন্ধ্যা-প্রভাত, পল্লীভবন, নদীর তীর,
উদার আকাশ, রবির আলোক, প্রাণে এসে তব করেছে ভিড়।
তাই, তুমি এরে বার বার করি ভালবাসিয়াছ হৃদয় দিয়া,
'আনন্দ সুধা সকল পাত্রে' পিপাসা মিটায়ে করেছ পিয়া।

এই বাংলার, এই ভারতের মাটিতে তোমার নুয়েছে শির,
স্বদেশ মায়ের অভিষেকে তুমি ডেকেছ সবারে ভরিতে নীর।
মহামানবের মিলন দেখেছ ভারতভূমির আকাশ তলে,
মানুষের ধারা বিচিত্র স্রোতে মিশিয়াছে হেথা বিপুল বলে।
"হৃদয় খুলিয়া চেয়েছ বাহিরে" দেখেছ তোমার স্বদেশ মাঝে,
"মিলিয়া গেছেন বিশ্বদেবতা", শুনেছ তাহার "শঙ্খ বাজে।"
তোমার দেশের "মূঢ় ম্লান মূক" নির্য্যাতিতেরে দিয়েছ ভাষা,
তাদের "শ্রান্ত শুষ্ক বক্ষে" ছন্দে জাগায়ে তুলেছ আশা।
স্বদেশের মাটি, স্বদেশের জল, স্বদেশের আলো, পাখীর গান,
ঝঙ্কার দেছে তোমার বীণায়, ভরিয়া তুলেছে তোমার প্রাণ।

আজ হেরি, তব জীবন আকাশে সন্ধ্যার আলো নামিছে ধীরে,
দীর্ঘ পথের পথিক এসেছ "অস্তপারের সাগর" তীরে।
শুনি, "পূরবীর ছন্দে" তোমার "শেষ রাগিনীর" বাজিছে বীণ্
অস্তকিরণ পড়িয়াছে মুখে, সারা হয়ে বুঝি আসিল দিন!
ওগো কবি, তবু, বারেক দাঁড়াও শ্যামল ধরার আলিঙ্গনে,
অশ্রু-আতুর ক্রন্দন ধ্বনি ওই শোন, বাজে দূর গগনে।
আরো কিছুদিন এই ধরণীর আকাশে বাতাসে জাগাও সুর,
আরো কিছুদিন ছন্দে ও গানে মোদের জীবন কর মধুর।
আমাদের মাঝে বারেক দাঁড়াও, দেখিব তোমারে নয়ন ভরি;
দীর্ঘপথের শ্রান্ত পথিক, চরণে তোমার প্রণাম করি।

শ্রীমতী মানসী দেবী

—— o ——

ছন্দ-জিজ্ঞাসা

(তৃতীয় পর্ব্ব)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি

'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধের সমালোচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ পৌষের 'বিচিত্রা'য় যে-প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারিনি ; কারণ 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যে-প্রশ্ন তুলেছি, ওই প্রবন্ধে সে-প্রশ্নের যথোচিত উত্তর পাইনি। কিন্তু মাঘের 'পরিচয়ে' তাঁর "ছন্দের হসন্ত হলন্ত" প'ড়ে খুশি হয়েছি, কারণ তাতে আমার প্রশ্নের আংশিক উত্তর পেয়েছি। তা-ছাড়া, জয়ন্তী-উপলক্ষে "বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান" নামক প্রবন্ধে কাব্য-রচনার প্রথম সূচনা থেকে 'মানসী'র যুগ পর্য্যন্ত তাঁর ছন্দের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা বলেছি, "ছন্দের হসন্ত হলন্ত" প্রবন্ধে তার সম্পূর্ণ সমর্থন পেলুম। এত শীঘ্র এত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার কথার এমন চমৎকার সমর্থন পেয়ে আমি স্বভাবতই বিশেষ সন্তোষ লাভ করেছি। আমি বলেছি, "রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের রচনায় যুক্তবর্ণের বিরলতা একটি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়।" তিনি লিখেছেন, তখনকার দিনে "যুক্ত অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জ্জন করবার একটি দুর্ব্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল।" কেন সে অভ্যাস হয়েছিল এবং কি ভাবে তার অবসান ঘট্‌ল, এ বিষয়ে আমি যা বলেছি তিনি তার সব কথাই সমর্থন করেছেন। ("জয়ন্তী-উৎসর্গ", ৬৬-৬৯ পৃষ্ঠা এবং 'পরিচয়', মাঘ, ৩৮২-৩৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তা-ছাড়াও, "ছন্দের হসন্ত হলন্ত" প্রবন্ধটিতে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বিষয়ের উত্থাপন করেছেন, ছন্দের আলোচনায় যার মূল্য খুবই বেশি। তাঁর এ প্রবন্ধটির দ্বারা বাংলা ছন্দের আসল প্রকৃতিটি বোঝবার বিশেষ সহায়তা হয়েছে। যাহোক্‌, যে-প্রশ্ন উপলক্ষ ক'রে তিনি এই প্রবন্ধটি লিখেছেন সে-প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার আরও কয়েকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে। আমি এ প্রবন্ধে ওই জিজ্ঞাস্য বিষয় ক'টির আলোচনা করব এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে বাংলা ছন্দের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উত্থাপন করব।

১

যে-কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয়েরই আলোচনায় উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার যথাসম্ভব বর্জ্জন ক'রে চলাই রীতি। কারণ বৈজ্ঞানিক আলোচনার রীতি আর সাহিত্যিক রচনার রীতি এক নয়। ব্যাকরণ এবং শব্দতত্ত্বের আলোচনার ন্যায় ছন্দের আলোচনাও যত নিরলঙ্কার হয়, আলোচ্য বিষয়কে নিঃসংশয়রূপে স্পষ্ট করার পক্ষে ততই ভালো। তুলনা উপমা প্রভৃতির দ্বারা মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ই অলক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ঋজু পথটিকে লঙ্ঘন ক'রে যাবারও সম্ভাবনা থাকে। ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিতে লক্ষ্য করেছি বক্তব্য বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ ক'রে তোল্‌বার উদ্দেশ্যে তিনি সর্ব্বত্রই নানা ভঙ্গীতে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর তুলনার আশ্রয় নিয়েছেন; আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। তুলনাগুলির অধিকাংশই এমন চমৎকার যে তাতে মন আকৃষ্ট ও মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস, ওসব তুলনা যথাসম্ভব পরিহার ক'রে আলোচনা করাই উচিত। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে আশা করি। রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে নানা স্থানে 'দ্বৈমাত্রিক' ছন্দের গতিকে পায়ে চলার ভঙ্গীর সঙ্গে এবং 'ত্রৈমাত্রিক' ছন্দের গতিকে চাকার চলার ভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনার দ্বারা ও-দুই ছন্দের সম্বন্ধে এক রকম ক'রে একটা

বিশেষ ধারণা হয় বটে। কিন্তু তার দ্বারা ও-দুই ছন্দের আসল প্রকৃতি ও পার্থক্য সম্বন্ধে বাস্তবিক উপলব্ধি হয় না। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি যথাসম্ভব তুলনার ভাষা বর্জ্জন ক'রে ছন্দের আলোচনা করেন তাহ'লে বাংলা ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করা পাঠকদের পক্ষে অনেক বেশি সহজ ও সরল হবে।

২

যে-ছন্দকে আমি বলেছি স্বরবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেন 'প্রাকৃত-ছন্দ'; আর যে-ছন্দকে আমি বলেছি যৌগিক বা 'অক্ষর'বৃত্ত তিনি তাকেই বলেন 'সাধু-ছন্দ'। তাঁর দেওয়া এ নাম দুটি ছন্দ-গত নয়, ভাষা-গত। তা ছাড়া যৌগিক ছন্দে যে সব সময়ই সাধু ভাষার ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো আবশ্যিকতা নেই; আর স্বরবৃত্ত ছন্দেও প্রয়োজন মতো সাধু শব্দের (অর্থাৎ সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের) ব্যবহার চ'লে থাকে। তাই তাঁর দেওয়া এ নাম-দুটি আমি গ্রহণ করতে পারিনি। এ বিষয়ে ফাল্গুনের 'বিচিত্রা'য় বিস্তৃত আলোচনা করেছি। যৌগিক ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও 'পয়ার-সম্প্রদায়' 'পয়ার জাতীয় দ্বৈমাত্রিক ছন্দ' 'দুই-মূলক সম মাত্রার ছন্দ' ইত্যাদি নামও দিয়েছেন। ঐসব নামের যৌক্তিকতা নিয়ে এস্থলে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ সব ছন্দকে আমি কেন 'যৌগিক ছন্দ' নাম দিয়েছি সে বিষয়ে যথা স্থানে আলোচনা করব। কোন্ ছন্দকে আমি 'যৌগিক' আখ্যা দিয়েছি আশা করি সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই।

অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় আমি এই যৌগিক ছন্দেরই অন্তর্নিহিত নিয়মটি, অর্থাৎ কবিরা স্বভাবতই যে-নিয়মটি স্বীকার ক'রে ও-ছন্দ রচনা ক'রে থাকেন সেই নিয়মটি, আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলুম। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি ক'রে তার পরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া" সঙ্গত নয়। এ বিষয়ে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি কবিদের স্বীকৃত নিয়মটি আবিষ্কার করতেই চেষ্টা করেছিলুম: কোনো নিয়ম 'জারি' ক'রে কবিদের উপর 'জবরদস্তি' করা কখনই আমার অভিপ্রায় ছিল না। যদি আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, আমি যাকে যৌগিক ছন্দের নিয়ম ব'লে মনে করি সেটা ওই ছন্দের আসল নিয়ম নয়, তাহ'লে আমি অসঙ্কোচে আমার ভ্রম স্বীকার করব। কোনো বিশেষ একটি নিয়মকে জবরদস্তির দ্বারা চালিয়ে দেবার মতো অন্যায় জেদ আমার নেই।

এখন দেখা যাক্ পূর্ব্বোক্ত যৌগিক বা সাধু ছন্দের নিয়ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে কি বলেন। তিনি লিখেছেন, "আক্ষরিক ছন্দ ব'লে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিম্বা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্ন মাত্র।* * অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো বিড়ম্বনা।* * * অক্ষরের সংখ্যা গণনা ক'রে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।" এসম্বন্ধে আমি প্রথমেই একথা বল্‌তে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ এখানে 'অক্ষর' শব্দটি বাংলায় প্রচলিত অর্থে অর্থাৎ হরফ অর্থেই ব্যবহার করেছেন; ('অক্ষর' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি)। তাই তিনি স্বভাবতই আক্ষরিক ছন্দ সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য করেছেন; আর তাঁর এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে 'অক্ষর' বল্‌তে সিলেব্‌ল্ বোঝায় এবং সমস্ত সংস্কৃত ছন্দোবিৎরাই 'আক্ষরিক' বা 'অক্ষরবৃত্ত' (syllabic) ছন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একমত। কিন্তু বাংলায় 'অক্ষর' বল্‌তে যা বোঝায় সে অর্থে আক্ষরিক ছন্দ নামে অদ্ভুত পদার্থ কোনো ভাষাতেই হ'তে পারে না, এ বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত। ছন্দ সম্বন্ধে যাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তারা এ বিষয়ে দ্বিতীয় মত পোষণ করতে পারে না। ছন্দোনিপুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথও ঠিক্ এই কথাই বলেছেন; "কেবল—'বিজোড়ে বিজোড় গেঁথে জোড়ে গেঁথে জোড়'—হরফের পর হরফ সাজিয়ে কম্পোজিটারের নকল করলে ঠিক্ চল্‌বে না। বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে" ছন্দ রচনা করতে হবে (ছন্দ-সরস্বতী, ভারতী—১৩২৫ বৈশাখ)। আর ঠিক্ এই কথাটি প্রতিপন্ন করাই ছিল আমার অগ্রহায়ণের প্রবন্ধের প্রধানতম উদ্দেশ্য। মাঘের 'বিচিত্রা'য়ও আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, কেবলমাত্র অক্ষরসংখ্যার সাম্য রক্ষা ক'রে কোনো যথার্থ ছন্দ রচনা করা যায় না।

কাজেই "যাঁরা অক্ষর গণনা ক'রে নিয়ম বাঁধেন" আমি তাঁদের দলে নই, একথা আমি জোরের সঙ্গেই বল্‌তে পারি।

বরঞ্চ "অক্ষরের দাসত্বে বন্দী" ব'লে বাঙালী কবিদেরকে আমি দোষ দিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আমি স্বীকার করতে পারি। কারণ ভারতচন্দ্রের সময় থেকে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত অক্ষরসংখ্যার সাম্য ছাড়া অন্য কোনো তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল ব'লে আমার জানা নেই। মেঘনাদবধ কাব্যখানি আগাগোড়া শুধু চোদ্দ অক্ষরের পংক্তিতেই রচিত হয়েছে। আমার এ অভিযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, "সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চল্‌ত"। অবশেষে রবীন্দ্রনাথই বাংলা কবিতার ছন্দকে অক্ষরসংখ্যার "লৌহশৃঙ্খলের ডোর" থেকে মুক্ত করেছেন। (বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—জয়ন্তী-উৎসর্গ, ৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আক্ষরিক ছন্দ ব'লে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলা কিম্বা কোনো ভাষাতেই নেই"। আর আমি বলেছি, "ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হ'তে পারে না" (জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃঃ ৭৬)। কিন্তু একথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যেপে বাংলায় যত কাব্য রচিত হয়েছে তার প্রায় ষোলো আনাই ওই অক্ষরগোনা ছন্দে রচিত। ফলে ওই সময়কার কাব্যে বহু স্থানেই ছন্দের ধ্বনিগত ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়। বরঞ্চ ওই সময়কার অক্ষরগোনা ছন্দে প্রতি পদেই যে স্খলন ঘটেনি সেটাই বিচিত্র। শুধু "অক্ষরের মাপ সমান রেখে" ছন্দ রচনা করা সত্ত্বেও ধ্বনির মাপে যে খুব বেশি দোষ ঘটেনি, তার প্রধান কারণ আমাদের লিপিপদ্ধতিতে ব্যঞ্জনসংহতিকে যুক্তাক্ষরের দ্বারা লেখার প্রথা। আমাদের লিপিপদ্ধতির দ্বারা বাংলা যৌগিক ছন্দটি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এখানে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করার স্থান আমাদের নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আক্ষরিক" ছন্দ নামে কোনো অদ্ভুত পদার্থ কোনো ভাষাতেই নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই পয়ারজাতীয় (অর্থাৎ যৌগিক) ছন্দগুলির বিশ্লেষণ উপলক্ষে প্রায় সর্ব্বদাই 'অক্ষরে'রই হিসাব ক'রে থাকেন; "ছন্দের হসন্ত হলন্ত" প্রবন্ধটিতেও তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি—"আধুনিক বাংলা ছন্দে সব চেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো 'অক্ষরে' গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট 'অক্ষরে'র পরে, শেষ যতি দশ 'অক্ষরে'র পরে পদের শেষে"। যদি আট 'অক্ষর' এবং দশ 'অক্ষর' গুনেই এই দীর্ঘ পয়ারের বিশ্লেষণ করতে হয়, তাহ'লেই বল্‌তে হবে যে এই দীর্ঘপয়ার একটি 'আক্ষরিক' ছন্দ। আসল কথা এই যে, প্রচলিত লৌকিক কায়দায়ই দীর্ঘপয়ার এবং তজ্জাতীয় সমস্ত ছন্দকেই 'অক্ষরে'র হিসাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং কাজেই লৌকিক পদ্ধতিতে এসমস্ত ছন্দকে 'আক্ষরিক' ছন্দ বলা চলে। কিন্তু যথার্থ বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিচার করলে 'অক্ষর'কে এসব ছন্দের unit বা ব্যষ্টি বলা চলে না। বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণ করতে হ'লে বল্‌তে হয় যে, দীর্ঘপয়ারের প্রতিপংক্তি আঠারো ধ্বনিব্যষ্টির যোগে রচিত; আর আট ব্যষ্টির পরে প্রথম যতি, শেষ যতি দশ ব্যষ্টির পরে।

লৌকিক কায়দায় "পয়ার-জাতীয়" সমস্ত ছন্দেরই হিসাব রাখা হয় 'অক্ষরে'র মাপে। তাই লৌকিক পদ্ধতিটাকে অগ্রাহ্য না ক'রে আমি এজাতীয় ছন্দের সাধারণ নাম দিয়েছিলুম 'অক্ষর'-বৃত্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমাকে বল্‌তে হয়েছিল, "অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষরসংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না" (বিচিত্রা—অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৫৮০); "কিন্তু আসলে অক্ষর-সংখ্যা এছন্দের মূলগত তত্ত্ব নয়; ধ্বনিবিচারহীন অক্ষর-সংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হ'তে পারে না" (জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃঃ ৭৬)। কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি এই শ্রেণীর ছন্দকে 'অক্ষর'-বৃত্ত নাম দিয়ে আবার এগুলিকে 'অক্ষর'-নিরপেক্ষ বলায় বিভ্রাট উপস্থিত হয়েছে। আমার এই উক্তির মধ্যে বিরোধ কল্পনা

করার ফলে আমি "অক্ষর গণনা ক'রে নিয়ম বাঁধি" ব'লেও অভিযুক্ত হয়েছি আবার "অক্ষরের দাসত্বে বন্দী ব'লে বাঙালী কবিদেরকে দোষ দিই" ব'লেও অভিযুক্ত হয়েছি। এই ঢুটি পরস্পরবিরোধী অভিযোগই যুগপৎ সত্য হ'তে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। যাহোক, এই উভয়সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে আমি "অক্ষরবৃত্ত" নামটার পরিবর্ত্তে "পয়ার-জাতীয় সাধু" ছন্দ-গুলিকে "যৌগিক ছন্দ" নামে অভিহিত করেছি। অক্ষর গুনে ছন্দের বিশ্লেষণ করার লৌকিক রীতির সঙ্গে কোনো রকম রফা না ক'রেই এই নতুন নামকরণ করেছি। অক্ষর সংখ্যার মাপে লৌকিক কায়দায় যাঁরা ছন্দের হিসাব রাখেন এই নতুন নামে তাঁদের অসুবিধে হ'তে পারে। কিন্তু ছন্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালীর তরফ থেকে আমাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকবে না, এই আশা করছি।

৩

বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার একটি ধ্বনিগত নিয়মের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সে নিয়মটি হচ্ছে এই। "বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হ'য়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে।" এই নিয়মটিকে আমি কখনও অস্বীকার করিনি; বস্তুত' এই নিয়মটিকে ভিত্তি ক'রেই আমি বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করেছি। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও ব'লে রাখা ভালো যে, এ নিয়মটি কেবলমাত্র বাংলা ভাষারই স্বকীয় নয়; ইংরেজি ভাষা এবং ছন্দের পক্ষেও এ নিয়মটি বহু অংশে খাটে। ইংরেজিতে অনেক সিলেব্‌ল্‌ আছে যা ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতার তরফ থেকে উভধর্ম্মী বা common; অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে ওই সিলেব্‌ল্‌গুলি হ্রস্ব হয় আবার অবস্থাবিশেষে অন্যত্র দীর্ঘও হ'তে পারে। এই উভধর্ম্মী সিলেব্‌ল্‌গুলি ইংরেজি ছন্দকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে (George Saintsbury's Manual of English Prosody, ২১-২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যাহোক্‌, রবীন্দ্রনাথের কথিত বাংলার উক্ত ধ্বনিগত নিয়মটিকে একটু ভালো ক'রে অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে, এ নিয়মটিকে তিনি অত্যন্ত বেশি ব্যাপক ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ নিয়মটিকে যদি ব্যবহারে লাগাতে হয় তাহ'লে এটিকে আরও বিশ্লেষণ করা দরকার। বাংলা ভাষার ধ্বনি 'স্থিতিস্থাপক'; প্রয়োজন মতো তাকে টান দিয়ে বাড়ানো যায়, আবার প্রয়োজন মতো টান ছেড়ে দিয়ে তাকে কমানোও যায়;—শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। কখন ওই ধ্বনিকে টেনে বাড়াবার প্রয়োজন হয়, আর কখন টান ছেড়ে দিয়ে তাকে কমানো দরকার হয়, সে-কথাটিও বলা চাই। কারণ ওই কথাটি না বললে এ নিয়মটিকে কাজে লাগানো যাবে না।

বাংলার ধ্বনিগত এই স্থিতিস্থাপকতা গুণটিকে কি ভাবে ছন্দ-রচনার কাজে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে আমি তাই দেখাতে চেষ্টা করেছি। ধ্বনির স্থিতিস্থাপকতাগুণের ব্যবহারিক প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করেছি। ধ্বনির যে ব্যাবহারিক তত্ত্বের উপরে আমি ছন্দের শ্রেণীবিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এস্থলে সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ করছি। বাংলা ছন্দে অযুগ্ম ধ্বনিকে সাধারণত' টেনে বাড়ানো হয় না; অযুগ্মধ্বনি প্রায় সর্ব্বত্রই এক unit ব'লেই গণ্য হ'য়ে থাকে। কিন্তু বাংলার সমস্ত যুগ্মধ্বনিই উভধর্ম্মী বা common; কখনও একে টেনে দীর্ঘায়ত ক'রে উচ্চারণ করা যায়, আবার কখনও একে ঠেসে হ্রস্ব আকারেও উচ্চারণ করা যায়। আমরা সর্ব্বদা যে ভাষায় কথা বলি তাতেও ভাবপ্রকাশের সুবিধা অনুসারে আমরা যুগ্ম ধ্বনিকে কখনও দীর্ঘ কখনও হ্রস্বরূপে উচ্চারণ ক'রে থাকি। যুগ্ম ধ্বনিকে টেনে দীর্ঘায়ত ক'রে আমরা যে উচ্চারণ করি আমি তাকে বলব যুগ্ম ধ্বনির 'বিশ্লিষ্ট' উচ্চারণ, আর তাকে ঠেসে হ্রস্ব ক'রে যে উচ্চারণ করি তাকে বলব 'সংশ্লিষ্ট' উচ্চারণ। যে-ছন্দে যুগ্ম ধ্বনি সর্ব্বত্রই 'সংশ্লিষ্ট' অর্থাৎ হ্রস্ব রূপে উচ্চারিত হয় তাকেই আমি বলি স্বরবৃত্ত ছন্দ। কেননা এ ছন্দের unit হ'চ্ছে স্বর বা সিলেব্‌ল্‌; আর এছন্দে যুগ্ম ধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট বা হ্রস্ব ব'লেই এছন্দে যুগ্ম ধ্বনিকেও অযুগ্মধ্বনিরই মতো এক unit ব'লে গণনা করা যায়। যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্ব্বত্রই 'বিশ্লিষ্ট' অর্থাৎ দীর্ঘায়ত রূপে উচ্চারিত

হয় তাকেই বলেছি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। কেননা এ ছন্দের unit হচ্ছে মাত্রা বা mora; আর এ ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট বা দীর্ঘ ব'লেই যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মর্য্যাদা দেওয়া হ'য়ে থাকে, অযুগ্ম ধ্বনি এক মাত্রা ব'লেই গণ্য হয়। যে-ছন্দকে আমি স্বরমাত্রিক নাম দিয়েছি সে-ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে দীর্ঘ-হ্রস্ব দু-রকমেই উচ্চারণ করা যায়; অর্থাৎ এ ছন্দে সমস্ত যুগ্মধ্বনিকেই ইচ্ছে হ'লে বিশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারণ করা যায়, আবার ইচ্ছে হ'লে সংশ্লিষ্ট রূপেও উচ্চারণ করা যায়। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।—

নিত্য নূতন | ছন্দ রচি' | তোমায় আমি | কর্‌ব দান

এটি চতুঃস্বর-পর্ব্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। বলা বাহুল্য আমরা এ ছন্দটি পড়ার সময় যুগ্মধ্বনিগুলিকে স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ ক'রে থাকি। এ পংক্তিটিকেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রূপান্তরিত করা যাক্।—

নিত্য নূতন | ছন্দ রচিয়া | তোমায় আমরা | করিব দান

এটি হচ্ছে ষণ্মাত্র-পর্ব্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। এই পংক্তিটিকে আবৃত্তি কর্‌লেই দেখা যাবে যে আমরা স্বভাবতই এ ছন্দের যুগ্মধ্বনিগুলিকে টেনে দীর্ঘ ক'রে অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ ক'রে থাকি; তাই এছন্দে অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনি অনায়াসে দুই মাত্রার (moraর) মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। এবার একটা স্বরমাত্রিক ছন্দের পংক্তি উদ্ধৃত কর্‌ছি।—

বিহঙ্গ-গান | শান্ত এখন | স্তব্ধ রাতের | পক্ষ-ছায়ে

—বিজয়ী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটা কি ছন্দ? যুগ্মধ্বনিগুলিকে সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ ক'রে এ পংক্তিটিকে আমার স্বরবৃত্তের ভঙ্গীতে আবৃত্তি কর্‌তে পারি। তাহ'লে এটি হবে চতুঃস্বর-পর্ব্বিক স্বরবৃত্ত ছন্দ। আবার যুগ্মধ্বনিগুলিকে টেনে দীর্ঘ বা বিশ্লিষ্ট (অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক) ক'রে মাত্রাবৃত্তের ভঙ্গীতেও এ পংক্তিটিকে আবৃত্তি করা যায়। যেমন—

বিহঙ্গ-গান | শান্ত এখন | স্তব্ধ রাতের | পক্ষ-ছায়ে

এ ভাবে আবৃত্তি কর্‌লে এটিকে বল্‌ব ষণ্মাত্র-পর্ব্বিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যে-সব ছন্দকে এ ভাবে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট) দুই ভঙ্গীতেই আবৃত্তি করা যায় সে-সব ছন্দকেই আমি স্বর-মাত্রিক ছন্দ নাম দিয়েছি। এই পংক্তিটি হচ্ছে চতুঃস্বর-ষণ্মাত্র-পর্ব্বিক স্বর-মাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত।

এবার একটি যৌগিক ছন্দের বিশ্লেষণ করা যাক্।—

মানবের | জীর্ণ বাক্য ‖ মোর ছন্দ | দিবে নব | সুর

—ভাষা ও ছন্দ, কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিটি বাঙালী পাঠক স্বভাবতই যে-ভঙ্গীতে আবৃত্তি করে তার প্রতি লক্ষ্য কর্‌লেই দেখ্‌তে পাব যে, এ ছন্দে শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট আর শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট; কাজেই শব্দ মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি এক unit ব'লে গণ্য হয়েছে আর শব্দান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি দুই unitএর মর্য্যাদা পেয়েছে। এইটেই হচ্ছে এছন্দের সাধারণ রীতি; আর এজন্যেই এছন্দকে নাম দিয়েছি যৌগিক ছন্দ। বাংলায় ব্যঞ্জন সংহতিকে সাধারণত' যুক্তবর্ণের সাহায্যেই লেখা হ'য়ে থাকে। ওই যুক্তবর্ণকে যদি বিযুক্ত ক'রে লেখা যায় তাহ'লেই যৌগিক ছন্দের এই সাধারণ-রীতিটি আরও স্পষ্ট হবে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সুরাঙ্‌গণা নন্‌দনের্ ‖ নিকুঞ্‌জ প্রাঙ্‌গণে
মন্‌দার্ মঞ্‌জরী তোলে ‖ চঞ্‌চল্ কঙ্‌কণে।

—'পরিচয়', ১৩৩৮-মাঘ, রবীন্দ্রনাথ

এখানে যুক্তবর্ণগুলিকে বিযুক্ত ক'রে লেখা হয়েছে অর্থাৎ যুগ্মধ্বনিগুলিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। আমরা এ পংক্তি-দুটিকে স্বভাবতই যে-ভাবে আবৃত্তি করি তার প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌লেই দেখা যাবে যে এখানে শব্দ প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিগুলির (যথা—নের্, দার্, চল্) উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট ও কাজেই দ্বিব্যষ্টিক; আর শব্দ মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিগুলির (যথা—রাঙ্, নন্, কুঞ্, প্রাঙ্, ইত্যাদি) উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট ও এক ব্যষ্টিক।

৪

যৌগিক ছন্দের এই নিয়মটি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশেষ ভাবে অনুভব করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যেই আছে। তিনি লিখেছেন "বাংলায় হসন্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ ক'রে টেনে পরবর্ত্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ ক'রে থাকি। * * বাংলা ছন্দে প্রাক্-হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবী দেওয়া হয়েচে" (বিচিত্রা, পৌষ)। এ নিয়মটির কথাই তো আমি বল্‌ছি। আমি শুধু এটুকু যোগ কর্‌তে চাই যে, এ নিয়মটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সর্ব্বত্রই খাটে বটে; কিন্তু যৌগিক ছন্দে এ নিয়মটি শুধু শব্দ প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির পক্ষেই খাটে, শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির পক্ষে খাটে না। যেমন কঙ্কণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এ শব্দটির উচ্চারণ হবে এরূপ—কঙ্ কণ্, এবং শব্দটিকে চার unit ব'লে গণনা করা হবে; কারণ এখানে দুটি যুগ্মধ্বনির প্রত্যেকটিরই উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট এবং কাজেই দ্বিমাত্রিক। দৃষ্টান্ত—

বন্ধ দুয়ার | খুলেছো আমার | কঙ্কণ-ঝঙ্ | কারে
—লীলাসঙ্গিনী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু যৌগিক ছন্দে 'কঙ্কণ' কথাটির উচ্চারণ হবে এরূপ—কঙ্‌কণ্, অর্থাৎ এ ছন্দে এ শব্দের প্রথম উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট আর কাজেই তার মূল্য এক unit; কিন্তু দ্বিতীয় যুগ্মধ্বনিটির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট, অতএব তার মূল্যও দুই unit। অর্থাৎ যৌগিক ছন্দে 'কঙ্কণ' শব্দটি তিন unit-এর বেশি মূল্য পায় না। যথা—

পিত্তল-কঙ্কণ

পিতলের থালি'পরে বাজে ঠন্ ঠন্।
—দিদি, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ

লক্ষ্য করার বিষয় এ ছন্দে 'কঙ্কণ' শব্দটিতে তিন unit ধরা হয়েছে বটে, কিন্তু 'ঠন্ ঠন্' কথা-দুটিতে ধরা হয়েছে চার unit। কারণ 'কঙ্কণ' একটি অখণ্ড শব্দ; তাই তার প্রথম যুগ্মধ্বনিটি উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট ও ধ্বনিমর্য্যাদায় এক unit; কিন্তু "ঠন্ ঠন্" দুটি স্বতন্ত্র শব্দ ব'লে দুটি যুগ্মধ্বনিই উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট এবং ধ্বনিমর্য্যাদায় দুই unit। শব্দটা যদি হ'তো 'ঠঠন্' তাহ'লে তার প্রথম যুগ্মধ্বনিটা সংশ্লিষ্ট হ'য়ে গিয়ে এক unit-এর বেশি মূল্য পেতো না এবং সমগ্র শব্দটা 'কঙ্কণ' শব্দের মতোই সবসুদ্ধ তিন unit ব'লে গণ্য হ'তো। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পংক্তিটাকে একটু পরিবর্ত্তিত ক'রে যদি লেখা হয় "পিতলের থালি পরে বাজিছে ঠন্ ঠন্" তাহ'লেই একথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

যৌগিক ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট হ'বার কারণ এই যে, ওই ছন্দটাই আসলে গদ্যধর্ম্মা। গদ্যের মতো প্রত্যেকটি শব্দকেই স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারণ করার প্রয়োজন ওই ছন্দের আছে। তাই ওছন্দে ধ্বনির প্রবাহ একেবারে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয় না; এছন্দে ধ্বনিপ্রবাহ প্রত্যেকটি শব্দের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার ক'রে চলে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেও আমার এই উক্তির সমর্থন পাই। তাঁর উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বিষয়টা বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ছি।—

মহাভারতের্ কথা ॥ অমৃত সমান্
কাশীরাম্ দাস্ কহে ॥ শুনে পুণ্যবান্।

এখানে তের্, মান্, রাম্, দাস্ এবং বান্ এই পাঁচটি যুগ্মধ্বনিরই বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ, কেননা এরা শব্দের অন্তে অবস্থিত আছে। এছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করার প্রয়োজন এই যে, এছন্দে প্রত্যেক শব্দকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্ররূপে উচ্চারণ কর্‌তে হয়। এক শব্দকে অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া চলে না। তাই কেউ 'মহাভারতেকথা' কিংবা 'দাস্কহে' এভাবে আবৃত্তি করে না। বাঙালী বরাবর সহজেই 'মহাভারতের্ কথা' এবং "দাস্ কহে" প'ড়ে এসেছে—অর্থাৎ 'তে'-র একারকে এবং 'দা'-এর আকারকে টেনে দীর্ঘ ক'রে, বিশ্লিষ্ট বা দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ ক'রে, শব্দগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। এই হ'লো এছন্দের অর্থাৎ যৌগিক

ছন্দের একটি নিয়ম। তার দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে যে-স্থলে এক শব্দকে অন্য শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করার প্রয়োজন থাকে না সে-স্থলে (অর্থাৎ শব্দের মধ্যে) যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট হ্রস্ব উচ্চারণই হ'য়ে থাকে। যেমন, পুণ্যবান্। এখানে 'বান্' এই যুগ্মধ্বনিটা শব্দের অন্তে আছে ব'লে এর বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক—বান্—উচ্চারণ হচ্ছে। কিন্তু পুণ্ যুগ্মধ্বনিটা শব্দের অন্তে নয়, তাই তার সংশ্লিষ্ট বা সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ এবং তার মূল্যও এক unit। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাঙালী পাঠক "পুণ্যবান্" কথাটার 'পুণ্যের' মাত্রা কমিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করে নি" (উত্তরা—১৩৩৮, আশ্বিন, পৃঃ ৩১৫ দ্রষ্টব্য)। যৌগিক ছন্দে 'পুণ্যবান্' কথাটার প্রথম যুগ্ম-ধ্বনিটাকে ('পুণ্'-কে) আমরা ঠেসে সংশ্লিষ্ট বা সংক্ষিপ্ত ক'রে উচ্চারণ করি, তাই তার ধ্বনিমূল্য এক unit; আর দ্বিতীয় যুগ্মধ্বনিটাকে ('বান্'-কে) আমরা টেনে দীর্ঘ বা বিশ্লিষ্ট ক'রে উচ্চারণ করি, তাই তার ধ্বনিমূল্য দুই unit। এইটেই এ ছন্দের রীতি; আর এজন্যেই এছন্দকে যৌগিক ছন্দ নাম দিতে চাই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মতভেদ আছে ব'লে আমি মনে করিনে।

স্বরবৃত্ত (syllabic) ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ সর্ব্বত্রই সংক্ষিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট আর মাত্রাবৃত্ত (quantitative) ছন্দে যুগ্মধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট। যেমন—

পুণ্যখাতায় | জমা শূন্য, | ভণ্ডামীতে | চারটি পোয়া
—বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া, মধুসূদন

এটি স্বরবৃত্ত ছন্দ। এখানে 'পুণ্য' এবং 'শূন্য' উভয় শব্দেই যুগ্মধ্বনির (পুণ্ এবং শূন্) সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ। কিন্তু—

পুণ্যলোভীর। নাই হ'লো ভীড়। শূন্য তোমার। অঙ্গনে

এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। এখানে ওই দুটি যুগ্মধ্বনিরই বিশ্লিষ্ট বা দুই মাত্রার উচ্চারণ।

কাশীরাম দাস কহে॥ শুনে পুণ্যবান্

এখানে পুণ্-এর উচ্চারণ এক unit-এর অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বান্-এর উচ্চারণ বিক্ষিপ্ত। অতএব এটি যৌগিক ছন্দ।

৫

যৌগিক ছন্দের এই রীতিটির কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবে খুলে না বল্‌লেও এবিষয়ে তাঁর মত ও আমার মতের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাঁর রচিত দৃষ্টান্ত গুলিই উদ্ধৃত কর্‌ছি:—

(১) টোট্‌কা এই। মুষ্টিযোগ॥ লট্‌কানের। ছাল,
সিট্‌কে মুখ। থাবি, জ্বর॥ আট্‌কে যাবে। কাল।
(২) একুটি কথা। শুনিবারে॥ তিন্‌টে রাত্রি। মাটি।
এর পরে। ঝগ্‌ড়া হবে,॥ শেষে দাঁত ক-। পাটি॥
(৩) একুটি কথা। শোনো, মনে॥ খট্‌কা নাহি। রেখে,
টাট্‌কা মাছ। নাই জোটে॥ সুট্‌কি দেখো। চেখে।

তিনি লিখেছেন এই "তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুণতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায় কিন্তু তাই ব'লেই যে পয়ার ছন্দের নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয় এটা যথেচ্ছাচার কিন্তু হিসাব ক'রে দেখ্‌লেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয় নি।" আমিও অবিকল এই কথা বলেছি। 'অক্ষর' গুনে কোনো ছন্দেরই পরিমাপ করা যায় না; কারণ "ধ্বনি-বিচারহীন 'অক্ষর' সংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হ'তে পারে না"। তাই উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তিনটিতে কোনো প্রকার 'যথেচ্ছাচার' হয়েছে ব'লে আমি মনে করিনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'হিসাব' করলেই দেখা যাবে এই ছড়া-তিনটিতে পয়ার ছন্দের 'নীতি' নষ্ট করা হয় নি, তার 'নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি' বেড়ে যায় নি। কিন্তু পয়ার ছন্দের নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি এবং নীতি কি, আর কি ভাবে তার 'হিসাব' করতে হবে সে-বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নি।

এ ছন্দের নীতি, নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি এবং তার হিসাব-প্রণালী সম্বন্ধে আমি যে নিয়মের উল্লেখ করেছি, সে-নিয়মটিকে এই দৃষ্টান্ত তিনটিতে প্রয়োগ করলেই দেখা যাবে যে এগুলিতে যৌগিক ছন্দের নিয়ম সর্ব্বত্রই অক্ষুণ্ণ আছে।—

(১) টোট্‌কা এই্। মুষ্টিযোগ্॥ লট্‌কানের। ছাল্
সিট্‌কে মুখ্। থাবি, জ্বর্॥ আট্‌কে যাবে। কাল্

(২) একটি কথা। শুনিবারে॥ তিনটে রাত্রি। মাটি।
এর্ পরে। ঝগ্ড়া হবে,। শেষে দাঁত্‌ক-। পাটি॥

(৩) একটি কথা। শোনো, মনে॥ খট্‌কা নাহি। রেখে,
টাট্‌কা মাছ্। নাই্ জোটে॥ শুঁট্‌কি দেখো। চেখে।

লক্ষ্য করার বিষয় শব্দ-মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি সর্ব্বত্রই এক unit এবং শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্ব্বত্রই দুই unit। এইটেই আমার কথিত যৌগিক ছন্দের নিয়ম। "লট্‌কানের ছাল"—এখানে 'লট্' যুগ্মধ্বনিটা শব্দমধ্যবর্ত্তী ব'লে তার উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত এবং তার ধ্বনিমূল্য এক unit। কিন্তু 'নের্' যুগ্মধ্বনিটার উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট নয়, কারণ আমরা 'লট্‌কানের্‌ছাল' এরকম আবৃত্তি করিনে; তাই তার উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট এবং তার ধ্বনিমূল্য দুই unit। তেমনি 'মুষ্‌টি যোগ্' কথাটার 'মুষ্' সংশ্লিষ্ট এবং এক unit আর 'যোগ্' বিশ্লিষ্ট ও তাই দুই unit। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(৪) পাৎলা করি। কাটো। প্রিয়ে॥ কাৎলা মাছ্-। টিরে
টাট্‌কা তেলে। ফেলে দাও্॥ শর্ষে আর্। জিরে,
ভেট্‌কি যদি। জোটে তাহে॥ মাখো লঙ্কা। বাঁটা,
যত্ন ক'রে। বেছে ফেলো॥ টুক্‌রো যত। কাঁটা।

(৫) আই্‌ডিয়াল্। নিয়ে থাকে,॥ নাসি চড়ে। হাঁড়ি,
প্র্যাক্‌টিক্যাল্। লোকে বলে॥ এ যে বাড়া-। বাড়ি।
শিবনেত্র। হোলো বুঝি,॥ এই্ বার। মোলো,
অক্‌সিজেন্। নাকে দিয়ে॥ চাঙ্গা ক'রে। তোলো,

(৬) কর্ণে দিলা। ঝুম্‌কা ফুল্॥ নাসিকায়্। নথ্
অঙ্গ-সজ্জা। সমাধানে॥ ভূরি মেহন্-। নৎ

যৌগিক ছন্দের যে 'নীতি' এবং তার নির্দ্দিষ্ট ধ্বনির যে 'হিসাবে'র কথা আমি বলেছি তাতে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির ছন্দ নিখুঁত আছে। ওই হিসাবে সবগুলি দৃষ্টান্তেরই প্রতি পংক্তি পর্ব্বে চারটি unit বা ধ্বনিব্যষ্টি আছে। সুতরাং বল্‌তে পারি যে এ দৃষ্টান্তগুলি চতুর্ব্যষ্টি-পর্ব্বিক যৌগিক ছন্দে রচিত হয়েছে। উক্ত 'হিসাব' ছাড়া অন্য কোনো হিসাবেই এ ছন্দের ধ্বনির পরিমাপ করা যাবে না ব'লেই আমি মনে করি। এই হিসাব ছাড়া আর কোন্ হিসাবে আই্‌ডিয়াল্, প্র্যাক্‌টিক্যাল্, অক্‌সিজেন্, মকা ঝুমুকুল্ প্রভৃতি শব্দে চার unit গণনা করা যাবে?

৬

এবার যৌগিক ছন্দের ওই নিয়মটির ব্যতিক্রমগুলির বিচার করা যাক্। উদ্ধৃত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে "তিনটে রাত্রি। মাটি" না লিখে যদি লেখা হ'তো "তিন্‌টে রাত্। মাটি" তাহ'লেও ওই নিয়ম অনুসারেই ছন্দ ঠিক্ থাকত, কেননা তখন 'রাত্' এই যুগ্মধ্বনির বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দুই মাত্রার উচ্চারণ হ'তো। কিন্তু চতুর্থ দৃষ্টান্তের "মাছ্‌টি" শব্দের ধ্বনি বিচার কি ভাবে করা যাবে? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

পাৎলা করি'। কাটো প্রিয়ে॥ কাৎলা মাছ-। টিরে

এখানে যৌগিক ছন্দের নিয়ম অব্যাহতই আছে, কেননা 'মাছ্' এই যুগ্মধ্বনিটাতে দুই মাত্রা রয়েছে। আমি যদি এই পংক্তিটাকে একটু পরিবর্ত্তিত ক'রে লিখি—

পাৎলা করি'। কাৎলা মাছ্‌টি॥ কাটো দেখি। প্রিয়ে

তাহ'লেও যৌগিক ছন্দের নীতি নষ্ট হবে না। তখন 'মাছ্' এই যুগ্মধ্বনিটা উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট ও ধ্বনিমর্য্যাদায় একব্যষ্টিক ব'লে গণ্য হবে। মাঘের 'বিচিত্রা'য় আমি লিখেছিলুম

'একটু ন'ড়োনা কেউ॥ রায়েদের লাঠিয়াল কই'

এটাও-যৌগিক ছন্দ। এখানে 'এক' ধ্বনিটাতে দুই মাত্রা। যদি একটু পরিবর্ত্তিত ক'রে লেখা যায়—

একটুও ন'ড়োনা কেউ

তাহ'লে 'এক্' শব্দটার ধ্বনিমর্য্যাদা ক'মে যাবে। অথচ ছন্দের নীতি ঠিক্‌ই থাক্‌বে। এটা কি ক'রে হ'তে পারে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার আশ্বিনের 'উত্তরা'য় সে-প্রশ্ন তুলেছেন। মাঘের 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ সে-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর উত্তর হচ্ছে এই যে, "বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হ'য়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টান্‌লে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে"। এই নিয়ম অনুসারে "কাৎলা মাছ্‌টিরে" এখানে 'মাছ্' ধ্বনিটাকে 'টেনে' বাড়ানো অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক করা হয়েছে। আবার "কাৎলা মাছ্‌টি" এখানে 'মাছ্' ধ্বনিটাকে 'ঠেসে' দিয়ে তার মাত্রা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তেম্‌নি, "একটু ন'ড়োনা কেউ" এখানে 'এক্' ধ্বনিটাকে টেনে (অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ ক'রে) বাড়ানো হয়েছে, তাই এখানে দুমাত্রা। আবার, "এক্‌টুও ন'ড়োনা কেউ" এখানে 'এক্' ধ্বনিটাকে ঠেসে (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ক'রে) কমানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথিত এই নিয়মটির সত্যতা সম্বন্ধে কারও সংশয় থাক্‌তে পারে না। বাংলা যুগ্মধ্বনির এই স্থিতিস্থাপকতার কথা আমি বহুবার বলেছি।

কিন্তু তথাপি একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে যৌগিক ছন্দে কি সর্ব্বত্রই সমস্ত যুগ্মধ্বনিকেই নির্ব্বিচারে টেনে বাড়ানো এবং ঠেসে কমানো যায়? আমার বিশ্বাস তা যায় না। এছন্দে যুগ্মধ্বনিকে টেনে বাড়ানো এবং ঠেসে কমানোর একটি বিশেষ নিয়ম আছে। সেটি হচ্ছে এই। শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে সর্ব্বদাই টেনে বাড়ানো হয়, কখনোই ঠেসে কমানো যায় না। আবার শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিকে অধিকাংশ স্থলেই ঠেসে কমানো হ'য়ে থাকে; তবে ক্বচিৎ কখনও কখনও টেনে বাড়ানোও যায়। যেমন "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্" এখানে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে (রাম্, দাস্ এবং বান্) টেনে বাড়ানোই হয়েছে আর শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনি 'পুণ্'কে ঠেসে কমানোই হয়েছে। এইটেই এছন্দের সাধারণ রীতি।

শব্দমধ্যস্থিত যুগ্মধ্বনিকে কোথায় কোথায় টেনে বাড়ানো যায়, সেইটেই আসল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর এই। (১) সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে কখনও টেনে বাড়ানো হয় না। (২) সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রথম পদের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে বাড়ানো কমানো যায়। (৩) অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে টেনে বাড়ানো কিংবা ঠেসে কমানো যায়। (৪) অ-সংস্কৃত প্রত্যয় পরে থাক্‌লে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে সাধারণত টেনে বাড়ানোই হয় এবং ইচ্ছে কর্‌লে ঠেসে কমানোও যায়।

৭

দৃষ্টান্ত দিলেই এই নিয়ম চারটির সার্থকতা বোঝা যাবে। প্রথমেই চতুর্থ নিয়মটির আলোচনা করা যাক্। এক, তিন, মাছ, এগুলি একেকটি যুগ্মধ্বনিমূলক শব্দ। যৌগিক ছন্দে এগুলি সর্ব্বদাই দুই মাত্রা ব'লেই গণ্য হয়। কিন্তু এসব শব্দের পরে যদি টি, টে, টু, টুকু, লা ইত্যাদি প্রত্যয় থাকে তবে এই যুগ্মধ্বনিগুলিকে বিকল্পে ঠেসে কমিয়ে দেওয়া যায়। তাই 'একটু' 'মাছটি' 'দিনটা' প্রভৃতি শব্দকে যৌগিক ছন্দে তিন unit ব'লেও গণ্য করা যায়, আবার ইচ্ছে কর্‌লে দুই unit ব'লেও চালানো যায়। অর্থাৎ ছন্দ-রচয়িতা ইচ্ছে কর্‌লে "এক্-টু" কথাটির 'এক' শব্দ এবং 'টু' প্রত্যয়কে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র রেখে সমগ্র কথাটিকে তিন unit ব'লে গণ্য করতে পারেন। আবার ইচ্ছে কর্‌লে তিনি 'একটু' কথাটিকে একটি অখণ্ড শব্দ-রূপে গণ্য ক'রে তাকে দুই unit এর মূল্য দিতে পারেন। এই অ-সংস্কৃত প্রত্যয়টি যদি একাধিক স্বর অর্থাৎ সিলেবল্-বিশিষ্ট হয় তবে ওই প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ্মধ্বনিটিকে সাধারণত ঠেসে কমানো হয় না। যথা—দিনগুলি। এখানে 'দিন্' এই যুগ্মধ্বনিটাকে টেনে বাড়িয়ে দুই unit এর মর্য্যাদা দেওয়াই সাধারণ রীতি এবং 'দিনগুলি' শব্দটাতে সবসুদ্ধ চার unit ধরা হয়। কিন্তু যদি 'দিন্' ধ্বনিটাকে ঠেসে কমিয়ে দেওয়াই অভিপ্রায় হয় তবে তাও করা যায় ব'লে আমার বিশ্বাস। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

॥
যৌবন-বেদনা-রসে ॥ উচ্ছল আমার দিনগুলি
— তপোভঙ্গ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'দিন্' ধ্বনিটাকে টেনে অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট ক'রে উচ্চারণ করা দরকার; তাই ওই ধ্বনিটার মূল্য দুই unit বা বাটি। কিন্তু যদি আমি লিখি,—

দুঃখের দিনগুলি মোর ॥ গিয়াছে কাটিয়া

তাহ'লেও ছন্দের নীতি নষ্ট হবে ব'লে মনে করিনে। কিন্তু এখানে 'দিন' ধ্বনিটাকে ঠেসে ছোট ক'রে উচ্চারণ করতে হবে।

এবার পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় নিয়মটির আলোচনা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথের রচিত দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলেই বোঝাবার পক্ষে সুবিধে হবে।—

(১) চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাক্‌রুণ।

(২) চিম্‌নি ফেটেচে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাক্‌রুণ মোর নাই কোনো দোষ।

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে 'চিম্‌নি' শব্দের 'চিম্' যুগ্মধ্বনিতে এক unit এবং 'ঠাক্‌রুণ' শব্দের 'ঠাক্' যুগ্মধ্বনিতে দুই unit। দ্বিতীয়টিতে 'চিম্'কে বাড়িয়ে দুই unit এবং 'ঠাক্'কে খর্ব্ব ক'রে এক unit করা হয়েছে। বাংলা যৌগিক ছন্দে অ সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে এভাবে বাড়ানো কমানো যায়, একথা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু প্রশ্ন হ'তে পারে 'চিম্‌নি' শব্দে দুই unit এবং তিন unit ধরা, কোন্‌টা এ ছন্দের সাধারণ নিয়ম (rule) এবং কোন্‌টা ব্যতিক্রম (exception)? আমি বলি 'চিম্‌নি' শব্দে দুই unit এবং 'ঠাক্‌রুণ' শব্দে তিন unit ধরাই এছন্দের 'সাধারণ' বিধি এবং ওই শব্দ দুটিতে যথাক্রমে তিন unit এবং চার unit ধরা এছন্দের পক্ষে 'বিশেষ' বিধি। অর্থাৎ যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে ঠেসে সংক্ষিপ্ত ক'রে এক unit ধরাই সাধারণ রীতি এবং তাকে টেনে দীর্ঘ ক'রে দুই unit ধরা বিশেষ রীতি। শুধু তাই নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে, শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে টেনে দীর্ঘ বা আয়ত করা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। সুতরাং যৌগিক ছন্দের কোনো পর্ব্বে যদি শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির আয়ত রূপ দেখ্‌তে পাই তবে বলব যে ওই পর্ব্বটি মাত্রিক (quantitative) পদ্ধতিতে রচিত। ইংরেজি ছন্দে এরূপ ব্যতিক্রম প্রায়ই দেখা যায়। যেমন trochaic ছন্দে মাঝে মাঝে dactylic foot বা পর্ব্ব দেখা যায়; iambic ছন্দে কখনও কখনও দুয়েকটা anapæstic foot ও চালিয়ে দেওয়া যায়। তেমনি বাংলা যৌগিক ছন্দেও মধ্যে মধ্যে মাত্রিক পর্ব্বের অদল-বদল (equivalent substitute) চলে। পূর্ব্বোক্ত প্রথম দৃষ্টান্তের 'নেই ঠাক্‌রুণ' পদটিকে বল্‌ব যৌগিক ছন্দে মাত্রিক substitute। তেম্‌নি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'চিম্‌নি ফেটেচে দেখে' পদটি মাত্রিক। যদি লেখা হয়—

চিম্‌নি ফেটেচে দেখে গিন্নি সরোষ

তাহ'লে বল্‌ব সমস্ত পংক্তিটাই মাত্রিক বা মাত্রাবৃত্ত অর্থাৎ quantitative ছন্দে রচিত হয়েছে।

কুস্তির আখ্‌ড়ায় ভিস্তিকে ধ'রে
জল ছিটাইয়া দাও ধুলা যাক্ মরে।

এই পংক্তি দুটি আগাগোড়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এটা পয়ার বটে; কিন্তু মাত্রাবৃত্ত পয়ার, যৌগিক পয়ার নয়। এর প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা বা mora আছে।

রাস্তা দিয়ে | কুস্তিগির ॥ চলে ঘেঁষা | ঘেঁষি
একটা নয় | দুটো নয় ॥ এক-শোর | বেশি।

এটি যৌগিক পয়ার। কিন্তু—

খুব তার বোলচাল সাজ ফিট্‌ফাট্,
তক্‌রার হ'লে আর নাই মিট্‌মাট্।
চষ্‌মায় চম্‌কায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এটিকে কখনোই সাধারণ (অর্থাৎ যৌগিক) পয়ার বলা যায় না। একে পয়ারের 'ছিব্‌লেমি' বল্‌লেও চল্‌বে না। এর আসল রূপে হচ্ছে মাত্রিক; অর্থাৎ quantitative পয়ার বল্‌লে এর আসল পরিচয় দেওয়া হয়। ধ্বনির পরিমাণ বা quantityর মাপ রক্ষা ক'রে এখানে সর্ব্বত্রই যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার (moraর) মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। এবং এর প্রতি পর্ব্বেই চার মাত্রা রয়েছে।

একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে, কথা যেন বন্যা ছোটে
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

এখানে "কথা যেন বন্যা ছোটে" শুধু এই পদটিতে যৌগিক ছন্দের নীতি আছে; অন্য সর্ব্বত্রই মাত্রিক প্রকৃতি অব্যাহত আছে। যদি লেখা হ'তো "কথার বন্যা ছোটে" তাহ'লে বল্‌তুম এই পংক্তি-কটি আগাগোড়া মাত্রাবৃত্ত (quantitative) ছন্দেই রচিত।

নবারুণ চন্দনের তিলকে
দিক্‌-ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
ঊষা এলো সুপ্রভাতে
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

এটি হ'লো খণ্ডিত যৌগিক পয়ার। রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন। একে যদি নিম্নলিখিত রূপে রূপান্তরিত করি—

নবারুণ-চন্দন-তিলকে
দিক্‌-ভাল এঁকে আজি দিল কে।
বরণ-পাত্র হাতে
এলো কে সুপ্রভাতে,
জয়শাঁখ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

তাহ'লে একে বলব খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার; এর যৌগিক রূপ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। এ দৃষ্টান্তটিতে যুগ্মধ্বনি সর্ব্বত্রই দ্বিমাত্রিক ব'লে গৃহীত হয়েছে। যদি যুগ্মধ্বনি একেবারে বর্জ্জন করা যায় তাহ'লে এ ছন্দের রূপ হবে এরকম—

অধীর বাতাস এলো সকালে,
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিনশেষে দেখি চেয়ে
ঝরা ফুল মাটি ছেয়ে
লতাকে কাঙাল ক'রে ঠকালে।

এটিকেও খণ্ডিত মাত্রিক পয়ার বলাই সঙ্গত।

৮

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক্‌। পূর্ব্বোক্ত চারটি নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে এই—সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রথম পদের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে বিকল্পে বাড়ানো কমানো যায়। দৃষ্টান্ত দিলেই এ বিষয়ে সংশয় থাক্‌বে না। যথা—

(১) সেই নির্ঝরিণী ধারা রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
'দিগ্দিগন্তে' প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা।
—পরিচয়, মাঘ, রবীন্দ্রনাথ

(২) নবারুণ চন্দনের তিলকে
'দিক্‌-ললাট' এঁকে আজি দিল কে।
—ঐ

(৩) উদয়-'দিক্‌প্রান্ত'-তলে নেমে এসে
—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই তিনটি দৃষ্টান্তেই 'দিক্‌' এই যুগ্মধ্বনিটার উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত; তাই তার মূল্য এক unit মাত্র। কিন্তু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে 'দিক্‌' ধ্বনিটার উচ্চারণরূপ বিশ্লিষ্ট ও আয়ত এবং তার মূল্যও দুই unit।—

(১) কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্ত্তেকে 'দিক্‌-দিগন্তর'
করি' অন্তরাল
—বর্ষশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

(২) কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে
ওগো 'দিক্‌ভ্রান্ত' পান্থ, তৃষার্ত নয়ানে
লুব্ধ বেগে!
—মরীচিকা, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

(৩) ইংলণ্ডের 'দিক্‌প্রান্ত' পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে।
— ৩৯, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

(৪) চলেছে উজান ঠেলি' তরণী তোমার,
'দিক্‌প্রান্তে' নামে অন্ধকার।
—নববধূ, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

(৫) 'দিক্‌প্রান্তে' তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।
—প্রত্যাগত, ঐ

'দিক্‌চক্র' 'দিগ্‌গজ' প্রভৃতি অন্যান্য শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। কিন্তু দিগ্বধূ, দিগ্বলয়, প্রাক্তন প্রভৃতি যে-সব সমাসবদ্ধ শব্দে প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হ'য়ে যায় সে-সব শব্দের প্রথম পদের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনিটিকে যৌগিক ছন্দে কখনও টেনে বাড়িয়ে দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া হয় না। যথা—

(১) জন্ম মরণের
'দিগ্বলয়'-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের।
—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(২) পশ্চিম 'দিগ্বধূ' দেখে সোনার স্বপন
—পরশ পাথর, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

সমাসবদ্ধ শব্দের সংযোগস্থলস্থ যুগ্মধ্বনির বৈকল্পিক দীর্ঘ-হ্রস্বতার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।—

(১) জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
—শা-জাহান, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

(২) হরিণের থর থর হৃৎপিণ্ড যেমন
—পদধ্বনি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(৩) ধ্বনিয়া উঠুক্ তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী
—নববর্ষ, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

(৪) আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
—উৎসবের দিন, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই চারটি দৃষ্টান্তেই 'মৃৎ' এবং 'হৃৎ' উচ্চারণের আকারে সংক্ষিপ্ত এবং ধ্বনিমর্যাদায় এক unit। কিন্তু—

(১) হৃৎপাত্রে রক্ত দিয়া লিখিয়াছে অন্তহীন প্রেম-পত্র তার
—কালস্রোত, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব

(২) আমাদেরি হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হবে জ্বলন্ত শলাকা
—কোনো বন্ধুর প্রতি, ঐ

(৩) প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি, হৃৎ-পত্রে প্রেমের স্বাক্ষর
—মোহমুক্ত, ঐ

এই তিনটি দৃষ্টান্তেই 'হৃৎ' উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট এবং ধ্বনিমর্যাদায় দুই unit। তেমনি জগৎ-বিখ্যাত, তড়িৎ-চকিত, বিদ্যুৎ-দীপ্ত প্রভৃতি বহু শব্দেরই সংযোগস্থলস্থিত যুগ্মধ্বনিটিকে বিকল্পে দীর্ঘ-হ্রস্ব করা যায়। শুধু যে ব্যঞ্জন-সন্ধির ফলেই এমন হয় তা নয়, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিই তার প্রমাণ। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ-চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।
—একাল ও সেকাল, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'তড়িৎ' কথাটিতে তিন unit। কিন্তু—

তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিলো নামি'
—শিবাজী-উৎসব, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'তড়িৎপ্রভা' শব্দের 'তড়িৎ' দুই unit-এর বেশী মূল্য পায় নি। যদি লেখা হ'তো 'তড়িৎপ্রভায়' তাহ'লেও অর্থাৎ 'তড়িৎ'কে তিন unit-এর মর্যাদা দিলেও খারাপ শোনাতো না। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।—

আঁকি' দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্বহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা।
—শিবাজী উৎসব, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'দিগ্‌দিগন্তে' শব্দের প্রথম পদান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিটির মূল্য এক unit বটে; কিন্তু 'বিদ্যুদ্বহ্নি' শব্দের প্রথম পদান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে দুই unit-এর মূল্য দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে
— তপোভঙ্গ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানেও 'বিদ্যুৎ' শব্দে তিন unit। যদি লেখা যায়—

বিদ্যুদ্বহ্নি সর্পসম হানে ফণা যুগান্তের মেঘে

অর্থাৎ যদি 'বিদ্যুদ্' শব্দের শেষ যুগ্মধ্বনিটিকে সংশ্লিষ্ট ক'রে তার ধ্বনিমর্যাদা এক unit কমিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লেও ছন্দের নীতি নষ্ট হবে না।

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।
—বর্ষশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

যদি 'বিদ্যুৎ' শব্দের অন্তিম যুগ্মধ্বনিটির মাত্রাসঙ্কোচ ক'রে লেখা যায় "বিদ্যুদ্দীর্ণ মহাশূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়" তাহ'লেও যৌগিক ছন্দের রীতি লঙ্ঘিত হ'তো না। আর দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আশা করি সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথমপদান্তস্থিত যুগ্মধ্বনির বৈকল্পিকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই। অতএব বাগ্‌দত্তা, বাগ্‌দেবতা, বাগ্‌বিতণ্ডা, হৃৎপদ্ম, হৃদ্‌বৃন্ত, ক্ষুৎপিপাসা প্রাঙ্‌মুখী, পরাঙ্‌মুখ প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দের সংযোগ স্থলের যুগ্মধ্বনিকে যে বিকল্পে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করা যাবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে ওসব শব্দের যুগ্মধ্বনিটিকে সঙ্কুচিত করাই যৌগিক ছন্দের সাধারণ বিধি, বিশেষত সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথম পদটী যদি একস্বরাত্মক (monosyllabic) হয়; আর ওরকম যুগ্মধ্বনিকে প্রসারিত করা হচ্ছে যৌগিক ছন্দের বিশেষ বিধি। তবে সমাসের প্রথম পদটি যদি একাধিক স্বর বা সিলেব্‌ল্ বিশিষ্ট হয় (যথা—বিদ্যুৎ, তড়িৎ, শরৎ ইত্যাদি) তাহ'লে বিশেষ বিধি অনুসারে ওই ধ্বনিটিকে প্রসারিত করলেই অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়।

৯

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এই কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে হসন্তবর্ণের (পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের) হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক্ পাঠ করতে বাঙালী পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিক্‌মতো চালনা করে।

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছেরে।

এছড়াটা পড়্‌তে গেলে বাঙালী নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড ত-এর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ ক'রে পড়্‌বে।" আবার যেমনি

পাৎলা করি কাৎলা মাছটি কাটো দেখি প্রিয়ে

এই পংক্তিটি সাম্‌নে ধরা, "অমনি প্রাক্-হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হবে না"। তাঁর একথা খুবই সত্য; কারণ ছন্দের ঝোঁকই পাঠককে ঠিক্ পথে চালনা করে। এ বিষয়ে মন্তব্য করার পূর্ব্বে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

টুন্‌টুনি কহিলেন—রে ময়ূর তোকে
দেখে করুণায় মোর জল আসে চোখে।

—ভার, কণিকা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'টুন্'-এর উকারকে টেনে প্রসারিত করা হয়েছে। যদি লেখা যায়—

টুন্‌টুনি কহেন ডাকি'—রে ময়ূর তোকে

তাহ'লে 'টুন্'-এর উকারকে ঠেসে সঙ্কুচিত করতেও কোনো বাধা নেই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—

মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি' উঠে—হিং টিং ছট!"

—হিং টিং ছট, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'উৎ'-এর উ-কে ঠেসে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। তাকে টেনে দীর্ঘ করতেও বাধা নেই। যথা—

মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উৎকট

আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কেননা ছুটাবো তেজে সন্ধানের রথ
দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্‌গা পাশে?

—সবলা, মহুয়া রবীন্দ্রনাথ

কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।

—কুরচি, বনবাণী, রবীন্দ্রনাথ

যে-আলোক আল্‌গোছে ঘুমের ঘোম্‌টাটুকু
তুলে নিয়ে যায়

—অমিতার প্রেম, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব

এখানে 'বল্‌গা' শব্দের যুগ্মধ্বনিটা সংশ্লিষ্ট, কিন্তু 'কুরচি,' 'আল্‌গোছে' এবং 'ঘোম্‌টা' শব্দের যুগ্মধ্বনিগুলি বিশ্লিষ্ট; পাঠকরা তাই স্বতই ছন্দের ঝোঁকে প্রাক্‌হসন্ত স্বরগুলিকে টেনে দীর্ঘ ক'রে পড়বে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পয়ারে (অর্থাৎ যৌগিক পয়ারে) 'এক্‌টি' শব্দকে তিন মাত্রার মর্যাদা যদি দাও তবে ওর হসন্ত

হরণ ক'রে অত্যাচারের দ্বারাই সেটা সম্ভব হয়।" অর্থাৎ যৌগিক বা সাধারণ পয়ারে 'একটি' শব্দকে "দ্বৈমাত্রিক ব'লে ধরতেই হবে" (উত্তরা, আশ্বিন, পৃঃ ৩১৭)। কিন্তু মাঘের 'পরিচয়ে' তিনি নিজেই দেখিয়েছেন যে, 'একটি' শব্দের হসন্ত হরণ না ক'রেও বিনা অত্যাচারেই, কেবলমাত্র ক্-এর পূর্ব্ববর্ত্তী একারকে টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ ক'রেই, 'একটি' শব্দকে তিন মাত্রার মর্যাদা দেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের এই দুই উক্তি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যৌগিক ছন্দে অর্থাৎ সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ক'রে এক unit ধরাই এ ছন্দের 'সাধারণ' রীতি; তবে অবস্থাবিশেষে তাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দুই unit এর মর্যাদা দেওয়াও চলে। আর এজন্যেই "একটি কথা এখনো হয় কলুষিত', 'একটি কথা শুনিবারে তিনটে রাত্রি মাটি' প্রভৃতি পদে 'একটি' শব্দে দুই unit ধরা হয়, অথচ 'একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি' কিংবা

> কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
> নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ
>
> —শা-জাহান, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

প্রভৃতি পদে 'একটি' শব্দে তিন unit ধরতেও আপত্তি নেই।

> ইচ্ছা করে অবিরত
> আপনার মনোমত
> গল্প লিখি একেক্‌টি করে।
>
> —বর্ষাযাপন, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'একেক্‌টি' শব্দে চার বাষ্টি ধরা হয়েছে। যৌগিক ছন্দের সাধারণ বিধি অনুসারে এ শব্দটিতে তিন বাষ্টিও ধরা যেত। এশব্দটি এখানে "কেবলমাত্র অক্ষর-গণনার দোহাই দিয়ে মান বাড়িয়েছে" আমি একথা বল্‌তে চাইনে। কিন্তু এ শব্দটিকে "যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তাহ'লেই এছন্দের সাধারণ বিধি অনুসারে "ধ্বনির কম্‌তি ধরা পড়্‌ত" একথা বল্‌তে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমি আরও বলব যে, এখানে পাঠক স্বভাবতই দ্বিতীয় একারটীকে দীর্ঘ উচ্চারণ ক'রে ওই 'ধ্বনির কম্‌তি'টা পূরণ ক'রে দেবে। অর্থাৎ ওই পদটা এই ছন্দে নিজের জোরে যতটা মর্য্যাদা দাবি করতে পারে তা তিন unitএর বেশি নয়: পাঠক আর এক unit যোগ ক'রে দিলে তবে সে চার unit এর মর্যাদা পাবে। এখানেই বলা যায়, "ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে" (বাংলা ছন্দ; সবুজপত্র —১৩২১, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯৫)। অবশ্য একথাও বলা দরকার যে, ওই বাইরের সুরটাকে আত্মসাৎ করার একটা ক্ষমতা আমাদের ভাষার আছে। যদি তার সে-ক্ষমতা না থাক্‌ত তবে বাইরে থেকে সুর যোজনা করলেও ছন্দ ঠিক্ থাক্‌ত না, কারণ তা অস্বাভাবিক হ'তো। যাহোক্, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে 'একেক্‌টি' শব্দটাকে যৌগিক ছন্দে তিন unit ব'লেও গণ্য করা যায়, চার unit ব'লেও গণ্য করা যায়।

> দিতেছি ভাসায়ে চির-প্রবাহিণী তটিনীর নীরে
> এক-একটি ক'রে মোর দিনরাত্রিগুলি
> সুগন্ধ, সুন্দরতনু এক-একটি সম্পূর্ণ পুষ্পসম।
>
> —কালস্রোত, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব

এখানে প্রথম 'এক-একটি'তে চার unit। এশব্দটির ধ্বনিরূপ হচ্ছে 'একেক্‌টি' অর্থাৎ দ্বিতীয় একারটির উচ্চারণ দীর্ঘ বা বিলম্বিত। দ্বিতীয় 'এক-একটি'তে তিন unit (এটিকে টেনে দীর্ঘ করে পাঁচ unitএ পরিণত করা সঙ্গত হবে না); এটির প্রকৃত ধ্বনিরূপ হচ্ছে 'একেক্‌টি' অর্থাৎ এর দ্বিতীয় একারটি দীর্ঘ নয়। এ দৃষ্টান্তটিতে একই শব্দকে দু'জায়গায় দুরকম মর্যাদা দেওয়া ঠিক্ হয়েছে কিনা সে-বিচার আমি করতে চাইনে।

১০

যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার সমস্ত আলোচনার সারমর্ম্ম এই। (১) এ ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি 'সর্ব্বদাই' বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈবাষ্টিক; (২) শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি 'সাধারণত' সংশ্লিষ্ট ও এক-বাষ্টিক; (৩) সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের এবং সমস্ত অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিটি বিকল্পে দীর্ঘ বা দ্বৈবাষ্টিক হয়; (৪) সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিটিকে টেনে দীর্ঘ

না করাই এ ছন্দের রীতি এবং (৫) 'অক্ষর'-সংখ্যার দ্বারা এছন্দের পরিমাপ করা অবৈজ্ঞানিক সুতরাং অবিধেয়।—

অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত

— লগ্ন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এখানে দৃশ্যত 'অক্ষর'-সংখ্যা বেড়ে গেছে, অথচ ছন্দ ঠিকই আছে। আবার আমি যদি কালিদাসের প্রতিধ্বনি ক'রে বলি—

বিষবৃক্ষ নিজে রোপি' 'স্বয়ং' ছেদন করা
নহে সমীচীন

তাহ'লে আমার উক্ত মত নিয়ে তর্ক চল্‌তে পারে, কিন্তু 'অক্ষর'-সংখ্যা কম হয়েছে ব'লে ছন্দ ঠিক্ নেই একথা বলা চল্‌তে পারে না। আমার নজির দেখাচ্ছি—

(১) দিনেরে 'মাভৈঃ' ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।

—সমাপন, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

(২) গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে 'দই য়ে'!
অম্বলের গন্ধে 'দৈ' জমিল আপনি!

—অম্বল-সম্বরা কাব্য, হসন্তিকা, সত্যেন্দ্রনাথ

(৩) 'বরং' প্রেমের ভাণ করিয়ো না—সেই হবে ভালো।

—প্রেমিক, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব

যৌগিক ছন্দে শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক এবং শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি 'সাধারণত' সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক। তাই উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে অপ্রগল্‌ভ = চার; দই য়ে = দুই; আর স্বয়ং, বরং, মাভৈঃ = তিন; দৈ = দুই। (দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির মূলে আছে দৈএ এবং দই।)

এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'ঐ' এবং 'ওই' সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে জানাচ্ছি যে, রবীন্দ্রনাথ যৌগিক অর্থাৎ সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দেও ঐ এবং ওই-কে সমান মর্য্যাদাই দিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। যথা—

(১) আমি কি চেয়েছি পায়ে ধ'রে
ওই তব আঁখি-তুলে-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে আসা-আসি
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চ'লে যাওয়া?

— নারীর উক্তি, মানসী

(২) নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।

—সৃষ্টির রহস্য, মহুয়া

(৩) ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।

—বলাকা, বলাকা

(৪) উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী

(৫) নদীপ্রান্তে তরুগুলি ঐ দেখ্ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য্য চাহে শেষ চাওয়া।

—মিলন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

(৬) ঐ নামে একদিন ধন্য হ'লো দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।

— বুদ্ধদেবের প্রতি, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ

প্রথম দুটি দৃষ্টান্তে যদি 'ওই' না লিখে 'ঐ' লেখা হ'তো কিংবা শেষ চারটি দৃষ্টান্তে 'ঐ' না লিখে 'ওই' লেখা হ'তো তাহ'লেও ছন্দ ঠিক্‌ই থাক্‌ত; কারণ 'অক্ষরে'র মাপে ছন্দ রচিত হয় না এবং ধ্বনিমর্য্যাদায় 'ওই' এবং 'ঐ' সম্পূর্ণ সমান।

১১

পূর্ব্বে বলেছি যৌগিক অর্থাৎ 'পয়ার-সম্প্রদায়ে'র ছন্দে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট ক'রে এক unit ধরাই এই ছন্দের সাধারণ নিয়ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নিয়মের বিকল্প চলে; কেননা বাঙালীর কান (এবং উচ্চারণ-রীতি) সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেছে।" অর্থাৎ শব্দমধ্যবর্ত্তী হসন্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী "স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হ'য়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টান্‌লে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে।" আমার প্রশ্ন হচ্ছে যৌগিক ছন্দে শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির এই সঙ্কোচন-প্রসারণ-ক্ষমতার অর্থাৎ তার স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্র কতখানি অর্থাৎ সমস্ত

শব্দেরই মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে বাড়ানো কমানো যায় কি না। যেমন—

দেশময় রটিয়া গেছে তব নামে কলঙ্ক-কাহিনী

কিংবা, ঘরছাড়া করিয়া দাও লক্ষ্মীছাড়াদেরে

ইত্যাদি রকমের পংক্তি আমি রচনা করতে পারি কি না। অর্থাৎ 'দেশময়,' 'ঘরছাড়া' প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির এতখানি সঙ্কোচন বাঙালীর কান মঞ্জুর করবে কি না তাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। পক্ষান্তরে—

মদির যৌবন-রস করিয়া নিঃশেষ

এখানে যৌগিক ছন্দের সাধারণ রীতি অনুসারেই 'যৌবন'-এর ঔ-কে সঙ্কুচিত এবং 'মদির'এর ই-কে প্রসারিত করা হয়েছে, কারণ 'ঔ' শব্দমধ্যবর্ত্তী এবং 'ই' শব্দান্তবর্ত্তী। কিন্তু আমি যদি লিখি—

স্নিগ্ধ যৌবন-সুধা করিয়া নিঃশেষ

তাহ'লে 'স্নিগ্ধ' শব্দের ইকারের সম্প্রসারণ বাঙালীর কান মঞ্জুর করবে কি? না, 'স্নিগ্ধ'কে 'সুস্নিগ্ধ' করতে বাধ্য করা হবে?

চিম্‌নি ফেটেচে দেখে গৃহিনী সরোষ,
ঝি বলে ঠাকরুণ মোর নাই কোনো দোষ।

এখানে 'চিম্'-কে দীর্ঘ এবং 'ঠাক্'-কে খর্ব্ব করা হয়েছে। এই ছড়াটিতেই 'গৃহিনী'-কে 'গিন্নি' করা যায় কি? তা ছাড়া আমি যদি লিখি—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ সুশীতল

তাহ'লে ছন্দ-গত অপরাধ হবে কি? না, 'সুশীতল-কে 'শীতল' ক'রে কিংবা 'নিম্নে'-কে 'সুনিম্নে' ক'রে সংশোধন করতে হবে?

আমার বিশ্বাস যৌগিক ছন্দে অ সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনির প্রসারণ করা গেলেও খাঁটি সংস্কৃত (অ-সমাসবদ্ধ) শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে টেনে দীর্ঘ না করাই সঙ্গত। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) "আহা আহা" 'চীৎকার' করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত;
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হ'য়ে ধরিবারে ধায়!
—নিষ্ফল উপহার, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

(২) কন্দল 'চীৎকারিছে' জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।
—যুগান্তর, নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ

(৩) সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর 'বর্ষার' মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
—বর্ষাযাপন, সোনারতরী রবীন্দ্রনাথ

(৪) 'বর্ষা' এলায়েছে তার মেঘময় বেণী
—একাল ও সেকাল, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(৫) 'জ্যোৎস্না' ডালের ফাঁকে
হেথা 'আল্‌পনা' আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানো আপনার।
—চামেলিবিতান, বনবাণী, রবীন্দ্রনাথ

(৬) 'জ্যোৎস্না'-রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সী'র
যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
—শা-জাহান, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

(৭) এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে 'কল্পনে', রঙ্গময়ি।
—এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এই দৃষ্টান্তগুলিতে 'চীৎকার', 'বর্ষা' 'জ্যোৎস্না' শব্দের দু-রকম মূল্য দেওয়া হয়েছে; তাছাড়া 'কল্পনা' শব্দে তিন এবং 'আল্‌পনা' শব্দে চার মাত্রা ধরা হয়েছে। (রূপ-রীতি-উৎসর্গ, পৃঃ ৭৭ দ্রষ্টব্য।) যৌগিক ছন্দে বর্ষা, জ্যোৎস্না, কল্পনা প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে দুই unit ধরা যায় কিনা, এইটেই আমার জিজ্ঞাস্য। যদি কোনো কবিযশোলিপ্সু কল্পনা-প্রবণ উৎসাহী বালক রচনা করে—

নিবিড় বর্ষা-রাতে সুখ-স্বপ্ন-পথে
চলিনু প্রফুল্ল মনে কল্পনা-রথে

তাহ'লে গুরু মহাশয় তাকে পাস্-মার্ক্ দেবেন কি? আমি যদি লিখি—

যৌগিক ছন্দ রচি' পড়েছি সঙ্কটে

তাহ'লে বোধ করি 'যউ্গিক ছন্দ রচি' কিংবা 'যৌগিক ছনদ রচি' এভাবে প'ড়েও, অর্থাৎ বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রার বৈকল্পিক দীর্ঘতার দোহাই দিয়েও, সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাব না। আমাকে বাধ্য হ'য়ে তাড়াতাড়ি সংশোধন ক'রে বলতেই হবে—

রচিয়া যৌগিক ছন্দ এড়ানু সঙ্কট।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

অঞ্জনা

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী

শুধু ভৈরবী সাধি নাই বসি' সকাল বেলা –
শুধাও যদি তা, বলিতে চাই ;
সূর্য্যমুখীর মত মুখ তুলি' সারাটি বেলা
কেন চেয়েছিলে ?---শুধাই তাই !

আঁখি দু'টি ভরি' ছিল যেন হায় সাগর মায়া—
কভু উদ্দাম, কভু প্রশান্ত নিবিড় ছায়া
তরল আলোকে নানা রঙে যেন রঙীন কায়া—
তত সুর বলো কোথায় পাই ?
ভৈরবী ভুলি' কত সুর নিয়ে করেছি খেলা
শুনিবে কি তবে ? বলিতে চাই !

একটি সুরের বাঁধনে তোমারে গেল না ধরা
ওগো আলো-ছায়া-মেখলা বন !
একটি পরাণে কত রূপ নিলে তিমির-হরা
হে আমার চির শফরী মন !
এসো দেখি আজ কানে কানে কহি একটি কথা
আভরণ খুলি' ভোলো যদি ক্ষণ চঞ্চলতা,
তবে একরূপে হেরিব তোমায় সরম-নতা—
বাজিবে পূরবী সারাটি ক্ষণ !
একটি সুরের বাঁধনে কি তবে দিবে গো ধরা—
ওগো আলো-ছায়া-মেখলা বন !

বড় উত্তাপ লেগেছিল চোখে, চাহিনু যবে
প্রদাহ-মলিনা ধরার পানে,
জ্বলিছে জীবন, হা-হা করে বায়ু অসীম নভে—
সে মরুশিখারে ধরিনি গানে !
বড় দীনতায় ত'ারি মাঝখানে খুঁজেছি রেখা,
জ্যোতি-ঝলসিত খর্জ্জুর বনে ফিরেছি একা
স্তিমিত চোখের মত নীল বারি—পেয়েছি দেখা,
মরীচিকা নয়, তবু সে টানে, —
জ্বলিছে জীবন, তবু সুরে সুরে অসীম নভে
গাহিনু কি গান, তাহা সে জানে !

দেখ দেখি আজ নীল অ'াখি খুলি' সবুজ বনে
জ্বালা সনে কিছু গেল কি মিশি' !
কোনো ক্ষণসুখ, ক্ষণবিস্মৃতি র'ল কি মনে
শুকালো কি মালা জাগিয়া নিশি !
দু'টি অ'াখি কোণে জল ঝরে, তবু মদির মধু
নলিন নয়নে আজো কি চাহিয়া দেখে নি বঁধু,
বলো দেখি আজ চেয়ে মুখপানে পরাণ-বধু
গাঢ় অঞ্জনে ভরিল দিশি—
জ্বালা সনে তবু কিছু র'ল কি গো তোমার মনে
কোনো সুর তাহে গেল কি মিশি' ?

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

শিশুমনের চলচ্চিত্র

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ এম্-এ, বি-এল

৪

জ্যোৎস্না সহস্রধারে বাতায়নের ফাঁকে আমার লেখার টেবিলে আসিয়া পড়িয়াছে। আলোর সমুদ্রে স্নান করিয়া মন যেন শুচিসুন্দর হইয়া দেখা দেয়। শৈশবের স্মৃতি জাগিয়া বসে।

শিশুকালের কথা মনে পড়িলে মনে হয় যেন হারান লেখার খাতা খুঁজিয়া পাইয়াছি। কতক বিস্ময়ে, কতক আনন্দে পাতার পর পাতা সেই পুরাতন লেখার মাঝে পুরাতন আমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি।

আজ দূরে বসিয়া গাঁয়ের পাঠশালার ছবি মনে পড়ে। ভৈরব নদ কলকল্লোলে বহিয়া চলে, তাহার পাশে ধানের ক্ষেত, আমের বন ও জঙ্গল, তাহা ছাড়াইয়া পথ। সেই পথ বাহিয়া গ্রামের হাটে যাওয়া যায়। "কদনার" লোভে ঠাকুরদাদার সঙ্গে হাটে যাই। হাট হইতে সওদা বহিয়া আনি, পুরস্কার একটী পয়সা মেলে। তাহারই আনন্দ ধরে কে? এক পয়সার আঠা মটকা কিনিয়া মনের আনন্দে বাড়ী ফিরি।

পথেই গাঁয়ের বটতলায় পাঠশালা। সেখানে ছেলের দল কোন দিন নামতা পড়ে—"চার কাকে এক কড়া, চার কড়ায় এক গণ্ডা—"। যুগপৎ সম্মিলিত স্বর বনপ্রান্তর ভেদ করিয়া যায়, চলিতে চলিতে পড়ুয়াদের আনন্দের কথা ভাবি। উহাদের দলে জুটিবার ইচ্ছা জাগে।

কোনও দিন বা ছেলেরা কিণ্ডারগার্ডেন পদ্ধতিতে বটতলায় দাঁড়াইয়া খেলা করে এবং গান করে। চাষীরা কেমন করিয়া চাষ করে, দাঁড়ীরা কেমন করিয়া দাঁড় বায়, তাহা লইয়া গান রচনা করে।

শিশু মনে পুলক জাগে। ভাবি এই জীবনের আনন্দরস চাই। বায়না ধরিলাম পাঠশালায় যাইব। সে বায়না সেদিন আনন্দ ও কৌতুকে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে যে কান্না জমা ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলে কি এমনি বায়না করি।

নূতন তালপাতা চিরিয়া পাতা হইল, ভাঙ্গা টিনের ল্যাম্প দিয়া দোয়াত হইল, কঞ্চির কলম, আর তালপাতায় রচিত আসন চাটখোল আর পাতা জড়াইয়া থাড়ু তৈরী হইল। এই ঐশ্বর্য্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া ঠাকুরমার কোলে চড়িয়া জয়যাত্রায় বাহির হইলাম।

স্মৃতির পথ বাহিয়া সমস্ত ইতিহাস ঠিক যেন মনে আসে না। অবচেতন মন সেই দিনের আলোছায়ার অনেক ঝিলিমিলি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে।

অপরিচিত শিশুদলের মাঝে আর ততোধিক অপরিচিত গুরু মহাশয়ের কাছে ছাড়িয়া দিয়া ঠাকুরমা চলিয়া গেলেন। মন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। অপরিচয় চিরদিন ভয় বহন করিয়া আনে। মায়ের স্নেহকোমল মুখের কথা মনে পড়ে, গৃহের সহস্র আহ্বান চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তোলে।

গুরু মহাশয় আসিয়া হাতে ধরাইয়া লিখিতে লাগিলেন। গুরু ও পড়ুয়া উভয়ে সমস্বরে পড়িতে লাগিলাম—A আজির ক, খ, গ,। পাঠক হয়ত অবাক হইয়া গিয়াছেন, এ আবার বলে কি! ভাবিতেছেন এ কোন অপূর্ব্ব দেশের কথা বলিতেছি। এখন চলে কিনা জানি না, আমরা যখন পাঠশালায় পড়ি, তখন পাঠশালায় আজির ক বর্ত্তমান ছিল, ইংরাজী 'এ' (A) অক্ষরের মত দেখিতে এই কিম্ভূত কিমাকার বর্ণটী কি অনেক দিন ধরিয়া তাহার হদিস পাই নাই।

আমাদের অঞ্চলে মাতামহীকে চল্‌তি কথায় আজি বলে, পশ্চিম বাংলায় বলে আয়ি।* আজিমার নামের সঙ্গে

স্নেহ ও প্রীতি মাখানো, তাই শিশু বয়সে ভাবিতাম, এ বোধ হয় সেই আজির ক, তারই স্নেহ ও প্রেমমধুর ক।

প্রত্নতত্ত্বের ধার ধারনা, বিদ্যা নাই, তবু বড় হইয়া ভাবিয়াছি এই আজির ক হয়ত আদির ক। বড় হইয়া জানি সর্ব্বকার্য্যে প্রণব উচ্চারণ মঙ্গলজনক, A এই আজির ক সেই প্রণবসূচক। শূদ্রের প্রণবাধিকার নাই, তাই এই কল্যাণতম মন্ত্র বিকৃত হইয়া আজির ক'য়ে পরিণত হইয়াছে।

গুরুমহাশয় একবার লেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি শুধু কঞ্চির কলম লইয়া 'হাঁড়ি কুড়ি' লিখিতে বসিলাম। অক্ষর বিন্যাসের আগে ইচ্ছামত কলম চালানো প্রয়োজন, তাই গোল গোল চৌকা চৌকা ঘরের মত যথেচ্ছাকৃত যে সব রেখাসমবায় করা হয় তাহাকেই 'হাঁড়ি-কুড়ি' লেখা বলে। 'হাঁড়ি কুড়ি' লিখিতে লিখিতে বেলা হইয়া উঠে।

খানিক পরে দেখি ঠাকুরমা নিতে আসিয়াছেন। অশান্ত নাতিকে দূর করিয়া দিয়া বুড়ীর হয়ত প্রাণ কাঁদিতেছিল। ঠাকুরমার কথা যত মনে পড়ে মন তত পুলকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মায়ের চেয়ে দরদী এমন সোনার মানুষ আমার জীবনে পড়েনি। তাঁর সেই দিব্য প্রীতির কথা মনে পড়িলে যেন স্বর্গ হাতে পাই।

লোকে বলে—এ অন্ধ-মায়া। আমি বলি' হোক অন্ধ-মায়া তবু জীবনের এই সোনার কাঠি। মায়া যে ভগবানের প্রকাশমান রূপ, মমতার মাঝেই ত ভগবান রূপ নিয়ে জাগেন। মায়া আছে বলেই জগৎ; মায়ার খেলা যেখানে শেষ সেখানেই প্রলয়ের বাঁশী বাজে।

ঠাকুরমাকে দেখিয়া পাতা দোয়াত ফেলিয়া ঠাকুরমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ঠাকুরমা কোলে লইয়া পাতা দোয়াত গোছাইয়া লইয়া চলিলেন। ছোট বয়স থেকে আমি গাছ-পালা, আকাশ, আলো, বাতাস ভালবাসি। কিন্তু সেদিন আর কোন আহ্বানই ভাল লাগিতেছিল না। ঠাকুরমার বুকে মুখ লুকাইয়া নীরবে শান্ত হইয়া বসিয়া রহিলাম। যে স্নেহের সরসী হইতে দূরে গিয়াছিলাম, সমস্ত অঙ্গ দিয়া সেই ভালোবাসাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম। ঠাকুরমা বলিলেন "কি রে অজু!"

আমি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিলাম "আর পাঠশালায় যাব না।"

ঠাকুরমা প্রশ্ন করেন—"কেন রে?"

আমি কথা কহিনা, শুধু দৃঢ়তার সহিত তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি। ঠাকুরমা হয়ত সব বুঝেন, তাই চুপ করিয়া পথ চলেন।

রাত্রে শুইয়া ঠাকুরমা শতনাম বলেন,

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে।

তাঁহার ললিত আবৃত্তি মনে অপূর্ব্ব এক আনন্দরস জাগাইয়া তুলে। কথার অর্থ বোঝাই সব নহে। শুধু অর্থ জানিবার চেষ্টায় যে শিক্ষা আজ দেশে চলিতেছে, সে শিক্ষা মন্ত্র না হইয়া কেবল ভার হইয়া উঠিতেছে। ভক্তি-মধুর কণ্ঠে ঠাকুরমা যখন এই মধুর শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তখন মন যেন অচিন অজানা রাজ্যে চলিয়া যাইত।

নিঃস্তব্ধ গৃহ। কোণে মৃৎ-প্রদীপে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে, তাহার যতটুকু আলো তার চেয়ে বেশী ছায়া, বাতায়নের ফাঁকে বাহিরের আকাশ ও তরুলতার সংহত ছবি কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া দেখা যায়। অন্ধকারের এই আবরণের মাঝে চিত্ত ব্যাকুল ও ভীত হইয়া ওঠে। সেই পরিবেশের মাঝে একটী বিকচমান শিশু বালিসে মাথা গুঁজিয়া ঠাকুমার সুধাকণ্ঠ শুনিয়া যাইতেছে।

মনের ভিতর একটী আঘাত লাগে, চমক লাগে। ভাব দিয়া, কল্পনা দিয়া একটা অস্পষ্ট ছবি গড়ি। মনে মনে যমুনার ছবি গড়িয়া তুলি। আমাদের গাঁয়ের নদীর সহিত কল্পনা মিশাইয়া তামালবনশীলা যমুনার ছবি মনে করি, আর তাহার তটভূমে গোষ্ঠ ভুমির কথা আঁকি। সেই বৃন্দাবনে শিখিপুচ্ছধারী কৃষ্ণের ছবি মনে পড়িয়া যায়।

ঠাকুরমা শ্লোক বলিয়া যান। আমি কল্পনার আবেশে পিছাইয়া পড়ি। মনে মনে ভক্তিনত চিত্তকে এক অদৃশ্য দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া দেই। কতক বা ভয়ে, কতক বা আনন্দে সে এক অপূর্ব্ব অনুপম অনুভূতি।

পরদিন আর পাঠশালায় যাই না। ভোরে উঠিয়া ফেন-ভাত খাইয়া আমাদের জ্ঞাতি-কাকাদের বাড়ীতে বদরী

ফলসংগ্রহে যাই। চলিত কথায় বদরীকে বরই বলে। বাতাস আসিয়া বদরীর শাখা প্রশাখায় মিলনস্পর্শ জানাইয়া যায়, চঞ্চল শাখার দোলায় পক্ক ফল মাটীতে আসিয়া পড়ে। মিলিত শিশুর দল কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা কুড়াইয়া লই। যে পায় সে নিজেকে দিগ্বিজয়ী বীর মনে করে।

চেষ্টা ও আয়াসে প্রাপ্ত এই ফল-লাভের মাঝে যে আনন্দ তাহা অনভিজ্ঞ সহরের শিশুদের বুঝাইয়া বলা মুস্কিল। প্রকৃতির মাঝে যে ঘাত-প্রতি ঘাত তার আবেষ্টনের মাঝে আমরা গড়িয়া উঠিয়াছিলাম, তাইত বারে বারে এই পুরাতন দিনের স্মৃতির কথা অন্তরে মধুধারা লইয়া জাগিয়া ওঠে।

বদরী লাভের জন্য সে কি প্রার্থনা। দল বাঁধিয়া প্রার্থনা করি

"শিব ঠাকুরের বর
একটী বরই পড়।"

শিবঠাকুরের প্রসন্নতা হইত কিনা কে জানে। পাখীর পাখনার ঝাপটায় কিংবা বাতাসে একটা ফুল মাটীতে পড়িত। আমরা সেই অলক্ষ্য দেবতার করুণার প্রকাশ মানিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতাম। শিব ঠাকুরের বরে একটী কুল পড়িয়াছিল, আমি যেই সেটা তুলিয়া ধরিব অমনি ও বাড়ীর মণিদাদা আসিয়া খপ করিয়া সে বরই কাড়িয়া লইলেন।

তাহা লইয়া যথেষ্ট বচসা হইল। মণিদাদা ফুল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি, পাঠশালে যাস নি পড়ুয়া ডেকে তোকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিতে বলে দিচ্ছি।

আমি ভয়ে ভয়ে বাড়ী পলাইলাম। ঠাকুরমা ভগবতীর দুধ দুইতেছিলেন। শৈশবে মাতৃস্তনে দুধ ছিল না, এই ভগবতীর দুধই আমার জীবন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমি ভগবতীর গলা চুলকাইয়া দিতে লাগিলাম। ঠাকুরমাকে বলিলাম "ও বাড়ীর মণিদা আমায় ভয় দেখিয়েছে ঠাকুমা, আমি আজ আর পাঠশালে যাব না।"

আমার আকুল মুখ দেখিয়া ঠাকুরমার দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা আজ না হয় না গেলি, কিন্তু কাল থেকে রোজ রোজ যেতে হবে" আমি অনাগতের চেয়ে আগতের প্রতি যত্নবান হইলাম। ভবিষ্যৎকে স্বীকার করিয়া লইয়া বর্ত্তমানের বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম।

মণিদাদার প্রেরিত দূতেরা ফিরিয়া গেল। সেদিন আর চ্যাংদোলায় চড়িবার সুবিধা হইল না। পরে একদিন এ মধুর আস্বাদ হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের যুগের পাঠশালা শেষ হইতেছে। তাই সে পাঠশালার কথা একটু বলি। বনস্পতি অশ্বত্থছায়ে দোচালা লম্বা ঘর। গুরু মহাশয় এক পাশে একটা জল চৌকীতে বেত্র হস্তে বসেন। ইটের উপর তক্তা ফেলিয়া ফলকাসন তৈরী, তাহাতে পাঠশালার সর্দ্দার পড়ুয়ারা বসে। অন্য সকলে নিজেদের নেওয়া তালপত্রের আসনে, কিম্বা চটের আসনে বসিয়া পড়া করে। আমরা ৩০।৪০টী ছেলে ছিলাম। প্রথমে তালপাতায় হাঁড়ি-কুড়ি লেখা হইত, হাঁড়ি-কুড়ির পর ক, খ, অ, আ, লিখিতাম। তাহার পর ক্ক, ক্ষ, শিখি, তাহার পর স্ক, স্ব, রূপ যুক্তবর্ণের সমাহার শিখি। এইরূপে কড়া, বুড়ি, গণ্ডা, পণ, সের শিখিয়া এবং 'সেবক' লিখিয়া পাতা লেখার পালা সমাপন হয়, তখন কলাপাতায় 'চিলতে' ধরানো হইত। চিলতে লিখিয়া অবশেষে কাগজ ধরিয়াছিলাম। কাগজের বাজার এখন সস্তা, তখন ছিল না। কাজেই এই দুষ্প্রাপ্যকে আমরা অবহেলা ও উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। কাগজ ধরিলে পণ্ডিতমহাশয় মানসাঙ্ক, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ প্রভৃতি শিখাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পুস্তক শিশুপাঠ ও তাহার পরে কথামালা ইত্যাদি পড়িয়াছিলাম।

পাঠশালায় শাসনের বহর পঠনের চেয়ে বেশী ছিল। দোষ করিলে নানাবিধ শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বেত্রদণ্ড নিত্য-নৈমিত্তিক ছিল, বিশেষত্ব বিশেষ কিছু নাই। পাঠশালা পলাইলে সর্দ্দার পাড়ুয়ারা যাইয়া পলাতককে গ্রেপ্তার করিয়া আনিত। তাহার পর তাহাকে ঘরের আড়ায় ঝুলিতে হইত। আর এক শাস্তি ছিল ঘুঘুমোড়া। ঘুঘুপাখী কেমন করিয়া মোড় খায় জানি না, ঘুঘুমোড়ার সহিত ঘুঘুর অঙ্গভঙ্গীর কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা জানিনা।

তবে ব্যাপারটা ছিল এই, আসামীকে মাটীতে চিত হইয়া শুইয়া পায়ের ভিতর দিয়া হাত ঘুরাইয়া কান ধরিয়া পাছা উঁচু করিয়া থাকিতে হইত। আর সেই উঁচু পাছায় মধ্যে মধ্যে বেতের কেমলস্পর্শ লাগিত। ইহা ছাড়া জল বিছুটি, হাতে ইট, কানমলা, নাকেখত প্রভৃতি বিচিত্র শাস্তি ছিল।

আজ অবাক্ হইয়া ভাবি, এই সমস্ত গুরু শাসনের ফাঁক দিয়াও কেমন করিয়া মা সরস্বতীর কমলাসনের জন্য সাধনা করিতে পারিয়াছিলাম। মানুষ সর্ব্বংসহ জাতি। সমস্ত অবিচারের মাঝে সে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। আমার এক বুড়ী দিদি বলিতেন,

শরীরের নাম মহাশয়
যা সহাও তাই সয়।

তাই বোধ হয় এই কড়া শাসন সহিয়াও বিদ্যার প্রতি প্রীতি কমে নাই।

পাঠশালায় গিয়া কিছু পুরাতন হইয়াছি। পড়ার আগ্রহ যথেষ্ট ছিল। সপ্তাহে সিধা লইবার সময় শুভাকাঙ্খিনী পিতামহীর মনে তৃপ্তি ও উল্লাস জাগাইবার জন্য গুরুমহাশয় বলিতেন "তোমার অজিত খুব বুদ্ধিমান ছেলে, কালে ও খুব বড় হবে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যৎ-বাণী হয়ত সফল হয় নাই। নাই বা হইল, সংসারে শুভকামনা দুর্ল্লভ, সেই শুভকামনা তিনি করিতেন তাইত তাঁহার আশীর্ব্বাদ বিফল নয়। ঠাকুরমা সিধা দিয়া বলিতেন, "দেখবেন ঠাকুর মহাশয়, ওকে বেশী মারবেন না। ও বড় আদুরে—"পণ্ডিত মহাশয় নীরব থাকিতেন। আমাদের দেশ নিষ্কাম কর্ম্মের দেশ, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে লাভালাভে সমান দৃষ্টি করিয়া কাজ করিবে, পণ্ডিত মহাশয় গীতা পড়িতেন কিনা জানি না, তবে তিনি পিতামহীর এই স্নেহানুরোধ না মানিয়া কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় অবিচল ছিলেন।

শ্রাবণ মাসের বর্ষা। ঝুপ ঝুপ করিয়া জল ঝরিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কালো মেঘের বাসর বসিয়াছে। ব্যাঙেরা জগঝম্প বাজাইতেছে। মন আর পাঠশালায় যায় না। বাগানে একটা ক্যাপল্ গাছে ক্যাপল ফল ফলিয়াছে। অম্ল মধুর ক্যাপলের আস্বাদ আজ হয়ত বিরাগজনক, কিন্তু কর্দ্দম-পিচ্ছল বাগানের মাঝে গাছে উঠিয়া নিঃসাড়ে ক্যাপল ভক্ষণের মাঝে একটা মাদকতা ছিল।

বর্ষার স্নেহালিঙ্গনকে একান্তভাবে চাহিয়া আমি ক্যাপল গাছে বসিয়া বসিয়া সুরে গাহিতেছিলাম।

বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদী এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিনটী কন্যে দান
একটী কন্যে রাঁধেন বাড়েন, আরটী কন্যে খান
আরটী কন্যে খেতে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।

এ ছড়ার যে গভীর অর্থ তাহা আজিও জানি না। কিন্তু সেই বর্ষা-ভেজা কাননে শ্যামল তরুলতার মাঝে, আকাশের কালো মেঘের মাঝে যখন বিজলী খেলিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল শিবঠাকুর ধরণীতে নামিতেছেন। শিব-ঠাকুরের নামাতে বেশী বাধা ছিল না, কিন্তু কোথায় তাঁহার বধূ তাই লইয়া মহা ভাবনায় পড়িতাম।

আমারই পরিচিত ছোট ছোট মেয়েদের মাঝে শিবঠাকুরের বধূর তল্লাস করিতাম। বাড়ীতে পিতৃপুরুষের আরব্ধ দুর্গাপূজা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু দশপ্রহরণ-ধারিণী ভগবতীকে কিছুতেই বিয়ের কনে বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। বিয়ের কনে ছোট হইবে, তাহার মুখে লজ্জার সঙ্কোচ থাকিবে, বিপদের আশঙ্কা ও চকিত চমক থাকিবে। অসুরদলনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী মা দুর্গা কখনও শিবঠাকুরের কনে হইতে পারে না।

শিবঠাকুরের এই তিন কন্যে খুঁজিবার ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িতাম। শিউলির লাস্যচপল মুখখানি মনে পড়িত। ভাবিতাম শিউলি ঠিক শিবঠাকুরের কনে হইতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই এ দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিতাম। শিবঠাকুরের যে ভয়ানক শরীর, নিশ্চয়ই শিউলি তাহাকে বিয়ে করিবে না। ত্রিশূল দেখিয়া শিউলি নিশ্চয়ই ভয় পাইবে।

পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অন্য কনে খুঁজিব, এমন সময় ক্যাপল-তল হইতে কলরব ও আক্রোশ শোনা গেল। পাড়ার সর্দ্দার পড়ুয়া নকুল আসিয়া বলিল "এই নাম বলছি!"

"কেন?"

"পণ্ডিতমহাশয় তোকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।" কি পরম পরিতৃপ্তির কথা! যে মাছ ধরে, তাহার কাছে তাহা পরম কৌতুক, কিন্তু যে মাছ মরে তাহার যে মৃত্যু একথা আমরা সকল কাজেই ভুলিয়া যাই। একথা মনে থাকিলে সংসারে অত্যাচার ও বলদর্প চলে না, তাই সংসার অপরের দিকে না তাকাইয়া আপন শাসন অপ্রতিহত ভাবে চালায়।

কিন্তু সেই বয়সে নিজের শক্তির উপর অবিশ্বাসী ছিলাম না। শরীরে না থাকিলেও মনে মনে খুব জোর অনুভব করিতাম। শাসনের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করিবার জন্যই বলিলাম "যা রে যা, আজ আর পাঠশালায় যায় না।"

শিবঠাকুরের মাথায় যে সাপ থাকে, তাহারা যেমন গরুড় পাখীর ভ্রুকুটিকে ভয় করে না, বৃক্ষসমাসীন আমিও তেমনই নিজেকে দুর্গাশ্রিত মনে করিলাম।

কিন্তু আমার কল্পনার ফল ঠিকমত হইল না। আততায়ীরা আমাকে এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা দুজনে গাছে চড়িল, আমি তাহাদের হাত এড়াইবার জন্য খানিকক্ষণ এ ডাল, সে ডাল করিলাম। পরে একটা নীচু ডালে গিয়া ঝুপ করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা ছিল পলাইয়া যাই। কিন্তু নীচের প্রহরীরা আমাকে কিছুতেই ছাড়িল না।

ধরিয়া চ্যাংদোলা করিয়া আমাকে পাঠশালায় লইয়া চলিল। আমি মরিয়া হইয়া হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলাম। কিন্তু পাঠশালার সৈন্যদল আমাকে সহজে নিস্কৃতি দিতে চাহেনা।

বধ্যভূমিতে কে সহজে যাইতে চাহে? শাস্তির প্রখরতা অনুমান করিয়া আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম। পাঠশালায় নিয়া ফেলিতেই গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে আগাইয়া আসিলেন না, মিষ্টস্বরে বলিলেন "যাও, অজু দুষ্টামি করো না।" পণ্ডিতমহাশয়ের এই অসাধারণ কোমলতায় বিস্মিত হইয়া দৃষ্টি উন্নত করিয়া দেখি পণ্ডিতমহাশয়ের পাশে চেয়ারে এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক উপবিষ্ট। পরে জানিয়াছিলাম তিনি পরিদর্শক। পরিদর্শককে ছেলেরা 'বাবু' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টি দেখিয়া অন্তর পুলকিত হয়। তিনি আমার আয়ত চক্ষু ও বিস্তৃত ললাটে কি দেখিয়াছিলেন কে জানে, আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "পাঠশালায় আসনি কেন খোকা?"

পাঠশালায় এমন স্নেহ-মধুরতা থাকিতে পারে তাহা আমাদের জানা ছিল না। আনন্দগদ-গদচিত্তে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিলাম "আজ আমার আসতে ইচ্ছা করছিল না।" আমার দিকে পণ্ডিত মহাশয় ক্রূরদৃষ্টিতে চাহিলেন, পাঠশালার পড়ুয়ারা আমার অদৃষ্ট ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার সত্য উত্তর পরিদর্শকের মনকে প্রীত করিল। তিনি আমায় আদর করিয়া বলিলেন "বাড়ী যেতে পারলে তুমি খুসী হ'বে?"

আমি বলিলাম "হাঁ।"

সকলে অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমার ধৃষ্টতায় তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বক্তা স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন "আচ্ছা বেশ, তুমি আজ বাড়ী যাও, কাল পরশুও তোমাদের ছুটী দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এর পরেও আর স্কুল পালাবে না।" আমি আনন্দবিহ্বল স্বরে উত্তর দিলাম "না।"

অনুমতি পাইয়া বিজয়গর্ব্বে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। এই স্নেহ-সম্ভাষণ আমার জীবনে যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। তাহার পর আর পাঠশালা হইতে পলায়ন করি নাই। লেখাপড়ায় একটা পরম অনুরাগ জন্মিয়া গেল।

সংসারে মিষ্টকথার মূল্য আমরা বুঝি না। কথাকে তীব্র কি মধুর করা আমাদের ইচ্ছাধীন। অতি কঠোর কথাও বক্তার মিষ্টভাষিতার গুণে পরম প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। এই পরিদর্শকের নাম ধাম জানি না, কিন্তু তাঁহার স্নেহ বাক্যই যে আমায় মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, সে কথা আজ ভক্তিনত চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

ইহার পর পণ্ডিতমহাশয়েরও ব্যবহার বদল হইয়া গেল। তিনি আর কখনও আমাকে প্রহার করেন নাই। অন্যায় করিলে কেবল মুখের শাসনই করিয়াছেন। কড়া শাসনের পালা এমনই করিয়াই তাহার শেষ পাওয়া গাহিয়া গেল।

৫

ভগবতীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মায়ের মত এই গাভীটি আমায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছিল। হারাণী এই ভগবতীর বাছুর—হারাইবার পূর্ব্বে তাহার কি নাম ছিল মনে নাই, কিন্তু হারাইবার পর হইতে আমরা তাহাকে হারাণী বলিয়া ডাকিতাম। লোমশ এই গোবৎসটী পাটল রঙের ছিল—সে আদর করিয়া আমার কাছ হইতে মর্ত্তামান দয়া কলার খোসা খাইয়া যাইত। দড়ি ধরিয়া তাহাকে মাঠে লইয়া বাঁধিতাম।

আমাদের গাঁয়ে শীতের সময় গরুবাছুর মাঠে মাঠে চরিয়া বেড়াইত, বর্ষাকালে তাহাদের বাঁধিতে হইত। সেবার ফাল্গুনে একদিন সকল গরু মাঠ হইতে ফিরিল, কিন্তু হারাণী ফিরিল না। হারাণীর তখন ৩।৪ বৎসর বয়স হইয়াছে সে শীঘ্রই দুগ্ধবতী হইবে, তাই তাহার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল।

সন্ধ্যার সময় এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া দেখিয়া আসা হইল, কিন্তু হারাণীকে পাওয়া গেল না। ঠাকুরমা ব্যথিত ও দুঃখিত হইলেন। পুণ্যশীলা এই মহীয়সী নারীর কথা যত মনে পড়ে, মন ততই আর্দ্র ও নম্র হইয়া পড়ে, লেখাপড়া তিনি কিছুই জানিতেন না, অথচ কি কুশাগ্র বুদ্ধি, কি অপূর্ব্ব শালীনতা, কি অনুপম চরিত্র-লাবণ্য, কি বিরাট ধর্ম্মপ্রাণতা! হারাণীকে না পাইয়া ঠাকুরমা বড়ই কষ্ট অনুভব করিলেন। তাঁহার নিকট বাড়ীর প্রতি পশুটি পরমাদরের ছিল। বাড়ীর একটী শিশু হারাইয়া গেলে তিনি যতটা কষ্ট অনুভব করিতেন, হারাণীর জন্য তিনি ততটা কষ্ট অনুভব করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় আর গল্প জমিল না। ঠাকুরমা আমাদের চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে বলিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমরা আর বিরক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

আমার জাঠতুতো বোন নীতির সহিত আমি শ্লোক ঝগড়ালি করিতে লাগিলাম। নীতি দিদি জ্যাঠামহাশয়ের সহিত বিদেশে থাকিত, কাজেই সে ঠাকুরমার মধুর সঙ্গ কম পাইয়াছে। কাজেই শ্লোক ও ছড়ায় সে আমার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। আমি তাহাকে হারাইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম "বলত দিদি,

কাল ছাগলটার গলায় দড়ি
নিত্যি হাটে রাজার বাড়ী।

এটা কি"?

ভাবিয়া চিন্তিয়া দিদি উত্তর খুঁজিয়া পায় না। রাজার বাড়ী ও কালো ছাগল লইয়া মনের মাঝে তোলপাড় করে। আমি অবশেষে হাসিতে হাসিতে বলি—"তেলের ভাঁড়"।

নীতি বলে—"কেন"?

আমি বলি, "ছাগল কাল, ভাঁড়ও কাল, প্রত্যেক হাটেই তেল আনিতে হয়, তাই সে হাটে হাটে যায়"। বুঝিতে পারিয়া দিদি, হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

আমি বলি "আচ্ছা আর একটা বলব"?

দিদির কৌতূহল জাগ্রত হয়, বলে "বলনা অজু!"

ছোট বয়সে ধীরে ধীরে অহমিকা জাগে। আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইলেই তাই মন খুসী হইয়া ওঠে। আমি গাম্ভীর্য্য আনিয়া উপদেষ্টার মত বলি "বেশ, এইটা বল,

এখান থেকে মারলাম ছড়ি
ছড়ি গেল ভুবন-ডাঙ্গা।"

এ কূট প্রশ্নের অর্থ নীতির মাথায় খেলে না। নীতি আকাশ পাতাল বসিয়া ভাবে। স্তিমিত দীপালোকে আমি আপন জয়গর্ব্ব আপনা-আপনি অনুভব করি। নীতির মনে আঘাত লাগে, সে বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করে।

নভেল-পড়া মায়েরা এই সমস্ত ছড়া ও প্রশ্ন ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ পুলকিত চিত্তে শিশুবয়সের এই আনন্দানুভবের কথা স্মরণ করি। এই সমস্ত ছড়া মনের তারে মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিত। বিকচমান শিশু-হৃদয়ে একটা কি জানি কি ভাব জাগাইয়া তুলিত। পরিচিতের মাঝে একটা অপরিচয়ের যাদু আনিয়া হৃদয়ের পুষ্টি মনের পরিসর বৃদ্ধি করিত। দেশে দেশে যুগে যুগে শিশুমন রূপকথা ভালবাসে তাহার কারণই এই। যাহা দেখি, যাহা শুনি সেই বস্তু-জগতই সংসারের সব নয়, দেখা ও শোনার পাছে এক মায়ালোক আছে, কল্পনার প্রস্ফুতির জন্য তাহার বশেষ প্রয়োজন আছে।

সারা ভুবন ভরিয়া যে-স্থলভূমি, যে-ডাঙ্গা, তাহার উপর দিয়া যে-ছড়ি চলিয়া গিয়াছে সে পথ। পরিচিত স্থান হইতে বাহির হইয়া অপরিচিত অরূপ লোকে বাহির হইয়াছে। দিদি কিছুতেই 'পথ' বলিতে পারিল না। কেবল স্তব্ধ বিস্মিত চিত্তে উত্তর শুনিল—'পথ'। দিদির প্রশ্নে আমি কেমন করিয়া তাহাকে সবটুকু বুঝাইয়া দিলাম, তাহা মনে পড়ে না, তবে কিছু হেঁয়ালি, কিছু রহস্য মাখাইয়া এক অপূর্ব্ব কিছু বলিয়াছিলাম, তাহাই মনে হয়।

পরদিন ভোরের ফাল্গুনের উদার আলো আসিয়া যখন বারান্দায় পড়িয়াছে যখন মুকুলিত আম্রতরুর সৌরভে দিগন্ত সৌরভিত, তখন নীতি ও আমি বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। নীতি হিন্দুস্থানীদের দেশে থাকিয়া হিন্দুস্থানী গল্প ও ভাষা শিখিয়া আসিয়াছিল, তাহাই সে আমায় বলিতেছিল।

সে হিন্দুস্থানী কথার সমগ্র রস যে অনুভব করিতেছিলাম তাহা নয়, কেবল সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিলাম। রোদের সোণালি আলোয় সবুজ বনসীমা ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। উপরে আকাশের নীলায়তনের অসীম বিস্তার মনকে কাড়িয়া লয়। পায়ের তলে অঙ্গনের হরিৎ দূর্ব্বাদল গৃহশেষে কাননে মিশিয়া যায়। এই আবেষ্টনের মাঝে আমি ব্যগ্র ও আকুল হইয়া কেবল অনুভব করিতেছিলাম।

ছোটকাকা বলিলেন "হারাণীকে খুঁজতে যাবি রে অজিত?"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া গল্পের মাধুর্য্য ভুলিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। চঞ্চল অধীরতায় বলিলাম "যাব।"

কাকার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁশবনের তলায় পথ চলে—খানিক আগাইয়া গাঁয়ের পথ তেমাথায় মেশে, এক পথ উত্তরে কোন দূরে চলিয়া গিয়াছে, পশ্চিমের পথ মাঠে চলিয়া গিয়াছে। তেমাথায় বৃহৎ বট গাছ শাখা-প্রশাখায় বিপুল রাজপাট বিস্তার করিয়া শোভা পায়।

পশ্চিমের রাস্তায় চলিতে চলিতে নারিকেল ও তাল, আম ও কাঁঠালের বন ছাড়াইয়া সহসা মাঠে আসিয়া পড়ি। ধান-কাটা ক্ষেত দিগন্ত পর্য্যন্ত ধূ ধূ করে, কর্ত্তিত তৃণের অবশিষ্টাংশ ভূমিতে রহিয়াছে, বন্ধনমুক্ত গোপাল তাহা মহানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও সেই ক্ষেতের মাঝে কলাইসুঁটী ছড়ান ছিল, চালতে চলিতে কলাইসুঁটী তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলাম।

কোথাও দূরে একটা লাল রঙের গাভী দেখা যায়। কাকা জিজ্ঞাসা করেন "কিরে অজিত! ঐটা হারাণী নয়?"

আমি সোৎসাহে বলি "হাঁ সেই রকম ত দেখায়।" তখন মাঠ ভাঙিয়া তাহার কাছে যাই, কিন্তু পৌছিয়াই দেখি আমরা মায়ামৃগের পিছনে ছুটিয়াছি। এমন কতবার যে হায়রাণ হইলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তখন মাঠ-চারী চাষীদের জিজ্ঞাসা করিলাম "ওগো তোমরা একটা লাল বাছুর দেখেছ?"

উত্তরে অপ্রতুলতা নাই। সহরে যেমন মানুষ মানুষের সহজ সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া দূরে বসিয়া থাকে, পাড়াগাঁয় তাহা হইবার জো নাই, প্রত্যেকেই একটা প্রশ্ন শুনিয়া, দশটা প্রশ্ন করে। ঠিকুজী, কুলজী ও ইতিহাস লইয়া আধ-ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়।

আজ জীবন-সংগ্রামে তাড়া বেশী। পথপ্রান্তে বসিয়া এইরূপ নিবিড় আলাপ জমাইবার সুযোগ নাই। তাই কৌতূহলকে দমন করিয়া যে যার কাজে মন দেই কিন্তু মন তাহাতে তৃপ্ত নহে। চেষ্টা ও যত্ন জটিল হইতেছে, জীবনের মধুরতা ও শান্তি ততই ত দূর হইতেছে।

তোরাপ সেখ আমাদের বর্গাদার প্রজা। আবাদে আমাদের জমি চাষ করে বলিয়া সে আমাদিগকে খাতির করিল। তাহার বাড়ী লইয়া গিয়া আমাকে মুড়ি ও গুড় খাইতে দিল। আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি করিল, অবশেষে বিফলমনোরথ হইয়া কাকাকে বলিল "বাবু, ব্যস্ত হবা না ও গরু তোমার সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ী যেয়ে হাজির হবেই।"

তাহার আশ্বাসবাণী একেবারে শূন্যগর্ভ নহে। কখনও কখনও গরু মাঠে চরিতে গিয়া অন্য সঙ্গে মিশিয়া অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, পরদিন আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে।

চলিতে চলিতে পথে রেল লাইন বাধিল। কাকা তাহার উপর উঠিয়া দূরে চাহিয়া দেখিল। দূরে প্রান্তর ভূমির শেষে জলের রেখা দেখা যাইতেছিল, যেন দিগন্তের চক্রনেমিতে

একখানি শুভ্র চাদর জড়াইয়া আছে। কাকা বলিলেন, ঐ ময়ূরাক্ষী নদী।

এই সুন্দর অনুভূতি আমার নিকট আজিও জীবন্ত রহিয়াছে। কালের ও দেশের ব্যবধান ছাড়াইয়া আমি যেন সেই উচ্চ রেলপথের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—আর আমার সম্মুখে যেন চক্রবালের তটপ্রান্তে সেই জলরেখা শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে।

প্রকৃতির মাধুর্য্যের এই যে অনুপম অনুভব ইহার মধ্যে অশেষের উল্লাস আছে, তাই কখনও ইহার শেষ নাই। সুন্দর যখন হৃদয়ে দেখা দেয় তখন সমস্ত ফাঁককে পূর্ণ করিয়া পরম পূর্ণতায় দেখা দেয়, তাই আনন্দের যেমন অবধি থাকে না, বোধের তীব্রতার তেমনই শেষ হয় না।

জীবনে তাহার পর কত বর্ষা, কত শরৎ, কত বসন্ত, আপন আনন্দ নিয়া দেখা দিয়া চলিয়া গিয়াছে তবু এই দৃশ্য, এই ছবি অম্লান ভাতিতে মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। আয়োজন বেশী কিছু নয়, মনের পথে সৃষ্টি করিতে বেশী কষ্ট হয় না নির্ম্মল নীলাকাশ অনন্ত সম্ভাবনায় উপরে বর্ত্তমান, পদতলে শ্যামলা বসুমতী, বনরাজিনীল চক্রবালরেখা আর তাহার নীচে জলরেখা।

জীবনে যখনই ব্যথা পাইয়াছি, যখনই দুঃখে বিহ্বল হইয়াছি, তখনই শিরায় শিরায় এই আশ্চর্য্য অনুভূতির স্মরণে এক নূতন উত্তেজনা জাগিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে রেলগাড়ী চলিতে দেখি নাই। একটী রেলগাড়ী আসিতেছিল, কাকা আমাকে নিয়া দূরে দাঁড় করাইয়া বলিলেন "রেলগাড়ী যাবে এখন দেখবি।" আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। দুরন্ত বিক্রমে গাড়ী ছুটিয়া আসিল। এই প্রচণ্ড গতিটা আমার সমস্ত অন্তরকে বিস্ময়ে আবর্ত্তিত করিয়া তুলিল। গতির মাঝে একটা পরম আনন্দ আছে। আমাদের জীবন বেশীর ভাগই স্থিতিশীল, তাই যখন পাখীর আকাশ-গতি দেখি, যানের দ্রুতগতি দেখি তখন তেজের বিকাশ দেখিয়া পরম পুলকিত হই। এই কারণেই বড় বয়সেও আমাদের মাঝে যে শিশুমন আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া বজায় থাকে, তারা জাগিয়া উঠিয়া মাঝে বুড়া শিশুকেও চলমান গাড়ীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে বাধ্য করে।

বেলা বাড়িতেছিল। ফাল্গুনের শীতমধুর প্রভাতী রৌদ্রের তেজ খরতর হইয়া উঠিতেছিল, কাজেই কাকা বলিলেন "চল অজিত ফেরা যাক।"

আমিও বাড়ী ফিরিবার দুর্নিবার লালসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলাম। কাজেই তথাস্তু বলিয়া অনুসরণ করিলাম।

ফিরিবার সময় একটী মাঠের মাঝে একটী বন্য কুলগাছে বন্যকুল পাকিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া চ্যাঙা মারিয়া কুল পাড়িলাম। পাকাগুলি ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম, আর ডাঁশাগুলি নীতি দিদির জন্য বাড়ী লইয়া চলিলাম।

ঠাকুরমা হারাণীকে পাওয়া যায় নাই বলিয়া পরম দুঃখিত হইলেন। সেদিন আর পাঠশালায় যাইতে হইল না। নীতিদিদি ও আমি বাগানে নারিকেলের মালা লইয়া রান্না-বাড়ী খেলা আরম্ভ করিলাম।

সন্ধ্যাকালে নীতি ও আমি বারান্দায় বসিয়া তারা দেখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রতি সন্ধ্যায় অন্তহীন সীমাহীন শূন্য পাথারে মণি-দীপের মত দীপ্তোজ্জ্বল এই যে সব নক্ষত্র ও তারকা দেখা দেয়, তাহাদের দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু আর তৃপ্ত হয় না। কত যে দেখিয়াছি তবুও আনন্দের শেষ নাই। নীতি দিদি প্রথমে একটী তারা বাহির করিয়া বলিল "ঐ দেখ অজু নারিকেল গাছের মাথায় একটা তারা ফুটেছে।"

আমি আগে দেখিতে না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। নীতিকে জব্দ করিবার জন্য বলিলাম—'এক তারা বামন মারা'। অর্থাৎ এক তারা দেখিলে ব্রহ্ম হত্যার পাতক হয়।

নীতিদিদি অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহে। আমি বলি "বেশ পাঁচটী মুনির নাম কর।"

ব্যথিত স্বরে দিদি বলে, "আমি ত কারও নাম জানিনে।"

"ধেৎ কারও নাম জান না?"

বিহ্বলতা ভুলিয়া দিদি আত্মস্থ হইয়া বলে—"এক ত নারদ মুনির কথা জানি।"

আমি উৎসাহিত করিবার জন্য বলি—"বেশ তারপর বশিষ্ঠ ব্যাস",—নীতি বলে, "আর বিশ্বামিত্র।"

আমি সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলাম "বিশ্বামিত্রে চলবে না, উনি যে আগে ক্ষত্রিয় ছিলেন, উনি ত আসল ব্রাহ্মণ নন।" বিশ্বামিত্র বালকের কথায় কুপিত হইয়াছিলেন কিনা

জানি না, নীতি দিদি বলিল "তা হলে কি হয়, উনি ত তপস্যা করে সত্যই ব্রাহ্মণ হয়ে ছিলেন।"

আমি পুরুষ, চিরকাল নারীকে কথা শুনাইব, কথা শুনিব না এই ত আমার বীরত্ব। তাই নীতি দিদিকে ধমকাইয়া বলিলাম—"ওতে হবে না যা বলছি শোন, বল নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভৃগু আর কশ্যপ।" মন্ত্র পড়ার মত নীতি বলিল "নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভৃগু, কশ্যপ।" তখন ক্রমে ক্রমে তারা ফুটিতে লাগিল। আমি নীতিকে দক্ষিণে একটা দেখাইলাম, নীতি দিদি আমায় উত্তরে একটা দেখাইল।

সম্মুখের আকাশে তখন সাত ভাই কৃত্তিকারা উঠিয়া ছিল, আমি বলিলাম "ঐ দেখ দিদি সাত ভাই কৃত্তিকা?"

দিদি অপলক নেত্রে এই তারকা মণ্ডলীর উপর চাহিয়া রহিল পরে বলিল "তুই সাত ভাই চম্পার গল্প জানিস?"

আমি সহর্ষে বলিলাম "জানি বই কি, ঐ যে শোলোক আছে

সাত ভাই চম্পা জাগরে
কেন বোন পারুল ডাকরে?"

দিদি বলিল "আমার হিন্দুস্থানী আয়া একটা মজার শোলোক বলেছে শুনবি"

গল্প শুনিতে অকাতর। দিদি গল্প বলিয়া গেল। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া এই বিদেশী গল্প বাহির করিতে পারি নাই। সমস্তই হিজিবিজি হইয়া গিয়াছে।

সাত রাজার ছেলে সাত ভাই চম্পা হইয়া ফুটিয়াছিল, আর তাহাদের অনাদৃতা কনিষ্ঠা দুলালী রাজতনয়া পারুল হইয়া জাগিয়াছিল। সেই রাজার ছেলেরা পৃথিবীর লীলা-শেষে তারা হইয়া জন্মিয়াছে, কিন্তু ছোট বোনটী পারুল কোথায়?

বড় হইয়া জানিয়াছি মেষ ও বৃষ রাশির এই নক্ষত্র পুঞ্জ আসলে বহু সংখ্যক তারার মণ্ডলী। বহু তারার সমবায় বলিয়া গ্রীকেরা ইহাকে প্লিয়াডিস্ বলিত। দেব সেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়কে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম কৃত্তিকা।

এই জ্ঞান পাইয়া আনন্দ পাইয়াছি কি ছোট বয়সের সেই সাত ভাই চম্পার মূর্ত্তিধর কৃত্তিকাকে দেখিয়া আনন্দ পাইয়াছি বলা সুকঠিন নহে। নির্য্যাতিত রাজার ছেলেদের সহিত সহানুভূতিতে অন্তর পূর্ণ ছিল, তাই সেই রাজতনয়েরা দীপ্ত তারকা হইয়াছে জানিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাই, তাহার সহিত তুলনায় সত্য জ্ঞানও ব্যর্থ মনে হয়।

পরের দিনে বিকালে আবার হারাণীর সন্ধানে চলিলাম। বাবা, কাকা ও আমি। হারাণীকে খুঁজিতে গিয়া আমি গ্রামকে চিনিয়াছিলাম। গাঁয়ের মাঠ, গাঁয়ের বাট, গাঁয়ের ক্ষেত, বন বাদাড়, গুল্ম, তরুলতা কত যে দেখিয়াছিলাম, কত যে চিনিয়াছিলাম, আজ ভাবী জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ভাবে বলা অতি কঠিন। পর জীবনের কিছু কিছু অনুভূতি হয়ত এই আনন্দ-প্রদ অভিযানের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

ঘরে বসিয়া বই পড়িয়া যাহা শিখি, তাহার অর্দ্ধেকই অজানা অশেখা হইয়া থাকে। বস্তুর সহিত মনের যেখানে সত্যকার যোগবন্ধন হয় নাই সেখানে পরিচয় পরিচয় নহে। ধানের ক্ষেত, সবজীবন, আমবাগান, খড়ের মাঠ, পুকুর, কূপ, গাছ এই অভিযানে যাহা দেখিয়াছিলাম, সকলই একটী বিচিত্র সাড়ায় হৃদয় স্পন্দিত করিয়াছিল।

যখন কাজ থাকে না, মন শূন্য হইয়া পড়ে, তখন কল্পনা-নেত্রে সেই ছোট বয়সের বিচিত্র ভাব বিলাস অনুভব করিতে চেষ্টা করি। সে আকাশ, সে বাতাস, সে বনভূমি আর চোখে জাগিবে না জানি, তথাপি অনন্ত সময়কে ফাঁকি দিয়া তাহার গতিবেগকে বিবর্ত্তিত করিয়া যদি হারাণো দিনের সেই আনন্দক্ষণগুলিকে ফিরিয়া পাই তাহার জন্য মন মাঝে মাঝে চেষ্টা করে।

হারাণীর সন্ধানে এমন করিয়া দিনের পর দিন ঘুরিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিলাম। বাড়ীর সকলেই ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বিব্রত হইয়া বাবা বলিলেন, "না হারাণীকে আর পাওয়া যাবে না, কাল থেকে আর মিছে মিছে ঘুরে কাজ নেই।"

ঠাকুরমা তখন সন্ধ্যা বেলায় দীপ দিতেছিলেন। তুলসী মঞ্চের নীচে প্রদীপ রাখিয়া তিনি আপন দেবতাকে প্রণাম

করিয়া বলিলেন "অমন কথা বলিসনে, আমি জানি আমার হারাণী ফিরে আসবে।" আমি বারান্দায় বসিয়া খেলা করিতেছিলাম। ঠাকুরমার সেই উচ্চ কণ্ঠ আমার কানে গেল। এ বাণীর যে কি মূল্য তাহা আমি জীবনে কতবার কত মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়াছি। যখনই কোনও বিপদ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে তখনই এই ভক্তিমতী নারী এমনই আশ্বাস বাণী দিয়াছেন, আর প্রতিক্ষেত্রেই তাহা ফলিয়াছে।

বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা, এই পরম নির্ভরতা যে ধর্ম্ম-পরায়ণতায় সম্ভব সে বিশ্বাস দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাইত এ দৃশ্য আর দেখিতে পাই না। আপদে বিপদে শোকে সন্তাপে তাঁহার অমৃত আশ্বাস যে মন্ত্র-শক্তির মত কাজ করিত, সে আশ্বাস আর কেহই দিতে পারে না। বড় হইয়া কত মানুষের সহিত মিলিয়াছি, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এই দৃঢ়তা, এই পরম গভীর আশ্বস্ততা আর কোথাও দেখি নাই।

হারাণীর পিছনে আর ঘুরিলাম না। ঠাকুরমা নিষেধ করিয়া দিলেন। মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা, ঐ কলসে যে দুধমৌ ধান আছে, ওটা খরচ করো না, হারাণী ফিরলে আশানারায়ণের পূজার সিন্নি দিতে হবে।"

সেই অমোঘ বাক্য ফলিল। হারাণী ফিরিল। একদিন রাত্রে আমাদের পোষা কুকুর কালী ডাকিতে লাগিল। ঠাকুরমা বিছানা হইতে উঠিয়া চাকর পরেশকে ডাকিয়া বলিলেন—"পরেশ হারাণী এসেছে, হারাণীকে বেঁধে রাখ"। হারাণীর অপ্রত্যাশিত আগমনে বাড়ীতে কল-কোলাহল পড়িয়া গেল। আমরা সকলে উঠিয়া হারাণীকে দেখিতে চলিলাম। বাবা দেখিয়া বলিলেন "হারাণীর একটা কান কেটে দিয়েছে মা।" ঠাকুরমা কথা কহিলেন না।

আরমান আমাদের গাঁয়ের নামজাদা চোর। বড় বয়সে বুড়া আরমানের নিকট তাহার চুরির অত্যদ্ভুত বহু কাহিনী শুনিয়াছি। আরমান বলিত সে মন্ত্রবলে দরজা খুলিতে পারে। কোনও দিন পরীক্ষা দিয়া সে আপন শক্তির পরিচয় দেয় নাই, তথাপি তাহার যে বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াছি তাহাতে তাহার অত্যদ্ভুত শক্তিতে অবিশ্বাসী হইতে সাহসী হই নাই।

পরদিন অতি ভোরে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখি আরমান ঠাকুরদাদার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে—"দোহাই দাদাঠাকুর আমায় রক্ষা করুন।"

মা আমাদিগকে দরদালানে যাইতে বারণ করিয়া বলিলেন "ওখানে খবরদার যাসনে, ওখানে চোরের সর্দ্দার আরমান জমাদার এয়েছে।"

মায়ের বারণে ভয় হইল। কিন্তু এতদিন কেবল গল্পেই চোরের কথা শুনিয়াছি, আসল চোরকে দেখি নাই, তাই কৌতূহল নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইল। অন্য ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া আরমানকে দেখিতে লাগিলাম।

কল্পিত চোরের সহিত আরমানের আদবেই সাদৃশ্য ছিল না। তাহার আকৃতি বিরাট যমদূতের মত নহে। মাংসল পেশীবহুল পুষ্ট দেহ শক্তিমান বীরের মত। মুখে একটা পরম প্রশান্তি। তাহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইল না। আমি ধীরে ধীরে দরদালানে উপস্থিত হইলাম।

ঠাকুরদাদা আমাকে দেখাইয়া বলিলেন "তোর জন্যে এই দুধের ছেলে মাঠে মাঠে হয়রাণ হয়ে ফিরেছে, তোকে কি করে ছেড়ে দেই?"

আরমান কথা কহিল না। তাহার বড় বড় চোখ দুটী দিয়া আমাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আমাকে কোলে লইতে আহ্বান করিল।

অপরিচিতের এ আহ্বান আর বিশেষতঃ চোরের আহ্বান আমার মনঃপূত হইল না। আমি দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আরমান ও আর কয়েকজন মিলিয়া আমাদের গরু চুরি করিয়াছিল। কেন এবং কি মতলবে সে সব কথা ঠিক মনে নাই। চোরেদের মনান্তর হওয়ায় হারাণীকে তাহারা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই নিয়া নালিশ ফরিয়াদ করিয়া আরমানকে অপদস্ত না করি এই জন্য সে অনুনয় করিতেছিল।

ঠাকুরমা কোথায় ছিলেন, তিনি আসিতেই আরমান সত্যই চোখের জল ফেলিল এবং করুণস্বরে বলিল "মা-ঠাকরুণ, আমায় এবার মাপ করুন্।"

ঠাকুরমার হৃদয় বজ্রের মত কঠোর আর কুসুমের মত কোমল ছিল। ঠাকুরদাদার মতের অপেক্ষা না করিয়া তিনি অনুতপ্ত আরমানকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু দৃপ্তস্বরে আমাকে সম্মুখে টানিয়া বলিলেন, "এই বালক নারায়ণের মত, এর পা ছুঁয়ে তুই বল যে আর কখনও এমন কাজ করবিনে, তাহলে তোকে ছেড়ে দেব।"

আরমান দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল। বড় হইলে সে আমায় বলিয়াছিল যে সে আর কখনও চুরি করে নাই, কিন্তু সে কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার দিকে চাহিয়া আদেশের মত বলিলেন "ওকে ছেড়ে দাও।" বাবা ও কাকা জোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। এমন চোরকে কায়দায় পাইয়া ছাড়িয়া দিলে যে সমূহ সর্ব্বনাশ হইবে সে কথা বার বার বলিলেন। কিন্তু ঠাকুরমা অবিচলিতা রহিলেন।

আরমান মনের উল্লাসে ফিরিয়া গেল। সেই হইতে সে আর আমাদের অবাধ্যতা করে নাই, এবং কালেভদ্রে আনুগত্য স্বীকার করিয়া মহদুপকার সাধন করিয়াছে।

গৌরবময়ী পিতামহীর এই তেজোদীপ্তি আজিও আমার চোখে যেন ঝলসিত হইতেছে। কিন্তু যে বালকের মাঝে তিনি নারায়ণের প্রকাশ অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন, সংসারের ধূলি ও কাদায় সে মলিন হইয়া গিয়াছে।

অতীতের কথা যখন মনে পড়ে, তখন ভাবিতে বসি, হায়! যে দেবতাকে তুমি জাগাইতে চাহিয়াছিলে, সে কি কখনও আমার অন্তরে জাগিবে না? তৃষিত মরুর দাবদাহ লইয়া কি জীবন বহিয়া চলিবে?

কে জানে কখন কি হয়? তাঁর সাধনা যে পিছনে রহিয়াছে তাইত অন্ধকারের মধ্যেও কিছু কিছু জ্যোতিরেখা আজিও দেখিতে পাই।

শ্রীমতিলাল দাশ

অহমিকা

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা

অন্তরযামী তিনি
অনাদি কারণ—
সকলি জানেন তবু
রাখেন গোপন।
কিন্তু হায়! অর্থহীন
এমনি সংসার—
যতটুকু জানে—তা'র—
দ্বিগুণ চীৎকার।

বিচার

(পারসী হইতে)

বাহুতে অসীম বল
তা'বলে কি তবে-
হীনবল জনে তুমি
পীড়ন করিবে?
আজিকে করিলে বটে
দুর্ব্বলে পীড়ন,
জানিও রাজার রাজা
আছে একজন!

—o—

নব-বধূ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সরকার

নব-বধূ, নব-বধূ—
সলাজ সভয় তোরি মনোময় কেবলি স্বপন কেবলি মধু!
কল্পলোকের উর্ব্বশী তুই মন্দার-পারিজাতের রথে
বাহিরিলি কি গো স্বপন-পুরীর আধ-আলো আধ-ছায়ার পথে?
সাত সাগরের ওপারে ঘুমায়ে ছিল যে রাজার দুলালী মেয়ে
সে বুঝি আজিকে জাগিয়া উঠিল তোরি অঙ্গের লাবণি বেয়ে!
পথে পথে তোর রাঙা-অনুরাগ ঝরা অশোকের শতেক দল
ছন্দোলীলায় বকুল বিলায় মুগ্ধ প্রাণের কী পরিমল!
অন্তরে তোর রঙের বিলাস কুঙ্কুমে তোর ও তনু ছায়
পদ্মনালের চারু অলক্ত রঞ্জিত তোর রাঙা দু'পায়।

অঙ্গ ঘেরিয়া অম্বর তোর উদয়-রাগেরি মতন রাঙা,
রক্তিমঘন সোহাগ সরম—অভিমান ক'র যেনরে ভাঙা!
দু'নয়নে তোর দূর আকাশের স্বচ্ছ গভীর সুনীল লেখা
বাঁকা চোখে তোর আঁকা পল্লব যেন দিগন্তে ভোরের রেখা!
আঁখি ভরা তোর কাজল-ছায়ার জাগে ভাষাহীন যে-মুখরতা
সে যেন সজল মায়া-সুগহন প্রথম শ্রাবণ-মেঘের কথা!
রাঙা কপোলের রাঙা ও পুলক লোধ্র-পরাগ-রেণুর দানে,
অলকার শ্বেত-চন্দনে কোন্ অলকার স্মৃতি বহিয়া আনে!
সিঁথির সিঁদুরে জাগিয়াছে তোর কল্যাণ-পূত মহিমা-ধারা,
সজল জলদ-কালো-কুন্তল ভুজগ বেণীর বাঁধনে হারা।

শুচিতায় তুই শকুন্তলাগো যুগে যুগে তপোবনের মেয়ে,
নিঝর-ধারার সরলতা তোর কোমলাগো বনফুলের চেয়ে।

দখিনায় ওই গায়' বধূ তোর আবাহনী বেণু-বনের মাঝে
গগনের নীল আঙিনায় তোর মঙ্গল-শুভ শঙ্খ বাজে।
আয় আয় ওগো কল্যাণি, আয় জীবনের ভরা নদীর কূলে,
হাসি ও গানের উজানে আজিকে সুরের দোলায় আয়গো দুলে!
নিবিড় ঘুমের আকাশ-কুসুমে আন্ জাগরণ—রূপের কায়া,
কামনার খর-বৈশাখে আয় মিলাইয়া দে'গো মেদুর ছায়া।
বধূ তোর আজি আলো অভিসার অঙ্গে উষার রঙের ভূষা
খোল্ ওগো তোর মুকুল হিয়ার গন্ধ-উতল ও' মঞ্জুষা।
ফুল-বাসরের জাগর-শয়নে যে-ভীরু ভাষায় জাগিবে হিয়া
এঁকে দিয়ে যাস্ রাতের তারায় স্পন্দিত তারে আবেগ দিয়া!

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

সাইকেলে শান্তিনিকেতন

শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধ্যায়

[স্কাউট সাইক্লিষ্ট ক্লব]

এত ছোট ভ্রমণকাহিনী হয়ত লিখতে বসতুম না যদি এই ভ্রমণ একজন বিদেশীকে নিয়ে আমাদের দেশের একজন মহাপুরুষ ও তাঁর কার্য্যকলাপ দর্শনের উদ্দেশ্যে না হত। যাত্রী আমরা তিনজন—মিঃ পুংটাক মিং (Poon-Tuck-Ming), অতুল চক্রবর্ত্তী ও আমি নিজে।



মিঃ পুং টাক্ মিং (মধ্যে), অতুল চক্রবর্ত্তী ও লেখক

সুদূর চীন থেকে একলা বেরিয়ে পুংটাক্ সাইকেলে ভূ-প্রদক্ষিণ করবার মানসে কলকাতায় এসেছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তাঁর কাছে গেলাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বল্‌তে পারেন। অল্প পরিচয়েই বন্ধুত্ব জ'মে গেল এবং মনে হতে লাগল তিনি যেন আমাদেরই দলের একজন। এত ভাল লাগল যে আমরা একদিন আমাদের ক্লাবে তাঁর অভি-নন্দনের বন্দোবস্ত করে ফেললাম। বাঙ্গলার প্রাদেশিক স্কাউট সঙ্ঘের সেক্রেটারী এবং ক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধাস্পদ নৃপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রে এই ক্লাবের পক্ষ থেকে যথাযোগ্যভাবে পুংটাককে অভিনন্দিত করেন। এই সভার জন্য নির্ব্বাচিত কিছু আমোদ-প্রমোদের পর মিঃ পুংটাকমিং তাঁর ভ্রমণকাহিনী চীনা ভাষায় বিবৃত করেন। চীনা ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণ সকলেরই কাছে এই প্রথম এবং বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। মিঃ লা (Wei Lai) Chinese Journal of Indiaর সম্পাদক এই বক্তৃতা ইংরাজী ক'রে উপস্থিত সকলকে বুঝিয়ে দেন।

কয়েক দিন কলিকাতায় অবস্থিতির পর পুংটাক মিং কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আমাদিগকে তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। ২১শে এপ্রিল সকাল ৮টার সময় Weston Streetএর Chinese Library

---

স্কাউট্ সাইক্লিষ্ট ক্লাবের সভ্য কর্ত্তৃক কয়েকটি অভিযান

১।	কলিকাতা	হইতে	নলহাটি	...	১৪৫ মাইল (পদব্রজে)
২।	ঐ	ঐ	ভাগলপুর	...	২৮৪ মাইল (সাইকেলে)
৩।	ঐ	ঐ	হুড্রু জলপ্রপাত, গিরিডি এবং হাজারিবাগ হইয়া		৪০৬ মাইল ঐ
৪।	ঐ	ঐ	গয়া, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি হইয়া কাশ্মীর		২০০০ মাইল ঐ
৫।	ঐ	ঐ	শান্তিনিকেতন	...	১২০ মাইল ঐ

১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে হঙ্গারী দেশে International Scouts' Jamboree হবে স্থির হয়েছে। বেঙ্গল স্কাউট সাইক্লিষ্টস্ ক্লাবের কয়েকজন সভ্য তথায় যোগদান করতে চেষ্টা করছেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এন্, এন্ বসু তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করছেন।

থেকে তিনজন বেরিয়ে হাওড়ায় এসে চা ইত্যাদি খেয়ে G. T. Road ধরে বরাবর চললাম। ক্রমশঃ শ্রীরামপুর চন্দননগর পেরিয়ে ব্যাণ্ডেলে এলাম। চনচনে কাট-ফাটা রৌদ্র; ভয়ানক জলতৃষ্ণা পেয়েছে। ঘড়িতে চেয়ে দেখি বারটা বেজে গেছে। একটু জল খাবার জন্যে নামা হল। মাটিতেও পদার্পণ আর গা দিয়ে অসম্ভব রকমে ঘামের ধারা বইতে আরম্ভ হল। মিঃ পুংটাক মিং বলল, ভারতে যে এত গরম হতে পারে আগে তার সে ধারণাই ছিল না। স্থির হল বেলা চারটার সময় পুনরায় যাত্রা সুরু করা যাবে। একটী ভদ্রলোক আমাদের এই গরমে গাছতলায় বিশ্রাম



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের সহিত ফটো তোলা

করতে দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বাড়ীতে ডেকে যায়গা দিলেন।

চারটে বাজতেই যাত্রারম্ভ। তখনও বেশ রৌদ্রের তাপ রয়েছে। মগরা পাণ্ডুয়া পার হবার পর হঠাৎ পুংএর চাকায় লিক্ হল। টায়ার ত খালি হাতেই কোন রকমে খুলে ফেলা গেল। গোলমাল বাধল পরানোর বেলা। পুং বলেছিল সে সব যন্ত্রপাতি আনবে, কিন্তু যথাসময়ে আনতে ভুলে গিয়েছিল। শুধু হাতে টায়ার পরানোর বিফল চেষ্টায় ক্রমে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজল। কোনও উপায় নাই দেখে পুং তার সাইকেল কাঁধে করে চলতে আরম্ভ করল।

এখান থেকে বৈঁচি দু মাইল; আজ এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে রাত্রি যাপনের জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া গেল। ষ্টেশনে এসে অতুল বলল, অশোকদা যেখানে লিক হয়েছিল sun glassটা সেখানে ফেলে এসেছি। অন্ধকার পথে দু মাইল ফিরে গিয়ে sun glass খুঁজে বার করা অসম্ভব, যেতে ইচ্ছেও হল না। বললুম, 'দুঃখ করো না ভাই, ও রকম sun glass তোমার অনেক হবে।' ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে waiting roomএ থাকা গেল। খাওয়ার ব্যবস্থা হল হরি মটর।

সকালে একটা দোকান খুঁজে বার করে সাইকেলটা সেরে নেওয়া গেল। বর্দ্ধমানে পৌঁছে খাওয়া দাওয়া করে বিকেলে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলাম। তালিতে পৌছালাম। এখান থেকে আমরা G. T. Road ছেড়ে ডান দিকের একটী রাস্তা ধরলাম। এই রাস্তাই বোলপুর গিয়েছে। মাইল দুই আসার পর এর নাম যে কেন রাস্তা হল তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এত বিশ্রী রাস্তা যে মাঠ বললেও ভুল হয় না।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলে আমরা বোনপাসে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে মেঠো রাস্তা দিয়ে অন্ধকারে যাওয়া অসম্ভব দেখে ষ্টেশনে platform এর উপর শুয়ে পড়ে মনের আনন্দে গান আরম্ভ করে দিলাম। পুং একটী চীনা গান গাইল। বেশ অদ্ভুত লাগল। কিছু সময় এই রকম করে কাটিয়ে সকলেই একে একে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আজ ২৩শে এপ্রিল, বোলপুর পৌঁছতেই হবে। রাস্তা আর ভাল হবার নামও করছে না দেখে সাইকেলের হাতল জোর করে ধরে সাবধানে গাড়ী চালিয়ে চলেছি পাছে গাড়ী হঠাৎ লাফিয়ে উঠে উলটে যায়। কেমন লাগছে পুংটাককে জিজ্ঞেস করলাম। সে তার কোমরে হাত দিয়ে হেসে ফেলল। বুঝলাম সকলেরই এক দশা। বেলা দশটা নাগাদ জল খাবার অভিপ্রায়ে এক জায়গায় সকলে নেবে

পড়লাম। Water bottleএর জল খেতে গিয়ে দেখলাম খাবার জল চায়ের জলে পরিণত হয়েছে। অগত্যা একটু সুশীতল জলের প্রত্যাশায় গৃহস্থ-গৃহে উপস্থিত হলাম। গৃহ-স্বামী কিছু গুড় আর জল খাওয়ালেন এবং দুপুর বেলাটা তাঁর বাড়ীতে বিশ্রাম নেবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। গরমের মাত্রাটা কিছু বেশী দেখে থাকাই স্থির হল।

আমাদের সহিত এই চীন জাতীয় যুবকটীকে দেখে ভদ্রলোকটির কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছিল। অবশেষে থাকতে



রবীন্দ্রনাথ-সহ ফটো তোলা

না পেরে অল্পক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলেন কিরূপে আমাদের পরস্পরের মিলন ঘটল। পুংটাকের কাহিনী তাঁর নিকট বিবৃত করলাম। সব শুনে তিনি বিশেষ গর্ব্বের সহিত আনন্দ প্রকাশ করলেন যে, আজ আমাদের মত ব্যক্তি বিশ্রামের জন্য তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি।

বেলা চারটা আন্দাজ বাহির হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্চি হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক চা লুচি ইত্যাদি এনে উপস্থিত। অপ্রস্তুতে পড়লাম, কারণ এই গরমে আমাদের জন্যে এগুলি প্রস্তুত করতে কত কষ্ট পেতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। যা হউক অবশেষে সেগুলির সদ্ব্যবহারও করা গেল। পুং লুচির খুব তারিফ করল।

চারটার সময় বেরিয়ে সন্ধ্যের সময় আমরা অজয় নদীর ধারে এসে পৌছলাম। নদীর এক জায়গা দিয়ে সামান্য স্রোত বয়ে যাচ্ছে; জুতা মোজা খুলে সকলে পার হলাম। নদীর এপারে এসে খানিকটা খারাপ রাস্তার পর ভাল রাস্তা পেলাম; গাড়ীও খুব জোরে ছুটতে লাগল। সাড়ে সাতটার সময় বোলপুর পৌছে সামনেই বাজার দেখে খিদে জেগে উঠল। বাজারে বসে সকলে খাওয়া সারা গেল।

এখান থেকে শান্তিনিকেতন দু'মাইল; কয়েক মিনিটের মধ্যেই তথায় হাজির হলাম। এখানকার ম্যানেজার মহাশয় Guest Houseএ থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। এ দুদিন রাস্তায় স্নান করবার সুবিধা পাওয়া যায় নি, তাই রাত্রেই স্নান করে ঠাণ্ডা হ'য়ে নিলাম।

পরদিন সকালে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের সহিত দেখা করতে গেলাম। ইনি অতি মিষ্টভাষী অমায়িক ব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথের সহিত চীন গিয়েছিলেন। আমাদের সহিত

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করলেন। এখানে আমাদের আসার উদ্দেশ্য তাঁকে বললাম। তিনি প্রথমে বললেন কবির শরীর



উত্তরায়ণ—শান্তিনিকেতন
কবির বাসভবন

অসুস্থ সেইজন্য আজকাল কারো সহিত দেখা করতে পারছেন না; অবশেষে আমাদের আগ্রহ ও কষ্টের কথা শুনে, যাতে আমরা রবীন্দ্রনাথের দর্শন পাই সে বিষয়ে কবির সেক্রেটারী মহাশয়কে চিঠি দিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আমরা যে-ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম, তার আসবাব পত্রগুলি কি সুন্দর! সবগুলিরই মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে; অথচ খুব মূল্যবানও কোনটা নয়। সাড়ে নটার সময় কবির দর্শন পেলাম। কি সৌম্য-শান্ত মূর্ত্তি! তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করলাম। আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি খুব খুসী হইলেন এবং তাঁর চীন ভ্রমণের কথা আমাদের বললেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর আমরা তাঁর হস্তাক্ষর গ্রহণ করলাম এবং তাঁর ছবি তুলবার জন্যে অনুমতি নিয়ে আমরা তাঁর সহিত ছবি তুললাম। তিনি আমাদের খুব উৎসাহিত করলেন। পুনরায় তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে আমরা বিদায় নিলাম।

তারপর আমরা শান্তিনিকেতনের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানের ফটো নিয়ে ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলাম। সর্ব্বত্রই কি সুন্দর বন্দোবস্ত। শান্তিনিকেতনের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক দিন ছাত্রদের মধ্য হ'তে একজন ক'রে গাইড্ নির্ব্বাচিত হয়। তাঁর উপর সমস্ত দেখাবার শুনাবার ভার। তেমনি একজন গাইড্ আমাদের সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাতে লাগলেন।

এখানকার ক্লাসগুলি কলিকাতার ন্যায় বদ্ধ কামরায় হয় না দেখে অত্যন্ত খুসী হলাম। উন্মুক্ত বৃক্ষতলে ক্লাস্ হয়। গত বৎসর যখন সাইকেলে কাশ্মীর যাই তখন পাঞ্জাবে এইরূপ open air ক্লাসের বন্দোবস্ত অনেক জায়গায় দেখেছিলাম। আমরা একে-একে রবীন্দ্রনাথের বাটী, লাইব্রেরী ভবন, কলাভবন, হাঁসপাতাল, ছাত্রাবাস, অতিথি ভবন প্রভৃতি দেখে আচার্য্যদের বাসস্থানে



শান্তিনিকেতনে গাছতলায় একটি ক্লাস্

গিয়ে হাজির হ'লাম। এঁরাই বাস্তবিক শিক্ষাগুরু এবং শিক্ষা দেবার প্রকৃত অধিকারী। পুরাকালের অধ্যাপকদের ন্যায় এঁরা

সামান্ত ভাবে কুটীরে বাস ক'রে শিক্ষাদানই জীবনের ব্রত ক'রে নিয়েছেন এবং ছাত্রদের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

পরিতৃপ্ত হ'ল। বিকাল বেলা খুব খানিকটা সাইকেল ক'রে ঘুরে বেড়াইলাম, কয়েকজন ছাত্রও আমাদের সহিত যোগ দিল। এখানে রাত্রে বিজলী-বাতি জ্বলে। সন্ধ্যার অপূর্ব্ব



বোলপুর রেল ষ্টেশন্

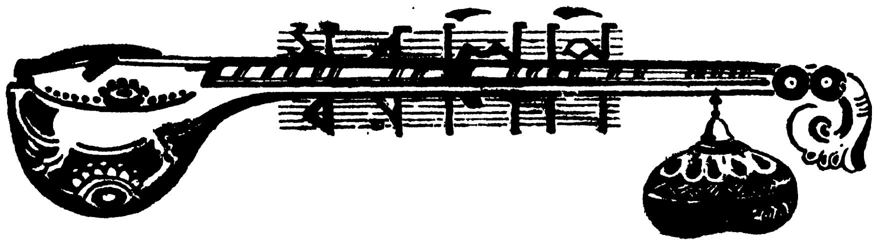
আহারের সময় ছাত্রদের সহিত একত্রে আহারে বসলাম। পরিবেষণের ভার থাকে ছাত্রদের উপর। সকলেই যেন এখানকার এক পরিবারভুক্ত। এই সুযোগে অনেক অধ্যাপক এবং ছাত্রের সহিত আলাপ হ'ল। পুং টাক বাঙ্গলা দেশীয় অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার ক'রে খুব

মায়া বিস্তারের সহিত মনে হল শান্তিনিকেতন যথার্থই শান্তিনিকেতন।

পরদিন প্রাতে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের নিকট বিদায় নিয়ে কলিকাতাভিমুখে রওনা হলাম।

শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়





গান *

আমার মিছে সব—
আকাশ-ভরা আলো,
          ফুল-হাসি কলরব !
নদী কুলু কুলু বয়ে যায়, হায়রে,
কি ব্যথা সুরে কয়ে যায় !
প্রাণ মুরছি পড়ে যে লুটায়ে,—
          কি দুখ নব নব ।

পাখীর গানে আকুলতা,
ভোরের আলোয় কি বারতা—
সজল আঁখি কি বেদনায়, হায়রে,
নিখিলের এই মিলন-মেলায়
          হতভাগিনী !
এ বেদনা কারে কব ! কারে কব !

কথা—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

I সর্সা -র্া ণধা পমা I জ্ঞা জ্ঞা রা সা । ন্সা রমজ্ঞা রা -া । -া -া -া -া I
আ - মা - - - - র্ মি ছে স- - - ব - - - - -

I সগা গা গা পমা । গা -া -া মসা । সা গা -া রগপা । মা -া -া -া I
আ কা শ্ ভ রা - - - আ - - - - - লো - - -

I ম্া মা রা মজ্ঞা । রা -া পরা রা । রা সরমা মা -া । জ্ঞা -া রা সা II
ফু ল হা - সি - ক ল র - - ব - - - - -

* লেখক-রচিত "স্বয়ংবরা" নাটকে সাবিত্রীর গান

{ I মা মা পা ধা । না র্সা র্জ্ঞা র্রসা না । র্সা -র্া -র্া র্সা । ধা র্সণা ধপা ধা I
ন দী কূ লু কু লু ব - - য়ে যা - - য় হা য় রে - -

I ণা র্রা র্সা র্রর্মর্জ্ঞা । র্রা -র্া -র্া -র্জ্ঞা । র্সর্রা র্রর্মা র্জ্ঞর্মর্জ্ঞা র্রা । র্সর্রর্সনা র্সা -র্া (মা) } I
কি - ব্য - - - প্রা - - - স্থু - রে - ক - - য়ে যা - - - - - য়্

-র্সা I নর্সর্রা র্সা ণা ধা । প ণা ণা র্সা -র্া । র্সা নর্রা র্সা -র্া । ণা ধা পা -া I
য়্ প্রা - - ণ মু র ছি - - - - - প ড়ে - গো - লু টা য়ে -

I পা ধপা মা গা । মা -া -া মপা । জ্ঞমা মা জ্ঞা রা । সা -া -া -া II
কি - - ছু - খ - - - - - ন ব ন - ব - - - -

I মধা ধা ধা সণা । ধা -া -া পমা । ধা পা ধা ণা । ণা -া ধা পা I
পা খী র্ গা নে - - - - আ - কু ল তা - - -

I না না না র্সা । না -া -া পা । না র্সা র্সর্রর্জ্ঞর্রর্সা না । র্সা -র্া -র্া -র্া I
ভো রে র আ লো - - - য় কি - বা - - - - র তা - - -

{ I মা মা পা ধা । না না র্সা র্রা । না র্সা র্সা -র্া । ধা র্সণা ধপা ধা I
স জল্ আঁ খি কি - বে দ না - য় - হা য় রে - -

I ণা র্রা র্সা র্রর্জ্ঞা । র্রা -র্া -র্া -র্জ্ঞা । র্সর্রা র্রর্মা র্জ্ঞর্মর্জ্ঞা র্রা । র্সর্রর্সনা র্সা -র্া (মা) } I
নি খি লে -র্ এ - - - মি - ল - ন্ - - যে লা - - - - - য়

-র্সা I র্সর্রা র্সা ণা ধা । পধণা ণা র্সা -র্া । র্সা র্রর্সা ণা ধা । পা -া -া -া I
য়্ হ- ত ভা গি নী - - - - এ - - বে দ না - - -

I পধা পা মা গা । মা -া -া -পা । জ্ঞমা মা জ্ঞা রা । সা -া -া -া II II
কা - রে ক - ব - - - - কা রে ক - ব - - - -

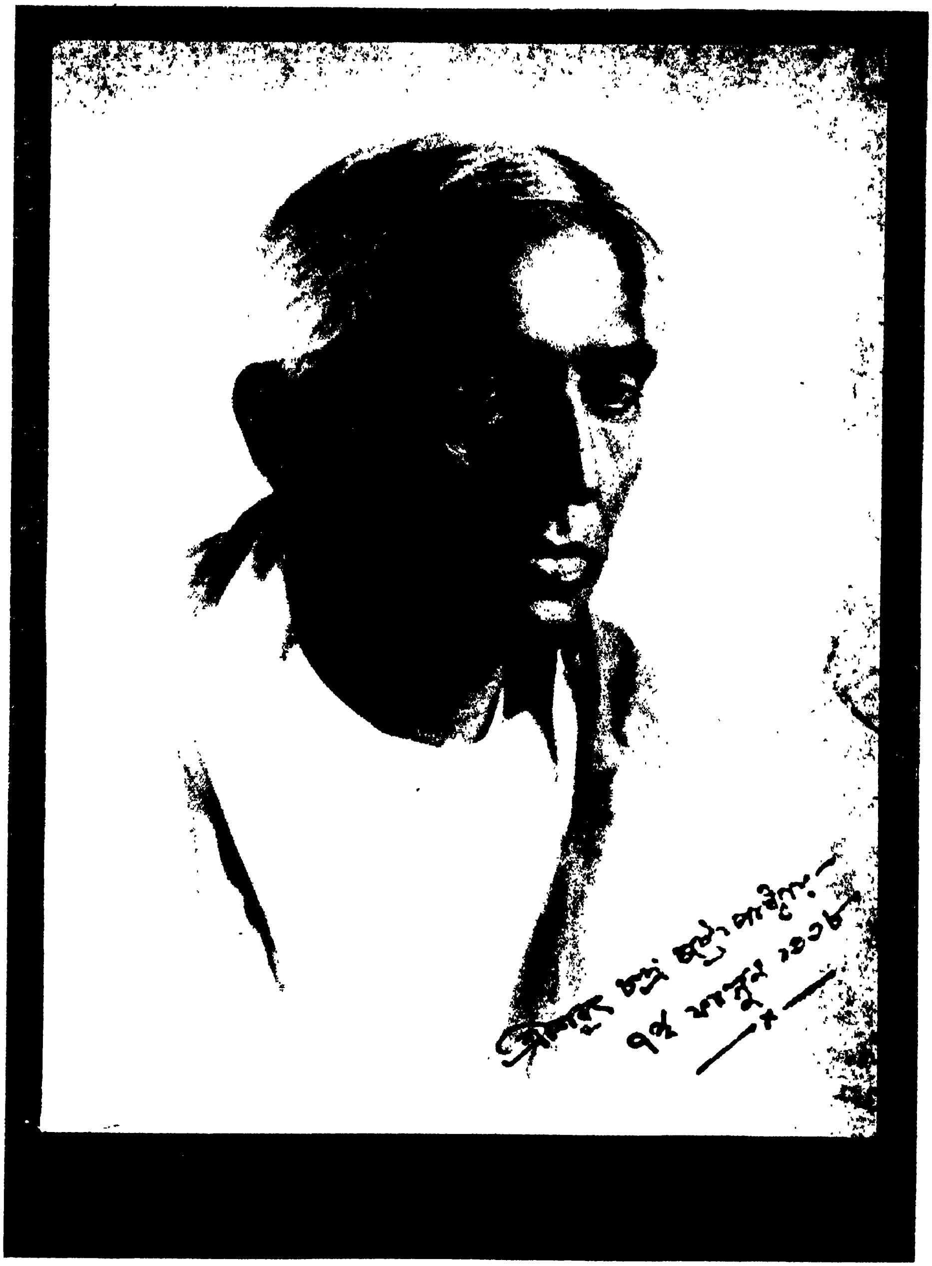
শরৎচন্দ্র

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ

পূজারিণী সব ছুটিয়া চলেছে
পূজা অঙ্গন বেদী-তলে—
সাজাইয়া ডালা ফলফুলমালা
সিঁন্দুর টিপ্ ভালে জ্বলে !
বলে "ওগো খোলো মন্দির দ্বার,
বিলম্ব মোরা করিব না আর ;
কতদিন ধরে' পীড়নের ভার
স'বো বল আর পলে পলে !
ব্যথার উৎস লুকাবো গো কত
শত-হাসি-মাখা শত ছলে !"

এ দেবতা নয় হৃদয়-বিহীন
পাষাণের স্তূপ, চির-উদাসীন।
চির-অমৃত এযে চিরদিন
ব্যথাতুর জনে নিয়ে কোলে
বলে 'আয় তোরা বুকে আয় মোর,
চিরদিন তরে ভুলে যারে তোর
শত দুঃখের গ্রন্থির ডোর
খুলে ফেলে আয় পায়ে দ'লে—
নির্য্যাতনের নিঠুর শাসন
হাসিভরা মুখে অবহেলে।

মন্দির দ্বার খোলো আজি ত্বরা—
হৃদয়-অর্ঘ্যে সাজি যে গো ভরা,—
নব উপচার সঞ্চিত করা—
কোটি নরনারী-আঁখিজলে
কণ্টক ফুলে গাঁথা এ মাল্য
ধরিব তোমার পদতলে।



শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[এই ছবিটির ফটোগ্রাফ্ প্রদান ক'রে
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায় 'বিচিত্রা'র
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন]

"— নন্দদা —"

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

মাঘ মাস। আগের মাসটা পৌষ মাস গিয়াছে। এ রকম প্রত্যেক বছরই যায়, এবারও গেল। সোনার দর ক্রমশঃ চড়িয়া যাইতেছে, গত মাসে বিবাহের দিন না থাকায় কুমার-কুমারীর সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং বিবাহের ঘটা এমাসে কেমন বলাই বাহুল্য। আমাদের মেসের পাশে যে পুরোহিত মহাশয় সন্ধ্যা বিল পাশ হইবার মুখে একতলা পাকা বাড়ী ফাঁদিয়াছিলেন, এবার তিনি সগৌরবে দোতলা উঠাইয়া আমাদের ঘরের পশ্চিমদিকের একটি মাত্র জানালাও বন্ধ করিয়া দিলেন। শীতকাল, বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই, কাজেই হোগলার চালা আর নজরে পড়ে না, লোকে শস্তায় একটা সামিয়ানা যেমন-তেমন করিয়া খাটাইয়া কাজ চালাইতেছে। ঝি বলে 'বাজারে আগুন লেগেছে।' মিথ্যাকথা! আগুন দেখিবার জন্য বাজারে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম, আগুন লাগে নাই, জিনিসের দাম বাড়িয়াছে। সেটা সত্য। এ বাজারে কপি কড়াই শুঁটি কিনিয়া খাইবার মত পয়সা নাই—উইলিংডন ব্রিজ খোলার পর হইতে রেল কোম্পানী কতকগুলি কপি স্পেশ্যাল চালাইতেছে, তবুও বাজারের চাহিদা মিটিতেছে না। শুধু আলু সম্বল করিয়া দিন কাটাইতেছি।

শীতকাল বটে,—কিন্তু শীত একেবারেই নাই বলিলে হয়, কারণ গলির ও পারের বাড়ী হইতে কোকিলের ডাক মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। ছয় ঋতুর মধ্যে গরমের ভাগটা বাড়িয়াই চলিল—দেশটা ক্রমে না আফ্রিকা হইয়া যায়। দিন দিন গায়ের রং কালো হইয়া যাইতেছে, অথচ ঠাকুমা বলেন আমি নাকি ছেলেবেলায় খুব ফর্সা ছিলাম। আর একটু গরম পড়িলে একটি দেশী 'স্নো' বাহির করিব ভাবিতেছি—মেয়ের বাপেরা খুব কিনিবে। সকলেই সুন্দরী পাত্রী চায়।

বিয়ের কথা বলিতেছিলাম। আমার নিজের নয়—সে অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, বয়সও অনেক হইল, তবুও চারিদিকে সানাই শাঁখের শব্দে থাকিয়া থাকিয়া একটু রঙীন্ স্বপ্ন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। নিজের আর বিয়ে করিবার ইচ্ছা নাই। সত্য বলিতে কি ইচ্ছা থাকিলেও খরচে কুলাইয়া উঠিতে পারিব না। তবু দুই চারিটি নিমন্ত্রণ, বিয়ে বাড়ীর হৈ চৈ, বাসর-ঘরের আনন্দ কোলাহল—মন্দ লাগে না। কিন্তু পোড়া অদৃষ্টে এ মাসে একটিও নিমন্ত্রণ জুটে নাই।

সেদিন সন্ধ্যায় নন্দদার ঘরে নিয়মিত ভাবে সভা জমাইয়া বসিয়াছিলাম। ঐক্যতান বাদ্যের বিভিন্ন যন্ত্রের মত চেহারার বৈষম্য সত্ত্বেও এক মণিভূষণ ছাড়া আমরা আর সকলে ছিলাম একতালে বাঁধা, তাহা না হইলে আমাদের অফিসার সাহেবদের জীবনযাত্রার সুর যে কাটিয়া যায়। পাকা ওস্তাদের হাতে আমরা ঠিক আইন-মাফিক বাজি, কিন্তু অতি আধুনিক মণি তার অতি তারুণ্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে আমাদের মধ্যে এমন এক প্রলয়ের সৃষ্টি করে যে অনভিজ্ঞের হাতে যন্ত্রের মত আমরা বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন গ্রামে চীৎকার করিতে সুরু করি, এবং তাহাতেই আমাদের সভা জমে। আমরা সকলে পাকা কেরাণী—, যে সব উদার হৃদয় ও মহৎ সংকল্প এই সব বত্রিশ ইঞ্চি বুকের মধ্যে অল্প বয়সে উঁকি ঝুঁকি মারিত তাহারা এখন সংসারের চাপে বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ভুঁড়ির মধ্যে ভালো করিয়াই চাপা পড়িয়াছে, কাজেই মণির সঙ্গে সকলেরই একটু আধটু তর্কাতর্কি হয়। সেটা বিশেষ কিছুই নয়—, একে অল্প বয়স, তাহার উপর সম্প্রতি পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে। অন্ধকার হইতে হঠাৎ বেশী আলোয় আসিলে সবার চোখেই প্রথম একটু ধাঁ ধাঁ লাগে। আমাদের বয়সে ও-সব ঠিক হইয়া যাইবে, তখন দেখিবে এই বাঁধা গভীর

মধ্যে চলিয়া বেড়াইতেই আরাম। নহিলে ছেলেটি ভাল। পঁয়তাল্লিশ টাকা সম্বল করিয়া দেশ হইতে এই মেসে আসিয়া উঠিয়াছিল মাস তিনেক আগে। সে টাকা ফুরাইবার আগেই এই বাজারে আশী টাকার একটি চাকরী যোগাড় করিয়া লইয়াছে, কেমন করিয়া তাহা আমাদের জানা নাই। কয়েকদিন হইল তাহাকে একটু গম্ভীর, অন্যমনস্ক দেখিতেছি; বোধ হয় প্রেমে পড়িয়াছে। আজ সান্ধ্য সভায় তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না, খুব সম্ভব দরজায় খিল লাগাইয়া প্রেমের কবিতা লিখিতেছে।

থাকিয়া থাকিয়া নন্দদা'র সিগারের আগুনটা অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিতেছে। চুপচাপ বসিয়া বসিয়া একটি সাদা-মত শূয়োরকে কয়েকটি চীনা কেমন হেঁটমুণ্ডে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে তাহাই দেখিতেছিলাম। কিছুদিন আগে ছোট নাগপুরে সর্ব্বত্র শূয়োরের পাল এবং খাইবার জিনিসের অভাব দেখিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলাম—যে পুনর্জ্জন্ম বলিয়া কোন জিনিষ যদি একান্তই থাকে, তবে এদেশে জন্মিলে যেন শূয়োর হইয়াই জন্মাই। দেশে শাক-সব্জী-ঘাস পালার একান্ত অভাব হইলেও না খাইয়া মরিতে হইবে না। আজ শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে বলিলাম, হে ভগবান্ জীবনে অনেক কিছুই তোমার কাছে চাহিয়াছি, কোনটাই পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এ টুকুও যেন অপূর্ণ থাকে। হেঁটমুণ্ডে ঝুলিয়া থাকা আমার সয় না, তাহাতে ব্লডপ্রেসার বাড়ে।

পরজন্মের চিন্তায় বিভোর ছিলাম এমন সময়ে সিঁড়িতে দুপ্ দাপ্ শব্দে সচকিত হইয়া উঠিলাম। অনেকগুলি পায়ের আওয়াজ, পুলিশের লোক, না স্বদেশী ডাকাত? ভয়ে বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল,—উঠিয়া গিয়া যে আলোটি জ্বালিব তাহারও সাহস হইল না। আলো তাঁহারাই জ্বালিলেন। চেহারাগুলি দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইলাম—, পুলিশের লোক হইতে পারে বটে, কিন্তু আর যাই হোক্ স্বদেশী ডাকাত হইবার মত আকৃতি নয়। যাক্ সন্ত সন্ত গুলি খাইয়া মরিতে হইবে না, মন্দের ভাল! পুলিশ হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ এই আটত্রিশ বছরের জীবনে রাজনৈতিক কলঙ্কটুকু লাগিতে দিই নাই। অনাহূত অথিতিদের মধ্যে যেটির চেহারা নীলকুঠির নায়েবের মত তিনি আগাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"মশাই, মণিভূষণ চাটুজ্যে এখানে থাকে?"

যাক্, আমাদের নয়। হাঁফ ছাড়িয়া একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। মণির ঘর দেখাইয়া দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা কি, ইয়ে, থানা থেকে আসছেন?' তাও নয়—একটা আফিসের নাম বলিলেন। সেটা মণিরই আফিস।

নন্দদা চুপি চুপি বলিলেন, "বোধ হয় ক্যাসের টাকা ভেঙ্গেছে।"

বিনয় বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহু", তাহলে সঙ্গে পুলিশ থাকতো। বোধ হয় ওই বুড়োর মেয়ের সঙ্গে লভে পড়েছে, বুড়ো পিটিয়ে ঘাড় থেকে ভূত নামিয়ে দিয়ে যাবে।"

এদিকে মণিকে ততক্ষণে তাহারা কয়জনে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া লইয়াছে আসিয়াছে; সদ্দার পোড়োটি আগে আগে আসিতেছেন, আর অবাধ্য ছাত্রের মত মণি তাহাদের কোলে হাত পা ছুঁড়িতেছে। সুবোধের সঙ্গে মণির তর্ক প্রায়ই ঝগড়ায় গিয়া দাঁড়াইত—তবু এখন সে-ই সব প্রথম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বুড়ার পথরোধ করিয়া বলিল, "একি?"

যেন কিছুই নয় এমন ভাবে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে আজ দুইমাস আগে তাঁহার মেয়েকে বিবাহ করিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া মণি তাঁহার অনেক নিকট ও দূরসম্পর্কীয় শ্যালককে বঞ্চিত করিয়া এই ডিপ্রেসনের বাজারে আশী টাকার চাকরীটি তাঁহার কাছ হইতে যোগাড় করে। তাঁহার ঘরের পাত্র কলিকাতায় সহজে পাওয়া যায় না। মণির ভরসায় তিনি মেয়ের বিবাহের উদ্যোগ করিয়া বসিয়াছিলেন। হইলই বা মেয়েটি একটু কালো আর একটু এরকম-সেরকম, তাই বলিয়া বিয়ের দিনে নিরীহ ভদ্রলোকের জাতিকুল মারিবার চেষ্টা মোটেই ভাল নয়। লগ্ন আসিয়া পড়িল প্রায়, তাই বরকে সময় থাকিতে তাঁহারা নিজেদের হেফাজতের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন।

বর ধেই ধেই করিয়া নিজের কনে খুঁজিয়া বেড়াইবে,

অথবা পাত্রী বিয়ের আগে পাত্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে, 'আমি তোমায় ভালবাসি,'—এসব মণিভূষণি চাল সুবোধের বিরক্তিকর হইলেও এই চ্যাংদোলা করিয়া ধরিয়া লইয়া বিবাহ দেওয়ার মত অসহ্য নয়। পারিলে সে ছুটিয়া গিয়া থানা অথবা সি, এস, পি, সি, এ'র অফিসে খবর দিত। উপস্থিত সে সব অচল, তাই সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করিয়া মরিয়া হইয়া হাতের আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে সে বলিল, 'সে হ'তেই পারে না।'

সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠিয়া দাঁড়াইলাম—না, সে হতেই পারে না।

অফিসের বড়বাবু আর যাই হোন এটুকু জ্ঞান তাঁহার ছিল যে সকলেই তাঁহার অফিসের কেরাণী নয়, এবং জোরজবরদস্তি এখানে খাটিবে না। কিন্তু মণির মৃত্যুবাণও তাঁহার তূণে জমা ছিল,—এখন সেইটি ছাড়িলেন। বলিলেন, স্বইচ্ছেয় বিয়ে করতে না চাইলে জোর করে আমি দিতে চাইনে, তবে উইলসন সাহেব অনেক দিন থেকে লোক ছাড়াতে বল্‌ছে।" মণির লম্ফঝম্ফ থামিয়া গেল। বড়বাবু বলিয়া চলিলেন, "এই বাজারে মা, বিধবা বোন, নাবালক ভাই নিয়ে দেশের ভাঙ্গা বাড়ীতে পাঁচটি প্রাণী, সে বাড়ীটুকুও বাঁধা দেওয়া। বিয়ে হলে আশী টাকা একশোয় পাকা হতে বেশীদিন লাগতো না। আর সত্যি বলতে কি আমাদের গেরস্তঘরের বৌ কাজকর্ম্মের হলেই হল, আলমারী সাজাবার জন্যে ত নয়। তা তোমার যদি····"

বাধা দিয়া নন্দদা বলিলেন,—"না, এর মধ্যে আর যদি টদি নেই, ও আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছে এখুনি। মণি!"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া মণি বলিল, 'চলুন।'

'আপনারা তা হলে—

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আবার বলতে। ঠিকানাটা দিয়ে আপনারা এগোন, আমরা আস্‌ছি এখুনি।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ বা পৃথ্বীরাজের সংযুক্তা হরণ বেশ লাগে, কিন্তু আমাদের মণিহরণ—না ব্যাপারটা বেশ নতুন রকমের বলিতে হইবে। বড়বাবু ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গের বদলে যদি তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেন তাহা হইলে এইটা আপত্তির কিছু ছিল না, চাই কি নিজেও ঝুলিয়া পড়িতে রাজী ছিলাম, কিন্তু! তবুও নন্দদা যখন বলিলেন, 'তবে চল, এবার ওঠা যাক,' তখন সত্যসত্যই যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম, কিন্তু সুবোধ বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল, 'যেতে হয় আপনারা যান, আমি যাব না।'

নন্দদা বলিলেন, 'ভায়া, বুঝি সব। কিন্তু এই অবস্থায় বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে চাকরী নিয়ে যখন কথা তখন করবার কি আছে বল?'

বিনয় বলিল, 'চাকরী চাকরী করেইত দেশটা গেল। দেশে গিয়ে চাষবাস করুক গে না।'

নন্দদা বলিলেন, 'ওটা বলা সোজা। দেশে সম্বলের মধ্যে ত বিঘে পাঁচেক জমী, তাও বাঁকড়োর পশ্চিমে একেবারে সাঁওতাল-পরগণার ধারে। পাথুরে জমী। নিজের চোখে দেখেছি একবিঘে জমী চষতে টানের চোটে পিঠের কুঁজ ল্যাজে নেমে গরুগুলো দুম্বা ভেড়া বনে গেছে।'

সুবোধ বলিল, 'দুর্ব্বলের ওপর সবলের অত্যাচার সে ত চিরকালই চলে আস্‌ছে। অসময়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণকে শুধু দাদাত্বের দাবীতে মেরেই ফেল্ল। তা বলে চুপ করে সইব এ কেমন কথা? আমরা নন্‌-কোঅপারেশন করবো, যাব না নেমন্তন্ন।'

নন্দদা বলিলেন, 'আরও একটা কথা—। ব্যাপারটাকে তুমি যতো বড়ো করে দেখছো আসলে সেটা তত গুরুতর নয়। শ্বশুর গুরুজন, পিতৃতুল্য লোক। তার কাছে মান অপমানের জ্ঞানটা অত টন্‌টনে না হওয়াই উচিত। এদেশের ইতিহাসে সেই সময়, যখন ভারতবর্ষের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ, আর গিন্নীকে বলতাম আর্য্যে, যে সময় আমরা সত্যি সত্যি মারামারি করতাম, সেই সময় এরকম ঘটনা অনেক ঘটে গেছে। বলি, ধর্ম্মপালের নাম শুনেছ? মূলগন্ধ কুঠিবিহারের ভিক্ষু ধর্ম্মপাল নয়, বাংলার পালসম্রাট ধর্ম্মপাল। তার না ছিল সংসারের ভাবনা, না ছিল চাকরী যাবার ভয়। তবু তার শ্বশুর তার ঘাড় ধরে একটা কাছাওলা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। কই সে ত লজ্জায় গলায় দড়ি দেয় নি,

আধুনিক যুগ ইউরোপীয় সভ্যতার যুগ। মানবের বর্ত্তমান জ্ঞান-ভাণ্ডারে আমাদের অথবা অন্যান্য প্রাচীন জাতির দান যতই থাকুক, ইহার অধিকার আজ সম্পূর্ণভাবে ইউরোপের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। ইউরোপের সাহিত্যগুলি এই সভ্যতা এবং বিপুল জ্ঞানের একমাত্র বাহন হইয়াছে। কাজেই ইউরোপের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম যেখানে ঘটিয়াছে সেখান হইতেই আমাদের আধুনিক জগতে স্থান লাভের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

প্রাচ্যখণ্ডে অল্প-বিস্তর সকল দেশেই আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মচর্চ্চাকে কেন্দ্র করিয়া সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে। গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সমূহের সন্ধান এবং আবিষ্কার ধ্যান-পরায়ণতা ও পারমার্থিক চিন্তা ছিল ইহার মূল কথা। মানুষের জীবন, কর্ম্ম ও আদর্শের মূল্যও এই মাপেই নির্দ্ধারিত হইত। কিন্তু, কালক্রমে প্রাচ্যমন এই অনুসন্ধিৎসা হারাইয়া ফেলে এবং তাহার বিচার-শক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

অন্য পক্ষে প্রবল কর্ম্মতৎপরতা, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব এবং জাগতিক সুখ-সুবিধার আকাঙ্ক্ষা হইতেই ইউরোপীয় সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে।

ইউরোপের সহিত সংস্পর্শে উভয় সভ্যতার মধ্যে যে আদর্শের সংঘাত ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রাচ্য মন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই সংঘাত ইউরোপকে তাদৃশ বিচলিত করিতে পারে নাই তাহার কারণ, ইউরোপ প্রবলতর পক্ষ। তাহার জগদ্ব্যাপী আধিপত্য তাহাকে অতিমাত্রায় দাম্ভিক করিয়া অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু আমাদের হীনাবস্থা আমাদের দৃষ্টিকে কতকটা অবাধ ও মনকে অনেকটা সংস্কারমুক্ত করিয়াছে।

ইউরোপের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘটিবার পূর্ব্বে আমাদের অবস্থাটা কি ঘটিয়াছিল এবং আমরা কিভাবে কালযাপন করিতেছিলাম সে কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। মানবের যে একটা বৃহত্তর সত্তা আছে, কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তৃততর পরিধি আছে, জীবনের মহত্তর সার্থকতা আছে এবং আদর্শের উচ্চতর লক্ষ্য আছে, সে কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেদিন আলস্যে এবং ব্যসনে আমাদের বুদ্ধিজীবিরা চণ্ডীমণ্ডপে ও বৈঠকখানায় তাস, দাবা, পাশার আড্ডায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণতা, আত্মশুদ্ধির বন্ধুর পথ ত্যাগ করিয়া অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের সহজ পথ অবলম্বন করায় ইহার পূর্ব্ব গতি ও শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। নানা প্রকারের কলুষ ও পঙ্কিলতা আমাদের জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই, জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুন্দর সৃষ্টি, প্রকাশকেও ইহা ব্যাহত করিয়াছিল। একদিন বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর গভীরতর চিত্তের যে স্পর্শ ইহাকে আন্তরিকতা, শক্তি ও সুষমা মণ্ডিত করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে রামায়ণ ও মহাভারত রচনায় বাঙ্গালীর তৎকালোচিত সাহিত্য-সাধনার যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এই অধঃপতনের যুগে বাঙ্গালীর মন সে স্বাভাবিক শক্তি এবং নির্ম্মল রসবোধ হারাইয়া ফেলিল। বাংলা সাহিত্য এই সময় কবি ও ছড়া গানে, বড়লোকের আসরের বয়স্যদের স্তুতিবাক্যের বচন-বিন্যাসে, উপদেবতাদের পুঁথি কথায় এবং সরকারি ও জমিদারি কাগজপত্রে যাবনিক বুলির গোলক ধাঁধায় সর্ব্বপ্রকার উচ্চাদর্শ ও স্বকীয় প্রতিভা হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

ইংরাজের মারফতে যখন পাশ্চাত্যের সহিত আমাদের প্রথম সংস্পর্শ ঘটিল, তখন আমাদের অবস্থা বহুদিন অন্ধকারারুদ্ধ মানুষকে মধ্যাহ্নের খরতাপে ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, অনেকটা তদনুরূপ হইল। সহসা আমরা আমাদের কুটীর দ্বারে মানুষের বিপুল ঐশ্বর্য্য, প্রবল শক্তি, অফুরন্ত প্রাণ এবং দৃপ্ত বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রথমটা আমাদের চক্ষু কতকটা ধাঁধিয়া গেল—এবং সাহেব হইবার ব্যর্থ প্রয়াসে শক্তিক্ষয় এবং কতকটা হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি কিছু না করিলাম তাহা নহে।

কিন্তু সমাজের তৎকালীন চিন্তাশীল মনীষিরা এ কথা বুঝিয়াছিলেন যে, বাঁচিতে হইলে ইউরোপের এই শক্তির উৎসদেশে আমাদের পৌছাইতে হইবে। সাহিত্যই এই উৎস। যাহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় কতকটা সহজ হইয়া উঠিতে পারে এই উদ্দেশ্যে আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মহাত্মা রামমোহন

রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা এই বাঞ্ছিত সুফলও অনেকাংশে আনয়ন করিয়াছে।

রামমোহন রায় একদিকে যেমন বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষা মৃতপ্রায় জাতিকে বাঁচাইবার একমাত্র পথ তেমনি একথাও বুঝিয়াছিলেন যে, দেশীয় ভাষার শুষ্কপ্রায় খাতে পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে প্রবাহিত করানই লক্ষ্যে পৌছিবার একমাত্র উপায়। দেশীয় ভাষাকে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা তিনি আরম্ভ করিয়া যান। বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার এই প্রচেষ্টা অল্প লোকের দ্বারা পরিচালিত হইলেও, ইহার পর অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমবাবুই সর্ব্বপ্রথম এই চেষ্টাকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলেন এবং বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাব্যতাকে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রমাণিত করেন।

এই সময় হইতে সাহিত্যের গতি স্পষ্টতঃ পাশ্চাত্যমুখী হইল। শিক্ষার পরোক্ষ শক্তিই অধিক। উপদেশাত্মক কোনও নীতিবাক্য অপেক্ষা যেমন ঐ নীতি-সম্বন্ধীয় পরোক্ষ শিক্ষা মানুষের মনের উপর অধিক কার্য্যকরী হয়—বঙ্কিমবাবুর রচনা তেমনি আমাদের আত্মমুখী করিয়া, আমাদের মধ্যে স্বাজাতিকতা, দেশাত্মবোধ এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদা জাগাইবার চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের শিষ্য করিয়া তুলিল। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যেও যে মহিমা আছে, আমাদের বাস্তব সুখ দুঃখগুলি যে অর্থহীন মায়ার কুহক নয়, আমাদের কর্ম্মজীবনে যে মহৎ আদর্শ এবং উচ্চ প্রেরণার স্থান আছে একথা বঙ্কিমবাবু আমাদের ঘরের ভাষায় আমাদিগকে শুনাইলেন। কিন্তু এ সকল কথা আমাদের কথা নহে। ইহা পাশ্চাত্য সাধনার মর্ম্মকথা।

বঙ্কিমবাবুর লেখার মধ্যে যে মার্জ্জিত শ্লেষ ও হাস্যরস, যে যুক্তিবাদ, বিচার ও বিশ্লেষণ প্রভৃতি স্পষ্ট হয়, তাহা সম্পূর্ণই পাশ্চাত্যভাব ও চিন্তা প্রণালী প্রসূত। বঙ্কিমবাবু পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছাঁচে বাংলা ভাষাকে সকল দিক দিয়া গড়িয়া গিয়াছেন। বাংলার উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। একটা ভাষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাই তাঁহার সৃষ্টির প্রয়াসও বহুমুখী। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা মনে করিতে পারেন নাই যে বাংলার ন্যায় একটী প্রাদেশিক ভাষা মানবের আধুনিক ভাব ও চিন্তা সম্পদের অধিকারী হইতে পারে।

অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে কিছু পাওয়া গেলে সে সম্বন্ধে মানুষের বিস্ময় অত্যন্ত অধিক হয়। বাঙ্গালীরও মাতৃভাষা সম্পর্কে অনেকটা তাহাই হইল। এ সময়ে ভারতের অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষার এই প্রকারের শক্তি বা আধুনিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কাজেই, বাংলা ভাষার শক্তি সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনে আর কোনও সংশয় রহিল না। আমরা মনে করিলাম, যে-ভাষায় বঙ্কিম বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, সে-ভাষার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত গৌরবময়। আমাদের এই ধারণার মধ্যে কোনও ভ্রম বা দুরাশা ছিল না। কিন্তু, আমাদের উৎসাহের ঝোঁকে সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও মনে করিতে লাগিলাম যে বঙ্কিমবাবু তাঁহার অভিনব সৃষ্টির দ্বারা বাংলা ভাষাকে জগতের সমৃদ্ধ ভাষাগুলির সহিত একাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। এক শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী অবশ্য পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য নিজেদের ইংরাজী বিদ্যার যথেষ্ট আস্ফালন করিয়াছেন এবং মাতৃভাষাকে কৃপা মিশ্রিত অবহেলার চক্ষে দেখিয়াছেন। তাহা হইলেও, দেশের চিন্তাশীল লোকদিগের একটী প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় মাতৃভাষার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন। ইঁহারা বঙ্কিমবাবুর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবশতঃ, অন্যান্য উন্নত ভাষাগুলির সহিত বাংলার সমকক্ষতা সম্বন্ধে যে ধারণা করিলেন, সম্ভবতঃ তাহার মধ্যে একটু ভুল রহিয়া গেল। কারণ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নিতান্ত দীন বাংলা ভাষার পক্ষে যাহা যথেষ্ট ও পরমাশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে তাহার স্থান কোথায়, দেখাইতে হইবে। বাংলার বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্র তাদৃশ আদৃত হন নাই, এবং বিদেশের বিশিষ্ট সমালোচক ও পাঠকবর্গ তাঁহার সৃষ্টিকে কি চোখে দেখিয়া কি মূল্য দিতে পারেন তাহাও জানা যায়

নাই। সহসা মনে হইতে পারে, বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার বোধ হয় এই দাবী নাই। কিন্তু, ইহার প্রধান কারণ এইটা হওয়াই সম্ভব যে, বাংলা সাহিত্য তখনও বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই এবং তখন বিদেশে প্রচারেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

কিন্তু, বঙ্কিমবাবুর সৃষ্টি সম্বন্ধে একথা বোধ হয় বলা যায়, যে তাঁহার সময় ঐ পুস্তকগুলি বা ঐ ধরণের পুস্তক যদি কোনও ইংরেজ সাহিত্যিক ইংরাজী ভাষায় লিখিতেন, তাহা হইলে ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার স্থান কোথায় হইত, সে সম্বন্ধে বিশেষ সংশয়ের কারণ আছে। হয়ত অন্য দশজন সাময়িক লেখকের অপেক্ষা অধিক উচ্চাসন তিনি পাইতেন না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তৎকালীন বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁহার দান যতই মূল্যবান বিবেচিত হউক, তাহার সাহিত্যিক কৌলিন্যের বিচার তাহা দিয়া করা যাইবে না। বাংলা সাহিত্যকে তিনি নূতন রূপ দিয়া নূতন পথে যাত্রা করাইয়া দিলেন এবং সেই পথ বাহিয়াই হয়ত একদিন ইহা বহু বাঞ্ছিত সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইবে। এজন্য বাঙ্গালী চিরদিন তাঁহাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আদি গুরু বলিয়া শ্রদ্ধাভারে পূজা করিবে। কিন্তু বিশ্বের সাহিত্যের আসরে মূল্য নিরূপণের সময়ে এ দাবী উপস্থিত করা যাইবে না।

অপর পক্ষে, যদি এই কথা সত্য হয় যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে এরূপ উৎকর্ষ আছে, যাহা সর্ব্বদেশে সমাদৃত হইতে পারিত, তাহা হইলেও একথা বলিতে হইবে যে এই সময় পর্য্যন্ত একজন মাত্র সাহিত্যিকের দানে সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য যাহা বাড়িল, তাহার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। কিন্তু একটা কথা ইহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইল যে, আমাদের ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল এবং কৃতী ও প্রতিভাবান লেখকের হাতে ইহা একদিন শ্রী ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের যুগে রবীন্দ্রনাথের জন্ম জাতির পক্ষে অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর জন্ম সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁহার দেশ ও যুগকে ধন্য করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্মে বাংলা সাহিত্য অপ্রত্যাশিত সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার দানের প্রাচুর্য্যে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, ছোট গল্পে তিনি বাংলা সাহিত্যকে শুধু মাত্র আধুনিক পর্য্যায়ে আনিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার এই সকল রচনা যে কোনও ভাষার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইতে পারিত এবং নব যুগ প্রবর্ত্তনের সম্মান লাভ করিত। বিশ্ব-সাহিত্যে ইহা ইতিপূর্ব্বেই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলিতে অনূদিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতমণ্ডলী ও অভিজাত ব্যক্তি বর্গের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু, ইহাই তাঁহার লেখার সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র নহে। তিনি জগতে বিশেষ ভাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন কবি হিসাবে। এক্ষেত্রে তাঁহার দান বাংলা ভাষা ও বিশ্ব-মানবের পক্ষে চিরন্তন গৌরবের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবে। মানব মনের যে গভীর সুরটি ইহার মধ্যে বিচিত্র ছন্দে ও রূপে ধরা দিয়াছে তাহা সমগ্র বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়াছে।

তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্য অপরিমেয় ও অতুলনীয়। চিন্তারাজ্যে তাঁহার সমকক্ষ লোক অধিক নাই। তাঁহার অভিনব দৃষ্টি-ভঙ্গী, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত জগৎ ও জীবনের নবতন ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের দিকে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গীতাঞ্জলির জন্য তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বঙ্গবাসীর মর্য্যাদা বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি করিয়াছে। অবশ্য প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথা বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় হয়ত গীতাঞ্জলিতে নাই। তিনি যে-জন্য তরুণ বাংলার চিত্ত জয় করিয়াছেন, সমগ্র জাতির অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার কবিতায় সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সহিত কাব্যরসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, বহুদূরাগত বিষাদের একটা করুণ সুর প্রভৃতির পূর্ণ পরিণতি বলাকা এবং পূরবীতে দৃষ্ট হয়। গীতাঞ্জলির মধ্যে অতীত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার বা বাংলার বৈষ্ণবীয় সাধনার যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে, পাশ্চাত্যবাসীর

মনে তাহা বিস্ময় ও প্রশংসার সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ইউরোপ আমাদের ধর্ম্ম-সাধনা এবং ঈশ্বরোপলব্ধির একটী দিক্‌কে অর্ঘ্য দান করিল।

কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইহাকে ছাড়াইয়া অনেকদূরে উঠিয়াছেন। এখানে তাঁহার স্থান ও মূল্য আজও অনির্ণীত রহিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য তাহার শক্তির যেটুকু পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতেই বিস্মিত হইয়াছে। তাঁহার সমগ্র পরিচয়, বিশেষ করিয়া তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার যে অংশ অতিশয় সূক্ষ্ম ও একান্তই তাঁহার নিজস্ব তাহা আজও বিদেশীর নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালা জাতির প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সহিত বিদেশী শিক্ষার্থীরা যতদিন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাষার ন্যায় বাংলা শিক্ষা না করিতেছেন ততদিন রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় পাইবেন এমন মনে হয় না।

বাংলা সাহিত্য যাঁহাদের দানে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়াছে এবং বলিতে গেলে যে দুইজন মনীষির জন্য ইহার খ্যাতি বাংলার বাহিরে গিয়াছে, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতর। আমাদের নীরস জীবনের পশ্চাতে যে এতখানি রসের ভাণ্ডার লুকাইয়া আছে, বৈচিত্র্যহীন একটানা মৃদু স্রোতের মধ্যেও যে মানব-মন আশায় উচ্ছ্বসিত, বেদনায় উদ্বেলিত এবং আনন্দে স্পন্দিত হইতেছে তিনিই তাহার সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার রচনার মধ্যে বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণ চিত্ত নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বিস্ময় ও পুলকের সহিত তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে ছোটকে ঘৃণা করিবার, হীনতাকে জয় করিবার এবং সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাকে দূরে নিক্ষেপ করিবার যে প্রচেষ্টা বলিষ্ঠ ঔদার্য্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, অল্প কথায় প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। তাঁহার নারী চরিত্রের মধ্যে সর্ব্বত্রই এমন একটা পবিত্র তেজস্বিতা, স্নেহপরায়ণতা এবং গভীর বেদনা-বোধ দৃষ্ট হয় যে, একান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পাঠকের শ্রদ্ধার হ্রাস ঘটে না। মানুষের কোনও অধঃপতন, কোনও অবস্থান্তর এবং কোনও প্রকারের পাতিত্যই যে তাহার মনুষ্যত্বকে নিঃশেষ ও নিশ্চিহ্ন করিতে পারে না এবং এই বিরুদ্ধতার সহিত মানবত্মার বিচিত্র সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রস যে কতখানি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে পারে, তিনিই আমাদের সে সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের আদর্শ সব সময়েই স্বেচ্ছাবৃত বিচ্ছেদ ও দুঃখের মধ্যে আত্মশুদ্ধি করিয়া ভোগের স্থূলতাকে দগ্ধ করিয়াছে।

তিনি আমাদের সমাজের ও মানব-মনের বহু দুরূহ সমস্যার অবতারণা করিয়া বাঙ্গালী পাঠক-সমাজকে বার বার সজোরে নাড়া দিয়াছেন এবং মালিন্যহীন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে তাহা দীপ্ত করিয়া অনেক নূতন জিনিসের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যেমন বাঙ্গালী চরিত্রের একটা গভীর এবং সত্যদিক সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়া শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে তেমনি তাহার গভীরতাও এমন অতলস্পর্শী যে, সেখানে দেশকাল, জাতি বর্ণ, শিক্ষা, সমাজ বা রুচির পার্থক্য গিয়া পৌঁছাইতে পারেনা; সেখানে সব মানুষের হৃদয়-স্পন্দন এক হইয়া গিয়াছে। তাই সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের মানবের যে নিত্য বাণী সকল উচ্চস্তরের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ, এখানে পদে পদে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটে।

শরৎবাবুর বিদেশে প্রচার সামান্যই হইয়াছে। সেই অল্প পরিসরের মধ্যে অবশ্য তিনি উচ্চ প্রশংসা পাইয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যের বিদেশে প্রচার সম্বন্ধে বাঙ্গালীর বিশেষ দায়ীত্ব রহিয়াছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির বিদেশে প্রচারের দ্বারাই বিদেশীদের নিকট মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

শরৎবাবুর পুস্তকের মূল্য বিদেশে বিস্তৃতভাবে যাচাই হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার স্থান সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকের মত, বঙ্কিমবাবুর যুগের পাঠকদের মত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। মাতৃভাষার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের প্রথম বিস্ময় কাটিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের রসোপলব্ধিকে অনেকটা উচ্চস্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এবং ইউরোপের উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য আমাদের পাঠক সমাজে বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিয়া তাঁহাদের বিচারশক্তিকে অনেকটা নির্ভর যোগ্য করিয়াছে। কাজেই, বাঙ্গালী পাঠক সমাজে যিনি এতটা সমাদর লাভ করিয়াছেন,

তিনি বিশ্ব সাহিত্যিকদের মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা বলিয়া সম্মানিত হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রখর ঔজ্জ্বল্যও যাঁহাকে ম্লানদীপ্তি করিতে পারে নাই, তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এই তিনজন স্রষ্টার পুস্তকগুলি ব্যতীত আরও ২।১ খানি এমন বই বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে, যাহা বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। অল্পদিন পূর্ব্বে 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বইখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে এই বইখানি এবং লেখকের অন্যান্য লেখাও পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। বাংলা উপন্যাসে ইনি যে নূতন ধারাটির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের একটা দিক জুড়িয়া থাকিবে, আশা করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই ধারাটি যদি সম্পূর্ণ অপরিচিত না-ও হয়, তাহা হইলেও ইহার মধ্যে দুঃখ-দারিদ্র্যময় বাঙ্গালী জীবনকে লেখক এমন গভীর সমবেদনা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত স্পর্শ করিয়াছেন, যাহা তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের সমজীবি করিয়া রাখিবে।

মূল কথায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বা অন্য ২।১ জন লেখকের ২।১ খানি বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট উচ্চ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু এই অল্প কয়খানা পুস্তক একটী ভাষার সাহিত্যিক সম্পদের পক্ষে কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। ইহাও ভাবিয়া দেখা দরকার, যে-পুস্তকগুলির কথা বলা হইল এক রবীন্দ্রনাথের কতক লেখা ব্যতীত সে সবই কথা-সাহিত্যের। আমাদের সাহিত্যের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা এই শাখায়। অবশ্য আমাদের কাব্যসাহিত্যও অনেকটা ইহার সহিত অগ্রসর হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগে আমাদের কোনও পুস্তক নাই বলিলেই হয়। অথচ, সাহিত্যের সমৃদ্ধির হিসাব করিতে গেলে, তাহার সকল শাখার কথাই ভাবিতে হইবে। এই সকল আলোচিত রচনা হইতে মাত্র এই কথাটাই প্রমাণিত হইয়াছে যে বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা প্রশংসনীয়, ইহার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির উৎস নিহিত আছে এবং ইহার সম্ভাব্যতা অপরিসীম।

আমাদের সাহিত্যের শিক্ষার দিকটা যে একেবারেই গড়িয়া উঠিতেছেনা সেদিকে আমাদের মনোযোগ যে আশানুরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে, এমন কথা বোধ হয় না। ইতিহাস, ভ্রমণ, দেশ বিদেশের পরিচয়, দর্শন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি সকল দিকই পড়িয়া আছে। এমন কি আমাদের সংবাদ সাহিত্য পর্য্যন্ত এতটা দীন যে, তাহা একপ্রকার নাই বলিলেও চলে।

এখনও বাংলা সাহিত্যের এতই দুরবস্থা যে, সকল বিভাগের সকল বই কুড়াইয়াও একশতখানি নাম করিবার মত ভাল বই পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয় ভাষাগুলির কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলিও, মৌলিক রচনায় না হউক অনুবাদের সাহায্যে সমৃদ্ধ হইয়া বাংলাকে পশ্চাতে ফেলিতেছে। বাংলা সাহিত্যের এই সকল অসম্পূর্ণতার কতকগুলি অপরিহার্য্য কারণও অবশ্য আছে। তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। *

শ্রীসুশীল কুমার বসু



* পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদে পঠিত

বিবিধ সংগ্রহ

চিত্রগুপ্ত

চলচ্চিত্রে দুর্নীতি

রেভারেণ্ড জি, স্যালিস্‌ব্যরী হচ্ছেন (Rev. G. Salisbury) বিলেতের একজন গণ্যমান্য ধর্ম্মযাজক। তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুবার আধুনিক চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আবার তিনি আজকালকার বায়োস্কোপের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

হলিউডের আধুনিক ছবিগুলির উপর তিনি এতদূর বীতরাগ এবং বিরক্ত হয়ে উঠেছেন যে এবার তিনি তাঁর রচনার শেষে একটা কবিতা যোজনা ক'রে তাঁর দুঃসহ মনঃক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"হে ভগবান ! তুমি বায়োস্কোপের এই সমস্ত ছলনাময়ী রমণীর লোভনীয় হাবভাব এবং যত নীচাশয় অপরাধীদের অসংখ্য খুন জখম এবং সহস্র রকমের চাতুরী লীলার ছবির হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর !"

তিনি বলেন যে আধুনিক আমেরিকান্ যে কোন একটি ছবি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে অধিকাংশই রমণীর রুচিবিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপের চিত্র এবং অপরাধীদের অপরাধ-দক্ষতা প্রভৃতির ছবিই চোখে পড়ে এবং সেন্সরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে খুব সামান্য মাত্রই ভাল অংশ তা'তে যোজনা করা হয়েছে এই রকম দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন যে,—মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং কদর্য্য ক্রিয়াকলাপের চিত্রকে প্রাণপণে লোকের চোখের সাম্‌নে রাঙিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করাটা নৈতিক দিক দিয়ে তো অপরাধ বটেই—তা' ছাড়া আর্ট হিসেবেও তা' শিষ্ট নয় এবং যে ফিল্মে নায়িকাকে সর্ব্বসাধারণের সাধারণ স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে সে-ছবি সমাজের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু আজকালকার আমেরিকান্ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের যেন উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্মের আপাত-মধুর ছবির সঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের যত তরুণদের পরিচিত ক'রে দেওয়া। আজকালকার যে কোন ডজনখানেক ছবি নিয়ে দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যা'বে যে তার প্রত্যেকখানির মধ্যেই নরনারীর পরস্পরের মধ্যের বিশেষ একটা সম্বন্ধকেই মাত্র হাজারো রকমের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এঁকে দেখানো হয়েছে এবং বিশ্বের যা' কিছু ভালো, যা' কিছু মহান্, যা' কিছু পবিত্র এবং কল্যাণকর, তা' সমস্তই এই সব ছবি থেকে একেবারে বহিষ্কৃত ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং তার বদলে মহোল্লাসে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা এবং সর্ব্ববিধ পাপের জয়ডঙ্কা বাজানো হয়েছে। এঁরা যেন মানুষের হৃদয়ের সিংহাসন থেকে ধর্ম্মকে বিচ্যুত ক'রে তার স্থলে পাপকেই অভিষিক্ত কর্ত্তে চান।

এই সব ছবি প্রত্যক্ষ করে তরুণদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠ্‌বে ব'লে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ ক'রেছেন। ডাক্তার ব্রিগ্‌স্ (Dr. Briggs) নামে অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ একজন আমেরিকান ভদ্রলোকও সম্প্রতি পাশ্চাত্য জেলখানাগুলি পরিদর্শন ক'রে মত প্রকাশ করেছেন, যে জেলে অপরাধীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যে আধুনিক বায়োস্কোপই প্রধানতঃ দায়ী। তিনি বলেছেন যে ইউরোপের জেলখানাগুলিতে আমি যে সমস্ত কয়েদীদের দেখেছি, তাদের দেখে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে নিম্নস্তরের সর্ব্বনাশা যৌন-আবেদন এবং চুরিজোচ্চুরির ছবি সম্বলিত ফিল্মগুলিই যত অল্পবয়স্ক অপরাধীর সৃষ্টি করেছে। যে সমস্ত ছোক্‌রা জীবনের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ একটু বৈচিত্র্যের পিয়াসী, বেশীর ভাগ তারাই আইনের সঙ্গে একটুখানি রসিকতা

করবার লোভটুকু সাম্‌লাতে না পেরে এই কাজ ক'রে বসে। ইনি বলেন, "যে-কেউ পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের জেলগুলিকে পরিদর্শন করলেই আমার মতকে সমর্থন করবে।" বাস্তবিক বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যের জেলগুলিতে অল্পবয়স্ক অপরাধীদের সংখ্যা দিন দিন যে রকম বেড়ে চলেছে তা'তে তাঁর কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বায়োস্কোপ আবিষ্কারের পূর্ব্বে ওখানকার কয়েদীদের গড়পড়তা বয়স ছিল ৪২ বছর। কিন্তু বায়োস্কোপ প্রচলিত হওয়ার পর আজকাল ওখানে ১৯।২০ বছর বয়সের অপরাধীই বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

অপরাধীদের কাহিনীপূর্ণ ছবিগুলি ওখানকার ছেলেদের তরুণ মনের ওপর কিরকম প্রভাব বিস্তার ক'রেছে তার পরিচয় এই ঘটনাটা থেকেই জানা যা'বে যে আমেরিকার এক ভদ্রলোক কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর সাতবছর বয়সের ছেলেকে তাঁর বিনা অনুমতিতে ঐ ধরণের ছবি দেখার জন্যে ব'কেছিলেন ব'লে ছেলেটা ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে!

বৈজ্ঞানিকী

(ক) টেলিভিসন

টেলিভিসন বা বেতার দর্শন-যন্ত্রের কথা অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগে মিঃ জে-এল-বেয়ার্ড্ সাহেব এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছেন। এখন রেডিওতে কেবল কথাবার্ত্তা গানবাজনাই শোনা যায়, কিন্তু তা ছাড়া গায়ক বা বক্তাকে দেখবার কোন উপায়ই বর্ত্তমানে এখানে নেই। টেলিভিসন্ যন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু বেতার অফিস থেকে যা' কিছু ব্রড্‌কাষ্ট্ করা হবে তাই গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। অবশ্য তার জন্যে বেতার অফিস্ এবং গ্রাহকদের বাড়ী এই উভয় স্থানেই তার উপযোগী আলাদা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। যে যন্ত্রপাতিতে বর্ত্তমানে কাজ চল্‌ছে তার দ্বারা কাজ হবে না। বর্ত্তমানে গ্রাহক যন্ত্রের সেটের সঙ্গে যেমন একটি ক'রে লাউড্ স্পীকার আছে, টেলিভিসন যন্ত্রের সঙ্গে তেমনি একটি প্রতিফলক থাক্‌বে যার ওপর বেতার অফিস থেকে প্রেরিত ছবির বিষয়টি ফুটে উঠ্‌বে।

যাই হোক্ বেয়ার্ড্ সাহেব এই বস্তুটির আবিষ্কারের কল্পনা যখন ক'রেছিলেন তখন লোকে সে কথা শুনে হেসেছিলো। কিন্তু তিনি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তাঁর সেই কল্পনাকে সত্যে পরিণত ক'রে তাঁর বিদ্রূপকারীদের মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

বর্ত্তমানে জিনিষটির এতখানি উন্নতি হ'য়েছে যে ইউরোপ এবং আমেরিকায় টেলিভিসন যন্ত্রটিকে এবার থেকে রীতিমত ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিলেতের ব্রিটীশ ব্রড্-কাষ্টিং কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি ছবি ব্রড্‌কাষ্ট্ করবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নতুন বাড়ীতে সব যন্ত্রপাতি বসাচ্ছেন।

সম্ভবতঃ টেলিভিসন যন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে প্রথমে বায়োস্কোপের ছবিই ব্রড্‌কাষ্ট করা হবে।

আমেরিকায় সম্প্রতি খুব সস্তায় টেলিভিসন্ গ্রাহক যন্ত্র বাজারে ছড়াবার জন্য প্রবল উদ্যমে তার নির্ম্মাণ কার্য্য চল্‌ছে। আর ছবি ব্রড্‌কাষ্ট করবার জন্যে অজস্র অর্থব্যয় ক'রে অনেকগুলি ট্র্যান্স্‌মিটিং ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। তার একটি ষ্টেশন এতখানি শক্তিশালী ক'রে তৈরী করা হ'বে, যার সাহায্যে আমেরিকা থেকে প্রেরিত ছবি ইউরোপে বসে বসে বেতার দর্শন-যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে।

এ সবই অবশ্য ইউরোপ আমেরিকার কথা। আমাদের এখানকার কথা এ সম্পর্কে না তোলাই ভালো।

(খ) আগামী বছরে বিজ্ঞানের উন্নতি

বিলেতে ক্যাপ্টেন্ জি ড্রুরি কোল্‌ম্যান্ বৈজ্ঞানিকদের নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'লে সরকারী পক্ষ থেকে তাঁদের পেটেন্ট বা আবিষ্কারকের স্বত্ব প্রদান ক'রে থাকেন। আগামী বছরে বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতি সম্বন্ধে তিনি যে ঘোষণা ক'রেছেন তা সম্ভবপর হ'লে মানুষ যে কত সুবিধা ভোগ করবে তার ইয়ত্তা হয় না। প্রত্যেক ট্রেন, মোটরকার, উড়োজাহাজ তাদের গতিবেগের জন্য যেটুকু বিদ্যুৎ দরকার

সেটুকু নিজেরাই তৈরী ক'রে নেবে। লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের ঘরে আজ যে খরচায় বিজ্‌লি বাতি জলছে তার সিকির সিকি খরচায় তাঁরা আস্‌ছে বছর থেকে বাতি জাল্‌তে পারবেন। ইলেক্‌ট্রিক্‌ বিল্‌ হবে যৎসামান্য—অতি গরীবরাও ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার ক'রতে পারবেন। বেতারের সাহায্যে উড়োজাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করা, রেলের কলিশন বাঁচান এত সহজে হবে যে বলবার কথা নয়। বেতার দর্শনযন্ত্র বা টেলিভিশনের সাহায্যে সকলে ঘরে ব'সে থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখতে পারবেন। যানবাহনের গতি বর্ত্তমান গতির চেয়ে ঢের বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং লোকে দশঘণ্টা রেলের পথ পাঁচঘণ্টায় চলে যাবে। মোটর এখন পেট্রোলের সাহায্যে চ'লছে কিন্তু এরপর থেকে মাত্র বিদ্যুতের সাহায্যে চ'লবে। লোকে ইলেক্‌ট্রিকের কল্যাণে রান্না বান্না খাওয়া দাওয়ার এত সুবিধে ক'রে নিতে পারবে যে এখন আমরা সে সব কথা ভাবতেই পারবো না। তিনি বলেন যে এডিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা এত জিনিষ আবিষ্কার ক'রে গেছেন যে আর নতুন কিছু আবিষ্কারের কথা ভাবতেই পারা যায় না, তাছাড়া বর্ত্তমানে টেলিভিশন যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়ে, আবিষ্কার-জগতে আর কিছু অসম্ভব নয় এই প্রমাণিত হ'ল। তিনি বহু বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং তাঁরা বর্ত্তমানে কতখানি অগ্রসর হ'য়েছেন সে সংবাদও রাখেন ব'লে এই ভবিষ্যৎবাণী ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন। অবশ্য তিনি বিলেতের লোকেদেরই এই সমস্ত সুবিধা আগামী বছরে ভোগ করার কথা ব'লেছেন; আমাদের কবে সে সৌভাগ্য হবে তা' কিছু প্রকাশ করেন নি।

চুরুট খাওয়ার ইস্কুল

একেবারে পরস্পরবিরোধী ব্যাপারের সন্ধান আমেরিকাতে যত দেখা যায় পৃথিবীর আর কোথাও তেমনটি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অপর সব স্থানের চেয়ে আমেরিকাতেই যে ধূমপান নিবারণী-সমিতির প্রতাপ বেশী একথা সকলেই জানেন অথচ আমেরিকার অন্তর্গত ইলিময়ের একটী স্কুলে ছাত্রদের নিয়মিত ভাবে চুরুট খাওয়া শেখাটাকেও ওখানকার অপরাপর পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভূত করা হয়েছে।

ওখানকার স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ পনেরো বছর এবং তদুর্দ্ধ-বয়স্ক ছাত্রদের ধূমপান করবার পাইপ সরবরাহ করে থাকেন এবং তারা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রতিবার ১৫ মিনিট করে, রোজ মোট আধ ঘণ্টা সময় নিখুঁত ভাবে ধূম পান করতে শেখে। এ থেকে কর্ত্তৃপক্ষের মতলব যে কী তা বোঝা কঠিন। তবে অনেকে মনে করছেন যে এটাও হয়ত ধূমপানের বিরুদ্ধে এক রকমের অভিযান, কারণ কঠোর নিয়মের অধীন রেখে কোন বিষয় ছেলেদের অভ্যাস করালে তারা লেখাপড়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দেয়। সুতরাং ধূমপান না করলে এবং করলেও ঠিকভাবে করতে না পারলে যদি শিক্ষকদের কাছ থেকে ধমক খায় তা' হলে ছেলেরা ও জিনিষটার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠবে, ফলে আর বড় হয়ে চুরুট খাওয়ার নামও করবে না।

মাথা ধরা ভালো

বিলেতের কতকগুলি বহুদর্শী লোকের মত হচ্ছে এই যে যখন আমাদের প্রচণ্ড রকমের মাথা ধরে, তখনই আমরা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারি। এর কারণ নাকি এই যে মাথাধরার তীব্র যন্ত্রণাকে ভোলবার জন্যে আমাদের মনটা কাজের দিকেই সে সময় খুব বেশী ক'রে ঝুঁকে পড়ে। পাঠকগণ পরীক্ষা ক'রে তাঁদের মতের সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

* * *

তারা গোণা

"একথালা সুপুরি ইত্যাদি ব'লে ছেলেদের মধ্যে একটা ধাঁধার প্রচলন আছে—যা'র দ্বারা তারা বোঝাতে চায় যে, আকাশের তারা গুণে শেষ করা যায় না। কিন্তু খ-তত্ত্ববিদ্‌রা বলছেন যে—তারা ছেলে মানুষ, জানে না তাই ওরকম ধারণা পোষণ ক'রে। আসলে কিন্তু তারা গুলোকে গুণে ফেলা এমন একটা কিছু শক্ত ব্যাপার

নয়। শুধু সেজন্যে মানুষের একটু দীর্ঘজীবী এবং কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ যদি কোন লোক না খেয়ে না ঘুমিয়ে মাত্র সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে আকাশের তারাগুলিকে গুণে যান তা'হলে তাঁর গণনায় একটী মাত্র তারাও বাদ পড়বে না !

মাছ ধরা

সাধারণতঃ লোকে বিবিধ সরঞ্জামের সাহায্যে নানা জোড়যোড় ক'রে তবে মাছ ধরে। মেক্সিকোর লোকরা কিন্তু অত হাঙ্গামার ধার ধারে না। মাছ খাবার ইচ্ছে হ'লে তারা সোজা বেরিয়ে পড়ে শুধু হাতে। তারপর জলের ধারে গিয়ে জলের ওপর নিমেষ মধ্যে একেবারে নির্ভুল একটা Cube root ক'সে ফেলে ঠিক হিসেব মত লক্ষ্য ক'রে খপ্ খপ্ ক'রে মাছগুলোকে ধ'রে ফেলে। তারা বলে ছোটবেলা থেকে অভ্যেস ক'রে করে তারা এই রকম কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে।

গরুর কানের মধ্যে গুপ্তধন !

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। বিলেতের গরুগুলোর কানের মধ্যে যে লোম জন্মায়,—তা' দিয়ে আর্টিষ্টদের ছবি আঁকবার খুব সুন্দর তুলি তৈরী হয়। এই লোমগুলি প্রায় চল্লিশ টাকা পাউণ্ড দরে বাজারে বিক্রী হয়।

আমেরিকায় লিঞ্চিং

টাস্কেজী ইন্‌ষ্টিটিউটের হিসাব অনুসারে গত ১৯৩১ সালে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্‌এ সবশুদ্ধ ১৩ তেরো জন লোককে লিঞ্চ্ করা বা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হ'য়েছে। এই হতভাগাদের মধ্যে দশজন ছিলো নিগ্রো, এক জন শ্বেতাঙ্গ এবং দু'জন অপর জাতি। তা'ছাড়া যে ৫৭টী ক্ষেত্রে লিঞ্চিং-এর চেষ্টা করা হয়েছিলো সেখান থেকে সরকারী কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় সব শুদ্ধ ৮৮ জন লোকের প্রাণরক্ষা হয়েছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্য না পেলে সভ্যতা-অভিমানী আমেরিকান্‌দের এই হিংস্র দুর্ব্বুদ্ধির ফলে তাদের জীয়ন্তেই পুড়ে মরতে হোত !

বেচারী পুসীমেনীদের ওপর অবিচার

সেদিন একটি বিচার প্রসঙ্গে বিলেতের এক বিচারপতি বেশ মত প্রকাশ ক'রেছেন। তিনি বলেন যে কোন মোটর-চালক কোন কুকুরকে চাপা দিলে সে তখনি গাড়ী থামাতে আইনতঃ বাধ্য ; কিন্তু সে যদি কোন বিড়ালকে চাপা দিয়ে ফেলে তা হ'লে তার গাড়ী থামাবার বিশেষ দরকার করে না। এর দ্বারা সহজেই বোঝা যাচ্ছে বিড়ালের তুলনায় কুকুরের খাতির অনেকখানিই বেশী।

কিন্তু এমন অনেক স্নেহ-প্রবণ লোক আছেন যাঁদের পোষা মেনী-পুসীদের ওপর তাঁদের মায়া তাঁদের নিজেদের সন্তান-সন্ততির চেয়ে কোন অংশেই কম নয় ; সুতরাং বিড়ালদের সম্বন্ধে এই রকম অবিচারে তাঁদের অভিমানে রীতিমত ঘা' লাগা উচিত।

বিলেতের একটী কাগজ কিন্তু বিড়াল-প্রিয় ব্যক্তিদের ওরকমের অভিমান প্রকাশ করতে নিষেধ ক'রছেন। সে কাগজখানি তাঁদের এই বলে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে, তাঁরা কুকুরের সঙ্গে বিড়ালের সমান অধিকার দাবী করবার আগে একথাটা যেন ভেবে দেখেন যে আজো বিড়াল পুষতে হোলে তার জন্যে একটা আলাদা লাইসেন্স করবার বা তার গলায় একটা কলার পরিয়ে তাতে তার প্রভুর নামধাম লেখবার দরকার হয় না। কিন্তু কুকুরের সঙ্গে বিড়ালের সমান অধিকার দাবী করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ফলে যে আবার নতুন একটা খরচ বেড়ে যাবে, সেটাও যে খুব আরাম-দায়ক একটা সুবিধের ব্যাপার হবে তা নয়।

বাজীর হার

"উইলিয়ম আর্" ১৯৩২ সালের পয়লা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিলেত থেকে আমেরিকায় ফিরে গেছেন। তিনি খুবই বড় লোকের ছেলে, তাঁর বন্ধুরাও তাঁরই মত, এবং তাঁদের কথাবার্ত্তা সবই যে খুব লম্বা চওড়া হবে এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ! একদিন এক হোটেলে বড় বড় কথা হ'তে হ'তে "উইলিয়াম আর্" প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'স্‌লেন যে তিনি আমেরিকার বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট হুভার সাহেবের সঙ্গে একদিন এক টেবিলে খানা খাবেন, প্রসিদ্ধ

গলফ্ খেলোয়াড় 'ববি জোন্সের' সঙ্গে গলফ খেলবেন, প্রসিদ্ধ ধনী রক্‌ফেলারের সঙ্গেও একটা কিছু খেলে আসবেন এবং সর্ব্বশেষে ইংলণ্ডের যুবরাজের সঙ্গে, তাঁর পাশে বসে মোটর ক'রে ঘুরবেন। ১৯৩১ সালের মধ্যে যদি তিনি এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন ক'রতে পারেন তাহ'লে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দশ হাজার পাউণ্ড দেবেন এই বাজী রাখেন। আর যদি তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা না রাখতে পারেন তাহ'লে ঐ ১০,০০০ হাজার পাউণ্ড তাঁকে দিতে হবে। 'উইলিয়াম আর্' হুভার সাহেবের সঙ্গে একদিন অবশ্য সত্যিই থানা খেয়ে এলেন কিন্তু বাকী তিনটী বাজী হারলেন। বব্ জোন্স ব'ললেন, আমি আনাড়ীর সঙ্গে গলফ্ খেলিনা, রক্‌ফেলার ব'ললেন, আমার বয়স হয়েছে এখন খেলবার সময় আমার নেই, আর যুবরাজের সেক্রেটারী বললেন যে মোটর চ'ড়ে ঘোরবার সাধ হয় তো বিলেতে অনেক লোক আছে, যুবরাজের সঙ্গে কেন?—অতএব নিরাশ হ'য়ে বেচারীকে আমেরিকায় ফিরে যেতে হ'ল। সেখানে পৌঁছেই তাঁকে বাজীর টাকা দিতে হবে।

চিত্রগুপ্ত

ব্যথাতুর

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

তটিনীর হিল্লোলে চঞ্চল বায়
তরীখানি উত্তরে উন্মন ধায়।
কোন্ পারে উজ্জ্বল সুন্দর দিন
চ'লে চ'লে শ্রান্তিতে মৃত্যু-বিলীন?
সেই পারে ক্লান্তির শান্তির দেশ;
তরী হবে সুস্থির, যাত্রার শেষ।
সেই খানে দুর্দ্দম উল্লাস আশ
বাসনার দুর্ব্বার উৎসের নাশ।
নিশ্চুপ নির্জ্জন সেই পরপার,
সেই মোর বাঞ্ছিত সুন্দরাগার।
নিয়ে যাও নিয়ে যাও, করো নির্ব্বাক্,
যাক্ দুখ, যাক্ শোক, দৈন্যও যাক্।

নির্ম্মম নির্গুণ এই ধরাখান
দ'লে দেছে, পিষে দেছে নিত্য এ প্রাণ।
যায় প্রাণ, নাই সুখ, ব্যথা-হুতাশন
জ্ব'লে জ্ব'লে জ্বেলে দেছে অন্তর-মন।
ব্যথাতুর দুখাতুর শোকাতুর আজ
ক্রন্দনে গুমরায় অন্তর মাঝ।
কে গো আছ? কোথা আছ? আছ ঈশ্বর
তুমি নাকি দুঃখীর চির-নির্ভর?
এস তবে, লহ তরী, ধর তুমি হাল,
ডোবে নাকো তরী যেন ঢেউএ উত্তাল।
চঞ্চল বায়ে তরী উন্মন যায়,
শান্তির দেশে যায়, সুপ্তির ছায়।

অজ্ঞাত বাস

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

২

পাঁচ শত ডিম চাই!

কোন এক অনাথাশ্রমের জন্য ঈষ্টার মহোৎসবের দরুণ পাঁচ শত ডিম চাঁদা করার ভার মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইটের উপর পড়েছে। তিনি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছেন কে ক'টা ডিমের মূল্য ভিক্ষা দিতে পারবে। সুধীকে পাকড়াও করে বল্লেন, "এই যে মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। আপনার নামে কত লিখ্‌ব বলুন। একশোটা?" সুধী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল, বুঝ্‌তে পার্‌ল না ব্যাপারটা কি।

মিস্ তাঁর চশমার ওপার থেকে মিটি মিটি চাউনি ক্ষেপণ করে মিষ্টি হেসে বল্লেন, "ওদের ত কেউ আপনার লোক নেই। আমরা না দিলে কে দেবে বলুন। মোটে পাঁচশোটা ডিম। আর্থার একশোটা দিতে দয়া করে রাজি হয়েছেন। না আর্থার?"

ডক্টর বল্লেন, "কই? না!"

মিস্ বেশ জোরে জোরে অথচ ধীরে ধীরে বল্লেন, বল্‌বার সময় তর্জ্জনীর দ্বারা তাল দিতে দিতে।—"আর্থার, গেল বছর তুমি একশোটা দিয়েছিলে। তার আগের বছরও একশোটা। অনাথাশ্রমের ছেলেমেয়েরা তাদের আর্থার কাকার নাম মনে রেখেছে। তুমি কি এ বছর তাদের নিরাশ কর্‌তে চাও?"

ডক্টর সুধীর সঙ্গে এমন ভাবে চোখাচোখি কর্‌লেন যেন তার অর্থ, "দেখ্‌লে ত! আমি বলেছিলুম কি না।" কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলালেন। তার পর সান্ত্বনার সুরে বল্লেন, "গ্রীকদের মধ্যে যোগ্যের পুরস্কার ছিল, কিন্তু অযোগ্যের প্রতি সকরুণ ভিক্ষা ছিল না। এটা আমাদের হৃদয়বৃত্তির সৌখীনতা।"

মিস্ তখন নিবিষ্টমনে একশোটা ডিমের বাজার দর কষ্‌ছিলেন। কান দিলেন না। সুধী বল্ল, "দানশীলতা আমার দেশে চিরদিন অযোগ্য পাত্রের অপেক্ষা রেখেছে: কারণ যোগ্যপাত্র ত দান চায় না।"

ডক্টর বল্লেন, "কিন্তু দানশীলতাই যে একটা দুর্ব্বলতা। ভারতবর্ষ ওটাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন ও কবে থেকে?"

সুধী বল্ল, "পুরাণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। তিনি স্ত্রীকে বিক্রয় করে সাম্রাজ্যদানের দক্ষিণা জুটিয়েছিলেন। ইতিহাসে হর্ষবর্দ্ধনের সম্বন্ধে পড়েছি তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যথাসর্ব্বস্ব দান করে নিঃসম্বল হতেন। অসংখ্য উদাহরণ আছে। আমার মনে হয় আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এর অর্থ নিহিত আছে। কতকগুলো লোক বলবান বিদ্বান ধনবান ও অন্য কতকগুলো লোক নিরাশ্রয় মূর্খ ও দরিদ্র হয়েই থাকে। সমাজ এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কর্‌তে সর্ব্বদা সচেষ্ট না থাক্‌লে দক্ষিণ অঙ্গের অতি বৃদ্ধি ও বাম অঙ্গের অতি ক্ষয় ঘটবে এবং পরিশেষে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমাজ ডিগ্‌বাজি খাবে। এই চেয়ারখানার একটা পায়া ভাঙ্‌লে যে দশা হয় সেই দশা। সেই জন্য দান করাটা দাতার গরজ। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দান কর্‌তে হয় এবং দানের সঙ্গে দিতে হয় দক্ষিণা।"

মিস্ যে সব কথা শুন্‌ছিলেন তা কাউকে জান্‌তে দেননি। হঠাৎ মুখ তুলে বল্লেন, "শুন্‌লে ত আর্থার? সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার সংকেত? তোমার গ্রীকরা অপঘাতে ম'ল ক্রীতদাস পুষে। রোমানরা ম'ল ক্রীতদাসকে সিংহের খাঁচায় পুরে মজা দেখ্‌তে দেখ্‌তে। তুমি কি তোমার স্বজাতির তেমনি মৃত্যু চাও? আমি জানি তুমি বল্‌বে মৃত্যু যার ঘটে রয়েছে তারই ঘটবে। কিন্তু আমি গ্রীক নই,

আমি Destiny মানি নে। যাকে প্রতিরোধ করতে পারি তাকে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ যতদূর সাধ্য ততদূর প্রতিরোধ করব। যা ঘটা উচিত নয় তাকে ঘটতে দেব না।"

সুধীর দিকে ফিরে বল্লেন, দেখুন দেখি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, যুদ্ধ একটা জিনিষ যা সভ্য মানুষের কলঙ্ক। নির্ব্বোধে লড়াই করে তিল তিল করে মরে—ওঃ সে অকথ্য যন্ত্রণা! বুদ্ধিমানেরা মিথ্যাকথায় খবরের কাগজ ভরিয়ে মনের মধ্যে নরক নিয়ে বাঁচে এবং বেশ দু'পয়সা করে খায়। আমরা নারীরা চিরকাল ঠাকুর দেবতার কাছে প্রার্থনা করে চোখের জলে ভেসে অনাহারে অল্পাহারে দিন কাটিয়ে প্রিয়জনকে হারিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখ্লুম ফল হয় না। আগুন একবার যদি লাগে তবে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ না করা অবধি নেবে না। আগুন যাতে না লাগে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমাদের এই No more war Movement. কিন্তু আর্থার কিছুতেই এতে যোগ দেবে না।"

সুধী বল্ল, "অমন করে কি যুদ্ধ নিবারণ করা যায়, মিস্ মেল্‌বোর্ণ হোয়াইট ? অবশ্য আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করবার অনুমতি দেন।"

মিস্ একটু ক্ষুব্ধ হলেন। ধরে রেখেছিলেন সুধীও তাঁদের দলে। বল্লেন, "বিশ্বের লোকমত যদি আমাদের দিকে হয় তবে যুদ্ধ করবে কারা ও কার সাহায্যে?"

সুধী সবিনয়ে বল্ল, "ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইটের মত যুদ্ধকে আমি কাম্য মনে করি নে, বরঞ্চ আপনারই মত ত্যজনীয় জ্ঞান করি। কিন্তু যুদ্ধের জড় আমাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রে উহ্য থেকে আমাদের চিন্তায় বাক্যে ও কাজে সঞ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীর অতি নগণ্য কোণে অতি সামান্য একজন মানুষ যদি একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলে তবে সেই ছিদ্র দিয়ে মহাযুদ্ধের মহামারী পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়। যদি একটি মুহূর্ত্ত মন্দ চিন্তা করে তবেও সেই কথা। যদি অন্যায় কাজ করে কিম্বা কর্ম্মবিমুখ হয় কিম্বা কর্ম্মের পরিমাণ লঙ্ঘন করে তবেও সেই কথা। স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কোনো সম্ভাবনা কোনো দেশে দেখ্তে পাচ্ছিনে, মিস্ মেল্‌বোর্ণ হোয়াইট। কোনো জাতির ধর্ম্মে ত্রুটী আছে, কোনো জাতির ফিলসফিতে, কোনো জাতির প্রকৃতিতে খাদ আছে, কোনো জাতির শিক্ষাদীক্ষাতে। আপনারা শেষোক্তটার—শিক্ষাদীক্ষার —উপর ঝোঁক দিয়েছেন। আপনাদের উদ্যমের প্রশংসা করি।"

মিস্ মনোযোগপূর্ব্বক সমস্ত শুনছিলেন,। কাগজপত্র ব্যাগে পুরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "আপনি বোধ করি পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত না দেখে কার্য্যক্ষেত্রে নামবেন না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। কিন্তু কথায় কথায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না যে আপনার কাছে আমার অনাথ বালকবালিকারা একপোটি ডিমের আশা রাখে।"

সুধী তাঁর দিকে একখানি পাউণ্ড নোট বাড়িয়ে দিল্ল।

ডক্টর বল্লেন, "আসুন কঠোপনিষৎ পড়া যাক।"

৩

Bayswater অঞ্চলে মেল্‌বোর্ণ হোয়াটইদের বাগান-বেষ্টিত বাড়ী। দু'জন মানুষের পক্ষে বেশ বড় বলতে হবে। বেসমেণ্ট নেই। নীচের তলায় বস্‌বার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। উপর তলায় আর্থার এলিনর ও প্রৌঢ়া পাচিকা মিস্ ডব্‌সনের তিনটি সুইট্ (suite)। তেতালায় আর্থারের মস্ত লাইব্রেরী। তিনি থাকেন বেশীর ভাগ সময় সেইখানে কিম্বা কলেজে আর তাঁর ভগিনী থাকেন নীচের তলার বস্‌বার ঘরে—যার একদিকে একটি গ্র্যাণ্ড পিআনো এবং অপর দিকে একটি ডেস্ক—কিম্বা সভা-সমিতিতে।

ভাই-বোন উভয়ের আমন্ত্রণে সুধীকে এ বাড়ীতে ঘন ঘন আস্তে হয়। একদিন আর্থার বলেন, "চক্রবর্ত্তী, ট্র্যাজেডীর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই যে প্রশ্ন আজ তুল্লে এর উত্তর চিন্তা করতে আমার দু'একদিন লাগ্‌বে অথচ শ্রোতার জন্য সাতদিন অপেক্ষা করলে সমস্ত ভুলে যাব। কাজেই তুমি পরশু আমার সঙ্গে কলেজে দেখা কোরো, একসঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ী আসা ও চা খাওয়া যাবে।" অন্যদিন এলিনর বলেন, "সুধী, অন্ধ কারুশিল্পীদের দেখ্‌তে চেয়েছিলে, কাল সুইজ কটেজ ষ্টেশনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো। কেমন? সেখান থেকে বাড়ী ফেরা যাবে, তোমার

সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য জন কয়েক বন্ধুকে চা খেতে ডেকেছি।"

ভাইবোনের মধ্যে ভাবসংক্রান্ত বিবাদে সুধী মধ্যস্থ হয় ও শেষ পর্য্যন্ত একটা সমন্বয় ঘটিয়ে উভয়কেই খুসী করে। ওঁরা ভাবেন, তাই ত, আমাদের মতবাদে মিল যত আছে অমিল তত নেই ত। তাঁরা একদিন প্রস্তাব করেছিলেন সুধী তাঁদের বাড়ী স্থায়ী অতিথি হলে তার জন্য জায়গা করে দিতে পারবেন। সুধী বলেছিল, মার্সেলকে ছেড়ে কোথাও নড়তে পারবে না; বাস্তবিক ঐ মেয়েটার প্রতি সুধীর মায়া পড়ে গেছল। দেশে ফেরবার সময় তাকে কেমন করে ছেড়ে যাবে ভাবতে তার এখন থেকেই মন কেমন করে। বিদেশে আসার এই এক কষ্ট, বিদেশী মানুষের সঙ্গে স্নেহ মমতার জোড় লোহার সঙ্গে চুম্বকের মত যত সহজে লাগে তত সহজে ভাঙ্গে না।

আর্থার তাঁর প্রকাণ্ড পুস্তকাগারের এক কোণে হারিয়ে যান। আত্মগোপনের দ্বারা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কোনো কোনো পশু পক্ষীর বর্ণকে বনজঙ্গল গাছপাতা বালু মাটীর সমান করে তোলে, শিকারী যেন তাদের সন্ধান না পায়। ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইটের দাড়িতে তাঁকে ধরা পড়িয়ে দেয়, নতুবা চেষ্টার তিনি ক্রটী করেন নি, তাঁর পোষাক তাঁর লাইব্রেরী ঘরের ওয়ালপেপারের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এবং তিনি যেখানে বসে পড়েন সেখানে এত বই গাদা করেন যে তাঁর শ্মশ্রুবহুল মুখ ঢাকা পড়ে যায়। বিবরের ভিতরে বীভার নামক প্রাণীর মতো প্রবেশ না করলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। যতক্ষণ না অন্তত চল্লিশ খানা মোটা মোটা কেতাব তাঁর টেবিলের উপর পারসাপোলিসের মতো উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে ততক্ষণ তিনি স্নায়ু তাড়িত ভাবে ছুটাছুটি করতে থাকেন।

তাঁর লাইব্রেরীতে তাঁকে চা দিয়ে আসতে হয়, যেদিন তিনি চায়ের সময় বাড়ী থাকেন। লাইব্রেরীর পাশে ছাতের খানিকটে খোলা। সেখানে তিনি পায়চারি করতে ভালবাসেন। কোনো কোনো দিন তাঁর প্রিয় শিষ্য বা প্রিয় বয়স্য সমাগত হলে তিনি ডেক টেনিস খেলেন সেখানে।

এদিকে তাঁর ভগিনীর দৃষ্টি নিম্নগামী। মালীকে খাটিয়ে ও নিজে খেটে তিনি তাঁর বাগানে যে মাসের যে ফুল সে মাসে সে ফুল ফুটিয়ে থাকেন। একটি কোণে একটা কুঞ্জের মত আছে। সেখানে একটা ফোয়ারা আছে, সেটি তাঁর বিশেষ প্রিয়বস্তু। তার মূলদেশে রাজ্যের ঝিনুক জড় করা, কেবল ঝিনুক নয় শাঁখ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা। এগুলি তাঁর নিজের সংগ্রহ। বসবার ঘরের যে দিকটাতে বাগান সেই দিকে একটা বারান্দা আছে। সেখানে বসে তিনি বাগানের শোভা দেখতে দেখতে জামা তৈরী করেন। কাছেই একটি লতা দেয়াল বেয়ে দোতালায় তাঁর শোবার ঘরের জনালা পর্য্যন্ত উঠে গেছে।

রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর হল মিস ডবসনের রাজ্য। মিস মেলবোর্ণ হোয়াইট সেখানে পদার্পণ করেন না, যদি না মিস্ ডবসন আহ্বান করেন। মিস্ ডবসন ভদ্রঘরের মেয়ে। তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তাঁর হাতে রান্না ও বাজার ছেড়ে না দিলে তিনি হয়ত কাজ ছেড়ে দিতেন। তাঁর নিরামিষ রান্নার হাত ভাল, স্বভাব চরিত্র ধাত ভাল। মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট ঠিকা ঝি রাখতে পারতেন, কিন্তু আজকালকার দিনে এমন ঝি পাওয়া যায় না যার কিছুমাত্র দায়িত্ব বোধ আছে। তাঁর প্যান্ট্রিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর Old China (চীনে মাটীর বাসন) যা আছে তার দাম এখনকার বাজারে হাজার পঁচিশ টাকা। বাড়ীখানার চাইতেও সেগুলিকে তিনি প্রিয় মনে করেন। পাছে সেগুলি চুরি যায় সেজন্য তিনি প্যান্ট্রিতে ডবল চাবীর ব্যবস্থা করেছেন। মিস্ ডবসনকে না পেলে তিনি কি বিপদেই পড়তেন। মিস্ ডবসনও এ বাড়ীতে আছেন প্রায় ষোল সতের বছর। মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট্‌কে "ম্যাডাম" বলে সম্বোধন করেন না, বলেন "মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট্।"

সুধীর পাগড়ি ও গায়ের রং মিস্ ডবসনকে প্রথমটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তিনি দরজা খুলে দু'পা পিছিয়ে যেতেন। সুধী ইংরেজী বলতে পারে জেনে তিনি আশ্চর্য্য হলেও আশ্বস্ত হন। ক্রমশ সুধীর ভক্ত হয়ে পড়লেন। একদিন হাত পেতে বলেছিলেন ভাগ্যগণনা করতে। সুধী পরিহাস করে বলেছিল, নিকটেই আপনার বিবাহের সম্ভাবনা দেখছি, মিস্ ডবসন। মিস্ ডবসন লজ্জায় সেই থেকে

আর হাত পাতেন নি, তবে সপ্তাহে একদিনের বদলে দুদিন হাফ ছুটী নিতে আরম্ভ কর্‌লেন দেখে মিস মেলবোর্ণ হোয়াইটের আশঙ্কা হতে লাগ্‌ল পাছে মিস ডবসন সত্যিই বিয়ে করে কাজ ছেড়ে দেন।

৪

মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট বাড়ী ছিলেন না। ডক্টর সুধীকে লাইব্রেরীতে বসিয়ে মিস ডবসনকে ডেকে বল্লেন দুজনের মত চা দিতে।

সুধীকে বল্লেন, "বল্‌ছিলুম ট্র্যাজেডী কথাটার অপপ্রয়োগ দৈনিক কাগজে প্রতিদিন দেখ্‌তে পাই, তাই তোমাকে গোড়াতেই সাবধান করে দিচ্ছি যে অমন ট্র্যাজেডীর ব্যাখ্যা আমার কাছে প্রত্যাশা কোরো না, চক্রবর্ত্তী।"

সুধী বল্ল, "না স্যার, আমি যার কথা পেড়েছিলুম সেটা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকদের মুখে শুন্‌তে পাওয়া ট্র্যাজেডী।"

তিনি বল্লেন, "সেটাতে পরিণামের কথাই বলে, যে পরিণামে শোকাবহ তার কথা। আরম্ভ হল হয়ত সুখ সম্পদের মধ্যে, শেষ হল দুঃখ দারিদ্র্যে অকাল মৃত্যুতে, এই আমাদের ইংলণ্ডীয় ট্র্যাজেডী। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডী অমন হয়, চক্রবর্ত্তী। তুমি যে বল্‌ছিলে সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডী নেই সেটা বোধকরি তুমি ইংরেজী অর্থে বল্‌ছিলে।"

সুধী বল্ল, "গ্রীক অর্থটা কি তাই আগে শুনি।"

ডক্টর চা ঢেলে দিতে দিতে বল্লেন, "ক' টুক্‌রা চিনি খাও?"

তারপর হেসে বল্লেন, "গ্রীক অর্থ হচ্ছে ছাগলের গান। এর উপর টীকা করা হয়েছে, ডাইওনিসাসের মন্দিরে ছাগবলি দেবার পরে নিহত ছাগলের উদ্দেশে যে গান করা হত সেই গান। হা হা হা। তোমার কি তাই মনে হয়?"

সুধী উত্তর দিল না। মৃদু হাস্‌ল।

তিনি বল্লেন, "সেকালে কোরাসদের নামকরণ হত পশু পাখীর নামে। যথা ব্যাং-এর কোরাস, ভীমরুলের কোরাস, রামছাগলের কোরাস। রামছাগলের কোরাস যে একটা গম্ভীর ভাবাত্মক ও করুণ রসাত্মক ব্যাপার হবে তার আর আশ্চর্য্য কি? কোনো কোনো টীকাকার বলেন য়্যারিষ্টফেনিসের 'ব্যাং' নামক কমেডি যেমন ব্যাং-এর কোরাস থেকে, সর্ব্বপ্রাচীন ট্র্যাজেডী তেমনি রামছাগলের কোরাস থেকে।"

সুধীও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে হাস্‌ল।

তিনি শান্ত হয়ে বল্লেন, "আড়াই হাজার বছর পরে শব্দের ধাতুগত অর্থ দিয়ে তার সংজ্ঞা বা প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা যায় না। গ্রন্থগুলি পড়ে তাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তোমার আমার যা ধারণা তাই তাদের তাৎপর্য্য। সদৃশ তাৎপর্য্য বিশিষ্ট নাটকগুলিকে ট্র্যাজেডী আখ্যা দিয়ে তারপর ট্র্যাজেডীর অর্থ কর্‌লে মোটের উপর সেইটেই হবে যথার্থ অর্থ। আমি জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের ও বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে অতীতের বিচার করে থাকি, চক্রবর্ত্তী। যারা কেবলমাত্র পণ্ডিত তাদের সঙ্গে আমার সেই কারণে বনে না।"

তিনি সুধীকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লেন সুধী সম্প্রতি সফক্লিসের "রাজা ঈডিপাস" পড়েছে। ঈডিপাসের পিতা পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুন্‌লেন যে সে একদিন পিতৃহত্যা করে নিজের জননীকে বিবাহ কর্‌বে। তিনি তার জন্মের অল্পদিন পরে তাকে বধ কর্‌বার জন্য এক রাখালকে দিলেন। রাখাল দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক বিদেশী পথিকের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। বিদেশী রাজা ছিলেন অপুত্রক। পথিকের কাছে তিনি এই শিশুকে পেয়ে অতি যত্নে লালন কর্‌লেন। বড় হয়ে সে তার পালক পিতাকে আপন পিতা বলে জান্‌ল। হঠাৎ একদিন উপরোক্ত প্রকার দৈববাণী শুনে পাছে পিতৃঘাতী হতে হয় সেই ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রথের সারথি তাকে পথ থেকে হটে যেতে বল্ল। বাক্‌বিতণ্ডার ফলে সারথি ও রথী উভয়েই হলেন তার দ্বারা নিহত। সে পালাতে পালাতে শেষকালে যে দেশে উপনীত হল সে দেশের লোক তাকে তাদের মৃত রাজার স্থলে অভিষিক্ত কর্‌ল ও বিধবা রাণীর সঙ্গে বিবাহ দিল। কালক্রমে তাদের সন্তান হল। অকস্মাৎ দেশে এল মহামারী। খোঁজ, খোঁজ কোন মহাপাপে এমন ঘটল। সব প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল। রাণী

দিলেন গলায় দড়ি। ঈডিপাস আপন হাতে দুই চক্ষু বিদ্ধ করে আপন ইচ্ছায় নির্ব্বাসিত হলেন।

সুধী বল্ল, "সফক্লিসের রচনার গুণে গল্পটি এমন ঘোরাল আর কথোপকথন এমন জোরাল হয়েছে যে আড়াই হাজার বছরে কোনো নাট্যকার ঐ দুই দিকে উন্নতি দেখাতে পারেন নি। তবে চরিত্রচিত্রণ বড় মোটা তুলিতে মূল রং-এর সাহায্যে হয়েছে।"

ডক্টর সুধীর সঙ্গে একমত হলেন। সফক্লিস তাঁর প্রিয় নাট্যকার। তিনি বল্লেন, "সমস্যা সংক্রান্ত নাটক আধুনিক যুগে রাশি রাশি লেখা হচ্ছে, কিন্তু হতভাগ্য ঈডিপাসের সমস্যাকে কোনো সমস্যাই অতিক্রম করতে পারছে না। পিতামাতার জন্য, পুত্রকন্যার জন্য, আপনার জন্য কি খেদ কি লজ্জা কি গ্লানি ঐ একটা মানুষের। কিন্তু ট্র্যাজেডী আমি সেইটুকুকে বলব না। ট্র্যাজেডী হচ্ছে তাই যার কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই, যা অবশ্যম্ভাবী, যাকে চুপ করে ঘটতে দেওয়া ও অসহায় ভাবে সয়ে যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। এই যেমন গত মহাযুদ্ধ। ঐ নরকের ভিতর দিয়ে যেতেই হল আমাদের সবাইকে, কেউ প্রাণে মরে সকলের থেকে এগিয়ে গেল, কেউ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করল, কেউ আমার মত অকর্ম্মণ্য হয়ে সকলের থেকে বেশী ভুগল।"

সুধী মন দিয়ে শুনছিল। বল্ল, ঈডিপাস যা করেছিলেন তা না জেনে করেছিলেন, তার দরুণ অনুশোচনার আবেগে আত্মপীড়ন করা তাঁর উচিত হয়নি। নিজের দুর্ভাগ্যকে সাধ্যমত খণ্ডন করাতেই মনুষ্যত্বের জয়।"

ডক্টর বাধা পেয়ে বিরক্তি দমন করে বল্লেন, "কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এরূপ ক্ষেত্রে অখণ্ডনীয়, মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড্। হয় বিধাতার নয় প্রকৃতির নয় অপরাপর মানবের Stern necessity আমাদের দুর্ভাগ্যের মূলে। যেমন এক একটা ঝড় বা ভূমিকম্প তেমনি মানব সংসারের এক একটা ট্র্যাজেডী। ঝড়ের পরে যেমন আকাশ নির্ম্মল হয় বাতাস ঝির ঝির করে বয়, নব জীবনের উল্লাস অনুভূত হয় তেমনি ট্র্যাজেডীর পরে। A stern necessity works itself out. দুই আর দুই মিলে চার হয়। তারপর আমরা বুঝি যা হয়ে গেছে তা মঙ্গলের জন্য। ঈডিপাসকে দিয়ে দেবতারা প্রমাণ করলেন যে মানুষ যতই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যের অধিকারী হোক অহংকারে আত্মহারা হোক তার পতনের বীজ তার উত্থানের মধ্যে গুপ্ত আছেই, সে বীজ অঙ্কুরিত হতে বিলম্ব করলেও ক্রমান্বিত হয়ে দশদিক আচ্ছন্ন করবেই।"

সুধী তাঁকে স্তব্ধ হতে দেখে ভরসা করে বল্ল, "বুঝেছি, আপনি যাকে ট্র্যাজেডী বলেন তাকে আমরা বলি কর্ম্মফল, সংক্ষেপে কর্ম্ম।"

সুধী তাঁকে বোঝাল। তিনি বল্লেন, "আমি আমার অজ্ঞাতসারে যা করছি তার ফল কি আমাকে ভোগ করতে হবে? তা কি কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের সামিল?"

সুধী "বল্ল, নিশ্চয়। আইন জানিনে বলে বিধাতার আদালত আমাকে মাফ করবে না। সেইজন্যই ত জ্ঞানার্জ্জন করা আমাদের নিত্যকালীন কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্ঞান মানুষকে আত্মহননের প্রেরণা দিতে পারে না। ঈডিপাসের জীবনে কি প্রমাণ হল? প্রমাণ হল এই যে সে যেন অত্যুচ্চ গম্বুজের চূড়ায় দাঁড়িয়েছে মাটীর থেকে পাঁচশ হাত দূরে; তাই দেখে তার মাথা গেল ঘুরে; সে দিল লাফ। এটা ত কর্ম্মফল নয়, নূতন কর্ম্ম।"

ডক্টর মেনে নিতে পারলেন না। বল্লেন, "তোমার দেখা ও আমার দেখা দুই স্বতন্ত্র ভূমি থেকে। আমি দেবতাদের স্বর্গ থেকে ঈডিপাস নামক একটি মানব ম্যারিয়নেটকে দেখছি। তাকে দিয়ে একরকম খেলা দেখান হল। খেলার থেকে শিক্ষা—Wait to see life's ending ere thou count one mortal blest. সব ট্র্যাজেডীই খেলা এবং প্রত্যেক খেলার পিছনে শিক্ষা উহ্য আছে। তা বলে আমি বলছিনে যে সকলের জীবনে ট্র্যাজেডী ঘটে। না, ওজিনিষ অত সস্তা নয়, চক্রবর্ত্তী। যাদের জীবন মহৎ উপাদানে তৈরি কেবলমাত্র তারাই ট্র্যাজেডীর নায়ক হয়ে থাকে। ঈডিপাস এই হিসাবে ভাগ্যবান।"

সুধী কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর চা ঢেলে টেবিলটাকে নোংরা করে

রেখেছিলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে হাতের ঘা লাগিয়ে একটা পেয়ালাকে দিলেন মেজের উপর কাৎ করে। মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট ঘরে ঢুকতেই দেখেন এই ট্র্যাজেডী। তাঁর বিরাট বপু শ্রমক্লান্তিতে ঘন ঘন আকুঞ্চিত প্রসারিত হচ্ছিল। তিনি কথাটি না বলে একগাদা বইয়ের উপর ধপ করে বসে পড়্লেন। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আস্ছিল। সুধী আলোর সুইচটা টিপে দিল। আলোর আকস্মিকতা সইতে না পেরে মিস্ হাত দিয়ে চোখ ঢাক্লেন।

৪

"এই যে সুধী, এ বেলা এইখানেই খেয়ো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"সে কি করে হবে মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট? আমার মাদাম যে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতে থাক্বে। আর মার্সেল গল্প না শুনে কিছুতেই ঘুমতে যাবে না।"

"আঃ মার্সেল!"

"ওকে আজকাল ভগবানের গল্প বলি, মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট। ভগবান কে, কোথায় থাকেন, কি করেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ, তাঁর জন্য আমরা কি কর্তে পারি। এই সব।"

"চমৎকার। তোমার মার্সেলকে দেখ্তে হবে একবার। তাকে নিয়ে আস্তে পার না?"

"উঁহু। গাড়ীতে চড়্লে তার অসুখ করে।"

মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইট সামান্য একজন শ্রমিকশ্রেণীর লোকের বাড়ী যাবেন মার্সেলকে দেখ্তে, এটা আশা করা অন্যায়। কাজেই সুধী তাঁকে আমন্ত্রণ করতে পারল না। তিনিও প্রসঙ্গটা চাপা দিলেন। সুধীকে ছেড়ে আর্থারকে নিয়ে পড়্লেন।

"তারপর আর্থার, কতক্ষণ বাড়ী এসেছ? চা খাওয়া হয়েছে? ভুলে যাওনি? কই, তোমার পেয়ালা কোথায়? সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ টুকরাগুলো উঠিয়ে রাখনি? অধ্যাপক হলে কি এমনি ভোলানাথ হতে হয়? দেখেছ সুধী আমার সেই পুরাণ হলাণ্ড দেশীয় টী-সেট্-এর একটী পেয়ালা। হায় হায়! মিস ডবসনকে আমি হাজারবার বারণ করেছি। বিয়ে-পাগলী হয়ে তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

পেয়ালার ভাঙ্গা অংশগুলি একত্র করে ধরে তিনি আস্ত পেয়ালার অনুকরণ কর্লেন। লোহার শিক দিয়ে ওগুলিকে ফুড়ে লোহার তার দিয়ে ওগুলিকে বেঁধে জোড়া যায়। সেজন্য কালকেই তিনি বণ্ড ষ্ট্রীটের এক দোকানে যাবেন সংকল্প কর্লেন।

আর্থার প্রথমটা অপদস্থের মত অধোবদনে ছিলেন। কিন্তু সুধীর সামনে এতখানি উচ্ছ্বাস দেখান এলিনরের পক্ষে অশোভন হয়েছে মনে করে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠ্লেন। কিন্তু বোনকে রীতিমত ভয় করে চল্তেন। সুধীর সামনে একটা কাণ্ড বাধাতেও তাঁর অপ্রবৃত্তি। সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগ্লেন।

সুধী ভাব্ল এই সুযোগে বিদায় নেওয়া যাক। বল্ল, "মিস্ মেল্বোর্ণ হোয়াইট্—"

"এত বড় একটা গালভরা নামে নাই বা ডাক্লে সুধী। বোলো আণ্ট এলিনর। আমি ত কবে থেকে তোমাকে সুধী বলে ডেকে আস্ছি। কিন্তু দেখ দেখি আর্থারের পাগ্লামি! বিয়ে করে থাক্লে বৌটাকে ক্ষেপিয়ে তুলে ছাড়্ত। আমি বলে সহ্য করি। অন্য কোনো বোন তাও পার্ত না। তুমিই বল না কেন, সুধী।"

"কিন্তু আণ্ট এলিনর, বয়ঃকনিষ্ঠের উপস্থিতিতে ওঁকে অমন কথা শোনান ঠিক হয়নি আপনার। আমাকে বিদায় দিয়ে আপনি যান্ ওঁকে প্রসন্ন করুন।"

"সে কি! তুমি খেয়ে যাবে না? তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা ছিল। আমি একটা দোকান আবিষ্কার করেছি যেখানে তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়, তোমরা যাকে 'কাডার' বল। কিছু কিনেও এনেছি। কাল পোষাক তৈরি করব বসে।"

অগত্যা সুধীকে প্রস্তাব করতে হল, "আচ্ছা, তবে কাল এসে দেখে যাব।"

পরদিন আণ্ট এলিনর বাগানের দিকের বারান্দায় বসে রঙিন পশমের খদ্দরের উপর কাঁচি চালাচ্ছিলেন, সুধীকে অভ্যর্থনা করে বল্লেন, "ভিতর থেকে একখানা চেয়ার টেনে

নিয়ে এসে বস।···পেয়ালাটা নিয়ে বণ্ড ষ্ট্রীটে যাব ভাবছিলুম। তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।···তোমার সেই ঈষ্টার ডিমের কথা মনে আছে? লেডী হেনরিয়েটা ব্রুমফিল্ড তোমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছেন। যদি তোমার কোনো দিন সময় হয় তবে আমার সঙ্গে তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করে আসা মন্দ নয়।···ও কি? আমার জন্য ফুল এনেছ? কি ফুল? স্নোড্রপ্। বহু ধন্যবাদ।"

সুধী বল্ল, "একটি বুড়ো ভিখারী পথে পাকড়াও করে এইটি হাতে গুঁজে দিল। ভাবলুম নতুন আণ্টকে উপহার দিয়ে সম্বন্ধটার সংবর্দ্ধনা করি।

আণ্ট এলিনর শুধু বল্‌তে থাক্‌লেন, "Too nice of you, too nice of you." উঠে গিয়ে একটি ফুলদানীতে যত্ন করে স্নোড্রপগুচ্ছটি রাখ্‌লেন। বাগান থেকে ভায়োলেট ফুল তুলে একটি ছোট্ট তোড়া বেঁধে সুধীর বাটনহোলে পরিয়ে দিতে গিয়ে দেখেন তার বাটনহোল নেই।

"তাই ত সুধী। অতটা লক্ষ করিনি। মিছি মিছি ফুলগুলিকে কষ্ট দিয়ে তুল্লুম। এখন কি করি! আচ্ছা, নিয়ে তোমার মার্সেলকে দিও।"

"ধন্যবাদ, আণ্ট এলিনর। মার্সেল খুব খুসী হবে।"

আণ্ট এলিনরের কি যে বল্‌বার ছিল বল্‌তে ত্বরা দেখা গেল না। সুধীর একটু কাজ ছিল। কিংস্ ক্রস্ ষ্টেশনে গিয়ে দেশ থেকে আস্‌তে থাকা একটি ছেলেকে অভ্যর্থনা কর্‌তে হবে। ছেলেটিকে সুধী চেনে না, যোগানন্দের পরিচয় লিপি থেকে তার নাম জেনেছে এবং তার নিজের টেলিগ্রাম থেকে তার পৌছানোর তারিখ, সময় ও স্থান।

বহুকাল উজ্জয়িনীর সংবাদ না পেয়ে তার উৎকণ্ঠা সঞ্চার হয়েছিল। এদিকে বাদলও নিরুদ্দেশ। কাকামশাই যথেষ্ট বড় চিঠি লেখেন না, কেবলমাত্র বাদলের কুশল জিজ্ঞাসা করে ও সুধীর কুশল আশা করে ইতি করেন। নবাগত যুবকটি হয়ত দেশের ও দশের খবর দিতে পারবে। যুবকটির সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুধী ব্যগ্র হয়ে রয়েছিল। আণ্ট এলিনরের সঙ্গে আলাপ জমছিল না।

আধ ঘণ্টাকাল বাগানের দিকে চেয়ে থেকে সুধী বল্ল, "দেশ থেকে একটি ছেলের পৌছানোর কথা আছে আজ, আণ্ট এলিনর।"

"বটে? তোমার বন্ধু বুঝি?"

"না, আণ্ট এলিনর। বন্ধু আমার একটিমাত্র। সে আজ মাস খানেক নিরুদ্দেশ।"

"নিরুদ্দেশ! অসম্ভব। স্থির জান নিরুদ্দেশ?"

সুধী চিন্তামৌন থাকল। চিন্তার কিছুটা দুশ্চিন্তাও বটে। মনটা কেমন করে উঠছিল। আণ্ট এলিনর হাতের কাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বল্‌ছিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর দিয়েছ? দাও নি? চল আজই দিয়ে আসি। বিদেশী ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোথায় যেন একটা সমিতি ছিল। খুঁজে বার কর্‌তে হবে সেটাকে। আচ্ছা, একটু বস, আমি কোটটা নিয়ে আসি, ছাতাটাও। ইস্, বৃষ্টিটা জোর নাম্‌ল।"

এপ্রিল মাস। এই বৃষ্টি, এই রোদ। উইলিয়াম ওয়াটসন তার বর্ণনা করেছেন,

> "April, April
> Laugh thy girlish laughter
> Then a moment after
> Weep thy girlish tears."

সুধীর সেই কথা মনে পড়্‌ল। অমনি বাদলের চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ সুধীকে সব ভোলায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে আহার নিদ্রার গণ্ডী লঙ্ঘন করে। তার প্রাণ শীতল হয় হৃদয় স্নিগ্ধ হয় অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও আত্মা পরিপূর্ণ হয়। আবেশ কিম্বা উত্তেজনা, মূর্চ্ছা কিম্বা গদগদভাব তাকে মত্ত কিম্বা মূঢ় করে না। বেগবিহীন বর্ষাধারা সবুজ তৃণের উপর এমনভাবে পড়্‌ছিল যেন ঘুম পাড়ানর সময় শিশুর মাথার উপর মায়ের হাতের চাপড়। জোরে নয়, পাছে শিশুর ঘুম না আসে। অথচ আস্তেও নয়, পাছে শিশু আদরের অস্বচ্ছলতা অনুভব করে থেকে থেকে চোখ মেলে চায়।

সিগ্‌রেট খায়, গাধাগুলোকে পিটাতে পিটাতে মাঠ থেকে বাড়ী নিয়ে যায়। Reformatoryতে না গেলে শোধ্‌রাবে না। ইংরাজী যা শিখেছিল বেবাক ভুল বক্‌ছে। মাই নেম ইস্ ওয়াশারম্যান, সার। কখনো কখনো বলে, ওয়াশার ওম্যান, সার। হা হা হা। কে নাকি তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, ম্যান নয়, ওম্যান। মধ্যে মধ্যে বলে, আই য়্যাম এ ডাঙ্কি—আমার একটি গাধা আছে।"

সুধী এই সরল মানুষটির প্রাণ-খোলা কথাবার্ত্তায় বাধা দিতে কুণ্ঠা বোধ কর্‌ছিল। কিন্তু যা জান্‌তে চাচ্ছিল তা শুন্‌তে পাচ্ছিল না। উজ্জয়িনী কেমন আছে? খুব ভজন পূজন কর্‌ছে নাকি? পার্থিব ব্যাপারে একান্ত উদাসীন? চিঠির উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করে না? কিন্তু বিভূতি ওদিক দিয়ে যায়ই না। ধোপার ছেলের গল্প শেষ করে সে তার নিজের ছেলের গল্প শুরু করেছে। "বড়টির বয়স সবে তিন বছর। এরি মধ্যে ইংরেজী বল্‌তে পারে, মশাই! দেখ্‌বেন ও বড় হ'লে আই-সি-এস্ হবেই। ছোটটা সয়তান। কথা বল্‌তে পারে না। কিন্তু ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসে, হাতে ছোবল মারে। বড় হলে স্যাণ্ডহার্ষ্টে ঢুকে সৈনিক হবে, দেখ্‌বেন। আমি এসেছি, সমস্ত খোঁজ খবর না নিয়ে ফির্‌ছিনে।"

এমন সময় বিভূতির একটি জাহাজী বন্ধু এসে সুধীকে অব্যাহতি দিল। সুধী বল্ল, "আজ তবে উঠি, বিভূতিবাবু। আমার ঠিকানা ত জানেন, কখনো দরকার হলে ফোন কর্‌বেন। সে সরকার রইল, কোনো অসুবিধা হবে না। নমস্কার। গুড্ বাই মিষ্টার—"

"ডোন্ট্‌ রে।" (মারাঠা যুবক।)

উজ্জয়িনীকে সুধী সেই রাত্রেই চিঠি লিখ্‌ল। বাদল যে হারিয়ে গেছে সে কথা প্রকাশ কর্‌ল না, কিন্তু মিথ্যা কুশল সংবাদও দিল না। চিঠিতে থাকলো শুধু উজ্জয়িনীরই কথা। সে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অংশ সুধীকে কেন দেয় না। তার আভ্যন্তরিণ বিকাশ সম্বন্ধে সুধী সশ্রদ্ধ ও সুকৌতুহলী। তার বাবার সঙ্গে তার মত বিরোধ যেন তাকে নির্ম্মম ও রূঢ় করে না, যুক্তি-মাধুর্য্যের দ্বারা উক্ত বিরোধ ভঞ্জন করা বিধেয়। সুধী জানতে পেরেছে তিনি অতি মর্ম্মাহতভাবে দিন যাপন কর্‌ছেন। মত-বিরোধ সত্ত্বেও বন্ধুতা সম্ভব, তার সাক্ষী সুধী ও বাদল। অল্পবয়স্কদের কাছে মত-বিরোধ ঘট্‌লে অধিকবয়স্করা সেটাকে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞান করে ভগ্ন-হৃদয় হন। অতএব মত ভিন্ন হলেও তার সঙ্গে বিনয়, ক্ষমা ও শ্রদ্ধা সংযুক্ত কর্‌তে হয়। মতবিরোধ পথ-বিরোধ উপলব্ধিবিরোধ সত্য। সত্যকে প্রিয় করা আমাদের কর্ত্তব্য। নতুবা চরম অকল্যাণ যে প্রিয়-বিরোধ তাই ঘটে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী প্রবন্ধের গ্রন্থ নির্দ্দেশের সঙ্কেত

[অজিত]—শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী :—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ। ইংরাজি ১৯১৬।

[আত্ম-জীবনী]—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্ম-জীবনী। ৩য় সংস্করণ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয়। আগষ্ট, ইংরাজি ১৯২৭।

[কেশবচন্দ্র]—আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, ১ম অংশ। শ্রীদরবারের অনুমত্যানুসারে প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৮১৪ শক।

[জীবন-স্মৃতি]—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—জীবন-স্মৃতি। ১ম সংস্করণ। কলিকাতা, ১৩১৯।

[পিতৃ স্মৃতি]—সৌদামিনী দেবী :—পিতৃস্মৃতি (প্রবাসী, (১১) ১৩১৮, ফাল্গুন, ৪৭২—৪৭৭ পৃষ্ঠা)।

[প্রশান্ত, (১)]—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ :—রবীন্দ্র পরিচয়। (প্রবাসী, (২১), ১৩২৮, মাঘ, ৪৮৭—৪৯৯ পৃঃ)।

[প্রশান্ত, (২)]— " রবীন্দ্র পরিচয়—বনফুল। (প্রবাসী, (২১), ১৩২৮, ফাল্গুন, ৫৯২—৬০০ পৃঃ)।

[প্রশান্ত, (৩)]— " রবীন্দ্র পরিচয়—কবি-কাহিনী। (প্রবাসী, (২২), ১৩২৯, জ্যৈষ্ঠ, ২১৫—২২২ পৃষ্ঠা ; আষাঢ়, ৩৪২—৩৪৪ পৃষ্ঠা)।

[প্রশান্ত, (৪)] :— " রবীন্দ্র পরিচয়—রুদ্রচণ্ড। (প্রবাসী, (২৩), ১৩২৯, শ্রাবণ, ৫০৭—৫১৩ পৃষ্ঠা)।

[ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি]—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ :—ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি। (নব্যভারত, ১৩২৯ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত পুস্তিকা, চৈত্র, ১৩২৯)।

[ব্রজেন্দ্র, (১)]—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—সমাচারদর্পণে সেকালের কথা। (ভারতবর্ষ, (১৯) ১৩৩৮, আশ্বিন।

[ব্রজেন্দ্র, (২)] " (ভারতবর্ষ (১৯), ১৩৩৮, শ্রাবণ।)

[ব্রা. বি.]—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় ভাগ। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ও স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত পীরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১ম খণ্ড। কলিকাতা, (১৩৩১)।

[মন্মথ]—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কলিকাতা। ১৩৩৪।

[রাজনারায়ণ]—রাজনারায়ণ বাবুর আত্ম-চরিত। ২য় সংস্করণ ; কলিকাতা। ১৩১৯।

পুস্তক পরিচয়

নানা চর্চ্চা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী (কমলা বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত ; দাম ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁর নব-প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ "নানা চর্চ্চায়" তাঁর কয়েকটি লেখা সাময়িক পত্র থেকে উদ্ধার করে আমাদের আনন্দের যথেষ্ট খোরাক দিয়েছেন। এর প্রায় সবগুলিই আগে পড়েছি, কিন্তু প্রমথবাবুর লেখা সেই জাতীয় যা বারবার পড়েও পুরানো হয় না, যার চিন্তার ও প্রকাশের বৈচিত্র্য ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এ প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে ও নানা বিষয়ে লেখা হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে, যা এদের একত্র না দেখতে পেলে হয়ত ধরা যেত না। "এসবগুলিই আমাদের দেশের বিষয়ে আলোচনা। এ এক রকম ভারত-বর্ষের হিষ্টরি জিওগ্রাফির বই।" আমাদের দেশের নানা-যুগের নানা চিন্তা, নানা চেষ্টা ও নানা মানুষের কথা বলার আগে গ্রন্থকার ভিৎ গেঁথেছেন দেশের জল হাওয়া ও মাটির কথা ব'লে। প্রথম প্রবন্ধ—"ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি"—যখন "সবুজ পত্রে" প্রকাশিত হয় তখন পাঠকমহলে খুব একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এত অল্প কথায় এই প্রকাণ্ড ও কঠিন বিষয়ের এমন সরস আলোচনা অসাধারণ প্রতিভারই নিদর্শন। একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, যে শুধু একখানা মানচিত্রের সাহায্যে ঘণ্টা দুয়েক সময়ের মধ্যে এই প্রবন্ধ পড়ে আমাদের দেশের যে স্পষ্ট ছবি মনে এঁকে যায়—তা বিদ্যালয়ে বহু বৎসরের বহু কষ্টের ফলেও ঘটে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় প্রবন্ধে হিন্দুস্থানের বাইরে হিন্দুর যে-যে স্থান এখনও আছে সেই অনু-হিন্দুস্থানের কথা বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে প্রবন্ধটি যখন লেখা তখন রবীন্দ্রনাথ ওসব অঞ্চলে যান নি এবং বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা তখন এখনকার চেয়ে অনেক কম ছিল। পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে কালের দিক্ থেকে একটা ক্রম লক্ষ্য করা যায়। গীতা ও মহাভারতের কথা দিয়ে আরম্ভ করে, ভগবান বুদ্ধের জীবনী আলোচনার পর গ্রন্থকার প্রাচীন হিন্দু ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের জীবন ও রাজ্য-ব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। তারপর মুসলমান যুগের ভারতবর্ষের দুটি চরিত্র পাই, একটি পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলী খাঁর, অপরটি আকবর-সুহৃৎ বীরবলের। অষ্টম প্রবন্ধ আমাদের প্রায় ইংরাজ-আমলের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। রায়গুণাকর গ্রন্থকারের অতি প্রিয় কবি। ভারতচন্দ্রের কথা তিনি বহুবার বলেছেন কিন্তু এমন দরদ দিয়ে তাঁর জীবনের ও কাব্যের কথা তিনি বোধ হয় আর কোথাও শোনাননি। "এদেশে ইংরাজের শুভাগমনের পূর্ব্বে বাঙলা দেশ ব'লে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্যই স্মরণ করিয়ে দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য"। নবম প্রবন্ধে আধুনিক যুগের বাঙলার অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রামমোহন রায়কে পাই। ইংরাজ আমলে এসে পড়েছে. সুতরাং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংঘাত ও মিলনের কথা এখন প্রাসঙ্গিক। তিনটি প্রবন্ধে ও প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে ; এবং সর্ব্বশেষ প্রবন্ধে পাই গোল-টেবিল-বৈঠকের প্রসঙ্গে প্রকৃত স্বরাজ-সাধনের-পথ-নির্দ্দেশ।

নানা কারণে বইখানা পড়ে বিস্মিত হতে হয়। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, পলিটিক্স, এত বিভিন্ন বিষয়ে সমান কৌতূহল আমাদের দেশে খুবই কম লোকের দেখা যায়। বহুবিধ জ্ঞানে এই অনুরাগ এবং অধিকার পাঠককে চমৎকৃত করে। কিন্তু লেখককে শুধু জ্ঞানী বা পণ্ডিত বললে সব কথাটা বলা হয় না। তিনি যে শুধু নানা বিষয়ের মালমশলা সংগ্রহ করেছেন তা ত নয়, তিনি দেখিয়েছেন এই মালমশলা তিনি সৃজন কার্য্যে ব্যবহার করতে জানেন। অনায়াসে

৫

আণ্ট এলিনর তাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সুধী বল্ল, "আগে তার ব্যাঙ্কে একখানা চিঠি লিখে দেখি।"

আণ্ট বল্লেন, "তবে চল কিংস্ ক্রস্।" চায়ের পেয়ালা সারাবার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে সুধী বল্ল, "ওকে একদিন এখানে নিয়ে আস্ব, আণ্ট এলিনর। আগে ও কোথাও উঠে বিশ্রাম করুক।"

একসঙ্গে খানিকটে পথ গিয়ে সুধী বিদায় নিল। কিংস ক্রস্ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গাড়ী এলে দেখ্তে পেল একটি কামরায় চার পাঁচ জন ভারতীয় যুবক। কোন্‌টি বিভূতি ভূষণ নাগ—সুধীর মনে প্রশ্ন উঠ্‌ল। সুধী একজনকে একটু নেপথ্যে ডেকে প্রশ্ন করতেই উত্তর পেল, "আমিই বিভূতি। আপনি কি--"

"হাঁ, আমিই। আপনার সঙ্গের জিনিষগুলি কোথায়?"

বিভূতিকে সুধী দে সরকারের ওখানে নিয়ে তুল্ল। দে সরকার বাসায় ছিল না, তার বাড়ীওয়ালী সুধীকে চিন্‌ত। একটি ঘরে জায়গা করে দিল। সুধী বল্ল, "এইবার আপনি বিশ্রাম করুন বিভূতিবাবু, আমি ওবেলা আস্ব।"

বিভূতির বয়স সুধীর থেকে দু'একবছর বেশী। নাদুস নুদুস গড়ন। গায়ের রং মিশ কাল। তার চেহারার বৈশিষ্ট্য তার চোখে ও গোঁফে। ডাগর কাল চোখ, পদ্ম-পলাশাকৃতি। সূক্ষ্ম কোমল গোঁফ, চিত্রার্পিতের মত। তার চলন শান্ত মন্থর, ভাষা জড়ান, টান বাঙ্গাল।

বল্ল, "একটু বসুন। আচ্ছা, বাথ রুমটা কোন দিকে?"

সুস্থ হয়ে সে যখন ফির্‌ল তখন সুধী বল্ল, "উঠি তা হলে?"

বিভূতি অসহায়ভাবে বল্ল, "উঠবেন? ভাবছিলুম, একবার সার নিকোলাস বিটসন বেলের সঙ্গে দেখা করতে যাব, বাবাকে বড় ভালবাস্তেন। পথ হারিয়ে ফেল্‌ব না?"

সুধী বল্ল, "সে কি মশাই? স্নানাহার করে বাকী ঘুমটা ঘুমিয়ে নিন। দে সরকার ফিরুক। আমিও ফিরি। গল্পগুজব চলুক। ইংলণ্ডের জলহাওয়া সহ্য হোক। তারপর সার নিকোলাসের পালা।"

বিভূতি এক তাড়া কাগজ সুধীর সাম্‌নে ফেলে দিল। সাহেবদের সুপারিশ পত্র। বিভূতির বাবা শ্যামাচরণ বাবুকে দেওয়া। Certified that Babu Shyama Charan Nag is a Sub-Deputy Collector of rare ability......"

সুধীর চেয়ারের পেছন থেকে ঝুঁকে পড়ে পিতৃ-গর্ব্বিত পুত্র টিপ্পনি কর্‌ল, "বেল সাহেব বাবাকে কানুনগো থেকে সাবডেপুটি কর্‌ল। অকালে পেন্সন না নিয়ে থাক্‌লে এতদিনে ডেপুটি না করে ছাড়ত না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। দেখি যদি বেল সাহেবকে ধরে মোবার্লি সাহেবকে চিঠি লেখাতে পারি।"

একটু পরে দে সরকার ফির্‌ল। কাজেই সুধীর ওঠা হল না। দে সরকার সম্পূর্ণ পরিচিতের মত হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্ল, "হাউ ডু ইউ ডু।" পেশাদার চালিয়াতের হাতের ঝাঁকানি খেয়ে বেচারা বিভূতির অন্তরাত্মা বুঝ্‌ল দে সরকারের তুলনায় সে একটা গেঁয়ো ভূত। আম্‌তা আম্‌তা করে বল্ল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

অসহায় মানুষ দেখলে দে সরকার তাকে নিয়ে তামাসা করতে ভালবাসে। জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ওয়েল, মিষ্টার ন্যাগ ন্যাগিনীটিকে কি এই দেশে সংগ্রহ করবেন না দেশে রেখে এসেছেন?"

বিভূতি প্রথমটা বুঝতে পার্‌ল না। যখন বুঝ্‌ল তখন লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে বল্ল, "দেখবেন? এই দেখুন। সর্ব্বক্ষণ বুকে করে রেখেছি।" পকেট থেকে একখানি ফটো বার করে বিভূতি দে সরকারের চোখের সাম্‌নে ধর্‌ল। একটি অতি রুগ্না কৃশকায়া তরুণী, অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে যারপর নাই ফর্‌সা। টিকল নাক, পাতলা ঠোঁট, ছুঁচল চিবুক, কাতর চাউনি।

দে সরকার ফস করে চারটে পকেট থেকে চারখানি ফটো বার করে টেবিলের উপর চারখানা তাসের মত ফেলে দিল। প্রথমটা বিভূতির মুখ থেকে তার মনের ভাব অধ্যয়ন কর্‌ল। বিভূতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দে সরকার বল্ল, "ইস্কাবনের বিবি, চিড়িতনের বিবি, হরতনের বিবি, রুহিতনের বিবি। বলুন দেখি এরা আমার কে হয়?"

বিভূতি সুধীর দিকে চাইল। সুধী মুচকে হাসছিল। দে সরকার ফটোগুলো গুটিয়ে যথাস্থানে ন্যস্ত করল। তারপর বল্ল, "অসময়ে এলেন যে? ইংলণ্ডে যারা পড়তে আসে তারা অক্টোবরের আগে আসে।"

বিভূতির এবার মুখ ফুটল। সে ফস করে বল্ল, "আসছে আগষ্টে আই-সি-এস্ দেব।"

দে সরকার বল্ল, "বয়স আছে ত?"

বিভূতি সখেদে বল্ল, "একবার দেবার বয়স আছে, দুবার দেবার নেই। কি করি বলুন, শ্বশুর মশাই পাঠাতে চান না, তাঁর ঐ একটি মেয়ে কিনা—"

"বুঝেছি। পাছে বিধবা হয়!"

"ছি। আপনি যা তা বলবেন না। আমার ছেলে দুটি—"

"ইতিমধ্যেই? ভাল করেছেন, মশাই। বেশ করেছেন। বিদেশে এসে স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু কিছু খেয়েছেন দেয়েছেন? না? দেশী খাবার পছন্দ করেন ত রাঁধতে লেগে যাই।"

বিভূতির মুখভাব থেকে মনে হল তার বিলম্ব সইবে না। অগত্যা দে সরকার তাকে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে চল্ল। তাকে এক হাতে ও সুধীকে অন্য হাতে। এ পাড়ার লোক বোহিমিয়ান হোক না হোক বোহিমিয়ানের কদর বোঝে। তিনটি কাল মানুষ দল বেঁধে চলেছে, দুজনের বগলে এক জনের দুই হাত ভরা, কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না। একটা ইটালিয়ান রেস্তোঁরায় তিনজনে টুমাটোর সঙ্গে Spaghettiর ফরমাস দিল।

৬

দে সরকারের কোথায় যেন এন্‌গেজমেণ্ট ছিল। সে সুধীকে ও বিভূতিকে বাসায় পৌছে দিয়ে ছুটী নিল।

সুধী বল্ল, "বিভূতিবাবু, ক্যাপটেন গুপ্তরা কেমন আছেন?"

বিভূতি বল্ল, "শুনছিলুম তিনি বেলুচিস্থানে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আগে খুব মিশতেন। আজকাল কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তবে বাবাকে বড় ভালবাসেন। দেখা করতে গেলে দোতালায় ডেকে পাঠান। বলেন, খবর কি শ্যামাচরণ, তোমার নাতিরা কেমন আছে? বাবা বলেন, ছেলেটিকে এবার বিলেত পাঠাচ্ছেন তার শ্বশুর। আমার সাধ্য কি, বলুন, যে আপনাদের সঙ্গে পাল্লা দিই। যদি একখানা চিঠি লেখেন আপনার জামাইকে—! গুপ্ত সাহেব বলেন, দুঃখের কথা কেন বল ভাই। মেয়ে কিম্বা জামাই কেউ আমার খোঁজ নেয় না। King Lear এর মত সবাই আমাকে ছেড়েছে।···বাবার চোখে জল এল তাঁর দশা দেখে।

সুধী উজ্জয়িনীর সংবাদ জানতে চাইল।

বিভূতি বল্ল, "ওটা একটা পাগলী। ওর বিয়ের আগে প্রায়ই দেখা যেত ধোপাদের একটা ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। অবিশ্যি সে ছেলেটাও ভদ্রলোকের ছেলের মত স্মার্ট। ওকে জিজ্ঞাসা করুন, তোর নাম কি রে? ও বলবে, মাই নেম ইস্ শ্রীহারাধন রজক। হা হা হা। ব্যাটা একদিন করেছে কি আমার ছোট ভাই কান্তির একটা শার্ট গায়ে দিয়ে টেরি কেটে এসেন্স মেখে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আট কি দশ তার বয়স, তবু চাল দেয় যেন বিলেৎ ফেরতের মত। আমি বল্লুম, দাঁড়া, আমি বিলেত থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে ফিরি। ব্যাটাকে Reformatoryতে পাঠাব। হা হা হা। আপনি স্মোক করেন না? ধন্য। আমি মশাই, ঐ ধোপার ছেলের মুখে সিগরেট দেখে অবধি স্মোক করা ছেড়ে দিয়েছি।"

উজ্জয়িনীর পাটনা প্রয়াণের সংবাদ দিয়ে বিভূতি বল্ল, "আশ্চর্য্য হবেন মশাই শুনে। হাসতে হাসতে শ্বশুরবাড়ী গেল। আর দেখতেন যদি গুপ্ত সাহেবের চেহারা! কি বলে—ইসের মত—! না মনে পড়ছে না কিসের মত।"

হেসে উঠে বিভূতি বক্তব্যের জের টেনে চল্ল। "আর সেই ছোঁড়াটা, যে বলত আই য়্যাম এ ওয়াশারম্যান, সার, সেও গেছল ষ্টেশনে। তার যা কান্না! কিন্তু কাঁদবার সময়ও চাল দিতে ছাড়ে না। বলে, ফরগেট মি নট্‌। খুকী বাবা, ফরগেট মি নট্‌।"

সুধী বল্ল, "সে এখন কি করে?"

বিভূতি বল্ল, "যার যা স্বভাব। তেমনি টেরি কাটে,

নানা কথা

নব বর্ষ—১লা বৈশাখ

আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং বন্ধুমণ্ডলীকে আমাদের নববর্ষের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি। গভর্ণমেণ্ট বাংলা নববর্ষকে ছুটির দিন ক'রে সম্মানিত করায় আমরা সুখী হয়েচি।

২৫শে বৈশাখ

আমাদের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হ'বার পূর্ব্বেই এবং সম্ভবতঃ কবির অনুপস্থিতি কালে ২৫শে বৈশাখ—কবির জন্মদিন—আবার ঘুরে আস্‌ছে। আশা করি দেশের সর্ব্বত্রই যথাযথভাবে এই জন্মদিনের অনুষ্ঠান হ'বে।

রবীন্দ্রনাথের পারস্য যাত্রা

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পারস্য-সম্রাট ভারতের কবিকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কবির স্বাস্থ্যের জন্য সে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করা এতদিন সম্ভব হয় নি। গত বৎসরও এই সময়ে যাত্রার সমস্ত আয়োজন হ'য়েছিল,—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হয় নি। এ বৎসরও কবির স্বাস্থ্য যে বিশেষ ভালো তা নয়,—কিন্তু তবুও তাঁর পারস্য-যাত্রা কোনো রকমে সম্ভব হ'য়েছে জেনে আমরা সুখী হ'য়েছি। ১১ই এপ্রিল দমদম এরোড্রোম থেকে তিনি রওনা হ'চ্চেন; সঙ্গে যাচ্চেন শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ৪ঠা এপ্রিল রওনা হ'য়েছেন ও পারস্য দেশে কবির সঙ্গে মিলিত হ'বেন।

এই বয়সে, কবির এই স্বাস্থ্য নিয়ে আকাশ পথে এই সুদূর অভিযানের মধ্যে উদ্বেগের কারণ যথেষ্টই আছে। কিন্তু তথাপি কবির পারস্য-যাত্রায় ভারতবর্ষ ও পারস্য—এই উভয় দেশের মধ্যে যে-মৈত্রী-স্থাপনের সম্ভাবনা আছে,—তার জন্য কোনো ত্যাগ বা কোনো কষ্ট স্বীকার করতেই কবি কুণ্ঠিত ন'ন্। এই কথাটি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে, আমরা,—কবির স্বদেশবাসিরা,—কবির নিরাপদ-যাত্রা কামনা করে তাঁকে বিদায় দিলাম।

স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গত ২২শে চৈত্র সোমবার বাংলার প্রসিদ্ধ গল্প-লেখক ও ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কলিকাতা বেথুন রো'র বাড়িতে প্রাণত্যাগ করেছেন। সন্ন্যাস রোগে মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিছুদিন থেকে তিনি রক্ত-চাপ বৃদ্ধিতে ভুগছিলেন।

প্রভাতকুমার বঙ্গ-সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কৃতী সন্তান ছিলেন—তাঁর মৃত্যুতে দেশের একটা গুরুতর ক্ষতি হ'ল। বাংলার গল্প-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি ক'রে যে-সকল লেখক যশস্বী হয়েচেন তাঁদের মধ্যে প্রভাতকুমারের স্থান অনেক উচ্চে। সাহিত্য-সেবার প্রথম যুগে তিনি গল্প লিখ্‌তে আরম্ভ করেন—এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে গল্পলেখায় তিনি অপরিমিত যশের অধিকারী হন। গল্প রচনার মধ্যে নির্ম্মল কৌতুকরসের সুনিপুণ অবতারণায় প্রভাতকুমার সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গল্প লিখ্‌তে লিখ্‌তে তিনি উপন্যাস লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হ'ন এবং ক্রমশঃ পরে পরে অনেকগুলি উপন্যাস রচিত করেন। তাঁর রচিত 'ষোড়শী' 'দেশী ও বিলাতী' 'সিঁদুরকৌটা' 'নবীন সন্ন্যাসী' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বাংলার পাঠক-পাঠিকাকে বহুদিন ধ'রে আনন্দ দিয়েছে এবং বহুদিন ধ'রে আনন্দ দেবে।

১২৭৯ সালে বর্দ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রাম গ্রামে প্রভাতকুমার জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কিছুদিন সরকারী চাকরী করেন—তারপর বিলাত গিয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন ক'রে ব্যারিষ্টার হয়ে আসেন। দার্জ্জিলিং এবং রংপুরে কিছুদিন ব্যারিষ্টারী করার পর তিনি গয়ায় গিয়ে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন, এবং তথায় স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ১৯১৬ সালে কলিকাতায় এসে ল কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি প্রধানত সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের অবলম্বন ক'রে তোলেন। অধুনালুপ্ত "মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার সম্পাদন তিনি বহুকাল ক'রেছিলেন এ কথা সাহিত্য-সেবী মাত্রেই জানেন।

মৃত্যুকালে প্রভাতকুমারের বয়স ৬০ বৎসর হয়েছিল।

প্রভাতকুমারের মৃত্যুতে আমরা অতিশয় ব্যথিত হয়েচি—এবং আমাদের আন্তরিক সমবেদনা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে জানাচ্ছি।

পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতির প্রদর্শনী

বাংলার অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত শিল্প সম্পদগুলির উদ্ধার এবং সংরক্ষণের মহৎ উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যে পল্লী সম্পদ রক্ষা সমিতি গঠিত করেচেন তার কথা বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাগণের অবিদিত নেই। অতি অল্পদিনই হ'ল এই সমিতিটি গঠিত হয়েচে— কিন্তু এরই মধ্যে দত্ত মহাশয় তাঁর অপরিমেয় উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে শিল্প দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করেচেন তার সংখ্যা এবং উৎকর্ষ্য সত্যই বিস্ময়জনক। গত মার্চ্চ মাসের শেষভাগে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের গৃহে সেই সকল শিল্প সামগ্রীর একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই প্রদর্শনী দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা সকলেই এ কথার সততা স্বীকার করবেন।

কোনো জাতি যখন তার আত্মমহিমা এবং আত্মমর্য্যাদার বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন হ'য়ে জগতের অপরাপর জাতির সম্মুখে অপকর্ষ-কুণ্ঠায় পীড়িত হয় তখন সে জাতির অবস্থা শোচনীয়। সেই জন্যে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, আপনাকে ভাল ক'রে জানো—আত্মানং বিদ্ধি। শিল্প বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি যে অকারণ অপকর্ষ-কুণ্ঠায় কুণ্ঠিত হয়ে আছে—এ কথা সেদিন পল্লী-সম্পদরক্ষা সমিতির প্রদর্শনী দেখ্‌তে গিয়ে মনে হয়েছিল। বাংলার একটি যে নিজস্ব শিল্পধারা আছে—এবং সে ধারা যে অপরাপর দেশের ধারাগুলির অপেক্ষা হীন নয়, এ কথা শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রমাণ করবার উপক্রম করছেন। তবু ত' এখন বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই বাকি,—মাত্র কয়েকটি জেলা হ'তে এই শিল্পদ্রব্যগুলি সংগৃহীত হয়েচে।

প্রদর্শিত বস্তুগুলির মধ্যে ছিল পট-চিত্র, জড়ানো পট, পুঁথির পাটা, কাঠের খোদাই, পিতল-তামার বাসন, নক্সী-কাঁথা, ধাতু মূর্ত্তি ইত্যাদি। জড়ানো পটগুলি উন্মোচিত করলে এক-একটি দৈর্ঘ্যে পনের ষোল হাত হয়। প্রস্থে এক হাতের কিছু বেশী। এক একটি জড়ানো পটে একই বিষয়ের বিভিন্ন অবস্থার ১৫।১৬টী ক'রে ছবি অঙ্কিত। বিষয় বস্তু প্রধানতঃ রামায়ণ এবং কৃষ্ণলীলা অবলম্বন ক'রে।

পট-চিত্রগুলি নিরীক্ষণ করলে তাদের রচন-ভঙ্গী (Composition), রেখাঙ্কন (Drawing) এবং বর্ণ-পরিকল্পন (Colour Scheme) দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। এ সকল ছবিগুলির কি সত্যসত্যই অশিক্ষিত পটুয়াদের অঙ্কিত ছবি? আমাদের মনে হয় কখনই তা নয়;—পুরুষানুক্রমে বহুদিবসাগত একটি শিল্পধারার উপলব্ধি না থাক্‌লে সহসা একদিনের খেয়ালে এমন ছবি আঁকা সম্ভবপর নয়। ২নং চিত্রে রামলীলায় লাল এবং সাদা রঙের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখেছিলাম। সেই রকম ৮নং চিত্র—মারীচ বধ, রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ, বালী এবং সুগ্রীবের যুদ্ধ প্রভৃতি ছবিগুলিতে নীল এবং সবুজ রঙয়ের প্রাধান্য বিস্ময়কর। ৯৫নং জড়ানো ছবি (রামের বিবাহ, সীতার সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন, রামের বনবাস) অতি সূক্ষ্ম রেখাঙ্কনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। ৮৬ নং ছবি (শ্রীকৃষ্ণ দধিভাণ্ড বহন করচেন প্রভৃতি ছবি) decorative styleএর সুন্দর নিদর্শন। নক্সী কাঁথাগুলি দেখ্‌লে সহসা মনে হয় বহুমূল্য কাশ্মীরী শাল।

আমরা সাধারণ ভাবে প্রদর্শনীর কথা বল্‌লাম। ভবিষ্যতে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। এ বিষয় আমাদের উপস্থিত বক্তব্য,—সংগৃহীত দ্রব্যাদির সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে কলিকাতায় একটি শিল্পগৃহ (museum) হওয়ার প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, দেশের ধনী সম্প্রদায় এবং জন-সাধারণের সহায়তায় একটি শিল্পগৃহ হওয়া এমন কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত তাঁর এই কীর্ত্তির জন্যে সমস্ত বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েচেন।

নিয়তির নির্ম্মম লীলা

বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রায় 'নন্দদা' গল্পটি যখন ছাপা হয় তখনও তার লেখক লক্ষ্মীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল ছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে বারবেল্ নিয়ে ব্যায়াম করবার সময়ে তিনি গলায় একটা আঘাত পান, তারই ফলে ভীষণ Mediastinitis রোগে গত ২৬শে চৈত্র তাঁর মৃত্যু হয়েচে। লক্ষ্মীপ্রসাদের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বৎসর। ১৯৩১ সালে তিনি ইতিহাসের এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এই প্রতিভাবান যুবকের শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে ব্যথিত হয়েচি।

Edited by Upendranath Ganguli, printed by Saratchandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works
259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street Calcutta

তিনি দুরূহ বিষয়ে প্রবেশ করেন, এবং জ্ঞাতব্য তথ্য সহজেই আয়ত্ত করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম-বিচারের কষ্টিপাথরে সকল তথ্য যাচিয়ে নিয়ে তিনি যথাযথ বর্জ্জন ও গ্রহণ করে থাকেন। ক্ষুদ্রকে বৃহৎ বা বৃহৎকে তুচ্ছ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তিনি সকল জিনিষকে দেখে থাকেন সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে, অর্থাৎ সমগ্র দৃষ্টিতে। কাজেই সকল জিনিষের যথাযথ মূল্য তাঁর কাছে ধরা পড়ে।

গ্রন্থকারের মনন শক্তি যেমন বিস্মিত করে, তাঁর প্রকাশ-রীতি তেমনই মুগ্ধ করে। প্রমথবাবুর লেখায় সুস্পষ্ট চিন্তার যে সহজ স্বচ্ছ প্রকাশ বাঙালী পাঠককে চিরদিন আনন্দ দিয়েছে এ প্রবন্ধগুলিতে তা' কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। তাঁর প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতা এবং ভাষার স্বচ্ছতা ও সরসতার বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে যাওয়াই ধৃষ্টতা, কারণ এ কথা সর্ব্বজন বিদিত যে তিনি ও-বিষয়ে আধুনিক বাঙলা লেখকদের গুরু। ভারতচন্দ্রের লেখার যে প্রসাদগুণের কথা প্রমথবাবু অমন সুন্দর করে বলেছেন সে আলোকে তাঁর নিজের লেখাও উদ্ভাসিত। এক কথায়, জ্ঞানে, চিন্তায়, বিচারশক্তিতে, কৌতুক-হাস্যে সমুজ্জ্বল একটি অসাধারণ বিদগ্ধ মনের যে সুপ্রসন্ন প্রকাশ আমরা এ প্রবন্ধগুলিতে পাই তার তুলনা মেলা ভার।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

১। অঙ্কুরা—শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত। বোলপুর, বীরভূম হইতে গ্রন্থকারই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। পৃঃ ১১, দাম দেড় আনা।

নয়টি কবিতার সমষ্টি। একটি ছাড়া আর গুলি চতুর্দ্দশ-পদী। আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু রসের ভাবে টলমল করিতেছে। বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক বলিয়া এতকাল আমরা জগদীশ-চন্দ্রকে জানিতাম। কবিতাতেও তিনি আমাদের তৃপ্তি দিয়াছেন। "অমৃতের রসাস্বাদন করাইবার সামর্থ্য নাই" লেখকের এই ভূমিকা আমরা স্বীকার করি না।

২। গোড়ায় গলদ—শ্রীগুরুসদয় দত্ত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ। পৃঃ ৬৩, দাম এক আনা।

বইখানিতে তিনটি প্রবন্ধ আছে। (১) গোড়ায় গলদ (২) কে অগ্রসর হইবে (৩) সমস্যা ও সমাধান। লেখক 'জাতির দুঃখ কষ্ট ব্যাধি নিরানন্দ ও অভাব' দূর করিবার জন্য গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন এবং শুধু ভাবনা নহে, কার্য্যক্ষেত্রেও ঐ জন্য বিস্তর শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। সেই সব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যে প্রবন্ধগুলি মূল্যবান। সাময়িক পত্রিকা হইতে পুস্তকাকারে নামমাত্র মূল্যে উহার পুনঃ প্রকাশ হওয়ায় দেশের উপকার হইবে।

শ্রীমনোজ বসু

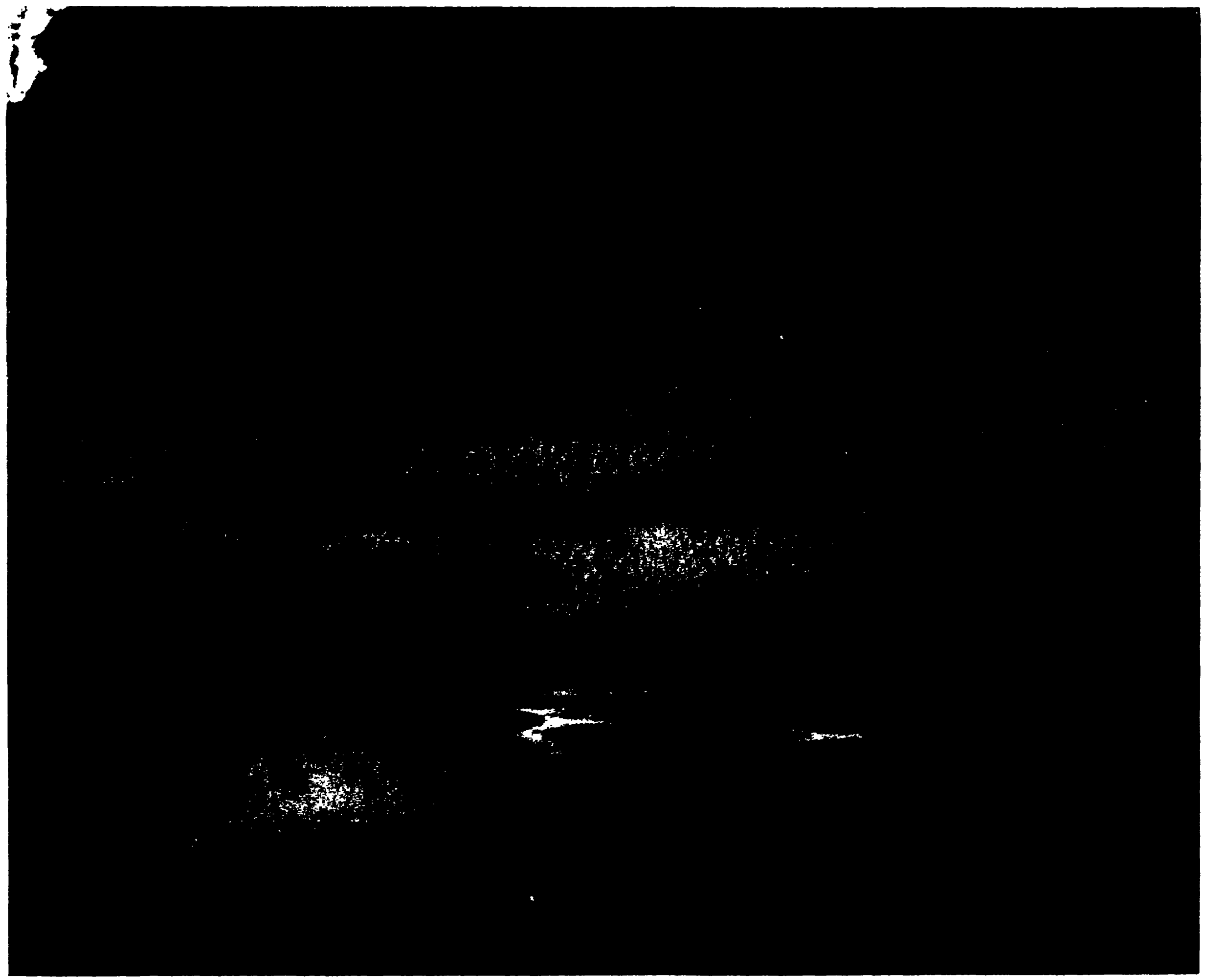
ছন্দের দ্বন্দ্ব

সম্প্রতি কয়েকটি মাসিক পত্র অবলম্বন ক'রে বাংলা কবিতার ছন্দ বিষয়ে একটু বিশদ আলোচনা আরম্ভ হয়েচে। উপমার অনুরোধে এ আলোচনাকে যদি একটি সাহিত্যিক যজ্ঞ বলা হয় তা হ'লে এ যজ্ঞের হোতা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এবং যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পৌরাণিক যুগের নজির মত এ যজ্ঞে যজ্ঞদ্বেষীরও অভাব ঘটেনি। ৩২।৫।১ নং প্রবোধচন্দ্রের যজ্ঞ নষ্ট করবার ভূমিকায় বলেচেন, ইতিপূর্ব্বে প্রবোধচন্দ্রের খণ্ড উদয় হয়েছিল, এবার কিন্তু তাঁর পূর্ণোদয়। আমাদেরও মনে হয় পূর্ণোদয়। রাহু (এ ক্ষেত্রে শনি) যে-চন্দ্রকে এমন প্রবলভাবে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েচেন সে-চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র নয় ত কি? প্রবোধচন্দ্র মুক্তিলাভ করলে আমরা ছন্দ-মন্দাকিনীর জলে স্নান ক'রে পুণ্যার্জ্জন করব।

অবান্তর কথা যাক্। কয়েকদিন পূর্ব্বে জোড়াসাঁকোর কবিগৃহে বাংলা ছন্দ নিয়ে একটা ছোটো-খাটো আলোচনা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে প্রবোধ বাবু এবং আরও দুই একজন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে প্রবোধ বাবু বল্লেন যে, বাংলা ছন্দে চার সিলেব্‌লের সঙ্গে পাঁচ সিলেব্‌লের মিল হয় না;—অন্ততঃ এম্‌নি ধরণের একটা কথা। আমার মনের মধ্যে অকস্মাৎ প্রতিবাদ-প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌ল, বললাম, নিশ্চয় হয়। তর্ক উপস্থিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বল্লেন, এ তর্কের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা হয় তুমি যদি চার এবং পাঁচ সিলেব্‌লে মিলিয়ে কবিতা তৈরী ক'রে দেখাতে পারো। কবির আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর চার এবং পাঁচ সিলেব্‌লে মিলিয়ে ত্রিবিধ ছন্দের কবিতা রচনা ক'রে কবিকে দিয়ে এসেচি। আমার প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হ'ল কি-না সে বিষয়ে সম্ভবতঃ আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রকাশিত হবে এবং তারপর আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় যে প্রবোধচন্দ্রের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হবে না তাও বলা যায় না। অদূর ভবিষ্যতে ছন্দের যে-দ্বন্দ্বটি অনিবার্য্য মনে হচ্চে তদ্বিষয়ে পাঠক-চিত্তকে অবহিত রাখবার উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি প্রকাশ করলাম। পূর্ব্বাহ্ণে বিষয়টির সূচনা জানা থাকলে যথাকালে রসোপভোগের সুবিধা হবে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। কবিতাটি পাঠ করলে ৩২।৫।১ নং হয়ত আমাকে বলবেন, বাপুহে, তোমাকেও ত খুব নিরীহ ব্যক্তি মনে হচ্চে না; প্রবোধচন্দ্রকে তুমিও যখন গ্রাস করতে উদ্যত হয়েচ তখন তোমাকেও ত' রাহু-গোত্রীয় বলা যেতে পারে। উত্তরে আমি বলব, না, আমি প্রবোধচন্দ্রকে গ্রাস করতে ত' চাই-ই নে, এমন কি তাঁর প্রভা কিছুমাত্র হ্রাস করতেও ইচ্ছা করি নে। তিনি সমুজ্জ্বল হ'য়ে প্রভা বিকীর্ণ করলেই আমি খুসী থাকব। আমার তাঁকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যের মধ্যে এই সরল স্বার্থটি নিহিত আছে যে, আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে একটা ছন্দের দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হোক্ এবং তার দু'চারটি মধুময় ফল আমি বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাদের পাতে পরিবেষণ করি। স্বর্ণ-ঘটিত সিদ্ধ মকরধ্বজের মধ্যে স্বর্ণের যে প্রকৃতি আমারও তা-ই—অর্থাৎ Catalytic agent। দ্বন্দ্ব আরম্ভ হ'লেই আমি ব্যূহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে আস্‌ব। এ-কে যদি ৩২।৫।১ নং সম্পাদকীয় হীন প্রবৃত্তি ব'লে অভিহিত করেন ত' কবুল-জবাব করতে আমার বাধবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



সন্ধ্যা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ২য় খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ | ৫ম সংখ্যা

পক্ষীমানব

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যন্ত্র দানব, মানবে করিলে পাখী।
স্থল জল যত তার পদানত,
আকাশ আছিল বাকি ॥

বিধাতার দান পাখীদের ডানা দুটি।
রঙের রেখায় চিত্রলেখায়
আনন্দ উঠে ফুটি ॥

তা'রা যে রঙীন পান্থ মেঘের সাথী।
নীল গগনের মহাপবনের
যেন তারা এক জাতি ॥

তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা,
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান
আকাশের সুরে সাধা ॥

তাই প্রতিদিন ধরণীর বনে বনে
আলোক জাগিলে একতানে মিলে
তাহাদের জাগরণে ॥

মহাকাশতলে যে মহাশান্তি আছে
তাহাতে লহরী কাঁপে থরথরি
তাদের পাখার নাচে ॥

যুগে যুগে তারা গগনের পথে পথে
জীবনের বাণী দিয়েছিল আনি
অরণ্যে পর্ব্বতে ॥

আজি একি হোলো, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্দ্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে

তা'রে প্রাণদেব করেনি আশীর্ব্বাদ।
তাহারে আপন করেনি তপন
মানে নি তাহারে চাঁদ

আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি'
কর্কশ স্বরে গর্জ্জন করে
বাতাসেরে জর্জ্জরি'

আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ আলোকে
হানিছে অট্টহাসে

যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে
অশান্তি আজ উদ্যতবাজ
কোথাও না বাধা মানে

ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা ॥

দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,

এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক্ দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে ॥

আর্ত্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন,
শ্যাম বনবীথি পাখীদের গীতি
সার্থক হোক পুন ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮।

ছন্দ-বিচার

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ

যে মূলতত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে আমি বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে থাকি সে তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা ক'রে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখি এবং সে বিষয়ে তাঁর মত কি তা জানতে চাই। নানা কাজে ব্যস্ত ও ক্লান্ত থাকাতে দীর্ঘ পত্রে এ বিষয়ের আলোচনা করা তাঁর পক্ষে বর্ত্তমানে কষ্টকর হবে ব'লে তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লেখেন। দেখা যখন হ'লো তখন প্রথমেই ব্যবস্থা হ'লো কিঞ্চিৎ জলযোগের। কিন্তু জলযোগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে-সমস্ত কৌতুককর বিষয়ে কথোপকথনের সূত্রপাত করলেন তার তুলনায় রসনার তৃপ্তিটা হ'য়ে গেল গৌণ। যাহোক্, রসনার কার্য্য সমাপ্ত হবার পর ছন্দ আলোচনার ভূমিকা ক'রে তিনি বল্লেন, "কিছু খেয়ে তো একটু সুস্থ হয়েছ, এখন তর্ক করতে পারবে।" এই বলে তিনি নিজেই ছন্দের কথা উত্থাপন ক'রে বল্লেন, "পাঁচটা unit কে দু-গুণ ক'রে দশ unit হয় বটে; কিন্তু এককেটা unit তো দিনুর মতো মোটাও হ'তে পারে আবার একজন রোগা মানুষের মতো সরুও হ'তে পারে। তেমনি সব ছন্দের unit গুলো আকারে সমান নয়।" আমি বল্লুম, "ধ্বনির unitএর আকৃতি ও প্রকৃতির এই পার্থক্য অনুসারেই তো আমি বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতে চাই।"

কবি বল্লেন, "কিন্তু একসময়ে বাংলায় সব unitকেই সমান মূল্য দেওয়া হ'তো; যুগ্ম অযুগ্ম ধ্বনির পার্থক্য স্বীকার করা হ'তো না। কিন্তু তিন unit এর ছন্দে, যাকে আমি বলেছি অসম ছন্দ, তাতে যুগ্মধ্বনিকে এক unit ধরলে ভারি খারাপ শোনায়। এইটে অনুভব ক'রেই তখনকার দিনে কবিরা এজাতীয় ছন্দে যুক্ত অক্ষর যথাসম্ভব বর্জ্জন ক'রে চল্তেন। যুক্ত অক্ষর সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে একটি কবিতা রচনা করতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন; মনে করতেন কবিতাটি খুব প্রাঞ্জল, সরল ও শ্রুতিমধুর হ'লো। কবি বিহারীলালের কাছে আমার প্রথম শিক্ষা। তাঁর রচনাতেও যুক্তাক্ষর বড়ো কম। আমারও বাল্যকালের রচনায় যুক্তাক্ষর খুব কম; তবু মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হ'য়ে ছন্দকে বন্ধুর ক'রে তুলেছে। "রাহুর প্রেম" কবিতাটিতেই তার নিদর্শন পাবে। তখনও আমি যুগ্মধ্বনিকে দু মাত্রা ব'লে ধরতে আরম্ভ করিনি; কারণ খারাপ শোনালেও তখনকার দিনে জবাবদিহি ছিল না। কিন্তু 'মানসী'র সময় থেকে আমি যুগ্মধ্বনিকে দু মাত্রা ব'লে ধরতে সুরু করেছি।"

আমি বল্লুম, "তখন থেকেই তো বাংলায় এক নতুন ধরণের ছন্দের সূচনা হ'লো।"

কবি—এ জাতীয় ছন্দ আমিই যে প্রথম করলুম তা নয়।

প্রবোধবাবুর এই প্রবন্ধটি আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত দেখিয়া প্রবন্ধটি অনুমোদিত করিয়াছেন। এবং পরিশেষে তাহার একটি নূতন মন্তব্য যোগ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে গত বৈশাখের 'বিচিত্রা'র ৫৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ছন্দের দ্বন্দ্ব দ্রষ্টব্য। বিঃ সঃ।

আমি—বৈষ্ণব পদাবলীতেও অবশ্য ছ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন আছে। কিন্তু তার উচ্চারণ-ভঙ্গী তো ঠিক্ বাংলা নয়, সংস্কৃত পন্থী।

কবি—কেন, চণ্ডীদাসের ছ মাত্রার ছন্দ তো বাংলা-উচ্চারণ অনুযায়ী। যথা—

চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।

যাহোক্, 'মানসী'র সময় থেকে আমি অসম মাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রার value দিয়ে আস্‌ছি এবং এখন বাংলা সাহিত্যে এই রীতিটাই চ'লে গেছে। আজকাল আর কোনো কবি অসম মাত্রার ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে এক unit ব'লে চালাতে সাহস করেন না, আর করলেও তাঁকে কেউ ক্ষমা করবে না। কিন্তু আমি নিজেও একটি মাত্র রচনায় এ রকম করেছি—যথা,

প্রভু বুদ্ধ লাগি' আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি।

আমি বল্‌লুম—আবৃত্তির ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌লে এ ছন্দটাকে সমর্থন করাও যেতে পারে।

কবি—তা যেতে পারে। কিন্তু তবু ওটা ঠিক হয়নি। ও রকম না করলেই ভালো হতো। বাস্তবিক ও-কবিতাটির জন্যে আমি একটু কুণ্ঠিত আছি। ওরকম করার একটু কারণও আছে। যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রা হিসেব ক'রে ছন্দ রচনা করলে ওছন্দে "অনাথ পিণ্ডদ" কথাটা ব্যবহার করা মুশকিল। তাই সমস্ত কবিতাটিতেই যুগ্মধ্বনিকে এক unit ব'লেই চালিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু অসম মাত্রার আর কোনো ছন্দেই আমি যুগ্মধ্বনিকে এক unit ব'লে গণ্য করিনি।

তারপরে কবি সম মাত্রার ও অসম মাত্রার ছন্দের প্রসঙ্গ তুলে বল্‌লেন, "সমমাত্রার ছন্দের অর্থাৎ পয়ার জাতীয় ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে এ-ছন্দে দুই চার ছয় আট দশ প্রভৃতি দুয়ের multiple-এর পর ইচ্ছামতো যতি স্থাপন করা যায়। এখানেই এ ছন্দের শক্তি। আর এজন্যেই এ-জাতীয় ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ (enjambement) চালানো সম্ভব হয়েছে। আঁজাঁব্‌মাঁ শব্দের তুমি কি বাংলা করেছ?

আমি বল্‌লুম—প্রবহমানতা।

কবি—যেখানেই দুয়ের multiple পাওয়া যায় সেখানেই থাম্‌তে পারা যায় ব'লেই প্রবহমান পয়ার রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এ-ছন্দে অযুগ্মসংখ্যার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর যতি দিয়েছেন। এটাকে অবশ্য এক রকম ক'রে সমর্থনও করা যায়। কিন্তু তথাপি বল্‌তে হয় যে এ-ছন্দে অযুগ্ম unitএর পর যতি না দেওয়াই রীতি। আর এ-জন্যেই অসম মাত্রার ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ বা প্রবহমানতা আনা যায় না। যে-ছন্দে তিনের পরে ভাগ, যাকে আমি বলেছি অসম মাত্রার ছন্দ তাতে যেখানে সেখানে থামা যায় না, লাইনের মধ্যেও থামা যায় না, একেবারে লাইনের শেষে গিয়ে থাম্‌তে হয়। যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী দলে।

আমি বল্‌লুম—এ জাতীয় ছন্দকেও তো সব সময় তিন তিন মাত্রায় ভাগ করা যায় না।

কবি—হাঁ, তা ঠিক্, দুয়ের multiple না হ'লে থাম্‌বার জায়গা পাওয়া যায় না। এজন্যেই এসব ছন্দে ছ মাত্রার পরেই থাম্‌তে হয়।

আমি—ছ মাত্রার পরেই যতি থাকে ব'লে আমি এছন্দকে ষন্মাত্রপর্ব্বিক ছন্দ বলি।

কবি—লক্ষ্য করলেই দেখ্‌তে পাবে অসম সংখ্যার পর ধ্বনি থাম্‌তে পারে না। সেখানে একটা ভাগ থাক্‌লেও ধ্বনিটা পরবর্ত্তী বিভাগের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। যেমন—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কি সন্ন্যাসী—

এখানে 'পঞ্চশরে' কথাটার পরে যতিটা স্থায়ী হয় না।

তারপর প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি accent এর বিষয় উত্থাপন ক'রে বল্‌লেন, "ইংরেজি ভাষার একটা মস্তগুণ এই যে ও-ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দেরই একটা বিশেষ জোর আছে; সেটা ওভাষার accentএর জন্যেই হয়। প্রত্যেকটি শব্দই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলে, অন্য কথার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। শব্দগুলিকে এভাবে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় ব'লেই ইংরেজি ছন্দ এরূপ তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা শব্দগুলি বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত ক'রে তরঙ্গিত ক'রে তোলে না। এজন্য বাংলায় আমরা এক ঝোঁকে অনেকগুলো শব্দ উচ্চারণ ক'রে আবৃত্তি ক'রে যাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অর্থবোধ হয় না। অর্থবোধের জন্যে বিষয়টাকে আবার ফিরে পড়তে হয়। এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলার এই দুর্ব্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন—এ জন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গী দেখা দিয়েছে। 'যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে' প্রভৃতি পংক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হ'য়ে উঠেছে তা দেখতে পাচ্ছ। অল্প বয়সে আমি মধুসূদনের যে কঠোর সমালোচনা ক'রেছিলুম পরবর্ত্তী কালে আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। বাংলা ভাষার এই সমতলতা, এই দুর্ব্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করেছি।

তারপর কবিকে একটু ক্লান্ত দেখে বিদায় নিয়ে যাবার সময় তিনি রহস্য ক'রে বল্‌লেন "অন্য সময় আবার এসো। তখন তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা যাবে।" সন্ধ্যার পর আবার যখন তাঁর কাছে গিয়ে বসলুম তখন তিনি সস্নেহে বল্‌লেন "তোমার কি কি জিজ্ঞাস্য আছে বুঝিয়ে বলো দেখি। তার পরে তোমার কথার উত্তরে যা বল্‌বার আছে তা বল্‌ব।" তখন আমি আমার বক্তব্য বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে বুঝিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লুম। তিনি প্রসন্ন ধৈর্য্যের সঙ্গে মন দিয়ে আমার সব কথা শুন্‌লেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর যা বক্তব্য তা খুব স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে লাগ্‌লেন। আমি বল্‌লুম "কয়েকটি মূল তত্ত্বকে অবলম্বন ক'রে বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে আমি আপনার কাব্যের ছন্দোনির্ণয়ের কাজেই প্রবৃত্ত হয়েছি। এ-কাজে আমি দুটি প্রণালী অবলম্বন করতে চাই। প্রথমতঃ, 'মানসী' থেকে 'বনবণী' পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যগুলিকে একে একে ধরে তার প্রত্যেকটি কবিতার ছন্দের analytic বিচার করব এবং তারপর সব কবিতার ছন্দের analysis-এর উপর নির্ভর ক'রে একটা synthetic আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে আপনার সব কবিতাকে আমি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কর্‌ব। এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানা আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।"

কবি বল্‌লেন—তুমি কি কি শ্রেণীতে ভাগ করতে চাও?

আমি—আপনি যাকে বলেছেন সাধারণ 'পয়ার জাতীয়' ছন্দ, সেগুলির কথাই আগে বল্‌ছি। এ ছন্দগুলির সাধারণত অক্ষরসংখ্যার সাহায্যেই পরিচয় দেওয়া হয়—যেমন চোদ্দ অক্ষরের পয়ার, আঠারো অক্ষরের পয়ার। তাই প্রচলিত প্রথাকে একেবারে অগ্রাহ্য না ক'রে আমি প্রথমে এগুলিকে বলেছিলুম 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ। কিন্তু আপনি বলেছেন যে আক্ষরিক ছন্দ ব'লে কোনো ছন্দ হ'তে পারে না। কারণ ছন্দ তো ধ্বনি নিয়ে কারবার করে, আর অক্ষর তো ধ্বনির চিহ্নমাত্র। আমিও বারবার ওকথাই বলেছি। কাজেই 'চোদ্দ অক্ষরের পয়ার', 'আঠারো অক্ষরের পয়ার' এ রকম পরিচয়টা ঠিক নয়। এ সব ছন্দে ধ্বনির পরিবেষণটা কি ভাবে ঘটে তাই দেখা দরকার। আমি এ ছন্দের ধ্বনি-সন্নিবেশ-প্রণালীটাই দেখাতে চেষ্টা করেছি।

কবি—যদি 'চোদ্দ অক্ষরের পয়ার' না বলো তবে কি বল্‌বে?

আমি—আমি বলি চোদ্দ unit বা যুষ্টির পয়ার। এই

unitগুলির হিসাব কি ভাবে করতে হবে আমি সেটাই দেখাতে চাই। অযুগ্ম ধ্বনির উচ্চারণ সর্ব্বত্রই সমান, তাকে এক unit ধরা যায়। আর যুগ্ম ধ্বনির উচ্চারণ সর্ব্বদা সমান নয়। আপনিই দেখিয়েছেন যে, আমাদের সাধারণ কথাবার্ত্তাতেও আমরা যুগ্ম ধ্বনিকে কখনও ঠেসে সংক্ষিপ্ত ক'রে উচ্চারণ করি আবার কখনও টেনে বাড়িয়ে উচ্চারণ করি। যুগ্ম ধ্বনির সংক্ষিপ্ত উচ্চারণকে আমি বলি সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ আর প্রসারিত উচ্চারণকে বলি বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। যদি সংশ্লিষ্ট যুগ্ম ধ্বনিকে এক unit এবং বিশ্লিষ্ট যুগ্ম ধ্বনিকে দুই unit ধরা যায় তাহ'লে আমরা সাধারণ পয়ারেও ধ্বনি-সন্নিবেশের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী পাই।

এ বিষয়ে কবির সমর্থন পেয়ে আমি একটু উৎসাহিত হয়ে বললুম, "ওই নির্দ্দিষ্ট প্রণালীটা হচ্ছে এই যে, সাধারণ পয়ার জাতীয় ছন্দে প্রত্যেকটি শব্দকে গদ্যের মতো স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারণ করতে হয়, তাই প্রত্যেক শব্দকে পরবর্ত্তী শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন। আর এজন্যেই আমরা এ-ছন্দে শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্ম ধ্বনির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ করি এবং কাজেই তার মূল্য দুই unit। কিন্তু শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্ম ধ্বনিকে সাধারণত বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করি না। কাজেই তার মূল্যও এক unitএর বেশী নয়। আপনি বলেছেন যেখানে সেখানে যুগ্ম ধ্বনি থাকা সত্ত্বেও পয়ারের ভারসাম্য নষ্ট হয় না, এটা এ-ছন্দের একটা অসাধারণ গুণ। আপনার একথা খুবই সত্য। আমার মনে হয় যুগ্ম ধ্বনিকে আমরা প্রয়োজন মতো সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করি বলেই যেখানে সেখানে যুগ্ম ধ্বনি থাকা সত্ত্বেও এ ছন্দের ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে থাকে।" কবি দৃষ্টান্তের কথা বলাতেই আমি বললুম,—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

এখানে তের্, রাম্, দাস্ প্রভৃতি যুগ্ম ধ্বনিকে আমরা টেনে প'ড়ে দুমাত্রার মর্য্যাদা দিয়ে থাকি, হসন্ত র্, ম্, স্‌কে তো একেকটি অক্ষর ব'লে গোনা যায় না। পক্ষান্তরে 'পুণ্যের' পুণ্-কে আমরা ঠেসে উচ্চারণ করি। তাই ছন্দ ঠিক থাকে। মাঘের 'পরিচয়ে' আপনি পয়ারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল

এখানে অক্ষরসংখ্যা বেশি হয়েছে বটে, কিন্তু শব্দ-মধ্যবর্ত্তী যুগ্ম ধ্বনির উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট এবং শব্দান্তবর্ত্তী যুগ্ম ধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট ব'লে এই লাইনটাতে চোদ্দ unit ঠিক্ আছে।

তারপর আমি আরেকটি দৃষ্টান্ত দিলুম—

দিনেরে মাভৈঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।

কবি নিজেই বললেন, এখানে 'ভৈঃ' ধ্বনিতে দুই unit এবং 'অন্ধকারের' অন্-এ এক unit হয়েছে।

আমি বললুম, এইটেই এ ছন্দের নিয়ম। যদি এ ছন্দে 'ভৈরব' শব্দটা ব্যবহার করা যায় তবে 'ভৈ'-কে এক unit ব'লেই ধরা হবে

কবি একটু ভেবে বললেন—

ভৈরব রবে যবে শৃঙ্গ ফুকারে

এখানে তো ভৈ-তে দুই unitই ধরা হয়েছে।

আমি বললুম—এটাও পয়ারেরই লাইন বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির পয়ার। একে আমি বলি মাত্রাবৃত্ত পয়ার। কারণ এ ছন্দে অবস্থান নির্ব্বিশেষে যুগ্ম ধ্বনির উচ্চারণ সর্ব্বত্রই বিশ্লিষ্ট।

একথার উত্তরে কবি শুধু বললেন—সে কথা ঠিক।

তারপর আমি বললুম,—'পরিচয়ে' আপনি দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে ইত্যাদি। যাতে 'চিম্‌নি' শব্দে একবার দুই unit এবং আরেকবার তিন unit ধরা হয়েছে। পয়ার জাতীয় ছন্দে 'চিম্‌নি' শব্দে 'ক' unit ধরা সাধারণ নিয়ম?

কবি বললেন—ও তর্কটা কি ভাবে উঠেছিল তা তো

তুমি জানো। নীরেন রায় লিখেছিল 'একটি কথা এতবার হয় কলুষিত।' মণ্টু প্রশ্ন তুলেছিল 'একটি'কে দুই ধরতে হবে না তিন ধরতে হবে? আমি এই উপলক্ষেই 'চিম্‌নি' শব্দটাকেও এনেছিলুম। পয়ারে 'চিম্‌নি' শব্দে দুই unit ধরাই সাধারণ নিয়ম; তবে তিন unitও ধরা যায় এ কথাটাই আমি বল্‌তে চাই।

আমি বললুম—এ জাতীয় ছন্দে যুগ্ম ধ্বনি কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক এবং কোথাও সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক হয় ব'লেই আমি এ ছন্দকে 'যৌগিক ছন্দ' নাম দিতে চাই। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

কবি বল্‌লেন—তুমি এসব ছন্দকে 'যৌগিক' নাম দিতে পার। আমার আপত্তি নেই। নামে কিছু আসে যায় না। ছন্দের প্রকৃতি অনুসারে ভাগ ক'রলেই হ'লো।

আমি—যেসব ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্ব্বদাই দ্বৈমাত্রিক তাকে আমি বলি মাত্রাবৃত্ত।

কবি—এ সব ছন্দকেই আমি বলেছি অসম বা তিন মাত্রার ছন্দ।

আমি—শুধু যে ত্রৈমাত্রিক ছন্দেই যুগ্মধ্বনির ডবল মূল্য হয় তা নয়; দ্বৈমাত্রিক ছন্দেও তা হ'তে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়', 'বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে', 'এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের', 'বুঝিয়াছি এ-জীবন একেবারে মরু না' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়।

কবি—এগুলি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর ছন্দ বটে, চার মাত্রায় একেকটি ভাগ হচ্ছে। তুমি তো জানোই, 'মানসী'তে আমি প্রথম এরকম ছন্দ রচনার চেষ্টা করেছিলুম।

আমি—'মানসী'তে 'নিস্ফল উপহার' ও 'কবির প্রতি নিবেদন', এই দুটি কবিতায় তা দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ পয়ার-জাতীয় ছন্দে দ্বৈমাত্রিক যুগ্মধ্বনি ব্যবহার করায় তা ভালো হ'লো না। কিন্তু পরে চার-চার মাত্রায় ভাগ করাতে খুব সুন্দর মাত্রিক পয়ার রচিত হয়েছে।

এস্থলে আমি প্রসঙ্গক্রমে বললুম যে পয়ার, ত্রিপদী শব্দ দ্বারা ঠিক ছন্দ বোঝায় না, বোঝায় ছন্দোবন্ধ। কারণ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি তিন রকমের হ'তে পারে। যৌগিক পয়ার (সাত কোটি সন্তানেরে ইত্যাদি), মাত্রিক পয়ার (বরষার নির্ঝরের ইত্যাদি) আর স্বরবৃত্ত পয়ার। আপনি যাকে বলেন প্রাকৃত ছন্দ তাকেই আমি বলেছি স্বরবৃত্ত। এ ছন্দটা আসলে syllabic, প্রত্যেক syllable-এই একটি ক'রে স্বর অর্থাৎ vowel থাকা চাই বলে নাম দিয়াছি স্বরবৃত্ত।

কবি বল্‌লেন—তুমি যে প্রাকৃত ছন্দকে চার চার সিলেব্‌ল্‌এ ভাগ কর সেটা ঠিক্ ব'লে আমার মনে হয় না। আমি বলি এ ছন্দে তিন মাত্রার ভাগটাই মূল কথা। এ ছন্দে আমি যত গান রচনা করেছি তার সবগুলিতেই দাদ্‌রা তাল—সব সময়েই তিন মাত্রার ভাগ হয়।

আমি—সে কথা ঠিক্ বটে। আপনি 'পরিচয়ে' সে দিক্‌টা দেখিয়েছেন। গানের পক্ষে ধ্বনির মাত্রিক দিক্‌টাই মুখ্য; কিন্তু ছন্দের পক্ষে এর syllabic দিক্‌টাই মুখ্য। গানে এ ছন্দের প্রতি পর্ব্বে ছ মাত্রা পাওয়া যায়, প্রকাশ্যত না থাক্‌লেও সেটা পূরণ ক'রে নিতে হয়। কিন্তু কবিতা পাঠ বা রচনার পক্ষে এ-ছন্দের প্রতি পর্ব্বে ছয় মাত্রার দিক্‌টা গৌণ, চার সিলেব্‌ল্ এর দিক্‌টাই মুখ্য। প্রতি পর্ব্বে ছ'মাত্রা ঠিক্ রেখে সিলেব্‌ল্ সংখ্যাকে তো ইচ্ছামতো পাঁচ বা ছয় করা চলে না।

কবি—এ ছন্দে কি সর্ব্বত্রই চার সিলেব্‌ল্-এর ভাগ হয়?

আমি—সর্ব্বত্রই হয়, তবে স্থলে স্থলে তিনটি যুগ্ম বা দ্বিমাত্রিক সিলেব্‌ল্ও চলে; তাতে ছয় মাত্রা ঠিক্ থাকে। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়ম নয়; exception মাত্র। এ ছন্দের পর্ব্বগুলিতে কখনও পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্ চালানো যায় না।

কবি—তা'হলে তো অন্য রকমের ছন্দ হ'য়ে যাবে।

আমি—কিন্তু এ ছন্দটা মুখ্যত চার সিলেব্‌ল্-এর হ'লেও গৌণত ছ মাত্রারই বটে। ছ মাত্রা প্রকাশ্যত না থাক্‌লেও ছ মাত্রার স্থান ঐ ছন্দে আছে। প্রয়োজন মতো আবৃত্তির সময় তা পূরণ করা যায়। আপনি 'পরিচয়ে'

দেখিয়েছেন—বৃষ্টি পড়ে টাটুর টুপুর ইত্যাদি ছড়াটাকে তিন মাত্রায় ভাগ করা চলে। কিন্তু সুর ক'রে ছড়া আবৃত্তির সময় এ রীতিটা যেমন খাটে, কবিতা পাঠের সময় তা ঠিক খাটে না। যেমন ক্ষণিকার 'সেকাল' কবিতাটা।

কবি—'সেকাল' কবিতাতেও খাটে। এর লয় চারমাত্রার নয়। সেই জন্যে তিনের ভাগে যেখানে কম পড়েছে সেখানে টেনে পুরিয়ে দিতে হয়। যেমন—

আমি— | যদি— | জন্ম | নিতেম |
কালি— | দাসের | কালে—।

এরকম ছন্দে আমরা যে প্রত্যেক পর্ব্বে ফাঁক ভরিয়ে নিই তা নয়, গানের তালের মতই যেখানে সুবিধে পাই সেখানেই কর্ত্তব্য সেরে নিয়ে থাকি। তাতে ছন্দোনৃত্যের বৈচিত্র্য ঘটে। ভালো করে বিচার ক'রে দেখ্‌লে বুঝতে পারবে, ঐ লাইনটাতে "আমি যদি" দুই দুই মাত্রায় দ্রুত পাঠ ক'রে "জন্ম" এবং "নিতেম" শব্দের কাছ থেকে উভয়ের জরিমানা ডিক্রি করে নিয়েছি। নইলে ছন্দের তাল কাটতই কেননা এটা নিঃসন্দেহ তিনমাত্রার তাল। "কালিদাসের" শব্দটাতেও ঐ রকম রফা নিষ্পত্তি করতে হয়েছে। অর্থাৎ "কালি"তে যেটুকু কম পড়েছে "দাসের" মধ্যে সেটা আদায় করে নিতে হলো। সব ফাঁকগুলি সমান ভরিয়ে দিয়েও আমি কবিতা লিখেছি।

আমি—সেই রকম ছন্দকেই আমি বলেছি স্বর-মাত্রিক। এ-ছন্দে স্বরসংখ্যা ও মাত্রা-পরিমাণ দুটোই যুগপৎ ঠিক্ থাকে ব'লে এ ছন্দকে স্বর-মাত্রিক নাম দিয়েছি।

কবি—স্বরমাত্রিক ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দাও দেখি।

আমি—"বিহঙ্গ গান শান্ত তখন অন্ধরাতের পক্ষছায়ে," —এখানে প্রতি পর্ব্বে চার স্বর ও ছ'মাত্রা ঠিক্ আছে।

কবি—পূরবীর 'বিজয়ী' কবিতাটিতে আমি মাত্রার ফাঁক পূরণ ক'রে দিতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সর্ব্বত্র তা আমি পারিনি। কারণ ছন্দের নূতনত্ব বজায় রাখ্‌তে চেষ্টা ক'রে কবিতাকে তো খর্ব্ব করতে পারিনে। কাজেই এ কবিতাটিতে কোনো কোনো জায়গায় মাত্রার ফাঁক আর পূরণ করা হয় নি। যারা কবিতা পড়বে তারাই ফাঁক পূরণ ক'রে নেবে। ছন্দের ঝোঁক আপনিই পাঠককে ঠিক্ পথে চালায়।

তারপর কবি প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি 'বলাকায়' যে নতুন রকমের ছন্দ রচনা করেছি তাকে তুমি কি নাম দিয়েছ? তাকেও কি তুমি প্রবহমান ছন্দ বল?

আমি বল্লুম—বলাকার নতুন ছন্দও প্রবহমান বটে, কিন্তু শুধু প্রবহমান বললে এ ছন্দের পুরো পরিচয় দেওয়া হয় না। কারণ এ ছন্দে তো পংক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য নেই, এ বিষয়েও এ ছন্দে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তাই এ ছন্দকে আমি বলেছি 'মুক্তক'।

কবি—মুক্তক? এ নাম চল্‌তে পারে।

আমি—অবশ্য শুধু বাইরের বাঁধন থেকেই মুক্তি ঘটেছে, ভিতরের বাঁধন থেকে নয়।

কবি—তা তো হবেই।

আমি—কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দকে আমি শুধু মুক্তক বলিনে, বলি যৌগিক মুক্তক। কারণ পলাতকার ছন্দও তো মুক্তক, সে ছন্দকে বলেছি স্বরবৃত্ত মুক্তক।

কবি—মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও মুক্তক রচনা করা যায় কি না আমি তাই ভাবছি। কিন্তু তাতে মুশকিল আছে। এ ছন্দ গড়িয়ে চলে কি না, যেখানে সেখানে থামানো যায় না।

আমি—কিন্তু পাঁচ মাত্রার ছন্দে তো কতকটা মুক্তক আপনি রচনা করেছেন। মহুয়ার 'সাগরিকা' কবিতাটি কতকটা মুক্তক ছন্দে রচিত।

কবি—আজকাল ছ মাত্রার মুক্তক রচনার চেষ্টা আমি করছি।

তারপর তিনি তাঁর কবিতার খাতা থেকে কয়েকটি নব-রচিত কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। ছ মাত্রার ছন্দ, পংক্তিতে পংক্তিতে মিল আছে, কিন্তু পংক্তি-দৈর্ঘ্যের কিছু স্থিরতা নেই, অথচ কবিতার ভাব বহু

পংক্তিতে প্রবাহিত হ'য়ে গেছে। তাঁর এই ছ'মাত্রার মুক্তক ছন্দের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হলুম। আজও তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অসাধারণ সৃষ্টিকার্য্যে কিছুমাত্র বিরাম ঘটেনি। আজও তিনি নূতন ছন্দ-রচনায় সমানভাবে নিরত রয়েছেন।

পরের দিন আবার যখন তাঁর কাছে গেলুম তখন তিনিই ছন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বল্লেন,—"ছন্দ এমন একটা বিষয় যাতে সকলে একমত হ'তে পারে না। তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারব এমন আশা করা যায় না। ছন্দ হচ্ছে কানের জিনিষ; একেক জনের কান একেক রকম ধ্বনি পছন্দ করে। তাই আবৃত্তির ভঙ্গীর মধ্যে এতটা পার্থক্য ঘটে। আমি দেখেছি কেউ কেউ খুব বেশি টেনে টেনে আবৃত্তি করে, আবার কেউ কেউ আবৃত্তি করে খুব তাড়াতাড়ি। কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে আর আবৃত্তি করারও অভ্যাস থাকা চাই। আমি কিন্তু কবিতা রচনার সময় আবৃত্তি করতে করতেই লিখি; এমন কি কোনো গদ্য রচনাও যখন ভালো ক'রে লিখ্‌ব মনে করি তখন গদ্য লিখ্‌তে লিখ্‌তেও আবৃত্তি করি। কারণ, রচনার ধ্বনি-সঙ্গতি ঠিক্ হ'লো কিনা তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কান।

আমি—গদ্য রচনার মধ্যেও যে rhythm থাকা প্রয়োজন, একমাত্র কানের সাহায্য ছাড়া তো সে rhythm-কে আয়ত্ত করার কোনো উপায় নেই।

কবি—বাংলায় rhythmic prose রচনা নেই। এক সময়ে আমি rhythmic prose রচনার চেষ্টা করেছি। 'লিপিকা'তে সে rhythm ধরতে পারবে। 'লিপিকা'র রচনাগুলিকে আমি প্রথমে rhythm রক্ষার জন্যে পদ্যের মতো ভাঙা ভাঙা লাইনেই লিখেছিলুম। পরে গদ্যের মতো ক'রেই ছাপানো হয়েছে।

আমি—Rhythmic proseকে rhythm অনুযায়ী ভেঙে ভেঙে রচনা করার সার্থকতা আছে। তাতে rhythmটা সহজে ধরা পড়ে।

কবি—তা আছে। আমি এক সময় সত্যেনকে বলেছিলুম বাংলায় rhythmic prose রচনা করতে। কিন্তু সে তো তা করলে না। সে কবিতার ছন্দের ঝঙ্কারে এমন আকৃষ্ট হ'লো যে সে শেষের দিকে একরকম ছন্দে-পাওয়া হ'য়েই গিয়েছিল। অবন্ (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এক সময় rhythmic prose লিখতে চেষ্টা করেছিল। তার লেখা আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু বেশি প্রলম্বিত এবং অসংশ্লিষ্ট হওয়াতে চললনা।

আমি—আপনি rhythmic prose এর আদর্শ কেমন হবে তা দেখিয়ে দিন না।

কবি—'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের proseএ যে rhythm রয়েছে তাতে সেদেশের লোকেরা আকৃষ্ট হয়েছে। মনে করেছি বাংলা গদ্যেও ওরকম rhythm রেখে কিছু রচনা করব। কিন্তু আমাকেই সেটা করতে হবে কেন? আধুনিক কালের কবিরাই একাজটা করে না কেন? আধুনিক কবিরা যে মিল বর্জ্জন ক'রে লাইন ভেঙে ভেঙে কবিতা রচনা করছে তাতে কিছু দোষ নেই। মিল না দেওয়াটা মোটেই অন্যায় নয়। কিন্তু অমিল কবিতা রচনা করা খুবই শক্ত, তাতে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন।

আমি—অমিল অসমপংক্তিক কবিতা তো আপনিই সর্ব্বপ্রথমে রচনা করেছেন। কিন্তু ওরকম কবিতা তো একটির বেশি পাইনে। 'মানসী'র "নিষ্ফল কামনা'ই তো তার একমাত্র নিদর্শন।

কবি—ও ছন্দের কবিতা আরও রচনা করেছিলুম। কিন্তু সেগুলি আর প্রকাশ করা হয়নি।

কবি বল্লেন—মিল জিনিষটার প্রতি কিছুকাল পূর্ব্বেকার কবিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সতর্কতা ছিলনা। তাঁদের অনেকে পংক্তির শেষে কোনো রকমে একটুখানি মিল ঘটিয়েই তৃপ্ত হতেন; অনেক সময় তো শুধু 'রে' 'হে' ইত্যাদি দিয়েই মিলের কাজ শেষ করতেন।

আমি—আপনিই প্রথমে বাংলায় dissyllabic (দ্বিদল) trissyllabic (ত্রিদল) মিলের আদর্শ দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পংক্তির শেষ পর্ব্বে মিলের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির

উত্থান পতনের দ্বারা যে cadence-এর সৃষ্টি হয় তা-ও আপনার কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল।

তারপর আবার ছন্দের কথা উঠ্‌ল। কবি বললেন—ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা কর। কিন্তু ছন্দ এমন হওয়া উচিত, এমন হওয়া উচিত নয়, একথা ব'লো না। ছন্দ কেমন হবে তা কবিরাই ঠিক্ করবেন, তাঁরা নিজের কান আর ছন্দবোধের উপর নির্ভর করে নতুন নতুন ছন্দ রচনা করবেন। ইংরেজি সাহিত্যে এক সময়ে ছন্দের ভাগ অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল, কোথাও ব্যতিক্রম হ'তো না। তারপর কোল্‌রিজ প্রভৃতি কবিরা এসে নতুন ছন্দের প্রবর্ত্তন করলেন, তাঁরা কাটা কাটা ছন্দের ভাগ মান্‌লেন না, কোথাও বেশি কোথাও কম চালাতে লাগলেন। প্রথম প্রথম তাতে আপত্তি হয়েছিল। পরে কিন্তু তাঁদের প্রথাটাই চ'লে গেল। সুতরাং ছন্দের কোনো অকাট্য নিয়ম নেই, একথাটা মনে রাখা দরকার।

আমি—আমার আদর্শটাও তাই। কবিদের কি করা উচিত, কি করা অনুচিত তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কবিরা বর্ত্তমানে কোন্ নিয়মে ছন্দ রচনা করছেন আমি তাই আবিষ্কার ক'রে দেখাতে চাই। আমার কাজ হচ্ছে শুধু induction। Stateএর lawএর মতো কোনো law চালিয়ে দিতে চাইনে। Natureএর lawএর মতো ছন্দের law; সেটি শুধু আবিষ্কার ক'রে দেখিয়ে দিলেই আমার কাজ শেষ হয়। কেউ যদি কোনো নতুন নিয়মের ছন্দ চালায় তবে তাও চল্‌বে। তার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা তো বৈয়াকরণিকের কাজ নয়।

কবি—শাস্তির ব্যবস্থা আছে বৈ কি। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যে-ছন্দ কানকে খুশি করতে পারবে না, সে-ছন্দ কেউ পড়্‌বে না। এর চেয়ে বড়ো শাস্তি আর কি আছে? কাজেই যেখানটাতে কান খুশি হয় না সেখানটাতে ছন্দ-পতন হয়েছে একথাও বলা চলে।

আমি—তা তো চলে। কেন ছন্দ-পতন হয়েছে তাও তো দেখা দরকার। তারপরে অন্য প্রসঙ্গে আমি বললুম—ইংরাজ কবিরা পংক্তির এবং পর্ব্বের দৈর্ঘ্যে অনেক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। ওরকম বৈচিত্র্য আপনার কবিতাতেও প্রচুর আছে এবং তাতে যে কত ছন্দোবন্ধের সৃষ্টি হয়েছে তার সীমা নেই। আমি এই বৈচিত্র্যকে বোঝাবার জন্যে 'বর্দ্ধিত' এবং 'খণ্ডিত' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করছি। যেমন একটি পংক্তিতে আছে চোদ্দ unit, তার পরের পংক্তিতে যদি থাকে দশ unit তবে বলি দ্বিতীয় পংক্তিতে চার unit এর একটি পর্ব্ব খণ্ডিত হয়েছে; তার পরের পক্তিতে আবার চার unit এর দুটি পর্ব্ব যোগ ক'রে আঠারো unit এর একটি বর্দ্ধিত পংক্তি রচিত হ'তে পারে। এভাবে যোগ বিয়োগের দ্বারা যে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আপনার রচনায় পাই।

আমাদের আলোচনা চলছে এমন সময় একজন ফরাসী অধ্যাপক কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। অন্যান্য কথার পর কবি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফরাসী কাব্যে quantitative ছন্দ আছে কি?

অধ্যাপক—না, ফরাসী কাব্যে quantitative ছন্দ চলেনা। শুধু syllabic ছন্দই চলে। তারপর তিনি কবিকে প্রশ্ন করলেন আপনি কোন্ ছন্দ ব্যবহার করেন?

কবি—আমি quantitative ও syllabic দুরকম ছন্দই ব্যবহার ক'রে থাকি।

অধ্যাপক—আপনি বাংলায় free verse রচনা করেছেন কি?

কবি—আমি অনেক free verse রচনা করেছি।

তারপর অধ্যাপক মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বল্‌লেন—বর্ত্তমানে ফরাসীতে free verse যেমন চলে rhythmic proseও তেম্‌নি চলে। Rhythmic prose রচনার ভঙ্গী এমন যে তাতে কবিতার ধ্বনিস্পন্দ ধরা পড়ে কিন্তু তা কোনো ছন্দের নিয়মের আমলে আসেনা।

তারপরে কবিকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে এলুম। কি প্রশান্ত ধৈর্য্য ও স্নেহের সঙ্গে তিনি আমার সমস্ত কথা শুনলেন এবং নিজের বক্তব্য আমাকে বুঝিয়ে বললেন, সে-কথা স্মরণ ক'রে এই কথাই বিশেষ ভাবে অনুভব করলুম যে তিনি শুধু অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী কবিই নন, ব্যক্তিগত সহৃদয়তাতেও তিনি অনন্যসাধারণ; তাঁর প্রতিভার ন্যায় তাঁর মহত্ত্বও সর্ব্বতোমুখী।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

কবির পুনশ্চ বক্তব্য

সেদিনকার আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন উঠেছিল যে, ছন্দে সিলেব্‌ল্ প্রধান, অথবা মাত্রা প্রধান। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কি ভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো, সে কথাটা গৌণ, তার ঝঙ্কারের লয়টাই আসল কথা। ষাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রত্যেক পর্ব্বে ঊর্দ্ধসংখ্যা কয় সিলেব্‌লের স্থান আছে তা আমি পূর্ব্বে বিচার ক'রে দেখিনি। 'বিচিত্রা' সম্পাদক বলেন ছয় বা পাঁচ বা চার সবই চলে। আমি তাঁকে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করতে অনুরোধ করেছিলুম। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা ক'রে দৃষ্টান্ত স্বয়ং রচনা করেচেন, পাঠকদের গোচর করা গেল :--

আজিকে তোমারে ডাক দিয়ে বলি, শুন গো সখী,
তোমার বীণায় বাজে অপরূপ ছন্দ ও কি ?
কোনো পদ তার চার সিলেবিলে কোনোটা পাঁচে,
এ যেন মিতালী ঝাঁপতালে আর কাবালী নাচে !
এ যেন আঠারো বরষের পাশে ষোড়শী নারী,
যে বলে ইহারে অমিল, তাহার সঙ্গ ছাড়ি।
চারে পাঁচে মিল হয় না, এ কোন্ দেশের কথা ?
চারে পাঁচে নয়, তার অভিনয় যথা ও তথা।
চারের সহিত পাঁচের প্রণয় রসিকে জানে,
অরসিক জনে শাস্ত্রই মানে, মানে না কানে।
কানের মাঝারে ছন্দের বাসা, নিয়মে নহে ;
কানে মানে না যে সুধীজন তারে বে-কানা কহে।
অসমে অসমে কত অপরূপ সাম্য আছে !
কত মধুভরা ফুল ফোটে, জানো, কাঁটার গাছে ?

রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বরষা ঝরে, বরষা ঝরে তরুর দেহে,
লতা দুলে দুলে পরশে তারে, পরশে তারে সজল স্নেহে
ঘন তমসায় সজল মায়া বিছালো ছায়া নেত্রে তব,
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে হাস্য ঝরে কি অভিনব !

না জানি আজি গাহ চুপি চুপি কি গান সখী,
একি এ [illegible] তোমার আজি নিরখি !
[illegible]
[illegible] !
[illegible]
[illegible] চারে ও পাঁচে।
--এখনো কাহারো মনে সন্দেহ কিছু কি আছে ?
সেদিন সন্ধ্যা, গুরুদেব-গৃহে উঠিল কথা,
চার পাঁচ দিয়ে ছন্দ করার নাহিক প্রথা।
গুরুর আদেশে ত্রিবিধ প্রমাণ দিলাম এনে,
দেখিব এখন কি বিধি করেন প্রবোধ সেনে।

দেখা যাচ্চে, "আজিকে তোমারে" ছয় সিলেব্‌ল্, তার পরেই "ডাক দিয়ে বলি" পাঁচ সিলেব্‌ল্। পরবর্ত্তী ছত্রে "তোমার বীণায়" চার সিলেব্‌ল্, আবার "বাজে অপরূপ" পাঁচ। প্রাকৃত বাংলা ছন্দেও এরকম দৃষ্টান্ত আছে, যথা—

৫	৪	৩	১
শিবুঠাকুরের।	বিয়ে হবে।	তিন কন্যে।	দান।

এই একটা লাইনেই দেখা যাচ্চে চার অসমান সংখ্যক সিলেব্‌ল্-পিণ্ড নিয়ে একই ষাণ্মাত্রিক ছন্দ রচিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



চৈতালি

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী

'চৈতালি' কাব্য খানি কাব্যসংগ্রহের মধ্যে পাই, স্বতন্ত্র ভাবে ইহা মুদ্রিত [illegible] জানা নাই। কাব্যসংগ্রহ প্র[illegible] সালে, প্রকাশক ছিলেন রবীন্দ্র[illegible], শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। [illegible] কশোরক কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতালি পর্য্যন্ত কবিতা সন্নিবেশিত আছে। অনেকে এই পরিষদে কবিবরের অনেক কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন, চৈতালি গ্রন্থখানি আমার বিশেষ প্রিয় বলিয়া আমি ইহাকেই নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছি। চৈতালি রবীন্দ্রের ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের রচনা, যাহার কথা বলিতে তিনি বলিতেন, "রবি এখন মধ্যাহ্ন গগনে, Zenithএ," তখন তাঁহার দেহ আর মনের পরিপূর্ণ যৌবন কাল, এই তো সেদিন তাঁহার সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব হইল, দেহ ক্ষীণ হইলেও মনের চির তারুণ্য এখনও বর্ত্তমান।

আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু যখনি তিনি একখানি কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন, তখনি মনে করেন সেই তাঁর শেষ রচনা, আর সেই ভাবের কবিতা তাঁহার লেখার মধ্যে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে চৈতালি লিখিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই রবি-শস্যই তাঁহার শেষ দান, সেই কারণেই ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন, "চৈতালি।" আপনারা সকলেই জানেন তাহার পর এই ৩৫ বৎসরে তিনি আমাদের জন্য লক্ষাধিক কবিতাকুসুম সৃষ্টি করিয়াছেন, সংখ্যাতীত গান কথায় সুরে মনোরম করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিয়াছেন, কত বিচিত্র নাট্যাবলী, প্রবন্ধ, রূপকের রূপকথা যে রচনা করিয়াছেন তাহার গণনা হয় না, আর এই সকল রচনাই বিশ্ব-সভায় তাঁহার দীপ্ত ললাটে যশের মুকুট পরাইয়া, ভারত-মাতার জন্য গৌরব পদবী অর্জ্জন করিয়াছে। আজ বাঙালী তাঁহারি গর্ব্বে গর্ব্বিত, তাঁহারি মহিমায় গৌরবান্বিত।

চৈতালির প্রথমেই উৎসর্গ কবিতাটি পড়িয়া মনে হয়, তাঁহার যৌবন-প্রদীপ্ত জীবনের উজ্জ্বল মদিরা বুঝি পেয়ালা ভরিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিবেন, কিন্তু ইহার পর হইতেই কেমন একটি বেদনার সুরে সমস্ত কাব্যখানি অনুবিদ্ধ। উৎসর্গ কবিতাটিতে আছে :—

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল! * * *
তুমি এসো নিকুঞ্জ নিবাসে,
এসো মোর সার্থক সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব্ব সমর্পণ;
হাসি মুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন॥
শুক্তি রক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল' বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি লতা মূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে

রবীন্দ্র পরিষদে পঠিত

বৃথা কাজে যেন অন্য মনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি'—তুলি';
তব ওষ্ঠে, দশন-দংশনে
টুটে যাক্ পূর্ণ ফলগুলি ॥

এ যেন ওমারথায়েমের সাকী ও তাহার প্রণয়ীর ছবি; কিন্তু পরবর্ত্তী কবিতাতেই দেখি, এ উচ্ছ্বাস আর নাই, কবি কাতর হইয়া বলিতেছেন "চলে গেছে মোর বীণাপাণি", বীণা আর বাজিবেনা, তাঁহার আর আশা নাই, আশ্বাস নাই বেদনায় অন্তর পরিপ্লুত।

"একদিন সন্ধ্যালোকে
অশ্রুজল ভরি চোখে
বক্ষে এরে লইলাম টানি,
আর না বাজিতে চায়—
তখনি বুঝিনু হায়
চ'লে গেছে মোর বীণাপাণি ॥"

ভগবানের বিভূতি যেমন অণোরণীয়াণ্ মহতোর্মহীয়ান্ কবিচিত্তের অনুভূতির মধ্যে আমরা তাহারি পরিচয় লাভ করি। তুচ্ছতম হইতে শ্রেষ্ঠের সহিত সহানুভব এই কাব্য-খানিতে, তাই গৃহকোণে তাঁহার আশার সীমা আসিয়া পড়িলেও আবার অসীম আকাশও ছাড়াইয়া যায়। কখনো কখনো তাই বলিয়াছেন,

"সব পাই যদি তবু নিরবধি,
আরো পেতে চায় মন,—
তারে যদি পাই, তবে শুধু চাই
একখানি গৃহ-কোণ ॥"

আবার গাহিয়াছেন

"নীরবে জ্বলিছে তব পথের দুধারে
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে"।

এই রচনাগুলির মধ্যে বাংলার পল্লী, বিরাট ভারত অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সর্ব্বত্রই তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত। পুঁটু-রাণীও তাঁহার স্নিগ্ধ নেত্রপাত এড়াইয়া যায় নাই, আবার দেব-সেনাপতি কুমার-জননীর, কুমার-সম্ভব কথার উল্লেখে মাতৃহৃদয়ের আনন্দ, অথচ নারীজনসুলভ লজ্জার অরুণিমা, আয়ত নয়ন, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; আর কেন যে কবি-শ্রেষ্ঠ কালিদাস তাঁহার কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিয়াছেন।

কবি রসানুবেত্তা, তাঁহার দরদী মন, কোন কিছুকেই তুচ্ছ মনে করে না। চৈতালি রচনা কালে তিনি তাঁহাদের জমিদারী পরিদর্শনে বাংলা পল্লীর অন্তরের অন্তঃপুরে, দুরন্ত পর্ব্বত-দুহিতা পদ্মার তটান্তদেশে বজরায় থাকিতেন। এই চৈতালিতে আর ছিন্নপত্রে, সেই সকল পল্লী-দৃশ্যের অনেকগুলি অনুপম ছবি আমরা দেখিতে পাই। যাঁহারা বাংলার পল্লীগ্রামের সহিত পরিচিত তাঁহারা বুঝিবেন 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটি তাহার কি নিখুঁত ছবি।

"প্রভাতে"—প্রভাতালোকে মনে করিয়াছেন,

"ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বসিয়াছি ভালো"।

"দুর্লভ জন্মে" বলিতেছেন

"দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ,
যা' পাইনি তাও থাক্, যা' পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ বলে যা' চাইনি তাও মোরে দাও ॥"

"কর্ম্ম" কবিতাটিতে, দরিদ্রের যে শোক করিবার অবসরও নাই, আর মানব-জীবনের সার্থকতা যে এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তাহা কেমন সহজ অথচ মর্ম্মস্পর্শী স্বল্প কথায়, রেখাক্ষরে ছবিতে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার নির্জ্জন বাসে নিঃসঙ্গ নৌকার বাতায়নে বসিয়া তিনি দেখিয়াছেন, হিন্দুস্থানী মাতৃহীনা বলিকার গৃহিণীপণা, "দিদি" কেমন করিয়া শিশুকালেই "মা" হইয়া বসিয়াছে। জীবধাত্রী ধরিত্রী যেমন পশু-শাবক ও মানব-শিশুকে সমস্নেহে বুকে ধরিয়া আছেন উভয়ের মধ্যেই স্নেহ-সূত্র বাঁধিয়া দেন, দিদিও তেমনি করিয়া—

"পশু-শিশু, নর-শিশু,—দিদি মাঝে পড়ে,"
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে ॥

ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথের দৃশ্য তাঁহার মনকে অনন্তের পথে লইয়া গেল। ঐ ছোট্ট খোলা বাতায়নটি যেমন তাঁহাকে দেখাইল শ্যামাঞ্চলা বসুমতীর চিরসুষমা তেমনি

দেখিলেন জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আর ছায়াপথে কৃষ্ণা রজনীর তমিস্রার রহস্য, শুক্লার সীমাহীন প্রকাশ।

এইখানেই সাধারণ মন আর কবিচিত্তের প্রভেদ। ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও তিনি ভূমার স্পর্শ লাভ করেন, আর এই জীবনের মিলন নিবিড় হইলেও তাহা ক্ষণিকের, কখন ফুরায় তাহা কে বলিতে পারে? তাইতো মুগ্ধ হৃদয় বলিয়া ওঠে,

এ ক্ষণ-মিলনে তবে ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর!
মুহূর্ত্ত আলোকে কেন, হে অন্তর-তম,
তোমারে চিনিনু চির-পরিচিত মম?

এই "চৈতালি" কাব্যখানি সকলকেই একবার পড়িতে বলি, যিনি পড়িয়াছেন তিনি আবার পড়িয়া দেখুন, আর যাঁহারা "বঞ্চিত শ্রীগোবিন্দ দাসে"র মত ইহার সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহারা পরিচয় লাভ করিলে দেখিবেন, 'পুঁটু' 'হৃদয় ধর্ম্ম', 'মিলন দৃশ্য', 'দুই বন্ধু' ও 'সঙ্গী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কি স্নিগ্ধ রস-মাধুর্য্য। সবগুলিই কেন যে কবিচিত্তের স্নেহ-বঞ্চিত নয়, তাহা বুঝা কঠিন হইবে না। সৃষ্ট জীবজন্তু তরুলতিকা, ওষধি, তৃণমঞ্জরী, প্রকৃতির অণু-পরমাণুর সহিত আমাদের দেহ মনের নাড়ীর টান আছে—সে কথা আমরা প্রতিদিনই কতভাবে অনুভব করি। সকলে প্রকাশের ভাষা পাই না, কবি সহজেই তাহা আভাসে প্রকাশে আমাদের চক্ষের ও মনের সম্মুখে ধরিয়া দেন।

চৈতালির সূচনা প্রতিদিনের জীবনের সরল রেখাপাতে, ক্রমে সে সরল রেখা সমান্তরাল রেখার প্রান্তে যেখানে গিয়া মিশিল সেটি অসীমার রাজ্য।

তিনি বাংলার পল্লী ছাড়িয়া বিরাট ভারতের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ তাঁহার মনে আবেগ সঞ্চার করিল। ইহার পরিচয় পাই 'বনে ও রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি' 'বন', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। শেষোক্ত কবিতাটি উদ্ধার করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই চতুর্দ্দশ পদে যে শব্দ-চাতুর্য্য মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান, যে চমৎকার শব্দনির্ব্বাচন, আর কয়েকটি রেখায় যে বিশাল বিরাট চিত্র আমাদের মানস-চক্ষে প্রকাশিত হয়, তাহা যেমন বৃহৎ তেমনি পরিষ্কার, এমনি শব্দচয়নের চাতুর্য্য তাঁহার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় দেখিতে পাই।

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধত-ললাট;
স্পর্দ্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্ঝনা আর ধনুর টঙ্কারে,
বীণার সঙ্গীত আর নূপুর ঝঙ্কারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জ্জে, বিজয়-উল্লাসে,
রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্ম্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্ব্বাক্ গম্ভীর শান্ত, সংযত উদার।
হেথা, মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

আমি যে বলিয়াছিলাম, কবি-চিত্তের অনুভূতি অণোরণীয়ান হইতে মহতোমহীয়ান্ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে তাহারি সম্যক্ পরিচয় পাই। আর এক কথা, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ বিশ্বরূপের মধ্যে চিত্তের যোগসূত্রের অস্তিত্ব অনুভব করা, জীবধাত্রী ধরিত্রীর মতই নির্ব্বিচার স্নেহ পরিবেশন—ভেদবুদ্ধিরাহিত্য, জীবে দয়া, মানবের মধ্যে মৈত্রী, আর তরুলতা-ওষধির প্রতি করুণা। আদি কবি বাল্মীকির কবিত্ব স্ফূর্ত্তি—ক্রৌঞ্চমিথুনের বিচ্ছেদ-বেদনার শোকোচ্ছ্বাসে, রুধিরাপ্লুত দেহের ব্যথিত ছবিতে। রামায়ণে নিষাদ-পতি অযোধ্যার যুবরাজের বান্ধব, সুগ্রীব তাঁহার মিতা, শবরী তাঁহার অনুরাগিণী, কতকাল হইতে তাঁহারি প্রতীক্ষায়, জীবনের সকল সম্ভোগ উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে, এমন কি শত্রু-ভ্রাতা বিভীষণও তাঁহার ভক্ত ও রাজ্যসুখত্যাগী।

শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে দেখিতে পাই, মাতৃহীন মৃগ-শিশু রোরুদ্যমানা শকুন্তলার অঞ্চল-প্রান্ত আকর্ষণ করিয়া

যেন বিদায় লইতে বারণ করিতেছে, আশ্রম-কন্যা শকুন্তলা স্নেহ-লালিত তরু-লতিকার কাছে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

"পদ্মা" কবিতাটি আমাদের মন মুগ্ধ করে তাহার আন্তরিকতায়:

'স্নেহগ্রাস', 'বঙ্গমাতা' কবিতায় তিনি যে পরামর্শ দিয়াছিলেন আজ ৩৫ বৎসর পরে আমরা তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি,—আর শুধু বাঙালী হইয়া পৈতৃক ভিটার মায়ায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, এবার যথার্থ ই মনুষ্যত্বের কঠোর সাধনার দিন আসিয়া পড়িয়াছে।

এই কাব্যখানিতে তিনি নারীর সম্মান পদবী বিস্মৃত হ'ন নাই,তাই বলিয়াছেন,—

যখন তোমার' পরে পড়েনি নয়ন
জগৎলক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাথাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।

* * * *

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে॥

এই কবিতাগুলি যেন কবির সেই সাময়িক মনের আত্মকথা, দিনের পর দিন এই রচনাগুলির মধ্য দিয়া জীবনের কয়েক পৃষ্ঠা তিনি খুলিয়া দেখাইয়াছেন, কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিলেও, বারম্বার ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহার নৌকার ছোট্ট বাতায়নটির পাশে, যেন কি এক আঘাতবেদনা, তাঁহার মনকে কাতর করিয়া তুলিয়াছে, ভুলিতে চাহিলেও ভুলিতে পারেন নাই, ব্যথার সুর ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া উঠিয়াছে। ছেলেবেলায় যখন তাঁহার একখানি কাব্যের নাম দেখিলাম "ভগ্ন-হৃদয়"—তখন বালিকা-বয়স, সংসারজ্ঞান নাই, হাসিয়া বলিয়াছিলাম,—"ওমা,—ভগ্নহৃদয়ের আবার কবিতা হয়?" এখন দেখিতেছি মানস-নিকষ যদি ব্যথায় ফাটিয়া ওঠে, তখনি উৎস উৎসারিত হইবার অবসর পায়, রস-গঙ্গার গোমুখীর মুখ খুলিয়া যায়।

ব্যথা পাইয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত কোন প্রমাণ জানা নাই, বোধ-হওয়ার উপরই বলা; তবে যদি আঘাত লাগিয়াই থাকে, ব্যথা বাজিয়াছিল তাঁহাকে; আমরা পাইলাম নিরাভরণা কণ্ব-তনয়ার মতই অনুপমমূর্ত্তি সরল সুন্দর এই কবিতাগুলি, যাহারা স্বাভাবিক সুষমায় সহজেই চিত্তহারী।

কাব্যখানি স্বল্পায়তন, আলোচনা বহু দীর্ঘ হইলে রসভঙ্গ হইবার ভয়। আমি ভাষ্য লিখিতে বসি নাই, ইহার প্রতি আমার কেন যে পক্ষপাত, আমার অন্তরের সেই কথাটি আপনাদের কাছে বলিলাম। আপনারাও ভাবিয়া দেখিতে পারিবেন।

কবিতাগুলি. অধিকাংশই চতুর্দ্দশপদী গীতি-কবিতা; তবে ইহার ভিতর শিল্পীর নিপুণ হস্তের পরিচয় সর্ব্বত্রই আছে চতুর্দ্দশ পদে; ঐ কয়েকটি ছত্রের মধ্যে একখানি ছবি সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিয়া সম্মুখে ধরা, ভাবকে অন্তরের অন্তরাল হইতে বাহিরে আনিয়া, ভাষায় বিকশিত করিয়া তোলা দক্ষ লেখনীর পরিচয়।

কোথাও কষ্ট-কল্পনা বা চেষ্টার চিহ্ন দেখিনা, তাহার কারণ টানিয়া বুনিয়া কিছু করেন নাই। যখনি মন মাথা নাড়িয়াছে, তিনিও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন:—

বৃথা চেষ্টা, রাখি দাও স্তব্ধ নীরবতা,
আপনি গড়িবে তুলি, আপনার কথা।
আজ সে রয়েছে ধ্যানে, এ হৃদয় মম,
তপোভঙ্গ ভয়-ভীত তপোবন সম।

তপোভঙ্গের শাস্তি ভয়াবহ, আর পরিণাম রতি-বিলাপ! তপোভঙ্গের কোন প্রয়াস নাই, কষ্ট—চেষ্টার পরিচয় পাই না, কবিতাগুলি প্রজাপতি, ফুল, ছোট পাখীর মতই সুন্দর, গঠনে সংহত, সংযত, সঙ্গত ও সুঘম। তাই যেমন কাব্যানুরাগীর চিত্ত মুগ্ধ করে, তেমনি সৌন্দর্য্য-প্রিয় দৃষ্টিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

সম্মুখে গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ, আপনারা সকলে না হইলেও অনেকেই নিজ নিজ পল্লীনিবাসে যাইবেন, তাহার পূর্ব্বে চৈতালি রবি-শস্যের সুন্দর ছবিগুলি, একবার মনে আঁকিয়া লইতে অনুরোধ করি, সেখানে চারিদিকের দৃশ্য-সমাবেশে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই কবিতার সৌন্দর্য্য

অনুভব করিবার সুযোগ পাইবেন। আমি সব কথা বলিলাম না, কতকটা বিচারের ভার আপনাদের উপর দিলাম।

যদিও আমাদের সে পল্লী-জীবন আর নাই, রোগে দারিদ্র্যে তাহা পীড়িত, তবু আকাশে তেমনি বর্ণ সমাবেশ হয়, শ্যামলিমা লুপ্ত হয় নাই, সহজ জীবন-যাপন বিরল নয়, আবার এই মহা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অনেকের মন ব্যথাক্লিষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। তাই চৈতালির শেষ, "বিদায়" কবিতাটি উদ্ধার করিয়া আমার আলোচনা সমাপ্ত করিলাম।

হে তটিনী, সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মতো ; উদার গগন
—অলিখিত মহাশাস্ত্র—নীল পত্রগুলি
দিক্ হ'তে দিগন্তরে নাহি রাখে খুলি' ; —
শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্চলে
সত্যের স্বরূপখানি নির্ম্মল নয়নে
রাখে না নবীন করি ; সেথায় কেবল
একমাত্র আপনার অন্তর সম্বল
অকূলের মাঝে। তাই ভীত শিশুপ্রায়
হৃদয় চাহে না আজ লইতে বিদায়
তোমা সবাকার কাছে। তাই প্রাণপণে
আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত্ত আলিঙ্গনে
নির্জ্জন লক্ষ্মীরে। শুভ শান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে বাঁধি লব।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

উৎপ্রেক্ষা

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

ওপারে জ্বলিছে চিতা—শিখা তার যেন
চুমিবারে চায় ভীত কুণ্ঠিত আকাশ ;
এপারে সাঁঝের বেলা—মনে লাগে হেন—
কর্ণে পশিতেছে কার্ তৃপ্তির নিঃশ্বাস।

চিতা নহে—
ক্ষুব্ধ দিবসের সে যে বিদায় চাহনি।
সে নিঃশ্বাস—
গৃহমুখী কপোতের ক্লান্ত পক্ষধ্বনি।

ওপারে দাঁড়ায়ে কে যে—হাতে দীপ তার—
নিশীথে উজলি' কার্ পথখানি বাঁকা ;
এপারে শুনিতে পাই শ্লেষ-হাসি কার্
বিদায়ের আয়োজনে অশ্রু দিয়ে ঢাকা।

দীপ নহে—
রাত্রিবায়ে ক্ষণিকের আলেয়া সৃজন।
হাসিধ্বনি—
গৃহাগত শকুন্তের নিদ্রালু ক্রন্দন।

ওপারে শুনেছি যেন অশ্রুভেজা সুরে
আশাহত জীবনের চরম আহ্বান ;
এপারে সরিয়া যায় দূর হ'তে দূরে
অলকের গন্ধ কার্—স্মৃতি অবসান।

সুর নহে—
ঊর্ম্মি সাথে পবনের লুকোচুরি খেলা।
গন্ধটুকু—
আমারি যে সাজি হ'তে বহে সন্ধ্যাবেলা

অজ্ঞাতবাস

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৭

ব্যাঙ্কের ঠিকানায় বাদলকে চিঠি লিখবার তিন দিন পরে সুধীর অবর্ত্তমানে সুজেৎ টেলিফোন ধর্‌ল। বাদল বল্ল, "কোনখান থেকে কথা বল্‌ছি জিজ্ঞাসা করো না, প্রত্যেক বুধবারে টাইমস্‌ কাগজের Personal স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

সুধী বুধবার অবধি উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা কর্‌ল। বাদলের এক লাইন বিজ্ঞাপন। "BADAL TO SUDHIDA.—ALL'S WELL."

দেশে চিঠি লিখবার সময় ঐটুকু খবর সুধীর কাজে লাগ্‌ল। বাদল কোথায় আছে সেটা সুধী চেপে গেল। কেমন আছে সেইটে জানাল। বাদল যে কেন তাকে চিঠি লিখে জবাব দিল না এর কারণ অনুধাবন কর্‌তে সুধীর বিলম্ব হল না। পাছে চিঠির পোষ্ট মার্ক থেকে তার ঠিকানা ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু কেন এ সতর্কতা? ছেলেমানুষী—বাদলটা চিরকাল ছেলেমানুষ। সুধীর সঙ্গে এই বয়সে লুকোচুরি খেলতে চায়। সুধীর আপত্তি নেই। কিন্তু দেশের লোক ঐ তামাসার মর্ম্ম বুঝ্‌বে না। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করবে কোথায় আছে সে। তার সঙ্গে দেখাশুনা হয় কি না। দেখা হলে কি বলে। তার পড়াশুনা কেমন চল্‌ছে ইত্যাদি। মহিম, যোগানন্দ, উজ্জয়িনী তিন জন মানুষ তার দিকে চোখ ফিরিয়ে রয়েছেন, সুধীর চিঠির দূরবীণ দিয়ে তার গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন, সুধীর চিঠির যা কিছু মূল্য তা বাদলের খাতিরে। "বাদল ভাল আছে"—কেবলমাত্র এইটুকু শুনে কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। মহিমচন্দ্র জান্‌তে চাইবেন কোন কোন সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ হল, যোগানন্দ জান্‌তে চাইবেন তার চিন্তার হাওয়া কোন দিকে বইছে, উজ্জয়িনী জান্‌তে চাইবে সে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে নতুন কিছু বলে কিনা। বাদল তাঁদের সম্বন্ধে যেমন উদাসীন তাঁরাও বাদল সম্বন্ধে তেমনি সপ্রতীক্ষ।

যা হোক বাদল যখন অজ্ঞাতবাস কর্‌তে দৃঢ়সংকল্প তখন সুধী তার সহায়তা কর্‌তে বন্ধুতার খাতিরে বাধ্য। তার খোঁজ করে তার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করা সুধীর পক্ষে পীড়াকর। সুধী বাদলকে লিখল, "আচ্ছা। কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে কুশলবার্ত্তা চাই।" বাদল এর উত্তরে বিজ্ঞাপন দিল, "SUDHIDA—I AM ALRIGHT."

সুধী কিম্বা বাদল কারুর খেয়াল ছিল না যে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন অন্য কারুর চোখে পড়তে পারে। তারা কেমন করে জানবে যে যোগানন্দ ইতিমধ্যে Quettaয় বদলি হয়েছেন ও সেখানকার ক্লাবে টাইম্‌স্‌ কাগজের দৈনিক সংস্করণ নিয়ে থাকে? কিন্তু সে কথা যথা সময়ে।

বাদলের যাতে ধ্যান ভঙ্গ না হয় তাই সুধীর লক্ষ্য। বাদলের আত্মীয়দেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুৎসুক রাখবার ভার সুধী নিল। লিখল, "বাদল ভালই আছে। চোখে দেখা না পেলেও লেখায় দেখা পাই।"

এদিকে দে সরকার বিজ্ঞাপনটা পড়ে বিভূতিকে দেখিয়েছে। দুজনেই সুধীকে চেপে ধর্‌ল। দে সরকার বল্ল, "Ariel to Miranda : Take... কি হে ব্যাপার কি? খবরের কাগজে ত তারাই বিজ্ঞাপন দেয় জানি যারা ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে কিম্বা যাদের চিঠি পরের হাতে পড়বার সম্ভাবনা আছে। যথা অল্পবয়সী আইবুড় মেয়েকে লেখা চিঠি তার মায়ের হাতে।"

বিভূতি বল্ল, "আই সে চাকারবাটী, হোয়াট্‌স্‌ দ' ম্যাটার?" এই ক'দিনে বিভূতি দে সরকারের নকল কর্‌তে

করতে দারুণ স্মার্ট হয়েছে। ধার করে ম্যানার্স পেয়েছে, ধার করে পেটেন্ট লেদারের জুতো থেকে আরম্ভ করে বোলার হ্যাট পর্য্যন্ত কিনেছে। নিজের এক ডজন ফটোগ্রাফ তুলিয়ে দেশে রপ্তানি করতে যাচ্ছে।

সুধী খুলে বল্ল না। বল্ল, "ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে সপ্তাহে একবার কুশল সংবাদ জানাবে।"

দে সরকার মাথা হেলিয়ে ভঙ্গী বিস্তার করে বল্ল, "বুঝেছি। পোষ্ট কার্ড লিখ্‌লে এক পেনি খরচ হয়, ওটা আমাদের মত গরীব ছাত্রদের জন্য। টাকা আছে সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান চাই ত।"

বিভূতি বল্ল, "হায়! আমার যদি টাকা থাকৃত আমি দিনে একবার Cable কর্‌তুম।"

দে সরকার তার মাথায় চাঁটি মেরে বল্ল, "বল ও টাকা যদি আমার হত। ও টাকার উপর বাদলের কি অধিকার আছে? কমিউনিস্‌ম্ চাই।"

বিভূতি অমনি বল্ল, "কমিউনিস্‌ম্ চাই। গিভ্‌ মি কমিউনিস্‌ম্ অর গিভ্‌ মি ডেথ্‌।"

দে সরকার সুর নামিয়ে বল্ল, "চুপ চুপ চুপ। ও ঘরে স্পাই আছে। ঐ যে আহ্লাদী মেয়েটা—"

বিভূতি তোৎলাতে তোৎলাতে বসে পড়্‌ল। তার কাল মুখ কালী হয়ে গেল। আহ্লাদীর সঙ্গে যে সে আজ সিনেমায় যাবে ঠিক হয়ে গেছে।

মিস্ মেলবোর্ণ হোয়াইটও জিজ্ঞাসা করছিলেন, "সুধী, তোমার বন্ধুর খোঁজ পেলে?"

"না আণ্ট এলিনর। সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, ভাল আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কি ভাব্‌ছে, কবে দেখা হবে, কেন আত্মগোপন করেছে—কিছু জানায় নি।"

আণ্ট এলিনর কিছুমাত্র সংকোচ না বোধ করে বল্লেন, "এই ব্যাপারের পিছনে কোনো গার্ল নেই ত?"

সুধী মৃদু হেসে বল্ল, "না। আমার বন্ধুকে আমি ভাল করেই চিনি।"

বাদলের জীবনকাহিনী, তার সাধনমার্গ, তার অসাধারণ মনীষা ও একাগ্র সংকল্প বক্তা ও শ্রোত্রী উভয়কে প্রীতি দিল। আণ্ট এলিনর আবেগের সঙ্গে বল্লেন, "আমি যদি তোমাদের দুজনের মা হয়ে থাক্‌তুম।" তাঁর বাগ্‌দানের আংটি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঝকমক করে উঠ্‌ল।

বাদলের গল্প শেষ করে সুধী পাড়্‌ল উজ্জয়িনীর গল্প। সে উজ্জয়িনীকে চাক্ষুষ না চিন্‌লেও আন্তরিক চিন্‌ত। প্রতিদিন উজ্জয়িনীর কথা চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে তার চিঠিপত্রের কাঠামোকে ঘিরে সুধী নির্ম্মাণ করেছিল একটি সজীব প্রতিমূর্ত্তি। লোকে যার যে পরিচয় পেয়েছে সেই তার একমাত্র পরিচয় না হলেও সেও তার সত্য পরিচয়। তাতে যদি কিছু বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটুকু সুধীর নিজের স্বভাব কিম্বা বয়স থেকে লব্ধ। সাক্ষাৎকার সেই বাহুল্যের প্রতিষেধক কিম্বা প্রতীকার নয়।

উজ্জয়িনীর সমস্যা আণ্ট এলিনরকে বিচলিত কর্‌ল। তিনি অনেকক্ষণ নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, "Men must work and women must weep."

৮

মে মাস এল। মে মাসের মায়ামন্ত্র সুধীকে সব ভোলাল। আকাশ মেঘবর্জ্জিত অনাবৃত গাঢ় নীল। দৃষ্টি সেই গভীর সরোবরে ডুব দিয়ে তলিয়ে গিয়ে আরাম পায়, সাঁতার দিয়ে কূল পায় না, স্নান করে উঠে যাই দেখে তাই সুন্দর। ঘাসের সবুজ মখমলকে পটভূমি করে ফুলের আলপনা আঁকা। মরি মরি কত নক্সা, কত রং, কত আকার কত প্রকার। টুলিপ ডাফোডিল প্রিমরোজ ব্লুবেল হায়াসিন্থ সুইট পী স্ন্যাপড্রাগন ড্যাণ্ডিলায়ন মারগেরিট ডেসী—একশ নাম, হাজার নাম, একশ রূপ, হাজার রূপ। কেউ আপনা হতেই গজায় কারুর আবাদ কর্‌তে হয়। কিন্তু সকলেই অমূল্য, প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। সুধী বিস্মিত হয়ে ভাবে, আকাশের রামধনু কি টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে মিহি গুঁড়া হয়ে বাতাসে উড়ে এসে মাটীতে ছড়িয়ে গেল? প্রতিদিন সূর্য্যের সাতরঙ্গা আলো বৃষ্টির জলের মত মৃত্তিকা ভেদ করে পাতালে হারিয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে উৎসের মত উত্থিত হয়ে ভূমিপটে চারিয়ে গেল। আলোর রং ভেঙ্গে ও জুড়ে ফুলের রং; আলোর রূপের আদল আলোর

ছেলে ফুলের মুখে, ফুলের স্বভাবে আলোর মৌন চঞ্চল স্বভাব।

গরম বোধ হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে ব'লে এদানীং সুধী টিউবে চড়া ছেড়ে দিয়েছে। সময় যত লাগে লাগুক বাস্-এর মাথায় বসে দু ধারের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আসা যাওয়া করে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তন্ময় হয়ে যায়, দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন থাকে। নানা দিগ্‌দেশাগত পাখীর সাময়িক নীড় নির্ম্মাণের ব্যস্ততা তাকে আমোদ দেয়। তাদের একো জনের একো রকম রঙ্গ তাকে মুগ্ধ করে। তাদের বিচিত্র কণ্ঠস্বর শুনে সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, একটি অদৃশ্য অর্গ্যানের সুর কি এগুলি, কার আঙ্গুলের স্পর্শ এদের খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, সন্ধ্যার আগে থাম্‌তে দেবে না। নাইটিঙ্গেলের গান শুন্‌বার জন্য সুধী লণ্ডন ছেড়ে দিন কয়েকের জন্য পাড়াগাঁয়ে যাবে স্থির করেছে। ওরা নিস্তব্ধ রাত্রি ও নির্জ্জন পল্লী না হলে গান করে না। লার্কের ও থ্রাসের গান শুনবে বলে সুধী ভোরে ওঠে। হ্যামষ্টেড হীথ কিম্বা কেনউড্-এ গেলে তার মনে হয় পাখীদের দেশে এসে পৌঁছেছে। মানুষের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর নেই তাদের, তারা গলা ছেড়ে তান ধরেছে, লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, কখনো ঘাসের উপর পায়চারি কর্‌ছে, কখনো গাছের আগডালে দুই পা জোড়া অবস্থায় চুপটি করে বসে নীচের দিকে তাকাচ্ছে আর মাথা নাড়্‌ছে। সুধী যতক্ষণ তাদের সঙ্গ পাচ্ছে ততক্ষণ যেন কি একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার কর্‌ল কিম্বা নূতন রাজ্যে পদার্পণ কর্‌ল এইরূপ বোধ করে উৎফুল্ল হয়।

শাখায় শাখায় অগুন্তি মুকুল, চেরীর শাখায় পেয়ারের শাখায় মে-গাছের শাখায়। শীতের দিনের শাদা বরফের কুচি যেন গলে যাবার সুযোগ পায় নি, দানা বেঁধে বোঁটায় বোঁটায় আটকে রয়েছে। ওক পাইন ফার বীচ বার্চ ইত্যাদি বনস্পতির সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সুধী যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। মানুষের চেয়ে এদের আয়ু, এদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, এদের প্রাণ ও এদের ধৈর্য্য কত বেশী। আহারের জন্য ছুটাছুটি করে চোখে আঁধার দেখাটা কিছু নয়, পরকে মেরে নিজের পথ্য করা ত বর্ব্বরতা। দুশ্চিন্তার বিমর্ষ উদ্বেগে আন্দোলিত সুখে শফরীর মত ফরফরায়িত, অধিকাংশ মানুষের জীবন ত এই। এই সমস্ত বনস্পতি তাদের তুলনায় সব দিক দিয়ে বৃহৎ। সুধীর মনে হয় এভল্যুশন থিওরীর দ্বারা জীবসৃষ্টির কিনারা হয় না। সুধী ভাবে মানুষ বানর বিড়াল বাঘ কোকিল কাক তাল তমাল সকলেই সৃষ্টির আদিতে ছিল, আদি থেকে আছে, অবসান পর্য্যন্ত থাক্‌বে—অবশ্য আদি ও অবসান কেবল কথার কথা, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তার মত সৃষ্টিও অনাদ্যন্ত। মানুষের রূপের এভল্যুশন সুধী মানে, মানুষ যুগে যুগে বিভিন্নরূপী। কিন্তু অ-মানুষ বা অবমানুষ থেকে মানুষ? অসম্ভব।

মে মাস এল। সুধী তার পড়াশুনা কমিয়ে দিল। এমন দিনে ঘরে বদ্ধ থাকা মূর্খতা। সুধী মিউজিয়াম থেকে সকাল সকাল ফেরে, সকাল সকাল খেয়ে মার্সেলকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে বেরয়। তার বাসার অনতিদূরে মস্ত খোলা মাঠ। মাঠ বেয়ে দুজনে অনেক দূর হাঁটে। যেদিন সুধী একলা বেরয় সেদিন হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে গোল্ডার্স গ্রীনের উত্তরাংশ ছাড়িয়ে হাইগেট অবধি চলে যায়। ফের্‌বার সময় বাস্-এ করে হ্যাম্পষ্টেড হীথ চিরে স্পানিয়ার্ডস্ রোড বেয়ে গোল্ডার্স গ্রীন ষ্টেশনে বাস বদল করে বাসায় ফিরে আসে। এক একটি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা যাপন করে তার যে আনন্দ ও যে মুক্তি তাকে বাদল কিম্বা উজ্জয়িনীর হাতে চিঠির পাতায় পৌঁছে দিতে পারলে তাকে দ্বিগুণ উপভোগ কর্‌ত, কিন্তু একজন নিরুদ্দেশ, অপরজন নীরব। হাতের কাছে আছে মার্সেল। ভাবনার ভাগ তাকে দেওয়া চলে না, সেদিক থেকে তার বয়স অল্প, কিন্তু সূর্য্যাস্ত-কালীন আভা যখন সবুজ ঘাসের উপর শেষবার তুলি বুলিয়ে যায় তখন সুধীর চিত্তে যে ভাব জাগে মার্সেলকে সহজেই সেই ভাবের ভাগী করা যায়। উদার উন্মুক্ত আকাশের নিঃসীম নীলিমা উভয়ের দৃষ্টিকে হাতছানি দেয়; উভয়ের বাহু হঠাৎ ডানা হয়ে উঠ্‌বার তাড়না অনুভব করে; উড়ে যাবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ও সেই প্রয়াসের নিশ্চিত নিষ্ফলতা উভয়ের অন্তরকে অবমর্দ্দিত কর্‌তে থাকে। মার্সেল মুখ ফুটে বলে, "দাদা, ঐ দেখ, ওরা কেমন

উড়ে যাচ্ছে।" সুধী বলে, "তোর বুঝি উড়তে ইচ্ছা করছে রে মার্সেল?" মার্সেল উত্তর দেয় না, সোয়ালো বলাকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

বৃষ্টি কদাচ হয়। ইংলণ্ডের বৃষ্টির যা স্বভাব, হুড়মুড় করে হাজির হয় বিনা খবরেরই। মাঠের মধ্যখানে বৃষ্টি নামে। সুধী ও মার্সেল দৌড়াদৌড়ি করে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে গাছতলায় আশ্রয় নেয়। একদিন এক পথিক মোটরকারে দয়া করে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল। তবু তাদের শিক্ষা হয় না, তারা ছাতা না নিয়ে বেরয়। যখন বেরয় তখন তাদের কি কোনো খেয়াল থাকে? শুনতে পেয়েছে কুকু-পাখীর ডাক। মার্সেল বায়না ধরেছে, "দাদা, চল আমরা কুকু দেখ্‌তে যাই।" সুধী বলে, "আচ্ছা। আগে তোর খাওয়া শেষ হোক্।" মার্সেলকে একবার নিয়ে চল্লে ফিরিয়ে আনা শক্ত। সে কুকু দেখ্‌তে হয়ত দেখ্‌ল কাদের কুকুর কিম্বা দেখ্‌ল তার চেয়ে বয়স কিছু বড় কতগুলি ছেলে একটা খালের মধ্যে নেমে বাঁধ দেবার উদ্যোগ করছে, অমনি তার চোখ আটকে গেল, চোখের ব্রেক কষা হলে পায়ের গতিরোধ।

মে-মাসের মায়াজালে বাঁধা পড়ে আণ্ট এলিনর ও ডক্টর মেল্‌বোর্ণ হোয়াইট্‌কেও সুধী ভুল্‌ল। তা বলে তাঁরা তাঁকে ভুল্‌লেন না। কিন্তু তাকে ক্রমাগত অন্যমনস্ক লক্ষ্য করে ঘন ঘন স্মরণ কর্‌লেন না। আর্থারকে এলিনর বল্‌ছিলেন, "ওর বন্ধুটি নিরুদ্দেশ হওয়া অবধি ওর মনটা খারাপ হয়ে গেছে।" এলিনরকে আর্থার বলেছিলেন, "তা হলে ওকে ও দুঃখ ভুলবার নিরিবিলি দাও।" সুধীর কাছে ওঁরা কোনোদিন বাদলের কথা পাড়েন না। ওকে পরিচিত করে দেবার জন্য পার্টিতে নিয়ে যাওয়া কিম্বা পার্টি দেওয়া আণ্ট এলিনর থামিয়ে দিলেন। তবে প্রতি রবিবারে তাকে চায়ে ডাকেন। তখন তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য তাঁর মন উসখুস করে, কিন্তু জিভ জড়িয়ে যায়। তিনি আশা করেন হয়ত সুধী নিজেই কথাটা পাড়বে। কিন্তু সুধী সম্প্রতি নক্ষত্র বীক্ষণে বিভোর আছে। সন্ধ্যা হলে কোন তারা কোন দিকে উঠ্‌বে সেই তার আপরাহ্ণিক ধ্যান। ইংলণ্ডের নৈশ আকাশ এতকাল প্রায়ই মেঘগুণ্ঠিত থাকত। সেই রহস্যময়ী আবরণ উন্মোচন করেছে। তার চোখের তারার সঙ্গে নিজের চোখের তারা মিলিয়ে সুধী কি যে বিস্ময় বোধ করছে, চিরন্তনকে নূতন করে চিন্‌তে পার্‌বার বিস্ময়। দেশ পরের হতে পারে, কিন্তু আকাশ ত সেই আকাশ, সুধীর আশৈশবের তারকাচিহ্নিত নভোমণ্ডল। সে যখন পুরাতন নক্ষত্রবন্ধুদের পরিচয় নিতে নিতে আনন্দে আপ্লুত হয় তখন তার মনে থাকে না যে সে ইংলণ্ডের মাটীতে বসে আছে।

নক্ষত্র বন্ধুরা তাকে মনে করিয়ে দেয়, সে গণনা কল্পনাতীত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী, ভারতবর্ষ তার ঘর, পৃথিবী তার পাড়া। মন তার কাল-পারাবারের পার পায় না, এক একটি নক্ষত্রের আয়ু যদি অমেয় হয়, যদি এক একটি রশ্মির ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসকে লজ্জা দেয়, তবে আমাদের যাঁহা জন্ম তাঁহা মৃত্যু, বাহান্ন আর তিপান্ন। এই জীবন নিয়ে এত ভাবনা! সুধী মাঠের হাওয়া প্রাণ ভরে সেবন করে, ঘ্রাণভরে শোষণ করে। আকাশের আলো অন্ধকার দুই চক্ষু ভরে লুট করে নেয়। সে আছে বিশ্বের মধ্যে, বিশ্ব আসুক তার মধ্যে, বিশ্ব হোক তার অধিবাসী। চিরন্তনকে সে স্বীকার কর্‌লে চিরন্তন কর্‌বে তাকে স্বীকার।

এতদিন রাত্রের মেঘাস্তরণ প্রায়ই সুধীর দৃষ্টিকে ঠুলি পরিয়ে রাখ্‌ত। দিনের ধূমগুণ্ঠিত মুখ দেখ্‌তে পার্‌ত না বলে সুধী গ্রন্থ খুলে মনোজগতের রূপ দেখ্‌ত। মে মাস এসেছে তাপহীন রৌদ্র দীর্ঘদিনব্যাপী, বায়ু পুষ্পগন্ধমধুর বিহঙ্গগীতি-মন্থর, রাত্রি শান্ত গম্ভীর দূরাতিদূর। সুধী আজকাল বাগানের দোলনায় ঘুমায়, দুটো গাছের শাখায় দোলনা খাটিয়ে।

৯

দেশ থেকে যেদিন চিঠি আসে, অর্থাৎ শনিবারের রাত্রে, সুধী পিয়নের পদশব্দ গোণে। আশ্চর্য্যের বিষয় কয়েক সপ্তাহ থেকে বাদলের বাবার চিঠি বন্ধ। বাদলের শ্বশুরের চিঠি ত মার্চের পরে আসে নি, যদিও সুধী প্রত্যেক বার ভেবেছে এইবার আস্‌বে। চিঠি আসুক বা না আসুক চিঠির জবাব দিতে সুধীর কসুর হয় নি, কিন্তু এই

বার হল। বাদলের খবর তাঁরা জান্‌তে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, এতদিনে বোধ করি বাদলের বিদায়স্মৃতি তাঁদের মনে ম্লান হয়ে এসেছে কিম্বা ম্লান হয়েছে বহুদিন, শুধু অভ্যাসের জের চল্‌ছিল। সুধীর দিক থেকেও ওটা ছিল কতক কর্ত্তব্যবোধ কতক অভ্যাস। এক সপ্তাহ কাজে ফাঁকি দিয়ে সুধী দেখ্‌ল এই ভাল। চিঠি পেলে চিঠির উত্তর লিখ্‌ব। ওঁরা যে আমার চিঠির প্রত্যাশা করছেন তার প্রমাণ ত আগে পাই।

দিন কয়েক বাদে সুধীর নামে এল এক cable. যোগানন্দ পাঠিয়েছেন কোয়েটা থেকে। "Where is Badal? Why Times advertisement?"

সুধী এর কি জবাব দেবে চিন্তা করে স্থির কর্‌তে পার্‌ল না। অথচ টেলিগ্রামের উত্তর টেলিগ্রামে না দিলে যোগানন্দের প্রতীক্ষা পীড়াবহ হবে। বাদলটা যে মানুষকে এমন বিপদে ফেল্‌বে কে জান্‌ত। সুধী বাদলের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যাদের ঠিকানা জান্‌ত সবাইকে ফোন কর্‌ল, বাড়ীতে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা কর্‌ল। মিসেস্ উইল্‌স উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সুধীকে প্রার্থনা কর্‌লেন বাদলের সংবাদ পেলে জানাতে। কলিন্স বল্ল, "ওর জন্য একখানা নতুন বই আনিয়ে রেখেছি, ও এসে নিয়ে যায় না কেন তাই দিন কয়েক থেকে ভাব্‌ছি।" মিলফোর্ড বল্লেন, "ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবার পর থেকে ওর খবর রাখি নি। ওকে আমার আপশোষ জানাবেন।" মিথিলেশ-কুমারী বল্লেন, "কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেনি ত?"

অগত্যা সুধী যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা একখানা খামে ভর্ত্তি করে বাদলের ব্যাঙ্কের ঠিকানায় রওয়ানা করে দিল। এবং যোগানন্দকে তার কর্‌ল, "Badal's private address unknown. Making enquiries."

ওর চেয়ে ভাল কিছু বলা যায় না। যাই বলুক সন্দেহ তাঁর মনে জন্মাবেই। সন্দেহ জন্মাক ক্ষতি নেই, আশঙ্কা দূর হলে হল। আণ্ট এলিনরের মত যোগানন্দও বোধহয় ভাব্‌বেন নারীঘটিত কোনো রহস্য আছে। কিন্তু বিদেশে ছেলে পাঠিয়ে কোন্ গুরুজন ও-বিষয়ে নিঃসংশয়? কিন্তু এমন আশঙ্কা মনে স্থান দেবেন না যে বাদল অসুস্থ হয়ে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে।

যোগানন্দ টাইম্‌স্ পড়ে চুপ ক'রে বসে থাকেন নি, নিশ্চয় মহিমচন্দ্রকে তার করেছেন কিম্বা চিঠি লিখেছেন। উজ্জয়িনী এ ব্যাপার জান্‌তে পেরেছে। সুধীর চিঠির সঙ্গে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন মিলিয়ে পড়্‌লে তাঁরা চিঠিকে অবিশ্বাস কর্‌বেন ও বিজ্ঞাপনের নানা অর্থ কর্‌বেন। দিন দুই তিন পরে তাঁদের cable উপস্থিত হবে। ততদিনে যদি বাদল যোগানন্দের প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে সুধী রক্ষা পায়, নতুবা কৈফিয়ৎ দিতে হবে সুধীকেই।

বাদল যে লণ্ডনেই আছে এ সম্বন্ধে সুধীর সন্দেহ ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ক'দিন লুকোচুরি খেল্‌তে পার্‌বে, দেখা না করে, কথা না বলে তর্কে না জিতে ঘরে খিল দিয়ে রইবে? পাগ্‌লা, কি একটা খেয়াল চেপেছে মাথায়, তার দুর্ভোগ গিয়ে পৌঁছচ্ছে বেলুচিস্থানে ও বিহারে। একজন মানুষ ইচ্ছা কর্‌লে ক'জন মানুষকে কষ্ট দিতে পারে এই বুঝি বাদল পরীক্ষা কর্‌ছে?

বাদল বিজ্ঞাপন দিল, "BADAL TO CAPTAIN GAPTA.—CONCENTRATING ON GREAT THOUGHTS IN SECRET RETREAT."

সুধী বাদলকে মনে মনে বল্ল, "সারাজীবন ত নিভৃত চিন্তা করে আস্‌ছিস্, কেই বা তোকে বিক্ষিপ্ত করেছে। বাড়ীতে তোর পড়ার ঘর গিরিগুহার মত বিজন ছিল। এদেশে এসে প্রথমটা হৈ হৈ করে বেড়ালি, এখন প্রতি-ক্রিয়াবশতঃ কোন্ গৃহকক্ষে বসে আগুন পোহাচ্ছিস্, এই মে মাসে!"

বাদলকে সুধী চিন্‌ত। ওর যা জেদ তা শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখ্‌বে। ওর যা খেয়াল তা আপনা থেকে না ছুটলে পরের পরামর্শে ফুল্‌তে থাক্‌বে—বাঁধ দিলে পাগলা-ঝোরার জলের মত। দিন পনের পরে হয়ত টেলিফোন ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌বে কিম্বা দরজার বেল ক্রিং ক্রিং ধ্বনি কর্‌বে, বাদল ঘরে ঢুকে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে পরিক্রমা কর্‌তে কর্‌তে বল্‌বে, "কি বল্‌ছিলুম? সুধী-দা, কি বল্‌ছিলুম?"

সেই বাদল! দু'মাস তার সঙ্গে দেখা হয় নি। এক সহরে থেকেও তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ নেই, চিঠি লিখ্‌লে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় দু' লাইন। দুঃখের কথা কাকে জানাবে। সুধী স্বভাবত চাপা। মনের দুঃখ মনে চাপ্‌ল। আকাশের দিকে চেয়ে ভুলে গেল। দিনের পর দিন বর্ষণবিহীন, নীলোজ্জ্বল, দিগন্ত-প্রসারী। দৃষ্টি যত গভীরে নাম্‌তে পারে তত গভীর। সুধী কখনো আশা কর্‌তে পারে নি, ভাব্‌তে পারে নি, এমন আশ্চর্য্য ঋতুপরিবর্ত্তন ঘট্‌বে! ঋতু আসে আর যায় কিন্তু টিপ টিপ বৃষ্টির বিরাম হয় না। এই ত লোকে বল্‌ত ও সুধী জান্‌ত।

দিনগুলি এত রঙ্গিন এত সুগন্ধি এত উজ্জ্বল এত পূর্ণ।

সুধী আহারকাল ভুলে যায়। কয়েকবার অপদস্থ হবার পর, মাদামকে বল্ল, "আমার জন্য কিছু তৈরী রেখো না, আমি যখন ফিরব তখন নিজে তৈরি করে নেব।" রুটি মাখনের স্যাণ্ডউইচ নিয়ে কোনো কোনো দিন বেরয়, যতক্ষণ ও যতদূর পারে হাঁটে, মাঠে কিম্বা হ্রদ নদীর ধারে শরীরকে বিশ্রাম ও চক্ষুকে স্বাধীনতা দেয়, তার পরে বাস কিম্বা ট্রেন ধরে বাসায় ফেরে। মার্সেলের কাছে গল্প করে, "আজ এতটুকুন্ একটি পাখী দেখে এসেছি, মার্সেল। ওকে বুঝি Tit বলে।" মার্সেল ঠোঁট ফুলিয়ে চুপ করে থাকে। সুধী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় নি বলে তার অভিমান হয়েছে। সুজেৎ তার গালে ঠোনা মেরে মানভঞ্জনের চেষ্টা করে। মার্সেল জানোয়ারের মত দাঁত খিঁচিয়ে নখ দিয়ে সুজেতের জামা ছিঁড়ে দেয়, তবু কথাটি বলে না। তখন সুধী দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণ করে। আণ্ট এগ্নিস খবর পেলে তাকে নোবেল পীস্ প্রাইজ পাইয়ে দিতেন। কিন্তু মাদাম তার অদ্ভুত ইংরেজীতে বলে, "ত্যাঙ্ক্ ইউ, মিস্তার সাক্রাবার্ত্তী।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

শিশু-সাহিত্যে ভূতের গল্প

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

ছেলেরা কেন বুড়োরাও ভূতের গল্প শুনিতে ভালবাসে। সেই জন্যই বোধ হয় শিশু-সাহিত্যে এবং বড়দের মজলিসে ভূতের গল্প পাড়িয়া বসিলে আর কেহ নড়িতে চাহে না।

ভূত আছে কি নাই, ঠিক করিয়া বলা শক্ত। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যাহাকে ভূত বলিয়া মনে করা যাইতেছিল তাহা বাস্তবিক ভূত নয়, অন্য-একটা-কিছু।

কিন্তু অনেকেই ভূতে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, ভূতের ভয় মনের মধ্যে পোষণ করে। হয় ত কোন দিন ভূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইল না, তবুও ভূতের ভয়ে জড়সড় হইতে অনেক মানুষকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকের বিশ্বাস যে, শিশু জন্মিবার পর, অন্যের দেখিয়া ভয় করিতে শেখে। অর্থাৎ ভয়ের আদি-উৎস অনুকরণ, তাহার পূর্ব্বে ভয়ের কোন চিহ্নই তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে থাকে না। কিন্তু অনেকে আবার এ কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁরা বলেন, শিশু-মস্তিষ্কে ভয়ের স্থান সুপ্তভাবে থাকে, সেটি পিতা-মাতার দেহ হইতে সে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে। মানসিক-শক্তি বিকশিত হইবার পূর্ব্বে শিশুকে সর্ব্বপ্রথমেই ভয় পাইতে দেখিয়া অনেকে এমন কথা মনে করিয়া থাকেন।

কথা হইতেছে ভয় লইয়া। ভয় করা মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিহিত। তবে সকল মানুষের কিছু সমান ভয় নয়। সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস, যে-সব জাতি স্বাধীন তারা পরাধীন জাতির চেয়ে সাহসী।

শুনিতে পাওয়া যায় যে ইংরাজেরা শিশুদের জুজুর ভয় দেখায় না। শিশুদের ভয় পাওয়ার অভ্যাস, কি প্রয়োজন থাকিতে পারে, এমন কথা উহারা বিশ্বাস করে না। বরঞ্চ উল্টো বিশ্বাসই করে।

কিন্তু আমাদের দেশে শিশুকে শাসন করিবার, ভাল-মানুষ তৈরী করিবার সহজ-পন্থা হইতেছে ভয় দেখাইয়া। পাঠশালায় বেত ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। অবশ্য একটু সেকেলে-ধরণের শিক্ষকদিগকে আক্ষেপ করিতেও শুনিতে পাওয়া যাইতে পারে যে, আর লেখাপড়া হওয়া সম্ভব নয়। না মারিলে কি ভয় থাকে? কর্তৃপক্ষরা মার বন্ধ করিয়া কি কায ভাল করিতেছেন?

সেদিন একজন প্রেমচাঁদ স্কলারের সহিত কথা কহিয়া মনে বড় বিস্ময় মানিয়াছিলাম।

তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনার অঙ্ক-শাস্ত্রে অতবড় উন্নতির কোন একটা কারণ নিশ্চয় আছে; আচ্ছা, আপনি নিজে কি অনুমান করেন?

ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া, একটুও না ভাবিয়া বলিলেন, ধনঞ্জয়, প্রহার!

সেকি? আপনি প্রহারে বিশ্বাস করেন?

তিনি অতি সংক্ষেপে নিজের গল্পটি বলিলেন। সেটি পাঠকের ভাল লাগিতে পারে মনে করিয়া, নীচে দিতেছি।

"তখন বোধ হয় আমার বয়স পাঁচ ছয়। বাড়ীতে বাবা কাকা এবং মায়ের ঘোর চিন্তার কারণ হ'লো যে আমি একটা গণ্ড-মূর্খ হব। অবশ্য সে-বয়সে বোধ হয় আমি দু'দশখানা বই ছিঁড়েছি, আর শ্লেট যে কত ভেঙ্গেচি তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মনে আছে, বাবা কাকা পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, আমাকে আর কলকতায় রাখা হবে না। দেশে গুরুমশাইএর জিম্মা করে দিয়ে আসা হবে। সেই গুরুমশাইএর কাছে বাবা কাকা দু'জনেই প'ড়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়-গুণ ছিল যে, তিনি শিশুকে মমতা ক'রে মেরে, কি না-মেরে, অযথা নাই-দিয়ে নষ্ট ক'রে ফেল্‌তেন না।

তাঁর নাম শুনে মা প্রায় আঁৎকে উঠ্‌লেন: বল্লেন, থাক্‌গে ও জন্ম-জন্ম মুখ্‌খু হয়ে।

সেকালের কর্ত্তারা স্ত্রীবুদ্ধিকে ভয়ঙ্করী মনে করতেন।

২

অবশেষে আমি দেশেই গেলুম। আর সেই পৈতৃক গুরু-মশাইএর কাছে বেধড়ক মার খেয়ে সোজা হ'য়ে গেলুম। যেদিন বুঝলুম, হয় মৃত্যু, নয় অঙ্ক ক'ষতেই পারা—সেদিন থেকে অঙ্কেতে এমন মন দিলুম যে,সে-মন আজও কেন্দ্রচ্যুত হয় নি।

গুরুমশাইকে বড় হ'য়ে দেখেছি; তিনি খুব স্নেহ-পরায়ণ—কোমল মনের মানুষ ছিলেন। মারটা কর্ত্তব্য মনে ক'রেই দিতেন। আর তিনি মনে করতেন, অঙ্কতে মন লাগিয়ে দিতে পারলেই লেখাপড়ার চোদ্দ আনা কাজ হ'য়ে গেল।"

উত্তরে বলিলাম, নিশ্চয়ই জানেন যে, ফরাসী দেশে ইস্কুলে ছেলে ঠেঙ্গালে শিক্ষকের জেল, কি জরিমানা হয়?

মাথা নাড়িয়া প্রেমচাঁদ বলিলেন, তা হোক্‌; কিন্তু মার অমোঘ! অন্ততপক্ষে আমার পক্ষে একথা বর্ণে বর্ণে সত্য!

শিক্ষা-শাসনে মারের স্থান আজকাল নাই বলিলেই হয়। শিশুর অক্ষমতাকে মারের দ্বারা পূরণ করিবার চেষ্টা বা প্রস্তাব সমর্থন করিবার যুগ গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করার ব্যাপারেও আমরা বুঝিয়াছি যে, ঐ উপায়টি প্রকৃষ্ট, কিম্বা একমাত্র নহে। শুধু তাই নয়, ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিলে সময়ে সময়ে উল্টা ফলই ফলিয়া থাকে।

এই ব্যাপার নিত্য-নৈমিত্তিকের, মনোযোগ দিয়া পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার সত্যটি উপলব্ধি করা শক্ত নয়।

আজকাল শিশু-সাহিত্যের প্রতি বহু সক্ষম লেখক মন দিয়াছেন। আশা করা যায় যে অল্প দিনের মধ্যে আমাদের শিশু-সাহিত্য পুষ্ট হইয়া উঠিবে।

জাতি-গঠনের পক্ষে শিশু-সাহিত্য এবং শিক্ষিতা মাতার যে কতবড় প্রয়োজন তাহা তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দিবার দরকার হয় না। বড় সত্যগুলির বিশেষত্ব যে সেগুলি প্রমাণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না।

শিক্ষিতা মাতার কথা বলিতে এডিসনের মার কথা সহসা মনে পড়িয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি শিক্ষকতা করিতেন।

এডিসনকে যে-বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠান হয় সেখানকার গুরুমশাই তাঁহাকে নির্ব্বোধের অজুহাতে তাড়াইয়া দেন।

এডিসনের জননী পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কি দাঁড়াইয়াছে তাহার সাক্ষ্য সমস্ত পৃথিবী দিতে পারে।

শিশুর প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক যে তাহার মাতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু সকল জননীর এত অবসর নাই যে শিশুকে দীর্ঘদিন মুখে মুখে শিক্ষা দেন। তাই শিশুকে পুস্তক হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতেই হয়।

বর্ণ-পরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনো প্রায় কিছুই হয় নাই। তাহার প্রমাণ ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। চার পাঁচ টাকা মাসিক বেতন দিয়া যে গৃহ-শিক্ষক শিশু-অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট পার হইতে পারেন নাই। শিক্ষকতা যে একটা প্রকাণ্ড বিদ্যা সে কথা উপলব্ধি করিবার বোধ পর্য্যন্ত ইঁহাদের হয় কি না সন্দেহ।

আমাদের শিশু-শিক্ষা যথেষ্ট অবহেলিত অবস্থায় রহিয়াছে; সেটিকে উন্নত করিয়া তোলা বোধকরি আমাদের সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

শিশু-সাহিত্যকে মনোরম করিতে গিয়া তাহাতে ভূতের গল্পের সমাবেশ হইয়া থাকে।

শিশুর কল্পনা শক্তি বাড়াইয়া তুলিবার জন্য পরীর গল্প কি উদ্ভট গল্প মন্দ নয়; কিন্তু ভূতের গল্পের সাহায্যে এই কায করিলে একটা মুস্কিল হয় যে, শিশু স্বভাবতই ভীরু হইতে থাকে।

মানুষের চরিত্রে ভয় খুব বড় কার্য্যকরী উপাদান। শিশুরা মিথ্যা বলে, তাহার অন্যতম কারণ ভয়। ভয় হইতে শিশু চরিত্রে এমন অনেক অবাঞ্ছনীয় উপদ্রব আসে যাহা অবশেষে আর কিছুতেই দূর হয় না—মজ্জাগত হইয়া পড়ে।

নির্ভীকতা যে মানবচরিত্রের একটি দুর্ল্লভ গুণ সে বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। শিশুকে নির্ভীক করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা, সত্যই আমাদের দেশে এখনো আসে নাই।

ভূতের গল্পের সপক্ষে কি বলিবার থাকিতে পারে তাহা আমার জানা নাই। যে-সব লেখক আমাদের শিশু-সাহিত্যে ভূতের গল্প লিখিতেছেন তাঁহারা দয়া করিয়া যদি ইহার পক্ষের কথা লইয়া আলোচনা করেন তাহা হইলে এই সম্পর্কে আমরা একটা সহজ নিষ্পত্তিতে আসিতে পারি।

আশা করি, আমরা ইহা হইতে বঞ্চিত হইব না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে মানুষকে সদুপদেশ দিয়া কখনো ফললাভ হয় না। সৎ পরামর্শ কিছুতেই কেহ শুনেনা। কিন্তু সত্য বলিয়াই দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সেই ঘটনাটা বলিব।

ঠাকুর্দ্দা দাঁত বাহির করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন, পুঁটু বিস্তর পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া আদেশ পালন করিল, কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে আমার পরিতাপের অবধি রহিল না। সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া কেবলি তিরস্কার করিতে লাগিল যে কে ইহারা যে বিদেশে চাকুরি করিয়া বহুদুঃখে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি তাহাই দিয়া দিব? ঝোঁকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বলিয়াই দাতাকর্ণ-গিরি করিতেই হইবে তাহার অর্থ কি? কোথাকার কে এই মেয়েটা গাড়ীতে অযাচিত প্যাঁড়া এবং দই খাওয়াইয়া আমাকে ত আচ্ছা ফাঁদে ফেলিয়াছে। একটা ফাঁস কাটিতে আর একটা ফাঁসে জড়াইয়া পড়িলাম। পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল, এবং এই নিরীহ মেয়েটার প্রতি ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। আর ঐ শয়তান ঠাকুর্দ্দা। ইচ্ছা করিতে লাগিল লোকটা যেন না আর বাড়ী পৌঁছায়, রাস্তাতেই সর্দ্দি-গর্ম্মী হইয়া মারা যায়। কিন্তু সে আশা ভিত্তি-হীন। নিশ্চয় জানি লোকটা কিছুতেই মরিবে না এবং একবার যখন আমার বাসার ঠিকানা জানিয়াছে তখন আবার আসিবে, এবং যেমন করিয়া পারে টাকা আদায় করিবে। হয়ত, এবার সেই হাকিম-পিসেমশায়কে সঙ্গে করিয়া আনিবে। এক উপায়—যঃ পলায়তি। টিকিট কিনিতে গেলাম, কিন্তু জাহাজে স্থানাভাব,—সমস্ত টিকিট পূর্ব্বাহ্নেই বিক্রী হইয়া গেছে, সুতরাং পরের মেলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সে ছয়-সাত দিনের ব্যাপার।

আর এক পন্থা বাসা বদল করা। ঠাকুর্দ্দা না খুঁজিয়া পায়। কিন্তু এমন একটি ভালো জায়গা এতশীঘ্র পাওয়াই বা যায় কোথায়? কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে ভালো-মন্দর প্রশ্ন অবান্তর,—যথারণ্যং তথা গৃহম্,—শিকারীর হাত হইতে প্রাণ বাঁচানোর দায়।

ভয় ছিল, আমার গোপন উদ্বেগটা পাছে রতনের চোখে পড়ে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে তাহার নড়িবার গা নাই, কাশীর চেয়ে কলিকাতা তাহার বেশি মনে ধরিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, চিঠির জবাব নিয়ে কি তুমি কালই যেতে চাইচো রতন?

রতন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আজ্ঞে না। আজ দুপুরে মাকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে দিলাম আমার দু-পাঁচ দিন দেরি হবে। মরা-সোসাইটি, জ্যান্ত-সোসাইটি না দেখে আর ফিরচিনে। আবার কবে কোন্ কালে আসা হবে তারতো কোন ঠিক নেই।

বলিলাম, কিন্তু তিনি তো উদ্বিগ্ন হতে পারেন—

আজ্ঞে, না। গাড়ীর ধকলটা এখনো কাটিয়ে উঠ্‌তে পারিনি সেকথা লিখে দিয়েছি।

কিন্তু চিঠির জবাবটা—

আজ্ঞে, দিন্‌না। কালই রেজেষ্ট্রি করে পাঠিয়ে দেবো'খন। সে বাড়ীতে মা'র চিঠি যমে খুল্‌তেও সাহস করবেনা।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নাপিত ব্যাটার কাছে কোন ফন্দিই খাটিল না। সব প্রশ্নই নাকোচ্ করিয়া দিল।

যাবার সময় ঠাকুদ্দা টাকার কথাটা প্রচার করিয়াই গেছেন। তাহা চিত্তের ঔদার্য্য অথবা সারল্যের প্রাচুর্য্য এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। তিনি সাক্ষী রাখিয়া গেছেন।

রতন ঠিক সেই কথাই পাড়িল, বলিল, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি বাবু।

কি কথা রতন?

রতন একটু দ্বিধা করিয়া বলিল, আড়াই হাজার টাকা তো নিতান্ত তুচ্ছ নয় বাবু—ওরা কে যে ওদের মেয়ের বিয়েতে এতটা টাকা আপনি খামোকা দান করবেন বল্লেন। তাছাড়া, ঠাকুর্দ্দাই হোক্ আর যেই হোক বুড়োটা লোক ভালো নয়। ওকে বলাটা ভালো হয়নি বাবু।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া যেমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম, মনের মধ্যে তেম্‌নি জোর পাইলাম।

তথাপি কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস দিয়া কহিলাম, বলাটা ভালো হয়নি, না রতন?

রতন বলিল, নিশ্চয় ভালো হয়নি বাবু। টাকাটা তো কম নয়। তাছাড়া, কিসের জন্যে বলুন তো?

ঠিক ত! কহিলাম, তা'হলে না দিলেই হবে।

রতন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সে ছাড়বে কেন?

কহিলাম, না ছেড়ে করবে কি? লেখা-পড়া করে তো দিইনি। আর, তখন আমি এখানে থাক্‌বো কি বর্ম্মায় চলে যাবো তাই বা কে জানে!

রতন এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, বলিল, বুড়োকে আপনি চিন্‌তে পারেননি বাবু, ওদের লজ্জাসরম মান-অপমান নেই। কেঁদে-কেটে ভিক্ষে করেই হোক্, আর ভয় দেখিয়ে জুলুম করেই হোক্ টাকা ও নেবেই। আপনার দেখা না পেলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ও কাশী গিয়ে মার কাছ থেকে আদায় করে ছাড়বে। মা বড় লজ্জা পাবেন বাবু, ও মৎলবে কাজ নেই।

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। রতন আমার চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। অর্থহীন আকস্মিক-করুণার হঠ-কারিতার জরিমানা আমাকে দিতেই হইবে। নিস্তার নাই।

রতন পাড়াগাঁয়ের ঠাকুর্দ্দাকে চিনিতে ভুল করে নাই, চতুর্থ দিবসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল আশা করিয়াছিলাম এবার নিশ্চয় হাকিম-পিশেমশাই সঙ্গে আসিবেন,—কিন্তু একাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, দশখানা গ্রামের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে দাদা, সবাই বল্‌চে, কলিকালে এমন কথনো শোনা যায় না। গরিব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় এভাবে উদ্ধার করে দিতে কেউ কথনো চোখে দেখেনি। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হও।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বিয়ে কবে?

এই মাসের পঁচিশে স্থির হয়েছে, মধ্যে কেবল দশটা দিন বাকি। কাল পাকা দেখা, আশীর্ব্বাদ,—বেলা তিনটের

পরে বারবেলা, এর ভেতরেই শুভকর্ম্ম সমাধা করে নিতে হবে। কিন্তু তুমি না গেলে বরঞ্চ সব বন্ধ থাক্‌বে, তবু কিছুই হতে পারবেনা। এই নাও তোমার পুঁটুর চিঠি,—সে নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছে। কিন্তু তাও বলি দাদা, যে রত্ন তুমি স্বেচ্ছায় হারালে তার জোড়া কথনো পাবেনা। এই বলিয়া তিনি ভাঁজ-করা এক খণ্ড হল্‌দে রঙের কাগজ আমার হাতে দিলেন।

কৌতূহল বশতঃ চিঠিখানা পড়িবার চেষ্টা করিলাম, ঠাকুর্দ্দা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কালিদাসের পয়সা থাক্‌লে হবে কি একেবারে ছোট লোক,—চাষার। চোখের চাম্‌ড়া বলে তার কোন বালাই নেই। কালই টাকা-কড়ি সব নগদ চুকিয়ে দিতে হবে,—গহনা-পত্র নিজের স্যাক্‌রা দিয়ে গড়িয়ে নেবে। ওর কাউকে বিশ্বাস নেই,—এমন কি, আমাকে পর্য্যন্ত না।

লোকটার মস্ত দোষ। ঠাকুর্দ্দাকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না। আশ্চর্য্য।

পুঁটু স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছে। একপাতা দুপাতা নয়, চার পাতা জোড়া ঠাস বুনানি। চার পাতাই সকাতর মিনতি। ট্রেনে রাঙাদিদি বলিয়াছিলেন আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। কেবল আজকালকার নয়, সর্ব্বকালের নাটক-নভেল হার মানে তাহা অস্বীকার করিব না। এই লেখার জোরে নন্দরাণীর স্বামী চৌদ্দ দিনের ছুটি লইয়া সাত দিনের দিন আসিয়া হাজির হইয়াছিল। কথাটা বিশ্বাস হইল।

অতএব, আমিও পরদিন সকালেই যাত্রা করিলাম। টাকাটা সত্যই সঙ্গে লইয়াছি, এবং ভাঙ্‌-চুর করিয়া প্রতারণা করিতেছিনা—ঠাকুর্দ্দা নিজের চক্ষে তাহা যাচাই করিয়া লইলেন, বলিলেন, পথ চল্‌বে জেনে, টাকা নেবে গুণে,—আমরা দেবতা নইতো রে ভাই, মানুষ,—ভুল হতে কতক্ষণ!

রতন কাল রাত্রেই কাশী রওনা হইয়া গেছে। তাহার হাতে চিঠির জবাব দিয়াছি, লিখিয়া দিয়াছি,—তথাস্তু। ঠিকানা দিতে পারি নাই ঠিক নাই বলিয়া। এ ত্রুটি যেন সে নিজ গুণে ক্ষমা করে এ প্রার্থনাও জানাইয়াছি।

যথাসময়ে গ্রামে পৌঁছিলাম, বাড়ীশুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা ঘুচিল। যত্ন ও সমাদর যাহা পাইলাম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অভিধানে নাই।

পাকা-দেখা ও আশীর্ব্বাদ করার উপলক্ষে কালিদাস বাবুর সহিত পরিচয় হইল। লোকটা যেমন রুক্ষ মেজাজের তেম্‌নি দাম্ভিক। তাঁহার অনেক টাকা এই কথাটা সকলকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করানো ছাড়া জগতে তাঁহার যে আর কোন কর্ত্তব্য আছে মনে হয় না। সমস্ত স্বোপার্জ্জিত, সদম্ভে বলিলেন, মশাই, বরাত আমি মানি নে, যা' কোরব তা' নিজের বাহুবলে। দেব্‌-দেবতার অনুগ্রহও আমি ভিক্ষে করি নে। আমি বলি দৈবের দোহাই দেয় কাপুরুষে।

বড়লোক বলিয়া এবং ছোটখাটো তালুক-দার বলিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন, এবং অধিকাংশেরই বোধকরি তিনি মহাজন—এবং দুর্দ্দান্ত মহাজন—অতএব সকলেই একবাক্যে তাঁহার কথাগুলা স্বীকার করিয়া লইলেন। তর্করত্ন মহাশয় কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, এবং আশে পাশে হইতে দুই-একটা পুরাতন কাহিনীরও সূত্রপাত হইল।

অপরিচিত ও সামান্য ব্যক্তি অনুমানে তিনি অবহেলা-ভরে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। টাকার শোকে আমার অন্তরটা তখন পুড়িতেছিল, দৃষ্টিটা সহ্য হইল না, বলিলাম, বাহুবল আপনার কি পরিমাণ আছে জানি নে, কিন্তু টাকা উপায়ের ব্যাপারে দৈব এবং বরাতের জোর যে যথেষ্ট প্রবল তা' আমিও স্বীকার করি।

তার মানে?

বলিলাম, মানে আমি নিজেই। বরকেও চিনিনে কনেকেও না, অথচ, টাকা যাচ্চে আমার এবং সে ঢুক্‌চে গিয়ে আপনার সিন্দুকে; একে বরাত বলে না তো বলে

কা'কে? এই বললেন, আপনি দেব-দেবতারও অনুগ্রহ নেন না, কিন্তু আপনার ছেলের হাতের আঙটি থেকে বৌয়ের গলার হার পর্য্যন্ত তৈরি হবে যে আমারই অনুগ্রহের দানে। হয় ত, বৌ-ভাতের খাওয়ানোটা পর্য্যন্ত আমাকেই যোগাতে হবে।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও বোধকরি সকলে এত বিচলিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। ঠাকুর্দ্দা কি-সব বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই সুস্পষ্ট বা সুব্যক্ত হইয়া উঠিল না। কালিদাসবাবু ক্রোধে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনি টাকা দিচ্ছেন তা' আমি জান্‌বো কি ক'রে? এবং দিচ্চেনই বা কেন?

বলিলাম, কেন দিচ্চি সে আপনি বুঝ্‌বেন না, আপনাকে বোঝাতেও চাই নে। কিন্তু, দেশশুদ্ধ সকলে শুনেচে আমি টাকা দিচ্চি, কেবল আপনিই শোনেন নি? মেয়ের মা আপনাদের বাড়ী-সুদ্ধ সকলের হাতে-পায়ে ধরেচে, কিন্তু আপনি বি-এ পাশ-করা ছেলের দাম আড়াই হাজারের এক পয়সা কম করতে রাজি হননি। মেয়ের বাপ চল্লিশ টাকা মাইনের চাক্‌রি করে, তার চল্লিশটা পয়সা দেবার শক্তি নেই,—এটা ভেবে দেখেন নি আপনার ছেলে কেনবার এত টাকা হঠাৎ তারা পায় কোথায়? যাই হোক্, ছেলে-বেচা টাকা অনেকেই নেয়, আপনি নিলেও দোষ নেই, কিন্তু এর পরে গাঁয়ের লোককে বাড়ীতে ডেকে টাকার অহঙ্কার আর করবেন না। এবং, একজন বাইরের লোকের ভিক্ষের দানে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন এ কথাটাও মনে রাখ্‌বেন।

উদ্বেগ ও ভয়ে সকলের মুখ কালীবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধহয় সবাই ভাবিলেন এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিবে, এবং ফটক বন্ধ করিয়া সকলকে লাঠি-পেটা না করিয়া কালিদাসবাবু আর কাহাকেও ঘরে ফিরিতে দিবেন না।

কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, টাকা আমি নেবো না।

বলিলাম, তার মানে ছেলের বিয়ে আপনি এখানে দেবেন না।

কলিদাসবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নয়। আমি কথা দিয়েছি বিবাহ দেবো—তার নড়-চড় হবে না। কালিদাস মুখুয্যে কথার খেলাপ করে না। আপনার নামটি কি?

ঠাকুর্দ্দা বাগ্র কণ্ঠে আমার পরিচয় দিলেন। কালিদাসবাবু চিনিতে পারিয়া কহিলেন, ওঃ—তাই বটে। এর বাপের সঙ্গেই না একবার আমার ভয়ানক ফৌজদারী মাম্‌লা বাধে?

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ,—কিছুই আপনি বিস্মৃত হ'ন না। এ তারই ছেলে বটে, সম্পর্কে আমারও নাতি হয়।

কালিদাস বাবু প্রসন্ন কণ্ঠে বলিলেন, তা' হোক্। আমার বড় ছেলে বেঁচে থাক্‌লে এম্‌নি বয়সই হোতো। শশধরের বিয়েতে এসো বাবা। আমার পক্ষ থেকে সেদিন তোমার নিমন্ত্রণ রইলো।

শশধর উপস্থিত ছিল, সে শুধু সকৃতজ্ঞ চক্ষে আমার প্রতি একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় মুখখানি আনত করিল।

আমি উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলাম, বলিলাম, যেখানেই থাকি অন্ততঃ বৌ-ভাতের দিন এসে নব-বধূর হাতের অন্ন খেয়ে যাবো। কিন্তু অনেক রূঢ় কথা বলেচি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

কালিদাসবাবু বলিলেন, রূঢ় কথা যে বলেচো তা সত্যি, কিন্তু আমি ক্ষমাও করেচি। কিন্তু উঠ্‌লে চল্‌বে না শ্রীকান্ত, শুভ-কর্ম্ম উপলক্ষে সামান্য-কিছু খাবার আয়োজন করে রেখেচি তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

যে আজ্ঞে তাই হবে, বলিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলাম।

সেদিন পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সভাস্থ অভ্যাগতগণের খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে সদুপদেশ সম্বন্ধে যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম, পুঁটুর বিবাহটা তাহারই একটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ। জগতে এই একটি

মাত্রই নিজের চোখে দেখিয়াছি। কারণ, নিঃসম্পর্কীয়, অপরিচিত হতভাগ্য মেয়ের-বাপের কান মলিলেই যেখানে টাকা আদায় হয় সেখানে বৈষ্ণব সাজিয়া হাতজোড় করিয়া বাঘের গ্রাস হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। নিষ্ঠুর নির্দ্দয় বলিয়া গালিগালাজ করিয়া সমাজ ও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্ষোভ কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে কিন্তু প্রতীকার মিলে না। কারণ, প্রতীকার বরের বাপের হাতে নাই, সে আছে মেয়ের বাপেরই নিজের হাতে।

৫

গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুসি হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারি রুক্ষ, বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমি বেটিদের আড্ডায়। কাল থেকে তো ঘরে আসাই হয় নি।

সে কি কথা নবীন! বোষ্টমি এলো আবার কোথা থেকে?

একটা? এক পাল এসে জুটেছে!

কোথা থাকে তারা?

ঐ তো মুরারিপুরের আখড়ায়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরোদাস বাবাজী মলো তার যায়গায় এসে জুটলো এক ছোক্‌রা বৈরিগী, তার গণ্ডা চারেক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরিগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব,—সেখানেই তো প্রায় থাকেন।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু তো মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাক্‌তে দেবে কেন?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐ সব আউলে-বাউলে গুলোর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে না কি? ওরা জাত-জন্ম কিছুই মানে না, যে-কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাচ-বিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ'সাত দিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলে নি?

নবীন বলিল, বল্‌লে যে কম্‌লি-লতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়তো। সে ক'য়দিন বাবু আখ্‌ড়ার কাছেও যায় নি। আর যাই আপনি চলে গেলেন বাবুও অম্‌নি খাতা কাগজ কলম নিয়ে আখড়ায় গিয়ে ঢুক্‌লেন।

প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিলাম দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধ-হস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমল-লতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী,—এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়। বৈষ্ণব সেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকা কড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্য পরম্পরায় বৈষ্ণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, বলিলাম, নবীন, আখড়াটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারবে?

নবীন ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, বলিল, আমার অনেক কাজ। আর আপনিও তো এই দেশের মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধ কোশের বেশি নয়, ঐ সুমুখের রাস্তা ধরে সিধে উত্তর মুখো চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সাম্‌নের দীঘির পাড়ে বকুল তলায় বৃন্দাবন লীলা চল্‌চে, দূর থেকেই আওয়াজ কানে যাবে,—ভাব্‌তে হবে না।

আমার যাওয়ার প্রস্তাবটা নবীন গোড়াতেই পছন্দ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয় সেখানে,—কীর্ত্তন?

নবীন বলিল, হাঁ, দিন রাত। খঞ্জনি খর্ত্তালের কামাই নেই।

হাসিয়া বলিলাম, সে ভালোই নবীন। যাই, গহরকে ধরে আনিগে।

এবার নবীনও হাসিল, বলিল, হাঁ যান্। কিন্তু দেখবেন কমলি-লতার কেত্তন শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না।

দেখি, কি হয়। এই বলিয়া হাসিয়া কমল-লতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশ্যে অপরাহ্ণ বেলায় যাত্রা করিলাম।

আখড়ার ঠিকানা যখন মিলিল তখন সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে; দূর হইতে কীর্ত্তন বা খোল করতালের শব্দমাত্র পাই নাই, সুপ্রাচীন বকুল বৃক্ষটা সহজেই চোখে পড়িল, নিচে ভাঙাচোরা বেদি একটা আছে, কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ক্ষীণ পথের রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রাচীরের ধার ঘেঁসিয়া নদীর দিকে গিয়াছে, অনুমান করিলাম হয়ত ও-দিকে কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে, অতএব সেই দিকেই পা বাড়াইলাম। ভুল করি নাই, শীর্ণ সঙ্কীর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন নদীর তীরে একখণ্ড পরিষ্কৃত গোময় লিপ্ত ঈষদুচ্চ ভূমির উপরে বসিয়া গহর এবং আর এক ব্যক্তি,—আন্দাজ করিলাম ইনিই বৈরাগী দ্বারিক দাস,—আখড়ার বর্ত্তমান অধিকারী। নদীর তীর বলিয়া তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয় নাই, বাবাজীকে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। লোকটিকে ভদ্র ও উচ্চ জাতির বলিয়াই মনে হইল। বর্ণ শ্যাম, রোগা বলিয়া কিছু দীর্ঘাকার বলিয়া চোখে ঠেকে; মাথার চুল চূড়ার মতো করিয়া সুমুখে বাঁধা, দাড়ি-গোঁফ প্রচুর নয়,—সামান্যই, চোখে-মুখে একটা স্বাভাবিক হাসির ভাব আছে, বয়সটা ঠিক আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি হইবে বলিয়া বোধ করিলাম না। আমার আগমন বা উপস্থিতি উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না, দুজনেই নদীর পরপারে পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। সেখানে নানা রঙ ও নানা আকারের টুকরা মেঘের মাঝে ক্ষীণ পাণ্ডুর তৃতীয়ার চাঁদ, এবং ঠিক যেন তাহারই কপালের মাঝখানে ফুটিয়া আছে অত্যুজ্জ্বল সন্ধ্যা-তারা। বহু নিম্নে দেখা যায় দূর গ্রামান্তের নীল বৃক্ষরাজি,—তাহার যেন কোথাও আর শেষ নাই, সীমা নাই। কালো, শাদা, পাঁশুটে নানা বর্ণের ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘের গায়ে তখনও অস্তগত সূর্য্যের শেষ দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে,—ঠিক যেন দুষ্ট ছেলের হাতে রঙের তুলি পড়িয়া ছবির আদ্য-শ্রাদ্ধ চলিতেছে। তাহার ক্ষণকালের আনন্দ,—চিত্রকর আসিয়া কান মলিয়া হাতের তুলি কাড়িয়া লইল বলিয়া।

স্বল্পতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধ করি গ্রামবাসীরা পরিষ্কৃত করিয়াছে, সম্মুখের সেই স্বচ্ছ, কালো অল্প পরিসর জলটুকুর উপরে ছোট ছোট রেখায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে, সন্ধ্যা-তারার আলো পড়িয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছে,—যেন কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া স্যাকরা সোনার দাম যাচাই করিতেছে। কাছে কোথাও বনের মধ্যে বোধ করি অজস্র কাঠ-মল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই গন্ধে সমস্ত বাতাসটা ভারি হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই নিকটে কোন গাছে অসংখ্য বকের বাসা হইতে শাবকগণের একটানা ঝুম্ ঝুম্ শব্দ বিচিত্র মাধুর্য্যে অবিরাম কানে আসিয়া পশিতেছে। এ সবই ভালো এবং যে দুটা লোক তদ্গত চিত্তে জড়'-ভরতের মত বসিয়া আছে তাহারাও কবি সন্দেহ নাই, কিন্তু এ দেখিতে এই জঙ্গলে সন্ধ্যাকালে আসি নাই, নবীন বলিয়াছিল একপাল বোষ্টুমি আছে, এবং সকলের সেরা বোষ্টুমি কমল-লতা আছে। তাহারা কোথায়?

ডাকিলাম, গহর!

গহর ধ্যান ভাঙিয়া হতবুদ্ধির মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, গোঁসাই, তোমার শ্রীকান্ত না?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার আবেগ থামিতে চাহে না এম্নি ব্যাপার ঘটিল। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম, বাবাজী আমাকে হঠাৎ চিন্‌লেন কি করে?

বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না গোঁসাই, ক্রিয়াপদের শেষের ঐ সম্ভ্রমের দন্ত 'ন' টি বাদ দিতে হবে। তবে তো রস জম্‌বে।

বলিলাম, তা' যেন দিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমাকে চিন্‌লে কি করে?

বাবাজী কহিলেন, হঠাৎ চিন্‌বো কেন? তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গোঁসাই, তোমার চোখ দুটি যে রসের সমুদ্দুর,—ও যে দেখ্‌লেই চোখে পড়ে। যেদিন কমললতা এলো—তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিন্‌লাম—কমল-লতা, কমল-লতা, এতদিন ছিলে কোথা? কমল এসে সেই যে আপনার হোলো তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ নেই। এই ত সাধনা গোঁসাই, একেই তো বলি রসের দীক্ষা।

বলিলাম, কমল-লতা দেখ্‌বো বলেই তো এসেছি গোঁসাই, কই সে?

বাবাজী ভারী খুসি হইলেন, কহিলেন, দেখ্‌বে তাকে? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গোঁসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেক দেখেচো। হয়ত ভুলে গেছো, কিন্তু দেখ্‌লেই চিন্‌বে সেই কমল-লতা। গোঁসাই, ডাকোনা একবার তারে। এই বলিয়া বাবাজী গহরকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইহাঁর কাছে সবাই গোঁসাই, বলিলেন, বলো গে শ্রীকান্ত এসেছে তোমাকে দেখ্‌তে।

গহর চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গোঁসাই, আমার কথা বুঝি তোমাকে গহর সমস্ত বলেছে?

বাবাজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ, সমস্ত বলেছে। তারে জিজ্ঞেসা কোরলাম গোঁসাই ছ' সাত দিন আসোনি কেন? সে বল্‌লে শ্রীকান্ত এসেছিল। তুমি যে শীঘ্রই আবার আসবে তাও সে বলেছে। তুমি বর্ম্মাদেশে যাবে তাও জানি।

শুনিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম রক্ষা হোক, ভয় হইয়াছিল সত্যই বা ইনি কোন্ অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি বলে আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন। যাই হোক এ ক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আন্দাজটা যে বেঠিক হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে।

বাবাজীকে ভালো বলিয়াই ঠেকিল, অন্ততঃ, অসাধু প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল না। বেশ সরল। কি জানি কেন, ইঁহাদের কাছে গহর আমার সকল কথাই বলিয়াছে,—অর্থাৎ, যতটুকু সে জানে। বাবাজী সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন। একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের,—হয়ত, কবিতা ও বৈষ্ণবী-রস-চর্চ্চায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত।

অনতিকাল পরেই গহর-গোঁসাইয়ের সঙ্গে কমল-লতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশী নয়, শ্যামবর্ণ, আঁট সাট ছিপ্‌ছিপে গড়ন, হাতে কয়েক গাছি চুড়ি,—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশি আড়ম্বর নাই। কিম্বা হয়ত সকালের দিকে ছিল এ-বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গেছে। ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখ মুখের ভাবটা যেন পরিচিত, এবং চলার ধরণটাও যেন পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষ্ণবী কথা কহিল। সে যে নিচের স্তরের লোক নয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। সে কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই, চিন্‌তে পারো?

বলিলাম, না; কিন্তু কোথায় যেন দেখেচি মনে হচ্চে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখেচো বৃন্দাবনে। বড় গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোননি এখনো?

বলিলাম, তা' শুনেচি। কিন্তু বৃন্দাবনে আমি তো কখনো জন্মেও যাইনি।

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বই কি। অনেক কালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্চে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আন্‌তে, বন-ফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—

সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বুঝিলাম, তামাসা করিতেছে, কিন্তু আমাকে না বড়-গোঁসাইজীকে ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিল, রাত হয়ে আস্‌চে আর জঙ্গলে বসে কেন? ভেতরে চলো।

বলিলাম, জঙ্গলের পথে আমাদেরও অনেকটা যেতে হবে। বরঞ্চ, কাল আবার আসবো।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, এখানের সন্ধান দিলে কে? নবীন?

হাঁ, সেই।

কমলি-লতার খবর বলে নি?

হাঁ, তাও বলেছে।

বোষ্টুমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বা'র হওয়া যায় না তোমাকে সাবধান করে দেয় নি?

সহাস্যে কহিলাম,—হাঁ, তাও দিয়েছে।

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, নবীন হুঁসিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভাল করনি।

কেন বলো ত?

বৈষ্ণবী ইহার জবাব দিল না, গহরকে দেখাইয়া কহিল, গোঁসাই বলে তুমি বিদেশে যাচ্ছ চাকরী কর্‌তে। তোমার তো কেউ নেই, চাকরি করবে কেন?

তবে কি কর্‌ব?

আমরা যা' করি। গোবিন্দজীর প্রসাদ কেউ তো আর কেড়ে নিতে পার্‌বে না।

তা জানি। কিন্তু বৈরিগী-গিরি আমার নতুন নয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেছি। ধাতে সয় না বুঝি?

না, বেশি দিন সয় না।

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেছি। কিন্তু অন্ধকারে ফির্‌ব কি করে?

বৈষ্ণবী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অন্ধকারে ফির্‌তেই বা আমরা দেবো কেন? অন্ধকার কাট্‌বে গো কাট্‌বে। তখন যেয়ো। এসো।

চলো।

বৈষ্ণবী কহিল, গৌর! গৌর!

গৌর গৌর বলিয়া আমিও অনুসরণ করিলাম।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার পরিচয়ের অভাব নাই। কিছুদিন হইতে তিনি স্নায়ুর রোগে অতিশয় অসুস্থ আছেন। সেই জন্য, বাংলা দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার দ্বারা চিত্র-সম্পদ বৃদ্ধি পাইবার পথ বন্ধ হইয়াছে।

আমরা ঐকান্তিক চিত্তে কামনা করি তিনি অচিরে আরোগ্য লাভ করুন।

এবারকার চিত্রশালায় গগনেন্দ্রনাথের সাতখানি চিত্র প্রকাশিত হইল। এই সুন্দর ছবিগুলি স্বতঃপ্রকাশ, সুতরাং ইহাদের নামকরণ বা পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন।

শেষ চিত্রটি cubistic প্রথা অনুযায়ী অঙ্কিত একটি রেল ষ্টেশন।



শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষ্টুডিয়ো

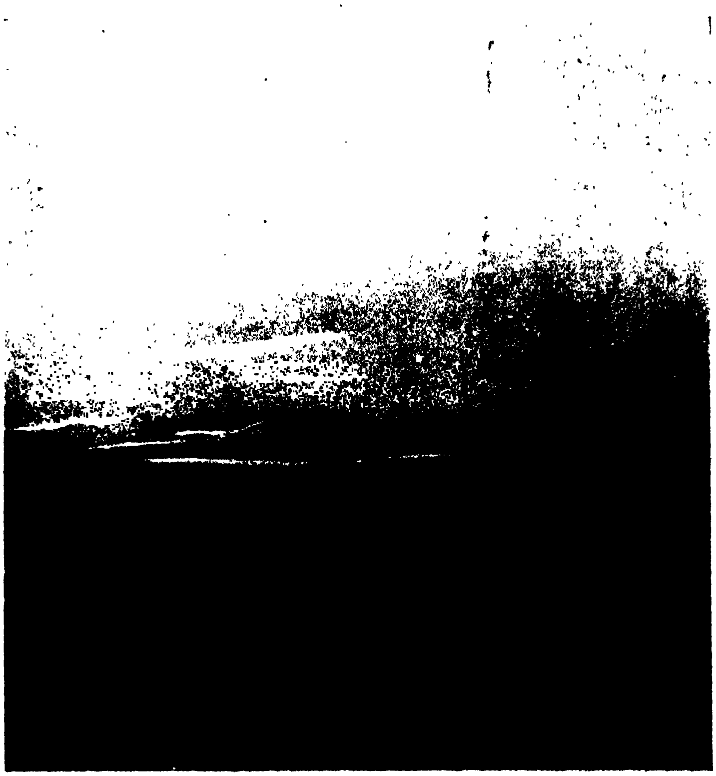
বিচিত্রা-

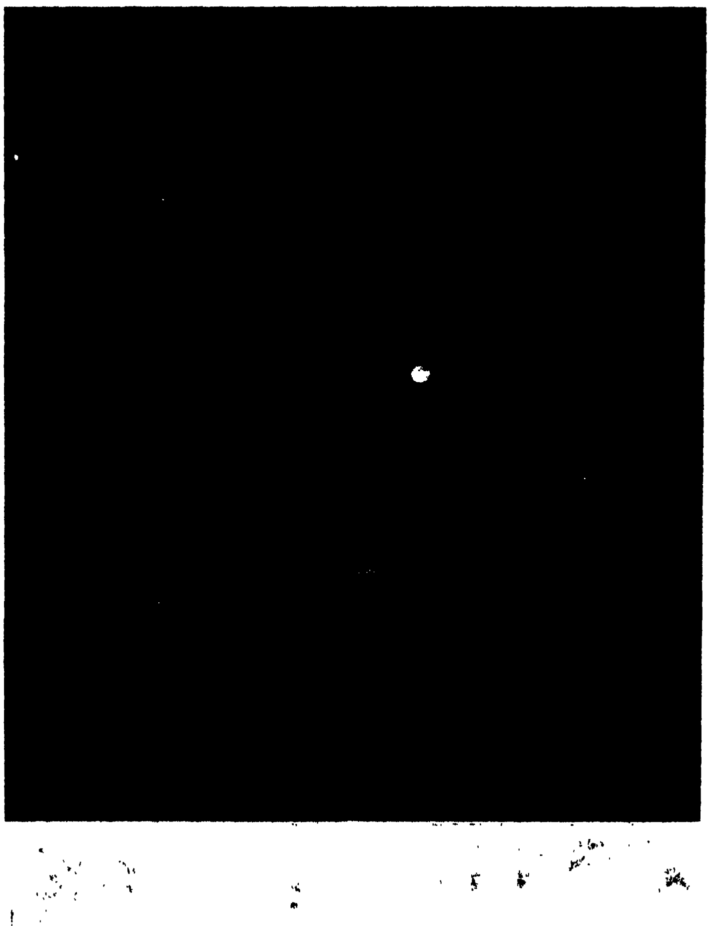


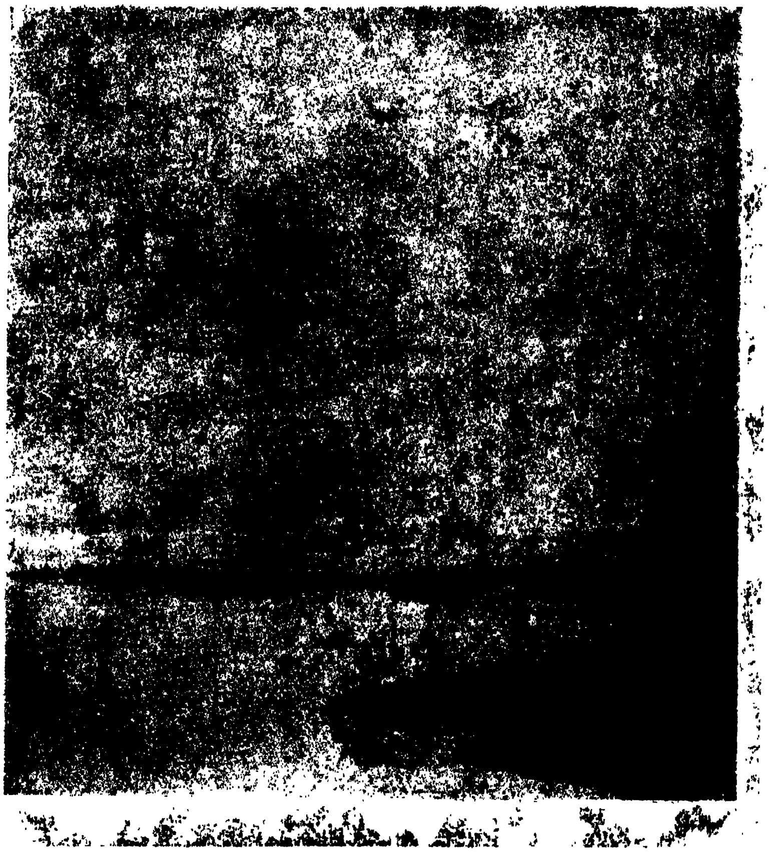
চিত্রশালা

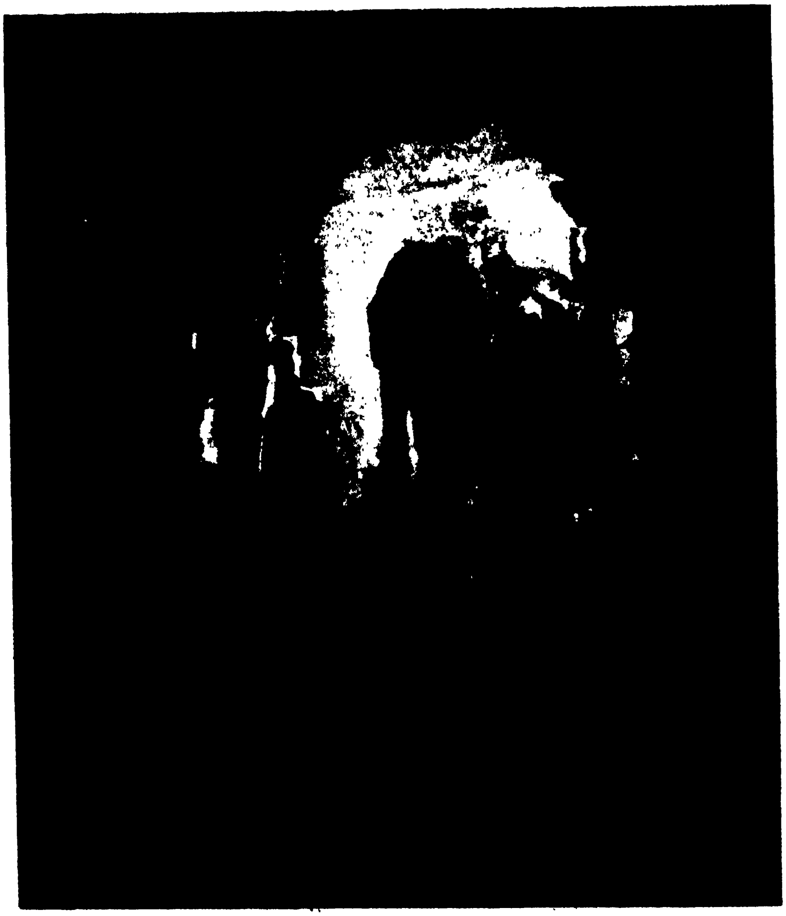
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

চিত্রাবলী













তিন সপ্তাহ

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এম্‌-এ

১

কিষাণপুরে সেবার প্লেগের প্রকোপ ছিল। সহর ছাড়িয়া সকলে বাহিরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। কেহ নদীর ওপারের নির্সী গ্রামে গিয়া অশ্রয় লইল, কেহবা আরও দূরে সিংপুরে গেল। গরীবেরা শহরের বাহিরে পাহাড়ের নীচে কুটির বাঁধিয়া রহিল।

সকাল সন্ধ্যায় বহু লোকজন কিষাণপুরে আসা যাওয়া করে, সেজন্য যেখানে প্রাণের ভয় সেখানেই আবার গতির আনন্দ। স্কুলের ছেলেরা বইয়ের ব্যাগ হাতে লইয়া রেলের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আনন্দে ছুটাছুটি করিতে থাকে। বৃদ্ধ নির্সীকর আজীবন সমাজকে পরিহার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি—তাঁহাকেও ট্রেণে বসিয়া দুকথা গল্প করিতে হয়, দুচারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

ছোট্ট "মীটার-গেজ" লাইনের উপর দিয়া ট্রেণখানা সবুজ পাহাড়ের বুক বাহিয়া আসা যাওয়া করে। কিষাণপুর ছাড়িয়া প্রথম আট মাইল পর্য্যন্ত দুদিকে জোয়ারী ও চিনেবাদামের ক্ষেত, তারপর পঞ্চগঙ্গা নদী, তার উপর পুল। পুলের নীচে দেখা যায় নদীর জলে কেহ স্নান করিতেছে, কেহ কলসী ভরিয়া জল ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। অপর পারে লম্বা ঘাসের পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে বক সারি বাঁধিয়া বসিয়া আছে।

পুল ছাড়াইয়া এক মাইল পরে ছোট্ট নির্সী ষ্টেশন; গাঁ থেকে আধ মাইল দূরে। প্ল্যাটফর্ম্মের পাশে দুটি ম্যালান-টোলিয়া গাছ হইতে শাদা সুগন্ধি ফুল পাথরে বাঁধানো জমিনের উপর বিছাইয়া থাকে। এক বৃদ্ধ অতি পুরাণো একটি ঝুড়ি হাতে লইয়া কখনও ভুট্টা, কখনও বা আতা অথবা শশা ফেরি করিতে থাকে। দুধের ব্যাপারীর মজুরেরা বড় বড় খালি ভাণ্ডসহ নামিয়া পড়ে, সেগুলি ভারে লাগানো সিকা হইতে ঝুলাইতে ঝুলাইতে গ্রামের দিকে চলিয়া যায়। সন্ধ্যার গাড়ী হইতে নামিয়া প্লেগের যাত্রীরা যার যার ছোট বড় পুটলা-পুটলি লইয়া, কেহ গ্রামের দিকে, কেহবা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করে। অন্ধকার রাতে সে পাহাড়ের তলার মাঠের উপর বহু আলো ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে, হঠাৎ দেখিলে, পূর্ব্ববঙ্গের কোনও বড় হাটের পাশের নৌকায় ভরা নদী বলিয়া ভ্রম হয়।

নির্সী হইতে সিংপুর আরও ষোল মাইলের পথ। প্রথম চার মাইল অতি উর্ব্বর জমির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। দুদিকে আক, তামাক, মরিচ প্রভৃতি ফসল দেখা যায়। পঞ্চম মাইল হইতে গাড়ী পাহাড়ে উঠিতে থাকে। এঞ্জিন "লো গিয়ারে" চালানো হয়, ঝক্ ঝক্ শব্দ করিতে করিতে আঁকিরা বাঁকিয়া পাহাড়ে চড়ে। যতই উপরে উঠা যায় ততই পাশের জোয়ারী গাছের উচ্চতা কমিয়া আসে, পাতার গাঢ় সবুজ রং ফিকে হইয়া পড়ে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিলে শুধু সামান্য ঘাস পাওয়া যায়, তাহাও যেন কোন রকমে বাঁচিয়া রহিয়াছে। চূড়া ছাড়িয়া গাড়ীখানা আবার কতক নীচে নামিয়া আসে, আবার দুই দিকে জোয়ারী ক্ষেত, মাথা তুলিয়া উঠে এবং তার পরেই দেখা যায়, লাল টালি-ঢাকা ছোট ছোট বাংলা, দুচারটা তেলের কলের চিমনি, আর সরল কয়েকটা রাস্তা। এ-ই সিংপুর।

সেবার অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে সিংপুর ও কিষাণ-পুরের মধ্যে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করিতে হইয়াছিল। প্রত্ন-তত্ত্বের আকর্ষণে কিষাণপুর আসিয়াছিলাম, আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম অধ্যাপকের পরিচয়ে এক মারাঠা ভদ্রলোকের। আসিবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই হঠাৎ প্লেগ ছড়াইয়া পড়িল, ভদ্রলোক কিষাণপুর ছাড়িয়া সিংপুরে বাড়ী লইলেন, আমিও সে সঙ্গে সিংপুরে গেলাম। তাম্রলিপি ও শিলালিপির

পাঠোদ্ধারে এত মস্‌গুল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে কোনও রকমে তিনটি সপ্তাহ কাটাইয়া কাজ শেষ করিয়া যাইব একথ ভাবিয়া রহিয়া গিয়াছিলাম।

অবশ্য যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম তাঁহার অতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও সে ব্যবস্থার একটা প্রধান কারণ ছিল। তিনি জাতিতে ছিলেন "মারাঠা", বয়সে প্রৌঢ়, বিদ্যায় আমেরিকা-ফেরৎ এঞ্জিনিয়ার, এবং পেশায় কন্ট্রাক্টার। সহরে বড় বড় দালান ইমারত তৈরি করিতেন। তাঁহার পদবী ছিল দেশাই, নাম শ্রীধর তার সঙ্গে পিতার নাম সখারাম যোগ করিয়া পুরা নাম লিখিতেন। তবে লোকে তাঁহাকে "বাবুরাও" বলিয়া ডাকিত। আমিও দুই একদিন "মিঃ দেশাই" বলিয়া পরে "বাবুরাও"ই বলিতাম।

বাবুরাও যে আমাকে শুধু আমার অধ্যাপকের পরিচয়ে খাতির করিতেন, তাহা নহে। তার আর একটা কারণ ছিল। আমি যেদিন কিষাণপুরে আসিয়াছিলাম, সেদিন তিনি আমাকে আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আপনার নাম চক্রবর্ত্তী? তা' হ'লে আপনি বাঙালী? নয় কি?"

আমি সে কথা স্বীকার করিলাম।

বাবুরাও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন, বাঙালীর সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাবু সুকুমার রায় আর দাশরথি মিত্রের সঙ্গে আমেরিকাতে আমি বহুকাল একত্র বাস করেচি, তারা আমার ভাইয়ের মত হ'য়ে গেছ্‌লেন। রায়কে আমরা 'দাদা' বলে ডাক্‌তাম।"

এ খবরে আমি আনন্দ জ্ঞাপন করিলাম।

বাবুরাও উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "সুকুমার রায়ের বাড়ী ত্রিপুরা, আর দাশরথি মিত্রের বাড়ী হুগলী জেলায়। আপনি তাঁদের চেনেন কি?"

তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই জানিয়া বাবুরাও নিরাশ হইলেন। বলিলেন রায় ব্রাহ্মণ ছিলেন, চক্রবর্ত্তীও ব্রাহ্মণ, তাই আশা করিয়াছিলেন কোনও রকমে বা আমাদের জানাশোনাও থাকিতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন তাঁরা আমেরিকা ছিলেন?"

বাবুরাও বলিলেন, "আমরা তিনজনে একত্র নিউইয়র্কে ছিলাম ১৯০৭ সালের জানুয়ারী হ'তে ১৯০৮এর মে পর্য্যন্ত। ব্রড্‌ওয়ের ওপর আমাদের বাড়ী ছিল।"

বাবুরাওয়ের সেই বাঙালী বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকুক আর না থাকুক, আমি যে তাঁহাদের স্বজাতি সে বিষয়ে তো ভুল নাই! তাই বাবুরাও আমাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার পরিবার ছিল না, তিনি নিজেই সব খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করিতেন। রসুয়েকে দিয়া আমার জন্য নানারকম বাংলা খাদ্য তৈরি করাইতেন ও তাহা বাংলা দেশের মতই হইয়াছে জানিলে খুব খুসী হইতেন।

সেই পাহাড়ে রাস্তার উপর দিয়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ডেলী প্যাসেঞ্জারি করার স্মৃতি এখনও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। বাবুরাও প্রায়ই দুপুরের গাড়ীতে যাইতেন। আমি সকালে নয়টার সিংপুরে গাড়ীতে চড়িতাম। ছোট্ট সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীখানা সে সময় সাধারণতঃ খালি থাকিত। তাহার দেয়ালের দুইপাশে দুইটি ছবি ছিল; একটি, গোয়ার নিকটস্থ ক্যাসল্‌রক পাহাড়ের, তাহার গা বাহিয়া দুধসাগর জল-প্রপাত ধাপে ধাপে নীচে পড়িতেছে; আর একটা ভিজেগাপাটামের বন্দরের। যখন আমার দৃষ্টি গাড়ীর ভিতরে থাকিত, তখন ঐ ছবি দুটির দিকে চাহিতাম; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই চক্ষু বাহিরে উন্মুক্ত আকাশ মাঠ আর দূরের ধোঁয়াটে পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে ডুবিয়া থাকিত।

মাঝে মাঝে আমার সহযাত্রী হইতেন রেলের কর্ম্মচারীরা। কেহ রোড-ইন্‌স্পেক্টার; সঙ্গে পিছনের ব্রেকে ট্রলি থাকিত, পাশের থার্ডক্লাসে তাঁহার লোকজন থাকিত। তিনি মাঝের ষ্টেশনে নামিয়া যাইতেন। জাহাজের তুলনায় যেমন ডিঙি, তেমনি ট্রেনের তুলনায় এ ছোট ট্রলিখানা। তিনি ইহার উপর বসিয়া তীরবেগে লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেন।

কেহ আফিস-ইন্‌স্পেক্টর, সঙ্গে বাক্সভরা কাগজপত্র থাকিত, কোনোটাতে সহি করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের হাতে ছাড়িয়া দিতেন, কোনোটাতে বা ষ্টেশন মাষ্টারের সহি লইয়া বাক্সে পুরিতেন।

কেহ বা ডাক্তার, সঙ্গে ঔষধের পেটরা শিশি বোতল। তাঁহার কাছে জ্বরে রক্তচক্ষু কেরাণী আসিত, টিকেট-চেকার আসিত, পোর্টার আসিত; তিনি তাঁহার বোতল হইতে মিক্শ্চার খানিকটা করিয়া ঢালিয়া দিতেন, ছোট একটা শিশি হইতে শাদা শাদা বড়ি বাহির করিয়া দিতেন, আর কাহাকেও ইংরেজীতে, কাহাকেও মারাঠীতে, কাহাকেও কেনাড়ীতে, এবং এক আধজনকে হিন্দুস্থানীতে ঔষধের সেবনবিধি বলিয়া দিতেন।

যখন গাড়ীখানা ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিত, তখন রোড-ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার ট্রলির কথা ভুলিয়া যাইতেন। আফিস-ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার সহি করিবার কাজ স্থগিত রাখিতেন, ও ডাক্তারের মনের ভিতর চিকিৎসা-বিষয়ক ও বহু ভাষার ব্যাকরণ-বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান চাপা পড়িয়া যাইত। তাঁহারা হঠাৎ সহজ সামাজিক মানুষ হইয়া যাইতেন। আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ জমিয়া উঠিত। ব্রাহ্মণ রোড-ইন্‌স্পেক্টার রিট্রেঞ্চমেণ্টের তীব্র নিন্দা করিতেন, জৈন ডাক্তার তাঁহার যুদ্ধকালীন পূর্ব্ব-আফ্রিকা-প্রবাসের গল্প বলিতেন, আর বৃদ্ধ ইউরেশিয়ান আফিস-ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার ছেলেবেলার স্কুলজীবন ও ক্যাথালিক ছাত্রদের প্রতি প্রোটেষ্টাণ্ট শিক্ষকদের বদ্ নজর হইতে আরম্ভ করিয়া, কলিকাতা প্রবাস ও লণ্ডন দর্শনের কাহিনীতে আসিয়া থামিতেন। ওসব কথা শুনিতে শুনিতে মাইলের পর মাইল অতি সহজে কাটিয়া যাইত।

সিংপুরের পরের ষ্টেশন কনঙ্‌লেতে গাড়ী একটু বেশীক্ষণ থামিত। এখানে ট্রেনের ক্ষুদ্র এঞ্জিনটীতে জলভরা হইত; এবং কিষাণপুরের গাড়ীর সহিত আমাদের গাড়ীর ক্রসিং হইত। আমি কৌতূহলের সহিত যাত্রীদের উঠা নামা দেখিতাম। ফর্সা, হাল্কা, চোখা নাক চোখওয়ালা চিতপাবন ব্রাহ্মণ; কালো, দিথ্‌লে, লালটে চোখওয়ালা কানাড়ী লিঙ্গায়ত; কাছাপরা মেয়েমানুষ,—ঘোমটাহীন ব্রাহ্মণী, কপালের গোড়া পর্য্যন্ত ঘোমটা পরা অব্রাহ্মণ মেয়েরা; বুকপর্য্যন্ত উর্ণা দিয়ে ঢাকা, ঘাগরা পরা মারবাড়ী বধূ; সর্ব্বাঙ্গ বুরখা দিয়া আবৃত মুস্‌লিম্ মহিলা;—এল্লামা সম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রীবেশী পুরুষ, তাহার চোখের দৃঢ়তা ও শাড়ীর ভিতর দেহের কঠিনতা তাহার পুরুষত্ব ঘোষণা করিত;—এরকম সব চলচ্চিত্র চোখের সমুখ দিয়া ভাসিয়া যাইত।

গাড়ী নির্সীতে আসিলে "প্লেগের যাত্রীতে" কামরাখানা ভরিয়া যাইত। বৃদ্ধ নির্সীকর বাঁদিকের বাঙ্কের কোণ চাপিয়া বসিতেন, বিশালকায় দুই জোলীভ্রাতা দুই বাঙ্কের মাঝের জায়গা জুড়িয়া বসিতেন। জ্যেষ্ঠ ভাউ-সাহেবের দিল-খোলা হাসি গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দকে ছাড়াইয়া আমোদের হল্লা তুলিত। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কথা উঠিত, ভাউ-সাহেবের দিকটায় গাড়ীটা যেন একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, 'ডি-রেল' হইবার আশঙ্কা! কথা আরম্ভ করিতেন, অপর কোণ হইতে, বেঁটে, ছিপ-ছিপে, মাথায় কায়দা করে পাগড়ী-আঁটা, পাট্‌নে রাও-সাহেব। তিনি রাজদরবারে চাঁকরি করিতেন, তাই তাঁহার রাও-সাহেব পদবী! তাঁহার কথার উত্তরে ভাউ-সাহেব প্রথম খুব এক চোট হাসিতেন।

রোজ রেল ভ্রমণের এই আধ ঘণ্টাকাল খুব সোরগোলে কাটিত। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির চর্চ্চা হইত,—নেতাদের তুলনামূলক সমালোচনা হইত, সঙ্গে সঙ্গে তুকারামের অভঙ্গ, বিবেকানন্দের বাণী ও মহাত্মার বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হইত। কিন্তু হঠাৎ এক একবার সমস্ত যুক্তি তর্ক আলোচনা আড়ষ্ট হইয়া পড়িত—কিষাণপুরের প্লেগের বিবরণে। প্লেগ সম্বন্ধে নানারকম খবর আনিতেন তাতা-সাহেব উদ্‌গাওকর। তিনি বয়সে নবীন, তবে এখনই বংশানুক্রমে আগত মস্ত সোনা জহরতের ব্যবসার মালিক ও চালক হইয়াছেন। তাহার ফর্সা, পীতাভ রং, মুখে কতকটা মোঙ্গলীয় ছাঁচ। তিনি তাঁহার চোখ কপালে তুলিয়া প্লেগের প্রসার বিষয়ে নানা রোমাঞ্চকর খবর দিতেন। 'গতকাল তেরটা কেস হয়েচে, তার মধ্যে সাতটাই মারা গেচে, আজকের কেসের সংখ্যা তার দ্বিগুণ'; 'পাশের আতীগ্র গ্রামে ইঁদুর পড়তে সুরু হয়েচে, শীঘ্র নির্সীতেও ইঁদুর পড়বে, তখন প্লেগের ক্যাম্প ভাঙ্‌তে হ'বে", ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই দিনের পর দিন পাহাড়ের উপর দিয়া রেল-ভ্রমণ, নানা লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, যাত্রীদের চঞ্চলতা,

—এসব আজ সুদূর কলিকাতায় বসিয়াও মনের মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এখনও সেই গাড়ীর চাকার ও রেলের ঘর্ষণজাত ইস্পাতের গন্ধ কল্পনায় অনুভব করিতে পারি।

২

সিংপুর হইতে কিষাণপুর যাইবার পথে কোনও কোনও দিন বাবুরাও আমার সঙ্গী হইতেন। আসিবার পথে সপ্তাহে দুইদিন উভয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিতাম, অপর তিনদিন আমি বিকালের গাড়ীতে চলিয়া আসিতাম। উভয়ে যখন গাড়ীতে একা বসিয়া থাকিতাম তখন প্রায়ই বাবুরাও অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিউইয়র্কে দুই বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার দেড়বৎসরের জীবন-যাত্রার কাহিনী বলিতেন। তাঁহারা কেমন করিয়া বাঙালী ধরণে মাছ রান্না করিতেন (তাঁহাদের কাছেই তিনি বাংলা রান্না শিখিয়াছেন), কেমন সুন্দর বাংলা গান গাহিতেন, তাঁহার অসুখের সময় কিরূপ প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন, এসব কথা তিনি অতি অক্লান্ত-ভাবে দিনের পর দিন বলিয়া যাইতেন।

সেই আমেরিকা প্রবাসী বাঙ্গালীর স্বজাতি বলিয়া আমি বাবুরাওয়ের নিকট-আত্মীয় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু বাবুরাও আমাকে আকৃষ্ট করিলেন তাঁহার কর্ম্মময় প্র্যাকটিকাল জীবন দিয়া। আমি থাকিতাম শুধু অতীত নিয়া।

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী
বিক্রমাদিত্যের ক'টা ছিল নাতী,

এরকম সব তথ্য বাহির করিয়া বিজ্ঞাজাহির করা, এবং পরিণামে ইউনিভার্সিটি হইতে চরম ডিগ্রিলাভ করা ইহাই ছিল আমার তখনকার জীবনের উদ্দেশ্য। বাবুরাও বাস করিতেন বর্ত্তমানে, বাস্তব জগতের ভিতরে—তাই তাঁহার চালচলন আমার কাছে ভারি কৌতুকপ্রদ মনে হইত। প্রত্যেক ষ্টেশনেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে লোকজন আসিত; কোথাও মিস্ত্রী, কোথাও রাজ, কোথাও মোষের গাড়ীওয়ালা, কোথাও দোকানদার অথবা ঠিকাদার। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা এক একটা কাজের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। তার ফলে কোথাও পাথর কাটা হইত, কোথাও সে পাথর গাড়ীতে উঠিত, কোথাও দেয়াল তোলা হইত, কোথাও বা ছাত লাগিত। কিষাণপুর ষ্টেশনে প্রায়ই তাঁহার কাছে একজন ক্ষীণকায়, তীক্ষ্ণ-চক্ষু মিস্ত্রী আসিত, তাহার বাঁ হাতে থাকিত একটা অস্ত্রের বাক্স, আর ডান হাতে ফুট-রুল; তাহাতে আর বাবুরাওয়েতে বর্গফুট ঘন-ফুটের মৌখিক আলাপ চলিত। মিস্ত্রীর মুখ কালো হইয়া পড়িত, চক্ষু হঠাৎ স্থির হইয়া আসিত, তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে টাকায় আনায় পাইয়ে হিসাব গুণিয়া বাহির করিত। এক এক সময় একা একা গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতাম, যেসব প্রাচীন দক্ষিণা রাজাদের বংশ-তালিকা সংগ্রহ করিবার জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, তাহাদের কেহ ঐ মিস্ত্রীটির মত সৎভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন কি, না শুধু পরের শ্রমলব্ধ অর্থ লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়া, পাথরে ও তাম্রপত্রে নিজেদের গৌরব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন?

রোজই ষ্টেশনে আসা যাওয়ার জন্য কিষাণপুরে আমার কাছে বাবুরাওয়ের গাড়ী আসিত। তাঁহার অতি পুরাণো একখানা ফোর্ড গাড়ী ছিল। তার শোফার ছিল না, নিজেই গাড়ী চালাইতেন। তবে তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই একজন ক্লীনার থাকিত, দরকার মত সেও গাড়ী চালাইত। তাহার মুখ্য কর্ত্তব্য ছিল হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া গাড়ীখানাকে ষ্টার্ট-করানো! সে এক মস্ত ব্যাপার!

হ্যাণ্ডেল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইত, তবুও এঞ্জিন সাড়া দিত না! গাড়ী ষ্টার্ট হইলে চারিদিকে এক ফার্লং পর্য্যন্ত লোকে সে খবরটা পাইত! যেদিন উভয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিতাম, সেদিন বাবুরাও গাড়ী লইয়া আমাকে ষ্টেশনে নিতে আসিতেন। তাঁহার গাড়ীখানা ফায়ার ব্রীগ্রেডের গাড়ীর মত সহর প্রকম্পিত করিয়া আসিত। আমার কাছে তাঁহার আর লোক পাঠাইতে হইত না, পৌঁছা মাত্রই আমরা খবর পাইতাম। বৃদ্ধ কিউরেটার ইঙ্গল হালিকর কানাড়ী শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতে করিতে হঠাৎ আঁৎকাইয়া উঠিতেন, তারপর তাঁহার দাঁতহীন মুখ খুলিয়া হাসিতে হাসিতে

বলিতেন, "মিঃ চাক্রাউঅর্ত্তীকে নিতে বাবুরাও এসেচেন! তা'হলে আজ এই পর্য্যন্ত।"

আমি বলিতাম, "বাবুরাও আপনি এত কষ্ট কর্চ্ছেন কেন? আমি তো টাঙ্গা করেই ষ্টেশনে যেতে পারি। আপনার হয়ত এতে কাজের কত ক্ষতি হয়!"

বাবুরাও মুখের বিড়ি সরাইয়া বলিতেন,—একটা বিড়ি প্রায় সারাদিনই তাঁহার মুখে থাকিত—"মিঃ, চক্রবর্ত্তী একে আপনি কষ্ট বলেন? এ যে আমার পক্ষে কত আনন্দ! বাঙালীর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তা' আপনি বাবু সুকুমার রায় আর দাশরথি মিত্রের সঙ্গে দেখা হ'লে বুঝতে পারতেন।"

কথা বলিতে বলিতে বাবুরাও ষ্টিয়ারিং হুইলটিকে আঁকড়াইয়া ধরিতেন, হয়ত চপ্পল-পরা পায়ে ব্রেক চাপিয়া পাশের গরুর গাড়ীওয়ালাকে সাইড্ ঠিক না রাখার জন্য ধমকাইতেন, অথবা সম্মুখের ঘোড়-সওয়ারের উদ্দেশ্যে তীব্রভাবে হর্ণ বাজাইতেন। আমি অনেক সময় ভাবিয়া অবাক হইতাম, বাবুরাও আমেরিকা-ফেরৎ হইয়াও, খাঁটি দেশী পোষাকে চলেন,—মাথায় পাগড়ী পরেন, আর পায়ে চপ্পল এবং পরিধানে অধিকাংশ সময়েই ধুতি থাকে। আর ধূমপান করেন শুধু বিড়ি দিয়া। অবশ্য খুব বড় ষ্টাইল রাখিবার মত তাঁহার আর্থিক অবস্থা ছিল না, কেননা তখন ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছিল,—তবে ছয় সাত বৎসর পাশ্চাত্য দেশে বাস করিয়া আসিয়া আবার সাধাসিধা দেশী ভদ্রলোক হইয়া যাওয়া—ইহা তখনকার দিনে আমি বাংলাদেশে কোথাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বাবুরাও খাঁটি দেশী হইলেও একটি বিষয়ে তাঁহার পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাব ধরা পড়িত। তাঁহার বেশ একটু পান দোষ ছিল। দিনে পাঁচ ছয়বার চাপান তো করিতেনই, তার উপর সন্ধ্যাকালে চা অপেক্ষা আরও অধিক উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করিতেন। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি মোটেই স্বদেশী-ভাবাপন্ন ছিলেন না। কত সব রং বেরং-এর লেবেলওয়ালা বোতল তাঁহার ঘরে দেখা যাইত! কিন্তু এক বিষয়ে বাবুরাওয়ের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তিনি বিকালে চিড়ে ভাজা, কলা ইত্যাদি সহযোগে আমার জল খাবারের বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু কখনও তাঁহার বোতলের পানীয়ের স্বাদ-গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন নাই।

গাড়ীতে একত্র চলাফেরা করিতে করিতে বাবুরাওয়ের সঙ্গে আমার বেশ অন্তরঙ্গ ভাব জমিয়া উঠিল। আমি তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করিলাম, বাবুরাও অতিশয় আগ্রহের সহিত সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ও নিজের অতীত জীবনের দীর্ঘ দীর্ঘ কাহিনী বলিতেন। আমার মত কৌতূহলী শ্রোতা বোধ হয় পূর্ব্বে তাঁহার জোটে নাই। একদিন সন্ধ্যায় নির্জ্জন ষ্টেশনে অন্য যাত্রীরা নামিয়া গেলে আমি বলিলাম, "বাবুরাও, আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন কি?"

বাবুরাও বলিলেন, "নিশ্চয়ই দেব! দেব না কেন? বলুনই না!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আপনার প্রেম-সম্পর্কিত কোনও অভিজ্ঞতা আছে কি?"

বাবুরাও আমার চোখে চোখে চাহিয়া জোরে হাসিলেন। তারপর বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি তরুণ, তা'তে অবিবাহিত, এ বিষয়ে কৌতূহল হওয়া আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ একথা মনে হ'ল কি করে?"

আমি বলিলাম, "অমনি জানতে চাই। মনের কৌতূহল ভিন্ন আর কিছু নয়।"

বাবুরাও বলিলেন, "আমেরিকা থাকতে আমি এক মহিলার প্রেমে পড়েছিলাম, হয়ত তার সঙ্গে আমার বিয়েই হয়ে যেত। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা' হ'য়ে ওঠে নি। না হ'য়ে ভালই হয়েছিল।"

আমি বলিলাম, "কেন?"

বাবুরাও বলিলেন, "তা'তে Bigamyর (দুই বিবাহের) দোষ হত, কেননা তখন আমার স্ত্রী বেঁচে ছিল।"

বাবুরাও মৃদু কি হাসিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর আর কারো প্রতি প্রেম হয় নি?"

বাবুরাও মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "হয়েছিল, সেও

বহুদিনের কথা। ঐ যে গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে পাটনে রাওসাহেব আসে যায়, যে বেশ কায়দা করে পাগ্‌ড়ী বাঁধে, তাকে নেহাৎ যুবক বলে' মনে করবেন না। তার আমার বয়স প্রায় সমান। তা'তে আমাতে ভয়ানক শত্রুতা হয় একজনের ভালোবাসা নিয়ে!"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "বটে? তার পর?"

"সে আমাকে ভালোবাসতো, কিন্তু পাটনে তাকে বিয়ে করতে চাইলে। তার কাছে প্রেম নিবেদন করলে। সে আমার মত জিজ্ঞাসা করলে। তা' জেনে তো পাটনে রেগে আগুন!"

"আপনি কি মত দিলেন? পাটনে তো যোগ্য পাত্রই ছিল।"

"আপনার আমার মতে যোগ্য পাত্র হ'লে কি হ'বে, সে তা মনে করেনি। আমিও অবাক্ হ'য়ে বলি, "সর্ব্ব শেষে পাটনের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে?"

"সে কি বল্‌ল?"

"সে হেসে' কুটি কুটি হ'ল।"

"সে আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল?"

"হতে পারে। তবে আমাকে তা' কোনো দিনও বলে নি।"

"আপনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করবেন না বলে কি সংকল্প করেছিলেন?"

"তা' নয়। সে সময় আমি চাকরি কর্‌তাম, মস্ত বড় একটা বাঁধ তৈরিতে উঠে পড়ে' লেগে গিয়েছিলাম। ও কথাটা ভাল করে ভাব্‌বার অবসর হয় নি।"

তারপর আরও গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হয়ত তা'কে বিয়ে করলে এখন আর প্রতি সন্ধ্যায় বোতল ঢাল্‌তে হ'ত না, দিনগুলি ভালই কাটত।" জীবনে সব বিষয় ঘটে ওঠে না। মানুষ সুযোগ পেয়েও এবং ইচ্ছা স্বত্ত্বেও সব কাজ কার্য্যতঃ করে উঠ্‌তে পারে না। এটাই হ'ল মনুষ্য-জীবনের ট্রাজেডি!"

তখন গাড়ী সিংপুরে আসিয়া থামিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁর কি বিয়ে হয়েছিল? তিনি এখন কোথায়?"

বাবুরাও বলিলেন, "সে সব কথা জিজ্ঞাসা করে কি হ'বে? সে যে অতীতের কাহিনী! দশ বৎসর পূর্ব্বেই সে আমার জীবন হ'তে স'রে পড়েছে।" বলিয়া বাবুরাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং তাড়াতাড়ি হাতব্যাগখানি লইয়া নামিয়া পড়িলেন। প্লাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে একাই ঘরে গেলাম।

৩

একদিন বিকালে বাবুরাও হাঁটিয়া মিউজিয়ামে আমার কাছে আসিলেন। বলিলেন, তাঁহার গাড়ীখানা কারখানাতে পাঠানো হইয়াছে, দুজনে পায়ে হাঁটিয়াই ষ্টেশনে যাওয়া যাক। আমি আনন্দের সহিত স্বীকার করিলাম। তিনি একটা গলির পথ দিয়া আমাকে নিয়া চলিলেন। সে একটা পুরাণো সরু রাস্তা, ইট পাথর তাহাতে অতি কম, সেখান দিয়া বেশী লোক চলা ফেরা করে না, গাড়ী ঘোড়া একেবারেই চলে না বলিলেও হয়। রাস্তার দুই ধারে অতি পুরাণো বাড়ী। কোনওটা মনে হইল অন্ততঃ দুই শত বছরের পুরাণো হইবে। এক জায়গায় একটা ছোট ভাঙা মন্দির ছিল, গড়ন দেখিয়া বোধ হইল, তাহা প্রথম জৈন যুগের, প্রায় দুই হাজার বছর আগেকার। এক এক জায়গায় দুই দিকের বাড়ীঘর ধসিয়া গিয়াছে, রাস্তাটা ধুলায় ধুলায় শাদা হইয়া রহিয়াছে, ঘরের পাশে সবুজ রংয়ের ক্যাক্‌টাস গাছ উঠিয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব চোখে ঠেকিল, অথচ কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যেন একটা অজানা বিষাদের ছায়া, একটা নৈরাশ্যের অবসাদ সে রাস্তাটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, প্রত্যেক দরজায় তালা, লোকজন নাই, রাস্তায় ছেলে পিলে হল্লা করিয়া বেড়ায় না। বাবুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি?" বাবুরাও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "প্লেগ! রোজ বড় রাস্তা দিয়ে যান বলে' তা' দেখ্‌তে পান না।"

দেখিলাম, সমস্ত গলিটার মধ্যে শুধু এক জায়গায় লোকের ঘন বসতি, মেয়ে মানুষেরা সারি বাঁধিয়া ঘরের পইঠায় বসিয়া আছে। কেহ কাহারও চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ ডাল চাল বাছিতেছে, কোথাও চার পাঁচ জনে মিলিয়া গল্প করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িলাম, চারিদিকে মনসার বেড়া, স্তূপে স্তূপে পাথর পড়িয়া আছে, কিন্তু সামনে গিয়া দেখা গেল, সুন্দর হাল ফ্যাসনের একটী বাংলা, দোতলা,—লাল ম্যাঙ্গলোরা টাইলের ছাউনি, চারদিকে বারান্দা, রেলিং, সমুখে ছোট্ট একটি বাগান, তাহাতে গোলাপ, যুঁই, রজনীগন্ধা আর বহুবর্ণের মোরসুমি ফুল ফুটিয়া আছে। এত সব ধ্বংসাবশেষ ও দরিদ্রের কুটিরের পর এ সুন্দর বাড়ীখানা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "চমৎকার বাড়ী-খানা তো!"

বাবুরাও বাড়ীটির দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিলেন। তারপর ফটকের সামনে গিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইলেন। বাগানে একজন চাকর গাছের গোড়া হইতে খুরপি দিয়া ঘাস খুঁটিয়া তুলিতেছিল, আর একজন একটা ঝারি দিয়া গাছের পাতায় জল ঢালিতেছিল। দুজনেই নীরব। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, বাবুরাওয়ের দৃষ্টি দোতালার বারান্দার উপর দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হইয়া আছে। আমি তাহার দিকে কৌতূহলী হইয়া চাহিলাম। তিনি হঠাৎ চোখ নামাইয়া নিলেন। তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক রকম ম্লান হইয়া গেল। আমি বলিলাম, "কি বাবুরাও?" বাবুরাও কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তার পর নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলেন। আমি ইহাতে অবাক হইলাম। হঠাৎ যেন তাঁহার সমস্ত সৌজন্য সমস্ত সরলতা অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলকে কঠোর করিয়া তুলিল। আমি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

সেদিন গাড়ীতে বাবুরাও খুব বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন —আমার সঙ্গে সাধারণ দুচার কথা হইল।

তার পরদিন আমি একা সে পথ দিয়া যাইতেছিলাম। সেদিনও বাবুরাও আর আমি একত্র ষ্টেশনে যাইবার কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবুরাও আসিলেন না। আমি চলিতে চলিতে গতদিন বাবুরাওয়ের আকস্মিক ভাবান্তরের কথা ভাবিতেছিলাম। বাংলাটার সামনে আসিলে আমি অন্য-মনস্কভাবে ইহার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সেই পশ্চিম দিকে মনসার বেড়া, তারপর পাথরের স্তূপ। এক পাশে চার পাঁচটা বড় বড় পাথর ছড়াইয়া আছে, দুটার গায়ে শাদা চূণের লেপ। বাগানের চারি দিকে কাঁটা দেওয়া তার। ভিতরে একসার রজনীগন্ধা, তাহাতে আধ-ফোটা কলি, তার পাশে গোলাপ, একটা গোলাপের ডাল সবকে ছাড়াইয়া উপর দিকে উঠিয়াছে, তাহাতে একটি বড় গোলাপ ফুটিয়া আছে। ফটকের উপর ঝুমকার লতা, তার পর যূঁই।

বাড়ীর কম্পাউণ্ড প্রায় ছাড়াইয়া আসিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম সমুখের দিক হইতে একটা ভিক্টোরিয়া গাড়ী আসিতেছে। আমি রাস্তার এক পাশে দাঁড়াইলাম। দেখিয়াই মনে হইল, এ ভাড়াটে গাড়ী হইতে পারে না। প্রকাণ্ড একজোড়া অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়া, চালকের পরণে লাল কুর্ত্তা, পাগড়ী, হাতে শালুমোড়া লম্বা চাবুক। গাড়ীর রং চক্‌চকে। গাড়ীখানা খোলাই ছিল। পিছনের গদীতে বসিয়াছিলেন একটি মহিলা। উজ্জ্বল 'দুধে আলতার রং' নাকে মুখে চোখে এক অসাধারণ কমনীয়তা, যদিও বয়স প্রায় ত্রিশের মত হইবে। তাঁহার শরীরের নিম্নভাগ একখানা মূল্যবান্ শাল দিয়া ঢাকা ছিল, বোধ হয় ধুলা হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য। তাঁহার পরণে ফিকে বাদামী রংএর সিল্কের শাড়ী ও কাঁচুলি। হাতে হীরা বসানো দুই গাছা চুড়ি। মহিলাটির বসিবার সুচারু ভঙ্গিমা, দৃষ্টির দৃঢ়তা, আর চেহারায় একটা অবর্ণনীয় স্থৈর্য্য তাঁহার আভিজাত্য ঘোষণা করিতেছিল।

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম। গাড়ী চলিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই তাহার ঘর্ঘর শব্দ থামিল। ফিরিয়া দেখিলাম, গাড়ীখানা সে সুন্দর বাড়ীটির উঠানে ঢুকিল।

ষ্টেশনে যাইতে যাইতে বাবুরাওয়ের গত দিনের চিত্ত চাঞ্চল্যের কথা মনে হইল। আমার কাছে সমস্ত বিষয়টা

রহস্যে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলাম, "এ মহিলা কে? ইনি তো বাবুরাওয়ের চিত্ত বিক্ষেপের কারণ নন্?"

মনে হইল, বাবুরাও যদি দুইবার নারীতে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন—বিবাহটা না হয় বাদই দেওয়া গেল,—তবে তৃতীয় বার হওয়াতে বাধা কি? আর তৃতীয়বারই বা বলি কেন —হয়ত চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠবারও হইতে পারে!

ভাবিলাম, কিষাণপুর ছাড়িবার আগে এ রহস্যটা ভেদ করিতেই হইবে। প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে না হয় একটা জীবন্ত তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়া গেলাম!

ষ্টেশনে গিয়া বাবুরাওয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার গাড়ী মেরামত হইয়াছে, তাই তাঁহাকে হাঁটিয়া আসিতে হয় নাই।' বলিলেন, আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মিউজিয়মে গিয়া দেখেন আমি চলিয়া গিয়াছি। গাড়ী কারখানা হইতে খুব দেরী করিয়া আসিয়াছিল। তাই যথাসময়ে খবর দিতে পারেন নাই।

সেদিন নিসী ষ্টেশনের পর গাড়ী খালি হইলে বাবুরাও বেঞ্চের উপর সটান হইয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার চোখ বুজিয়া আসিল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। গাড়ীর জানালা খোলা ছিল, বাহিরে অন্ধকারের ভিতর এক একবার এক একটা গাছ অথবা পাহাড়ের টিলা মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। কোথাও আমাদের এঞ্জিনের সার্চ্চলাইট পড়িয়া লেভেল ক্রসিং এতে দাঁড়ানো মোটর ও গরুর গাড়ীগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আমি ভিতরে মুখ করিয়া বসিলাম। গ্যাসের আলোর নীচে বাবুরাওয়ের ঘুমন্ত মুখ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমি অভিনিবেশের সহিত তাঁহার সে পুরু ভ্রূ, তার নীচে কোটরগত দুইটি চক্ষু, তার নীচে ঈগল পাখীর ঠোঁটের মত নাকটি, মসৃণ করিয়া কামানো, কতকটা বুড়ো মেয়েমানুষের মত, তাঁহার ঈষৎ উল্টানো ঠোঁট ও ভাঙা গাল, আর তাঁহার চেপ্টা, দুইভাঁজ করা চিবুক আমি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল যেন মারাঠা চরিত্রের সমস্ত তীক্ষ্ণতা সমস্ত জটিলতা ঐ মুখটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এ জাতির ভিতর বুদ্ধিবৃত্তির যে ঘাতপ্রতিঘাত গিয়াছে, আমার সম্মুখের মুখটীতে যেন তার সমস্ত ছাপ অঙ্কিত হইয়া আছে।...

আমার মনে নানারকম কল্পনা জাগিতে লাগিল। জানিয়াছিলাম, বাবুরাও বিপত্নীক। তবে কি তিনি এখন গোপনে প্রেমলীলার অভিনয় করেন? হয়ত তিনি সেই মহিলাটির প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, হয়ত তাঁহার জন্য নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য খোয়াইয়া ফেলিতেছেন,– তাই তাঁহার এত বৃহৎ ব্যবসা সত্ত্বেও তিনি নির্ধন, তাই তাঁহার ঐ পুরাণো ফোর্ড গাড়ী!

ভাবিলাম হয়ত ঐ সুন্দর বাংলাটি তিনিই ভাড়া করিয়াছেন, সে ভিক্টোরিয়া গাড়ীটি তাঁহারই, সেই একান্তে অধিবাসিনী রূপসী নারী তাঁহারই প্রেম-পাত্রী!

৪

পরদিন সকালে কিষাণপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমি মোটর বিদায় করিয়া দিয়া গলির পথে হাঁটিয়া চলিলাম। ভাবিলাম, নূতন কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখা যা'ক। সে বাংলাটির কাছে আসিলে দেখিলাম, বাগানের লাল রাস্তার উপর দুইটি শিশু ছোট হকি ষ্টীক লইয়া খেলা করিতেছে। তাহাদের গায়ে নীল সেলর সুট, পায়ে পুরা মোজা, জুতা। একটা লম্বা লোমওয়ালা, ছোট্ট, কালো মিশমিশে বিলিতি কুকুর তাহাদের পাশে ছুটাছুটি করিতেছে। খেলিতে খেলিতে ছেলেদুটি মিঠে গলায় এক একবার ডাকাডাকি করিতেছে। তাহাদের অতি কোমল চেহারা, চক্ষু শান্ত, গতি ছন্দোময়,—আভিজাত্যের চিহ্ন!

আমি সে বাড়ীর ফটক পার না হইতেই সেই অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়ায় টানা ভিক্টোরিয়া গাড়ীটি আসিল। আজ তাহা হইতে নামিল একটা মেয়ে, এগারো বারো বছরের, পিঠে বেণী দুলানো, তার আগায় ফুল বাঁধা, হাতে একটা ছোট ব্যাগ ও শ্লেট। সে বাগানের মাঝখানে গিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া কি বলিল এবং হাসিল। শান্ত, মিষ্টি হাসি, যেন একটা অজানা সংযম মাখা, যাহা শুধু অভিজাতদের মধ্যেই সচরাচর দেখা যায়।

সেদিন বিকালে গাড়ীর সময়ের বহু আগেই আমি মিউজিয়াম ছাড়িয়া বাবুরাওয়ের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম, বাবুরাও একান্তমনে বিড়ি টানিতেছেন ও চিঠি লিখিতেছেন। চিঠি লেখা শেষ করিয়া ও তাহা পিয়নের হাতে দিয়া তিনি আমার সঙ্গে সাময়িক রাজনীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

ট্রেনের সময়মত যখন আমরা মোটরে উঠিতে যাইব তখন দেখা গেল, একটি চাকাতে হাওয়া নাই। ক্লীনার হাওয়া করিতে গিয়া দেখিল চাকাতে পাংচার হইয়াছে। সে চাকা বদ্‌লাইয়া অপর চাকা লাগানো পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না, তাই আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। ভরসা ছিল সামনের রাস্তায় গিয়াই টাঙ্গা পাইব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা পাওয়া গেল না। তখন আমরা দুজনে অতি দ্রুতপদে হাঁটিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। অবশ্য গলির রাস্তাই ধরিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে তখনও রাজনীতির আলোচনাই চলিতেছিল। কিন্তু আমি প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সুন্দর বাংলাটির কথা ভাবিতেছিলাম।

সেখানে আসিলে দেখিলাম, সেদিনকার মহিলাটি রাস্তার উপরের জানালায় বসিয়া আছেন; তাঁহার পরিধানের ময়ূরকণ্ঠী রঙের মিহি শাড়ীর আঁচলের কোণটি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং বাতাসে উড়িতেছে। তাঁহার মুখের উপর অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ আভা পড়িয়া সেই দুধে আল্‌তা রঙের মধ্যে একটা স্থির, শান্ত, ঔদাস্য মাখা লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

বাবুরাও হঠাৎ থামিয়া দৃঢ় দৃষ্টিতে সে মুখের দিকে চাহিলেন, মহিলাটিও অবিচলিতভাবে বাবুরাওয়ের দিকে চাহিলেন। তারপর বাবুরাও আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

ভাবিলাম, সে দৃষ্টির অর্থ কি? আমি কলিকাতায় পাশের বাড়ীর বাতায়নে উপবিষ্টা তরুণীর পানে মেসের ছাত্রের চঞ্চল বুভুক্ষু দৃষ্টি দেখিয়াছি; রাস্তায় সুবেশা তরুণীর সমুখে আফিসগামী কেরাণী বাবুর পান-রাঙা ঠোঁট হঠাৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অশ্লীল হাসিতে বাঁকিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। আবার এমন মহিলাও দেখিয়াছি, অপরিচিত পুরুষ তাঁহাদের দিকে চাহিলেই, যেন তাঁহারা ভাবিতে আরম্ভ করেন, "নারীর রূপ আকাশকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করে!" কিন্তু বাবুরাও বা সে-মহিলাটির দৃষ্টির ভিতর কোনও রকম চিত্ত-চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

তবে বাবুরাও যখন চলিতে লাগিলেন তখন আমি লক্ষ্য করিলাম, তিনি যেন একটা তীব্র উত্তেজনা ঠোঁট মুখ চোখ দিয়া সজোরে চাপিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার গতি শিথিল হইয়া পড়িল, হাত পা যেন সহসা অসাড় হইয়া আসিল। উভয়ে নীরবে ষ্টেশনে আসিলাম। কিন্তু সেদিন এত তাড়াহুড়া করিয়া ষ্টেশনে আসিয়াও গাড়ী ফেল হইল। বাবুরাও আমাকে প্লাটফর্ম্মে বসাইয়া একখানা টাঙ্গায় চড়িয়া সহরে গেলেন এবং আধঘণ্টা পরে তাঁহার ফোর্ড গাড়ীখানা লইয়া হাজির হইলেন। সেই সন্ধ্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাবুরাও আমি ও তাঁহার ক্লীনার আবদুল, তিনজনে সেই জীর্ণ ফোর্ড গাড়ীটিকে আশ্রয় করিয়া পঁচিশ মাইল পাহাড়ে পথের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। সে যাত্রায় কি দুর্ভোগই না ভুগিলাম! প্রথমবার পাহাড় চড়িবার সময়েই হঠাৎ গাড়ীর এঞ্জিন বন্ধ হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ হ্যাণ্ডেল ঘুরাইবার পর তাহাকে ষ্টার্ট করা গেল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন আবার এঞ্জিন বন্ধ হইল তখন তিনজনে মিলিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়া তুলিতে হইল। যখন গাড়ী ঠিক ঠিক চলিত, তখন বাবুরাও ষ্টীয়ারিং হুইল ধরিয়া গ্যাট হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহার তীক্ষ্ণ চোখ দুটি রাস্তার উপরে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকিত। এক একবার মোড় ফিরিবার সময় তাঁহার হাতের পাঞ্জাটি লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিত, ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া পড়িত, কপালে ঘাম দেখা দিত। একবার হঠাৎ একটা মোড় ফিরিয়া দেখা গেল, গাছের ছায়ার অন্ধকারের ভিতর হইতে যেন ত্রিশ চল্লিশটি মোতি সহসা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাবুরাও দাঁত মুখ খিঁচাইয়া ব্রেক চাপিলেন, বারংবার হর্ণ বাজাইতে লাগিলেন। ভেড়ার দল রাস্তার দুপাশে ছড়াইয়া পড়িল। আমি বলিলাম, "ভেড়ার চোখ আলোতে ওরকম দেখায়?"

বাবুরাও গাড়ীখানা খোলা মাঠের উপর আনিয়া,

আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চোখের কি চমৎকার mechanism তা' আপনি জানেন না মিঃ চক্রবর্ত্তী ?"

কিন্তু ওসব আলাপ করিবার আর অবসর রহিল না, কেননা টিলা চড়িতে গিয়া গাড়ীখানা আবার থামিয়া গেল। সে রাত্রে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অন্ততঃ পাঁচটা কি ছয়টা টিলা পার হইলাম। কিন্তু কেবল তাহা হইলেও হইত। দুইবার চাকা পাংচার হইল, প্রথমবার "স্পেয়ার" হুইল লাগানো হইল, কিন্তু দ্বিতীয়বার রাস্তার পাশে প্রায় ঘণ্টা খানেক বসিয়া ছেঁড়া রবার জোড়া দিতে হইল! সিংপুরের কাছাকাছি আসিয়া দেখা গেল তেলের পাইপ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বহু পর্য্যবেক্ষণের পর সে ত্রুটি ধরা পড়িল, এবং বাবুরাওয়ের নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত নানা ফন্দি দ্বারা সে ভাঙা পাইপটিকে কাজের উপযোগী করা হইল।

বাবুরাও যখন সকল কলকব্জা নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আমি ধীরে ধীরে রাস্তায় পাইচারি করিতে লাগিলাম। চারিদিকে সুদূর বিস্তৃত মাঠ ও পাহাড় জ্যোৎস্নালোকে ডুবিয়া রহিয়াছিল। পাশে একটা ক্ষেতে জোয়ারীর লম্বা সরু পাতাগুলি নীচের জমির সঙ্গে আলো ছায়ার খেলা খেলিতেছিল। পাইচারি করিতে করিতে ফিরিয়া যখন মোটরের কাছে আসিলাম, তখন দেখিলাম, বাবুরাও এঞ্জিনটির উপর ঝাঁকাইয়া পড়িয়া এক অংশ বিশেষ করিয়া দেখিতেছেন। তখন হঠাৎ আমার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল, নেভি ব্লু সুটপরা দুইটি ছেলে ছোট্ট হকি ষ্টীকের উপর নুইয়া বলে ঘা দিতেছে, আর উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিতেছে; একটা ছোট কালো কুকুর সঙ্গে সঙ্গে ছুটাছুটি করিতেছে। আর একটা লম্বা গোলাপের ডাল, তাহাতে একটা বড় গোলাপ, আর তার পাশে গোলাপের মতই মুখ একটী ছোট্ট মেয়ে, সবুজ পাতলা শাড়ী-পরা, পিঠে বেণী দুলানো, হাতে ছোট একটী ব্যাগ ও শ্লেট। মনে হইল ঐ তিনটি শিশুমুখ আর বাবুরাওয়ের মুখে এক অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে!

তেলের পাইপ ঠিক হইলে বাবুরাও আবার ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিলেন এবং যাত্রা করিবার সাড়ে চার ঘণ্টা পরে, রাত্রি বারোটাতে পঁচিশ মাইল পর্য্যটন শেষ করিয়া আমরা সিংপুরে পৌছিলাম।

৫

পরদিন বিকালে মিউজিয়ামে বাবুরাওয়ের চাকর আমার কাছে একখানা চিঠি লইয়া আসিল। তিনি এক ভদ্রলোককে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং আমাকেও তাহাতে যোগ দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গুটাইয়া উঠিলাম এবং বাবুরাওয়ের বাড়ীতে চলিলাম। বাড়ীর কাছে গিয়া অবাক হইয়া দেখিলাম, সেই দুই অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়ায় টানা ভিক্টোরিয়া গাড়ীখানা বাবুরাওয়ের বাড়ীর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সেই লাল কুর্ত্তা ও পাগড়ীপরা সইস ঘোড়ার মাথার পাশে দাঁড়াইয়া গলার উপর হাত বুলাইয়া দিতেছে।

ভিতরে গিয়া দেখিলাম বাবুরাওয়ের টি-রুমটি অতিরিক্ত রকম সজ্জিত। টেবিলের উপর সুন্দর একখানা চাদর পাতা হইয়াছে, তার উপর তিন চারটা ফুল-দানী, তাহাতে সব তাজা ফুল।

দেখিলাম, বাবুরাওয়ের পাশে একজন যুবাবয়সী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। খাসা চেহারাটি তাঁহার। প্রবেশ মাত্রই বাবুরাও আমাকে সে ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, ক্যাপটেন ভোস্‌লে।" ভোস্‌লে মৃদু হাসিয়া, ঘাড় ঝাঁকাইয়া করমর্দ্দন করিলেন ও যথারীতি কুশল প্রশ্ন করিলেন। সে সব নেহাৎই মৌখিক ভদ্রতা হইলেও, সে হাসি, সে করমর্দ্দন, সে কুশল প্রশ্নের সুরের ভিতর কেমন একটা বৈশিষ্ট্য, একটা মার্জ্জিত ভাব, একটা সুরুচি ফুটিয়া উঠিল, যাহা বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না।

বাবুরাও তাঁহার নিকট আমার সব খবর বলিলেন। শেষে ইহাও বলিলেন, যে বাঙালীর সঙ্গে তাঁহার বহুকালের যোগ, নিউইয়র্কে বাবু সুকুমার রায় ও দাশরথি মিত্রের সঙ্গে দেড় বৎসর একত্র ছিলেন।

ভোস্‌লে মধ্যভারতের কোনও দেশীরাজ্যের ফৌজে

ক্যাপটেন। তিনি বলিলেন, তাঁহারও বাঙালী বন্ধু আছেন। তিনি বাংলাদেশের বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, তিনি দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন, তাহা খুব সুন্দর জায়গা, ইত্যাদি। আমি ভোস্‌লের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইলাম।

একটা রূপার ট্রের উপর বাবুরাওয়ের শ্রেষ্ঠ চায়ের সেট লইয়া সুসজ্জিত ভৃত্য আসিল। বাবুরাও চা ঢালিতে লাগিলেন। ভোস্‌লে উঠিয়া দুধ মিশাইয়া দিতে লাগিলেন।

চা খাইতে খাইতে প্লেগের কথা চলিতে লাগিল। আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলাম, ভোস্‌লে কেমন সুকুমারভাবে চায়ের পেয়ালা ধরিয়াছিলেন, কেমন সৌষ্ঠবের সহিত পেয়ালা হইতে চা পান করিতেছিলেন।

আমি ভোস্‌লেকে তাঁহাদের ফৌজের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার ধারণা ছিল, মিলিটারী লোক বুঝি সবাই কাঠখোট্টা গোছের, তাহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝি শুধু বীরত্বই ঘোষিত হয়। ভোস্‌লেকে দেখিয়া সে ধারণা দূর হইল।

হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া বাবুরাও বলিলেন, "আপনি সেদিন যে বাংলাটির তারিফ কচ্ছিলেন ক্যাপটেন ভোস্‌লে সেখানে থাকেন।"

বলিতে বলিতে বাবুরাওয়ের চোখদুটি কুঞ্চিত হইয়া পড়িল। আমার শরীরে যেন একটা অকারণ রোমাঞ্চ বহিয়া গেল। আমি ক্ষণেকের জন্য ভোস্‌লের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, ইনি কি সেই মহিলার স্বামী? মনে হইল অসম্ভব। তিনি সে মহিলা হইতে বয়সে ছোট হইবেন। তবে উনি কে?

বাবুরাও হঠাৎ গম্ভীর হইয়া, পূর্ব্ব বিষয় ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ক্যাপটেন্, প্লেগের সময়ে যে প্লেগ এরিয়া (area)'তে থাকা উচিত নয়, একথা আপনাকে বোঝাতে হ'চ্চে এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।"

ভোস্‌লে বলিলেন, "আমাদের বাড়ীর কাছে তো কেস হয় নি, শুধু ইঁদুর পড়েচে।"

বাবুরাও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তার মানে প্লেগ নয়? ইঁদুর মরে ঠাণ্ডা হওয়া মাত্র তার গায়ের পিশুগুলো সরে পড়ে, তারপর মানুষ সাম্‌নে পেলেই গায়ে লাফিয়ে ওঠে।"

ভোস্‌লে বলিলেন, "আমাদের পাড়ায় তো আরো লোক রয়েচে!"

বাবুরাও হঠাৎ থামিয়া, উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "পাড়ার ঐ গরীব লোকদের কথা বলচেন? তারা জীবন-মরণ সম্বন্ধে কি জানে? পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মে, আবার পঙ্গ-পালের মতই ঝাঁকে ঝাঁকে মরে! ওদের নিজের বিচার শক্তি আছে? 'পাড়ার মাতব্বর যখন আছেন, তখন আমরা থাক্‌বো না কেন?' এই হ'ল তাদের যুক্তি! কেউ যদি প্লেগ হয়ে মরে যায়, তবে তারা বল্‌বে 'ঈশ্বরের ইচ্ছা! অদৃষ্ট কে খণ্ডাবে?" অথচ আমরা রোজ পঞ্চাশ মাইল রেল চড়ে' অদৃষ্ট খণ্ডাবার চেষ্টা কর্চ্ছি!"

ভোস্‌লে হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা পঞ্চাশ মাইল রেল চড়েও তো দিনের অধিকাংশ ভাগ কিষাণপুরেই কাটাচ্চেন, আমরা না হয় আর একটু বেশী কাটালাম।"

বাবুরাও বলিলেন, "প্লেগ যে "ফ্লা"র ব্যাপার! দিনের আলোতে তারা আস্‌তে পারে না। তাই রাত্রিতে "এরিয়ার" বাইরে থাক্‌লেই পনের আনা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।" তারপর বলিলেন, "আপনারা জেনে' শুনে' এই প্লেগের দিনে কিষাণপুরে এলেন কেন, ক্যাপটেন ভোস্‌লে?"

ক্যাপটেন মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "দেখুন, শুধু আমরা আসি নি, মিঃ চক্রবর্ত্তীও কোন্ দূর থেকে এসেচেন!"

"আপনার দায়িত্ব মিঃ চক্রবর্ত্তীর চেয়ে অনেক বেশী!" বলিয়া বাবুরাও ভোস্‌লের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ক্যাপটেন্, আপনাকে আমার মতে আনা কঠিন দেখ্‌চি। আপনার বৌদিকে বল্‌বেন, আমার অনুরোধ তাঁরা যেন সত্বর এ জায়গা ছেড়ে দেন।"

ভোস্‌লে বলিলেন, "তা' বেশ। তবে আমি আর বলি কেন, আপনিই এসে সমঝিয়ে বলবেন। আগামী কাল আপনাদের দুজনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। বিকালে চারটায়।"

ভোস্‌লে উঠিয়া অতি সৌজন্যের সহিত আমাদের উভয়ের নিকট বিদায় লইলেন। বাবুরাও ও আমি দরজা পর্য্যন্ত গেলাম। বিশাল অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়া দুটি তাহাদের মাংসবহুল দেহ দোলাইতে দোলাইতে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া দেখিলাম, বাবুরাও ভিতরের কামরায় চলিয়া গিয়াছেন এবং সজোরে বোতলের ছিপি খুলিতেছেন।

৬

পরদিন যথাসময়ে বাবুরাওয়ের বাড়ী গিয়া দেখিলাম তিনি ঘরে নাই। কিছুক্ষণ বসার পর তিনি তাঁহার গাড়ীতে করিয়া আসিলেন। সে গাড়ীখানা দেখিয়া সেদিনকার রাত্রির অভিযানের কথা মনে পড়িল।

বাবুরাও বলিলেন, তাঁহার হাতে অনেক কাজ, তিনি আসিতে পারিবেন না। আমি যেন ক্যাপ্‌টেন্ ভোস্‌লের কাছে তাঁহার আসিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি এবং আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আমি যেন তাঁহার হইয়া সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি।

আমি বলিলাম, "যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল আপনি ক্যাপটেন্ ভোস্‌লের বৌদিকে প্লেগের বিষয় বুঝিয়ে বল্‌বেন, নয় কি?"

বাবুরাও আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন ভাবিতেছেন, আমি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছি।

একটু থামিয়া অত্যন্ত কঠিনভাবে বলিলেন, "আমি সে ইচ্ছা ত্যাগ করেচি। তবে আমি যদি আশা করি, মিঃ চক্রবর্ত্তী, যে আপনি আমার হয়ে সে কাজটা কর্‌বেন, তবে কি তা' বেশী আশা করা হয়?"

আমি বাবুরাওয়ের ভাবগতিক দেখিয়া অবাক্ হইলাম। বলিলাম, "তা' আপনার হ'য়ে আর বলার দরকার কি? আপনার আজ সময় না হয়, আর একদিন যাবেন, আজ আমরা যাব না বলে খবর পাঠান।"

বাবুরাও উন্মনস্কভাবে ঘরে পাইচারি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আজ কেন, কক্‌খনই আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আপনাকে একাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হ'বে!"

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তার মানে?"

সহসা বাবুরাওয়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল। মুখের মাংসপেশী কুঞ্চিত হইয়া পড়িল। চোখের দৃষ্টি ক্লিষ্ট হইল। বাবুরাও বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী! আপনি তরুণ, আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত ভবিষ্যৎ। যাদের ভবিষ্যৎ নেই শুধু অতীত আছে, আর সে অতীত ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তাদের পেছনে লেগে থাকে, তাদের প্রতি আপনার সহানুভূতি জাগে না? বলুন্! বলুন্!"

বলিয়া বাবুরাও আমার অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছিল।

তাঁহার চক্ষু একটু বেশী রকম লাল হইয়া উঠিল। আমি শুধু ধীরে ধীরে বলিলাম, "আজ এ অসময়ে পান করেছেন কেন, বাবুরাও?"

বাবুরাও অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করবেন। আশা করি আজকার এ এন্‌গেজ্‌মেণ্ট নষ্ট করবেন না। আমি যদি আস্‌তে পার্‌তাম, তবে অবশ্যি আস্‌তাম। আপনি আমার গাড়ীটা নিয়ে যান। আবদুল—" বলিয়া আবদুলকে দক্ষিণী উর্দ্দুতে গাড়ীর বিষয়ে বলিয়া বাবুরাও ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি শুধু লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাঁহার ঠোঁট আর হাতের আঙ্গুল কেমন কাঁপিতেছে। আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল; ভাবিলাম, এ মাতালকে নিয়াই বা কি হইবে? একাই গিয়া গাড়ীতে বসিলাম।

গাড়ী ষ্টেশনের পথে ঘুরিয়া ভোসলেদের বাড়ীতে গেল। বাড়ীতে ঢুকিবার সময় মনে হইল আমি যেন অতি পরিচিত স্থানে যাইতেছি। কেননা প্রত্যেকটী ইট পাথর গাছ গাছড়ার ছাপ ইতিপূর্ব্বে আমার মনেতে বসিয়া গিয়াছিল। গাড়ী থামিতেই দরজায় আসিয়া ক্যাপটেন ভোসলে আমাকে "রিসিভ্" করিলেন ও উপরে লইয়া গেলেন। সিঁড়ির উপর কার্পেট পাতা ছিল। দোতলার মধ্যখানে একটি হল ঘরে গিয়া উঠিলাম। দেয়ালে সুন্দর সব চিত্র ঝুলানো

ছিল ; অধিকাংশই বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপের। কোথাও এল্পস্ পাহাড়, কোথাও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লেক, কোথাও জার্ম্মেনীর কালো বন, কোথাও বা ইংলণ্ডের সমুদ্রকূল। একখানা বড় ছবিতে দেখানো হইয়াছিল, সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে একটা জাহাজ হাবুডুবু খাইতেছে, অথচ তাহার সুন্দর কেবিনগুলি ভিতরের আলোতে মায়াভবনের মত দেখাইতেছে। ঘরের আসবাব সব ভারী কালো কাঠের চেয়ারে মখ্‌মলের গদি আঁটা।

ক্যাপটেন ভোস্‌লে আমাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার গবেষণা কিরূপ চলিয়াছে জানিতে চাহিলেন। কিছুকাল পরে বলিলেন, "বাবুরাও এলেন না তা' হ'লে?" এ প্রশ্নটা বাড়ীর দরজাতেই জিজ্ঞাসা করা হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। হয়ত আমি যে শুধু বাবুরাওয়ের সাঙ্গোপাঙ্গ নই, তাহা বুঝাইবার জন্মই তখন সে-প্রশ্ন করা হয় নাই। সৌজন্য বটে!

বড় বড় বিলাতী ছবির মাঝখানে দু একখানা ফোটোও ছিল। একটাতে দেখিলাম একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটী সুসজ্জিতা তরুণী মহিলা দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কার চিত্র। ভোস্‌লে বলিলেন, তাঁহার দাদা ও বৌদির। তারপর তাঁহার দাদার বিষয়ে কথা বার্ত্তা চলিল। তিনি ছেলেবেলাতেই বিলাত গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন, তারপর বম্বেতে সলিসিটার হ'ন। ছবিটা তাঁহার বিবাহের কিছু পরে তোলা। তিনি একটু বেশী বয়সেই বিবাহ করিয়াছিলেন। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে তাহার মৃত্যু হয়। সে প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা।

চা খাইতে খাইতে তাঁহার দাদার কথাই বিশেষ করিয়া হইল। তিনি খুব আর্টের ভক্ত ছিলেন, তাই ঘরে ওসব ছবি। সঙ্গীতেও তাঁহার খুব রুচি ছিল,—প্রাচ্য, পাশ্চাত্য উভয়েই। তাঁহাদের পরিবার কিষণপুরেরই বাসিন্দা। বুঝিলাম, ইঁহারা খুব বুনিয়াদি ঘরের লোক। সহরের অপর ভাগে তাঁহাদের পুরাণো বাড়ী আছে, তবে ক্যাপটেন ভোস্‌লে তাহা পছন্দ করেন না। তিনি খুব আমোদের সহিত সে বাড়ীর বর্ণনা দিলেন। প্রকাণ্ড সাবেকী দরজা, তাহাতে তিনটা মুষল লাগাইয়া বন্ধ করিতে হয়। তারপর হাসিয়া বলিলেন, "ওসবের ওপর আপনাদের কোনও গবেষণা চলে না?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের বাড়ীতে পুরাণো কাগজপত্র আছে কিনা।

ভোস্‌লে একথায় আবার হাসিলেন। বলিলেন, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে খুব পণ্ডিত-গোছের লোক ছিলেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁদের গর্ব্ব ছিল ঘোড়ায় চড়াতে আর অতর্কিতে শত্রুকে আক্রমণ করাতে ও কার্য্য সমাধা করে' আবার তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের ভিতর ছুটে আসাতে। মিলিটারী বিদ্যাও যে তাঁদের খুব বেশী আয়ত্ত ছিল, তা' নয়। তাঁরা চল্‌তে জান্‌তেন, তাই এগিয়ে গিয়েছিলেন!"

চাপানের পর ভোসলে বলিলেন, "আচ্ছা, এখানে প্লেগ বাস্তবিকই হচ্চে নাকি, না শুধু লোকের আতঙ্ক?"

আমি সেদিনকার কেসের সংখ্যা বলিলাম।

ভোস্‌লে বলিলেন, "বৌদি কিন্তু ও কথা শুনে' খুবই ভয় পেয়েচেন। এবং শিগ্‌গিরই বাড়ী ছাড়তে চাইচেন।"

আমি বাবুরাওয়ের উপদেশ স্মরণ করিয়া সে কথার বিশেষ সমর্থন করিলাম।

যাইবার পূর্ব্বে ভোস্‌লে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীখানা দেখাইতে লাগিলেন। হলের দুই পাশে সুন্দর দুই সেট সুসজ্জিত ঘর। পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে। মেঝের উপর কারুকাজ করা গালিচা পাতা, ঘরের রংয়ের সঙ্গে পর্দ্দার রং "ম্যাচ" করা। প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়া চেয়ার, টেবিল, শেল্‌ফ। দেয়ালে কাচে বাঁধানো জরীর ফুলপাতা; মখমলের জমিনের উপর তোলা; সিল্কের সূতায় তৈরি গাছপালা, পাখী: পুঁতিতে বোনা একটি ময়ূর। ভোস্‌লে বলিলেন, এসব তাঁহার বৌদির হাতের তৈরি। এক ঘরে দেখিলাম, একটা বড় সেতার। সেখানে সেদিনের মেয়েটি বসিয়া কি ছবি আঁকিতেছিল, ও ছেলেরা বসিয়া লিখিতেছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সেতার কে বাজায়?"

ভোস্‌লে বলিলেন, "ওটা বৌদি বাজান। তবে শালিনীও সেতার বাজাতে পারে। তারপর মেয়েটির দিকে চাহিয়া

বলিলেন. "আমাদের তোমার একটা গৎ বাজিয়ে শোনাও না, শালিনী !"

আমরা ভিতরে গিয়া বসিলাম। শালিনী একটা ফুলের চিত্র আঁকিয়া তাহাতে রং দিতেছিল। কাকার কথায় সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দৃষ্টির স্থৈর্য্য ও মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া অবাক হইলাম। ভোস্‌লে আবার স্নিগ্ধ কণ্ঠে তাহাকে বাজাইতে বলিলেন। শালিনী ঘরের কোণ হইতে একটি সেতার আনিয়া বসিল। ছেলেরা লেখা ছাড়িয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। শালিনী সেতারটিকে কোলের উপর লইয়া তাহার তার ঠিক করিয়া আঙুলের ঘা দিতে লাগিল। তারপর তাহাতে একটা গৎ তুলিল। ভোস্‌লে তাহাকে গাহিতে বলিলেন। মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট কণ্ঠে একটি গান গাহিল। পূরবী রাগ, দিবা শেষের অবসাদ মাখা শূন্য গোষ্ঠের রিক্ততা ভরা !

সেই সেতারটির উপর এলাইয়া পড়া মেয়ের সুঠাম দেহভঙ্গী, সেই তারেতে তাহার চঞ্চল অঙ্গুলিচালনা, আর মেয়ের কোমল কণ্ঠস্বর ও সেতারের মৃদু মূর্চ্ছনার সহযোগে সেই উদাস-করা, ব্যথাভরা গান আমাকে সহসা অবাক করিয়া দিল। এ যেন একটা প্রাচীন জাতির বহু অভিজ্ঞতা-লব্ধ, বহু তপস্যা-দগ্ধ ভাবনার তীব্র অভিব্যক্তি, তাহাতে বাল্যের চাপল্য নাই, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নাই,—যেন জীবনের শত অশ্রু শত বেদনায় অভিসিক্ত হইয়া এ সুরের মূর্চ্ছনা নির্গত হইতেছে! সুন্দর কোমল বালিকা কণ্ঠের পূরবী রাগের গান! সেই সেতারের তারের উপর মেয়ের ছোট্ট কোমল আঙুলটির এক একটি ঘা যেন আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল !

গান শেষ হইলে আমরা নীচের ঘরে গেলাম। শুধু উপরের কোণের ঘরটা দেখা হইল না, সেখানে নিশ্চয়ই বাবুরাওয়ের বৌদি ছিলেন।

নীচের ঘর দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহাদের "দেব-ঘরের" দরজায় গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এদেশে বিলাত-ফেরতের বাড়ীতেও দেব-ঘর থাকে। তাহাতে গৃহ-দেবতার পূজা হয়। দুজনে বিস্মিত ভাবে পরস্পরের দিকে চাহিলাম। উপরে সুন্দর মঞ্চের উপর দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ছবি। তার সাম্‌নে মেঝের উপর একটা ইঁদুর মরিয়া পড়িয়াছিল। তার শাদা দুই পাটি ছোট ছোট দাঁত কতক বাহির হইয়া রহিয়াছিল, চোখ অর্দ্ধেক বুজিয়াছিল, লেজটা সোজাভাবে মেজের উপর বিছাইয়া পড়িয়াছিল। ঐ মসৃণ মেঝের উপর এই ক্ষুদ্র প্রাণহীন জীবটি একটা আতঙ্কের শিহরণ আনিল।

আমি বলিলাম, "এ নিশ্চয়ই প্লেগের ইঁদুর। মিউনিসি-পালিটির লোক ডাকিয়া এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। আর এ বাড়ীতে এখন থাকা ঠিক নয়।"

ভোস্‌লে নিজের মনের চাঞ্চল্য চাপিয়া রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

"তা' হস্পিটালে পাঠিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জান্‌তে হ'বে। চাকরেরা ইঁদুরের বিষ ছড়িয়ে রেখেছিল কিনা তারও খোঁজ করতে হ'বে।"

আমি বলিলাম, "আজকালকার দিনে সতর্ক থাকাই ভাল।"

ভোসলে বলিলেন, "তা' নিশ্চয়। তবে এক্ষণই বাড়ী পাওয়া যাবে কোথায় ? আমরা ঐ মাঠে ঘাটে চালা তুলে থাক্‌তে পারব না !"

আমি বলিলাম "বাবুরাওকে বলিব, তাঁহার সাহায্যে সিংপুরে বাড়ী পাওয়া যাইবে।"

আমি বিদায় লইলাম। তার পূর্ব্বে নীচের বারান্দায় ছেলে দুটির সঙ্গে দেখা হইল। তাহাদিগকে নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। একজনে বলিল, "শ্রীধর।" অপরে বলিল, 'সুরেশ।' আমি ভোসলেকে বলিলাম, "বাঙ্গালী নাম যে।"

ভোসলে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ যে নূতন যুগ !"

ভোসলে আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গেলেন। গাড়ীতে যখন আবদুল হ্যাণ্ডল মারিতেছিল, তখন একবার উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম সেদিনকার সে মহিলাটি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমার দিকে দৃষ্টি পড়াতেই একটু ঘাড় ফিরাইয়া নিলেন। সে অচঞ্চল অথচ সলজ্জ অঙ্গভঙ্গী আমাকে চমৎকৃত করিল। আমি আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার কপালে সিঁদুর নাই।

বাবুরাওকে যখন ভোসলদের বাড়ীর খবর বলিলাম এবং জানাইলাম যে তাঁহারা কোথায় যাইবেন জানেন না, তখন সহসা তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কোথাও গাড়ীতে, কোথাও সাইকেলে, লোক পাঠাইলেন। কাহারও সঙ্গে চিঠি লিখিয়া দিলেন। কাহাকেও বা মুখের কথায় সমঝাইয়া দিলেন। হঠাৎ বাবুরাওয়ের একখানা চিঠির কাগজের উপর দৃষ্টি পড়িল, কোণে লেখা ছিল "শ্রীধর সখারাম দেশাই।" আমি অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলাম "শ্রীধর!" বাবুরাও আমার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?" আমি নিজকে সামলাইয়া বলিলাম, "কিছু না।"

তারপর বাবুরাও খুব বৈষয়িক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাজ কি পর্য্যন্ত হয়েচে?"

আমি বলিলাম, "আগামী পরশু আমার তিন সপ্তাহ শেষ হচ্চে। সে দিনই আমার যাওয়া ঠিক। সেভাবে পুণা ও বম্বে চিঠি লিখেচি।"

বাবুরাও বলিলেন, "যদি প্লেগ না থাকৃত, তবে আপনাকে আরও থাকৃতে অনুরোধ করতাম, তবে বর্ত্তমানে তা' করা চলে না।"

ষ্টেশনে যাইবার সময় হইলে বাবুরাও বলিলেন, তিনি সে রাত্রে কিষাণপুরেই থাকিবেন, খুব কাজ আছে। আমাকে তাঁহার গাড়ী দিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি রাত্রিতে প্লেগ "এরিয়াতে" থাকৃবেন, এ কি রকম?"

বাবুরাও বলিলেন, "আমি প্লেগ-'প্রুফ' হ'য়ে গেচি, মিঃ চক্রবর্ত্তী!" তারপর বলিলেন, "এ দুদিন আপনাকে একাই থাকৃতে হ'বে, মিঃ চক্রবর্ত্তী। সঙ্গে ঠাকুর চাকর থাকৃবে, দেখবেন, আপনার খাওয়া দাওয়ার যেন ক্রটি না হয়।"

ষ্টেশনে যাইবার পথে মনে হইল, যাইবার বেলায় বাবুরাওকে মাতাল দেখিয়া গিয়াছিলাম, অথচ এখন তো তার চিহ্নও দেখা যাইতেছে না।

৭

সে রাত্রে সিংপুরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বাবুরাওয়ের সব জিনিষপত্র আমার ঘরের বারান্দায় স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। চাকর বলিল, বাবুরাওয়ের লোক কিষণপুর হইতে তার পাইয়া তাঁহার সব ঘর খালি করিয়াছে, এবং তারের লেখামত জিনিস আমার ঘরের পাশে রাখিয়াছে।

পরদিন কিষাণপুরে গিয়া বাবুরাওয়ের দেখা পাইলাম না। তিনি কি কাজে সহরের বাহিরে গিয়াছিলেন।

বিকালে সিংপুরে ফিরিয়া দেখিলাম, বাবুরাওয়ের ঘরগুলির জানালায় রঙিন পর্দ্দা ঝুলিতেছে। দরজায় চিক, মেঝের উপর সুদৃশ্য গালিচা দেখা যাইতেছে। হঠাৎ ভিতর হইতে হকি ষ্টীক হাতে নীল পোষাক পরা দুইটী ছেলে ও তাহাদের পিছনে পিঠে বেণী দোলাইয়া গোলাপী শাড়ী পরা একটী মেয়ে বাহির হইল। আমি অবাক হইয়া দেখিলাম, সেই ভোসলেদের ছেলে মেয়ে, শালিনী, শ্রীধর আর সুরেশ! আমি আমার মারাঠী বিদ্যা জড়ো করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা এখানে কখন এলে?" বড় ছেলেটি বলিল, "কাল রাত্রে।" মেয়েটি ভিতরে গিয়া তাহার কাকাকে ডাকিয়া আনিল। ভোসলে তো বিনয় ও সৌজন্যে আমাকে অভিভূত করিয়া দিলেন। বলিলেন, তাহারা সিংপুর দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছেন। এ সহর নূতন হইয়াছে, বেশ পাহাড়ে জায়গা, আর বাড়ীখানাও খুব সুন্দর! আমি বলিলাম, "বাবুরাও প্রথম এসেছিলেন বলেই ও বাড়ীখানা পেয়েছিলেন। ওটার ওপর অনেকেরই লোভ ছিল।"

ভোসলে অবাক হইয়া বলিলেন, "বাবুরাও এই বাড়ীতে থাকৃতেন? তা' হ'লে আমাদের জন্যে নিজ বাড়ী ছেড়ে দিয়েচেন! তিনি এখন থাকৃবেন কোথায়?"

একথাটা তাঁহার জানা ছিল না দেখিয়া এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহা বাহির করিয়া দিয়া আমি অপ্রস্তুত হইলাম। বলিলাম, "পরশু আমি চলে যাচ্চি। বাবুরাও একা, আমার ঘরটাতেই থাকৃতে পারবেন।"

"আপনি চলে যাচ্ছেন? আমাদের জন্য নয় তো? বাবুরাও কাল কোথায় ছিলেন? তাঁর জিনিসপত্র কোথায়? আপনাদের তো খুবই অসুবিধায় ফেলেচি আমরা!" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ক্যাপটেন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, "এ পরিবারের সঙ্গে বাবুরাওয়ের কি সম্বন্ধ? কোনও কুটুম্বিতা আছে বলিয়া তো মনে হয় না!"

রাত্রে ভাল ঘুম হইল না, বহু হিজিবিজি স্বপ্ন দেখিলাম, বাবুরাও যেন ঠিক বাবুরাও নন, মুখটা তাঁহারই, দেহটা চীনের ড্রাগনের মত, তা' যেন ভোসলেদের বাড়ীর শিশু তিনটিকে লেজের বেষ্টনে জড়াইয়া রাখিয়াছে। সবুজ শাড়ী-পরা ফুটফুটে মুখ, শালিনী যেন আমার পানে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। তাহার হাতে সেতার, তাহা হইতে যেন আপনাআপনি একটা করুণ গান বাহির হইয়া আমার মনকে ক্লান্ত করিয়া দিতেছে। ঘুম ভাঙ্গিবার আগে দেখিলাম, ভোসঁলেদের সেই কিষাণপুরের বাড়ীটা যেন আঁকাইয়া বাঁকাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই মাঝখানে জানালার ভিতর সেই মহিলাটির মুখ, তাহাতে একটা জটিল হাসি!

পরদিন সকালে কিষাণপুর ষ্টেশনে পৌছিয়াই দেখিলাম, বাবুরাও প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি নামিতেই আসিয়া ভোসলেদের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাড়ী পছন্দ হইয়াছে কিনা, দুধের বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা চাকরাণী পাইয়াছে কিনা ইত্যাদি। আমি শুধু প্রথম বিষয়ে উত্তর দিতে পারিলাম। সন্ধ্যায় বাবুরাওয়ের সঙ্গে আমার যাইবার কথার আবার আলোচনা হইল। আমি কোন্ গাড়ীতে যাইব, পুণা কখন পৌছিব, বম্বে কখন যাইব, এ সব বিষয়ের খুঁটিনাটি তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বাবুরাও সে রাত্রেও কিষাণপুর রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আগামী কাল আমি সিংপুরে আস্‌চি না। আমাকে জিনিসপত্র গোছাতে হ'বে।"

বাবুরাও ধীরভাবে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে সিংপুর ষ্টেশনে দেখা হ'বে।"

আমি একটু রহস্য করিয়া বলিলাম, "বুঝেচি, আমার ঘর খালি না হ'লে আপনি সিংপুরে আস্‌চেন না? কেন, এক ঘরে দুজনে একদিনও থাকা যায় না?"

বাবুরাও সহজভাবে বলিলেন, "তা' নয় মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি আশা করি ভুল বুঝবেন না।"

আমি বাবুরাওকে তাঁহার আথিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু বাবুরাও সে সব কথায় বিশেষ সাড়া দিলেন না।

আমার মনে হইল, আমি থাকিতে বাবুরাও সে বাড়ীতে যাইতে চান না, আমি চলিয়া গেলে যাইবেন। সে পরিবারের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি, হয়ত তাহা আমার কাছ হইতে গোপন করিতে চান।

দরজার সামনে আমাকে ষ্টেশনে লইয়া যাইতে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। আবদুল হর্ণ বাজাইল। আমি ভাবিলাম, আমার কৌতুহল নিবৃত্তির ইহাই শেষ সুযোগ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবুরাও, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

বাবুরাও আমার দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "না। তা' হ'লে আপনার গাড়ী ফেল হ'বে।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "গাড়ী ফেল হোক, তবু আমি একটা কথা জানতে চাই।"

বাবুরাও মুচ্‌কি হাসিলেন। বলিলেন "কি কথা?"

"মিসেস্ ভোসলে কে?"

"পরলোকগত ব্যারিষ্টার ভোসলের স্ত্রী, ক্যাপটেন ভোসলের ভ্রাতৃবধূ, কিষাণপুরের অতি প্রাচীন অভিজাত পরিবারের কুলবধূ!" বাবুরাও হাসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তার মুখ শুধু কুঞ্চিত হইয়া পড়িল।

আমি একটু থামিয়া বলিলাম, "আমি ভাবিতেছিলাম, ইনি তো সে-ই নন?"

"কে?

"যাঁর কথা আপনি একদিন গাড়ীতে বলেছিলেন?"

বাবুরাও চঞ্চলভাবে বলিলেন, 'তা' আপনি কি করে জান্‌লেন? তাঁরা কিছু বলেচেন?"

আমি বলিলাম, 'তাঁরা কি বলবেন? ও আমার অনুমান মাত্র।"

"অনুমান?" বলিয়া বাবুরাও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন।

আমি একটু তরলভাবেই বলিলাম, "এঁর সম্বন্ধেই পাটনে রাও সাহেব ও আপনার ঝগড়া হয়েছিল?"

বাবুরাও আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন। বলিলেন, "পাটনে বলেচে নিশ্চয়!"

আমি অবাক হইয়া বাবুরাওয়ের দিকে চাহিলাম। বলিলাম, "পাটনে এঁদের বিষয় জানবেন কি করে?"

বাবুরাও কিঞ্চিৎ থামিলেন। তাঁহার মুখের কুঞ্চিতভাব কতকটা কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'মিঃ চক্রবর্ত্তী!"

"কি?"

আপনি বাস্তবিকই এ বিষয়ে কারো কাছে কিছু শোনেন নি?"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "না।"

বাবুরাও স্থির ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "এই সেই!"

তখন আবদুল আসিয়া বলিল, "ট্রেণের পাঁচ মিনিটও সময় নেই।" আমি মোটরে গিয়া উঠিলাম। ষ্টেশনে যখন গেলাম তখন ট্রেণ ছাড়িতে উদ্যত। ছুটিয়া গিয়া আমাদের কামরাতে চড়িলাম।

সে রাত্রে নির্সী ষ্টেশনে যখন যাত্রীরা কামরা হইতে নামিয়া গেলেন তখন প্রত্যেকে আমাকে শুভইচ্ছা জানাইলেন। বৃদ্ধ নির্সীকর আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভাউসাহেব জোরে হাণ্ডশেক করিয়া কার্য্যে সাফল্য ইচ্ছা করিলেন। বাপুসাহেব ও পাটনে-রাওসাহেব আবার দেখা হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিলেন। উদ্‌গাওকর প্রীতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন, তিনি শুনিয়াছেন বাবুরাও নাকি কিষাণপুর ছাড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহার কাজ সব শঙ্কর মিস্ত্রি আর আফ্‌তাপ আলিকে দিয়া ফেলিয়াছেন! আমি শুধু অবাক হইয়া তাহা শুনিলাম।

সেরাত্রে ফিরিবার পথে কণ্ডলে ষ্টেশন হইতে বৃদ্ধ ক্যাথলিক আফিস ইনস্পেক্টর উঠিলেন। বাকী আধঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে প্লেগের কথা, কলিকাতার কথা, মাদ্রাসের কথা ও অবশেষে ক্যাথলিক ছাত্রের প্রতি প্রোটেষ্টাণ্ট শিক্ষকের বদ্‌নজরের কথা হইল।

সিংপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই ভোসলেদের চাকর আসিল। সে আমার হাত-ব্যাগটী লইয়া চলিল।

সেদিন প্রাতে কিষাণপুর যাইবার পূর্ব্বে ভোসলে আমাকে রাত্রিতে তাঁহাদের বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে আহার করিতে করিতে অনেক খোস্ গল্প হইল। অবশেষে আমি তাঁহাকে চাকরাণী ও দুধের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "বাবুরাওয়ের লোকে উভয়েরই সুবন্দোবস্ত করেচে। বাবুরাও আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টস্বীকার করেচেন!"

খাবার পর ভোস্‌লে আমার ঘরে আসিয়া নানা গল্প করিতে লাগিলেন। আমি আনন্দের সহিত তাহা শুনিতে লাগিলাম। আমার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল, তাহা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। হঠাৎ বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, অপর দিকের বারান্দায় মিসেস্ ভোসলে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন, তার পাশে শালিনী চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ের উপর মুক্ত জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের পেছনে অস্পষ্ট পাহাড়-রাশি জ্যোৎস্নার স্পর্শে এক অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। কথা বলিতে বলিতে এক একবার বাহিরের দিকে চাহিতেছিলাম, আর দেখিতেছিলাম, সেই ধূসর পাহাড়-রাশিকে পেছনে রাখিয়া উজ্জল জ্যোৎস্নালোকে মেয়ে মায়ের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ের শুভ্র বসন জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝলসিয়া উঠিতেছে।

ভোসলে চলিয়া গেলে আমি কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বারান্দায় দেখিলাম, শালিনী চলিয়া গিয়াছে, মিসেস্ ভোসলে একা রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। জ্যোৎস্নায় অতি অস্পষ্টভাবে তাঁহার মুখ দেখা যাইতেছে। তাঁহার দেহ স্থির, নিস্পন্দ; দৃষ্টি বোধহয় ঐ জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছিল।

আমি দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, কাল হইতে বাবুরাও এ বিছানায় শুইবেন, আমি থাকিব বোম্বের পথে! বাবুরাও একদিন এ মহিলাটিকে ভালোবাসিয়াছিলেন! হয়ত আবার ভালোবাসিবেন। তখন শালিনী ও-ভাবে মায়ের গা ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে কি?

৮

তার পরদিন সিংপুরে আমার শেষ দিন। প্রভাতে পাহাড়ের উপর যখন সমতল ভূমির আধঘণ্টা আগেই কোমল

রোদ ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম। তার পূর্ব্বেই ভোসলে-পরিবার উঠিয়াছিলেন। প্রভাতে স্মিতমুখে ক্যাপটেন আমাকে সুপ্রভাত জানাইলেন ও চা খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। চা-ঘরে গিয়া দেখিলাম, তাঁহার বৌদিও সেখানে। তিনি ছেলেমেয়ে-সহ আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়াই চা খাইলেন। আমার সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা-সূচক দুচারটা কথা হইল। তিনি সুন্দর ইংরেজী বলেন। তাহার কথার ভিতর এমন একটা সৌজন্য মেশানো ছিল যাহা শুধু অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; যেন ফুলের সৌরভের মত, সে প্রভাতের রৌদ্রের মৃদু আভার মত।···

শালিনী গতদিনের আঁকা ছবিখানি মাকে আনিয়া দেখাইল। তিনি আমাকেও তাহা দেখাইলেন, বলিলেন বম্বেতে রীতিমত ওয়াটার পেন্টিং শিক্ষা দেওয়া হইত, এখানে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।" আমি বলিলাম "তবে এখানে নেচার ষ্টাডি করবার সুযোগ পাবে।"

মিসেস ভোসলে মৃদু হাসিয়া বলিলেন "সুযোগ পেলেই তো হ'ল না, ষ্টাডি করতে প্রথম শেখা চাই!" হাসির মধ্যে স্থৈর্য্য ও মাধুর্য্যের এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সুন্দর ফুলটি আঁকিয়াছিল শালিনী। তাহা খুব বাস্তব ধরণের নয়, তবে প্রত্যেকটা রেখাপাতের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বোধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। শালিনী এগারো বারো বছরের মেয়ে, মায়ের চেয়ারের পাশে সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কপালে অতি ছোট একটী সিঁদুরের টিপ ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল।

দুপুরের গাড়ীতে বাবুরাওয়ের লোক আসিল। ঘর দরজা ঠিক ঠাক করিতে লাগিল, জিনিস সব গুছাইতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, আজ আমি, কাল হইতে বাবুরাও ঐ ঘরের বাসিন্দা!···তা'তে কি? তবু যেন মনে কেমন ঈর্ষা জাগিতেছিল।

লোকটি বলিল, বাবুরাও সন্ধ্যার গাড়ীতে আসিবেন। সে বাবুরাওয়ের বিছানা ট্রাঙ্ক ইত্যাদি নিতে আসিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবুরাও কোথায় যাবেন?"

লোকটা বলিল, "তিনি কোথায় যাবেন বলেন নাই।"

বিকাল হইল, সন্ধ্যা ঘনাইল, আমার যাইবার সময় নিকট হইয়া আসিল। ক্যাপটেন তো আমাকে একরকম পাইয়াই বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, আবার এদিকে আসিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অতিথি হইতে হইবে, কলিকাতা যাইতে যেন মধ্যভারতের পথে যাই ও তাঁহার কাছে হইয়া যাই ইত্যাদি। ছেলেরা উঠানে খেলিতেছিল, ছোট্ট কালো কুকুরটা ছুটিয়া ছুটিয়া মুখে করিয়া বল আনিয়া দিতেছিল।

তখন যদি আমাকে বলা হইত, 'তুমি কি পাইলে সবচেয়ে সুখী হও?' তবে আমি কি চাহিতাম? শালিনী একটা গান গাহিয়া শুনাক্, না মিসেস্ ভোসলে মেয়ের ওয়াটার-কালার পেন্টিং শিখার কথাটা তেমনই সৌষ্ঠবের সহিত আবার বলেন? না ক্যাপটেন ভোসলের আর একটা গল্প? না ঐ ছোট্ট, কালো মিশমিশে, লম্বা লম্বা লোমওয়ালা 'পমারেনীয়ান' কুকুরটা?···

সূর্য্য পাহাড়ের কোলে ঢলিয়া পড়িল। আকাশের গায়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শেষ জ্যোতিটি লাগিয়া রহিল। আমি আমার সমস্ত গোছানো সমাপ্ত করিলাম।

তারপর ষ্টেশনে রওয়ানা হইলাম। ক্যাপটেন আমার সঙ্গে আসিলেন। কালো কুকুরটাও তাঁহার সঙ্গ লইল। ছোট্ট ষ্টেশন, লোকের ভিড় নাই। ট্রেণে বাবুরাও আসিলেন। সে-ষ্টেশনে ট্রেণ অতি অল্প সময় থামে। ভোস্‌লে বাবুরাওকে খুব ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহার ও আমার সঙ্গে হৃদ্যতার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদূর যাচ্ছেন?" বাবুরাও বলিলেন, "পুনা"।

"শিগ্‌গিরই ফিরচেন্ তো?"

"তা ঠিক বলতে পারি না।"

ভোসলের চাকর আমাদের কামরায় এক ঝুড়ি খাবার আনিয়া রাখিল। বলিল, "মাঈ-সাহেব দিয়াছেন।"

বাবুরাওয়ের লোক তাঁহার ও আমার মালপত্র ব্রেকে উঠাইল। গাড়ী সিংপুর ত্যাগ করিল।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাবুরাও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সে-কামরাতে আর কোনও প্যাসেঞ্জার ছিল না। কামরাখানি

অতি মূল্যবান বিলাতী মদের সৌরভে আমোদিত হইয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক পর বাবুরাও কথা বলিলেন। তাঁহার স্বর ভারী, মনে হইল পানটা একটু অধিক মাত্রায়ই করিয়াছেন। বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আশা করি আপনি কিষাণপুরের মিউজিয়াম হ'তে যেসব বিষয় সংগ্রহ করবেন বলে' স্থির করেছিলেন, তা' সংগ্রহ করতে পেরেছেন?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ।"

বাবুরাও বলিলেন, "দেখবেন, তা যেন লিখে' শেষ করে ফেলেন। আশা করি আপনার পরিশ্রম সার্থক হ'বে।"

আমি মাথা নাড়িলাম।

বাবুরাও আবার বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। দুদিকে মাঠ ও জ্যোৎস্না-প্লাবিত পাহাড় অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানা দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমাদের কামরার মাঝখানে গ্যাস্ লাইট উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল, জানালা দিয়া তার আলোক জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া গলিয়া পড়িতেছিল। গ্যাসালোকের কাচের নীচে গুটিকতক পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং এক একবার কাচে গিয়া ধাক্কা খাইতেছিল।

আমি বাবুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি পুনায় কয়দিন থাকিবেন এবং কবে ফিরিবেন।

বাবুরাও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা' বলতে পারি না। নিশ্চয়ই শিগ্‌গির নয়।"

আমি বলিলাম, "শুনচি আপনি কাজ গুটিয়ে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?"

"কে বল্লে?"

আমি উদ্‌গাওকরের নাম করিলাম। বাবুরাও বলিলেন, "বর্ত্তমানে তাই সঙ্কল্প করেচি। আপনি এতে নিশ্চয়ই অবাক হয়েচেন?"

"নিশ্চয়! ক্যাপটেন ভোসলেরাও খুব অবাক হ'বেন, কেননা তাঁদের আমি বলেচি আপনি আমার ঘরটায় গিয়ে থাকবেন।"

বাবুরাও চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আপনি একথা বলেচেন? তাঁরা কি বল্লেন?"

আমি বলিলাম, "কিছু না।" তারপর বলিলাম, "তাঁরা আপনার সাহায্যের জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি তো বেশ লোক, নিজের বাড়ী পরকে দিয়ে দেশান্তরে চলেছেন!"

বাবুরাও বলিলেন, "তা' না করলে বিধাতাকে প্রলুব্ধ করা হ'ত!--We should not tempt Fate!"—তাঁহার কথার সুরে মাতলামির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল।

আমি বলিলাম, "তার মানে?"

বাবুরাও হঠাৎ প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি বাঙালী, আমার বন্ধু বাবু সুকুমার রায় আর দাশরথি মিত্রের স্বজাতি। আজ আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। যে কথা গত পনর বৎসর যাবৎ জগতে কেউ জানতে পারে নি আজ আপনার কাছে তা' খুলে' বলব।"

আমি বলিলাম, "কি সে কথা বাবুরাও?"

বাবুরাও বলিলেন, "একদিন এ-গাড়ীতে, এই কামরাতে বসেই আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি জীবনে কাকেও ভালবেসেচি কিনা। আমি আপনার কাছে সুমিত্রার কথাই বলেছিলাম। সেদিন জানতাম না সে দশ বৎসর পরে আবার আমার সংস্পর্শে আসবে।

আমি বলিলাম, "মিসেস ভোসলে?"

বাবুরাও বলিলেন, "হ্যাঁ, সুমিত্রাই মিসেস ভোস্‌লে হয়েচে। ছেলে বেলায় তাদের আমাদের পাশাপাশি বাড়ী ছিল। সে আমার কাছে পড়া শিখত, দুনিয়ার সব খবর জিজ্ঞাসা করত। আমি তার এক গুরু ঠাওরেছিলাম।—আমি জানতাম, সে তার প্রথম যৌবনের নির্ম্মল হৃদয়টি দিয়ে আমায় ভালোবাসত। কিন্তু অসময়ে আমার বিয়ে হ'য়ে গেল। সে পড়াশোনা করতে লাগল, তার কিছুকাল পর আমি আমেরিকা গেলাম। ফিরে এলে পরে আবার দুজনের মধ্যে যে কেমন করে পূর্ব্বভাব ফিরে এল তা' আমি জানতেও পারলাম না।"

বাবুরাও বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "সে যে আমাকে কত ভালোবাসত, আর আমি তাকে কত ভালোবাসতাম, সে কথা বুঝতে পারলাম তখন, যখন সে-বোঝার কোনও সার্থকতা রইল না। আমেরিকা থাকতেই আমার পত্নী-বিয়োগ হয়—আমার ছেলেবেলায় বিয়ে করা স্ত্রী, যার সঙ্গে

আমার পরিচয়ই হয়নি। আমেরিকা হ'তে ফিরে এসে ইচ্ছা করলেই আমি সুমিত্রাকে বিয়ে করতে পারতাম, কিন্তু কাজের ভিড়ে সে-কথাটা সে-রকম করে ভাবি নি। এক বছর গেল, দুবছর গেল,—আমি তা'কে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেও তা'কে পেতে চাইলাম না। অবশেষে সে বিয়ে করলে ব্যারিষ্টার ভোস্‌লেকে।"

তারপর আবার বলিতে লাগিলেন, "বিয়ের পর সে বম্বে চলে গেল। তখন আমার জীবনে যে তার কি স্থান তা' বুঝতে পারলাম।"

আমি বলিলাম, "ইনিই পাটনে রাওসাহেবের বিষয়ে আপনার মত শুনে' হেসে কুটি কুটি হয়েছিলেন?"

বাবুরাও বলিলেন, "হ্যাঁ। সুমিত্রা প্রথম জীবনে খুব হাস্য-প্রবণ ছিল। বিয়ের পর প্রথম তিন চার বছর কয়েক-বার তার সঙ্গে দেখা হয়েচে, তবে একটি কথাবিনিময়ও হয় নি! এত বৎসর পর ঘটনাচক্রে সে আবার আমার পথে এসে পড়েচে! ঘটনার চক্র কেমন নির্ম্মম, মিঃ চক্রবর্ত্তী!"

বাবুরাওয়ের প্রতি আমার চিত্ত সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "তা' হ'লে এতকাল আপনি তাঁকে ভালোবেসে এসেচেন?"

বাবুরাও নিরুত্তর রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। সেখানে যখন সে এসে দাঁড়ায়, তখন তা'কে অতি সাবধানে পা ফেল্‌তে হয়, মিঃ চক্রবর্ত্তী!"

আমি তরলভাবে বলিয়া গেলাম, "বাবুরাও, ভালোবাসাকে আপনি ভয় করেন? জগতে ভালবাসার চেয়ে সুন্দর জিনিস আর কি আছে?"

বাবুরাও বিষণ্ণভাবে হাসিলেন। বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি ছেলে-মানুষ। ভালোবাসা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই শুধু বইয়ে পড়েচেন। তার জীবন্ত স্বরূপ যে কি তা' প্রত্যক্ষ করেন নি।"

আমি বলিলাম, "তিনি আপনাকে ভালোবাসেন?"

বাবুরাও কিছুকাল গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, "তা' আমি জানিনে, জানতে ইচ্ছাও করি নে। মিঃ চক্রবর্ত্তী, আপনি ওসব অভিজাতদের বিষয় জানেন না, মনে হয়?"

"কি রকম?"

"তাদের পুরুষেরা এমন পাপ নেই যা' না করবে, এমন নীচতা নেই যা' থেকে মুখ ফিরে দাঁড়াবে। এ ভোস্‌লে পরিবারের দুটা জারজ শাখা আছে তা' জানেন?"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "না!"

বাবুরাও বলিলেন, "আমার মিস্ত্রিকে জানেন, ঐ যে ছুতোরের কাজ করে,—সেও ভোস্‌লে, তাদেরই বংশের শাখা—"

আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ করিতে যাইতেছিলাম, বাবুরাও বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তাদের মেয়েদের দেখুন, বংশানুক্রমে সেই পর্দ্দার আড়ালে জীবন কাটাচ্চে, কি সংযম, কি কঠোরতা তাদের ভিতর! তারা যখন সমাজে বেরোয়, তখন লোকে দেখে তারা গর্ব্বিতা, তারা তাদের পোষাকে গয়নায় সবাইর চোখে তাক লাগিয়ে দেয়,—কিন্তু তাদের প্রাণের খবর ক'জনে রাখে? যদি রাখত, তবে জান্‌ত, সে-প্রাণ সে-আভিজাত্যের চাপে কেমন হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু তবু তারা সে আভিজাত্যের গর্ব্ব দিয়েই নিজেদেরে আগলে' রাখে!"

বাবুরাওয়ের মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছিল। তিনি নেশার ঘোরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ওসব মেয়েমানুষের প্রেম মানে আপনার ঝি, চাকরাণী, বোষ্টুমীর প্রেম নয়, যে 'হাঁ' করতেই 'হুঁ' করে উঠবে, চাওয়া মাত্রই নিজকে বিলিয়ে দেবে! না মিঃ চক্রবর্ত্তী, তা' যদি হ'ত তবে আজ ছয় বছর পরে সুমিত্রা আমার দিকে ওরকম নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চাইত না!"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "কিন্তু তিনি তো আপনাকে প্রথম জীবনে খাঁটিভাবে ভালোবেসেছিলেন? আপনি বোধ হয় জানেন যে তাঁর বড় ছেলেকে আপনার নাম দেওয়া হয়েচে। সেটার নিশ্চয়ই অর্থ আছে।"

বাবুরাও মাথা তুলিয়া স্থিরভাবে আমার দিকে চাহিলেন, তারপর কাঁপা স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, সুমিত্রা আমাকে ভালোবেসেছিল একথাটা যত সত্য, সে আমায়

আবার ভালোবাসবে এরূপ আশা করাটা তেমনই মিথ্যা! আমি তা'কে ছেলেবেলা হ'তে জানি, সে সে-জাতের মেয়েই নয়!"

আমি সমালোচনার সুরে বলিলাম, "মেয়েদের মধ্যে আবার জাত আছে নাকি?"

বাবুরাও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ভাঙা গলায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "নিশ্চয়! জগতে দুরকম মেয়ে মানুষ আছে, মিঃ চক্রবর্ত্তী! এক রকম প্রজাপতির মত, তারা সুন্দর, তারা বিলাসপ্রিয়, তারা চঞ্চল আনন্দশীল! রূপ-যৌবন তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা দিয়ে তারা জগৎকে পায়ের তলায় টেনে আন্‌তে চায়।—তাদের নিয়েই জগতের সব কাব্য উপন্যাস তৈরি হয়। তাদের হাসিতে ফুল ফোটে, অশ্রুতে মুক্তা ঝরে, গতিতে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগে।

"আর এক রকম মেয়ে মানুষ আছে, তারা পাখীর মত। পাখীরা দেখবেন, দিনের পর দিন ঠোঁটে করে খড়কুটা নিয়ে আসে, নিরাপদ দেখে একটা কোণ খুঁজে নেয়, সেখানে বাসা বাঁধে। বাসাটাই এদের জীবনের কেন্দ্র, তা' রক্ষা করবার জন্যে প্রবল শত্রুর সঙ্গেও ক্ষুদ্র ডানা দুটি মেলে' লড়বে, শত্রুর পাখার দাপটে সে ডানার সরু হাড় ভেঙ্গে যাবে, রক্তে রক্তাক্ত হ'বে, তবুও সে বাসাটি ছেড়ে যাবে না। সে-মেয়েমানুষেরাও তেমন। গৃহই তাদের জীবনের কেন্দ্র। গৃহের জন্যে তারা নিজকে উৎসর্গ করে দেয়। সূর্য্য-কিরণের মধ্যে যেমন রামধনুর সাতটা রংই লুকিয়ে থাকে, তাদের প্রাণের ভিতরও তেম্‌নি জীবনের কাব্য, আর্ট রোমান্স সব মিলিয়ে যায়, বাইরে শুধু একটা শুভ্র তেজ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আপনাদের কবি আর্টিষ্টের পক্ষে এরা গদ্যময়। এদের জীবনে বৈচিত্র্য নেই, ব্যভিচার নেই, ডাইভোর্স নেই,—এরা একটা ভাবনা, একটা আদর্শ, একটা কল্পনা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়!"

বাবুরাও ক্ষণেক থামিয়া আমাকে নীরব দেখিয়া, আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, মেয়েদের মধ্যে, ব্রাহ্মণ মারাঠা, বাঙালী, পাঞ্জাবী, ইংরেজ, ইয়াঙ্কি, এ-সব ভেদ নেই, তারা সব এক; ভেদ আছে শুধু ঐ দুই জাতের।"

বাবুরাওয়ের কথা শেষ হইলে আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বাবুরাও মুখ ফিরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। দূরে পাহাড়শ্রেণী জ্যোৎস্নায় ঢাকিয়া রহিয়াছিল।

তারপর পকেট হইতে দিয়াশলাই ও বিড়ি খুলিয়া বহুক্ষণ নিবিষ্টভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

আমি ঝুড়ি খুলিয়া ভোসলের বাড়ী হইতে দেওয়া খাবার উভয়ের মধ্যে বাঁটিয়া লইলাম। বাবুরাও রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি খান, আমি পরে খাব 'খন।"

আমার খাওয়া হইলে বাবুরাও ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন, "রাত্রি এগারোটা হয়েচে, এবার ঘুমিয়ে পড়ুন, মিঃ চক্রবর্ত্তী।"

আমি শুইয়া পড়িলাম, এবং সত্বরই ঘুম আসিল। তারপর এক একবার ঘুম ভাঙিলে চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইতাম, খোলা জানালার পাশে বসিয়া বাবুরাও একান্তমনে বিড়ি টানিতেছেন, আর যেন দূরের ঐ জ্যোৎস্নাস্নাত পাহাড়-মালার মধ্যে তাঁহার মন ডুবিয়া আছে।

প্রভাতে বাবুরাও আমাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিলেন। গাড়ী তখন পুণায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কুলি ডাকিয়া মাল দিলেন। রাত্রির অভুক্ত মিষ্টিগুলি ঝুড়িতে তুলিয়া লইলেন।

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তী, চলুন একবার গরম চা খাওয়া যাক।" আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, চোখের আরক্ত ভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। মদের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়া বাবুরাও চা, টোষ্ট, বিস্কিট সব একে একে অর্ডার দিতে লাগিলেন, এবং দৃঢ় হস্তে সে সব একের পর এক গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন।

সে হলটাতে আরও অনেক লোক বসিয়া খাইতেছিল।

আমি বলিলাম, "বাবুরাও তা' হ'লে আপনি সিংপুরে বা কিষাণপুরে শিগ্‌গির ফিরচেন না?"

বাবুরাও অতি বুভুক্ষুভাবে মাখন ও জ্যাম মাখা একখানা টোষ্ট গিলিয়া বলিলেন, "সে কথাই কাল সারারাত ধরে ভাব্‌চি। আমার একটা ভারি দুর্ব্বলতা আছে, মিঃ চক্রবর্ত্তী। একটু বেশী পান করলে মনটা অতিরিক্ত রকম senti-

mental (ভাবপ্রবণ) ও idealistic (কল্পপন্থী) হ'য়ে পড়ে! ওসব আইডিয়ালিজম কিছু নয়! জীবন যখন যে দিকে চলে, চল্‌বে; তাকে নিয়ে অত টানা-হেঁচড়া করে লাভ কি?"

আমি অবাক হইয়া বাবুরাওয়ের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, পানের দোষ কাটিয়া গিয়া তাঁহার চোখ দুটি নিস্তেজ, নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার বহু রেখা বিশিষ্ট কপালটি কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে।

আমি বলিলাম, "উদ্‌গাওকর বলেছিল, আপনি সব ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেচেন?"

বাবুরাও বৈষয়িক ভাবে বলিলেন, "ব্যবসা আবার গুটানো কি? হাতের দুচারটা কাজ অন্যকে দিয়েচি। আজকাল 'ডিপ্রেশনের' দিনে ব্যবসাই বা কি!"

বাবুরাও মুচকি হাসিলেন। সে হাসিটির মধ্যে যেন তাঁহার সমস্ত সাংসারিক অভিজ্ঞতা মূর্ত্তি গ্রহণ করিল!

কাল রাত্রিতে, নেশার ঘোরে, বাবুরাও ছিলেন কবি, ভাবুক, কল্পলোকের অধিবাসী; আজ প্রভাতে, নেশা কাটিয়া গিয়া, তিনি আবার নিপুন, কর্ম্মঠ, প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, নেশার সঙ্গে সঙ্গে শুধু উত্তেজনা কাটিয়া যায় নাই, সমস্ত ভাব-প্রবণতা, আইডিয়ালিজম্ চলিয়া গিয়াছে!

আমি বলিলাম, "সিংপুরে আপনি আমার ঘরটায় তো বেশ সুবিধামতই থাকতে পারেন?"

হঠাৎ বাবুরাওয়ের মুখ জটিল হইয়া পড়িল। চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলিল। যেন বলিতে চাহিলেন, "তোমার মত ছোকরার ওটুকু সামান্য চালাকি আমি আর বুঝি না!"

রিফ্রেশমেণ্ট রুম হইতে আমরা উভয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে আসিলাম। আমি বম্বে মেলে উঠিয়া বসিলাম। বাবুরাও দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আমার পুনা-প্রবাসী এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন,—পূর্ব্বে তাঁহাকে খবর দিয়াছিলাম। আমি বাবুরাওয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিলাম। বাবুরাও তাঁহার পোষাক দেখিয়া প্রথম ভাবিয়াছিলেন তিনি মহারাষ্ট্রী। যখন জানিলেন তিনি বাঙালী, তখন খুব হৃদ্যতার সহিত তাঁহার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন,—"বাঙালীর সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ট পরিচয়। নিউ ইয়র্কে বাবু সুকুমার রায় আর দাশরথি—"

গাড়ীর সিটি পড়িল। বাবুরাও বাক্যটা শেষ করিয়া বলিলেন, "মিঃ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গেও তিন সপ্তাহ বেশ কাট্‌ল। প্লেগের জন্য তিনি আর থাক্‌তে পারলেন না, থাক্‌লে—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "বাবুরাও তা' হ'লে আপনি কবে সিংপুর ফিরচেন?"

বাবুরাও বলিলেন "ও-বিষয়ে এত ব্যস্ততা কেন?"

আমি বলিলাম, "সন্ধ্যায় আবার মত বদলে যেতে পারে!"

বাবুরাও গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না, মিঃ চক্রবর্ত্তী, আমি সংকল্প করেচি, আর মদ স্পর্শও করবো না!"

আমার বন্ধুটি অবাক হইয়া চাহিলেন। আমিও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বাবুরাওয়ের মুখের দিকে চাহিলাম। গাড়ী ছাড়িল। বাবুরাও হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, এবং যতদূর দেখা যায় আমার দিকে চাহিয়া রুমাল উড়াইতে লাগিলেন।

আমার মনে হইল, রুমালটা যেন নাচিয়া নাচিয়া বলিতেছে, "আজই সিংপুরে যাব, তোমার ঘরটাতেই থাক্‌ব। নেশার ঘোরে ত্যাগকে ভোগের চেয়ে বড় করে দেখেছিলাম, আভিজাত্যকে ও মাতৃত্বকে অপরাজেয় মনে করেছিলাম! এখন হ'তে আমি মাতাল নই, ভাবপ্রবণ নই; আমি sober (স্থির-চিত্ত)! আমি প্র্যাকটিকাল!"

কিষাণপুরের সেই তাম্রলিপির নকলগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে কতসব স্মৃতি মনে আসে। আবার যদি শীঘ্র সেখানে যাই, তবে প্রথম গবেষণার বিষয় হইবে, শালিনী ওয়াটার-কলার পেন্টিংএ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আর সে এখনও সন্ধ্যাবেলায় আগের মত, মায়ের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিনা!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

ঘুড়ি

শ্রীযুক্ত এস্ ওয়াজেদ আলি বি-এ (কাণ্টাব) বার-এট্-ল

ঘুড়ি ওড়ান, ঘুড়ি ওড়ান দেখা, নিজের ঘুড়ি নিয়ে অপরের ঘুড়ির সঙ্গে লড়াই করা, এ-সব ছেলে বেলায় বিশেষ ভাবেই আমি উপভোগ করতুম। শৈশবের বেশীর ভাগ কথাই মনে নেই, কারও থাকে না। তবে যে-সব ঘটনা মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছে, অন্তরে ভাবের বিচিত্র তরঙ্গ তুলেছে, তাদের ছবি আমার মানস পটে চিরকালের জন্য আঁকা রয়ে গেছে। যখন বিরলে বসে থাকি, যখন বিশেষ কোন কাজ কর্ম্ম থাকে না, কিম্বা যখন বর্ত্তমানের ক্রূরতার দরুণ অন্তরে জীবনের উপর বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, তখন অতীতের এই স্মৃতিগুলি একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত এসে আমাদের জীবনকে রসাভিষিক্ত করে, অতীতের খাতিরে বর্ত্তমানকে সহনীয় করে, আর সেই অতীতের খাতিরেই ভবিষ্যতের জন্য কাজ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। অতীতের সেই মধুর স্মৃতিগুলি না থাকলে, বর্ত্তমান তো অসহনীয় হতোই, তা ছাড়া, ভবিষ্যতের জন্য বাঁচতেও আমাদের প্রবৃত্তি হত না। আমার জীবনের অতীতের সেই স্মৃতিগুলির অনেকগুলির সঙ্গে ঘুড়ির বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। তাদের বিষয়ই এখন দুএক কথা বলা যাক।

বয়স তখন আমার ছয় বৎসরের বেশী নয়। মাঠে আমি ঘুড়ি উড়াতে গিয়েছিলুম। নিয়ম মত সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাড়ি ফিরলুম। অস্তগামী সূর্য্যের গোলাপী আভায় তখন আকাশ বাতাস, গাছ পালা, ঘরবাড়ি, এক কথায় সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি অনুরঞ্জিত হয়েছিল। সে রংএর ছাপ আমার শিশু অন্তরকেও রাঙিয়ে তুলেছিল। মাঠের ঘুড়িদের কথা ভাবতে ভাবতে আমি মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। মার মুখে তৃপ্তি এবং আনন্দের এমন একটা মধুর হাসি ফুটে উঠেছিল, আর অস্তগামী সূর্য্যের স্নিগ্ধ আভায় সে হাসি এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে আমি তাঁকে আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারলুম। না উত্তরে কিছু না বলে প্রসন্ন মুখে তিনি ঘরের ভিতর চলে গেলেন, আর প্রকাণ্ড একটা বেগুণে রংএর ঘুড়ি এনে আমার হাতে দিলেন। অত বড় একটা ঘুড়ি উড়াবার সৌভাগ্য তখন পর্য্যন্ত আমার হয়নি। সে-ঘুড়ি পেয়ে আনন্দে আমি নাচতে লাগলুম, আর কেমন করে মা সে-ঘুড়ি যোগাড় করলেন সে-বিষয় তাঁর উপর প্রশ্নের বাণ অজস্র ধারে বর্ষণ করতে লাগলুম। কাটা ঘুড়ি আকাশ পথে ভেসে যাচ্ছিল; তিনি তাড়াতাড়ি সূতো ধরে সেটিকে হস্তগত করেন; আর সে-ঘুড়ি পেলে আমি খুব খুশী হব বলে আমার জন্য সেটাকে তুলে রাখেন! মা ঠিকই বুঝেছিলেন। দৈবলব্ধ সেই ঘুড়ি পেয়ে আমি নিজেকে সেদিন যেমন ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলুম, পরে পরীক্ষা পাশ করে কিম্বা চাকরী পেয়ে কিম্বা অন্য কোন বড় রকমের কৃতকার্য্যতা লাভ করে, ঠিক ততটা সৌভাগ্যবান বলে নিজেকে কখনও মনে করতে পারিনি। মার সেই স্নেহোজ্জ্বল হাসি মাখা মুখ, বেগুণে রংএর দৈবলব্ধ সেই অপরূপ ঘুড়ি, গোলাপী আভায় রঞ্জিত ঐন্দ্রজালিক সেই বিশ্ব-প্রকৃতি, আমার মনে, চিরতরে তাদের ছাপ রেখে গেছে। অতীতের কথা ভাবলেই সেই স্বর্গীয় দৃশ্যটা আমার মানস-পটে জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠে!

তখনকার আর একটী ঘটনা আমার মনে একান্ত স্পষ্ট ভাবে আঁকা আছে। বেলা তখন তিনটা কি চারটা। মাঠের ধারে একা বসে আমি ঘুড়ি উড়াচ্ছিলুম। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশে, মনের আনন্দে উড়তে উড়তে, ঘুড়িটি ক্রমেই উপরে উঠছিল। বিহ্বল নয়নে আমি তাই দেখছিলুম। হঠাৎ কোথা থেকে ধূসর বর্ণের একরাশ মেঘ এসে আকাশ অন্ধকার করে দিলে। আমার ছোট ঘুড়িটি সেই মেঘের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল। ঘুড়িকে সহসা অদৃশ্য হতে দেখে

আমার মনে অভূতপূর্ব্ব এক ভাবের সঞ্চার হল! মনে হল, ঘুড়ি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে চলে গেছে! সেখানকার জনপ্রাণী সবই যেন ভিন্ন! ঘুড়ি আমায় ভুলে তাদের সঙ্গেই এখন মেলামেশা করছে। প্রবীণদের কাছে শুনা হুর পরীদের কথা, ফেরেস্তাদের কথা, জীনেদের কথা আমার মনে এল। অবর্ণনীয় এক ত্রাসের আবেগে আমি লাটাইয়ে সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামাতে আরম্ভ করলুম। ঘুড়ি দৃষ্টিগোচর হল—কি দীর্ঘ এক যুগের পর (আমি অবশ্য ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাই বলছি; ঘড়ির সময়ের কথা বলছি না)! যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুড়ি নামিয়ে দ্রুতগতিতে আমি বাড়ি ফিরে এলুম—কম্পিত কলেবরে, যেন পরীদের কথা ভাবতে ভাবতে! সেদিনকার সেই অনুভূতির কথা এখনও ভুলতে পারিনি, কখনও পারবো বলে তো মনে হয় না!

শৈশবের এই রকম দুচারটে ঘটনা, নিশ্চয় প্রত্যেক পাঠকের স্মৃতির চিত্রাগারে জলজলে রংএ আঁকা আছে। সেই ছবিগুলিই অতীতের অনুভূতিকে আবার আমাদের মনে নূতন করে জাগিয়ে দেয়, আর তাদের কল্যাণে কালের গর্ভে লীন অতীতকে আমাদের সুখদুঃখ ভরা বাস্তব জীবনের অপরিহার্য্য একটা অংশ বলে আমরা চিনতে এবং অনুভব করতে পারি; আর তাদের কল্যাণেই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল এই জীবনের মধ্যে আমাদের স্থায়ী আত্মার (ব্যক্তিত্বের) সন্ধান পাই। অতীতের সুখ দুঃখের স্মৃতি-ভরা সেই আলেখ্যগুলি সত্যই আমাদের অমূল্য সম্পদ! তারা না থাকলে, নিজেদেরই আমরা চিনতে পারতুম না!

যাক, ওসব জটিল দার্শনিক তত্ত্ব ছেড়ে ঘুড়ির কথাই বলা যাক। ছেলেবেলায় ঘুড়ি উড়িয়ে কেন আমরা অত আনন্দ পাই? অন্তরের কোন তন্ত্রী স্পর্শ করে, ঘুড়ি আমাদের প্রাণে এই অপরূপ রসতরঙ্গের সৃষ্টি করে? ঘুড়িতে এমন কি আছে, যার দরুণ, তাকে কেনবার জন্য, তাকে উড়াবার জন্য, তাকে নিয়ে লড়াই করবার জন্য, লাটাই হাতে করে তার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার জন্য আমরা ব্যাকুল হই?

ঘুড়ির যে জিনিসটির উপর প্রথম আমাদের দৃষ্টি পড়ে সেটি হচ্ছে তার রং। উজ্জল রংএর সঙ্গে শিশু-প্রাণের বিশেষ এক ঘনিষ্টতা আছে। ছোট দুগ্ধপোষ্য শিশুকে লাল রং দেখে আনন্দে অধীর হতে পাঠক অবশ্যই দেখে থাকবেন। আমার ছোট ছেলেটিকে সেদিন লাল, সবুজ, বেগুণে প্রভৃতি রংএর সেলিলয়েডের কয়েকটী খেলানা এনে দিয়েছিলুম। তাদের রংএর বাহার দেখে আনন্দে সে একেবারে আত্মহারা হয়েছিল। সাত রাজার ধন মাণিক হাতে পেলেও তার চেয়ে বেশী আনন্দ তার হত না!

সত্যই, রংএর জলুস দেখে ছেলেবেলায় মনে আনন্দের যে অবর্ণনীয় হিল্লোল উঠতো, সেটীকে ফিরে পাবার জন্য অনেক কিছু দিতে আমি প্রস্তত আছি। পায়রার লাল ঠোঁট, দুধের মত সাদা পালক, আর সুন্দরীর আলতা-দেওয়া পায়ের মত সুগঠন পাগুলি দেখে যে আনন্দের প্লাবন আমার অন্তরে আসতো তার স্মৃতি কখনও ম্লান হবে না। হাফেজের কথায় "আজ মান্ জান্ বেরওদ্, ওআজ জান্ আন্ না রাওদ্" (শরীর থেকে প্রাণ চলে যেতে পারে, কিন্তু প্রাণ থেকে সে জিনিস কখনও যাবে না)!

ঘুড়ির এই রং হচ্ছে আমাদের তরুণ চিত্তকে আকৃষ্ট করবার অন্যতম ম্যাগনেট (magnet)। শিশু-চিত্তের উপর রংএর কেন এত প্রভাব, সে-বিচার মনস্তত্ত্ববিদেরাই করবেন। আমি এখানে এইটুকু মাত্র বলতে চাই যে, রংএর এই সম্মোহনী শক্তি হচ্ছে, শিশু-মনস্তত্ত্বের অন্যতম মূলগত জিনিস, Basic fact। আর, রংএর ইন্দ্রজাল কি কেবল এই শিশু-চিত্তেই সীমাবদ্ধ? রং কি শিশু, কিশোর যুবা, বৃদ্ধ সকলকেই সমান ভাবে আকৃষ্ট করে না? যে-মাশুকা হচ্ছে, কবির সাধনার এবং কামনার পরম বিষয়বস্তু, তার গোলাপী গণ্ডদেশ, এবং ইয়াকুত-বিনিন্দিত ওষ্ঠাধর কি অবহেলার জিনিস? তার মুক্তা-মালার মত দন্তপংক্তি কি কবির প্রাণে ভাবের তরঙ্গ তুলে না? সুন্দর রং আমরা ভালবাসি; কেন ভালবাসি তা বলতে পারি না; তবে, একথা বেশ বলতে পারি, রংএর উজ্জলতা, রংএর সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণকে আকৃষ্ট, মুগ্ধ করে। উজ্জল এবং সুন্দর রং নিয়েই ঘুড়ির কারবার; সুতরাং ঘুড়িকে ভালবাসা হচ্ছে, আমাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কত রং-বেরংএর ঘুড়িই না দোকানে দেখতে পাই? লালঘুড়ি,

বেগুনে ঘুড়ি, সবুজ ঘুড়ি, গোলাপী ঘুড়ি, হলদে ঘুড়ি, কম্‌লার রংএর ঘুড়ি; লাল এবং সাদা, সবুজ এবং বেগুনে, গোলাপী এবং কম্‌লা প্রভৃতি কত বিচিত্র রংএর ঘুড়িই না হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকতে থাকে, আর আমাদের আদরের স্পর্শটুকু পাবার জন্য ব্যগ্র প্রাণে প্রতীক্ষা করে!

তবে এ-কথা অবশ্য বলতে হবে, কেবল মাত্র মাশুকের রংই আমাদের আকৃষ্ট করে না। রংএর সঙ্গে প্রাণ বস্তুটিও আমরা চাই। তা না হলে, খেয়াল এবং যথেচ্ছাচারের মূর্ত্ত প্রতীক, চঞ্চল-চিত্ত জীবন্ত মাশুককে ছেড়ে, আমাদের কবিরা (বন্য জন্তুকে বস করা যাদের ব্যবসা মোটেই নয়) স্থৈর্য্য এবং ধৈর্য্যের আধার, ভাস্করের তৈয়েরী পুতুলদের, বিশেষতঃ Dutch Dollদের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হতেন। কিন্তু প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য, পৃথিবীর কোন অংশের এবং কোন যুগের কবিকেই সেইটুকু করে সন্তুষ্ট হতে দেখি নি, এবং শুনিও নি।

অবশ্য আদর্শ মাশুকে রং এবং প্রাণের খেলা ছাড়া Perfect form বা নিখুঁত নক্সারও আমরা প্রত্যাশা করি। ঘুড়ির form বা নক্সা হিসাবে তেমন কিছু নাই। কড়া রকমের সৌন্দর্য্যবাদী (aesthate) খুব সম্ভব এই formএর বৈশিষ্টহীনতার দরুণ ঘুড়ির মাশুক হবার দাবীকে তাচ্ছল্য করবেন। তা তিনি করুন। আমরা ছেলেরা প্রেমের বিষয় তাঁর মত Fastidious খুঁতখুঁতে নই। রংএর সঙ্গে প্রাণের স্পন্দন পেলেই আমরা সন্তুষ্ট, আর এ-দুটী জিনিসই ঘুড়িতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

ঘুড়িকে হেলেদুলে, নেচেখেলে আকাশে উঠতে দেখে শিশুর প্রাণ যে তার দিকে আকৃষ্ট হবে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ছেলেদের কথা ছেড়ে দিন, বয়স্কেরাও প্রেমিকার হাস্যলাস্য দেখে আত্মহারা হন। mr. Nevinson তার Essays in Rebellion পুস্তকে মানব-চরিত্রের সাধারণ এই দুর্ব্বলতার সুন্দর একটী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। The Judgment of Paris শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক Mr Clerkson নামক কোন এক ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার (experience) কথা বলেছেন। Mr. Clerkson এক Beauty show বা সৌন্দর্য্য প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন প্রদর্শনীটি উৎসুক এবং উত্তেজিত দর্শকবৃন্দে একেবারে ভরে গেছে।

বিভিন্ন রূপসীরা তাঁদের রূপের বিচিত্র লীলা-খেলা দেখিয়ে পুরস্কার দাবী করলেন। রূপসীদের রং, নক্সা, হাবভাব, হাস্যলাস্য প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে বিচারকেরা গোলাপ-বসনা-সুন্দরীকে প্রথম পুরস্কার দিলেন, কেননা, "সে তার মাথাটিকে বেশ একটু সোহাগের সঙ্গে একদিকে হেলিয়ে রাখতে জানে।" কারখানার সুন্দরীটিকে দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হল, কেননা, "লোক তার শালতা-হীন পোষাক দেখে তার দিকে আকৃষ্ট হয়।" নীলবসনা-সুন্দরীকে তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হল, "তার জালীর কাজ-করা মোজার জন্যে!"

বিলাতের সাহেব জুরীরাই যদি গোলাপ-বসনা-সুন্দরীকে সৌন্দর্য্যের প্রথম পুরস্কার দেন, তার মাথাটিকে বেশ একটু সোহাগের সঙ্গে এক দিকে হেলিয়ে রাখবার জন্যে; তাহলে, আমরা (অর্থাৎ অপরিণত-বয়স্ক বালকেরা) যদি ঘুড়িকে তার হাস্যলাস্য এবং হাবভাবের জন্য ভালোবাসি, তাতে আশ্চর্য্য হবার আর কি আছে?

সহৃদয় পাঠক কিন্তু বিচার না করেই আমাদের বিলাতের সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতার সাহেব জুরীদের মত vulgar বা কুরুচি-দোষ-দুষ্ট বলে মনে করবেন না। ঘুড়িকে কেবল তার রং এবং হাস্যলাস্যের জন্যই আমরা ভালবাসিনা। আমাদের এই পক্ষপাতিত্বের অন্যবিধ গুরুতর কারণও আছে। এখন সে-বিষয়েই কিছু বলা যাক।

শিশুই হই, আর যুবকই হই, আর প্রবীণই হই, প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করবার সহজাত একটা প্রবৃত্তি আত্ম-প্রকাশের জন্য সর্ব্বদা আমাদের মধ্যে উদগ্র হয়ে আছে। সুযোগ পেলেই সেটা চির-বৈরীর সঙ্গে লড়াইয়ে মেতে যায়। ঘুড়ির মত শরীরী একটা জিনিষকে শূন্যে ওড়ানও তো প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করাই বটে! জাত-যোদ্ধা হিসাবে শিশু যদি তাতে আনন্দ পায়, তাহলে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? প্রকৃতির সঙ্গে এই লড়াই-ই যে হচ্চে তার জীবনের, তার জাতের জীবনের সবচেয়ে exciting, সবচেয়ে উত্তেজক খেলা! ওয়াট্‌স (watts) ধোঁয়ার সাহায্যে

কল চালিয়ে যে-আনন্দ পেয়েছিলেন, এডিসন (Eddison) বিদ্যুতের একটী বোতামটিপে সমস্ত সহর আলোকিত করে যে-আনন্দ পেয়েছিলেন, মারকোনি (marconi) সাহেব ঘরে বসে তারের সাহায্য না নিয়েই পৃথিবীময় সংবাদ পাঠিয়ে যে-আনন্দ পেয়েছেন এবং পান, আমরা, গরীব ছেলেরাও, সরু এক গাছা সুতোর সাহায্যে ঘুড়ির মত একটা শরীরী জিনিষকে আকাশে উড়িয়ে ঠিক সেই আনন্দই পেয়ে থাকি! আমরা যে ওয়াট্‌স্, এডিসন্ এবং মার্‌কোনির ছোট ভাইয়ের দল!

আর ঘুড়ি উড়িয়ে কি কেবল প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার সখটাই মেটান হয়? পরস্পরের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করবার প্রতিযোগীতায় সমবয়স্কদের হারাইবার যে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রত্যেক সুস্থ এবং অবিকৃত শিশুর মধ্যে বর্ত্তমান, তাকে চরিতার্থ করবার সুযোগ যেমন এই ঘুড়ি উড়ানর মধ্যে পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশী আর কিসে পাওয়া যায় বলুন?

শক্তি-পরীক্ষার সে কি বিরাট আয়োজন! অব্যর্থ মাঞ্জার কি ব্যগ্র অনুসন্ধান! নিজের ঘুড়ি দিয়ে প্রতিযোগীর ঘুড়ি কাটবার কি ব্যাকুল ব্যগ্রতা! শক্তি-পরীক্ষার ফলাফলের জন্য কি উগ্র উৎকণ্ঠা! ওয়াটারলু যুদ্ধে নেপোলিয়ান্ তাঁর ইম্পিরিয়াল্ গার্ডের আক্রমনের ফলাফলের জন্য যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলেন, আমরাও নিজনিজ ঘুড়ির আক্রমণের ফলাফলের জন্য তার চেয়ে বড় কম একটা উৎকণ্ঠা অনুভব করিনা! আর ওয়াটারলু যুদ্ধের ফলাফল নেপোলিয়ান কিম্বা ওয়েলিংটনের অন্তরে ভাবের যে তুমুল তরঙ্গ হিল্লোল তুলেছিল, ঘুড়ির লড়াইয়ের ফলাফলও আমাদের অন্তরে তার চেয়ে বড় কম আন্দোলনের সৃষ্টি করেনা! Strategy এবং Tacticsএর বিষয় নেপোলিয়ান্ কিম্বা ওয়েলিংটন্ ওয়াটারলু-ক্ষেত্রে যতটা মস্তিষ্ক চালনা করেছিলেন, ঘুড়ির লড়াইয়ে আমরাও তার চেয়ে বড় কম মস্তিষ্ক চালনা করি না! আর "delight of battle" যুদ্ধের উন্মাদনাময় আনন্দ, আমরা এই ঘুড়ির লড়াইয়ে নেপোলিয়ান কিম্বা ওয়েলিংটন সত্যকার লড়াইয়ে যে-আনন্দ পেতেন, তার চেয়ে কোন অংশে কম পাইনা! ঘুড়ির জন্য, লাটাইয়ের জন্য, ভাল সুতোর জন্য, টেঁকসই মাঞ্জার জন্য আমাদের শিশুচিত্ত যদি ব্যাকুল হয়ে উঠে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

তবে নিজের বিষয় বলতে পারি, শক্তি-পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ না হলেও, ছেলেবেলা থেকেই আমি শান্তিপ্রিয় ছিলুম, আর ঘুড়ি নিয়ে লড়াই করার চেয়ে নিরিবিলি বসে নিজের ঘুড়িকে স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়িয়েই আমি বেশী আনন্দ পেতুম; আর আনন্দ পেতুম, আকাশে রং বেরংয়ের ঘুড়িগুলোর নাচানাচি মাতামাতি দেখে। Actor বা অভিনেতা হিসাবে নিজের ঘুড়ি নিজের মনোমত উড়াতে পারলেই আমি সুখী হতুম; আর, spectator বা দর্শক হিসাবে অন্য ছেলেদের ঘুড়ির লড়ালড়ি, মাতামাতি দেখতে ভালবাসতুম। আমার প্রকৃতির এই সহজাত বিশেষত্ব এখনও যায় নি। নিজে আমি নিরিবিলি বসে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতেই ভালবাসি; তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাঁটি পছন্দ করি না। তবে দর্শক হিসাবে, অপরের তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাঁটি দেখতে বড় মন্দ লাগে না।

নীল আকাশের সেই উদার, উজ্জ্বল পটভূমিতে লাল, নীল, সবুজ, বেগুনে, সাদা, কাল, প্রভৃতি বিভিন্ন রংএর ঘু'ড়কে আনন্দে উড়তে আর ছুটো-ছুটি, নাচানাচি, মাতামাতি করতে দেখে আমার মনে যে অবর্ণনীয় ভাবের সঞ্চার হত, তার স্বরূপ অনেক দিন পরে জানতে পেরেছি, হাফেজের অমর কবিতায়:—

বার জামালে তু চুনান্ সুরাতে চীন্ হায়রাণ শুদ্;
কে হাদিমাস্ হামাজা বরদরওদিওয়ার বমান্দ্!

"তোমার রূপ দেখে চীন দেশের শিল্পীর সুন্দরীটি এমন মুগ্ধ হয়েছিল, যে, তার কথা ঘরে দোরে সর্ব্বত্র আঁকা রয়ে গেছে!"

একা মাঠের ধারে বসে যখন ঘুড়ির সুতো ছাড়তুম, আর ঘুড়ি উড়তে উড়তে যখন সুদূর মেঘমালায় অভিযান করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতো, আমার মনটীও তখন, অজ্ঞাতের সন্ধানে তার অনুগমন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। অনেক সময়, ঘুড়িকে পিছনে ছেড়ে ব্যগ্র মন আমার সেই রহস্যের জগতে প্রবেশ করতো, আর মেঘের পর্দ্দা অতিক্রম করে কোন দূর-দূরান্তরে সে চলে যেতো। হাফেজ যে

চীনদেশের শিল্পীদের কথা বলেছেন, তাঁদের পরিকল্পিত Dragonএর চিত্রে কল্পনার সেই বিশ্ব-অভিযানের কথা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কুয়ান্ সু (Kuan Tsu) বলেছেন—"The dragon becomes at will reduced to the size of a silk worm, or, swollen till it fills the space of heaven and earth. It desires to mount, and it rises until it affronts the clouds : to sink, and it descends until hidden below the foundations of the deep."

তারপর সেই Dragon, "climbing aloft on spiral gusts of wind, passing over hills and streams, treading in the air. and soaring higher than the Kwan-lun mountains, bursts open the gate of Heaven, and enters the Palace of God."

প্রাচীন চীনা পেয়ালায় আঁকা লাল এক Dragonএর ছবি আমার চোখের সামনে রয়েছে। আকাশে ঘন মেঘের ঘটা ; বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ শিখা মেঘের আবরণ ভেদ করে প্রকৃতিকে প্রলয়ের বার্ত্তা জানিয়ে যাচ্ছে। জন-প্রাণীর কোথাও চিহ্নমাত্র নাই। বিরাট এক ধ্বংস-লীলার যেন সূচনা হচ্চে। আমাদের Dragon কিন্তু তাতে তিল-মাত্র ভীত হয় নি, স্বচ্ছন্দ-গতিতে, নির্ভীক অন্তরে, প্রসন্ন আননে সেই প্রলয়-সমুদ্রে সাঁতার কেটে সে চলেছে, সুবর্ণ-চূড়া-শোভিত, মণিমুক্তা-খচিত তার গন্তব্য জগতের উদ্দেশ্যে—ঠিক আমার মুক্তপক্ষ কল্পনারই মত !

এস-ওয়াজেদ আলী

'সে আমার নহে অপরাধ'

তোমারে বেসেছি ভালো সে আমার নহে অপরাধ।
তুমি কি তুষিবে তা'রে চকোরের যদি হয় সাধ
ছুঁইতে দূরের চাঁদ ? তবু জানে স্বপ্নমুগ্ধ পাখী
অনন্ত তৃষ্ণার পারে অর্থহীন শুধু কা'রে ডাকি ?
চাঁদ কি নিকটে আসে ? তবু সেত সন্ধ্যার সোপানে
কাঁদে বসি' চিররাত্রি উর্ব্বশীর অনন্ত আহ্বানে।
কাঁদিছে কাতর কণ্ঠে, 'আজিকার স্বপ্ন-লোক সভা
প্রাণ পাবে তব স্পর্শে ; লগ্ন যায়, আমি পুরূরবা
বসেছি অনন্ত ধ্যানে।' চাঁদ জাগে চোখের মুকুরে ;
কিরণ-অঙ্গুলী স্পর্শে ব'লে যায় সুললিত সুরে,
'তোমার মর্ম্মের দ্বারে জাগি নিত্য অদেহী একাকী ;
অনন্ত পথের প্রান্তে অচঞ্চল আমি ধ্রুব-আঁখি।'
তেমনি চেয়েছি তোমা ওগো সখি আত্মার আত্মীয়া !
দেহের অতীতলোকে চিররাত্রি রহগো জাগিয়া।
অমৃত-প্রদীপ হাতে স্বপ্ন-প্রিয়া ! কল্পনা-উর্ব্বশি !
জীবন-মৃত্যুর দ্বারে চিরন্তন তুমি থাক বসি'।

শ্রীকরুণাময় বসু

কোনো আভাসই পেলুম না যে ওর মনে কোনোরকম অতৃপ্তি আছে।...একটু অবাকই হ'লাম।

যা-ই হোক্—ট্রেনে বসে' আমি ভাব্‌লাম—ও কেমন আছে, নিজের চোখেই এবার দেখে আসা যাবে।

আগে কোনো খবর দিই নি; করুণা আমাকে দেখে খুসি যতটা হ'লো, অবাকও তার চেয়ে কিছু কম হ'লো না। বল্‌লে, 'যাক্—তবু এতদিনে তুমি এলে। আমি তো তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।'

আমি ওর দিকে একবার ভালো করে' তাকিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কেমন আছিস্, করুণা?'

'ভালো আছি, দাদা।'

ওর ও-কথা যে মিথ্যা, ওর মুখ-চোখ, ভাব-ভঙ্গী থেকে তা'র কোনোই প্রমাণ সংগ্রহ করতে পার্‌লুম না। বাস্তবিক ও ভালো আছে। স্বীকার কর্‌বো, একটু হতাশই হ'লাম। মেয়েরা অদ্ভুত জীব; কিসে যে ওদের সুখ আর দুঃখ, শেষ পর্য্যন্ত তা'র দিশে করা যায় না।

খানিকক্ষণ এটা-ওটা আলাপের পর করুণা বল্‌লে, 'তুমি স্নান করে' এসো, দাদা; আমি ততক্ষণ চায়ের জোগাড় দেখি।'

আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'নীহারবাবু এখনো কাজ থেকে ফেরেন নি বুঝি?'

'এক্ষুণি এসে পড়্‌বেন। তা—তাঁর জন্যে তোমার অপেক্ষা করে' কাজ নেই।'

স্নানান্তে জঠরে এমন অগ্নি-সংযোগ অনুভব কর্‌লুম যে অপেক্ষা করা সম্ভব মনে হ'লো না। সোজা চায়ের টেবিলে গিয়ে বস্‌লাম।

করুণা আমার পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে আমার পাশে একটা চেয়ারে বস্‌লো। আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কই, তোর চা?'

করুণা বল্‌লে, 'সে হ'বে। তুমি খাও না।'

মনের মধ্যে কথাটা খচ্ করে' বিঁধ্‌লো। বছরের পর বছর আমরা দু'জন এক টেবিলে বসে' একসঙ্গে চা খেয়েছি; ভাব্‌তে পারি নি, আজ সে নিয়মে ব্যতিক্রম হ'বে। কিন্তু মুখে কিছু বল্‌লুম না; অত্যন্ত সুস্বাদু স্যাণ্ডউইচ্ আর পেস্‌ট্রির সঙ্গে আমার অভিমান গিল্‌তে লাগ্‌লুম।

আমার খাওয়া যখন শেষ হ'য়ে এসেছে, নীহারবাবু ফির্‌লেন। অন্য-কেউ হ'লে আমাকে দেখে বিস্ময় বা আনন্দ যা হোক কিছু প্রকাশ কর্‌তো, কিন্তু তিনি শুধু বল্‌লেন, 'এই যে—ভালো তো?'

ইংরেজিতে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌লে প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি কর্‌তে হয়, তাই আমিও বল্‌লুম, 'ভালো আছেন।'

'Excuse me—এক্ষুণি আস্‌চি!' বলে' তিনি ভেতরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

দু' মিনিটের মধ্যেই পোষাক বদ্‌লে, পরিচ্ছন্ন হ'য়ে নীহারবাবু ফিরে' এসে চায়ের টেবিলে বস্‌লেন। করুণা তাঁকে চা ঢেলে দিয়ে তারপর নিজে নিলো। আমিও নিজের পেয়ালা আবার ভর্ত্তি করে' নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর আরামে একটা সিগ্রেট ধরালাম। এতক্ষণে আমার মনটা স্বাভাবিক প্রফুল্লতায় ফিরে এসেছিলো।

নীহারবাবু খেতে খেতে দু' একটা ভদ্র আলাপ কর্‌লেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর খাওয়া হ'য়ে গেলো। আমার মনে হ'লো, ভদ্রলোক সব কাজই যথাসম্ভব কম সময়ে সারেন; অথচ কোনো রকম তাড়া করেন না; তাঁকে দেখে অত্যন্ত মৃদু, মন্থর গোছের লোক মনে হয়। তার কারণ, আমি ভাব্‌লুম এই যে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তাঁর একেবারে হিসেব করা; নিয়ম করে' তিনি সময় খরচ করেন। সেইজন্য বাইরে কোনোরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না ক'রেও তিনি অত্যন্ত দ্রুত হ'তে পারেন; তাঁর ক্ষিপ্রতার খোলসটা হচ্ছে শান্ত। সময় সম্বন্ধে এ-রকম কৃপণ মিতব্যয়িতা আমার ভালো লাগে না।

নীহারবাবু বল্‌লেন, 'আমাকে এক্ষুনি আবার বেরুতে হ'বে; করুণা, তুমি না-হয় গাড়িটা নিয়ে সুরেশবাবুর সঙ্গে একটু ঘুরে' এসো।'

আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কোনো কাজে বেরুচ্ছেন নাকি?'

'একটু ক্লাবে যেতে হ'বে—বিলিয়ার্ড্‌স্ খেল্‌তে।'

আমি বল্‌লাম, 'আজ না-হয় না-ই গেলেন। চলুন্ না, সবাই মিলে' একসঙ্গে বেরুনো যাবে।'

একটু ভেবে নীহার বাবু বল্‌লেন, 'সে হয় না। আমি একজনকে কথা দিয়ে রেখেছি। আমার ফিরতে বেশি দেরি হ'বে না।'

লক্ষ্য করলুম, করুণা আমার পক্ষ নিয়ে একটা কথাও বল্‌লে না। হাজার হোক্, আমি নীহার বাবুর গৃহেই অতিথি; আমাকে ফেলে' বিলিয়ার্ডস্ খেল্‌তে চলে'-যাওয়া —এটা কি ঠিক সঙ্গত হ'লো? অবিশ্যি, অতিথির আপ্যায়নের ভার গৃহকর্ত্রীর ওপরই ন্যস্ত, এবং আমিও করুণাকে দেখতেই এসেছি—সুতরাং কোনো দিক থেকেই কোনো ক্ষতি হলো না। তা ছাড়া নীহার বাবু সে-ধরণের লোক নন, যা'র অনুপস্থিতি কারো নজরে পড়ে।

সন্ধ্যের পর করুণা আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো। ওর হাতে প্রকাণ্ড প্যাকার্ড গাড়ি অনায়াস, মসৃণ গতিতে, প্রায় নিঃশব্দে চলেছে। ততক্ষণে পশ্চিমের গ্রীষ্ম-রাত্রির শীতলতা আরম্ভ হয়েছে—ভারি আরাম লাগছিলো।

'বেশ গাড়ীটা তোদের। কিন্তু আসানসোলে কি বেড়াবার রাস্তা আছে?'

'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ ই আছে—ভাবনা কী?—প্রায়ই আমরা অনেকদূর ঘুরে' আসি। কাছাকাছি কয়লার শহরগুলোয় মাঝে-মাঝে যাই; একবার রাঁচিও গিয়েছিলুম।'

'কল্‌কাতায় গেলেই তো পারিস একবার।'

'যাবো।'

করুণা আর-কিছু বল্‌লে না। ঝরিয়া কি রাঁচি থেকে কল্‌কাতা যে ওর পক্ষে কোনো রকমে আলাদা, এমন ভাব ও দেখালে না। চেষ্টা করে' নিজকে আহত হ'তে দিলুম না। আশ্চর্য্য, মেয়েরা কী সহজেই বদ্‌লায়! আমরা যত সহজে এক কাপড় ছেড়ে অন্য কাপড় পড়ি, তত সহজে ওদের ভালোবাসা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়।

খানিক পরে আমরা শহর ছাড়িয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোডে এসে পড়্‌লুম। অন্ধকার, প্রশস্ত রাস্তা; দু' দিক গাছে ঘন। করুণা হেড্-লাইট্‌স্ জ্বালিয়ে দিলে; তীব্র, নীল আলোয় বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির গতি এক দমকে প্রায় দ্বিগুণ হ'য়ে গেলো—অন্তত, আমার তা-ই মনে হ'লো। আমি একটু ভয় পেয়ে বল্‌লুম, 'এই—করিস্ কী, আস্তে চালা।'

'আস্তেই তো চালাচ্ছি; এ-রাস্তায় পঁয়ত্রিশ কিছুই নয়।' তারপর চট্ করে' বল্‌লে, 'দাদা, তুমি নতুন কী লিখ্‌লে আর পড়্‌লে, বলো।'

এতক্ষণে আমার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ও অনুসন্ধান করলে—খুসি না হ'য়ে পার্‌লুম না। বল্‌লাম, একটা নতুন উপন্যাস শেষ করেছি।'

'নিয়ে এলেই পার্‌তে সঙ্গে করে'।

নিয়ে আস্‌বার কথা যে ভাবি নি, তা নয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশককেই দিয়ে আস্‌তে হ'লো। এ-পর্য্যন্ত এমন কিছু লিখি নি, যা'র পাণ্ডুলিপি করুণা না পড়েছে এবং পড়ে' মূল্যবান সমালোচনা না করেছে। এখন অনুশোচনা হ'তে লাগলো—কেন নিয়ে এলাম না। মুখে বল্‌লাম—কী যে বল্‌তে যাচ্ছিলাম, তা আমার ঠিক মনে নেই; কারণ ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিঃশ্বাসের জন্য ঢোঁক গিল্‌তে হ'লো। অনুভব করলাম, বরফের চাবুকের মত বাতাস আমার মুখ কেটে দিয়ে যাচ্ছে। কান দুটো কন্‌কন্ করছে—মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত শিরশির্ করে' নেবে যাচ্ছে। করুণার দিকে তাকাতে সে তা টের পেলো। বল্‌লে, 'পঁয়তাল্লিশ করে' দিলুম। এমন ফাঁকা রাস্তায় গোরুর গাড়ির মত নিয়ে লাভ কী?'

আমি আতঙ্কিত হ'য়ে বল্‌লুম, 'এ কী পাগ্‌লামি!'

পেছন দিকে মাথা ছুঁড়ে' দিয়ে করুণা খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠ্‌লো।—'এ তো কিছুই নয়। গাড়িটায় এক শো-পঁচিশ মাইল অবধি ওঠে। সত্তর কি আশি স্পীডে তো আমরা প্রায়ই যাই।'

'প্রায়ই যাস্!'

করুণা আবার হেসে উঠ্‌লো।—'বা, ওঁর সঙ্গে যখন বেরোই, ষাটের নীচে তো গাড়ি চলেই না।'

আমাকে কিছু বল্‌বার সময় না দিয়ে করুণা বল্‌তে লাগ্‌লো, 'বেশি দূরের রাস্তা না পেলে মনের সুখে গাড়ি চালানোই যায় না। ষ্টার্ট্ না দিতেই পথ ফুরিয়ে আসে। ভাব্‌ছি, একবার কাশ্মীর যাবো।'

'সম্প্রতি যদি বাড়ি ফিরে যাস্—'

'কেন, তোমার কি খারাপ লাগ্ছে ?'

'ভয়ানক ভালো লাগ্ছে।'

'Glorious—নয় ?'

করুণা কী-একটা সুর গুণ্গুণ্ করতে লাগ্লো। অন্ধকারে তা'র মুখ অস্পষ্টভাবে দেখ্তে পাচ্ছিলাম। সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে: তা'র হাত আলগোছে স্টীয়ারিং হুইল্-এর ওপর ন্যস্ত: আর তা'র মুখে এমন-এক অস্বাভাবিক দীপ্তি, যা অত্যন্ত উত্তেজিত ও চোখ-ঝল্সানো সাহিত্যালোচনার সময়েও তা'র মুখে আমি কখনো দেখি নি।

উত্তেজনা আমিও যে অনুভব না করছিলুম, তা নয়। ভালো আমারোও লাগ্ছিলো—ভয়ানক ভালোলাগ্ছিলো। কিন্তু আমি সাবধানী মানুষ; বাঁ হাতে কোঁচার প্রান্তদেশ তুলে' ধরে' অন্য হাতে চাঁদরের ভাঁজ সযত্নে রক্ষা করতে করতে মৃদুগতিতে ফুটপাথ্ দিয়ে চলি; এতটা ভালো-লাগা আমার মন অনুমোদন করতে পার্ছিলো না। তা ছাড়া, এত দ্রুতগতি আমাকে যেন শারীরিক কষ্ট দিচ্ছিলো; আমি ভালো করে' চোখ মেলে' তাকাতে পারছিলুম না, আমার মাথা ধ'রে গিয়েছিলো, গা বমি-বমি করছিলো। এরি মধ্যে দেখ্লুম, করুণা বাঁ হাত দিয়ে ওর শিথিল-হ'য়ে-আসা খোঁপাটাকে পরখ্ করে' দেখ্ছে। উল্টো দিক থেকে আর একখানা গাড়ি আস্ছে, ওর যেন খেয়ালই নেই। আমি প্রায় চীৎকার করে' উঠ্তে যাচ্ছিলাম, করুণা চট্ করে' হেড্লাইট্স্ নিবিয়ে দিয়ে গাড়িটাকে একটু ডানদিকে ঘুরিয়ে দিলে। অল্পের জন্য ফাঁড়া কাট্লো।

'আর বেড়িয়ে কাজ নেই,' আমি বল্লাম, 'চল্ ফিরি।'

অত্যন্ত খুসি হ'লাম, করুণা আমার কথা রাখ্লো। গাড়ির গতি কমিয়ে তা'র মুখ ঘোরালো। আমি বল্লাম, 'তোর গাড়িটা একটু চালিয়ে দেখ্তে ইচ্ছে করছে।'

'বেশ তো চালাও না।'

আমরা জায়গা বদল করলুম। অত্যন্ত ভদ্র, নিরাপদ, ধীর গতিতে গাড়ি চল্তে লাগ্লো। মনে শান্তি ফিরে এলো।

করুণা আপত্তি কর্লে, 'কী ছাই তুমি চালাও, দাদা; গাড়িটাকে রীতিমত অপমান কর্ছো।'

আমি শুধু বল্লুম, 'কলকাতায় চালিয়ে অভ্যেস কিনা।'

হঠাৎ করুণা বলে' উঠ্লো: 'আসল কথা স্বীকার করো—তোমার ভয় করে।'

'না—না, ভয় করবে কেন ? তাই বলে' অমন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেই বা লাভ কী—এই তো বেশ; ধীরে-সুস্থে যাওয়া যাচ্ছে।'

'ছাই বেশ। মনে হচ্ছে, বেলা দশটার সময় ড্যাল্হাউসি স্কোয়ার দিয়ে যাচ্ছি।' কিন্তু করুণার আপত্তিতে আমি কর্ণপাত কর্লাম না। আমার পরিচালনায় গাড়ি নেহাৎই পনেরো মাইলে এগোতে লাগ্লো। করুণা শেষটায় হতাশ হ'য়ে আমার হাতে নিজকে ছেড়ে দিলে।

বাড়ি ফিরে দেখি, নীহারবাবু আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর্ছেন। জিজ্ঞেস কর্লাম, 'কী আপনার বিলিয়ার্ডস্ হ'য়ে গেলো ?'

'হ্যাঁ। আমি অনেকক্ষণ ফিরেছি।"

মনে হতে পারে, ভদ্রলোক আমার খাতিরে তাড়াতাড়ি খেলা সাঙ্গ করে' ফিরে' এসেছেন; কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি যা আলাপ কর্লেন, তা হচ্ছে এই:

'I hope you enjoyed your drive.'

উত্তরে আমি বল্লাম 'Oh quite.' আমার উপভোগে যে একটু মিশেল ছিলো, নীহারবাবুর কাছে তা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ কর্লাম।

একটু পরেই ডিনারের সময় হ'লো। খেতে বসে' কথাবার্ত্তা করুণার আর আমার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইলো। নীহারবাবু মাঝে-মাঝে যা দু' একটা মন্তব্য প্রকাশ কর্লেন, তা-ও এমন-কিছু ব্রিলিয়েন্ট্ নয়। খাওয়া শেষ হ'বার একটু পরেই তিনি 'Excuse me, আমার একটু কাজ আছে।' বলে চেয়ার থেকে উঠ্লেন। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে বল্লেন, 'Good night.'

'Good night,' আমিও বল্লাম।

নীহারবাবু চলে' গেলে আমি না বলে' পারলুম না: নীহারবাবু তো বেজায় কাজের লোক, দেখ্ছি।

করুণা বল্‌লে যে, রোজ অনেক রাত জেগে তিনি পড়াশুনো করেন; কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না।

আমার মনে যে-সব কথা উঠ্‌লো, তা অনেক সংশোধন করে আমি বল্‌লুম, অদ্ভুত লোক নীহারবাবু।'

করুণা কথাটার ওপর অন্য রকম কাকু দিয়ে বল্‌লে, 'অদ্ভুত!'

ওর কণ্ঠস্বরে সপ্রশংস ভাবটা এত স্পষ্ট ফুটে উঠলো যে এ-প্রসঙ্গ আর আলোচনা করা সঙ্গত মনে কর্‌লুম না। অন্য কথা পাড়তে হ'লো।

পরদিন নীহারবাবুর পরিচয় ভালো করে' পেলুম। নিজের দৈনন্দিন জীবনকে তিনি এমন করে' সাজিয়েছেন যে এক পল সময়ও তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে না; এক মুহূর্ত্ত তিনি অলসভাবে বসে' থাকেন না; যে-কাজ পাঁচ মিনিটে করা যায়, তাতে কখনো ছ' মিনিট খরচ করেন না। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি, স্নান এবং বেশভূষা সমাপন করে' তিনি চায়ে বসেছেন: এক্ষুনি তাঁকে আপিসে বেরুতে হ'বে। সকালবেলা সামান্য ব্রেক্‌ফাস্‌ট্‌ খেয়ে তিনি কর্ম্মস্থলে যান, ফেরেন সেই ছ'টায়। মাঝখানে করুণা একবার তাঁকে হাল্‌কা একটু লাঞ্চ পাঠিয়ে দেয়—এক পেয়ালা দুধ, দু'এক টুক্‌রো রুটি-মাখন, কিছু আঙুর—এ-ই। ফিরে' এসে চা খেয়ে ক্লাবে, ক্লাব থেকে ফিরে' ডিনার, তা'র পর অনেক রাত অবধি পড়াশুনো—ঘুম। দিন কেটে গেলো। নীরবে, সঙ্কল্পিতচিত্তে, দৃঢ়ভাবে তিনি এই নিয়মের দাসত্ব করে' যান: সব কাজ যে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে করেন, তা-ও আমার মনে হ'লো না। অভ্যাসের সু-তেলিত যন্ত্র মসৃণভাবে চলে। শুধু যে কথা তিনি কম বলেন, তা নয়; তাঁর আহারের পরিমাণও এত কম যে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ তা'তে স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাক্‌, জীবন-ধারণ কী করে' করে, তা-ই ভেবে আমার অবাক্‌ লাগ্‌লো। তা'র ওপর, তাঁর আহার্য্যের তালিকা অত্যন্ত সাধারণ; রসনাকে প্রশ্রয় দিতেও যেন তিনি নারাজ। সকালে-বিকেলে জলের মত পাৎলা একটু চা খান—চায়ের বদলে ওভ্যাল্‌টিন কি কোকো হ'লেও চলে। কোনো নেশা করেন না—সিগ্রেট পর্য্যন্ত নয়। যে-লোক কোনো নেশা করে না, তা'কে আমি সর্ব্বদা সন্দেহের চোখে দেখে এসেছি: কারণ, জীবন-ধারণের পক্ষে যেটুকু পুষ্টি দরকার, তা'র সংস্থান পশুও করে, মানুষও করে; উপরন্তু যে-নেশা, সেটাই হচ্ছে পশুর অতীত, এবং তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। সাধারণের চোখে নীহারবাবুর মত ভালো ছেলে হয় না—এমন সংযম, এমন মিতাচার! কিন্তু এই সংযমে—এই মিতাহারে, মিতভাষিতায়, মিতব্যবহারে আমার একেবারে হাঁফ ধরে' গেলো। একেবারে রক্ত জমানো ব্যাপার! কোথাও যদি একটু উচ্ছৃঙ্খলতা, একটু অনিয়মের ফাঁকও থাক্‌তো! আমার ভগ্নীপতি যদি প্রাণ খোলা, দিল-দরিয়া বোহিসেবী মাতাল হ'তো, তা হ'লেও আমি এর চেয়ে বেশি খুসি হ'তে পারতুম।

সব চেয়ে অবাক হ'লাম এ-কথা ভেবে, করুণা কী করে' তা'র স্বামীকে সহ্য করছে। গল্প-লেখক-হিসেবে মানব-চরিত্রে যেটুকু অন্তর্দৃষ্টির বড়াই কর্‌তে পারি, তা'তে এ-কথা নিঃসংশয়ে মনে হয় যে নীহারবাবুর মত মানুষের সঙ্গে বাস করে' কেউ আরাম পেতে পারে না। বিশেষ, করুণার মত মেয়ে—যা'র বাল্য ও প্রথম যৌবন আমাদের পরিবারের অজস্র প্রফুল্লতায়, অবাধ আনন্দের মধ্যে কেটেছে। ও যে এ-বিয়েতে অসুখী হ'বে, নীহারবাবুর কঠোর নিয়মানু-বর্ত্তিতায় ছটফট্‌ কর্‌বে, তা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্‌বে, তা'কে ভেঙে ফেল্‌তে চাইবে—এর চেয়ে স্বাভাবিক, এর চেয়ে যুক্তিসঙ্গত, অনিবার্য্য আর কী হ'তে পারে? কিন্তু করুণার চাল-চলন, হাব-ভাব, কথাবার্ত্তা লক্ষ্য করে' কোনো রকমেই একটুখানি বিদ্রোহের আভাসও আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌লুম না। নীহারবাবুকে ও মেনে নিয়েছে, তাঁর সঙ্গে নিজকে মানিয়ে নিয়েছে। স্বামীর অস্তিত্বের মধ্যে অনায়াসে নিজকে মিশিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাস কর্‌বার প্রবৃত্তি হ'লো, পৃথিবীতে এখনো মাঝে-মাঝে মির্যাক্‌ল্‌ ঘটে।

মুখে কিছু বল্‌তে আট্‌কাতো: জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মাঝে-মাঝে করুণার মুখের দিকে তাকিয়েছি। সে-দৃষ্টির মানে করুণা বুঝ্‌তে পারে নি, এ কথা বলে' তা'র বুদ্ধির অবমাননা কর্‌বো না। কিন্তু সে না-বোঝ্‌বার ভাণ করেছে, ইচ্ছে করে'

আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে গেছে। প্রকারান্তরে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমার অনুসন্ধানকে প্রশ্রয় দিতে সে প্রস্তুত নয়।

করুণা নিজেও যেন একটু বদ্‌লে গেছে, মনে হ'লো। সে-চঞ্চলতা, সে-উচ্ছলতা তা'র আর নেই। কথা আগেকার চাইতে কম বলে; অত চেঁচিয়ে আর হাসে না। শুধু সেদিন, গাড়িতে পঁয়তাল্লিশ মাইল যেতে যেতে, শুধু সেই সময়ে তা'কে ঠিক পুরাণো পরিচিত করুণা মনে হয়েছিলো। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসেই সে যেন ধপ্‌ করে' নি থেকে রে-তে নেবে গেলো। সাধারণত, তা'র মনটা আজকাল নীচু পর্দ্দায় বাঁধা। গাড়িতে বসে' সে আমার অধুনাতম সাহিত্যিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলো; কিন্তু পরদিন তা'র সঙ্গে সাহিত্যালাপ করতে গিয়ে হতাশ হ'লাম। দেখ্‌লুম, এ-ক'মাসে সে ধাতুতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়েছে। আমি যখন তা'র কাছে টি, এস্‌ এলিয়টের কাব্যের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, সে হয়-তো আমাকে রাসায়নিকের সঙ্গে ধাতবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝাচ্ছে। লিটন্‌ স্‌ট্রেইচি সম্বন্ধে অতি উপাদেয় আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ একটু ফাঁক করে' নিয়ে সে হয়-তো কয়লার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা আরম্ভ করলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো, খনিজ দ্রব্য ও তৎসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নিয়েই করুণা আজকাল সব চেয়ে বেশি উৎসাহ নিচ্ছে। চেহহব্‌-এর সেই অতুলনীয় গল্প মনে পড়ে' গেলো; সে-গল্প যে এত সত্যি, তা আমিও কখনো মনে করি নি। গভীর দুঃখে উপলব্ধি করলুম যে আসলে সব মেয়েই ডার্লিঙ্‌; এমন যে আমার বোন করুণা, সে-ও ব্যতিক্রম নয়। আমার প্রভাবে যতদিন ছিলো, ততদিন ও সাহিত্য নিয়েই মাতামাতি করেছে; এখন খনিতত্ত্ববিদ্‌ স্বামীর প্রভাবে এসে ধাতুবিজ্ঞানই ওর পক্ষে পরম উৎসাহের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। এ-সব দেখে শুনে' নারীজাতি সম্বন্ধে হতাশ না হ'য়ে উপায় থাকে না। এবং, আমার সেই নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে' নিয়ে আসা হয় নি বলে' মনে-মনে আমার প্রকাশকের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠ্‌লুম।

করুণার বাড়িতে আমার সময় খুব আনন্দে কেটেছিলো, তা বলতে পারি নে। আমি হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভালোবাসি, আর এখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। দীর্ঘ দুপুর বেলাটা এক শাস্তি। দারুণ গরম; জানালায় খস্‌ টাঙিয়ে, মেঝেয় জল ছিটিয়ে, পাখা খুলে' দিয়ে পাটি পেতে শুয়ে' থাকতে হয়। তবু শান্তি নেই। তিন চার বার ঘুমিয়ে, গল্পের বই পড়ে', হাঁসফাঁস করে' সময় আর কাটে না। বাড়িটা যেন স্তব্ধতার ভারে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। এক যুগ পরে বিকেল হয়; আস্তে-আস্তে উঠে' স্নান করে', চা খেয়ে তবে একটু সুস্থ বোধ করতে আরম্ভ করি। সন্ধ্যের পর ঠাণ্ডা হ'তে আরম্ভ করে; একটু বেড়িয়ে আসি। করুণা রোজই গাড়ি নিয়ে বেরোতে চেয়েছে আমি, বলেছি, 'থাক্‌, চল্‌ না একটু হেঁটেই ঘুরে' আসি।' করুণার হাতে গাড়ির চাকা দিয়ে তা'র পাশে বসে'-থাকা আমার কাছে লোভনীয় মনে হয় নি।

যা-ই হোক্‌, এক রকম করে' তিন দিন কাটলো। সোমবার সকালে আমি ফের্‌বার কথা পাড়্‌লাম। করুণা বল্‌লে, 'এত শীগ্‌গির। আরো দু'একদিন থাকো না।'

আরো দু'একদিন থাকতে যে কিছুতেই না পার্‌তাম, এমন নয়। কিন্তু কল্‌কাতায় ফের্‌বার জন্য মন অস্থির হ'য়ে উঠেছিলো; তা ছাড়া, আরো থাক্‌বার কোনো সার্থকতাও দেখ্‌ছিলুম না। সুতরাং, যাওয়াই ঠিক করে' ফেল্‌লাম। বিকেলের দিকে একটা সুবিধে-মত গাড়ি পাওয়া গেলো; চায়ের পর উঠে' রাত্তিরে খাবার সময় কল্‌কাতায় পৌঁছনো যাবে।

এমন সময় নীহারবাবু বলে' উঠ্‌লেন, 'চলুন্‌ না আপনাকে মোটারে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।'

হঠাৎ এই প্রস্তাবে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। কোনো কারণ নেই, নীহারবাবু একসঙ্গে এতগুলো ঘণ্টা বাজে খরচ করে' ফেল্‌তে চাচ্ছেন, এটা আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছিলো না। সঙ্কুচিতভাবে বল্‌লুম, 'থাক্‌, কী দরকার।'

'চলুন্‌ না।'

'আমার যে একটা রিটার্ণ-টিকিট—'

'তা হোক্‌।'

'আপনার কাজকর্ম্ম—'

'সে ঠিক হ'বে। সন্ধ্যের সময় রওনা হওয়া যাবে—'

'তা হ'লে কল্‌কাতা পৌঁছতে অনেক দেরি হ'য়ে যাবে যে—'

'না, এমন আর কী দেরি হ'বে।'

করুণা জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'আজকে রাত্তিরেই তুমি ফিরে' আস্‌বে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

ওরা দু'জনে যেন সব ঠিক করে' ফেল্‌লো; আমি প্রতিবাদ কর্‌বার সময় পেলুম না। কেন যে নীহারবাবুর হঠাৎ আমাকে কল্‌কাতায় পৌঁছিয়ে দেবার খেয়াল হলো, তা-ও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। ভদ্রলোকের সম্বন্ধে মনে-মনে আমি যে-রকম ছবি এঁকেছিলুম, এ ব্যাপারটা তার সঙ্গে ঠিক খাপ খেলো না।

একটু পরে করুণা হেসে বল্‌লে, 'একটু সাবধানে গাড়ি চালিয়ো; দাদা কিন্তু বেজায় নার্ভাস্।'

আমি বলে' উঠ্‌লুম, 'না, না, নার্ভাস নই; তবে তুই সেদিন যে-রকম ছেলে মানুষি কর্‌ছিলি—'

উত্তরে করুণা শুধু একটু হাস্‌লো।

করুণার সেই হাসি আমার মনে পড়েছিলো—স্খলিত তারার মত যখন শূন্য থেকে শূন্যে ছুটে' চলেছি, শরীর যখন গলে' হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, নিজের অস্তিত্বের চেতনাকে যখন মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে' থাক্‌তে হচ্ছে—সেই ভীষণ সময়ে করুণার হাসি আমার মনে পড়েছে, হিংস্র জন্তুর দন্ত-বিকাশের মত, অশুভ অপদেবতার বিদ্রূপের মত। কিছুতেই মন থেকে এ-ধারণা দূর করতে পার্‌ছিলুম না যে করুণা আর তা'র স্বামী মিলে এই চক্রান্ত করেছে—কেন? কোনো উদ্দেশ্য নেই—সেটাই সব চেয়ে খারাপ। অহেতুক হিংসা—না, ঠিক হিংসা নয়, অহেতুক অমঙ্গলবৃত্তি ওদেরকে পেয়ে বসেছে, তা'রি দুর্জ্জয় তাড়না ওদের এই আচরণে পরিস্ফুট। আমার মূর্চ্ছিত অবশ মস্তিষ্কে চকিত আঘাতে এই উপলব্ধি জেগে উঠ্‌লে যে আমার পার্শ্ববর্ত্তী মিতাহারী, মিতাচারী অতি সংযমী এই লোকটি উন্মাদ—একেবারে উন্মাদ; এবং তা'র সংস্পর্শে এসে এমন যে আমার বোন সেও পাগল হ'য়ে যাচ্ছে।

কী হ'লো, বলি। নীহারবাবু একটু শীগ্‌গিরই কাজ থেকে ফিরে' এলেন; বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা রওনা হ'য়ে পড়্‌লুম। করুণা বল্‌লে, 'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু!'

আমি বল্‌লুম, 'সে কি কথা! আজকের রাতটা অন্তত কল্‌কাতায় থাকবেন তো?'

'তা'র দরকার হ'বে না।' নীহারবাবু বল্‌লেন।

'তুইও চল্ না, করুণা। বাড়ির সবাইকে একবার দেখে আস্‌বি।'

'এখন গেলে তো থাক্‌তে পার্‌বো না, দাদা।'

'তা হ'লে কবে যাবি বল্।'

'শীগ্‌গিরই একবার যাবো।'

করুণার কণ্ঠস্বরে কোনো আগ্রহ প্রকাশ পেলো না: আর কোনো কথা না বলে' আমি গাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লুম। দরজার কাছে করুণা এসে দাঁড়ালো। আমি ভদ্রতা করে' বল্‌লুম, 'বেশ কাট্‌লো ক'টা দিন।'

করুণা বল্‌লে, 'আবার এসো।'

নীহারবাবু আমার পাশে এসে বসে' গাড়িতে ষ্টার্ট দিলেন। আমি হাত তুলে' করুণাকে বিদায়-জ্ঞাপন কর্‌তে-না-কর্‌তেই গাড়ি বোঁ করে' লন পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়্‌লো।

কিছু বলা দরকার মনে করে' আমি বল্‌লুম, 'সুন্দর গাড়িটা।'

'She's a beauty—isn't she?' নীহারবাবুর মুখ হাসিতে জ্বলে' উঠ্‌লো। তাঁর মুখে ও-রকম দীপ্তি দেখে আর কথায় অমন চটুলতা শুনে' আমি অবাক হ'লাম। আরো অবাক হ'লাম, যখন তিনি গায়ে পড়ে' বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'She looks just like a greyhound, doesn't she? greyhound-এর মত সুন্দর আর কোন্ জন্তু, বল্‌তে পারেন? লিক্‌লিকে চাবুকের মত—কী গতি, গতির কী অদ্ভুত লীলা!'

নীহারবাবু কখনো কোনো বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হ'তে

পারেন, এমন সন্দেহ করি নি। বিস্ময়ের ধাক্কা সাম্‌লে নিতে নিতে শুধু বল্‌তে পারলুম, 'ভারি সুন্দর।'

'লণ্ডনে একবার গ্রেহাউণ্ডের রেস্ দেখেছিলুম,—what a sight !...Are you a race-goer ?'

'না।'

'আমিও নই। ঘোড়দৌড়ে যারা যায়, তা'রা বলে যে—when the horse gives a good run for your money, তা'র মত উত্তেজনা নাকি আর কিছু নেই। আমি একবার ডার্বি দেখেছি; সেবার লর্ড লন্‌স্‌-ডেলের বিখ্যাত ঘোড়াটা—কী যেন নাম, মনে আছে আপনার ?'

সে-ঘোড়ার নাম আমি কোনোকালে শুনিই নি; বিনীতভাবে বল্লুম, 'না, মনে পড়্‌ছে না।'

'যাক্ গে নাম। সে-ঘোড়াটা—Oh, it did put up a bit of a show ! বেঁটে একটা জানোয়ার, মেটে গায়ের রঙ্‌—কে বল্‌বে দেখে ওর ভেতর এত আগুন থাক্‌তে পারে! আর একটা ঘোড়া ছিলো—টগ্‌বগে, দুরন্ত, লাল সিল্কের মত চাম্‌ড়া। প্রথম থেকে ওটা লীড্ নিচ্ছে; বেঁটে ঘোড়াটা ঝিমুতে-ঝিমুতে পেছনে আস্‌ছে। তারপর ফিনিশ্‌-এর আধ ফার্লঙ্ আগে—হঠাৎ কী যে হ'লো, কেউ যেন একটা সুইচ্ টিপে' দিলে, আর কিছু দেখা গেলো না, পরমুহূর্তে দেখা গেলো, ফিনিশ্ পার হ'য়ে সে মাথা নীচু করে' চুপচাপ গাধার মত দাঁড়িয়ে আছে। Oh, it was *marvellous* !'

আমি বল্লুম, 'আশ্চর্য্য তো !"

'কিন্তু সব চেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম কুকুরের দৌড় দেখে। লণ্ডনে সেটা তখন latest craze। ঘোড়া জানোয়ারটা অত বড় বলে' ওর দৌড় আমার কাছে অতটা picturesque মনে হয় না। কিন্তু একপাল গ্রেহাউণ্ড যখন নীচু হ'য়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে' গিয়ে ছুটতে থাকে, মনে হয়, চোখের সাম্‌না দিয়ে শাঁ করে' কতগুলো কালো বিদ্যুৎ ঝল্‌সে গেলো—বাস্তবিক থ্রিল হয় দেখে।'

আমি বল্লুম, 'হওয়াই স্বাভাবিক।'

ইতিমধ্যে আমরা গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়েছিলুম। নীহারবাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'এই গাড়িটায় চড়্‌লেই আমার সেই গ্রেহাউণ্ড-রেসের কথা মনে পড়ে—'

হঠাৎ গাড়ির এঞ্জিন গান করে' উঠ্‌লো; মুহূর্ত্তের মধ্যে কী যেন হ'লো, ভালো করে' বুঝ্‌তে পার্‌লাম না; মনে হ'লো, স্খলিত তারার মত শূন্যের পর শূন্য অতিক্রম করে' ছুটে' চলেছি।

পাশে একটা কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলুম, 'চমৎকার গাড়ি প্যাকার্ড; দেখ্‌লেন, কী রকম চট্ করে' স্পীড্ নেয়! এখন ষাট মাইল যাচ্ছে। Glorious, নয় ?'

নীহারবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালাম। উত্তেজনায় ভয়ানক সুন্দর সে-মুখ। সমস্ত মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে, ব্যগ্র, তীব্র দুই চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে, দুই ঠোঁট অল্প-একটু ফাঁক হ'য়ে গেছে; সমস্ত শরীরে অসহিষ্ণুতা, উন্মাদনা। আমি চীৎকার করে' বল্‌লাম্, 'কর্‌ছেন কী ? গাড়ি যে এক্ষুণি উল্টে' যাবে।'

'পাগল হয়েছেন। ভালো রাস্তায় এ-গাড়ি একশো-পঁচিশ মাইল অবধি চলে; এ-রাস্তায়ও আমি আশি চালিয়েছি—দেখ্‌বেন ?'

আমি প্রতিবাদ কর্‌বার সময় পেলুম না। অ্যাক্‌সিলা-রেটরের ওপর চাপ পড়্‌লো, এঞ্জিন উঠ্‌লো গর্জ্জন করে'। আমি চোখে অন্ধকার দেখ্‌লুম, শরীরের সমস্ত রক্ত মস্তিষ্কে এসে বাড়ি খেতে লাগ্‌লো; মনে হ'লো, এক্ষুনি টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়ে যাবো।

দেখ্‌লাম, নীহারবাবুর মুখ এক অমানুষিক, প্রায় পৈশাচিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল! এক উন্মাদের হাতে আজ আমি আমার জীবন তুলে' দিয়েছি। কোনো উপায় নেই—চোখ বুজে' আমি আত্ম-সমর্পণ কর্‌লুম। নিঃশ্বাস টান্‌তে আমার রীতিমত কষ্ট হচ্ছিলো—প্রতি মুহূর্ত্তে ধারালো ছুরির মত বাতাস আমার মুখটাকে কেটে-কেটে দিয়ে যাচ্ছে। একটা প্রবল বমির ভাব দমন কর্‌বার চেষ্টায় দুর্ব্বল হ'য়ে গেলুম। হঠাৎ খেয়াল হ'লো, নীহারবাবু কী যেন সব কথা বল্‌ছেন। বোধ হয় আমাকে উদ্দেশ্য ক'রেই। কিন্তু তা'র এক বর্ণও আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আমার

মস্তিষ্ক একেবারে অসাড়, নিষ্প্রাণ হ'য়ে গেছে; শুধু এই উন্মাদ গতির ভয়ঙ্কর, অসহ্য চেতনা ছাড়া আর কোনো চেতনা আমার নেই।

ক্রমে সে-চেতনাও লুপ্ত হ'লো। সমস্ত পৃথিবী লুপ্ত হ'য়ে গেছে, সমস্ত জীবন থেমে গেছে; এক অন্তহীন শূন্যের মধ্যে অস্পষ্টভাবে শুধু অশরীরী আমি আছি। বিশাল সৃষ্টি অনস্তিত্বের ধোঁয়ায় মিলিয়ে যেতে-যেতে আমার আত্ম-চেতনায় এসে ঠেকেছে; আমি ছাড়া আর কোনোখানে কিছু নেই। তা-ও, বাস্তবিক যে আমার অস্তিত্ব আছে, তা নয়; আমি আছি, শুধু এই চেতনা আছে। একটু আগেও অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা হচ্ছিলো, এখন তা-ও আর নেই। আমার যে কখনো একটা শরীর ছিলো, তা মনে করতে পারলুম না। সব ভুলে' গেলুম—করুণার সেই অমঙ্গল হাসিকে, আমার পার্শ্বোপবিষ্ট নীহারবাবুকে, সাহিত্য, কল্‌কাতা, আমার সমস্ত অতীত জীবনকে; মানুষের কাজ, মানুষের কথা, শতশতাব্দী ব্যাপী সভ্যতার ইতিহাস, জীবনের ক্ষান্তিহীন, মৃত্যুহীন অভিযান—সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে' গেছে। সময় নেই, স্থান নেই। তা'রি মধ্যে একবার জেগে উঠে' মনে-মনে ভাবলুম কত কষ্ট পেয়ে—যন্ত্রণায়, আর্ত্তনাদে, রক্ত-ক্ষরণে, কত ভীষণ অবস্থায় মানুষ মরেছে, আমার মৃত্যু না-হয় এ-ভাবেই হ'লো, দারুণ গতির সংঘর্ষে, এক আকস্মিক ধাক্কায় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গিয়ে। ভালোই তো—কেনো অনুভূতি নেই, নিমেষে পরিপূর্ণ অচেতনের মধ্যে ডুবে যাওয়া। অনেক মৃত্যুর চাইতেই এ ভালো। কানের কাছে যেন মৃত্যুর পাখা-ঝাপ্‌টানি শুন্‌তে পেলাম; এক মূর্চ্ছার তরঙ্গ আমাকে গ্রাস করে' নিলো।

এর পরে আর গল্প নেই। বাড়ি এসে যখন পৌছলাম, কল্‌কাতার রাস্তায় সবে গ্যাস জ্বলেছে। গাড়ি থেকে নাবার সঙ্গে-সঙ্গেই নীহারবাবু তাঁর পুরানো মূর্ত্তি ধারণ করলেন। বাড়ির লোক তাঁকে দেখে মহা খুসি; হাজারো প্রশ্নে তাঁকে জর্জ্জর করে' তুললেন; যথাসম্ভব সংক্ষেপে তিনি সে-গুলোর জবাব দিলেন। তাঁকে দেখেই বোঝা গেলো, তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন। খানিক পরেই তিনি উঠলেন; কিছুতেই তাঁকে রাতটা কল্‌কাতায় কাটাতে রাজি করানো গেলো না। তিনি গাড়িতে উঠে' বসলে আমি শেষ চেষ্টা করলুম, 'রাতটা না হয় থেকেই যেতেন। করুণাকে টেলিফোন করে' দিলেই হ'তো।'

উত্তরে তিনি বল্‌লেন, 'I must reach home before dinner-time.'

জামাইয়ের সম্বন্ধে কোনোরকম অপ্রিয় কথা বল্‌বার রীতি আমাদের দেশে নেই; তাই মা বল্‌লেন, 'নীহার ছেলেটি ভারি শান্ত, মুখে কথাটি পর্য্যন্ত নেই।'

তাঁর জামাইটি যে প্রকাশ্যে এক সাংঘাতিক নেশা অভ্যেস করে' থাকে, এবং তাঁর মেয়েকেও যে সে-নেশা অভ্যেস করাচ্ছে, এ-সব কথা আমি অবিশ্যি মা-কে বললুম না। তখন ভেবেছিলুম আমার ভগ্নীপতি মাতাল হ'লেও এর চেয়ে ভালো হ'তো; এখন দেখ্‌ছি, তাঁর নেশা মদের চেয়েও ভয়ানক। মদ আস্তে-আস্তে মারে, কিন্তু তাঁর নেশায় প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হ'বার সম্ভাবনা; মৃত্যু না-হওয়াটাই আশ্চর্য্য। এবং, করুণা কেন যে এত সহজেই স্বামীর অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছে, তা-ও যেন এখন বুঝতে পারছি। ওর চঞ্চল প্রাণ-শক্তি গতি-উন্মাদনার মধ্যে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় বলে' সাধারণ জীবনে তা অপেক্ষাকৃত শান্ত হ'য়ে থাকতে পারে। করুণা উত্তেজনা ভালোবাসতো, ওর স্বামী ওকে সে বিষয়ে অজস্র প্রাচুর্য্য দিয়েছে; অকারণ নয়, ও যে ওর স্বামীকে পেয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্ত।

কাউকে বলি নে, কিন্তু গোপনে নীহার আর করুণার জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে থাকি; কবে যে কী দুঃসংবাদ শুনতে হয়, তা'র নিশ্চয়তা নেই।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

বেগম সমরু

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

সমরুর কথা বলিতে গিয়া বেগম সমরু, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কথা এবং তাঁহার সেনাদলভুক্ত ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এ যুগের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বেগম সমরু একজন প্রসিদ্ধা নায়িকা। নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি অনেক পুরুষদুর্লভ গুণগ্রামে সমালঙ্কৃতা ছিলেন এবং নিজ ক্ষমতা, দুরদৃষ্টি ও চতুর রাজনীতির জ্ঞানে নানা বিপ্লব এবং যুদ্ধানলের মাঝে যাহাতে বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন হইতেছিল, নিজ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীকালেরও অধিক রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানধর্ম্মে জাতা ও ভবঘুরে গুণ্ডাপ্রকৃতিক ধর্ম্মহীন সমরুর বিবাহিতা স্ত্রী হইলেও খৃষ্টধর্ম্মের কল্যাণকল্পে তিনি যে সুপ্রচুর প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তজ্জন্য ক্যাথলিক জগতের ধর্ম্মগুরু পোপ মহোদয়ের প্রশংসা অর্জ্জনে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলতঃ নানা কারণে বেগম সমরু নিজে ইউরোপীয় না হইলেও তাঁহার কথা না বলিলে ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বেগম সমরুর পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা জানা যায় না। এমন কি তাঁহার নাম কি ছিল তাহাও অজ্ঞানা। বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতি বুসী ৩রা মার্চ্চ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে ইঁহাকে Pargauna Begum বলিয়া লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কোন মুসলমানী নামের অপভ্রংশ তাহা বলা কঠিন। বেগম একমতে আসলে ছিলেন এক কাশ্মীরী নর্ত্তকী, এবং অপরমতে সম্ভ্রান্ত কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে দারিদ্র্যদোষদুষ্ট এক মুসলমান ভদ্রলোকের কন্যা। তাহার জাতি এবং নাম লইয়া আবার মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন বেগমের পিতা জাতিতে আরব, কেহ বলেন মোগল; কোন মতে ঐ ব্যক্তি এতদ্দেশীয় মুসলমান। তাহার নাম লইয়াও আবার গোলমাল; লুৎফ আলি বা লতিফ আলি এবং আক্দদ খাঁ বা আসাদ খাঁ ইত্যাদি অনেকরূপেই তাহার নাম বিভিন্ন লেখকের লেখায় দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ সংক্ষেপে বলিতে বেগমের পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। বেগমের পিতার দুই স্ত্রী ছিল; তন্মধ্যে তাহার জননীই কনিষ্ঠা। অনুমান ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মীরাটের সন্নিকটবর্ত্তী কোটানা নামক স্থানে বেগমের জন্ম হইয়াছিল। ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বেগমের মাতা সপত্নীপুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া কোটানা হইতে দিল্লীতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জাঠদের পক্ষে থাকিয়া সমরু যখন দিল্লী অবরোধে ব্যাপৃত ছিল তখন বেগমের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে এবং তাঁহার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সমরু মুসলমানী পদ্ধতিমতে তাঁহার পাণিপীড়ন করে। বেগম যে সমরুর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বেগমসহ বিবাহকালে সমরুর আর এক মুসলমানী স্ত্রী এবং তাহার গর্ভে জাত একবৎসর বয়স্ক একটি পুত্র ছিল।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে আগ্রা নগরে সমরুর মৃত্যু হইল। অতঃপর তাহার সেনাদলের আগ্রহে ও অনুরোধে সম্রাট সাহ আলম বেগমকে পূর্ব্বতন সর্ত্তে স্বামীর জায়গীরের আধিপত্য প্রদান করিলেন। মহাসমারোহে বেগমের অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। অতঃপর বেগম নিজ জায়গীরের শাসনভার পরিচালন করিতে থাকিলেন। সমরুর বন্ধু কর্ণেল পাওলী নামক জনৈক জর্ম্মণ ভাগ্যান্বেষীর প্রতি সেনাদলের অধিনায়কত্ব প্রদান করা হইল। বেগম বাদসাহের জায়গীরদাররূপে অনেকবারই নিজের সেনাদল সহ বিপদকালে সাহ আলমকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর ঠিক তিন বৎসর পরে ৭ই মে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বেগম নিজ সপত্নীপুত্র জাফর ইয়াবের সহিত ক্যাথলিক

খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কি কারণে বেগম খৃষ্টান হইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। মনে হয় নিজের ইউরোপীয় অফিসরদের সন্তুষ্ট করিবার জন্যই তিনি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বেগমের নাম হইল "জোয়ানা" এবং জাফর ইয়াবের নূতন নাম হইল "লুই ব্যালথাজার রীণহাড সোম্‌।" বেগম পরে নিজ জোয়ানা নামের পশ্চাতে "নোবিলিস" কথাটী যোগ করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের নিকট "জেবউন্নিসা" উপাধি পাইয়াছিলেন; কিন্তু এ সকল নামের পরিবর্ত্তে বেগম সমরু নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত।

সমরুর সেনাদলে তাহার ন্যায় অনেক বিদেশী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক আসিয়া জুটিয়াছিল। শুনা যায় এক সময়ে নাকি ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় প্রায় দুই শত ব্যক্তি এই দলে ছিল। উহাদের মধ্যে ইউরোপের প্রায় সকল দেশের লোকই ছিল। অফিসরবৃন্দ এবং গোলন্দাজগণ প্রধানতঃ জাতিতে ইউরোপীয় ছিল: পদাতিক ও অশ্বারোহীগণ এতদ্দেশীয় সৈনিকজাতি হইতে সংগৃহীত হইত। ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণের মধ্যে ভদ্রবংশজাত এবং চরিত্রবান লোক খুবই কম ছিল, অধিকাংশ ব্যক্তিই ছিল সমাজের অতি নিম্নস্তরের জঘন্য প্রকৃতির জীব। উহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম নীতিজ্ঞান বলিয়া কোন জিনিষই ছিল না। এ বিষয়ে সমরুর সহকর্ম্মী হইবার যোগ্যতা তাহাদের প্রকৃতিই ছিল বলিতে হইবে, কারণ তাহার ব্রিগেডের মত অতগুলি হতভাগা লোকের একত্র সমাবেশ ভাগ্যান্বেষীদের ইতিহাসেও বিরল। ভদ্র এবং সুচরিত্র যে কয়েকজন ছিল তাহারাও একে একে উত্যক্ত হইয়া বেগমের কর্ম্মত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভাগ্যপরীক্ষা করিতে চলিয়া গেল,—যাহারা রহিল তাহারা অশিক্ষিত, অপদার্থ, মদ্যপ এবং সদাই অবাধ্য ও অশান্ত। উত্তরকালে উহাদের লইয়া বেগমকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি নিজেই প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন।

বেগমের সৈন্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনও যে ঠিকমত হইত না তাহাও বলা প্রয়োজন। কর্ণেল পাওলীর কথা বলিয়াছি। স্বামীর স্বজাতি বলিয়াই বোধ হয় বেগম তাঁহাকে সেনাপতিত্ব দিয়াছিলেন, কারণ তাহার এ ছাড়া কোন গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মীর্জ্জা সফিপ্রমুখ বিদ্রোহী মোগল আমীরদের বিরুদ্ধে পাওলী সার্দ্ধানা ব্রিগেড সহ যুদ্ধ যাত্রা করে; কিন্তু সন্ধিব্যপদেশে নিজেদের শিবিরে ভুলাইয়া আনিয়া দুর্দ্দান্ত আমীরগণ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাহার প্রাণসংহার করিয়াছিল। কর্ণেল পাওলীর পর মেজর লে মার্শা (Le Merchand), মেজর বাওয়ার্স, কাপ্তেন এভান্স, শ্বেভালিয়ে দুদ্রেনেক একে একে ব্রিগেডের নায়কত্ব লাভ করে, কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই সকলে একে একে কর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। অনুমান ১৭৮৭ সালে বেগমের সেনাদলে দুইজন ইউরোপীও ভাগ্যান্বেষী প্রবেশ করে; একজন বিখ্যাত আইরিস যোদ্ধা জর্জ্জ টমাস, অপরজন জাতিতে ফরাসী, কর্ণেল লেভাসুলৎ। উভয়েই প্রতিভাশালী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কালক্রমে বেগমের অনুকম্পা ও ব্রিগেডের কর্তৃত্বলাভের আশা ইঁহাদের দুইজনকে পরস্পরের ভীষণ শত্রু করিয়া তুলিল। জর্জ্জ টমাস একজন বিখ্যাত ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। ইংরাজ রণপোত হইতে পলাতক মাল্লা কপর্দ্দকবিহীন টমাস শুধু নিজ অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে একদিন কি করিয়া "হান্সির রাজা" হইয়াছিলেন তাহা বলিবার জন্য এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আবশ্যক। দুদ্রেনেকের পর বেগম টমাসকেই নিজের সেনাদলের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মীর্জ্জা নজফ খাঁর মৃত্যুর পর (১৭৮২ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার চেষ্টায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইল। সেই সুযোগে মহাদজী সিন্ধিয়া হিন্দুস্থানে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে রাজপুতগণ অভ্যুত্থান করিল, হিন্দু কর্ত্তৃত্বে অসন্তুষ্ট মোগল আমীরের দল তাহাদের সহিত যোগদান করিল। টোঙ্গা বা লালসাতের যুদ্ধে পরাজয়ের পর কিছুকালের মত উত্তরাপথ হইতে সিন্ধিয়ার আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। * এই সুযোগে দুর্দ্দান্ত রোহিলা সর্দ্দার গোলাম কাদের বাদসাহের কর্ত্তৃত্ব লাভে সচেষ্ট হইল। দিল্লী নগরে অবস্থিত সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি সাহ নিজামুদ্দীন তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া পরাজিত

* সিন্ধিয়ার বিখ্যাত সাভোয়ার্ড সেনাপতি কাউণ্ট দি বইন প্রসঙ্গে এ সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে।

হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তখন বাদসাহ একেবারেই অসহায় হইয়া পড়িলেন। গোলাম কাদের দিল্লী দখল করিয়া বাদসাহের নিকট উজীরী দাবী করিল, সাহআলমের তাহার প্রস্তাবে রাজি হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এমন সময় বেগম সমরু আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। বেগমের আগমন সংবাদে ভীত রোহিলা সর্দ্দার তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে মাত্র দুইজন অনুচর লইয়া তাহার নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে ভগিনী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া দলে টানিবার চেষ্টা করিল। কাদেরের দুষ্টবুদ্ধি ও গোপন অভিপ্রায় বেগমের অজানা ছিল না। তিনিও শঠেশাঠ্যং সমাচরেৎ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে জানাইলেন যে যদি যমুনা নদীর অপরপারে সাহদরায় নিজ সেনাদলমধ্যে সে প্রতিগমন করে তবেই তিনি তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। বেগমের চাল বুঝিতে না পারিয়া গোলাম কাদের সাহদরায় নিজ শিবিরে গেল; তখন বেগম যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্রতার সহিত নদীতীরে নিজ সেনাদল সাজাইয়া ফেলিলেন, যাহাতে একপ্রাণীও নদীর এপারে আসিতে না পারে।

বেগমের নিকট বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গোলাম কাদেরের ক্রোধের অবধি রহিল না। বেগমকে দূর করিয়া দিবার জন্য সে বাদসাহকে বলিয়া পাঠাইল। কিন্তু আদেশ প্রতিপালিত হইল না দেখিয়া দিল্লীদুর্গের উপর সে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। বাদসাহী ফৌজও তাহার উত্তর দিতে ছাড়িল না। এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে বাদসাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সাহজাদা জীবন বখৎ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তখন ভয় পাইয়া গোলাম কাদের বাদসাহের সহিত সন্ধি করিল। কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ, নগদে বহু অর্থদণ্ড প্রদান এবং অধিকৃত জনপদ সমূহ প্রত্যর্পণের সর্ত্তে সম্মত হইয়া রোহিলা নায়ক অনন্তর নিজ সাহরাণপুরের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বাদসাহ তাঁহার উদ্ধারকর্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে "জেবউন্নিসা" বা রমণীরত্ন সংজ্ঞা দিলেন।

দিল্লীতে বিশৃঙ্খলার সুযোগে দুরন্ত মোগলগণ আমীরগণ আবার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সম্রাটের আনুগত্য স্বীকারে বা তাঁহাকে রাজকর প্রদানে অসম্মত হইল। তাহাদের নেতা ছিল নজফ্‌কুলি খাঁ, এই ব্যক্তি মৃত নজফ খাঁর ধর্ম্মপুত্র এবং গোলামকাদেরের ভগিনীপতি ও একজন স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দু ছিল। মীর্জ্জার অনেক যুদ্ধে, বিশেষ করিয়া বারসানার যুদ্ধে, নজফকুলি যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। মেবাৎ প্রদেশে অর্থাৎ দিল্লী ও রাজপুতানার মধ্যবর্ত্তীভূখণ্ডে তাহার জায়গীর ছিল এবং কনৌন্দ ও গোকুলগড়ের সুদৃঢ় দুর্গদ্বয় তাহার দখলে ছিল। শীতাপগমের পর অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সাহ আলম নজফকুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; জর্জ্জ টমাস পরিচালিত বেগমের সেনাদল তাহাদের অধিনেত্রীর সহিত তাঁহার সঙ্গে চলিল। ৫ই এপ্রিল তারিখে বাদসাহী ফৌজ গোকুলগড়ে আসিয়া নজফকুলিখাঁকে অবরোধ করিল। অকস্মাৎ বিদ্রোহী সৈন্যদল দুর্গ হইতে বাহির হইয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। বিদ্রোহীরা শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টাই করিবে এই কথা বাদসাহের সেনানায়কগণ ভাবিয়াছিলেন; তাহারা যে বাহিরে আসিয়া অবরোধকারীদের আক্রমণ করিয়া বসিবে এ সম্ভাবনা কাহারও মাথায় আসে নাই। সুতরাং আকস্মিক এ বিপৎপাতে বাদসাহী ফৌজ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদল ক্রমে শিবির মধ্যে বিশ্রামসুখনিরত বাদসাহের সমীপবর্ত্তী হইল। তখন সকলে ভাবিল বাদসাহের আর রক্ষা নাই, এবার তাহাকে ধৃত হইতে হইবে। এমন সময়ে অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রতা সহ শিবিকারোহণে বেগম জর্জ্জ টমাস সহ বাদসাহের রক্ষায় আসিয়া উপনীত হইলেন। সঙ্গে আসিল তাঁহার তিন ব্যাটালিয়ন পদাতিক এবং একটী মাত্র তোপ লইয়া জন কয়েক ইউরোপীয় গোলন্দাজ। যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত জর্জ্জ বাদসাহী শিবির রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সেনা সাজাইয়া ফেলিলেন। গোলন্দাজদল মহোৎসাহে কামান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল; পদাতিকদল বন্দুক হইতে গুলিবৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহযোগিতা করিতে লাগিল। নজফকুলির অশ্বারোহীরা এ প্রকার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না; তাহাদের অগ্রগতি প্রতিহত হইল, তাহারা

থামিল। অনন্তর যখন একদল মোগল অশ্বারোহী রঙ্গভূমে আসিয়া দেখা দিল এবং তাহাদের আক্রমণে উদ্যত হইল তখন আর তাহারা রণস্থলে তিষ্ঠিতে সাহস না করিয়া পলায়ন করিল। সম্রাট যে সুধুই রক্ষা পাইলেন তাহা নহে; বেগমের সিপাহীগণের আক্রমণে দুর্গও অধিকৃত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে বাদসাহের জয়লাভ সুধু বেগমের সাহস ও বীরত্বের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। সেইদিন বিকালে প্রকাণ্ড দরবারে বাদসাহ বেগম সমরুকে তাঁহার সাহস ও রাজভক্তির জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে নিজ দুহিতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। জর্জ্জ টমাসও মূল্যবান খেলাৎ পাইলেন।

গোকুলগড়ের যুদ্ধই এই অভিযানের একমাত্র সংগ্রাম। কারণ পরাজয়ের পর হতাশ হইয়া নজফকুলি সম্রাটের মার্জ্জনাভিক্ষা করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিলেন। তখন বাদসাহ সদলবলে দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।

রাজপুতানায় পরাজয়ের পর কিছুকালের মত দিল্লী হইতে সিন্ধিয়ার আধিপত্য অন্তর্হিত হইল, কারণ মহাদজীর অনুপস্থিতিতে রাজধানীতে তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত কেহ ছিলনা। দুর্ব্বলচিত্ত বাদসাহ আমোদ-প্রমোদ লইয়াই মাতিয়া রহিলেন। বিশ্বাসঘাতক নাজির মনসুর আলিই অতঃপর দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইল। বাদসাহের তাহার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল। সে যে ভিতরে ভিতরে তাঁহারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে তাহা বুঝিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সাহজাদা জীবন বখৎ অবাধ্য আমীরদের দমনে রাখিয়া বাদসাহী গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এই সময় রাজধানীর অদূরবর্ত্তী ফরিদাবাদ নামক স্থানে ছিলেন। বেগম সমরুর তখন দরবারে যথেষ্ট প্রভাব। সাহজাদা তাঁহার সাহায্যলাভের অভিপ্রায়ে নিজ বিশ্বস্ত অনুচর ফকির খয়েরউদ্দীন মহম্মদকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। স্থির হইল যুবরাজ পিতাকে তাঁহার হস্তে রাজ্যের সকল ভার অর্পণের নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন।

কিন্তু বাদসাহের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না, তিনি সম্পূর্ণরূপেই মনসুর আলির ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন। দুষ্ট নাজির সাহ আলমকে বুঝাইল সাহজাদার অভিপ্রায় ভাল নহে; তিনি স্বয়ং সিংহাসনে বসিতে চাহেন। বাদসাহও তাহাই বিশ্বাস করিলেন, তিনি যুবরাজকে রাজ্য শাসনের কর্ত্তৃত্ব দিতে সম্মত হইলেন না। তখন হতাশ হইয়া জীবন বখৎ দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন; ইহার অল্প পরেই বারাণসী-ধামে ভগ্নহৃদয়ে তিনি গতাসু হইলেন (মে ১৭৮৮)

সাহজাদার অন্তর্দ্ধান এবং বেগম সমরুর অনুপস্থিতির ফলে রাজধানী সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া গোলাম কাদের আবার আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল। বাদসাহ নিষেধ করিলেও মনসুর আলির সাহায্যে দিল্লীদুর্গে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে কিছুই কঠিন হইল না।

এবারে আর বেগম সমরু বাদসাহকে রক্ষা করিতে আসিলেন না। গোলাম কাদেরের অনাচার অত্যাচারের কাহিনী এবং তাহার চূড়ান্ত বর্ব্বরতা, স্বহস্তে বাদসাহের চক্ষুদ্বয় উৎপাটনের কথা, পরে দি বইনের প্রসঙ্গে বলা যাইবে। এখানে আর তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। তবে বেগম সমরু যে এ-সময় বাদসাহের রক্ষায় ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহার কারণ নির্দ্ধারণের উপায় নাই। একথাও বলা দরকার যে এই সময়ের চারি বৎসর কালের (১৭৮৮-১৭৯২) সার্দ্ধানার বা তাহার অধিষ্ঠাত্রীর কোনও ইতিহাস জানা যায় না।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ টমাস বেগমের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা করিতে চলিয়া যান। তাহার কারণ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সুন্দরী ও ধনবতী বেগমের অনুকম্পা লাভের জন্য জর্জ্জ ও লেভাসুলতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলিয়াছি। বেগম সাহসী প্রিয়দর্শন মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন ফরাসী সৈনিকের প্রতি নাকি কতকটা আসক্ত ছিলেন। ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাজয় আশঙ্কায় ক্রুদ্ধ আইরিশ ভাগ্যান্বেষী অন্যত্র ভাগ্যপরীক্ষা করিতে চলিয়া গেল। টমাসের প্রস্থানের পর লেভাসুলৎ সেনাদলের কর্ত্তৃত্ব এবং তাহাদের কর্ত্রীর পাণিলাভ করিয়াছিল।

কর্ণেল স্লীমানই সর্ব্বপ্রথম এই বিচিত্র কাহিনীর উল্লেখ করেন। পরবর্ত্তী লেখকবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহার মত

গ্রহণ করিয়াছেন এবং সে-জন্য জর্জ্জ টমাসের বেগম সমরুর কর্ম্ম ত্যাগের এই কারণই সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিন্তু ইহাকে প্রকৃত কারণ বলিবার পক্ষে প্রবল বাধা এই যে, ইতিপূর্ব্বেই জর্জ্জ টমাস মারিয়া নাম্নী বেগম সমরুর আশ্রিতা একটি বর্ণশঙ্কর ফরাসী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিল, বেগমই অগ্রণী হইয়া এ-বিবাহ দিয়াছিলেন। বেগমের আশ্রিতা পরিচারিকা-শ্রেণীভুক্তা রমণীকে যে-ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিল, সেই স্ত্রীর জীবদ্দশায় তাহাকে বেগমের বিবাহ করা কতদূর সম্ভব তাহা সহজেই বিবেচ্য। বেগম পরে জর্জ্জের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী লেভাসুলৎকে বিবাহ করা হইতেই যে এই কাহিনীর সৃষ্টি তাহা সহজেই অনুমেয়।*

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে দিল্লী হইতে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি পুনায় তাঁহাকে এক পত্রে বেগম টমাসকে চরিত্র-হীনতাপরাধে পদচ্যুত করিয়াছেন লিখিয়াছিলেন।

জর্জ্জের মৃত্যুর পর লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র-লেখক Asiatic Annual Register পত্রে "জর্জ্জ টমাসের প্রামাণিক ইতিহাস" নামে এক সন্দর্ভে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তখনকার দিনের অনেক বৃটিশারের মতই জর্জ্জও ঘোর ফরাসী-বিদ্বেষী ছিল। বেগমের সেনাদলে ফরাসী সৈনিকের সংখ্যা হ্রাস করার প্রতি তাহার বরাবরই লক্ষ্য ছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে, অতএব ব্রিগেডের অফিসরদের সংখ্যা কমান প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই তিনি বেগমকে বুঝাইলেন। ফরাসী সৈনিকগণ একথা শুনিয়া ভীত হইল এবং শিখদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে টমাসের অনুপস্থিতির সুযোগে তাহারা বেগমকে বুঝাইল যে জর্জ্জ তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে প্রধান বাধা ফরাসী সৈনিক পুরুষগণকে এই কারণেই তিনি তাড়াইতে চাহেন; বৃটিশ বংশোদ্ভূত সৈনিকগণের নিকট তাঁহার কোন আশঙ্কার কারণ নাই, তাহারা সকলেই তাঁহার পরম বাধ্য। বেগম এ-কথা সত্য বলিয়া মনে করিলেন; না করিবারও কোন কারণ ছিল না, কারণ বাহ্যতঃ-দৃষ্টে জর্জ্জের আচরণের হেতু ঐরূপই বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক। ফরাসী ও ইংরাজ চিরশত্রু হইতে পারে, কিন্তু বেগমের বাহিনীর সে বিরোধের সহিত কোনই সম্বন্ধ ছিল না। টমাসকে হাতের কাছে না পাইয়া তিনি মরিয়ার উপর কোপ প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে আটক করিয়া রাখিলেন। এ সংবাদ পাইয়া জর্জ্জ টমাস তৎক্ষণাৎ সার্দ্ধানায় আসিয়া স্ত্রীর উদ্ধার সাধন করিলেন এবং বেগমের কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেগম ও লেভাসুলতের বিবাহের কথা বলিয়াছি। ফাদার গ্রেগরিও নামক বেগমের এক অনুগত পাদ্রি কর্ত্তৃক উভয়ে দাম্পত্যবন্ধনে গোপনে আবদ্ধ হইলেন। সেনাদলের বিরাগ-ভাজন হইবার আশঙ্কায় বিবাহের কথা সাধারণে প্রচার করা হইল না। তবে লেভাসুলতের স্বপক্ষে বলা উচিত যে বিবাহের সময় সাক্ষী রাখিবার জন্য তিনি কর্ণেল সাল্যর এবং মেজর বার্ণিয়ার নামক দুইজন সুহৃদ ও সহকর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের কথা গোপন রাখিয়া বেগম এবং তাঁহার নবীন স্বামী এক সাঙ্ঘাতিক ভ্রম করিলেন।

বেগমের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া জর্জ্জ টমাস আপ্পাজী খাণ্ডেরাও নামক একজন মহারাষ্ট্র সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহাদজী সিন্ধিয়ার পুণায় মৃত্যু হইলে মারাঠা-জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সুযোগে আপ্পাজী দিল্লীতে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্ধ বাদসাহের নামে তাঁহার অন্যতম পুত্র মীর্জ্জা আকবর (পরে বাদসাহ দ্বিতীয় আকবর যিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন) দিল্লীতে রাজ-প্রতিনিধিত্ব করিতেন। আপ্পাজীর আচরণে ভীত হইয়া তিনি বেগম সমরু এবং অপরাপর অনুচরবৃন্দের সহযোগিতায় খণ্ডেরাওকে বাধা দিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহজাদা ঐ ব্যাপারে ইংরাজদের সাহায্যলাভে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু স্পষ্টতঃ ইংরাজদের সহিত মিত্রতা করা সম্ভব ছিল না, কারণ ইংরাজদের দিল্লীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে

* সুন্দরী বেগমকে অর্থলোভে বিবাহ করিতে তখনকার দিনের অনেক ইউরোপীয়েরই স্পৃহা হইত। ৩রা মার্চ্চ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত বুসীর পূর্ব্বোক্ত পত্র হইতে জানা যায় যে Montigny নামক জনৈক উচ্চ-পদস্থ ফরাসী কর্ম্মচারীও বেগমের পাণিপীড়নে আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু পাওলীর পরিণাম স্মরণে তাঁহার ঐ কার্য্যে আর সাহসে কুলায় নাই।

দেখিলে অপরাপর মারাঠা নায়কবর্গের খণ্ডেরাওয়ের সহিত মিলিত হইবার আশঙ্কা ছিল। আপ্পাজীর সহিত বেগম সমরুর বিবাদ ছিল, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সেনানায়ক জর্জ্জ টমাস খণ্ডেরাওয়ের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আক্রোশবশতঃ তাঁহার জনপদ উৎসাদিত করিতেছিলেন। এই কারণে স্থির হইল যে বেগমই জর্জ্জের পরামর্শে আপ্পাজী তাঁহার শত্রুতা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। ১৬ই জুন ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বেগমের পত্র লইয়া তাঁহার বিশ্বাসী পুরোহিত গ্রেগরিও কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কিন্তু ইংরাজরা এ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; তিনমাস কাল কলিকাতায় কাটাইয়া বিফলমানসে পাদ্রী মহাশয় সেপ্টেম্বরের শেষে সার্দ্ধানায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে বেগম ও জর্জ্জ টমাসে স্পষ্ট যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। নিজ সেনাদলসহ বেগম যুদ্ধযাত্রা করিয়া টমাসের হেড-কোয়ার্টার্স ঝাঝারের অদূরে আসিয়া উপনীত হইলেন; কিন্তু সার্দ্ধানায় গোলযোগের সংবাদে তথায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

বেগমের স্বামী লেভাস্যুলৎ ছিলেন ভদ্রবংশজাত সন্তান এবং তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার যথেষ্ট উৎকর্ষ ছিল; তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যও ছিল প্রচুর। কিন্তু তাঁহার একটী মহৎ দোষ ছিল,—তিনি নিতান্ত গর্ব্বিত এবং কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং সেইজন্যই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। অধস্তন পশুপ্রকৃতিক ইউরোপীয় সৈনিকগণকে তিনি নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, কিছুতেই নিজেকে তাহাদের সমকক্ষ মনে করিতে পারিতেন না। তিনি তাহাদের সহিত মিশিতে চাহিতেন না। বেগমের সহিত বিবাহের পর তিনি যে-সকল আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন, বিবাহের কথা অজানা থাকায়, সকলেই তাহাতে নিরতিশয় বিরক্ত এবং নিজেদের অপমানিত বোধ করিতে লাগিল। একদিন তাঁহার আদেশ বাহির হইল যে ইউরোপীয় সেনানীবৃন্দ আর পূর্ব্বের মত বেগমের সহিত ডিনারে বসিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য এ-অবমাননায় তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। সেনাদলের বিশ্বস্ততারই উপর সব নির্ভর করিতেছে, তাহাদের ক্রোধোদ্রেক করার অর্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদ ডাকিয়া আনা এ-সকল কথা স্বয়ং বেগম তাঁহাকে বুঝাইলেও আদেশ প্রত্যাহৃত হইল না। ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারীর দল স্থির করিল যে সামাজিক ভাবে যে-ব্যক্তি তাহাদের সহিত সমানভাবে চলিতে চাহে না অতঃপর তাহারা আর এতাদৃশ ব্যক্তিকে নিজেদের অধিনায়ক বলিয়া মানিবে না। সাধারণ সৈন্যরাও অফিসরদের সহিত যোগ দিল। চারিধারেই অশান্তি, বিরক্তি, অসন্তোষের স্রোত বহিল। তথাপি লেভাস্যুলতের ঔদ্ধত্য দিন দিন মাত্রা ছাড়াইতে লাগিল। বেগমের স্বামীরূপে সে সকল বিষয়েই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া চলিতে চাহিত; কিন্তু বেগমের সহিত তাহার বিবাহের কথা অপ্রকাশ থাকায় সকলে উভয়ের মধ্যে একটা অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে মনে করিত। সমরু সাহেবের বিধবার এবম্বিধ আচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ সেনাদল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সমরুর পুত্র লুই ব্যালথাজার সোম্ব্রুকে সার্দ্ধানার আধিপত্য প্রদান করা স্থির করিল। লুই নামে খৃষ্টান হইয়াছিল, তাহার মধ্যে খৃষ্টানত্বের কিছুই ছিল না। সমরুর এই অপদার্থ পুত্র তাহার মুসলমানী "নবাব জাফর ইয়াব খাঁ, মজঃফরউদ্দৌলা" নাম লইয়া তাৎকালীন মোগল আমীরের চালে দিল্লীতে বাস করিত। বিদ্রোহীদলের নেতা ছিল লেজয় (Legois) নামক একজন বেলজিয়ান সৈনিক। লেভাস্যুলতের প্রতি তাহার আক্রোশের কারণ ছিল। লেজয় জর্জ্জ টমাসের বন্ধু ছিল, লেভাস্যুলৎ টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করিলে সে বেগমকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বেগমের বাহিনীর প্রধান সেনাপতি লেভাস্যুলৎ অবাধ্যতাপরাধে লেজয়কে কর্ম্মচ্যুত করেন। লেজয়ের অধীন সৈনিকগণ তাহাদের অধ্যক্ষের এ-অপমান এবং ক্ষমতার একান্ত অপ-ব্যবহার দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। প্রথমটায় সকলে লেজয়কে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেভাস্যুলতকে সম্মিলিতভাবে অনুরোধ করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় বেগম এবং তাঁহার প্রণয়ীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে সকলে কৃতসঙ্কল্প হইল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লেজয় বিদ্রোহীদলের মুখপাত্র-রূপে লুইয়ের সহিত সর্ত্তসম্বন্ধে আলোচনা করিবার অভি-প্রায়ে দিল্লী গমন করিল। বিপদের গুরুত্ব দর্শনে প্রাণ-

ভয়ে ভীত বেগম এবং তাঁহার স্বামী সার্দ্ধানা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজরাজ্যে আশ্রয় লওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তজ্জন্য ইংরাজের অনুমতির প্রয়োজন। উভয়ের মধ্যে কাহারও ইংরাজী ভাষা ভাল জানা ছিল না—বেগমের ত একেবারেই ছিল না, লেভাসুলতেরও না থাকারই মত ছিল। যাহা হউক ব্যাকরণ ও অভিধান পুস্তকের সাহায্যে কোনমতে একখানি পত্রের মুসাবিদা করিয়া লেভাসুলৎ অনুপসহরে অবস্থিত সীমান্তরক্ষী বৃটিশসেনার অধিনায়ক কর্নেল ম্যাকগাওয়েনের নিকট তাহা পাঠাইলেন। এই পত্রে তিনি তাঁহার নিজের এবং বেগমের জন্য কর্নেলের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে অনুপসহর হইতে তাঁহারা ফরুখাবাদে যাইবেন এবং অবশিষ্ট জীবনকাল তথায় অতিবাহিত করিবেন। পত্র পাইয়া কর্নেল ম্যাকগাওয়েনের আশঙ্কা হইল যে সিন্ধিয়ার এই দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে কর্ত্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে আশ্রয় দিলে পরে হয়ত ইহার জন্য তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব হইতে পারে; তিনি নিজের দায়ীত্বে কিছু করিতে সাহস না করিয়া লেভাসুলতের পত্র কলিকাতায় গভর্নরজেনারেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সে-কথা সার্দ্ধানায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। লেভাসুলৎ এই চিঠি যেদিন পাইলেন সেইদিনই (২রা এপ্রিল, ১৭৯৫) আবার তাঁহাকে শীঘ্র তাঁহাদের রক্ষার উপায় করিতে লিখিলেন। বেগমও কলিকাতার দরবারে বঙ্গবিহারে যে কোনও জায়গায় বাস করিবার অনুমতি চাহিয়া এক চিঠি লিখিলেন। কলিকাতা হইতে উত্তর আসিতে কিছুকাল কাটিয়া গেল। শেষে তাঁহাদের ইংরাজ রাজ্যে আশ্রয় লইবার অনুমতি দেওয়া হইল এই সর্ত্তে উভয়ে চন্দননগরে গিয়া বাস করিবেন এবং ইংরাজ অধিকারে যতক্ষণ থাকিবেন লেভাসুলতের প্রতি যুদ্ধ-বন্দীর মত ব্যবহার করা হইবে।

বিদ্রোহীরা সকল সংবাদই পাইল। জাফর ইয়াবকে সার্দ্ধানায় আসিয়া পৈতৃক গদীতে বসিবার জন্য লিখিয়া পাঠান হইল; প্রথমটায় তাহার সাহসে কুলায় নাই, কারণ সে ভালরূপই জানিত যোগ্যতায় তাঁহার বিমাতা তাঁহার চেয়ে অনেক উচ্চে। কিন্তু সৈন্যগণ তাহার আদেশ পালনে সম্মত এবং বেগম পলায়নে সচেষ্ট জানিয়া তাহার ভরসা পাইল। এ সকল সংবাদে বেগম ও তাঁহার স্বামী বুঝিলেন আর সময় নষ্ট করা অনুচিত; অতঃপর সার্দ্ধানায় থাকিলে শত্রুহস্তে বন্দীদশা অনিবার্য্য। তাঁহারা জুন মাসের এক দিন প্রত্যুষে ধনরত্নাদি লইয়া গোপনে পলায়ন করিলেন। অর্থ লইয়া যাওয়াই তাঁহাদের কাল হইল; রাখিয়া গেলে বিদ্রোহীরা সম্ভবতঃ উহা লুণ্ঠন করিয়াই সন্তুষ্ট হইত, পলাতকযুগলের আর পশ্চাদ্ধাবন করিত না।

লেভাসুলৎ অশ্বপৃষ্ঠে এবং বেগম শিবিকারোহণে,—তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন প্রয়োজন হইলে আত্মহত্যা করিয়া বরং নিষ্কৃতি লইবেন তথাপি প্রাণ থাকিতে ধরা দিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে লাঞ্ছনা সহ্য করিবেন না। মীরাটের পথে তাঁহারা মাত্র তিন মাইল গিয়াছেন, পশ্চাতে বহু অশ্ব-পদ-শব্দ শুনা গেল। অনুসরণকারী বিদ্রোহীদল আসিয়া পড়িয়াছে, আর রক্ষা নাই। বেগম নিজকরধৃত ছুরিকা বক্ষে বসাইয়া দিলেন, রক্তে বস্ত্র ভাসিয়া গেল। লেভাসুলতের ঘোড়া কতকটা আগে চলিয়া গিয়াছিল, ইচ্ছা থাকিলে দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। পশ্চাতে শিবিকাবাহকগণের মধ্যে গোলমাল শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন; বেগমের পরিচারিকা জানাইল তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। পুনরায় প্রশ্ন করিলে পরিচারিকা বলিল, বেগমের মৃত্যু হইয়াছে। রক্ত-রঞ্জিত রেশমী অঙ্গবস্ত্র দেখিয়া লেভাসুলতের প্রতীতি জন্মিল যে বেগম আর সত্যই ইহ জগতে নাই। তখনও পলায়ন করিলে প্রাণ রক্ষা হইত। কিন্তু ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের আর জীবনের স্পৃহা ছিল না; তিনিও নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। আর মুহূর্ত্তমাত্র কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে নিজ উন্মুক্ত মুখ-বিবর মধ্যে পিস্তলের নল প্রবেশ করাইয়া দিয়া লেভাসুলৎ ঘোড়া টিপিলেন। গুলি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উর্দ্ধে ছুটিয়া গেল, পেশীর আকুঞ্চনে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তাঁহার দেহ একহস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই সবেগে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

বিদ্রোহীরা লেভাসুলতকে না পাইয়া তাহার মৃতদেহের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইল না। তিন দিন মৃতদেহ সেইখানেই পড়িয়া পড়িল, পরে তাহা এক নালায় ফেলিয়া দেওয়া হয়; তথায় উহা শৃগাল কুকুর ও শকুনির আহার্য্যে পরিণত হইল। বিদ্রোহীরা ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া সংজ্ঞাহীনা বেগমকে লইয়া মহোল্লাসে সাদ্ধানায় ফিরিল।

বেগম আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে নিজ অঙ্গে অস্ত্রচালনা করিলেও বাস্তবিক কিন্তু তাঁহার আঘাত তাদৃশ গুরুতর হয় নাই। কেহ কেহ ইহা লইয়া রহস্য করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে বেগমের আত্মহত্যা করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; লেভাসুলতের হাত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য ইহা তাঁহার একটা কারসাজি মাত্র, কারণ ইতোমধ্যেই তিনি তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীকে লইয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এ সকল কথার কোন মূল্য নাই। বিদ্রোহীরা আহত বেগমকে সাদ্ধানায় লইয়া গিয়া একটি কামানের চাকার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। সপ্তাহকাল বেগম এই অবস্থায় রহিলেন। এক বিশ্বাসী পরিচারিকা মধ্যে মধ্যে গোপনে তাঁহাকে কিছু কিছু আহার্য্য আনিয়া না দিলে এ সময় তাঁহার প্রাণ ধারণ করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। পরে লেভাসুলতের বন্ধু বেগমের বিশ্বাসী কর্নেল সাল্যরের চেষ্টায় তিনি এ-অবস্থা হইতে কতকটা রক্ষা পাইয়া গৃহমধ্যে বন্দীভাবে রক্ষিত হইয়াছিলেন।

বিদ্রোহী অফিসরগণ এইবার তাহাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারে মত্ত হইল; সাদ্ধানায় গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবধি রহিল না। জাফর ইয়াব আসিয়া গদীতে বসিল। তাহার সাহায্যকারী বন্ধুর দলই সর্ব্বেসর্ব্বা হইল। অশিক্ষিত দুর্ব্বলচিত্ত, নিষ্ঠুর-প্রকৃতিক এবং লম্পট লোকটির মধ্যে ভাল বলিবার মত কিছু ছিল না। নবাব হইয়া বসিয়া লুই ব্যালথাজার ইংরাজ কোম্পানীর সাহায্যলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানী তাহার আধিপত্য স্বীকার করেন নাই।

কর্নেল সাল্যরের চেষ্টায় বেগমের বন্দীদশায় স্বাচ্ছন্দ্যলাভের কথা বলিয়াছি। ইউরোপীয় সৈনিকগণের এই বিদ্রোহ ব্যাপারে সাল্যর নিজে ত অংশমাত্র লয় নাই, বরং সহকর্ম্মীগণকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। বেগমের উদ্ধার সাধন উহা দ্বারাই হইল। বেগমের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী জর্জ্জ টমাসের কথাই সাল্যরের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় সমর-ব্যবসায়ী জর্জ্জ একটা সামরিক অভিযানে সাদ্ধানার অদূরেই অবস্থান করিতেছিলেন। সাল্যর তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া বেগমকে উদ্ধার করিতে অনুরোধ করিলেন। উদার-হৃদয় জর্জ্জ বেগমের সমস্ত পূর্ব্বের আচরণ ও শত্রুতা-সাধন ভুলিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ বেগমের উদ্ধার সাধনে যত্নবান হইলেন। ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মীগণকে তিনি প্রথমেই তাহাদের এবম্বিধ গর্হিত আচরণের জন্য ভৎর্সনা করিয়া এক কড়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন এবং জানাইলেন যে তাহারা যে-পথে চলিতেছে যদি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হয় অথবা বেগমের কোন অনিষ্ট করে তবে সিন্ধিয়া কোনমতেই তাহাদের রেহাই দিবেন না; কারণ বেগম সমরু তাঁহার জায়গীরদার। সিন্ধিয়া নিশ্চয়ই ব্রিগেড ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং বিদ্রোহিতাপরাধে তাহাদের সকলকে শমনসদনে পাঠাইবেন। জর্জ্জ শুধু চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তিনি সসৈন্যে সাদ্ধানায় আসিয়া দেখা দিলেন। সিন্ধিয়ার ক্রোধের আশঙ্কা, টমাসের সৈন্যগণের উপস্থিতি, তৎপ্রদত্ত প্রচুর উৎকোচ এবং নূতন নবাবের জঘন্য চরিত্র,—এই সকল নানা কারণে বিদ্রোহীদের চৈতন্যোদ্রেক হইল। তাহারা কৃতকর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আবার বেগমের আনুগত্য স্বীকার করিল। আবার বেগম সাদ্ধানার আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জাফর ইয়াবকে বন্দী করিয়া দিল্লী পাঠান হইল, শুনা যায় সেইখানেই ১৭৯৯ (কোনমতে ১৮০৩) খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু ঘটে। বলা বাহুল্য এ-ধরণের ভুল, অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ বেগম সমরু আর কখনও করেন নাই।

অতঃপর কর্নেল সাল্যর ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব লাভ করিল। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় প্রধান প্রধান ত্রিশ জন অফিসর বরাবরের মত বেগমের বশ্যতা স্বীকার

করিয়া এক দলীলপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিল। এক মুসলমান মুন্সী কর্ত্তৃক ফরাসীভাষায় ঐ দলিল লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এখানে বলা উচিত যে উহাদের মধ্যে শুধু সাল্যারেরই নিজের নাম লিখিবার মত বিদ্যা ছিল; অধিকাংশ ব্যক্তিই দলিলে নিজ নিজ মোহর-চিহ্ন অঙ্কিত করে, কেহ কেহ আবার নিজের বিদ্যা জাহির করিবার জন্য নামের আদ্য অক্ষরগুলি লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু সে-চেষ্টা যে সর্ব্বত্র সফল হইয়াছিল এমন কথা বলা চলে না। ইহা হইতেই কি ধরণের ইউরোপীয়েরা তখনকার দিনে এদেশে আসিয়া সেনাদলের নায়কত্ব লাভ করিত তাহা বুঝা যাইবে। বেগমের উদ্ধারসাধনে জর্জ্জ টমাস নিজ তহবিল হইতে উৎকোচদানে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-টাকা বেগম তাঁহাকে পরে ফেরৎ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

ইহার পর প্রায় সাত বৎসর কাল ধরিয়া প্রায় স্বাধীন ভাবে বেগম সমরু সার্দ্ধানার আধিপত্য ভোগ করেন। সাল্যারই এই সময় তাঁহার সেনানায়ক ছিল। তাহার চেষ্টায় ব্রিগেডের কিছু বলবৃদ্ধিও হইয়াছিল। পূর্ব্বে বেগমের অশ্বারোহী সৈন্য ছিল না। সাল্যারের চেষ্টায় চারিশত সৈন্য-সম্বলিত ক্ষুদ্র এক পল্টন অশ্বারোহীবাহিনী গঠিত হইল। পদাতিকদল ও চারি ব্যাটালিয়নের স্থলে ছয় ব্যাটালিয়ন এবং তোপ সংখ্যা চল্লিশটীতে দাঁড়াইল। বাদসাহের জায়গীরদাররূপে বেগম সমরু তাঁহাকে যুদ্ধকালে সেনাসাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু বাদসাহ নাম-সর্ব্বস্বে পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিনিধি সিন্ধিয়াই উত্তরভারতের প্রকৃত অধিপতি ছিলেন। সুতরাং বাদসাহের নামে সিন্ধিয়ার সকল সমরে বেগম সমরুর সেনাদল বাদসাহী ফৌজ হিসাবে গমন করিতে বাধ্য ছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সুলতানসাহ নামক একজন ভণ্ড রোহিলা সর্দ্দারের বিদ্রোহে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে হান্সির রাজা জর্জ্জ টমাসের সহিত সিন্ধিয়ার প্রধান সেনাপতি পেরঁর যুদ্ধে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে বেগমের ব্রিগেড সিন্ধিয়ার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়াছিল।

ইংরাজ ও মারাঠাদের এই সংগ্রাম ইতিহাসে দ্বিতীয় মারাঠাযুদ্ধ নামে পরিচিত। এই সময়ের ফলে ভারতের ইতিহাসে যে গুরু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন। ফলতঃ এই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াই ইংরাজ হিন্দুস্থানের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্য প্রবন্ধে বলা যাইবে, এখানে সুধু বেগম সমরুর কথা বলা হইতেছে। দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতেই উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ একরূপ নিশ্চিত হইয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে সমরানল প্রজ্জলিত হয় নাই। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি যে নীতির বলে সিন্ধিয়ার কয়েকজন ফরাসী সৈনিককে নিজ পক্ষে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই নীতি অনুসরণ করিয়া বেগমকেও সিন্ধিয়ার পক্ষ হইতে ইংরাজের দলে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতেই তাঁহাদের মধ্যে পত্রব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন মারাঠাদের সহিত যুদ্ধের কোনই আপাতসম্ভাবনা দেখা যায় নাই। ৪ঠা আগষ্ট ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বেগম এক চিঠিতে ওয়েলেসলীকে জানান যে ইংরাজের আশ্রয়ের বিনিময়ে তিনি তাহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহার ধনজন দিয়া সর্ব্ব-প্রকারে তাহাদের আনুকূল্য করিবেন। তখনও যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাহার পর বসই (Bassein) সন্ধির ফলে (৩১শে ডিসেম্বর ১৮০২) যখন সিন্ধিয়ার সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, তখন গভর্ণর-জেনারেল যাহাতে বেগম সসৈন্যে ইংরাজের পক্ষ-ভুক্ত হন এবং পূর্ব্বতন প্রভু সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেগমের ব্রিগেড এই সময় দাক্ষিণাত্যে সিন্ধিয়ার সেনাদলের সহিত অবস্থান করিতেছিল। ওয়েলেসলির চেষ্টা সফল না হইলেও এবং কর্ণেল সাল্যারের পরিচালনে বেগমের সৈন্যগণ আসাইয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে (২৩শে সেপ্টেম্বর) সিন্ধিয়ার সেনাদলের সহিত ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও কিন্তু উভয় পক্ষের পক্ষে সদ্ভাবের অভাব হয় নাই এবং সমস্ত যুদ্ধকালটাই বেগমসমরু ও ইংরাজে পত্রব্যবহার চলিয়াছিল।

৭ই আগষ্ট ইংরাজের প্রধান সেনাপতি লেক কানপুর হইতে যুদ্ধযাত্রা করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি বেগমকে তাঁহার সেনাদলের যমুনা নদী পার হইবার উপযোগী নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন এবং নিজের সৈন্যগণকে ইংরাজ-পক্ষে যোগ দিবার আদেশ দিতে, অন্ততঃ পক্ষে রণস্থল হইতে ফিরাইয়া লইতে আদেশ দেন। কিন্তু নানা কারণে সাল্যরের পক্ষে সে আদেশ পালন সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সার্দ্ধানা বিগ্রেডের শুভাদৃষ্ট বশতঃ তাহাদের বড় বেশীরকম যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয় নাই। মাত্র এক ব্যাটালিয়ন সিপাহী আসাইয়ের শোণিত-রঞ্জিত রণস্থলে উপস্থিত ছিল এবং সিন্ধিয়ার সেনাদলের সহিত ইংরাজহস্তে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, বাকী চারি ব্যাটালিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে মারাঠা শিবির রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। যুদ্ধের পর সাল্যর ইহাদিগকে ভীগে নিরাপদে ফিরাইয়া বেগমের আদেশমত কর্নৌন্দে কর্ণেল বলের সহিত সম্মিলিত হন।

বেগমের রবার্ট স্কিনার নামক একজন ইউরেশীয় সৈনিক ছিল। রবার্ট অপেক্ষা তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণেল জেমস্ স্কিনারের নামই ইতিহাসে সমধিক সুপরিচিত। আলিগড় অধিকার করিয়া লেক সিকন্দ্রাবাদে পৌঁছিলে বেগম সমরু তিনি যে সিন্ধিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন একথা নিবেদন করিবার জন্য রবার্টকে তৎসকাশে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন। জেমস স্কিনার নিজ আত্মচরিতে এ-সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার একাংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল।

"জেনারেল লেককে সম্মান দেখাইবার জন্য বেগম সমরু যখন আসেন তখন একটী হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ডিনারের অব্যবহিত পরেই বেগম আসিয়া পৌছেন। জেনারেল সাহেব যে তাঁবুতে সকলকার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, বেগমের শিবিকা তথায় লইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। লেক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। বেগমের অধীনতা স্বীকারে তিনি খুব উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে কোন রাজা বা সর্দ্দারের ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করাটা একটা খুবই গুরুতর ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত, তা তিনি যতই ছোট রাজা বা সর্দ্দার হউন না কেন, তাহাতে কিছু যাইয়া আসিত না। ডিনারকালে মদ্যপানের ফলে জেনারেল বোধ হয় তখন একটু খোসমেজাজে ছিলেন;—তিনি ভুলিয়া গেলেন যে বিরাট গুম্ফশ্মশ্রুধারী পুরুষের পরিবর্ত্তে একটী স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আসিয়াছে। তিনি বেগমকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। ইহা দেখিয়া বেগমের অনুচরবর্গের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু বেগমের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সকল দিক রক্ষা করিল। সম্মানে জেনারেল সাহেবকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বেগম নিজ বিস্ময়বিমূঢ় পরিচারকদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "কন্যার প্রতি পাদরির সম্ভাষণ এইরূপই হইয়া থাকে।" বেগম ছিলেন খৃষ্টান, কাজেই তাঁহার প্রদত্ত কৈফিয়ৎ উহারা সম্ভব বলিয়াই মনে করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকতর অভিজ্ঞ যদি কেহ থাকিত তবে রক্তবর্ণের সামরিক-পোষাকপরিহিত পাদ্রি দেখিয়া সে নিশ্চয়ই না হাসিয়া থাকিতে পারিত না।

রণপরাজিত সিন্ধিয়া সমগ্র হিন্দুস্থানের আধিপত্য ইংরাজকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, চম্বল নদ তাঁহার ও কোম্পানীর রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। অতঃপর বেগম ইংরাজের অধীন জায়গীরদার হইলেন। ওয়েলেসলী বেগমের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা স্থির করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই ২৩শে ডিসেম্বর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড লেককে লিখিয়াছিলেন যে কোম্পানী কোনমতেই বেগমের জায়গীর অধিকার করিতে বা তাঁহার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। প্রথমটায় ওয়েলেসলির অভিপ্রায় ছিল যে যমুনা নদীকেই ইংরাজের নিজ রাজ্যের পশ্চিম সীমা করিবেন; তাহার অপর পারে কোম্পানীর সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ সামন্তনৃপতিবৃন্দের রাজ্য থাকিবে। বেগমের জায়গীরের অধিকাংশ যমুনা নদীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত ছিল; পশ্চিম-তটেও কিছু ছিল। গভর্ণরজেনারেল স্থির করিলেন

বেগমের দোয়াবমধ্যস্থ জনপদের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে যমুনার পশ্চিমপারে একটী অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিবেন এবং তজ্জন্য বেগমকে তাঁহার রাজ্য ইংরাজ-করে সমর্পণ করিতে বলিলেন। তাঁহাকে জানান হইল ভবিষ্যতে সুবিধামত কোম্পানী তাঁহাকে বিনিময়ে যমুনার অপরপারে রাজ্য দিবেন। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থায় বেগম সমরু সম্মত হইতে পারিলেন না; কোম্পানী তাঁহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। ইহার অনতিকাল পরেই ওয়েলেসলি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নূতন গভর্ণরজেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের এ ব্যবস্থা মনঃপূত না হওয়ায় উহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতঃপর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উভয় পক্ষে যে নিষ্পত্তি হইল তাহাতে স্থির হইল যে বেগম তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর জায়গীরদার থাকিবেন এবং পূর্ব্বের মত তাঁহার সকল অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কোম্পানীর অনুমতি বিনা অপর কোন রাজার সহিত তিনি কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন না, তবে নিজ জায়গীর মধ্যে তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। যুদ্ধকালে নিজ সেনাদল দিয়া তিনি কোম্পানীকে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। সেনাদলের অর্দ্ধাংশ তাঁহার নিকট জায়গীর মধ্যে থাকিবে এবং অপর অর্দ্ধাংশ কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তবে তাহার ব্যয়ভার বেগম বহন করিবেন। বেগমের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সুধু তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার পাইবেন, জায়গীর আর তাঁহাদের বর্ত্তাইবে না, উহা কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হইবে। তখন বেগমের বিগ্রেড ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং তাবৎ রণসম্ভার কোম্পানীর হস্তে সমর্পিত হইবে।

সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল এইভাবে কোম্পানীর আশ্রয়ে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া ২৭শে জানুয়ারী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তঅশীতিতম বর্ষে বেগম সমরু লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার রাষ্ট্র-শাসন, সার্দ্ধানায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ, ভজনালয়াদির বিবরণ, খৃষ্টধর্ম্মের কল্যাণ কল্পে তাঁহার প্রচুর অর্থদান এবং বৃটিশ ভারতের বড়লাট ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অপ্রয়োজনীয় বিধায় বলা হইল না। কৌতুহলী পাঠক এবিষয়ে বেগম সমরু সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থাদি দেখিতে পারেন।*

বেগম সমরু জাফর ইয়ার বা লুই ব্যালথাজার রীণহার্ডের দৌহিত্র ডেভিড অক্টারলোনি ডাইস-সোম্ব্রকে নিজ উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে বেগমের পরিত্যক্ত তাবৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী ইনিই হইয়াছিলেন। ইঁহার বিচিত্র কাহিনী অন্যবারে বলা যাইবে।

ইতিপূর্ব্বে ওয়াল্টার রীণহার্ড সমরু সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার শেষাংশ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতে কয়েকটি গুরুতর ভ্রম-প্রমাদও রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছিল সমরু রোহিলাদের পরিত্যাগ করিয়া জয়পুরের রাজার অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং জাঠদের নিকট সমরু বেশী দিন থাকে নাই। এ কথাগুলি ঠিক নহে। ডাঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে জাঠজাতির ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে জাঠপক্ষে থাকা কালে সমরুর জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। এজন্য তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করা প্রয়োজন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সমরু ভরতপুরের জাঠ রাজা জাহিরসিংহের কর্ম্ম গ্রহণ করে এবং অতঃপর নয় বৎসর কাল তাহার জাঠেদের সঙ্গে কাটিয়াছিল। জাঠসঙ্গে থাকা কালে যে সকল সামরিক অভিযান এবং যুদ্ধ ব্যাপারে সমরু লিপ্ত ছিল তাহার আদ্যন্ত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নহে। কর্ম্ম গ্রহণের অনতিকাল পরেই সমরু একবার জাহিরসিংহের সহিত দিল্লী অবরোধে গমন করিয়াছিল। রণস্থলে বিজয়লাভ করিলেও কিন্তু তাঁহার সহযোগী মহলর রাও হোলকরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জাহিরসিংহ তাহার পূর্ণ ফললাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমরুর পক্ষে এই অভিযান স্মরণীয় হইয়াছিল, কারণ এই যুদ্ধ কালেই

* বেগম সমরু সম্বন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইখানি গ্রন্থ আছে; বাঙ্গালাটী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং ইংরাজীটী প্রামাণিক ও সাতিশয় মূল্যবান। এই গ্রন্থ ও Comptonএর ভাগ্যান্বেষীদের ইতিহাস হইতে প্রবন্ধ লিখিতে যথেষ্ট সাহায্য লওয়া লইয়াছে।

ওয়াল্টার এক রূপ-লাবণ্যবতী মুসলমান বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছিল; ইনিই পরিশেষে বেগম সমরু নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সমরু ইংরাজের ভয়ে রোহিলাদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া জাটদের নিকট আশ্রয় লইলেও ইংরাজেরা এথান হইতে তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে ছাড়েন নাই। ১৯শে আগষ্ট ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে গভর্ণর জাহির সিংহকে সমরুকে বিতাড়িত করিবার অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই; এমন কি গভর্ণর বাহাদুরের পত্রের উত্তর দেওয়ারও কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। জাঠ-সঙ্গে থাকিয়া সমরু যে সকল যুদ্ধ ও অভিযানে লিপ্ত ছিল তাহার সকল বিবরণ এথানে দেওয়া সম্ভব নহে; মাত্র কয়েকটীর কথা পরে সমরুর সহকর্ম্মী ভাগ্যান্বেষী ফরাসী সৈনিক মাদেক-প্রসঙ্গে বলা যাইবে।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জাহিরসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রতনসিংহ রাজা হইলেন; কিন্তু পর বৎসর এপ্রিল মাসে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল। অতঃপর আত্ম-কলহে ও বহির্শত্রুর আক্রমণে জাঠরাজ্যে মহা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সুযোগ বুঝিয়া মোগল, মারাঠা, রাজপুত, রোহিলা, শিখ সকলেই একে একে জাঠদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল; একটির পর একটি করিয়া প্রদেশ জাঠদের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল। সুরযমলের এত যত্নে গঠিত রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কথা। সাহআলম দীর্ঘপ্রবাসের পর সিন্ধিয়া কুলগৌরব মহাদজীর চেষ্টায় দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বপুরুষের মহাগৌরবপূর্ণ তথ্‌তে বসিলেন। তাঁহার সেনাপতি ও প্রধান সহায় মীর্জ্জা নজফ খাঁ মোগলের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জাঠরাজ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগে তিনি তাহাদের কবল হইতে আগ্রাপ্রদেশ উদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন। নিজ সেনাদল সংগ্রহ করিয়া তিনি জাঠদের বিরুদ্ধে কতকটা পথ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল চতুর জাঠসেনা ডীগদুর্গ হইতে রওনা হইয়া অন্যপথে ঘুরিয়া দিল্লী অধিকারে ছুটিয়াছে এবং রাজধানী হইতে ৩৬ মাইল দূরবর্ত্তী সেকেন্দ্রাবাদ অধিকার করিয়াছে। বর্ষা নামার জন্য তথনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রহিল—জাঠরা সেকেন্দ্রাবাদেই বর্ষা বাস করিল। হেমন্তের প্রারম্ভে মীর্জ্জা দশ সহস্র অশ্বারোহী ও মাদেকের সেনাদল (মাদেক ইতোমধ্যে বাদসাহের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন) লইয়া অভিযান করিলেন। কয়েকটী খণ্ড-যুদ্ধের পর মথুরার ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বারসানা নামক স্থানে ৩১শে অক্টোবর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল।

বারসানা যুদ্ধের কথা ইতি পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। তবে যুদ্ধের পরদিনই সমরু নজফ খাঁর দলে যোগ দিয়াছিলেন বলা হইয়াছে, সে কথা কিন্তু ঠিক নহে। সমরুর সেনাদলের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া মীর্জ্জা তাহাকে নিজ পক্ষে আনয়ন করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার সহিত পত্রব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আগ্রাপ্রদেশ পুনরুদ্ধার এবং রক্ষণে সমরুর সাহায্য অপরিহার্য্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। কারণ দীর্ঘকাল জাঠদের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার ফলে তাহাদের রাষ্ট্র ও সেনাদল সম্বন্ধে সকল কথাই তাহার জানা এবং আগ্রা প্রদেশের পথঘাট সব তাহার সুপরিচিত ছিল। মীর্জ্জা সমরুকে মাসিক ত্রিশ হাজার বেতন দিবেন বলিলেন; সে-ও বুঝিল আর জাঠপক্ষে থাকিয়া কোনও লাভ নাই।

নজফ খাঁর সহকারী মন্ত্রী মাজউদ্দৌলার তাঁহার প্রতি হিংসার অভাব ছিল না। তাহার ভয় হইল সমরু যদি মীর্জ্জার কর্ম্ম লয় তবে ত তাঁহার ক্ষমতা অত্যন্ত বাড়িবে; একারণ সমরু যাহাতে নজফের পক্ষে যাইতে না পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে মন্ত্রীবর সচেষ্ট হইল। মীর্জ্জাকে যুদ্ধ-বিবাদ লইয়া প্রায়ই দিল্লীর বাহিরে থাকিতে হইত, সেজন্য মাজউদ্দৌলার বাদসাহের উপর কতকটা প্রভাব হইয়াছিল। বাদসাহকে সে বুঝাইল যে শিখরা দিন দিন যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে সে জন্য তাহাদের দমনার্থে এবং যাহাতে অপর কোন বিদ্রোহী দলে গিয়া সমরু মিশিতে না পারে তজ্জন্যও তাহাকে বাদসাহের কর্ম্মে গ্রহণ করা উচিত। দুর্ব্বলপ্রকৃতি বাদসাহের নিজস্ব বলিয়া কোন মতামত ছিল না, তাঁহাকে যে যাহা বলিত তিনি তাহাতেই স্বীকৃত

হইতেন। মাজউদ্দৌলার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন। সমরুকে দরবারে আহ্বান করা হইল। বাদসাহ তাহাকে ২১শে মে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে দরবারে খিলাৎ দিলেন। শিখকবল হইতে বাদসাহীরাজ্য পুনরুদ্ধারের ভার তাহার প্রতি অর্পিত হইল, এবং নির্দ্দিষ্ট বেতনের পরিবর্ত্তে পাণিপথ এবং সোণপেট এই দুই স্থান তাহাকে জায়গীরসত্ত্বে দেওয়া হইল। নজফ খাঁ তখন রাজধানী হইতে দূরে, তিনি এ ব্যবস্থায় কোন বাধাই দিতে পারিলেন না।

মীর্জ্জার কিন্তু সমরুকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাহাকে তাঁহার কর্ম্ম গ্রহণ করিলে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা দেখাইলেন। তাঁহার পরামর্শমত সমরু মাজউদ্দৌলাকে জানাইল যে তাহাকে প্রদত্ত জায়গীর হইতে সেনাদলের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ আদায় হইতেছে না, তাহাকে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। সুতরাং তাহাকে নগদ টাকা দেওয়া হউক অথবা জায়গীরের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হউক। মীর্জ্জা ভালরূপই জানিতেন যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে দুইটির একটি করাও সম্ভব হইবে না। মাজউদ্দৌলা সমরুর পত্রের কোন উত্তর দিল না। তখন সমরু মীর্জ্জার কর্ম্মগ্রহণ করিল। তাহার বেতন হইল মাসিক ৬৫০০০৲ টাকা। বলা বাহুল্য ইহার সবটাই তাহার নিজস্ব পারিশ্রমিক নহে; সেনাদলের সকল ব্যয় এই টাকা হইতেই নির্ব্বাহ করিতে হইত।

অতঃপর সমরু নজফ খাঁর অধীনে তাহার পূর্ব্বতন প্রভু জাঠনৃপতির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। জাঠরাজধানী ডীগদুর্গ অধিকারে সমরু যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। এপর্য্যন্ত সমরু প্রায় দশবার প্রভু পরিবর্ত্তন করিয়াছিল; কিন্তু বাদসাহের কর্ম্মগ্রহণের পর আর সে পক্ষান্তর আশ্রয় করে নাই, তাহার অবশিষ্ট জীবন বাদসাহের সেবাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

মীর্জ্জা নজফের অনুরোধে সাহআলম সমরুকে দোয়াব-প্রদেশমধ্যে মীরাটঅঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সেনাদলের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ জায়গীরসত্ত্বে প্রদান করিয়াছিলেন। মোগলের অধঃপতন হইতেই এ অঞ্চলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা চলিয়া আসিতেছিল। সমরু সে সকল বিদূরিত করিয়া নিজ জায়গীর মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং মীরাট সহরের বার মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত সার্দ্ধানা নামক স্থানে নিজ রাজপাট প্রতিষ্ঠা করিল। ঠিক কোন্ সময়ে সমরু সার্দ্ধানার আধিপত্য লাভ করিয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে ২০শে মে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মেজর পোলিয়ার লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে তখন পর্য্যন্ত মীর্জ্জার বহু অনুরোধসত্ত্বেও সমরু জায়গীর লয় নাই; নগদ টাকায় বেতন লইত, তাহাও আবার দশমাস বাকী পড়িয়াছিল। এই সময় সমরুর সেনাদলে তিন ব্যাটালিয়ন পদাতিক, ২০০ অশ্বারোহী এবং ১৪টী উৎকৃষ্ট কামান ছিল বলিয়া উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছিল।

সার্দ্ধানার আধিপত্য সমরুর খুব বেশীদিন উপভোগ করা হয় নাই, কারণ শীঘ্রই নজফ খাঁ আগ্রাপ্রদেশের শাসনভার তাহাকে প্রদান করেন। ৪ঠা মে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে নিউমোনিয়া রোগে আগ্রায় তাহার মৃত্যু হইল।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বিয়োগান্ত

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

যে প্রিয়তম বন্ধুর জীবনের কথা আপনাদের শুনাইতে বসিয়াছি তাহার কথা বলিবার অধিকার একমাত্র আমারই আছে। জীবনোন্মেষের যে করুণ চিত্রটি তাহার আমার মনে আঁকা রহিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি কথা যেন আমারই একান্ত নিজস্ব উপলব্ধির কথা,—নিজের অন্তরের সহিত তাহারা এমনি মিশিয়া জড়াইয়া এক হইয়া আছে যে তাহাদের বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিবার কোন উপায় নাই।

তাই যে-কাহিনী আজ আপনাদের বলিব, নাই থাক তাহার ভিতর সুখপাঠ্য গল্পের কৌতুকাবহ উপাদান, কিম্বা অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির কৌশল, তাহাকে নিজের কানে নিজে অহোরাত্র শ্রবণ করিয়া যে বেদনা অনুভব করি, আমার সেই অনুভূতির বার্ত্তাটুকু যদি আপনাদের মনের দ্বারে পৌঁছিয়া দিতে পারি তাহা হইলেই নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিব।

বাঙলার এক শান্ত শ্যামল পল্লীর প্রান্তে যেদিন পরিজন-বর্গের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষার পর সংসারের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ নির্ব্বিঘ্নে পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন তখন সবাকার মুখে যে কী আনন্দের ছায়াপাত হইল, তাহা না দেখিয়াও যেন আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। বংশের প্রথম সন্তান, এবং ভবিষ্যতে তাহার গৌরব যে এই নবাগত অতিথির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে-ই—এই নিশ্চিৎ-বিশ্বাসের পুলকোচ্ছ্বাসে পৌরজনের কোলাহল সেদিন ছোট্ট গ্রামখানির আকাশ আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

দুই-চার দিনেই শিশু সকলের নয়নানন্দ হইয়া উঠিল। সকলের মুখে সে হাসির রেখা আনিয়াছে; নিজের সঙ্গে সকলের মধ্যে সে আনন্দ সঞ্চারিত করিয়াছে। বোধ করি, সেই জন্যই তাহার নাম রাখা হইল—রঞ্জন।

পল্লীগ্রাম। সুতরাং তাহার আনুসঙ্গিক দুরপনেয় ব্যাধির বিষ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া আছে। পরিজনবর্গের অনেকেই সময়-অসময়ে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করেন। তিন বৎসরে রঞ্জনের তিনদিন গা গরম হইয়াছে। ইহার পরেও আর অবহেলা করা চলে না। সকলেই পিতামাতাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। বংশের ভবিষ্যত উজ্জ্বল আশা, শেষে কি স্বাস্থ্যহীন হইয়া জর্জ্জরিকৃত হইবে। শুভদিনে গুরুজনের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া পিতামাতার সহিত রঞ্জন গ্রাম ছাড়িল।

কলিকাতায় আসিয়া তেমনি আর এক শুভদিনে মহাসমারোহে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইয়া গেল। পুরোহিত আসিলেন, পুস্তকাদি আসিল, কোথাও কোন অনুষ্ঠানের কিছু মাত্র ত্রুটি হইল না। স্ত্রী আঁচলে চোখ মুছিয়া স্বামীকে বলিলেন—দেখে নিও, ছেলে তোমাদের নাম রাখবেই।

পুত্র তখন অদূরে বসিয়া ভাঙা শ্লেটখানা কেমন করিয়া জোড়া যায় তাহারই চেষ্টায় বিব্রত হইয়া উঠিতেছে।

এমনি করিয়া স্নেহ-ভালবাসা-আদরের প্রাচুর্য্যের মধ্যে রঞ্জন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার তুচ্ছতম আকাঙ্খাটি পর্য্যন্ত পিতামাতার স্নেহের উচ্ছলতায় অপরিপূর্ণ থাকে না। চাওয়ার ব্যাকুলতা অপেক্ষা দিবার ব্যাকুলতাও কম নহে, তাই তাহার জীবনে পাইবার অধিকার মনের মধ্যে সহজ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

জীবনে যাহা কিছু সুন্দর নিত্য নব নব ভাবে তাহাদের সহিত রঞ্জনের পরিচয় ঘটে। সুন্দর-কে সে ইহারই মধ্যে চিনিতে শিখিয়াছে।

মেধাবী ছাত্র রঞ্জন। স্কুলে শিক্ষক ছাত্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রিয়। তাহার উপর সেদিন স্কুলের 'পুরস্কার-

বিতরণ-সভায় রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ' আবৃত্তি করিয়া প্রাইজ পাইয়াছে! পিতা তাহার আনন্দের আতিশয্যে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন এবং তাহাদের সমক্ষে পুত্রকে 'ভারত-তীর্থ' আবৃত্তি করাইলেন। বলা বাহুল্য সকলেই বাহবা দিলেন।

এমনি করিয়া কিশোর রঞ্জন যৌবনে পদার্পণ করিল।

এখন রঞ্জন আর সে-রঞ্জন নহে। কলিকাতার ছাত্র-মহলে এখন তাহার প্রচুর নাম। সে কবি। তাহা ছাড়া, অভিজাত-সমাজের সভা-সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতে তাহার জোড়া নাই। নিজের অন্তরের সুকুমার ঐশ্বর্য্যে সে সকলকে বশ করিয়াছে। সকলেই তাহাকে চায়।

কিন্তু বাহিরে তাহার যত পরিবর্ত্তনই আসুক, ভিতরে আজো সে তেমনি শিশুর মতোই সরল আছে। আজো বন্ধুদের বক্র পরিহাস সে বুঝিতে পারে না; আজো আমার সহিত তাহার কোন বিষয়ে তর্ক যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠে; সামান্যতম ব্যাপারেও আজো আমার পরামর্শ ভিন্ন সে অগ্রসর হইতে পারে না। এমনিই সে।

তাই সেদিন বন্ধুদের নিকট হইতে সংবাদ-টা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। আমি জানিবার আগেই অন্য সকলে জানিল। মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অভিমান বোধ করিতে লাগিলাম। ঠিক করিলাম, রঞ্জনের উপর আজ সত্যকার রাগ করিব।

বন্ধুদের বৈঠক বসিয়াছে। খবরটা সেইখানেই পাইলাম। রঞ্জন প্রেমে পড়িয়াছে। নাম, ধাম, বিবরণ সমস্তই শুনিলাম। উপর্য্যুপরি কয়েকটি সভায় নন্দিনী রায়-এর সঙ্গে রঞ্জন একত্র বসিয়াছে। কখনো বা সে আগে গান গাহিয়াছে তারপর রঞ্জন আবৃত্তি করিয়াছে; কখনো বা রঞ্জন আগে আবৃত্তি করিয়াছে তারপর সে গাহিয়াছে। বন্ধুরা কয়েকদিন হইতেই রঞ্জনের বিহ্বলভাব লক্ষ্য করিতেছিল;—আজ সে তাহাদের কাছে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে।

প্রলয়েশ বলিল—কিন্তু যাই বল ভাই, রঞ্জনের পছন্দের তারিফ করতে পারলাম না। মেয়েটিকে তো খুব-সুন্দর দেখতে না।

কুমুদ বলিল—Beauty is a lover's gift! চমৎকার গায়।

প্রলয়েশ সিগার রাখিয়া সোজা হইয়া বসিল—আরে, গান নিয়ে কী ধুয়ে খাবে? কয়েকদিনের মধ্যেই যখন দৃষ্টির সামনে তাকে সহ্য করতে পারবে না তখন গান-ও তার কিছুতেই ভাল লাগবে না—এ আমি লিখে দিতে পারি।

মনীশ বলিল—কিন্তু সে তো গেল পরের কথা। তার আগের ব্যাপারটা তোমরা কেউ-ই ভাবছ না। কী ভুলই ও কোরে বসেছে, বলতো? ও-রকম ফাষ্ট্ টাইপের মেয়ে রঞ্জনের মতো টেম্পারামেণ্টের ছেলের পক্ষে কখনই কল্যাণকর হোতে পারে না। কিছুদিন ওকে খেলিয়ে ছেড়ে দেবে বৈত নয়। (আমাকে উদ্দেশ করিয়া) তুমি ভাই ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলো;—শেষ-কালে কী না কী ঘটবে—

প্রলয়েশ বলিয়া উঠিল—চুপ, চুপ! রঞ্জন আসছে।

পরক্ষণেই অভ্যর্থনা সুরু হইল—

—এস, এস, প্রেমিকবর।

—তারপর, খবর কী বলো। আজ দেখা হল?

—কোথায় ছিলে, বাবা, এতক্ষণ? ইত্যাদি।

আজ সহসা তাহাকে যেন নূতন করিয়া দেখিলাম। দুই চোখের উজ্জ্বলতা তাহার যেন অত্যধিক বাড়িয়া উঠিয়াছে। মুখের উপর এমন একটি করুণ কোমল ভাব লক্ষ্য করিলাম যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখি নাই।

হাসিয়া বলিলাম—কী শুনচি সব?

আকর্ণ রক্তিম হইয়া রঞ্জন বলিল—ওদের যত বাজে কথা। ওদের কথা শুনিস নে।

সকলে সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল।

—বাজে কথা বৈকি! তুমি থাক শ্যামবাজারে, রোজ বিকেলে বেড়াতে যাও গড়পারে; সামনে কোন বিশেষ মেয়ের চোখে চোখ পড়লে তোমার আবৃত্তির লাইন ভুল হোয়ে যায়;—এ-সব আমাদের বাজে কথা বৈকি!

দেখিলাম, এই কল-কোলাহলের মাঝে সুস্থির চিত্তে

তাহার কাছে কোন কথাই পাওয়া যাইবে না। বলিলাম—বড্ড গরম লাগছে, চল্ রঞ্জন—একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

গঙ্গার তীরে ঢালু জমির উপর বসিয়া একটি একটি করিয়া সকল কথাই তাহার নিকট হইতে জানিয়া লইলাম। কোন কথাই সে গোপন করিল না। গানের আসরে সে মেয়েটিকে প্রথম দেখে এবং তাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হয়। তেমন গান রঞ্জন কখনো শোনে নি। গান তো নয়, সে যেন সুরের ঝঙ্কারে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিবার মহা-সাধনা।

একদিন শুনিয়া পরের দিন সে আবার যায়। তারপরের দিনেও। এমনি করিয়া প্রথমে দৃষ্টি-বিনিময় তারপর স্বল্প দু'চারিটি কথা—তাহারই মধ্যে রঞ্জন কোন্ এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে তাহার মন হারাইয়া বসিয়াছে!

বলিলাম—তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওরা যে বলছিল, মেয়েটি নাকি—

দুই চোখ বড় করিয়া রঞ্জন প্রশ্ন করিল—মেয়েটি কী?

ইঙ্গিত সে বুঝিতে পারে না, অথচ কথাটাকে রুক্ষভাবে প্রকাশ করিতেও বাধিতেছিল। বিব্রত হইয়া কহিলাম—এই, যাকে বলে একটু অতি-আধুনিক ধরণের।

সবেগে মাথা নাড়িয়া রঞ্জন বলিয়া উঠিল—কক্ষণো নয়। বিশ্বাস করিস নে ওদের কথা। গানের মধ্যে তার মনের পরিচয় আমি পেয়েছি। অন্তরে যার অতখানি সৌন্দর্য্য, সে কখনো কোনদিক দিয়ে কারুর চেয়ে ছোট হোতে পারে না। আর, বাইরে থেকে তাকে বিচার করা যায় না—অন্তরে-বাইরে তার এমনিই প্রভেদ। কত বড় গুরুর কাছে তার শিক্ষা, তাতো জানিস। ওদের কথায় কান দিসনে। ওদের ওই-সব কথা আমায় যে কতখানি বেদনা দেয়, তা ওরা জানে না। কিন্তু তার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা তা ওদের কথায় কমে না, বরং বাড়েই। আর সে-শ্রদ্ধা আমার চিরদিন থাকবে।

কথা আরম্ভ করিয়া রঞ্জন আর থামিতে চায় না। দেখিলাম, মেয়েটীর প্রশংসায় তাহার চোখ-মুখ উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। আর্দ্র কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভক্ত যেমন করিয়া ভগবানের স্তোত্র উচ্চারণ করে, রঞ্জন তেমনি করিয়াই একাগ্র-নিষ্ঠায় তাহার জীবনের প্রথম মনোহারিকার কথা বলিয়া যাইতেছে। মেয়েটির উদ্দেশ্যে তাহার সমস্ত দেহমন যেন স্তবেরই মতো উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে।

রঞ্জনকে আমি চিনি। মনে মনে একবার সে যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহার প্রতি তার নিষ্ঠা কোনদিন বিচলিত হয় না। উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি। বন্ধুদের নিকটে যাহা শুনিয়াছি তাহার কিছুও যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতের যে-ছবি চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিল, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবার মতো বিশেষ-কিছুই তাহার ভিতর দেখিতে পাইলাম না।

সহজ এবং সাধারণ বস্তুকে সংসারের লোক সহজ-সাধ্য এবং সাধারণ মূল্য দিয়া গ্রহণ করে; কিন্তু রঞ্জনের এই যে অসাধারণ চিত্ত-ব্যাকুলতা, ইহার যথার্থ-মূল্য যদি কেহ না দিতে পারে তাহা হইলে যে মর্ম্মঘাতী আঘাত তাহার বুকে বাজিবে তাহার গুরুত্ব আগে হইতে সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। সেদিন সন্ধ্যায় একান্ত মনে কামনা করিয়াছিলাম—জীবনে সে ভীষণ অভিজ্ঞতা তাহাকে যেন না পাইতেই হয়।

বন্ধুদের সভায় রঞ্জনের প্রবন্ধ পাঠ করিবার কথা।

সকলে চায়ের-কাপ সুমুখে লইয়া বসিয়াছি, রঞ্জনও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় প্রলয়েশ ঘরে প্রবেশ করিল। প্রলয়েশ ইঞ্জিনীয়ার। দু'নলা বন্দুক হাতে করিয়া একলা বাঘ শিকার করে এবং যাহা মুখে আসে তাহাই অবাধে বলে। ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—আঃ! তোদের কবিত্বর জ্বালায় আর পারা গেল না! সমস্ত দিন হাতুড়ি পিটে কোথায় এখানে এসে দুটো রসের কথা ব'লে বাঁচবো, তা নয় এই সব গুরু-গম্ভীর সাহিত্য-আলোচনা, রট্! রঞ্জন, ও-সব বন্ধ কর বাপু! তার চেয়ে তোমার গার্ল্-এর কথা বলো—জমবে।

ইহার পর আর সাহিত্য চলে না। রঞ্জন ক্ষিপ্রহস্তে খাতা বন্ধ করিল। নিমেষ মধ্যে কথার স্রোত ফিরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মজলিস্ জমিয়া উঠিল।

সহসা আমার পিছন দিকে আকর্ষণ অনুভব করিয়া

ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, রঞ্জন আমাকে বাহিরে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। উঠিয়া পড়িলাম।

গঙ্গার তীরে সেই পরিচিত স্থানটিতে গিয়া বসিয়া রঞ্জন বলিল—আঃ, বাঁচলুম! ওখানে এতক্ষণ যেন হাঁপিয়ে উঠছিলাম। যত সব অসভ্য কথা! আমার এমনি বিশ্রী লাগে!

পরক্ষণেই, যাহা শুনিবার প্রত্যাশা করিতেছিলাম, তাহাই আরম্ভ হইল। এমনিই মানুষের মন। যে অত্যন্ত প্রিয় এবং গোপন কথাটি নিজের মনে অনুক্ষণ গুঞ্জরণ করিয়া চলিয়াছি, সেই কথাটি আর একজন প্রিয়-পাত্রকে বলিতে না পারিলে অস্বস্তির যেন আর অন্ত থাকে না। যে-ভালোবাসার আস্বাদ পাইয়া রঞ্জনের অন্তর-বাহির মধুময় হইয়া উঠিয়াছে তাহারই গুঞ্জন সে আমাকে শুনাইতে চায়—ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য কিছুই নাই; মানুষকে যাঁহারা কিছুমাত্র চিনেন, তাঁহারাই তাহার এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাটুকু স্বীকার করিয়া লইবেন।

বলিলাম—কী বল্‌বি, বল। অত ইতস্তত করছিস্ কেন? আমি জানি, তুই কী বল্‌বি।

রঞ্জন যেন বাঁচিয়া গেল। বলিল—তুই যে আগে থাক্‌তেই কী ক'রে বুঝতে পারিস্,—আশ্চর্য্য! সেই জন্যে তোর কাছে কোন কথা বল্‌তে লজ্জা লাগে না। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অন্য সুরে) অনেক দিন পরে আজ তার দেখা পেয়েছি।

—কোথায়?

—ট্রামে।

—ট্রামে?

—হ্যাঁ। সারকুলার রোড দিয়ে বিকেলবেলা আসছিলাম—হেঁটে। হাঁটছিলাম—ট্রামের লাইনের ওপর দিয়ে। হঠাৎ সামনে থেকে একখানা গাড়ি খুব জোরে এসে একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর একটু হ'লেই চাপা পড়েছিলাম আর কী! মুখ তুল্‌তেই দেখি, সামনের সীটের ধারে সে ব'সে আছে। চোখোচোখী হ'তেই হেসে নমস্কার করলে।

মনে মনে বলিলাম—তবে আর কী! উদ্ধার হইয়া গেলে। মুখে বলিলাম—অমন অন্যমনস্ক হোয়ে রাস্তা দিয়ে চলিস! কোন্‌দিন গাড়ি চাপা যাবি, দেখ্‌ছি।

রঞ্জন হাসিতে হাসিতে বলিল—সেদিন গেলে বেশ হোতো।

—বেশ হোতো, কী রকম?

—হাঁসপাতালে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, যে গাড়িতে সে বসেছিল, সেই গাড়িখানাই আমার ওপর দিয়ে গেছে,—সেই য়্যাক্‌সিডেন্ট্ আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা হোয়ে থাক্‌তো চিরকাল। তার চোখের সামনে আমি চাপা পড়েছি, নিশ্চয় আমার প্রতি সহানুভূতিতে নিভৃত ঘরের কোণে তার চোখ দুটী সজল হয়ে উঠ্‌ছে—সেই ছবি কল্পনা কর্‌তে কর্‌তে মৃত্যু যদি আসতো, তাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌তে পার্‌তাম।

এ কী অসম্ভব ভাবপ্রবণ কল্পনা! বলিলাম—থাক্, সব জিনিষকে আর অত তুচ্ছ জ্ঞান কোরে কাজ নেই। কিন্তু এ-কথা আজ তোমাকে স্পষ্ট কোরেই বলছি—মেয়েটীর প্রতি তুমি যে আকর্ষণ অনুভব করছ, সে তোমার মোহ; এবং এ-মোহ তোমার যত শীঘ্র কাটে ততই মঙ্গল।

আমার কথায় রঞ্জন যেন বিহ্বল হইয়া গেল। রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল—মোহ! বেশ, তাই যদি হয়, এই মোহ-ই আমার পক্ষে সত্য। আর, এ-কথা আজ নিশ্চয়-কোরে জেনো—এ-মোহ আমার কোনদিন ঘুচবে না।

হাসিয়া বলিলাম—এখন তাই মনে হচ্ছে বটে। কিছু দিন যাক্, তারপর বুঝবে। হঠাৎ একজনের সংস্পর্শে এসে যে-উন্মাদনা অনুভব করছ, কিছুদিন পরে তার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সে-উন্মাদনাও যাবে কেটে। এমনি কতই দেখেছি। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—out of sight out of mind; কথাটা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে নিতান্ত হাল্কা কথা নয়।

স্তিমিত একটী হাসির রেখা রঞ্জনের মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল; বলিল—সংসারে কোন-একটা কথাকে সবার পক্ষেই সত্য ব'লে চালাবার চেষ্টা কোরো না, ভাই; ওতে ঠক্‌তে হয়। চোখের আড়াল সে হয় বটে কিন্তু মনের

আড়াল? যে মনকে সে জাগালো, আর যে-ঘুমন্ত মন জেগে ওঠে তাকেই প্রথম দেখলো—এ'দুয়ের সম্বন্ধ কী এত সহজেই ছিন্ন হবার? তুমি তো আমার সবই জানো;—মনের ওপর এতখানি অধিকার এর আগে আর-কেউ কী বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে? জীবনকে যে এতখানি সার্থক ব'লে মনে করছি, কর্ম্মে যে এতখানি প্রেরণা অনুভব করছি,—আমার সে সার্থকতার, সে অনুপ্রেরণার উৎস তো সে-ই। আমার সমস্ত অন্তর তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় অনুক্ষণ আপ্লুত হোয়ে আছে। চোখের সুমুখে তাকে যখন দেখি, তখন একটা উন্মাদনা অনুভব করি, তা সত্যি। কিন্তু চোখের সামনে যখন তাকে পাইনে, তখন সে হয় আমার মনের সঙ্গিনী। সর্ব্ব সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত্তে তাকে আমার পাশে পাশে কল্পনা করি—রাত্রিদিন, ঘুমে জেগে-থাকায়। এ-কল্পনা আমার মনে যে-প্রশান্তি এনে দেয় তাই দিয়ে আমি পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করি। পৃথিবীর কোন দুঃখই তখন আমায় স্পর্শ করতে পারে না।

উত্তপ্ত হইয়া উঠিলাম। এ যেন উহার নিতান্ত বাড়াবাড়ি। তর্ক করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। বলিলাম—কাব্য তো যথেষ্ট করছ। কিন্তু তাকে তুমি বিবাহ করতে পারবে কোনদিন?

শান্তকণ্ঠে রঞ্জন উত্তর দিল—সে-কথা ভাববার অধিকার আজো আমার আসে নি। আপনাকে এখন সম্পূর্ণরূপে তার যোগ্য কোরে তোলবার কাজেই নিজেকে নিযুক্ত করেছি। সেই তো আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। তারপর ভবিষ্যতে কোনদিন যদি সে-মহা-শুভলগ্ন আমার আসে, ভগবানের পরম আশীর্ব্বাদ ব'লে মাথা পেতে তাকে গ্রহণ করব। বিবাহ যে নর-নারীর জীবনের পবিত্রতম বন্ধন, সে-সত্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, তাতো তুমি জান।

বলিলাম—জানি। কিন্তু তোমার জীবনে এ পবিত্রতম বন্ধন সংঘটিত হবার পথে কত যে বাধা তা কি তুমি একবারো ভেবে দেখেছো? তোমাদের মিলন যে কতখানি সামাজিক বিপ্লব এবং পারিবারিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে, তা কী তুমি জান? যে পবিত্রতম বন্ধনের জন্য তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ কোরে বসে আছে, সে-বন্ধন তোমার পারিবারিক জীবনে এমনি অশান্তির সূচনা করবে যার মধ্যে তার যা কিছু মাধুর্য্য সব নিঃশেষে লুপ্ত হোয়ে যাবে। দাম্পত্য-জীবনের সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ গতির জন্য যে অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন তা তোমরা পাবে না এবং তারই অভাবে তোমাদের বিক্ষোভ-গ্রস্ত প্রেম কোন কল্যাণ সাধন করতে পারবে না। এ-কথাগুলো তুমি ভাল কোরে ভেবে দেখো, রঞ্জন।

রঞ্জন ধীরে ধীরে উত্তর দিল—এমনি হিসেব কোরে একবারো ভেবে দেখি নি, ভাই; আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এমন কোরে কখনো যেন ভাবতেও না হয়। তুমি যে বাধার কথা বলছিলে, আগে মনে হ'ত, সে-বাধা পার হওয়া বুঝি আমার পক্ষে অসাধ্য। এখন কিন্তু তাকে নিতান্ত সহজ বোলেই মনে হয়; মনে হয়, যা আমি পাবো, তার তুলনায় সে কিছুই নয়, সে-বাধা আমার গতিকে কোনদিন এতটুকুও শ্লথ করতে পারবে না। তুমি ভাবছ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা আর পারিবারিক বিক্ষোভ-এর মধ্যে আমার প্রেম বাসা বাঁধবে না। আমি কী ভাবছি, জানো? আমি ভাবছি, সমাজের ভ্রূকুটি আর পারিবারিক বাধা—এই দুই ঝড়ের মুখে অতি সাবধানে অতি যত্নে আমরা যে নীড় রচনা করব, ভগবানের শুভ-আশীর্ব্বাদ যেন অজস্র-ধারায় তার ওপর ঝরে পড়বে। তার চেয়ে সত্য বস্তু আমাদের কাছে এ-পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। দূর এবং আপন জনের কাছ থেকে যে-আঘাত আমরা পাব, সে-ই হবে আমাদের প্রেমের কষ্টি পাথর। সে-পরীক্ষা পার হোয়ে যে সত্য-বস্তু আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে, খাঁটি সোনার মতোই সে নিখাদ। 'আমরা দুজনে স্বর্গ খেলেনা, গড়িব না ধরণীতে',—আমার জীবনের এ আদর্শ তো তোমার অজানা নেই।

ইহার পর আর কী বলিব? এমনি অন্ধ হইয়া নিঃশেষে যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাকে বিবেচকের যুক্তির দ্বারা চক্ষুষ্মান করিয়া তুলিতে পারে এমন শক্তি বোধ করি পৃথিবীতে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই এ আলোচনা বন্ধ করিয়া বলিলাম—তোমার আদর্শ আমি জানি, তোমার জীবনকে আমি চিনি; প্রার্থনা করি, তোমার আদর্শ

সার্থক হোক, তোমার জীবন পরিপূর্ণ হোক। আমার আন্তরিক শুভ-কামনা তুমি গ্রহণ কর।

রঞ্জনের কবিতার বই বাহির হইল,—নীলফুল। এই কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশের সকল ভার আমারই উপর ন্যস্ত ছিল। রঞ্জন ইহার কিছুই খোঁজ রাখিত না। তাই যখন একখণ্ড 'নীলফুল' আনিয়া তাহার হাতে দিলাম তখন তাহার আনন্দ আর ধরে না। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, চুমো খাইয়া, আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিল।

তারপর তিন দিন ধরিয়া চলিল—বই বিতরণের পালা। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক—কেহই বাদ পড়িল না।

তিন-চার দিন পরে প্রকাণ্ড একখানা লিষ্ট আমার হাতে দিয়া কহিল—দেখতো ভাই, জানা-শোনা কেউ বাদ পড়ল কিনা।

কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া বলিলাম—কিন্তু সেই পরম নামটি কেন দেখছি না হে? সে-নামটি তো সব প্রথমেই দেখতে পাবো—আশা করেছিলাম।

রঞ্জন বলিল—সে-নামটি আমার সবার আগেই মনে পড়েছে; সর্ব্বক্ষণই মনে পড়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য ভাই, যাকে দেবার আগ্রহ আমার সবচেয়ে বেশী তাকে একখানা বই কিছুতেই দিতে পারছি না।

বলিলাম—না-পারার হেতুটা কী। নাম লিখে একখানা পাঠিয়ে দিলেই তো হয়।

—তা হয়। কিন্তু, কী জানি, সাহস হয় না। সংশয় লাগে—যদি আমার সে-দান ঠিক-মতো গৃহীত না হয়। তার চেয়ে বেদনার আর কিছু নেই। কিন্তু, জানিস, সর্ব্বপ্রথম যে-বইখানি হাতে পেয়েছি তাতে তারই নাম লিখে রেখে দিইছি—এই দ্যাখ্।

কথা শেষ করিয়া সম্মুখের দেরাজের টানা হইতে রঞ্জন একখানা মলাট-দেওয়া 'নীলফুল' সযত্নে বাহির করিয়া পাতা উল্টাইয়া আমার সম্মুখে ধরিল।

ঝুঁকিয়া দেখিলাম, উপহারের পৃষ্ঠায় লেখা আছে;—

শ্রীমতী নন্দিনী রায়

করকমলেষু

তাহার নীচে—

"ভীরু মোর দান ভরসা না পায়
মনে সে যে রবে কারো,
হয়ত বা তাই তব করুণায়
মনে রাখিতেও পারো।"

বলিলাম—লিখে যখন রেখেছিস, তখন দে না পাঠিয়ে।

রঞ্জন কহিল—না। ও থাক—'একটি আমার গোপন কথার মতো।' যদি কখনও তেমন দিন আসে, নিজের হাতে বইখানি তার হাতে তুলে দেব। কিন্তু একটা কথা তোকে এখনো অবধি বলিনি।—পরশু তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—হয়েছিল। কোথায়?

—সিনেমায়।

—কী কথাবার্ত্তা হল?

—বিশেষ কিছু না। দেখলাম, একটি বান্ধবীর সঙ্গে এসেছেন—একাই। আমার দু'-রো আগে বসেছিলেন। ইণ্টারভ্যালের সময় দূর থেকে আমাকে দেখেই কলহাস্যে এগিয়ে এলেন। কী ফরওয়ার্ড মেয়ে। অমন সতেজ স্ত্রী আর কারুর মধ্যে দেখলাম না। অত লোকের মাঝখানে বিশেষ স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। বল্লে—আপনাকে অন্য দিনের মতো তেমন সহজ-ভাবে পাচ্ছি না কেন? আজ কেন এত গম্ভীর? বল্লাম—আমি তেমনই সহজ-ই আছি; আপনাকে দেখেই বরঞ্চ সময়-সময়ে অত্যন্ত অসহজ ব'লে মনে হয়। গ্রীবা দুলিয়ে উত্তর দিলে—আমায়? মোটে না। বল্লাম—হ্যাঁ। আপনাকে যত দেখছি, ততই আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছি। আপনাকে দেখে বিস্ময় লাগে, ভয়-ও হয়। হাসছেন? হয়ত কাব্যের মতোই শোনাচ্ছে;—কিন্তু এ আমার মনের কথা।

বলিলাম—এমন কোরে বলতে পারলি?

রঞ্জন কহিল—সঙ্গত-অসঙ্গত, শোভন-অশোভন উপলব্ধি করবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। তাই তখন যে-কথা অবলীলাক্রমে বলেছিলাম, এখন তা ভাবতেও সঙ্কোচের অবধি থাকছে না।

প্রশ্ন করিলাম—কী উত্তর দিলে সে?

—উত্তর ভাষায় দিলে না। দিলে—উচ্ছসিত হাসিতে। সে হাসি আমি বর্ণনা করতে পারবো না। কত লোক যে চারপাশ থেকে আমাদের দুজনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, তার সংখ্যা নেই। তখন ওকে দেখে আমার রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন দুটো মনে পড়ছিল—

সে তুষার নির্ঝরিণী রবিকর-স্পর্শে উচ্ছসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তারপর?

—তারপর আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলে। ইণ্টারভ্যালের পর ওদের পাশে বসেই ছবি দেখলাম। ছবি কিছুই দেখি নি, খালি ওর কথাই শুনেছি। ছবির শেষটা কিচ্ছু মনে নেই।

বলিলাম—জীবনের এ-ছবির সমস্তটাই যদি মনে না থাকে তাহলে সত্যিকার খুসী হই। এমন কোরে কতদিন চলবে?

মৃদু হাসিয়া রঞ্জন বলিল—সে-খুসী এ জীবনে তোমায় করতে পারবো না—নিশ্চিৎ জেনো। এমন কোরে কতদিন চলবে তা জানিনে, কিন্তু আমার চলার পথ চিরদিনের জন্য ঠিক হোয়ে গেছে। সে-রাত্রে বায়োস্কোপ থেকে ফিরে এসে একটা কবিতা লিখেছি—দেখবে?

—দেখি।

টেবিলের উপর হইতে একখানা বাঁধানো খাতা রঞ্জন আমার দিকে আগাইয়া দিল। সমস্ত খাতাখানির মধ্যে ওই একটি মাত্র কবিতাই লেখা হইয়াছে। কবিতাটি পড়িলাম। স্পষ্ট মনে আছে, পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। চমৎকার কবিতা। ছন্দের মধ্যে এমন অকৃত্রিম প্রাণের স্পন্দন খুব বেশী কবিতার মধ্যে শুনিতে পাই নাই। এতদিনে কবিতাটি ভুলিয়া গিয়াছি, তবে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবের প্রবাহটুকু স্পষ্ট মনে আছে। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কবি যেন বলিতেছে--

সেই দিন,—যে-দিন তুমি আর আমি এই ধরণীর তীর্থ পথে কয়েক লহমার জন্য একত্র যাপন করিয়াছিলাম—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন সে। যা-কিছু পথের মালিন্য আমার ধুইয়া গিয়াছিল, আকাশের বর্ণরাগ মনের মধ্যে ছায়া সঞ্চার করিয়াছিল; নিখিল জগৎ সেদিন আমার চোখে নূতন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আমার নব-জীবনের পরম লগ্নকে স্মরণ করিয়া আমার বাকী পথচারী জীবন তোমাকেই নিবেদন করিলাম। নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রীর আজিকার কামনা শুধু এই—বারবার এই পৃথিবীতে যখন আমার আসা-যাওয়া চলিবে তখন তোমার সেই ক্ষণিক সঙ্গটিকে যেন পাই। আকাশে যেন তেমনি করিয়াই সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া থাক, গাছের মাথায় মাথায় যেন তেমনি মর্ম্মর-ধ্বনি শোনা যায়; তোমার কণ্ঠের গুঞ্জর-তান যেন তেমনি করিয়াই আমায় উন্মন করিয়া তোলে।

সেদিন সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশ কালো—কাজল মেঘে সমাচ্ছন্ন; বিরহীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের মতো হু হু করিয়া বাতাসও বহিতেছে, অবিশ্রান্ত। সকল দিক দিয়াই প্রকৃতির শোভা সেদিন এমনি কবি-জনোচিত হইয়া উঠিয়াছে যে আমার মতো কাজের লোকের মনকেও উদাস করিয়া দেয়।

কী একটা কার্য্য-ব্যাপদেশে দিন দুই কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। বাড়ি ফিরিয়া আহারাদি সারিয়া ক্লাবে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, এক রঞ্জন ছাড়া সকলেই সমাগত। কলকণ্ঠে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য, কাহারো নিকট হইতেই সাড়া পাইলাম না;—মুখ বিষণ্ণ করিয়া সকলেই গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে।

সকলের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম—ব্যাপার কী? বর্ষায় বান্ধবীদের চিঠি পেয়ে সকলেই বিরহী-যক্ষ বনে' গিয়েছিস দেখি। প্রলয়েশ, ইউ টু!

প্রলয়েশ এইবার ধীরে ধীরে বলিল—হাসির ব্যাপার এর মধ্যে কিছু নেই। তোমাকে ভয়ানক একটা দুঃসংবাদ দেবার আছে। কিন্তু সে অপ্রিয় কাজটা করবে কে, তাই ভাবছি।

প্রলয়েশের কণ্ঠও ভারী। সুতরাং কোথাও কিছু গোলমাল ঘটিয়াছেই। বলিলাম—যে হোক্, বল। আমি যে হাঁপিয়ে উঠ্‌লাম।

মনীশ বলিল—গোড়াতেই বলেছিলাম, তখন আমাদের

কথা গ্রাহ্যই করলে না। এ-সব বিষয়ে অনেক বিবেচনা কোরে কাজ করতে হয়। তখন আমার কথা যদি শুনতো, তাহলে আজ আর—

কুমুদ বলিল—ঠিক এমনি যে ঘটবে, এ-তো আমরা নিজেরা আগেই বলাবলি করেছিলাম।

অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। প্রলয়েশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—ঈশ্বরের দোহাই, প্রলয়েশ, স্পীক্ আউট্।

প্রলয়েশ তখন ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল।

শুনিতে শুনিতে অসাড় স্তব্ধ হইয়া গেলাম। এমনি করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া অনভিজ্ঞ আপন-ভোলা ছেলেটির সরল বিশ্বাসকে লোক-চক্ষে লাঞ্ছিত করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা—হৃদয়হীনতার দিক দিয়া ইহা বোধ করি বর্ব্বরতম যুগের চরম নির্ম্মমতাকে পর্য্যন্ত ম্লান করিয়া দিয়াছে! এ-আঘাত তাহার বুকে যে কতখানি বাজিয়াছে, তাহা আর কেহ না বুঝুক, আত্মাভিমানী ছেলেটিকে জানিতে আমার আর বাকী ছিল না!

প্রিয়তম বন্ধুর জীবনারম্ভের প্রথমেই তাহার ভাগ্যে এমন বিড়ম্বনা যে ঘটাইল, মনে মনে তাহাকে অভিসম্পাত দিলাম, বলিলাম—কিসের বিনিময়ে কী পৌরুষ কিনিয়া তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে তাহা যদি একবারো বুঝিতে পারিতে! হৃদয়ের মূল্য তুমি না-ই দিতে পারো তাহার জন্য তোমাকে দোষ দিই না—যে অবিশ্বাসী আবহাওয়ার মধ্যে তুমি বাড়িয়া উঠিয়াছ তাহাতে পুরুষের সঙ্গে ক্ষণিকের এমনি-তর চপল লীলাই তোমার শোভা পায়, তাহার অপেক্ষা হৃদয়ের মহত্তর বৃত্তি তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হইবার অবসর পায় নাই, তাহা জানি,—কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বেচ্ছাকৃত নৃশংসতা, তুমি নারী, ইহা তো তোমার কাছে আশা করি নাই।

সহসা অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলাম। আমরা তো এখানে পরম আরামে বসিয়া বন্ধুর দুর্ভাগ্যের প্রতি সমবেদনায় এবং তাহারই সহিত নিজেদের ভবিষ্যত-বাণীর সফলতার প্রচ্ছন্ন গর্ব্বে বিভোর হইয়া আছি, কিন্তু সে এখন কোথায় কী অবস্থায় আছে তাহা তো একবারো ভাবিয়া দেখিতেছি না। দুর্যোগের রাত্রি তাহার কেমন করিয়া কী ভাবে কোথায় কাটিবে তাহা সে-ই কি ভালো করিয়া জানে? মনে হইল, ঠিক এই সময়ে আমার সঙ্গ যেন তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়। নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িলাম।

সে-রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বহু প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত স্থানে সন্ধান করিয়াও তাহার দেখা পাইলাম না। পরদিন ভোরে উঠিয়াই তাহার খোঁজে বাহির হইলাম। সেদিনও তাহার দেখা পাইলাম না।

পরের দিনেও না।

দিন আবার পূর্ব্বের মতোই চলিতে লাগিল। মধ্যে দিনকয়েকের জন্য বন্ধুমহলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু সে-চাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ এবং কয়েকদিনেরই। এখন আবার ক্লাবের মজলিশের আনন্দ-কলরোল তেমনি করিয়াই উদ্দাম হইয়া ওঠে; তেমনি করিয়া বন্ধুর দল তাসের নেশায় দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে; সুদূর গলির মোড় হইতে তেমনিই উচ্চ কণ্ঠের হাসির হর্‌রা শোনা যায়। কেহ একজন প্রিয়জন আজ তাহাদের মধ্যে নাই—এ অভাব-বোধের পরিচয় সে আসরে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তবুও মাঝে মাঝে স্মৃতির একটা ক্ষীণ সুর ক্ষণিকের জন্য কখনো হয়ত শুনিতে পাই। মানুষ আসে এবং চলিয়া যায়; তাহার এই আসা-যাওয়ার মাঝে থাকিয়া যায় শুধু তাহার কথাটি। সেই কারণেই বোধ করি বন্ধুদের আলোচনার মাঝে রঞ্জন আজো বাঁচিয়া আছে। আজো সময় সময় যখন তাহার কথা ওঠে তখন তাহার ভাগ্যহীনতার জন্য সহানুভূতিতে, তাহার বুদ্ধিহীনতার জন্য করুণায় এবং তাহার ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিজেদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির আত্মগরীমায় বন্ধুদের কণ্ঠ মুখর হইয়া ওঠে।

শুনিতে শুনিতে বেদনায় আমার হৃদয় ছাপাইয়া যায়। বন্ধুদের এই 'নিষ্করুণ সমালোচনার মাঝে এমনি করিয়া তাহার বাঁচিয়া থাকা—এ মর্ম্মান্তিক অমরত্ব যেন আমি সহ্য করিতে পারি না। মনে মনে ভাবি—জগতে কাহারো

কোন পরম শত্রুকেও যেন এমনি করিয়া মানুষের করুণার পাত্র রূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিতে না হয়।

যেখানে আমার গল্পের পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছিলাম, মনে হয় নাই তাহার পরে কোনদিন কোন কারণেই আবার তাহার জের টানিবার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এ-জগতের সংখ্যাতীত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনার মতো তাহাকে একদিন পুনরুদ্ঘাটিত করিতেই হইল; সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে গ্রীষ্মের এক প্রখর দ্বিপ্রহরে সহরের রৌদ্রক্লিষ্ট রাজপথের উপর আর একবার আমার কাহিনীর যবনিকা উত্তোলন করিলাম।

কী একটা কাজ সারিয়া ট্রামে করিয়া আপিস-অঞ্চল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলাম সহসা পিছন হইতে নাম ধরিয়া কে যেন ডাকিয়া উঠিল।

অবচেতন অন্তরের অন্তস্থলে ওই আহ্বান শুনিবার জন্যই যেন এতকাল অপেক্ষা করিতেছিলাম; চমকিয়া মুখ ফিরাইবার আগেই মুখ দিয়া বাহির হইল—রঞ্জন!

সুমুখের বেঞ্চি ডিঙাইয়া, অভদ্রের মতো লোক-জনের ঘাড়ের উপর দিয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

—কোথায় ছিলি বল্‌তো, তিন বছর ধ'রে? কত যে খুঁজেছি! এমনি কোরেই কি ভাবাতে হয়!

কথা শেষ করিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম,—বহুদিন পরে শিশুকে যদি তাহার অতি-প্রিয় খেলার বস্তুটি ফিরাইয়া দেওয়া যায়, অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সেটিকে লইয়া সে যেমন সস্নেহে নাড়াচাড়া করে তেমনি করিয়া আমি তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে আমার মুখ ম্লান হইয়া আসিল। মুখের উপর তাহার প্রথম যৌবনের সে সুকুমার লালিত্যের চিহ্নমাত্র নাই—কুটীল রেখায় সারা মুখ আকীর্ণ। পানের ছোপে দাঁতের সারি কালো হইয়া গেছে। দেখিলাম, পূর্ব্বের অপেক্ষা সে অনেকখানি মোটা হইয়াছে। হাতের দশ আঙুলে ন্যূনকল্পে গোটা পাঁচেক আংটি। মোটা কোটের তলায় পিরাণের বোতামের ঘরে মীনের বোতাম চক্ চক্ করিতেছে।

প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলাম—হাসি নয়। কোথায় ছিলি বল্? জানিস, তোকে খুঁজতে বেলুড়, চন্দন-নগর এমন কি পণ্ডীচেরী অবধি গিছলাম!

কথা শুনিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া রঞ্জন বলিল—তাই নাকি? কিন্তু এত কাছাকাছির ভিতর কি আমার দর্শন মেলে। বোম্বাই-এর ছগনলালের আড়তে গেলে আমার খোঁজ পেতিস।

আশ্চর্য্য! হাসিটা পর্য্যন্ত বদলাইয়া গেছে। বলিলাম—তারপর? এখন কোথায় আছিস? করছিস কী?

—বলব সব। চল্‌না আমার আপিসে। জরুরী কাজ আছে কিছু?

—কিছু না। চল্।

দুইজনে নামিয়া পড়িলাম। তারপর একটা অনতি-প্রশস্ত জনাকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকিয়া বাঁকা-চোরা পথে এ-গলি পার হইয়া সে-গলির পাশ দিয়া যখন একটা প্রকাণ্ড অদ্ধ-পুরাতন আপিস-বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম তখন গলিতপীচের রাস্তার উত্তাপে পা হইতে মুখ পর্য্যন্ত যেন সিদ্ধ হইবার কাছাকাছি আসিয়াছে।

বাড়ির ফটকের উপর সুবৃহৎ এক চিত্র-বিচিত্র করা সাইন-বোর্ড। তাহাতে লেখা—জয়কালী প্রেস। প্রোঃ, শ্রীরঞ্জনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঞ্জন বলিল—আমার প্রেস। এই আমার ভাগ্যলক্ষ্মী। বোম্বাই থেকে এনেছি। ছগনলাল ফউত্ হোয়ে গেল; তারই কাছ থেকে কিনে নিয়েছি। ভারী দাঁও মারা গেছে।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—বাঃ, বেশ তো?

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বৃহৎ ব্যাপার। বহুবিধ বিকটাকার যন্ত্রের মধ্য হইতে উত্থিত গর্জ্জনের ঐক্যতান দুই কানে যেন মধুবর্ষণ করিল। অসংখ্য লোক খাটিতেছে। কালি-ঝুলি মাখা আকৃতি দেখিয়া তাহাদের মানুষ বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই; সম্মুখস্থিত যন্ত্রের সচল অঙ্গ রূপেই যেন তাহারা বিরাজ করিতেছে।

বাহির হইতে প্রচুর কোলাহল শুনিতে পাইতেছিলাম। দুইজনে ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে অতগুলি মনুষ্য-কণ্ঠ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রগুলা দ্বিগুণ উচ্চরবে গর্জ্জন সুরু করিল।

ভিতরে ঢুকিয়াই রঞ্জনের আর এক মূর্ত্তি দেখিলাম।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে হাঁকিয়া উঠিল—কী হে হরিদাস! খুব যে গলা শানানো চলছিল! মাইনে বাড়ানোর কথা কাল বলছিলে না? বুচার কোম্পানীর কাজ-টা নেমেছে? এখনো নামেনি। বেশ, বেশ! পথ ছাখো, বুঝেছ? তোমায় নিয়ে চলবে না। এই নবীন! কালকের কপির প্রুফ তুলেছিস? কেন, হয় নি কেন? মা'র অসুখ করেছিল, তাই আসতে দেরী হোয়েছিল? তবে আর কী, আমাকে রাজা করেছ! ছাখো হরিদাস, কাজ যদি ঠিক সময়-মতো না পাই, তবে তোমায় নিয়ে চলবে না। কাজ দিতে পারবে না, অথচ তোমাদের ঘ্যানঘ্যানানি সহ্য করব, তেমন বাপের বেটা আমি নই। সরকার মশাই, এদিকে আসুন। নব্নে আজ কখন এসেছে? বলুন, হাঁ করে রইলেন যে! খানিক আগে। বেশ। ও আজ রোজ পাবে না। ইচ্ছে হয় কাজ করুক, না হয় চ'লে যাক। (আমার দিকে ফিরিয়া) চল।

ইহার পর আবার কোথায় যাইব! এমনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলান যে কোন কথা মুখে আসিল না, নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিলাম। কিছুদুর গিয়া ডান-হাতি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে রঞ্জন আমাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিল—সব শালা চোর! একটু নোল দিয়েছ কি ফাঁকী! আরে বাবা, তো-শালারা পারিস আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে,—ছিগনলালের কাছে পুরো দুটি বচ্ছর সাকরেদী করেছি। তার মতন খলিফা লোক-কে ঘাল কোরে দিয়ে এলাম, তোরা তো কোন ছার! হ্যাঁ, ওস্তাদ লোক ছিল বটে বেটা বোম্বাই-ওয়ালা।

সাকরেদের অসম্ভব উন্নতি দেখিয়া গুরুর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে মনে কোন সংশয় ছিল না। বলিলাম—তা ছিল। কিন্তু যে-ছোকরা মায়ের অসুখের জন্ম আসতে দেরী করেছিল তার ফাইনটা মাপ করিস। রোজ পাবে না শুনে তার চোখে জল এসেছিল।

রঞ্জন হাসিল। তারপর বলিল—বেশ, অনেক দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল আর আজ তুই আমার আপিসে এসেছিস, তাই তোর অনারে ওকে মাপ করলাম। কিন্তু, জেনে রাখিস, এমন করলে বিজ্নেস্ চলে না।

মনে মনে বলিলাম—তোমার ব্যবসা অক্ষয় হইয়া চলুক, কিন্তু তাহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিতে যদি এমনি পুরুষ হইয়া উঠিতে হয়, তাহা হইলে আসুক তাহাতে মাসিক লক্ষ টাকা, সে-কাজ যেন কাহাকেও কোনদিন করিতে না হয়। মুখে বলিলাম—তা তো বটেই।

আপিস-ঘরে বসিয়া সুদীর্ঘ-ক্ষণ ধরিয়া অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যত জীবনের অনেক তথ্যই আলোচনা করিলাম দেখিলাম, কাব্যের মধ্য দিয়া জীবনকে দেখিয়া যে-রঞ্জন মুগ্ধ হইয়া যাইত, আজ সে জীবনের প্রত্যেকটি অন্ধ্-রন্ধ্র ব্যবসায়ীর চক্ষু দিয়া যাচাই করিয়া লয়। কোন দিক দিয়া এতটুকু ফাঁকী তাহার কাছে চলে না।

কথা কহিতে কহিতে রঞ্জন এক-সময় বলিয়া উঠিল—তাহলে আছিস বেশ! বিয়ে-থা করবি কবে? এখনো কাব্য চল্ছে বুঝি? তোদের রবি-ঠাকুর-বাই আজো আছে নাকি?

হাসিয়া বলিলাম—আছে বৈকি। পুরোমাত্রায় আছে। তোর-ও তো কারুর চেয়ে কম ছিল না; সে কি একেবারেই গেছে? স্ক্রীনে নটীর পূজা দেখেছিস? দেখিস নি। বেশ, চল্না, আজ রাত্রের ট্রিপ-এ।

রঞ্জন হাসিয়া বলিল—Those days are gone; ওসব পাগ্লামী এখন আর নেই। ও-সব বাজে ছবি দেখে পয়সা নষ্ট করার চেয়ে মিনার্ভা থিয়েটারে বাসুকী দেখ্লে কাজ হবে। চমৎকার প্লে।

ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঃ; এক-কালে রবি-ঠাকুরের প্লে দেখবার জন্তে কী ঝোঁকই না ছিল। এখন ভাবতেও লজ্জা হয়। কত পয়সাই যে তাঁর জন্তে আমার নষ্ট হয়েছে; তার জন্তে ওঁর নামে বোধ করি ড্যামেজ-সুট পর্য্যন্ত আনা যায়। আর শুধু কি পয়সাই? হা, হা, হা!

অপরের মুখে এমনি-তর কথা শুনিলে একদিন অপরিসীম ব্যথায় যাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিত আজ সে পরম রসিকতার সহিত অবলীলাক্রমে তেমনিতর কথার পুনরুক্তি করিয়া চলিয়াছে! মানুষের জীবনে এত বড় পরিবর্ত্তন আর কবে কোথায় দেখিয়াছি!

কথার স্রোত ফিরাইবার জন্য বলিলাম—প্রে থাক। বই পড়াও ছেড়েচিস বোধ হয়?

—সময় কই। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি এই হাড়-ভাঙা খাটুনির পরে কি আর বই পড়তে ভাল লাগে। তাছাড়া সন্ধ্যের পর কি অন্য কোথাও যাবার জো আছে;—রোজ হাজ্‌রে দিতে হয়। একদিন যদি না যাই তো ভেবে অস্থির হোয়ে ওঠে।

এই প্রত্যহ হাজিরা দেওয়া এবং ভাবিয়া অস্থির হওয়ার ইতিহাস পূর্ব্বাহ্নেই কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম, তাই সে-কথা চাপা দিয়া বলিলাম—তোর প্রেসে একখানা বই ছাপাবো, রঞ্জন।

—কী বই? কবিতার। বেশ, বেশ। কত কবিতার বই-ই যে বেরুলো বাজারে! আচ্ছা, তোদের রবীন্দ্রনাথ আজো কবিতা লেখেন নাকি?

—লেখেন বৈকি। যেমন কবিতা ওঁর তুই আবৃত্তি করতে ভালবাস্‌তিস তেমনি কবিতাই আজো লেখেন। শুনবি একটা?

—মুখস্থ আছে বুঝি? শুনি।

বলিলাম—

—নব-জাগরণ-চঞ্চল তব পাখা
নিভৃত নীড়ের কোণে সে কি রবে ঢাকা?
নিয়ে যাবে তারে ওড়ার আবেগ সে যে
বাতাসে উঠিবে হুঙ্কার তার বেজে
দিবে সে ঝলকি প্রভাত রবির তেজে
পালখে পালখে যে বর্ণ তার আঁকা।

যখন শেষ করিলাম—

—আপনি আপন নিত্য নিবিড় কারা
তুমি উদ্দাম সেই বন্ধন-হারা
কোনো শঙ্কার কার্ম্মুক টঙ্কারে
পারেনি তোমায় বিহ্বল করিবারে
মৃত্যুর ছায়া ভেদিয়া তিমির পারে
নির্ভয়ে ধাও যেথা জ্বলে ধ্রুবতারা॥—

দেখিলাম, শুনিতে শুনিতে রঞ্জন তন্ময় হইয়া গেছে। শেষ হইলে বলিল—এখনো এমন কবিতা লেখেন? আশ্চর্য্য! মনে হয়, এ-যেন বলাকা-মানসীর কবির রচনা; কে বলবে, সত্তর বছর বয়েসের লেখা। হাঁ, দেশে একজন কবি এসেছিলেন বটে!

বলিলাম—শুধু কবি নন; জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ নিয়ে এত বড় বিরাট পুরুষ পৃথিবীর আর কোন জাতের মধ্যেই আজ পর্য্যন্ত দেখা দেন নি।

রঞ্জন মাথা নাড়িয়া বলিল—তা নিশ্চয়।

আরও পাঁচ-টা অন্য কথার পর পুনরায় সেই কথাটাই পাড়িলাম। হয়ত তাহার মধ্যে কাব্যের অনুভূতি তখনো কিছু বাঁচিয়াছিল, এবং তাহার নিজের মুখ হইতে করুণ সেই অভিব্যক্তিটিকে শুনিয়া তৃপ্ত হইব বলিয়া প্রশ্ন করিলাম —সেতো সব হল। কিন্তু বিবাহ করতে চাস না কেন বল্ দেখি? এখনো কী পুরনো দিনের কথা—

আমাকে থামাইয়া দিয়া হাসিয়া রঞ্জন বলিল—বারবার ওই কথাই কেন? বল্লাম তো—সময় হয় না।

বলিলাম—আমার কাছে কথা দিয়ে কথা চাপ্‌বার চেষ্টা করিস নি। ফল হবে না। তার চেয়ে বরং বলেই ফেল্। না শুনে আমি ছাড়চি নে।

মুখের উপর হইতে হাসির রেখাটি তাহার মিলাইয়া গেল; এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল—কী বা শুনবি; আর, বলবারই বা কী আছে। আমার জীবনযাত্রার পথে স্ত্রীর প্রয়োজন আমি তো একদিন একান্তমনে অনুভব করেছিলাম। জীবনে তাকে চেয়েওছিলাম এবং আমার সে-চাওয়ার মধ্যে বোধ করি একাগ্র-নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু ভাই, তাকে তো পেলাম না। আমার সে-প্রার্থনা ব্যবসা ব'লে, চাতুর্য্য ব'লে অপমানিত হ'ল—আমি হলাম প্রত্যাখ্যাত। ভালই হ'ল। আজ যাকে কামনার সঙ্গিনী রূপে নিয়ে আছি তার সঙ্গে এমনি-তর ভুল-বোঝার বিরোধ নেই। আমরা দু'জনে দু'জনের ব্যবসাকে ভালো কোরেই জানি। সুতরাং যা তাকে দিই, কড়ায়-গণ্ডায় তা আদায় কোরে নিতে ছাড়ি না। এর মধ্যে আঘাতের বেদনা নেই, বঞ্চনার জালা নেই, হতাশার আক্ষেপ নেই। ব্যবসাদার লোক আমি, আমার এই ভাল।

কথা শেষ করিয়া চাকর-কে ডাকিয়া বলিল—আশুর দোকান থেকে দু'কাপ চা নিয়ে আয়। বেশী কোরে দুধ-চিনি দিয়ে আনবি।

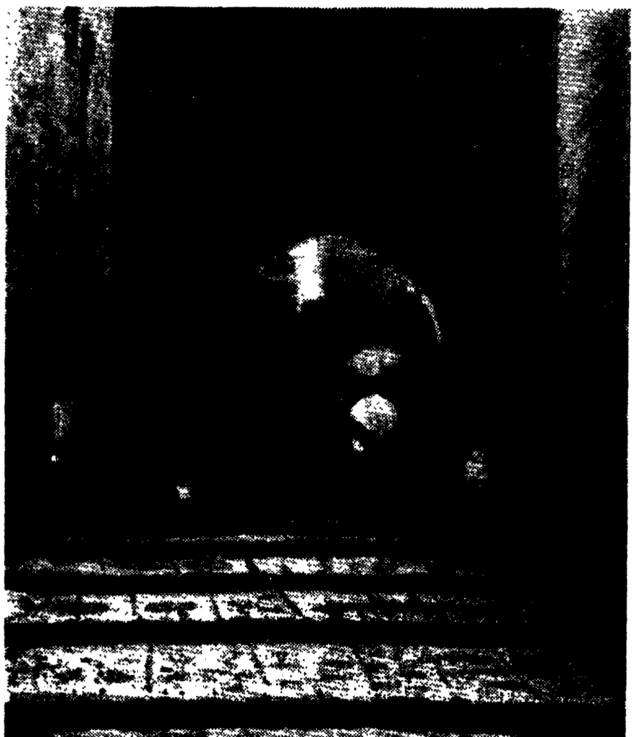
এই বলিয়া পকেট হইতে মণি-ব্যাগ বাহির করিয়া গণিয়া গণিয়া তাহার হাতে চারিটি পয়সা দিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্যালেষ্টাইন্

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর

আরবদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ছ'হাজার স্কোয়ার মাইল জুড়ে যে প্রদেশটী অবস্থিত—তারই নাম প্যালেষ্টাইন্। এই প্রদেশটির সীমা নির্দ্দেশ করে দিয়েছে—উত্তরে 'কাসিমিয়ে' নদী, পূর্ব্বে 'জর্ডন' নদী, পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর আর দক্ষিণে অনুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী। সিরিয়া মরু-ভূমির পাশে এই দেশে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ যেমন কষ্টকর, শীতের তীব্র কন্কনে বাতাসও তেমনি অসহ্য। বৃষ্টি হয় অ-প্রচুর। শরতের শেষে সামান্য যা বৃষ্টি হয় তাতেই বালুময় দেশের মধ্যে ফুটে ওঠে শ্যামলিমা, ফুল ফোটে, অরণ্যের বুকে জাগে কিশলয়।

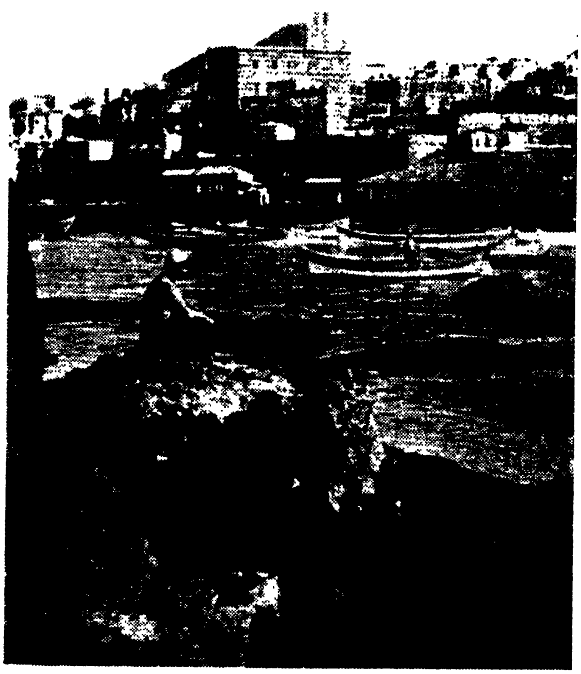


জেরু সালেম
খিলান রাজির নীচে দিয়া পথ।

এ দেশে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ছড়িয়ে পড়িয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'ফিলিষ্টাইন্' জাতি সমুদ্র উপকূলে বসবাস করতো, তারাই নাম দিয়েছিল প্যালেষ্টাইন্। তারপর খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহুদিরা যখন এদেশটি জয় করে তখন 'ক্যানানিটিশ' জাতিরা এখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিল। এদেরই বংশধরেরা খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে 'স্যামারিটান' বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে 'বেবিলোন' অবরোধের পর 'ইস্রেল' জাতি এদেশে ছড়িয়ে পড়ে, এরাই ইতিহাসে ইহুদি নামে প্রসিদ্ধ। এরা উন্নতির উচ্চ শিখরে এসে পৌঁছায় 'হ্যারল্ড দি গ্রেট'এর রাজত্বকালে। এই হ্যারল্ডেরই রাজত্ব-কালে যিশুর জন্ম হয় 'বেথ্লেহাম' সহরে। তারপর রোম্যানরা জেরুশালেম জয় করে ইহুদিদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর পার্সীয়ান, সারাশিন, তুর্কী এবং ক্রুজেডাররা এদেশটির বুকের উপর যুদ্ধ-বিগ্রহে এমন মাতা-মাতি করে যে এদেশের কোন অধিবাসীর এক-স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এখন য়ুরোপীয়দের অধীনে দেশটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার ক্রম-বিবর্ত্তনে উন্নতও হচ্ছে ধীরে ধীরে।

দেশটির অধিবাসীরা দু-জাতীয়। গ্রাম্য অধিবাসীদের বলা হয় 'ফ্যালাগীন' আর মরুবাসীদের বলা হয় 'বেদুঈন'। এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। প্রাচীন ক্রুজেডারদের বর্ণিত অবস্থার সঙ্গে এদের আধুনিক অবস্থার অমিল নেই একটুও।

ভূমধ্য-সাগরের উপরেই জেরুশালেমের প্রবেশ তোরণ "ব্যাব্-এল্-খ্যালীল্"। এই প্রবেশ তোরণ অতিক্রম করলেই চোখে পড়ে সহরের কর্ম্মব্যস্ত জন-কোলাহল। গ্রাম্য-স্ত্রী



জেরুসালেমের বন্দর। পাহাড়ের উপর ফ্রানসিসকান গির্জ্জার চূড়া দেখা যাচ্ছে।

এবং পুরুষেরা দ্বিপ্রহরের তপ্ত রৌদ্রে নিজ নিজ গৃহের পানে ফিরে চলেছে সহরের হাটে শ্রমলব্ধ জিনিষগুলো বিক্রী করে। পুরুষদের পোষাক-পরিচ্ছদের বিশেষ কোন আড়ম্বর নেই, মেয়েরা লাল কিম্বা নীল রঙের পরিচ্ছদের উপর একটি শাদা ওড়নায় মুখ ঢেকে পথের উপর দিয়ে চলেছে, পিঠে একটি ছেলে বাঁধা, কাঁধে হয়তো আর একটি ছেলে বসে আছে—ষষ্ঠী দেবীর কৃপা এদেশীয় পরিবারে বিশেষ ভাবেই লক্ষিত হয়। পুরুষেরা আভূমিলম্বিত একটি সার্টের উপর ছাগ-চর্ম্মের একটি কোট পরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং সাময়িক খবরাখবরের আদানপ্রদান করতে করতে গৃহের পানে ফিরে চলেছে মন্থর গতিতে, পথের পাশে একটি কফিখানায় এসে তারা আশন গ্রহণ করবে এক 'মেটালিক' (ডবল পয়সা) দিলেই এক কাপ কফি আর একটি টুল ভাড়া পাওয়া যাবে, সন্ধ্যা পর্যান্ত সেখানে গল্পগুজব এবং ধূমপান চলবে।

সহরবাসীও চোখে পড়বে। এরা গ্রামবাসীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ফরসা। এরা বড় বেশী অনুকরণ-প্রিয়, য়ুরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করতে এরা বড় ভালোবাসে—কোট না হলে এদের একদিনও চলে না। মেয়েরা এক রকম লাল টুপী পরে তার সম্মুখদিকে ওড়নার মত একটি মুখ-বস্ত্র ঝোলে। সহুরে মেয়েদের মধ্যে পায়জামার চলনই বেশী। ইহুদি মেয়েরা মাথায় একখানি রুমাল বাঁধে শুধু আর গায়ে অলঙ্কার থাকেও খুব বেশী।

প্যালেষ্টাইনের সহরগুলোতে বেদুঈনরা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের স্বাতন্ত্র্যের জন্য। স্বাধীন স্বচ্ছন্দ-গতিতে এরা চলা ফেরা করে। বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া এদের চেহারা। শীত-গ্রীষ্ম, জল-ঝড়—কোন কিছুতেই এরা ভ্রুক্ষেপ করে না একটুও। বেদুঈন মেয়েরা পথে বেরোয় না। যদি বিশেষ কোনও কারণে পথে বেরুতে হয় তাহলে কালো একটা 'বোরখা' পরে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত। বোরখার সম্মুখভাগে বংশগত পরিচয়চিহ্ন আঁকা। মেয়েদের মুখেও বংশচিহ্ন উল্কি দিয়ে আঁকা থাকে। বেদুঈন মেয়েরা এমনি এক ধরণের আলখাল্লা পরে যা' সম্মুখে এবং পশ্চাতে দু-তিন হাত লুটিয়ে পড়ে ভূমির উপর; তা' প'রে পথ চলাচল করা এদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

বেদুঈনরা ঐশ্বর্য্য-বিভব-খ্যাতির চেয়ে বংশমর্য্যাদাকে উচ্চ জ্ঞান করে। এরা বড় অতিথিবৎসল। গৃহে অতিথি

পাথরটার উপর কাপড় আছড়ায় কিন্তু এই কাপড় কাচার ফলে কূয়ার পানীয় জল কিরূপ দূষিত হয়ে উঠছে সে কথা বললে—তা সে যতই বুঝিয়ে বলা যাক না কেন গ্রামের লোকেরা একটু হেসেই উড়িয়ে দেবে।

গ্রাম্য মেয়েরা রঙীন পরিচ্ছদ ভালবাসে—উজ্জ্বল নীল, সবুজ এবং লাল রংয়ের কাপড়ই এরা খুব বেশী পরে।



বেথানি
পশ্চাতে লাজারিষ্টদের প্রাচীন আশ্রমের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

প্রাচ্য শিক্ষা এবং সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য অধিবাসীরা বড় বেশী আড়ম্বর-প্রিয় হয়ে উঠছে। দেশীয় পরিচ্ছদ তাদের আর ভালো মানায় না যেন। পাশ্চাত্য ঔজ্জ্বল্য না থাকলে সেটা যেন পরবার উপযোগীই নয়—এই তাদের এখন ধারণা হয়ে উঠেছে।

ফ্যালাহীনরা কৃষি-জীবি। যাদের ক্ষেত নাই তারা তো পরের ক্ষেতে মজুরী করেই কিন্তু যাদের ক্ষেত আছে তারাও পরের ক্ষেতে মজুরী করবার সুযোগ খোঁজে। গ্রাম্য মেয়েরাও মজুর খাটে। সহরের মত গ্রামে পর্দ্দা প্রথা নেই, মেয়েরা স্বাবলম্বী; পুরুষদের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে তাদের জীবন-ধারণ করতে হয় না। মেয়েরা পুরুষের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ—এই জন্যই বিবাহে বরপক্ষকে প্রচুর যৌতুক দিতে হয় কন্যার মূল্যস্বরূপ।

মোসলেম ধর্ম্মাবলম্বীরা মদ স্পর্শ করে না। খৃষ্টানরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তাড়ি খায়। ধূমপান করবার প্রবৃত্তি এদের মধ্যে খুব প্রবল। তামাক খেতে এরা ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত হয় আর সিগারেট হলে তো কথাই নেই। প্রত্যহ সকালে এককাপ করে কফি চাই প্রত্যেকেরই। ফ্যালাহীনরা নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী, তবে আত্মীয় কুটুম্বগণের সমাগমে কিম্বা উৎসবের দিনে এরা মাছ-মাংসের আয়োজন করে অপর্য্যাপ্ত।

আকারে বেদুইনদের চেয়ে খর্ব্বকায় হলেও এদের দেহেও শক্তি আছে বেশ। এক একজন এক একটা 'কটেজ পিয়ানো' অনায়াসে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। পুরুষেরা মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল রাখে। আকারে এরা বলিষ্ঠ হলেও রোগ-জীবাণুর সঙ্গে লড়াই কর্‌বার শক্তি এদের কম, দু-একদিনে সামান্য রোগেই এরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রচণ্ড রৌদ্র এবং শীতের হাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য ফ্যালাহীনরা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে পরিচ্ছদের উপর উট, ছাগ কিম্বা মেষ চর্ম্মের একটী করে আলখাল্লা পরে; মেয়েরা সব সময়েই একটি করে টুপি মাথায় পরে, তার সম্মুখ দিকে একটি মুখ-বস্ত্র ঝোলে ঘোমটার মত। ফ্যালাহীন পুরুষেরাও মাথায় একটি সাদা টুপি পরে, তার উপর একটি লাল 'টার্কিশ ক্যাপ' পরে, তারপর তার চারপাশে একটা শাদা রুমাল এমনভাবে জড়ায় যাতে দেখায় যেন একটি পাগড়ী। আবার কেউ কেউ রুমালের বদলে টুপির চারপাশে

দীর্ঘ একটি ছাগ-লোমের দড়ি জড়ায়, তার একপ্রান্ত আবার পশ্চাতে লম্বিত থাকে পাগড়ীর মত। মাথায় টুপি কিম্বা এই ধরণের পাগড়ী পরা এদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, না হলে প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে এদের মাথা ধরে।



প্রলোভন গিরির চূড়া
নীচে জেরিকোর উপত্যকাভূমি

সহরের অধিবাসীরা কিন্তু গ্রামবাসীদের মত নয় মোটেই; একেবারে পাশ্চাত্য ধরণের আদব-কায়দা আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত। এই তীর্থক্ষেত্রে, অহিংসামন্ত্রের মহান উপাসক যীশুর লীলাক্ষেত্রে য়ুরোপীয়ের সমাগম হয় খুবই। তারই ফলে সহরগুলির অধিবাসী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে।

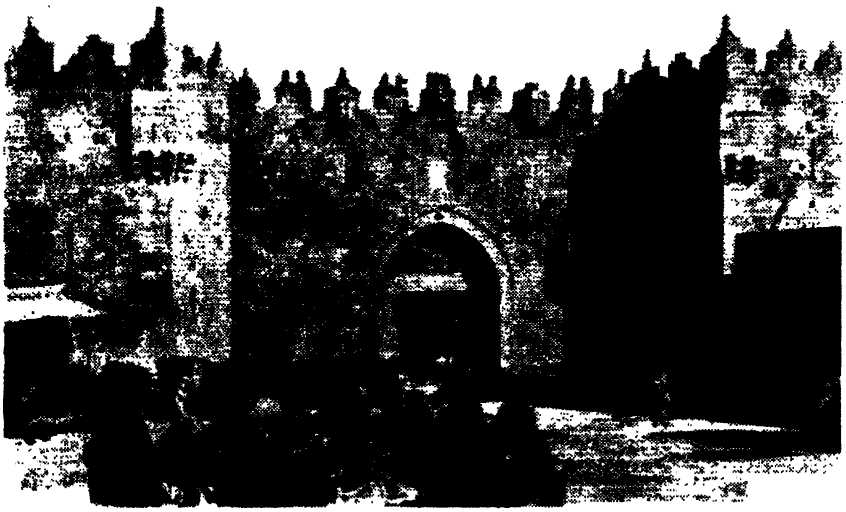
প্যালেষ্টাইনের অধিকাংশ সহরই প্রাচীন যুগের। সেইজন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে পূর্ব্ব হতে সতর্ক থাকবার জন্য সহরগুলির চারপাশে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা,—একথা আগেই বলেছি। মধ্যযুগে এই প্রাচীরের বাহিরে কোন বাড়ি-ঘর ছিল না—লোকে তৈরী করতো না শত্রু ভয়ে, কিন্তু এই বিংশশতাব্দীতে সহরে প্রাচীরের বাইরেও বাড়ি-ঘর, স্কুল, হাঁসপাতাল, গির্জ্জা, মস্‌জিদ্—এক কথায় ঘিঞ্জি বসতি হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক সহরেই কয়েকটি করে ছোট 'মিনার' আছে, তার উপর থেকে চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসীদের উপাসনার সময় নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক সহরে বাজারের নিকটে একটি ফোয়ারা কিম্বা কূয়া থাকে। সেই জলে উপাসনার পূর্ব্বে সমাগতেরা হাত-মুখ ধুয়ে কিম্বা স্নান করে উপাসনার জন্য শুদ্ধ হয়।

ওদেশের অর্থশালী মুসলমানেরা টাকা কখনো ব্যাঙ্কে জমা রাখে না, এক একখানি বাড়ি তৈরী করে ভাড়া দেয়। বাড়িগুলি দু-মহল হয়—পুরুষমহল এবং হারেম বা অন্দরমহল। মেয়েরা গৃহকর্ম্মেই ব্যাপৃত থাকে। পর্দ্দাপ্রথা বড় প্রবল, কাজেই মেয়েরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, কিন্তু সহরের মুসলমান মেয়েরা একেবারেই যে অন্দরে আবদ্ধ থাকে তা নয়, সময় সময় পাঁচ-সাতটি আত্মীয় পরিবারে মিলিত হয়ে উদ্যান-ভোজন ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদে প্রবৃত্ত হয়। এই সব সম্মিলনীতে গান-বাজনা, ধূমপান (বয়স্কা রমণীরা ধূমপানে অভ্যস্ত) এবং সর্ব্বোপরি পর-চর্চ্চা বিশেষ ভাবেই করা হ'য়ে থাকে। এতে কোন পুরুষ যোগ দিতে পারে না। এটিকে ওদেশে বলা হয় 'শেম্ এল হাওয়া'—বায়ু-সেবন। ওদেশের মেয়েদের শতকরা নিরানব্বই জনের ভাগ্যে অক্ষর পরিচয়ও ঘটে না যদিও জেরুশালেম মিউনিসিপ্যালিটি আজকাল কয়েকটি মেয়ে-স্কুল এবং নারীশিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এদেশের মেয়েদের রন্ধনকার্য্যে এবং গৃহকর্ম্মে যথেষ্ট নিপুণতা আছে, গৃহশিল্পেও ওরা বিশেষ পটু।

সহরের অর্থশালী মুসলমানদের পার্ব্বত্যপ্রদেশে একটি করে বাগানবাড়ী থাকে। গ্রীষ্মের ক'মাস এরা সেই বাগান-বাড়ীতে গিয়ে বাস করে। ফুল এরা বড় ভালবাসে, সেই জন্য গৃহসংলগ্ন বাগানের এরা বিশেষ পক্ষপাতী।

প্যালেষ্টাইনের সহরগুলিতে আগে প্রশস্ত পাকা রাস্তা ছিল না বললেই হয়। ফিটন গাড়ি ছাড়া আর কোন গাড়ির প্রচলনও ছিল না তখন। ধনী কিম্বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা গাধা, ঘোড়া কিম্বা উটের পিঠে চড়ে গন্তব্য স্থানে গমনাগমন করতেন। অধুনা মোটর গাড়ির প্রচলন হওয়ায় আর মিউনিসিপ্যালিটির দৌলতে প্রতি সহরেই পাকা প্রশস্ত রাস্তা তৈরী হয়েছে।

আগে এদেশে দারিদ্র্য ছিল না মোটেই। মধ্যযুগে য়ুরোপীয়েরা বিশেষ করে রুসেরা যীশুর এই পবিত্র লীলাক্ষেত্রে তীর্থ-পর্য্যটনে আসতো, এবং ব্যয় করতো প্রচুর পরিমাণে। দশ-পনেরো হাজার তীর্থ পর্য্যটকের ব্যয়িত অর্থে প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদের জীবনধারণের যথেষ্ট সহায়তা করতো কিন্তু অধুনা যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এদের দারিদ্র্যের অবধি নেই।



ডামাস্কাসের তোরণ
প্রাকারগুলি থেকে ষোড়শ শতাব্দীর স্থাপত্য ভঙ্গির একটা আভাস পাওয়া যায়।

প্যালেষ্টাইনের লোকসংখ্যা এখন প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ। তার মধ্যে শতকরা যাট জন মুসলমান, আটাশজন খৃষ্টান আর বাকী ইহুদি। অধিকাংশ ভূ-সম্পত্তির মালিকই মুসলমান। কৃষকদের মধ্যেও শতকরা নব্বই জন মুসলমান। কৃষিকার্য্য ব্যতীত ব্যবসাবাণিজ্য-প্রভৃতিতে এদেশীয়দের একটুও উন্নতি ঘটে নাই। উন্নতিশীল ব্যবসা বাণিজ্য এদেশে একেবারে নাই বললেই হয়, এজন্য এদেশটির আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়, অথচ স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার ব্যয় আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় বহু পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে এবং খৃষ্টানদের দানের উপর তাদের জীবনধারণ করতে হয়—অনাথ-আতুরদের তো কথাই নাই।

অবিরত পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শ লাভ করার ফলে অধিকাংশ সহরবাসীই জার্ম্মানী, স্পেনিশ ও ইংরাজী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে মাতৃভাষার মত। এদের মধ্যে হিব্রুভাষার প্রচলনই খুব বেশী—মাতৃভাষা বললেই হয়। আদালতে বিচারকার্য্য সমাধা হয় তিনটি ভাষায়—আরবী, হিব্রু এবং ইংরাজী, যদিও একই কথা তিনবার তিন ভাষায় ব্যক্ত করবার জন্য বিচার কার্য্য শেষ হতে তিনগুণ সময় লাগে!

প্যালেষ্টাইনের সহরে যে ক'টি উৎসব হয় তার মধ্যে ইষ্টার এবং বড়দিনের উৎসবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ হতে খৃষ্টানদের সমাবেশ হয়—যদিও পূর্ব্বের তুলনায় এরা মুষ্টিমেয়

মাত্র। গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে বড় উৎসব হয়—'শস্যপ্রাপ্তি ধন্যবাদ' (Harvest Thanks-giving)। অক্টোবর মাসের শেষভাগে এবং নভেম্বর মাসের প্রথমে ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্য কাটা হলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় করুণাময়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য। গ্রামে ছোট ছোট আরো কয়েকটি উৎসব হয় বটে কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

এদেশের অধিবাসীরা সিংহকে পর্য্যন্ত ভয় করে না কিন্তু 'জিন্'—ভূতকে এরা ভয় করে ভয়ানক। ডাকিনী বিদ্যা, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতির উপরও এদের বিশ্বাস অচল। এই সব জিন্, ভূত আর ডাকিনীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এরা কবচ-মাদুলী প্রভৃতি ধারণ করে।

য়ুরোপ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত রাত্রে এদেশের পথ জনবিরল হয় না, জনবহুল হয়ে ওঠে। দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে একস্থান হতে অন্যস্থানে গমনাগমনের সুবিধা হয় না বলে পর্য্যটকেরা রাত্রিকালে গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করে। তাদের উটের গলার ঘণ্টা বহুদূর থেকে শুনতে পাওয়া যায় নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করে।

বসন্ত-সমাগমে এদেশে ফুল ফোটে যত রকম বিভিন্ন বর্ণের পাখীও দেখা যায় তত জাতীয়। বসন্তের রাত্রে বুলবুলির গান আর কোকিলের কুহু নৈশনিস্তব্ধতাকে মুখর করে তুলে তরুণ তরুণীর সবুজ মনে অজানিত ব্যথা জাগায়। 'জেরিচো' প্রদেশের শাদা গোলাপ প্রসিদ্ধ—যদিও তাতে গন্ধ নেই একটুও। এপ্রিল মাসে মরুর বুকে আর এক রকমের ফুল ফোটে। উজ্জ্বল সোণালী রং, আকারে পিরামিডের মত বালির মধ্যে গজিয়ে ওঠে, যেন ব্যাঙের ছাতা —শিকড়ও নেই পাতাও থাকে না একটিও।

মুসলমানরা অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু—ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করায় এরা আবাল্য অভ্যস্ত। উপাসনার সময় এরা যে কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন যখনি 'মিনার' থেকে প্রার্থনার ডাক পড়বে তখনি এরা উপাসনা সুরু করবে—তা সে ফুটপাতে হোক, দোকানে হোক, অফিসে হোক—সর্ব্বত্রই চোখে পড়বে দক্ষিণ দিকে মক্কা সহরের দিকে জানু পেতে বসে প্রার্থনা করছে। এদের বিশ্বাস প্রতি-দিনকার কাজ যত ভালই হোক আর মন্দই হোক না কেন সেটা তাদের নিজের ইচ্ছাধীন নয়, ঈশ্বরই তাদের দিয়ে সে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কুসংস্কার এদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। "অমুক কুয়াটায় পেত্নী আছে", "ও লেকটায় স্নান করতে গেলে লোকে ডুবে যায়", "ওটা হানাবাড়ি"—একথা প্রায়ই শোনা যায়। এই সব অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওঝা এবং তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবস্থাও আছে।

বিবাহের সময় বর আগে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করে সে ঈশ্বরের উপাসনা করে কি না। উত্তরে অবশ্য মেয়েটি বলে 'হ্যাঁ'। তখন বিবাহ হয়। এদের বিশ্বাস মেয়েরা যদি প্রত্যহ ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা না করে তাহলে সংসারে সুখ-শান্তি থাকে না একেবারেই। মুসলমানদের গৃহের দেওয়ালে পাঁচ-আঙুলের একটি ছাপ দেওয়া থাকে—ঈশ্বরের হাতেই যে এদের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করছে এটি তারই নিদর্শন।

য়ুরোপীয় শিক্ষা এবং সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশটির মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটেছে। হাঁসপাতাল, ফ্রি স্কুল, সেবা-সদন এবং দরিদ্রের জন্য অর্থসাহায্যে সমর্থশীল গির্জ্জা প্রভৃতির বহুল প্রতিষ্ঠায় এদেশের দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানতা দূর করবার জন্য ইংরাজ সরকার বিশেষ চেষ্টা করছে।

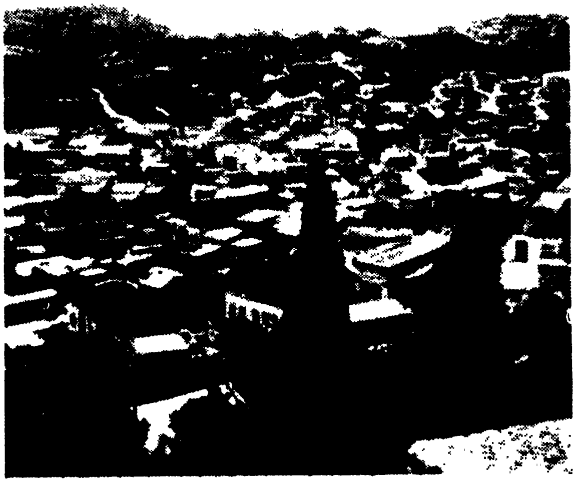
অধুনা 'জাফা' থেকে 'জেরুশালেম', 'হাইফ' থেকে 'দামস্কস', এবং 'দামস্কস' থেকে 'বেরুট'—এই তিনটি রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় এক স্থান হতে অন্যস্থানে ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

প্রথমেই ভূমধ্য সাগরের উপরেই 'জাফা' সহরটি সাগরের বুক থেকে ঠিক ছবির মত দেখায়। এই সহরে প্রত্যেকটি বাড়ির সম্মুখে একটি করে ছোট ছোট বাগান আছে—এতে সহরটি আরো নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে। সেখান থেকে রেলপথে যেতে 'লিদ্দা' এবং 'র‍্যামলেহ্' সহর পড়ে। দুটি সহরই প্রাচীন। অনেক পুরাতন গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখা যায়। প্রাচীন 'সারাসিন্' জাতীয় স্থাপত্য-শিল্পেরও বহু নিদর্শন পাওয়া যায় এ-দুটি সহরের ধ্বংসের মধ্যে। তারপর সুরু হয় পুষ্পাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। এই 'শেরোণ'

প্রদেশে ফসল হয় প্রচুর পরিমাণে—এইটিই নাকি প্যালেষ্টাইনের মধ্যে সবচেয়ে উর্ব্বরা প্রদেশ। এই প্রদেশের 'উইলেলনা' গ্রাম ননী মাখন এবং মদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিখ্যাত।

ঘণ্টা চুয়েক পার্ব্বত্য পথে গাড়ি চলবার পর জেরুশালেম নগর। সমতল ভূমি হতে হাজার ফিট উচ্চে এই নগরটি অবস্থিত। প্রাচীন কালে এই নগরটি জয় করবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছিল বহুবার, সেইজন্যই সহরটি সুরক্ষিত করবার আশায় প্রাচীন শাসকেরা প্রাচীর তৈরী করিয়েছিলেন সহরটিকে ঘিরে। সে প্রাচীর আজও আছে কিন্তু সে প্রাচীর আজকাল আর সহরের সীমা নির্দ্দেশ করে না সহরটি প্রাচীরের বাইরেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। অধুনা সহরটিকে সুন্দর এবং সুশ্রী করে তোলবার জন্য জেরুশালেম মিউনিসিপ্যালিটি বিশেষ চেষ্টা করছে। এই সহরের তোরণদ্বার 'দামস্কস্ দ্বার' বিশেষ প্রসিদ্ধ। "ওমরের মসজিদ"ও স্থাপত্য-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। য়ুরোপীয়দের মতে সৌন্দর্য্যে এবং স্থাপত্য-নৈপুণ্যে এই মসজিদটি নাকি তাজমহলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ! এই মসজিদটি জেরুশালেম সহরের পঞ্চমাংশের একাংশ ব্যাপিয়া আছে, তুটি মহলে বিভক্ত। প্রতি সন্ধ্যায় পুরুষ এবং রমণীরা এই মসজিদের প্রার্থনায় নিয়মিত ভাবেই যোগদান করে।

জেরুশালমের কিছু দুরে 'মাউণ্ট অব্ অলিভ্' অবস্থিত। এইখানে যীশুমাতা মেরীর কবর আছে বলে প্রবাদ। এই মেরীমাতার মানসিক করলে শারীরিক এবং মানসিক সবকিছু অশান্তিই দুর হয় বলেই শোনা যায়। আগষ্টমাসে এখানে একটি বিরাট উৎসব হয়। মুসলমান এবং খৃষ্টান সকলেই সাম্মিলিত হয় এই উৎসবে নিজ নিজ মানসিক উদ্‌যাপন করবার জন্য।



নাজারেৎ
দুরের গিরিশিখর থেকে ইহুদিরা যীশুখৃষ্টকে নীচে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হ'য়েছিল

জেরুশালেমের অল্পদূরে 'বেথলেহেম' সহর—অতি প্রাচীন সহর এটি। এইখানে একটি আস্তবলে যীশুর জন্ম হয়েছিল—এখন সে স্থানে প্রকাণ্ড একটি গির্জ্জা তৈরী হয়েছে। এই পবিত্র স্থানটি পরিদর্শনের জন্য প্রতি বছরেই শত শত খৃষ্টানের সমাগম হয়। আগে সহরের অধিবাসীরা তাদের নিজ গৃহে আশ্রয় দিতেন কিন্তু ক্রমশঃই তাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে তাদের জন্য এখানে একটি প্রকাণ্ড অতিথিশালা তৈরী করাতে হয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা অমায়িক প্রকৃতির, বুদ্ধিমান এবং অক্লান্তকর্ম্মী। আমাদের দেশের মারোয়াড়ীর মত বিদেশে এরা যায় 'লোটা কম্বল সর্ব্বস্ব' হয়ে, কিন্তু দশ-পনেরো বছর পরে স্বগৃহে ফেরে প্রচুর সঞ্চয় করে। এ সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গির্জ্জার সংখ্যা এ সহরটিতে খুব বেশী বলেই মনে হয়—স্কুল অনাথাশ্রম হাঁসপাতালের সংখ্যাও বড় কম নয়।

"নাজারেথ' সহরেও তীর্থ যাত্রীর সমাগম হয় খুবই। এখানে নাকি যোশেফের কামারশালা আর মেরীর

রন্ধনশালা আছে। যদিও এ-সম্বন্ধে অনেক খৃষ্টানের মতভেদ আছে তবু এ-স্থানটি দেখবার লোভ তারা ছাড়তে পারে না।

'বিরুট' সহরটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রাচীনকালে কোন এক দিগ্বিজয়ী এই সহরের অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-গাত্র খোদিত করে নিজ দিগ্বিজয় ঘোষণা করে গেছেন। তারই পাশে আর একটি ঘোষণা পর্ব্বত-গাত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করে।

প্রাচীনত্বের দিক হ'তে দামাস্কস সহরটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এ সহরটি পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি প্রাচীন সহর। সব যুগের সমসাময়িক সভ্যতার ঢেউ এর বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। সাময়িক সভ্যতা কখনো একে পশ্চাতে ফেলতে পারে নি। আধুনিক সভ্যতার সব উপকরণই এ সহরটির বুকে আছে। মহানুভব যোদ্ধা 'শালে-এদ্-দিন্' এর কবর দামাস্কসের গৌরব।

আর একটি সহরের কথা না বললে চলবে না—সে সহরটি 'জুরিচো'। আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাসিতার প্রাচুর্য্য এ সহরটিতে এত বেশী যে একে "মন্টি কার্লো"র সঙ্গে তুলনা করে এর নাম-করণ হয়েছে The Holy Monte Carlo. জুয়ার আড্ডায় এবং কফিখানায় এ সহরটি ছেয়ে গেছে। এই সহরটিতেই প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন সহরের ধনী অধিবাসীরা শীতকালে এসে আশ্রয় লয় আরাম, বিলাসিতা এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য।

প্যালেষ্টাইনের রাজধানী জেরুশালেম। রাজধানীর লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর।

শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনে তারা যোগ দান করে না। এই জন্যই এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন বা শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত কোন বিশেষ আলোচনা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না মুষ্টিমেয় শিক্ষিতকে নিয়ে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্যালেষ্টাইন বিশেষ ভাবে পরমুখাপেক্ষী। তাই এই বিংশ শতাব্দীতেও তারা নিজেদের দারিদ্র্য এবং শিক্ষাভাবের কোন প্রতিকারই করতে সমর্থ নয়। সুদিনের আশায় এরা বসে আছে—ভবিষ্যতের পানে চেয়ে।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

নীরব-ভাষা

শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘের বুকের সজল-ভাষা তড়িৎ-রেখায় উঠ্ছে কেঁপে।
নয়ন তাহার জানায় বেদন, যূঁই-মালতীর বক্ষ বেপে।
কমল তাহার মনের ভাষা, ফুটিয়ে তোলে রঙিন্ ঠোঁটে
অস্ত-রবির বক্ষ মাঝে, সেই বাণীটির অর্থ ফোটে।
চকোর জানায় বুকের ভাষা, চাঁদের পানে মুখটি তুলি।
চন্দ্রমা তাই অধীর-প্রাণে, দেছে বুকের বাঁধন খুলি।
ফুলের ভাষা নীরব রহে, গোপন-হিয়ার পরাগ-তলে
ভ্রমর বুঝে লয় সে-ভাষা বেদন-বিধুর অশ্রু-জলে।
রাত্রি জানায় আলোর তৃষা কাঁপিয়ে ঘন অন্ধকারে
প্রভাত যে তাই লক্ষ-ধারায় মিটায় রাতের পিপাসারে।
বিরহিনীর বুকের ভাষা, বেদন-বিধুর-মৌনতায়—
উপ্ছে ওঠে প্রিয়ের বুকে, সকল বাণীর পূর্ণতায়।

দৃষ্টি

(গল্প)

শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়

তিনু মাঝিকে কখনও নাকি হাসিতে দেখা যায় নাই। কদাচিৎ যখন তাহার ম্লান মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া ওঠে, তখন অকারণে সবল বাহু দুটী উপরে তোলাই ছিল তাহার মুদ্রাদোষ! বহুলোককেই সে জানে, পাঠশালার ডানপিটে ছোঁড়া হইতে তাহাদের আশীবছরের পিতামহরাও তাহার অপরিচিত নহে, তাহাদের প্রতিপদক্ষেপ তাহার পরিচিত, তাহার খেয়া নৌকায় সে আজ বিশ বছর ধরিয়া যাত্রী পারাপার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের গলার স্বর, নিঃশ্বাসের ভঙ্গী সমস্তই তাহার পরিচিত, এমন কি আগন্তুক না হইলে ওপারে যখন তাহারা ঘণ্টা বাজাইয়া ডাকে, বাজাইবার ভঙ্গীতেই সে বুঝিতে পারে বাদকটী কে। তাহাদের নাম, ধাম, পেশা সমস্তই তাহার জানা, অনেকের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কাহিনীও তাহার নিকট অজ্ঞাত নয়! কেন জানিবেনা, আজ বিশ বছর ধরিয়া সে এই খেয়া তরীর মাঝি। গাঁয়ের লোকের সে তিনপোয়া পথশ্রম লাঘব করিয়াছে, ইহার বিনিময়ে যে দু-চার পয়সা অর্জ্জন করে তাহাই তাহার জীবিকা।

কানা, তিনু বলিয়াই তাহাকে পাশাপাশি তিনখানা গাঁয়ের লোকে জানে, তিনু অন্ধ, বাল্যাবধি সে আলোর আড়ালেই বাড়িয়া উঠিয়াছে।

অগভীর চন্দনানদীর নীচে যে-স্বচ্ছ নীল জলের মেলা তাহা সে কখনও দেখেনাই, কিন্তু তাহার কল্লোল সে বর্ষায় শুনিয়াছে, স্রোতের মুখে লগী ছাড়িয়া দিয়া বহুদিন সে উৎকর্ণ হইয়া সর্‌সর্ শব্দ শুনিয়া পুলকিত হইয়াছে, কোন বাঁকে লগীটি কনুই দিয়া ধীরে ঘুরাইয়া ডাঙায় লাগাইতে হয় তাহাও সে জানে; জল-কল্লোল, বাতাসের গন্ধ, মেঘের হুঙ্কার, কাল-বৈশাখীর চাঞ্চল্য, শীতের হিমেল হাওয়া লইয়াই তাহার জগৎ, এ জগৎ তাহার অতি পরিচিত। স্পর্শ, গন্ধ, ও শ্রবণের সাথে সাথে কদাচিৎ সে দৃষ্টির কামনা করিয়াছে—আলোর অভাব সে খুব কমই অনুভব করে!

প্রথম যখন হৈমকে সে বিবাহ করিয়া আনিল, তখন একবার তাহার মনে হইয়াছিল, যদি দেখিতে পাইতাম, হৈমকে একবার দেখিতাম, কেমন না জানি তাহাকে দেখিতে, একবার স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হইতাম, আঁখিতে যদি দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে, ভালোবাসা কত সহজ হইত!

সেই একদিন সে আঁখির অভাব অনুভব করিয়াছিল! কিন্তু নিজের চোখে তাহাকে না দেখিতে পাইলেও হৈমর চোখেই সে হৈমকে দেখিয়াছিল। হৈমকে নাকি চমৎকার দেখিতে, তিনুর কাছে সে তদবধি রূপ ও সৌন্দর্য্যের রাণী হইয়া আছে।

কিন্তু ইদানীং হৈম যেন কেমনতর হইয়া গিয়াছে, তাহার কথায় সে মধু নাই, ব্যবহারে সে আন্তরিকতা নাই, তিনুর উপর তাহার আর সে দরদ নাই! তিনু বুঝিতে পারেনা কেন এমন হইল, এমন দিনও গিয়াছে, হৈম সকালে তাহাকে ডিঙিতে বসাইয়া গিয়াছে, দুপুরে আমানি আনিয়াছে, আবার সন্ধ্যা না হইতেই তাহার কোমল স্পর্শ তিনু অনুভব করিয়াছে, কিন্তু আজকাল তাহাকে একাই আসিতে হয়, এখন যে সন্ধ্যা হয় বুঝিতে পারে না, মন্দিরের শাঁখের আওয়াজে ধীরে ধীরে পারে ডিঙা ভিড়াইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে!

খানায় পড়িয়া যাওয়া, হঠাৎ গাছে আঘাত লাগা, এমন কি কোনও মানুষের সহিত ধাক্কা লাগিলেও কিছু আসে যায় না, পথের সাথে নূতন করিয়া পরিচয় হয়।



[illegible]

কিন্তু হৈম যখন ঝঙ্কার করিয়া ওঠে, 'কানা মিন্‌সে, মরণ হয়ত বাঁচি, এমন সোয়ামী না থাকা ভালো, বলি নদীর জলেই থাক্‌তে পারোনা—' তখন দুঃখে অভিমানে তিনুর চোখ ভিজিয়া উঠে, কিন্তু কি ভাবিয়া সে চুপ করিয়া যায়!

তিনু ভাবে হৈমর একি হইল? সে অন্ধ, কিন্তু যাহাদের চোখে জ্যোতি আছে তাহাদের মতোই ত' সে আহারের উপায় করিয়া আনিতেছে, সে অন্ধ, তাহার এই দৃষ্টিহীনতাই কি হৈম'র রাগের কারণ, কে জানে?

আবার ভাবে হৈম কেনই বা রাগ করিবেনা, আহা বেচারী আর তাহাকে লইয়া পারেনা। হয়ত তাহার চোখ নাই বলিয়া কত কথা তাহাকে বলিতে পারেনা, হৈম মুখরা, হৌক সে মুখরা। পৃথিবীতে সে যে একা নহে ইহাই কি তাহার কম সান্ত্বনা!

আঁখি থাকিলে হয়ত মন্দ হইত না, এই কথাটাই একদিন ডিঙিতে বসিয়া চুব্‌ড়ি বুনিতে বুনিতে তাহার মনে হইল। ডিঙি বাহিবার অবসরে চুব্‌ড়ি বুনিয়া দু' পয়সা পাওয়া যাইত, আর যাহাই হউক হৈমর সাংসারিক বুদ্ধি আছে। এই পয়সা সে আপৎকালের জন্য একটি বিস্কুটের টিনের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। তিনু মাঝে মাঝে ভাবে যদি দৃষ্টি-শক্তি থাকিত তাহা হইলে সে হৈমকে লইয়া সহরের হাটে যাইত, মকর-সংক্রান্তির দিন বাঁশখালির মেলায় যাইয়া হৈম ও সে সজীব ছবি দেখিত।

সহসা ওপারে ঘণ্টা বাজিল, চুব্‌ড়িটি একপাশে সরাইয়া, লগী বাহিয়া তিনু ওপারে চলিল।

পারে পৌছিয়া তিনু প্রশ্ন করিল—কজনা গো? একযোগে উত্তর আসিল—আমরা দুজন আছি হে। তিনু বলিল—ওঃ বাবা ঠাকুর আর সরকার মশাই বুঝি! একটু সাম্‌নে আস্‌বেন ওখানটায় আবার ভোরের দিকের পশলাটায় জল জমেচে!

স্বামিজী চারটী পয়সা পেরুণী দিয়া কহিলেন—ভালো আছো তিনু?

তাঁহার পদধূলি লইয়া তিনু মৃদু হাসিল মাত্র। সরকার মশাই কহিলেন—আমি জমিদারী কাজে এসেচি, বুঝলে হে!

এবারও সেই মৃদু হাসিয়া তিনু জানাইল সে বুঝিয়াছে।

ডিঙি চলিতে লাগিল।

স্বামিজী সহসা দেখিলেন সরকার অদূরে যেন কাহাকে কি ইঙ্গিত করিতেছে। তাহার দৃষ্টিপথ লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল অদূরে এক কুটীরের দিকে সরকার চাহিয়া আছে, আর বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া এক সুশ্রী রমণী! স্বামিজীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, রমণী বোধ হয় তাঁহার পরিচিত!

চুপ করিয়া থাকিতে স্বামিজীর ভালো লাগিল না—কৃত্রিম উদ্বেগের সুরে প্রশ্ন করিলেন—ডিঙা বেশ মজবুত আছে ত' হে তিনু? কতকাল হাত পড়েনি!

তিনু কহিল—আজ্ঞে, সরকার মশাই সেদিন বলছিলেন জমীদারবাবু নাকি একটা নতুন ডিঙি গাঁয়ের লোকদের জন্যে দেবেন, গরীব দুঃখীর ওপর তাঁর নাকি বড় দয়া! সরকার তাড়াতাড়ি বলিল—তোমার কথা তাঁর কানে গেছে হে তিনকড়ি, এ মাসেই হোত, তা 'পল্‌তাবেড়ে'র জমীটা এবার খরিদ হলো কিনা, আস্‌চে মাসেই যাতে হয় আমি স্বয়ং তার ব্যবস্থা কর্‌বো, এ হ'ল পাঁচজনের উপকার! স্বামিজী এবার নূতন কথার প্রয়োজন অনুভব করিয়া প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা তিনু নন্দ কামার সেই যে গঙ্গাসাগরে গিছ্‌লো, ফির্‌লো কিনা কিছু জানো?

—তা জানেন না বুঝি? এবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে সে মহাপুণ্যি করে' এসেচে, ওদের নৌকো বুঝি ডুবে যায়, তা, ও নিজেত' কোন গতিকে বেঁচেছে আবার ভূতো কলুর ছোট ছেলেটাকেও উদ্ধার করেচে। ভূতোর মা টেঁসে গিয়েছে, তা সে বুড়ো মানুষ গঙ্গালাভ করেচে, কিন্তু মশাই ছোকরার জীবনটা ত' আর তুচ্ছ নয়! সারা গাঁয়ে ধন্নি ধন্নি পড়ে গেচে—।

এতগুলি কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া সরকার থামিল! তিনু বিস্মিত হইয়া বলিল—বলেন কি? আমরা ত' শুনেচি গঙ্গাসাগরে গেলেই সশরীরে ফেরা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপ্যার, তা ভূতনাথের সে ছেলেকে আবার বাঁচিয়েছে? তাজ্জব কাণ্ড!

সরকার মশাই মুরুব্বিয়ানা চালে কহিল—এতবড় ব্যাপারটা সবাই শুন্‌লে হে, আর তিনু তোমার কানে

পৌঁছায় নি! স্বামিজী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন এইবার বলিলেন—সবই সম্ভব হে, সবই সম্ভব! তাঁর দয়া হে তিনকড়ি! মানুষ যতক্ষণ না হাতে-নাতে ফল পায় ততক্ষণ বিশ্বাস করে না। নন্দ তোমাদের পরিচিত তাই, নইলে এ ত' গল্প কথা হ'য়ে দাঁড়াত। তবু তাঁকে মানুষ ডাকেনা। বিধাতার ইচ্ছে বুঝ্‌লে তিনকড়ি! গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনকড়ি কহিল—আজ্ঞে তাঁর ইচ্ছে বই কি, এই দেখুন না চোখ নেই বলে কি আমার কাজ আটকাচ্চে, আজ বিশবছর এই কাজ করচি কোনো গোল হয় নি।

স্বামিজী সহসা বলিয়া ফেলিলেন—আচ্ছা তুমি যদি আজ দেখ্‌তে পাও তিনু—তাহলে কেমন হয়? তিনু আবার মৃদু হাসিল! অন্ধকারে সে যেন কি দেখিতে পাইতেছে, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার তাহার দিকে কঠোরভাবে চাহিয়া আছে। আহাদের তীক্ষ্নদৃষ্টির সম্মুখে তিনু চোখ খুলিতে পারিতেছে না। তিনু সভয়ে জ্যোতিহীন চোখের পাতা বন্ধ করিল!

ডিঙা প্রায় পারে আসিয়া পড়িয়াছে! স্বামিজী আবার প্রশ্ন করিলেন—তোমার আশপাশে কি আছে না আছে, তোমার কি দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না তিনকড়ি, এই যেমন আমরা দেখ্‌তে পাই!

এইবার তিনকড়ি আর নির্ব্বাক রহিল না, আক্ষেপের সুরে কহিল, আপনাদের মুখেই শুনেচি, আমাদের দেহ হোল ভগবানের দান, তা তিনিই যখন দেননি বাবাঠাকুর! তখন মিছে কেন ওর জন্যে ভেবে মরি!

সরকার মশাই এতক্ষণ কেন জানি না তিনুর দৃষ্টি-হীন চোখের উপর সভয়ে চাহিয়াছিলেন, এইবার কথায় কৃত্রিমতা মিশাইয়া বলিলেন—চোখ কি জিনিষ তাই ও জানেনা, আর ওর কিসের অভাব বলুন না, চোখ ওর থেকেও যা না থেকেও তাই—কি বলো হে!

ডিঙা পারে লাগিল।

স্বামিজী তিনুর হাতে আর একটা আনি দিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করিলেন।

সরকার মশাই সেই ভাবেই বলিতে লাগিল বুঝ্‌লে হে, হুজুরের স্মরণ করিয়ে দেব'খন—প্রণাম ঠাকুর মশাই!

স্বামিজী ততক্ষণ চলিতে সুরু করিয়াছেন!

ইহার কিছুকাল পরে—

গ্রীষ্মের একরৌদ্র-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে ঘাটে ডিঙি ভিড়াইয়া প্রতিদিনকার অভ্যাস মতো তিনু চুবড়ি বুনিতেছে, নিপুণ আঙুলে অভ্যাস মতো চুবড়ি বুনিলেও মন যেন তাহার কিসের চিন্তায় ভরপুর। সূর্য্যকিরণ তালগাছের পাশ দিয়া ডিঙির উপর ছড়াইয়া পড়িল সেই আলোয় তিনুর মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার চোখের পাতার উপরেই অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা আসিয়া পড়িয়াছে, তিনুর সহসা মনে হইল চোখের উপরের সেই পুঞ্জিভূত অন্ধকার যেন তরল হইয়া গিয়াছে, আবছা আলো যেন চোখের উপর দেখা যাইতেছে। জ্যোতিহীন চোখের পাতা সে একবার খুলিল আবার বন্ধ করিল। কিন্তু সেই অস্পষ্ট পাত্‌লা আলো তাহার চোখের উপর!

আশ্চর্য্য হইয়া তিনু ভাবিতে লাগিল ইহাও কি সম্ভব! চুবড়িটি পাশে সরাইয়া রাখিয়া সে আপন মনে হাসিয়া উঠিল, আপন মনেই ভাবিতে লাগিল ইহাও কি সম্ভব! ভাবিল তাহার বহুদিনের কামনা আজ হয়ত স্বপ্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল ইহা যে স্বপ্ন নহে ইহা যে সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

তিনু আবার হাসিল—এবার কিন্তু তাহার চোখের কোল হইতে জল ঝরিয়া পড়িল।

ঠিক এই সময়েই পরিচিত কণ্ঠে ডাক আসিল—তিনু পার করে' দাও হে!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

আর কাহারও স্বর হইলে সে বিস্মিত হইত না। কিন্তু এ-কণ্ঠ স্বামিজীর, তবু সে প্রশ্ন করিল বাবাঠাকুর নাকি?

উত্তর আসিল—হাঁ ঠিকই ধরেচ তিনু, আমি একা!

তিনু ডিঙা আগাইয়া আনিয়া কহিল, উঠে আসুন।

ডিঙিতে উঠিয়াই স্বামিজী প্রশ্ন করিলেন—বউ বুঝি সহরে গেল তিনু?

তিনু নিঃসন্দেহে বলিল, আজ্ঞে না, সে বাড়ীতেই আছে কাজ কর্ম্ম নিয়ে, সহরে যাবে সেই হাটবারে। চমকিত স্বামিজী শুধু কহিলেন—হুঁ!

ডিঙা মাঝ নদীতে আসিয়া পড়িল।

কম্পিতকণ্ঠে তিনু কহিল—বাবাঠাকুর! গেলবারে আপনাকে পার করার পর থেকে আমি খালি ঠাকুরকে ডেকেচি, ঠাকুর! তুমি সবাইকে আলো দিলে আমায় কেন বঞ্চিত্ করলে। তাঁর চরণে বার বার দুঃখ জানিয়েচি। তা আশ্চয্যির কথা বাবাঠাকুর, আজ আমার মনে হোল আমি যেন ঝাপ্সা আলো দেখ্লাম!

স্বামিজী দৃঢ়স্বরে কহিলেন—পাগল হ'লে তিনু! তা'ও কি কখন সম্ভব!

—না বাবা ঠাকুর! নিশ্চয়ই আজ আমি আলো দেখেচি। আজ বোধ হয় রোদের ঝাঁঝ খুব বেশী!

—তা আজ কি রকম গরম পড়েচে বুঝ্চোনা?

—আজ্ঞে হাঁ। নদীর জল যেন ফুটন্ত জলের মত গরম।

—আজ্কের মতো রোদ আর গরম এ বছরে হয় নি তিনু।

—তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই আলো দেখেচি, আমার চোখ আর তত' অন্ধকার নয়।

—কি যে বলো বাবা, তুমি কদিন ধরে' এই কথা ভেবেচ তাই তোমার মনে হচ্চে তুমি আলো দেখ্তে পেয়েচ।

তিনু তথাপি দৃঢ়স্বরে জানাইল তাহার এতটুকু ভুল হয় নাই, সে ঠিকই দেখিয়াছে।

স্বামিজী তখন বলিলেন—তা হ'লে এ নেহাৎ দৈব ঘটনা তিনকড়ি। আর কাউকে বলেচ নাকি?

—আর কাউকে জানাবো কেম্নে, আপনি ডাকার কিছু আগেই আমার এরকম বোধ হোল। তিনিই আপনাকে পাঠিয়েচেন!

তিনু তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিল! স্বামিজী কি ভাবিলেন, তারপরে বলিলেন—তোমার ডাক তাঁর কাছে পৌঁছেচে, তিনকড়ি। আজ রোদের তেজ খুব বেশী ছিল, তোমার চোখের ওপর সেই আলো পড়ায় চোখের শিরায় আঘাত লেগেচে। সবই তাঁর ইচ্ছা। এতকাল পরে হয়ত তুমি আমাদের মতোই দেখ্তে পাবে! বিধাতার বিচিত্র মহিমা!

ডিঙা ঘাটে ভিড়িল, কিন্তু স্বামিজী নামিলেন না, তিনুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—তিনু তুমি যদি কাউকে না জানাও, আমি তোমার চোখ ভালো করার চেষ্টা দেখ্তে পারি।

—বউকে বল্তে পারি ত' বাবাঠাকুর?

—না বউকেও নয়। কাউকে জানানো উচিৎ নয়।

—কিন্তু সে জান্লে বড় খুসী হোত, আমার আবার চোখ হ'বে শুন্লে তার বড় আহ্লাদ হ'বে, আমি তার জীবন নাকি বোঝা করে তুলেছি, এ সব কথা জান্লে তার মন অনেকটা হাল্কা হবে।

—না তিনু আমার কথা শোন, এখন কাউকে জানিয়ে লাভ নেই, যথাসময়ে জানিয়ো। কাল আমি আবার আস্বো।

স্বামিজী চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে তিনু স্বামিজীর ডাক শুনিল।

স্বামিজী কহিলেন—তিনু কল্কাতায় তুমি কখনও যাওনি ত', আমার সঙ্গে কাল কল্কাতায় চলো, সেখানে অনেক বড় ডাক্তার আছেন তাঁদের কাছে আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

তিনু কহিল - তা হ'লে ত' বাবাঠাকুর বউকে জানানো দরকার। আমার দুচার পয়সা যা জমানো আছে তাও কাজে লাগ্বেখন, তা ছাড়া সব না শুন্লে বউ ত' যেতে দেবে না।

স্বামিজী ওষ্ঠ দংশন করিয়া কহিলেন—টাকার জন্যে ভেবোনা তিনু। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর বউকে বল্বার যদি দরকার হয় আমিই বল্বো, তোমার কিছু বল্বার দরকার নেই। চোখটা একবার দেখি।

স্বামিজী তিনুর চোখের পাতা তুলিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। তিনু জানাইল তাহার চোখের উপর কি নাকি ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

স্বামিজী শুধু কহিলেন—কাল কল্কাতা যেতেই হ'বে,—বউকে আমি রাজী কর্বোই, তুমি কিছু ভেবো না তিনকড়ি!

তিনকড়ির কলিকাতা যাত্রা পরদিন স্থির হইয়া গেল।

ভোর না হইতেই স্বামিজী তিনুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত।

হৈম তখন উঠানে গোময় লেপিতেছে, স্বামিজী প্রথমেই তাহাকে বলিলেন–তোমার কাছেই এলাম মা, কাল কল্‌কাতায় যাচ্ছি, তা আমার ভারী ইচ্ছে এবার তিনুকে নিয়ে যাই, ভেবে দেখ্‌লাম ও বেচারারও হাওয়া বদ্‌লানো প্রয়োজন। এই হরিণডাঙ্গা আর নূরনগর এ ছাড়া আর কোথাও ও কখনো যায় নি। অন্ধ হোলেও দেশভ্রমণের প্রয়োজন ওর আছে, তাই ভাবলাম এবার তিনুও চলুক। দিন কয়েক পরেই আবার ফিরে আস্‌বে।

অসম্বৃত অঞ্চল সুবিন্যস্ত করিয়া ক্ষিপ্তের মতো হৈম কহিল, সে মিন্‌সেই বুঝি আপনার কাছে বায়না নিয়েছে, কোথায় গেলো কানা মিন্‌সে ?

স্বামিজী অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন—ছিঃ মা! স্বামীর ওপর কটুকথা বল্‌তে নেই, ওকে তুমি বড় অশ্রদ্ধা করো!

ছেদ্দা, ছেদ্দাভক্তি করি কেমন করে, বছরের পর বছর ধরে খালি ওর পিণ্ডি সেদ্ধ করে চলেচি, আর কচি ছেলের মতো আগ্‌লে বেড়াচ্ছি, সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য তা টের পেলাম না, আমার বয়সী কোন্ মেয়েমানুষ এমন ধারা করে বলো ত', কোনো দিনের তরে যদি একটু যত্ন আত্তি করেছে!

ঘরের ভিতর হইতে ভয়ে ভয়ে তিনু উত্তর করিল— আমার জন্যে তুই একঘণ্টা খাটিস্ ত' ঢের, যত্ন আত্তির কথা বল্‌চিস্ তোর মুখে ত' একদিনের তরে একটা ভালো কথা শুনি নি!

হৈম চোখ বুজিয়া মুখ বিকৃত করিয়া ঘাড় বেঁকাইয়া এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া কহিল—শুন্‌লে ত' বাবাঠাকুর! মিন্‌সের কি আক্কেল গো সোহাগের কথা চুলোয় যাক্ বলে কিনা যত্ন আত্তি করি না, কি নেমখারাম এখনো চন্দর সূয্যি ওঠে, বলে না সেই যার জন্যে চুরি করি—, উনি রাতদিন তামাক খাবেন আর বসে বসে সাপের মন্তর আওড়াবেন, যাক্‌না বাপু কোন্ চুলোয় যাবে, আর ফিরে এসো না, যেখানে খুসী ওকে নিয়ে যাও, মিন্‌সে থেকেও ত' পেরায় কুটো ভেঙে দুটো করে—।

স্বামিজী কহিলেন—রাগ কর্‌তে নেই মা, তোমার স্বামীর চোখ নেই তাকে ওভাবে বল্লে তার মনে কষ্ট হয় না? ওর যাতে ভালো হয় তাই তোমার চেষ্টা করা উচিত—আমি ওর ভালোর দিকেই নজর রাখ্‌বো।

হৈম আবার কহিল—কি আমার সোয়ামী গো, ভাত দেবার কেউ নয় নাক কাটবার গোঁসাই। আর তাও বলি বাপু আমার সোয়ামীর ভালো মন্দয় পাঁচজনের কি? আমার ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাই নিয়ে পাঁচজনের মাথা ব্যথা কেনরে বাপু!

তিনু আর ঘরে থাকিতে পারিল না,—সরোষে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, দেখ্ বউ আমাকে যা বলিস্ বলিস্, এঁরা হলেন ঠাকুর দেবতার সামিল। অমন করে কথা কস্‌নি বলে দিচ্চি, জিভ্ খসে যাবে যে!

হৈম বলিল—কি আমার ঠাকুর দেবতা রে, যাওনা তোমার ঠাকুর দেবতার সঙ্গে যেখানে খুসী। কল্‌কাতায় গিয়ে থ্যাটারের গান শিখে এসো। তারপর সহসা আরো চীৎকার করিয়া বলিল—বলি ডিঙি বাইবে কে ?

হতাশ হইয়া তিনু কহিল, দেখ্‌লেন বাবাঠাকুর! আমি বলেছিলুম বউ আমায় যেতে দেবে না। তারপর হৈম'র হাত ধরিয়া মিনতির সুরে কহিল—বাবাঠাকুর কি মানুষরে বউ, তুই কিছু ভাবিস্ নি, পয়সা কড়ি যা খরচ হবে সব উনি দেবেন, আর শশী বলেচে যে কদিন না ফিরি সে-ই আমার হয়ে কাজ কর্‌বে।

হৈম কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু স্বামিজীর অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপর সহসা চোখ পড়িয়া যাইতে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

স্বামিজী শুধু কহিলেন—তা হ'লে আজ দুপুরেই আমরা যাচ্ছি।

হৈম তিনুকে ধাক্কা দিয়া ঝঙ্কারিয়া উঠিল—যাও সাজগোজ করগে, বলিয়াই পাশের ঘরে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিল।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি—

কলিকাতার এক জনবহুল পথে স্বামিজী আর তিনু পাশাপাশি চলিয়াছেন—একজনের গৈরিক আলখাল্লা ও সৌম্যমূর্ত্তি আশপাশের লোকের সম্ভ্রম সৃষ্টি করিতেছে, আর

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পল্লীযুবকের অযত্ন-বর্দ্ধিত বিশৃঙ্খল কেশরাশি হাওয়ায় উড়িতেছে, মলিন বেশভূষায় দারিদ্র্য প্রস্ফুট হইলেও সারাদেহে যেন কিসের বৈশিষ্ট্য, বহু লোকের মধ্যেও যেন এর স্বাতন্ত্র্য আছে!

পল্লীবাসীটি তিনকড়ি, তাহার চোখে নীলচশমা, অপূর্ব্ব কৌতূহলে তার সারা দেহমন ভরপুর!

হাঁসপাতাল হইতে তিনু আজই বাহির হইয়াছে, স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় অল্পভাষী তিনুও মুখর হইয়া উঠিয়াছে!

তিনু বলিতেছে—জানেন বাবাঠাকুর! ছেলেবেলায় এক সন্ন্যাসীর কাছে বাবা নিয়ে গিছ্‌লো, তা সে বল্‌লো, এ-রোগ সারানো শিবেরও অসাধ্য, নারাণ কবিরাজ হেসে উড়িয়ে দিয়েচে, দেখ্‌তে যে কোনোদিন পাবো তা স্বপ্নেও ভাবি নি, আপনার দয়ায় আজ তাই সম্ভব হোল।

স্বামিজী তাহার বাহু নিজের মুঠার মধ্যে ধরিলেন, হয়ত কোনো পথিকের সহিত তিনু ধাক্কা লাগাইবে; লাইট পোস্‌টে আঘাত লাগিয়া তিনু পড়িয়া যাইতেও পারে। তিনু যে আর অন্ধ নহে' এ কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন।

একটি মোটরবাস ছুটিয়া চলিয়া গেলো, তিনু চশমাটি খুলিয়া অবাক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

চোখ থাকলে কত আশ্চর্য্য ঘটনাই না দেখা যায়।

—আশ্চর্য্যই বটে, প্রথম দৃষ্টিতে সবই অদ্ভুত তিনু, ওই দেখ কত বড় শিবমন্দির, কত দোকান পসার দেখেচ!

তিনু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, বিস্ময়ের সীমা নাই! —কল্‌কাতার সবই তাজ্জব! হাওয়া গাড়ীগুলো সবচেয়ে মজার, চোখ হ'বার আগে যেমনটি ভাবতুম তেমন নয় তো!

—সবই অভ্যাস হয়ে যাবে বাবা, চলো আমরা এখন আশ্রমেই ফিরি, তুমিও সেই হাসপাতালে কি খেয়েচ কখন। ক্ষিধে পেয়েচে ত'?

—ক্ষিধে-তেষ্টা কি আর আছে, চোখ পেয়ে এখন ভাব্‌চি, কানা হয়ে আমার কেমন করে চল্‌তো!

স্বামিজী হাসিলেন মাত্র!

ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, তিনু বার দুই কাপড় দিয়া চশমা মুছিয়া চোখে পরিল, তারপর অকস্মাৎ বিপন্নের মতো ভয়ার্ত্তকণ্ঠে কহিল—বাবাঠাকুর আবার চোখ গেলো!

বিস্মিত হইয়া স্বামিজী বলিলেন—সে কি তিনু! বলো কি? তাঁহারও উদ্বেগের আর সীমা নাই।

তিনু বলিল—সবই আবার আগেকার মতো অন্ধকার হয়ে গেলো! এ চোখ যে আমার না হওয়াই ছিলো ভালো!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামিজী বলিলেন—যাক্ বড়ো ভাবিয়ে তুলেছিলে তিনু, ও কিছু নয়। রাত হয়ে এলো কি না তাই অন্ধকার হয়ে গেলো, এখুনি আলো জ্বলো বলে। এটা আবার অন্ধকার পক্ষ। চাঁদ থাক্‌লে আলো হয়!—

—রাতে তাহ'লে কেউ দেখ্‌তে পায় না?

কি মধুর সরলতা!

স্বামিজী বলিলেন—দেখ্‌তে পায় বৈকি, তবে আলোর প্রয়োজন।

—অদ্ভুত! রাতে তাহ'লে সবাই কানা?

আত্মগতভাবে স্বামিজী কহিলেন—তা এক রকম কানা-ই আর কি! শুধু বিধাতার রাজ্যেই অন্ধকার নেই। সত্যের পথে সর্ব্বদাই আলো। তারপর তিনুর হাত ধরিয়া বলিলেন, চলো বাবা, তুমি যেন শিশু, নতুন করে তোমার জীবন সুরু হবে। নতুন করে তোমায় সব জান্‌তে হবে, চিন্‌তে হবে! ভেবেছিলুম বেশ সহজ ভাবেই সব হয়ে যাবে, এখন বুঝচি কাজ কঠিন। এই গলির ভিতরেই আমার আশ্রম।

তিনু নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বামিজী আশ্চর্য্য হইয়া তিনুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক সুন্দরী তরুণী মোটর হইতে নামিতেছে তিনু সেই দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। স্বামিজীর দিকে লক্ষ্য পড়িতেই বলিল—দেখুন কেমন সুন্দর মেয়েটা! বউকেও ঠিক এমনিই দেখতে। ওই বউ কি না কে জানে? বউ হ'লেও ওর সাথে কথা কইবার উপায় নেই।

—উনি তোমার স্ত্রী ন'ন।

—না বাবাঠাকুর বউকে অমনই দেখ্‌তে অমনি মুখের গড়ন, অমনি পরিষ্কার,—আপনিও দেখেচেন, নয় কি? আপনি আমার দিকে ওভাবে চেয়ে আছেন কেন?

—তোমার স্ত্রীকে ওঁর মতো দেখ্‌তে নয়।

—না বাবাঠাকুর আমি জানি বউকে অমনই দেখ্‌তে তবে বোধ হয় আরো একটু ফাঁপালো। বউকে এখন দেখ্‌তে পেলে হোত। আমার হরিণডাঙায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করচে। সেই ডিঙি সেই নদী!

তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া স্বামিজী কহিলেন—সবই দেখ্‌তে পাবে বাবা। আচ্ছা আজ রাতের গাড়ীতেই দেশে যাওয়া যাবে তার জন্যে কি, চলো এখন আশ্রমে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক্।

তিনু আবার স্বামিজীর সঙ্গে চলিল।

গলির ভিতর ঢুকিয়াই তাহার মনে হইল সবাই যেন তাহার দিকে করুণ ভাবে চাহিতেছে, আজ সকালেও যে তাহার দৃষ্টিশক্তি ছিল না তাহাও যেন ইহাদের অজ্ঞাত নহে। অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে একজনের সহিত তাহার ধাক্কা লাগিয়া গেল, লোকটি হয়ত কোনো শুভকার্য্যে যাইতেছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল, কাণা নাকি! ভালো ফ্যাসাদ।

তিনুর হঠাৎ বৌর কথা মনে পড়িল, সে উত্তেজিত হইয়া বলিল মুখ সাম্‌লে কথা ক'য়ো,—কেমনতর—!

স্বামিজী তাহাকে টানিয়া লইয়া এক প্রাচীন বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

ইহাই তাঁহার আশ্রম।

আশ্রমে ঢুকিয়াই এক আরসীর দিকে তিনুর চোখ পড়িল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে বুঝিল ওই মূর্ত্তি তাহারই।

সেই নীল চশমা, গোলাকার রুক্ষ মুখমণ্ডল, শ্রীহীন অদ্ভুত মূর্ত্তি! সে উন্মত্তের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। স্বামিজী তাহাকে ধরিয়া কহিলেন—কি হোলো তোমার তিনু। এত ভয় পেলে কিসে? সব জিনিষ এখন শান্তভাবে তোমায় গ্রহণ করতে হবে, চলো কিছু খেয়ে নিই, তারপর একটু বিশ্রাম করে একেবারে নটা চুয়াল্লিশের ট্রেন ধরা যাবে।

তিনু অর্থহীন চোখে শুধু চাহিয়া রহিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া স্বামিজী তিনুকে দাঁড় করাইয়া টিকিট আনিতে গেলেন। দীর্ঘদেহ অপূর্ব্ব-দর্শন তিনু নূতন জগতের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। চশমার ঘন নীল আবরণের মধ্য দিয়া যদিও সুস্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছিল না তথাপি এই নূতন জগৎ তাহার মনে এক উন্মত্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করিল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। তাহার সুমুখ দিয়া যতগুলি স্ত্রীলোক চলিয়া গেলেন সবাইকেই সে তাহার স্ত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে। দৃষ্টিশক্তি পাইবার পর রমণীর যে-রমণীয় রূপ আশ্রমে যাইবার সময় সে দেখিয়াছে তাহা তাহার সারা প্রাণমন ছাইয়া আছে। হৈমকে নিশ্চয়ই ওই রকম দেখিতে এখনই না হয় একটু মোটা হইয়াছে কিন্তু বিবাহের পর অবিকল অমনই ছিলো। হাসপাতালে তাহারা রঙ চিনাইয়াছিল—সেই রমণীর ঠোঁট দুটি লাল-টুকটুকে, একজোড়া ঘন-নীল নয়ন, শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ, সে শুভ্রতায় বুঝি অন্তর গলিয়া যায়। কিন্তু গলিয়াই বা কেন যাইবে তাহা তিনু ভাবিয়া পায় না। দেখিতে পাওয়া কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আরো নূতনতর কিছু দেখিবার জন্য সে জ্বলিতে লাগিল। তাহার দেহ মন কি যেন এক জ্বালাময় আগুনে জ্বলিতেছে, এ আগুন তাহার নিকট পরিচিত নহে।

হরিণডাঙায় ফিরিবার পথে হৈম ছাড়া আর কোনো কথা তিনুর মুখে নাই। তাহার এ ভাবান্তরে স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। এই শ্রীহীন যুবক হঠাৎ সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে ইহা কম বিস্ময় নহে। ফুটপাথের ওপর সেই সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া না হয় সে অভিভূত হইল কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় তিনু কেন ভাবিতেছে তাহার স্ত্রী সুন্দরী! সে কালও অন্ধ ছিল, আলো ও আঁধারের পার্থক্য যাহার জানা ছিল না, সুন্দর ও কুৎসিতের তারতম্য বিচার করা যাহার অসাধ্য ছিল, তাহার মনে কেমন করিয়া ধারণা হয় তাহার স্ত্রী সুন্দরী!

স্বামিজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—না হে তিনকড়ি। তোমার স্ত্রী সাধারণ গেরস্থ ঘরের মেয়েদের মতো, অন্য সব স্ত্রীলোকদের যেমন দেখলে তেমন কিছু আশা কোরো না। নর-নারীকে বহুরূপে, বহু ধরণে, সুন্দর ও কুৎসিত করে কেন যে বিধাতা গড়েচেন তা তিনিই জানেন। তাঁর বিধানে যারা স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রিত হয়েচেন তাদের অনুশোচনা করা মোটেই উচিত নয়। তারা পরস্পরের দুর্ব্বলতা সহ্য করে সাংসারিক জীবনের ভার বহন করে চল্‌বে এই তাঁর অভিলাষ।

অন্যমনস্ক তিনু কহিল—হাঁ হাঁ। বিয়ের সময় এই সব শুনেছিলুম বটে।

স্বামিজী কহিলেন—তোমার এ-সব কথা স্মরণ আছে জেনে আনন্দ পেলাম, ঘরে ফিরে গিয়ে সস্ত্রীক তাঁকে প্রণাম জানাবে, দৃষ্টিশক্তি পেলে এ তোমার এক রকম তোমার নব-জীবন! নতুন যে সব জিনিষ দেখবে তা তোমার ধারণার অতীত হলেও, সেগুলো সহ্য করতে চেষ্টা করবে, তবেই তুমি সুখী হবে।

তিনুর মন ভিজিয়া গেল। সে কহিল আমার চোখ হোল বাবা ঠাকুর। বউ আর আমায় গালাগালি দেবে না, আগের মতোই সে আমার কাছে আস্‌বে। আপনাকে বল্‌বো কি বহুকাল ধরে সুখ কাকে বলে তা জানিনে, এখন বোধ করি বউ আবার সুখী হবে। পূজোর সময় আমি তাকে কলকেতায় নিয়ে আস্‌বো, আর এখন যখন চোখ হোল তখন টাকা কড়িরই বা কি দরকার বলুন না। ফেরবার সময় একবার মনে হলো বউ-র জন্যি কিছু নে যাই, এই ধরুন সাড়ীটা বা বেলোয়ারী চুড়ি এক কুড়ি। বেলোয়ারী চুড়ি পর্‌তে বউ বড়ো ভালোবাসে কিনা। অনেক পয়সার দরকার বলে কিনে দিতে পারিনি।

এতগুলি কথা কহিয়া সে থামিল, কে জানে হয়ত আবার স্ত্রীর ধ্যানে মগ্ন হইল।

স্বামিজীর আশ্রম হরিণডাঙা হইতে আগে পোয়াটাক যাইতে হয়। পক্ষীমাতা যেমন শাবকটীকে ডানা দিয়া আগলাইয়া রাখে স্বামিজী এতখানি পথ তিনুকে তেমনই সামলাইয়া আনিয়াছেন।

উভয়ে নীরবে পথ চলিতেছেন। তিনুর হৃদয়ের স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুততর হইতেছে, সে প্রথম দর্শনে হৈমের সহিত কি কথা কহিবে তাহা ভাবিয়াই আকুল।

স্ত্রীর স্বপ্নে সে বিভোর।

আর স্বামিজী ভাবিতেছেন তিনুর দৃষ্টিশক্তিলাভের প্রধান সহায়ক হইয়া তিনি কি তাহার মঙ্গল করিলেন। তিনুর কুটিরের কাছাকাছি পৌঁছিয়া তিনি কহিলেন—বাবা, এইবার আমি তোমায় ছেড়ে যাব, তোমার ঘর কাছেই, ওই যে অল্প আলো দেখা যাচ্চে ওই তোমার বাড়ী। এই সোজা পথ চলে গিয়েচে, আমি এখন চলি, অনেকটা পথ আবার যেতে হবে, তুমি চিনে যেতে পার্‌বে ত?

তিনু ব্যস্ত হইয়া বলিল—আজ্ঞে আপনি আসুন, আমি সব দেখতে পাচ্ছি, ঠিক চিনে যেতে পার্‌বো 'খন।

জয়ের গর্ব্বে তাহার সেই শ্রীহীন মুখ উদ্ভাসিত। স্বামিজী তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় লইলেন।

দু চার পা চলিয়াই তিনুর কেমন অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল, কেমন যেন তাহার মনে হইল, এ হয়ত ভুল পথ, সে চোখ বন্ধ করিল ও অন্ধের মতো চলিতে সুরু করিল। এ পথ তাহার পরিচিতই বটে, দৃষ্টি-হীনতা এক রকম মন্দ ছিল না। এই পথেই তাহার বাড়ী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনু পদক্ষেপ গণিতে লাগিল, তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, বাড়ী আর দশ পা দূরে—সে চোখ মেলিল, কি আশ্চর্য্য! এই তাহার বাড়ী। পতনোন্মুখ এই ছোট চালা তাহার? এত রাতেও তাহার বাড়ীতে আলো? বউ বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বউকে সে এইবার দেখিবে।

তিনু জানলার পাশে গেল, সামান্য ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতরে নজর করিল, একপাশে একটী কেরোসিনের কুপী আলো অপেক্ষা অধিক ধুম উদ্গীরণ করিতেছে, আর একপাশে তথ্‌তোপোষের উপর মলিন বিছানায় দুইটী নর-নারী শুইয়া আছে।

না—ইহা কথনই তাহার বাড়ী নয়! সে ভুল দেখিয়াছে,

অপর লোকের বাড়ীতে সে আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। সভয়ে সে জানালার পাশ হইতে সরিয়া গেল। কিন্তু এ কাহার বাড়ী! তাহার বাড়ীর আশপাশে ত' আর কাহারও বাড়ী নাই বলিয়াই সে জানিত। সে আবার চোখ বন্ধ করিল। দুই বাহু সামনে আগাইয়া দিয়া সে চলিতে সুরু করিল। এই যে বাঁশের খুঁটি, এই সেই জিউলি গাছ,—এই যে বাগানের আগড়। চুবড়ি তৈরী করিবার জন্য এই বাঁখারি চাঁচা পড়িয়া রহিয়াছে! হাঁ—রান্নাঘরের চালে হাওয়া লাগিয়া লাউমাচার উপর হাঁড়ি দিয়া বউ যে মানুষ বানাইয়াছে তাহা নড়িতেছে,—এ তাহারই বাড়ী।

এই সময়ে ঘরের ভিতরে কে যেন কাসিয়া উঠিল। তিনু চোখ মেলিয়া চারিদিক ভালো করিয়া দেখিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকের জাফ্‌রী দিয়া ঘরের ভিতরে চাহিল। দেখিল একটী মোটাসোটা স্ত্রীলোক বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার কেশবাস বিস্রস্ত, তেলের কুপীর পাশে গিয়া কি যেন শুনিবার জন্য সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, বড় বড় দুটী চোখ, একজোড়া পুরু ঠোঁট ঈষৎ উন্মুক্ত, মিশি মাখানো কালো কালো দাঁত দেখা যাইতেছে, কলিকাতায় দেখা সেই স্ত্রীলোকটির সহিত ইহার একতিল মাত্র সাদৃশ্য নাই। তাহার মুখে চোখে এক কুৎসিৎ ভঙ্গী। তেলের কুপীর পাশ হইতে সে সরিয়া দাঁড়াইল, বিছানা হইতে উঠিয়া সেই কালো লোকটী দড়ি হইতে একটা ফতুয়া লইয়া পরিতে লাগিল, কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাহার পুরু ঠোঁটের উপর আঙ্গুল চাপা দিয়া তাহাকে বোধ হয় চুপ করিতে ইসারা করিল।

তিনু চোখ বন্ধ করিয়া দরজার কাছে আগাইয়া গেল, দৃষ্টিহীনতা বিধাতার বিশেষ করুণা। অন্ধকারের আড়ালে কত কি ছিল, এক অসহ্য বেদনায় তাহার সারা দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এই তাহার ঘর তাহা সে জানে, ঘরণীকেও জানিত, কিন্তু ঘরের অধিবাসীরা তাহার কাছে আগন্তুক!

নিজের অজ্ঞাতে তিনু সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল! দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীলোকটী মুখ বাড়াইয়া কহিল—কে গা? হোথায় দাঁড়িয়ে কে?

সামান্য কয়েকটী কথা কিন্তু তাহাই তিনুর বুকে ভীষণ হইয়া বাজিল।

সে বলিল—হাঁ আমিই গো বউ।

—ওঃ কলকেতা থে কখন ফির্‌লে?

চশমা জোড়াটী তাড়াতাড়ি স্বামিজী-প্রদত্ত জামার পকেটে লুকাইয়া চোখ মুদিয়া তিনু বলিল—দরজা কই গো, খুঁজে পাচ্ছি না যে!

—কানা মিন্‌সেয় ঢঙ কতো? বলি খুব সময়ে ত' বাড়ী এলে, রাত কত হয়েচে খেয়াল আছে?

—কানা মান্‌সের আর রাত কি বউ? আমার কাছে সবটাই রাত।

দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া গেল, পথ অনুভব করিয়া তিনু ঘরে প্রবেশ করিল, তারপর চোখ মেলিয়া সেই মানুষটীকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিল—

একলা থাক্‌তে ভয় করে নি ত' বউ?

হৈম তাড়াতাড়ি সেই পুরুষটীকে আড়াল করিয়া কহিল—ভয় কর্‌বে কি, তোমার মতন পুরুষ মানুষ বাড়ী থাক্‌লেই বুঝি ভরসা!

সেই লোকটী পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া দেয়াল ধরিরা দরজার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

হৈম আবার ইসারা করিল।

তিনু বলিতে লাগিল—আমি ভাবছিনু তুমি বুঝি একা আছ, তা মতির মা থাক্‌বে বলেছিল যে।

—সে আজ আর আস্‌তে পারে নি।

—ওঃ সে আজ আস্‌তে পারেনি বুঝি।

হৈম গলার স্বর নরম করিয়া তিনুর হাত ধরিয়া বলিল চলো বসে একটু জিরোয়। খাওয়া দাওয়া হয়নি ত?

তিনুকে দরজার পাশ হইতে সরাইতে পারিলে সে বাঁচে। কিন্তু তিনু নড়িল না, হৈম তাহার নৈশ অতিথিকে আবার কটাক্ষ করিল।

সে আবার বলিল—বস্‌বে চলো না—থ্যাটারের গান শিখে এসেচো ত'?

—অনেক কিছু শিখেচি বউ, কোথায় মাছিটী পর্য্যন্ত বসে আছে বলে দিতে পারি, কার মুখে কি লেখা আছে তা-ও দেখ্‌তে শিখে এসেচি !

তিনুর হাত টানিয়া হৈম কহিল, এসো না, বাইরে যে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়্‌চে, বুঝ্‌তে পার্‌চো না !

—বৃষ্টি !—তা একটু না হয় ভিজলাম। কলকাতা বড় আজব সহর বউ, অনেক কিছুই শিখ্‌লাম, কিন্তু মানুষের গলার আওয়াজ না পেলে মানুষ চিন্‌তে ত' তারা শেখায় নি !

তাহার সারাদেহের রক্ত যেন মুখে আসিয়া জমা হইয়াছে।

হৈম রাগে জ্বলিয়া উঠিল—কহিল—ওঃ দোর বন্ধ করে দাও, রাতদুপুরে তাড়ি খেয়ে মাত্‌লামি করার আর জায়গা পেলে না, কানা মিন্‌সের গুণ কম নয় !

হৈম আবার তাহার হাত ধরিল, তিনু তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিল। বলিল—

—আমি সরে গিয়ে ওই শয়তানটার যাবার পথ করে দেব। তেমন মানুষ আমায় পাস্‌নি বউ ! আমার কথার জবাব দিয়ে তবে যেতে হবে ওকে।

ঘরটিতে মুহূর্ত্তের জন্য গভীর স্তব্ধতা—তারপর হৈম কম্পিত কণ্ঠে কহিল—ওঃ এই জন্যে বুঝি বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে—কেন মিছে মাথা গরম কর্‌চো ঘরে কেউ নেই গো তুমি ভুল বুঝেচ।

—সুমুন্দি আমার কথার জবাব দিক্‌। আগে জানি ও কে তারপর তোর কথার জবাব পাবি বউ।

আগন্তুক এতক্ষণ চেষ্টা করিয়া দরজার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, এখন তিনু ও দেয়ালের মাঝে একটু পথ করিয়া লইতে পারিলেই হয়, সহসা তিনু তাহাকে সবল বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল। সে উন্মত্তের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল—এইবার তোকে আমি ধরেচি। আমার কথার জবাব দিয়ে তবে তুই যাবি—শয়তানীর জায়গা পাওনি ! আজ তোকে খুন কর্‌বো—তিনু মাঝির রাগ জানো না, তোকে খুন করে তবে মর্‌বো !

ভয়ে হৈম অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

সবলে একটি হাত মুক্ত করিয়া, দেয়াল হইতে একটী পুরাতন হাল লইয়া তিনুর কপালে সজোরে মারিয়া আগন্তুক কহিল—খুন করা অতো সহজ নয় যাদু।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনু—ওঃ তুমি সরকার মশাই—বলিতে বলিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। রক্তে চারিদিক ভাসিয়া গেল।

সরকার অন্ধকারে ছুটিয়া পালাইল।

• •

কি যে হইয়া গেল হৈম প্রথমটা স্থির করিতে পারিল না, তাহার মনে হইল তিনু আর বাঁচিয়া নাই, সে গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল কিন্তু বাহিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া গেল।

তারপর সে কি ভাবিয়া দুইচারখানি কাপড়ের তাড়াতাড়ি এক পুঁটলী বাঁধিল, একটী বিস্কুটের টিন তাহার ভিতর সযত্নে রাখিল ; তাহার চেপ্টা নাকে রুপীর ভূষা লাগিয়াছে, মাথার চুলগুলি সাপের ফণার মতো উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সে বীভৎস মূর্ত্তি দেখিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে হয় !

সে একবার তিনুর সংজ্ঞাহীন মুখের পানে চাহিল, তারপর অস্ফুট শব্দ করিয়া অন্ধকারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

•

আষাঢ়ের আকাশে ঝড়-জলের প্রলয়-তাণ্ডব সুরু হয়।

নিস্তব্ধ তামসী নিশা বুঝি উদাসিনীর মতো রুদ্ধ বেদনায় কাঁদিয়া ওঠে !

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

কালিদাসের গল্প ঃ—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক এম-এ, বিরচিত, প্রবাসী প্রেস, ১২০৷২ অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৩৲।

এই বইখানি পড়ে আমরা বিশেষ প্রীত হ'য়েছি। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না কালিদাস-সাহিত্যের সহিত তাঁদের সামান্য একটু পরিচয় করে দেওয়াটাই বইখানির উদ্দেশ্য,—কালিদাস-সাহিত্যের রস উপভোগ করানো নয়। সেটা সংস্কৃত না জান্‌লে এবং কালিদাসের গ্রন্থগুলি না পড়লে সম্ভব হয় না। তবে এই বইখানি যাঁরা পড়বেন,—তাঁরা যে কোনো রসই পাবেন না,—শুধুই নীরস সাধনা দ্বারা কালিদাস-সাহিত্যের সামান্য একটু পরিচয় লাভ করবেন,—সে কথা ঠিক নয়। গল্পগুলি গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় খুবই সরস করে লেখা,—পড়ে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা কলেজে প্রবেশ করার আগে এই বইখানি পড়ে আনন্দও পাবেন, কালিদাসের গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভও করতে পারবেন।

বইখানির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কালিদাসের গল্প" বইটিতে ছবির সীমান্তরেখাটি দেখা দিয়েচে, রংগুলি বাদ পড়লো; যাই হোক পরিচয়ের সূচনা হোলো, সে কম কথা নয়।"

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার এবং বহু ত্রিবর্ণ চিত্রে অলঙ্কৃত সে পক্ষে তিন টাকা দামটা খুবই শস্তা।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

সনাতন হিন্দু (১ম ও ২য় খণ্ড)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ। প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ নং ২৩৫+৮৪। মূল্য ১৷০, পরিশিষ্ট ।৵০ আনা।

দেশবরেণ্য গ্রন্থকার চিন্তাশীল সুলেখক ও সুবক্তা। দেশের কে তাঁহাকে না জানে? অন্ধ শাস্ত্রানুশাসনরুদ্ধ হিন্দু-সমাজ যে পথে শনৈঃ আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হইতেছে, পূজ্যপাদ তর্কভূষণ মহাশয় সকলকে সতেজে স্পষ্ট ভাষায় সে পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে বহুদিন ধরিয়া অনুরোধ করিতেছেন ও বিভিন্ন স্থানের প্রাদেশিক হিন্দুসভা ও সম্মেলনে এ বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বাধীন মত নির্ভীক ভাবে ব্যক্তও করিয়াছেন। ঐ সকল বক্তৃতা ও তাঁহার মতের বিরোধী সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ও তাহার উত্তর এই পুস্তক দু'খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীনপন্থীদের উগ্র ও কটু আক্রমণ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই—বা তাঁহার উপর আরোপিত নানা প্রকার মিথ্যা অভিযোগেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই—পরন্তু যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, হিন্দু-সমাজের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন, সে পথে উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন।

কথা দাঁড়াইয়াছে শাস্ত্রের অনুশাসন লইয়া নহে, তাহাদের ব্যাপকতা লইয়া ও কোন্ অর্থ আমরা তাহাদের উপর আরোপ করিতে চাই তাহা লইয়া। তর্কভূষণ মহাশয় যে উদার দৃষ্টি লইয়া শাস্ত্র বিচার করিয়াছেন, আধুনিক যুগের গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোয় প্রাচীন পুঁথির বিস্মৃত অধ্যায়গুলি পাঠ করিয়াছেন, সে দৃষ্টি, সে জ্ঞান সহজলভ্য নহে। দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসরের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে যে নির্ম্মল দৃষ্টির প্রয়োজন হয়—তর্কভূষণ মহাশয় তাহা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারিয়াছেন—"আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়ই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য।"

আমরা বই দু'খানি পড়িয়া তাঁহার আন্তরিকতা ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি, হিন্দু সমাজের

এই দুর্দ্দিনে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলকেই আমরা বই দুখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

অপরাজিত—(১ম ও ২য় খণ্ড) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত—প্রকাশক—রঞ্জন প্রকাশালয়। ৫ সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার টাকা চার আনা।

"পথের পাঁচালীর" লেখক বিভূতিভূষণের পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। 'অপরাজিত' লিখে তিনি তাঁর সমস্ত দেশবাসীর হৃদয় জয় করে ফেলেছেন। 'পথের পাঁচালীর' মধ্যে 'অপুর' যে শিশু-মন প্রকৃতির মাঝখানে উন্মুক্ত ও বিকশিত হ'য়েছিল, যৌবনে কর্ম্ম-জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে সেই মনের পরিণতি 'অপরাজিতে'র মধ্যে অনুপম কৌশলের সঙ্গে দেখানো হ'য়েছে। 'অপুর' মত এমন একটা মনের পরিণতির যে ইতিহাস, 'তা' সত্য-সত্যই অপূর্ব্ব,—তার মধ্যে জগৎ ও জীবনের, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের, অনন্তকালের অনন্ত প্রাণ-প্রবাহের একটা নিবিড় ও সরস অনুভূতি পাঠকের প্রাণকে যেমন পুলক তেমনি বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে। এমন উপন্যাসের তুলনা বাংলা সাহিত্যে অতীব বিরল—অল্প পরিসরের মধ্যে তার কোনো পরিচয় দেওয়া বা সমালোচনা করাও সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে পৃথক প্রবন্ধে বিভূতি-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

৩। **কাঁটাফুল**—শাদাহাৎ হোসেন। প্রকাশক মুসলমান পাবলিশিং কোং লিঃ, ১১-৫ কড়েয়াবাজার রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১৫৪, কাপড়ে বাঁধা, দাম পাঁচ সিকা।

গল্পটা এই—খলিল ও রাবেয়া আবাল্য একসঙ্গে বাড়িয়া উভয়ের মধ্যে ভালবাসা হইল। খলিলের বাপ জমিদার, রাবেয়ার বাপ চাষা। অতএব বিবাহ হইল না, খলিল লেখাপড়া করিতে কলিকাতায় গেল। এদিকে লতিফ নামক আর একজনের সহিত রাবেয়ার বিবাহ হইল। এই খবর পাইয়া খলিল দেশত্যাগী হইল। ট্রেণে সতীশ বাবু নামক এক ভদ্র লোক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাকে এলাহাবাদে লইয়া গিয়া এক আশ্রমের ভার দিলেন। খলিলের বাপ ছেলের সেই মনো-বিকারের জন্য রাবেয়াদের দোষী সাব্যস্ত করিয়া জাল দলিল সৃষ্টি করিয়া রাবেয়ার বাপকে খুব অপদস্থ করিলেন। এই অপমানে রাবেয়ার বাপ মরিল এবং তারপর খলিলের বাপ অনুতপ্ত হইয়া মরিবার কালে রাবেয়াকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া গেলেন। রাবেয়া ও খলিলের সম্পর্কে নানারূপ মিথ্যা অপবাদ উঠায় লতিফ রাবেয়াকে তালাক দিল। ইহার পর দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় প্রজাদের বাঁচাইতে রাবেয়া নিজেই বাহির হইল। স্বেচ্ছাসেবকদের কাপ্তান হইয়া খলিল আসিয়াছিল। ঐখানে খলিল মারা গেল। মরিবার সময় রাবেয়াকে সে অনেক কথা বলিয়া গেল। লতিফ লুকাইয়া তাহাদের সব কথা শুনিয়া বুঝিল রাবেয়াকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু রাবেয়া লতিফের সহিত মিলিত হইতে আর রাজী হইল না।

লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, লিখিবার ক্ষমতা আছে। ঘটনা সংস্থান ও অনেক কেলে উপভোগ্য। তবে স্থানে স্থানে উদ্দেশ্যের (আভিজাত্যের দোষ দেখানো) প্রতি বেশি ঝোঁক দিতে গিয়া আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মুসলমান সমাজের একাধিক ব্যক্তি কবিতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাস বা ছোট গল্পে তেমন কাহারো নাম মনে পড়িতেছে না। আমরা লেখককে উচ্চতর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস করিতে সমাদরে আহ্বান করি।

শ্রীমনোজ বসু

৪। **আহরণী**—কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের রচিত কবিতাবলীর চয়ন-গ্রন্থ। সুন্দর সচিত্র বাঁধাই, ১২০ পৃষ্ঠা; দাম দুই টাকা। 'গুরুদাস লাইব্রেরি' প্রমুখ সকল প্রধান প্রধান পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী প্রতিভার প্রভাব ও প্রসাদপুষ্ট জীবিত বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে কালিদাস রায় মহাশয়ের স্থান প্রথম পংক্তিতে। ইহার অধিক বলিতে সাহস করিলাম না, কিন্তু বলিলেও উহা অন্যায় হইত না। কালিদাস বাবুর ৯।১০ খানি কবিতা পুস্তক আছে; তাহার অধিকাংশই

জনপ্রিয়তার নিদর্শন স্বরূপ বাঙ্গলা কবিতা-পুস্তকের ভাগ্যে যাহা দুর্লভ, সেই সংস্করণান্তর লাভ করিয়াছে। এই সকল কবিতার বই হইতে এবং মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত বহু অগ্রথিত কবিতার মধ্য হইতে রসচক্রের সদস্যেরা নিজেদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি ব্যয় করিয়া একখানি "আহরণী" গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন। এক সময়ে কেবল রবীন্দ্রনাথেরই "চয়নিকা" ছিল, এখন বহু খ্যাতনামা কবিরই একখানি করিয়া এইরূপ চয়ন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর নূতন সংস্করণের চয়নিকাখানি প্রণয়ন করিবার সময় সম্পাদকদের যাহা লক্ষ্য ছিল, আমার মনে হয় প্রত্যেক চয়ন-গ্রন্থ প্রণয়নের সময়ই ঐ লক্ষ্য থাকা উচিত। সেই লক্ষ্য এই যে, গ্রন্থটি এমনভাবে সংকলন করিতে হইবে যাহাতে উহা পাঠ করিলে কবির বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি একত্র পাওয়া যায় ও তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি নিখুঁৎ হয়। কালিদাস রায় মহাশয়ের মত জনপ্রিয় কবির যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কবিতা, অথবা বিশেষ সুন্দর সুন্দর রচনাগুলি ইহার মধ্যে একত্র না পাইয়া অনেক পাঠকই ক্ষুন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, তথাপি আহরণীর অধিকাংশ কবিতাই যে সুসংকলিত ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আমি তাঁহার বহু ভক্ত পাঠকদের মধ্যে একজন বলিয়াই এ সব কথা বলিলাম। সভ্য-সম্পাদক মহাশয়েরা পরিচায়িকায় একটা অস্পষ্ট কৈফিয়ৎ দিয়াছেন:—"নানা কারণে **কেবলমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ** কবিতাগুলিকেই একত্র চয়ন করার সুবিধা হইল না"। আমার মনে হয় ইহাতে কালিদাস বাবুর সকল পাঠক, সভ্যদের কার্য্যের প্রশংসা করিবেন না।

পুস্তকটি দ্বিখণ্ডিত। প্রথমার্দ্ধে 'ব্রজকথা' পর্য্যায়ভুক্ত কবিতাগুলি কালিদাস বাবুর 'ব্রজবেণু' নামক অপূর্ব্ব মধুর কবিতা-সমন্বিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ব্রজলীলা কথা আমাদের অনেকের বুকের ধন; কালিদাস রায় মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সারল্যময় সুললিত ছন্দে সেই ব্রজগোপালকে আমাদের বঙ্গ-আঙিনয়ে আনিয়া ধরিয়াছেন। শ্যামসুন্দরের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি পরিচয়, তাঁহার মান-অভিমান, লীলাবিলাস, মথুরা বৃন্দাবনের ইতিহাস, এমন সরস আন্তরিকতাময় ও আবেগপূর্ণ ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন যে কেবল 'ব্রজবেণু' গীতিকাব্যই তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। আহরণীতে সন্নিবিষ্ট 'সিন্ধুকূলে' 'বৃন্দাবন অন্ধকার' 'উভয় সঙ্কট' তাঁহার 'ব্রজবেণু' বহু সুন্দর কবিতার কয়েকটি। 'চিত্রকথা' পর্য্যায়ে কতকগুলি গাথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেগুলি কবিগুরুর গাথার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "লালাবাবুর দীক্ষা" গাথাটির ভঙ্গি যেমন সাবলীল, ছন্দও সেইরূপ মনোরম, বিষয়-বস্তুর ত কথাই নাই! "রঙ্গ ও ব্যঙ্গ" কবিতা সমষ্টি চমৎকার। বাঙ্গালীর জীবনে রস-কস কমিয়া গিয়াছে, হাসিখুসি তাহাদের স্বভাব-দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে; সাহিত্যেও তার প্রচুর পরিচয় বর্ত্তমান। রঙ্গ-সাহিত্য রচনা করারও ক্ষমতা থাকা চাই। কেবল কাতুকুতু দিয়া জোর করিয়া হাসানো উপভোগ্য হয় না। যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ অন্তরে পৌঁছিয়া, অন্তঃস্থল হইতে গাম্ভীর্য্যের জগদ্দলকে সরাইয়া হাস্য-স্রোত উৎসারিত করিয়া দেয় সেই রঙ্গ-রচনাই সার্থক। "গুরু চাই, গুরু চাই, কোথা গেলে গুরু পাই, গুরু বিনা ভেউ ভেউ কাঁদে সারা প্রাণটা"—অথবা "যাহা কিছু কামাই সবি চ্যারিটিতে যায়" সেই ধরণের রচনা।

রস-সৃষ্টির উপাদান অনেক কিছু হইতে পারে। রস-সৃষ্টির ভঙ্গিতে পার্থক্য না থাকিলে কবিতে কবিতে রসের উপাদান লইয়া পার্থক্য থাকিতে পারে। কালিদাসবাবুর রসোপকরণে বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। উদাহরণস্বরূপ "ভারত-ভারতী" কবিতাবলী। কবি, ভারতীয় সাধনা ও পুরাণেতিহাস লইয়া এইগুলি রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের প্রতি গভীর মমতাই কবিতাগুলির প্রেরণা। জবা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতীক-কুশ, অনুষ্ঠানমূলক হিন্দু-সংস্কারের,—এবং তুলসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেমধর্ম্মের প্রতীক। "সুরধুনী," "হিমাদ্রি" ও "সোম" পড়িলে কবির পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্রুতিসুখকর নির্দ্দোষ ছন্দে এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ কবিতা কেবল কালিদাস রায় মহাশয়ই লিখিয়াছেন। "কাব্যকণা" পর্য্যায়ের epigrammatic কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের "কণিকা" পুস্তকের অনুরূপ কবিতার সমকক্ষ।

আহরণী দ্বিতীয় খণ্ডের "পল্লীচিত্র" কবিতাগুলি কালিদাসবাবুর আর এক বিশেষত্ব। এই ধরণের কবিতা তাঁহার দরদী হৃদয়ের, খাঁটি পল্লী-অভিজ্ঞতার ও চিত্রাঙ্কণের নিখুঁৎ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। দরিদ্র পল্লীবাসীর হাসি-কান্নায় ভরা সরল জীবন-যাত্রা, তাহাদের সুখ-দুঃখের ছোট ছোট ঘটনা, পল্লীজননীর নিজস্ব সহজ সৌন্দর্য্যময় আবেষ্টনীর মধ্যে মনোরম রূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবি কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায় মহাশয়ের অসংখ্য কবিতায় বাঙ্গালীর এই অতি নিবিড় আদরের বস্তু রমণীয় কাব্যশ্রী মণ্ডিত হইয়াছে। এই দুই পল্লীকবির রচনা ভঙ্গি দুই রকমের। কুমুদরঞ্জনের পল্লীগীতিকা "উজানী"র মত সাবলীল ভঙ্গিতে মাধবী-মালতীর শীতল কুঞ্জছায়াতলে ছন্দহীন মধুছন্দা ধারায় প্রবাহিতা, আর কবি কালিদাস রায়ের পল্লীগীতি ছন্দোগৌরবে, রস-বৈভবে দুইতটে মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ, কেদার ঘাটের পুণ্যপীঠ সৃষ্টি করিয়া সুরধুনির মত আভিজাত্যের গৌরবে প্রবাহমানা। যে কবিপ্রতিভা, "সোম" অথবা "হিমাদ্রি" রচনাকালে গাম্ভীর্য্যময় বিরাট বিশাল চিত্র আঁকিয়া আমাদের মনকে ভারতের গৌরবময় অতীতের মহিমালোকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাই আবার এই সব পল্লীকবিতা রচনাকালে আমাদিগকে বর্ত্তমানের দৈনন্দিন সুখদুঃখের খুঁটিনাটির মধ্যে টানিয়া আনিয়া করুণার্দ্র করিয়া তোলে। ইহা কালিদাস রায় মহাশয়ের মত প্রবীণ প্রতিভা-ধন্য কবির পক্ষেই সম্ভব বলিয়া বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কারণ সত্যকারের কবি-প্রতিভাই ত এই। নতুবা কোনো এক শ্রেণীর মাঝামাঝি গোছের কতকগুলি কবিতা লিখিয়া যদি রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী পংক্তিতে স্থান পাওয়া যাইত তবে সে পংক্তিরেখা বিষুবরেখার মত পৃথিবী বেষ্টন করিয়া ফেলিত!

"আহরণী" পুস্তকটিতে পাঠক পঞ্চপুষ্পের ডালির মত একাধারে কবির কাব্য-মালঞ্চের নানাবিধ প্রস্ফুটিত প্রসূনের সাক্ষাৎ পাইবেন। এই সংগ্রহ পুস্তকের কবিতাগুলি বিভিন্ন রসাশ্রয়ী হওয়ায় এবং ইহার মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর রচনা থাকায় দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত হইলে অন্য বহুর প্রতি অবিচার হইবে,—এই ভয়ে কবিতাংশ তুলিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে বিরত হইলাম। প্রবন্ধও দীর্ঘায়তন হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মানস-নেত্রে সম্পাদক মহাশয়েরও ভ্রূকুটি দেখিতে পাইতেছি; কবিতা উদ্ধার না করার ইহাও একটা উপেক্ষণীয় কারণ নয়। সর্ব্বোপরি পুস্তকখানি দুইটি রজতমূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া উৎসুক পাঠক-পাঠিকা যুগপৎ কবির প্রতি সুবিচার এবং আমার কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিলে কাজটা সব চাইতে সুখের হইবে এবং আমি যে কবিতা উদ্ধার করিয়া দিতাম তাহাও ঐ সঙ্গেই পড়িতে পারিবেন বলিয়া এইখানেই বিদায় লইলাম।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

আধুনিকী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত; প্রকাশক মডার্ণ বুক্ এজেন্সি, ১০ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই বইখানি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধের একটি সংগ্রহ পুস্তক। কিন্তু তা'হলেও প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে অনৈক্য নেই। এই প্রবন্ধগুলিতে আধুনিক জগতের, বিশেষত' ইয়োরোপের, সাহিত্য ও সভ্যতার কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ ও তার ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে নানা দিক্ থেকে আলোচনা করা হয়েছে, অথচ সবগুলি প্রবন্ধেই একই মনন-শক্তি, একই বিশ্লেষণ-প্রণালী ও একই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। যাঁরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ-সাহিত্যের সংবাদ রাখেন তাঁরাই নলিনীবাবুর সুচিন্তিত রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত আছেন। নলিনীবাবুর চিন্তন ও রচনার বিশেষ ভঙ্গীটি এবং তাঁর চিন্তানুগামী ভাষার বৈশিষ্ট্যটিই তাঁর রচনার প্রতি পাঠকের মনকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। এই পুস্তকখানিতে আধুনিক সভ্যতার গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা তিনি করেছেন তাতে মনোযোগী পাঠক মাত্রেরই চিন্তাকে বিশেষ ভাবে উদ্রিক্ত করবে; আধুনিক সভ্যতার ধারা ও বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটবে। আমাদের সাহিত্যে এরূপ আলোচনা হবার বিশেষ সার্থকতা আছে, তা বলাই বাহুল্য।

এই পুস্তকখানিতে যে-সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সে-সমস্ত বিষয়ে স্বভাবতই মতভেদের যথেষ্ট অবসর

আছে। যে-কোনো আধুনিক চিন্তা ও কর্ম্ম সম্বন্ধে বহু লোকে বহু মত পোষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহ'লেও এসমস্ত বিষয়ে চিন্তাশীল লেখকদের মতের একটি বিশেষ মূল্য ও মর্য্যাদা থাকে, একথা স্বীকার করতেই হবে। আধুনিক জগতের চিন্তা ও কর্ম্মধারা সম্বন্ধে নলিনীবাবুর আলোচনাগুলিতেও ঐরূপ একটি স্বকীয়তা আছে; এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করার তাঁর একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে যার মর্য্যাদা কম নয়। কিন্তু তাহ'লে এই আলোচনা-গুলি প'ড়ে কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের মন অতৃপ্ত থেকে যায়; মনে হয় সিদ্ধান্তগুলি যেন ঠিক প্রমাণিত হ'লো না, সিদ্ধান্তগুলিকে আমাদের মনের নিকট স্বীকৃত করাবার জন্যে আরও প্রমাণ আরও তথ্য উপস্থাপিত করা উচিত ছিলো। অনেকগুলি সিদ্ধান্তকেই এরূপ তথ্য নিরপেক্ষ ব'লে অনুভব হ'লো; অপরপক্ষে যে-সব কথা বলা যায় সে-সব কথা যেন বলা হয় নি এম্‌নি একটা ভাব মনে জাগে। এখানে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করার স্থান আমাদের নেই; তা-ছাড়া পুস্তকখানির পূর্ণ সমালোচনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই নলিনীবাবুর কয়েকটি মাত্র সিদ্ধান্তের উল্লেখ ক'রেই আমরা নিরস্ত হবো।—"পশুর যে ভোগবাসনা, যে ইন্দ্রিয়পরতা তাহা দেহগত প্রয়োজনের সীমার মধ্যে পরিমিত। শরীর যতখানি চাহে এবং সহিতে পারে তাহার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা পশুর নাই। তাই পশুর ভোগজীবনে আছে একটা সামঞ্জস্য, একটা সহজ স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতা। মানুষের মধ্যে মন আসিয়া প্রাণের ও দেহের মধ্যে এই নৈসর্গিক সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়া দিতে সুরু করিয়াছে। * * * (মানুষ) ভুলিয়া গিয়াছে শরীরের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে প্রয়োজন তাহার পরিমাণের সহজ সীমার কথাটি" (পৃঃ ১৮-১৯)। বর্ত্তমানের যুগে দেখি আদিকালের সৌষ্ঠব পারিপাট্য হাস্যলাস্য আমাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে নাই; আমরা ভূগর্ভস্থ খনির মজুরের মত কয়লায় ময়লায় স্বেদে খেদে ক্লিন্ন খিন্ন হইয়া উঠিয়াছি। * * * একেবারে হালে সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা হইতে চলিয়াছে শূদ্রেরও শূদ্র যাহারা—চতুর্থ বর্ণ নয়, পঞ্চম বর্ণ বা অস্পৃশ্য যাহারা; আর নারীর মধ্যেও তাহারাই যেন তত প্রধান হইয়া উঠিতেছে যাহারা কুলশীল যত বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে" (পৃঃ ৫৬-৫৮)। "মেয়ে পুরুষ হইয়া উঠিতেছে অনুচিকীর্ষার ফলে আর জেদে পড়িয়া—কিন্তু এই অনুচিকীর্ষা ও জেদের আছে একটা ভিতরের গুপ্ত উৎস—তাহা এই পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা নূতন সম্বন্ধ অর্থাৎ পুরুষালী সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে—পুরুষ নারীকে আজ চাহিতেছে পুরুষালী ভাবে, নারী প্রতিদানে সেই ভাবেই আসিয়া দেখা দিতেছে। * * এই সংঘের বৈশিষ্টাই হইতেছে একটা তীব্র বিকৃত লালসা। * * নারী যে রূপান্তরিত হইয়া পুরুষত্ব লাভ করিতেছে তাহার গোড়ায় আছে এই নূতন রকমের প্রাণস্পন্দন, এই অভূতপূর্ব্ব ভোগৈষণা, এই উৎকট কামের সৃষ্টিআবেগ (পৃঃ ৭৬-৭৮)। প্রসঙ্গচ্যুত ক'রে এভাবে স্থানে স্থানে বাক্য উদ্ধৃত করলে অবশ্যই ভ্রম-উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে। তথাপি এই কথাগুলি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটুকু দেখানো যে এসব বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করা চলে এবং অনায়াসেই তার সমর্থক তথ্যও দেখানো যায়। পাঠক পুস্তকখানি পড়্‌লেই একথার যথার্থ্য উপলব্ধি করবেন এবং বিশেষ ভাবে উপকৃতও হবেন; কেননা বিভিন্ন মতের যোগেই আসল সত্য আবিষ্কৃত হয়।

পুস্তকখানি এণ্টিক কাগজে পাইকা টাইপে অতি সুষ্ঠুরূপে মুদ্রিত; মুদ্রাকারের প্রমাদ প্রায় নেই; বাঁধাই বেশ সুন্দর! এই পুস্তকখানির বিপুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন



বিবিধ সংগ্রহ

শ্রীচিত্র গুপ্ত

পিসার পতনোন্মুখ স্তম্ভ

মানুষের হাতের তৈরী যে সব আশ্চর্য্য জিনিষগুলি দীর্ঘকাল ধ'রে মানুষের মহিমা ঘোষণা ক'রে আস্‌ছে তাদের উপর আমাদের মোহ বড় কম নয়। এই বস্তুগুলি অতীত কালের মানুষের কলা কৌশল এবং শক্তি সামর্থ্যের সাক্ষ্য দেয় ব'লে মানুষ মাত্রেরই কাছে এগুলি পরম আদরের বস্তু, সুতরাং এগুলিকে দেখে আজকের যুগের লোকদেরও গৌরবের অন্ত নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কালের অপ্রতিহত প্রভাবে একে একে মানুষের এই অমূল্য সম্পদ গুলিও ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্চে। এমনি ক'রে আমরা রোড্‌স্‌ দ্বীপের বিখ্যাত পিতলের মূর্ত্তি, Colossus, থীব্‌স্‌ এর অনিন্দ্য-সুন্দর দেবমন্দির, ব্যাবিলনের অত্যাশ্চর্য্য ঝুলন-বাগান প্রভৃতি অনেকগুলি অতুলনীয় গৌরবের সামগ্রী চিরকালের মতন হারিয়েছি। আজ আমাদের কাছে বাকী আছে, শুধু তাদের নাম এবং বর্ণনাটুকু!...বাকী সমস্তই—কালের তিমির-গর্ভে সমাহিত!...

কিন্তু এখনো অনেকগুলি বস্তু কালের সুদীর্ঘ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে মানুষের অতীত গৌরবের পরিচয় হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তবে এদেরো আয়ু আর বেশী দিন নয়, আর কিছুদিনের মধ্যেই এমন একটা সময় আসবে যখন এগুলির অস্তিত্বও পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। তবে যদি এযুগের লোকে আবার নতুন চেষ্টা পরিশ্রম এবং কৃতিত্ব প্রয়োগ ক'রে তাদের কালের বিরুদ্ধে লড়বার মত কিছু নতুন শক্তি দান করে তা হ'লে এগুলি আবার কিছুদিন টিকে যেতে পারে।

সম্প্রতি ইটালীর অন্তর্গত পিসা নগরীর সুবিখ্যাত স্তম্ভটির ধ্বংস আশঙ্কা ক'রে নানা দেশের সুধী-সমাজে অত্যন্ত একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

আমেরিকার একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার লেফ্‌টন্যাণ্ট্‌ কলোনেল হাওয়েস্‌ (Lient. Col. W Gerald Howes) এই স্তম্ভটিকে খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বলেছেন যে যদি, বছর দু'য়েকের মধ্যে এটিকে রক্ষা করবার উপযুক্ত প্রতিবিধান না করা হয় তাহ'লে অচিরেই ৭০০ (সাতশো) বৎসরের প্রাচীন এই বিস্ময়কর বস্তুটি একদিন লক্ষ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে হুড় মুড়্‌ ক'রে মাটীতে ভেঙ্গে পড়্‌বে। এই মতটিও শুধু তাঁর নিজেরই মত নয়। তাঁর পূর্ব্বে পিসা নগরীর বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারেরা মিলে সারা জীবন ধ'রে এই বিখ্যাত স্তম্ভটীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা ক'রে যে মত প্রকাশ ক'রেছিলেন তিনি সেই মতের প্রতিধ্বনি ক'রেছেন মাত্র।

এই হেলানো স্তম্ভটি কেমন ক'রে তৈরী হয়েছিল সেকথা সকলেই জানেন। ভিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার মানসে পিসার প্রধান ব্যক্তিরা মিলে, শ্বেতপাথরের তৈরী এক অপরাজেয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন (১১৭৪ খৃঃ)। স্তম্ভটি খানিক গড়া হয়ে গেলে কিন্তু দেখা গেল যে, যে স্থানের ওপর সেটিকে গ'ড়ে তোলা হচ্ছিল সেখানকার মাটীর দোষে একদিকের ভিত্‌ খানিকটা ব'সে গেছে। তখন কিন্তু অনেক টাকা খরচ ক'রে প্রায় অর্দ্ধেকটা গড়া হ'য়ে গেছে, সুতরাং ভবিষ্যতে যাতে কোন ক্ষতি না হয় এ উদ্দেশ্যে সেই দিককার ভিতের তলায় মোটা মোটা কাঠের গজাল পুতে দিয়ে এবং হিসেব ক'রে দুদিককার ভারের একটা সামঞ্জস্য রেখে স্তম্ভটির বাকী অংশ টুকু গড়া শেষ করা হয় (১৩৫০ খৃঃ)। বলা বাহুল্য, তার ফলে থামটি একদিকে বেশ খানিকটা হেলে রইলো, কিন্তু তখন লোকে তাতে

আশঙ্কার বিশেষ কিছু দেখ্‌লে না। কিন্তু এমনি দুর্দ্দৈব যে কিছুকাল পরে দেখা গেল, স্তম্ভটিকে যে অবস্থায় গ'ড়ে তোলা হয়েছিল সেটি ঠিক সেই অবস্থাতেই রয়ে যায়নি, যত দিন যাচ্ছে, ততই খুব ধীরে ধীরে স্তম্ভটির সেইদিকের ভিতটার একইঞ্চিরও অতি সূক্ষ্মতম অংশ মাটীর মধ্যে ক্রমাগত বসে যাচ্ছে। ফলে সাতশো বৎসর ধ'রে সেটি অনেক খানি ব'সে গেছে। কিন্তু এতদিন গ'তে বিশেষ কিছু ক্ষতি ঘটেনি বরং স্তম্ভটির এই হেলানো অবস্থার জন্যেই এটি লোকের কাছে বিশেষভাবে বিচিত্র লেগে এসেচে।

কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। ক্রমাগত এইরকম ব'সে যেতে যেতে ক্রমে এই স্তম্ভটির এমন অবস্থা আস্‌বে যার থেকে আর এক চুল বেশী বস্‌লে এটির আর নিজের স্থিতিশীলতায় নির্ভর করে দাঁড়াবার শক্তি থাক্‌বে না, তখন এক নিমেষে মানুষের এতবড় কীর্ত্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

এর কারণ হচ্ছে এই যে, যে-ভারকেন্দ্রের ওপর এটির অবস্থান নির্ভর করছে, ভিতের ক্রমিক নিমজ্জনের ফলে, সেই ভারকেন্দ্রটি ভিতের আধার থেকে কেবলি স'রে স'রে আস্‌ছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সেটি ভিতের সীমার মধ্যে থাক্‌বে ততদিন কোন বিপদ ঘট্‌বে না, কিন্তু ঐ ভারকেন্দ্রটি যে মুহূর্ত্তে ভিতের থেকে চুল-পরিমাণও বেরিয়ে আস্‌বে সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বংসহা ধরিত্রীও ঐ চুলপরিমাণ সীমা-লঙ্ঘনের অপরাধে সরোষে তা'কে বুকের ওপর আছ্‌ড়ে ফেলে গুঁড়িয়ে দেবেন।

মধ্য-যুগের মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তী—এই বিরাট বস্তুটির সেই চরম দুর্দ্দিন অদূরে সমাগত দেখে আজ সকলেই একে এই অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন।

সুদীর্ঘকাল ধরে এই রকম একটা পতনোন্মুখ বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা ক'রে, যে বস্তুটি মানুষের সবিস্ময় মর্য্যাদার অর্ঘ্য লাভ ক'রে ধন্য হয়েছে,—পৃথিবীর নানা দেশের কোটী নরনারীর চরণের ঘর্ষণে যা'র সিঁড়িগুলি ক্ষয়ে ক্ষয়ে তীর্থ-রেণুতে পরিণত হয়েছে তা'র এই রকমের অকাল মৃত্যু যে অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হ'য়ে উঠ্‌বে তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু তা ছাড়া অন্য ক্ষতিও যা' হ'বে তাও বড় উপেক্ষণীয় নয়।—

জগতের বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ—পিসা নগরীর অসংখ্য দরিদ্রলোক গাইডের কাজ ক'রে এই স্তম্ভটির মাটীর প্রতিরূপ তৈরী ক'রে এবং পোষ্টকার্ড ছবি ভ্রমণকারীদের কাছে বিক্রী করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এটি ধ্বংস হয়ে গেলে তারা অনাহারে মারা যাবে তো বটেই তা ছাড়া ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে নানাভাবে প্রাপ্ত সমগ্র দেশের—একটি মোটা টাকার আয়ের পথও একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

এই সমস্ত নানাদিক বিবেচনা ক'রে এটিকে রক্ষা কর্ব্বার উদ্দেশ্যে বহু ইঞ্জিনীয়ার নানা রকম উপায়ের কথা বলেছেন। কেউ ব'লেছেন এটির তলায় সিমেণ্ট পাম্প করে ঢুকিয়ে দিয়ে এর তলাকার নরম মাটীকে শক্ত করে দেওয়া হোক, কেউ ব'লেছেন, এটিকে একটী ক্রেনে করে সবশুদ্ধ তুলে এনে অপর কোন দৃঢ়তর স্থানের উপর সুদৃঢ় ভিত্‌ স্থাপন ক'রে রক্ষা করা হোক্‌, ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত মতের কোনটাই কার্য্যকরী হবে না। এটিকে রক্ষা করবার যে উপায় সম্ভব এবং অবলম্বন-যোগ্য বলে জগতের সমস্ত বিশিষ্ট স্থপতিই মত প্রকাশ করেছেন সেটি হচ্ছে একখানি একখানি ক'রে এর প্রত্যেকটী পাথর খুলে এনে অপর কোন ভাল জায়গায় একে আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা।

ইটালিয়ান্‌ গভর্ণমেণ্ট্‌ কিন্তু এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রকাশ ক'রেছেন যে, যে-কোন প্রতিভাবান্‌ ইঞ্জিনীয়ার এই স্তম্ভটিকে স্থানান্তরিত না ক'রে যথাস্থানে রেখেই ওটিকে অকাল-ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার উপযুক্ত উপায় বলে দিতে পার্ব্বেন, তাঁকে পুরস্কার-স্বরূপ প্রভূত অর্থ দান করা হবে।

কুৎসিতের কাহিনী—

সম্প্রতি কোন বিলিতি কাগজে এক ভদ্রলোক তার যে দুঃখময় কাহিনীর বর্ণনা করেছেন তা' পড়লে বেশ বোঝা যায়

কুৎসিৎ চেহারা মানুষের কতখানি অভিশাপ। এই অভিশপ্তদের উপর বাস্তবিক সহানুভূতির উদ্রেক হয়। হৃদয়ের দিক দিয়ে ভদ্রলোকটি অতি মহৎ বলেই প্রসিদ্ধ অথচ তিনি বলেন —আমার মুখখানা এমনই কুৎসিৎ যে যখনই কোথাও যাই তখনই সেখানকার লোকে আমার চেহারা দেখে আমার ওপর রেগে যায় আর আমাকে অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক বলে সন্দেহ করে। এমন কি অনেকে বলাবলি করে "দেখ, দেখ লোকটার মুখ দেখ—হতভাগা নিশ্চয়ই গুণ্ডা কিম্বা খুনে ডাকাত হবে।" বেপাড়ার মধ্য দিয়ে যদি কখনো যাই তো লোকে আমাকে ইট্ মারে, এমন কি দোকানদাররাও আমাকে দেখ্‌লে দোকানের বেচাকেনা বন্ধ করে দেয়। একবার এক ষ্টেশনে আমি আমার লাগেজ নিতে গেছি; যে কেরাণী ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমার মাল বুঝে নেবার কথা, তাঁকে আমি আমার কথা বলবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর জিম্মায় যে সমস্ত মালপত্তর ছিলো সেগুলো সামলাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন, পাছে ডাকাতটা তাঁর কাছ থেকে কিছু কেড়ে কুড়ে নেয়। মনে মনে হাস্‌লুম—হায়রে এম্‌নি আমার অদৃষ্ট!

বড় রাস্তার ধারের বড় বড় দোকানগুলির বাইরের দিকে মূল্যবান্ যে সমস্ত লোভনীয় চিত্তাকর্ষক জিনিষ সাজানো থাকে সেগুলির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাক্‌বার লোভ খুব কম লোকেই সাম্‌লাতে পারেন। একবার আমার কি দুর্গ্রহ হোল আমিও সেই লোভ সামলাতে না পেরে কুক্ষণে এক জুয়েলারীর দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দোকানের এক কর্ম্মচারী অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে চাইতে এগিয়ে এলো, এবং তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চেয়ে সাম্‌নের শো-কেসের গয়নাপত্তরগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌লে সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু তবুও সে গালাগালি দিয়ে আমাকে সেখান থেকে হাঁকিয়ে দিলে। আহত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখ্‌লুম আমার আশ-পাশে দাঁড়িয়ে আর যারা দেখছিলো তাদের কিছুই বল্‌লে না, তারা তেমনি দেখ্‌তে লাগ্‌লো শুধু আমিই হ'লাম অপরাধী!...

নিদারুণ লজ্জা আর অপমানের তীব্র কশাঘাত লাভ ক'রে উদ্গত অশ্রুকে কোন মতে সংবরণ ক'রে আমি তাড়িত কুক্কুরের মত সেখান থেকে চলে এলাম। তাকে একটুও অভিশাপ দিলাম না, শুধু মনে মনে বল্‌লাম "তোমার তো কোন দোষ নেই—দোষ সবি আমার অদৃষ্টের! জানিনা কোন অজ্ঞাত অপরাধের শাস্তি দেবার জন্যে বিধাতা এই অভিশপ্ত জীবন আমায় দান করেছেন।" এমনই কদর্য্য আমার চেহারা যে কোনোদিন কোন দরদী মেয়ের হৃদয়ের সকরুণ সহানুভূতির স্পর্শে আমার জীবনের বেদনা দূরীভূত হবার আশা আমি কোন দিনই করিনা। যাই হোক জীবনে যা' পাইনি তা নিয়ে আমি আমার বিধাতার কাছে কোন নালিশ করতে চাইনা। আপাততঃ আমি ভাব্‌ছি যে তাঁর এই কঠোর দানকে আশ্রয় ক'রে হলিউডের বায়োস্কোপ ওয়ালাদের কাছ থেকে আমি আমার জীবিকার সংস্থান করতে চেষ্টা কর্‌বো। বিলেতের এল্‌ষ্ট্রীর কর্ত্তৃপক্ষরা তো আমার চেহারা সিনেমাতেও অচল ব'লে ভাগিয়ে দিয়েছেন।

কিছুদিন আগে মিঃ ফ্রিণ্ডার্স ষ্টোব ব'লে এঁরই অনুরূপ চেহারাসম্পন্ন এক ভদ্রলোক সেই কাগজে তাঁর আত্মকাহিনী প্রকাশ করেন। সে কাহিনীও এরই অনুরূপ। তাঁরও রাস্তায় বার হবার উপায় ছিলোনা, কারণ তাঁর চেহারা দেখ্‌লেই পুলিশ তাঁকে নিয়ে গিয়ে গারদে পুর্‌তো। তবে সেই ভদ্রলোককে এঁর চেয়ে কতকটা ভাগ্যবান্ বলা যেতে পারে, কারণ তিনি সম্প্রতি মিস্ জ্যানেট্ মস্ নাম্নী জনৈকা সুন্দরী মহিলাকে পত্নীরূপে লাভ করেছেন যার ফলে তাঁর অন্তর্বেদনা গভীর সহানুভূতির প্রলেপে কথঞ্চিৎ শান্ত হতে পারবে। এই মহিলাটি স্বেচ্ছায় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রে "কন্যা বরয়তি রূপম্" এই কবি-বাক্যের ব্যতিক্রম প্রমাণিত করেছেন। মিস্ জ্যানেট্ ব'লেছেন যে আমার স্বামীর বাহ্যরূপের অভাবটিই কেবল লোকের চোখে পড়ে কিন্তু তাঁর সুবর্ণমণ্ডিত অন্তরের গোপন মণিকোঠার সন্ধানটি যে আমি পেয়েছি তাই তো তাঁর বাইরের খোলসটা তাঁর কদর্য্যতা নিয়ে আমাকে একটুও পীড়া দিতে পার্‌লে না।

মরণের পার থেকে প্রত্যাবর্ত্তন

যুদ্ধে গিয়ে যারা সঙ্গীণ বা গোলাগুলির আঘাতে প্রাণ-ত্যাগ করে তারা মরণের ভীষণ যন্ত্রণা ততটা উপলব্ধি করতে পারেনা যতটা করে বন্দী সৈন্তেরা। যুদ্ধের বাজনার মধ্যে, সহস্র-লোকের মাতনের মধ্যে যে মরণোল্লাস জেগে ওঠে, তার মধ্যে মরণ যে কখন এসে কাকে বরণ ক'রে নিয়ে চলে যায় তা জানবার বা বোঝবার মত অনুভূতি যোদ্ধাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠে না; মৃত্যুকে বোঝবার অবকাশ যদি একবার তাদের মধ্যে জাগতো তা হ'লে শাণিত তরবারী শোণিত পানের জন্য কখনও ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌তে পারতো না; কামানের আওয়াজ যেত স্তব্ধ হ'য়ে, তার পরিবর্ত্তে চারিধারে ভেসে উঠ্‌তো সঙ্গীতের কলঝঙ্কারে, মহাশান্তির স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য। কিন্তু মরণ যাদের কাছ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চ'লে গেল, পরিশ্রান্ত হ'য়ে বন্ধুদের বিসর্জ্জন দিয়ে যারা ক্লান্তদেহে শ্লথচরণে ফিরে আসছে সেই সময় চারিধার থেকে সহস্র শত্রুর অনুচর যদি তাদের ঘিরে, বন্দী ক'রে, অজ্ঞাত যাত্রার জন্য পথ নির্দ্দেশ করতে থাকে তাদের তখনকার মানসিক অবস্থা কল্পনা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ঠিক এমনি এক বন্দীর করুণ মানসিক অবস্থার বিবৃতি প্রকাশ করেছেন মিঃ অলিভার বল্ড্‌উইন্‌। বন্দী তিনি স্বয়ং। কিভাবে তিনি মৃত্যুর পার থেকে ফিরে এসেছেন তার যে মনোহর বিবরণী তিনি দিয়েছেন তা যেমনি করুণ তেমনি চিত্ত-বিমুগ্ধকর। ১৯২০ সালে আর্ম্মেনিয়ানদের পক্ষাবলম্বী হ'য়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করেন। একদিন যুদ্ধের পর তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করবার সময় সহসা তিনি বন্দী হ'ন। তুরস্কের সেনানায়করা তাঁকে বন্দী ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করলে, বিচারে তিনি গুপ্তচর ব'লে সাব্যস্ত হলেন। গুপ্তচরের প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে দিন রাত্রি যে অবর্ণনীয় যাতনার কথা তিনি বর্ণনা ক'রেছেন তা' প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছাড়া মানুষের ধারণার অতীত। তিনি লিখছেন, 'যে কারাগারে আমি নিক্ষিপ্ত হ'লুম তার মধ্যে আমারই মত আরও দুটি হতভাগ্য ছিল। তারা আর্ম্মেনিয়ান। একজনের নাম কামাল আর একজনের নাম মাক্‌সুট্ (Maksout)। তিনমাস বন্দী অবস্থায় আমরা সেই জনহীন অন্ধকারাগারে কাটাচ্ছি, বাইরে একটু বেরুতে দেয় না, কারাকুঠরির সামনে ছোট্ট একটু রকের মত, তারই সীমানা পর্য্যন্ত আমাদের হুকুম; সারাদিন অনাহারের পর জানোয়ারেরও খাবার অযোগ্য দু'টুকরো পোড়া রুটি আমাদের খেতে দিত। সেইটুকু খেতে পেয়ে মনে হ'ত স্বর্গের অমৃতও বুঝি এত স্বাদু নয়। সৈনাধ্যক্ষরা মাঝে মাঝে দু'একটি কয়েদির ওপর অকথ্য অত্যাচার ক'রতো, দূর থেকে চোখের সামনে তাই দেখতুম, তারপর শুধু কান্না আর কান্না। রাতের অন্ধকারে তাও যেন ভয়ে থেমে যেত······ওদিকের বন্দীশালা থেকে মাঝে মাঝে শুধু কম্পিত আর্ত্তনাদ, এদিকের এই তিনটি প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রকে যেন দৈত্যের মত চেপে ধরতো, মনে হ'ত এবার বুঝি আমার পালা। ওঃ সে যে কী যন্ত্রণা তা কি ক'রে লিখে বোঝাবো। প্রতিদিন মৃত্যুর পদধ্বনি যেন একবার শোনা যায়, আবার মিলিয়ে যায়, এইভাবে মরণের দোলায় দোল খেতে খেতে শ্রান্ত হ'য়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তুম জানি না। সকাল হোত। আবার সেই প্রতিদিনকার একঘেয়ে নীরস দৃশ্য। চারিধারে পাষাণের দেওয়াল, বন্দীদের হত্যাশালা, ঘরের মধ্যে ভালো ক'রে সূর্য্যের আলো ঢোকে না, মাঝে মাঝে দুচার জায়গায় সূর্য্যের রশ্মি ফাঁক পেয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে। তাতে অন্ধকার আরও ভয়াবহ হ'য়ে উঠ্‌তো, মনে হোত যেন একটা ঘেয়ো কালো কুকুর গুঁড়ি মেরে শিকারের জন্যে অপেক্ষা ক'রছে। মাকড়সার জালে সারা ঘর ছেয়ে গেছে। একটি ক্যালেণ্ডার দেওয়ালে লাগানো ছিল, কয়লার টুক্‌রো দিয়ে তাতে প্রতিদিনের বিগত তারিখগুলোর ওপর দাগ দিয়ে যেতুম। ভাগ্যবশে একজোড়া তাস ছিল আমার পকেটে, সেই তাস পাশিয়ে কামাল, মাক্‌সুট্ আর আমি ভাগ্য পরীক্ষা করতুম। আশ্চর্য্য! বার বার নিশ্চিত মরণের চিহ্ন ব'লে যে তাসটিকেই আমরা নির্দ্দেশ করতুম, ঠিক সেইটিই মাক্‌সুটের ভাগ্যে উঠ্‌তো। একদিন রবিবার সকালে কারা-প্রহরী বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁকালে "ম্যাক্‌সুট্‌"!—ডাক শুনে ম্যাক্‌সুট্ চলে গেল, মুখখানা তার ভয়ে সাদা হ'য়ে গেছে। ডাকবার দশমিনিট

পরেই কামাল আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লো······বাইরে দুড়ুম ক'রে একটা শব্দ তারপর আবার সব নিস্তব্ধ······বুঝলুম শেষ হ'য়ে গেছে।

তার পরদিন কারা-প্রহরী জানিয়ে দিলে যে কাল কামালের প্রাণদণ্ড এবং তার পর দিন আমার। কামালের মুখ তখন শুকিয়ে গেছে, চোখে বিন্দুমাত্র জল নেই। বাইরের দিকে একবার সে চাইলে, পৃথিবীর দিকে সেই যেন শেষ করুণ চাওয়া। কুড়ি বছর মাত্র বয়েস, তরুণ জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা হতভাগ্য অকালেই বিসর্জ্জন দিয়ে চললো। তার মুখের দিকে আমি চাইতে পারলুম না, মুখ ফিরিয়ে নিলুম। কিন্তু হঠাৎ তারপর দিন আমার ডাক হোল। কুঠরি থেকে বেরুবার মুখে কামাল আমায় একবার জড়িয়ে ধর্‌লে, চোখ ফেটে তার রক্ত বেরুচ্ছে। বল্‌লে 'বন্ধু বিদায়!'——আমি চলে এলুম। কিন্তু আশ্চর্য্য আমায় তারা হত্যা করবার মোটেই আয়োজন করে নি। আমি যেতে বললে 'বন্দী তোমায় আজ মুক্তি দেওয়া হবে, তোমার পরিবর্ত্তে আমরা আমাদের একজন লোককে ফিরে পাচ্ছি,··· ···যাও! কথাটা বিশ্বাস হ'ল না। তবু চলে এলুম। বাইরে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে······কারার লোহার শিকগুলো ধ'রে কামাল। বিদায়ের শেষ দৃষ্টি! ঘাড় নেড়ে শেষ অভিবাদন জানিয়ে চ'লে এলুম। সন্ধ্যের অন্ধকারে যাত্রা সুরু হ'ল।

যখন দেশের সীমানায় এসে পৌচেছি, তখন দেখি ভোরের আলো তার করুণ করস্পর্শে আমায় আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে নেমে এসেছে!—

মরু অভিযান

এম্, গার্‌ডাইন্ রিচ নামে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রসেবী এবং অভিযানকারী কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সাহারা মরুভূমির অজ্ঞাত প্রদেশ দেখতে বেরিয়েছিলেন। রিচ সাহেব তার পূর্ব্বে গ্রাফ্ জেপ্‌লিন ক'রে আট্‌লান্টিক সমুদ্র পার হন। সারা জীবন অনেক অভিযান ক'রে তাঁর সাহসের মাত্রা এত বেড়ে গেল যে সাহারার দুরন্ত মরুভূমি মোটরে ক'রে পার হ'তে গিয়ে এখন যে তিনি কোথায় গিয়ে পড়েছেন তার কোন ঠিকানাই পাওয়া যাচ্ছে না। সবশুদ্ধ চারজনে মিলে তাঁরা সাহারা মরুভূমি পার হবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। দুখানি মোটরে বেতার প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহক-যন্ত্র তাঁরা সন্নিবিষ্ট করেন, উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সংবাদ ও জগতের সংবাদ আদান প্রদান করবেন। সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফলও হ'য়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু দিন হ'ল আর তাঁদের কোন সংবাদই পাওয়া যাচ্ছেনা। সাহারার ভীষণ উত্তাপে তাঁরা যে মারা পড়েছেন তা মনে হয়না। খুব সম্ভবতঃ দুর্দ্ধর্ষ বেদুইন জাত তাঁদের আটক ক'রেছে কিম্বা হত্যা ক'রেছে। স্থানীয় গভর্ণর তাঁদের যে সমস্ত প্রদেশে যেতে নিষেধ ক'রে ছিলেন হয়তো সেইখানে যাবার চেষ্টা করাতেই তাঁদের দারুণ বিপদে পড়তে হয়েছে। পথের এই বিপদের কথা তাঁরা যে জানতেন না তা' নয় কিন্তু তথাপি দুরন্ত কৌতূহলই বোধ হয় তাঁদের সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গেল। প্রত্যহ তাঁরা বেতার যোগে নিজেদের অবস্থানের কথা জানাতেন এবং পথের মাঝে যে নিদারুণ কষ্ট তাঁদের পেতে হয়েছে তার সকরুণ বর্ণনা প্রত্যহই তাঁদের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যেত। মরক্কোর ফরাসী শাসনকর্ত্তা তাঁদের বেতার-যোগে অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁরা আর বেশী অগ্রসর হবার চেষ্টা না করেন, কিন্তু তাঁরা সে অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে নিয়তই অজ্ঞাত প্রদেশের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। একদিন তাঁরা বললেন যে আমরা এখন অসহ্য উত্তাপ ভোগ ক'রছি, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে আসছে, আমাদের মোটরের হুড্ একটু একটু ক'রে কালচে হ'য়ে যাচ্ছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এখনও কোন দুর্দ্ধর্ষ বেদুইন দস্যুদলের সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। শোনা যায় তাঁরা নাকি প্ল্যাটিনাম্ সংগ্রহের আশায় এই প্রদেশে যাত্রা ক'রেছিলেন এবং তারই সন্ধানে এরূপ দুঃসাহকিতার পরিচয় প্রদান ক'রে চ'লেছিলেন। যাই হোক তাঁরা আরও এগিয়ে গিয়ে একটি নির্জ্জন দুর্গে উপস্থিত হন। সেখানে কয়েকজন সৈন্য পাহারা দেয়; তারা ফরাসীদের অধীনে কাজ করে। এদের অবস্থানের পর আর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের

বিষয় তাঁরা তবুও সেই দিকেই ছুটলেন। হঠাৎ একদিন তাঁরা খবর পাঠালেন যে আমরা এখন বিপদে প'ড়েছি। এতদূর এগিয়ে এসেছি যে অদূরে দস্যুদলের আড্ডা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে হয় আমাদের ফিরতে হয় নয় তাঁরা এসে পড়বার পূর্ব্বে দ্রুতবেগে মোটর চালিয়ে তাদের ভিতর দিয়েই চলে যেতে হয়। কি ক'রবো তাই ভাবছি। সকলের মত হ'য়েছে যে এতদূর যখন এসে পড়া গেছে তখন এগিয়ে যাওয়াই কর্ত্তব্য। উত্তরদিকে "রেগাম্" ব'লে একটি মরুউদ্যান আছে আমরা তারই অভিমুখে যাত্রা করলুম, পৌছে খবর দেব।" কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন খবরই এসে পৌছল না। সাহারার এই ভীষণ মরুভূমির মাঝে তাঁরা মৃত্যুকে বোধ হয় বরণ ক'রেছেন এই আশঙ্কাই সকলে ক'রছেন...অথচ কোন উপায় নেই তাদের বাঁচাবার। সম্ভবতঃ দস্যুদলের ছাউনি তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারেন নি এবং সেই নিষ্ঠুর বেদুইন ডাকাতরা তাঁদের গুপ্তচর ভেবে হত্যা ক'রেছে।

ভৌতিক কাহিনী

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে গত চৈত্র-সংখ্যা বিচিত্রার বিবিধ সংগ্রহে আমি "মৃতের চলাফেরা" নাম দিয়ে যে একটি সংবাদ প্রকাশ ক'রেছিলাম, তাতে আফ্রিকার "হাইতি" নামক স্থানের কতকগুলি ভূত নামাবার ওস্তাদ যে কি ভাবে কবর থেকে মৃত ব্যক্তিকে তুলে এনে তার দ্বারা বিবিধ কাজ করিয়ে নেয় তার বিবরণ ছিল।

সম্প্রতি আরও কতকগুলি বিচিত্র ভৌতিক কাহিনী সংগ্রহ করেছি তা' এখানে বিবৃত করছি :—

(ক) দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ের একটি লাইনে ভূত ঘোড়ায় চেপে চলাচল করে ব'লে স্থানীয় কুলীরা কিছুদিন হ'ল চাকরি ছেড়ে পালিয়েছে। তারা বলে যে, রাত দু'টোর সময় যখন ওখান দিয়ে একখানা ট্রেণ বেরিয়ে যায় তখন এক ঘোড়সওয়ার কালো আঙরাখায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে এক বিকট কালো ঘোড়ায় চেপে, খোলা তলোয়ার নিয়ে প্রত্যহ রাত্রেই তার পিছোনে পিছোনে ধাওয়া করে। এ দৃশ্য তারা বহুদিন লক্ষ্য ক'রে দেখেছে এবং ওখানকার বাবুদেরও দেখিয়েছে। অতএব এই ভৌতিক স্থানে তারা কাজ করতে প্রস্তুত নয় ব'লে সকলেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে।

(খ) পাদ্রীভূত বেরিনার্‌বোর্‌ ব'লে বিলেতের একটি গ্রামে পাদ্রীভূতদের আড্ডা হ'য়েছে। সাদা গাউন পরে দুটি মৃত পাদ্রী যমজ ভায়ের মত হাত ধরাধরি ক'রে মাঝে মাঝে দেখা দেন।

সেদিন ছিল খৃষ্টানদের উৎসব। হঠাৎ চার্চ্চের সামনে একটা সরু গলি দিয়ে তাঁরা গির্জ্জায় এসে উপস্থিত। তারপর গির্জ্জার মধ্যে ঢুকে তাঁরা অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। ওখানকার প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় প্রথমে ব্যাপারটা বাজে ব'লে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু পরে সাক্ষীর সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে তিনি আর বিশেষ কোন প্রতিবাদ ক'রতে পারলেন না। গ্রামেতে দু'চারটি মেয়ে আছে তারা সামান্য অধ্যাত্মশক্তি সম্পন্ন। তারা মৃত পাদ্রীদের ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেনি অথচ তাদের ধরণ ধারণ চেহারার বর্ণনা, রুচি প্রকৃতির কথা অতি সহজভাবেই ব'লে গেল। পাদ্রীরা স্বর্গে গিয়ে যে খুব নিরুপদ্রব ভাবে দিন কাটাচ্ছেন তাও তারা 'শক্তি'-বলে নাকি দেখতে পেয়েছে। তারা বলে চার্চ্চের পাশের রাস্তার ঐ গলিটার মধ্যে একটা গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তের ভিতর থেকে তাঁরা নাকি প্রথম বেরিয়ে এসেছিলেন এবং এইবারই যে প্রথম এলেন তা' নয় ইতিপূর্ব্বেও নাকি বছর দুয়েক পূর্ব্বে একবার মর্ত্ত্যবাসীকে চাক্ষুষ দেখা দিয়ে গেছেন। অবিশ্বাসী লোকেরা ব'লছেন তাঁরা যদি স্বর্গেই গেলেন তবে ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে না পড়ে মাটী ফুঁড়ে বেরুচ্ছেন কেন?

(গ) সমারসেট্‌এর মিসেস্ এইচ, উইল্‌সন্ ব'লে একটি মহিলা বল্‌ছেন—বছর দুই হোল আমার মা মারা গেছেন কিন্তু তবুও তাঁর দর্শন আমরা কয়েকবার পেয়েছি।

আমাদের পরিবারে তিনজন আত্মীয়ই যখন মোটর চাপা প'ড়ে মারা যান, তখন প্রত্যেকবারই আমার মা মৃত্যুর পরপারের রহস্যলোক থেকে আমাদের মর-জগতে

এসে আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন এবং আমাদের ঘনায়মান বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক ক'রে দিয়ে গেছেন।..... জানিনা, মৃত্যুর পরও তার অস্তিত্ব কেমনভাবে কোন্ অজানা রহস্যলোকে বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর হ'য়েছে, আর সেখান থেকে আমাদের ভবিষ্যতের অনাগত বিপদের সন্ধান কেমন ক'রে তিনি পান আর তার জন্যে স্নেহ-করুণ আশঙ্কাই বা তিনি বোধ করতে যান কেন? আর তার ফলে আমাদের কাছে এসে আমাদের সতর্ক ক'রে যানই বা কি ক'রে!......

তিনি বলেন—গত অক্টোবর মাসে আমার পিতা প্রথম, সতর্ক-বাণী পান, আর ঠিক তার পরদিনই তিনি একখানি টেলিগ্রাম পেলেন, তাতে লেখা যে আগের দিন সন্ধ্যাবেলা আমার জ্যাঠামশায় ব্রিষ্টলের কাছে মোটর চাপা প'ড়ে মারা গেছেন।

দ্বিতীয় বারের ঘটনাটি ঘটে মাস ছয়েক আগে।

নিশীথরাত্রে একদিন টেবিলের ধারে নিবিষ্টমনে ব'সে ব'সে আমি একখানি চিঠি লিখছি এমন সময় হঠাৎ অনুভব করলাম, যে ঠিক আমার পাশেই যেন কে দাঁড়িয়ে!

ভয়ে আঁৎকে উঠে কলম ছেড়ে আমি একেবারে উঠে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে কাঠ হ'য়ে দাঁড়ালুম। দেখ্লুম, একটা নিবিড়-কৃষ্ণ ছায়ামূর্ত্তি আমার ঘরের ঠিক্ মধ্যখানে ভেসে উঠ্‌লো! সেই মূর্ত্তিকে ঘিরে রয়েছে বাদল-দিনের বৃষ্টির ছাট্-লাগা—গ্যাসের অস্পষ্ট আলোর মত রহস্যময় এক অপূর্ব্ব আলোক রশ্মি! সেই আলোতে আমি বেশ স্পষ্ট দেখলুম যে সে মূর্ত্তি আমার মায়ের—ঘর নিস্তব্ধ!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তিনি ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"এমিলী খুড়ী"—তিনবার তিনি ঐ কথাটা উচ্চারণ কর্‌লেন। তারপরই সেই অলৌকিক মূর্ত্তি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আর ঠিক তারপর দিনই খবর পেলাম যে পূর্ব্বরাত্রে থিয়েটার থেকে ফের্‌বার সময় এমিলী খুড়ী মোটর লরী চাপা পড়ে মারা গেছেন।

আর শেষ রাত্রে মাত্র দু'সপ্তাহ আগে আমি আমার মাকে আবার দেখ্‌লুম। এবার এসে তিনি বল্‌লেন,—"কর্ত্তা! কর্ত্তা!"

আর তার পরের দিনে সকাল বেলাই আমি টেলিগ্রাম্ পেলুম যে বাবা-আমার আগের দিন মোটর চাপা প'ড়ে ইহলোক পরিত্যাগ ক'রেছেন।

(ঘ) এদিকে আমেরিকা থেকে শ্রীমতী উইল্‌ফ্রেড্ পো ২১০০ হাজার মাইল আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ী দিয়ে বিলেতে ভূত দেখতে গেছেন। সুবিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক এড্‌গার এলেন পোর তিনি খুব নিকট আত্মীয়া। তিনি বলেন—বিলেতের সাফোক্ প্রদেশে দু' একটি বাড়ীতে নাকি ভীষণ ভূতের উপদ্রব হয় শুনেছি। তা' আমার ইচ্ছা আমি একবার সেই জীবগুলিকে দর্শন করবো। বিলেতের প্রেততত্ত্ব-অনুসন্ধান-সমিতি বলেন যে সাফোকে একটি পুরোণো বহুকালের ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম্য উপাসনা-মন্দিরে সত্যি ভয়ানক প্রেত বাস করে। শ্রীমতীর ইচ্ছা তিনি নিজের চোখে তা দেখবেন। বহুকাল পূর্ব্বে ঐ চার্চ্চের একটি উপাসিকা, একটি কোচম্যানের প্রেমে পড়ে। ব্যাপারটা প্রকাশিত হ'লে কোচম্যানকে হত্যা করা হয় এবং উপাসিকাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়।

তারপর থেকে উৎপাত সুরু হয়। শ্রীমতী পো বলেন আমি স্বচক্ষে সেই সমস্ত ব্যাপার দেখতে চাই। আমার আত্মীয় এলেন পো যদিও ভূত বিশ্বাস করতেন কিন্তু আমি মোটে বিশ্বাস করিনা। আমি এটা বেশ বুঝেছি লোকের ভূত সম্বন্ধে একটা মিথ্যা কল্পনা আছে তা ছাড়া আর কিছু নয়। সমাধির ক্ষেত্রে গভীর নিশীথে আমি ভূতের দর্শন আশায় বিচরণ ক'রেছি, বহু দুর্গমস্থানে তাদের অপেক্ষা ক'রেছি, যেখানে ভূতের আড্ডা ব'লে লোকে দিনের বেলা ভয়ে মাড়ায়না আমি সেখানে গিয়ে পর্য্যন্ত দেখেছি কারুর দর্শন মেলেনি। সেইজন্যে ভূতের সম্বন্ধে লোকের সমস্ত ধারণা মিথ্যা বলে আমার ধারণা এবং সেইটে প্রমাণ করতেই আমি আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাফোকের ভৌতিক স্থান দেখতে এলাম। যদি নিজের চোখে কিছু দেখি বা অন্য কোন রকম বিশেষ প্রমাণ পাই তা হ'লেই আমার ধারণা আমি বদ্‌লাবো নতুবা নয়।

(ঙ) যাই হোক সম্প্রতি কিন্তু বিলেতের ন্যাশন্যাল লেবরেটরী অব সাইকিক্যাল্ রিসার্চ্চ (জাতীয় প্রেততত্ত্ব

সমিতি) ১৫০০০ পনেরো হাজার টাকা দিয়ে একটি লোককে নিয়ে আসছেন যিনি সকলকে নাকি প্রত্যক্ষভাবে ভূত দেখাতে পারেন। লোকটি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন। শোনা যায় ইনি একবার বহু লোকের সামনে আঠারোটি ভূতকে সশরীরে হাজির করেন। যাঁদের আত্মীয় মারা গেছেন তাঁদের কাছে সেই সমস্ত মূর্ত্তি এনে হাজির করার ফলে সকলেই ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।

স্বাস্থ্যের খাতিরে নগ্নতা

সূর্য্যের আলোক যে শরীরের পক্ষে কতখানি উপকারী সে কথা আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমতঃ শরীর রক্ষার পক্ষে ভাইটামিনের উপযোগিতা উপলব্ধি ক'রে অবধি সকলেই শরীরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। এবং যেদিন থেকে লোকে জেনেছে যে সূর্য্যালোকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন বর্ত্তমান, এবং বিশেষ ক'রে সূর্য্যালোক সেবন করে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন ডি সংগ্রহ করা যায়, এবং ভাইটামিনের অভাব দেহে রিকেট্স্ প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধির সৃষ্টি করে, সেই দিন থেকে, পূর্ব্বে যাঁরা সূর্য্যালোক সেবনের বিরোধী ছিলেন তাঁরাও ক্রমে সূর্য্যালোকের একান্ত ভক্ত হ'য়ে পড়ছেন। ফলে বর্ত্তমানে সূর্য্য-আলোক-রশ্মির সাহায্যে স্নান করার প্রচলন পাশ্চাত্য প্রদেশে খুব বেশী দেখা দিয়েছে। কৃত্রিমভাবে সূর্য্যরশ্মি সেবনের জন্যে নানা রকম যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে এবং তাঁর প্রচলনও খুব বেড়ে গেছে।

বিলেতে সূর্য্যরশ্মি সেবনের ভক্তরা সম্প্রতি একটি সমিতি স্থাপন করেছেন। লণ্ডন সহরের পশ্চিম প্রান্তে এই সমিতিটি স্থাপিত হয়েছে। হলের মধ্যে সমিতির সভ্যরা সমবেত হ'য়ে একত্রে কৃত্রিম সূর্য্যালোকের সাহায্যে নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করেন। এজন্যে অনেকগুলি 'আলট্রা ভায়োলেট' রশ্মি উৎপাদক বাতি সেই হলটার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সূর্য্যালোক সেবন করবার সময় কেউই দেহের কোন অংশেই কোনরূপ আবরণ রক্ষা করেন না। ঐ সমিতিতে স্ত্রী পুরুষ উভয়বিধ সভ্যই আছেন। সমিতির মহিলা ও পুরুষ সভ্যরা ইচ্ছা করলে একত্রেও স্নান কার্য্য সমাধা করতে পারেন যদিও মহিলা এবং পুরুষদের জন্যে পৃথক পৃথক স্নানের ব্যবস্থাও আছে। বহুশত ডাক্তার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সমাজের বহু গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তিও এই সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন।

বহু উৎসাহী সভ্য এখানে সূর্য্যালোক সেবন ছাড়া চিত্তবিনোদ করবার জন্য সামান্য রকম খেলাধূলোও করে থাকেন।

এই সমিতির নিয়ম কানুন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এই সমিতির মধ্যে বেশীর ভাগ স্বামী স্ত্রী এবং বাকদত্ত যুগলকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়।

পুরুষের নারীত্ব প্রাপ্তি

কিছুদিন আগে রয়টারের একটা খবরে ভারী একটি কৌতুকাবহ ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিলো, পাঠকরা সেটি প'ড়েছেন কিনা জানি না। খবরটি হ'চ্ছে এই যে আমাদের অমৃতসরে একটি ১৭ বছর বয়সের শিখ বালক হঠাৎ আশ্চর্য্য ভাবে একটি ১৭ বছরের বালিকাতে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যাপারটি খুব সহজ নয় কারণ তার এই পরিবর্ত্তন হচ্ছে সত্যিকার দেহগত পরিবর্ত্তন, এবং এর মধ্যে ফাঁকি কোথাও নেই। সে ছেলেটি (কিম্বা বর্ত্তমানে তাকে মেয়ে বলাই ভালো),—সে মেয়েটি এখনো খুব সম্ভবতঃ লাহোরের মেয়ো হসপিটালেই আছে।

ব্যাপারটি যে কারো কারো কাছে খুবই বিচিত্র ব'লে মনে হবে তা ঠিক, কিন্তু এই ধরণের ব্যাপার ইতর প্রাণীতে খুব বেশী পরিমাণেই দেখা যায় এবং কতকগুলি জীবের বিভিন্ন বয়েস হিসেবে দেহে এই ধরণের পরিবর্ত্তন খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

মানুষের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা যে বিরল নয় তাও অনেকেই জানেন। এই কিছুদিন পূর্ব্বেই খুব সম্ভব দৈনিক আনন্দ বাজারেই এর চেয়েও বিচিত্র এক কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিলো। সে মানুষটির দেহে আবার এই রকমের পরিবর্ত্তন নাকি উপর্য্যুপরি কয়েকবার ঘ'টেছিলো।

বিলেতেও কিছুদিন আগে মার্গারী (Margery)

ব'লে একটী ১৪ বছরের মেয়ে মরিশ (Maurice) ব'লে ছেলেতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে ব'লে জানা গেছলো। জন্মের সময় মেয়ে বলে তার জন্ম রেজেষ্ট্রী করা হয়েছিলো। কিন্তু এখন সে ছেলে। আগে তার মা বাপ তাকে গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিচ্ছিলেন তারপর হঠাৎ একদিন তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে তাকে চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সে আর মেয়ে নেই ছেলে হ'য়ে গেছে। তখন তার পিতা তাড়াতাড়ি তাকে আপিসের কাজকর্ম্ম শেখাতে আরম্ভ করলেন।

গত ডিসেম্বর মাসে ম্যাঞ্চেষ্টারেও ১৮ বছর বয়েসের একটি হাইস্কুলের মেয়ে ছেলেতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ব'লে শোনা গেছ্‌লো।

মেডিক্যাল রেকর্ডে মানুষের দৈহিক পরিবর্ত্তনের এই রকম অসংখ্য কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়।

অন্ধকার ভবিষ্যৎ

বেতার আবিষ্কৃত হ'বার পর নানা কারণে লোকের বাইরে বেরুনো অনেকাংশে ক'মে গেছে এবং অন্যান্য দিকদিয়েও মানুষের নানা সুবিধে হয়েছে। এই দেখে অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন, যে এখনও লোকের যেটুকুও বা বাইরে বেরুবার প্রয়োজন হয় এবং লোকের যে সমস্ত অসুবিধে এখনো কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে, টেলিভিসন (Telivision) বা বেতার দর্শন যন্ত্র সম্পূর্ণতা লাভ করবার পর সে সমস্ত আর কিছুই থাক্‌বে না। তখন লোকে পরম শান্তিতে ঘরে বসে থাক্‌বে, পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য রোগবালাই প্রভৃতি সমস্ত রকমের উপসর্গ নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে গিয়ে জগৎ একেবারে স্বর্গে পরিণত হ'বে।

কিন্তু শ্রীযুক্ত কম্পটন্ মেকেঞ্জী (Compton Makenzie) সেদিন গ্ল্যাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে (Glasgow University) এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সে অবস্থা এলে তা নাকি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হবে। কারণ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ ক'রেছেন যে তখন ললিতকলার ওপর থেকে মানুষের টানটা একদম চ'লে যা'বে লোকে পড়াশুনো ছেড়ে দেবে এবং এমন কি লোকের আর তার আত্মাকে পর্য্যন্ত 'নিজের' ব'লে অভিহিত করবার উপায় থাক্‌বে না।

সেদিন বৈজ্ঞানিক ব্রিটীশ রাসায়নিকদের সমিতিতে মিঃ রোড্‌স্‌ও (Mr. Henry T. F. Rhods) বলেছেন যে ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধলে সে যুদ্ধ কিন্তু ভয়াবহ হ'য়ে উঠ্‌বে কারণ বেতারের সাহায্যে তখন মানুষ নাকি ভীষণ (Death-ray) মরণ-রশ্মি ব্যবহার কর্ব্বে যা'র ফল মোটেই মানুষ-জাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে না। তা' ছাড়া তিনি এ আশঙ্কার কথাও বলেছেন যে ভবিষ্যতে যখন কৃষিকার্য্যের উন্নতি হবে তখন ১৪।১৫ ফিট উঁচু কুৎসিত গমের গাছ্‌গুলি দেশের প্রান্তরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে ভয়ানক ক্ষতি ক'রে দেবে সেটাও বড় কম ভাবনার কথা নয়।

যাই হোক বিলেতের বিশিষ্ট লোকদের এ সমস্ত কথাতেও টেলিভিসনের আবিষ্কর্ত্তারা কিন্তু বিশেষ বিচলিত হন নি।



শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের লোক-শিল্প প্রদর্শনী

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

মার্চ্চমাসের শেষভাগে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের গৃহে বাংলার লোক-শিল্পের একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। ঐ সব দুষ্প্রাপ্য ও ক্রমবিলীয়মান অমূল্য শিল্প-সম্পদের সংগ্রহ-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এক সপ্তাহ কাল উহা খোলা ছিল। দত্তমহাশয়ের সংগ্রহগুলি এবং তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতা বাংলার পল্লী-শ্রীর একটি গৌরবময় অপূর্ব্ব মনোহররূপ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।



হাতী ও সিংহ
কাঠ খোদাই—কার্ণিশের ব্র্যাকেট।
সিংহটি ক্ষুদ্রায়তন। শিল্পীর ঐটুকু মাত্র কাঠ ছিল। তাহাতেই সিংহের সমগ্রমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আয়তনের অনুপাত-রক্ষায় মনোযোগ দেওয়া শিল্পী প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই।

আমরা বাঙালী জাতি এ যাবৎ কেবলমাত্র আমাদের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লইয়া গর্ব্ব করিতাম। কিন্তু অন্যান্য ললিত-শিল্পেও যে আমাদের অনুরূপ অধিকার আছে লোক-শিল্প প্রদর্শনীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

প্রদর্শনীর সামগ্রীগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রাম্য পটুয়াদের আঁকা সুদীর্ঘ জড়ানো পট। এইরূপ প্রায় চল্লিশ খানি পট কক্ষ-গাত্রে লম্বিত ছিল। কোন কোনটি এক শ' দেড় শ' বছরের প্রাচীন, আবার কোনটি সবে সম্প্রতি আঁকানো হইয়াছে। এক একটা প্রায় কুড়ি হাত লম্বা। প্রদর্শনী-গৃহের যেটুকু উচ্চতা পটের ততটুকু মাত্র খোলা ছিল, অধিকাংশই বাধ্য হইয়া জড়াইয়া রাখিতে হইয়াছিল। এই জন্য দীর্ঘপটের সমগ্র সৌন্দর্য্য আরো যে কি অনুপম তাহা সকলের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হয় নাই।

এই সব পটভূমিতে পরপর বহুসংখ্যক ছবি আঁকাইয়া রামায়ণ ও নানা পুরাণোক্ত বিচিত্র কাহিনীগুলি পটুয়ারা জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। অনেকটা বায়স্কোপ ফিলমের মতো। পনের কুড়ি বছর আগেও লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঐ পট দেখাইয়া পটুয়ারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিত। পট দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার গান হয়—পটের ঘটনাবলী গান গাহিয়া উহারা লোকের মনে মুদ্রিত

করিয়া দেয়। রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, যমালয়ে পাপীর দণ্ড, ধার্ম্মিকের সুখসৌভাগ্য এবং আরও অনেক পৌরাণিক ও ঘরোয়া কাহিনী লইয়া পটুয়ারা যেমন ছবি আঁকিয়াছে তেমনি ছড়া বাঁধিয়াছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন-দিনে গ্রাম হইতে আনীত একজন পটুয়া শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর,



মনসা

প্রাচীন পটের একাংশ।

উদ্যত-ফণা নাগ-সংযুক্ত মনসাদেবীর এইরূপ বিস্তর ছবি পটুয়াদের পটে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে দত্ত মহাশয় অনুমান করেন "পাল-যুগের বিখ্যাত 'নাগপদ্ধতি' পন্থী চিত্রকর ধীমান ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ"।

দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সম্মুখে এইরূপ একটি দীর্ঘ ছড়া গাহিয়া পট দেখাইয়াছিল, উহা সকলে খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। ইহারা নিরক্ষর কিন্তু এমন স্বাভাবিক শক্তি ইহাদের আছে যাহাতে রামায়ণ পুরাণের গল্প গ্রামের কাহিনী ও প্রবাদ সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে কবিতায় রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছে। পটসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় এইরূপ বিস্তর কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন; তাহার কতক আমি দেখিয়াছি। ঐগুলির যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য আছে বলিয়া আমার বিবেচনা হয়।

এখন দেশের ভাব দ্রুত বদলাইয়া গিয়া পটুয়াদের ঐ পট ও গানের আর কোন আদর নাই। তাহারা আজকাল নিরন্ন হইয়া চিরদিনের শিল্প-ব্যবসা ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিতেছে। বাংলার বহুমূল্য আদিম চিত্রশিল্প এইরূপে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। দেশের ধনী ও শিক্ষিতগণের বিদেশী সভ্যতা-মুগ্ধ মনোবৃত্তির ফলেই এই দশা।

এই সব পট দু-দশ বছরের জিনিষ নয়। বাংলার নিজস্ব শিল্পধারা পুরুষানুক্রমে বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহাদের প্রাণ-সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। আজ যখন আমরা চিনিতে পারিলাম, ইহার উপর আমাদের মমতা হইবারই কথা। কিন্তু সেই মমতার বশে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে আধুনিক চিত্রশিল্পের কঠোর মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, এতদিনের অবজ্ঞাত এই সব পটের মূল্য উচ্চাঙ্গের চিত্রকলা হিসাবেও অপরিমেয়। বস্তুতঃ ইহাদের রচনা ভঙ্গী রেখা-অঙ্কন ও বর্ণবিন্যাস দেখিয়া কিছুতে বিশ্বাস হয় না যে নিরক্ষর গ্রাম্য লোকেরা ইহা আঁকিয়াছে।

পটের কোন ছবিতে পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) বালাই নাই। বাংলার যাত্রাগানে যেমন কোনদিন দৃশ্য-পটের আড়ম্বর ছিল না তেমনি পরিপ্রেক্ষিতহীন চিত্রকলা বাংলা-শিল্পের চিরদিনের আদর্শ। সহজভাবই সৌন্দর্য্যের আদর্শ, জগতের সব সুন্দর জিনিষই সহজ হইবে। বাইবেলও এই কথা বলেন।

শিল্পীকে বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটিতে মনোযোগ করিতে হইলে রূপসৃষ্টি গৌণ হইয়া পড়ে। প্রতীচ্য শিল্পে পরি-প্রেক্ষিত ও আলোছায়ার খেলায় এতকাল খুব ধুমধাম করিয়া এখন সে দেশের বিশিষ্ট শিল্পিগণ সরল সহজ

ছবি আঁকা ধরিতেছেন; যেমন থিয়েটারের দৃশ্যপটাদি ত্যাগ করিয়া আবার যাত্রার যুগে ফিরিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

রঙের ও রেখার স্বতঃস্ফূর্তি ও বলশালিতায় এই সব পট সহজে চিত্ত জয় করে। কোথাও ধোঁয়াটে ভাব কিছু নাই, রূপ কল্পনার কোন বাড়াবাড়ি নাই। একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এই ভাবটা বেশ ধরিতে পারা যায় যেন শিল্পী বাহিরের আড়ম্বর ছাড়িয়া ধ্যান-দৃষ্টিতে নিগূঢ় সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিতে সমস্ত শক্তি অর্পণ কিন্তু কিছুদিন আগেও গাছ গাছড়ার নিজেদের ঘরে তৈয়ারী রঙে তাহারা পট আঁকিত। মাত্র গুটিকতক প্রাথমিক রঙ—বর্ণ-মিশ্রণ অতিশয় সামান্য—কিন্তু সমাবেশের কৃতিত্বে এইগুলি এমন মনোহর হইয়া উঠিয়াছে যে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ইহাকে বলিয়াছেন Colour music (বর্ণ-সঙ্গীত)। সঙ্গীতই বটে! এই নিষ্কৃত্রিম বর্ণ-সঙ্গতিতে যে সহজ রূপ ফুটিয়াছে তাহাই পটের মনোহারিত্ব।

পটের বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ পৌরাণিক। তাহা হইলেও ছবির মধ্যে বাঙ্গালা পল্লীজীবনের সুপরিস্ফুট ছায়া পড়িয়াছে।



পাপ ও পুণ্য—কোনটা ভারী?
প্রাচীন পটের একাংশ।
বিলাসিনী ও তাঁর দাসীর সামনে বৈষ্ণব ওজন করিয়া বুঝাইতেছেন ভোগের চেয়ে ত্যাগের ফল অনেক ভারী।
ওদিকে রাজপুত্র গোয়ালিনীর সহিত রসালাপ জমাইয়াছেন। সামাজিক চিত্রের মধ্য দিয়া পুণ্যের জয়-কীর্ত্তন পটের মধ্যে এইরূপ অনেক থাকে।

করিয়াছেন। সমস্ত ভাবভঙ্গীর মধ্যে পবিত্র আধ্যাত্মিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পটের মধ্যে অনেকগুলি নগ্নচিত্র আছে কিন্তু রেখাঙ্কনের কৌশলে এবং বর্ণলেপের শুচিতায় সেগুলি মনে কিছুমাত্র বিকৃতভাব জাগায় না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আজকাল পটুয়ারা বাজারের রং ব্যবহার করিতেছে, ইহাতে চিত্রকরদের জীবন্ত মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্র ধুতি পরিয়া কোচা ঝুলাইয়া দিব্য বাঙালী বাবু সাজিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়া আনিতেছেন, উঠানে কলাগাছ পুঁতিয়া সীতার বিবাহ হইতেছে, অযোধ্যায় রাজ-প্রাসাদের সামনে দারোয়ান বুট:জুতা পরিয়া পট্টি বাঁধিয়া বন্দুক কাঁধে পাহারা দিতেছে…। এই শিল্প ধারা যে এখনও

সম্পূর্ণ জীবন্ত অর্থাৎ আধুনিক পটুয়ারা কেবলমাত্র গতানুগতিকরূপে পূর্ব্ব পুরুষদের ছবির অনুকৃতি সাজাইয়া আসিতেছে না এই ধরণের ছবিই তাহার পরিচয়। তাহারা দু চোখে যাহা দেখে তাহাই ছবির মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। নিরক্ষর বলিয়া রামায়ণী যুগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ছবি আঁকিতে বুঝে না, কিন্তু তাহাদের সজীব চিত্ত যে পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে সাড়া দিতেছে আধুনিক পটে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল। বিষয়-বস্তু এবং বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদেরও অনেক সাধনা সাপেক্ষ। গাছ পালা ও প্রাণী আঁকিবার ক্ষমতা ইহাদের বিস্ময়কর। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আঁকা এইরূপ অনেক রেখাচিত্র (বর্ণযুক্ত ও বর্ণহীন) প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল। স্টেলা ক্রামরিচ্ প্রমুখ শিল্পবিদ্‌গণ তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অজন্তা প্রমুখ ভারতীয় প্রাচীন শিল্প ধারারও কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। অজন্তা পরম সুন্দর, আজ উহা নিখিল বিশ্বের শ্রদ্ধা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, দেশ-বিদেশের শিল্পীদের অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, বৌদ্ধ প্রভাবের মধ্যে সেই শিল্পধারার যে রূপ অজন্তার কক্ষগাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল সেইখানে সে অচল হইয়া আছে—কালের গতির সহিত কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। আজিকার দিনে এই নূতন আবেষ্টনীতে অজন্তা চিত্রের কি রূপ দাঁড়াইত তাহাও কেবল কল্পনা করা ছাড়া পথ নাই, কারণ অজন্তার শিল্পধার কোথাও যে পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহার



শ্রীকৃষ্ণের গো-দোহন
প্রাচীন পটের একাংশ।
ওদিকে মা যশোদা। একজন গোপবালক বাছুর ধরিয়াছে, আর দুইজনে গাভী। বিভিন্ন ধরণের চারিটি গাছ, এই গাছগুলি আধুনিক উৎকৃষ্ট ছবির সমকক্ষ। প্রাণী ও গাছপালা আঁকিতে পটুয়াদের যে কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা তাহা এই ছবি হইতে বোঝা যায়।

সন্ধান আমরা পাইতেছি না। কিন্তু বাংলার পট বয়সে বহু বহু প্রাচীন হইলেও আজও জীবন্ত রহিয়াছে। আজও শতবিধ অসম্মান ও অনাদরের মধ্যে বাংলার পটুয়া পট আঁকে। প্রদর্শনীতে যে সকল বিচিত্র চিত্র-পটের অঙ্কনরক্ত পটুয়ার অঙ্কন কৌশল দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহার মধ্যে একখানি ছিল যতীন পটুয়ার আঁকা। সেই যতীন আজও বাঁচিয়া আছে। যতীন নিজ হাতে সেই পট

অঙ্কন রীতির মূলধারা পূর্ব্বানুরূপ আছে, উহা থাকিবেই—উহাই হইল বাংলার নিজস্ব অঙ্কন-পদ্ধতি। মূল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি ভাবে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা যায় দত্ত মহাশয়ের প্রদর্শনীতে বিভিন্ন সময়ের অঙ্কিত পটগুলি দেখিয়া তাহার স্পষ্ট ধারণা হইল।

মাত্র দুই এক মিনিটের মধ্যে দু চারিটি রেখার টানে অতি সহজে পটুয়ারা ছবি আঁকিতে অভ্যস্ত যাহা শিল্প

আঁকিয়াছে বটে, কিন্তু পদ্ধতি শত শত বৎসর পূর্ব্বেকার। নহিলে এমন রূপ-কল্পনা যতীন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও বাহির করিতে পারিত না। প্রাচীন ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও দিনে দিনে এই পট-শিল্পের রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বাংলা চিত্র শিল্পের ইহা আর একটি বিশেষত্ব।

বিশিষ্ট স্থান পাইবার অধিকারী দত্ত মহাশয় তাহা প্রমাণ করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

পট ছাড়া প্রদর্শনীতে বাংলার যে দারু-শিল্পের নমুনা রাখা হইয়াছিল, সেগুলিও অতি অপূর্ব্ব। এই সব কাঠ খোদাই দত্ত মহাশয় প্রধানতঃ বীরভূম জেলার নানা গ্রাম



অঙ্কন-রত পটুয়া

বাংলার অবজ্ঞাত যে শিল্প ধারার সহিত শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় আমাদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ জীবন্ত। এখনও গ্রামে গ্রামে পটুয়ারা ছবি আঁকিয়া থাকে। এইরূপ ছবি আঁকিবার সময় দত্ত মহাশয় এই ফটোগ্রাফ তুলিয়া লন।

শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বাংলার শিল্পীদের আহ্বান করিতেছেন, এই সব পটুয়াদের নিকট শিল্প-ধর্ম্মের মূল প্রেরণা গ্রহণ করিতে—দেশ-বিদেশে ভিক্ষাবৃত্তি করিবার আগে নিজের ঘরের মাণিকটি আঁচলে বাঁধিয়া লইতে। নিখিল পৃথিবীর কলামন্দিরে বাংলার অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত শিল্প-ধারা যে

হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কাজেই শিল্প চাতুর্য্যের অপরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের দেশের খোঁজ না রাখিয়া কাঠের কাজের জন্য আমরা চীনা' বাড়ী দৌড়িয়া থাকি। এখনও গ্রাম্য সূত্রধরেরা যে এইরূপ চমৎকার কাজ করিয়া থাকে তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটী সম্প্রতি আরব্ধ

অসমাপ্ত কাঠ খোদাই দেখানো হইয়াছিল। এই সব দারুশিল্প অনাবশ্যক বিলাসের উপকরণ নহে। কোনটি কার্ণিশের ব্রাকেট, কোনটি চালার বরগা, কোনটি চৌকাঠের পাট, আবার কোনটি বা দরজার কবাট। সাধারণ নিরলঙ্কার একখণ্ড কাঠ দিয়াও কাজ চলিতে পারিত, কিন্তু



অপ্সরা
কাঠ খোদাই কার্ণিশের ব্রাকেট।

বাংলার জাতীয় জীবনে যে সহজ সৌন্দর্য্য-নিষ্ঠা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে তাহারই প্রেরণায় ইহাদের সৃষ্টি। Havel বলেন Fitness is beauty—কোন শিল্প-বস্তু যদি ব্যবহারিক জীবনে যথার্থ প্রয়োজনে লাগানো যায় তাহার সত্যকার সৌন্দর্য্য সেইখানেই। এই হিসাবে দত্ত মহাশয়ের দারুশিল্প সংগ্রহে বাংলা-শিল্পের একটা নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া গেল।

এ সব ছাড়া প্রদর্শনীতে সাঁওতালদের রচিত দীর্ঘপট, পল্লী মেয়েদের আঁকা প্রাচীর চিত্রের প্রতিলিপি, পুঁথির পাট, নক্‌সী কাঁথা, পিত্তল ও তামার কাজ, ধাতু ও প্রস্তর মূর্ত্তি, কাঠের ও মাটির পুতুল, ইটের নক্সা, দত্ত মহাশয়ের আবিষ্কৃত নানাবিধ লোক-নৃত্যের ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য পল্লী-শিল্পের বিস্তর নমুনা ছিল। স্থানাভাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল না। এই সমস্ত অবজ্ঞাত পল্লী- সম্পদের আবিষ্কার ও পুনঃ প্রচার করিয়া দত্ত মহাশয় সমগ্র বাংলা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমনোজ বসু

নানা কথা

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখে বাঙলা দেশের যে মহা শুভদিন সূচিত হয়েছিল বিগত ২৫শে বৈশাখ তার একসপ্ততিতম বর্ষ আরম্ভ হ'ল। এবারকার জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ পারস্যরাজের মহামান্য অতিথিরূপে ইরাণ দেশের রাজধানীতে অবস্থান করছেন। যেখানেই তিনি থাকুন, তাঁর স্বদেশবাসীর নীরব ভক্তি-অর্ঘ্য তাঁর কাছে পৌছেচে।

অনেকের মতে ইরাণই আর্য্যদের আদি বাস-স্থান ছিল। আর্য্যদের আদিম বাসস্থানে উপনীত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ যদি ইরাণ ও ভারতকে আত্মীয়তা ও সখ্যের বন্ধনে বেঁধে দিতে পারেন তা হ'লে তাঁর এবারকার জন্মদিনটি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে। কবি-শক্তির অপরিমেয়তা ইতিহাসের একটি পাতা উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌বে।

রবীন্দ্রনাথ সত্যসত্যই যে সে-রকম শক্তি ধারণ করেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন Stockholm-এর Swedish Academy রবীন্দ্রনাথের এবারকার জন্মদিনে অভিনন্দন পাঠিয়ে। তাঁরা বলেছেন, "The Swedish Academy sends her homage to India's great poet, the noble representative of all the world's ideal forces and wishes."

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের কবির সুদীর্ঘ জীবন এবং স্বাস্থ্য কামনা করি।

* * * *

প্রফুল্ল জয়ন্তী

আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতায় একটি উৎসবের আয়োজন হ'চ্চে। ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে আচার্য্যদেবের সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান আগেই হ'য়ে গিয়েছে; আমরা আশা করি, কলিকাতার অনুষ্ঠানটিও এমনতর হ'বে, যার মধ্যে আচার্য্য-দেবের প্রতি দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধার একটা যথোপযুক্ত প্রকাশ থাকে, এবং যার মধ্যে আচার্য্যদেবের আজীবন সাধনার ও আদর্শের একটা যথা-সম্ভব সুপরিস্ফুট আভাস থাকে। এই উপলক্ষে আমরা প্রফুল্লচন্দ্রকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জানাচ্চি।

দেশের যাঁরা মনীষি ও কৃতী সন্তান, যাঁদের নিকট দেশ প্রভূত ভাবে ঋণী, তাঁদের জন্মোৎসব উপলক্ষে এই সব অনুষ্ঠানগুলির অথবা যে-কোনো একটা উপলক্ষ ধরে তাঁদের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা-নিবেদনের যে একটা বড়ো সার্থকতা আছে, সে কথা আমরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রসঙ্গে বলেছি। মহাপুরুষদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়ার মধ্যেই এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সার্থকতা সীমাবদ্ধ নয়; তার চেয়ে বড়ো লাভ এই যে এর মধ্য দিয়ে দেশের একটা নিবিড়তর আত্মোপলব্ধির সুযোগ হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখনকার বাংলা দেশ আর এখনকার বাংলা দেশ ঠিক এক নয়। যে পরিবর্ত্তনটা ঘটেছে,—তার মধ্যে আচার্য্যদেবের অনেকখানি তপস্যা আছে। তাঁর একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধনার ফলে আজ বাংলাদেশে একটা রাসায়নিক সঙ্ঘ (School of Chemistry) গ'ড়ে উঠেছে, তার জন্য বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের মান বেড়েছে। আজকাল বাংলার তরুণদের মধ্যে যে-একনিষ্ঠ সাধনার অধ্যবসায়, যে-অক্লান্ত কর্ম্মের উৎসাহ, যে-নিঃস্বার্থ ত্যাগের অনুপ্রেরণা দেখা যায়, তার অনেকখানির উৎস এই সপ্ততিবর্ষ-বয়স্ক চির-তরুণ আচার্য্যের মধ্যে। শুধুই জ্ঞানের সাধনায় নয়,—জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মের সাধনাতেও—দেশীয় ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি-সাধনে, জাতির অর্থকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থায়, দুর্ভিক্ষ-বন্যা-প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় প্রপীড়িত নরনারীর সাহায্যের আয়োজনে, জাতির মুক্তি-সংগ্রামে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার প্রাণশক্তিকে যে প্রচণ্ড ঠেলা দিয়েছেন, সেজন্য আজ তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি।

পারস্যে রবীন্দ্রনাথ

"লিবার্টি"র মারফৎ পারস্যদেশে রবীন্দ্রনাথের আমরা যে-সংবাদ পাচ্ছি, সেজন্য লিবার্টির কর্ত্তৃপক্ষ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছেন। সম্প্রতি উক্ত দৈনিক পত্রে শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হ'য়েছে, তা-থেকে জানা গেল যে ভারতের কবিকে সম্মান-প্রদর্শন ও যথোপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য পারস্য গবর্ণমেণ্ট বিপুল আয়োজন করেছেন। সেই আয়োজনে শুধুই যে বিপুলতা আছে, জাঁক-জমক আছে,—ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি আছে,—তা নয়,—তার মধ্যে সব-চেয়ে মূল্যবান্ ও সব চেয়ে বড়ো জিনিস যা' আছে,—তা' হ'চ্চে আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতা আমাদের কবিকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে; আর কবির অন্তরের সেই গভীর অনুভূতিকে আশ্রয় করে আজ পারস্য-দেশ ও ভারতবর্ষ পরস্পরের নিকট সংস্পর্শে এসেছে। আমরা আশা করি, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ইমারতে এইখানে একটা পাকা গাঁথুনী পড়ল।

বুসাইরের গবর্ণর কবির সম্বর্দ্ধনা-ভোজের অন্তে বলেছিলেন—"জনাব্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্যাকাশের উজ্জ্বলতম তারা; তাঁর মনীষার দীপ্তি শুধু এশিয়া মহাদেশকে নয়, সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করেছে। আজ যে তিনি পারস্যদেশে পদার্পণ করেছেন, এতে তিনি আমাদের দেশকে গৌরবদান করেছেন।

"পুরাকালে ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশ পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল; ধর্ম্ম, শিল্প এবং আরো অনেক উপায় আশ্রয় ক'রে তারা পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই নিবিড় আত্মীয়তায় দুটি দেশেরই প্রচুর লাভ; সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রকৃষ্ট উপায় হ'চ্চে এই মহাপুরুষের আমাদের দেশে পদার্পণ। আজ তাঁর আগমনে সমস্ত ইরাণ দেশে একটা সাড়া পড়ে গেছে; আমরা সকলেই একান্ত কামনা করি, তাঁর এই ভ্রমণে যেন তিনি আনন্দ লাভ করেন, আমাদের মধ্যে যা' কিছু সত্য, যা'কিছু ভালো আছে,—আমাদের দেশে ভ্রমণ ও অবস্থান কালে যেন তাই দিয়ে আমরা তাঁকে খুসী করতে পারি।"

প্রত্যুত্তরে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় কবি

বলেন—"চিন্তা-সমৃদ্ধ এই প্রাচীন দেশের প্রতি আমি চিরকালই অন্তরে একটা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি : এই দেশ দেখা এবং এই দেশের অধিবাসীদের পরিচয় লাভ করাটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল। বাংলাদেশের কবি আমি, আজ ইরাণদেশে এসেছি,—প্রাণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে। দুঃখ এই, আমার এই বৃদ্ধ বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আমি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারব না,—প্রাণভরে এখানকার জীবনযাত্রার নিকট সংস্পর্শে আসতে পারব না। তবুও এটা বলতে পারি,—যে এখান থেকে আমি প্রচুর অনুপ্রেরণা ও শাশ্বত মূল্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরব।"

ইস্পাহানের একজন কৃতী অধিবাসী শ্রীযুক্ত জামসেদ্ সিরাজি কবিকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার প্রেরণ করেছিলেন :—"হে প্রিয়তম জগদ্‌গুরু! আমি একজন পারস্যের অধিবাসী। আপনার আত্মার অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে যে মণি-মুক্তাগুলি,—তার অনেকগুলি আমি পেয়েছি,—এবং তা' দিয়ে নিজেকে প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ করে তুলেছি। আমি আজ আপনাকে আমাদের দেশে সাদরে অভ্যর্থনা করছি। আশা করি এখানে অবস্থান কালে আপনি আনন্দ পাবেন, এবং তার ফলে আপনার করুণাময় মানব-হৃদয়ে এখনো যে অজস্র মুক্তা লুকানো আছে,—তার মধ্যে আরো কয়েকগুলো বেরিয়ে আসবে।"

আগামী মাসে ইরাণদেশে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার আরো বিবরণ আমরা প্রকাশ করব।

নববর্ষের লিপি

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও তাঁহাদের প্রকাশিত নববর্ষের লিপি (New Year Card) আমাদের উপহার পাঠিয়েছেন। সুচিক্কণ শুভ্র কার্ডের এক দিকে দুই বর্ণে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে নববর্ষের বাণী এবং অপর দিকে আট কলারে ছাপা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর একটি মনোহর চিত্র। সুতরাং মণিকাঞ্চন সংযোগে এই লিপি যে একটি মনোরম বস্তু হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী প্রসিদ্ধ ব্লক নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত এই লিপিখানির সম্পাদনে সুরুচি এবং শিল্প-রুচি উভয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণীটি এইখানে মুদ্রিত ক'রে আমরা বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

কিছুকাল পূর্ব্বে বড়দিন এবং ইংরাজী নববর্ষের সময়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত ক্রিশমাস এবং নিউইয়ার কার্ড পাঠাবার একটা প্রথা বাঙালীদের মধ্যে ছিল। দেশাত্মবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথাটা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে পেয়ে উপস্থিত প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ উৎসব-আনন্দের দিনে দূরস্থিত বন্ধুবান্ধবকে এরূপ উপহার লিপির সাহায্যে শুভেচ্ছা

জীবনরথের পথে চলে যায় ছুটে,
কালে কালে তার খেলার পুতুল
পিছনে ধুলায় লুটে।

১ বৈশাখ
১৩৩৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠানোর প্রথা ভালই। মাঘোৎসবের সময়ে এবং এবারকার নববর্ষের সময়ে উপহার লিপি প্রকাশিত ক'রে ললিত বাবু এই প্রথাটিকে বাঁচিয়ে রাখবার বিষয়ে সহায়তা করেছেন। আমরা আশা করি আগামী শারদীয় পূজার সময়ে তিনি যদি এই রকম মনোহর 'আগমনী লিপি' অথবা 'বিজয়া লিপি' অথবা উভয়ই প্রকাশিত করেন তা হ'লে অর্থের দিক্ থেকেও তাঁর ক্ষোভের কোনো কারণ হবে না।

বাংলার পল্লী-নৃত্য

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বাংলার লুপ্তপ্রায় পল্লীশিল্পের উদ্ধার কল্পে যে সমিতি গঠন করেছেন, এবং সেই সমিতি কর্ত্তৃক যে-শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল,—সে সম্বন্ধে গত বৈশাখ সংখ্যায় আমরা কিছু আলোচনা করেছিলাম। শুধুই চিত্রাঙ্কন বা অনুরূপ শিল্পে নয়,—নৃত্য-কলাতেও যে বাংলার অশিক্ষিত পল্লীবাসীর একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, সে দিকেও পল্লীবাসীর এই অকৃত্রিম সুহৃদ্ শিক্ষিত সহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত ১৬ই এবং ১৭ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতার গলষ্টন্ পার্কে তিনি যে পল্লীনৃত্যের আয়োজন করেছিলেন, তা' আমাদের যেমন চমৎকৃত করেছিল, তেমনি আনন্দ দিয়েছিল। কাঠি-নৃত্য, রায়-বেঁশে নৃত্য, জারিনৃত্য প্রভৃতি নানা-বিধ যে নৃত্যকলা দেখেছিলাম,—তা' জাতির একটা বড়ো আধ্যাত্মিক সম্পদ। এই সমস্ত নৃত্য-কলাকে বিলুপ্তির কবল থেকে উদ্ধার কল্পে যিনি প্রাণ মন নিয়োগ করেছেন, তিনি সমস্ত দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

কুমারী সুরভি সিংহ বি-এল্

১৯৩২ সালে কুমারী সুরভি সিংহ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে কৃতিত্বের সহিত বি-এল পাশ করেছেন। এর পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় মহিলা রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি।

কুমারী সুরভি ১৯৩০ সালে কলিকাতার বেথুন কলেজ হ'তে ইংরাজি সাহিত্যে অনার্সের সহিত বি-এ পাশ করেন। আই-এ পরীক্ষা তিনি প্রাইভেটে দিয়াছিলেন এবং



কুমারী সুরভী সিংহ

কলিকাতা ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুল হ'তে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বাল্যকালে তিনি বর্ম্মার বেসিন্ সহরে কন্ভেন্টে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা ডাক্তার রঘুনাথ সিংহ বেসিনে একজন প্রথম শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

আমরা কুমারী সুরভির সর্ব্বতোভাবে সফলতা কামনা করি।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ৫০৲ টাকা পুরস্কার

"Commercial India"র সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধমত আমাদের পাঠকদের জানাচ্ছি যে—"How they have started in Business"—এই বিষয়ে উক্তপত্রের সম্পাদক মহাশয় দেশবাসীকে প্রবন্ধ লিখ্‌তে আহ্বান করছেন। দেশের এমন অনেক যুবক আছেন যাঁরা কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হ'য়েছেন, অনেকবার উত্থান-পতনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখ্‌বেন তাঁকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হ'বে। প্রবন্ধটি উক্ত পত্রের চার থেকে ছয় পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত হওয়া চাই এবং আগামী ২০শে মে তারিখের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়ের হস্তগত হওয়া চাই। প্রথম পুরস্কার ছাড়া আরো কয়েকটি Consolation পুরস্কার আছে। এ বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ২২নং R. G. Kar Road, শ্যামবাজার,—এই ঠিকানায় পত্র লিখ্‌লে আরো বিস্তারিত বিবরণ জানা যাবে।

বাঙালী ছাত্রের বীরত্ব

শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রিপন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেদিন বালীগঞ্জ ষ্টেসনের কাছে তিনজন গুণ্ডার কবল থেকে একটি হিন্দু ছাত্রীকে রক্ষা করেছিল এই যুবক,— একা, নিরস্ত্র। শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণের



শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সাহস ও শক্তির প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। আমরা বাঙালী জাতির গৌরব এই তরুণ ছাত্রের দীর্ঘ-জীবন ও উন্নতি কামনা করি।

Edited by Upendranath Ganguli, printed by Sarat chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street Calcutta.



মেঘদূত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার

বিচিত্রা
আষাঢ় ১৩৩৯

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ২য় খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৩৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

"আমি"-র লীলা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

রাণী, আমি যে তোমাকে চিঠি লিখেচি এতদিন পরে তার একখানি প্রাপ্তি স্বীকার পাওয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই গত সপ্তাহে প্রশান্তর একখানি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। তাতে বর্ত্তমান য়ুরোপের সর্ব্বত্রই যে একটা দুশ্চিন্তার আলোড়ন চল্‌চে তার একটা বেশ স্পষ্ট ছবি দেওয়া হ'য়েচে। মনে করচি এর ইংরেজী অংশ বাংলা করে এটাকে কোন একটা কাগজে ছাপান যাবে।

এইমাত্র বিকেলের গাড়ীতে রে—চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঢাকায় তার শ্বশুর বাড়ীর অভিমুখে চলে গেল। অমিয় বল্‌লে, নূতন বিয়ের কালে যে কোন স্বামীকেই তার যে কোন স্ত্রীর উপযুক্ত বলে মনে হয় না। শুনে মনে হল তার কারণটা এই যে, নব-বধূ আপনার সমস্ত কিছুকে দান করে, তার চোখের জলের মধ্যে সেই কথাটাই প্রচ্ছন্ন থাকে। অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ বন্ধনের তন্তুতে তন্তুতে জীবনকে ছিন্ন করে নিয়ে নিজকে উৎসর্গ করে—কিন্তু তার স্বামী সব দিতে বাধ্য হয় না—এই আদান প্রদানের অসমানতাকে নিজের পৌরুষ সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারে এমন সামর্থ্য অল্প লোকেরই আছে। তার পরে দিন যায়;—স্ত্রী ক্রমে যখন নিজের গুণে ও শান্তিতে নিজের সংসার সৃষ্টি করে তোলে, তখন সেইটেই তার পুরস্কার হয়—কেননা তার বাপমায়ের যে সংসারে সে ছিল সে সংসারে সে ছিল অকর্ত্তা—সে সংসারে তার

অধিকার আংশিক—তার দাম্পত্যের জগৎ তার আপনারি জগৎ। এই জন্যে তার চোখের জল শুকোতে দেরি হয় না ;—যে অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তুলনায় সে অতীতের গৌরব কমে যায়, এই জন্যে তার আকর্ষণ শক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসে। তখন, যা সে দিয়ে এসেছে তার পরিবর্ত্তে যা সে পায় তা বেশি বই কম হয় না।

*   *   *   *

কবে আস্‌বে তোমরা? ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ তো হয়ে গেল। যদি মার্চ্চমাসের গোড়াতেই দেশে রওনা হও তাহলে হয়ত এই চিঠিই তোমার য়ুরোপ প্রবাসের শেষ চিঠি হবে।

আমার চিঠি লেখার বয়স চলে গেছে—এখন দু' লাইন চিঠি লেখার চেয়ে গাড়িভাড়া করে বাড়িতে গিয়ে বলে আসা অনেক সহজ বোধ হয়। কলমের ভিতর দিয়ে কথা কইতে গেলে কথার প্রাণগত অনেকটা অংশ এদিক ওদিক দিয়ে ফস্‌কে যায়—যখন মনের শক্তি প্রচুর থাকে তখন বাদসাদ দিয়েও যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত থাকে—তাই তখন লেখার বকুনিতে অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন বাণী সহজে বকুনিতে উছ্‌লে উঠ্‌তে বাধা পায়—তাই কলমের ডগায় কথার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, বোধহয় এই জন্যেই লেখ্‌বার দুঃখ স্বীকার কর্‌তে মন রাজি হয় না।

তা হোক্ গে, তবু তোমাকে একটু মনের কথা বলি। কিন্তু আমার মনের কথার মধ্যে কোনো আখ্যান নেই, এ যে নিছক ভিতরের কথা। এ যে অন্তর অন্তরীক্ষের মেঘ ও রৌদ্রের লীলা। সময় অনুকূল নয়, নানা চিন্তা, নানা অভাব, নানা আঘাত সংঘাত। ক্ষণে ক্ষণে ভিতরে ভিতরে অবসাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে, একটা পীড়ার হাওয়া মনের একদিক থেকে আর একদিকে হুহু করে বইতে থাকে। এমন সময় চম্‌কে উঠে মনে প'ড়ে যায় যে এ ছায়াটা "আমি" বলে একটা রাহুর। সে রাহুটা সত্য পদার্থ নয়। তখন মনটা ধড়ফড় করে চেঁচিয়ে উঠে ব'লে ওঠে—ও নেই, ও নেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। বাড়ির সাম্‌নের কাঁকর-বিছানো লাল রাস্তায় বেড়াই আর মনের মধ্যে এই ছায়া-আলোর দ্বন্দ্ব চলে। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা কি ক'রে জান্‌বে ভিতরে একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চল্‌চে। এ সৃষ্টির কি আমারই মনের মধ্যে আরম্ভ আমারই মনের মধ্যে অবসান? বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে এর কি কোনো চিরন্তন যোগসূত্র নেই? নিশ্চয় আছে। জগৎ জুড়ে অসীম কাল ধরে একটা কি হয়ে উঠ্‌চে, আমাদের চিত্তের মধ্যে বেদনায় বেদনায় তারি একটা ধাক্কা চল্‌চে। ব্যক্তিগত জীবনে সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি বিচ্ছেদ মিলন নিয়ে যে সব বিশেষ ঘটনার ধারা বয়ে চলে গেল কয়েক বছর পরে কোথাও তার কোনো চিহ্নই থাক্‌বে না—ঝঞ্ঝামথিত সমুদ্রের পরে ফেনাগুলোর যেমন কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। তরুণ পৃথিবীতে যেমন একদিন আগুন জল হাওয়ার যে প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা চলেছিল সে নৃত্যলীলার নাট্যমঞ্চ আজ একেবারেই নেই—কিন্তু সেই নৃত্যলীলারই চরণপাতে আজকেকার পৃথিবীর প্রাণনিকেতন তৈরি হয়ে উঠেচে—সৃষ্টির উপকরণ ও প্রকরণ বদল হ'ল কিন্তু সৃষ্টি রইল। মনের উপর দিয়ে নানা ঘটনার ধাক্কা নানা অবস্থার আলোড়ন তুফান তুলে যায়, আজ্‌বাদে কাল তারা থাকেনা কিন্তু সেই ধাক্কায় সেখানেই এই "আমির" ঘন আবরণ

ছিন্ন হয়ে যায় সেইখানেই সত্যের কোন একটা চিরন্তন রূপ-সৃষ্টির প্রকাশ হতে থাকে—আমি তার উপলক্ষ্য মাত্র।

সভ্যতার ইতিহাসধারায় মানুষ আজ যে অবস্থার মধ্যে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে—এই অবস্থা-সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে কত কোটি কোটি নামহীন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের চিরবিস্মৃত চিত্তসংঘাত আছে। সৃষ্টির যা কিছু রয়ে-যাওয়া তা সংখ্যাহীন চলে-যাওয়ার প্রতি মুহূর্তের হাতের গড়া। আজ আমার এই জীবনের মধ্যে সৃষ্টির সেই দূতগুলি, সেই চলে-যাওয়ার দল তার কাজ করচে—"আমি" বলে পদার্থটা উপলক্ষ্য মাত্র।—বাড়ি তৈরির সময় যে ভারা বাঁধা হয়, তা ভারা মাত্র—আজকের দিনে এর প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য যতই থাক কালকের দিনে যখন এর চিহ্নমাত্র থাকবে না তখন কারো গায় একটুও বাজবে না। ইমারত আপন ভারার জন্যে কোথাও শোক করে না। কথাটা এই যে, আজ আমার এই "আমি"-টাকে নিয়ে যে গড়া-পেটা চল্‌বে, এই লালকাঁকর-বিছানো রাস্তা দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে ভিতরে ভিতরে যা কিছু উপলব্ধি করচি তার অনেকখানিই আমার নামের স্বাক্ষর মুছে ফেলে দিয়ে মানুষের সৃষ্টি-ভাণ্ডারে জমা হচ্চে। এই কথা মনে রেখে ক্ষণিকের আঘাত বেদনাকে তুচ্ছ করতে পারি। মনে যেন রাখি চিরমানব আমার মধ্যে তপস্যা করচেন—তপস্যার দ্বারাই সৃষ্টি হয়। সেই তপস্যার আগুনে আমার এই "আমি"—ইন্ধনে ছাই হয়ে যাক্ না, তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু তার অন্তরের দান সবটাই ব্যর্থ হবেনা। ইতি ২৫ মাঘ ১৩৩৩।

স্নেহাসক্ত—

শান্তি-নিকেতন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬

যদিচ ধর্ম্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও বিঘ্ন ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন অন্ধি-সন্ধি আমি কোনকালে খুঁজিয়া পাইব না। তথাপি, ধার্ম্মিকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত স্বামীজি ও অখ্যাত সাধুজি,—কাহাকেও ছোট-বড় করিনা, উভয়ের বাণীই আমার কর্ণে সমান মধু বর্ষণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি বাঙ্‌লা দেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে, এবং সেইটাই নাকি বাঙ্‌লার নিজস্ব খাঁটি জিনিস। ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ কিছু-কিছু করিয়াছি, ফল-লাভের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি দৈবাৎ খাঁটি বস্তু কপালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিব না সঙ্কল্প করিলাম। পুঁটুর বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ আমাকে রাখিতেই হইবে, অন্ততঃ, সে কয়টা দিন কলিকাতার নিঃসঙ্গ মেসের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবী-আখড়ার আশে-পাশে কোথাও কাটাইতে পারিলে আর যাই হোক্ জীবনের সঞ্চয়ে বিশেষ লোক্‌সান ঘটিবে না।

ভিতরে আসিয়া দেখিলাম কমল-লতার কথা মিথ্যা নয়, সেথায় কমলের বনই বটে, কিন্তু দলিত বিদলিত। মত্ত হস্তিকুলের সাক্ষাৎ মিলিল না কিন্তু বহু পদচিহ্ন বিদ্যমান। বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার, এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। কেহ দুধ জ্বাল দিতেছে, কেহ ক্ষীর তৈরী করিতেছে, কেহ নাড়ু পাকাইতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ ফল-মূল বানাইতেছে,—এ সকল ঠাকুরের রাত্রের ভোগের ব্যাপার। একজন অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়সী বৈষ্ণবী একমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে, এবং তাহারই কাছে বসিয়া আর একজন নানা রঙে ছোপানো ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড সযত্নে কুঞ্চিত করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছে, সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ কাল স্নানান্তে পরিধান করিবেন। কেহই বসিয়া নাই, তাহাদের কাজের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সকলেই আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু নিমেষ মাত্র। কৌতূহলের অবসর নাই, ওষ্ঠাধর সকলেরই নড়িতেছে, বোধ হয় মনে মনে নাম জপ চলিতেছে। এদিকে বেলা শেষ হইয়া দুই একটা করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে সুরু করিয়াছে, কমল-লতা কহিল, চলো, ঠাকুর নমস্কার করে আস্‌বে। কিন্তু, আচ্ছা,—তোমাকে কি বলে ডাক্‌বো বলো ত? নতুন-গোঁসাই বলে ডাক্‌লে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাদের এখানে গহর পর্য্যন্ত যখন গহর-গোঁসাই হয়েছে তখন আমি ত অন্ততঃ বামুনের ছেলে। কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে? তার সঙ্গেই একটা গোঁসাই জুড়ে দাও না।

কমল-লতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও-নামটা আমার ধরতে নেই,—অপরাধ হয়। এসো।

তা' যাচ্চি, কিন্তু অপরাধটা কিসের ?

কিসের তা' তোমার শুনে কি হবে ? আচ্ছা মানুষ ত !

যে-বৈষ্ণবটি মালা গাঁথিতেছিল সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নিচু করিল।

ঠাকুর-ঘরে কালো পাথর ও পিত্তলের রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি। একটি নয়, অনেকগুলি। এখানেও জন পাঁচ ছয় বৈষ্ণবী—কাজে নিযুক্ত। আরতির সময় হইয়া আসিতেছে, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

ভক্তিভরে যথারীতি প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ঠাকুর ঘরটি ছাড়া অন্য সব ঘরগুলিই মাটির, কিন্তু সযত্ন-পরিচ্ছন্নতার সীমা নাই। বিনা আসনে কোথাও বসিতেই সঙ্কোচ হয় না, তথাপি কমল-লতা পূবের বারন্দার একধারে আসন পাতিয়া দিল, কহিল, বোসো, তোমার থাক্‌বার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি।

আমাকে এখানেই আজ থাক্‌তে হবে নাকি ?

কেন, ভয় কি ? আমি থাক্‌তে তোমার কষ্ট হবে না।

বলিলাম, কষ্টের জন্য নয়, কিন্তু গহর রাগ কর্‌বে যে।

বৈষ্ণবী কহিল, সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

একাকী বসিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই তাহাদের সময় নষ্ট করিবার সময় নাই, আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। মিনিট দশেক পরে কমল-লতা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমিই মঠের কর্ত্রী না কি ?

কমল-লতা জিভ্ কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী,—কেউ ছোট-বড় নেই। এক একজনের এক একটা ভার, আমার ওপর প্রভু এই ভার দিয়েছেন, এই বলিয়া সে মন্দিরের উদ্দেশে হাত-জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখে এনোনা।

বলিলাম, তাই হবে। আচ্ছা, বড়-গোঁসাই গহর-গোঁসাই এঁদের দেখ্‌চিনে কেন ?

বৈষ্ণবী কহিল, তাঁরা এলেন বলে। নদীতে স্নান করতে গেছেন।

এই রাত্রে ? আর ঐ নদীতে ?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

গহরও ?

হাঁ, গহর-গোঁসাইও।

কিন্তু আমাকেই বা স্নান করালে না কেন ?

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, আমরা কাউকে স্নান করাইনে তারা আপনি করে। ঠাকুরের দয়া হলে তুমিও একদিন করবে, সেদিন মানা করলেও শুন্‌বে না।

বলিলাম গহর ভাগ্যবান, কিন্তু আমার ত টাকা নেই, আমি গরিব লোক আমার প্রতি হয়ত ঠাকুরের দয়া হবে না।

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতটা বোধ হয় বুঝিল, এবং রাগ করিয়া কি-যেন একটা বলিতে গেল কিন্তু বলিল না। তারপরে কহিল, গহর-গোঁসাই যাই হোন কিন্তু তুমিও গরিব নয়। অনেক টাকা দিয়ে যে পরের কন্যা-দায় উদ্ধার করে ঠাকুর তাঁকে গরিব ভাবেন না। তোমার ওপরেও দয়া হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

বলিলাম, তাহলে সেটা ভয়ের কথা। তবু, কপালে যা' লেখা আছে ঘট্‌বে, আট্‌কানো যাবেনা,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কন্যাদায় উদ্ধারের খবর তুমি পেলে কোথায় ?

বৈষ্ণবী কহিল, আমাদের পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষে করতে হয়, আমরা সব খবরই শুন্‌তে পাই।

কিন্তু এ খবর বোধ হয় এখনো পাওনি যে টাকা দিয়ে দায় উদ্ধার করতে আমার হয়নি ?

বৈষ্ণবী কিছু বিস্মিত হইল, কহিল, না এ খবর পাইনি। কিন্তু হোলো কি, বিয়ে ভেঙে গেলো ?

হাসিয়া কহিলাম, বিয়ে ভাঙেনি, কিন্তু ভেঙেছেন কালিদাসবাবু—বরের বাপ নিজে। পরের ভিক্ষের দানে ছেলে-বেচা পণের কড়ি হাত পেতে নিতে তিনি লজ্জা পেলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। এই বলিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। বৈষ্ণবী সবিস্ময়ে কহিল, বল কি গো, এ যে অঘটন ঘট্‌লো!

বলিলাম, ঠাকুরের দয়া। শুধু কি গহর-গোঁসাইজিই অন্ধকারে পচা নদীর জলে ডুব মারবে, আর সংসারে কোথাও কোন অঘটন ঘট্‌বে না? তাঁর লীলাই বা প্রকাশ পাবে কি করে বলো ত? বলিয়াই কিন্তু বৈষ্ণবীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম কথাটা আমার ভালো হয় নাই,—মাত্রা ছাড়াইয়া গেছে। বৈষ্ণবী কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, শুধু হাত তুলিয়া মন্দিরের উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল। যেন অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল।

সম্মুখ দিয়া একজন বৈষ্ণবী মস্ত একথালা লুচি লইয়া ঠাকুর ঘরের দিকে গেল। দেখিয়া কহিলাম, আজ তোমাদের সমারোহ ব্যাপার। বোধ হয় বিশেষ কোন পর্ব্ব দিন,—না?

বৈষ্ণবী কহিল, না, আজ কোন পর্ব্ব-দিন নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের ব্যাপার, ঠাকুরের দয়ায় অভাব কখনো ঘটে না।

কহিলাম, আনন্দের কথা। কিন্তু আয়োজনটা বোধ করি রাত্রেই বেশি করে করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, তাও না। সেবার সকাল-সন্ধ্যা নেই, দয়া করে যদি দুদিন থাকো নিজেই সব দেখ্‌তে পাবে। দাসীর দাসী আমরা, ওঁর সেবা করা ছাড়া সংসারে আর তো আমাদের কোন কাজ নেই। এই বলিয়া সে মন্দিরের দিকে হাত জোড় করিয়া আর একবার নমস্কার করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা' দেখ্‌লে, তাই।

কহিলাম, এসে দেখলাম বাট্‌না বাটা, কুট্‌নো কোটা, দুধ জাল দেওয়া, মালা গাঁথা, কাপড় রঙ করা—এম্‌নি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন কি শুধু এই করো?

বৈষ্ণবী কহিল, হাঁ, সারাদিন শুধু এই করি।

—কিন্তু এসব তো কেবল ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন করো কখন?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

—এই রাঁধা-বাড়া, জল-তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপানো,—একেই বলো সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাস-দাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাবো কোথায় গোঁসাই?

বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ দুটি যেন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার হঠাৎ মনে হইল এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমল-লতা, তোমার বাড়ী কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

কিন্তু গাছ-তলা তো আর চিরকাল ছিলনা?

বৈষ্ণবী কহিল, তখন ছিল ইঁট-কাঠের তৈরি কোন একটা বাড়ীর ছোট্ট একটি ঘরে। কিন্তু সে গল্প করার তো এখন সময় নেই গোঁসাই। এসোত আমার সঙ্গে, তোমার নতুন ঘরটি একবার দেখিয়ে দিই।

চমৎকার ঘর খানি। বাঁশের আনলায় একটি পরিষ্কার তসরের কাপড় দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐটি পরে' ঠাকুর ঘরে এসো। দেরি কোরোনা যেন। এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

একধারে ছোট একটি তক্ত-পোষে পাতা বিছানা। নিকটেই জল-চৌকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রন্থ ও একথালা বকুল ফুল; এইমাত্র প্রদীপ জালিয়া কেহ বোধহয় ধূপ-ধুনা দিয়া গেছে তাহার গন্ধ ও ধুঁয়ায় ঘরটি তখনও পূর্ণ হইয়া আছে,—ভারি ভালো লাগিল। সারাদিনের ক্লান্তি ত ছিলই, ঠাকুর-দেবতাকেও চিরদিন পাশ কাটাইয়া চলি, সুতরাং, ও-দিকের আকর্ষণ ছিলনা,—কাপড় ছাড়িয়া ঝুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কি জানি এ কা'র ঘর, কাহার শয্যা অজ্ঞাত অতিথিকে বৈষ্ণবী একটা রাত্রির জন্য ধার দিয়া গেল,—কিম্বা হয়ত, এ তাহার নিজেরই,—কিন্তু এ সকল চিন্তায় মন আমার স্বভাবতঃই ভারি সঙ্কোচ বোধ করে, অথচ, আজ কিছু মনেই হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনার জনের কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি। বোধহয় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম কে-যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুন-গোঁসাই মন্দিরে যাবেনা? ওঁরা তোমাকে ডাক্‌চেন যে।

ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা সহযোগে কীর্ত্তন গান কানে গেল, বহুলোকের সমবেত কোলাহল নয়, গানের কথা গুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকণ্ঠ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম এ কমল-লতা। নবীনের বিশ্বাস এই মিষ্ট স্বরই তাহার প্রভুকে মজাইয়াছে। মনে হইল অসম্ভব নয় এবং অত্যন্ত অসঙ্গতও নয়।

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলের দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমল-লতা কীর্ত্তন করিতেছে—মদন গোপাল জয় জয় যশোদাদুলাল কি, যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি। নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী লাল কি, গিরিধারী লাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি।

এই সহজ ও সাধারণ গুটি কয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষস্থল মন্থিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া। এই সকল রসের রসিক আমি নয়, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমন ধারা করিয়া উঠিল। বাবাজী দ্বারিকদাস মুদিত নেত্রে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেলনা, এবং শুধু কেবল ক্ষণকাল পূর্ব্বের স্নিগ্ধ-হাস্য-পরিহাস-চঞ্চল কমল-লতাই নয়, সাধারণ গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্তা যে-সকল বৈষ্ণবীদের এইমাত্র সামান্য তুচ্ছ ও কুরূপা মনে হইয়াছিল তাহারও যেন এই ধূপ ও ধুনায় ধূমাচ্ছন্ন গৃহের অনুজ্জ্বল দীপালোকে আমার চক্ষে মুহূর্ত্তকালের জন্য অপরূপ হইয়া উঠিল। আমারও যেন মনে হইতে লাগিল অদূরবর্ত্তী ঐ পাথরের মূর্ত্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্ত্তনের সমস্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছে।

ভাবের এই বিহ্বল মুগ্ধতাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম,—কেহ লক্ষ্যও করিল না। দেখি প্রাঙ্গণের একধারে বসিয়া গহর। কোথাকার একটা আলোর রেখা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। আমার পদ-শব্দে তাহার ধ্যান ভাঙিলনা কিন্তু সেই একান্ত সমাহিত মুখের প্রতি চাহিয়া আমিও নড়িতে পারিলাম না, সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল শুধু আমাকেই একাকী ফেলিয়া রাখিয়া এ বাড়ীর সকলেই যেন আর এক দেশে চলিয়া গেছে—সেখানের পথ আমি চিনিনা। ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় জানি, জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ইহাদের সকলেরই বড়, তথাপি কিসের ব্যথায় জানিনা মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল এবং তেমনিই অজানা কারণে চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানিনা, কানে গেল, ওগো নতুন গোঁসাই।

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম,—কে?

আমি গো,—তোমার সন্ধ্যেবেলার বন্ধু। এতো ঘুমোতেও পারো।

অন্ধকার ঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া কমল-লতা বৈষ্ণবী। বলিলাম, জেগে থেকে লাভ হোতো কি? তবু সময়টার একটু সদ্ব্যবহার হলো।

তা' জানি। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পাবে না?

পাবো।

তবে ঘুমোচ্চো যে বড়?

জানি বিঘ্ন ঘট্‌বেনা, প্রসাদ পাবোই। আমার সন্ধ্যে-বেলাকার বন্ধু রাত্রেও পরিত্যাগ করবেনা।

বৈষ্ণবী সহাস্যে কহিল, সে-দাবী বৈষ্ণবের, তোমাদের নয়।

বলিলাম, আশা পেলে বোষ্টম হতে কতক্ষণ? তুমি গহরকে পর্য্যন্ত গোঁসাই বানিয়েছ আর আমিই কি এত অবহেলার? হুকুম করলে বোষ্টমের দাসানুদাস হতেও রাজি।

কমল-লতার কণ্ঠস্বর একটুখানি গম্ভীর হইল, কহিল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তামাসা করতে নেই গোঁসাই, অপরাধ হয়। গহর-গোঁসাইজিকেও তুমি ভুল বুঝেছো। তার আপন লোকেরাও তাকে কাফের বলে, কিন্তু তারা জানেনা। সে খাঁটি মুসলমান, বাপ-পিতামহর ধর্ম্ম-বিশ্বাস সে ত্যাগ করেনি।

কিন্তু তার ভাব দেখেতো তা' মনে হয় না।

বৈষ্ণবী কহিল, সেইটেই আশ্চর্য্য। কিন্তু আর দেরি কোরোনা, এসো। একটু ভাবিয়া কহিল, কিম্বা প্রসাদ না হয় তোমাকে এখানেই দিয়ে যাই,—কি বলো?

বলিলাম, আপত্তি নেই। কিন্তু গহর কোথায়? সে থাকে তো দুজনকে একত্রেই দাও না।

তার সঙ্গে বসে খাবে?

বলিলাম, চিরকালই তো খাই। ছেলেবেলায় ওর মা আমাকে অনেক ফলার মেখে দিয়েছে, তোমাদের প্রসাদের চেয়ে সে তখন কম মিষ্টি হোতোনা। তাছাড়া গহর ভক্ত, গহর কবি,—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

অন্ধকারেও মনে হইল বৈষ্ণবী একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, তারপরে কহিল, গহর গোঁসাইজি নেই, কখন্ চলে গেছে আমরা জানতে পারিনি।

কহিলাম, গহরকে দেখ্‌লাম সে-উঠনে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে যেতে দাওনা?

বৈষ্ণবী কহিল, না।

বলিলাম, গহরকে আজ্ আমি দেখেচি। কমল-লতা, আমার তামাসাতে তুমি রাগ করলে কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাসা করচো না। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় তা' নয়।

বৈষ্ণবী এ অনুযোগের আর জবাব দিলনা, নীরবে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটুখানি পরেই সে অন্য একটি বৈষ্ণবীর হাতে আলো ও আসন এবং নিজে প্রসাদের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল, কহিল, অতিথি সেবার ত্রুটি হবে নতুন-গোঁসাই, কিন্তু এখানকার সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।

হাসিয়া বলিলাম, ভয় নেই গো সন্ধ্যার-বন্ধু, বোষ্টম না হয়েও তোমার নতুন-গোঁসাইজির রস-বোধ আছে। আতিথ্যের ত্রুটি নিয়ে সে রসভঙ্গ করেনা। রাখো কি আছে,—ফিরে এসে দেখ্‌বে প্রসাদের কণিকাটুকুও অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুরের প্রসাদ অম্‌নি কোরেই তো খেতে হয়, এই বলিয়া কমল-লতা নিচে ঠাঁই করিয়া সমুদয় খাদ্য-সামগ্রী একে একে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কাঁসর ঘণ্টার বিকট শব্দে। সুবিপুল বাদ্য-ভাণ্ড সহযোগে মঙ্গল-আরতি সুরু হইয়াছে। কানে গেল ভোরের সুরে কীর্ত্তনের পদ—কানু গলে বনমালা বিরাজে, রাই গলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে, মঞ্জীর রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে। তারপরে সারাদিন ধরিয়া চলিল ঠাকুর সেবা। পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, নাওয়ানো, খাওয়ানো, গা-মোছানো, কাপড় ছাড়ানো, চন্দন মাখানো, মালা পরানো—ইহার আর বিরাম-বিচ্ছেদ নাই। সবাই ব্যস্ত, সবাই নিযুক্ত। মনে হইল, পাথরের দেবতারই এই অষ্টপ্রহরব্যাপী অফুরন্ত সেবা সহে, আর কিছু হইলে এতবড় ধকলে কবে ক্ষইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত।

কাল বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তোমরা সাধন-ভজন করো কখন্? সে উত্তরে বলিয়াছিল,—এই তো সাধন-ভজন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাঁধা-বাড়া ফুল-তোলা মালা-গাঁথা দুধ জ্বাল দেওয়া একেই বলো সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখনি জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আমরা একেই বলি সাধনা,—আমাদের আর কোন সাধন-ভজন নেই।

আজ সমস্তদিনের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম কথাগুলা তাহার বর্ণে বর্ণে সত্য। অতিরঞ্জন অত্যুক্তি কোথাও নাই। দুপুরবেলায় কোন এক ফাঁকে বলিলাম, কমল-লতা আমি জানি তুমি অন্য সকলের মতো নও। সত্যি বলোত ভগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্ত্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কি গো,—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান!—এমন কথা আর কখনো মুখেও এনোনা নতুন-গোঁসাই—

আমার কথায় সে-ই যেন লজ্জা পাইল বেশি। আমিও কেমন একপ্রকার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি তো জানিনে, তাই জিজ্ঞেসা করচি তোমরা কি সত্যই ভাবো ঐ পাথরের মূর্ত্তির মধ্যেই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে যাবো কিসের জন্যে গো, এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা কাটাতে পারোনা বলেই ভাবো রক্ত-মাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যর আর কোথাও থাকবার যো নেই। কিন্তু তা' কেন? আর এ-ও বলি, শক্তি আর চৈতন্যর হদিস কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছো যে বলবে পাথরের মধ্যে তার যায়গা হবেনা? হয় গো হয়, ভগবানের কোথাও থাকতেই বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে যাবো কেন বলোত?

যুক্তি হিসাবে কথাগুলো স্পষ্টও নয়, পূর্ণও নয়, কিন্তু এ তো তা' নয়, এ তার জীবন্ত বিশ্বাস। তাহার সেই জোর ও অকপট উক্তির কাছে হঠাৎ কেমন ধারা থতমত খাইয়া গেলাম, তর্ক করিতে, প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না, ইচ্ছাও করিল না। বরঞ্চ ভাবিলাম, সত্যই ত, পাথরই হোক আর যাই হোক এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আপনাকে একান্ত সমর্পণ না করিতে পারিলে বৎসরের পর বৎসর দিনান্তব্যাপী এই অবিচ্ছিন্ন সেবার জোর পাইত ইহারা কি করিয়া? এমন সোজা হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দাঁড়াইবার অবলম্বন মিলিত কোথায়? ইহারা শিশু ত নয়, ছেলে-খেলার এই মিথ্যা অভিনয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মন যে শ্রান্তির অবসাদে দুদিনেই এলাইয়া পড়িত। কিন্তু সে তো হয় নাই, বরঞ্চ, ভক্তি ও প্রীতির অখণ্ড একাগ্রতায় আত্ম-নিবেদনের আনন্দোৎসব ইহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ জীবনে পাওয়ার দিক দিয়া সে কি তবে সবই ভুয়া, সবই ভুল, সবই আপনাকে ঠকানো!

বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কওনা যে!

বলিলাম, ভাবচি।

—কাকে ভাবচো?

—ভাবচি তোমাকেই।

—ইস্! বড় সৌভাগ্য যে আমার। একটু পরে কহিল, তবুত থাকতে চাও না, কোথায় কোন্ বর্ম্মাদের দেশে চাকরি করতে যেতে চাও। চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার তো মঠের জমি-জমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই,—খাবো কি?

—ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম, অত্যন্ত দুরাশা। কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা তাও তো মনে হয় না। নইলে ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, যাই তিনি দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে। নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতাম না। না খেয়ে শুকিয়ে ম'রলেও না।

—কমল-লতা, তোমার দেশ কোথায়?

—কালকেই তো বলেছি গোঁসাই ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।

—তা'হলে গাছতলায় আর পথে পথে না থেকে মঠে থাকো কিসের জন্যে।

—অনেক দিন পথে পথেই ছিলাম গোঁসাই, সঙ্গী পাইতো আবার একবার পথই সম্বল করি।

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ কথা তো বিশ্বাস হয় না কমল-লতা। যাকে ডাকবে সে-ই যে রাজি হবে।

বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকচি নতুন গোঁসাই,—রাজি হবে?

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, হাঁ রাজি। নাবালক অবস্থায় যে-লোক যাত্রার দলকে ভয় করেনি, সাবালক অবস্থায় তার বোষ্টমীকে ভয় কি।

—যাত্রার দলেও ছিলে না কি?

—হাঁ।

তা'হলে তো গান গাইতেও পারো।

—না, অধিকারী অতটা দূর এগোতে দেয়নি তার আগেই জবাব দিয়েছিল। তুমি অধিকারী হলে কি হোতো বলা যায় না।

বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, আমিও জবাব দিতাম। সে যাক্, এখন আমাদের একজন জানলেই কাজ চলে যাবে। এদেশে যেমন তেমন কোরেও ঠাকুরের নাম নিতে পারলে ভিক্ষের অভাব হয় না। চলোনা গোঁসাই বেরিয়ে পড়া যাক্। বল্‌ছিলে শ্রীবৃন্দাবন ধাম কখনো দেখোনি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাট্‌লো, পথের নেশা আবার যেন টান্‌তে চায়। সত্যি, যাবে নতুন-গোঁসাই ?

হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভারি বিস্ময় জন্মিল, কহিলাম, পরিচয় তো এখনো আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি, আমাকে এতোটা বিশ্বাস হলো কি করে ?

বৈষ্ণবী কহিল, চব্বিশ ঘণ্টা তো কেবল এক পক্ষেই নয় গোঁসাই, ওটা দুপক্ষেই। আমার বিশ্বাস পথে-প্রবাসে আমাকেও তোমার অবিশ্বাস হবে না। কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারি শুভদিন,—চলো। আর পথের ধারে রেলের পথ তো রইলই,—ভালো না লাগে ফিরে এসো আমি বারণ করব না।

একজন বৈষ্ণবী আসিয়া খবর দিল,—ঠাকুরের প্রসাদ ঘরে দিয়া আসা হইয়াছে।

কমল-লতা বলিল, চলো তোমার ঘরে গিয়ে বসিগে।

আমার ঘর ? তাই ভালো।

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও নিশ্চিত, কিন্তু যে কারণেই হোক্ এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পালাইতে পারিলে বাঁচে,—তাহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

ঘরে আসিয়া খাইতে বসিলাম। অতি পরিপাটি প্রসাদ, —পলায়নের ষড়যন্ত্রটা জমিত ভালো, কিন্তু কে-একজন অত্যন্ত জরুরি কাজে কমল-লতাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুতরাং, একাকী মুখ বুজিয়াই সেবা সমাপ্ত করিতে হইল। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না, বাবাজী মহারাজ দ্বারিকদাসই বা গেলেন কোথায় ? দুই-চারিজন প্রাচীন বৈষ্ণবী ঘোরা-ঘুরি করিতেছে,—কাল সন্ধ্যায় ঠাকুর-ঘরে ধোঁয়ার ঘোরে ইহাদেরই বোধ হয় অপ্সরা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ দিনের বেলার কড়া আলোতে কল্যকার সেই অধ্যাত্ম-সৌন্দর্য্য-বোধটা তেমন অটুট রহিল না, গাটা কেমনতর করিয়া উঠিল, সোজা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সেই শৈবালাচ্ছন্ন শীর্ণকায়া মন্দঃস্রোতা সুপরিচিত স্রোতস্বতী এবং সেই লতাগুল্ম কণ্টকাকীর্ণ তটভূমি, এবং সেই সর্পসঙ্কুল সুদৃঢ় বেতস-কুঞ্জ ও সুবিস্তৃত বেণুবন। দীর্ঘকালের অনভ্যাস বশতঃ গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল, অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছি, কোথায় একটি লোক আড়ালে বসিয়া ছিল উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য্য হইলাম এ যায়গাতেও মানুষে থাকে। লোকটির বয়স হয়ত আমাদেরই মতো,—আবার বছর দশেক বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়। খর্ব্বাকৃতি রোগা গড়ন, গায়ের রঙটা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নিচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট, চোখের ভ্রূ দুটাও তেমনি অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘে প্রস্থে বিস্তীর্ণ। বস্তুতঃ, এত বড় ঘন মোটা ভুরু যে মানুষের হয় ইতিপূর্ব্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না। দূর হইতে সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত প্রকৃতির কোন্ হাস্যকর খেয়ালে একজোড়া মোটা গোঁফ ঠোঁটের বদলে লোকটার কপালে গজাইয়াছে। গলা-জোড়া মোটা তুলসীর মালা, পোষাক পরিচ্ছদও অনেকটা বৈষ্ণবদের মতো, কিন্তু যেমন ময়লা তেমনি দীর্ঘ।

মশাই ?

থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আজ্ঞা করুন।

—আপনি এখানে কবে এসেছেন শুনতে পারি কি ?

—পারেন। এসেছি কাল বৈকালে।

—রাত্তিরে আখড়াতে ছিলেন বুঝি ?

—হাঁ, ছিলাম।

—ওঃ!

মিনিট খানেক নীরবে কাটিল। পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেই লোকটা বলিল, আপনি ত' বোষ্টম নয়, ভদ্র-লোক—আখড়ার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিলে যে ?

বলিলাম, সে খবর তাঁরাই জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন।

—ওঃ! কমলি-লতা থাকতে বললে বুঝি?

—হাঁ।

—ওঃ! জানেন ওর আসল নাম কি? উষাঙ্গিণী। বাড়ী সিলেটে,—কিন্তু দেখায় যেন ও কলকাতার মেয়েমানুষ। আমার বাড়ীও সিলেটে। গাঁয়ের নাম মামুদপুর। শুনবেন ওর স্বভাব চরিত্র?

বলিলাম, না। কিন্তু লোকটার ভাব-গতিক দেখিয়া এবার সত্যাই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। প্রশ্ন করিলাম, কমললতার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

—আছে না?

—কি সেটা?

লোকটা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কেন, মিথ্যে নাকি? ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কণ্ঠি-বদল করিয়েছিল। তার সাক্ষী আছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি জাত?

—আমরা দ্বাদশ-তিলি।

—আরে, কমল-লতারা?

প্রত্যুত্তরে লোকটা তাহার সেই মোটা ভ্রূ-জোড়া ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওরা শুঁড়ী,—ওদের জলে আমরা পা ধুইনে। একবার ডেকে দিতে পারেন?

—না। আখড়ায় সবাই যেতে পারে, ইচ্ছে হলে আপনিও পারেন।

লোকটা রাগ করিয়া বলিল, যাবো মশাই যাবো। দারোগাকে দু'পয়সা খাইয়ে রেখেছি, পেয়াদা সঙ্গে ক'রে একেবারে ঝুঁটি টেনে বার করে আনবো। বাবাজীর বাবাও রাখতে পারবে না। শালা রাস্কেল কোথাকার।

আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া চলিতে লাগিলাম। লোকটা পিছন হইতে কর্কশ কণ্ঠে কহিল, তাতে আপনার কি হলো? গিয়ে একবার ডেকে দিলে কি শরীর ক্ষয়ে যেতো নাকি? ওঃ—ভদ্দর লোক!

আর ফিরিয়া চাহিতে ভরসা হইল না। পাছে রাগ সামলাইতে না পারি এবং এই অতি দুর্ব্বল লোকটার গায়ে হাত দিয়ে ফেলি এই ভয়ে একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিলাম। মনে হইতে লাগিল বৈষ্ণবীর পলাইবার হেতুটা বোধহয় এইখানেই কোথায় জড়িত।

মনটা বিগড়াইয়াছিল, ঠাকুর-ঘরে নিজেও গেলাম না, কেহ ডাকিতেও আসিল না। ঘরের মধ্যে একখানি জলচৌকির উপরে গুটি কয়েক বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী সযত্নে সাজানো ছিল তাহারি একখানা হাতে করিয়া প্রদীপটা শিয়রের কাছে আনিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নয়, শুধু সময় কাটাইবার জন্য। ক্ষোভের সহিত একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল কমল-লতা সেই যে গিয়াছে আর আসে নাই। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি যথারীতি আরম্ভ হইল, তাহার মধুর কণ্ঠ বার বার কানে আসিতে লাগিল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল কমল-লতা সেই অবধি কোন তত্ত্বই আমার লয় নাই। আর সেই ভ্রূ-ওয়ালা লোকটা। কোন সত্যই কি তাহার অভিযোগের মধ্যে নাই?

আরও একটা কথা। গহর কৈ? সেও ত আজ আমার খোঁজ লইলনা। ভাবিয়াছিলাম দিন কয়েক এখানেই কাটাইব,—পুঁটুর বিবাহের দিনটি পর্য্যন্ত,—কিন্তু সে আর হয় না। হয়ত কালই কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িব।

ক্রমশঃ, আরতি ও কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। কন্যকার সেই বৈষ্ণবী আসিয়া আজও বহু যত্নে প্রসাদ রাখিয়া গেল, কিন্তু যে জন্য পথ চাহিয়াছিলাম তাহার দেখা মিলিল না। বাহিরে লোকজনের কথাবার্ত্তা, আনাগোনার পায়ের শব্দ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল, তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনাই আর নাই জানিয়া আহার করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া দীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বোধ করি তখন অনেক রাত্রি, কানে গেল, নতুন-গোঁসাই ?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমল-লতা। আস্তে আস্তে বলিল, আসিনি বলে মনে মনে বোধহয় অনেক দুঃখ করেছো,—না গোঁসাই ?

বলিলাম, হাঁ, করেচি।

বৈষ্ণবী মুহূর্ত্তকাল নীরব হইয়া রহিল, তারপরে বলিল, বনের মধ্যে ও-লোকটা তোমাকে কি বল্‌ছিল ?

—তুমি দেখেছিলে না কি ?

—হাঁ।

—বল্‌ছিলো সে তোমার স্বামী,—অর্থাৎ, তোমাদের সামাজিক আচার মতে তুমি তার কণ্ঠি-বদল-করা পরিবার।

—তুমি বিশ্বাস করেছো ?

—না, করিনি।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে আমার স্বভাব-চরিত্রের ইঙ্গিত করেনি ?

—করেছে।

—আমার জাত ?

—হাঁ, তাও ?

বৈষ্ণবী একটুখানি থামিয়া বলিল, শুন্‌বে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস ? কিন্তু হয়ত তোমার ঘৃণা হবে।

বলিলাম, তবে থাক্, ও আমি শুন্‌তে চাইনে।

—কেন ?

বলিলাম, তাতে লাভ কি কমল-লতা ? তোমাকে আমার ভারি ভালো লেগেছে। কিন্তু কাল চলে যাবো. হয়ত আর কখনও আমাদের দেখাও হবে না। নিরর্থক আমার সেই ভালো-লাগাটুকু নষ্ট করে ফেলে ফল কি হবে বলোত ?

বৈষ্ণবী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে কি করিতেছে ভাবিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাব্‌চো ?

—ভাব্‌চি, কাল তোমাকে যেতে দেবোনা।

—তবে, কবে যেতে দেবে ?

—যেতে কোনদিনই দেবোনা। কিন্তু অনেক রাত হোলো, ঘুমোও। মশারিটা ভালো করে গোঁজা আছে ত ?

—কি জানি, আছে বোধহয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া কহিল, আছে বোধহয় ? বাঃ—বেশ তো। এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঘুমোও গোঁসাই,—আমি চল্‌লুম। এই বলিয়া সে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং বাহিরে হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ছন্দের দ্বন্দ্ব (?)

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

গত বৈশাখ মাসের 'বিচিত্রা'য় 'ছন্দের দ্বন্দ্ব'-শীর্ষক প্রবন্ধে বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয় আভাস দিয়াছিলেন যে বাংলা ছন্দে চার সিলেবলের সহিত পাঁচ সিলেবলের যে মিল হইতে পারে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তিনি রচনা করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তগুলিতে চার, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি বিভিন্ন সংখ্যক সিলেবলের সমাবেশে সমমাত্রার পর্ব্ব রচনা করিয়া ছন্দ বজায় রাখা হইয়াছে। প্রথম ও চতুর্থ স্তবকে প্রতি চরণে পর্ব্বের সংখ্যা তিন, সঙ্কেত ৬+৬+৫ ; দ্বিতীয় স্তবকে প্রতি চরণে পর্ব্বের সংখ্যা চার, সঙ্কেত ৬+৫+৫+৫ ; তৃতীয় স্তবকে প্রতি চরণে পর্ব্বের সংখ্যা তিন, সঙ্কেত ৫+৬+৫ , কিন্তু তাঁহার মতের সমর্থনের জন্য তিনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত রচনা না করিয়া অন্যান্য কবি-দের রচনা হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

।। ।। ।।। ।।। ।।। ।। ।।।

হৃদয় আমার | নাচেরে আজিকে | ময়ূরের মত | নাচে রে

(রবীন্দ্রনাথ)

এই চরণটিতে প্রথম তিনটি পর্ব্বেই মাত্রাসংখ্যা ছয়, কিন্তু সিলেবল্‌-সংখ্যা যথাক্রমে ৪, ৬ ও ৫। এরূপ অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

বস্তুতঃ বাংলা ছন্দ যে সিলেবল্‌-সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, মাত্রাসংখ্যার উপর নির্ভর করে, ইহা বাংলা ছন্দ-শাস্ত্রের গোড়ার কথা। বাংলা ছন্দ মাত্রেই মাত্রা-ছন্দ। বাংলায় চার সিলেবলের বা পাঁচ সিলেবলের ছন্দ নাই, আছে চার বা পাঁচ মাত্রার ছন্দ।

সম্ভবতঃ তথাকথিত স্বরবৃত্ত ছন্দকে নির্দ্দেশ করিয়া কেহ বলিতে পারেন যে বাংলাতে-ও ত সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা লইয়া ছন্দ রচনা চলে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ছন্দ মাত্রাগত, সিলেবল্‌-অনুযায়ী নহে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সে রকম কবিতাতেও তিন সিলেবলের সহিত চার সিলেবলের মিল করা যাইতে পারে।

এক কন্যে | র'াধেন বাড়েন | **এক কন্যে** | খান
রাজপুত্তুর | যাচ্ছে মাঠে | একলা ঘোড়ায় | চেপে

(শিশু—রবীন্দ্রনাথ)

বাপ্‌ বল্‌লেন, | কঠিন হেসে, | "তোমরা মায়ে | ঝি
এক লগ্নেই | বিয়ে ক'রো | আমার মরার | পরে

(পলাতকা-রবীন্দ্রনাথ)

গেছে দোঁহে | ফরাকাবাদ | চ'লে,
সেই খানেতেই | **ঘর পাত্‌বে** | ব'লে (ঐ)

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে সর্ব্বত্রই মূল পর্ব্ব চার মাত্রার। অনেক স্থলেই চার মাত্রার পর্ব্বে চার সিলেবল্‌ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু মোটা অক্ষরে ছাপা পর্ব্বগুলিতে সিলেবল্‌-সংখ্যা তিন।

মাত্রার যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা আমি পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৮। ৪র্থ সংখ্যা) 'বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি। বাংলা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি কি এবং কি ভাগে বাংলা কবিতায় মাত্রা সমকত্ব বজায় রাখা হয় তাহা মৎ-প্রচারিত Beat-and-Bar Theoryতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১৩৩৯ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঐ Theoryর সূত্রগুলি প্রকাশিত হইতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাই। বাংলার পাঁচ মাত্রা ও চার মাত্রা মিলাইয়া অর্থাৎ নয়মাত্রা লইয়া পর্ব্ব রচনা করা যায় কি? সে বিষয়ে কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন। নয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার বাংলায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে অনেক সময় যাহাকে নয় মাত্রার পর্ব্ব বলিয়া মনে হয় তাহা বাস্তবিক অন্য জিনিষ। ছয় মাত্রার পর্ব্বের সহিত একটি অপূর্ণ ছয়মাত্রার অর্থাৎ তিনমাত্রার একটি পর্ব্ব যোগ করিয়া একটি চরণ রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নয় মাত্রার পর্ব্ব বলা যাইবে না। সেইরূপ চৌপদীতে পর্য্যায়ক্রমে চার ও পাঁচ মাত্রার পর্ব্বের সমাবেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও নয়-মাত্রার পর্ব্বের উদাহরণ বলিয়া ধরা চলিবে না। বাংলায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ও দশ মাত্রার পর্ব্ব আছে, নয় মাত্রার ব্যবহার চলে কিনা পরীক্ষা করা উচিত। নয় মাত্রার পর্ব্বের পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের সঙ্কেত হইতে পারে—৩+৩+৩, ৪+৩+২, ২+৩+৪, যদি কেহ বিভিন্ন সঙ্কেতে নয় মাত্রার পর্ব্ব গঠন করিয়া ছন্দে চালাইতে পারেন, তবে তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক রূপতন্ত্রের ভূমিকা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন, বি-এল

সৌন্দর্য্যচর্চ্চার পথ উত্তরোত্তর জটিল হয়ে পড়্ছে। এ পথ সহজ, এ পথে সকলেই আনাগোনা কর্‌তে পারে—এ রকমের একটা আস্বাদন অনেককেই লুব্ধ করে—রূপতীর্থের বিচিত্র পথে; ক্রমশঃ পান্থশালাগুলি ব্যক্তিগত তুচ্ছতার জঞ্জাল ও রুচির আর্জ্জনায় দুঃসহ হয়ে' ওঠে। এজন্য সকল দেশে ও কালে সৌন্দর্য্যলোককে এ সমস্ত রুগ্ন ও গলিত ক্লেদ হ'তে নির্ম্মুক্ত কর'তে হয়; সৌন্দর্য্যস্বপ্নকে এ রকমের দুর্য্যোগপঙ্ক হ'তে উদ্ধার কর্‌তে বার বার রসিকরা চেষ্টা করেছে।

এ যুগের চিত্ত সৌন্দর্য্যকে সাহিত্যে অপরূপভাবে উপস্থাপিত করতে সাহস কর্ছে কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী কারণে। রসচক্রগুলি এ যুগে নিতান্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে—খণ্ডখণ্ড ভাবে শাস্ত্রচর্চ্চার প্ররোচনায়। এ যুগ খণ্ডতার পক্ষপাতী বলে' এক একটা বিষয়েও অসংখ্য অংশ সৃষ্ট হয়েছে। মানুষের অন্তঃকরণ অখণ্ডতার সেবক—সমগ্রের অঙ্কে অখণ্ডের প্রতিমা গড়্‌তে না পার্‌লে সে সৌন্দর্য্যজগতে হাঁফিয়ে ওঠে; এজন্য শুধু কবিতাচর্চ্চাকে আঁকড়ে ধরে' গণ্ডীবদ্ধ হ'তে এযুগের সাহিত্য প্রলুব্ধ হচ্ছে না। কবিতা রসপ্রকাশের শুধু একটা উপায় মাত্র; বর্ণ, গন্ধ, মর্ম্মর ও ধ্বনির নানাপথে সে রসবাহুল্য পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

নব্য সাহিত্য রসসম্পর্কের বিচিত্র বহুমুখী কারুতার সম্মুখীন হচ্ছে—এবং বিশ্বের রস-সম্পুট চয়ন করে' জাতির চিত্তবিনোদনের জন্য সুকুমার মধুচক্র রচনা কর্‌তে উৎসাহিত হয়েছে; এজন্য এরকমের রসসাহিত্য কবিতা, চিত্র, মূর্ত্তি ও হর্ম্ম্যের কারুতা নিয়ে এক নূতন সৃষ্টি উপস্থাপিত কর্‌ছে—যা' নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও খণ্ডতাত্ত্বিকের ধারণাতীত। মানুষের সকল তত্ত্বের যেখানে যোগ, সৌন্দর্য্যসম্ভারের বিপুল সমন্বয়কে সেখানে এক নূতনতর রূপে সৃষ্টি করার অসীম অধিকার আধুনিক সাহিত্যের রূপস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সাহিত্যের সূক্ষ্ম ও পেলব বাক্যপুটকে বাহন করে' এবং অঘটনঘটনপটুতাকে অন্তর্গ্রহণ করে' নব্য রূপস্রষ্টা অগ্রসর হচ্ছে। সৌন্দর্য্য মানুষের সমগ্রতা ও অখণ্ডতার প্রকাশ—এজন্য সত্যিকার রসব্যঞ্জনা হচ্ছে নূতন রূপসৃষ্টি—তা' আলোচনা বা বিশ্লেষণ নয়, টীকা বা টিপ্পনি নয়। সাহিত্যের রাজন্যেরা এ রকমের নব্য রসমৃগয়ায় উৎসাহিত হচ্ছে এ যুগে। আধুনিক চিত্তের ব্যাপক প্রাঙ্গণে তাই নূতন সৃষ্টির উৎসাহ দীপ্ত হচ্ছে—অগ্রদূতেরা রূপশিবির রচনায় ব্যস্ত হয়ে' উঠেছে!

সকল রসসম্পর্কই মানুষের হৃদয়সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে; এ সম্পর্ক সাহিত্যই বিস্তৃত করে' তোলে। জগতের মহাকাব্যগুলি এরূপে মানুষের সুখদুঃখের চিরন্তন উৎস হয়েছে এবং এক একটা যুগের সমগ্র বেদনা ও স্বপ্নের, আকাঙ্খা ও কীর্ত্তির বাহন হয়ে' অবিনশ্বর হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যে মহাকাব্যের স্থান দেখা যায় না; তবু সে সাহিত্য চিত্তের রূপরসগন্ধবর্ণের সকল উচ্ছ্বাসকে অঙ্কে গ্রহণ করে' এক নূতনতর মরীচিকা রচনা করে ধন্য হচ্ছে। রসসৃষ্টির এই নব্যতর সাহিত্য সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন ব্যাপার। এই নব্য সাহিত্যসৃষ্টির উৎসাহ মানুষের সকল রসস্পর্শের রেখাজালে এক নূতন পারস্য-গালিচা বুনে' তুলছে—যা' সেকালের সাহিত্যে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না। সেকালের মহাকাব্য

* প্রসিদ্ধ রসকার শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন "আন্তর্জাতিক রূপতন্ত্র" সম্বন্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত করিতেছেন। উক্ত গ্রন্থে পাশ্চাত্য দেশে এতাবৎ প্রচলিত রূপচর্চ্চা-পদ্ধতির অসারতা তিনি দেখাইয়াছেন এবং প্রকৃত সুষ্ঠু পদ্ধতি কি হওয়া উচিত তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বইখানি বাঙলা ভাষায় যে একটি মূল্যবান সম্পদ হইবে বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। বিঃ সঃ।

জাতির সকল ভাবাবেশের বাহন হ'ত—একালে মহাকাব্য নেই--এই ব্যাকুল নব্য সাহিত্যই কবিতার গুঞ্জন, বর্ণের বার্ত্তা, ধ্বনির আলেয়া ও মর্ম্মরের নিঃশব্দ আলাপন প্রভৃতি নিয়ে এক রম্যলোক সৃষ্টি করে' মানুষের হৃদয় বেপথুকে সার্থক করে' তুলছে।

জগতের সকল সম্পর্কই—তা রসমূলক হোক্ বা জ্ঞান-মূলকই হোক্—সাহিত্যে আশ্রয় পেয়ে' আশ্বস্ত ও ধন্য হয়। সাহিত্যের আসন হ'তে বঞ্চিত বা স্খলিত হ'য়ে অসহায় হয়ে পড়ে—নিজের অক্ষমতা ও ভঙ্গুরতা প্রকাশ করে। সেকালের দেবাসুরের যুদ্ধ ও বুদ্ধবোধিসত্ত্বের জীবনলীলার মূলে বিরাট দেবসাহিত্য (mythology) ছিল এবং যুগাগত চর্চ্চায় মানুষের নিজস্ব ভাবসম্পত্তি হয়ে পড়েছিল—এজন্য স্থপতি বা ভাস্করকে নূতন আশ্রয় খুঁজতে হয় নি। একালের রসসৃষ্টি একান্তভাবে ব্যক্তিগত—স্বাতন্ত্র্যই তার মুখ্য উদ্দীপনা —এজন্য এ সমস্ত বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী সৃষ্টিকে সাহিত্যের আবেষ্টন বা উপস্থাপন খুঁজতে হয়—তা' না হ'লে তা' জাতিচিত্তে স্থান পায় না। কাজেই এযুগে রূপচর্চ্চা বা তথাকথিত 'art-criticism' অপরিহার্য্য হয়েছে সকল দেশে। কিন্তু রূপালোচনা বল্‌তে দু'খানি রঙের খবর, দু'টি হাহুতাশ বা খেয়াল, ইতিহাস বা পুঁথির দু'চারটা শ্লোক উদ্ধার, কিম্বা চিত্রবহুল কেতাবের গোড়াকার টিপ্পনি বোঝায় না। সত্যিকার রূপচর্চ্চা সাহিত্যের অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তির ক্রীড়া—মনোমন্থনে জাগ্রত অনির্ব্বচনীয় ও লোকোত্তর শ্রীকে উপস্থাপন করা। সাহিত্যের রূপ সকল রূপের সেরা —সে রূপ অশেষ। সাহিত্যের তিলোত্তমায় তিল তিল করে' সকল রূপকলার নিঃশব্দ অর্ঘ্য আছে—তা' জাতির হৃদয়শতদলের রূপক—মানস-সরোবরের অগণিত নীলোৎ-পলের নিঃশেষ নিবেদন তার ভিতর গুণ্ঠিত রয়েছে।

সেকালের মহাকাব্য রচিত হ'ত মানুষের বিভিন্ন ও বহুমুখী সৃষ্টিগুলিকে এক করে'—একাধারে একটি বিরাট ঐক্য দিয়ে; একাল মহাকাব্য মানেনা—রসসৃষ্টি মানে। সেকালের অভঙ্গুর হৃদয়বত্তা একালে নেই—অথচ সকলদেশে নব্যতর বিশ্ব-সম্পর্ক যে এরকমের একটা মহত্তর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছে না একথা বলা যায় না—কারণ সকল দেশের রূপচর্চ্চার ভিতর তা' প্রস্ফুট হচ্ছে। প্রাচ্য পটকার ছবি আঁকছে—প্রায়ই সে অজ্ঞ—লেখাপড়ার ধার কমই ধারে—সেটাই হচ্ছে তার মানপত্র; রঙ ও তুলিকা হচ্ছে তা'র সম্বল। মূর্ত্তিকার মর্ম্মর খোদাই করা জানে; স্থপতি পাথর স্তূপাকার করে' প্রাসাদ রচনা করতে জানে; সঙ্গীতকার ধ্বনি নিয়ে মশগুল, সত্যিকার কবি নিজেই জানে না দুনিয়ায় সে কি সম্পদ দিচ্ছে! এ সব ছড়ান মুক্তোর এলোমেলো ব্যঞ্জনাকে দেশের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে' দেখ্‌বার ও তা'তে তাদের স্থান নির্দ্দেশ করার কাজ সাহিত্যের রূপকারের। সাহিত্যের রাজযোগীর চিত্তপটে নাট্যকারের নাট্যসৃষ্টি, কবির কাব্য, চিত্রকরের পটবাহুল্য, গায়কের ঝঙ্কার, স্থপতির গগনস্পর্শী ব্যাকুলতা এক বিরাটতর চিত্র রচনা করে—ভাষার অসীম কুহককে বর্ষণ করে'। শিল্পীদের পরিধি অতি ক্ষুদ্র; পটকার ছবি বোঝে, মূর্ত্তি বা স্থাপত্য সম্বন্ধে সে একেবারে অজ্ঞ; সঙ্গীতকার ছবির ধার ধারে না—এদের হয়ত কবিতার সঙ্গে পরিচয়ই নাই। স্থপতি ছবির রচককে হেয় চোখে দেখে—কবি হয়ত মন্দির রচনার দুর্বোধ্য জটিলতার ভিতর ঘেঁসে না কিম্বা মূর্ত্তিকারের ব্যবসাকে দুঃসহ মনে করে। এদের সকলেই এক একটা কোণ অধিকার করে' এক একটা রূপগণ্ডীর ভিতর আনাগোনা করছে—এজন্য এদেশে এদের আসন চিরকালই সমাজের অতি নিম্নস্তরেই ছিল। কিন্তু মানুষের মন একটা কোণ নয় বা কতকগুলি কোণের সমষ্টি নয়—তার ভিতর এসব নিয়ে একটা অখণ্ডলোক সৃষ্টি অনিবার্য্য হয়ে' ওঠে। তাই সাহিত্যের মহত্তর সৃষ্টির ভিতর এদের একটা ঐক্য দেওয়া সম্ভব হয়—এদের শীর্ণ খণ্ডতা, আন্তর বিচ্ছিন্নতা, ও ইতর বিরোধকে এক অখণ্ডের স্বপ্নে পরিণত করতে হয়। সেটা হ'ল একটা সৃষ্টি, সে সৃষ্টি এসবের ব্যখ্যা মাত্র নয়। রঙের বা পাথরের কারিগরিদের পক্ষে এই সৃষ্টিলোক ধারণাতীত। আজকাল চিত্র, মূর্ত্তি প্রভৃতি রচকদের ভিতর অসংখ্য চক্র হয়েছে—সকলেই পরস্পরের প্রতি খড়্গহস্ত—এক পটকার দ্বিতীয়কে একেবারেই বোঝে না কারণ সত্যিকার রসতত্ত্ব এদের জানা নেই। রেখা বা রঙের খবর এক কথা—রসচর্চ্চা বা বিশ্লেষণ অন্য ব্যাপার।

যে পাখী নীড় রচনা করে সে নীড়স্থাপত্য জানেনা—সংস্কারে তা, তৈরী করে; শিল্পীরাও সংস্কারে কাজ করে মাত্র। যে কুমোর প্রতিমা তৈরী করে সে কি ব্রহ্মতত্ত্ব জানে? এ কথাটুকুও এদেশে অনেকের জানা নেই। অপর পক্ষে সাহিত্যের সত্যিকার রূপসাধকের চোখে রূপলোকের এসব টুক্‌রোগুলি উপকরণ মাত্র—এ সমস্ত নিয়ে সে এ যুগে ও সকলযুগে নব্যতম মহাকাব্য রচনা করে' ধন্য হচ্ছে এবং জগৎকে তারই মহান্ বার্ত্তায় আহ্বান করে' উচ্চতর পাদপীঠে নিয়ে যাচ্ছে।

বল্‌তে গেলে এ যুগে এ শ্রেণীর সাহিত্যই মহাকাব্যের শূন্য স্থান পূর্ণ কর্‌তে সাহসী হচ্ছে। এ দুটি সাহিত্যের ভিতর প্রকৃতিগত ঐক্য আছে। শুধু এ দুটি সাহিত্যের ভিতর দিয়েই সকল রকমের ও সকল বার্ত্তার সমন্বয় সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। দু'টিরই কাজ হচ্ছে যুগের সকল রূপের, তত্ত্বের ও ভাবোচ্ছ্বাসের ডালিকে ঐক্য দিকে অবিনশ্বর করা। খণ্ড সৃষ্টিগুলি ইতিহাস হ'তে মুছে গেছে কিন্তু এখনও যেখানে তাদের স্থান ছিল সে রামায়ণ ও মহাভারত আছে! সাহিত্যের রস-শিল্পীর পটে সঙ্গীত, কবিতা, চিত্র, মূর্ত্তি ও হর্ম্ম্যসংগ্রহ, বর্ণের মত ন্যস্ত হয়ে মহত্তর চিত্রে পর্য্যবসিত হয়। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সেবকদের পথ এটা নয়। সে যুগে ছন্দে মহাকাব্য রচিত হ'ত; এ যুগে গদ্যের পরিধি বেড়ে' গেছে। রসব্যঞ্জনার সমস্ত প্রসাধন-সম্পদ নব্য গদ্যের অঙ্গীভূত হয়ে তাকে ভূষণে, পরিচ্ছদে ও চাঞ্চল্যে রূপসী নটীতে পরিণত করেছে; এমন কি কোথাও বা পদ্য-কারুতাকেও এ নটীর গতিবেগের কাছে হার মান্‌তে হয়েছে। এ যুগে এই ঝঙ্কারমুখর ছন্দাত্মক গদ্যে কবিতা রচিত হয়েছে তাই এ গদ্য পদ্যের সীমা আক্রমণ করে' উচ্ছ্বসিত হয়েছে; কোথাও বা—যেমন নাট্যকাব্যে—পদ্যকে নির্ব্বাসিত কর্‌তেও সাহসী হয়েছে। কাজেই যদি আজ-কালকার দিনে এ রকমের রূপাত্মক গদ্য রসের বিশ্বরূপী প্রতিমার বাহন হয় তা'তে বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই। এ যুগের মহাকাব্যের পক্ষে যুগোপযোগী বাহনই অপরিহার্য্য। তাই সকল রসের অনুধ্যায়ী ও সকল রূপের মহাচক্রী, সতীর ছিন্ন দেহের মত রূপের বিচ্ছিন্ন টুক্‌রোগুলিকে নিয়ে রচনা কর্‌ছে নব্য মহাকাব্য—সাহিত্যের বৃন্তে। মিলরাপার উচ্ছ্বাস, গেঞ্জিমনোগতরীর রূপোজ্জ্বল উষ্ণ স্বপ্ন, কোরিণের রচনা, সজানের (Cezanne) রূপসূত্র, ওয়েডেকাইণ্ডের সৃষ্টি, ও "কা" মূর্ত্তির রসবার্ত্তাকে একাধারে বোনা গণ্ডীবদ্ধ রঙের বা পাথরের কারিগরের কাজ নয়।

সাহিত্যে রসসত্য উপস্থাপনার প্রণালীও বিশেষভাবে আলোচ্য। সৃষ্টি-মাত্রেরই বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতি আছে; পশ্চিমের সাহিত্য সে দেশের সৃষ্টি ও জীবনতত্ত্বের (philosophy of life) ছন্দে নানা চেষ্টায় একটা সত্যিকার সার্থক পথ কাটতে চেষ্টা কর্‌ছে। বৈজ্ঞানিক বা যান্ত্রিক চর্চ্চার পথ রসচর্চ্চার পথ নয়। রসসাহিত্যে সকল তথ্যের সমন্বয় আছে এজন্য জ্ঞানের মানচিত্রে যে সমস্ত খণ্ড সাম্রাজ্যগুলি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির সহিত পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। তথ্যের বিশ্ব-সংগ্রহ যেমনি ভাবে, তেমনি রসসমাবেশের প্রগাঢ় ও বিচিত্র কারুতাতেও দীক্ষা চাই। এ কাজ দুরূহ; দার্শনিকেরা হয়ত রূপকলা বোঝে না, আবার কলার কালোয়াতদের কাছে রসতত্ত্ব ও বৈচিত্র একটা ধাঁধাঁ। জীবনচেষ্টার নানাদিক—সমাজ, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও প্রত্ন-সাহিত্য যেমনি ভাবে, তেমনি রসপ্রয়াণের বহুমুখী নির্দ্দেশগুলিকে আয়ত্ত না করলে এ শ্রেণীর সাহিত্যের রূপকার হওয়া মুস্কিল। ভাষা-তাত্ত্বিকের কাছে সমাজতত্ত্ব দুরূহ, বৈজ্ঞানিকের কাছে প্রত্নতত্ত্বের মৃত্যুবার্ত্তা নিরর্থক; অথচ মানুষের রসপ্রকাশের সঙ্গে সমগ্র জীবনচেষ্টা জড়িত। একটা বহুমুখী যোগ চাই—মানুষের প্রাণরস যা কিছু স্পর্শ করেছে এরাজ্যে তাকে বর্জ্জনের যো নেই। এজন্য এ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টিতে সমাজ, বিজ্ঞান, প্রত্ন ও রসতত্ত্বে সমান অধিকার চাই।

অন্য কথাও ভাবতে হবে। বৈজ্ঞানিক বা যান্ত্রিক সত্য উপস্থাপনার পথ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নয়। সাহিত্যের রসমণ্ডলে স্থাপন করতে হলে সব সময় ওজন নিয়ে বা কম্পাস কাঁটা হাতে নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায় না। একটি হৃদ্‌কম্পের ভিতর একটি যুগের প্রলয়ঝড়ের বার্ত্তা খুঁজে পাওয়া যায়—প্রাণের বা ভাববস্তুর ন্যায়শাস্ত্র (logic) জ্যামিতিক পুঁথি মানে না—তাকে প্রকাশ করার প্রথা বিভিন্ন। কাজেই তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচারের ক্ষুদ্রতা ও খণ্ডতাকে আশ্রয়

করে রসবস্তু সৃষ্টি করতে যাওয়া নিরর্থক। দুনিয়ার রসবস্তু ফরাসীরা যাকে বলে 'inedit' তারই মত; তা' ঘটনার অন্তরালে থাকে; সে অবগুণ্ঠনটুকু মুক্ত করে'ও তার খণ্ডতা দূর করে' রসলীলার নৃত্যমঞ্চে উপস্থাপিত করতে হয়; তখন সে ঘটনার চেহারাই অন্য রকম হয়ে পড়ে! কাজেই টুকরো করে' কেটেকুটে উপস্থিত করাই একমাত্র কাজ নয়—টুক্‌রোগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে যোগ করলেই কোন সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না। Bertrand Russel প্রমুখ নব্যতম বস্তুবাদীরাও (realists) মেনে নিচ্ছে, দুনিয়ার বস্তু পর্য্যায় পরমার্থ নয়—ওসব sense data মাত্র—বস্তুসত্য অনুধাবন অন্তরতম ব্যাপার। তা হলে রসবস্তু সৃষ্টিতে বাইরের তুলনামূলক চেষ্টার স্থান কোথা? রূপকারের "বিশ্লেষণ" হাসপাতালের শবব্যবচ্ছেদ নয়, দুনিয়াও একটি মৃত্যুমন্দির (museum) নয়।

দুনিয়ার সকল মৃত্যুমন্দির (museum) তন্ন তন্ন করলেও সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর অঞ্চল-ছায়া মেলে না। এজন্য জড়চর্চ্চার উৎসাহ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। রঙের পুঁথি বা লিষ্ট, রেখার তালিকা, ছন্দের খতিয়ান, প্রত্নবস্তু সংগ্রহের খুব প্রয়োজন আছে—কিন্তু এ সমস্ত রসচর্চ্চা নয়, তারই অতি সামান্য উপকরণ। নব্য বিজ্ঞানবিদ্ শাস্ত্রকে খণ্ড ও নগ্ন করে' মহতের পরিমাপ করতে যায়—যন্ত্র-জগতে মানুষের শরীর ও মনকে এমনি ভাবে শতধা ছিন্ন করা হয়েছে, কিন্তু তা'তেও ভিতরকার কোন তত্ত্ব মেলেনি। শুষ্কজ্ঞান অজ্ঞানের রাজ্যই বাড়াচ্ছে। মানুষ যন্ত্র নয়—মানুষের রসসৃষ্টিও যন্ত্রধর্ম্ম মানে না। মানুষের ভিতর সীমা ও অসীমের মিলন হয়েছে; মানুষের সৃষ্টির ভিতরও এই রূপাতীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিত্ব আছে। কাজেই এই দ্বৈতাদ্বৈতের বিচার কি ক'রে হতে পারে? এ প্রশ্ন সহজেই ওঠে। মাটি-গোঁড়া জগত বা তালপাতার শাসনকে যে ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় রসজগত উদ্ঘাটনে সে পদ্ধতি খাটবে এ আশা উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়ারাও করে নি—এ যুগের কথা ছেড়ে দি।

ইদানীন্তন সাহিত্যে রসচর্চ্চার দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, ও অপ্রাচুর্য্য দুর্ব্বলের হাতের রঙের তাস হয়ে পড়েছে। যে জায়গায় প্রবেশ দুঃসাধ্য সেখানকার কোন প্রাণবান্ অধ্যাত্ম বিধি লক্ষ্য করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সে জায়গাটি খেয়ালের রাজ্য মনে করাই এবং আবোল্ তাবোল্ বকবার একটা নির্ঝঞ্ঝাট ময়দান মনে করা এ অবস্থায় খুব লোভনীয়। আমার যা ভাল লাগে তাই ভাল আর সব ঝুট—এ হ'ল এদের কথা। সত্যিকার ভাল তারই লাগে যে এই ঐশ্বর্য্যবান 'আমি'র খবর রাখে এবং এই 'আমি'র আন্তর প্রকৃতি জানে। ভাল লাগার জান্তব সংস্কার ও ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম এ পরিচয়ের ঐশ্বর্য্য জানতে পারে না। এই 'আমি'র ও দুনিয়ার 'আমি'র একটা সমানভূমি আছে। যে এই বিশ্বভৌমিক 'আমি'কে জানে না বা পায়নি তার পক্ষে বিশ্বের রসবার্ত্তার ভিতর দিয়ে কিছু অনুভব বা প্রকাশ করা অসম্ভব। এদেরই যমজ ভাই হল তারা, যারা বলে, কবিতাও ছবি সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন কারণ ওসব নিজেই আত্মপ্রকাশ করে। রূপকলা ত' প্রকাশমূলক সে সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন কিন্তু সে প্রকাশটি কি মাটি বা ক্যান্‌ভাসের ভিতর হয় না মনের ভিতর হয়? সকল প্রকাশই চিত্ত-সাপেক্ষ—রঙের কারিগর বা চটুল আলোচকের তা জানা নেই। রঙ ও রেখাজাল চিত্তপটে ফলিত হলেই সৃষ্টি হয় মনোবৃন্তে—মাটি, পাথর, কাপড়—এসব বাহন মাত্র, সৌন্দর্য্যতত্ত্বের এসব ক-খগ এদের জানা নেই! মানুষের চিত্তাকাশেই বর্ণ ও রেখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, ছন্দ ও ধ্বনি-গুঞ্জনের রূপলতিকা উদ্ভাসিত হয়! চিত্তের এই রসবার্ত্তা যার কাছে কবিতাপাঠে বা মূর্ত্তিদর্শনে মুখর হয়ে ওঠে না সে ত পাথরের টুকরো—তার কাছে আবার রসের নিবেদন? কতকগুলি শব্দ ও ছন্দে কবিতা হয় না, রঙ ও রেখায় ছবি হয় না—এ সমস্তের জড়তা ভেদ করবার ঋকমন্ত্র—রূপসৃষ্টির প্রণব—রসবান চিত্তই ধ্বনিত করে তোলে। এ মন্ত্র যার কানে বাজেনি সেই বলতে পারে কবিতা ও গান সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার নেই। যে সৃষ্টি করতে জানে না তার কাছে সকল সৃষ্টিই ব্যর্থ।

তা হলে কি সৃষ্টির একটি প্রাণবান্ পদ্ধতির নির্দ্দেশ করতে হয় না? রসচর্চ্চা বিবৃতি মাত্র নয়; আমি যা দেখছি তার বিবৃতির প্রয়োজন হয় না, আমি যা পাচ্ছি তারই খবর

দিতে হয়। Impressional বা অনুকরণাত্মক প্রকাশ এবং Expressional বা সৃষ্টিমূলক প্রকাশে ভেদ রয়েছে। তা হ'লে যা পাচ্ছি বা সৃষ্টি কর্‌ছি তার খবর দেওয়ার পথ কি? রূপচর্চ্চার একটা আন্তর প্রকৃতি বা পদ্ধতি (critical method) নির্দ্দেশ না করলে এ শ্রেণীর চর্চ্চার ধর্ম্মটিই উপলব্ধ হবে না। অতি সহজে হাহুতাশ, উচ্ছ্বাস, ক্রন্দন, বা নীতির নেতিমন্ত্র প্রভৃতি দিয়ে এ জায়গাটি পূর্ণ করা চলে। এদেশ অনেককাল থেকে পশ্চিমের ছন্দানুবর্ত্তন করে' এসেছে। কাজেই সহজে এদেশে ওদেশের বর্জ্জিত ও ভ্রান্ত বিধিগুলি কেউ কেউ ভুল্‌তে পার্‌ছে না—যদিও জীব-বিজ্ঞানের (Biology) ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের (Historico-comparative method) অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

এ শ্রেণীর চর্চ্চায় আবিষ্ট হয়ে' পশ্চিমে এক সময় মেনে নিয়েছিল, মানুষ সৃষ্টির চারিদিকের আবেষ্টনের ফল মাত্র কাজেই এই আবেষ্টনের খবর দিতে পারলেই মানুষের বা সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা হল। এজন্য পৈত্রিক ও সমসাময়িক চারিদিকের আবহাওয়া নির্দ্দেশ করে' কবিদের জীবন ও কবিতা বোঝান হ'ত। সে কালে বিশ্বাস ছিল যে মানুষ চারিদিকের ঘটনার দাস, তার কোন স্বাধীন প্রেরণা বা গতি-শক্তি নেই। এটা হল Philosophy of continuityর দ্যোতক। মানুষ যে, সকল বেষ্টনের বাইরের বস্তু, চারিদিকের আশপাশ ঘেঁটেও যে মানুষের হৃদয়ারণ্যের বার্ত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না এজ্ঞান তাদের ছিল না। বিখ্যাত ফরাসী আলোচক Taine এবং তাঁর শিষ্যানুশিষ্যেরা এই পথে চলেছে। এরা চারিদিকের খুঁটিনাটি আবর্জ্জনা ও মাটি ঘেঁটে বিকশিত পদ্মের স্বরূপ বাইর করতে চেষ্টা করেছে। তারা সেক্ষপীয়রীয় শিক্ষার তালে তালে এই রকমের একটা গন্ধমাদনের বোঝা এযুগে পর্য্যন্ত নিয়ে চলে' এসেছে। এদেশে এখনও উদ্দাম উৎসাহে এই ধারার উপর নৌকো চালান হচ্ছে কারণ অনেকেরই খবর নেই আজকাল এ বিশ্বাসের জোয়ারও চলে গেছে এবং জলও নেই সে দেশে, যে দেশে এ পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল। এ দেশের তরুণ সিন্ধবাদ নাবিকেরও এই বোঝা সম্বন্ধে হুঁস নেই। সেকালের পণ্ডিতরা নস্য নিয়ে পুরাণ শ্লোক আওড়ায় এ নিয়ে বিদ্রূপ করা হয় কিন্তু একালের পণ্ডিতদের খবর কি?

বাইরের কয়টি ঘটনা যোগ করে' একটা সত্যের চেহারা দাঁড় করান যায় না—ভিতরকার অন্তর্গূঢ় অনেক ঘটনার নির্দ্দেশ হয়ত অন্য রকমের হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষুদ্র অজানা হাস্য ও ক্রন্দনের পুলকে নৃপতিকে সিংহাসন হারাতে হয় ও যোগীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে হয়। বাইরটা দেখে' খুঁজেও যোগ করে' কি হবে? এ যুগের Panpsychic বা মনস্তাত্ত্বিক নাটকগুলি এই গুণ্ঠিত জগতের বিরাটত্ব প্রকাশ করে' দুনিয়ায় যান্ত্রিক পরিমাপের মূঢ়তা দেখাচ্ছে। ঘটনা (mileu) ও মুহূর্ত্তগুলি ঘাঁটলেও অনেক সূক্ষ্মবার্ত্তা ও গূঢ় হিল্লোল বাকি থাকে! টেইনের সেক্ষপীয়রীর আলোচনার মূলে যে এ রকমের দুর্ব্বলতা আছে তা' এখন স্বীকৃত হয়েছে। অপর পক্ষে আর একটা গভীরতর পদ্ধতিও দেখা যায়। সেটা হচ্ছে Philosophy of discontinuityর দ্যোতক। র‍্যামুভিয়ে হ'ল এ পদ্ধতির পথ প্রদর্শক। ইনি ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে বিপজ্জনক মনে করেন। তাঁর মতে কোন জীবন্ত সত্যের ইতিহাস আবেষ্টনের ভিতর থাকে না। র‍্যামুভিয়ের এই নব্য চর্চ্চার (Le Neocriticism) মতে দুনিয়া একটা-মাত্র রেখার বা টানের ইতিহাস নয় এবং কোন কিছুই দুনিয়ায় অবশ্যম্ভাবী নয়; কাজেই ঘটনা শ্রেণীবদ্ধ করে কোন রসবস্তু বা জীবনতথ্যের অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করতে যাওয়া মূঢ়তা। প্রতি মুহূর্ত্তেই সমগ্র অতীত ও বর্ত্তমানের বেষ্টনী তুচ্ছ করে' নূতন রস সৃষ্টির প্রকাশ হ'তে পারে—এ হ'ল এর মূল কথা। মানুষ অতীতের দাস নয়, সে চিরজয়ী—স্থান ও কালের অধীশ্বর; কাজেই সৃষ্টির মানে খুঁজতে গিয়ে অতীতের উপলখণ্ড কুড়োন ক্ষ্যাপামি মাত্র। সৃষ্টির বীজ অতীতে নয়, উপস্থিতে।

এই পদ্ধতির ভিতর প্রাণতত্ত্বের ও সৃষ্টির সূক্ষ্মতর স্বীকৃতি আছে এবং সাহিত্যের প্রকাশমূলক স্বাধীনতার স্থান আছে। বলা প্রয়োজন নব্যতর রসসাহিত্য এই তত্ত্বের স্বীকৃতি ও স্বাধীন প্রেরণায় রসব্যঞ্জনার বিপুল ঐশ্বর্য্যকে উদ্‌ঘাটন করতে সাহসী হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমের খণ্ডবাদের

পক্ষপাতিত্ব সকল পদ্ধতিগুলির মূলেই প্রচ্ছন্নভাবে কাজ কর্ছে। সব জায়গায়ই সমগ্রত্বের প্রাধান্য নেই যদিও সামান্য আভাস আছে মাত্র। পশ্চিমের আন্তরছন্দ খণ্ডতলে পক্ষপাতী। একটি কেন্দ্র হ'তে বা একএকটি দৃষ্টিকেন্দ্র হ'তে (angle of vision) দেখে একএকটা খণ্ডতলকে (sectional plain) আশ্রয় কর্বার জন্য সেখানে মন ব্যাকুল; এজন্য সেখানে মন্দির বা মূর্ত্তির এমন কি সব কিছুরই section বা খণ্ডতল রচনা করে' মন তৃপ্ত হয়। কাজেই একটা অভিশাপের মত (original sin)এই খণ্ডতার আকর্ষণ পশ্চিমের রসরচনাকে কোন কোন জায়গায় ব্যর্থ ও বিভ্রান্ত করে' তুলেছে!

এ অবস্থায় রসচর্চ্চার একটা সুষ্ঠুতর পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা একান্ত অনিবার্য্য মনে হয়। লোকোত্তর সৃষ্টির বার্ত্তা শুধু কয়েকটা অংশকে উপস্থাপিত করে দেওয়া যায় না—অখণ্ড সৃষ্টিও খণ্ডকে যোগ ক'রে হয় না। পশ্চিম এ পথে অনেকটা পথহারা বলে' এ দেশ থেকে কিছু বলা হবে না এমন কোন কথা হ'তে পারে না। কিন্তু বিস্তৃতভাবে সে বিষয় বল্তে যাওয়া এখানে সম্ভব নয়। এ দেশে লোকোত্তরের উপলব্ধি ও প্রকাশের জন্য এক সময় প্রচুর সাধনা হয়েছে। স্থূল-জগতেও সে ইতিহাসের পরিস্ফুট প্রতিভাস আছে। এদেশে চাক্ষুষ দৃষ্টির কি প্রথা ছিল? ভারতবর্ষে দেবদর্শনের একটা প্রথা ছিল প্রদক্ষিণ করা; এজন্য মন্দির প্রদক্ষিণ করা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। প্রদক্ষিণ করার মানে কি? একটা বস্তুকে চক্রাকারে চারিদিক ঘুরে দেখ্লে যে রূপ চোখে পড়ে, একদিক বা পাঁচদিক ঘুরে দেখ্লে তা পড়ে না। বার বার প্রদক্ষিণ করে' যে রূপ প্রস্ফুট হয়ে থাকে জড়বস্তুর সম্পর্কেও সেই দৃষ্টিই সত্যোপেত, কারণ তা' সংহতিমূলক ও সম্পূর্ণতার দ্যোতক। প্রতি বস্তুরই বিশ্বরূপ আছে; বিশ্বতোমুখী অসীম দিক্ হ'তে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্লেই তা চোখে পড়ে এবং চিত্তে সে মূর্ত্তিচয় ঐক্য লাভ করে। এটা পাঁচটা দিক্ থেকে দেখা মাত্র নয় এবং পাঁচটা section বা খণ্ডের নক্সা যোগ করা নয়। এ ক্ষেত্রে অধীক্ষা নয়, পরীক্ষাই প্রয়োজন। আরম্ভ ও সমাপ্তির একটি জায়গায় অক্ষত ও অনিবার্য্য যুগ্মসম্ভাষণ চাই। বৃত্তগতির অক্ষত সমাপ্তি একটা অখণ্ডতার স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে। সার্থক দৃষ্টি এমনি ভাবে ঐক্য লাভ করে—একটা বিশ্বমুখী দৃষ্টিচক্রের রেখা হ'তে কেন্দ্রাধিষ্ঠিত বস্তুকে পর্য্যবেক্ষণ করে'। এ রকমের সুষ্ঠু সমাপ্তির একটা স্থূল নির্দ্দেশ এ দেশের রস জগতের রম্য-সৃষ্টিতেও আছে। রাসলীলাতে তাই শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবিন্দু করে চক্রনেমির আবর্ত্তে নৃত্যগতির নির্দ্দেশ আছে। এ রকমের দেখা monocentral বা এক-কেন্দ্রিক নয় বা multicentral বহু-কেন্দ্রিকও নয়। এ হ'ল circum-central বা পরিকেন্দ্রিক পর্য্যবেক্ষণ। এদের ভিতর আকাশ পাতাল ভেদ রয়েছে। চক্রাবর্ত্তনে খণ্ডতা বা বিরতি নেই তাই চক্র অসীমতার দ্যোতক। প্রদক্ষিণক্রিয়ার অক্ষত ও বিরামহীন গতিচক্র যে অনির্ব্বচনীয় ঐক্য সৃষ্টি করে তা' আর কোন উপায়ে সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়লোকে এ পদ্ধতি স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণকে এবং অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী প্রথাকে সমন্বয় করেছে। অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধির পথও এই রকমের—তা'তেও আবর্ত্তনমূলক অনুভূতি এবং circumcentral দৃষ্টি বা পরীক্ষা চাই। এ দুরাজ্যেই শুধু বহু দৃষ্টি নয়—অখণ্ড দৃষ্টির সমীকরণ প্রয়োজন।

যা লোকোত্তর—যা সীমা ও অসীমের অন্যান্যিত্ব গ'ড়ে তোলে এ পদ্ধতিতেই তা'র শুধু আলোচনা সম্ভব। চারিদিক দিয়ে ঘুরে' কষে' নিতে হবে প্রাণবস্তুকে—অবশ্যম্ভাবিতার লৌহনিগড় বা স্বেচ্ছাচারিতার অত্যাচার এ দু'টিকে নিয়ন্ত্রিত কর্তে হবে একটা পরিক্রমার ছন্দে—একটা মধ্যবিন্দু আকর্ষণে—তবেই সার্থক রসমন্দিরের স্বর্ণচূড়া দেদীপ্যমান হবে। শুধু পূর্ব্বাঞ্চলে নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও সৌন্দর্য্যলোক উপলব্ধি ও দৃষ্টির এই দেবযান পথ অনভিজ্ঞাতভাবে নব্য সাহিত্যে গৃহীত হচ্ছে। এ পথই সার্থক পথ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

অজ্ঞাত বাস

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

১০

ঠিকানা লেখার ভুলে চিঠিখানা লণ্ডনের দুতিনটে পাড়া ঘুরে এসেছে। বুধবারে সুধীর হস্তগত হল। সুধী না খুলেই চিন্‌তে পার্‌ল উজ্জয়িনীর চিঠি। কি লিখেছে বেচারি উজ্জয়িনী?

লিখেছে,

"সুধীদাদা,

আপনাকে কত কাল লিখিনি। লিখে কি ফল হত বলুন। আপনারা ত কিছুতেই আমাকে বুঝ্‌বেন না। আমার প্রাণ কি যে চায় আমি নিজেই বা তার কতটুকু বুঝি। তবু এক কথায় বলি আমি আমার অবস্থাকে লঙ্ঘন করে অতীতকে অতিক্রম করে দেহমনকে পিছনে ফেলে কোথাও একজায়গায় পালিয়ে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাই। ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, তাঁর মধ্যে হারিয়ে যাব, আমার সত্তা থাকুবে না, আমার চিহ্ন থাক্‌বে না।

পাগলের প্রলাপ। না?"

এই পর্য্যন্ত পড়ে সুধীর চোখে জল আসে আর কি। দুই বিভিন্ন স্থানে দুটি বিভিন্ন মানুষ, মাঝে সাত হাজার মাইল ব্যবধান—বাদল ও উজ্জয়িনী একই সময়ে একই কথাই ভাব্‌ছিল, ওরা সত্যিকারের স্বামী স্ত্রী। দুজনেই চাইছিল নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে—বাদল ত হয়ে গেলই, এখন উজ্জয়িনী কি করে দেখা যাক্।

"পাগলের প্রলাপ। না? আমারও তাই মনে হয়। কাজেই আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা মৌলিক নয়। কিন্তু পাগল মাত্রেই অশ্রদ্ধেয় নয়। এবং চেষ্টা কর্‌লে পাগলের প্রলাপেরও অর্থ-বোধ হয়। তারপর পাগলামীর দ্বারা এমন অনেক কাজ হাসিল করা যায় ভদ্রতার দ্বারা যা অসাধ্য। এই ধরুন মিসেস স্যামুয়েল্‌সের বিদায়। মিসেস স্যামুয়েল্‌সের পরিচয় দিই। মায়ের বন্ধু, মিশনারী বিধবা। আমাকে *সামাজিকতা শিক্ষা দিতে মায়ের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন।* ভাল মানুষ, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ একটা ভাণ নয়। কিন্তু আমার সাধনার বৈরীকে আমি প্রশ্রয় দেব কেন? যা আমার ভাল লাগে না তা আমার ভাল লাগে না। এই চূড়ান্ত। আমি তর্ক না করে এই কথাটা প্রলাপের মত করে বুঝিয়ে দিলুম। মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ বুদ্ধিমতী। আমার সংসারে আমি মালিক, আমার মা নন্। তবে যদি তিনি আমার শাশুড়ীর শূন্য স্থান পূর্ণ কর্‌তেন তবে সে হত ভয়ানক ভাবনার কথা। আমার শ্বশুর আকারে ইঙ্গিতে অমন প্রস্তাব করেন নি তা নয়। কিন্তু মিসেস স্যামুয়েল্‌স্ একদিন আমাকে স্পষ্টই বল্‌ছিলেন, "বর্ণভেদ বিধাতার হাতে, ভিন্ন বর্ণাকে আমি অনাদর করিনে। কিন্তু ধর্ম্মভেদ? মানুষের কেবল একটিমাত্র ত্রাণ-কর্ত্তা, সুতরাং একটি ধর্ম্ম। God so loved the World that He gave His only son...."

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ যেমন অকস্মাৎ এসেছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন। আমার জীবনে তাঁর কি প্রয়োজন ছিল ভাব্‌ছি। বোধ করি আমাকে পরীক্ষা কর্‌তে ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। মাঝখান থেকে আমার শ্বশুরের হৃদয়ে আঘাত রেখে গেলেন। প্রথমটা তিনি এখুনি বিলেত যাবেন বলে ক্ষেপেছিলেন। (সেখানে বিয়ে করা কি এতই সোজা?) ছুটী পাওয়া গেল না। এই সময়টাতে সাহেবরা ফার্লো নেয়, বাঙ্গালীকে ছ মাসের জন্য মোটা মোটা গদিগুলো ছেড়ে দেয়। কাজেই শ্বশুর মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট হবার আশ্বাস পেয়ে শীতকালের আশায় দিনপাত কর্‌ছেন।

আমরা হয়ত পুরী কিম্বা পূর্ণিয়া যাচ্ছি। পাটনা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।"

সুধী বুঝ্‌ল কার স্মৃতি! বেচারি উজ্জয়িনী—বাদলের উর্ম্মিলা! সুধী পড়তে লাগ্‌ল :

"ইতিমধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়েছে। তার নাম করুণা। করুণাকে দেখে সত্যিই করুণা হয়। শুধু তার উপর করুণা হয় তাই নয় নিজের উপর করুণা হওয়া কমে। তার স্বামী থাকেন সমস্ত দিন আপিসে, বাড়ী ফিরেই পাড়ায় হাজিরা দিতে যান, অর্দ্ধেক রাত্রি অবধি তাস খেলা চাই। আবার ভোরে উঠে বেরিয়ে যান বড় দেখে মাছ কিন্‌তে, ওটি না হলে তাঁর চলে না। স্ত্রীকে ভালবাসেন না এমন নয়। কিন্তু সে ভালবাসায় কোথাও এতটুকু রং নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়ত চব্বিশটি কথা বলেন না স্ত্রীকে; বলার দরকার বোধ করেন না। রাগ করেন না, হাসেন না, অভিমান করেন না, খুবই ভদ্র। কি যে স্ত্রীর অপরাধ তা ত আমরা অর্থাৎ বীণা আর আমি অনুমান কর্‌তে পারলুম না। ভদ্রলোকের নামে কোনো অপবাদ শোনা যায় না। চিরকাল পিতৃমাতৃভক্ত। লেখাপড়ায় ভাল। মা বাবা যেখানে পাত্রী স্থির কর্‌লেন সেইখানেই বিবাহ কর্‌লেন। আপত্তির আভাস পর্য্যন্ত দিলেন না, মেয়েটি সুশ্রী, সরল, সৎ। শাশুড়ীর নির্দ্দেশ অনুসারে সমস্ত ক্ষণ খাটে। দেওরদের আব্‌দার অত্যাচার বিনা বাক্যে সয়। একটি ছেলে হয়েছে, সেটির যত্ন নিতে জানে না, কোনোদিন শিক্ষা পায় নি, সেজন্য দেওরদের কাছে বকুনি খায়। ছেলে যেন ওদেরই, তার নয়। স্বামীর কাছে নালিশ করে না, কর্‌লে কোনো প্রতিকার হত না। শ্বশুর তার পক্ষ নিয়ে দুটো শক্ত কথা বলেন, তাইতেই সে খুসী।

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা নতুন দিক আমার চোখে পড়েছে। আমরা মেয়েরা স্বভাবত কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি আমাদের মনোনয়ন করে ঘরে আনেন। স্বামীর চাইতে শ্বশুরকেই আমরা আপনার বলে জানি। তাই স্বামী বিয়োগে পুনর্ব্বার বিবাহ করিনে। স্বামীর স্নেহ না পেলে শ্বশুরের স্নেহ পেয়ে দুঃখ ভুলি। করুণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই শিক্ষা লাভ কর্‌লুম।"

সুধী বুঝ্‌ল উজ্জয়িনী নিজের দুঃখ ভুল্‌বার এই উপায়টা খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, শ্বশুরের স্নেহ পায়নি বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উজ্জয়িনী তা স্বীকার করেনি। সে বলে,

"এই মিথ্যা সংসার আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না, এর ছলনা আমি ভেদ করেছি। এর মধ্যে কাণা কড়ির সত্য নেই, শান্তি নেই। সংসারের নিয়ম কানুন মেনে ঘোরতর সংসারী হয়ে যারা ধন মান পদ মর্য্যাদায় বড় হয়েছে তারা মূর্খ। যারা সংসারের প্রশংসা কুড়িয়ে বাহবা পেয়ে ভালমানুষ হয়েছে তারা মূঢ়। আমি উল্কার মত ছুটে বেরিয়ে পুড়ে জুড়িয়ে নিবে হারিয়ে যেতে পার্‌লে বাঁচি। সংসারের বাইরে আমার জীবন কাটি। না জানি কোন নক্ষত্রে আমার বাসা। তাই ত আমি রাত জেগে তারার দিকে চেয়ে থাকি। আমার ঘরের জানালা দিয়ে অনেকখানি আকাশ ঘরে আসে। জানালা খোলা রেখে মেজেতে গড়িয়ে পড়ি।"

ভাগবত উপলব্ধির কথা উজ্জয়িনী উত্থাপন করেনি। বোধ হয় সুধী পছন্দ কর্‌বে না অনুমান করে। বীণার কথাও বিশেষ উল্লেখ করে নি। বোধ হয় সুধী বীণার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্‌তে বল্‌বে ভেবে। বাদলের কথাও জান্‌তে চায়নি। বোধ হয় না চাওয়াটাই সুধীর মনে লেগে ফলপ্রদ হবে জেনে। শেষে লিখেছে,

"আপনাকে কত কথা জানিয়ে ফেল্লুম, ফেলে অনুতাপ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে আমার স্বত বিশ্বাস হয়। আমার বড় ভাই নেই। বড় ভাই কেন, কোনো ভাই নেই। আপনাকে ভাই ভেবে আমার খানিকটে ভার নামে।"

১১

বাৎসল্যে সুধীর অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়। আহা, ছোট বোনটি। বাপ মা'র সঙ্গে ঝগড়া করেছে, স্বামীর প্রেম পায়নি। শ্বশুরকে শ্রদ্ধা কর্‌তে পারে না। কি যে তাকে নিয়ে করা যায়। দূর থেকে উপদেশ দেওয়া সোজা,

এর মত হও ওর মত হও বল্‌তে পারা সুলভ, কিন্তু তার অবস্থায় পড়লে নিজে কি করতুম সেইটে বিবেচনা করতে হয়। উজ্জয়িনীর বয়স সতের আঠার, ও বয়সে কজন পুরুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, যেথানে ইচ্ছা ভাগ্য-পরীক্ষা করে বেড়িয়েছে? ইউরোপেও ঐ বয়সের তরুণী মেয়েকে নিরাপদে ও সসম্মানে স্বাবলম্বী হতে সচরাচর দেখা যায় না। সুজেতের মত যারা দোকানে কাজ করে তাদের উপার্জ্জন এত স্বল্প যে পৈত্রিক বাড়ী বা বাসা না থাক্‌লে তারা পথে বস্‌ত।

যে নারী ভাগ্যদোষে স্বামী ও শ্বশুরের স্নেহ হারিয়েছে সে নারী পিতামাতার আশ্রয় গ্রহণ করে, যার সে আশ্রয়ও নেই আমাদের সমাজ তার কোনো ভদ্র আশ্রয় রাখেনি। বয়স একটু বেশী হলে সে রাঁধুনীবৃত্তি করে দাসীবৃত্তি করে কোনো ধনী পরিবারে একটুখানি মাথা গুঁজ্‌বার ঠাঁই পেতে পারে; বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যালয় সম্মত হলে চাকরী পাওয়াও সম্ভব, কিন্তু উজ্জয়িনী কোনোটাই পাবে না। না পাবার সব চেয়ে বড় কারণ সে তার বংশপরিচয় গোপন রাখ্‌তে পারবে না, অবশেষে তার বাবা কিম্বা শ্বশুর তাকে পাকড়াও করে বাড়ী ফিরিয়ে আন্‌বেন।

মহিমচন্দ্রের উপর সুধীর ভরসা ছিল। উজ্জয়িনীর এই পত্র পেয়ে কিছু কম্‌ল। এই বয়সে তিনি নূতন করে সংসার পাৎবার উদ্যোগ কর্‌ছেন, সেই ঝঞ্ঝাটে ছেলেকে কয়েক সপ্তাহ চিঠি লিখ্‌তে পারেন নি, বাদল শুন্‌লে কি মনে করবে। সুধী লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ বোধ কর্‌ছিল। দূর থেকে এই! নিকট থেকে উজ্জয়িনী যা বোধ করেছে তার সমস্তটা জ্ঞাপন করেনি নিশ্চয়। যে বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেয়েছে সে আবার মানুষ খুঁজ্‌তে থাকে। মহিমচন্দ্র মিসেস স্যামুয়েল্‌সের পদ শূন্য রাখ্‌বেন না বলে আশঙ্কা হয়। সকলেই কিছু মিসেস স্যামুয়েল্‌সের মত ভাল হবে না। তা হলে বেচারি উজ্জয়িনীর কি দশা হবে? বৈষ্ণবজনোচিত সহিষ্ণুতা ও সুনীচতা উজ্জয়িনীর স্বভাবে শিকড় গাড়ে নি। সে তেজী মেয়ে। যেটা তার ভাল লাগে না সেটা তার ভাল লাগে না। এই যদি চূড়ান্ত হয় তবে সে হয়ত একটা কাণ্ড করে বস্‌বে। যদি রাগ করে কোথাও চলে টলে যায়—ধর বীণাদের বাড়ীতে—তবে আর কিছু না হোক একটা প্রহসন হবে। যে পাখীর ডানায় জোর নেই, কিন্তু প্রাণে আকাশের আকুতি, সে পাখী মাটীর উপর ডানা ঝটপট করবে কিছুকাল, তারপর খাঁচায় ঢুক্‌বে, যদি না ইতিমধ্যে বিড়ালের মুখে পড়ে থাকে।

মহিমচন্দ্রকে সুধী চেনে। চিন্তাশীলতা, সৌন্দর্য্যবোধ, কল্পনাবৃত্তি তাঁর নেই। আইডিয়ালিসম্‌ তাঁর স্বভাবে সয় না। হয় আর্থিক নয় পারমার্থিক লাভ ও লোভ তাঁকে অবিশ্রান্ত খাটায়। খাটুনির জোরে লোকটা সরকারী চাকুরেদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। অসাধারণ তাঁর য়্যাম্বিশন। একটা উপাধি পেতে না পেতেই আর একটার জন্য দেহপাত। বছরে বছরে তাঁর পদোন্নতি হওয়া চাই, নতুবা জীবন বৃথা গেল, গবর্ণমেণ্ট তাঁর যোগ্যতার মর্য্যাদা রাখ্‌ল না। একদিক দিয়ে এর ফল ভাল হয়েছে। তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি, স্ত্রীজাতির প্রতি দৃক্‌পাত করেন নি। কেউ ঘুষ দিতে এলে তিনি ঘুষি পাকিয়ে তাড়া করে গেছেন। পান দোষ থেকে মুক্ত। তবু তাঁর সঙ্গে বাস করা উজ্জয়িনীর পক্ষে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হবে। শ্বশুর বাড়ীর মোহ যথন অপগত হবে তখন উজ্জয়িনী তাঁকে পরিহার করতে ইচ্ছা করবে। তারপর যদি সত্যই তিনি স্ত্রী গ্রহণ করেন তবে সেই ইচ্ছা ব্যাকুলতায় পরিণত হবে। তখন কি উপায়? বাদলটা ত অবুঝ। যোগানন্দকে বোঝান যায় না?

উজ্জয়িনীর ভাগবত উপলব্ধির উল্লেখ না থাকায় সুধীর আশা হল হয় ত উজ্জয়িনীর প্রাথমিক উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে এসেছে, অপরকে অংশ দেবার উৎসাহ অস্তমিত হয়েছে। তা যদি হয় তবে যোগানন্দের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া অল্পায়াসে ঘটবে। যোগানন্দের প্রাথমিক বিস্ময় ও বিরক্তি এতদিনে পুরাতন হয়ে পূর্ব্বের উগ্রতা হারিয়েছে, তিনি হয় ত বাদলের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকে অপরাধী কর্‌ছেন। পিতাপুত্রীর সন্ধির পক্ষে এই অবস্থা ও এই মুহূর্ত্ত অনুকূল। সুধী যোগানন্দকে চিঠি লিখ্‌ল।

লিখ্‌ল, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন আমরা অতিরিক্ত ভক্তিপ্রবণ হয়ে উঠি।

আমাদের পাপবোধ প্রবল হয়, আমরা নিজেকে নিপীড়ন করে শান্তি পাই, আহার নিদ্রা কমিয়ে দিই, স্নান করে ধ্যান কর্‌তে বসি, শুচি বায়ুগ্রস্ত হয়ে সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা দেখি, আমিষ ছাড়ি, হবিষ্যান্ন খাই, একাদশী করি। অনেকেই আমাদের গুরু হন, অনেকের অজ্ঞাতে আমরা তাঁদের একলব্য হই, বাঁধান খাতায় বচন উদ্ধার করি, ডায়েরী রাখি, প্রতিদিন সংকল্প করি মহৎ হব, আক্ষেপ করি মহৎ হতে পার্‌ছিনে, ভগবানকে প্রার্থনা করি, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ি, অকারণে চোখের জল ফেলি।

উজ্জয়িনীর এখন সেই বয়স। এ বয়সকে আপনি এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। অবস্থা যেই অনুকূল হল বয়োধর্ম্ম অমনি চেপে ধর্‌ল। বাদল তার কাছে থাক্‌লে তার ভক্তিবৃত্তি স্বামী অভিমুখে ধাবিত হত। সে স্বামীর পট পূজা কর্‌ত, স্বামীসেবার নানা ফুল খুঁজে স্বামীর পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিত, এমনি আত্মনিগ্রহ কর্‌ত। বাদল অকালে বিদায় নিল, সকল রকমে বিদায়। স্ত্রীকে সে অস্বীকার কর্‌ল। দেশকে সে অস্বীকার কর্‌ল। তার ভাব থেকে মনে হয় বন্ধুকেও সে অস্বীকার করবে। সাতদিনে একদিন তার বিজ্ঞাপন পড়্‌তে পাই। শুধু এইটুকু বার্ত্তা, SUDHIDA,—I AM. উজ্জয়িনীর হয়ে তাকে আমি অনেক বলেছি। তার এক কথা, সে কারুর সঙ্গে বাঁধা থাক্‌তে অপারগ। তাতে তার মুক্ত মানসিকতা পীড়া পায়। হয় ত একদিন তার এ পাগ্‌লামি সার্‌বে। সৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার না করে মুক্তি কোথায়?

কিন্তু বাদলের জন্য অপেক্ষা করা উজ্জয়িনীর পক্ষে দুরাশা হবে। সে কেমন করে একথা বুঝ্‌তে পেরেছে বলে হরিভক্ত হয়েছে। হাতের কাছে অন্য কোনো ভক্তির উপকরণ পায় নি, উপলক্ষ পায় নি। ইউরোপে থাকলে বোধ করি কুকুর-ভক্ত হত।

তার এ বয়স চিরস্থায়ী হবে না। কারুর জীবনে হয় না। এর পরবর্ত্তী বয়স সংশয়ের অশ্রদ্ধার। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছেই। স্বামী থাক্‌লে স্বামীর উপর দিয়েই সুরু হত। স্বামীর অভাবে দেবতার উপর দিয়ে। উজ্জয়িনী নিজের বানান মূর্ত্তি নিজের হাতে ভাঙবে। যাদেরকে গুরু করেছে তাদেরকে দূর করে দেবে। এক আতিশয্যের স্থলে আর এক আতিশয্য। তারপরে সংযমের সময় আস্‌বে। কার জীবনে কখন আসে বলা যায় না। কারুর কারুর জীবনে কোনো কালে আসে না। আশা করি উজ্জয়িনীর জীবনে যথাকালে আস্‌বে।

বাদলের অপেক্ষা না রেখে কেমন করে এই সংযম সম্ভব হবে জানিনে। তবে বিধাতা আমাদের একান্ত পর-নির্ভর করে গড়েন নি। নিজের মধ্যে নিজের পূর্ণতা উহ্য রয়েছে, খুঁজে নিতে হবে। উজ্জয়িনীর উপর আমার ভরসা আছে, সে পরমুখাপেক্ষী হবে না।

ভরসা আছে, সেই সঙ্গে ভাবনা আছে। তার শ্বশুর বাড়ীতে সে তার স্বামীর অধিকারে আছে। স্বামী যদি তাকে অস্বীকার কর্‌ল তবে সে কার অধিকারে থাক্‌বে? শ্বশুর তাকে অস্বীকার কর্‌বেন না বটে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু না লেখাই ভাল। ধরে নেওয়া যাক্ শ্বশুরের অধিকার দুর্ব্বল হয়ে আস্‌বে। শ্বশুরের স্নেহ সে এখনকার মত পাবে না। তা হলে সে দাঁড়ায় কোথায়? ভাত কাপড়ের জন্য শ্বশুরের আশ্রয়ে পড়ে থাকা তার পক্ষে মরণাধিক। অথচ স্বাবলম্বী হবার মত শিক্ষাও সে পায় নি। যার হাতে জোর নেই তার মনে উচ্চ চিন্তা থাকা করুণরসাত্মক। এই জন্যই আমার ভাবনা। কিন্তু আমি ত তার স্বামীর বন্ধু ও পাতান ভাই, আপনি তাঁর পিতা ও প্রথম গুরু। আপনার ভাবনা আরো নিত্যকার, আরো সত্যকার। আমি জানি আপনি কেবলমাত্র তার মনের ভবিষ্যৎ ভাব্‌ছেন না, তার ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের চিন্তাও কর্‌ছেন।

১২

চিঠিখানা নিকটতম পিলার-বক্স-এ দিয়ে সুধী বহুল পরিমাণে নিশ্চিন্ত হল। যোগানন্দ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভাবগ্রহণ কর্‌বেন।

সুধীর সঙ্গে অনাহূত ছুটে গেছ্‌ল মার্সেলের কুকুর জ্যাকী। তাকে এদানীং বেঁধে রাখা হয় না, কিন্তু বদ্ধ রাখা হয়। দুয়ার খোলা পেয়ে সে ত সুধীর সঙ্গে চল্‌ল; মৎলবটা এই যে মার্সেলের কাছে বকুনি খাবার সময় জিভ

লক্ লক্ কর্‌তে কর্‌তে সুধীর দিকে চেয়ে দোষটা সুধীর ঘাড়ে চাপাবে। যেন সুধীই তাকে আদর করে ডেকে সঙ্গী করেছিল।

সুধী ডাক্‌ল, "জ্যাকী, আয়, ফিরি।"

জ্যাকী শোনে না। সামনের বাড়ীর সামিল বাগানে ঢুকে একটা বিড়ালকে তাড়া করেছে। বিড়ালটা যেখানে লুকাতে চেষ্টা করে সেখানে জ্যাকী। বিড়ালটা চুপ করে বসলে জ্যাকী একটা থাবা বাড়িয়ে দিয়ে একটু রঙ্গ করে, বিড়ালটা ফুলতে থাকে। সুধী ডাকে, "জ্যাকী।" জ্যাকী না শোনার ভাণ করে। সুধী অত্যন্ত লজ্জা বোধ করে। বিড়ালের ও বাগানের মালিক যদি দেখ্‌তে পান্ কি ভাব্‌বেন। সে বিরক্তির সুরে ডাকে "জ্যাকী।" কুকুরটা ল্যাজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে সুধীর দিকে তাকায়, যেন সেও লজ্জিত। কিন্তু বিড়ালকে এক পা এগোতে দেয় না।

অগত্যা সুধীকে অপরিচিতের দরজায় কড়া নাড়্‌তে ও বেল টিপ্‌তে হল। দরকারটা জরুরি। একটি খোকা দরজা খুলে সুধীর রং ও পাগড়ি দেখে পিটটান দিল। একটি মহিলা হাঁফাতে হাঁফাতে এলেন। এসেই বল্লেন, "No hawkers allowed," অর্থাৎ সুধীকে ঠাওরালেন ফিরিওয়ালা। সুধী মৃদু হেসে বল্ল, "ফিরি কর্‌বার মত কিছু নেই।" এই বলে দুই হাত ডানার মত মেলে দেখাল। মহিলাটি তার দিকে কটমট করে তাকালেন। বল্লেন, "কি জন্য এসেছেন?" সুধী আঙ্গুল দিয়ে নির্দ্দেশ করে বল্ল, "আমার কুকুর আপনার বিড়ালকে তাড়া করেছে, হুকুম মান্‌ছে না। বাগানে প্রবেশ কর্‌বার অনুমতি পেলে তাকে ধরে আন্‌তে পারি।" এ কথা শুনে খোকা বাগানের ভিতরে লাফ দিয়ে ছুট্‌ল। মহিলাটি বল্লেন, "আসুন।"

ততক্ষণে বিড়ালটি ভয়েই মরে গেছে। তার সঙ্গে একটু পরিহাস কর্‌ছিল। গায়ে আঁচড়টি দেয় নি। সুধীকে দেখে জ্যাকী ল্যাজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে এগিয়ে এল। পরিহাসের পরিণাম বেচারাকে বড় অপদস্থ করেছে।

খোকা বিড়ালটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। নুয়ে পড়ে চোখে চোখ রাখ্‌ল। বিড়ালটি তুলে চার পায়ে খাড়া কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ল। অবশেষে কান্নার সুরে বল্ল, "O Mummy!" তার মা সুধীর দিকে তাকালেন। সুধী তখন অন্যমনস্ক। জীবন-মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাকে মুগ্ধ কর্‌ছিল।

মহিলাটি বল্লেন, "এবার আপনার কুকুরটাকে নিন্ এবং যান।"

সুধী বল্ল, "কুকুরটাকে রেখে বিড়ালটিকে দিন।"

মহিলাটি সুধীর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভাব্‌লেন।

খোকা লাফিয়ে উঠে মায়ের মুখে চোখ রেখে আব্দারের সুরে বল্ল, "Yes Mummy."

মা কঠিন হয়ে বল্লেন, "তা হয় না।"

খোকা কুকুরটার দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইল, বিড়ালটার কথা ভুলে গেল। কুকুরটা ততক্ষণে আবার খেলা কর্‌তে লেগেছে—এবার নিজের ল্যাজের সঙ্গে।

খোকার মা বল্লেন, "আপনি ওটাকে নিয়ে যান। আমরা আমাদের বিড়ালকে গোর দেব।"

সুধী অগত্যা তাই কর্‌ল। জ্যাকী লক্ষ্মী ছেলের মত ধীরে ধীরে সুধীর সঙ্গ রাখ্‌ল। সুধী ভাব্‌ছিল, ব্যবধান ত নেই। একটা মুহূর্ত্তেরও ব্যবধান ত নেই। জীবনের পিঠ পিঠ মরণ। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে। চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিলে কে? জ্যাকী। দুষ্টু ছেলেতে যা করে থাকে সে তাই করেছে। প্রকৃতি সবাইকে দিয়ে সমস্তক্ষণ চাকাটাকে ঘোরাচ্ছে। জীবনের পিঠ পিঠ মরণ। কিন্তু মরণের পিঠ পিঠ জীবন আছে কি? জীবনের বেলা ত দেখি জীবনের ভিতর থেকে জীবন আসে। তা আসুক। কিন্তু কি করে থাকে? জীবনের ঘড়িতে প্রতিদিন চাবি দেয় কে? মরণ। এই বিড়ালের মৃতদেহ বহু কীট কীটাণুর জীবন-কালকে দীর্ঘতর কর্‌বে। মরণের পিঠ পিঠ আয়ু। কার মরণে কার আয়ু সে কথা তুচ্ছ। মরণ নামক সত্যের উত্তরাধিকারী আয়ু নামক সত্য।

বাসায় পৌছবার মুখে সুধী যাকে দেখ্‌ল সে একটা টেলিগ্রাফ পিয়ন। ইংলণ্ডে সাধারণত বাচ্চা পিয়ন টেলিগ্রাম বিলি করে। সুধী জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কার নামে টেলিগ্রাম?"

ছোকরার গাল লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্ল, "মনে পড়ছে না ঠিক্‌। বোধ হয় ক্রিষ্টফার—টী।"

সুধীর চোখ ও বুক মুহুর্মুহু কাঁপ্‌ল। সে বাড়ীতে ঢুক্‌তেই সুজেৎ অনুযোগ করে বল্ল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল এতক্ষণ? দশবার উপর তল্‌ বার ভিতর কর্‌তে কর্‌তে আমার পা যে ভেঙ্গে পড়্‌ল!"—সে আজকাল মুখরা হয়েছে। কাকে ভালবেসেছে বলা যায় না। হয়ত সুধীকেই।

তার হাত থেকে বিনাবাক্যে খামখানা ছিনিয়ে নিয়ে পটাপট ছিঁড়ে টেলিগ্রামখানার উপর সুধী যেই চোখ বুলিয়ে গেল অমনি ওখানা তার হাত থেকে খসে পড়্‌ল, তেমনি বিনাবাক্যে।

"বাদলের শ্বশুর হার্ট ফেল করে মারা গেছেন।—মহিম।"

মরণ জীবনকে দেয় আয়ু, আগুনকে দেয় ইন্ধন। কিন্তু আত্মাকে দেয় কি? আত্মাকে দেয় এত বিপুল কাল যে তাকে কাল বলা চলে না, এত বৃহৎ দেশ যে তাকে দেশ বলা চলে না। সসীম মানবের ঐতিহাসিক কাল ও আইনষ্টাইনীয় বিশ্ব; সীমার মধ্যে সে সোয়াস্তি পায় বলে সীমা খুঁজেই সে নাকাল। তাকে অনন্ত বিরতি ও অপার বিস্মৃতি দিতে পারে কে? দিতে পারে মৃত্যু। হে মৃত্যু, তুমি দেহের সীমা থেকে সীমাহীন দেহে দেহীকে পৌছে দিলে, মনের সীমা থেকে সীমাহীন মনে মনস্বীকে উপনীত কর্‌লে, তুমি আরামকে দিলে বিরাম, ব্যস্ততাকে নিরস্ত কর্‌লে, উদ্বেগকে দিলে ক্ষান্তি, সঞ্চয়কে ব্যঙ্গ কর্‌লে! তোমায় নমস্কার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

মন ভুলাবার খেলা

শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন সামন্ত

কেবল আমার মন ভুলাবার লাগি
বিশ্বে চলে নানান্‌ আয়োজন
বোঁটার 'পরে ফুলগুলি রয় জাগি
দিবস নিশি ভুলাতে মোর মন!

মলয় পবন মাতাল ফুলের বাসে
আমার কাছে কেবল ঘুরে আসে—
আমার চোখে চোখ রাখিয়া হাসে
নীল আকাশের প্রশান্ত নয়ন॥

চলেছে সেই অনাদি কাল হতে
বিচিত্র এই মন ভুলাবার খেলা
তাইত ধরা ভাসে প্রেমের স্রোতে
বনে বনে তাইত ফুলের মেলা।

তাইত ধরা সৌন্দর্য্যেতে ভরা
অরূপ রূপের বসন দিয়ে মোড়া
ছয় ঋতু তাই—ভিন্ন বসন পরা
নানান্‌ রূপে করিছে নর্ত্তন॥

ছন্দ-ধন্ধ

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এম্‌-এ

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা বিচিত্রায় ছন্দ-বিচার পড়িয়া অনেক শিখিলাম। প্রবোধবাবুর ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়িয়া থাকি। এখন স্বয়ং কবিগুরু ছন্দ-আলোচনায় যোগদান করিয়া পাঠককে আনন্দ ও কৌতুকের নূতন আলোকে জাগ্রত করিয়াছেন। হয়ত আমরা ছন্দ-বন্ধ বিশেষ কিছু বুঝি না ; তবে এইটুকু বুঝিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ প্রবোধবাবুর অধিকাংশ মতই অনুমোদন করিয়াছেন, এবং কোন কোন বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত বিচার ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারি একটি বিষয় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রাকৃত ছন্দ (অথবা প্রবোধবাবুর স্বরবৃত্ত ছন্দ) সম্পর্কে একটু মতদ্বৈধ দেখিয়া মুস্কিলে পড়িলাম। ঐ ছন্দ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ধারণা ছিল ; এখন একেবারে গোলোক-ধাঁধায় পড়িয়াছি।

প্রবোধবাবুর মতে এই স্বরবৃত্ত ছন্দে সাধারণত চার সিলেব্‌ল্‌-এর ভাগ হয়। তবে, ইহার মাঝে মাঝে যুগ্মধ্বনির সিলেব্‌ল্‌ থাকে, এবং সেজন্য কখনো কখনো ইহাতে ছয়মাত্রা হইয়া যায়। কিন্তু এ ছন্দ মাত্রা-প্রধান নয়, ইহাতে সিলেব্‌ল্‌ই প্রধান। অতএব ছয়মাত্রা হইল কি পাঁচ মাত্রা হইল, তাহা লক্ষ্য করিবার তেমন প্রয়োজন নাই। ইহার সিলেব্‌ল্‌ লইয়াই বিশ্লেষণ চলে, এবং বিশ্লেষণ করিলে প্রায়শঃ এ ছন্দকে চার সিলেব্‌ল্‌ এর অংশে ভাগ করা যায়।

এ ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটে শেষ পর্ব্বের সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার কম-বেশীতে, কিংবা পর্ব্ব-সংখ্যার কম-বেশীতে। এ ছন্দের সাধারণ পংক্তিতে চারটি পর্ব্ব থাকে। যেমন—

৪ ৪ ৪ ২
আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | চাঁদের লোভে | লোভে

শেষ পর্ব্বে দুই সিলেব্‌ল্‌, ইহাই অধিকাংশ কবিতায় চলে। কিন্তু এই শেষ পর্ব্বে যখন সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা বেশী হয়, তখনি ছন্দটি একটু দীর্ঘ সুর ধারণ করিয়া নূতন দেখায়। যেমন—

৪ ৪ ৪ ৪
হঠাৎ ধরার | বক্ষ ভেদি | কেগো তুমি | নয়ন মেলো
—ভুঁইচাপা, কুমুদ মল্লিক

যাচ্ছে পুড়ে | নূতন ক'রে | সেকেন্দ্রিয়ার | গ্রন্থশালা
—সত্যেন্দ্র দত্ত

আবার—

৪ ৪ ৫
ঐ দেখ গো | আজকে আবার | পাগ্‌লি জেগেছে
—বর্ষা, সত্যেন্দ্র দত্ত

প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের শেষ পর্ব্বে ৪টি সিলেব্‌ল্‌, এবং তৃতীয়টিতে একটি পর্ব্ব কম ও শেষ পর্ব্বে ৫টি সিলেব্‌ল্‌ থাকায়, এই ছন্দ-দ্বয় কিছু অ-সাধারণ। পাগ্‌লি জেগে- | ছে অর্থাৎ ৪ + ১ সিলেব্‌ল্‌ এ ভাবেও পর্ব্বভাগ চলে।

প্রবোধবাবুর ঐ চার সিলেব্‌ল্‌-এর বিশ্লেষণ মানিয়া চলিলে অনায়াসেই প্রত্যেক স্বরবৃত্ত ছন্দ অনুসরণ করা যায় ; আমাদের মতো সাধারণ পাঠকও এ ছন্দ ধরিতে পারে বা প্রয়োজন হইলে স্কুলের ছাত্রকেও ধরাইতে পারে।

প্রমাদে পড়িলাম কবিগুরুর 'সেকাল' কবিতায় পৌঁছিয়া।

'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে'—ইহার ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন ষাণ্মাত্রিক প্রাকৃত ছন্দ। তাঁহার মতে ইহাকে তিন মাত্রার অংশে ভাগ করা চলে, এবং ছয় মাত্রার পর যতি পড়ে। অর্থাৎ "আমি যদি" এই শব্দ দুটিতে চারি মাত্রা থাকিলেও "জন্ম নিতেম" এই দুটি শব্দে আট মাত্রা আছে ; আপাত-দৃষ্টিতে না থাকিলেও আবৃত্তির সময় টানিয়া করিয়া নিতে হইবে। তবেই ত মুস্কিল!

রবীন্দ্রনাথ নিজে এক বিশিষ্ট অননুকরণীয় ভঙ্গীতে আবৃত্তি করেন। সে-ভঙ্গী সঙ্গীতের সগোত্র, কারণ তাঁহার ন্যায় এতো গীতাভ্যাস আর কেহ করেন না। অতএব আবৃত্তির ঝোঁকে 'জন্ম নিতেম'-এ আট মাত্রা আসিলেও এই মাত্রা-বিচার এ ছন্দ-বিশ্লেষণের পক্ষে একেবারেই অবান্তর। প্রাকৃত ছন্দকেও যদি সিলেব্‌ল্‌-এর ছন্দ না মানিয়া মাত্রার ছন্দ বলি ত বিশেষ সমস্যায় পড়িতে হয়। তাহা হইলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের পার্থক্য নিরূপণ করিব কিরূপে ?

রবীন্দ্রনাথের মতে—'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে'—

এ লাইনে ৪+৮+(৬+২) এই ২০ কুড়ি মাত্রা আছে। আবার 'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্ব্বোধ অতি ঘোর'—

এ লাইনেও ৬+৬+৮ এই কুড়ি-মাত্রা বিদ্যমান। তাহা হইলে ইহাদের পার্থক্য-নির্ণয় হইবে কি-রূপে? নিশ্চয়ই এই উভয় পংক্তি একই ছন্দের নয়।

এ সমস্যার মীমাংসা হয় তখনই যখন রবীন্দ্রনাথের প্রাকৃত ছন্দকে মাত্রিক ছন্দ না মানিয়া আমরা উহাকে সিলেব্‌ল্‌-এর ছন্দ ভাবে দেখি। প্রবোধবাবুর মতে কেবল এই প্রাকৃত ছন্দেই সিলেব্‌ল্‌-বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং এই জন্যই ইহাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ নাম দেওয়া চলে। কিন্তু প্রবোধবাবুর উক্তি—"তবে স্থলে স্থলে তিনটি যুগ্ম বা দ্বিমাত্রিক সিলেব্‌ল্‌ ও চলে; তাহাতে ছয় মাত্রা ঠিক্ থাকে। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়ম নয়, exception মাত্র।"—এ-বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে।

আমার মতে এই দ্বিমাত্রিক সিলেব্‌ল্‌ অত্যাবশ্যক। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রাণই এই যুগ্মধ্বনি। যদি যুগ্ম-ধ্বনি-বর্জ্জিত কেবল চারি সিলেব্‌ল্‌-এর ছন্দ রচনা করা হয় তবে তাহাতে সব সময়ে প্রাকৃত ছন্দের গতি রক্ষা করা হয় না। যেমন—'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে'—এর অনুকরণে যদি রচনা করি—

আমি যদি | গৃহ বাঁধি | গিরি-নদী- | পারে,
কতো ফুলে | মধু খাবো | সুখে চারি- | ধারে।

তবে আমরা পাই ৪+৪+৪+২ সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা; অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দের বাহ্য রূপ রক্ষা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ দুই পংক্তিতে স্বরবৃত্ত ছন্দের আসল ধ্বনিটিই ধরা পড়ে না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গীতে যদি উহার প্রত্যেক স্বরকে টানিয়া পড়িয়া আবৃত্তি করি, তাহা হইলে উহাতেই প্রাকৃত ছন্দের ধ্বনি বাজিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার গানের লয়-অনুসারে 'সেকাল'-এর ছন্দকে ষাণ্মাত্রিক ধরিয়াছেন। তবে এইভাবে প্রত্যেক স্বর টানিয়া সুর দিয়া পড়া ছড়াতে চলিলেও কবিতার পক্ষে অস্বাভাবিক। সেই জন্যই স্বরবৃত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনির উপস্থিতি আবশ্যিক, আকস্মিক নয়। প্রত্যেক পর্ব্বে একটি করিয়া যুগ্মধ্বনি থাকিলে অর্থাৎ প্রতি চার সিলেব্‌ল্‌-এ একটি দ্বিমাত্রিক সিলেব্‌ল্‌ থাকিলে তবে ছন্দটি পরিপূর্ণ (perfect) হয়। অন্ততঃ সারা পংক্তিতে গোটা তিনেক যুগ্ম সিলেব্‌ল্‌ থাকা আবশ্যক।

অতএব রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধ সেন এই উভয়ের মতের এক প্রকার সামঞ্জস্য করা চলে। প্রবোধবাবু যাহাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলেন, তাহাকে সিলেব্‌ল্‌ দিয়াই বিচার করেন ও তদনুসারে চারি সিলেব্‌ল্‌-এর পর্ব্বে ভাগ করেন, এবং এ ছন্দের মাত্রা বিচার তিনি গৌণ বলিয়া গণ্য করেন: আর রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকেই প্রাকৃত ছন্দ বলেন, এবং ইহার যুগ্মধ্বনির টান বা আবৃত্তির ঝোঁকে ফাঁক-পরিপূরণ অনুসারে প্রতি পর্ব্বে ছয় মাত্রা গণনা করেন। এ গণনা সাধারণের পক্ষে দুরূহ।

এই ত গেল ছন্দ-বিচারের কথা। তারপর 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' পড়িয়া আরও ধাঁধায় পড়িয়াছি।

'ছন্দে সিলেব্‌ল্‌ প্রধান, না মাত্রা প্রধান' এরূপ কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বাংলাছন্দকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রবোধবাবু দেখাইয়াছেন যে, কেবল এক শ্রেণীর বাংলাছন্দে (স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত) আমরা সিলেব্‌ল্‌কে প্রধান ধরিয়া পর্ব্ব ভাগ করি। অতএব সকল ছন্দেই মাত্রা প্রধান না সিলেব্‌ল্‌ প্রধান, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। বাংলা কবিতার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আমরা কেবল মাত্রা-বিচারই করিব, তাহাতে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা গণিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ষাণ্মাত্রিক ছন্দে প্রতি পর্ব্বে ছয় মাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট; তাহাতে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারই হইল আর পাঁচই হইল, তাহাতে কিছুই এসে যায় না। উপেনবাবু যে 'গুরুর আদেশে ত্রিবিধ প্রমাণ' আনিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, তিনটি প্রকার মাত্র। ছয় মাত্রার সঙ্গে পাঁচমাত্রার মিলনে ছন্দো-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বিভিন্ন সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার সমাবেশ হইতে স্বরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে কোন নূতন প্রমাণ মিলে না। সুতরাং উপেনবাবুর রচিত

দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত হইল না। প্রাকৃত ছন্দের পর্ব্বে বিভিন্ন-সংখ্যক সিলেব্‌ল্-এর সমাবেশ দেখাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। ঐ পংক্তিটি প্রাকৃত ছন্দের একটি রেগুলার লাইন নয়।

৫ ৪ ৩ ১
শিবুঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে | দান

--ছড়ার সুরে এ লাইন পড়িতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কবিতার লাইন হিসাবে পড়িতে গেলেই প্রথম পর্ব্বে একটি সিলেব্‌ল্ বেশী ও তৃতীয় পর্ব্বে একটি সিলেব্‌ল্ কম বোধ হয়। ছড়ার সুরে যে পড়িতে বাধে না তাহার একটি কারণ হয়ত, ঐ তিন পর্ব্বে মোট সিলেব্‌ল্ সংখ্যা বারো অর্থাৎ চারের তিন গুণ। পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'শিবুঠাকুর' এর স্থলে 'শিবঠাকুর' লিখিতেন। এখন সহসা একটি উ-কার বসাইয়া শিবঠাকুরকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে। এ ছন্দের দুয়েকটি রেগুলার লাইন দেখাইতেছি :—

৪ ৪ ৪ ২
(১) আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | চাঁদের লোভে | লোভে

৪ ৪ ৪ ২
(২) মায়ের 'পরে | দৌরাত্মি, সে | না যায় লেখা- | জোকা

—ছেলেবেলার গান, রবীন্দ্রনাথ

৪ ৪ ৪ ১
(৩) মা গো আমার | শোলোক-বলা | কাজ্‌লা দিদি | কই

—কাজ্‌লাদিদি, যতীন্দ্র বাগ্‌চী

দ্রষ্টব্য :—দ্বিতীয় উদাহরণের দ্বিতীয় পর্ব্বে "দৌরাত্মি" শুধু এই শব্দটি লিখিয়া কবি নিজেকে রেহাই দেন নাই, কারণ ইহাতে মাত্র তিনটি সিলেব্‌ল্। অথচ এই তিন সিলেব্‌ল্ দিয়াই কবিতাটি পড়িতে বিশেষ অসুবিধা হইত না, যেহেতু দুইটি যুগ্মধ্বনি থাকায় একটা সিলেব্‌ল্-এর অভাব পোষাইয়া যায়। যেমন,—'বাইরে কেবল | জলের শব্দ | ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্'—এই লাইনে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—এই তিনটি সিলেব্‌ল্ সুরের টানে প্রায় ছয় সিলেব্‌ল্এর সময় অধিকার করে। সুতরাং মনে হয় যেন রেগুলার ফর্ম্ অর্থাৎ চার সিলেব্‌ল্-এর পর্ব্ব করিবার জন্যই কবি 'দৌরাত্মি'র পর 'সে' প্রয়োগ করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, ধরিয়া নিলাম—'শিবুঠাকুরের বিয়ে হবে, তিন কন্যে দান'—এই পংক্তিটি রেগুলার লাইন। আচ্ছা, ইহারি অনুকরণে আমি দুইটি লাইন রচনা করিতেছি :—

৪ ৪ ৩ ১
হরিচরণের | মেয়ে যাবে | দূর বস্তি- | পুর,
দিদি শাশুড়ীর | তরে নেবে | তিন কল্‌সী | গুড়।

এই দুই লাইন পড়িতে গেলেই প্রথম পর্ব্বের একটি অতিরিক্ত সিলেব্‌ল্ কানে খচ্ করিয়া বাধে। এইরূপ ৫+৪+৩+১ এই সংখ্যায় সিলেব্‌ল্ সমাবেশ করিয়া যদি একটি কবিতা রচনা করা হয় তবে সে-কবিতার ছন্দ মোটেই শ্রুতিমধুর হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, এ ছন্দের রেগুলার পর্ব্বে চার সিলেব্‌লই থাকা উচিত।

আবার,—

৫।৬ ৫।৬ ৩।৫
শিবুঠাকুরের | বিয়ে হবে, তিন | কন্যে দান,—

এইভাবে যদি পংক্তিটিতে ৫ সিলেব্‌ল্ বা ৬ মাত্রার পর যতি দেওয়া হয়, এবং ৫।৫।৩ সিলেব্‌ল্, অথবা ৬।৬।৫ মাত্রা, এইভাবে পর্ব্ব সাজানো হয় ত কবিতাটির কি ছন্দ হইবে? নিম্নলিখিত ধরণে যদি একটি কবিতা লেখা হয় এবং তাহার যতি-ছেদ দেওয়া না থাকে ত পাঠক কোন ছন্দে সে কবিতা পাঠ করিবে, সে-কথা প্রবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।—

৬ মাত্রা ৬ মাত্রা ৫ মাত্রা
শিবুঠাকুরের | বিয়ে হবে, তিন | কন্যে দান,
হরু ঘোষালের মেয়ে ছিলো, তাই রক্ষে পান।
মতি-চাঁড়ালের ছেলে এলো বর- যাত্রী তার,
কলি যুগে ভাই কোনোখানে নাই জাত-বিচার।—ইত্যাদি।

কোনো পাঠক যদি প্রাকৃত ছন্দে লিখিত কবিতাকে কসরৎ করিয়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পড়িয়া ফেলিতে পারে ত তাহাকে প্রশংসা করিবেন কি?

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

বিগত-বসন্তে

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী

তখন আমরা লণ্ডনে, শীতাপগমে, নব বসন্তের সঞ্চার হইয়াছে, হেমন্তের নগ্ন, ঊর্দ্ধ অধোমুখ বিবিধ • বিস্তার শাখাবলি, সুকুমার হরিতাভ নব পল্লবে, গোলাপী, শ্বেত, পীত, নীল, স্বর্ণোজ্জ্বল কুসুমের স্তবকে আর মঞ্জরীতে মণ্ডিত হইয়াছে। পদতলে ধরিত্রী শষ্প-শ্যামলা, মাথার উপর আকাশ ঈষন্নীল, সূর্য্যালোক উজ্জ্বল, অথচ তাপহীন। বাতাসে, ফুল গন্ধ বিতরণ করা অপেক্ষা বিলোল ভঙ্গীতে বর্ণ বিন্যাস করিতেছে। রংএর খেলা। চারিদিকে নব বসন্তের নবীন আনন্দ, এমন দিনে, আমাদের স্বভাবের সুপ্ত বালক অংশটি অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া আমোদ করিতে চায়। পাঠমুখস্তর পর ছুটি। আমরা Oxonian (অক্সফোর্ডের ছাত্র) ছুটিতে লণ্ডন আসিয়া দুই বন্ধুতে পার্কে বেড়াইতে গিয়াছি। উদ্দেশ্যবিহীন আলস্যের যাত্রা। গন্তব্য স্থল অবশ্য একটা ছিল, কিন্তু সেখানে পৌছিবার তাড়া ছিল না। সুখের সন্ধানে চলিয়াছি, পৃথিবীতে সে পরম বস্তু, বেলের মত ঘড়ি ঘণ্টা আঁটিয়া আসে না, তবে কিন্তু অনুকূল মুহূর্ত্তে তাহাকে ধরিতে না পারিলে রেলগাড়ীর মতই কাহারো খাতির না রাখিয়া পলায়ন করে। তাহাকে ধরিব বলিয়া আগে ভাগে গিয়া বসিয়া থাকিয়াও সুসার হয় না, সে খাম-খেয়ালি কোথা দিয়ে কোথায় যায়, কে জানে? নানাপ্রসঙ্গে গল্প চলিয়াছে, তবে তরুণ বয়সে সৌন্দর্য্যের শুধু নয় সুন্দরীর প্রতি পক্ষপাত স্বাভাবিক। সেদিন পার্কে রূপের হাট বসিয়াছিল, আকবরী যুগের নওরোজা, কত সুন্দর মুখ শোভন বেশ-বাস। এই রূপসী সজ্ঘ প্রজাপতি পুঞ্জের মতই হেলিয়া, দুলিয়া, দ্রুত, ও মন্থর গতিতে যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। আমরাও অনিবার্য্য আকর্ষণে আশে পাশে চলিয়াছি।

অকস্মাৎ আমার বন্ধু অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে, পার্শ্ববর্ত্তী একটি তরুণী পথিক রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সুন্দরী বটে!" সে কথা তার কাণে পৌছিয়াছিল, রূপের প্রশংসা মেয়েদের লাগে ভাল, কত সময় কল্পনা করিয়া লইয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করে সত্যই পাইলে ত আর কথাই নাই, তাই এই এক হাট রূপসীর মধ্যে বিশেষ করিয়া তার রূপের ব্যাখ্যান, তার বড়ই ভালো লাগিয়াছিল। মেয়েটি ঘাড় বাঁকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া, আমার বন্ধুর প্রতি তীব্র উজ্জ্বল কটাক্ষপাত করিয়া চলিয়া গেল। সেই চাহনি, সেই ভঙ্গী তাহার অজ্ঞাত জীবন-ইতিহাসের আর তার প্রচ্ছন্নতম অ[illegible] প্রদেশের রহস্য মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের সম্মুখে পরিষ্কার করিয়া দিল, আমাদেরও আমোদ আর কৌতূহল বোধ হইল, মনে হইল এ বড় মন্দ নয়, নারী চরিত্রের রহস্য ভেদ করিবার কেমন সহজ উপায় আবিষ্কার করা গিয়াছে। দুজনেই বেশ একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, বুঝিলাম এতক্ষণে মনের মত খেলা পাওয়া গিয়াছে। এখন হইতে সকলেরি মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, যেখানি চোখে ধরে বলিয়া উঠি, "সুন্দর!" কত রকম মুখের ভাবেরি পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিলাম, কেহ একটু মুচকি হাসি হাসিয়া চলিয়া যায়, বিলোল কটাক্ষপাত করে। তাহার প্রগল্‌ভ, স্বল্প-লজ্জ স্বভাব বুঝিতে বাকী থাকে না। কাহারো বা গ্রীবামূল পর্য্যন্ত লজ্জায় আরক্ত হইয়া ওঠে, সসঙ্কোচে মাথাটি নীচু করিয়া মৃদু পাদক্ষেপে চলিয়া যায়। কাহারো মুখের ভাবে মনে হয়, কথাটা লাগিয়াছে ভাল তবে স্ত্রী-সুলভ শোভন লজ্জায় সে হর্ষ-বিকাশ সংযত করিয়া রাখিয়াছে। কেবলমাত্র চক্ষু দুটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সুকুমার গোলাপী ওষ্ঠপুটে অতি মৃদুহাস্য রেখা জাগিতে না জাগিতেই যেন মিলাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ মুখে, স্বাভাবিক সুসংযত একটুখানি প্রফুল্লতা।

আবার কোন ভদ্রমহিলা এরূপ স্তুতিবাদে এতই অপমানিত বোধ করিয়াছেন, যে. আমাদের ফুটপাথ, (foot

path) ছাড়িয়া সুগম্ভীর মুখে, দৃঢ় পদক্ষেপে অন্য ফুটপাথে চলিয়া গিয়াছেন, যেন আমাদের মত বর্ব্বরের গায়ের বাতাসও অসহ্য, এমন সব মানুষ-সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এই অতি মাত্রিক আত্মাভিমান দেখিয়া, কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক আমরা বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতাম। আবার কেহ বা এরূপ বাচালতায় অসম্মান বোধে ক্রুদ্ধ হইয়াছে; রোষ-দীপ্ত দুটি আয়ত চক্ষু, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের আপাদ মস্তকের নির্ম্মম সমালোচনা করিয়া, স্থির দৃষ্টিতে জানাইয়াছে, সাহস তো কম নয়!

সেই "নিমেষ-নিহত" দৃষ্টিতে আমাদের উভয়ের হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন একটু বিশেষ দ্রুত হইয়া উঠিত। তাঁহার ত্বরিত প্রয়াণের পর স্বস্তির নিশ্বাস লইতাম যেন আশু উদ্যত বজ্রপাত হইতে রক্ষা পাইলাম; কিন্তু হইলে কি হয়, আমোদ চড়িয়াছে, খেলা জমিয়াছে, ছাড়া কঠিন। প্রতিদিন এম্নি চলিতে লাগিল। সুনীল, গাঢ়, ভায়োলেট, ধূসর, পিঙ্গল, পাটল গভীর কৃষ্ণ নেত্র তারকার নীল, স্নিগ্ধ মুগ্ধ, তুষ্ট, রুষ্ট, অধীর, প্রশান্ত কত দৃষ্টিপাতই চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; মনোমন্দিরে বহু প্রতিমাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

খেলা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেল, এখন সুন্দর দেখিলে সুন্দর কথাটি অনায়াসে বলিয়া বসি, দেশকাল পাত্র বিবেচনার অপেক্ষা রাখি না। অকস্মাৎ একদিন আমাদের দুই সৌখীন বন্ধুর সখের খেলা সাঙ্গ হইয়া গেল। সেদিন আমরা একটু অসময়ে পার্কে গিয়াছিলাম, জনসমাগম তখনও হয় নাই। দু'একটি প্রাণী বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনো একক, কখনো বা যুগলরূপে। আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি একটি যুগলের সম্মুখীন হইয়াছিলাম, সহগামী পুতুলের মত ছোট্ট অতি সুন্দর 'কটি জাপানী Poodleও ছিল। তাঁহাদের দেখিয়া সদ্য-পরিণীত বলিয়া বোধ হইল, যেন কোথাও 'মধুচন্দ্র' যাপন করিয়া, সবে সহরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বেশ বিন্যাস অতি পরিপাটী, অভিজাত বংশীয় না হইয়া যায় না; স্বামীটি রীতিমত পুরুষ পুঙ্গব, ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, প্রস্থও দৈর্ঘ্যের অনুরূপ, সুগঠিত, সবল মজ্জা-পেশী-বহুল, প্রকাণ্ড অসুর বিশেষ, পল্টনের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, তখমা তাবিজের অভাব ছিল না। সঙ্গিনীটি আবার ঠিক্ তাহার বিপরীত। ক্ষীণ সুকুমার দেহযষ্টি, উন্মেষ-উন্মুখ-নব যৌবন, এখনও যেন অষ্টাদশ বর্ষ দেশের সীমানা পার হয় নাই। আয়ত প্রশান্ত করুণ স্নিগ্ধ নীল নেত্র, ঘন সুদীর্ঘ পক্ষ্মজাল-বেষ্টিত, আর বর্ণ-লালিত্য তাহা শ্বেত দ্বীপেই দেখা যায়। বর্ণনা করিয়া বোঝান কঠিন। এক কথায় বলিতে গেলে অমন একখানি মুখ দেখিয়া স্বতঃই সুন্দর বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়, তাহার উপর আমরা কিছুকাল হইতে এই কথাটি যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, তাই আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। মুখখানি দেখিবামাত্র তাহাদেরি দেশীয় ভাষায় বলিয়া উঠিলাম, অতি সুন্দর। দেখিলাম তাঁহার গ্রীবামূল পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত চোখ দুটি একবার আমার দিকে বিস্মিত ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করিয়াই অন্যদিকে ফিরিল, নিমেষ কাল সময়ে বিশিষ্ট ভদ্র মহিলার নম্র, সসঙ্কোচ, আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ ভাবটি সুস্পষ্টরূপে আত্ম প্রকাশ করিল। বলিয়া, আমাদের যেমন অভ্যাস, নিশ্চিন্ত ভাবে, পরম আরামে চলিয়া আসিতেছি, কিছু দূর গিয়া দেখি, তাহাদের দুজনের মধ্যে কি কথা হইল; মেয়েটিও তার খেলনা-কুকুর সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, স্বামী ক্রুদ্ধ বৃষভের মত মাথা নীচু করিয়া, গষ গষ শব্দে আমাদের দিকে আসিতেছে, রাগে মুখ তপ্ত অঙ্গারের মত রাঙা। তাহাকে আসিতে দেখিয়া বন্ধুবর যঃ পলায়তি পন্থার অনুসরণ করিলেন, এ তাঁর চিরন্তন রীতি, প্রথমটা অনপেক্ষিত বিপদের আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়েন, আবার যখন বিপদ শুধু আশঙ্কা নয় বাস্তবে পরিণত হয় তখন তিনিও ধ্রুব সহায়রূপে পার্শ্ববর্ত্তী হ'ন। বন্ধুতো ভয়ে পলাইয়াই ছিলেন, দেখিলাম মেয়েটিরও বড়ই ভীত ভাব। প্রকাণ্ড অসুর স্বামী, ক্ষীণ বঙ্গ-সন্তানকে পিষিয়া মারিবে ইহা সে স্থির নিশ্চয় বলিয়া জানিত। আমি স্থির হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম—বন্ধু কিছু দূর গিয়া দেখিলেন, আমি নড়ি নাই, সে ব্যক্তিও অগ্রসর হইতেছে, তখন তিনিও আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। জন-বুল (John-Bull) মশ মশ করিয়া আসিয়া সম্মুখে খাড়া হইল, রাগে বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়া দুষ্কর তবু প্রশ্ন করিল, What did you mean Sir, What did you mean"? (মহাশয় কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছ?) আমি তাহার মুখে প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিত হাস্য বলিলাম, "Your beautiful Japanese Poodle Sir"—(আপনার জাপানী কুকুরটির প্রশংসা-বাদ)। সেইদিন হইতে খেলা সাঙ্গ হইল, এমন রস-ভঙ্গের পর কি আর রঙ্গরস চলে? *

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* এই রচনা সম্বন্ধে আমার একটু কৈফিয়ৎ আছে—ঘটনার বিবরণ দেন আমার এক আত্মীয়—Bull Dog তিনি বলেন, আমি তাহাকে জাপানী Poodle বলিয়াছি—আদৌ এমন কিছু ঘটিয়াছিল কিনা জানি না, আমি ইহাকে বর্ণনায় চলচ্চিত্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছি, হইল কিনা পাঠকগণের বিবেচ্য। লেখিকা

ছন্দের দ্বন্দ্ব ও শনিবারের চিঠি

গত বৈশাখ মাসের বিচিত্রায় "ছন্দের দ্বন্দ্ব" নামে আমি একটি অতি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখেছিলাম সে কথা বোধ হয় বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকাগণের মনে আছে। তা'তে আমি লিখেছিলাম, "অদূর ভবিষ্যতে ছন্দের যে দ্বন্দ্বটি অনিবার্য্য মনে হচ্চে তদ্বিষয়ে পাঠকচিত্তকে অবহিত রাখবার উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি প্রকাশ করলাম।" আমার অনুমান যে অমূলক হয় নি তার প্রমাণ পাঠকগণ বর্ত্তমান সংখ্যার বিচিত্রায় পাবেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই 'ছন্দের দ্বন্দ্বে' যোগ দিয়েছেন। বাঙলা কবিতার ছন্দ বিষয়ে অমূল্যধন বাবুর জ্ঞান অসাধারণ, তিনি সম্প্রতি ঐ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। তাঁর মত উপযুক্ত ব্যক্তি এই ছন্দের আলোচনায় যোগ দেওয়ায় আমরা অতিশয় আনন্দিত হয়েছি।

অমূল্যবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে, আমার মতের সমর্থনের জন্যে আমি স্বয়ং দৃষ্টান্ত রচনা না ক'রে অন্যান্য কবিদের রচনা হ'তেই উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারতাম। এ কথায় সন্দেহ মাত্র নেই। যে-কোনো কবির রচনা হ'তে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের আদেশ অনুযায়ী অস্ত্রাগারের দ্বার উন্মুক্ত না ক'রে নিজেই অস্ত্র তৈরী ক'রে নিয়েছিলাম।

অনেক ইতস্ততঃ ক'রে এখানে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। শনিবারের চিঠির কোনো-এক সংখ্যায় প্রবোধ চন্দ্রোদয় শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দ বিষয়ক প্রবন্ধগুলির বিরুদ্ধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বৈশাখের বিচিত্রায় প্রকাশিত ছন্দের দ্বন্দ্ব প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমি উক্ত সমালোচনা সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করি। বৈশাখ সংখ্যার শনিবারের চিঠিতে সে সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়েচে।

হয়েচে, ভালই হয়েচে; আমিও একটু রসিকতা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলাম, তাঁরাও চিরকাল যা ক'রে থাকেন তাই করলেন, ভাবলাম চুকে-বুকে গেল। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে সব জিনিসকে চোকানো যায় না সে জ্ঞান ত' জীবনে বারে বারে কম বারও গেলো না! বন্ধু বান্ধবেরা উত্তেজিত করতে লাগ্‌লেন চেপে যেয়ো না, উত্তর দেওয়া চাই-ই। অন্যায়কে নিরুত্তরে সহ্য করা দুর্ব্বলতার লক্ষণ ব'লে আত্মীয় স্বজনেরা অনুযোগ করতে লাগলেন। অবশেষে বিচিত্রার একটি সহৃদয়া পাঠিকাও (শ্রীমতী প্রতিভা দেবী বি-এ) সে বিষয়ে অনুরোধ ক'রে চিঠি দিলেন। তিনি লিখেচেন, "সাহিত্যক্ষেত্রে সুরুচিপূর্ণ দ্বন্দ্ব কলহ যে খুবই উপভোগ্য, এ বিষয়ে আর মতভেদ থাকিতে পারে না।" কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের বিচিত্রায় আমার পক্ষ থেকে শনিবারের চিঠির অশিষ্ট সমালোচনা কোনও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নি দেখে তিনি আশঙ্কা করেছেন যে, আমি হয়ত শনিবারের চিঠির কাছে "পরাজয় স্বীকার"ই করলাম।

জ্যৈষ্ঠের বিচিত্রা প্রকাশিত হওয়ার পরে বৈশাখের শনিবারের চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং জ্যৈষ্ঠের বিচিত্রায় প্রতিবাদ প্রকাশিত করা চলত না। কিন্তু সে যাই হ'ক, আমি ব'লি, পরাজয় স্বীকার করলেই বা ক্ষতি এমন কি? পথে-ঘাটে হাটে-বাটে বনে-বাদাড়ে এমন ত কত জিনিসের কাছেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েচে, সেই তালিকায় আর একটাই না হয় যোগ হ'ল।

কিন্তু এ কথাও বলছি শুধু তর্কেরই হিসেবে। আসলে পরাজয় হয়েচে শনিবারের পক্ষেই; অন্ততঃ লক্ষণ দেখে তাই ত মনে হয়। রসিকতার উত্তরে রসিকতা না ক'রে অন্য জিনিসের আশ্রয় নিলে তা পরাজয় নয় ত কি? এই প্রসঙ্গে অনেক দিনের একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল। একজন মহাজন ছিল, আর একজন খাতক। এই মহাজনে

আর খাতকে কোনো-না-কোনো বিষয় নিয়ে নিত্য তর্ক হোত। যুক্তিতে খাতক পরাস্ত হ'লে মহাজন প্রসন্ন চিত্তে বাড়ি চ'লে যেত। এমনি প্রায় নিয়তই ঘটত। কিন্তু কোনো দিন তর্কে খাতক প্রবল হয়ে উঠ্‌লে মহাজন হঠাৎ তর্ক পরিত্যাগ ক'রে টাকার কথা তুলত; বলত, তবেরে ড্যাশ, টাকা যে স্বদে আসলে পাহাড় হয়ে উঠ্‌ল তার কি করছিস্ বল্? প্রতিবেশীরা মহাজনের মুখে টাকার তাগাদা শুন্‌লেই বুঝতে পারত আজ তর্কে মহাজন পরাস্ত হয়েচে। শনিবারের চিঠির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েচে। কৌতূহলী পাঠক বৈশাখের শনিবারের চিঠির ১৬০ পৃষ্ঠার ১১-১৩ পংক্তি দেখ্‌লেই এ কথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবেন।

রসিকতা জিনিসটা উপাদেয় বস্তু নিশ্চয়ই—কিন্তু উপাদেয় হ'তে হ'লে তাকে এই নিয়মগুলি পালন ক'রে চল্‌তে হবে।

(১) রসিকতা শিষ্ট (dignified) হওয়া চাই—, অসার ভাঁড়ামি আজ-কালকার দিনে মার্জ্জিত সমাজে অচল। মনে রাখ্‌তে হবে, It is but one step from the sublime to the ridiculous।

(২) রসিকতা সংযত হওয়া চাই—ঢিলে-ঢালা আবোল-তাবোল গোছের হ'লে চল্‌বে না,—যেমন বৈশাখের শনিবারের চিঠির ১৫৯ পৃষ্ঠার ১৩ হইতে ১৭ পংক্তিতে হয়েচে। "ব্যাপারী বেঙ্কটনাথ! আর্টের মছলন্দ! দৃশ্যের গোয়ালন্দ।" এসব আবার কী? এই সম্পূর্ণ অর্থহীন আবোল-তাবোল শুন্‌লে ক্রোধোন্মত্ত পরাভূত ব্যক্তির প্রলাপ-বচন ব'লে মনে হয় না কি?

(৩) রসিকতা নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) হওয়া চাই। ব্যক্তিগত হওয়া রসিকতার পক্ষে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ, যে অপরাধ শনিবারের চিঠি বৈশাখ সংখ্যার ১৬০ পৃষ্ঠার 'ভ্রম-সংশোধন'-এর মধ্যে করেছেন।

(৪) রসিকতা অসার হ'লে চল্‌বে না, তার মধ্যে কিছু সার বস্তু থাকা প্রয়োজন; অর্থাৎ, একেবারে বোলতার চাক্ হ'লে চল্‌বে না, মৌমাছির চাক হ'তে হবে,—হাত দিলে শুধু হুলই যেন না ফোটে, মধুও যেন কিছু আসে।

তবে বোলতার চাক ভিন্ন বাজারে আর কিছু যদি একান্তই না চলে তা হ'লে আর কি বলব, Live and let live এর দিনে নিরুত্তরে থাক্‌তেই হবে। বাজারের অবস্থা অবশ্য ভাল নয়, কিন্তু তাই ব'লে কি এতই মন্দা?

আমরা বলি, আর কিছু একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে হয় না?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যায় (অর্থাৎ আগামী শ্রাবণ সংখ্যায়) রবীন্দ্রনাথের গভীর চিন্তা-পূর্ণ প্রবন্ধ "**প্রাচীন কীর্ত্তি**" প্রকাশিত হইবে। কবির অননুকরণীয় প্রাঞ্জল ভাষায় মানবজীবনের মূল সমস্যার উপর অপরূপ আলোক সম্পাতে চমৎকৃত হইবেন। সম্প্রতি ইস্পাহানের ময়দানের চারিদিকে কবি যে-সব অত্যাশ্চর্য্য মস্‌জিদ্ দেখিয়া আসিয়াছেন তাহারি চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে।

উত্তর মেঘ

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

দেখিবে অলকায় সৌধশ্রেণী ভায় অভ্রভেদী শির তোমারি প্রায়,
ললিত বনিতার চটুল গতিভার বিজলী খেলা যেন জলদ গায় ;
ইন্দ্রধনু জিনি ভিত্তি আলেপনি মণির মেঝ-শোভা তোয়দ হেন,
প্রহত মুরজের গভীর বাদ্যের ধ্বনি সে মনে লয় তোমারি যেন ॥ ১ ॥

দেখিবে পুরী মাঝ অলকাবধূ সাজ হস্তে শোভে তার লীলাকমল,
কুন্দ কেশে ভায় লোধ্র-রেণুকায় পাণ্ডু মুখশোভা সুনির্ম্মল ।
কর্ণে সুকুমার শিরীষফুলভার নবীন কুরুবক চূড়াতে রাজে,
তোমারি পরশনে যে নীপ ফোটে বনে, তাহারি বিরচন সীঁথির সাজে ॥ ২

সেথায় মনোলোভা নিত্য ফুলশোভা পাদপ ঘিরে অলি পাগলপ্রায়,
চিরায়ু নলিনীরে সায়রে সেথা ঘিরে হংসশ্রেণী-রচা মেখলা ভায় ;
ভবন-শিখি যত নৃত্যে চিররত কণ্ঠে কেকা রব ফুটিছে নিতি,
নিত্য জ্যোছনায় প্রদোষ ভরি যায় নাশিয়া নগরীর তামস ভীতি ॥ ৩ ॥

সেথায় নরনারী মুছেনা দুখবারি, অশ্রু বহে শুধু সুখের ক্ষণে,
মদন ফুলবাণে যেটুকু ব্যথা হানে তাহারো অবসান মিলন সনে ;
সেথায় বিরহের জ্বালা সে নিমিষের, প্রণয়-কলহের ক্ষণিক স্মৃতি,
অমর তনু-মন সুচির যৌবন, সেথায় নাহি ভায় জরার ভীতি ॥ ৪ ॥

ফুলের প্রতিছায়া মণিতে রচি মায়া মেঘেতে আঁকে যেন তারকা পাতি,
সেথায় মধুরাতে যক্ষপ্রিয়া সাথে কল্পতরু রসে উঠে যে মাতি—
সে রতি-সুধা পানে তৃষা না মিটে প্রাণে মুরজ রবে আরো উছলে প্রীতি—
সে রব মনোরম তোমারি নাদ সম স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিছে নিতি ॥ ৫ ॥

মন্দাকিনী তীর— সেথায় নগরীর অমর-বাঞ্ছিতা কন্যা যত
স্বর্ণ বালু দিয়া মুষ্টি ভরি নিয়া রত্ন-খুঁজি-ফেরা ক্রীড়নে রত ;
ছুটিয়া নহে সারা ক্লান্ত নহে তারা বালুকা নিক্ষেপি সিকতো'পরি
শীতল নদীবায় মন্দা তরুছায় নিতেছে তাহাদের শ্রান্তি হরি' ॥ ৬ ॥

বিচিত্রা-চিত্রশালা

ইণ্ডিয়া হাউস ভিত্তি-চিত্র



ইণ্ডিয়া হাউস, এক্সিবিশন রুম　　আনারকলি　　শিল্পী—শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী



ইণ্ডিয় হাউস, এক্জিবিশন রুম

বন দেবী

শিল্পী—শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী



ইণ্ডিয়া হাউস, ডোম

চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নারী-প্রহরিণীগণের নিকট হইতে প্রাতঃকালীন অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন।

শিল্পী—শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী



• ইণ্ডিয়া হাউস, ডোম

মহারাজ অশোকের কন্যা বোধিদ্রুম লইয়া সিংহল যাইতেছেন।

শিল্পী—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বর্ম্মণ



ইণ্ডিয়া হাউস, ডোম

সম্রাট্ আকবর ফতেপুর শিকরীর নক্সা নিরীক্ষণ করিতেছেন

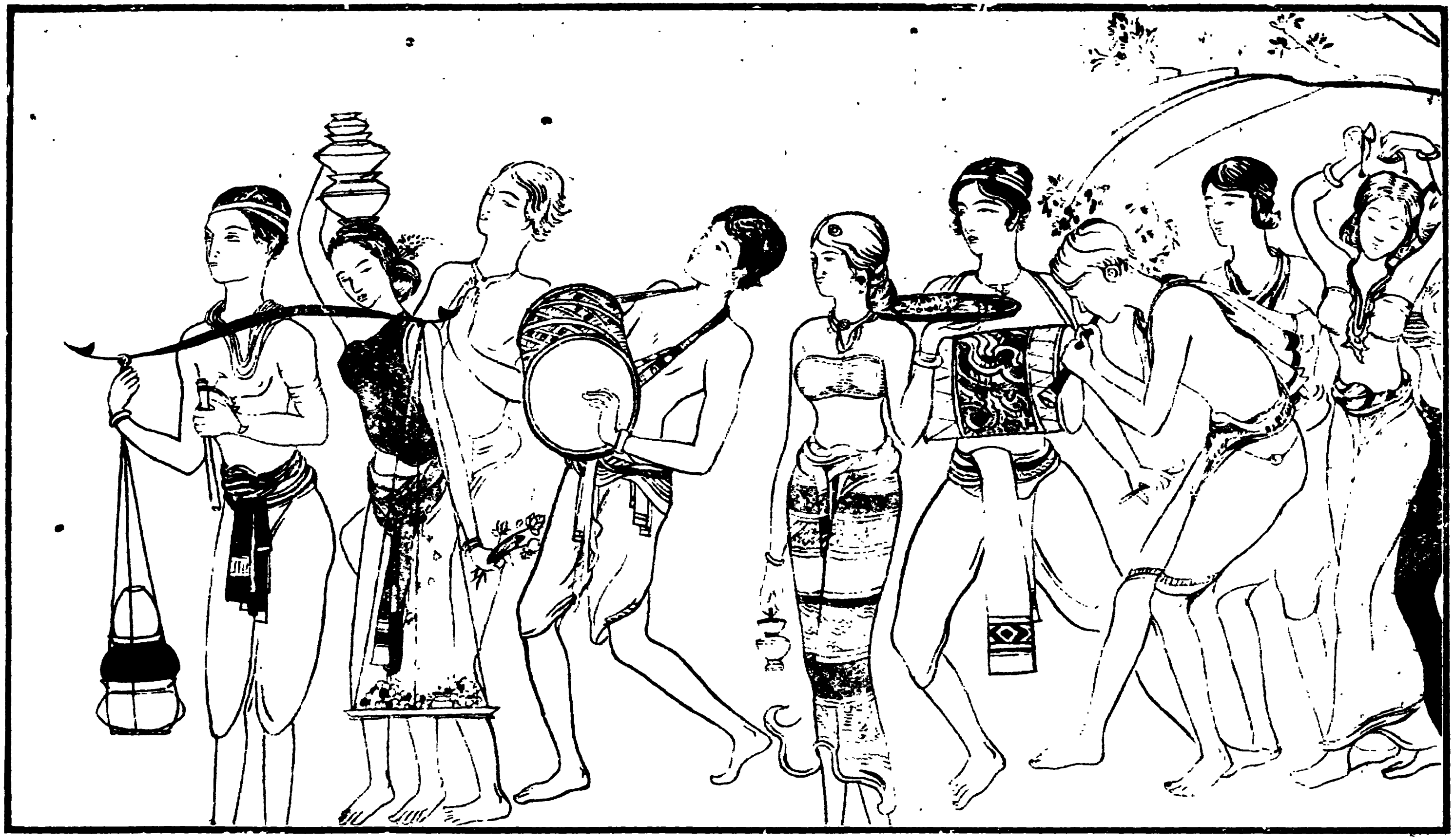
শিল্পী—শ্রীললিতমোহন সেন



ইণ্ডিয়া প্রেস, ঢাকা

পুরু ও আলেকজান্দার

শিল্পী—শ্রীরণদা উকিল



এখানি ইণ্ডিয়া হাউসের চিত্র নয়।

উৎসব

শিল্পী—শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী

রবীন্দ্রকাব্যের একটা দিক

শ্রীমতী লতিকা বসু বি লিট্ (অক্সন)

বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবজীবনে যৌবন ও চিরচঞ্চলের খেলা চলেছে, তার যে-গান রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন এ-প্রবন্ধে আমি শুধু তার-ই আলোচনা করবো। যখন প্রাচীন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাণহীন জড়পদার্থে পরিণত হ'য়েছিল, যখন আবহমান প্রচলিত রীতিনীতি এবং প্রাচীনপ্রথা জীবনের মহত্তর আদর্শের স্থান অধিকার ক'রে বসেছিল সেই সময় রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন এবং এই নিশ্চল অবস্থার গতি ফিরিয়ে দিতে সমাজে যখন বিদ্রোহের প্রলয়শিখা জ্বলে উঠেছিল সেই সময় তাঁর জীবনযাত্রা সুরু হ'য়েছিল। সুতরাং তাঁর কাব্যের ভিতর যে একটা অস্থির ভাব বা বিপ্লবের ছায়াপাত হ'বে তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। জীবন ও প্রগতিকে তিনি ভিন্ন ক'রে দেখ্তে পারেন নি। গতি ছাড়া জীবন ব'লে কিছু থাক্তে পারে না—গতিই প্রাণের স্পন্দন। একদিকে নিশ্চলতা ও জড়তা কবিকে যেমন ব্যথিত ক'রে তুলতো অন্যদিকে তেমনি মানবজীবনে ও বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে আনন্দের রূপ তাঁকে আকর্ষণ করতো। তাঁর মধ্যে সব সময় ছিল একটা গতির আবেগ—অবাধ উন্মুক্ত। তথাপি যা' কিছু নির্ব্বিশেষ তা' তাঁকে বেশিক্ষণ ধরে রাখ্তে পারত না। তার একঘেয়েমি তাঁকে পীড়া দিত—তাই বার বার তাঁর বনবেতসের বাঁশী বেজে উঠেছে তাঁর অতিপ্রিয় নদীর মর্ম্মর ধ্বনিতে, বৃক্ষের সবুজ পত্রের কম্পনে, পুষ্পের সুষমায়, এই বসুন্ধরার প্রতি বালুকণায়। এই সুন্দর বিশ্বের মাঝখানেই তাঁর চিরসুন্দরের স্থান—এর বাইরে তিনি ভগবানকে খুঁজে বেড়ান নি। তিনি জান্তেন ভগবান চিরচঞ্চল—এই বৈচিত্র্যের মধ্যে, এই নয়নাভিরাম দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের মধ্যেই তাঁর রূপ ফুটে উঠে। হিন্দুরা মনে করে প্রকৃতির যে সমারোহ, এই যে আড়ম্বর, এ হ'চ্ছে ভগবানের লীলা—শ্রীকৃষ্ণের সখাদের সঙ্গে ক্রীড়া, রাধা ও গোপিনীদের সঙ্গে নৃত্য। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব হয়, তাই ভগবানের অপূর্ব্ব বিকাশ বাঙালী মনে একটা গভীর ছাপ অঙ্কিত ক'রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এর প্রভাব থেকে মুক্ত ন'ন। যখন ভগবানের সঙ্গে তাঁর সংযোগের সময় হয় তখন এই বিশ্বপ্রকৃতির মাঝেই তিনি তাঁকে খুঁজে পান, এই 'বহু বরষের' বসুন্ধরার মৃত্তিকাতেই ভগবানের বাণী তাঁর কাছে ধরা পড়ে। বিশ্বের দ্বারে দ্বারে রবীন্দ্রনাথ সেই বার্ত্তাই প্রচার ক'রেছেন। হিন্দু সভ্যতার কৃষ্টি আজ অন্ধ কুসংস্কারের ভিতর ডুবে গিয়েছে, ধর্ম্ম ও প্রকৃত জ্ঞান তাদের প্রাণবস্তু হারিয়ে ফেলেছে—আমরা শুধু তাদের কঙ্কালের পূজা কর্চ্ছি। বাহ্যাড়ম্বরের কঠিন নিগড় থেকে সত্য ও সুন্দরকে মুক্ত করাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের আদর্শ ব'লে বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর কাব্যের প্রাণবস্তুও সেই আদর্শে বেড়ে উঠেছে। বার বার যৌবনের ও পরিবর্ত্তনের জয়গান তিনি গেয়েছেন—বলাকা'র প্রথমেই দেখি যৌবনের আবাহন,

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
* * * *
চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার্ দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস্ ধরা,
ঝড়ে মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস্ আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,
আয়রে অমর আয়রে আমার কাঁচা॥

কিন্তু কবি জানেন নবীনের আগমন হ'বে নূতন যুগে এবং তার সঙ্গে দেখা দেবে বিদ্রোহের রক্তিম আভা। তাই তিনি তার পরের কবিতাটিতে বলেছেন—

"এবার যে ঐ এলো সর্ব্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠ্‌ছে অট্টহেসে গো।
এবার যে ঐ এলো সর্ব্বনেশে গো।"

তারপর তিনি মনুষ্যত্বকে ডেকে বলেছেন ভৈরবকে সম্ভাষণ ক'রে আনতে। প্রভঞ্জনের রুদ্রতেজে গৃহ পতনোন্মুখ হ'য়েছে, ভিত্তি কেঁপে উঠেছে কিন্তু ভয় কি তা-তে? প্রশস্ত পথ রয়েছে উন্মুক্ত—এই পথ-ই নিয়ে যাবে দুঃখ ও আনন্দের অপর পারে, সেই অমৃত আলোকে। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন,

"কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠ্‌বে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে।
রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো।
ঐ বুঝি তোর এল সর্ব্বনেশে গো॥"

এর পরের কবিতাটিতে আমরা দেখ্‌তে পাই নির্ভীক যাত্রীদলের প্রথম বাহিনী জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।

"আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধ্‌বে?
রৈলো যারা পিছুর টানে,
কাঁদ্‌বে, তারা কাঁদ্‌বে।"

আবার বলেছেন—

"জাগবে ঈশান, বাজ্‌বে বিষাণ
পুড়্‌বে সকল বন্ধ।
উড়্‌বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আন্‌বো হ'রে
ওরা জীবন আঁকড়ে ধ'রে
মরণ-সাধন সাধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে, ওরা কাঁদ্‌বে।"

কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের এই প্রথম পূজারীদের অদৃষ্টে কি লেখা আছে? সে কি শান্তি, সে কি যশ? এই যে তারা মনের আনন্দে এগিয়ে চ'লেছে ভালোবাসা কি তাদের দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করবে? কবি তাদের মিথ্যা আশার কোন পথ রাখেন নি। তিনি বলেছেন—

"পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

এই যে আমরা দুঃখদৈন্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চ'লেছি, কিসের আশা আমাদের ধ্রুবতারার মত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কে আমাদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সঞ্জীবিত ক'রে তুলবে?

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে

মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"

বিদ্রোহের এই সুর কবির নাটকের ভিতর আরও বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। আমি এখানে তাঁর তিনটি নাটকের কথা বলব। 'ডাকঘর'-এ কবি মানবাত্মার একটি গভীর সমস্যা ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই সমস্ত নাটকটির চারিদিকে একটি স্বপ্নাবিষ্ট রাজ্যের, একটি অতীন্দ্রিয় ভাবের ছবি ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর দৈনন্দিন কর্ম্ম-কোলাহল হ'তে এখানে আত্মা দূরে স'রে দাঁড়ায়, সে তার মুক্ত পাখা মেলে কোন্ সুদূর আকাশে উড্ডীন হ'তে চায়, তখন তার কাছে প্রতিভাত হ'য়ে উঠে একটি মুক্তির রাজ্য একটি আলোকের দেশ। নাটকের ভাব-বস্তুটি খুব সরল, জটিলতার কঠিন পাশ থেকে মুক্ত-বলেই এই মায়াময় মোহময় ভাবটিকে শেষ পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় দেখ্‌তে পাই। ঘরের ভিতর আবদ্ধ একটি ছোট রুগ্ন বালক, এই নাটকের নায়ক, তার আত্মা চায় মুক্তি, চায় এই বিশাল পৃথিবীতে খেলে বেড়াতে, অজানা অচেনা দেশগুলিতে চ'লে যেতে। এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, এরই বেদনার সুরের পর্দ্দাগুলি নাটকের অন্যান্য চরিত্রও বাজিয়ে চলেছে। কৃপণ খুড়া, ছোট্ট ফুলওয়ালী মেয়ে, ডাক্তার, দইওয়ালা, পাহারাওয়ালা, মোড়ল, ঠাকুরদা এরাই হ'চ্ছে গ্রামের সাধারণ চরিত্র। তুলিকার কয়েকটি সুনিপুণ রেখাপাতে চরিত্রগুলি প্রাণবান্ হ'য়ে উঠেছে—কবি তাদের যথাযথ অঙ্কন করেছেন। এই কয়টি চরিত্র দেখে গ্রামের আর হাজার হাজার লোককে আমরা চিনে ফেলি এরা তাদের নিখুঁত ছবি। কিন্তু নায়কের উপর সব সময়েই পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। কে এই বালক,—যে প্রথম থেকেই আমাদের চিত্ত অধিকার করে ? সে-ই তো মানুষের রুদ্ধ আত্মা ! সে সহসা জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে, মুক্তির জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে। মুক্তির ভিতরই সে বাঁচতে পারে—স্বাধীনতাই তার জীবন, স্বাধীনতাই তার সত্যরূপ। কঠোর-হৃদয় স্বার্থপর খুড়া ব্যবসায়ী মানুষ, তার প্রাণেও আজ কিসের সাড়া জেগে উঠেছে—তার আত্মা চায় মুক্তি। যে-আদর্শের কাছ থেকে সে সারাজীবন পালিয়ে বেড়িয়েছে সেই আদর্শ-ই আজ তাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে। গ্রামের ডাক্তারের ভিতর আমরা দেখতে পাই চলিত রীতি-নীতির রূপ আত্মাকে সে চায় পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখ্‌তে কিন্তু তা সে পারে না। তারকা যেমন তার ক্ষুদ্র আলোক-কণা নিয়ে আঁধারের পথে আলোকের দেশে যাত্রা করে আমাদের আত্মাও তেমনি অসীম সাহস ভরে মুক্তির পথে তার যাত্রা সুরু ক'রেছে। ঠাকুরদা'র কথায় কল্পলোকের ছবি ভেসে উঠে, তাঁর অস্ফুট ধ্বনি আমাদের কানে এসে বাজছে, বলছে কোন্ সে সুদূর দেশের কথা, তার চারি দিক্ ঘিরে উর্ম্মিমালা নৃত্য করছে, ধূসর পর্ব্বতমালা আকাশ চুম্বন করছে আর গীতিমুখর ঝরণা সারাদিন রূপের তরঙ্গ তুলে ছুটে চলেছে। ফুলওয়ালী মেয়েটি আসে সৌন্দর্য্যের প্রতীক হ'য়ে ; কিন্তু যে-আদর্শ ডাকপিয়নের মধ্যে লুকানো আছে, সেই আদর্শ ই কেবলি বালকটিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মানুষের আত্মা যে তার ধর্ম্ম না মেনে পারে না ! তাই ছেলেটিকে যে মহারাজের দূত হ'তেই হবে। বাস্তব জগতের মানুষ তাকে করেছে ভৎর্সনা, তার উপর অত্যাচারও করেছে ; সে কিন্তু তাঁর আহ্বানের প্রতীক্ষায় বসে আছে। তারপর শুভ মুহূর্ত্তে মৃত্যু যখন তার শুভ আহ্বান নিয়ে এল তখন সে ছুটে গেল তার কাছে, জীবনের ক্ষুদ্র ভাগ্য-বিপর্য্যয় তাকে ধরে রাখতে পারল না।

'ডাকঘর'-এ জীবনের বিভিন্ন দিকের কোন সংঘাত দেখানো হয় নি। দেখানো হয়েছে মানবাত্মার মুক্তির সংগ্রাম, বন্ধনের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ,—মৃত্যুর মধ্যে তার নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে প্রয়াণ।

এই গেল মানবাত্মার সমস্যা। 'অচলায়তনে' কবি দেখিয়েছেন মানুষের চিন্তা ও কৃষ্টি কিরূপে মিথ্যা বাহ্যাড়ম্বর এবং প্রাণহীন রীতি নীতি ও বর্ব্বর প্রথার চাপে তলিয়ে গিয়েছে। মানুষ তার জীবনের সত্যিকার সুর ভুলে গিয়েছে। পঞ্চক যেন একটি জীবন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—মনুষ্যত্বের সীমাহীন রূপ। যা বর্ব্বর অর্থহীন প্রথার চাপে নিষ্পেষিত হয় না তারই রূপ দেখ্‌তে পাই এই পঞ্চকের মধ্যে। দাদাঠাকুরের মধ্যে দেখ্‌তে পাই একটা বিবর্ত্তনের আবেগ, গতির অনুপ্রেরণা যার মধ্যে বিদ্রোহের বীজ লুকানো থাকে।

যতরকম প্রথাগত আচার অনুষ্ঠান তারই অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি হ'চ্চে মহাপঞ্চক; আর অনুষ্ঠানের নিগড় থেকে মুক্তি চায় যে-ধর্ম্ম তারই প্রতীক্ হ'চ্চেন আচার্য্য। উপাধ্যায় প্রাচীন রীতিনীতির গভীর আবেষ্টনে আবদ্ধ। প্রাচীন চিরকাল নূতনের বিরোধী। পুরাতনের নিষ্ঠুরতার বেদীমূলে নিজকে উৎসর্গ করবার জাগ্রত চেতনা সত্বেও নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখবার স্পৃহা ফুটে উঠেছে সুভদ্রের চরিত্রে। দাদাঠাকুরের দুইদল শিষ্য শোণ পাংশু ও দর্ভক। এরা হচ্ছে চাষী আর অনুন্নত জাতি যাদের ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়, এবং যুগের পর যুগ যারা অত্যাচারের ইতিহাস সগর্ব্বে বুকে ধারণ করে এসেছে। কিন্তু এদের মধ্যেই গতি ও পরিবর্ত্তন তাদের সুখনীড় রচনা করেছে কারণ তাদের হৃদয় সরল, তারা কখনও ভগবানকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শেখেনি, অচলায়তন এখনও তাদের মনকে পিষে মারতে পারে নি। তারপর যখন এই প্রাণহীন নিশ্চলতাকে ধূলিসাৎ ক'রে দেবার সময় আসে তখন এরাই সে কাজের হয় অগ্রণী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গুরু দাদাঠাকুর যখন দেখ্‌লেন আমাদের কৃষ্টি তার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছে, এখন আমাদের জ্ঞান আর নূতনের সন্ধানে ছুটে যায় না তখন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। মৌলিকতার অভাবে আমাদের কৃষ্টি প্রাচীনের রীতি নীতির চাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হ'লো। সত্যের পরিবর্ত্তে তার কঙ্কালের উপাসনা আরম্ভ হ'লো। ধর্ম্ম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার নামে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হ'লো। ঠিক্ সেই সময় আচার্য্য নির্ব্বাসিত হ'লেন কারণ আচার্য্য-ই ধর্ম্ম। দাদাঠাকুর তাঁর চাষীদের নিয়ে ফিরে এলেন, এবার আর গুরুর বেশে নয়, যোদ্ধ্‌বেশে। প্রভঞ্জনের রুদ্রমূর্ত্তি আরম্ভ হ'লো, সমস্ত দেশ বিদ্রোহের কালানলে জ্বলে উঠ্‌লো, মনুষ্যত্বের মুক্তরূপের প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার পঞ্চকের উপর পড়লো এবার নূতন কৃষ্টি-সৌধ গড়ে তুলবার ভার।

গভীর ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশে নাটকটি পরিপূর্ণ। প্রকৃতির সঙ্গে কবির মিলনাকাঙ্খা আর যে বন্ধনপাশ আমাদের জীবনকে দেয় পঙ্গু ক'রে তার হাত থেকে মানবাত্মার মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সুর ফুটে উঠেছে নাটকের প্রতি ছত্রে —তার মুক্তজীবন ও আনন্দ সঙ্গীতে।

বন্ধন হ'তে মানবাত্মা চায় মুক্তি—'ডাকঘর'-এ রবীন্দ্রনাথ তা' আমাদের দেখিয়েছেন। ভারতের কৃষ্টির অধঃপতন এবং তার পুনরুদ্ধারের সাধনা তিনি 'অচলায়তন'-এ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু 'রক্তকরবীতে' সমস্যা আরও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। যে-আধুনিক সভ্যতা প্রকৃতির নিগূঢ় আলয়ের গুপ্ত রত্নরাজিও ধ্বংস করতে দ্বিধাবোধ করে নি—সেই সভ্যতার কথা তিনি এখানে বলেছেন। বস্তুতান্ত্রিকতা শ্রমশিল্প ও অর্থোপার্জ্জনের উন্মত্ত লালসার পাদমূলে কেমন ক'রে মানুষ আত্মবিসর্জ্জন করছে, দেহে ও মনে কিরূপ ভাবে নিজেদের হত্যা করছে তারই চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাই। নাটকের আখ্যান-বস্তু আরম্ভ হ'য়েছে সোনার খনির ভিতর। এখানে সকলেই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুধু সোনা খুঁড়ছে, তারা চায় সোনা, যত বেশী সম্ভব তত বেশী সোনা। পুরুষ স্ত্রীলোক সকলেই তাদের মাঠ, তাদের দেশ ছেড়ে এখানে চ'লে এসেছে। যে-মুহূর্ত্তে তারা এখানে প্রবেশ করে সেই মুহূর্ত্তে তাদের ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ তাদের কাজ করতেই হবে। দেহ অবসন্ন হলেও, মন বিষিয়ে উঠ্‌লেও তাদের কাজ করতেই হবে। সর্দ্দারগণ এমন জটিল করে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছে, এদের গোয়েন্দা-বিভাগ এমন কর্ম্মকুশল যে এদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার কোন পথই খোলা নেই। সে দিক্ দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটিকে আদর্শ বলা চলে। যদি কোন সবল ও স্বাধীনচেতা মানুষ এখানে উপস্থিত হয় তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয় একটা ঘরের ভিতর এবং তার উপর চলে অত্যাচারের একচ্ছত্র রাজত্ব। যখন সে বেরিয়ে আসে তখন আর তাকে চেনা যায় না! বেরিয়ে ত সে আসে না, আসে তার প্রেত-মূর্ত্তি—ভগ্ন, অবসন্ন, জর্জ্জরিত। তখন তাকে খনিতে কাজ করতে যেতে দেওয়া হয় কারণ তাকে এখন কাজের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এই রাজ্যের রাজা শক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতীক্। রাজা কখনও জনসাধারণের সম্মুখে আসেন না,

সব সময় এক জালের অন্তরালে বাস করেন। সর্দ্দারগণ বণিকের শক্তি। রাজার অনুগ্রহে ও আশ্রয়ে তারা বহু-বিধ সুবিধা ভোগ করে কিন্তু রাজাকে বাইরে প্রকাশ করতে সাহস পায় না। এই অন্ধকার রাজ্যে মানুষের অন্তরের যে আদর্শ তারই আবির্ভাব হয় সুন্দরী নারীর রূপে; নন্দিনী আসে বিদ্রোহের ধ্বজা—রক্তকরবী—তার কেশে ও বক্ষে ধারণ করে। যেখানে সে যায় সেখানেই ফুটে উঠে অস্থিরতা, অধৈর্য্য ও অশান্তি। যে তার কাছে আসে, সেই মুগ্ধ হ'য়ে যায়। সর্দ্দাররা তাকে ভয় করে। কিশোর তার ক্রীতদাস—বিদ্রোহের চিহ্ন ঐ রক্তপুষ্প নন্দিনীকে এনে দেবার জন্য কি কষ্টই না সে সহ্য করে। অবরুদ্ধ আনন্দ ও উৎসাহের রূপ নিয়ে আসে বিশু, নন্দিনীকে সে তার গান শিখিয়ে দেয়। শ্রমিকের প্রতীক্ ফাগুলাল নন্দিনীর কাছে এসে কেমন একটা অপরূপ উপলব্ধির সাড়া পায় অন্তরের মধ্যে। সর্ব্ব শাস্ত্রে সু-পণ্ডিত শুষ্ক-হৃদয় যে অধ্যাপক সে-ও নন্দিনীকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, রাজা- জ্ঞান ও শক্তির প্রতীক্ যে রাজা—সেও নন্দিনীর মধ্যে যে-আদর্শ রূপ গ্রহণ করেছে, তার আকর্ষণে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। নন্দিনী তার জালের আবরণ ছিন্ন করবেই,—তার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করবেই। যদিও শেষ পর্যান্ত সে পারল না তবুও রাজার উপর তার দাবী সে প্রকাশ করে গেল।

রাজা নন্দিনীকে ভালবাসে। ইতিমধ্যে নন্দিনী রঞ্জনের পথ চেয়ে বসে আছে। রঞ্জন যৌবন, সৌন্দর্য্য ও সাহসের প্রতীক্। রঞ্জন কিন্তু পূর্ব্বেই নন্দিনীর সন্ধানে এসে সর্দ্দারদের হাতে ধরা পড়ে। সর্দ্দাররা কিছুতেই তাকে বাগ মানাতে ও তাদের ইচ্ছামত তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে না পেরে তাকে হত্যা করবার জন্য রাজাকে প্ররোচিত করে। এদিকে কিশোরও নিহত এবং বিশু বন্দী। তখন নন্দিনী রাজার কাছে যায় সাহস করে—যা-ই কেন সে তাকে করুক না সে আর রাজাকে ভয় করবে না। হঠাৎ দ্বার খুলে যায়—সে দেখে তার ভালোবাসার ধন রঞ্জনের মৃতদেহ। দুঃখে রাগে সে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। তখন রাজা বুঝতে পারে যে, যে দিতে পারতো তাকে মুক্তি তাকেই সে করেছে হত্যা। যৌবন, সৌন্দর্য্য ও সাহসই শুধু নন্দিনী অর্থাৎ আদর্শকে লাভ করতে পারে। এইখানেই রাজার সঙ্গে নন্দিনীর মিলন। আদর্শের অনুপ্রেরণা, শক্তি ও জ্ঞান একজোটে বস্তুতান্ত্রিকতা ও অর্থ-তান্ত্রিকতার শক্তিকে পরাভূত করতে চায়। বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ—রক্ত করবীর লাল পাপড়ি—এই ন্যায় যুদ্ধের মধ্যে যেন একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে তোলে।

প্রত্যেক মহা-বিপ্লবের গোড়াতেই থাকে একটা আদর্শ যা প্রাণের অস্থিরতা ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষকে আশ্রয় করে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দেয়। যৌবন ও সৌন্দর্য্য এই আদর্শের চির-প্রিয়—আপনাকে তারা বিলিয়ে দেয় তার বেদীমূলে। তারপর শক্তি ও জ্ঞান—তারাও এই আদর্শের সম্মোহনী শক্তির কাছে যখন বাঁধা পড়ে তখন বর্ত্তমানকে বাঁচিয়ে রাখতে আর তারা চেষ্টা করে না বরং তাকে বিধ্বস্ত ক'রে তার স্থানে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তু-তান্ত্রিকতা ও অর্থতান্ত্রিকতার নিগড় থেকে আমাদের সভ্যতাকে মুক্ত করতে হ'বে—এই কথাটি হ'চ্ছে 'রক্ত করবী'র বাণী।

অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে মিষ্টিক বলে নিন্দা করে থাকে; কিন্তু তাঁর যে মিষ্টিসিজম, সেটা কেবল তাঁর সৃষ্টিকে একটা শিল্পরূপ দেবার চেষ্টা। কোন বিশেষ সমস্যার বিশেষভাবে আলোচনা করাটা শিল্পীর কাজ নয়। শিল্পীর যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, তা তার শিল্পকাজকে এমন একটা জিনিষে মণ্ডিত করে, যাকে ধরা ছোঁওয়া যায় না,—অথচ সেইটেই হ'চ্চে সমস্ত বড় শিল্পের বিশেষত্ব এবং তারই জন্য সেই শিল্প সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের হ'য়ে ওঠে।

নীলদর্পণ কিরূপ লোকপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল, দেশে কিরূপ একটা সাড়া এনে দিয়েছিল বাংলা দেশের নাট্যামোদীর তা মনে থাক্‌তে পারে। কিন্তু এই নাটকটিতে শিল্পচাতুর্য্য ব'লে বিশেষ কিছু ছিল না। তাছাড়া সমস্ত বিশ্বের লোককে আকৃষ্ট করতে পারে এমন কোন বিশ্বজনীন আবেদনও এর মধ্যে ছিল না। ইংরেজ কবি Longfellowর কবিতা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। দাস-সমস্যার মীমাংসা হ'বার পর তাঁর কবিতা লোকের মনকে আর

তেমন নাড়া দিতে পারে না। বিশ্বের দ্বারে এর আবেদন পৌঁছায় না, কালদর্শ্মকে তারা অতিক্রম করে যেতে পারে না —তাদের আবেদন শুধু করুণ রসকে আশ্রয় করে নির্দ্দিষ্ট স্থানেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত তাকে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমান ভাবে আদরণীয় ক'রে তুলবে। যতদিন সভ্যতা বিরাজ করবে ততদিন প্রাচীন ও নবীনের ভিতর দ্বন্দ্ব চল্‌তে থাক্‌বে, রক্ষণশীলতা ও অগ্রগতি এবং বস্তুতান্ত্রিকতা ও আদর্শবাদের মধ্যে বিরোধের শেষ কোন দিনই হ'বে না। প্রাচীন রীতি নীতি ও অতি-নিশ্চয়তা এবং নানা জ্ঞানলাভের ইচ্ছা ও সহজবুদ্ধি বিভিন্ন পথে চল্‌তে থাক্‌বে কোনদিনই এদের মিল হ'বে না। মানবাত্মা চিরদিন উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে উঠ্‌তে চেষ্টা করবে আর যে সমস্ত শক্তি তার প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়াবে, তার অগ্রগতিকে রোধ করতে চেষ্টা করবে তাদের হাত থেকে নিজকে মুক্ত ক'রে আত্মদর্শনের দিকে ধাবিত হবে। এবং যুগ যুগ ধরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মানুষকে সাবধান করে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব মুখরিত করে ঘোষণা করতে থাক্‌বে— "ভাঙো—চলো—এগিয়ে চলো।"

শ্রীলতিকা বসু

গ্রীষ্মে

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

যে-কথা বলেছি সখি বরষার রাতে
আজি এই তীব্র গ্রীষ্মে বলা কি তা যায়!
সে-সুর কেমনে পাব খর রবি সাথে
কানে কানে গেয়েছি যা ফাগুন-সন্ধ্যায়!
শারদ-জোছনা তলে যে আঁখির পাতে
জীবনের সঞ্জীবনী সহজে হেলায়
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে প্রেমের সম্পাতে
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে তা কি মিলে সাহারায়?
তাই সখি, আজি আর নহে প্রেম বাণী,—
পার যদি তৈরি কর ঠাণ্ডা সরবৎ,
বরফ মিশায়ে তাতে ওষ্ঠাধরে আনি'
দেখাও প্রেমের এক নব সহবৎ;—
শীতল পানীর সাথে সেবারত পাণি
উড়াক্ নিশান এক নব পত্‌ পত্‌।

২

সবেরই সময় আছে। প্রণয়ের নাই?
দিনরাত দিনরাত প্রেম গুন্ গুন্,
জানি তবে না রহিবে সোহাগের ঠাঁই,
হৃদয়ে জাগিবে তবে সুনিশ্চয় খুন।
প্রিয়া যবে করিছেন কাঁথার সেলাই
কিম্বা যবে হেঁসেলেতে ভাজেন বেগুন,
তখন ফুকারি যদি প্রেমের সানাই
জানি প্রিয়া-দেহ হবে কিসেতে আগুন
প্রেমিক প্রেমিকা মাঝে যাঁহারা চতুর
কভু তাঁরা অতিরিক্ত নাহি কচলান্
প্রণয়ের লেবুটিরে; দুদিনে ফতুর
করিয়া প্রেমের পুঁজি নাহি খাবি খান
জীবনের দীর্ঘপথ, ক্লিষ্ট ব্যথাতুর
সারাটা জনম শুধু হয়ে হয়রান।

—:০:—

উপগ্রহ

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তালগাছওয়ালা পুকুরটার পাশে, গ্রামের সমস্ত সংস্রব বাঁচাইয়া কয়েক ঘর মুচির বাস। নিজেদের জমিজমা কিছু নাই, গ্রামের লোকের চাষবাস করিয়াই তাহারা দিন চালায়। জুতা অবশ্য দু'একজন তৈরি করিতে জানে, কিন্তু কিনিবার লোকের অভাবে সাজ-সরঞ্জাম ঘরের দেওয়ালে পেরেকের গায়ে বারো মাস অম্‌নি টাঙ্গানোই থাকে। জমিদারের পাইক্‌-পেয়াদার জন্য যদিই-বা বছরে এক আধ জোড়া তৈরি করিতে হয়, তাও তেমন জুৎসই হয় না।

তা হোক্‌-না মুচিপাড়া! কিন্তু পাড়াটি বড় মনোরম। সুমুখেই বহুদিনের প্রাচীন একটি বটের গাছ চারিদিকে নাবাল্‌ নামাইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। তালপুকুরটার ওপারে তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে গরু ছাড়িয়া দিয়া রাখাল-ছেলেরা এই বটতলায় আসিয়া খেলা করে; মাটিতে ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া কেহ বা কড়ি চালে, কেহ-বা দোল্‌নার মত করিয়া দু'হাতে বটের ঝুরি ধরিয়া দুলিতে থাকে, কেহ-বা গাছের ডালে চড়িয়া পা ঝুলাইয়া বাঁশী বাজায়।

এদিকে বটগাছ, ওদিকে তালপুকুর,—মাঝখানে মুচিদের বস্তি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খড়ের ছাউনী-দেওয়া ছোট ছোট ঘর।

পাড়া ঢুকিতেই ছবির মত যে-ঘরখানি প্রথমেই চোখে পড়ে সেইখানেই আমাদের গল্প আরম্ভ।

চারিদিকে খাটো খাটো মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা, দোরের কাছটিতে বাঁকা একটি নিমের গাছ; গাছের তলায়, প্রাচীরের উপর এবং ঘরের উঠানে ছোট বড় কয়েকটি মুরগী চরিয়া বেড়াইতেছে এবং ভিতরের দিকে উঠানের একপাশে কয়েকটি ঝুম্‌কা ও গাঁদা গাছের গা ঘেঁসিয়া পরিপুষ্ট কয়েকটি লাউএর লতায় মাচার উপর অজস্র কচি কচি লাউ ধরিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। মুচিপাড়ার কয়েকটা মেয়ে তালপুকুরের ঘাটে মাটির কলসি ভরিয়া জল আনিতে গেছে। দূরে পশ্চিম দিগন্তে বহুবিস্তৃত শাল-তমালের জঙ্গল। জঙ্গলের মাথার উপর আকাশটাকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়া সূর্য্যাস্ত হইতেছে এবং তাহারই খানিকটা ঝিক্‌মিকে রাঙা রোদ মাঠের উপর সারি সারি কয়েকটি হিন্তাল্‌ ও হিজল গাছের ফাঁক দিয়া তির্য্যগ্‌ গতিতে মুচিপাড়ার বুড়া বট ও নিম গাছটির চিকন্‌ কচি পাতার উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

এমন সময় মুচিপাড়ায় একটা ভীষণ গোলমাল উঠিল। গোলমালটা অনেকক্ষণ হইতেই চলিতেছিল। আগুন যেমন ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে হঠাৎ একসময় দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে—এও যেন হইল ঠিক সেইরকম।

মুচিদের ঘরে ঘরে গত কয়েকদিন হইতেই ঝগড়া হইতেছিল—'ভাগাড়ের' ভাগ লইয়া। 'ভাগাড়' মানে গ্রামের লোকের গরু-বাছুর মরিলে যে জায়গাটায় ফেলিয়া দেয় সেইটাকেই 'ভাগাড়' বলে। দীনু মুচির ভাগাড়ের ভাগ—রকম দু'আনা। অর্থাৎ একটা গরু মরিলে মাংসটা তাহার প্রথমে ষোলো ভাগ করা হয়। তাহার দু'ভাগ পায় দীনু। মাস পাঁচছয় আগে সেই দীনু কোনও ওয়ারিশ না রাখিয়াই মরিয়াছে। তাহার এই ভাগটা লইয়াই গোলমাল। দূরের একটা গ্রাম হইতে স্ত্রী পুত্র লইয়া এক ঘর মুচি তাহাদের পাড়ায় আসিয়া বাস করিয়াছে। কয়েক জন বলিতেছিল, দীনুর এই দু'আনা অংশ তাহাকেই দেওয়া হোক্‌, আবার কয়েকজনের তাহাতে ঘোর আপত্তি। বলে, দয়া করিয়া প্রত্যেকেই তাহাকে কিছু কিছু করিয়া বরং এম্‌নি দিবে তাহাও ভালো, তবু সরকারী অংশ তাহারা এমন করিয়া ভিন্‌গাঁয়ের মানুষকে বিতরণ করিতে পারিবে না।

ভিন্ গাঁয়ের মানুষটি কিন্তু ইহার-উহার কাছে ভিক্ষা করিয়া কিছু লইতে নারাজ।

সেদিন অমনি ভাগাড়ে একটা গরু পড়িয়াছে। তাহারই ভাগ হইতেছিল। দীনুর সেই দু'আনা অংশের কথা উঠিল। নিমগাছ ওয়ালা যে-বাড়ীটার কথা আমরা আগে বলিলাম সেই বাড়ীর মালিক বুড়া লক্ষণ মুচির অংশ মাত্র এক আনা। লক্ষণের মেয়ে—আমিন্ গিয়াছিল তাহাদের ভাগ আনিতে। দীনুর কথা উঠিতেই আমিন বলিল, 'আমরা ত' ও-সব কেউ খাই না পিসি, আমাদের ভাগটা তুমি দিয়ে দাও ওদের।'

সারদা বুড়া ভাগ করিতেছিল। এত বড় স্বার্থত্যাগ যে মানুষে করিতে পারে, তাহা তাহার ধারণার অতীত। রক্তমাখা হাতখানা তুলিয়া চোখের ইসারায় আমিনকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'ওমা, সে কি লা! দিবি কেনে? কেনে দিবি শুনি?'

আমিন বলিল, 'ও আমরা খাই না পিসি, নিয়ে কি করব বল!'

বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা তাহার চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইল না। স্তূপীকৃত মাংসের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়া চুপ্ড়ি হাতে লইয়া যে কয়জন প্রতিবেশিনী সেখানে বসিয়া ছিল, সারদা-বুড়ী তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'দেখলি মজা?'

সৈরভী বলিল, 'ও আর কত দেখব মা, দেখে দেখে চোখ আমাদের পেকে গেল।'

সিদ্ধি-বৌ নাক সিঁট্কাইল।—'ওর কথা আর বলিসনে দিদি, পাড়ার যে-বদ্নামটা ও ক'রে দিলে সে কি আর ঘুচ্বে কখনও?'

বলিয়াই খানিক্ থামিয়া একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া সে আবার কহিল 'ও রুহিতে-ছোঁড়াকে ভাগ দেবার মানে বুঝিস্ ত?'

'তা আবার বুঝি না!' বলিয়া সকলেই একসঙ্গে হাসিয়া চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল দুপুরে। আমিনের হাত-কাটা স্বামী নেপাল তখন বাড়ী ছিল না। মাতাল-শাল হইতে মদের ভাঁড়টা ডানহাতে ঝুলাইয়া বাড়ী যখন ফিরিল তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে। ফাল্গুন মাস। বাড়ীর হাঁস ও মুরগীগুলা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডিম দিতেছিল। তাহাই বিক্রি করিবার জন্য বুড়া লক্ষণকে প্রায় প্রত্যহই গঞ্জের হাটে যাইতে হয়। সেদিনও গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিতেই আমিনের মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া বলিল, 'বেশ করেছিস মা, ভালই করেছিস।'

নেপাল তখন ঘরে ঢুকিতেছে। একবার বুড়া শ্বশুরের দিকে একবার স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া মদের ভাঁড়টা লাউয়ের মাচার একটা বাঁশে ঝুলাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

লক্ষণ বলিল, 'ভাগাড়ের ভাগটা আমিন আজ রুহিতকে দিয়ে এসেছে। ও-সব অখাদ্য গুলো আর··'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই নেপাল কট্মট্ করিয়া আমিনের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'কাকে? রুহিতকে?'

তাহার এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে আমিনের দেরি হইল না। কথা কহিলে এখনই হয়ত একটা অনর্থ বাধাইয়া বসিবে ভাবিয়া সে একবার ঘাড় নাড়িয়াই ঘরে গিয়া ঢুকিতেছিল, নেপাল আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কাউকে না দিয়ে ও-শালাকে কেন?'

আমিন ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কি হয়েছে কি তাতে?'

নেপাল গম্ভীরমুখে বলিল, 'হুঁ। আবার কোন্দিন শুনব হয়ত—'

আমিন বলিল, 'চুপ কর বলছি, নইলে ভাল কাজ হবে না।'

'হ্যাঁ, তুই তোর যা-খুশী তাই করবি আর দেশসুদ্ধ লোক চুপ করে' থাকবে, কিছু বলতে পাবে না।'

'না, যা-খুশী তাই করিনি। করলে তোর পোড়া মুখ এতদিন আমি দিতাম পুড়িয়ে।

'না, দিস্নি!'

'না দিইনি।'

নেপাল এইবার দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, 'দেবার আর লোক পেলে না হারামজাদী!'

'দাঁড়া তবে দাঁড়া খাল্‌ভরা।' বলিয়া হন্ হন্ করিয়া আমিন তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

মেয়ে-জামাইএ ঝগড়াঝাঁটি এরকম প্রায় প্রত্যহই হয়, কাজেই বুড়া লক্ষণ সেদিকে আর বড়-একটা কান দেয় না। মা-মরা ওই একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটাকে চোখের বাহির করিতে চায় না বলিয়াই সে বিবাহ দিয়া জামাইকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর মেয়ে তাহার সুন্দরী। এত সুন্দরী মুচির বাড়ীতে সত্যই দুর্ল্লভ। যেমন স্বাস্থ্য তাহার তেম্‌নি গায়ের রং, তেমনি গড়ন! মাও তাহার দেখিতে কতকটা অম্‌নিই ছিল। তাহারও যৌবনে সুন্দরী স্ত্রী লইয়া সে অনেক কাণ্ডই করিয়াছে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও যে তাহাই হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! বুড়া ভাবে, চুপ করিয়া থাকাই ভালো।

নেপাল কিন্তু সেদিন তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দিল না। কাছে আসিয়া বলিল, 'তোমার মুখে কি 'রা' নাই নাকি? ওকে দুটো ধম্‌ক দিতে পার না?'

লক্ষণ বলিল, 'না বাবা তুমি ভুল বুঝছ নেপাল, মেয়ে আমার নিদ্দুষী।'

'হ্যাঁ নিদ্দুষী! অম্‌নি করেই ত' মেয়ের মাথাটি তুমি খেয়েছ।'

বুড়া হেঁটমুখে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'দুটো ছেলেপুলে হোক্ তখন আপ্‌নিই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

নেপাল বলিল, 'না শ্বশুর, আমি মিছে কথা বলছিনি। ওই রুহিতে শালার সঙ্গে ওর ভারি ভাব। আর তাছাড়া সেদিন ওই বামুনদের কালো-ঠাকুর ওকে একটা টাকা দিয়েছিল, দেখতে না পেলে কথাটাকে ও উড়িয়েই দিত; শেষে বলে কিনা ডিম কিনতে দিয়েছিল। এমন ও কত করে তা জানো? তবে এই আমার শেষ কথা, আর যদি কিছু করে ত' এবার আমি পালাব। মেয়ের তুমি আবার বিয়ে দিও।'

বলিতে বলিতে অকারণেই চোখ দুইটা তাহার ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। এক হাত দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে উঠিয়া যাইতেছিল, এমন সময় রুহিতের বাড়ী হইতে তাহার দেওয়া মাংসের চুপ্‌ড়ি ফেরত আনিয়া আমিন তাহার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়া বলিল, 'এই নাও তুমি খাও বসে' বসে'। হলো ত' এবার?'

আমিন যে এই কাণ্ড করিয়া বসিবে কেহই তাহা ভাবে নাই।

বুড়া লক্ষণ বলিল, 'হতভাগীর সবই কি বাড়াবাড়ি! কে তোকে ফিরে আনতে বললে শুনি! ছেলেমানুষ ত' নোস্ আমিন, বুঝিস্ ত' সবই!'

আমিন ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'তুমি আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না বাবা, তুমি চুপ কর।'

আমিনকে কাঁদিতে দেখিয়া প্রতিবেশিনী একটি মেয়ে জলভর্ত্তি কলসিটা কাঁখে লইয়াই প্রাচীরের ওপাশে দাঁড়াইয়া পাড়ল। খাটো একবুক প্রাচীর,—বেশি উঁচু নয়। এদিকে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাঁদচিস্ কেন লা? আমিন্!'

তাহার দেখাদেখি আরও একজন আসিয়া দাঁড়াইল।

'কি হয়েছে লা, চারু?' বলিয়া সৈরভী তাহার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

এবং এম্‌নি করিয়া দেখিতে দেখিকে ছেলেতে মেয়েতে বুড়াতে বুড়ীতে জায়গাটা একেবারে ভরিয়া গেল।

বেগতিক্ দেখিয়া বুড়া লক্ষণ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে চুপড়ির ভিতর মাংসের টুকরাগুলা বাছিয়া বাছিয়া তুলিতে লাগিল। বলিল, 'কিছু হয়নি মা, ওদের যেমন ছেলেমান্‌ষী নিত্যি হয় আজও তেমনি······ ও কিছু না, তোমরা যাও।'

বলিয়া চুপ্‌ড়িটা লইয়া নিজেই সেগুলা সে রুহিতের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, লোকজন সব চলিয়া গেছে। কন্যা তাহার খুব খানিকটা কাঁদিয়া চোখদুইটা লাল করিয়াছে, বোধ করি মাটিতে মাথা ঠুকিয়া কপালটা ফুলাইয়াছে

এবং মাথার চুলগুলা খুলিয়া দিয়া আলুলায়িতকেশা উন্মাদিনীর মত ঘরের চালার একটা খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া বসিয়া স্বামীর সঙ্গে গল্প করিতেছে, আর তাহার স্বামী বসিয়া আছে ঠিক তাহার পায়ের কাছটিতে। মাটির ভাঁড় হইতে কাঁসার জাম-বাটিতে মদ ঢালিয়া বাটিটা নেপাল তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া যেন খাইতে ভুলিয়া গেছে। আমিনের আয়ত দুইটি চক্ষুর কোণ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রু গড়াইতেছে অথচ তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুমিষ্টি একটুখানি হাসি! হাসিতে সারা মুখখানি তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে —আর নেপাল তাহার মুগ্ধ মৌন দৃষ্টি সেদিক হইতে কোনোপ্রকারেই ফিরাইতে পারিতেছে না। রাত্রি বোধ করি সেদিন পূর্ণিমা। শুভ্র জ্যোৎস্নায় ইহারই মধ্যে চারিদিক উদ্ভাসিত। বুড়া লক্ষ্মণ দরজা হইতে তাহাদের দেখিয়া আর ঘরে ঢুকিতে পারিল না। বটগাছটার তলায় তখন পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে চিতাবাঘের মত ছায়া পড়িয়াছিল; বুড়া গিয়া চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল।

গভীর রাত্রি। আমিন ও নেপাল—দু'জনের চোখেই ঘুম নাই। দু'জনেই সেদিন প্রচুর মদ খাইয়াছে।

অনেকক্ষণ ঝগড়াঝাঁটির পর নেপাল কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

আমিন বলিল, 'কাঁদছিস্ কেনে শুধু-শুধু?'

নেপাল বলিল, 'শুধু-শুধু কাঁদিনি আমিন, আমার যে কত কষ্ট তা তুই জানিস না।'

'সেই এক কথা! আর আমি পারি না বাবা! কাঁদ্ তবে তুই ওইখানে পড়ে' পড়ে'।' বলিয়া আমিন বোধ করি রাগ করিয়াই সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া একটুখানি দূরে মেজেতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

নেপাল বলিল, 'উঠে আয় বলছি নইলে ভাল কাজ হবে না।'

আমিন চুপ করিয়া রহিল।

নেপাল তাহার কান্না বন্ধ করিয়া তাহাকে আরও বার-কতক ডাকিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার সাড়া না পাইয়া টলিতে টলিতে তাহার কাছে উঠিয়া গিয়া বলিল, 'চল।'

আমিন বলিল, 'না যাব না। কে তোর ও-কথা শুনবে দিনরাত?'

নেপাল বলিল, 'আচ্ছা আর যদি বলি ত' এই কান মললাম।'

বলিয়া সে তাহার নিজের হাতেই কানদুইটাকে সজোরে একবার মলিয়া দিয়া বলিল, 'হ'লো ত? নে চল্ এবার।'

আমিন ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া তাহাদের দড়ির খাটিয়াটিতে আসিয়া বসিল।

নেপাল বসিল, 'এইবার তুই বল্ যে আর আমাকে কখনও কষ্ট দিবি না!'

'আবার?'

নেপাল চুপ!

কি কথা বলিবে কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া নেপাল চুপি চুপি কহিল, 'আচ্ছা আমিন, সত্যি কথা বল দেখি, আমার চেহারা খারাপ আর এই হাতটা কাটা, তাই তোর ভাল লাগে না, না?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়া আমিন শুইয়া পড়িল। বলিল, 'ঘুমোবি ত' ঘুমো। কাল সকালে আমি খাটতে যাব।'

'কোথায়?'

'বাবুদের দালানে।'

'না, তা আমি যেতে দেবো না তোকে।'

'আমি যাব।'

'গেলেই হলো কি না!'

'গেলে কি করবি শুনি?'

'ঠেঙিয়ে পাদুটো খোঁড়া করে' দেবো।'

'তাই দিস্। দেখব তুই কেমন মরদ।' বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিয়ৎক্ষণ দু'জনেই চুপ!

তাহারপর নেপালই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, 'আমি তোকে বিয়ে করেছি, জানিস্?'

আমিনের কোনও সাড়াশব্দ না পাইয়া নেপাল তাহাকে খুব খানিকটা জোরে জোরে নাড়া দিয়া বলিল, 'এই! ঘুমোলি নাকি?'

আমিন বলিল, 'জানি, জানি। বিয়ে করেছিস্ ত' কি হয়েছে কি ?'

'আমি তোকে যা বলব তাই তোকে শুনতে হবে।'

'ওমা আমার কে রে! মরতে বললে মরব, না ?'

'তাই আবার বলে নাকি কেউ ?'

আমিন চুপ করিয়া রহিল।

নেপাল আবার তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, 'এই!'

'আঃ!'

'রাগলি নাকি ?'

আমিন কথা কহিল না

নেপাল বলিল, 'যাস্ ত' কাল আমি মরব, না হয় কুন্দুদিকে পালাব।'

'তাই তোর যা খুশী তাই করিস।'

'তবু যাবি ?'

'হঁ্যা, যাব।'

'বেশ।' বলিয়া নীরবে সেদিন সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে নেপাল বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরিয়াই কাঁদিল।

কিন্তু পরদিন দেখা গেল, বাবুদের দালানে কাজ করিতে আমিন যায় নাই।

নেপাল হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তবে? কাল যে আমাকে ভারি—'

আমিন বলিল, 'মাথাটা ধরেছে। অমন ক'রে মদ আমি আর খাব না।'

'মাথা ধরেছে ? কই দেখি!' বলিয়া এক হাত দিয়া নেপাল তাহার মাথাটা টিপিতে গিয়া আর-একটি হাতের দুঃখে যেন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার সেই কাটা হাতটার দিকে বারে-বারে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিতে লাগিল, 'কেন যে মরতে গাছ কাটতে গিয়েছিলাম কে জানে! মড়্ মড়্ করে' গোটা গাছটা এসে পড়লো আমার গায়ের ওপর। মরেই যেতাম, তা ওই সরকারী হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবু যদি না থাক্‌তো ত' গিয়েছিলাম। বললাম, হাতটা তুমি আমার কেটো না ডাক্তারবাবু, তা সে কি আর শোনে! বললে, তা'হলে আমি আর বাঁচাতে পারব না। বহুৎ দায়ে পড়েই কাটতে হয়েছে।··· মাথাটা ছাড়লো এবার ? একটা দড়ি বেঁধে দেবো ?'

'না থাক্। সকাল সকাল চান ক'রে আসি। এসে রাঁধব।' বলিয়া আমিন উঠিয়া দাঁড়াইল।

নেপাল বলিল, 'না হ'লে বল ত' ছাখ্ আমিই রেঁধে দিই আজকার মতন। তুই ঘুমো।'

আমিন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'না।'

বলিয়া সে কলসী কাঁখে লইয়া তাল-পুকুরে স্নান করিতে গেল আর নেপাল সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিক পানে তাকাইয়া রহিল।

• •

তা চেহারার দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমিনের স্বামীর যোগ্যতা নেপালের ত' নাই-ই, এমন-কি সারা গ্রামের মধ্যে কাহারও আছে কিনা সন্দেহ।—আমিন এত সুন্দরী!

নেপাল শুধু সেই দুঃখেই মরে, অথচ মুখ ফুটিয়া তাহার সে দুঃখের কথা কাহাকেও বলিবার উপায় নাই।

বাঁ-হাতটা তাহার কনুই-অবধি কাটা; তা হোক্। পথ চলিতে চলিতে নেপাল অনেক সময় তাহার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায়। দেখে, তাহার গায়ের রংটা অতিরিক্ত কালো, আমিনের সঙ্গে রাত্রি ও দিনের মত প্রভেদ, হাত-পা গুলা লম্বা-লম্বা, একটুখানি কুঁজো, চলিবার ধরণটাও বিশেষ ভাল নয়, তবে তাহার মুখের চেহারা নেহাৎই-বা এমন কী খারাপ! পচা বাউরির মুখখানা যেমন কিম্ভূতকিমাকার, তেমন ত' নয়! আমিনের সঙ্গে তুলনায় অবশ্য কিছুই নয়, তবে পুরুষ মানুষ অমন হইয়াই থাকে! আমিনের একটা আর্শী আছে, নিজের মুখখানা তাহাতে সে বহুবার দেখিয়াছে। দেখিয়া তৃপ্তি কিন্তু তাহার তেমন হয় নাই। মনটা এক-এক সময় খুঁৎ-খুঁৎ করে। বাবুদের মেজবাবুর মত চেহারা হইলে আমিনের সঙ্গে তাহাকে মানাইত চমৎকার। কিন্তু মেজবাবু? না। অত সুন্দরী আমিন

নয়। তবে 'চাটুজ্যেদের' রাখহরির মত চেহারাটা হইলেও বা হইত।—কিন্তু দূর ছাই! ছোট জাত, গরীব তাহারা, দুখ্ভিখ্ করিয়া খায়,—চেহারার কথা ভাবিয়া এমন করিয়া কে কবে কষ্ট পাইয়াছে? আমিনের সঙ্গে বিয়ে না হইলে তাহাকেও এ-কথা ভাবিতে হইত না। আমিনকে বিবাহ করা হয়ত' তাহার অন্যায় হইয়াছে। আচ্ছা এমন হয় না······হয়ত' রাত্রে সে অচেষ্টভাবে ঘুমাইতেছে হঠাৎ দেখিল এক দেবতা আসিয়া তাহার শিয়রের কাছে দাঁড়াইল।—'খা এই ওষুধটা, তাহ'লেই তোর চেহারা ভাল হয়ে যাবে।' বাস, পরের দিন হইতে তাহাকে আর চিনিবার উপায় নাই। কিম্বা এমন যদি হয়, দিনের বেলা সে যে-নেপালকে সেই নেপাল, অথচ রাত্রি হইলেই অন্য লোক। 'স্বপ্নে ত' অনেক লোক অনেক-কিছু পায়, সেই বা পাইবে না কেন? কিন্তু ওষুধ খাইয়া চেহারা বদ্‌লাইয়াছে এমন ত' কখনও শোনা যায় নাই, সুতরাং সে আর এ-জীবনে হইবার নয়।

নেপাল ওই কথা দিবারাত্রি ভাবে বটে, আমিন কিন্তু ভুলিয়াও কোনোদিন তাহার চেহারা লইয়া কোনও মন্তব্যই করে না, বরং তাহাকে পথে-ঘাটে স্বামীর গুমোর করিতেই শোনা যায়।

গ্রামের ও-প্রান্তে বাবুরা একটা প্রকাণ্ড দালান-বাড়ী তৈরি করিতেছে। বাউরি বাগ্দি মেয়েদের সঙ্গে আমিনও কয়েকদিন সেখানে খাটিতে গিয়াছিল। ছুটির পর এক দিন বাড়ী ফিরিবার পথে রুহিতের সঙ্গে আমিনকে হাসিতে দেখিয়া নেপাল সেই যে তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে তাহার পর সেখানে খাটিতে সে আর যায় না। রাগ করিয়া নেপালকে সে এক-একদিন যাইবার কথা বলে বটে, কিন্তু মেয়েরা তাহাকে ডাকিতে আসিলে জবাব দেয়—'না ভাই, আমার কি আর কোথাও যাবার জো আছে? ও যদি শুনতে পায় ত' আর বাকি কিছু রাখবে না।'

এক-একটা দুষ্টু মেয়ে চোখ ঠারিয়া হাত নাড়িয়া বলে, 'বাবা-লো! এত কেন? এমন আবার তুই কবে থেকে হলি?'

আমিন হাসিয়া বলে, 'কেনে, আমি কি খারাপ নাকি?'

'না তুই সাধু—স্যাওড়া গাছ!'

আমিন হয়ত' মুখ ভারি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। নেপাল বলে, 'মুখটা তোর আজ অমন হাঁড়ির মতন কেনে বল্ দেখি?'

আমিন বলে, 'যা যাঃ, তুই আর আমার সঙ্গে কথা বলিস্ না খাল-ভরা!'

'ও আবার কি হ'লো?' বলিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত নেপাল তাহার মুখের পানে ফ্যাল্ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকে।

আমিন বলে, 'হলো তোর মাথা! গাঁ-শুদ্ধু লোকের কাছে আমার মুখ দেখানো ভার হ'য়ে উঠলো! এবার কোনোদিন কিছু বলেছিস্ ত' আমি গলায় দড়ি দিয়ে না মরি ত' কী!'

'কই আমি ত' কিছু বলিনি আমিন্।' বলিয়া ভয়ে-ভয়ে নেপাল তাহার কাছে আগাইয়া যায়। বলে, 'আর আমি কিছু বলব না তোকে। আমি কি আর সাধ ক'রে বলি আমিন্, অনেক দুখে বলি।'

'দুখ না তোর পিণ্ডি! সোয়ামী যদি দোষ দেয় ত' লোকে দেবে না কেন? গাঁয়ে কি আমার মুখ পাতবার জো আছে?'

'নাঃ, আর আমি কখনও কিছু বল্ব না।' বলিয়া নেপাল তাহার মনে-মনে সত্যই সেদিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তাহার বেশিদিন সে রাখিতে পারে না—এই যা দুঃখ।

সন্ধ্যায় সেদিন পুকুরে জল আনিতে গিয়া বাড়ী ফিরিতে আমিনের দেরি হইল।

নেপাল তখন মদ খাইয়া একটা লাঠি লইয়া উঠানে বসিয়া আছে। আমিন আসিয়া উঠানে পা দিতেই সে দাঁত কিস্‌মিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আয়, তোকে আজ আমি খুন করে' জেহেল্ খাটিগে যাই।'

আমিন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে খুন করবি মুখপোড়া ?'

'তোকে, তোকে।'

'আ! তাও যদি দু'টো হাত থাক্‌তো!'

বলিয়া হাসিতে হাসিতে জলের কলসীটা আমিন ঘরের মধ্যে রাখিতে গেল।

কাটা হাতের ইঙ্গিত ইহার পূর্ব্বে আমিন কখনও আর করে নাই। কাপড় ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতেই দেখে, অন্ধকার উঠানের একপাশে নেপাল নির্জ্জীবের মত চুপ করিয়া হেঁটমুখে বসিয়া আছে।

আমিন তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'নে মার। মেরেই যদি তোর সুখ হয় ত' তাই মার।'

যে-নেপাল এতক্ষণ এত আস্ফালন করিতেছিল সেই নেপালের মুখে আর রা নাই।

আমিন তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া দিয়া বলিল,

'অমন ক'রে ব'সে রইলি যে? নে—মার্।'

লাঠিখানি হাতে লইয়া নেপাল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুখে আর কোনও কথা না বলিয়াই সে বাহিরে চলিয়া গেল।

আমিন তাহার পিছু পিছু দরজা পর্য্যন্ত গিয়া ডাকিল,—

'এই! শোন্! ফিরে আয় বলছি!'

নেপাল পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইয়াও দেখিল না। অন্ধকার পথ ধরিয়া কোথায় চলিয়া গেল কে জানে।

খবর পাইয়া বুড়া লক্ষণ মাঠের পথ ধরিয়া অন্ধকারে 'নেপাল! নেপাল!' বলিয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, মুচিপাড়াটা একবার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও তাহার কোনও সংবাদ না পাইয়া হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আমিনকে গালাগালি করিতে লাগিল।

আমিনও পড়িয়া পড়িয়া খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর নিজেই এক সময় ঝাড়াঝুড়ি দিয়া উঠিয়া বাপকে খাওয়াইয়া নিজে খাইল এবং নক্ষত্রখচিত আকাশের পানে তাকাইয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া আপন মনেই কত-কি সব বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন্ সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

তিনদিন পরে, কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না, সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া চুপি চুপি নেপাল আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

দেখিল, রান্না করিবার জায়গাটায় জলন্ত চুল্লীর কাছে বসিয়া বুড়া লক্ষণ উনানের ভিতর মাঝে-মাঝে শালের শুক্‌নো পাতা গুঁজিয়া দিতেছে। আমিনকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

নেপাল ধীরে-ধীরে লক্ষণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'সে কোথা ?'

'এই যে, এসো বাবা এসো। সেদিন অমন করে' চলে গেলে···ছি! তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কতদিনে হবে বাবা কে জানে।'

নেপাল সে কথার কোনও জবাব না দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'আমিন কোথা গেল ?'

লক্ষণ বলিল, 'মাতাল-শালে মদ আনতে গেছে। এলো বলে।'

গম্ভীর মুখে নেপাল বলিল, 'হুঁ। তা আবার যাবে না! তা ত যাবেই।'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া নেপাল বসিল। বসিয়া বলিল, 'শোনো শ্বশুর, আমিনকে আমি নিয়ে যাব। এখানে আর রাখব না।'

কথাটা শুনিয়া বুড়া একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'সে কি বাবা! আমি বুড়ো মানুষ, কবে হুট করে মরে যাব। তা বেশ, আমি মলে ওকে নিয়ে যেয়ো তোমার যেখানে খুশী। এখন থাক্।'

নেপাল বলিল, 'তাহ'লে পাঠাবে না বল।'

লক্ষণ বলিল, 'বিয়ের সময় ত' সেকথা তোমার দাদাকে বলেই আমি বিয়ে দিয়েছি বাবা। এখন ওকে নিয়ে যদি যাও ত' মরবার সময় মুখে একটু জলও পাব না।'

নেপাল তাহার দাদার সঙ্গে বুঝিয়া আসিয়াছে। বলিল, 'আচ্ছা, আসুক্ সে। ওকে একবার শুধোই। বাস্, না যায় ত' আমি চলে যাব।'

মাতাল-শাল হইতে মদ লইয়া আমিন ফিরিয়া আসিল।

নেপাল বলিল, 'ত্থাখ্ আমিন, ভালয়-ভালয় বলছি তোকে, আমার সঙ্গে যাবি কিনা বল্। এখানে তোকে আমি আর রাখব না।'

আমিন বলিল, 'আর আমার বাবা?'

'বাবা তোর থাকবে এইখানে।'

আমিন বলিল, 'মাইরি আর কি! বাবাকে তুই রেঁধে দিয়ে যাবি?'

নেপাল বলিল, 'কেনে, নিজে রেঁধে খাবে।'

আমিন হাসিল।

'হাস্লি যে?'

'তোর কথা শুনে'।'

'তাহ'লে যাবি না বল্।'

আমিন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

'কিছুতেই না?'

'না।'

'বেশ, তবে আমি চলে যাব—জন্মের মতন—আর আসব না কিন্তু।'

'তা আর আমি কি কর্‌ব বল্।'

রাত্রে সেদিন আমিনকে নেপাল অনেক করিয়া বলিল, অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক কান্নাকাটি করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষ পর্য্যন্ত ইহাই স্থির হইল যে, আমিন তাহার বাবার কাছে এইখানেই থাকিবে এবং নেপাল তাহাকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া দিয়া—জঙ্গলের ধারে ডাঙ্গাল-পাড়ায়, যেখানে তাহার দাদা আছে, সেইখানেই চলিয়া যাইবে।

নেপাল বলিল, 'তাহ'লে কাল সকালেই আমি চলে যাব আমিন। হায় হায়, শেষ পর্য্যন্ত এই আমার কপালে ছিল। ওঃ! তুই খুব মেয়ে যা-হোক্!'

আমিন চুপ করিয়া রহিল।

নেপাল আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা তোর মায়া দয়া কি কিছুই নাই? তুই মানুষ না পাথর?'

আমিন বলিল, 'না আমার কিছু নাই। ঘুমোবি ত' ঘুমো, আর চেঁচাস্ না।'

রাত্রে ঘুম আর নেপালের হইল না। ভাবিল, যাক্‌গে, তাহার উপর টান যার একেবারেই নাই, তাহার জন্য সে-ই বা এমন করিয়া ভাবিয়া মরে কেন?

ঘন-ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রভাত হইল। একটু একটু করিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল। যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই নেপাল একবার ঘরের উঠানে বসিল, একবার বটতলায় বসিল, একবার তালপুকুরের পা'ড়ে গিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, অকারণেই একবার মুচিপাড়াটার এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর দুপুরে ঠিক খাইবার সময় নিতান্ত বিষণ্ণ মুখে আমিনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দিবি চারটি ভাত?'

আমিন ভাত বাড়িয়া দিল। যাইবার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল না

এমনি করিয়া যাই যাই করিয়াই নেপালের দিন কাটিতে লাগিল, অথচ যাওয়া আর তাহার হইয়া উঠিল না।

রাগ করিয়া আমিনের সঙ্গে সে ভাল করিয়া কথাও বলে না, খাইবার সময় চারটি খায় আর যেখানে-সেখানে শুধু ওই এক কথা ভাবিয়া ভাবিয়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। শুধু সেই এক চিন্তা, শুধু সেই একখানি মুখ, শুধু আমিন আর আমিন!···

আমিনও কয়েক দিন চুপ করিয়াই ছিল, সেদিন হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'কই, গেলি না যে?'

নেপাল বলিল, 'আমি যদি না যাই, তোর কি? তোর সঙ্গে আমার ত' কোনও সম্বন্ধ নাই।'

আমিন হাসিতে লাগিল।—'সম্বন্ধ নাই? বেশ, তবে আমার যা খুশী তাই করি।'

'কর্ না! কে তোকে বারণ করছে? আর আমার বারণ শুনবিই বা কেনে, আমি তোর কে?'

আমিন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাবাঃ!

বাঁচলাম! কাল থেকে বাবুদের দালানে তা'হ'লে খাটতে যাব।'

নেপাল বলিল, 'যাস্। না যাস্ ত' তোকে দিব্যি রইল। ওরে বাবারে বাবারে, আমাকে তাড়াবার জন্যে বসে আছে হারামজাদী।'

আমিন আর কোনও কথা না বলিয়া হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

নেপাল বলিতে লাগিল, 'ভুবেলা চারটি ভাত দিস্, না হয় দিবি না। এই ত? চলে যাব।··· আমার হাতে পড়েছিস তাই রক্ষে, অন্য কারও হাতে যদি পড়তিস্ ত' এতদিন তোকে কি আর জ্যান্ত রাখতো? কেটে কুটে খণ্ড খণ্ড করে' নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতো। তা জানিস?'

এম্নি করিয়াই দিন চলিতেছে। এমন দিনে একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল। কলিকাতা হইতে এক ছোক্‌রা আসিল, নাম সুরেন, মাথায় টেরি, গায়ে জামা, পায়ে ফিতা দেওয়া জুতা, হাতে একটি চামড়ার বাক্স, দেখিলে মুচি বলিয়া মনে হয় না, অথচ সে গ্রামে ঢুকিয়াই মুচিপাড়ার খোঁজ লইয়া লক্ষণ মুচির সেই নিমগাছওয়ালা বাড়ীটিতে আসিয়া ঢুকিল।

বুড়া লক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। চিনিবেই বা কেমন করিয়া? কখনও তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পরিচয় দিতেই চিনিল। লক্ষণের শালীর দেওর। সম্পর্ক একটুখানি দূরের। কিন্তু যতই দূর হোক্—কুটুম্ব। সুরেনের বাপের সঙ্গে এককালে তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতাই ছিল। উঠানে দড়ির খাটখানি পাতিয়া দিয়া সুরেনকে বসিতে বলিয়া বুড়া তাহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

বর্দ্ধমান জেলার দামোদর নদীর তীরে তাহাদের গ্রামের বাড়ীখানা এখনও আছে বটে, কিন্তু বারো মাস ধরিতে গেলে একরকম কলিকাতা সহরেই বাস। বাস না করিলে চলেও না। জুতার দোকানটি ত' আছেই, জুতা তৈরির কার-খানাও একটা খুলিয়াছে এবং সেখানে তাহার আরও দুইটি ভাইকে বসাইয়া দিয়া নিজে সে সম্প্রতি একটা কাঁচা চামড়ার ব্যবসা করিতেছে, আর তাহারই জন্য এমনি করিয়া প্রায়ই তাহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

লক্ষণ বলিল, 'কিন্তু ভাই, আমরা ত' গরীব—পাড়া-গাঁয়ের মানুষ,—তোমার বড় কষ্ট হবে।'

সুরেন বলিল, 'না, না, কোনও কষ্টই হবে না। আপনি ভাববেন না।'

সসম্ভ্রমে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন বুড়া লক্ষণকে আজ পর্য্যন্ত কেহই বোধ হয় করে নাই। সুরেনের এই বিনীত সম্বোধনে সে গলিয়া জল হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার আতিথ্যের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আমিন এতক্ষণ দেওয়ালের ফুটা দিয়া তাহাদের গৃহের এই নবীন আগন্তুকটিকে দেখিতেছিল। লক্ষণ তাহার কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কে বাবা?'

'ও তোর ফুলবেড়ের সেই বড় মেসোর ভাই। কলকাতায় থাকে, খুব বড়লোক, দিনকতক আদর-যত্ন ক'রে রাখতে হবে, কুটুমের ছেলে,—পারবি ত?'

আমিন বলিল, 'খুব পারব। কেন পারব না?'

মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল নেপালের সেই বিষণ্ণ কাতর মুখ, তাহার সেই সসঙ্কোচ মিনতি, তাহার নিস্ফল আক্রোশ! বাড়ী ফিরিয়া এই অতিথিটিকে সে যে কি বলিয়া অভ্যর্থনা করিবে কে জানে। কিসের যেন একটা অজানা আতঙ্কে বুকের ভিতরটা তাহার দুর্ দুর্ করিতে লাগিল।

•

গত কয়েকদিন হইতে অনেক রাত্রি করিয়া নেপাল বাড়ী ফিরিতেছিল, সেদিনও ফিরিল যখন, তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। দিনের আগন্তুক তখন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে। রান্নার জায়গাটায় বসিয়া আমিন রান্না করিতেছিল আর তাহারই পাশে বসিয়া সুরেন। সহর হইতে বহুদূরের নিতান্ত নিভৃত এই পল্লীগ্রামের অবজ্ঞাত অবহেলিত এই মুচিদের বাড়ীতেও এমন অকস্মাৎ যে এমন সুদুর্লভ সুন্দরীর সাক্ষাৎ মিলিতে পারে সুরেনের তাহা

কল্পনার অতীত। আমিনকে দেখিয়া অবধি সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সেই তখন হইতে সে তাহার পিছন ছাড়ে নাই। আমিনের মনে-মনে ভয় হইতেছে, কিছু বলিতেও পারিতেছে না অথচ ভালও লাগিতেছে।

নেপাল প্রথমে অন্ধকার উঠানের উপর দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিয়া ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মদ খাইয়া আসিয়াছে, নেশার ঝোঁকে ভুল দেখিতেছে না ত? চোখ দুইটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া লইয়া একটু-খানি আগাইয়া গিয়া দেখিল, ভুল নয়, সত্যই কে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আমিনের অত্যন্ত সন্নিকটে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছে, আর আমিনও তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতেছে।

নেপাল ভাবিল, ঘটনাটা তাহার শ্বশুরকে ডাকিয়া আনিয়া দেখায়। তাই সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'কোথা রয়েছ তুমি?'

লক্ষণ মুড়িসুড়ি দিয়া চালার একপাশে বসিয়াছিল। বলিল, 'কে? নেপাল?'

'হাঁ, তুমি উঠে এসো ত' একবার!'

লক্ষণ উঠিয়া আসিল। বলিল, 'কি?'

তাহার হাত ধরিয়া উঠানে লইয়া আসিয়া আমিনের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, 'ছাখো, মিছে না সত্যি!'

সেখান হইতে বলিলে পাছে কুটুমের ছেলেটি শুনিতে পায় তাই লক্ষণ তাহাকে পুনরায় সেই চালার উপর আনিয়া বলিল, 'ও ছেলেটি আমার এক শালীর দেওর। কলকাতা সহর থেকে আজই এসেছে, খুব বড়লোকের ছেলে। ওর সাম্‌নে আমিনকে কিছু বোলো না বাবা, নিন্দে হবে।'

নেপাল একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বলিল, 'হুঁ।'

বলিয়া সে গুম্‌ হইয়া মাথা নামাইয়া অন্ধকারেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

লক্ষণ বলিতে লাগিল,—'আসবামাত্র দেখলে যে আমরা গরীব, ঝপ্‌ করে' অমনি জামার জেব্‌ থেকে দশটা টাকা বের করে' দিলে। বললে আবার দরকার হলেই বোলো। চামড়ার কারবার করে কিনা, কলকাতার মতন সহরে মস্ত দোকান·····দিন কতক থেকেই আবার চলে যাবে।'

নেপাল ভাবিল, আমিনের আশা এইবার পরিত্যাগ করাই উচিত। বলিল, 'তোমার কে হয় বললে?'

লক্ষণ বলিল, 'আমার শালীর দেওর।'

'তাহ'লে আমিনের কে হচ্ছে?'

'আমিনের মাসীর দেওর। মেসোর ভাই।'

নেপাল আবার তেমনি গম্ভীরভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হুঁ।'

দু'দিন পরেই গ্রামে গরু-বাছুরের মড়ক্‌ লাগিল। কাহারও চাষের বলদ, কাহারও দুধওয়ালা গাই, কাহারও বাছুর—একটার পর একটা নির্ব্বিচারে মরিতে সুরু করিল। ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গেল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'পছে বাওড়্‌' আসিয়াছে।'

কেহ বলিল, 'গরুবাছুরকে এই সময় দুব্‌ ঘাস আর লুন খাওয়াইতে হয়।

আবার কেহ-বা বলিল, দেবী ভগবতী কুপিতা হইয়াছেন। এই সময় সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া ভগবতীর পূজা করানো উচিত।'

যে যাহা বলিল, সকলে মিলিয়া তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিনের পর দিন চিল-শকুনীতে ভাগাড় ভরিয়া রহিল।

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুচিপাড়ার উপর কাকের ঝাঁক কা কা করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। লক্ষণের উঠানে চামড়ার গাদা! দুর্গন্ধে সেদিক দিয়া পার হইবার উপায় নাই।

মুচিরা এখন মাত্র ছুরি হাতে লইয়া ভাগাড়ে গিয়া গরু-বাছুরের চামড়াটা ছাড়াইয়া লইয়া আসে। চামড়া বিক্রি করিবার জন্য অন্যত্রে যাইতে হয় না। সুরেনের কাছে একেবারে হাতে হাতে নগদ দাম! মাংসের পরিবর্ত্তে এখন তাহারা ঘরে ঘরে পয়সা ভাগ করিয়াই খালাস।

বুড়া লক্ষণের বাড়ীতে ভোজ যেন দিবারাত্রি লাগিয়াই আছে। গ্রামের শুঁড়ি-ঘর হইতে ধেনো মদ এখন আর তাহারা আনে না। প্রত্যহ বৈকালে সুরেন ডাকে,—আমন!

হাসিতে হাসিতে আমিন তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

'আজ পাঁচ বোতল।'

আমিন বলে, 'মরণ আর কি!' বলিয়া সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া ঘরে গিয়া ঢোকে। ঘর হইতে টাকা বাহির করিয়া আনিয়া নেপালের হাতে দিয়া বলে, 'বেশী দেরী কোরো না যেন।'

আমিন তাহার স্বামীকে 'তুই' আর বলে না। এখন সে ভদ্র হইয়াছে।

সুরেনের দেওয়া সবুজরঙের সার্টখানি গায়ে দিয়া নূতন একটি গামছা কাঁধে লইয়া নেপাল মদ আনিতে যায়।

লক্ষণের উঠানে পাড়ার আরও দু'চারজন ছোক্‌রা আসিয়া জোটে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সুরেনের সঙ্গে তাহারা মদ খাইয়া হাল্লা করিয়া গান গাহিয়া জায়গাটাকে বেশ করিয়া জাঁকাইয়া রাখে, তাহার পর কেহ বা সেইখানে গড়াইয়া পড়ে, কেহ-বা টলিতে টলিতে বাড়ী চলিয়া যায়, আর নেপাল প্রায় প্রত্যহই মদ খাইয়া বমি করিয়া বেহুঁস হইয়া উঠানের একপাশে পড়িয়া থাকে, বুড়া লক্ষণ ঘরের ভিতর নাক ডাকাইয়া ঘুমায়।

ঘুমায় না শুধু আমিন আর সুরেন। সারারাত্রি ধরিয়া আমোদ আহ্লাদ হাসি গল্পের পর সকালে দেখা যায়, সুরেন যেখানে ঘুমাইতেছে আমিন তাহার ত্রিসীমানায় নাই।

গরুর মড়ক্ শুধু এ গ্রামে নয়, পাশাপাশি আরও দু'চারটা গ্রামেও ঠিক এম্‌নি মড়ক্ সুরু হইয়াছে।

প্রতিদিন প্রভাতে সুরেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, ফিরিয়া আসে অন্য গ্রাম হইতে চামড়া লইয়া। এমনি করিয়া এই দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই সে তিন চার গাড়ী চামড়া কলিকাতায় চালান করিয়াছে।

কেহ কাছে না থাকিলে আমিন হাসিয়া বলে, 'তা তোমার বুদ্ধি আছে সত্যি।'

সুরেন বলে, 'বুদ্ধি না থাকলে কি টাকা হয় পাগলী?'

আমিন বলে, 'তা বটে। কিন্তু হ্যাঁগা, খোলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে গরু চরবার মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে আসতে হয়; না?'

সুরেন হাসিয়া ঘাড় নাড়ে। বলে, 'হাঁ'।

আমিন জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, সে বিষ খেলে মানুষ মরে না?'

'কেন?'

আমিন হাসিয়া বলে, 'আমি একটুখানি খেতাম তাহ'লে।'

সুরেন জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, কি দুঃখে?'

'তোমার দুঃখে।' বলিয়া আড়চোখে ঈষৎ হাসিয়া আমিন লজ্জায় সেখান হইতে ছুটিয়া পালায়।

সুযোগ বুঝিয়া একলা পাইলেই সুরেন তাহাকে ধরিয়া বসে, 'না বলো তুমি বিষ খাব কেন বললে বল!'

আমিন কিছুতেই বলিতে চায় না। বলে, 'ছাড়ো।'

'না বললে ছাড়ব না।'

আমিন তখন বলিতে বাধ্য হয়। হেঁটমুখে বলে, 'কাজ ফুরোলেই ত' পালাবে!'

'যদি না পালাই।'

আমিন সে কথা বিশ্বাস করে না। বলে, 'হ্যাঁ—। আমি জানি, যাও!'

সুরেন তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বলে, 'এমন সুন্দরী আমি সত্যি কোথাও দেখিনি আমিন, আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

আমিন বলে, 'বা-রে! আমার সোয়ামী রয়েছে……'

'ওকে তুমি ছেড়ে দাও।'

আমিন এইবার জোর করিয়া তাহার হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া যায় এবং যতক্ষণ না তাহার বাবা বাড়ী ফেরে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুকুরের ধারে বসিয়া বসিয়া কাঁদে।

আমিনকে নেপাল আজ কয়েকদিন কিছু বলে নাই। শ্বশুর বলিয়াছে, কুটুম্বের সাক্ষাতে বলিলে নাকি নিন্দা হয় আর তা' ছাড়া আমিনও হয়ত দুঃখ করিতে পারে তাই সে তাহার মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখে।

সহর হইতে সুরেন সেদিন আমিনের জন্য কয়েকখানা

ভাল ভাল শাড়ী আনাইয়া দিয়াছে, তাহাই সে পরিয়া পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, দেখিতে তাহাকে আরও সুন্দরী বলিয়া মনে হয়, নেপাল তাহার মুখের পানে এমন সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে মনে হয়, ভক্ত যেন প্রতিমার পানে তাকাইয়া আছে।

নেপাল রোজ মদ খাইয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকে, রাত্রে কোথায় কি যে হয় কিছুই সে টের পায় না। রোজই ভাবে, মদ আর সে অমন করিয়া খাইবে না। কিন্তু জীবন-ভোর শুঁড়িঘরের পচাই মদ খাইয়াই দিন কাটিয়াছে, ভাল মদ অদৃষ্টে একরকম জোটে না বলিলেই হয়, এতদিন পর হঠাৎ যদিই-বা জুটিয়াছে তাহাকে এমন করিয়া অবহেলা করা হয়ত তাহার উচিত নয় ভাবিয়া সে খাইবার সময় লোভ আর কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারে না

সেদিন অম্নি মদ আসিয়াছে, উঠানের মজলিসও বসিয়াছে, সুরেনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও নেপাল তাহার লোভ সম্বরণ করিল। দূরে মাত্র একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলিতেছিল, উঠানে জ্যোৎস্না, কিন্তু নেপালের বসিবার জায়গাটায় নিমগাছের ছায়া পড়িয়াছে, তাই তাহার চালাকি কেহ দেখিতে পাইল না। পাথরের বাটির উপর বোতল হইতে সুরেন তাহাকে নিজের হাতে মদ ঢালিয়া দিতেছিল। যতবার দিল ততবারই নেপাল তাহা হাত বাড়াইয়া লইল বটে, কিন্তু খাইবার নাম করিয়া মদটুকু সে বাটি হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিতে লাগিল। এবং শেষ পর্য্যন্ত ছল করিয়া সে মাতালের মত সেইখানে পড়িয়াও রহিল।

তাহার ফল হইল এই যে, তাহার কাছে এতদিন যাহা গোপন ছিল, সেদিন রাত্রে দিবালোকের মতই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

রাত্রি তখন বোধ করি দু'পহরেরও বেশি। জ্যোৎস্না ডুবিয়া গিয়া চারিদিক তখন অন্ধকারে পুনরায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। নেপাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। একটু দূরে রান্না করিবার চালাটার কাছে মনে হইল কাহারা যেন কথা কহিতেছে। বুকের ভিতরটা নেপালের দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, পা দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তবু সে ঠিক চোরের মত হামাগুড়ি দিয়া অন্ধকারে একটু একটু করিয়া সেইদিক পানে আগাইয়া গিয়া বড় ঘরের দরজার কাছে চুপ করিয়া বসিল। এবং প্রাণপণে নিজের নিশ্বাসের শব্দটিকেও যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শুনিতে লাগিল—

আমিন বলিতেছে,—'না।'

সুরেন বলিল, 'না কেন?'

'না, ওকে আমি নিজে থেকে ছাড়তে পারব না।'

'তাহ'লে বল নেপালকে তুমি ভালবাসো।'

'তা আমি জানি নাকো যাও!'

তাহার পর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধতা।

পরে সুরেন বলিল, 'তোমাকে আমি বিয়ে তাহ'লে করব কেমন ক'রে? ভেবেছি, বিয়ে ক'রে তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাব।'

আমিন বলিল, 'বিয়ে নাই-বা করলে!'

'বিয়ে না করে' এইখানে থাকব বুঝি বারো মাস?'

'না, মাঝে-মাঝে আসবে, আবার চলে যাবে, আবার আসবে।'

'না গো না, তোমায় আমি চিরদিনের জন্যে পেতে চাই। নেপালকে তুমি ছাড়ো।'

আমিন চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন বলিল, 'তোমায় আমি খুব—খুব ভালবাসি।'

আমিন কথা বলিল না। সুরেন মাঝে মাঝে বলিয়া যাইতে লাগিল—

'তোমার মত মেয়ে আমি দেখিনি।'

'ও হাতকাটা হারামজাদা কি তোমার উপযুক্ত নাকি? আমার মত বর হ'লে তোমায় মানায়।'

'তুমি যদি একান্তই ওকে না ছাড়ো ত' একদিন রাত্রে উঠে তোমায় নিয়ে পালাব।'

আমিনের চাপা হাসির শব্দ পাওয়া গেল।

নেপালের মনে হইতে লাগিল, তাহার যেন জ্বর আসিয়াছে।—এই সময় সে যদি একটা অস্ত্র পায়!—খুব ধারালো ইস্পাতের খাঁড়া কিম্বা তলোয়ার! তাহা হইলে এখনই এই মুহূর্ত্তে হয়ত' সে উহাদের দু'জনকেই একসঙ্গে খুন করিয়া আসিতে পারে।

কি যে করিবে তাহা সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। অথচ উহারাও কিয়ৎক্ষণ পরে চুপ করিল। আর কাহারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। চারিদিক নিঝ্ঝুম! অন্ধকার রাত্রি। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। দূরে কোথায় যেন একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে।

হঠাৎ তাহারা দু'জনেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এবং সে হাসির শব্দ নেপালের বুকে আসিয়া বিঁধিল ঠিক যেন বিষাক্ত তীরের মত। অমন করিয়া আর বেশিক্ষণ সেখানে তাহার বসিয়া থাকা চলিল না। ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিনকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, কণ্ঠে তাহার আর আওয়াজ বাহির হয় না। শেষে অতি কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া ডাকিল, 'আমিন!'

সহসা সুমুখের অন্ধকারে ঝট্‌পট্ করিয়া কিসের যেন একটা শব্দ হইল। আমিন তাহার পাশ দিয়াই অন্ধকারে ছুটিয়া পালাইতেছিল, নেপাল হাত বাড়াইয়া তাহার পরণের কাপড়খানা চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল। দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, 'এদিকে আয়!'

মুখে আর কিছু সে বলিতে পারিল না। পা দিয়া এক লাথি মারিয়া মাটিতে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, পাশেই লাউএর মাচা হইতে একটা বাঁশ টানিয়া আনিয়া তাই দিয়া সজোরে সে তাহার দেহের উপর প্রহার করিতে লাগিল। দু'তিন ঘা মারিবার পর অস্ফুট চীৎকার করিয়া প্রাণের ভয়ে আমিন সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। নেপালও তাহার পিছু পিছু ছুটিতেছিল, কিন্তু ঘরের দরজায় প্রকাণ্ড যে একখানা পাথর আছে সেকথা তাহার মনেই ছিল না, হঠাৎ সেই পাথরে হোঁচট্ লাগিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেই সে আর অগ্রসর হইল না। সেইখান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিল, 'থাক্ তবে তুই ওকে নিয়েই থাক্ আমিন, আমি চললাম।'

চীৎকার শুনিয়া লক্ষণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হ'লো নেপাল?'

নেপাল তখন উঠান পার হইয়া বাহিরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাষ্পরুদ্ধ বিকৃত কণ্ঠে সে সেইখান হইতেই জবাব দিল, 'আমি চললাম।'

বুড়া ভাবিল, এমন তাহাদের নিত্যই হয়, এমন সে যায় আবার ফিরিয়া আসে, সুতরাং ইহার জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কিছু নাই। বুড়া তাই আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই নিজের জায়গাটিতে গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে দেখা গেল, সুরেনের দেওয়া সবুজ রঙের সেই কামিজটি আর গামছাটি যাইবার সময় নেপাল তাহাদের দরজায় নিমগাছের ছোট একটি ডালে সযত্নে টাঙাইয়া দিয়া গিয়াছে।

সেবার দু'দিন পরেই নেপাল ফিরিয়াছিল কিন্তু এবার আর ফিরিল না।

ফিরবে না আমিন তাহা জানে।

এই লইয়া সুরেনের সঙ্গে তাহার কথা হইয়াছে।

সুরেন বলে, 'বিয়ের কথাটা এবার বলি তাহ'লে তোমার বাবাকে?'

আমিন বলে, 'না, থাক্।'

'সে ফিরে আসবে এখনও কি তোমার তাই বিশ্বাস?'

বিষণ্ণমুখে আমিন শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায় যে, না, সে বিশ্বাস তাহার আর নাই।

'তবে?'

আমিন আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে।

এম্‌নি করিয়াই দিন যায়।

গরুর মড়ক্ এবার থামিয়াছে। সুরেন তবু কলিকাতায় ফিরিয়া যায় নাই। তাহার ইচ্ছা, বিবাহ সে তাহাকে করিবেই এবং আমিনকে সঙ্গে লইয়াই সে কলিকাতায় ফিরিবে।

কথাটা কে যে উত্থাপন করিল কে জানে, পাড়ায় পাড়ায় এই লইয়া কানাকানি হইতে লাগিল যে, আমিনকে নেপাল ছাড়িয়া দিয়াছে এবং এইবার সুরেনের সঙ্গেই বোধ হয় আমিনের বিবাহ হইবে।

বুড়া লক্ষণকে আর কষ্ট করিয়া বলিতে হইল না, কথাটা সেদিন সে কাহার মুখে শুনিয়া আসিয়াই আমিনকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'জামাই কি আর আসবে না মা?'

আমিন মাথা হেঁট করিয়া পায়ের আঙুল দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, 'জানি না।'

বুড়া বলিল, 'লোকে যে বলছে···হ্যাঁ, মা, ওই সুরেনের সঙ্গে···'

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কথাটা সে যে কেমন করিয়া কন্যাকে তাহার গুছাইয়া বলিবে বুঝিতে পারিল না; একটা ঢোঁক গিলিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বাপ যে কি বলিতে চায় আমিন বুঝিল সবই, কিন্তু প্রশ্নটা ভাল করিয়া না শুনিয়াই জবাব সে দিবে কেমন করিয়া! তাই লজ্জায় চুপ করিয়া থাকা ছাড়া তাহার আর উপায় ছিল না।

লক্ষণ বলিল, 'শুনছি নাকি সুরেন তোকে বিয়ে করতে চায়, এ কি সত্যি?'

আমিন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ।'

সুরেন তাহার কন্যাকে দয়া করিয়া বিবাহ করিবে ইহা তাহার আশাতীত সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু নেপাল যতক্ষণ পর্য্যন্ত দশজন লোকের সাক্ষাতে আমিনকে পরিত্যাগ না করে এবং বিবাহের সময় আমিনের হাঁতে যে লোহাগাছটি সে নিজের হাতে পরাইয়া দিয়াছে সেটি সে আবার খুলিয়া না লয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমিনের দ্বিতীয়বার বিবাহ চলে না।

সুতরাং—

বুড়া বলিল, 'কাল তাহ'লে আমি একবার যাই নেপালের কাছে।'

আমিন কিছু না বলিয়াই সেখান হইতে ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

সকলেই ভাবিয়াছিল, লক্ষণ যখন নিজে গিয়াছে, নেপাল তখন নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়া আমিনের হাতের লোহাগাছটি খুলিয়া দিয়া যাইবে, কিন্তু মুখখানি শুকনো করিয়া সারাদিনের পর সূর্য্যাস্তের সময় বুড়া একা ফিরিয়া আসিল। নেপাল আসে নাই।

লক্ষণ বলিল, 'নাঃ, সে নিজেও আসবে না, লোহাও খুলবে না।'

সুরেন রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'জানি আমি—হারামজাদাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল পাজির একশেষ। না এসে মনে করেছে জব্দ করব।' বলিয়া সে তাচ্ছিল্যভরে ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'নাই বা এলো। ভারি ত! লোহা নাই-বা খুললে। দেখুন, আজকাল ও-সব আমরা মানি না।'

লক্ষণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না বাবা, সমাজে বাস করে' থাকলে মানতেই হবে। নইলে নালিশ চলবে যে!'

'চলুক্ না নালিশ! আমার সঙ্গে নালিশ-মোকদ্দমা করে' ও পারবে ভেবেছেন? আর ধরুন্—হ্যাঁ, এই সেদিন, ঠিক এম্‌নি একটা ঘটনা ঘটেছিল আমার মনে আছে। সেও ঠিক এম্‌নি এই নোয়া খোলাখুলি নিয়েই ব্যাপার··· কি হ'লো কি? শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হলো না।'

এই বলিয়া মিছামিছি তৈরি করিয়াই একটা গল্প সে লক্ষণকে শুনাইয়া দিল।

লক্ষণ বলিল, 'তা বটে বাবা, তোমরা আজকালকার ছেলে, কিন্তু আমাদের রাঘব মুচির বংশ···আমার বাবার আমলে আমাদের কি আর এই দশা ছিল সুরেন? আমি নিজে দেখেছি, এই গাঁয়ে বামুন-সজ্জনের কোনও কাজকর্ম্মে ষোল-আনার মজলিসে আমার বাবার হ'তো ডাক্। আমি তখন ছেলেমানুষ। বাবার হাত ধরে' ধরে' আমিও যেতাম। বাবার সে কী খাতির! সবাই বলতো, এসো রাঘব, এসো! বোসো ওইখানে। বাবার মাথায় ছিল ইয়া লম্বা লম্বা বাব্‌রি-কাটা চুল, টাঙ্গির মতন গোঁফ্, লম্বা চওড়া যেমন জোয়ান, তেম্‌নি সুন্দর! মুচি ব'লে চেনবার জো ছিল না কারও।'

লক্ষণ একটুখানি থামিয়া চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'নাঃ! আমি যদি এ কাণ্ড করি ত' সেই রাঘব মুচির নাম ডুবে যাবে বাবা, তা আমি পারব না। তবে দেখি, যদি নেপালকে আবার বুঝিয়ে-সুজিয়ে···'

ইহার উপর আর কথা চলে না।

আমিনের হাতের নোয়া নেপালকে দিয়া দশজনের সাক্ষাতে খোলাইতেই হইবে, তাহা না হইলে সুরেনের আর আশা নাই!

পাড়ার দু'চারজন লোককে রাজি করিয়া সুরেন নেপালের কাছে পাঠাইল। তাহারা গিয়া নেপালকে প্রথমে অনেক করিয়া অনুরোধ করিল, বলিল, 'দিয়ে আয় নেপাল, আমিনের নোয়াটা ভাল চাস্ ত' খুলে দিয়ে আয়। তারপর ও-ও বিয়ে করুক্, তুইও বিয়ে কর্। যার সঙ্গে হ'লো না, তাকে নিয়ে আর কেন মিছেমিছি বেকুবের মত টানাটানি করিস্ বল্ ত?'

কিন্তু নেপালের সেই এক কথা!

জবাব দিতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার ছল্ ছল্ করিয়া আসে, ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না, তা আমি পারব না।'

লোকগুলা শেষে বেশি-কিছু বলিতে গেলে নেপাল হয়ত বা চুপ করিয়া থাকে, কিম্বা শেষে রাগ করিয়া উঠিয়া পালায়।

মাসাবধি কাল এখানে থাকিয়া সুরেন সেদিন কলিকাতায় গেছে। যাইবার সময় আমিনকে সে খানকতক্ ঠিকানা-লেখা খাম আর চিঠির কাগজ দিয়া বলিয়াছে, 'বাবা যদি তোমার ওই হাত-কাটাকে রাজি করতে পারে ত' তৎক্ষণাৎ আমায় জানিও। আমি ঠিক হয়েই থাকব।'

আমিন ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছে, 'বেশ। কিন্তু তুমি আবার এসো।'

নেপাল রাজি না হইলে সে আর কি জন্য আসিবে—কথাটা সে বলিতে গিয়াও বলিল না। বলিল, 'হাঁ, আসব। —কিন্তু চিঠি তুমি লেখাবে কাকে দিয়ে? পাড়ায় তোমাদের লিখতে-টিখ্তে কেউ জানে?'

জবাব দিতে গিয়া আমিন বড় বিপদে পড়িল। পাড়ায় তাহাদের কে যে লিখিতে পড়িতে জানে তাহা সে জানে না। খানিক ভাবিয়া বলিল, 'ভোলা ত' আমাদের পাঠশালে দিনকতক পড়েছিল—বোধ হয় জানে।'

সুরেন বলিল, 'বেশ, তবে ওকে দিয়েই লিখিয়ো।'

আমিন বলিল, 'না, তা আমি পারব না। ভোলাকে দিয়ে···? উহুঁ—ছি!' বলিয়া সে জিব কাটিয়া ঘাড় নাড়িল।

'বা-রে! তোমার খবর না পেলে ত' আমার চলবে না!'

আমিন বলিল, 'আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক্, লেখাবার লোক আছে।'

'কে?'

'বামুনদের কালো-ঠাকুরের বৌ। আমাকে খুব ভালবাসে।'

'তোমায় কে না ভালো বাসে বল!'

এই বলিয়া হাসিয়া সুরেন তাহার কাছ হইতে বিদায় লইয়াছে।

সে হাসি আমিন এখনও ভুলে নাই।

কিন্তু আর-একজন? সে ত' হাসিয়া বিদায় লয় নাই! যাইবার সময় সে তাহাকে কাঁদাইয়া নিজেও কাঁদিয়াছে। কাঁদিয়া বলিয়া গেছে—'থাক্ তবে তুই ওকে নিয়েই থাক্ আমিন, আমি চললাম।'

তীক্ষ্ণধার তীরের মত সেকথা এখনও তাহার কানে আসিয়া বাজে।

নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে সেই যে সে অদৃশ্য হইয়া গেছে তাহারপর ভুলিয়াও সে আর এদিক পানে ফিরিয়া তাকায় নাই। তাহারই নিদারুণ বঞ্চনায় বুক তাহার নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া গেছে। তাহার মত পাষাণীর দিকে সে আর তাকাইবেই বা কেমন করিয়া! তাই এখনও মাঝে-মাঝে আমিনের মনে হয় যেন তাহার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ এ-বাড়ীর আনাচে-কানাচে প্রতিনিয়তই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মনে হয় যেন তাহারই তীব্র অভিশাপে এ-বাড়ীর প্রত্যেকটি বস্তু একদিন না একদিন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে।

তাহার সেই সবুজরঙের জামা এবং লালরঙের গামছাটি আমিন সযত্নে এখনও তুলিয়া রাখিয়াছে। সেদিকে তাকাইলে এখনও তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া ওঠে,

প্রতিদিনের অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত তাহার মনে পড়িয়া যায়। নিতান্ত অসহায় দুর্ব্বল সে,—তাহারই একটুখানি ভালবাসার কাঙাল! ছি, ছি, এত অপমান বেচারাকে হয়ত সে না করিলেও পারিত!

এক-এক সময় মনে হয়—চুলোয় যাক্ তাহার কলিকাতার সুরেন, এখনও একবার নেপাল যদি আসে ত' আমিন তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না।

তিন মাস পার হইতে না হইতেই আমিনের রূপ যেন একেবারে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। একে ত' রূপবতী সে চিরদিনের, তাহার উপর পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করিতে লাগিল—তাহার ছেলে হইবে।

আমিনের লজ্জার আর অবধি রহিল না। বাপের কাছ হইতে সে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাপ ত' শুনিয়া অবধি রাগিয়া আগুন!

মেয়েকে যা-খুসী তাই বলিয়া মাথা ঠুকিয়া রক্তপাত করিয়া বুড়া আবার একদিন নেপালের সন্ধান করিতে গেল। এবার সে তাহাকে যেমন করিয়াই হোক্ তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়াও বুঝাইবে। না বুঝাইলে তাহার আর উপায় নাই—বুড়ার মান সম্ভ্রম ত' যাইবেই, এমন-কি মেয়ের দায়ে হয়ত তাহাকে এই বুড়া বয়েসে এ গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও পালাইতে হইবে।

কিন্তু হায়, এমনি দুর্ভাগ্য, গিয়া শুনিল, নেপাল ত' এক-রকম পাগলের মতই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পর আজ দিন-দশ হইল—কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহার কোনও সন্ধান জানে না।

হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া বুড়া তাহার মেয়েকে সেদিন আর তিরস্কারের কিছু বাকি রাখিল না। রাগের মাথায় সুরেনের উদ্দেশ্যেও বেশ দু'চার কথা শুনাইয়া দিল। শেষে আমিনকে ডাকিয়া বলিল, 'শোন্!'

আমিন ভয়ে ভয়ে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া বলিল, 'তবে তাই সুরেনকেই খবর দে। সে আসুক, এসে' বিয়ে ক'রে তোকে নিয়ে যাক্ এখান থেকে। তারপর নেপাল যা করে করবে।'

আমিনের মনে হইতে লাগিল, ধরণী দ্বিধা হোক্, কিম্বা যে-কোনও রকমে সে যদি আজ আত্মহত্যাও করিতে পারে ত' বড় ভাল হয়।

ভাবী সন্তানের জননীর পক্ষে আর যাই হোক্, আত্মহত্যা করা কঠিন। আমিনও তাহা করিতে পারে নাই।

সুরেনকে চিঠি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু চিঠির জবাব এখনও আসে নাই। কাজের মানুষ, হয়ত' সে তাহার চামড়ার কাজে দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

একমাস একমাস করিয়া ন'মাস পার হইয়া গেছে।

আমিন আসন্ন-প্রসবা।

যাক্, ভগবান বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এতদিন পরে নেপাল ফিরিয়া আসিয়াছে। এতদিন ধরিয়া কোথায় কোন্ পথে প্রান্তরে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল কে জানে। ফিরিয়া আসিয়াছে একেবারে অন্য মানুষ হইয়া। নিতান্ত কঙ্কালসার উপবাসক্লিষ্ট দেহ,—সে-নেপাল বলিয়া সহজে আর চিনিবার উপায় নাই।

নেপাল বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। তাহার উপর আসিয়াই শুনিল—আমিনের ছেলে হইবে।

কথাটা শুনিবামাত্র মনে তাহার কি যে হইল কে জানে, স্থির মৌনদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সুমুখের একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের পানে একাগ্রভাবে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দাদা, আমি চললাম।'

দাদা জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় রে? আজ আর এই সন্ধ্যেবেলায় কেন, কাল যাবি।'

রাত্রিটা বোধকরি পূর্ণিমার রাত্রি। বনপ্রান্ত আলোকিত করিয়া চাঁদ উঠিয়াছে। নেপাল বলিল, 'তা হোক্।'

বলিয়া সে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

দাদা তাহাকে সাবধান করিয়া দিল।—'দেখিস, রাগের চোটে মারামারি কিছু করিসনে যেন।'

নেপাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না দাদা, আমি শুধু ওর হাতের নোয়াটা খুলে দিয়ে আসব।'

বলিতে গিয়া গলার আওয়াজটা তাহার কাঁপিয়া উঠিল।

দাদা বলিল, 'হ্যাঁ সেই ভালো। তাহ'লে আবার তোর বিয়ে দিই।'

'বিয়ে?' বলিয়া নেপাল তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিল। চোখ দুইটা অনেকক্ষণ হইতেই জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, জ্যোৎস্নার আলোয় দাদা পাছে তাহা টের পায় বলিয়া সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না।

বটগাছের তলায় কয়েকজন লোক জড়ো হইয়াছিল।

'ওই যে, এদিকে কে একজন আসছে না? ওকেও নেওয়া যাক্ সঙ্গে।'

লোকটা কাছে আসিতেই কে একজন বলিয়া উঠিল, 'ওই! নেপাল যে রে?'

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এসময় তাহার আগমন কেহই প্রত্যাশা করে নাই। সকলেই অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

নেপালকে দেখিবামাত্র বুড়া লক্ষণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। 'এ সময় আর কেন এলে বাবা?'

অবাক্ হইয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নেপাল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতেছিল। ভোলা মুচি তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া ঘণ্টাখানেক আগে আমিন মরিয়া গেছে।

কে একজন বলিল, 'দেখাশোনা করবার লোক থাকলে মেয়েটা হয়ত এমন করে' মরতো না। লজ্জায় ও কাউকে কিছু বলেনি।'

শ্মশানে গিয়া দেখা গেল, আমিনের কাপড়ের খুঁটে কি যেন একটা কাগজের মত বাধা রহিয়াছে। নোট ভাবিয়া খুলিয়া দেখিল, একখানা চিঠি। কিন্তু পড়িতে তাহারা কেহই জানে না।

দূরের ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিবার জন্য লণ্ঠন হাতে লইয়া দু'জন লোক সেই পথে পার হইতেছিল। তাহাদেরই মধ্যে একজন দয়া করিয়া চিঠিখানা পড়িয়া দিল।

ধীরেন বলিয়া কে একজন লোক আমিন মুচিনীকে চিঠিখানি লিখিয়াছে কলিকাতা হইতে।

লিখিয়াছে—

'কেন বার-বার চিঠি দিয়া দাদাকে তুমি বিরক্ত করিতেছ জানি না। তোমাদের ও বুজরুকি রাখিয়া দাও। দাদার বিবাহ অনেকদিন আগেই হইয়া গেছে।'

'থাক্ আর পড়তে হবে না। দাও।' বলিয়া চিঠিখানি লক্ষণ চাহিয়া লইল।

ভোলা জিজ্ঞাসা করিল 'ধীরেনটি কে হে?'

লক্ষণ জবাব দিল না।

রুহিত বলিল, 'সেই যে কলকাতার সেই সুরেনের ভাই-টাই হবে।'

কিন্তু নেপালের কানে তাহাদের কোনও কথাই গিয়া পৌঁছিল না। অনতিদূরে জলন্ত চিতার উপর আমিনের মৃতদেহ তখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুষ্কপ্রায় ছোট্ট নদীটির বালুচরে বসিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নিশিখার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে তখন তাহার কলঙ্কিনী আমিনকে বোধ করি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইতেছিল।

বাঁচিয়া থাকিলে মেয়েটা বোধ করি লজ্জায় এতক্ষণ ঠিক ওই আগুনের মতই রাঙা হইয়া উঠিত।

সুতরাং মরিয়া সে কিছু মন্দ করে নাই।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র বর্ষ-পঞ্জী

বিচিত্রা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

বৈশাখের বিচিত্রায় আমার "রবীন্দ্র বর্ষ-পঞ্জী" সমালোচনার দু তিনটি ভুল দেখিয়ে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে একখানি চিঠি লিখেছেন। এই ভুলগুলি এখনি সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১) বিচিত্রা ১৩৩৯ বৈশাখ, ৪৪২ পৃষ্ঠা। নীলমণির দুই পুত্র নয়, তিন পুত্র :—রামলোচন, রামমণি, রামবল্লভ। রামবল্লভের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ঠিক জানা নেই। খগেন্দ্র বাবুর মতে আনুমানিক জন্ম-বৎসর ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ, আর মৃত্যুর বৎসর আনুমানিক ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ। এই রামবল্লভের কন্যা বিনোদিনী দেবী মহর্ষির আত্ম-জীবনীর ১২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মহর্ষির চারি পিসির একজন। দ্বারকানাথ যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন তখন বিনোদিনী দেবীর পুত্র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এবং বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যুর সময়েও কাছে উপস্থিত ছিলেন।

(২) বিচিত্রা ঐ পৃষ্ঠাতেই রমানাথের মাতৃদেবীর নাম 'দুর্গামণি' হবে, 'গঙ্গাদেবী' নয়।

(৩) ৪৪২ পৃষ্ঠায় দক্ষিণের কলমে 'খগেন্দ্র বাবু বলেন' ইত্যাদি কথায় একটু 'গোল হয়েছে। খগেন্দ্র বাবু লিখেছেন :—"আমি দ্রবময়ী দেবীকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমি দ্রবময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কালিদাসী দেবীর নিকট (মহর্ষির প্রথমা কন্যা-সন্তানের কথা) শুনেছিলাম।' তিনি মহর্ষির ৭।৮ বছরের ছোট। কালিদাসী দেবীর বিবাহের পরে মহর্ষির এই প্রথমা কন্যার জন্ম।"

এ ছাড়া প্রভাত বাবুর দেওয়া বংশ-লতিকায় যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের বংশধারা সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুতর ভুল খগেন্দ্রবাবু দেখিয়েছেন। আমার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত ব'লে এ সম্বন্ধে এখানে কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্ম-তিথি সম্বন্ধে খগেন্দ্রবাবু যে আলোচনা করেছেন তা সকলেরই জানা উচিত। প্রভাত-বাবুর মতে ১২৬৮ (১৮৬১-৬২) ২৫এ বৈশাখ, দ্বাদশী, কৃষ্ণপক্ষ, সোমবার, ইংরাজি ৬ মে, ১৮৬১, তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

খগেন্দ্রবাবু লিখেছেন :—"বঙ্গবাসী প্রকাশিত পুরাতন পঞ্জিকায় দেখা যায় যে ১২৬৮ সালের ২৫এ বৈশাখ তারিখে দ্বাদশী ছিল ৪৩ দণ্ড ১৭ পল। যতদূর জানি কবিবরের জন্ম রাত্রি ২॥৹।৩টা। অর্থাৎ ৫৩ দণ্ডে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১০ দণ্ড (৪ঘণ্টা) পূর্ব্বে দ্বাদশী উত্তীর্ণ হইয়া ত্রয়োদশী আরম্ভ হয়। তিথির সহিত রাশি, নক্ষত্র দেওয়া ভাল। কবিবরের জন্মরাশি, মীন। জন্ম নক্ষত্র, রেবতী।"

খগেন্দ্রবাবু যা লিখেছেন তাতে ইংরাজি তারিখও বদলিয়ে যাচ্ছে। ২৫ বৈশাখ রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ইংরাজি তারিখ ৬ই মে। কিন্তু রাত্রি ২॥৹।৹টার সময়ে ইংরাজি হিসাবে হয় ৭ই মে। বাংলা হিসাবে সোমবার, ইংরাজি হিসাবে মঙ্গলবার। তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই :—

শকাব্দা ১৭৮৩, বাংলা ১২৬৮ সাল, ২৫ বৈশাখ, সোমবার, কৃষ্ণত্রয়োদশী, মীনরাশি, রেবতী নক্ষত্র, আর ইংরাজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ, ৭ মে, মঙ্গলবার, রাত্রি ২॥৹।৩ টার সময়ে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

বিনীত

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

কামনা

শ্রীযুক্ত তারাপদ রাহা এম-এ

আমার এ ডায়রীর পাতায় পাতায় নিত্য নূতন কথা। এ কার হাতে পড়বে জানি না—কিন্তু এ জানি একবার পড়া ধরলে শেষ না করে কেউ উঠতে পারবে না—পাপের টান এমনি।

কালকার ঘটনা আমার সারা মনটাকে যেন একবার বেশ করে নাড়া দিয়ে গেছে। খুব যে খুশী হয়েচি এ কথা বল্‌লে ঠিক হবে না, কিন্তু এ পথে এসে মাঝে মাঝে যে একটা গ্লানি বোধ করতাম, তা' বোধ হয় আর করতে হবে না। মস্ত বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে কা'ল রাত্রে।

পুরাণো অভ্যাস একেবারে ছাড়তে পারি নি, তাই ব্যবসার ক্ষতি করেও কাল একটু মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইডেন্ গার্ডেন বেড়িয়ে যখন আউট্রাম ঘাটে পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শীতের রাত, তাই বেশী লোক আর ছিল না, একখানা বেঞ্চ খালি পেয়ে তাতে বসে পড়লাম। মনে হচ্ছিল দু'বছর আগে এই ঘাটে এ বেঞ্চে বসে অমিয় কত ভালবাসার কথাই বলেছিল। পুরুষের ফাঁদে পড়ে কত সুখের স্বর্গই গড়ে তুলেছিলাম। ভাবতে ভাবতে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। কতক্ষণ এ ভাবে ছিলাম জানি না, হঠাৎ বেঞ্চখানা একটু কেঁপে উঠতে দেখি—আমার বেঞ্চের পাশে এক বৃদ্ধ এসে বস্‌লো। যে আলো ছিল তাতে ঠিক বোঝা যায় না তার বয়স কত—তবে ষাট ছাড়িয়েছে এটা ঠিক। যারা তরুণ তারা দুটী চোখ দিয়ে নারীর সারা দেহটা পারলে গিলে খায় এ ত নিত্যই দেখি, কিন্তু এই ষাট বছরের বুড়ো—যে পারের খেয়ায় এক পা দিয়ে বসে আছে তার চোখে ঐ ক্ষুধা দেখে আমি সত্যিই আঁৎকে উঠেছিলাম। লোকটীর জীবনের সীমা শেষ হয়ে এলেও সখের শেষ ছিল না। পাকা শাদা লম্বা চুলগুলি যত্নে ব্রাশ করা, চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধা চস্‌মা, হাতে সোনার রিষ্টওয়াচ, পরণে কাগজের মত থাপি ফিন্‌ফিনে সাদা থান,—শাদা ভায়লার পাঞ্জাবীর উপর একটা রামপুরী চাদর। চেহারায় ত দিব্য সৌম্য সেজেছে, কিন্তু ঐ চোখ দুটো। এই যে আমি, আমারও বড় ঘেন্না হ'ল—উঠে পড়লাম।

ট্রামে উঠে কিন্তু আমার কেমন দুঃখ হচ্ছিল ঐ বুড়োর জন্য। ছেলে বেলায় ঠিক এমনি দুঃখ হ'ত গাছের শুক্‌নো পাতা দেখে,—তাদের কাজ শেষ হয়েচে দু'দিন পরেই তারা ঝরে পড়বে আর তাদের জায়গায় দেখা যাবে কতকগুলি নোতুন কচি মুখ—দু'দিন বাদে পেকে বুড়ো হ'তে।

বাসায় এসে যখন পৌছিলাম, তখন ৯টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে কেবল বাইরে এসে দাঁড়িয়েচি,—সামনে দেখি সেই বুড়ো। পাশ থেকে ললিতা হেসে বল্‌লে—"ওলো, তোর নাগর এসেছে ঘরে নিয়ে যা, বিমলী বলে উঠ্‌লো—"হেঁ, হেঁ যা—মজবে ভালো।" বৃদ্ধ গ্রাহ্য করলো না, এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—'দক্ষিণে ?'

পাশের গ্যাস লাইটের আলোতে বুড়োর হাতের হীরের আংটীর দিকে নজর পড়লো,—বললাম দশ টাকা।

বুড়ো আর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্‌লে—'আজ রাতটুকুর জন্য যদি তোমার ঘরে আশ্রয় নেই তবে কত দিতে হবে তোমায় ?'

বল্লাম '৫০৲ টাকা দেবেন।'

বুড়ো ক্রমে আমার সঙ্গে এগিয়ে এল, সঙ্গে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার খাওয়া হয়েচে ?"

হাসি এল—বল্লুম, "কই আর হ'ল, এই ত আসছি ১০।১৫ মিনিট আগে, আপনি ত জানেনই।"

বৃদ্ধ বড় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্‌লে—"আচ্ছা, আচ্ছা তবে একটু সবুর করো,—আমি আসছি।"

ফিরে তার দিকে চেয়ে বল্‌লাম—'কেন ?'

ও আমার চোখে কি দেখলে জানি না, একবার ভ্রূ কুঁচকে বল্‌লে—'ও !', তার পর একখানা দশটাকার নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বল্‌লে—'এইখানা ধরো, আমি এক্ষুণি আসছি।'

মিনিট বিশেক পরে বুড়ো ফিরে এল, হাতে এক চুপড়ী খাবার। বল্লুম—"এ সব কি ?"

বুড়ো একটু মুচকি হেসে বল্‌লে—"আজকার রাতের মত ত তোমায় কিনে নিয়েচি, যা বলি লক্ষীটির মত তাই করো দেখি,—এইগুলি খেয়ে ফেল।"

বুড়ো বেশ ত !

পাশের চেয়ারটায় ওকে বসতে বল্লাম। বুড়ো চেয়ারে বসে আমার দিকে যে চোখে চেয়ে রইল—তা'তে মনে হচ্ছিল ওর অন্তরের তৃষ্ণা যেন দুটো মণির ভিতর দিয়ে এসে আমাকে পান করতে চাইছিল। বল্লুম "—কি দেখছেন অমনি করে ?"

কিছু কথা বল্‌লে না, ঠিক তেমনি করে চেয়ে রইলো। বেশী নেই দেওয়া ঠিক নয়, বল্লুম—"আপনার যখন তাড়া নেই, তখন আপনি বসুন, খাওয়াটা সেরে আসি।"

"তা' বেশ, বেশ, আমিও এক্ষণি একটু ঘুরে আসছি।" বলে আর একখানা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বের করে—আমার হাতে ধরলে। আমার আগেকার সেই 'ও' মনে পড়্‌লো, তাই লজ্জিত হয়ে বল্‌লাম—"ওর আর দরকার হবে না, আপনি চট্ করে ঘুরে আসুন।"

বুড়োটা দেখচি বেড়ে লোক, আর এমন অদ্ভুতও কখনো দেখি নি, ওর পর ক্রমেই মায়া পড়ে যাচ্ছিল, আহা বেচারা !

আমি খাওয়া সেরে বিছানায় আর একটা নূতন সুজনী পেতে নিচ্ছি—এমন সময় বুড়ো দেখি একরাশ গোলাপ আর চমৎকার একটি মালা এনে হাজির। ওগুলি পাশের টিপয়ে রেখে চেয়ারে বসে একটু দম নিয়ে বল্‌লে—"মার্কেটে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে, তাই এই কাছ থেকে কিনে আনলাম,—এগুলি তোমার যোগ্য হবে না।"

বড্ড হাসি পেল—আচ্ছা পাগল ত !

"কি হবে এ দিয়ে ?"

বুড়োর মুখখানা দেখি কথাটা শুনে বড় ম্লান হয়ে গেল। একটু কষ্ট হ'ল,—বেচারা টাকার মত টাকা দেবে, কাজ কি আমার তার খেয়ালে বাঁধা দিয়ে ? বল্লুম—"আপনি কি বলছেন ? এ তো চমৎকার হয়েচে ?"

"আ ! চমৎকার হয়েচে ! বলো কি অ্যা—" বল্‌তে বলতে এগিয়ে এসে বুড়ো মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিলে। আবার বলে—"রাগ করবে না ত ?—বলবো একটি কথা ?"

হেসে বল্লুম—"বলুন না—রাগ করবো কেন ?"

বুড়ো চসমা জোড়া একবার চোখ থেকে নামিয়ে বেশ ভালো করে মুছে আবার চোখে দিয়ে বল্‌লে—

"আমি বল্‌ছি কি—মানে,—আজ রাত্রের মত তুমি আমার ত ?"

"সে আবার জিজ্ঞেস্ করছেন কেন ? সে ত আগেই ঠিক করে নিয়েছেন।"

"না, তুমি বুঝলে না, মানে,—আমার কোন ইচ্ছায় বাধা দেবে না ত ?"

"সঙ্গত ইচ্ছা হ'লে আর বাধা দেব কেন ?—তা' বলে এখন যদি আপনার আমায় খুন করতে ইচ্ছে হয়—তাতে বাধা দেব বই কি ?"

"তোমার গায়ে ব্যথা দেব আমি ?"—বলে ছুটে এসে বুড়ো আমার পা দু'খ'না টেনে নিয়ে প্রথমে বুকে তারপর ক্ষৌর-মসৃণ গালে বার বার চেপে ধরতে লাগলে—আর চুমো।

আমার সারা গাটা একবার ঝাকুনী দিয়ে উঠ্‌লো,—ওই ঠাকুরদার বয়সী বুড়ো—আমার পা দু'খানা—ছিঃ !

বুড়োকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম,—বুড়ো তখনও আমার বাঁ পায়ের তলায় মুখখানা রেখে চোখ বুজে পড়ে আছে,—কিছু বলা আর হ'ল না। বড় কৌতুহল হ'ল। মিনিট পাচেক পরে বুড়ো চোখ মেল্‌লে জিজ্ঞাসা করলাম—"সংসারে আপনার কে আছে ?"

"আছে টাকা"

"সে ত বুঝতেই পারছি,—তা ছাড়া ?"

"আর তৃষ্ণা।"

"ছেলে মেয়ে কটি ?"

"কিচ্ছু না।"

"বউ ?"

"আরে রাম !"

হেসে বল্লাম—"তাই বুঝি এমনি করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান ?"

বুড়ো তাড়াতাড়ি আমার দুটো হাত ধরে বল্লে—"কখ্খনো না, এই তুমি প্রথম। আর হয়ত এই জীবনের মত শেষ।" বলে—একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে। বুঝলাম বয়সকালে আমারই মত হয়ত কোন দাগা পেয়েছিল।

আমার ঘরের জাপানী ক্লকটায় ঢং ঢং করে পাচটা বেজে গেল। বুড়োর জীবনের কথা শুনতে শুনতে আমার এ কলুষ প্রাণও যেন কেমন উদাস হয়ে উঠেছিল। সারা ঘরময় আকাশময় যেন কোটী কোটী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে—শুধু পিপাসা, অতৃপ্ত বাসনা। এই পিপাসা মেটাতে গিয়ে কেউ বা নিজের বুকে ছুরি বসিয়েছে, কেউ বা পরকে মেরে হাত রাঙা করেছে, কত সংসার পুড়েছে, কত রাজ্য ছারখার গিয়েছে।

বুড়োকে বল্লাম—"আর না, এইবার একটু ঘুমোন্"

বুড়ো খুব জোরে আমাকে আর একবার চেপে ধরে পাগলের মত বলে উঠ্লো—

"না, না, না—আমি চাই আজ রাত্রি শেষের সঙ্গে সঙ্গে আমারও যেন শেষ হয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে কত সুন্দর ফুল ফুটবে, কত জোছনা রাত্রিতে পাপিয়া ডেকে যাবে,—কত তরুণ-তরুণী প্রেমের গান গাইবে, শুধু আমি চলে যাব গাছের শুক্‌নো পাতার মত,—আর তাদেরই মত মাটীতে মিশিয়ে রইব চিরদিনের মত। তখন আমারই বুকের পরে হয়ত গোলাপ ফুটে উঠবে, কত পাখী গেয়ে যাবে; কত যুবতী তার কোমল পা ফেলে যাবে। শুধু—শুধু আমারই চলে যেতে হবে—আহ্বান এসেছে।····তা' মনে হয় কি জানো ?—" বুড়ো দু'হাতে আমার মুখখানা ধরে চোখের দিকে চেয়ে বল্লে "—মনে হয় কি জানো -? যাবার আগে এক চুমুক—শুধু এক চুমুকে সব শেষ করে দি।"

তার সেই তৃষ্ণাতুর চোখ দুটী যেন এখনও আমার চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল করছে।

(১৩৩২ সালের ২৫শে ফাল্গুন তারিখে কলিকাতার কোন বিখ্যাত গণিকা মদের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া আত্মহত্যা করে। তাহার তোরঙ্গাদি অনুসন্ধান করিয়া অন্যান্য বহু কাগজ পত্রের মধ্যে একখানা ডায়েরী পাওয়া যায়। ইহা তাহারই কয়েকটি পৃষ্ঠা)। •

শ্রীতারাপদ রাহা

কবির দেশে বিশ্বকবি

সুদূর ইরাণে উদাস পথিকের ঘরছাড়া বাঁশী বেজে উঠেছে—ভারতের দুয়ারে এসে পৌছেছে তার আহ্বান-লিপি—কবিকে চাই। বিশ্ব প্রকৃতির সভায় যিনি শাহান শাহের আসন লাভ করেছেন—আজ পারস্যের শাহানশা তাঁকে আহ্বান করেছেন নিজের সভায়। শুধু তিনি নন, অনেক অশরীরী অমর আত্মাও তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছে। হাফিজ, ওমর, সাদী রুমী সবাই দাঁড়িয়ে আছে—

ভাষার অতীত তীরে

কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরেফিরে।

কবি পারস্য যাত্রা ক'রেছেন। কবি-ভূমি ব'লে পারস্য পৃথিবীর ইতিহাসে চির-প্রসিদ্ধ। কবির পিতৃদেব হাফিজের অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তিনি হাফিজের অনেক কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তিও করতে পারতেন। পিতার দেখাদেখি কবিও এক সময়ে হাফিজের ভক্ত হ'য়ে পড়েন। আর সেই জন্য ছেলে বেলায় তাঁর এক নামই দেওয়া হ'য়েছিল—বুলবুল। তাই এতদিনে বুঝি ভারতের বুলবুল হাফিজের দেশে চলেছেন—শূন্য কুঞ্জে ফুল ফোটাতে।

কিন্তু—'সেদিন গিয়াছে ;

শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি।'

সে কুঞ্জবন হয়ত আজও আছে। নার্গিশ-ছেনা-বসরাই গোলাপ আজও সেখানে ফোটে। এখনও বুলবুল গান শুনায়। গোলাপের কলি ফুটে ওঠে। দুলে দুলে গন্ধে বাতাস ছেয়ে হাসে। সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য সেখানে পাতার ফাঁকে ফাঁকে উকি দিয়ে বিশ্বজগৎকে হাত ছানি দেয়। স্নিগ্ধ শীতল নদী শ্যামল সীমা রেখায় ছোঁওয়া বুলিয়ে—দুকুলের পানে তাকাতে তাকাতে অকূলের পথে চলে যায়। সবই রয়েছে—তারা নেই। সেই 'পান পিপাসু' প্রাণ যারা বুক ভরে এই ফুলের বাসরে স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করত। আজ সেখানে—'হু হু করে বায়ু সতত ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।'

তারা কবিকে ডাকছে। ফুলের পাতায় ভরা তরুলতা গুল্ম হাত বাড়িয়ে সম্বর্দ্ধনা করছে—ঝরা ফুলের পাপড়ি বিছিয়ে পথ সাজিয়ে রেখেছে। পারস্যের মিনার ঘিরে—সাদা গুম্বজের উপর ছড়িয়ে পড়েছে—নব উষার অরুণ আলোক। আর তার রঙীন ধারার সুরে সুরে ঝরে পড়ছে এই অভিনব নওরোজের আগমনী গান কবির আসবার পথে।

'যেখানে ভোরের তারা

অসীম আলোকে করিছে আপন

আলোর যাত্রা সারা।'

হাফিজ একদিন ভারতের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রেছিলেন বার্দ্ধক্যের অজুহাতে। কবির পক্ষে সে অজুহাত কার্য্যকরী হ'লেও সময়ে তা ফলপ্রসু হয়নি। ফেলে আসা জীবন পথের অনেকখানি পেরিয়ে এসেও তিনি সাদরে পারস্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। বিশ্ব জোড়া খ্যাতি প্রতিভার পাশে এই বিরাট ত্যাগও মহত্ত্ব—

'শিখরে শিখরে কেতন তোমার

রেখে যাবে নব নব।'

কবি আকাশ পথে চলেছেন। পারস্যের প্রতি প্রান্তর অনিমিথ চেয়ে দেখছে। সিরাজ ইস্পাহান মেসেদ সবাই দেখছে। তাদের দেশে মেঘ মালা বায়ুস্তরের ভিতর দিয়ে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আকাশ পথে নেমে আসছে।

'উর্দ্ধ আকাশে তারা গুলি মেলি অঙ্গুলি

ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া।'

তাঁকে দেখবার জন্য সবাই উৎসুক। তাঁর শ্মশ্রু শোভিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল—সুগভীর আয়ত চক্ষুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তারা হাফিজ ওমরের সন্ধান পেয়েছে। আজ তারা নেই। তাদের মুরলী-রবাব-বীণের ঝঙ্কার চিরদিনের মত থেমে গেছে। তবুও তারা একদিন ছিল। আজ অদৃশ্য লোক থেকে তাদের আত্মা তাদেরই দেশে

কবিকে আহ্বান করছে—একদিন যেখানে শত শত বর্ষ পূর্ব্বে স্বর্গ থেকে ভেসে আসা চঞ্চল পুলকরাশি বিশ্বের দ্বার বেয়ে নিখিলের মর্ম্মে এসে লেগেছিল। তাদের সমাধি ক্ষেত্রের গুম্বজ মিনার আকাশের দিকে মাথা উচুকরে দেখছে আজ 'প্রভাতে কারে চাহিয়া' এই "ক্ষণিকের অতিথি তাদের দেশে আসছে। মর্ম্মরে গড়া মিনার গুম্বজের সমারোহ তাদের যুগ যুগ ব্যবধান-কবলিত স্মৃতিকে ঘিরে রাখলেও তারা বিস্মৃতির পর পার থেকে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করছে। তাদের সেই মৌন ব্যথিত নির্ব্বাক আত্মার সবেদন আবেদন ঘুরে ফিরে বাতাসে সঞ্চারিত হ'য়ে গোরস্থানের প্রতি ধূলি-কণায় মিশে রয়েছে—বলছে—হে কবি, একবার চেয়ে দেখ। জীবনের আনন্দ-লগনে আমরাও একদিন এখানে হাসি খেলা করেছি। বুলবুলও গান গেয়েছিল। নওরোজের পুষ্প সম্ভার আমাদেরও কুঞ্জ ঘিরে ফুটে উঠত। কিছুই আমাদের আটকাতে পারে নি। আমাদেরও নামতে হ'য়েছে—যেখানে আদি নেই—মধ্য নেই—শেষ নেই—সেই অন্তহারা অসাড় শীতল দেশে। হে কবি, বল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইরাণের আনন্দ আজ সমস্ত পৃথিবী ছড়িয়ে পড়বে। আকাশের পথে বাতাসের দোলা বেয়ে নেমে আসবে—হাফিজ ওমরের স্বস্তিবচন আশীর্ব্বাদ। হেনা গোলাপের কুঞ্জে—পাতায় পাতায় ডালের ভিতরে ভিতরে ফুঁপিয়ে উঠবে তাদের আফশোস—দীর্ঘশ্বাস; কে আছ একটি দিনের জন্যও আমাদের পারস্যে নিয়ে চল। একবার মাত্র দেখে আসব—সেখানে আজ কে এসেছে।

এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।

হাফিজ নেই। প্রিয়ার সন্ধানে ফিরে তার ব্যথিত চিত্ত ভুবনভরা ব্যর্থতা নিয়ে—বিরহীর শেষ শয্যা শান্ত শীতল গোরের মধ্যে চির বিশ্রাম লাভ করেছে। বিরহ ব্যথায় ঝরা রুমীর বাঁশরী আজ ইরাণের আকাশ বাতাস আর প্লাবিত করে না। সেই বাঁশরী রুমীকে অজ্ঞাত পথের সন্ধানে নিয়ে গেছে। বৃদ্ধ অটবীর বুকে ফুল্ল মাধবীর মত সেই তরুণী তন্বী আর ওমরের বুকে লুটিয়ে পড়ে না। সুরার সুরভি তার সমাধি শিয়র হয়ত এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে—কিন্তু সে পাত্র নেই। নিঃশেষ শূন্য করে ওমর তা সাকীর বুকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সাদী নেই। উপদেশ বাণী শুনবার জন্য ভুল করেও কেউ তার আস্তানা সিধা রাস্তায় যাতায়াত করে না। আজ সব ফুরিয়ে গেছে। সুফী কবি সাধকের দেশ ইরাণ আজ শূন্য। মরণের কোলে গা ঢেলে দিয়ে তারা আর কোন কালেও ধরণীর বুকে ফিরে আসবে না। বিদায় বেলার অমৃত সুর—শেষ ফাগুনের গানে গানে তাদের কাণে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। সরাইখানার যাত্রীদল ভিড় ভেঙ্গে দিয়ে সরে পড়েছে। যবনিকা পতন বহুদিন হ'য়েছে। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার।

মুহূর্ত্তের শুধু অভিনয়
চলেছেলো এই বিশ্বময়;
সাঙ্গ হ'লে রঙ্গলীলা যবনিকা পারে,
গাঢ়তম চির অন্ধকারে
নটনটী করিছে প্রবেশ
জীবনের অবসানে নাটকেরও হ'য়ে যায় শেষ।

কবির এই নব অভিযান সার্থক হ'ক। বার্দ্ধক্যের শেষপ্রান্তে এসেও কবি পারস্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন—এই জন্য সমগ্র মুসলিম জগৎ ভক্তিকৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে থাকবে। তাঁর অন্তরের অন্তরতম কামনা হিন্দু-মুসলমানের মিলন এই অভিযান সাফল্য মণ্ডিত করুক। সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনার সঙ্গে এই শুভেচ্ছাটুকু তাঁর যাত্রাপথে 'ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে।'

এম, আবদুল আলী

প্রাইভেট টিউটর

শ্রীমতী মানসী দেবী

আজ সকালে সে চলে গেছে।

আমার চোখ থেকে তখনো ঘুমের ঘোর ভাল করে কেটে যায় নি। সবে বিছানায় উঠে বসেছি। পূব্ দিকের জানালাটা খোলাই ছিল। নাগকেশরের ডালগুলিতে ভোরের আলোয় সবে মাত্র কাঁপন ধরেছে। রাত্তিরে কি যেন একটা মিষ্টি স্বপ্ন দেখেছিলাম; বিষয় ভুলে গেছি, কিন্তু সন্ধ্যাকাশে নিবে-যাওয়া আলোর মত তখনো তার আমেজটুকু চেতনার তীরে জেগে আছে। হয় ত তাই আজ বসন্তের ভোর বেলাটাকে প্রথম চোখ খুলে চাইতেই এত ভাল লাগ্ছিল।

কিন্তু আমার মনেও ছিল না আজ বারোই চৈত্র।

অপু ছুটে এসে বল্লে—"দিদি, মাষ্টারবাবু চলে যাচ্ছেন!"

"আজই যাচ্ছেন! কেন রে?"

"বা রে! আজ যে বারোই!"

"তা তুই এখানে কেন? বড় জেঠা হয়েছিস্ দেখ্ছি; চলে যা' আমার সুমুখ থেকে—এক্ষুণি যা বল্ছি।"

মুখখানি কাচুমাচু করে অপু চলে গেল।

এই এতটুকু ছেলে; কেমন করে বুঝে নিয়েছে যে মাষ্টারবাবুর বিদায় সংবাদটা সব চাইতে আগে আমাকেই দেওয়া দরকার।

কিন্তু, সে চলে গেছে।

কয়দিন অবধি মোটেই বৃষ্টি হয় নি। রোদের তাপে তাতিয়ে-উঠা মাটির বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস মাঠে মাঠে মরীচিকার সৃষ্টি কর্ছিল। আজ, একটু আগেই এক পশ্লা বর্ষণ হয়ে গেছে। কচি কচি শিশুর মুখে কান্নার পরেই যেমন একখানি শুভ্র হাসির দীপ্তি ফুটে ওঠে, আজ বৃষ্টিধৌত ধরণীর মুখের উপর রবির আলো তেমনি একখানি শান্ত সকরুণ সৌন্দর্য্যের আভা ফুটিয়ে তুলেছে। জারুল গাছের ডাল থেকে এখনো ফোঁটা ফোঁটা করে জল ঝর্ছে। চাঁপাকুড়ালির ভিজে পাতার উপর রবির আলো ঝিক্ ঝিক্ কর্ছে। ছাতিমতলা ধরে যে রাস্তাটা সোজা মাঠের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, তারি একপাশে পিয়াল গাছের ছায়ায় রাখাল ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে। একটু দূর বলে সুর-টুকু ভাল বুঝা যাচ্ছে না; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এ যেন মাটির বুকের চাপা কান্নার অস্ফুট ধ্বনি। যেন কোন অদৃশ্য মুসাফির আজ বৃষ্টিধৌত ধরণীর মর্ম্মস্থলে বসে যোগিয়া রাগিণীতে গান ধরেছে।

অপুর পড়া দেখিয়ে দেবার জন্য তাকে রাখা হয়েছিল। সে পড়তো মুরারি চাঁদ কলেজে—বি, এ ক্লাসে। ৮ই চৈত্র তাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বারোই তারিখ চলে যাবে বলে আগেই বলে রেখেছিল। মাত্র দুটি বছর সে এখানে থেকে প্রাইভেট টিউটরি করেছে। কিন্তু আমি ভাব্ছি, যে-মানুষ দু'বছর আগে গৃহ-শিক্ষক হয়ে আমাদের বাড়ীতে প্রথম ঢুকেছিল, আর আজ যে বেরিয়ে গেল ওরা কি এক?

আমার বয়স ষোল। সুতরাং পাড়াগাঁয়ের নিয়ম মতে ওর সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা সাম্নে বের হওয়াও গর্হিত।

কিন্তু ওর পড়্বার ঘরের জানালার কাছে যে বকুল গাছ, তারি তলা দিয়ে আমাকে অনেকদিন বিকেলে জল আন্বার জন্য পুকুর ঘাটে যেতে হয়েছে। (আমাদের পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থ ঘরে এ-কাজ মোটেই অশোভন নয়।) অনেকদিন দেখেছি; সুমুখে তার বই খোলা রয়েছে,—অপু হয়ত পাশে বসে অঙ্ক কষ্ছে; কিন্তু কী করুণ মিনতি ভরা চোখে সে আমারি পানে চেয়ে! হঠাৎ চোখে চোখ পড়্তেই মুখ নামিয়ে নিয়েছে,—আমি বেগে পুকুর ঘাটে জল তুল্তে গিয়েছি। তখন আমার বুকের

ভেতর যে কী ঝড় উঠেছে সে কেউ জানে না। অনেক সময় ভারি রাগ হয়েছে। অনেক দিন নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে একা একা কেঁদেছি। হয়ত অপু সেদিন পড়ার পর খেতে এসেছে, একটু গরম হয়ে ধমকের সুরে তাকে বলেছি—"তোর মাষ্টার কি আর তোর পড়াশুনায় তেমন মন দেয় না রে অপু ?"

"কেন দিদি, তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন, খু—ব"

"যা'! বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না, কেবল আদর দিয়ে দিয়ে তোকে নষ্ট ক'রে তুল্‌ছেন।"

অপু ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। আমার ভারি কষ্ট হ'ল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বল্‌লুম—

"আচ্ছারে অপু, তোর মাষ্টার তোকে খুব ভালবাসেন ?"

"খুব দিদি। সত্যি! বল্‌লে তুমি বিশ্বেস করবে না।"

"বেশ! তিনি তোকে কি বলেন বল্‌তো !"

"বা রে! তিনি ত রোজ জিজ্ঞাসা করেন,—কে আমাকে খাইয়েছে—রান্নায় আজ ছিল কে, এম্‌নি আরো কত কি।"

"তুই কি বলিস্ ?"

"কেন, আমি ত বলি, দিদি রেঁধেছে, দিদিই পাশে বসে খাইয়েছে।"

"তিনি কিছু বলেন না ?"

"বলেন বই কি ? সে কি সব মনে আছে দিদি ? এই ত সেদিন বল্লেন,—আজকের চচ্চড়ী তোর দিদি রেঁধেছেন, না রে অপু ? খুব চমৎকার হয়েছে !"

"আচ্ছা, থাক, ওদিকে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুগে যা।"

এমনিতর কতদিন গিয়েছে।

প্রতি দিবসের হাসিতে এবং কথায় প্রতিটি দিবসকে সে উদ্ভাসিত করে দিয়ে গেছে। বাড়ীর সবাই তাকে খুব ভালবাসতো সবারই নিকট সে ছিল সহজ। আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে সে একখানি আনন্দ কিরণের মত দীপ্তি পেত।

কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অনাত্মীয় তরুণ তরুণীর মধ্যে যে গভীর লজ্জা এবং সঙ্কোচের ব্যবধান, তাই আমাদিগকে পরস্পরের কাছ থেকে বহুদূরে ঠেলে রেখেছিল।

কিন্তু সে জান্‌তো অপুকে আমি ভালবাসি। তাই বোধ করি, অপুকে বুকে নিয়ে আদর করে, সে তার বুভুক্ষিত হৃদয়ের স্নেহ-পিপাসা সার্থক করে তুল্‌তে চেয়েছে। তার আমার মধ্যে ছিল অলকা আর রামগিরি পর্ব্বতের মধ্যেকার যোজনব্যাপি ব্যবধান। অপুই ছিল তাঁর একমাত্র মেঘদূত। তাই অপুকে অজস্র স্নেহধারায় অভিষিক্ত করে সে তার নীরব হৃদয়ের পূজা উপহার পাঠাতে চেয়েছে। অপুকে বুকে নিয়ে—অপুকে ভালবেসে কী তৃপ্তি সে পেত সে শুধু সেই জানে।

কিন্তু সে আজ চলে গেছে।

এটা বেশ জানি, এ সংসারে কোনো দিন তার আমার সহসা মুখোমুখি দেখা হবার পর্য্যন্ত সম্ভাবনা নেই,—হয়ত সেও তা জান্‌তো। তাই ভাব্‌ছি, এই যে একটা মৌন হৃদয়ের নিরর্থক ভালবাসা, এই বৃহৎ জগৎ ব্যাপারে এর কি কোন সার্থকতা নেই ?

আজ এই বৃষ্টি-ধৌত বসন্তের দুপুর বেলায় পৃথিবীর মর্ম্মস্থল ভেদ করে শুধু এ প্রশ্নটারই যেন করুণ প্রতিধ্বনি আমার বুকে এসে বাজ্‌ছে !

শ্রীমানসী দেবী।

চন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়

চন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের একখানি ছোট্ট গল্পের বই। আমার ধারণা চন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে সামাজিক যে প্রশ্ন শিল্পীর মনে আত্মপ্রকাশ করেচে সেটি হচ্চে এই যে মায়ের অপরাধ মেয়ের উপর বর্ত্তায় কি না। সরযূর মা একদিন অপরাধ করেছিলেন—তিনি কুলত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। সরযূ তখন পাঁচ বছরেরটি—সুতরাং তার এতে না ছিল অংশ না ছিল হাত। কিন্তু তবু যখন তার বিয়ের ৬ বছর পরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সংবাদ গ্রামে এসে পৌছলো তখন এই ঘটনার সমস্ত লজ্জা, কালিমা এবং গ্লানি সকলে মিলে সরযূর মুখেই লেপে দিলে। চন্দ্রনাথের অগাধ ভালবাসা তাকে রক্ষা করতে পারলে না। সে দীনহীন কুকুরের মত আশ্রয়হীনা হ'য়ে বিতাড়িত হ'ল। কিন্তু যে আচারনিষ্ঠ সমাজ সরযূর জন্যে এই দণ্ডবিধান করলে সেই হরকালীকে মাথায় করে রেখে গৌরব বোধ করলে! অথচ মানুষ হিসাবে দু'জনে কতই না তফাৎ! হরকালীর স্বভাবের মধ্যে সমস্ত প্রবৃত্তিই ছিল নীচ—চন্দ্রনাথের সংসারে এই নববধূটির আবির্ভাবকে সে কোনদিনই স্বাভাবিকভাবে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই তার তিরোভাবের সম্ভাবনা মাত্রেই সে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। যাত্রা করবার আগে সরযূকে দিয়ে একখানা দানপত্র পর্য্যন্ত সে সই করিয়ে নিলে। সমস্ত বুঝেও সরযূ তাতে সই করে দিলে। আমি তাই মনে মনে ভাবি যে এই সব ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ কি ভুলই না করে! ষড়যন্ত্র করবার প্রবৃত্তির জন্যে নির্ব্বাসন হওয়া উচিত ছিল যে হরকালীর তারই দুষ্কৃতির বোঝা মাথায় নিয়ে নির্ব্বাসিত হ'ল সরযূ। অথচ এই নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সে যেমন কথাটিমাত্র বল্লে না, মাসীমার দানপত্রে দস্তখৎ ক'রে দিতেও তেমনি আপত্তি করলে না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এই ঘটনা নিয়ে কি কোলাহল এবং অনর্থেরই না সৃষ্টি হতে পারত। বিবাহ-বিচ্ছেদ, গ্রাসাচ্ছাদনের মোকর্দ্দমা, এই রকম আরো কত কি! কিন্তু প্রাচ্যের অত্যাচারসহনশীল মেয়েটি নির্ব্বিবাদে নিষ্কৈফিয়তে এক বর্ষা সন্ধ্যায় মাত্র কয়েকগাছি কাচের চুড়ি এবং সামান্য কাপড় পরে তার একমাত্র আশ্রয়স্থান স্বামীর প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে মনে তখন না ছিল কোন দ্বিধা, না ছিল কারোর উপর কোন অভিশাপ! সে মন একটা কথাই নিঃসন্দেহে মেনে নিয়েছিল—সে কথাটি এই যে, যে অপরাধ সে করে নি তার শাস্তি ভোগ তাকেই করতে হবে। তার প্রতীকার করার সাধ্য কারোর নেই! কিন্তু আমি তাই মনে মনে ভাবি যে সেদিন জয়ী হয়েছিল কে! ঐ পরস্বলোলুপ হরকালী, না স্বেচ্ছাদাতা সরযূ!

সমাজের যেটি আচরিত প্রথা সেইটিকেই মানুষের মন কি রকম বিনা যুক্তিতে মেনে নেয় তার আর একটি প্রমাণ হরিদয়ালে। এই হরিদয়াল নিতান্ত খারাপ লোক ছিল না। দয়ামায়া তার ছিল বলেই সে আশ্রয়হীনা সুলোচনাকে একদিন আশ্রয় দিতে পেরেছিল। কিন্তু সে ছিল নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই যেদিন সরযূ চন্দ্রনাথের আশ্রয়চ্যুত হ'য়ে তার দুয়ারে এসে দাঁড়াল সেদিন সে কঠোর হ'য়ে উঠল। সে সাংসারিক নিয়মে বিচার করে দেখলে যে স্বামী হয়ে যদি চন্দ্রনাথ সরযূকে আশ্রয় দিতে না পেরে থাকেন তবে তার দায়িত্ব কিসের? সে কেন স্বেচ্ছায় এই ভার নিয়ে যজমান-মহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে যতদিন দয়া করা চলত ততদিন সে পিছপাও হয় নি। কিন্তু এখন আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তার উপর ছিল শাস্ত্রাচার সহায় এবং সাংসারিক দৃষ্টি। কিন্তু এই সমস্ত আচারের বাঁধন যাঁকে বাঁধতে পারেনি তিনি এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন—তিনি কৈলাস

খুড়ো। ইনি কৈলাস-শিখর-বিহারী ভোলানাথের মতই স্বচ্ছন্দ এবং নিত্যমুক্ত। সাংসারিক লোকের দৃষ্টির সঙ্গে এঁর দৃষ্টি কোনদিনই মিল্‌ত না—সেদিনও মিল্‌ল না। শাস্ত্রের আচার যত বড়ই হোক্ একটি নিরপরাধ নিঃসম্বল আশ্রয়-ভিখারিণী মেয়েকে আশ্রয় নেই একথা বলার জোর কোন মতেই তিনি মনের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। আচারের পেছনকার যে সত্য চিরকাল মানুষকে চালিত করে আস্‌চে তারই ছবি তাঁর চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল। নীলকণ্ঠ যেমন সমুদ্র মন্থনের পর সকলের পরিত্যক্ত হলাহল অবলীলাক্রমে কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন কৈলাসখুড়োও তেমনি সেদিন সামাজিক আচারের উদ্গীর্ণ গরল সরযূকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ফুলটির মত কুড়িয়ে মাথায় করে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন।

গ্রন্থকার বলেচেন যে এই কৈলাসখুড়োর কাছে লোকে কোনদিন পরামর্শ নিতে আসেনি——রোগ হলে শুশ্রূষা করবার জন্যে তাঁর ডাক পড়ত, মলে দাহ করবার জন্যে তাঁর ডাক পড়ত, আর দাবা খেলার আসরে তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়। তাঁর পরামর্শ লোকের কেন কাজে লাগ্‌ত না তা পূর্ব্বেই বলেচি—সুবিধা এবং সামঞ্জস্য করে পরামর্শ দেবার তিনি ছিলেন উপরে। সত্যের নিষ্কুণ্ঠ এবং ভাস্বর মূর্ত্তি সাধারণত লোকের চোখে সয় না। নিজের পুত্র এবং কন্যা-বিয়োগের পর এই বৃদ্ধ এক রকম অনন্যোপায় হয়েই পরপারে যাবার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সরযূ এবং তার পরই তার পুত্র বিশুর অভ্যাগমে তাঁকে আবার সংসার পাতিয়ে বস্‌তে হ'ল। এই স্নেহাতুর বৃদ্ধ এবং বিশুকে অবলম্বন করে শিল্পী বাৎসল্য রসের যে আখ্যায়িকা সৃষ্টি করেচেন তার তুলনা মেলা ভার। আমি তাই অনেক সময় আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি যে পরের ছেলেও আমরা ঢের দেখেছি, কাশীতেও আমরা অনেকে গেছি, সতরঞ্চ খেলার লাল মন্ত্রীও বাজারে দুষ্প্রাপ্য নয় কিন্তু তবু এই সমস্ত উপাদান সমবায়ে যে অনবদ্য উপাখ্যান রচিত হ'ল আমাদের শত কল্পনার সাধ্যও ছিল না যে তার সন্ধান দেয়। কেননা এ ত শুধু কল্পনা নয়, এ যে বুক ছিঁড়ে দিয়ে সৃষ্টি!

কৈলাসখুড়োর জীবনের ভিতর দিয়ে রাজা ভরতের জীবন প্রতিবিম্বিত হয়েচে। কৈলাস যেদিন কথক ঠাকুরের মুখে রাজা ভরতের উপাখ্যান শুনতে গিয়েছিলেন সেদিন কল্পনাও করেন নি যে তাঁর নিজের জীবনেও ঐ কাহিনী সত্য হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু তাই হ'ল। রাজা ভরত যেমন হরিণ শিশুর শোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে শেষে মৃত্যু-মুখে পতিত হলেন, কৈলাসও তেমনি বিশু চলে যাওয়ার পর অতিমাত্রায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌লেন। এ পারের দিনগুলি সংক্ষিপ্ত হয়েই এসেছিল। কমলা এবং কমলচরণ চলে যাওয়ার পরে বৃদ্ধ পরপারের নৌকায় পা দিয়েই বসেছিলেন—বিশু আসায় মাঝখানের ক'টা দিন আবার জমজমে হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু বিশু চলে যাওয়ার ধাক্কা বৃদ্ধ আর সাম্‌লাতে পারলেন না। এখানে আমি গ্রন্থকারের নিজের লেখা একটুখানি উদ্ধৃত করে দিচ্চি ঃ—

"কাঁঠালতলায় তাহার (বিশুর) ক্ষুদ্র খেলাঘর এখনও বাঁধা আছে। দুটো ভগ্ন ঘট, একটা ছিন্ন-হস্ত-পদ মাটির পুতুল, একটা দু' পয়সা দামের ভাঙ্গা বাঁশী। ছেলে-মানুষের মত বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া আপনার শোবার ঘরে রাখিয়া দিলেন।

দুপুর বেলা আবার গঙ্গা পাঁড়ের বাড়ীতে দাবা পাতিয়া বসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠক-খানায় আবার লোক জমিতে লাগিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বলিয়া কৈলাসচন্দ্রের আর তেমন সম্মান নাই; তখন দিগ্বিজয়ী ছিলেন, এখন খেলামাত্র সার হইয়াছে। সেদিন যাহাকে হাতে ধরিয়া খেলা শিখাইয়াছিলেন, সে আজ চাল বলিয়া দেয়। যাহার সহিত তিনি দাবা রাখিয়াও খেলিতে পারিতেন, সে আজ মাথা উঁচু করিয়া স্বেচ্ছায় একখানা নৌকা মার দিয়া খেলা আরম্ভ করে।

পূর্ব্বের মত এখনো খেলিবার ঝোঁক আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই। দুই একটা শক্ত চাল এখনো মনে পড়ে কিন্তু সোজা খেলায় বড় ভুল হইয়া যায়। দাবা খেলায় তাঁহার গর্ব্ব ছিল—আজ তাহা শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে। তবে শম্ভু মিশির এখনো সম্মান করে; সে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া খেলে না, প্রয়োজন হইলে দুই একটা কঠিন সমস্যা পূর্ণ করিয়া লইয়া যায়।"

কর্ণধারবিহীন নৌকা স্রোতের মুখে পড়ে যেমন

বানচাল হয়ে যায় কৈলাসচন্দ্রের অবস্থাও যে তখন তেম্‌নি উপরের বর্ণনা থেকে এটুকু বোঝা শক্ত নয়। বিশু তখন তাঁর সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়ে চলে গেছে। সুতরাং শেষ মুহূর্ত্ত এসে পড়তে আর দেরি হ'ল না। মৃত্যু শয্যার সঙ্গী দাবা খেলার সাথী শম্ভু মিশির, আর অনেক দিনের পুরাণো ঝি লখিয়ার মা। চিন্তা একমাত্র বিশুর—সরযূর হাতের লেখা বিশুর জবানী চিঠি বালিশের নীচে রাখা—হাতে হাতে সকলকে পড়ে শুনিয়ে শুনিয়ে সে মলিন হ'য়ে গেল। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ যে কথাটি ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল, সে কথাটিও বিশুর—"বিশু, বিশ্বেশ্বর, মন্ত্রীটা একবার দে ভাই, মন্ত্রী হারিয়ে আর কতক্ষণ খেলি বল ?"

রাজা ভরত এবং কৈলাসের জীবন নিয়ে হয়ত দার্শনিক তর্ক উঠ্‌বে। পণ্ডিত বল্‌বেন জগৎটাই যখন মায়া তখন রাজা ভরত এবং কৈলাস Phenomenon ত্যাগ করে Nonmenon এর পেছনে নিজেদের প্রবৃত্তিকে ছুট্ করালে কাজ হ'ত। কিন্তু "রসো বৈ সঃ" এ যদি শাস্ত্রীয় বাক্য হয় তবে রাজা ভরত তথা কৈলাস যে পথভ্রান্ত হন নি। একথা নিশ্চিত। যে রসস্বরূপ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে বারম্বার উপলব্ধি যে সেই অখণ্ডেরই উপলব্ধি এতে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই !

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শুন্‌তে পাই যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস topical interest এর—সে চিরস্থায়ী হবে না।

কিন্তু উপরে ষষ্টিবর্ষ পরিমিত বৃদ্ধের সঙ্গে দু'বছরের শিশুর যে শৈশবলীলা বর্ণনা করেচি তার আবেদন, আমার বিশ্বাস, সর্ব্বকালের মানুষের কাছে। সে কোনমতেই দু'দিনের নয়, সে চিরদিনের। এই রকম শরৎচন্দ্রের সমস্ত গ্রন্থ থেকেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

মাত্র গুটি আট দশ চরিত্র নিয়ে বইখানির সৃষ্টি কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন চরিত্রটিই অপরিস্ফুট নেই ! অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্রগুলিও তাদের পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। লুপ্ত-সম্মান কৈলাস-চন্দ্রকে রোগশয্যায় পরিচর্য্যার মধ্যে দিয়ে অ-বাঙ্গালী শম্ভু-মিশিরের উদার বন্ধুত্ব চোখে পড়ে। হরকালীর হাতের ক্রীড়নক ব্রজকিশোরের নির্ব্বুদ্ধিতা চোখে পড়েতেও দেরি হয় না। সরযূর বিভিন্ন বয়সী সখী হরিবালার স্নেহ কাতর হৃদয়টিও দৃষ্টি এড়ায় না। আর সরযূকে তিনি স্নেহ করতেন বলেই যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে কারোর কথায় চন্দ্রনাথ কর্ণপাত করেন নি তখন হরিবালার কথা কার্য্যকরী হয়েছিল। চরিত্রহীন মদ্যপায়ী ধূর্ত্ত রাখালদাসের চরিত্রও অপরিণত নয়।

প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় উত্তীর্ণ সংসার জ্ঞানাভিজ্ঞ মণিশঙ্কর চন্দ্রনাথকে যা বলে বুঝিয়েছিলেন আমার মনে হয় সেই কথাটিই বইখানির সার কথা। তিনি বলেছিলেন, "মানুষের দীর্ঘ জীবনে তাকে অনেক পা চল্‌তে হয়। দীর্ঘ পথটির কোথাও কাদা, কোথাও পিছল, কোথাও বা উঁচু নীচু থাকে, তাই, বাবা, লোকের পদস্খলন হয়; তারা কিন্তু সে কথা বলে না, শুধু পরের কথা বলে।" এই মানদণ্ডে বিচার করলে সুলোচনাকেও ক্ষমা করা যায়। রাখাল দাসকে সে ছেলেবেলা থেকেই ভালবাস্‌ত। তাদের বিয়ের কথাও হয়েছিল কিন্তু নীচ ঘর বলে বিয়ে হতে পায় নি। বিধবা হয়ে ফিরে এসে সুলোচনা ফের এই রাখালের সংস্পর্শেই আসে এবং অবশেষে একদিন তার হাত ধরেই বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং এই যে বেরিয়ে পড়া, এ ততটা প্রবৃত্তির তাড়নায় নয় যতটা আগেকার ভালবাসার জোরে। এই ভুলের জন্যে তাকে পরবর্ত্তী জীবনে যথেষ্ট শাস্তিভোগ করতে হয়েচে—এমন কি রাখালদাসের অত্যাচারে যখন হতভাগিনীর আর মুখ দেখাবার জো রহিল না তখন তাকে গঙ্গার সর্ব্বংসহা বুকে আশ্রয় নিতে হ'ল। এর পরও কি তাকে ক্ষমা করা যায় না ?

চন্দ্রনাথ সরযূকে তার রূপ দেখেই বিয়ে করেছিলেন কিন্তু পরে দেখ্‌লেন যে তিনি ঠকেন নি। সরযূ অশেষ গুণেরও অধিকারিণী ছিল। তার মত বুদ্ধিমতী আত্ম-সম্মান-জ্ঞানসম্পন্না সৌন্দর্য্যশালিনী নারী চন্দ্রনাথের ঘরে বেমানান হয় নি। কিন্তু সে জান্‌ত যে চন্দ্রনাথ তাকে দয়া করেই গ্রহণ করেচেন। আর মায়ের অপরাধের জন্য যে কুণ্ঠা তা' ত তাকে সব সময়ে ঘিরে থাক্‌তই। সুতরাং দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য্য তাদের মিলনকে নিবিড় করে তুলতে পারে নি। কিন্তু যখন দুঃসংবাদের এক বাত্যাঘাতে এই ছদ্মবেশ খসে পড়ল তখন সরযূর মধ্যে থেকে এক

প্রগল্‌ভা নারী বেরিয়ে এল। এ নারী যেমন মহিমময়ী তেমনি দৃপ্তা। বিশুকে সেতু করে যখন এই দম্পতীর পুনর্মিলন হ'ল তখনই পূর্ব্বাহ্ণের দাস্য রস মধ্যাহ্নে মাধুর্য্যে পরিপক্ক হ'য়ে উঠ্‌ল।

চন্দ্রনাথ সরযূকে কম ভাল বাসতেন তা' নয় এ কথা পূর্ব্বেই বলেচি কিন্তু সেই ভালবাসাকে বর্ম্ম করে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন এমন দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। ধনীর ছেলে হ'য়েও অজ্ঞাত কুলশীল সরযূকে যখন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তখন সে গ্রহণের ঔদার্য্যটাকেই কেবল তিনি দেখেছিলেন। তার মধ্যে প্রবঞ্চনা থাক্‌তে পারে এটি তিনি কল্পনা করেন নি। তাই প্রবঞ্চনার কথা যখন জানা গেল তখন একদিকে যেমন অপার লজ্জা তাঁকে মাটিতে মিশিয়ে দিলে আর একদিকে তেমনি আত্মবুদ্ধির উপর ধিক্কার তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুল্‌লে। এর উপর মণিশঙ্কর বল্লেন যে বৌমাকে ত্যাগ করাই হচ্চে বিধি। মনের এই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থার উপর দিয়েই সরযূর নির্ব্বাসন ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। পরে যখন সরযূকে নিয়ে ঘরে ফিরবার তিনি সংকল্প করলেন তখন তার মধ্যে সরযূর উপর অনুকম্পাই বা কতখানি কাজ করেচে, আর বিশুর উপর স্নেহই বা কতখানি কাজ করেচে, এর সঠিক কারণ নির্ণয় করা শক্ত।

চন্দ্রনাথ বইখানি বিয়োগান্ত নয়, মিলনান্ত। তাই শরৎ চন্দ্রের "পল্লী-সমাজ" "চরিত্রহীন" প্রভৃতি উপন্যাসের মত ঐ উপন্যাসখানি মর্ম্মস্পর্শী হ'লেও মর্ম্মন্তুদ হয় নি। কিন্তু চন্দ্রনাথ আর সরযূর দিক দিয়ে যদি চ বইখানি মিলনান্ত, কৈলাস-খুড়োর দিক্ দিয়ে সেখানে বিয়োগের বিষাণ বেজে উঠেচে। বই এর নামকরণ দেখে মনে হয় গ্রন্থকার চন্দ্রনাথকেই হয়ত এ গল্পের hero কর্‌তে চেয়েছিলেন কিন্তু লেখক পরে নিজে নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন। নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছেন কৈলাস খুড়ো। ফলে মধুর রস বাৎসল্য রসের কাছে হার মেনেছে। রাজা ভরত তথা কৈলাসের মৃত্যুশয্যার যে শেষ করুণ সুর সে বিশ্বের বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর—বিশ্বপ্রাণও চিরকাল তার সাথী হারিয়ে কেঁদে কেঁদে বল্‌চে, 'ফিরে আয়, ফিয়ে আয়, ফিরে আয়।' যাকে পাওয়া যাবে না তাকে পাওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা, যাকে ধরে রাখা যাবে না তাকে ধরে রাখ্‌বার নিষ্ফল প্রয়াস, এই নিয়েই চির-চঞ্চল বিশ্বপ্রাণ লীলামুখর। এই বিরহেরই আর্ত্তনাদ তরু-মর্ম্মরে গিরি-গুহায় গুমরে মর্‌চে, এরই সীমাহীন আকুল ক্রন্দন ধরণীর পঞ্জর ভেদ করে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে! বিশ্ব-ব্যাপী এই যে করুণতার প্লাবন তাকেই বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর কাব্যে মূর্ত্তি করে তুলেচেন :—

"চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠ স্বরে শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু ত রে
শিথিল হ'ল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মত
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি'
'যেতে নাহি দিব।' ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব।' যতবার পরাজয়
ততবার কহে—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে?
আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল বিশ্বে কিছু আছে আর?
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
'যেতে নাহি দিব।'—তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলি সম উড়ে চলে' যায়
একটি নিঃশ্বাসে তার আদরের ধন,—
অশ্রুজলে, ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হত গর্ব্ব নত-শির। তবু প্রেম বলে,
"সত্য-ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।"

শ্রীঅবনীনাথ রায়

জন্মের ইতিহাস

শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকার আসার যখন মাস কয়েক বিলম্ব ছিল মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত দুজনের জল্পনা কল্পনার আর বিরাম থাকিত না। তার অর্দ্ধেক বাস্তব অর্দ্ধেক অবাস্তব এবং প্রায় সমস্তটাই স্বপ্নবৎ মনোরম। এ হেন আশ্চর্য্য সম্ভাবনা যেন জগতের আর কোন নরনারীর জীবনে আজ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। তিন বছর ধরিয়া তাহাদের যে অনন্যসাধারণ প্রেম বসন্তের ফুলবনে পথ-ভোলা পথিকের মত লক্ষ্যহীন দায়িত্বহীন বাধাহীন অবস্থায় ঘুরিতেছিল আজ লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া মাত্র সে প্রেম তাহাদের স্বর্গে মর্ত্ত্যে অতীত ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সকল প্রেমের মধ্যে অতুলনীয় হইয়া গিয়াছে।

লণ্ঠন নিভাইয়া সুলতা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়াছে, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িবার পরেও ঘরের কোণে এ দীপ জ্বলিতে থাকে। খানিক আবোল তাবোল বকিবার পর বিকাশ বলে, 'বৌ অনেকের থাকে সুলতা, কিন্তু তোমার মত বৌ—'

সুলতা মনে মনে বলে, 'কত জন্মের তপস্যা আমার সেটাতো দেখতে হবে?'

বিকাশের একটু উচ্ছ্বাস জাগে, আন্তরিক নাটকীয় সুরে সে বলে 'না, সুলতা, তুমি শুধু আমার প্রিয়া নও, প্রিয়ারও বেশী। ঠিক যে তুমি কি তা অবশ্য আমি বলতে পারি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তুমি প্রিয়ারও অতিরিক্ত কিছু।'

লজ্জায় সুলতা হাসে, বলে 'ছাখো, এত বাড়িও না। এতদিন বাইরের লোক স্ত্রৈণ বলেছে, এবার তাহলে আমিও বলতে সুরু করব।'

বিকাশ বলে 'হুঁ বল না! গলা বুজে আসবে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালবাসতে পারে না, তারাই পরকে স্ত্রৈণ বলে গাল দেয়। তুমি কি ও কথা বলতে পার?'

সুলতার চোখ ছল ছল করিয়া আসে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালবাসিতে পারে না তাহারা সুলতার অজানা জগতের মানুষ নয়। পাশের বাড়ীতেই চরম দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কি কান্নাই বৌটা এক একদিন কাঁদে? ভালবাসুক আর না বাসুক- স্ত্রীকে যার অমন ভাবে কাঁদিতে হয় সে দুর্ভাগা বৈ কি!……

ভালবাসার ভবিষ্যৎ ভাগবাটোয়ারা নিয়া রোজ তাহাদের তর্ক হয়।

সুলতা স্বীকার করে না তার ভালবাসার সীমা আছে। ছেলেকে ভালবাসা দিতে হইলে স্বামীর ভাগটা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে,—একথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

'তোমার জন্যে যে ভালবাসা সে তোমারি থাকবে গো, খোকার জন্য নতুন ভালবাসা জন্মাবে। তুমিই বরং আমাকে আর তেমন—'

'দেখো! খোকাকে নিয়ে আমার দিকে যখন তাকাবারও সময় পাবে না—'

এমনি সব অর্থহীন কথার খেলা। অথচ ইহারি ভিতর দিয়া—দুজনের যে অনির্ব্বচনীয় মিলন ঘটিয়া চলে প্রেরণার মুহূর্ত্তেও কি কোন কবি কোনদিন তার মানসীর সঙ্গে তেমন মিলনের স্বাদ পাইয়াছে?

—'যে কাঁথাটা ধরেছিলে শেষ হ'ল?'

'একটু বাকী আছে। আজ হয়ে যেত, ঠাকুরঝি এমন ঠাট্টা সুরু করলে—'

—'মিনুর খোকার জন্য মা আর কাঁদে না দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি। কেন বলত?'

'তোমার খোকার পথ চেয়ে আছেন। তোমার যে খুকীও হতে পারে একথা কিন্তু মার মনেও পড়ে না!'

'তোমার পড়ে?—'

—'আমি হার দিয়ে খোকার মুখ দেখব সুলতা।'

'মা যে হার দেবেন ঠিক করেছেন?'

'ও, হ্যাঁ। মনে ছিল না। আমি তবে কি দেব বলত?'

'ওর মাকে একটু ভালবাসা দিও।'

এমনি ভাবে তাহারা কথার পিঠে কথা গাঁথিয়া চলে, কখন যে তাহা হাস্যপরিহাসে দাঁড়াইবে কখন গম্ভীর আলোচনার রূপ নিবে কিছুরই স্থিরতা থাকে না। দুজনের মনেই যেন স্বয়ংক্রিয় গ্রামোফোন ও একস্তূপ রেকর্ড আছে, কীর্ত্তনের পরেই কমিক গান বাজিয়া যায় এবং গ্রামোফোনের প্রথম শ্রোতা বালকবালিকার মত তাহাতেই তাহাদের সবিস্ময় পুলকের অন্ত থাকে না।

শেষরাত্রে হঠাৎ সুলতার ঘুম ভাঙ্গাইয়া খোকা কার মত দেখিতে হইবে এবং কি নাম রাখিলে সমবেত ভাবে দুজনের পছন্দের মর্য্যাদা থাকিবে এ আলোচনা আরম্ভ করা বিকাশের কাছে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য মনে হয় না। কিন্তু দিন ঘনাইয়া আসার সঙ্গে তাহাদের ছেলেমানুষী আলাপ আলোচনা কমিয়া যায়। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় ঘটিবার প্রতীক্ষায় সুলতার দেহ যেমন অস্থির অস্থির করে মনে তেমনি একটা একটানা ভয় বাসা বাঁধে। স্বামীর একটা হাত বুকে চাপিয়া সে অনেক রাত্রি অবধি নীরবে জাগিয়া থাকে, বিকাশ তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করে।

'ভয় কি সুলতা?'

সুলতা আরও শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে। কথা বলিতে গিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না।

আত্মীয় পরিজন সকলের মুখে অল্পবিস্তর চিন্তার লক্ষণ দেখা দেয়, বয়স্কেরা মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে নানারকম পরামর্শ করেন, মন্থরগতিতে আগামী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আয়োজন চলিতে থাকে।

বিকাশের বিধবা মা মা কালীর কাছে মানত করেন, ভালয় ভালয় একটি খোকা দিও মা, খোকা দিও। জোড় পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব।

কোথা হইতে গোটা তিনেক মাদুলি সংগ্রহ করিয়া পুত্রবধূর বাহুতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শুধু কি মাদুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়? মা কালীর ঘাড়েও দায়িত্ব চাপাইয়া তিনি স্বস্তি খোজেন।

কি জানি কি হইবে? একবার ভালয় ভালয় হইয়া গেলে পরেরবার অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা চলে। প্রথমবারই যত ভয়।

আপিসের কাজে বিকাশের মন বসে না, চলিতে বার বার কলম থামিয়া যায়, সময় যেন ভ্রূণভারবাহী মন্থর-গমনা অলস বধূ। বাহিরে কোনদিন রোদ ওঠে কোনদিন মেঘের ছায়া পড়ে কোনদিন অবিশ্রাম ধারাপাত হয়। ফ্যাণের বাতাসে কাগজপত্র মৃদুশব্দ করিয়া নড়িতে থাকে, চোখ বুজিলে মনে হয় কোরা তাঁতের সাড়ী পড়িয়া সুলতা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুলতার নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য দূরে থাকাটাও বিকাশের কাছে আজকাল অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাবনার মধ্যে সুলতার সঙ্গ সে এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে পারে, মমতার এমন সব অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির সন্ধান সে পায় যে তাহার মনে হয় শুধু সুলতার নয় নিজেরও অনেক আশ্চর্য্য গোপন পরিচয় ধরা পড়িতেছে।

এ অমৃত যে একদিন ভালবাসার ভিত্তিগত দৈহিক প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল বিকাশ আর তাহা বিশ্বাস করে না। তাহার মনে হয় বহুকাল ধরিয়া সে শুচিশুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিল এতদিনে সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের যুগধর্ম্মের প্রতি বিকাশের কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। স্ত্রীকে সে আজ সত্যই শ্রদ্ধা করে।

সুলতার মনে হয় সে যেন নেশা করিয়াছে। আনন্দের নেশা আতঙ্কের নেশা প্রাণধারণের নেশা।

স্বামীর অতিরিক্ত ভালবাসার কথা একান্তে বসিয়া ভাবিতে গেলে কোথায় যেন তাহার একটু বাধিত, মনে হইত ইহাকে প্রাপ্য মনে করা অনুচিত, এতবেশী করিয়া পাওয়া অন্যায়। আজ আর পাওনার কাছে দাবীকে ছোট মনে হয় না। নিজের মূল্য নিজের কাছেই সুলতার আজ অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।

দুপুরটা ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অলস-ভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া সুলতা চোখ বোজে। এই ঘরে সে তিন বছর ধরিয়া বাস করিতেছে, তিন বছরের ইতিহাসে এ ঘর যেন ঠাসা, বাতাসে যেন পুরাণো মাটির গন্ধ।

এই ঘরে তার প্রথম স্বামী-স্পর্শ জুটিয়াছিল!

সেদিনের বুক দুরু দুরু পুলক আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আকাশের অশ্রু-ছাঁকা সূর্য্যালোক যেমন আকাশের গায়েই রামধনু আঁকিয়া দেয়, আত্মীয়-বিচ্ছেদ-বেদনায় পরমাত্মীয়ের সোহাগ মনে সেদিন তেমনি রঙ মিশাইয়াছিল; ভ্রূণস্পন্দনে যেন তাহারই চঞ্চল চেতনা!

তারপর একদিন দুপুরে খাইতে বসিয়া সুলতা খানিকক্ষণ মাখা ভাত নিয়া নাড়াচাড়া করিল, শেষে পাংশুমুখে হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

মৃণ্ময়ী বলিল "ওকি বৌ? খাও? ভারি মাসে আবার কিসের অরুচি।'

স্নেহলেশ-শূন্য কণ্ঠ। এবং তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তার হৃদয়ে স্নেহ নাই, মমতা নাই, ঘুমানো আগ্নেয়গিরির মত তার বুকভরা শুধু জ্বালা। স্বামী তাহাকে নেয় না, এই সেদিন পাঁচ বছরের ছেলেটা মরিয়াছে। সহ্যের অতিরিক্ত বলিয়া তাহার শোক আজ আর বেদনার ব্যাপার নয়,—মনের বিকার, হৃদয়ের রূক্ষতা।

সুলতা বলিল 'আমার গা কেমন করছে ঠাকুরঝি—বড্ড খারাপ লাগছে।'

'বলো কি বৌ?' বলিয়া মৃণ্ময়ীর যেন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ক্ষণকাল একাগ্র দৃষ্টিতে সে ভ্রাতৃবধূর মুখখানি নিরীক্ষণ করিল। কতকাল পরে তাহার শুষ্ক চোখ দুটি আজ আবার জলে ভরিয়া উঠিতে চায়!

মুখ ফিরাইয়া নিয়া হঠাৎ অনাবশ্যক শব্দ সহকারে মৃণ্ময়ী হাঁকিল 'ওমা! মা! শুনছ? বৌএর শরীর কেমন করছে দেখে যাও।'

মা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সারিয়া উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন 'কি বৌমা, কি? কি রকম বোধ করছ?'

কি রকম যে বোধ করিতেছে সুলতা নিজেই তাহা বোঝে না, শাশুড়ীকে বলিবে কি। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন আপনাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, মাথাটা এমন ভারি যে মাটিতে না নামাইলে খসিয়াই পড়িবে বোধ হয়, অজস্র এলোমেলো চিন্তা জড়াজড়ি করিয়া মনের মধ্যে আসা যাওয়া সুরু করিয়াছে।

সে করুণস্বরে বলিল 'কেমন যেন লাগছে মা, অস্থির অস্থির করছে।'

মা চিন্তিত মুখে বলিলেন, 'কি জানি, এখনো কিছু বলা যায় না। ঘরে গিয়ে তুমি বরং শুয়েই থাক বৌমা, খেয়ে আর কাজ নেই। ব্যথা ট্যথা টের পাওয়া মাত্র আমায় কিন্তু জানিয়ো বাছা, দাই ডাকতে হবে, বিকুর কাছে খবর পাঠাতে হবে—'

সুলতার ইচ্ছা হইল বলে, দাই ডাকিতে লোক যাক, বিকাশের কাছে লোক ছুটুক, যত কিছু আয়োজন দরকার সব সমাপ্ত হইয়া থাক। ডাক্তার ডাকার কথাটা তো শাশুড়ী কই উল্লেখ করিলেন না? শুধু দাই এর উপর ইহারা নির্ভর করিয়া থাকিবে নাকি?

বিকাশ বলিয়াছে দরকার হোক বা না হোক (ভগবান করেন যেন দরকার না হয়) প্রথম হইতে একজন ডাক্তার আনিয়া বসাইয়া রাখিবে। কিন্তু সে খবর পাইয়া আপিস হইতে আসিবার পূর্ব্বেই যদি ভয়ানক কিছু ঘটিয়া যায়? সে যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে? যদি মরিয়া যায়?

মৃণ্ময়ী তীব্র দৃষ্টিতে সুলতার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন দেখিতেছিল, ঠোঁট ভাঙ্গিয়া হাসিয়া বলিল 'বৌ এর মুখ দেখেছ মা? যেন ফাঁসি যাচ্ছে। সারাজন্ম ছেলে বিইয়ে কাটবে, মেয়ে মানুষের এতে এত ভয় কিসের শুনি?'

মা বলিলেন 'আহা, তুই চুপ কর মিনু।'

মৃণ্ময়ী উদ্ধত ভাবে বলিল 'কেন চুপ করব? হক্ কথা বলব তার আর চুপ করা করি কি!'

সুলতা ছল ছল চোখে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন 'যাও বৌমা, তুমি শুয়ে থাকগে। ভাততো মুখেও করলে না, একটু গরম দুধ খাবে?'

সুলতা মাথা নাড়িল। মৃণ্ময়ী বলিল, 'খোকা যখন হয়, আমার শাশুড়ী আমায় একবাটি দুধ গিলিয়েছিল মা। শেষে মরি আর কি বমি করে!'

সুলতা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বার দুই অকারণেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, ও কি ঠিক সময়ে আজ আসতে পারবে? সকাল বেলাই শরীর ভাল ঠেকছিল না, কেন বললাম না তখন?

ছোট ননদ সুধাময়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সন্তর্পণে বিছানার একপাশে বসিল, কানে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিল 'বৌদি সেই যে বলবে বলেছিলে, এবার বল!'

সুলতা অবাক হইয়া গেল। কিশোরী মেয়ের একি কৌতুহল! বিবাহের কথায় যে এখনো ভাল করিয়া লজ্জা পাইতে শেখে নাই সে জানিতে চায় পৃথিবীর আলো-বাতাসের ডাকে খোকা সাড়া দিতে চাহিলে জননীর কেমন লাগে!

মাংসের সীমানায় আলোর জন্মেরও পূর্ব্বেকার যে আদিম অন্ধকার নিয়া মানুষ পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীর আলো কোনদিনই যে অন্ধকারের নাগাল পায় না, চিতাগ্নির পথে যে অন্ধকার আবার আলোর যবনিকার ওপারে চলিয়া যায়, সেই অন্ধকারে শিশুর অস্তিত্ব সুধার মনে জিজ্ঞাসা জাগায় না। জীবনের আরম্ভ তাহার কাছে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর,—আঁতুরে। সে শুধু জানিতে চায় ওই আরম্ভটা কেমন, শিশুর কাছে উহা কেমন লাগে। অকস্মাৎ চারিদিকে আলো ও শব্দের সমারোহ তাহার নিজের একদিন কেমন লাগিয়াছিল? যে মা হইতে বসিয়াছে তাহার অনুভূতির মধ্যে সে এই দুর্ব্বোধ্য ঝাপসা কৌতূহলের সমাপ্তি খোঁজে।

গতকল্য বেশ মনে পড়ে, গতবৎসর এতটুকু অস্পষ্ট নয়। এই উজ্জ্বলতা কমিয়া কমিয়া সীমান্তের কাছে স্মৃতি শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাহার পরেই এক অদ্ভুত রহস্য ভরা কুয়াশা।

সুধা জানিতে চায় ওই রহস্যের মধ্যে সে কি ছিল।

জবাব না পাইয়া তাহার রাগ হইয়া গেল। 'বলিল বল্‌বে না তো? আচ্ছা, নাই বল্‌লে।'

সুলতা বলিল, 'বলছি। বড় মাথা ধরেছে।'

সুধা হতাশ হইয়া বলিল 'এই শুধু?'

'আর ভয় করছে।'

ভয়! মনে হইল এবার যেন সুধা তাহার প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছে। চোখ বড় বড় করিয়া সে বলিল 'ভয় করছে বৌদি? ভারি আশ্চর্য্য তো!' বলিয়া কিশোরী মেয়েটি এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া উঠিল।

বিকালের দিকে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে আজ রাত্রির অন্ধকারেই আকাশে একটি নূতন জন্ম তারকা দেখা দিবে।

ক্লিষ্টস্বরে সুলতা বলিল 'সুধা ভাই, মাকে বল ওঁর কাছে লোক যাক্।'

সুধা বলিল, 'দাদার আসবার সময় হয়েছে, এক্ষুনি এসে পড়বে।'

সুলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বাড়াবাড়ি করিতে লজ্জা বোধ হয় কিন্তু কি করিয়াই বা চুপচাপ থাকা যায়? ছেলের চেয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকাটাই তাহার কাছে অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই কথাটা ইহাদের সে বোঝায় কেমন করিয়া?

খানিক পরেই সুলতা আবার বলিল 'কিন্তু আপিস থেকে ও যদি কোথাও চলে যায় ভাই? কোন বন্ধু যদি বায়স্কোপে ধরে নিয়ে যায়? কি হবে তাহলে?'

মৃণ্ময়ী সারা দুপুর বার বার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে। সুলতার এ কথাটা সে শুনিতে পাইল। উঁকি দিয়া বলিল 'কি আর হবে তা হোলে, পৃথিবী রসাতলে যাবে! সে পুরুষ মানুষ এসে তোমার কাছে কি কর্‌বে শুনি? আমরাও ছেলে বিইয়েছি বৌ, এমন বেহায়াপনা কখনও করিনি!'

সে অতীত কথা। মনে হয়, এ জন্মে বোধ হয় ঘটে নাই। কী যন্ত্রণার মধ্যেও বাহিরে স্বামীর অস্থির পাদচালনার বিষয়ে সচেতন হইয়া ছিল আজ তাহা অস্পষ্ট মনে পড়ে মাত্র।

সেই খোকা আজ নাই, সেই স্বামী আর খবর নেয় না। অস্পষ্ট ভাবেও সেই শীতের রাত্রির কথা যে স্মরণ আছে ইহাই যেন আশ্চর্য্য। হয় ত আজ রাত্রে আর অস্পষ্ট থাকিবে না,—কে বলিতে পারে? বৌ যখন ব্যথায় কাতরাইতে আরম্ভ করিবে তাহার চিত্তেও হয় ত অচেতনার স্পর্শ লাগিবে, বুকের মধ্যে চঞ্চল পদে একজন হাঁটিয়া বেড়াইবে, বিনিদ্র রজনী আর পোহাইতে চাহিবে না।

মৃণ্ময়ীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার পা দুটি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রোয়াকে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল আজ রাত্রিটা

কোথাও কাটাইয়া আসা যায় না? পাড়ার কাহারো বাড়ীতে হোক, ভবানীপুরে পিসিমার বাড়ীতে হোক, এবাড়ীর সমারোহের সংবাদ যেখানে আজ পৌঁছিবে না?

ছোটবাড়ী, অন্দরের গা ঘেঁষা বৈঠকখানা। ভিতরের দিকে দরজায় একটি মুখ উঁকি দিতেছিল, মৃণ্ময়ীকে চাহিতে দেখিয়া চাপা গলায় বলিল 'বিকুদা বাড়ী আছে?'

মৃণ্ময়ী তীব্রকণ্ঠে বলিল 'যান্, যান আপনি। চাষা।'

এতক্ষণ অবধি ছাদে রোদের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুখে কালিমার ছাপ পড়িয়াছিল, আরও একটু কালো হইয়া মুখখানা সরিয়া গেল। মৃণ্ময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া দোতালায় গেল,—কপালে সিঁদুর পরিতে। সিঁদুরের ফোঁটার অভাবে তাহার কপাল স্নুর স্নুর করিতেছিল। কপালই বটে! সাদা হাড়ের উপরে খানিকটা টান করা সাদা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সিঁদুরের টিপ পড়িয়া মৃণ্ময়ী আয়নায় মুখ দেখিল। মনে হইল কপালটা তাহার এমনি সাদা যে লাল সিঁদুরের চেয়ে কালো কাজলের ফোঁটা হইলেই যেন মানাইত ভাল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র পাচু টের পাইল বাড়ীর আবহাওয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। বারান্দায় ষ্টোভ জ্বলে নাই, বৈকালিক জলযোগের কোন আয়োজন দেখা যায় না। একটা চাপা চাঞ্চল্য যেন চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া আছে, প্রাইজ বিতরনের দিনে স্কুলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিবার আগে যেমন হয়, তেমনি। পশ্চিমের ছোট অন্ধকার ঘরখানা ইতিপূর্ব্বে একদিন পরিষ্কার করা হইয়াছিল, এই অবেলায় দিদিমা আবার সে ঘরের মেঝে পুছিতেছেন, দিদিমার মুখের ভাব অন্ধকার ঘরখানার মতই সন্দেহ-জনক। বড়মাসীর মুখের রূক্ষতা যেন বাড়িয়াছে, ছোটমাসী বসিয়া আছে মামীর শিয়রে।

কি শিথিল অবসন্ন মামীমার পা গুটাইয়া শুইবার ভঙ্গি! কাহাকেও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না। পাঁচু মুহূর্ত্তমধ্যে সব বুঝিতে পারিল। বইখাতা হাতে বিস্ফারিত চোখে সে স্থলতার দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তেজনায় তাহার ছোট বুকখানির মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। ঘরে সে ঢুকিতে পরিল না। চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার ক্ষমতা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সুধা বলিল 'কিরে পাঁচু?'

পাঁচু সলজ্জ হাসিয়া সরিয়া গেল। বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিয়া পাইল না কোন দিকে যাইবে, এ বাড়ীর কোন ঘরে আজ তাহার কি প্রয়োজন।

মার জন্য পাঁচুর আজ সহসা বড় কষ্ট হইতে লাগিল, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। তাহার মা থাকিলে মামীমা তাহাকে এমনভাবে শাস্তি দিতে পারিত না।

দাইএর কাছে খবর গিয়াছিল একটা কাপড়ের পুঁটলি হাতে পান চিবাইতে চিবাইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণের মোটা কাপড়খানা তাহার যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধ। তা, কাজটাও তাহার অতিশয় নোংরা বৈকি!

হাতে মুখে সে অনেকগুলি উল্কির ছবি আকাইয়াছে, গায়ের রঙ এতকালো যে আর একটু কালো হইলে উল্কিগুলি দেখা যাইত কি না সন্দেহ।

কোনদিকে দৃক্পাত নাই, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিতে করিতে তাহার প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। আসিয়াই হাঁকিল, 'গিন্নিমা কুথায় গো?'

মা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন।

দাই বলিল 'এস্‌লাম তো গিন্নিমা, উদিকে যে আবার ফ্যাকড়া বাঁধল।'

মা শঙ্কিতা হইয়া বলিলেন, 'কি আবার ফ্যাকড়া বাঁধল বাছা?'

'হোই ও পাড়ার ভূষণবাবুর মেয়েরও আজ ব্যথা উঠেছে। আমার হাত ধরে কি টানাটানিই না করলে!—দত্তমশায় নিজে, লজ্জায় মরি গিন্নিমা। বললে, তুমি থাকলে বুকে ভরসা পাই রাখীর মা, ভালয় ভালয় খালাস করে দাও পঁচিশ টাকা নগদ আর তোমার যা রোজ বাঁধা আছে দু'টাকা করে—'

একটু নিরুপায় হাসি হাসিয়া দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাই মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন 'ওইতো বাছা তোমাদের দোষ। একেবারে শেষ সময়ে মোচড় দিয়ে পাওনা বাড়িয়ে নিতে চাও। দেনা পাওনার কথা তোমার সঙ্গে তো হয়েই আছে কবে থেকে?'

দাই বলিল 'কথা হয়ে থাকলেই কি গরীবের চলে মা! যেখানে দুটাকা বেশী মিলবে আমাদের সেইখেনেই নাগতে হবে।'

মার সাংসারিক অভিজ্ঞতাও কম নয়, বলিলেন 'তবে তুমি সেইখানেই যাও বাপু, আমরা অন্য লোক দেখছি। সিধুর বোনকে বলা আছে, ডাকলেই আসবে।'

শুনিয়া ঘরে সুলতার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। এমন বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিবে, বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, ছেলের বৌ বাঁচিবে কি মরিবে ঠিক নাই, শাশুড়ী তুচ্ছ কটা টাকার জন্য এমন করিতেছেন! যে টাকা তারই স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করে! প্রথমেই পাওনা নিয়া গোল বাঁধিলে দাই কি আর মন দিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিবে? আর্থিক ক্ষতির প্রতিশোধটা দাই যদি তার উপরেই নেয়?

সুলতার মনে হইল, পরমাত্মীয়ের মৃত্যুকালে এ যেন জীবনের মূল্য নিয়া ধন্বন্তরির সঙ্গে দর কষাকষি করা!

মনে মনে সে স্থির করিয়া ফেলিল দাইকে এক সময় চুপি চুপি জানাইয়া দিবে, টাকার ব্যাপারে তাহার কোন দোষ নাই। দাই যত টাকা চায় সুলতা গোপনে তাহার হাতে দিবে, সে যেন তাহার সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করিতে কৃপণতা না করে, এবারের মত সে যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। ভবিষ্যতে—

স্বামীর পায়ে ধরিয়া সে কাঁদিবে, কিন্তু মা আর মরিয়া গেলেও হইবে না।

বায়স্কোপ নয়, বিকাশ খেলা দেখিতে গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিতে তাহার সাতটা বাজিয়া গেল।

কালও যে খেলা দেখিয়া এমনি সময়ে সে বাড়ী ফিরিয়াছিল সে কথা বিকাশের মনে পড়িল না, বিশেষ করিয়া আজিকার দিনটিতে দেরী করার জন্য মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিরক্তি গোপন করিবার কোন চেষ্টাই সে করিল না।

'আমায় একটা খবর পাঠাতে পারলে না কেউ? কি যে সব ব্যবস্থা তোমাদের!'

মা বলিলেন 'খবর পাঠাবার যখন দরকার হ'ল বাবা, তোর ছুটির সময় হয়েছে। কোথায় তোকে খুঁজে বেড়াত?'

বিকাশ যেন এই কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিল!

মা আবার বলিলেন 'এই তো গেল আঁতুরে, এখনো কিছুই নয়।'

বিকাশ জামা কাপড় ছাড়িল না, বিরস মুখে জল চৌকীতে বসিয়া রহিল। এখনো কিছুই নয় সত্য, কিন্তু তাহার দুঃখ অন্য কারণে। সুলতার সঙ্গে একটা কথা বলিবার সুযোগও তাহার হইল না এমন ক্ষতি এ জীবনে আর সম্ভব নয়। ও ঘরে ঢুকিবার আগে তাহার নিকট হইতে শেষ সাহস শেষ স্বান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়া নিবার কি অধীর ভাবেই না জানি সুলতা প্রতীক্ষা করিয়া ছিল! তাহাকে এতখানি প্রয়োজন আর কোনদিন একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত্তের জন্যও কি সুলতার হইবে!

সুলতার নির্ভরশীলতার চরম অভিব্যক্তি অগোচরে ব্যর্থ হইয়া গেল ভাবিয়া বিকাশের ক্ষোভের সীমা রহিল না।

ও ঘর হইতে সুলতা বাহির হইবে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া, সন্তানের জননী এই পরিচয়ের কাছে তাহার প্রিয়া ও পত্নী সংজ্ঞা তুচ্ছ হইয়া যাইবে। যাক্, তাহা অপ্রিয় নয়, কিন্তু এই মহেন্দ্রক্ষণ সন্নিকট হইলে প্রিয়ার বিবর্ণ কপোলে যে ক্ষুদ্র একটি চুম্বন দেওয়া হয় নাই সে আপশোষ এ জীবনে আর ঘুচিবে না।

সুধাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বিকাশ বলিল 'বৌদিকে বলগে আমি এসেছি।' সুধা আঁতুর ঘরে ঢুকিল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল 'বৌদি জানে।'

জানে! কেমন করিয়া জানিল? সে জোরে কথা বলে নাই, শব্দ করিয়া হাঁটে নাই, তবু খবর পৌছিল? বিকাশ চাহিয়া দেখিল ঘরে কি আলো জ্বালা হইয়াছে জানালাটা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া আলো হয় নাই। আলোর কার্পণ্যে তাহার রাগ হইয়া গেল। সে ভাবিল, আদ্ধ আধঘণ্টার মধ্যে ও ঘর যদি ইহারা ভাল ভাবে আলোকিত না করে সে নিজে ডে লাইট ভাড়া করিয়া আনিবে।

'ভেতরে কে আছে রে সুধা?'

'মা, ও বাড়ীর পিসীমা আর দাই।'

'মিনু?'

'দিদির শরীর ভাল নয়, শুয়েছে।'

বিকাশের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ শুভ নয়। মৃণ্ময়ীকে সে ভালবাসে, তাহার জীবন সবদিক দিয়া ব্যর্থ হইবার পর করুণার রসে সে মমতা বাড়িয়াই গিয়াছিল। সুলতার সন্তান-সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পাইবার পর তাহার মধ্যে যে ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল অন্য কাহারো কাছে ধরা না পড়িলেও তাহা বিকাশের চোখ এড়ায় নাই। আজ হঠাৎ মৃণ্ময়ীর শরীর খারাপ হওয়ার সবটুকু ইতিহাস অনুমান করিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। সুলতার শুভকর বিপদে একি অমঙ্গলের ছায়াপাত!

জুতা খুলিয়া বিকাশ বারান্দার একপাশে রাখিয়া দিল। জামা খুলিয়া কলতলায় মুখহাত ধুইয়া আবার জল চৌকীটাতেই বসিল। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে। তামাকের তৃষ্ণাও যেন ক্ষুধার মতই অবুঝ। আপিস যাওয়ার সময় সুলতাকে সে নারকেল কোরাইতে দেখিয়া গিয়াছিল। তক্তি টক্তি কিছু করিতে পারিয়াছিল কিনা কে জানে! করিয়া থাকিলেও চাহিয়া খাইতে বিকাশের ইচ্ছা হইল না। ক্ষুধার জ্বালা সামান্য, সুলতা অমন কষ্ট পাইতেছে সামান্য ক্ষুধার জন্য সে ব্যস্ত হইবে? সুলতার যন্ত্রনা তাহার খাওয়া না খাওয়ার উপর নির্ভর করে না খাওয়ার স্বপক্ষে এ ছাড়া আর কি যুক্তিই বা আছে!

রান্নার ভারটা এবেলা সুধার উপরেই পড়িয়াছিল। মুখ তাহার গম্ভীর ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত। একটা বাটিতে মুড়ি আর কয়েকটা নারকেল সন্দেশ আনিয়া সে দাদার হাতে দিল, তামাকও সাজিয়া আনিল। তার পর অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল 'বৌদিকে একবার দেখবে দাদা? সারাক্ষণ তোমায় খুঁজছিল।'

বলিতে বলিতে দাদার প্রতি উচ্ছ্বসিত মমতায় কচি মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বিকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল 'থাক।'

'আচ্ছা।' বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সুধা চোখ মুছিতে লাগিল।

দাদার দুঃখ এ বাড়ীতে তাহার চেয়ে কে ভাল করিয়া বোঝে! সারাদিন খায় নাই, কিন্তু কেমন অনিচ্ছার সঙ্গে দাদা মুখে খাবার তুলিতেছিল? হুঁকা হাতে নিয়া কতক্ষণ টান দিতে খেয়াল থাকে নাই? সমবেদনায় সুধার বুক ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ডালে কাঁটা দিতে দিতে মুখ চোখ বিকৃত করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া সে উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ ঠেকাইয়া রাখিল। মনোবৃত্তির এমন ভয়ানক বিপর্যয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে আর দেখা দেয় নাই। প্রথমে এতটা হয় নাই, দাদার ম্লান মুখ ও ছলছল চোখ দেখা অবধি সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে তামাক টানিতে টানিতে চারিদিকে চাহিয়া বিকাশ ক্রমাগতই মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল। এই সময়টির যে কল্পনা সে মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল তার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। সে রকম ছুটাছুটি হাঁকা-হাঁকি হইতেছে কই? সমস্তই ধীর মন্থর গতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে। পুরাতন কাপড় নিতে আসিয়া মা পরম নিশ্চিন্ত মনেই যেন চাকরকে জিনিষের ফর্দ্দ লিখিয়া পয়সা বুঝাইয়া দিলেন, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোসগিন্নির সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করিলেন, রান্না সম্বন্ধে সুধাকে কয়েকটা উপদেশও দিলেন। মৃণ্ময়ী উপরে শুইয়া আছে, পাঁচু বোধ হয় তার ছোট আলোটি জ্বালিয়া অঙ্ক কষিতে বসিয়া গিয়াছে, বেচারীর হাফইয়ারলি পরীক্ষা আসন্ন। আঁতুরের দিক হইতে কাঠকয়লা পুড়িবার একটা গাঢ় গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। দাইএর অবিশ্রান্ত বকুনি ও মাঝে মাঝে সুলতার মৃদু কাতরাণি ছাড়া ও ঘরে শব্দ নাই চাঞ্চল্য নাই।

অথচ একি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার! পুরা দশটি মাস ধরিয়া বিধাতা স্বয়ং যে ক্লাইম্যাক্সের আয়োজন করিয়াছেন এই কি তাহার উপযুক্ত সমারোহ? বিধাতার খেলায় তাড়াহুড়া নাই বলিয়াই কি সকলে চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া আছে?

এই চিন্তার শেষটা নিয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে যাহা ঘটিবার ধীরে সুস্থে তাহা ঘটিবেই একথা মানিয়া নেওয়ার মধ্যে যে কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য আছে বিকাশ নিজেও সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বিকাশের মনে হইল তাহার দুশ্চিন্তা ও সুলতার যন্ত্রণা যে অশেষ নয় এই কথাটাই সে বাড়ীতে পা দেওয়া অবধি

স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাত বারোটা একটার মধ্যে সব চুকিয়া যাইবে আশা করা যায়। যত কষ্টই পাক সুলতা বারোটা একটা তো একসময় বাজিবেই আজ! সাতাশ বৎসর ধরিয়া তাহার জীবনে সংখ্যাহীন রাত্রি পোহাইয়াছে আজিকার রাত্রিও পোহাইবে বৈকি!

আগামীকল্যের যে সূর্য্যালোকে সে সন্তানের মুখ দেখিবে, সে সূর্য্যকে মাটির পৃথিবী কয়েক ঘণ্টার জন্য আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

জোরে জোরে হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া বিকাশ জামাটা তুলিয়া নিয়া দোতালায় গেল। নিজের ঘরে পা দিয়াই তাহার চমক লাগিল। এখানেও কে যেন অস্ফুটস্বরে কাঁদিতেছে।

ঘরের মেঝেতে আলোটা কমানো ছিল বাড়াইয়া দিয়া ঠাহর করিয়া বিকাশ দেখিতে পাইল, একটা বালিশ আঁকড়াইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া পাঁচু থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এবং মাঝে মাঝে অস্ফুট শব্দ করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার পিঠে হাত দিয়া বিকাশ বলিল, 'তোর আবার কি হলরে পাঁচু?'

পাঁচু তৎক্ষণাৎ মামাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল, বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিক তাকাইয়া বলিল 'ভয় করছে মামা।'

'কেন, ভয় করছে কেন? যা ভয়ের কিছু নেই।'

পাঁচু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে 'একটা শাকচুন্নী ছাদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চুল বাঁধছিল একটা ভূত এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।'

ছেলেটা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, ভয় সে সত্যই পাইয়াছে, কিন্তু কারণটা বিকাশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। খোলা জানালা দিয়া ছাদের খানিকটা দেখা যায়, অল্প অল্প জ্যোস্নায় মন্দ আলো হয় নাই। ওই ছাদে কিসের উপলক্ষে আজ শাকচুন্নীর আবির্ভাব হইল, তাহার চুল বাঁধা দেখিতে ভূতই বা আসিল কোথা হইতে? কিন্তু যে কারণেই ভয় পাইয়া থাক পাঁচুর ভয় ভাঙ্গানো দরকার।

'তুই ছায়া দেখেছিস পাঁচু। চল্ দেখবি, ছাদে কিছু নেই।'

পাঁচু সভয়ে বলিল 'না মামা!' কিন্তু বিকাশ তাহা শুনিল না, পাঁচুকে শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছাদের দিকে চলিতে চলিতে হাসিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে যাচ্ছিস, তোর ভয় কিরে? ভূতের আমি কাণ মলে দেব।'

ছাতে গিয়া দেখা গেল শাকচুন্নীর কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। চুল এলাইয়া দিয়া মৃণ্ময়ী অসম্বৃত বেশে ছাতের আলিসার সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে। পায়ের শব্দেও সে মুখ তুলিল না।

'তুই যে এখানে মিনু?'

মৃণ্ময়ী কলহের সুরে বলিল 'কেন এখানে কি আমার থাকতে নেই নাকি?'

বিকাশ বলিল 'মিথ্যে চটিস্ কেন? পাঁচু বড় ভয় পেয়েছে। মাথা ধরা কমাতে তুই ছাতে বেড়াচ্ছিলি, ও মনে করলে আমাদের বাড়ীতে আজ একটা শাকচুন্নীই বা এলো। যে ফর্সা কাপড় তুই পরিস্!'

মিনু ঝাঁঝালো সুরে বলিল 'এবার থেকে ময়লা কাপড় পরব। ধোপার পয়সা দিতে তোমার কষ্ট হয় জানতাম না দাদা।'

বিকাশ অবাক হইয়া গেল। মৃণ্ময়ীর মেজাজ সব সময় ভাল থাকে না, কিন্তু এ ভাবে কলহ করাও তাহার স্বভাব নয়। তথাপি সকৌতুকে হাসিয়াই বিকাশ বলিল 'হয়ই ত কষ্ট। তোর জন্য একটা পয়সা খরচ করতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তোর ভূতটা কইরে?'

মৃণ্ময়ী চমকাইয়া উঠিল 'ভূত! ভূত কি?'

'পাঁচু দেখেছে। তুই বেড়াচ্ছিলি, একটা ভূত এসে তোকে জড়িয়ে ধরল।'

মৃণ্ময়ী হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল 'তুই দেখেছিস পাঁচু? মিথ্যেবাদী হারামজাদা, দেখেছিস্ তুই।'

চাঁদের আলোয় তাহার গালে জলের দাগ চকচক করে, চোখ যেন পাগল মেয়ের রাগকরা চোখ। মনে হয়, পাঁচুকে সে আঘাত করিবে। কিন্তু হঠাৎ সে সুর বদলাইল।

'ওটাকে ভূত মনে করেছিল বোধ হয়।'

মৃণ্ময়ী নিজের ছায়াটি দেখাইয়া দিল। একটি হ্রস্ব বাহু নাড়াইয়া ছায়াও তাহার কথায় সায় দিল।

পাঁচুকে নীচে নামাইয়া দিয়া বিকাশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃণ্ময়ী প্রশ্ন করিল "কি ভাবছ শুনি?"

'ভাবছি পাঁচু কেন ভয় পেল। তোকে তো ও কতদিন অন্ধকার ছাতে ঘুরতে দেখেছে, আর আজ এমন জ্যোস্না। এও কি সুলতার দোষ রে?'

মৃণ্ময়ী শুষ্কস্বরে বলিল 'তা ছাড়া কি?'

বিকাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'চল্ মিনু, আমরা নীচে যাই।'

'নীচে গিয়ে কি করব? তোমার বৌ-এর সেবা?'

'করলে কি তোর পাপ হবে? বড় নির্লজ্জ তুই। বড় ছোট মন তোর।'

এমন কঠিন কথা দাদার কাছে মৃণ্ময়ী জীবনে আর শোনে নাই। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

'বৌকে আমি হিংসা করি না দাদা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি একটুও হিংসা করি না।' বিকাশ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না, সংক্ষেপে শুধু বলিল 'তা জানি। চল নীচে।'

রাত নটায় সুলতা চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, থামিল এগারটার সময়; একেবারে অজ্ঞান হইয়া। বিকাশ সভয়ে বলিল 'একি হ'ল? মরে গেল নাকি ডাক্তার বাবু?'

ডাক্তার বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, বলিলেন 'যান মশাই, আপনি রাস্তায় যান।' বিকাশ মিনতি করিয়া বলিল 'আপনি আর একবার দেখে আসুন ডাক্তার বাবু। এমন আচমকা চুপ করে গেল, আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।'

ডাক্তার উঠিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিলেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই, সুলতা শুধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

'অজ্ঞান!'

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'আচ্ছা পাগলতো আপনি! আপনার জন্য দরকার মত উনি অজ্ঞানও হতে পারবেন না?'

বিকাশ ছটফট করিতেছিল, এবার বসিল। কোলাহল সমারোহ নাই বলিয়া সন্ধ্যায় সে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন আর ও বিষয়ে নালিশ করিবার কিছু নাই। সুলতা একাই সমারোহের সীমা রাখে নাই।

সমস্ত বাড়ীটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুলতা হয়ত আর শব্দ করিবে না, এ স্তব্ধতা ভাঙ্গিবে একেবারে শঙ্খধ্বনিতে,—যদি ছেলে হয়। শাঁখ সম্ভবতঃ মৃণ্ময়ীই বাজাইবে। শঙ্খ হাতে সেই যে সে প্রহরীর মত আঁতুরের দরজায় বসিয়াছিল, একবারও সেখান হইতে নড়ে নাই।

ভীত পাঁচুর সঙ্গে সুধাকেও শুইতে হইয়াছিল, তাহারা দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাঢ় অবসাদের গাঢ় ঘুম, কাল সকালের আগে টানিয়া তুলিলেও তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিবে না। সুস্থ সানন্দ-চিত্তে কাল তাহারা নবাগতকে দেখিবে। কিন্তু আজিকার অভিজ্ঞতা তাহারা ভুলিবে না কোনদিন। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে খাপ খাইতে হয়ত ক্রমাগত রূপান্তর নিবে, কিন্তু কখনো বিস্মৃতিতে তলাইয়া যাইবে না।

হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া বিকাশ ভাবিতে লাগিল, সমস্ত জীবন মানুষ দুঃখ ভোগ করে রোগে শোকে কষ্ট পায় কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তাহার জন্মগ্রহণ। কিন্তু কেন? এই অনাবশ্যক বীভৎসতার মধ্য দিয়া কে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায়?

খোকা আসিবে আসুক, কিন্তু এযে বর্গী আসারও বাড়া!

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়



কবি-সাথী

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌

১

বৈশাখ রাত,—বসে আছি বাতায়নে
আমরা দুজন, কত কথা মনে মনে!
দখিনা মলয় বহিছে ছাদের পরে,
প্রিয়া মোর কহে বাহুটি আমার ধরে,
"হে মোর পরাণ-প্রিয়,
ঘুমায়ে পড়িলে আমারে জাগায়ে দিও।"

২

ঘন-ঘোর ভরা সেদিন বাদল সাঁঝে,
ঝম্‌ঝমাঝম্‌ বাহিরে মাদল বাজে;
বড় মিঠা শীত লাগিছে দোঁহার গায়ে,
কাছটি ঘেঁসিয়া প্রিয়া মোর বসে তাহে।
"হে মোর পরাণ-প্রিয়,
ঘুমায়ে পড়িলে আমারে জাগায়ে দিও।"

৩

শরতের রাত,—জ্যোৎস্না উঠিছে ফুটি'
দোর জানালায় জ্যোৎস্না পড়িছে লুটি,
ঘরের মেঝেতে ছড়ানো রজত ধূলি,
প্রিয়া মোর কহে আঁখি দুটি তার তুলি,
"হে মোর পরাণ-প্রিয়,
দুপুর নিশীথে আমারে জাগায়ে দিও।"

৪

হিমের খবর এসেছে ধরার কোলে,
দেখিতে দেখিতে বেলা যেন যায় চলে';
জ্যোছনা মলিন নীহারিকা জল্‌সাতে,
প্রিয়া মোর কহে ঘুম-মাখা আঁখি-পাতে,
"হে মোর পরাণ-প্রিয়,
গভীর নিশীথে আমারে জাগায়ে দিও।"

৫

কন্‌ কন শীত, শব্দ নাহিক তিল,
থম্‌ থম রাত, দুয়ারে লাগানো খিল;
লেপের ভিতরে আমরা দুজনে শুয়ে
প্রিয়া মোর কহে বুক পরে বুক থুয়ে,
"হে মোর পরাণ-প্রিয়,
ঘুমায়ে পড়িলে আমারে জাগায়ে দিও।"

৬

চৈতালি রাত—মল্লিকা যূথী সাথী,
সুরভি-মাতাল, করে তারা মাতামাতি;
পিক্‌ মুহু মুহু কুহু কুহু ওঠে ডাকি
প্রিয়া মোর কহে বক্ষে কপোল রাখি,
"হে মোর পরাণ-প্রিয়,
ঘুমায়ে পড়িলে আমারে জাগায়ে দিও"

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

প্রভাত-কথা

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

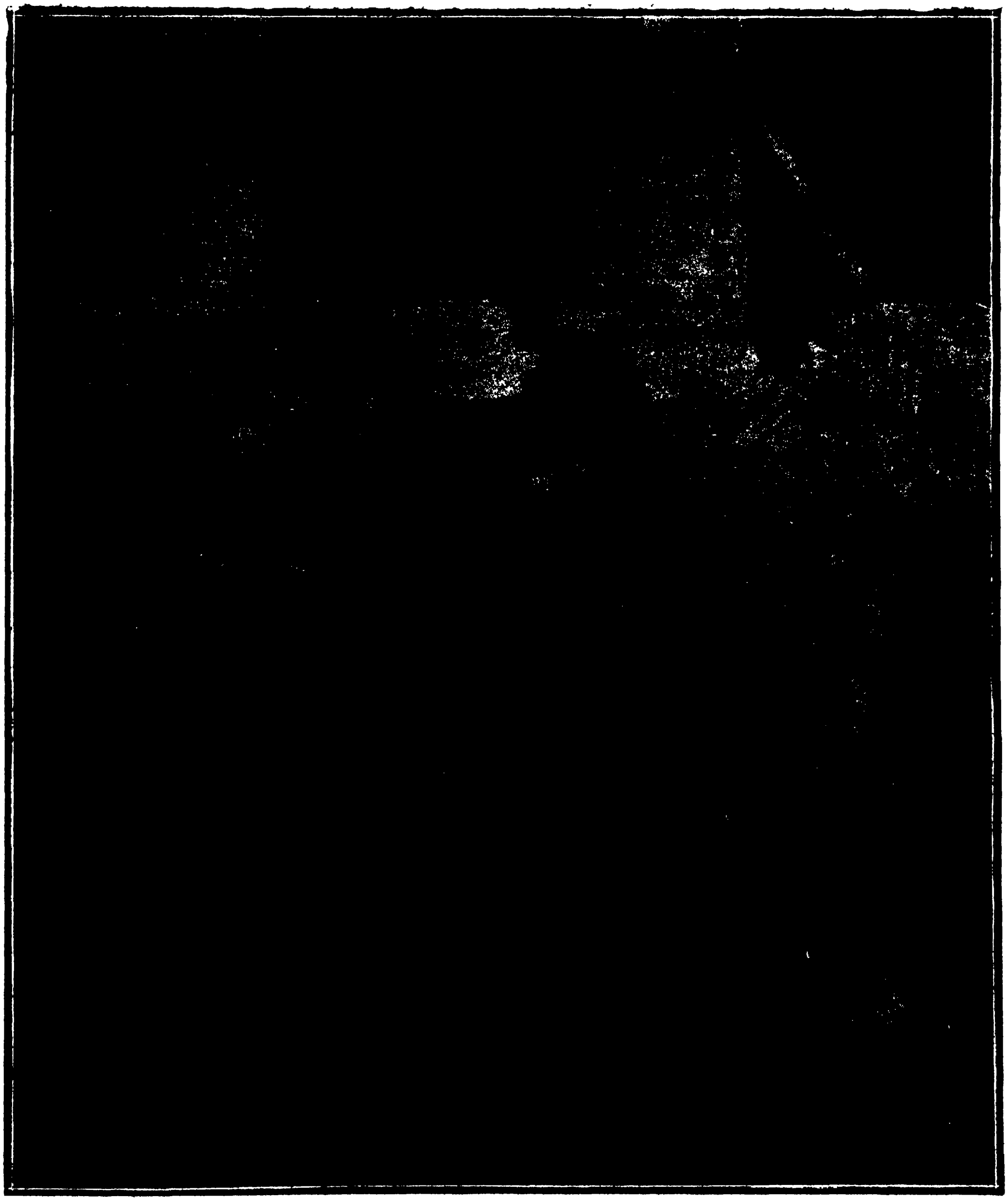
সুপ্রসিদ্ধ কথা সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। ছোট গল্প রচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন যদিও তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বড় উপান্যাস রচনার উপযোগী ছিল বলিয়া মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের এক একটা দিক নিখুঁতভাবে প্রকটিত করিয়া দেখাইতে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদের সাহিত্যে কেবল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যেই দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এই দুইজন শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক হইতেও অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁহার গল্প লেখার ভঙ্গীটি ছিল সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। এবং যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার লেখায় অনুকরণের লেশমাত্র কখনও লক্ষিত হয় নাই। জটিল মনস্তত্ত্বমূলক বা কাব্য-রসাত্মক ভঙ্গী তাঁহার মোটেই ছিল না। কিংবা কথা সাহিত্যের দ্বারা সমাজে নূতন ভাব বা আদর্শ প্রচার করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। একটা সুন্দর সংযত নির্ম্মল হাস্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকে তাঁহার অধিকাংশ রচনা উদ্ভাসিত। ফলে তাঁহার লেখা সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার গল্পগুলি এক একটি অনাবিল আনন্দের প্রস্রবণ। এইখানেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের চরম সার্থকতা তিনি লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া প্রভাতবাবু যে উদ্দেশ্যমূলক কিছুই কখনও লেখেন নাই তাহা ঠিক বলা চলে না কিন্তু তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কলাকুশলী। তাঁহার শিল্প চাতুর্য্যে উদ্দেশ্যটি প্রায়ই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার 'প্রত্যাবর্ত্তন' গল্পটির উল্লেখ করিতে পারা যায়। গল্পের নায়ক তথাকথিত নীচজাতিভুক্ত। উচ্চ জাতির অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। কিন্তু এই নব ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াও সে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় এবং পরিশেষে সে কিরূপে আবার হিন্দু-সমাজের গণ্ডীর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাই অতি নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গল্পটি যখন প্রবাসী পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়া উক্ত পত্রের পরবর্ত্তী সংখ্যায় 'ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর' এই নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

একাধিক গল্পে তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে। স্বদেশী যুগের নির্য্যাতিত দেশ-সেবকের দুঃখের কাহিনী কোন কোন গল্পের আখ্যানবস্তু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে যে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় বাঙ্গলা দেশ যখন ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল তখন প্রভাত বাবু রংপুরে প্র্যাক্‌টিস করিতেছিলেন। সেই সময়ে একদিন খবরের কাগজে পড়া গেল যে রংপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্পেশাল কনষ্টেবল নিযুক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রভাতবাবুর নাম দেখিয়া বেশ একটু আমোদ উপভোগ করিয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বেই গল্প লেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

রংপুর হইতে তিনি গয়ায় যান। সেইখানে ১৯১৩ সালে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই প্রথম আলাপের সময় তিনি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের যে ইতিহাস আমার নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমি শ্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'সঙ্কল্প' পত্রিকায় প্রকাশ করি। এইখানে তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সেই সময়ে 'লেডী ডাক্তার' নামে প্রভাতবাবুর একটি



পিছনে দাঁড়াইয়া—শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

চেয়ারে বসিয়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিম্নে বসিয়া—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগ্‌চী, সত্যেন দত্ত।

[খেয়ালীর সৌজন্যে]

গল্প 'মানসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গল্পটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। আমি বলিলাম, 'লেডী ডাক্তার' পড়িয়া কেহ কেহ ইহাতে প্রকৃত ঘটনার ছায়া আছে বলিয়া অনুমান করিতেছেন। তাহা কি সত্য?'

প্রভাতবাবু বলিলেন 'না—তাহা সত্য নহে। আমার গল্পগুলিতে প্রকৃত ঘটনার ছায়া খুব কমই থাকে। আর যদিও কোন কোনটিতে থাকে তাহা দু'আনা রকমের, বাকী চৌদ্দ আনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। লোকে কিন্তু তাহা অনেক সময়ে বিশ্বাস করিতে যে প্রস্তুত নয় তাহা আমি বুঝিতে পারি। আমার প্রথম বয়সের লেখা গল্প 'ভুল ভাঙ্গা' যখন 'ভারতী'তে বাহির হয়, তখন তাহাতে আমার নাম ছিল না—সে বৎসর ভারতীর কোন প্রবন্ধের নিম্নেই লেখকের নাম থাকিত না। আমি অনেককাল জামালপুরে ছিলাম, কাজেই ঐ গল্পে জামালপুরের যে চিত্র দিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় অপ্রকৃত হয় নাই। কিন্তু গল্পটি ছিল আগাগোড়া কাল্পনিক। জামালপুরের অনেকেরই কিন্তু ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ঘটনাটা সত্য। আর একটা বড় কৌতুককর ব্যাপার হইয়াছিল। 'ঘোড়ানিম' বলিয়া একরকম গাছ আছে তাহা বোধ হয় আপনি জানেন। আমার এই গল্পের বিষয়ীভূত গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে একটি ঘোড়ানিমের গাছ আছে এইরূপ আমি লিখি। এখন মুদ্রাকরের অনুগ্রহে ঘোড়ানিম যোড়ানিমএ রূপান্তরিত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। যাঁহারা গল্পটি সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাঁহারা জামালপুরের কোন্ বাঙ্গালীর বাড়ীর সম্মুখে দুইটি নিমগাছ তাহার অনুসন্ধানে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। 'মাতৃহীন' নামক গল্পটাও অনেকে সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এমন কি গল্পের নায়কের পিতা প্রবীণ ব্যারিষ্টারটি কে তাহা লইয়া বারলাইব্রেরিতে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সত্য ঘটনার সহিত এ গল্পেরও কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল 'আদরিণী' নামে গল্পটির চৌদ্দ আনা সত্য।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'ভুলভাঙ্গা'ই কি আপনার প্রথম গল্প?'

প্রভাতবাবু বলিলেন 'না, ইহা ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে বাহির হয়। প্রথম বৎসরের 'প্রদীপে' ১৩০৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি' সর্ব্বপ্রথমে লিখিত ও প্রকাশিত। কিন্তু তখন আমি ছিলাম 'কবি'। সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়া শ্রীরাধামণি দেবী এই কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম। এই নামটির একটু ইতিহাস আছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসরে কুন্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল পূজার চিঠি,—স্ত্রী যেন প্রবাসী স্বামীকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিতেছে, আর এটা ওটা জিনিসের সহিত এক শিশি কুন্তলীন আনিতেও অনুরোধ করিতেছে—এইরূপ পত্র রচনা করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামিতে আমি একখানি পত্র রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং উহাই প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ঐ নামটির উপর কেমন মায়া হইয়া যায়; গল্পের ছদ্ম নামস্বরূপ উহাই ব্যবহার করি। পরে কুন্তলীনেরা কেমন করিয়া জানিতে পারেন পত্রখানি আমার লেখা। সেই অবধি উঁহারা পুরস্কার ঘোষণার সময় লিখিয়াছেন, কেহ আসল নাম গোপন করিয়া ছদ্ম নাম ব্যবহার করিলে পুরস্কার পাইবেন না।'

অতঃপর অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার গল্প লেখার সূত্রপাত কিরূপে হয় তাহা বলেন। ইহার মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। তিনি যখন আমায় গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম—'কবিতার মা বাপ নাই, যা খুসী লিখিয়া যাই। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, সে পাণ্ডিত্য আমার কই?'

ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, গদ্য রচনার জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর না বাঁধিয়া, সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক, একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি। ইহার ফলে 'দাসী'তে চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাই; তাহাতে কোন নাম দিই নাই। আর, প্রদীপের জন্য ঐ গল্প রচনা করি। কিন্তু গল্পের কথা রবীন্দ্রনাথকে আমি জানাই নাই। সেই সংখ্যা 'প্রদীপ' ভারতীতে সমালোচনা করিয়া(তিনি তখন

ভারতীর সম্পাদক) আমার গল্পটির সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ভাদ্রের 'প্রদীপে' আর একটি গল্প ছাপা হইল— 'বেনামী চিঠি'—তাহাও ঐ রাধামণির বেনামীতে। রবিবাবু এবারও ভারতীতে ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন। তখনও তিনি জানেন না যে আমিই রাধামণি। দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচনা হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর প্রদীপে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়াই বাহির হইলাম। 'অঙ্গহীনা' এবং 'হিমানী' গল্প দুইটি আমার স্বাক্ষরযুক্ত হইয়াই বাহির হইল।

এক বৎসর সম্পাদকতা করিয়া রবিবাবু ভারতী ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদন আরম্ভ করিলেন। সেই বৎসর ভারতীতে 'ভুলভাঙ্গা' বাহির হইল।'

একটু থামিয়া প্রভাত বাবু বলিতে লাগিলেন, 'আমার গল্পের জন্য অনেক সময় অনেক Compliment পাইয়াছি, কিন্তু একটি Compliment কখনও ভুলিতে পারিব না। সদ্য পত্নী-বিয়োগ-বিধুর, কলেজের কোনও অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ব্যারামের সময় আমার স্ত্রী বিছানায় পড়িয়া আপনার গল্প পাঠ করিয়া রোগ যন্ত্রণা ভুলিতে চেষ্টা করিতেন। মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে নামাইবার পর বালিশের তলা হইতে আপনার গল্পযুক্ত খানকতক 'ভারতী' বাহির হইয়াছিল।'

আবার আমার গল্পের জন্য একবার এক গরীব বেচারির চাকরি গিয়াছে, এ খবরও আমি পাইয়াছি। 'বন্ধশিশু' গল্প ভারতীতে বাহির হইলে দার্জ্জিলিঙে কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী তাহা পড়িয়া এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার ছেলেমেয়ের জন্য যে লেপচা আয়াটি ছিল তাহাকে তিনি বিদায় করিয়া দেন। তাঁহার কেবল আশঙ্কা হইতে লাগিল, এই আয়া তাঁহার ছেলে-মেয়েকে খুন না করিয়া ফেলে।'

প্রসঙ্গক্রমে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথা উঠিলে প্রভাত বাবু তাঁহার নিজের কবিতা রচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সরস কাহিনীটি ব্যক্ত করেন। ১৮৯১ কিংবা ১৮৯২ সালে মাঝে মাঝে আমি গাজিপুরে যাইতাম। তখনকার দিনে আমার মনে কবি হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল। মাসিক পত্রে কবিতা ছাপাইয়া নিরীহ পাঠকগণের উপর সেকালে অনেক অত্যাচার করিয়াছি। গাজিপুরে গোলাপ ক্ষেত্র দেখিয়া একটি সনেট লিখিয়াছিলাম। প্রস্ফুটিত ক্ষেত্রের বর্ণনায় লিখিয়াছিলাম,—

'যেন হায় প্রেয়সীর প্রেমলিপিখানি
ফুটিয়াছে ভাবপুষ্প মাধুরী হিল্লোলে।'

উপমাটির নূতনত্বে সাহিত্য-জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিবার অভিসন্ধি করিতেছি, এমন সময় একদিন সদ্যপ্রাপ্ত ভারতীর মোড়ক খুলিয়া দেখি, 'গাজিপুর' নামক দেবেন্দ্র বাবুর একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার আরম্ভটি এইরূপ—

এবে গোলাপে গোলাপে ছাইয়া ফেলেছে
এ মধু কানন-দেশ;
সখি, তুমিও আসিও গোলাপী অধরে
ধরিয়া গোলাপী বেশ।

এই কবিতার পার্শ্বে আমার সনেটটি হংসের পার্শ্বে যেন বকটির মত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সুতরাং সে যাত্রা সাহিত্য-জগৎকে মার্জ্জনা করিলাম। সেটি আর কাগজে পাঠাইলাম না।'

সাহিত্য-সাধনাই ছিল প্রভাত বাবুর জীবনের একমাত্র ব্রত। এই জন্যই তিনি ব্যারিষ্টারীতে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ সেদিকে তাঁহার মন ছিল না। তাঁহার শেষ পনর বৎসর তিনি কলিকাতাবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। গয়ায় থাকিতেই তিনি মহারাজ জগদীন্দ্রনাথের সহযোগে মানসী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পরে 'মর্ম্মবাণী' নামে একখানি সাহিত্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকাও তাঁহারা বাহির করেন। এই কাগজখানি কিন্তু ছয় মাস মাত্র চলিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং অতঃপর ইহাকে মানসীর অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য করা হয়। ফলে তাহার পর হইতে মানসীর নাম হইল 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'। মানসীতে প্রভাত বাবুর অনেকগুলি গল্প ও কয়েকটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপন্যাসগুলি তাঁহার যশোবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে নাই। মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় একাধিক তাঁহার উপন্যাসের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইয়াছে

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসখানি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। বইখানি পুস্তকাকারে বাহির হইলে এই 'প্রবাসী'তেই আবার যে সমালোচনা বাহির হয় তাহা মোটেই সুখ্যাতিপূর্ণ ছিল না। এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই উপন্যাসখানির সম্বন্ধে সমালোচকের প্রধান অভিযোগ এই ছিল যে ইহাতে unity of actionএর অভাব আছে; অর্থাৎ কোন চরিত্রই কেন্দ্রগতভাব বা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ফুলের বীজ কোষের পাশে পাপড়ির মত ফুটিয়া উঠে নাই। এই দোষ তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসেই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাতবাবু বলিতেন, 'এই unity of action জিনিসটি নাটকেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ—উপন্যাসের নয়। তবে যে সকল উপন্যাস নাটক-লক্ষণাক্রান্ত, যেমন বঙ্কিমবাবুর, সেগুলিতে এই গুণ দেখা যায় বটে। কিন্তু আরও এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে—তাহা চিত্রজাতীয় বলা যাইতে পারে। ডিকেন্সের উপন্যাসগুলি ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাতে প্লটও ঘোরালো হয় না—বীজকোষ পাপড়িরও কোনও হাঙ্গামা নাই। আমার 'নবীন সন্ন্যাসী'ও সেইরূপ চিত্র-জাতীয় উপন্যাস। এক সময়ে বিলাতী সমালোচক ডিকেন্সের বিরুদ্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, প্লট ঘোরালো নয়, unity of action নাই। তাই বলিয়া মনে করিবেন না, ডিকেন্সের সহিত আমি নিজেকে তুলনা করিতেছি। এক জাতীয়ত্ব দাবী করিতেছি মাত্র—যেমন সার গুরুদাস বাঁড়ুয্যে আর ঐ রসুয়ে বামুন আর কি।' বলিয়া প্রভাতবাবু হাসিতে লাগিলেন।

প্রবন্ধান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

পরাজয়

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিদায় নেওয়া এতই যদি সহজ হবে
দুই আঁখি হায় অশ্রু-সজল কেনই তবে?
চলতে পথে পরাণ কাঁদে,
সবুজ লতায় চরণ বাঁধে
ব্যাকুল বাঁশী কেবল সাধে
করুণ রবে।
মাটির দীপে একটুখানি আলোক জেলে
আঁধার রাতে দু'হাত দিয়ে দুয়ার ঠেলে,
অভিমানের দম্ভভরে
বাহির হলেম পথের 'পরে
পরাণ তবু তারেই স্মরে
ভাবনা মেলে।
যতই ভাবি যাবই যাব এবার চলে
চিত্ত লোকের বিচিত্র এই শিসমহলে
নিত্য ফোটে পুষ্পপারা
তাহার দুটি আঁখির তারা,
লুব্ধ করে হৃদয়-কাড়া
হাজার ছলে।
সব অভিমান ধুলায় লোটে কি মন্তরে
দুই নয়নে আপনা হ'তেই অশ্রু ঝরে।
পরাণ আমার এক নিমেষে
সকল ভুলে, মধুর হেসে
আবার ফেরে তার উদ্দেশে
আসন যাহার অন্তরেরি গোপন পুরে
প্রাণ গাঁথে তার গলার মালা গানের সুরে।
সকল ক্ষণে সকল স্থলে
তাহার সনে আলাপ চলে
কানন ভরা কুসুম দলে,
তৃণাঙ্কুরে।
সবুজ শাখে ফুল ফোটানো তাহার খেলা
গগন ভরে' সিঁদুর ঢালে সাঁঝের বেলা।
আপন বুকের আঁচল খানি
নীল আকাশে দেয় সে টানি;
তার অধরের স্পর্শে জানি
রঙের মেলা।
বিদায় নেওয়া নয় গো অত সহজ নহে,
হৃদ্‌কমলের মধ্যখানে নিত্য রহে
তাহার মুখের মধুর হাসি,
তার নয়নের অশ্রুরাশি
মোহন সুরে বাজায় বাঁশি
পরাণ দহে।
জোর ক'রে তায় ভুলতে ওগো চাইনে আর
কণ্ঠ খুলে' এবার মেনে নিলেম হার।
যার অধিকার সকল স্থলে
বসুক্‌ সে প্রাণ-পদ্মদলে,
গুরুক্‌ সুরে বুকের তলে

ফেলকরা ভগবান

শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত

গগনের সহিত যে কোন লোকের যে কোনও মুহূর্ত্তে হাতাহাতি বাধিতে পারিত। গগন যে গোঁয়ার তাহা নহে,—তাহার মত নিরীহ, নির্ব্বিরোধী, সরল, উদার-হৃদয় লোক চট্ করিয়া এই কুঁচো চিংড়ির বাজার হইতে সংগ্রহ করা শক্ত। কিন্তু এক বিষয়ে তাহার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ছিল। যদি কেহ বলিত যে, সে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাহা হইলে রাগে গগনের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া যাইত। একদিন তাহাকে বলিলাম, "গগন তুমি রাগ কর বলেই ওরা তোমাকে বেশী করে' ক্ষেপায়, নইলে ওরা কি সত্যিই ওসব বলে!"

কথা শুনিয়া বিস্মিত চোখে গগন আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, পরে কহিল, "একথা নিয়েও যে রসিকতা চল্‌তে পারে তা এই প্রথম শুন্‌লাম।" ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমাদের কাছে আর কোনও জিনিষই পবিত্র নেই, তরলতার রাহুতে আমাদের সমস্ত পুণ্য চিন্তাকে গ্রাস করে' বসে আছে—"

"কথাটাকে এত প্রাধান্য দিচ্ছ কেন?"

"না, জিনিষটা বাস্তবিকই গুরুতর,—কর্ম্মব্যস্ত দিবসের শেষে কোন্ ঊর্দ্ধলোকের পানে যে চিত্তকে প্রসারিত করে' দেব, তা ভেবে পাইনে,—মাথার উপরকার নক্ষত্রলোককে গ্রহণের কালো আড়াল করে' দাঁড়িয়েছে—"

আমার বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রায়ই মজ্‌লিশ বসে, এবং গগন বলে, "ভগবান আছেন; স্থলে, জলে, গগনে, পবনে, অন্তরে-বাহিরে, অণু-পরমাণুতে, তিনি আছেন,—একথা যে স্বীকার করে না, সে নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে—" বলিয়া গগন যেন বাতাসের বিরুদ্ধে তাল ঠুকিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কেহ না থাকিলেও তাহাকে উত্তেজিত করিবার লোকের অভাব কোনদিন হয় না এবং ওকাজে অত্যন্ত অল্প আয়োজন করিলেই চলিতে পারে, কেবলমাত্র একবার বলিলেই হয়, "বল্‌শেভিক রাশ্যা বল্‌ছে—" অথবা "বাক্‌নিনের মতে—" তারপর ঘণ্টাখানেক আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না। নিজের মনেই গগন তর্কজাল রচনা করিয়া চলিবে, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি গগন নিজেই গড়িবে, নিজেই তাহা খণ্ডন করিবে এবং মিনিট খানেক পরে শুষ্ককণ্ঠে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিবে, "ভজু, দু'গেলাস জল—" জল খাইয়া গগনের স্তিমিত উৎসাহ প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে, চীৎকার করিয়া বলে, "চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, কোটি কোটি জগৎ, পৃথিবীর লক্ষ কোটি জীব, নদ নদী সাগর মহাসাগর ভূধর প্রান্তর এসবের কোনও একটা গ্রেট কজ্‌ নেই, ফার্ষ্ট ইন্‌টেলিজেণ্ট্ কজ্‌ নেই, এইটেই কি যুক্তি? এই যুক্তির বলেই কি মানুষকে যৌক্তিক জীব বলব? লর্ড বেকনের ভাষা ধার করে', তার সঙ্গে বাঙ্গালীর কায়দায় বল্‌তে পারি, ভগবানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ কর্‌বার জন্যে অলৌকিকত্বের দরকার নেই। শীতলাঠাকুর বগলে করে' যখন কোনও লোক ভয় দেখিয়ে ভিক্ষে আদায় কর্‌বার জন্যে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে ভিক্ষে না দিলে বসন্তরোগে দেহ খসে যাবে, এরকম প্রমাণ তিনি দেন না, দিলে, বেচারা আড়াই-কড়া নাস্তিকদের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটত। তাঁর সৃষ্টির প্রতি ধূলিকণাটি তাঁর পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। একটুখানি বিজ্ঞান, অত্যল্প দার্শনিকত্ব মানুষকে তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তার কাছ থেকে কদাচ দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা আবার মানুষকে তার ভগবানের কাছে ফিরিয়ে আনে।—ভন্ হলবাকের তাই হ'য়েছিল। বেচারা পুরোদস্তুরভাবে ভগবানকে অস্বীকার করে' প্রকৃতির আবাহন আরম্ভ

করলেন। তিনি বল্‌লেন, ধর্ম্ম, যুক্তি, সত্য এসব প্রকৃতির কন্যা, এরাই মানুষকে রক্ষা করবে। প্রকৃতিকে ডেকে হল্‌বাক বল্‌ছেন, সে মানুষকে শান্তির পথ দেখাবে, মানুষের মন থেকে ভ্রান্তি অপনোদন করবে, চিত্ত থেকে অন্যায় বিদূরিত কর্‌বে, যাত্রাপথের ত্রুটি সংশোধন কর্‌বে, জ্ঞানের আলোক দান কর্‌বে, আত্মাকে কর্‌বে শিব, অন্তরকে করবে নির্ম্মল।—মৃদু হেসে হল্‌বাককে জিজ্ঞাসা করা যেতে পার্‌ত, এটা কি ভগবদুপাসনার মন্ত্র নয়?—এই হল্‌বাকই অন্যত্র বল্‌ছেন, নাস্তিক হ'তে হ'লে ভাবুক হ'তে হয়, আর দরকার হয় অনেক পর্য্যবেক্ষণের এবং অনুশীলনের। আস্তিকতা সহজ,ও জিনিষ সবাই বোঝে, নাস্তিকতা সকলের জন্যে নয়, অতি অল্পসংখ্যক মনীষীদের জন্যেই এর বন্দোবস্ত। কিন্তু মজা হচ্ছে, হল্‌বাকের যুক্তির চমৎকার জবাব তিনি নিজেই। হল্‌বাক যতক্ষণ ধর্ম্মকে ভাসা ভাসা ভাবে দেখেছেন, ততক্ষণই তিনি নাস্তিক, যেখানে তিনি অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল, সেখানে তিনি আস্তিক। অত্যন্ত ইতর ব্যক্তির পক্ষেও নাস্তিকতা জলের মত সহজ, এবং নাস্তিকতার প্রসার মানেই সেইসব লোকের প্রভাববৃদ্ধি;—তার প্রমাণ দেখ্‌তে পাই, ইতিহাসে যে সব যুগকে বস্তুতান্ত্রিক যুগ বলে' আমরা জানি, সেসব যুগে এমন কিছুই ঘটে নি যা' আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কষ্ট স্বীকার করে' মনে রাখতে পারি।—পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ, তা ঘটেছে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করে'। শিল্প, কাব্য, বিজ্ঞান গড়ে' উঠেছে ধর্ম্মকে অবলম্বন করে'—" বলিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া গগন আবার বলে, "ভজু, একটু জল—"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এমনি করিয়া চীন, জাপান, রাশ্যা, হনলুলু প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতদের শ্রুত এবং অশ্রুত নানান্ দুরুচ্চার্য্য নাম এবং কাহিনী আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। সর্ব্বক্ষেত্রে যে, তাহার কথায় যুক্তির বাঁধন থাকে তাহা নয়, কিন্তু আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। যাহা আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরে পরমতম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাই, তাহা হয়ত গগন যথাযথরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার অকপটতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করি না কোনদিন, সেইজন্য তাহার কথা শুনিলে মনটা খুশীতে ভরিয়া উঠে।

সংবাদ আসিল, যতীনের মেয়েটি মারা গিয়াছে। বন্ধুর দল ভিড় করিয়া তাহার গৃহে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পাঁচ বছরের যে ফুলের কুঁড়িটি ধরণীর শ্যামচ্ছায়াতলে স্থান লইয়াছিল, রৌদ্রের তাপে তাহা ঝরিয়া পড়িল। আমাদের সকলের একান্ত স্নেহের ছিল এই শিশুটি। ছোটদের সহিত গগনের আত্মীয়তা অত্যন্ত শীঘ্র স্থাপিত হয়। জনতার মধ্য হইতেও শিশুর দল তাহাকে তাহাদের পরমাত্মীয় বলিয়া চিনিয়া লয়। যতীনের মেয়ের নামকরণ করিয়াছিল গগন,—অনুরাধা যে তাহার কত প্রিয় ছিল, তাহা আমরা জানিতাম। তাহার প্রতি আমাদের সকলের স্নেহের প্রতিযোগিতায় গগন সবাইকে টেকা দিয়াছিল। যতীনের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া গগনের দিকে চাহিলাম,—বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া গেছে, আকাশের দিকে চাহিয়া কি যে দেখিল, কে জানে। নিজের চোখ মুছিয়া, যতীনের হাত দুইটা ধরিয়া সে কহিল, "যিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টির পক্ষে কতটুকু প্রয়োজনীয় তা বেশ ভালো করেই জানেন, একথা যেন আমরা কোনদিন না ভুলি, তাঁর ন্যায়বিচার সম্বন্ধে আমাদের মনে যেন কোনদিন কোন প্রশ্ন না ওঠে—" বলিয়া নিজেকে সংবরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় গগন কাঁদিয়া ফেলিল।—

মাসখানেক পরের কথা বলিতেছি। অনুরাধার শোকে যতীন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বন্ধুবাহিনীর হাস্যপরিহাসের উপর বেদনার ছায়া গাঢ় হইয়া নামিয়াছে। হয় ত পৃথিবীতে অনুরাধার প্রয়োজন ছিল না, স্বর্গলোকের বৃহত্তর প্রয়োজনের কাছে ধরণীর ক্ষীণতর দাবীকে সেই জন্যই সম্ভবতঃ হার মানিতে হইল। গগনের স্নিগ্ধ, শান্ত ভাষা তাহাদের স্নিগ্ধতা হারায় নাই;—ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া, বেদনা-বিক্ষুব্ধ অন্তরে সে সমস্ত ঘটনাটাকে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হইল। তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল। কেবলই অনুভব করিতে লাগিলাম গগনের তুলনায় আমরা কত দুর্ব্বল! যতীনের চোখ যখন ছল্‌ছল্‌ করে, গগন তখন ব্যথিত কণ্ঠে বলে, "আমাদের চেয়ে তার কিছু বেশী বুদ্ধি আছে, একথা কি তুমি বিশ্বাস কর না?—তাঁর কাজ তিনি বেশ ভালো করেই বোঝেন, আমি শুধু এই টুকুই জানি।"

অসহায় যতীন কথা কয় না, তাহার চোখ দিয়া শুধু জল ঝরিতে থাকে।.

অফিসঅঞ্চলে গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া বৃষ্টির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিলাম। জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তিনটা ছাতা কিনিয়া প্রতি মাসে একটা করিয়া হারাইয়াছি, অথবা চুরি গিয়াছে! অবশেষে হতাশ হইয়া ছাতার চেষ্টা ছাড়িতে হইয়াছে। একটা ওয়াটার প্রুফ্ কিনিয়া লইতে পারি,—বৃষ্টি যখন ছাড়িয়া যাইবে তখনও যদি গা হইতে না খুলিয়া রাখি, তাহা হইলে খুব সম্ভব, চুরি যাইবে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার ওয়াটার-প্রুফের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কানের পাশের জুলপী তিন ইঞ্চি নামাইতে হইবে, চুরুটটাও হয়ত ধরিতে হইবে,মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া, কোঁচার প্রান্তটাকে পেখমের মত ফেলিয়া দিয়া ময়ূর বনিতে হইবে হয়ত, এবং এইসব অভ্যাস করিতে করিতে আরও গোটাতিনেক বর্ষাকাল আসিয়া এবং চলিয়া গিয়া পুরাণো হইয়া যাইবে,—অতএব ওয়াটারপ্রুফ থাক্।—গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া বৃষ্টির দিকে চাহিয়াছিলাম,—অর্থশূন্য বৃষ্টি! বাড়ীতে বসিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া কবিত্ব করিতে বড় ভাল লাগে,—একখানা মোটর থাকিলে নিরীহ আহম্মক পথিকগুলার গায়ে কাদাছিটাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতে বড় আমোদ। কিন্তু আমার মত হৃতছত্র পদব্রজী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে এরূপ বৃষ্টি না আনে কবিত্ব, না বাড়ায় আনন্দ। দু' মিনিট আগেকার প্রখর, দীপ্ত, অকরুণ রৌদ্র যে অকস্মাৎ এমনতর কাজল মেঘে স্নিগ্ধ সজল হইয়া উঠিয়া ধারাবর্ষণ সুরু করিবে, ইহা ভাবিলে, হঠাৎ কৌতুক অনুভব করিয়া বলিতে হয়, বাঃ রে মজা! বৃষ্টিতে ভিজিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার আশঙ্কা কিন্তু কমে না!

—গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা করিতেছিলাম। হকারটা হাঁকিয়া বলিল, "টেলিগ্রাম, বাবু, টেলিগ্রাম—তাজা খবর বাবু, আবার গুলি চল্‌ল—" একখানা কাগজ কেনা গেল—অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাগজখানার নীচের দিকে এক কোণে গুলিচালনার সংবাদ আবিষ্কার করিলাম। নেট্যালের পীটারমারিজবুর্গ সহর হইতে চার দিন আগের তারিখ দিয়া খবর আসিয়াছে, এক ভদ্রলোকের গৃহে চোর আসিয়াছিল ভদ্রলোক বন্দুকের গুলিতে চোরকে খোঁড়া করিয়া, তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্প করিয়াছেন, চোর প্রাণে বাঁচিয়া আছে, অতএব চিন্তা কারণ নাই।—কলিকাতায় সংবাদপত্রের অতিরিক্ত সান্ধ্য সংস্করণ বাহির করিয়া এই অতি প্রয়োজনীয় খবর প্রকাশিত হইয়াছে!—হকারটা চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে গেল, "তাজা খবর বাবু, টেলিগ্রাম,—আবার গুলি চল্‌ল..."

প্রাবৃটঘন আকাশের দিকে চাহিয়া বড় ভালো লাগিতেছিল। বারান্দার নীচে হইতে হাত বাড়াইয়া অঞ্জলি পু করিয়া বৃষ্টির জল লইলাম—বোধ হইতে লাগিল যেন বহুদূরে আকাশের সহিত আমার নিকট আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে—অনুভব করিতে লাগিলাম যে, বৃষ্টিতে-ভেজা স্নিগ্ধ হাওয়া দিবসের দাবদাহ জুড়াইয়া গেছে, এবার নূতন করিয় কোনও কাজ আরম্ভ করা আমার পক্ষে সহজ হইবে। (স্নেহের রসে মানুষের দেহমন বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই বৃষ্টিটুকুতে তাহারই প্রকাশ বলিয়া বোধ করিলাম। বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হইতে আর আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল না,—ভাবিলাম, রাস্তায় নামিয়া পড়ি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেই বীরদর্পে বাড়ী ফিরিব,—য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ই, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র আফ্‌শোষ করি না। সম্মুখের বড় বাড়ীটার ফাঁক দিয়া পশ্চিমদিকে আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিলাম, ওই ফ্রেমে আঁটা ছবিটুকুর দাম দিতে পারে, এমন ধনী যদি পৃথিবীতে কেহ থাকেন তাহা হইলে তিনি যে সত্যকার বিত্তশালী (সম্বন্ধে সন্দেহ করিব না। গগনের কথা মনে হইল, একদি সে বলিয়াছিল, "কূটতর্ক অনেক করেছি,—এসব কূটতর্কে জিনিষ নয়, এ বস্তু মন দিয়ে পেতে হয়, বুক দিয়ে অনুভ করতে হয়,—এটা ডিবেটিং ক্লাবের কোলাহলকুজ্‌নে দ্বারা সুপ্রাপ্য নয়। বায়ুকে আমরা দাঁতের কামড়ের দ্বা পাই না, রসনার অবলেহনের দ্বারা লাভ করি না, কেব মাত্র অনায়াস গ্রহণ-ক্ষমতার সাহায্যেই তা আমাদের আ হ'য়ে ওঠে। দাঁতে আছে ধার, নিশ্বাসে আছে প্রাণ।" এতটা আন্তরিকতার সহিত সে তাহার কথাগুলি উচ্চা

করিয়াছিল যে, আমরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। কতদিন ভাবিয়াছি, আমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে আমি যেন গগনের মত করিয়া ভালবাসিতে পারি, তাহার ও আমার মাঝখানে সেতু গড়িবার মত কোন ব্যবধানও যেন না থাকে।—বৃষ্টি তখনও আসে নাই,—ফুটপাথের উপর হইতে রাস্তায় পা বাড়াইলাম, জলে ভিজিয়াই বাড়ী যাইব! পিছন হইতে কাঁধে হাত দিয়া কে বলিল, "ভগবান নেই—" আঁৎকাইয়া উঠিয়া পিছন দিকে চাহিলাম। শ্রীযুক্ত গগণচন্দ্র ঘুসি পাকাইয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন "অবাক হ'য়ে চাইছ কি? আমি বল্‌ছি ভগবান নেই,—একথা আমি প্রমাণ করে' দেব—"

ঝড়ো কাকের মত তাহার চেহারা হইয়াছে, সারা দ্বিপ্রহরের রৌদ্র এবং অপরাহ্নের বর্ষণ দুইই সম্ভবতঃ তাহার মাথার উপর দিয়া নির্দ্দয়ভাবে বহিয়া গেছে। প্রশ্ন করার জন্য ঠোঁট খুলিবার পূর্ব্বেই পরুষকণ্ঠে গগন বলিল, "সমস্ত ভুয়ো,—তিন তুড়িতে সব উড়িয়ে দেওয়া যায়,—সৃষ্টিকর্ত্তা,—ফিড্‌ল্‌ষ্টিক্!—"

পুনরায় তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করিতেই বাধা দিয়া সে কহিল, "কাল সকালে যাব তোমার ওখানে—" বলিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেল।—

বৃষ্টির দিকে চাহিয়া, আমার আর একবার মনে হইল, বাঃ রে মজা! আকাশের পানে তাকাইয়া, বিশ্ববিধাতাকে যেন আমি নূতন করিয়া পাইলাম। তাঁহার লীলার ছন্দে আজ অপরাহ্ণে আমার চোখে নবীনরূপে সপ্তবর্ণের বৈচিত্র্য লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় বরুণ আসিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়া কহিল, "বৃষ্টি সারারাত থাম্‌বে না—"

গগনের কথা ভাবিয়া অন্যমনস্ক ছিলাম, বলিলাম, "হুঁ—"

বরুণ বলিল, "বেচারা গগন!"

সচেতন হইয়া কহিলাম, "কেন?"

"আমাদের অফিসে একটা চাকরীর চেষ্টায় গিয়েছিল, আমিই সন্ধান দিয়েছিলাম,—দিনে এক টাকা করে' মাইনে—ও সেটার ওপর খুব ভরসা কর্‌ছিল,—আমিও ওর জন্যে চেষ্টা কর্‌ছিলাম,—কিন্তু সাহেব আজ দুপুরে ওকে মুখের ওপর বলে' দিয়েছে যে, প্রথমতঃ গগন ও কাজের উপযুক্ত নয়, এবং দ্বিতীয়তঃ সাহেব তার মতলব বদ্‌লেছে, এখন বোধ হয় লোকই নেওয়া হ'বে না। বেচারা বড্ড ডিসয়্যাপয়েণ্টেড্ হ'য়েছে—"

জানালা দিয়া জল আসিতেছিল,—সার্শীটা বন্ধ করিয়া দিলাম।—

শ্রীআশীষ গুপ্ত

"বাঁশী"

শ্রীমতী বরুণা দেবী

বাঁশীটী বাজে
সকাল সাঁজে,
করায় ভুল
সকল কাজে!

চকিতে চাহি
কোথাও নাহি
যেন সে কোথা
লুকায়ে আছে!

আকুল স্বরে
কাহার তরে
মরম কথা
বলিতে চায়!

যেন কি কথা
লুকান ব্যথা,
হৃদয় মাঝে
রয়েছে হায়!

তৃষিত আঁখি
চাহিয়া থাকি
লাগেনা মন
সকল কাজে।

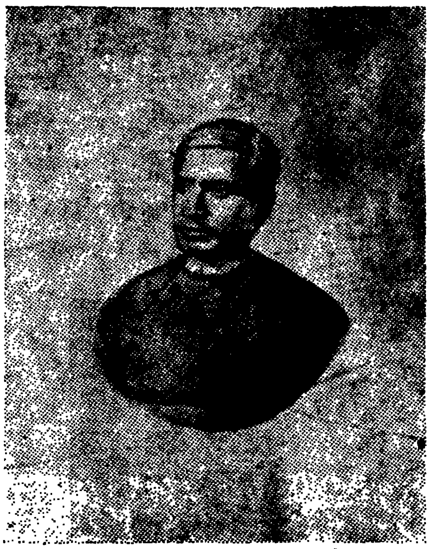
দিন রজনী
বাঁশীর ধ্বনি—
উতলা হৃদি
মরিছে লাজে

জগদীশনাথ রায়

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ

উপক্রমণিকা

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় উপন্যাস "বিষবৃক্ষ" তাঁহার "কাব্যপ্রিয়, পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায় সুহৃদ্বরকে" "বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত" হয়। 'বিষবৃক্ষে'র লক্ষ লক্ষ পাঠকগণের মধ্যে অধুনা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই, বোধ হয়, জগদীশনাথের জীবন-কথা অবগত আছেন, এবং তাঁহার কাব্যপ্রিয়তা ও পাণ্ডিত্যের প্রভাব তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্য-সেবকগণের উপর কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা অনুভব করা এক্ষণে তাঁহাদের সাধ্যাতীত। কাল-সাগরকূলে তিনি যে সকল চরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনচরিত লেখকগণ তাঁহার অন্তরঙ্গ ও বিশিষ্ট বন্ধুগণের যথোচিত পরিচয় প্রদান না করিয়া যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে কেবল তাঁহার উপেক্ষিত বন্ধুগণের প্রতি অবিচার করা হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিও অবিচার করা হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জগদীশনাথ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে মনঃস্থ করিয়াছি।



৺জগদীশনাথ রায়

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্য-সেবকগণের সাহিত্য-গুরু, খাঁটী বাঙ্গলার শেষ কবি 'প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মস্থান, নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচরাপাড়া গ্রামে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবংশে জগদীশনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

কথিত আছে ইঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ মুক্তারাম রায় আলিবর্দ্দি খাঁর দেওয়ান ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক 'রায় রায়ান' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। জগদীশের পিতামহ গোকুলচন্দ্র ওয়ারেন হেষ্টিংসের অধীনে হিসাবনবীশ ছিলেন এবং প্রভু হেষ্টিংশের সহিত মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়নকালে সর্ব্বস্বান্ত হন। পরে তিনি কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং বিখ্যাত ধনকুবের নিমাইচরণ মল্লিকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হন। কলিকাতাতেই গঙ্গাতীরে তিনি সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেন। জগদীশের পিতা গুরুচরণ তাঁহার সৎকারান্তে কাঁচরাপাড়া প্রত্যাগমন করিলে গোকুলচন্দ্রের সাধ্বী পত্নী পুত্রকে তীব্র ভৎসনা করেন। তিনি পূর্ব্বেই পুত্রকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে যেন মৃতদেহ কাঁচরাপাড়া আনয়ন করা হয়, কারণ তিনি সহমৃতা হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু নিমাইচরণ গুরুচরণকে উক্তবিধ কার্য্য করিতে নিরস্ত করেন এবং কোমলপ্রাণ গুরুচরণও তাঁহার পরামর্শ সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার জননী রোষদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন 'বৎস, তুমি কি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছ?' তখন তিনি জননীর পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। সতী বলিলেন,"তুমি আমার একমাত্র পুত্র, তোমাকে অভিশাপ দিব না। আমি অনুমৃতা হইব, নদীতীরে তাহার ব্যবস্থা কর।" অতঃপর সতী তাঁহার স্বামীর গাত্রবস্ত্রসহ জ্বলন্ত চিতায় সহাস্যবদনে ঝাঁপ দিলেন। এইস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক

হইবে না, ইনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য শিবানন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুরুচরণ বাঙ্গালা সংস্কৃত ও পারস্যভাষা ব্যতীত ইংরাজীও জানিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। শুনা যায় যে সেকালে বড়লাট বা উচ্চ পদস্থ য়ুরোপীয়কে অভিনন্দন পত্র উপহার দিতে হইলে তাঁহার দ্বারা পত্রখানি লিখাইয়া লওয়া হইত। তিনি 'শব্দরত্নাকর' নামক একখানি সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করিয়া হরেস হেম্যান উইলসন, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনিও (পিতার ন্যায়) ক্রোরপতি নিমাই-চরণ মল্লিকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। গুরুচরণ সঙ্গীত বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। সাধকশ্রেষ্ঠ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে গোকুলচন্দ্রের ভ্রাতা হইতেন। জগদীশনাথ পিতার সঙ্গীত বিদ্যার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিত।



হিন্দু কলেজ
(১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত চিত্র হইতে)

শিক্ষা

শৈশবে জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট নিম্নপ্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করিয়া অনুমান ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে নবম বর্ষ বয়সে জগদীশনাথ হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই পাঠে মনোযোগী ছিলেন এবং তাঁহার অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ ছিল। সেকালের শিক্ষা বিবরণীগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয় যে তিনি বিদ্যালয়ের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে প্রথম স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' রচয়িতা প্রতাপচন্দ্র ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় জগদীশনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জগদীশনাথ জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় (বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার তুল্য) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আট টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। অন্যান্য যে সকল ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। গুণানুসারে তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। জগদীশনাথ রায় ২। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (পরে শিক্ষা বিভাগের অন্যতম পরিদর্শক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার) ৩। রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ৪। অবতারচন্দ্র গাঙ্গুলী ৫। বনমালী মিত্র ৬। মধুসূদন দত্ত (পরে বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন) ৭। শ্যামাচরণ লাহা।

অতঃপর জগদীশনাথ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। উহাতে বর্ত্তমান কলেজে পাঠ্য পুস্তকাদি পড়ান হইত এবং ছাত্রগণ ইচ্ছামত তিন চারি বৎসর উক্ত শ্রেণীতে পাঠ করিয়া সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির নানা গ্রন্থ একত্রে পাঠ করিতেন। বার্ষিক পরীক্ষার ফল অনুসারে প্রতিবৎসর সিনিয়র স্কলার্শিপ প্রদত্ত হইত। যাঁহারা নূতন কলেজ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে তিন চারি বৎসরের পুরাতন ছাত্রগণকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়া বৃত্তিলাভ করা বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। জগদীশনাথ প্রতিবৎসরেই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৪০৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

সেকালে ছাত্রগণকে পুস্তকাগারে ইচ্ছামত গ্রন্থাদি পাঠ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করা হইত। তৎকালীন শিক্ষাপরিষৎ নিয়ম করিয়াছিলেন যে ছাত্রগণ বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট পাঠাগারে ইচ্ছামত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া সেই সকল গ্রন্থের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলে একটি সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হইবে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই লাইব্রেরী মেডাল পরীক্ষা আরব্ধ হয়। বলা বাহুল্য এই লাইব্রেরী মেড্যাল লাভ করা আজিকালিকার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির ন্যায় ছাত্রগণের বিশেষ গৌরবের পরিচয় ছিল। বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে না পারিলে এই পদক কাহাকেও প্রদান করা হইত না। হিন্দু কলেজের কোনও ছাত্রই প্রথমে এই প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জগদীশনাথ এই পরীক্ষায় সতীর্থগণকে পরাস্ত করিয়া এই ঈপ্সিত পুরস্কার লাভ করেন।

হিন্দু কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিষ্টার জেম্‌স কার এই পরীক্ষা প্রথম গ্রহণ করেন। পরীক্ষান্তে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"পরিষৎ কর্তৃক পরীক্ষাগ্রহণের আদেশ প্রাপ্ত হইবা মাত্র আমি পরীক্ষা-প্রদানেচ্ছু ছাত্রগণকে তাঁহারা গত বারমাসে লাইব্রেরী হইতে যে সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাহার তালিকা দিতে বলি। তাহার পর আমি সেই তালিকাগুলি পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক, উপন্যাস এবং অন্যান্য যে সকল পুস্তক বর্ত্তমান পরীক্ষার উপযোগী নহে তাহার নামগুলি কাটি। তাহার পর আমি লাইব্রেরিয়ানের নিকট হইতে কবে কোন পুস্তক লওয়া হইয়াছে এবং কবে ফেরত দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি তালিকা লইয়া পরীক্ষা করতঃ কয়েকজন পরীক্ষার্থীর নাম ও পুস্তকের নাম কাটিয়া দিই। নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত গ্রন্থ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয় :—

জগদীশনাথ রায় (প্রথম শ্রেণী) Tytler's General History, Potter's Æschylus, ditto Sophocles and ditto Euripides.

হরচন্দ্র দত্ত (প্রথম শ্রেণী) Tytler's General History, Sir Walter Scott's Poems, Richardson's Literary Leaves, Tragedy of Douglas.

চুনীলাল গুপ্ত (দ্বিতীয় শ্রেণী) Mackintosh's Ethical Philosophy.

যাদবচন্দ্র মল্লিক (ঐ) Schlegel's Philoscphy of History.

ভগবতীচরণ বসু (ঐ) Alison's French Revolution.



হরচন্দ্র দত্ত

পরীক্ষারম্ভের অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল প্রতিযোগিতা যথার্থ প্রথম দুই জন ছাত্র জগদীশ ও হরচন্দ্রর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উভয়েই অন্যান্য পরীক্ষার্থীদিগের অপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন এবং অধিকতর মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছেন। অতএব আমি জগদীশ ও হরচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব যত্নসহকারে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য কাগজে কতগুলি প্রশ্ন লিখিয়া লইলাম।

আমার ধারণা জগদীশ নাথ রায় পরীক্ষাটি বিশেষ সন্তোষজনকভাবে দিয়াছে। গ্রীক ট্রাজেডি ও টাইটলারের ইতিহাসে তাঁহার সুক্ষ্ম জ্ঞান দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম এ কথা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিতে পারি। উভয় বিষয়ে এমন কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারা যায় নাই যাহার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন না। অধীত পুস্তকের সংখ্যা সম্বন্ধে যদি পরিষৎ সন্তুষ্ট থাকেন তবে আমি অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি যে গ্রন্থগুলি অসাধারণ যত্ন ও মনোযোগের সহিত অধীত হইয়াছে এবং জগদীশ লাইব্রেরী মেডেল লাভের যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে গ্রন্থখানি দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রই পাঠ করিয়াছেন—সেই টাইটলারের ইতিহাসে—হরচন্দ্র অপেক্ষা জগদীশের শ্রেষ্ঠতা অনায়াসেই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। এই বিষয়ে হরচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পাবেন নাই কিন্তু এ কথা স্বীকার্য্য যে স্কটের কবিতাটি ও ট্রাজডি অব ডাগলাসে তিনি অতি উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিলেন।"

শিক্ষা পরিষৎ উক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া জগদীশ নাথকে লাইব্রেরী মেড্যাল প্রদান করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজের অধ্যক্ষ জেম্‌স্ কার্ পুনরায় লাইব্রেরী পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এবারেও জগদীশনাথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া শিক্ষাপরিষৎ কর্তৃক লাইব্রেরী মেড্যাল প্রাপ্ত হন। জগদীশনাথ উপর্য্যুপরি দুইবার লাইব্রেরী মেড্যাল পাইবার পর শিক্ষাপরিষৎ এইরূপ আদেশ দিলেন যে "ভবিষ্যতে উপর্য্যুপরি একই ব্যক্তিকে এই পুরস্কার প্রদত্ত হইবে না, উপর্য্যুপরি একই ব্যক্তি পরীক্ষায় প্রথম হইলে, প্রথম ব্যক্তির নাম রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করা হইবে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি পুরস্কার পাইবেন।" ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী লাইব্রেরী মেড্যাল প্রাপ্ত হন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে লর্ড হার্ডিং এক সার্কুলার প্রকাশ করেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কলেজ সমূহের ছাত্রগণকে বিশেষভাবে পরীক্ষাপূর্ব্বক পারদর্শিতা অনুসারে একটি তালিকাভুক্ত করিবার আদেশ দেওয়া হয়। এই তালিকা মুদ্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট আফিসের কর্ত্তাদিগের নিকট প্রেরিত হইত এবং তাঁহাদের উপর এইরূপ আদেশ ছিল যে যথাসম্ভব এই সকল উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণকে চাকুরীতে নিযুক্ত করিতে হইবে। ডাক্তার ডফ্‌ প্রভৃতি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষগণ এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় কয়েক বৎসর পরে এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে যে তালিকা প্রস্তুত হয় তাহাতে প্রথম শ্রেণীতে কেবল জগদীশনাথের নাম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে হিন্দু ও হুগলী কলেজের আটজন ছাত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। জগদীশ অত্যল্প কাল হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করিয়া একশত টাকা মাসিক বেতনে Western Salt Chowkies এর সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন।

জগদীশনাথের পঠদ্দশায় সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডি এল রিচার্ডসন এবং তাঁহার দীর্ঘ অবকাশগ্রহণ কালে জেম্‌স্ কার্ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহাদের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি অতি অল্পই এদেশে আসিয়াছেন। জগদীশনাথ ইঁহাদের উপদেশে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেকালের কলেজ বিবরণীতে বেকন্-সন্দর্ভ সংক্রান্ত পরীক্ষার প্রশ্নের জগদীশ যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। গণিতে অধ্যাপক ডি এল রীজ্, জরীপে অধ্যাপক জে রো, বিজ্ঞানে অধ্যাপক জে সাটক্লিফ ও বাঙ্গালায় রামচন্দ্র মিত্র তৎকালে হিন্দুকলেজে অধ্যাপনা করিতেন। জগদীশ সকল অধ্যাপকেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সচরাচর যাঁহারা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী, গণিতে তাঁহাদের আতঙ্ক থাকে। জগদীশ সাহিত্যে ও গণিতে উভয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন। কলেজ পরিত্যাগকালে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে জগদীশনাথ রায় চতুর্দ্দশবর্ষকাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। কলেজ পরিত্যাগের সময় তিনি প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন। তিনি গণিতে অতি উত্তম ব্যুৎপত্তি এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। কলেজ পরিত্যাগের সময় তিনি উচ্চ বৃত্তি পাইতেছিলেন।"

জে, ই, ডি, বেথুন, সভাপতি
রসময় দত্ত, সম্পাদক
ডি, এন, রিচার্ডসন—অধ্যক্ষ

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯

গবর্ণমেণ্টের চাকুরীর জন্য যে সকল ছাত্র নির্ব্বাচিত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে জগদীশনাথ প্রথম হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে মৌএট ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে একখানি পত্র সহ তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্র দেন :—

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ

"এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে হিন্দু কলেজের জগদীশনাথ রায় গবর্ণমেণ্টের ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবরের অবধারণ অনুসারে গৃহীত পরীক্ষা প্রদান করিয়া উক্ত অবধারণ অনুসারে শিক্ষা পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রস্তুত তালিকায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।"

অনুমত্যানুসারে
শিক্ষা পরিষৎ, ২৯শে মে, ১৮৪৮ এফ জে মৌএট
সম্পাদক"

স্যর সিসিল্ বীডন্ জগদীশনাথকে নিম্নলিখিত প্রশংসা-লিপি প্রদান করেন :—

তাঁহার প্রশংসাপত্র হইতে অনায়াসেই প্রতীত হইবে যে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে যে সকল ছাত্র উহা হইতে পাঠ সমাপনান্তে বহির্গত হইয়াছে তন্মধ্যে জগদীশনাথ রায় সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ছাত্রগণের অন্যতম। শিক্ষাবিষয়ক কার্য্য বিবরণীগুলি হইতে প্রতীত হয় যে গত সাত বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসরেই তিনি কলেজে উচ্চ ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতার জন্যও তিনি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। আমি আর কোনও ছাত্রের বিষয় জানিনা যিনি বিদ্যায়তনে উচ্চতর সম্মান লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভের জন্য ইঁহাপেক্ষা যোগ্যতর।

সিসিল বীডন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জগদীশনাথ গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবার যোগ্যতা দেখাইয়া নিমকের চৌকির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে এক শত টাকা মাসিক বেতনে সেরেস্তাদারের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখের একখানি পত্র হইতে প্রতীত হয় যে তিনি ঐ সময়ে উক্ত চাকুরীর জন্য চারি টাকা সুদের এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ জামিন স্বরূপ জমা রাখিয়াছিলেন।

জগদীশনাথের প্রথম কর্ম্মস্থল হাবড়ায়। এখান হইতে তিনি খুলনায় স্থানান্তরিত হন। সেখানে তিনি কার্য্যে এরূপ প্রশংসা লাভ করেন যে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জলেশ্বরে নিমকের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন। ইহার এক বৎসর পরে তিনি মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত হন। এখানে অবস্থিতিকালে তিনি নিমক বিভাগের সুবর্ডিনেট্ এক্জিকিউটিভ্ সার্ভিসের ৪র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং উহার ফলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে তাঁহার বেতন মাসিক ৩৫০৲ নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই তিনি স্পেশিয়াল এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ নিযুক্ত হন। উক্ত বৎসর নবেম্বর মাসে ইনি কলিকাতায় স্পেশিয়াল এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশরূপে স্থানান্তরিত হন। তাঁহার প্রধান কার্য্য অবশ্য হাটখোলায় নিমক অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগিরি। এই সময়ে লিভারপুলের আমদানী লবণ ব্যবহার করিতে সাধারণের আপত্তি ক্রমে ক্রমে দূর হওয়াতে অধিক পরিমাণে বিদেশী লবণ এ দেশে আসিতে থাকে এবং গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। চট্টগ্রামের নিমকের চৌকী উঠিয়া গেল, হুগলী ও তমলুকের চৌকী মিলিত হইয়া একজন পরিদর্শকের অধীনে রাখা স্থির হইল। এই সকল পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত প্রশ্নাদির বিচারের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি সমিতি নিযুক্ত করেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী (পরে ছোটলাট) মাননীয় মিষ্টার (পরে স্যর) এশলি ইডেন, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিষ্টার শক্, কাষ্টমস্ কলেক্টর মিঃ ক্রফোর্ড, নিমক বিভাগ সম্পর্কীয় পুলিশের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেল মেজর প্যাটার্সন, কলিকাতার ডেপুটী পুলিশ কমিশনার মেজর রেভেলি, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ওয়েজ, এবং নিমক চৌকীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জগদীশনাথ রায় ছিলেন।

কলিকাতায় নিমক অফিস উঠিয়া গেলে জগদীশনাথ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে আলিপুরের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ট অব পুলিশ নিযুক্ত হন। উক্ত বৎসর জুলাই মাসে তিনি এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন।

এইবার তাঁহাকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট মুস্কিলে পড়িলেন। তখনকার দিনে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ চিহ্নিত মিলিটারি বা সিবিল সার্ভেণ্টদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তখন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে অনেক য়ুরোপীয় এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকিতেন

পদোন্নতি

এবং একজন দেশীয় ব্যক্তির অধীনে ইঁহারা কার্য্য করিতে আপত্তি তুলিলেন। গবর্ণমেণ্ট এই বিবাদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জগদীশনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। জগদীশনাথের বন্ধুবর্গ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি তাঁহাকে এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন এরূপ পদ বাঙ্গালীরা পাইয়াছে, কিন্তু পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ বাঙ্গালীর জন্য উন্মুক্ত করান আবশ্যক। জগদীশনাথ পুলিশ বিভাগে এরূপ প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্য কাহাকেও উচ্চতর পদে উন্নীত করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। বাঙ্গালার তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর উইলিয়ম এর সুপারিশে উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষগণ অবশেষে জগদীশনাথকে জিলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ অনুসারে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে জগদীশনাথ নোয়াখালিতে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে নিযুক্ত হইলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

জগদীশনাথ অসাধারণ সাহসী ছিলেন এবং অপূর্ব্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। নোয়াখালীতে অবস্থান কালে একবার কোনও দুরস্থ মফঃস্বল পরিদর্শন করিয়া বাসায় ফিরিবার সময় একজন গুণ্ডা তাঁহার গাড়ী অবরোধ করে। জগদীশ নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন "কে তুই?" সে বলিল "আমি একজন পুরাতন কয়েদী, তোমাকে মারিব বলিয়া অপেক্ষা করিতেছি।" "তোকে বোধ হয় পেটের দায়ে চুরি ডাকাইতি করিতে হইতেছে" এই বলিয়া জগদীশ তাহার হস্ত-ধৃত ছোরাটি তাহাকে অর্পণ করিয়া গাড়ীতে উঠিতে আদেশ দিলেন। পরে তাহাকে পুলিশ বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া লন।

আর একবার একটী গ্রামে এক ব্যক্তির গৃহে ডাকাত পড়ে। সে ও তাহার ভ্রাতারা ডাকাতদের সহিত রীতিমত লড়াই করে। একজন ডাকাত মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং সঙ্গীর[illegible]য় পলায়ন করেন। গ্রামবাসীরা নিরক্ষর, মানুষ খুন করিয়া তাহাদের ভয় হইল। তাহারা দূরে এক নির্জ্জন ধান্যক্ষেত্রে মৃতদেহটী ফেলিয়া দিয়া আসিল। জগদীশনাথ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সেই গৃহাধিকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, আত্মরক্ষার্থ দস্যুকে নিহত করিয়া সে আইনতঃ কোন অপরাধ করে নাই বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহার সাহায্যে অন্য দস্যুগণকে ধৃত করিয়া ফেলিলেন।

তিন বৎসর নোয়াখালিতে কার্য্য করিবার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বালেশ্বরে বদলি হন। তিনি নোয়াখালি পরিত্যাগের সময় সেই জিলায় ডাকাইতি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

উড়িষ্যায় অবস্থানকালেও জগদীশনাথ রায় আশ্চর্য্যরূপে কয়েকটি ডাকাতের দল গ্রেপ্তার করিয়া শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ তেজঃদীপ্ত নয়নের সম্মুখে অপরাধীরা মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিত। একবার তাঁহার অধীনস্থ একজন পুলিশ কনেষ্টবল্ তাহার প্রণয়িণীর কোনও প্রিয়পাত্রকে হত্যা করে। তাহাকে ধৃত করিতে গেলে সে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে উন্মত্তের ন্যায় এরূপ আস্ফালন করিতে লাগিল যে পুলিশের অন্যান্য লোকরা তাহাকে ধৃত করা দূরে থাকুক, ভয়ে অস্থির হইল। জগদীশনাথ সংবাদ পাইয়া তথায় গিয়া হত্যাকারীর প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বাভাবিক দৃঢ় কণ্ঠে তাহাকে আদেশ করিলেন, "তরোয়াল ফেল্!" হত্যাকারী দ্বিরুক্তি না করিয়া তরবারি ফেলিয়া দিল এবং সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর সে ধৃত হয় এবং বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

জগদীশনাথ অপূর্ব্ব কৌশল ও বুদ্ধির বলে বহু অপরাধীকে ধৃত করিয়াছিলেন। সে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলে একখানি মনোরম ডিটেক্টিভ বহি প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

জগদীশনাথ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর দিনাজপুরে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ নিযুক্ত হন, এবং পর বৎসর এপ্রিল মাসে ৪র্থ গ্রেডে উন্নীত হন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২১শে অক্টোবর তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে

উন্নীত হন এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

জগদীশনাথ অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহার য়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে প্রায়ই শিকার করিতে যাইতেন এবং অনেক ব্যাঘ্র, ভল্লুক বরাহ প্রভৃতি শিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস অসীম ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ ছিল।

মৃগয়াপ্রিয়তা

কিন্তু জগদীশনাথের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ ছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চ্চায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জগদীশনাথের পিতা গুরুচরণ অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। জগদীশনাথ বাল্যকাল হইতে উত্তমরূপে উপযুক্ত কলাবিৎদিগের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া শ্রোতামাত্রেই মুগ্ধ ও অভিভূত হইতেন।

সঙ্গীতানুরাগ



দীনবন্ধু মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র প্রভৃতি রসজ্ঞ সাহিত্যিকগণ জগদীশনাথের সাহচর্য্য এই জন্যই ভালবাসিতেন। দীনবন্ধুর সুরধনী কাব্যে জগদীশনাথের এই চিত্র অঙ্কিত আছে।

'জগদীশ পুলিশরতন বিজ্ঞবর,
তান লয়ে সাধিতেছে গীত মনোহর।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত জগদীশনাথের কবে প্রথম ঘনিষ্ট আলাপের সূত্রপাত হয় তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাগোয়া মহকুমায় চাকুরী করেন তখন জগদীশনাথ মেদিনীপুরে কায করিতেন। ১৮৬৪ হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র চব্বিশ-পরগণায় বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুরে কার্য্য করেন। জগদীশনাথও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও আলিপুরে ছিলেন। এই সময়ে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন এবং জগদীশনাথের গান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কথিত আছে মেদিনীপুরে অবস্থানকালে একবার জগদীশনাথ দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সংবাদ না দিয়া কাঁথিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে যান। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসার সন্নিকটে গিয়া জগদীশনাথ ভিখারীর সুরে একটি গান ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গান শুনিয়াই গৃহের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "থাম ভিখারী থাম! তোমাকে চিনিয়াছি—এ গান কি ভুলিবার!"

আর একবার বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে অবস্থানকালে জগদীশনাথ বিনা সংবাদে তাঁহার বাসার সম্মুখে গিয়া গান ধরিলেন, "আমি বাগবাজারের মেথরাণী!" বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন এবং "চাপরাশি নিকাল্ দেও, নিকাল্ দেও" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিলেন।

কেবল সঙ্গীত নহে, তাঁহার অসামান্য সাহিত্যানুরাগ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনিষীগণকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ছাত্র-জীবনে যে অনুরাগের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইয়াছিল, রাজকর্ম্মের গুরুভার তাহাকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে নাই। জগদীশনাথের পুস্তকালয়ে নানা বিষয়ের গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল এবং সেকালের জ্ঞান-পিপাসু মনীষিরা ইহার সহিত সাহিত্যালোচনা করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের আলোচনায় জগদীশনাথের বৈঠকখানা গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মুখরিত থাকিত এবং বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ প্রায়ই জগদীশ-

সাহিত্যানুরাগ

নাথের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহে রাত্রি-যাপন করিতেন।

জগদীশনাথের বহু বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য তিনি স্বয়ং বঙ্গ-সাহিত্যকে তাঁহার রচনাদির দ্বারা সেরূপ সমৃদ্ধ করিয়া যান নাই। কিন্তু যখন আমরা স্মরণ করি যে বঙ্কিমযুগের শ্রেষ্ঠতম লেখকগণ তাঁহার নিকট সামান্য উৎসাহ উপদেশ ও প্রেরণা লাভ করেন নাই, তখন আমাদিগের এই বিষয়ে ক্ষোভের অনেক উপশম হয়।

'বঙ্গদর্শন'

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন তখন তিনি যাঁহাদিগের নিকট হইতে উৎসাহ সহায়তা ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে জগদীশনাথ অন্যতম। জগদীশনাথের বয়ঃক্রম তখন ৪৭ বৎসর এবং তিনি তখন ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশের দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুভার রাজকার্য্যে নিযুক্ত। তিনি পূর্ব্বে কখনও বাঙ্গালা রচনাদি লিখেন নাই। তাঁহার অবসর অল্প তথাপি তিনি এই পরিণত বয়সে "বঙ্গদর্শনে"র জন্য লেখনী ধারণ করিতে সম্মতি জানাইয়াছিলেন এবং 'বঙ্গদর্শনের' অনুষ্ঠানপত্রে অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের নামের সহিত তাঁহার নামও লেখক বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি মাতৃ-ভাষার উন্নতিকল্পে তাঁহার পুত্রগণকেও লেখনী ধারণ করিতে আদেশ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধানাথ তখন প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগব্যথায় কাতর। জগদীশনাথের পরামর্শে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন :—

Berhampore.
the 29th Feby.

My dear Radhanath,

I am going to start a magazine after the model of the best English magazines. Both myself and your father wish that you should write in it.

So pray set about an article. I am not much in favour of poetry for magazines, as poetry can be tolerated only when it is first-rate and first rate poetry is always ill-placed in a magazine. Take up some literary, scientific or philosophical subject. I shall not need long articles at present. Six or eight octavo pages will do for each. When writing remember that the magazine is intended for the more cultivated classes and do not descend therefore to the so-called popular style of writing You must understand from this that you must read and think a good deal on the subjects you undertake to write upon.

It is possible you may feel disinclined towards such work in the present state of your feelings. But it is for this very reason that your father and myself wish you particularly to betake to it. I have myself always found by experience that nothing allays the feelings better, and leads to pure and abiding enjoyment than literary pursuits of the severer kinds.

Yours affectionately
Bankim Ch. Chatterjee.

জগদীশনাথ 'বঙ্গদর্শনের' জন্য প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করিবেন এই কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

Berhampore.
the 3rd March.

My dear Jagadish,

I am delighted to hear you will at least try to write for my magazine. I have written to Radhanath about it, but have not got his reply yet. It will be my delight to train him and his brother in literary pursuits. Tell Khany he must take a great deal of trouble with his essays, thoroughly studying and reading up a subject before he attempts to write upon it, and however much I may have admired his productions as school attempts, it is a different thing when he comes to be a contributor to my magazine, which is intended for scholars

and thinkers. I will accept nothing which has not absolute merit, without any consideration as to who the writer is.



৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

What gives me particular delight is that you yourself will try to write. Let us once get your hoary self under my editorial birch and I shall show you no mercy.

I have got a lot of contributors who have promised to write and can write, in Dinabandhu, Hem Chandra, Krishna Kamal Bhattacharyya, Tara Prosad Chatterjee and a young man, whom you don't know, but whose intellectual life I think I have greatly influenced, for good or for evil, and whose inherent gifts presage something great for him in the future. His name is Akkhay Sarkar. Though I have got so many contributors, I have not received a single contribution yet, except one from the last. So you see I shall have mainly to depend on my own energies. I have no objection to that—so far therefore as I can see the first number will be something like the following. With the introduction wherein I explain my objects—I insist there-on the necessity of greater sympathy between the educated classes and the masses without which there is no hope of general social progress, and I assert that such sympathy can be a fact only if the educated community adopt their own language as the medium of their public utterances, I present the public with my magazine as an organ for such utterances. The second article will be one on the military character of the Ancient Hindus, and show from such historical data as exists that it stood very high. The third article will be the first five chapters of the novel which was to be inscribed to you.

The fourth is a public lecture by ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল—who is a very learned tiger in the habit of reading very well-written papers before an association of tigers in the Sunderbans. The lecture is on man and the learned lecturer of course views mankind from a tiger's point of view. The fifth paper will be on eloquence in ancient India by Akkhay Sarkar, in which he shows (1) that poetry is not eloquence though nicely divided from it, (2) that though we had abundance of poetry in ancient India, it followed normally out of the national character that we should have little eloquence, (3) that such eloquence as we had only when there arose some great social or political revolution to need its aid, and that these revolutions were four—1. the Aryan invasion of Southern India, described in the Ramayana, 2. the first union of Upper India under one scepter by the Pandus, 3. the overthrow of Hinduism by Sakya

Singha and the kind of Hinduism by Sankaracharyya. Here is the sketch you wanted.

Your affectionately,
Bankim Chandra Chatterjee.

জগদীশনাথ তাঁহার প্রতিশ্রুতিপালন করিয়াছিলেন এবং অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে 'সঙ্গীত' সম্বন্ধে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেরণ করেন। উক্ত প্রবন্ধের প্রথমভাগে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি ভূমিকা লিখিয়া সন্দর্ভের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। সঙ্গীত বিষয়ক এই প্রস্তাবটি বঙ্গ-দর্শনের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের যে অংশটুকু রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যসহ পুনর্মুদ্রিত হয় :—

"১২৭৯ সালে বঙ্গদর্শনে সঙ্গীত-বিষয়ক তিনটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহার কিয়দংশ ৺জগদীশনাথ রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা; যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না।" বঙ্গদর্শনের এই প্রথম চারি সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ও জগদীশনাথ রায় ব্যতীত নিম্ন লিখিত লেখকগণের রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন।

জগদীশনাথ অবসরাভাববশতঃ স্বয়ং 'বঙ্গদর্শনে' উপরি লিখিত প্রবন্ধ ব্যতীত আর কোন প্রবন্ধ দ্বারা মাতৃ-ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন নাই। সঙ্গীত বিষয়ে সন্দর্ভ লিখিতে তিনি যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ছিলেন তাহা না বলিলেও চলে।

জগদীশনাথ স্বয়ং 'বঙ্গদর্শনে' লিখিবার অবসর পায় নাই বটে কিন্তু উক্ত পত্রের সাফল্যের প্রতি তাঁহার অবিচলিত দৃষ্টি ছিল এবং তিনি তাঁহার পুত্রগণকে উক্ত পত্রে লিখিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বন্ধুপুত্রগণকে এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন কিন্তু তাঁহার অসীম স্নেহ কখনও তাঁহাকে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য হইতে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। জগদীশনাথের দ্বিতীয় পুত্র খগেন্দ্রনাথ কোনও প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিলে তিনি দৃঢ়ভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেও কিরূপ সমীচীন উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাকে সৎসাহিত্য রচণায় প্রণোদিত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রপাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে :—

Malda
3-4-75.

My dear Khani,

I trust Radhanath has recovered by this time. I cannot accept your paper for the 'Banga Darshan'. I will send it to the Editor of the 'Bhramar', but I do not know if he will accept it. I have no connection with the 'Bhramar'.

You must not be disheartened if your first efforts do not succeed. There is great promise in you, and if you avoid affectation and ornament, and aim at only simplicity, truth, sincerity and feeling, you will command success.

Pray do not lose further time in paying Kristo Das Babu.

Yours affectionately,
B. C. Chatterjee.

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র 'ভ্রমর' সম্পাদন করিতেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহারও সম্পাদকীয় স্বাধীন মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতেন না।

'বিষবৃক্ষ'

প্রথম বর্ষের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসখানি জগদীশনাথকে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল ইহা প্রস্তাবারম্ভেই উল্লেখিত হইয়াছে। অনেকেই অনুমান করেন যে উক্ত উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের ছায়া পতিত হইয়াছে। সুলেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"আমি [বঙ্কিমবাবুকে] বলিলাম, 'শুনেছি, বিষবৃক্ষ আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?" উত্তর—"কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হয়েছে।'

বিষবৃক্ষে শুধু 'বঙ্কিমচন্দ্রের নহে, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশনাথ রায়েরও ছায়া পড়িয়াছে। হরদেব ঘোষালের

চিত্র জগদীশনাথের আদর্শে অঙ্কিত, এমন কি শুনা যায় জগদীশনাথের একখানি ইংরাজী পত্রের অনুবাদ বিষবৃক্ষে অবিকলভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র একখানি পত্রে জগদীশনাথকে লিখিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আমি তোমাকে আঁকিতে পারিলাম না।"

বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগদীশনাথ অতি মধুর কীর্ত্তন গাহিতে পারিতেন। তিনি অনেক বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রস্তাবকর্ত্তা বিখ্যাত সিভিলিয়ান জন বীম্‌স্ 'দি ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি' নামক প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক পত্রে (প্রথমবর্ষ ১৮৭২) 'কীর্ত্তন বা প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের পদাবলী' এবং 'বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস' নামক দুইটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধ মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলী ও তাহার সুললিত ইংরাজী অনুবাদও সন্নিবিষ্ট হয়। জগদীশনাথই বীম্‌স্ সাহেবকে এই সকল পদাবলী সংগ্রহ করিয়া দেন এবং উহার অনুবাদে সহায়তা করেন। বীম্‌স্ সাহেব প্রবন্ধ শেষে এইরূপে জগদীশনাথের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন :—

"In conclusion, I must acknowledge the source whence I obtained these interesting hymns. I have to thank Babu Jogadishnath Rai for his kindness in procuring them for me, for assisting me with his advice in translating and making notes on them.

He has promised to endeavour to procure for me some more of them, which, if the specimens herein given should prove interesting to any class of readers, I will publish in due course hereafter.

পরবৎসর (২য় বর্ষ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারিতে' বীম্‌স্ সাহেব 'চৈতন্য ও বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণ', "বাঙ্গালার প্রাচীন বৈষ্ণব কবি—(১) বিদ্যাপতি (২) চণ্ডীদাস" সম্বন্ধে কয়েকটি উপাদেয় প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রস্তাবটির প্রনয়ণে জগদীশনাথ তাঁহাকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে—

"The facts which here follow are taken from the Chaitanya Charitamrita, a metrical life of Chaitanya, the greater part of which was probably written by a contemporary of the teacher himself. The style has unfortunately been much modernised, but even so, the book is one of the oldest extant works in Bengali. My esteemed friend Babu Jagadishnath Ray has kindly gone through the book, a task for which I had not the leisure, and marked some of the salient points for me."

সাহিত্য পরিষদের অগ্রদূত

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার বীম্‌স্ "বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার" নামে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপনের যে প্রস্তাব করেন তাহার মূলে জগদীশনাথ ছিলেন। আমরা জগদীশনাথের কাগজ পত্রের মধ্যে শোভাবাজারের সদ্বিদ্বান রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের একখানি পত্র দেখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে জগদীশনাথ তাঁহাকে সভার অনুষ্ঠান



রাজনারায়ণ বসু

পত্র প্রেরণ করিয়া বীম্‌স্ সাহেবের দ্বারা প্রস্তাবিত উক্ত বেঙ্গল একাডেমীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে রাজা বাহাদুর উক্ত সভার

সভাপতিকে কি কি কার্য্য করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিয়াছেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জগদীশনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব ও তৎকালীন ছাত্রগণের একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়া যে আনন্দজনক ও কল্যাণকর উৎসবের সৃষ্টি করেন, তাহা আজি কালি প্রসিদ্ধ কলেজ সমূহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। "সেকাল আর একালে"র রাজনারায়ণ বাবু তদীয় আত্মচরিতে এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

কলেজ সম্মেলন

"ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (College Reunion) হয়। আমি উহা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দুকলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম District Superintendent of Police হন। যখন আমি তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের District Superintendent of Police ছিলেন। আমি প্রথম এই প্রস্তাব করি কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কোন উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। জগদীশনাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্রদিগকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকত নিকুঞ্জ" (Emerald Bower) নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই সম্মিলনে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। উহা আমার বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে আছে। আমি যে ঘরে উহা পাঠ করিতেছিলাম সেই ঘরে ঢুকিয়া কি হইতেছে দেখিতে একটি দর্শক উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু এই বলিয়া বারণ করিলেন যে "ওঘরে আর কি দেখিবে? ওঘরে 'সেকাল একাল' হইতেছে।" আমার কলেজের সহাধ্যায়ী ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙ্গালা পুস্তক হইতে বাছা বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন এমন সময়ে জগদীশনাথ রায় তাঁহাকে একটি ধমক ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা তাহা হইতে তাঁহাকে বিরত করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশধারণ জন্য বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সকল তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ-সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল।

* * * *

কলেজ সম্মিলন জ্ঞানাহার ও সৌহার্দ্দ্যরসামৃতপানের (Feast of reason and flow of soul) অথবা জ্ঞানের ভোজ ও আত্মার ঢলাঢলি করিবার একটি প্রধান উপায় ছিল।"

জগদীশনাথ এই কলেজ-সম্মিলনের সাফল্যের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মালদহে। সম্মিলনে তিনি উপস্থিত হইতে পারিবেন না জানিয়া জগদীশনাথ তাঁহার নিকট হইতে উক্ত উৎসবক্ষেত্রে পঠিত হইবার জন্য একটি সময়োপযোগী কবিতা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সময়াভাব বশতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুরোধ পালন করিতে পারেন নাই। জগদীশনাথের মধ্যম পুত্র খগেন্দ্রনাথের একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ছিল, তাহা এই উৎসবে পঠনার্থ প্রেরণ করিয়া এবং স্বকীয় রচনা প্রেরণের অক্ষমতার কারণ প্রদর্শিত করিয়া তিনি জগদীশনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধারযোগ্য।

Malda
The 30th December.

My dear Jagadish,

You write that you would be glad if I sent something for the Re-union. As I would do anything to make you glad, I immediately got down to write a poem for you. I received your note on the evening of the 28th, the post having been accidentally delayed for a few hours. I finished a few stanzas this evening, but sleep came on and I put it off to next morning.

If I send it by tomorrow's post you won't get it in time. So I think I must

give up the idea of contributing to your pleasure.

But it strikes me that it may be some compensation to you for this if Khani had an opportunity of reading his unfinished novel before the assembled friends at the Re-union. And I therefore post back his manuscript today. Khani must, in my opinion, chasten down his style and curb his redundant flow of words and imagery, which at present obscures the meaning and wearies the reader. He should try to avoid too much rhetoric and ornament. Explain to him that clearness and simplicity are the best of all ornaments, and that I have arrived at this conviction after much painful experience. He should re-write his book with reference to these remarks.

Yours affly.
Bankim Chandra Chatterjee.

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জগদীশনাথ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার গৃহ পুনরায় সাহিত্য ও সঙ্গীতের আলোচনায় মুখরিত হইয়া উঠে।

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ

বঙ্গের প্রধান প্রধান সাহিত্যিক ও সঙ্গীতাচার্য্যগণ তাঁহার সাহচর্য্য কামনা করিতেন। নানা জনহিতকর সভায় তিনি যোগদান করিতে আহূত হইতেন। কৃষ্ণদাস পাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে তিনি বাঙ্গালার বিখ্যাত রাজনৈতিক সভা 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা'র সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং উহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। মফঃস্বলের বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যেরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই সভার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভাপতি ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সাম্বৎসরিক অভিভাষণে জগদীশনাথের কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে "অদ্বিতীয় ধরা মাঝে মিউজিক ডাক্তার" রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'দি বেঙ্গল ফিলহার্মনিক একাডেমী' নামে এক সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

সঙ্গীত বিদ্যালয়

শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ স্যর এলফ্রেড ক্রফট্ এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু উহার সম্পাদক, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী উহার অধ্যক্ষ এবং রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন উহার সভাপতি ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে শেষোক্ত মহোদয়গণের স্বাক্ষরযুক্ত একটি ডিপ্লোমা দৃষ্টে প্রতীত হয় যে উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ জগদীশনাথকে একাডেমীর বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অতি সুযোগ্য পাত্রেই এই সম্মান প্রদত্ত হইয়াছিল।

কেবল সাহিত্য ও সঙ্গীতে নহে, চিত্রশিল্পেও জগদীশনাথের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। একবার স্যর রিচার্ড টেম্পলের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতায় একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়।

চিত্রশিল্পে জ্ঞান

জগদীশনাথ তাঁহার পুত্রগণকে লইয়া প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক চিত্রের বিষয় ও চিত্রকরের প্রতিভার পরিচয় এরূপ বিশদভাবে তাঁহাদের নিকট বিবৃত করিতেছিলেন যে প্রদর্শনী দর্শনান্তে প্রত্যাগমনোন্মুখ স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র ও হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান সরকারী উকীল অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় জগদীশনাথের সহিত সমস্ত চিত্রগুলি দর্শন করিবার জন্য এবং তাঁহার নিকট চিত্রের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য ফিরিয়া আসেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই জগদীশনাথ স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, সঙ্গীতানুরাগী, বন্ধুবৎসল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

স্বর্গারোহণ

তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। একবার একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট একটি চাকুরী প্রার্থনা করে এবং তিনি তাহা মঞ্জুর করেন। সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে তাঁহার এক ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বন্ধু বলেন "এ ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি পাওয়া যায়, আপনি ইহাকে চাকুরীটি দিয়া অন্যায় করিলেন।" জগদীশনাথ হাস্যমুখে বলিলেন, "এ লোকটি অত্যন্ত অভাবে পড়িয়াছে, যোগ্যতা থাকিলে অনায়াসেই এই লোকটি

জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিত, আমার শরণাগত হইত না। লোকটি যখন আমার শরণাগত হইয়াছে এবং আমার চাকুরিটি দিবার ক্ষমতা আছে তখন ইহার একটু উপকার করিলে ক্ষতি কি? কেবল যোগ্যতা দেখিয়াই কি সর্ব্বত্র চাকুরী দেওয়া হয়? অনেক সময়ে ত যোগ্যতর ব্যক্তি থাকিতে সাহেব সুবোকে ধরিয়া অযোগ্য ব্যক্তিও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পাইয়াছেন।" ডিপুটী বন্ধুটী নিঃস্তব্ধ হইলেন।

জগদীশনাথ অতি অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন এবং ধনী ও নির্ধনের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। একবার কোনও নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সহিত তিনি শ্রদ্ধার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার এক ডেপুটী বন্ধু পরে অনুযোগ করিয়া বলেন যে বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তির সম্মুখে নিম্ন পদস্থ ব্যক্তির সহিত এইরূপ আলাপ করিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদের সম্মান আহত হইয়াছে মনে করিতে পারেন। জগদীশনাথ বলেন, যে কার্য্যক্ষেত্রে সে ব্যক্তি নিম্নপদস্থ হইলেও তাঁহার বাটীতে আসিলে তিনি তাহাকে শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

হিমালয়

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস

সকলের মাঝে তুমি চিরদিন রহিলে গো একা একাকী
পাষাণ পুরীর তুষার শীতল ঘরে,
প্রকৃতির এই রঙিন তুলিকা আঁকিলনা কোনও রেখা কি
হে গিরি, তোমার শুভ্র দেহের পরে?
দিকে দিকে তব উঠে কলরোল গুরু গরজন কত না,
ধেয়ান-মগন মৌন আসন মাঝে;
তোমা হতে নদী বিপুল বিভব ধরাতলে করে রচনা,
তুমি চিরদিন রহিলে ভিখারী সাজে।
ওগো উদাসীন মহা ভিক্ষুক, কী মহিমা তোমা ভরিয়া—
তুলনা-বিহীন, সুন্দর ভয়াবহ!
শঙ্কর-রূপ অঙ্কিল ঋষি তোমারে হৃদয়ে স্মরিয়া
হে গিরি আমার ক্ষুদ্র প্রণাম লহ।

সমাপ্তির পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

পাথরখণ্ডীর ভগীরথ দত্ত পৌষমাসে ছাপ্পান্ন বৎসরে পদার্পণ করিলেন এবং মাঘ মাসেই তাঁর একটি দাঁত পড়িয়া গেল—পড়িল উপর-পাটির সামনেরই বড় দুটি দাঁতের একটি, দক্ষিণ দিকেরটা। ভগীরথ এখন ডাঁসা পেয়ারা খান্ না—মাংসাশীও তিনি নন্; তবু তিনি দুঃখিত হইলেন। মাথার দশভাগ চুল আগেই পাকিয়াছিল; কলপ লাগাইয়া তিনি তাহা তরতাজা রাখিতেন। এবার মাঘে দাঁত পড়িল। সম্মুখের চুল ঈষৎ পাত্‌লা হইয়া আসিয়াছে—সেটিও বার্দ্ধক্যের ভাঙ্গন, তবে মর্ম্মান্তিক নয়···কিন্তু দাঁতের শূন্য স্থান যদি পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করিতে হয় তবে মেরামতের সরঞ্জাম লইয়া বার্দ্ধক্যের ভাঙ্গনের পশ্চাতে সে দৌড়ের শেষ যে কোনোদিনই আসিবে না!·· যার সাম্‌নের চুল পাত্‌লা সেই যে অশক্ত এরূপ সন্দেহ কেহ করে না; কিন্তু যার দাঁত পড়িয়াছে, শক্তির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আর তার স্থান নাই পরাজিত ও পশ্চাতে পরিত্যক্তের লাঞ্ছনা সর্ব্বসমক্ষে তার ললাটে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা পড়িয়া গেছে ··

অনেক দিন হইতেই ভগীরথ দাঁতের দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু সে কেবল নিজস্ব অনুভূতিই—সে দৌর্ব্বল্য লোকের চোখে ধরা পড়ে নাই। যাহা আপনিই লোকের চোখে পড়ে না তাহাকে ঢাকিবার জন্য আয়োজনের দরকার নাই; কিন্তু লোকের চোখে যাহা পড়িবেই তাহা ঢাকিয়া রাখিবার ব্যস্ত হইয়াও যদি ঢাকিয়া রাখিবার উপায় না থাকে তবে সে বড় বিপদ। ভগীরথ মাঘ মাসে এই বিপদে পড়িলেন।···বার্দ্ধক্যের পীড়নে শক্তির নিদর্শন, দেহের অংশ খসিয়া পড়িতেছে—এ বড় ভয়ঙ্কর।

দাঁতগুলি ভগীরথের গর্ব্বের সামগ্রী ছিল—যৌবনে তাঁর স্ত্রী শঙ্করী তাঁর দাঁতের প্রশংসা করিতেন; এবং এখনও ভগীরথের বিশ্বাস, যৌবনের প্রিয়া প্রিয়ের অধর স্পর্শ করিতেন কেবল সুসজ্জিত দাঁতের শোভায় মুগ্ধ হইয়া।... শঙ্করী সে বিষয়ে এখন নীরব হইয়া গেছেন—এমন কি, তাঁহাকে নির্লিপ্তই মনে হয়...তবু ভগীরথের প্রাণে যৌবনের 'জলতরঙ্গ' এখনও মাঝে মাঝে বাজিয়া বাজিয়া ওঠে।

যাহা হউক, ভগীরথের দাঁত একটি পড়িল...দাঁতটি খসিয়া আসিল প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময়—

ভগীরথ সেটিকে হাতের পাতার উপর রাখিয়া উলটাইয়া পালটাইয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক খানিক্ নিরীক্ষণ করিলেন... ভিতরের দিক্‌টা ঠিক্ কালো নয়—লাল রং গাঢ় হইয়া আসিতে আসিতে কালো হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে দেখিতে যেমন হয় অর্থাৎ পাঠার মেটের যে রং দেখা যায়, সেই রঙের ...উপরটা সাদা—অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ একটা রেখা রহিয়াছে —পাড়ে'র মত।...দাঁতের শিকড় ছিল কিনা দেখিতে যাইয়া ভগীরথ তেমন কিছু দেখিতে পাইলেন না—সঙ্গে শিকড়ের আঁশ লইয়া দাঁত খসিয়া আসে নাই।

দাঁতটিকে ভগীরথ টান মারিয়া ফেলিয়া দিলেন না—, যে সৌখীন যৌবনের আর পরিপাকপ্রিয় জীবনের পরমোপকারী সঙ্গী ছিল তাহাকে পরকালের প্রয়োজনে ব্যবহার্য্য করিয়া রাখিয়া দিলেন···

দাঁতটির এ-পিঠ্ ও-পিঠ্ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তিনি মাটি ছানিয়া একটি অনতিবৃহৎ ডেলা প্রস্তুত করিলেন... আঙ্গুল চালাইয়া তাহাতে একটি ছিদ্র করিলেন...দাঁতটিকে ডেলার ঠিক্ মধ্যস্থলে প্রবেশ করাইয়া ডেলাটা হাতের উপর নাচাইয়া নাচাইয়া তাহাকে নিরেট করিয়া তুলিলেন

দাঁতটি একেবারে অকীটবিদ্ধ কর্ম্মক্ষম ছিল স্মরণ করিয়া তাঁর একটি নাতিদীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল—

তারপর তিনি উঠিয়া যে-কাজে বসিয়া গেলেন তাহা আশ্চর্য্য…

মাটির ডেলাটা আনিয়া সযত্নে তুলসী তলায় নামাইয়া রাখিলেন—

…এতক্ষণে শঙ্করীর দৃষ্টি তাঁহার, অর্থাৎ অকেজো লোকের, কাজের দিকে আকৃষ্ট হইল; বলিলেন,—কি করছ?

ভগীরথ কাটারির অগ্রভাগ দিয়া তুলসীতলার মাটি খুঁচাইতেছিলেন…মুখ তুলিয়া বিমর্ষমুখে বলিলেন,—একটা দাঁত পড়্‌ল…বলিয়া দাঁত দেখাইলেন, যেটা পড়িয়াছিল সেটা নয়, মুখের গুলি।

শঙ্করী দেখিলেন, শূন্য স্থানটা নূতন বটে!

গর্ত্তের মাটি কুরিয়া কুরিয়া তুলিতে তুলিতে ভগীরথ বলিলেন,—আমার অস্থি রইল, মানে রাখ্‌লাম, এই তুলসীতলায়…নিজেই যেয়ে গঙ্গার জলে ফেলে' দিব একসময়।…আপনার লোক বল্‌তে ত' সেই জামাই দু'টো, আর ভাগনেরা…তারা ত' যমের মতই আপন…অস্থি নিয়ে গঙ্গায় দিতে তাদের বয়ে গেছে।…খবর পেয়ে তখন তোমায় যদি দেখ্‌তে আসে তা-ই ভাগ্যি মেন'।…তুমিও—

কিন্তু শঙ্করী বহুপূর্ব্বেই নিজের কাজে গেছেন—

মুখ ফিরাইয়া স্ত্রীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া ভগীরথ নিঃশব্দে গর্ত্তখনন সমাপ্ত করিয়া অস্থিসহ মৃত্তিকা পিণ্ডকে তুলসীতলায় সমাধিস্থ করিলেন।

যেখানে দাঁতটা ছিল, ভগীরথের অজ্ঞাতেই তাঁর বিরহী জিহ্বা সেখানে বিচরণ করিতে আসে—সে আর নাই, বৃথা জানিয়াও তাহাকেই যেন খুঁজিয়া বেড়ায়…

যে কথায় আপত্তি আছে কাহারো সেই কথায় দাঁতে কিরে কাটা ভগীরথের পুরাতন অভ্যাস…আগে সুসম্পূর্ণ দংশন ভালই দেখাইত—আপত্তিও জোরাল হইত; কিন্তু অন্তঃপুরে খসিয়া ইতিমধ্যেই দেখা গেছে দংশন এখন সম্পূর্ণ বসে না—আপত্তির জোর কমিয়া যায়; আর, দুই পাশে চাপ পাইয়া ভূতপূর্ব্ব দাঁতের শূন্য স্থানে জিহ্বা স্ফীত হইয়া ওঠে…

দাঁতের দুঃখে ভগীরথ ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন…অজীর্ণ রোগ কবে দেখা দেয় যেন!

ধ্বংসদেবতা নামে যতই ভীষণ হউক, তাঁর হাতে থাকে কেবল একটি তুলিকা, আর একটি সাঁড়াশী। তিনি যদি উপযুক্ত পাত্রের উপর তাহা কাজে লাগান্‌ তবে সেই কারণে সেই পাত্রের মানুষের উপর ক্রোধের কারণ কি থাকিতে পারে!

ভগীরথের অবশ্য মনে হয় নাই যে, দাঁত পড়িয়াছে বলিয়া রাগের কারণ ঘটিয়াছে…তবু তিনি রাগিয়া উঠিলেন।

ভগীরথের বন্ধু সদাশিব প্রাতঃকালীন ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন—হাতে নিজের হাতে প্রস্তুত বাঘ মুখো বাঁশের লাঠি রহিয়াছে…বাঘের মুখের উপর কাচের চোখ ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে।

আদরের লাঠিখানা হাতে করিয়া সদাশিব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।…ও-পাড়া সারিয়া এ-পাড়ায় পৌঁছিতেই সদাশিবের তামাকের তৃষ্ণা পাইল। ভাবিলেন, ভগীরথের কাছে একটু বসিয়া যাই…গভীরভাবে আলোচনার উপযুক্ত একটা ব্যাপারও সম্প্রতি গ্রামে ঘটিয়াছে।

সদাশিবের যাত্রা ভালই ছিল—অল্পেই ভগীরথের সাক্ষাৎ মিলিল—

ভগীরথ তাঁর বাড়ীর দুয়ারেই ছিলেন; বলিলেন,—এস।

সদাশিব ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলেন; আলাপ জমাইতে বলিলেন,—জেলেপাড়ার কথাটা শুন্‌লে ত'?

ভগীরথ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—শুন্‌লাম পরম্পর।

—কি আস্পর্দ্ধা বেটার! বুকের পাটাটা দেখ একবার!…সন্ধ্যেবেলা—চারিদিকে লোক ঘরে বাহিরে বেড়াচ্ছে ..তখন কি না!…দেখ বেটার সাহস! বলিয়া সদাশিব সাহসের প্রতিবাদস্বরূপ লাঠি দিয়া খুঁচাইয়া খানিকটা মাটি তুলিয়া ফেলিলেন।

এই প্রসঙ্গের উপরেই সদাশিবের বসিবার এবং তামাকু সেবনের নিমন্ত্রণ পাইবার কথা…কিন্তু একটা বিঘ্ন ঘটিয়া গেল—

জেলেপাড়ার কোনো এক গৃহস্থের তুষমন ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতে সন্ধ্যাবেলাতেই আসিয়াছিল, এবং ধরা পড়িয়া মা'র খাইয়া আধ-মরা হইয়াছিল···

সুতরাং গৃহস্থের সেই শত্রুর তুঃসাহসিকতার মধ্যে যে নির্ব্বুদ্ধিতা ছিল তাহাতেই ছিল ভগীরথের আপত্তি—

তিনি দাঁতে জিব্ কাটিলেন—

জিব্ আর দাঁত বাহির হইয়া পড়িল ·

সদাশিব ভগীরথের মুখের দিকেই তাকাইয়া ছিলেন: দেখিলেন, যেন শুভ্র যবনিকার গাত্রে ছিদ্র হইয়া ওপারের অসীম কৃষ্ণসাগর চোখে পড়িতেছে.. চম্‌কাইবার ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—দাঁত পড়েছে!···বলিয়া মুহূর্ত্তেক হা করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—তা' হ'লে ত' এইবার···

বলিয়া সদাশিব থামিয়া আর হাসিয়া আর বন্ধুর মুখের সাম্‌নে হাত তুলিয়া তুড়ি বাজাইয়া দিলেন—ফট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, যেন কেউ বাঁধন ছিঁড়িল··· ··

ইঙ্গিতটা পরকালের দিকে নিশ্চয়ই—

মুখে কিছু না বলিয়াও সদাশিব এমন স্থানের দিকে অব্যর্থ অঙ্গুলি তুলিয়াছেন যেখানে ভগীরথকে যাইতেই হইবে···যাওয়াই নিয়ম। ভগীরথ তা জানেন—

তথাপি তিনি রাগিয়া উঠিলেন—

বলিলেন,—দাঁত তোমার বাবার পড়ে নাই? তোমার মায়ের পড়ে নাই? তোমার পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহীর পড়ে নাই? তোমার পড়বে না?

ক্রমাগত এই কয়টি ব্যক্তিসম্পর্কিত প্রশ্ন করিয়া ভগীরথ তারপর বলিলেন,—যাও, বিরক্ত করো না। বলিয়াই তিনি পিছন ফিরিয়া অমঙ্গলের সঙ্গ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন।

এই অকারণ এবং আকস্মিক উগ্রতায় তামাকের তৃষ্ণা বিস্মৃত এবং অবাক্ হইয়া সদাশিব বিমুখ বন্ধুর পিঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন··তাঁর লাঠির মাথার বাঘের চোখ ছাড়া আর সবই যেন ম্লান হইয়া গেল।

হাস্যচ্ছলে মৃত্যুর আলোচনা ইতিপূর্ব্বে এত হইয়াছে যে তাহার ইয়ত্তা নাই···সেদিন যে দ্রুতগতিতে আসিতেছে ইহা ক্লেশের বা শঙ্কার বিষয় বলিয়া কাহারও মনে হয় নাই। "মরিলেই বাঁচি"—অভিমান এবং বীতস্পৃহামূলক এরূপ উক্তি ভগীরথের মুখে শোনা গেছে। মরিয়া এই যন্ত্রণাপ্রদ এবং অকৃতজ্ঞ সংসারের কবল হইতে তাঁর মুক্তিলাভের বাসনাটা যেমন কপট, সদাশিব 'এইবার' বলিয়া তুড়ি বাজাইয়া দিয়া অনতিদূরোপনীত কালের দিকে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাও তেমনি কপটতায় পরিপূর্ণ—

বহুবার উক্ত বাক্যের সরস পুনরাবৃত্তিতে রাগের কারণ কি থাকিতে পারে?

সদাশিব ভাবিলেন, বন্ধুর মন অন্য কারণে খারাপ আছে···তাঁহারও মন খারাপ হইয়া গেল।

সদাশিব চলিয়া গেলে ভগীরথ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ বেড়াইলেন···উঠানের ঘাসের ভিতর তু'টি কাঁটানটে,র গাছ বড় হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা উপ্‌ড়াইয়া ছিটে কঞ্চির বেড়া পার করিয়া ফেলিয়া দিলেন··তারপরে ভৃত্য রাখালকে সম্মুখে পাইয়া গরুগুলি কেন রোগা হইয়া যাইতেছে জানিতে চাহিয়া তাহাকে বিস্তর ভৎসনা করিলেন···

তারপর কার কাছে কি খুচরা পাওনা আছে মনে করিতে যাইয়া ভগীরথ দেখিলেন, খুচ্‌রা পাওনা যথেষ্টই আছে কিন্তু তাহা সকালবেলায় আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই···

তারপর তাঁর মনে পড়িল, ঋষি জোয়াদ্দারের দরুণ ক্ষেতটাতে চাষ দিয়া মুগ বপনের কথা ছিল...তাহাই কতদূর অগ্রসর হইয়াছে একবার তদারক করিয়া আসিলে হয়··· ভাগের জমিতে চাষ দিতে লোকের অবহেলা যেন দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে!

সুতরাং ভগীরথ ঋষি জোয়াদ্দারের দরুণ সেই ক্ষেতখানা যে মাঠে আছে সেই মাঠের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন···

কিন্তু পথে তাঁহাকে অপরে ডাকিয়া লইল···

জিব দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া অন্যান্য দাঁতের গোড়া পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন - জিব্ স্থিতিস্থাপক বলিয়া তাঁর ভ্রম হইতেছিল যে, সবগুলি দাঁতই নড়বড়্ করিতেছে···এমন সময় পথের পাশেই হেমাঙ্গ সেনের বৈঠকখানার ভিতর হইতে অনেকগুলি লোকের সুপ্রচুর কথাবার্ত্তার আওয়াজ আর উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ তাঁর কানে পৌঁছিল—

কৌতূহলী হইয়া ভগীরথ সেই দিকেই গেলেন···দরজা দাঁড়াইয়া বিড়ির গন্ধ নাকে পাইয়া তিনি গলার সাড়া দিলেন ···ঢুকিয়া দেখিলেন, অপরিচিত সেখানে কেহ নাই; ফরাসে বসিয়া গ্রামেরই কয়েকটি যুবক গল্প করিতেছে—মহীন্দ্র, ভবভূষণ, কাশীনাগ, সরসী প্রভৃতি।···দু'খানা তক্তাপোষ জুড়িয়া ফরাস পাতা, তিনটা বালিশ গড়াইতেছে; চেয়ার একখানা আছে বটে, কিন্তু তাহার উপর মানুষ ব সয়া নাই—উচ্ছিষ্ট চায়ের পাত্র, আর চায়ের পাত্রের উপর মাছি রহিয়াছে। চতুষ্পদ একখানা টেবিলের উপর সংবাদপত্র বিছাইয়া তাহার কর্কশ দেহে মসৃণ পরিচ্ছদ পরাণো হইয়াছে। টেবিলের উপর খবরের কাগজের মলাটওয়ালা স্কুলপাঠ্য পুস্তক দুই পংক্তি সাজানো রহিয়াছে।...মহাত্মা গান্ধির এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চিত্র বাণবিদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ ভাঙা কাঠি গুঁজিয়া গুঁজিয়া বেড়ার সঙ্গে আট্‌কানো রহিয়াছে: বেড়ার সঙ্গেই আট্‌কানো আর একখানা চৌকা কাগজে লেখা রহিয়াছে স্বাগতম্।

বিড়ির সব ধোঁয়া কেবল জানালা পথে নির্গত হইয়া যায় নাই—অন্য দিকেও তাহা প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়া ভিতরে গন্ধ ছিলই···ভগীরথের নাসারন্ধ্রে তাহা প্রবেশ করিল··কি ভাবিয়া তিনি একবার টানিয়া নিঃশ্বাস লইলেন তাহা কেউ জানে না; কিন্তু মহীন্দ্ররা তাহাতে লজ্জিত হইল; ভাবিল, এটা ওঁর অন্যায়।

মহীন্দ্র বহু সমাদর করিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল—

ভগীরথ বলিলেন,—পায়ে মাটি। বলিয়া তক্তাপোষের বাহিরে পা ঝুলাইয়া বসিলেন···বলিলেন,—আজ আমার বড় কুপ্রভাত হে!

যুবকেরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল! "বাড়ীর সব খবর ভাল ত'?"

ভগীরথ ওষ্ঠদ্বয় বিস্তৃত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন—

বলিলেন,—হাঁ, সে দিকে খবর ভালই চল্‌ছে। কুপ্রভাত আমার নিজের! বলিয়া একটু হাসিলেন, পরে ঠোঁট ফাঁক করিয়া দাঁত দেখাইয়া বলিলেন,—দাঁত একটা পড়্‌ল' আজ!

সমবয়স্ক বন্ধু' সদাশিবকে ভগীরথ এই ক্ষতিটা দেখাইতে চান নাই··তখন তুচ্ছ কথায় চটিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু যুবজনসমাজে বসিয়া তাহাকে প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত করিবার কি কারণ তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার সে মনের কথা তিনিই জানেন।

মহীন্দ্ররা শূন্যতার প্রদর্শনী দেখিয়া হাসিতে লাগিল—

ভগীরথ বলিতে লাগিলেন,—দাঁত পড়ুকগে।···বয়স হলে সবারই পড়ে।···অশুভ উল্কাপাতের মত আমার দাঁত পড়্‌ল ভেবে আমি ভয় পেয়েছি ভেবেছ? রামঃ!—বলিয়া ভগীরথ সবারই মুখের দিকে প্রদীপ্ত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন...তাঁহার অদৃষ্টাকাশে যে উল্কাপাত ঘটে নাই তাহা উহারা বিশ্বাস করিয়াছে কিনা তাহাই যেন তিনি প্রাণপণে দেখিতে লাগিলেন···মনে হইল, কাহারো সে বিশ্বাস নয়—তাহারা আদৌ শঙ্কিত হয় নাই।

ভবভূষণ বলিল,—আজ্ঞে, ঐ যখন নিয়ম তখন আমাদেরও একদিন পড়বে।

—সদাশিবকেও আমি স্পষ্টই বলে' এলাম তা-ই।... নিশ্চয় তোমাদের পড়বে একটি দু'টি করে' সবগুলি পড়বে··· মুখ দিয়ে কথা জড়িয়ে বেরুবে···পা চল্‌বে না, হাত উঠবে না···কাজের বাইরে যাবি একেবারে।

ভগীরথ থামিলেন—

কিন্তু হাপরের মত ফোঁস ফোঁস্ শব্দ করিয়া তাঁর নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল...

এবং নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত উহাদের মনে হইতে লাগিল, সবাই জানে যে বাঁচিয়া থাকিলে মানুষ বার্দ্ধক্যে অথর্ব্ব হয়—তাহা প্রতিদিনের জানিত সত্য···কিন্তু ভগীরথ এই সাধারণ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা উচ্চারণ করিয়াছেন যেন অভিসম্পাতের অসাধারণ উগ্রতা ঢালিয়া দিয়া! ··

হঠাৎ শক্ত করিয়া মুঠা বাঁধিয়া ভগীরথ বলিলেন,—খুল্‌তে পারিস্ কেউ?—বলিয়া তিনি ঘুষি চালাইবার মত করিয়া সজোরে তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ হাত উহাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলেন···

ভগীরথের হাড় মোটা নয়—

তাঁহার প্রসারিত শীর্ণ হাতখানা উহাদের চোখের সাম্‌নে এমন করিয়া কাঁপিতে লাগিল যে দেখিয়া করুণা জন্মে—

তাঁহার দুর্ব্বল মুষ্টি খুলিয়া পৌরুষ দেখাইতে কেহ হাত বাড়াইল না…

মহীন্দ্র তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে বলিল,—আমাদের সাধ্য কি খুলি?

সরসীও অক্ষমতার ঐ কথাটাই অন্যভাবে বলিল,—আমাদের কারো সে-ক্ষমতা নেই।

—দেখ্, আমার শক্তি এখনো আছে। নেই? বলিয়া ভগীরথ মুষ্টি সম্বরণ করিলেন।

তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেই মহীন্দ্র পুনরায় বলিল,—আছে বৈ কি।

ভগীরথের পরবর্ত্তী প্রশ্নটা আরো বিস্ময়জনক—

—আমি যদি এখন বিয়ে করি তবে—হঠাৎ আসিয়া ভগীরথ নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া মহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন…পরক্ষণেই 'তবে'র পর তিনি কেবল উচ্চারণ করিলেন "কেমন হয়?"

যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত তরুণ দেহের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া বিবাহিত জীবনের সুখ-তৃপ্তি-সম্ভোগে তিনি সক্ষম কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি পারিলেন না…উত্তপ্ত প্রাণের আবহ ব্যাপিয়া তাহা ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল…

মহীন্দ্ররা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া সমস্বরে বলিল,—তা' ভালই হয়।

ভগীরথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,— পারি কি না?

অর্থাৎ দন্তস্খলনের পরও এই বয়সে বিবাহে পরছিদ্রা-ন্বেষী সমাজের অনুমতি আছে কি না?

মহীন্দ্র বলিল,—খুব পারেন।

অর্থাৎ পরচর্চ্চানুরক্ত সমাজের অনুমতি অবশ্যই আছে।

—তা-ই বল্ রে তোরা।—পরমোৎসাহের সহিত এই কথা বলিবার পর ভগীরথের বুকের গুরুভার যেন নামিয়া গেল—তাঁহাকে আর কিছু না হোক, কিঞ্চিৎ নমনীয় দেখাইল।

যা'হোক একটা সমাধানের পর কথা যখন একটা শান্ত-ধারায় প্রবাহোন্মুখ হইয়াছে তখন নাবালক শ্যালকের হাত ধরিয়া বৈদ্যনাথ সাহার নব জামাতা 'অলষ্টার' পরিয়া দেখা দিল…

—আসুন, আসুন; কবে এলেন? আছেন কেমন?… ইত্যাদি প্রশ্নের সঙ্গে মহীন্দ্র উঠিয়া যাইয়া বৈদ্যনাথ সাহার জামাতার হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া দিল…

জামাই জুতা খুলিয়া উঠিয়া বসিল—

বলিল,—কা'ল সন্ধ্যার পর এসেছি।

ভগীরথ যে সম্মুখে রহিয়াছেন—তাহা সরসীর মনে ছিল—সংযমের সহিত বলিল—রা'ত পোয়াল বুঝি এখন?

জামাই হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল,—হুঁ।

কিন্তু ভগীরথের কানে উহাদের আলাপ প্রবেশ করে নাই—তিনি নির্নিমেষ চক্ষে জামাইয়ের দিকে চাহিয়া ছিলেন… ইহার যৌবন যেন আরো ভরাট্, আরো তাজা—

জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইটি কে?

জামাই নিজের পরিচয় দিল না; মহীন্দ্র বলিল,—বদ্যিনাথের জামাই।

জামাই হিসাবে এবং শিক্ষিত বাবু হিসাবে জামাই গণ্যমান্য আপনি আজ্ঞার পাত্র, কিন্তু এখনও মাথায় করিয়া ধানের ধামা হাট হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত টানে বলিয়া শ্বশুর মাত্র বদ্যিনাথ।

ভগীরথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি বদ্যিনাথের জামাই? কি করো?

মহীন্দ্র প্রভৃতির স্বভাবতঃই ইচ্ছা হইল যে, জামাইয়ের আগমনে আসর যখন নূতনত্ব লাভ করিয়া বিশেষ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়াছে তখন ভগীরথ উঠিলেই ভাল হয়…এম্‌নি সব মামুলী প্রশ্ন করিবেন ত' কেবল!

ভগীরথের প্রশ্নের উত্তরে জামাই বলিল,—আজ্ঞে, ক'ল্‌কাতায় আমাদের আড়ত আছে।

—কি নাম তোমার?

—শ্রীবুদ্ধদেব সাহা।

—বয়স কত তোমার?

—এই বাইশ।

বাইশে কি বিষ আছে কে জানে; কিন্তু ভগীরথ জামাইয়ের ঐ উত্তরের পরই ছট্‌ফট্ করিয়া আচম্‌কা বলিয়া বসিলেন,—বাবা, এ ফূর্ত্তি থাক্‌বে না চিরকাল…বাইশ থেকে বেয়াল্লিশ হবে—বেয়াল্লিশ থেকে বাষট্টি হবে তখনই চিৎ।—বলিয়া কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি চক্ষু ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন তাহা একটুও বুঝা গেল না।

বুদ্ধদেব জামাতৃসুলভ বিনয়ের সহিত বলিল,—যে আজ্ঞে, তা' হবে…কেউ তা' অস্বীকার করবে না।

—অস্বীকার? কারো বাপের সাধ্য আছে অস্বীকার করে?…ওহে থামো…আমিও একদিন বাইশ বছরের ছিলাম—কিসের কি স্বাদ তা' জানি।…এখনো—

গর্জ্জন অসমাপ্ত রাখিয়াই ভগীরথ হঠাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন……

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ছোট গ্রামখানি

শ্রীযুক্ত সুধীর মিত্র

ছোট গ্রামখানি শান্তির নীড়! ভালো বেসেছিনু তাই
কী যে মধু তার বুক ভরা ছিল, আজো তারে ভুলি নাই
স্নিগ্ধ-শ্যামল বনানীর বুকে সন্ধ্যা আসিত ছেয়ে,
সেই অবসরে গেছি নদী চরে তব অঙ্গণ বেয়ে,
যদি কভু তুমি বাতায়ন ফাঁকে গৃহ কাজ করি শেষ,
মধুর-আবেশে নদীটির পানে চেয়ে থাকো অনিমেষ!
আজিও সে নদী চলেছে তেমনি ;—তুমি কি তাহারই বুকে
এই অবেলায় স্তব্ধ-নিশায় ঘুমায়ে পড়েছ সুখে?

ঘুমায়ে পড়েছ? নহে নহে নহে,—হয়ত মনের ভুল
আমারি লাগিয়া আজো জেগে আছ ওগো মোর বুলবুল!
তোমারি কুটীর অঙ্গণ ঘিরি আজো ফুল ফুটিয়াছে
দেবদারু তলে আজিও বিরলে মালা গাঁথা পড়ে আছে,
সরু পথখানি দু-পাশে কি জানি ভুঁই চাঁপা থরে থরে
আপনার মনে বাড়িয়া চলেছে দীর্ঘ দিবস ধরে,
কবে তুমি সেথা আঁচল দুলায়ে চুপি চুপি গেলে হাঁটি
রাঙা-চরণের মধু-মঞ্জীরে—ধন্য হইল মাটি!

তবু ঘাটে এনু একেলা সন্ধ্যায়! মনে ভেবেছিনু বুঝি,
মোর পলাতকা গোপন প্রিয়ারে চকিতে পাইব খুঁজি!
ছল করে তুমি পইঠার পরে কলসী ভাসায়ে জলে,
যদি বসে থাকো ভুল হবে নাকো—তোমারে সাধিব বলে!
অভিমান-ভরা ছল ছল মুখ কত সুন্দর দেখি,
তুমি বুঝিবে না তাই ভয় মানি,—রাগ করিয়াছ একি!
আর কতখন বসি রবে একা, ওঠ বঁধু ওঠ ত্বরা
ভিজে চুল বেয়ে ঝরিতেছে জল! সাজে অভিমান করা?

ছোট গ্রামখানি! সন্ধ্যা না হ'তে নিশ্চুপ একেবারে
প্রাণলক্ষ্মীর দীপ জ্বলে নাক', কেন যে সুধাই কারে?
সবটুকু সুধা সাথে করি তুমি নেছ নিঃশেষ করি,
মৃত্যু নেমেছে এ ধরায় তাই, প্রাণহীনা শর্ব্বরী?
বন্ধু গো তুমি যদি ডাক দাও চোখে তাই নাই ঘুম,
রাত্রি আঁধিয়ার নাই কোন পার—বনভূমি নিঝ্ঝুম!
শুকতারা অই নিভে আসে যেন—রাত আর নাই বাকী,
আমার শিয়রে পা টিপে টিপে তুমি আসিয়াছ নাকি?

ও-পারের খেয়া শেষ হ'ল ঐ ;—কে যেন ডাকিছে পারে,
মত্ত-বাতাস হা হা করে হায় লুটাইছে মোর দ্বারে!
তুমি কি ডাকিছ হাত-ছানি দিয়ে? বেয়ে নিয়ে যাব তরী?
মোর নায়ে তুমি রাখিবে চরণ একবার ভুল করি?
কোন্ দূর-পথে আছ দাঁড়াইয়া কিশোরী লজ্জানত,
প্রথম প্রণয়-দীপ্ত নয়নে নব বধূটির মতো?
সন্ধ্যা তারার টিপটি পরেছ? জ্যোৎস্না রজনী ভরি
বহু যুগ পরে মিলনের বাঁশী উঠিল কি মর্ম্মরি?

আমি যাব আজ ভাসায়ে তরণী ডেকে ডেকে কূলে কূলে,
নিমিষের লাগি যদি তুমি সাড়া দাও গো মনের ভুলে!
যদি দীপ হাতে জনহীন রাতে দূর-সিন্ধুর পার
'ওগো নিরুপমা, মোর পথ চেয়ে থাকো তুমি অনিবার,—
হবে দেখা হবে সে আলো-শিখাতে এক লহমার তরে
শুভ-দৃষ্টির চকিত চাহনি—লব আমি বুক ভরে' ;—
তারপর যদি নিভে যায় দীপ,—তব কম্পন খানি
প্রথম রাতের মিলনের মতো নিঃশেষে লব টানি।

শ্রীসুধীর মিত্র

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চৌধুরী

ভারতীয় প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতি নামে চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে বিশেষ পদ্ধতি যে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা এবং আধিপত্য লাভ করিয়াছে, শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চৌধুরী তাহার অন্যতম প্রমাণ। অন্যতম প্রমাণ এইজন্য বলিলাম যে, যে-সকল শিল্পী চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতবর্ষের বাহিরেও, খ্যাতি লাভ করিয়াছেন সুধাংশু চৌধুরী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

কিছু কাল পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, বেশী দিনের কথা নয় বছর ত্রিশ আগেকার হইবে, তখন এই 'ভারতীয় প্রাচ্যকলা' বাক্যটির ব্যবহার পর্য্যন্ত দেখা যাইত না। তাহার কারণ, সে-সময়ে পাশ্চাত্য চিত্রকলার দাপটে ভারতীয় প্রাচ্য চিত্রকলা গিরিগুহায় এবং সিন্দুক-পেঁটরায় লোকচক্ষুর অন্তরালে মূর্চ্ছাহত; দেশী চিত্র বলিতে সাধারণে বাংলা দেশে বহুবাজার আর্টষ্টুডিয়োর অঙ্কিত নিকৃষ্ট চিত্র বুঝিত। শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত সম্প্রদায়ের নিকট সে-সকল চিত্রের আদর ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের শয়ন কক্ষে এবং বৈঠকখানায় ইয়োরোপের বড় বড় মাষ্টার-আর্টিষ্টদের, অর্থাৎ রাফেল, টিশিয়ান, 'মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতির চিত্রের প্রতিলিপি বিরাজ করিত। একদিকে নিকৃষ্ট দেশী ছবি এবং অপর দিকে উৎকৃষ্ট বিদেশী চিত্র, এতদুভয়ের তলে 'ভারতীয় চিত্র' নির্ব্বিবাদে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভা লইয়া নিদ্রিতা কলালক্ষ্মীকে সোনার কাঠির স্পর্শ দিলেন। সেই সোনার কাঠির স্পর্শে যে জিনিষ জাগিয়া উঠিল তাহা যদি ভারতীয় প্রাচীন কলা পদ্ধতির মাত্র নির্ব্বিচার অনুকরণ হইত তাহা হইলে তাহার পুনরায় নিদ্রাচ্ছন্ন হইতেও কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না। অবনীন্দ্রনাথের অপেক্ষা কিছুমাত্র হীনপ্রতিভার শিল্পী হইলে সেই দুর্ঘটনাই ঘটত, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ সেই অবজ্ঞাত কলাকন্যাটির মুখে এমন একটি নূতন আলোকের দীপ্তি মাখাইয়া দিলেন যে, তথায় একটি নব সুষমা জন্মলাভ করিল, মেয়েটি পুনর্জীবিত হইল। অবশ্য এ কার্য্যে তাঁহাকে প্রথম যুগে উপহাস অবজ্ঞা বিদ্রূপের অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইতে হইয়াছে। কিন্তু অত বড় প্রতিভাবান সাধকের অন্তর্দৃষ্টি এবং একনিষ্ঠ সাধনা নিষ্ফল হইতে পারে না, তাই তাঁহার 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'



শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চৌধুরী



বুদ্ধদেবকে নারীর প্রলোভন

অবশেষে এমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া হাউস চিত্রিত করিবার জন্য যখন সুদক্ষ চিত্রকরের প্রয়োজন হইল তখন বৃটিশ গভর্মেণ্ট ও ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক যে চারজন চিত্রকর নির্ব্বাচিত হইলেন তাঁহারা চারজনেই 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির' চিত্রকর। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চৌধুরী। বাকি তিনজনের নাম, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন, শ্রীযুক্ত রণদা উকিল এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মণ।

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর চৌধুরী ১৯২২ সালে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় প্রাচ্যকলা সমিতি'তে (Indian Society of Oriental Arts) শিক্ষার্থীরূপে প্রবেশ করেন এবং অবনীন্দ্রনাথের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষারম্ভ করেন। প্রাচ্যকলা সমিতির সহিত শিক্ষকতা বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাত কোনও যোগ না থাকিলেও তাঁহার নিকট শিক্ষার সাহায্য ব্যাপারে যে-কোনো শিক্ষার্থীর অবাধ গতি আছে। ক্ষিতীন্দ্রনাথও সময়ে সময়ে তাঁহার শিক্ষোৎসুক শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে গুরুপীঠে উপস্থিত হইয়া অবনীন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কোনো কার্পণ্যই নাই—তিনি প্রসন্নচিত্তে সকলকেই প্রয়োজন মত সহায়তা প্রদান



শ্যামদেশীয়া নর্ত্তকী

করেন। সুধাংশুশেখর এ-ভাবে অবনীন্দ্রনাথের নিকট হইতে সাহায্য লাভে বঞ্চিত হন নাই।

একাদিক্রমে তিন বৎসর 'ভারতীয় প্রাচ্যকলা সমিতি'তে শিক্ষা গ্রহণ করিবার পর দেশ-ভ্রমণের একটা প্রবল বাসনা সুধাংশুশেখরের চিত্ত অধিকার করে। তাহার ফলে তিনি সমিতির সংস্রব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে উপনীত হন এবং পদব্রজে উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের সমস্ত স্থান—পাহাড় পর্ব্বত অরণ্য ঘুরিয়া বেড়ান। সেই অবস্থায় রাজনৈতিক ব্যাপারে অবরুদ্ধ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাহার পর কিছুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া পুনরায় তিনি ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, পেনাঙ, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণে যান ও নিতান্ত ভবঘুরের জীবন যাপন করিয়া এক বৎসরের অধিককাল সে-সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর সন্ধানে অনুধাবন করিবার এই পথ নিষ্কণ্টক ছিল না—কয়েকবার তাঁহাকে বিপদেও পড়িতে হইয়াছিল।



দেশ-ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতা গভর্মেণ্ট স্কুল অফ আর্টসের চিত্র-প্রদর্শনীতে ছবি দিয়া তিনি প্রাচ্য শিল্প বিভাগের একটি পদক পাইয়াছিলেন। তাহার পর ১৯২৮ সালে দেশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই Indian

Museumএর কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার দুইখানি ছবি বিক্রয় করেন। সে দুইখানি ছবি Museumএর চিত্র-শালায় রক্ষিত আছে।

সেই বৎসরেই ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউস চিত্রালঙ্কৃত করিবার জন্য ভারতীয় শিল্পীদের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। ১৯২৯ সালে সুধাংশুশেখর এবং আর তিন জন বাঙ্গালী শিল্পী নির্বাচিত হইয়া উক্ত কার্য্যের জন্য বিলাত গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা কিছুদিনের জন্য Royal College of Art এর অধ্যক্ষ W. Rothenstien-এর অধ্যাপনায় ভিত্তি-চিত্র (Mural decoration) অঙ্কন পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন শিল্পীদের অঙ্কিত Mural painting দেখিবার উদ্দেশ্যে গভর্মেণ্টের ব্যয়ে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হলাণ্ড, ইটালী, বেলজিয়ম প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। সেই সকল স্থানে তাঁহারা অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সুধাংশুশেখরের ভ্রমণ-পিপাসু মন মাত্র একবার ঘুরিয়া আসিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, তাহার পরে আরও দুইবার তিনি কণ্টিনেণ্ট বেড়াইয়া আসেন।

ভ্রমণ শেষ করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়াই শিল্পী চতুষ্টয় নিজেদের কার্য্য আরম্ভ করেন। সুধাংশু বাবু ইণ্ডিয়া হাউসের Exhibition Roomএ দুইখানি চিত্র আঁকেন,—একখানির বিষয় বস্তু "আনারকলি", অপরটি "বনদেবী।" ইণ্ডিয়া হাউসের ডোমে তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করেন তাহার বিষয়-বস্তু—চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নারী-প্রহরিণীদের নিকট হইতে প্রাতঃকালীন অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রণদা উকিল Exhibition Room-এর দেওয়ালে যে দুইখানি ছবি অঙ্কিত করেন তাহার একটি "রাগিণী টোড়ি" এবং অপরটি "ইদের চাঁদ"। ডোমে অঙ্কিত ছবিটির বিষয়-বস্তু "পুরু ও আলেকজান্দার"।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্ম্মণ ডোমে ও ডোমের নিম্নদেশে ছবি আঁকিয়াছেন। ডোমের ছবিটির বিষয়-বস্তু মহারাজ অশোকের কন্যা বোধিদ্রুম লইয়া সিংহলে যাইতেছেন। অপরটির বিষয়-বস্তু,—মানবের অষ্টদশা।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন Library Roomএ এবং ডোমে ছবি আঁকিয়াছেন। Library Roomএ অঙ্কিত ছবির বিষয় বস্তু—বুদ্ধদেব শিষ্যদের ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। ডোমে অঙ্কিত ছবির বিষয় বস্তু—সম্রাট আকবর ফতেপুর শিকরীর নক্সা নিরীক্ষণ করিতেছেন।



দীপক রাগ

ইণ্ডিয়া হাউসের চিত্রাঙ্কণের কার্য্য শেষ করিতে প্রায় দেড় বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চার জন শিল্পী ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রকরগণের এবং জনসাধারণের



সম্মুখে বসিয়া (বাম হইতে)—শ্রীযুক্ত ললিত সেন, শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রণদা উকীল, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র দেববর্ম্মণ।
মধ্যে উপবিষ্ট (বাম হইতে)—রবীন্দ্রনাথ, লেডি রথেন্‌ষ্টীন, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।
পিছনে দাঁড়াইয়া (বাম হইতে)—General Secretary to the High Commissioner for India, Deputy High Commissioner, লেডি চ্যাটার্জ্জী, Sir William Rothenstien, Dr. Quale (Educational Secretary), Mrs. Palit, শিল্পী অতুল বসু, স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জী।

ষ্টুডিও—ইণ্ডিয়া হাউস্, লণ্ডন



ষ্টুডিও, ইণ্ডিয়া হাউস্, লণ্ডন
সুধাংশু চৌধুরী, রণদা উকীল, ললিত সেন ও ধীরেন্দ্র বর্ম্মণ

নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বহু সংবাদ পত্রেও চিত্রগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল—বাহুল্য ভয়ে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। শুধু সম্প্রতি India House হইতে সুধংশুবাবুকে Secretary for the High Commissioner (General Department) যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে Grosvenor House (Park Lane) Society Ball-এ "প্রবুদ্ধ চন্দ্রোদয়" নাটক অভিনীত হয়। তাহাতে সমস্ত stage decoration ও costume setting সুধাংশু বাবু করিয়াছিলেন। নিপুণ শিল্পীর সূক্ষ্ম কলারুচির স্পর্শে সমস্ত জিনিসটি সুষমামণ্ডিত হইয়া সকলের প্রশংসা উদ্রিক্ত করিয়াছিল।



ষ্টুডিও, ইণ্ডিয়া হাউস্, লণ্ডন
রণদা উকীল, সুধাংশু চৌধুরী, ধীরেন্দ্র বর্ম্মণ ও ললিতমোহন সেন

Dear Mr. Chaudhury,

.........You will be interested to know that His Majesty the King Emperor and Her Majesty the Queen Empress honoured India House on the 12th March with an informal visit and personally inspected your work and that of your colleagues.

সুধাংশু বাবু শীঘ্রই পুনরায় লণ্ডনে যাইতেছেন তাঁহার চিত্রাবলীর প্রদর্শনী করিবার জন্য। পরে তিনি ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার চিত্রগুলি প্রদর্শিত করিবেন। তাঁহার যাত্রা জয়যুক্ত হোক্।

আমরা এই প্রবন্ধে সুধাংশু বাবুর অঙ্কিত চারখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করিলাম।

সম্পাদক

—:•:—

বিবিধ সংগ্রহ

শ্রীচিত্রগুপ্ত

কি ধরণের পুরুষ মেয়েদের প্রিয় ?

আমেরিকার Stanford Universityর মহিলা ছাত্রদের সেদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে কি ধরণের পুরুষ তাঁরা পছন্দ করেন। তার উত্তরে তাঁদের অধিকাংশই বলেন "আমরা আদিমকালের গুহাবাসী দৃঢ়দেহ পুরুষ-সিংহের মতন পরিপূর্ণ পৌরুষের অধিকারী মানুষদেরই পছন্দ করি।" যে পাঁচশ' মেয়েকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো তার মধ্যে ৩২৫ জন মেয়েই ঐ কথা ব'লেছেন। আর মাত্র ১৫০ জন বলেছেন যে আমরা চাই সৌখীন এবং আদবকায়দা-দুরস্ত পুরুষ এবং বাকী ২৫ জন বলেছেন যে তাঁরা তাঁদের মনের মানুষটিকে পাবার আগে ও-বিষয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেই রাজি নন। অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে যে ধরণের লোককে মনে ধরবে তাঁকেই তাঁরা বরণ ক'রে নেবেন; এখন সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা তাঁরা করতে পারেন না।

যাই হোক না হ'লেই দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ মেয়েই মিষ্টি-হাসি ঢুলু ঢুলু আঁখি, সৌখীন পরিচ্ছদধারী মৃদু ধরণের মানুষের চেয়ে পরিপূর্ণ পৌরুষের প্রতীক্, প্রবলচেতা শক্তিধর পুরুষকেই বেশি পছন্দ করেন,—পৌরুষই যার একমাত্র গুণ—অর্থাৎ বাংলার মেয়েদের পরম সাধনার ধন যে মহাদেবের মত স্বামী—তাই। শক্তির প্রকাশে তিনি হবেন রুদ্র চণ্ড মহেশ্বর আর বেশবাসের প্রতি ঔদাসীন্যে হবেন তিনি সদাশিব ভোলানাথ। আর যে দেড়-শো মেয়ে রোম্যান্টিক্ টাইপের কার্ত্তিক পুরুষকে পছন্দ করেন বলেছেন তাঁরাও আমার মনে [redacted] কার্ত্তিক সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার অনুরূপ কার্ত্তিককে [redacted] কার্ত্তিকের রূপ এবং সৌখীনতার সঙ্গে পুরাণোক্ত [redacted] বীরশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিককেই তাঁরা চাইবেন। মিন্‌মিনে পুরুষকে চাইবেন না ব'লেই আমার মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যে আজকালকার অধিকাংশ তরুণরাই এ কথাটি যেন বুঝতে চাইছেন না; এবং এ কথা আমি কেবল কথার কথা হিসেবে বলছি না, এ-কথা বলার গুরুতর কারণ আছে। সেইটাই এইবার বলছি।

কথাটা হচ্ছে এই যে, মেয়েলীপনার দিকে ঝোঁকটা বর্ত্তমানে কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই একটু বেশি মাত্রাতেই দেখা দিয়েছে। প্রথমে ধরুন আমাদের দেশ। আমাদের দেশে অনেক পুরুষের যে মেয়েলীত্বের দিকে ঝোঁকটি কতখানি বেড়ে গেছে তার পরিচয় আমাদের শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয় পথে ঘাটে চলতে ফিরতেও প্রায়ই দেখতে পাই। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মাথার কেশ এবং বেশের বিন্যাসে অঙ্গরাগের ব্যবহারে এমন কি ঘড়ি, ছাতা, রুমাল সোয়েটার, পায়ের স্যাণ্ডাল, লেখবার ফাউণ্টেনপেনটি পছন্দ করবার সময়েও আমরা মেয়েদের ব্যবহৃত সুকুমার, সৌখীন এবং হাল্‌কা জিনিষগুলিরই পক্ষপাতী হয়ে পড়ি। তাই দেখেই পরলোকগত অমৃতলাল বসু মহাশয় ব'লেছিলেন যে আজকালকার নব্য সৌখীন কোন ছেলে যখন হাল্কা খাতাখানি দু'আঙুলে আলগোছে ধ'রে কলেজ ষ্ট্রীটে কলেজ যাবার জন্যে হেদোর মোড়ে ট্রামে চ'ড়েন তখন ইচ্ছে হয় যে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করি "মা লক্ষ্মী তুমি কোথায় পড় বেথুনে, না মহাকালীতে ?"

এই কথার পিছনে কতখানি বেদনা-বোধের মধ্যে কোন কঠোর সত্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে তা' সুধীমাত্রেই বুঝবেন। অবশ্য এর দ্বারা তিনি তরুণমাত্রকেই তিরস্কার করেন নি। মাত্র যে সম্প্রদায়ের তরুণদের মধ্যে তিনি ঐ

রকমের দুর্ব্বলতার পরিচয় পেয়েছিলেন তাদের সম্বন্ধেই তিনি ও-কথা বলেছিলেন। নইলে আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে পৌরুষের সন্ধান নেই এমন কথা কেউই বল্‌তে পারবেন না। সে যাই হোক যে সম্প্রদায়ের কথা হচ্ছিল তার কথাই বলি। ঐ সম্প্রদায়ের তরুণদের ভুল মনোবৃত্তির পরিচয় আর বেশী দেবার দরকার নেই। এখন ওঁদের ঐ মনোবৃত্তির-ফলটা যে মানুষের ভবিষ্যতের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি করে,তা' মানতেই হবে। অনন্তকাল ধরে প্রবহমান জগতের জীব-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে প্রকৃতির এই যে আয়োজন—যে পুরুষ পুরুষের মতো হবে এবং নারী নারীর মতো হবে,—এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে গেলে তার যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তার প্রমাণ আমরা পাই ইতিহাসে। ইম্পিরিয়াল রোমের ধ্বংসের কারণই তো হোল এই।

ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় হেন্‌রীকে কজন মেয়ে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তে পারেন? তিনি ছিলেন রাজা—সুতরাং পরিপূর্ণ মেয়েলীপনার চর্চ্চা কর্ব্বার তাঁর অবসর এবং উপকরণ এ দু'টোর কোনটারই অভাব ছিল না এবং তার ফলে করেছিলেনও তাই। তাঁর ধারণা ছিলো যে মেয়েদের যখন তাঁর চোখে সুন্দর লাগে তখন মেয়েলীত্বই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের মাপ-কাঠি। সুতরাং তিনি সুন্দর হতে গিয়ে প্রাণপণে নারী হবার সাধনায় লেগে গেছলেন। তখনকার মেয়েদের অনুকরণে তিনি সূক্ষ্ম কোমরের সৌন্দর্য্য লাভ কর্ব্বার জন্যে লোহার দৃঢ় কর্সেট্ ব্যবহার ক'রে তাঁর কোমরটিকে এত সরু ক'রে ফেলেছিলেন যে তখনকার সকল মেয়েই তাঁর সরু কোমরকে ঈর্ষার চোখে দেখ্‌তো, গালে প্রচুর পরিমাণে রুজ্ ব্যবহার ক'রে গাল দু'টিকে তিনি এত লাল ক'রে রাখ্‌তেন যে সব সময়েই তা'থেকে রূপসী তরুণীর কপোলের লজ্জারক্তিম আভার মতো আভা ফুটে বেরুতো! প্রচুর পরিমাণে কসমেটিক এবং গন্ধ দ্রব্য তিনি ব্যবহার করতেন। মাথার চুলকে তিনি অতিযত্ন সহকারে কুঁচিয়ে সেই ঘনকুঞ্চিত কেশ-দাম বাঁধতেন আর তার ওপর সৌখীন পালক এবং মণিমুক্তা-শোভিত ক্ষুদ্র একটা টুপী পরতেন। তাঁর কানের আকৃতি এবং সৌকুমার্য্য সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত গর্ব্ব ছিল এবং সেইজন্যে তিনি সেই কানে ইংয়ারীং পরবার জন্যে কান বিঁধিয়েছিলেন—এবং প্রতিকানে মণিমুক্তার দীর্ঘঝুলওয়ালা দুটো ক'রে মাকড়ী পর্‌তেন। কিন্তু এত ক'রেও তিনি মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী হতে পার্‌লেন না—সুতরাং মনে মনে তাঁর মেয়েলী সৌন্দর্য্যের কেউ প্রশংসাও করলে না; উপরন্তু পৌরুষের খ্যাতির অধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন। লোকের কাছে তিনি Homme-femene অর্থাৎ She-man আখ্যা পেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তবুও লোকে ভুল করতে ছাড়ে না এবং আজ বিলেতের ছেলেদের মধ্যেও এ অভ্যাসটি খুবই দেখা যাচ্ছে। তাই বিলেতের H. W. Seaman ব'লে এক ভদ্রলোক বিলেতের এক খানি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁদের এই মনোগতির বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন বর্ত্তমানে দেশের গভর্ণররা Budget, Sweepstake, Sunday Cinema প্রভৃতি বাজে জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে অথচ এখানকার ছেলেরা যে দিন দিন কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেদিকে কারো খেয়াল নেই এইটেই আশ্চর্য্য। তিনি বলেন যে বিলেতের ছেলেদের আকৃতি প্রকৃতি পছন্দ এমন কি তাদের চাল চলন এবং ভাষা পর্য্যন্ত দিন দিন যে রকম মেয়েলী হ'য়ে উঠ্‌ছে তাতে আর একপুরুষ পরে দেশে আর প্রকৃত পুরুষের অস্তিত্বই থাক্‌বে না। সুতরাং তার পরের পুরুষের অবস্থা যে কি হবে তা ভগবানই জানেন!

তিনি বল্‌ছেন—ছেলেদের মধ্যে আজকাল কেবল রঙীন সিল্কের পোষাক পরে প্রজাপতি সেজে বেড়ানোর ঝোঁকটা খুব দেখা যাচ্ছে; শুধু তাই নয় বর্ত্তমানে তারা পুরুষোচিত প্রকৃতিটি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে তার বদলে নারীজনসুলভ মৃদুতা আয়ত্ত করছে। তিনি বল্‌ছেন যে এই সেদিনই আমাকে প্রকাশ্যে এই ব'লে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে যে অনেকদিন আমি বন্ধুর হাত থেকে বন্ধুর ওপর এমন একটা আদরের অথচ দৃঢ় আঘাত বর্ষিত হতে দেখিনি যা দেখ্‌লে দুজনকেই প্রকৃত পুরুষ মানুষ ব'লে মনে হয়।

বর্ত্তমানে বিলেতে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ এমন দু'খানা ক'রে বই প্রকাশিত হচ্ছে যা'র পুরুষদের চরিত্রগুলি একান্ত ভাবে মেয়েলী ক'রে আঁকা; এমন কি তাদের কথোপকথনের মধ্যে স্থানে স্থানে "Frightfully" "awfully" "fear-

fully" প্রভৃতি এমন সব expression ব্যবহার করা হয় যে গুলো একান্তভাবে মেয়েরাই ব্যবহার করে থাকে। এখন এই সমস্ত মেয়েলী কথা পুরুষ-চরিত্রের মুখে এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে পড়্‌তে পড়্‌তে মাঝে মাঝে মনে করে নিতে হয় যে বইতে দুজন পুরুষের কথাই পড়্‌ছি, মেয়েদের কথা নয়। কিন্তু এজন্যে ঔপন্যাসিকদের আদৌ দায়ী করা যায় না, কারণ তিনি তাঁর সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সত্যরূপকেই তাঁর বইতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ত্তমানে ওখানকার ছেলেদের অনেকেই পরস্পরকে "Darling" "Dear" "Sweet heart" প্রভৃতি মিষ্টি সম্বোধনে ডাক্‌তে আরম্ভ ক'রেছে—জলদ গম্ভীর স্বরেই যে পুরুষের সৌন্দর্য্য-বিকাশ তা তারা আজ ভুলেছে। তাই তারা আজ কোকিলের স্বরে মিষ্টি কথা কইতেই যত্নবান, এমন কি তারা আজ কথায় কথায় লজ্জারক্তিম হয়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অশ্রুবর্ষণ করা পর্য্যন্ত বাদ দেয় না। তারা বোঝেনা যে এতে কেবল তাদের মেয়েদের ব্যর্থ অনুকরণ করাই সার হয় এবং এ ধরণের তোষামোদকে মেয়েরা সত্যিই আন্তরিক ঘৃণা করেন। Mr. Seaman বল্‌ছেন যে দেশের যুবকদের এই মহাভুল থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র মেয়েরা। দেশের মায়েরা বোনেরা এবং স্ত্রীরা যদি নিজেদের মনের মতো করে তাঁদের ছেলে ভাই এবং স্বামীকে সাজাবার ভার নেন এবং তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত কিনে দিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে পুরুষকে তাঁরা কি ভাবে দেখ্‌তে চান একমাত্র তা'হলেই ছেলেরা তাদের ভুল বুঝ্‌তে পারবে, নইলে তাদের ভবিষ্যত যে কি হবে তা বলা যায় না। তাদের এইটুকু বোঝা চাই যে—মৃদু-মলয় বীজনে, সঞ্চারিণী পল্লবিনী ললিত-লবঙ্গ-লতার মত হিল্লোলিত হ'য়ে অলস অপাঙ্গে চাইতে চাইতে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে থাক্‌লে মেয়েদের কাছ থেকে বিদ্রূপাত্মক বিরহিণী রাইকমলিনী আখ্যাই পাওয়া যায় এবং তেমন লোককে মেয়েরা কোন দিনই শ্রদ্ধা করতে পারেন না।

চুলের সাহায্যে চোরধরা

সকলেই জানেন যে মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ একজনের সঙ্গে আর একজনের মেলে না। এক্ষেত্রে এই সূত্রটিকে অবলম্বন করে পুলিশ ও ডিটেক্‌টীভদের পক্ষে অপরাধীদের ধরার ভারী সুবিধে। এবং আজকাল সেই জন্যে প্রায়ই সাংঘাতিক অপরাধীরা প্রাণপণ সতর্কতা অবলম্বন করেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে; কারণ যতই সতর্কতা অবলম্বন করুক, কখন কোন ব্যস্ত মুহূর্ত্তে ঘরের কোনস্থলে তার আঙ্‌ুলের একটু ছাপ ঘরের মধ্যে রয়ে গেল এবং সেটুকুকে মাত্র সম্বল ক'রেই পরে তাকে খুঁজে বার করে তার সমুচিত শাস্তি বিধান করা হোল।

কিন্তু তবুও পুলিশের চক্ষে ধূলা দেবার জন্যে চোরেরাও মাথা বড় কম ঘামায় না। তাই আজকাল অনেক ক্ষেত্রে তাদের আঙ্‌ুলের ছাপ সংগ্রহ করাও ক্রমশঃ শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারণ তারা পূর্ব্ব হতেই হাতে দস্তানা প্রভৃতি ব্যবহার করে আঙ্‌ুলের ছাপের সাহায্যে ধরা পড়বার সম্ভাবনা বন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি এদের ধরার আবার নতুন আর এক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। চিকাগো নর্থ ওয়েষ্টার্ণ যুনিভার্সিটীর সায়েন্টিফিক্‌ ক্রাইম্‌ ডিটেক্‌শন ল্যাবোরেটরীর বৈজ্ঞানিক Dr. Carlton Hood সম্প্রতি এই আবিষ্কারটি করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে মানুষের মাথার চুল নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের মাথার চুলকে ১৫৪৬ গুণে বর্দ্ধিত ক'রে তার ফোটোগ্রাফ নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে প্রত্যেক মানুষের মাথার চুল বিভিন্ন প্রণালীর এবং কারোর চুলের সঙ্গে অপরের চুলের বিন্দুমাত্রও মিল নেই। তিনি বলেন যে প্রত্যেক মানুষেরই দিনে অন্ততঃ দশ গাছি করে চুলও খসে যায় এবং কোন অপরাধ ক'রে পালাবার সময় তার অন্ততঃ একগাছি চুলও ফেলে যাবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। এবং সেই চুলের সূত্র ধ'রে অপরাধীকে খুঁজে বার করা খুবই সহজ। একগাছি চুল দেখে একথা তো ব'লে দেওয়াই যেতে পারে যে সে ভদ্রলোকের মাথার চুলের রঙ্‌ কি, কিন্তু তা ছাড়া এখন ঐ চুল দেখে একথাও ব'লে দেওয়াও যায় যে লোকটির মাথায় মরামাস আছে কিনা, তার মাথায় টুপি ছিল কিনা, সে কি উপায় অবলম্বন ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে, এমন কি তার বয়স কত তা পর্য্যন্ত চুল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লোকের পক্ষে বলা সম্ভব।

ডাঃ হুড্ বলেন যে তিনি এই চুলের সাহায্যে একটা হত্যারহস্যের সমাধান পর্য্যন্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

একবার একজন হিন্দু ব্যক্তি ওখানে খুন হয়, এবং তার হাতে খুনী লোকটির একগাছি চুল পাওয়া যায়। সেই চুলটি দেখে তিনি পুলিশকে এক বত্রিশ বৎসর বয়স্ক ফিলিপিনোর সন্ধান করতে বলেন এবং এও বলে দেন যে সে লোকটি ডিস্‌ধোয়ার কাজ করে এবং প্রায়ই সে খোলামাথায় বেড়ায় এবং তার মাথায় এমন একরকম রোগের চিহ্ন পাওয়া যাবে যার সন্ধান গরম দেশছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর এই নির্দ্দেশ মত পুলিশ হত্যাকারীর সন্ধান করে এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে তার ফলে তারা প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধানও পায়। এই দেখে বর্ত্তমানে মনে করা হচ্ছে অপরাধীদের ধরার এই নতুন উপায়টি মানুষের পক্ষে সত্যসত্যই কার্য্যকরী হবে।

ডাইনীর কাহিনী

হাঙ্গারীর একটি খবরে প্রকাশ যে আগে যেমন পিশাচ-সিদ্ধ ডাইনীরা জন-সমাজে আতঙ্ক উপস্থিত করতো এবং কারো কার্য্য-কলাপের মধ্যে কোন রকম অস্বাভাবিকতা দেখ্‌লে তার ওপর মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হোত—সেই রকম-ভাবেই সম্প্রতি সেখানকার একটি স্ত্রীলোকের মধ্যে জন-সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপের পরিচয় পেয়ে সেখানকার জোল্‌নক ক্রিমিন্যাল-কোর্ট (Szolnok Criminal Court) থেকে তাকে দু' বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এই স্ত্রীলোকটির অস্বাভাবিক সম্মোহন-শক্তি আছে বলে প্রকাশ। এর ক্ষুদ্র গ্রামে এ স্ত্রীলোকটি সকলের কাছে 'বুড়ো ডোব্‌রাল মা—' নামে অভিহিত হোত। দক্ষিণ হাঙ্গারীতে এই রকম প্রবাদ এবং এমন কি আদালতে সাক্ষ্য দেবার সময় পর্য্যন্ত নাকি অসংখ্য লোক রীতিমত হলপ্ পড়ে বলেছে যে এই পিশাচসিদ্ধ স্ত্রীলোকটি তার শক্তিবলে আজ পর্য্যন্ত কত রকমের লোকের কত বিভিন্ন রকমের ক্ষতি যে করেছে তার নাকি আর সংখ্যা নেই। এই দুষ্কৃতকারিণী নারী তার এই নীচ কাজে এতখানি সফলতা অর্জ্জন করেছিলো যে ফেরেন্স্ ভোয়েজিয়েসি ব'লে একজন Nerve Specialist ডাক্তার পর্য্যন্ত রীতিমত পরীক্ষা ক'রে দেখে মত প্রকাশ করেছেন যে এই পিশাচীর কবলে যারাই এসে পড়েছিলো এর অপকর্ম্মের ফলে তাদের সকলেরই স্নায়ু-মণ্ডলীর এতখানি ক্ষতি সংসাধিত হ'য়েছে যে তাদের মস্তিষ্কের প্রায় বিকৃতি ঘটবার উপক্রম হ'য়েছে। অনেক হতভাগ্য ভুক্তভোগী কোর্টে এসেও স্বীকার করেছে যে এই সর্ব্বনাশী তাদের উন্মাদ ক'রে দিয়েছে। এমন কি তার কারাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত নিজে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সে লোকটির ওপর হুকুম ছিলো যে সে যেন জেলের ওয়ার্ডে এই স্ত্রীলোকটির উপর কড়া নজর রাখে। সে বেচারী রীতিমতই তার কর্ত্তব্য পালন করেছিলো, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ডাইনী বুড়ি তার সম্মোহন-শক্তিবলে তাকে গাঢ়ঘুমে অচেতন ক'রে রেখে কারাগার থেকে পালিয়ে যায়। অবশ্য পরে আবার তাকে ধরে এনে বিচারালয়ে হাজির করা হয়।

যে আঠারো জন চাষী তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসেছিলো তারা কিন্তু কোর্টে এসেও তাকে দেখে ভয়ে রীতিমত জড়সড় হ'য়ে গেছ্‌লো। এমন কি পাছে তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে যায় এই ভয়ে তারা তার দিকে পিছোন করে দাঁড়িয়েছিলো। পরে Judge যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের ও-রকম করার অর্থ কি, তখন তারা বললে, "ওর চোখের দিকে চাইতে আমাদের ভয় করে কারণ যদি সে একবার ভালো ক'রে আমাদের চোখের দিকে তাকাতে পায় তাহ'লে সে যে আমাদের সম্মোহিত ক'রে ফেল্‌বে তাতে সন্দেহ নেই এবং তার ফলে সে তার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে আমাদের দিয়ে কোর্টের মধ্যে যা' তা' বলাবে। এবং তারা এও প্রমাণ ক'রে দিলে যে ইতিপূর্ব্বে ঐ স্ত্রীলোকটি ঠিক ঐভাবেই তাদের দিয়ে যা'ইচ্ছে তাই বলিয়ে নিয়েছিলো। ওখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেস্তোর"ার স্বত্বাধিকারী—কার্ল নেগী বলে এক ভদ্রলোক বল্‌লেন যে রাক্ষসী তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের একেবারে সর্ব্বনাশ করে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি বল্‌লেন "ও আমাদের পরিবারের প্রত্যেককে পৈশাচিক শক্তিবলে সম্মোহিত করেছিলো এবং কেউই ওর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কবল থেকে

অব্যাহতি পায়নি। আমার ছেলেকেও সম্মোহিত ক'রে তাকে দিয়ে এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করিয়েছিলো যার সঙ্গে তার কোন দিনই আলাপ ছিল না এবং সহজ অবস্থায় যার সঙ্গে ওর কোনদিন আলাপ করবার ইচ্ছেও ছিল না। এবং আমি যখন ঐ ডাকিনীকে ওর ইচ্ছামত অর্থ দিলুম না তখন ও আমাকেও সম্মোহিত ক'রে ইডা কারসাল্ ব'লে এক নারীর প্রেমে পড়তে বাধ্য করলে, কিন্তু অধীনের কথা বিশ্বাস করুন হুজুর যে আমি নিজে এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গও কোন দিন টের পাইনি।"

আরো অনেকে কোর্টে এই ধরণের নানা কাহিনী বিবৃত করেছে। কেউ বলেছে যে ডাইনী তাকে সম্মোহিত করে তাকে অপরিচিতা বিদেশিনী নারীর প্রেমে পড়িয়েছে কেউ বলেছে যে তার সঙ্গে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর বিবাদ বাধিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি।

এমন কি তারা তার এই পৈশাচিক শক্তির কবল থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করার ফলে তাদের ভীষণ হৃদ্রোগ কঠিন আন্ত্রিক-বেদনা প্রভৃতি নানা রকমের পীড়া ভোগ ক'রতে হয়েছে।

রুমানিয়াতেও এই রকম পৈশাচিক শক্তি সম্বন্ধীয় একটা মোকর্দ্দমা হ'য়ে গেছে।

আলেকজাণ্ডা এ্যান্টনিউ (Alexandar Antoniu) কোর্টে বিচারকের সমক্ষে এই আবেদন ক'রেছেন যে কোর্ট থেকে তাঁর পূর্ব্বতন প্রিয়া তাঁর ওপর যে পৈশাচিক শক্তি প্রয়োগ করে রেখেছে তা' প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হোক্। তাঁর পৈশাচিক শক্তি-সিদ্ধা এই স্ত্রী তাঁর স্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্য অপহরণ করেছে ব'লে তিনি তার সংস্রব একেবারে পরিহার করেছেন। বিচারালয় থেকে বিষয়টির প্রতি প্রখর মনোযোগ দেওয়া হয়েছিলো এবং তার ফলে ঐ স্ত্রীলোকটি একটি পাগ্‌লা-গারদে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

মানুষের ডানা

এবার যদি কেউ দেখেন যে পাখীদের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষরাও দিব্য ডানা মেলে উড়তে আরম্ভ ক'রেছে তাহ'লে যেন তিনি ভীত বা বিস্মিত না হ'ন; কারণ সে ভাবে যাদের উড়তে দেখবেন তারা কিন্নর কিন্নরীর মত অন্য জগতের লোক হবেন না—তাঁরা নিতান্তই আমাদের মতন মাটীর মানুষ! ব্যাপারটি বলি।

মিঃ এইচ্ ডিক্সন্ (Mr. H. Dixon) ব'লে একজন ব্রিটিশ আবিষ্কারক বল্‌ছেন যে তিনি কিছুকাল ধ'রে রীতিমত পরীক্ষা ক'রে ক'রে সম্প্রতি এমন চমৎকার দু'খানি ডানা আবিষ্কার করেছেন যা নাকি হাতে বেধে তিনি খুব শীগগীরই ইংলিশ চ্যানেলটি উড়ে পার হবেন এবং দেখিয়ে দেবেন যে তাঁর আবিষ্কারে সারা জগতের কতখানি মহৎ লাভ হ'ল। ইতিমধ্যেও যে তিনি তাঁর প্রতিভার বড় কম পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, অর্থাৎ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বাইসিক্লের প্যাড্‌ল্ লাগানো এক উড়বার যন্ত্র বার ক'রে তার সাহায্যে খুব খানিকটা উড়ে তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের কার্য্যকারিতা প্রমাণিত ক'রে ছিলেন। তারপরে তিনি বর্ত্তমানে আবার যে যন্ত্র বার করলেন তা হবে আরো বিস্ময়কর! এতে আর প্যাডল্ বা অপরাপর যন্ত্র পাতি নয় একেবারে দু'খানি ডানা যার সাহায্যে মাত্র নিজের শক্তিতে মানুষ ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতে সক্ষম হবে।

তাই বল্‌ছি যে পুরাকালের মানুষদের বিচিত্র কল্পনাকে আমরা কত বিদ্রূপ করে থাকি কিন্তু প্রত্যেকবারই বিজ্ঞান তার এক একটি আবিষ্কারের চমকে আমাদের মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। এক্ষেত্রেও তাই হোল—সুদূর অতীত কালে একদিন এইভাবে ওড়বার কল্পনা ক'রেছিলেন যে লিলিয়েন্‌থাল্ (Lilienthal) তাঁর কল্পনাকে আমরা একদিন ঠাট্টা করেছিলুম কিন্তু আর একজন তাঁর কল্পনার সত্যতা প্রমাণিত করতে চ'লেছেন।

ওড়ার কথা

এরোপ্লেন চালনায় ইংলণ্ড দিন দিন খুব উন্নতি করছে। গত ১৯২৫ সালে ইংলণ্ডে বিশেষ কৃতী Pilot বা বিমান-চালকের সংখ্যা ছিল ১১৭। কিন্তু গত বৎসরের হিসেব নিয়ে দেখা গেল যে গত দু'বছরে ইংলণ্ড ওবিষয়ে অনেকখানি উন্নতি করেছে। গত বছরের ওখানকার কৃতী বিমান

চালকের সংখ্যা হ'য়েছিলো দু'হাজার একানব্বই জন। বর্ত্তমান বছরে আরো ৪০০ জন নতুন বিমান চালক ওখানে তৈরী হবে ব'লে আশা করা যায়। এবিষয়ে ওখানে বর্ত্তমানে লোকের উৎসাহের অন্ত নেই। ইতিমধ্যে ওখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭টী ওড়বার ক্লাবই প্রতিষ্টিত হয়েছে। ওখানে ওড়া শিখ্তে গেলে বর্ত্তমানে ক্লাব এবং টিউশন ফি নিয়ে সবশুদ্ধ ১৮৯ টাকা খরচ পড়ে; তাছাড়া এয়ার মিনিষ্ট্রীর লাইসেন্সএর দরুণ পড়ে আরও পৌনে চার টাকা আর রয়্যাল এরো ক্লাবের সার্টিফিকেট্ ফি লাগে টাকা চোদ্দ। অর্থাৎ সব নিয়ে ওখানে বর্ত্তমানে ওড়া শিখতে তার সার্টিফিকেট্ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করতে দু'শোটাকারও ঢের কম খরচ পড়ে। সেই জন্যে সকলেই উড়্তে শেখ্বার জন্যে খুব উঠে পড়ে লেগেছেন।

বাঘের উপকারিতা

কিছুদিন আগে বিলেতে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান করবার উদ্দেশ্যে যখন চাঁদা তোলা হচ্ছিল তখন একজন দাতা চাঁদা স্বরূপ একটি সিংহ-শাবক দান করেন। চাঁদা সংগ্রহ কারক কিন্তু অনেক ভেবেও সেটি নিয়ে কি যে কর্ব্বেন তা ভেবে পেলেন না। শেষে সেটিকে তাঁরা দাতার হস্তেই ফিরিয়ে দেন।

কিন্তু বাস্তবিক এই সমস্ত হিংস্র জন্তু জানোয়ারও স্থলবিশেষে মানুষের কাজে আস্তে পারে। মিঃ ইষ্টন্ ব'লে বিলেতের এক রেসিং মোটরিষ্ট্ সেদিন এই ব'লে কাগজে এক বিজ্ঞাপন দেন যে তাঁর একটি প্রকাণ্ড রকমের বেঙ্গল টাইগার প্রয়োজন এবং সেটি আবার যতদূর সম্ভব বন্য এবং হিংস্র প্রকৃতির হওয়া চাই।

মিঃ ইষ্টন্ একটি এঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্মের বড় সাহেব। নতুন ধরণের এক মোটর গাড়ী প্রস্তুত করতে গিয়ে তাঁকে তার গঠন সম্বন্ধীয় কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। সেই সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে প্রকৃতির গঠনপদ্ধতি পর্য্যালোচনা কর্‌বার জন্যেই তাঁর বাঘটিকে প্রয়োজন। তিনি আশা করেন যে পাখীর দৈহিক গঠন এবং তার ওড়বার প্রণালী দেখে মানুষ এরোপ্লেন তৈরী করবার যেমন কতকগুলি সুবিধার সন্ধান পেয়েছে তেমনি এই বাঘটির শ্লো-মোশেন-ফিল্ম্ তুলে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরী করবার মত কোন কিছু নিয়মের সন্ধান তিনিও পেতে পারবেন যার দ্বারা এখনকার চেয়ে উন্নত ধরণের মোটরকার প্রস্তুত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না।

চিরজীবী হওয়া

কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্যের এক ল্যাবোরেটরীতে একটি মুরগীর বাচ্চার হৃৎপিণ্ডটির একুশ বছরের জন্ম-দিন অতিবাহিত হ'য়ে গেল। এতকাল পরেও জিনিষটি প্রথম দিনের মতই সজীব অবস্থাতেই বর্ত্তমান রয়েছে। এই দেখে মনে করা হচ্ছে যে এই ভাবে হয়তো এটাকে চিরকাল ধ'রে জীবিত রাখাও সম্ভবপর হবে।

কারণ যে কোনও জীবের হৃৎপিণ্ডই কতকগুলি শক্ত মাংসপেশীর সাহায্যে প্রস্তুত। এখন এই পেশীগুলি যে সময়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে তার কারণ হচ্ছে এই যে পরিশ্রমের ফলে এগুলির মধ্যে একধরণের বিষ সঞ্চিত হয়। এখন এই বিষ তার মধ্যে সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিকে যদি বিদুরিত করবার ব্যবস্থা করা যায় তা' হ'লে ঐ পেশীর শ্রমখিন্ন হ'য়ে পড়বার কোন সম্ভাবনাই থাকে না, এবং তার মধ্যে বার্দ্ধক্যের চিহ্নও কোন দিনই পরিলক্ষিত হয় না। উক্ত ল্যাবোরেটরিতেও ওই হৃৎপিণ্ডটির উক্ত টিষুগুলিকে সজীব রাখবার জন্যে তার মধ্যস্থ বিষ পরিহার করবার এই উপায়ই অবলম্বন করা হয়েছে। এবং তার ফল-স্বরূপ এটি এত দিন ধ'রে জীবিত রয়েছে। এই দেখে এখন বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে চিরজীবী করবার কোন একটি ব্যবস্থা করবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন। এবং তার ফলে একদিন যে তাঁরা কতকাংশে এবিষয়ে সফল হবেন না এমন কথা জোর ক'রে বলা চলে না।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী লোক

চীন দেশের অন্তর্গত "শ্যাং চুয়ান্" (Shang Chuan) নামক একটি গ্রামে লি-চিং-ইউন্ (Li-Ching-Yun)

বলে এক ভদ্রলোক বাস করেন, তার বয়স হচ্ছে দু'শো পঞ্চান্ন বছর!......আজ পর্য্যন্ত যত দীর্ঘজীবী লোকের বিবরণ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে তাঁর বয়সই সব চেয়ে বেশী! "North China Herald" বিশেষ অনুসন্ধানের পর তাঁর এই বয়সের হিসেব সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন এবং সত্য বলে ঘোষণাও করেছেন।

এই প্রবীণ লোকটি যে শুধু কোন রকমে কায়ক্লেশে প্রাণবায়ুটুকু ধারণ করে আছেন তা নয়, যাকে বলে রীতিমত বেঁচে থাকা সেই ভাবেই ইনি এখনো বেঁচে রয়েছেন। এঁর বয়েসের মধ্যে কত বাহাত্তর বছর তলিয়ে যায় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এঁর মধ্যে বাহাত্তর বছরের বার্দ্ধক্যসুলভ কোন দুর্ব্বলতা আত্মপ্রকাশ করেনি। এই বয়সেও এঁর অদ্ভুত স্মরণ শক্তির প্রখরতা দেখলে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। তাছাড়া এঁর চোখ এখনো একটুও খারাপ হয় নি, বিনা চশমায় ইনি অতি সুন্দর ভাবে পড়তে পারেন। এমন কি এই বয়েসেও একদিনে একশো 'লি' পথ (অর্থাৎ একশো লি পথ হচ্ছে প্রায় চল্লিশ মাইলেরও বেশি) অবলীলাক্রমে হেঁটে যাওয়াকে এমন কিছু শক্ত কাজ ব'লে তাঁর মনে হয় না। অথচ অধিকাংশ জোয়ান লোক ওর অর্দ্ধেক পথ অর্থাৎ কুড়ি মাইল রাস্তা হাঁটবার কথাও কল্পনা করতেই পারেন না। ইনি আজ পর্য্যন্ত সব' শুদ্ধ চোদ্দটি বিবাহ ক'রেছেন এবং সেই চোদ্দটি স্ত্রীর গর্ভে তাঁর সবশুদ্ধ একশো আশিটী সন্তান সন্ততি হয়েছে।

ইনি অতি সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করেন। ইনি চিকিৎসা বিদ্যায় বেশ নিপুণ। বহু দূরদেশ থেকে লোকে এঁর কাছে আসে এঁর মুখে দীর্ঘ-জীবন-লাভের উপায়টী শুনবে ব'লে। তা' উনি তাদের কাউকেই হতাশ করেন না। তিনি তাদের সকলকেই এই ব'লে উপদেশ দেন—যে যদি দীর্ঘজীবী হ'তে চাও তো—"হৃদয়কে শান্ত রাখ্‌বে—

কচ্ছপের মতন বস্‌বে—

পায়রার মতন হাঁট্‌বে—আর—

কুকুরের মতন হাঁট্‌বে—" যা'র অর্থ হচ্ছে এই যে মনের মধ্যে অশান্তি থাক্‌লে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় না। সুতরাং মনকে সব সময় নিরুদ্বেগ রাখ্‌তে হবে;—সাধ্যমত কিছুক্ষণ ক'রে নিরিবিলিতে ধ্যান করে মনের মধ্যে মৌন-জনিত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, বুকখানাকে রীতিমত উন্নত রেখে এমন ভাবে চল্‌তে হবে যাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অতি সহজ ও সুন্দর ভাবে চল্‌তে থাকে—এবং শরীরের প্রয়োজন অনুসারে শরীরকে নিদ্রার মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ দিতে হবে। তা হ'লেই মানুষের পক্ষে দীর্ঘজীবন লাভ করা খুব সহজ হ'য়ে আস্‌বে।

যাঁরা এই ভদ্রলোককে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছেন তাঁরা বলেন যে এঁর চেয়ে অন্ততঃ দু'শো বছরের ছোট যাঁরা, তাঁদের মুখের চেয়েও এঁর মুখে বেশী তারুণ্যের উজ্জ্বলতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তিনি প্রত্যহই সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। এবং মাঝে মাঝে প্রায় চল্লিশ মাইলেরও বেশি পথ তিনি এই সূত্রে হেঁটে ফেলেন—কিন্তু তাঁর পথচলার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিষ এই যে ইনি কখনই বেশি জোরে হাঁটবার চেষ্টা করেন না। বেড়াবার সময় ইনি খুব স্বাভাবিক গতিতেই হাঁটেন।

দু'শো বছর আগে অর্থাৎ এঁর যখন পঞ্চাশ বছর বয়স সে সময়ে ইনি যোদ্ধার কাজে লিপ্ত ছিলেন। এবং সে সময় ইনি সমগ্র প্রাচ্যভূখণ্ডের সর্ব্বত্রই বেড়িয়েছিলেন। মাঞ্চু রাজবংশের সম্রাট কাংশি কর্ত্তৃক সামরিক সম্মানের চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত বহু উপহার সামগ্রী এখনো এঁর কাছে আছে।

এঁর নিজ গ্রাম শ্যাং চুয়ানেতে। যে-কোন বিষয় নিয়ে যখনই কোন সমস্যা উপস্থিত হয় তখনই সে সমস্যা সমাধান করার জন্যে সকলে এঁর কাছে উপস্থিত হয়। এবং ইনি সকল বিষয় স্থিরচিত্তে শুনে কিছুক্ষণ চোখ মুদে থাক্‌বার পর ধীরে ধীরে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে সেই সমস্যার সমাধান ক'রে দেন। এবং এঁর প্রদত্ত বিচারকেই সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা পেতে গ্রহণ করে। বিশেষ ক'রে লোকে বিবাহসংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে মিঃ লীকে একেবারে দেবতার মতন শক্তিমান ব'লে মনে করে; কারণ পর পর চোদ্দটী মহিলার পাণিগ্রহণ ক'রে এবং তাদের

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবন যাপন করার ফলে ও বিষয়ে তাঁর যেমন জ্ঞান জন্মেছে তেমন জ্ঞান আর কার আছে ?

তাঁর বয়স সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে অনেকে চীনের গত দু'শো আড়াইশো বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ঘেঁটে বহু প্রশ্ন ক'রে এবং আরো হাজারো রকমে তাঁকে ঠকিয়ে অপ্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউই তাতে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। তাঁর আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর দীর্ঘ গত জীবনের সময়কার সকল ঘটনা হুবহু বর্ণনা করেছেন, এমন কি প্রত্যেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছেন সেজন্যে অনর্থক বেশী সময় নেন নি। তা'ছাড়া আরো নানা ভাবে তাঁর বয়সের প্রাচীনত্ব তিনি প্রমাণিত ক'রেছেন !

মিঃ লির সম্বন্ধে আর একটি প্রধান জিনিস যা লক্ষ্য করবার সেইটি হচ্ছে এই যে আজ পর্য্যন্ত বহু লোকে নানা ভাবে চেষ্টা ক'রেও কখনো তাঁকে রাগাতে পারে নি। ও বিষয়ে তিনি ভারী চালাক ! সে সময়েও তিনি ঠিক চুপচাপ কচ্ছপের মতন বসে থাকেন। তাঁর চিত্তের শান্তি-রক্ষার দিকে তাঁর সব সময়েই অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি থাকে। আর প্রধানতঃ সেই জন্যেই তিনি আজ দু'শো পঞ্চান্ন বছর ধরে মৃত্যুকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পেরেছেন।

জাপানী মনোবৃত্তি

চেরীফুল, ললিতকলা, ভূমিকম্প এবং শিষ্টাচারের দেশ, জাপানের সবই বিচিত্র! জাপানে কোন লোক কারুর বাড়ীতে শুধু মাত্র এক কাপ চা' খেলেও তাকে বলতে হয় যে আজ আমি আপনার বাড়ী উপাদেয় যে সমস্ত চর্ব্ব-চষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ খাদ্য-সম্ভার সাহায্যে ভূরি ভোজন সমাধা করলুম বহুদিন এরকম খাই নি! এবং যে ব্যক্তি খাওয়ায় সেও বলে যে আজ আপনি আমার বাড়ী অতি বিস্বাদ যে সামান্য মাত্র জল স্পর্শ করে আমাকে কৃতার্থ করলেন তাতে আমার বংশ পুরুষানুক্রমিক ভাবে ধন্য হয়ে গেল।

ওখানে আর একটি প্রথা বিদ্যমান আছে সেটিও বড় কম কৌতুকাবহ নয়। বর্ত্তমানে চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত জাপানী পুরুষ যুদ্ধে যোগদান করেছেন তাঁদের স্ত্রী এবং প্রণয়িনীরা নাকি এই বলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন—

"হে ঈশ্বর তুমি আমাদের সর্ব্বরকমে কাঙ্খণীয় বৈধব্য প্রদান করে আমাদের কৃতার্থ কর !"

সেখানকার প্রত্যেক মেয়ের এখন এইটেই সবচেয়ে ভাবনার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে পাছে তাঁদের প্রিয়তমরা কোন রকমে মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে জীবিত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন। অর্থাৎ একজন লোক যুদ্ধক্ষেত্রে যত বীরত্বই প্রদর্শন করুক যতক্ষণ না সে মরছে ততক্ষণ তার সুখ্যাতি লাভ করা দূরে থাক নিন্দা এবং অপমানের হাত থেকে তার কোনক্রমেই নিষ্কৃতি নেই বললেই হয়। সে মরলে তবে তার এবং তার স্বজনবর্গের প্রাণে শান্তি আসবে।

এর অবশ্য কারণও আছে। প্রভাত-সূর্য্যের দেশ এই জাপানের নরনারী সৃষ্টির আদিম কাল থেকে পৌরুষকে এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্য দিয়ে আসতে অভ্যস্ত; সুতরাং বহুকালের সংস্কারের বশে তাঁদের সে অভ্যাস আজ এইভাবে রূপান্তরিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সেটা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেচে যেটি আমাদের চোখে বাড়াবাড়ি ব'লেই মনে হয়। অনেকে বোধ হয় জানেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ছাড়া বাড়ীতে বংশানুক্রমিক ভাবে রক্ষিত একখানি তরবারির সাহায্যে হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে প্রাণত্যাগ করাও জাপানীদের পক্ষে বড় কম গৌরবের কথা নয়। এইভাবে প্রাণত্যাগ করার প্রথাকে জাপানে "হারাকিরি" ব'লে অভিহিত করা হয়।

সেদিন মেজর কুগান ব'লে জাপানের একজন সৈনিক যুদ্ধে আহত হয় এবং তাকে মৃত ব'লে অনুমান ক'রে কবরিত করা হয়। এদিকে চীনেরা কবর খুঁড়ে তাকে তুলে দেখে সে জীবিত, তখন তারা তাকে বন্দী করে এবং পরে জাপানীদের হাতে তাকে প্রত্যর্পণও করে। এই সমস্ত ঘটনার ফলে সে অপমানে এবং ক্ষোভে আত্মহত্যার চেষ্টা করাতে তাকে সেকাজে প্রবলভাবে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া মাত্রই লোকটি আত্মহত্যা

ক'রে তার কল্পিত মানকে বজায় রাখ্‌তে ইতস্ততঃ করলে না।

জাপানীদের আত্মসম্মান-বোধের তীব্রতা যে কতখানি বিকৃতি লাভ করেছে তা নিম্নলিখিত ঘটনা থেকেই আরো বেশী করে বোঝা যাবে।

একবার জাপানের কোন স্কুলে এক ইউরোপীয় শিক্ষক তাঁর এক অন্যমনস্ক ছাত্রকে চম্‌কে দিয়ে একটু মজা করবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ কৌতুকবশে তার সামনে তাঁর চশমার খাপ্‌টা ছুঁড়ে দেন। এখন কি রকম ভা'বে সে খাপ্‌টি ছেলেটির গায়ে গিয়ে একটু ঠেকে। ব্যস্‌—আর যায় কোথা! সমস্ত স্কুলশুদ্ধ ছেলে এই ব্যাপারে অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। এদিকে ব্যাপার কি বুঝ্‌তে না পেরে সে ভদ্রলোক একেবারে অবাক্‌ হ'য়ে গেলেন। শেষে অনেক কষ্টে ওদেরই মধ্যে একটু বয়স্ক এবং শান্ত-প্রকৃতির ছেলেকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লেন যে তাঁর ব্যবহারের দ্বারা ছেলেটি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছে, এমন কি এ অপমানের পর আর জীবনধারণ করাই হয় ত তার পক্ষে অসম্ভব ব'লে ঠেক্‌চে। বাস্তবিক হোলও তাই—তার এই অপমানের প্রতিকার-স্বরূপ ছেলেটি আত্মহত্যা করবার জন্যে একেবারে দৃঢ়-সংকল্প হ'য়ে বস্‌লো। শেষে অনেক ক'রে ক্ষমা চেয়ে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই ঘটনায় তিনি এমন দ'মে গেলেন যে তার পর থেকে তিনি তাঁর প্রতিটী কার্য্য-কলাপে অতিসতর্কতা অবলম্বন ক'রে চল্‌তে আরম্ভ কল্লে'ন।

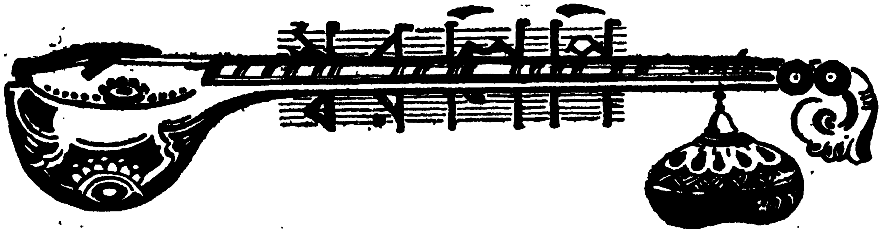
ভ্রম সংশোধন

গত ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার বিচিত্রায় যথাক্রমে ২৭০ ও ৪১৭ পৃষ্ঠায় যে দুইটি সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে সে গুলির ঘটনাস্থলের নাম করিতে মেসোপটেমিয়ার ইরাক-রাজ্যের স্থলে অনবধানতাবশতঃ পারস্যের অন্তর্ভুক্ত ইরাক-প্রদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া ভ্রমটি সংশোধন করিয়া লইবেন। চিত্রগুপ্ত

আষাঢ়

শ্রীযুক্ত করুণাময় বসু

কোথা তুমি চলে যাও আষাঢ়ের ওগো পান্থ মেঘ
কোন্‌ নিরুদ্দেশ পথে? বক্ষে তব যে স্তম্ভিত বেগ
নিরত দুঃসহ তাপে আবর্ত্তিয়া ওঠে ঊর্দ্ধপানে
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস রসে অশ্রুব্যাপ্ত বাক্যহারা গানে।
কোথায় পেয়েছ ভাষা? তাই তব রুদ্ধ বাণী ধারা
মানস-শৃঙ্গের তলে উৎসারিল বাধা বন্ধ হারা
শুষ্কতার জীর্ণদ্বার টুটি। প্রাণেরে আড়াল করি'
রচিয়াছে পলে পলে বৈশাখের রৌদ্র দাহ ভরি'
একখানি মরু আচ্ছাদন। তব মন্ত্র সুগভীর
ঢাকিয়াছে তপ্ত দাহ, যুগান্তের পাষাণ প্রাচীর
চূর্ণ হ'ল, লুপ্ত হ'ল এ বিশ্বের জনতার মাঝে।
আরামের কণ্ঠ রোধ করি' তোমার ডম্বরু বাজে।
হে প্রবল প্রলয় আষাঢ়, বাজে প্রগতির ভেরী,
মুক্তি যে আসন্ন হ'ল, ধ্বজা ওড়ে, আর নহে দেরী।
নিগূঢ় মৃত্তিকা-তলে জাগে তাজা প্রাণের অঙ্কুর
বাহিরে বিস্তীর্ণ করি,' কীর্ণ করি জয়-যাত্রা-সুর,
প্রাণের অরণ্য তলে মুহুর্মুহু দিয়ে যাও নাড়া,
তাই বুঝি সাড়া দেয় এতকাল সুপ্ত ছিল যারা।
অমৃত বন্যার ধারা ফেনাইয়া চলে দেশান্তরে;
আত্মা তোলে বৌদ্ধ বাহু, ভাষা ফোটে নির্ব্বাক অধরে।



গান

তোমার ভালবাসার পরশমণি
ছুঁইয়ে দিয়ে যাও গো যাও—
(আমার) মলিন কিছু বিষাদ কিছু
ধুইয়ে আজি দাও গো দাও !
তোমার প্রেমের কনক বরণ
আজকে আমি করব হরণ,
আজকে আমার জীবন মরণ
ঐ চরণ তলে মুছে নাও !

জানি তোমার মুখের হাসি
হে প্রিয়তম, উঠবে ভাসি—
আমার সকল ব্যথার রাশি
তোমার মাঝে আজ মিলাও !

কথা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

সা সা -া I
তো মা

II {সা সা ন্সরা । রা রা -া I রা রা গা । রা গপা মা I
ভা ল • • • বা সা র প র শ ম • • •

গা -া -া । (-া -া -া I গা পা পা । স্মা ধপা -া I
ণি • • • • • ছুঁই • • য়ে দি য়ে •

গরা -া -গা । রগা মপা পমা I গা -া -মা । রা গা সা)} I
যা • • • • • ও গো যা • • ও তো • মার্

গা গা মা I মা মা গমপা । পা পধা পর্সা I
আ মা র্ ম লি • • ন্ কি ছু • • •

ধর্সা গা -া । পধা পা -া I পা পধা ধপা । মা গা মা I
বি • ষা দ্ কি ছু • খুই • • য়ে আ জি •

রা গরা গা । মা পা পধা I গা পা মা । গা গরা সা II
দা • • • • ও • • দা ও গো তো মা • র্

{ গা মা রা । গা গা র্সা I র্সা র্সা নর্সর্রা । র্সা না -া I
তো মা - র প্রে মে র্ ক ন ক • • ব র ণ্

সা সগা গা । রা রা ধা I ধা নি ধনর্সর্রা । র্সা নি -া } I
আ • জ কে আ মি • ক র্ ব • • • হ র ণ

পা -া ধা । পর্সা -া -া I পা ধনা র্সর্রা । র্সা না -া I
আ • জ কে • • আ মা • • র্ জী বন্ •

নধা পা -া । পমা গা -মা I রা রা গা । রা পা মা I
ম র. • ণ ঐ • চ র • ণ • ত

ধপা -া -া । পমা গা -া I রা গরা গা । মা পা পধা I
লে • • • • • মু • • • ছে না • •

গা পা মা । গা গরা সা II
• ও গো তো মা • র্

{ গা গা -মা । পা না -া I না ধা নর্সা । না ধপা -া I
জা নি • তো মা র্ মু খে • র্ হা সি •

পা না না । র্সা র্রা র্গর্রা I র্সা নধা না । র্রর্সা না -া } I
হে • প্রি য় ত • ম্ উ • ঠ বে ভা সি •

গপা পা -া । হ্মা পা -া I হ্মধা পা -া । মা গা মা I
আ মা র্ স ক ল ব্য • থা র্ রা শি •

রা রা গা । বা পা হ্মা I ধপা -া -া । ধা না -া I
তো মা র্ মা • • ঝে • • • • •

নপা না পনা । ধা পা -া I গা পা মা । পা গরা সা II II
আ জ্ মি • লা • • • ও গো তো মা • র্

সন্ধ্যায়

কে, এম, সম্‌শের আলী

দিন শেষে প্রতীচীর অস্তাচল-চূড়ে
কনক-কিরীট খুলি' অতি সযতনে
রাখি' ধীরে দিন-পতি নিশা-অন্তঃপুরে
প্রবেশেন কর্ম্মক্লান্ত অলস নয়নে।
নীল চন্দ্রাতপ-তলে দীপ্ত নিশাকর
তারকার ফুলঝুরি ছড়া'য়ে চৌ-দিকে
জাগে সারা বিভাবরী। 'পিউ কাঁহা' স্বর
ঝঙ্কারে পাপিয়া। ফুল চাহে অনিমিখে।

সারা বিশ্ব জুড়ে' আজ সে কোন্ মায়াবী
কেতকীর সুরভিত মদিরা নিশ্বাসে
দূরাগত 'হাস্না'র মন্দার সুবাসে
রচে স্বপ্ন ইন্দ্রজাল, তাই বসে ভাবি।
আলো ছায়া দোলায়িত বিচিত্র প্রকৃতি
কোন্ মহা মহানেরে করিছে প্রণতি!

পুস্তক পরিচয়।

ইতি—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। দাম দেড় টাকা।

পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। শেষ গল্পের নামানুসারে বইএর নামকরণ। গল্পগুলি সেই ধরণের নয় যাহা এক কথায় ভাল কি মন্দ বলিয়া চুকাইয়া দেওয়া যায়। লেখকের সবল কল্পনা প্রতি গল্পে নানা বিচিত্ররূপ নিয়াছে। প্রথম গল্প 'অরণ্য' কয়েক বৎসর আগে এই বিচিত্রা'তেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ছোট্ট সঙ্কীর্ণ পটভূমি, অথচ তাহাতে এত বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ, প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—লেখকের শক্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। অরণ্য বলা হইয়াছে একটি জনবহুল বৃহৎ বাড়ীকে। সেই তেতলা বাড়ীর 'তেত্রিশটা ঘর থেকে একসঙ্গে তিয়াত্তরটা আওয়াজ' বাহির হয় একেবারে লোকারণ্য! এই বিপুল জনতার প্রত্যেকটি মানুষকে অচিন্ত্য বাবু ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়াছেন, একটির সহিত অপরটির এতটুকু মিল নাই। আজকাল অনেক নাম-করা লেখকদের সৃষ্ট চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় একের ছায়া অন্যের মুখে পড়িয়াছে। অচিন্ত্য বাবুর কোনখানে ত্রুটী দেখিলাম না। গল্পের শেষদিকে অরণ্যে যখন আগুন লাগিল, জনবহুল বাড়ীটার নিত্যনিয়মিত আবহাওয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত ও চারিদিকে সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া গেল লেখক অতি অভিনব কৌশলে খুব সহজে এতগুলি মানুষের বিচঞ্চল আশা আকাঙ্খার উপর যবনিকা পাত করিয়াছেন।

'ইতি' গল্পটি ছোট সহরের একটি অতিশয় সাধারণ সরলা পতিতা মেয়ের কাহিনী। নূতন থিয়েটার আসিয়াছে, তাহাদের বড় অভিনেত্রী অসুস্থ হইয়া পড়ায় রাণী সাজিবার জন্য এই মেয়েটির ডাক পড়িল। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু সরলাকে আবশ্যক হইল না, আসল অভিনেত্রী সারিয়া উঠিয়া অভিনয়ে যোগ দিল। কিন্তু অত্যাচার-জর্জ্জরিত ঐ মেয়েটির চিরাভ্যস্ত অন্ধকার মনে ঐ যে রোমান্সের আলো ঢুকিল, শেষ পর্য্যন্ত সে সেই রাণীই হইয়া রহিল।

কিন্তু আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিল, 'ধন্বন্তরী" গল্পটি। মৃত রোগীর বিভীষিকা—লক্ষ লক্ষ করতল প্রসারিত করিয়া রেবতীর জীবন-ভিক্ষা পড়িবার পর এ স্বপ্ন অনেকক্ষণ মনে জাগিয়া থাকে।

একটি দোষ আমাদিগকে পীড়া দিয়াছে। গল্পের কোন কোন জায়গায় কথাবার্ত্তার মধ্যে মিল ও অনুপ্রাস বহুলতা। এ ঝোঁক লেখককে কেন পাইয়া বসিয়াছিল, কে জানে।

বইখানার ছাপা সৌষ্ঠব চমৎকার। আর একটা কথার উল্লেখ করা দরকার—এই বই স্বচ্ছন্দে সকলের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়। আশা করা যায় বাংলা সাহিত্যে 'ইতি'র সমাদর হইবে।

শ্রীমনোজ বসু

ত্রিস্রোতা—শ্রীকুমুদনাথ দাস প্রণীত। প্রকাশক—বসাক, চৌধুরী এণ্ড কোং, নওগাঁ, রাজসাহী; ১৩৩৮; মূল্য দেড় টাকা।

কুমুদ বাবু "History of Bengali Literature" "Rabindranath : His Mind and Art" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন ও বহু পাশ্চাত্য মনীষিদিগের নিকট হইতেও প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে এমন সুন্দর বাংলা কবিতা লিখিতে পারেন তাহা আমরা জানিতাম না। এই পুস্তকে খণ্ড কবিতা ও প্রবন্ধ উভয়েই স্থান পাইয়াছে। মানবের প্রতি প্রীতি, প্রকৃতির প্রতি প্রীতি, ভগবানের প্রতি প্রীতি—এই তিনধারার সম্মিলনে এই 'ত্রিস্রোতার' সৃষ্টি। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। কবিতাগুলির যেমন গভীর ভাব তেমনি সহজ সরল ভাষা। কিন্তু

প্রবন্ধ ও কবিতা দুই একসঙ্গে না ছাপাইয়া কবিতাগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপাইলে কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইত। উপরন্তু নিকৃষ্ট ছাপা ও কাগজের দরুণ পুস্তকের বিশেষ সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। দামও অত্যন্ত বেশী হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

বাঁচবার পথ—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম্-বি প্রণীত। ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামোটা প্রয়োজনীয় কথায় পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। প্রসূতিমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, ছাত্রমঙ্গল, খাদ্যনির্ব্বাচন-সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় উপদেশ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

সনাতনী—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত ও প্রকাশিত, প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

লেখক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, এখন অবসর-প্রাপ্ত। তাঁর পেন্‌সন্-জীবন তিনি সাহিত্য চর্চ্চায় অতিবাহিত করবেন মনস্থ করেছেন। এটা আনন্দের কথা। লেখক গোঁড়া হিন্দুপরিবারের সভ্য কিন্তু তাঁর লেখনী সর্ব্বদা হিন্দুসমাজের গোঁড়ামী ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে অভিযানে রত। তাঁর লেখা অনেক বইতেই এ মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে।

বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানি কতগুলি গল্পের সমষ্টি। [এর একটা গল্প বিচিত্রার পাঠকদের নিকট পরিচিত।] প্রত্যেকটি গল্পে হিন্দু গোঁড়া সমাজের একটা না একটা দিকের দুর্ব্বলতা, অনিষ্টকারিতা, এবং কূপমণ্ডূকতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

এই লেখকের লেখা কতকাল বাঁচবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা অসমীচীন কিন্তু তিনি যে আন্তরিক উৎসাহ এবং মানসিক সম্পদ নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রসর, তাতে সমসাময়িক সাহিত্যে একটা ছাপ রেখে যেতে পারবেন বলে মনে হয়। লেখকের ভাষা বৈজ্ঞানিকের ভাষার ন্যায় শুষ্ক কিন্তু মর্ম্মস্পর্শী, বলবার ভঙ্গী বাহুল্য-বর্জ্জিত এবং গল্পের ঘটনাবস্তু বৈচিত্র্যময়।

গ্রন্থখানি আমার ভাল লেগেছে।

জরীনকলম

অবলা—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আট আনা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ হাইকোর্টের এটর্নী বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি ছোট গল্পে বর্ত্তমান সময় ও সমাজের নারী-সমস্যা নির্ণয়ে উজ্জ্বল চিত্র সামান্য এক একটি রেখাপাতে যেরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইবে। আধুনিক নানা বিভিন্ন ভাবের সংঘাতে নারীর জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং সমাজে ধীরে ধীরে তাহার প্রভাব আসিয়াছে, গল্পের ভিতর দিয়া নিপুণভাবে লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। গ্রাম্য অশিক্ষিতা মেয়ের স্বাভাবিক সরলতা, সহুরে শিক্ষিতা নারী-চরিত্রের দৃঢ়তা, বিনা দোষে নারীর সমাজে লাঞ্ছনা, হিন্দু-সমাজে উৎপীড়িতা নিরপরাধিনী নারীর আশ্রয় দানে বিমুখতা, পতি-হিতৈষিণী নারীর পতিকে অসৎসঙ্গ হইতে উদ্ধারের সফল চেষ্টা, অবাধ মেলামেশায় স্ত্রীচরিত্ররহস্য মূলতঃ এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা বাহুল্যতা-বর্জ্জিত, আধুনিক ছাঁচের, তবে গ্রন্থকারের নিজস্ব বলিবার একটি ভঙ্গী আছে এবং স্থানে স্থানে দুই একটি কথায় এক একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে আশা করি পাঠকদেরও ভাল লাগিবে।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

ফুলের ডালি—শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত প্রণীত। ছোট ছেলেদের গল্প পুস্তক। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। দাম আট আনা।

"ফুলের ডালি" পাঠ কালে বৈদ্যরাজ জীবকের কাহিনী মনে পড়িতেছিল।

একদা বুদ্ধদেব কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'ন। রোগ দিনে দিনে জটিল হইয়া উঠিতেছে, অথচ তিনি কোন ক্রমে ঔষধ সেবন করিবেন না। অন্যদিকে বৈদ্যরাজের পণ,

তথাগতকে রোগমুক্ত করিবেন। প্রত্যহ একটি প্রস্ফুট শ্বেত কমল সকৌশলে ঔষধে নিষিক্ত করিয়া তথাগতের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, শাক্যমুনি যেরূপ পুষ্প-বিলাসী তাহাতে কখনো-না-কখনো তিনি সে পদ্ম আঘ্রাণ করিবেন, এবং তাহাতেই রোগ দূর হইবে। ঘটিলও তাই। কয়েক দিনের মধ্যেই বুদ্ধদেব সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

কালক্রমে আমাদের দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য কিন্তু বুদ্ধের প্রভাব অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁর একগুঁয়েমী আমাদের শিশুদের মধ্যে নির্ব্বিকার ভাবে বিরাজ করিতেছে। যাহা বলা যাইবে, এই শিশু-সংঘ ঠিক তাহার বিপরীত করিবে। বিদ্রোহীদের বিদ্রোহী হইতে দিতে হইবে এবং বিদ্রোহের ভিতর দিয়াই তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকারে স্বাস্থ্যবান্ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রামেন্দু বাবুর "ফুলের ডালির" ফুলে যে কৌশল লুকায়িত আছে তাহা জীবকের কৌশলের অনুরূপ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়

শেষের দাবী—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। দাম ২।০—২৬২ পৃষ্ঠা।

এই সুদীর্ঘ উপন্যাসখানি একদিনেই শেষ করে ফেলা যায়। গল্পের ধারা অপ্রতিহত ভাবে বেয়ে চলে পাঠকের মনকে নানা রসে আপ্লুত করে রাখে। গল্পের নায়িকা উৎসা হিন্দুনারীর পতিপ্রাণতার প্রতীক। সে আধুনিক কালের শিক্ষিতা মেয়ে, কিন্তু যে পতিপ্রাণতার আদর্শ যুগ যুগ ধরে ভারতনারীর প্রতিটি শিরা সঞ্জীবিত করে রেখেছে আধুনিক কালের ইংরাজী শিক্ষায় সে আদর্শ তার অন্তরে একটুও ম্লান হয়নি।

লেখিকা উপন্যাস-সাহিত্যে অপরিচিতা নন। যে শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার জন্য তিনি লেখেন, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলির মত এ উপন্যাসখানিও তাদের আনন্দ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীমতী বেলা দেবী

সমাজতন্ত্রবাদ—শ্রীগোপাললাল সান্যাল প্রণীত, পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে সান্যাল বুক ষ্টোর কর্তৃক প্রকাশিত। ১০১ পৃষ্ঠা দাম ১৲।

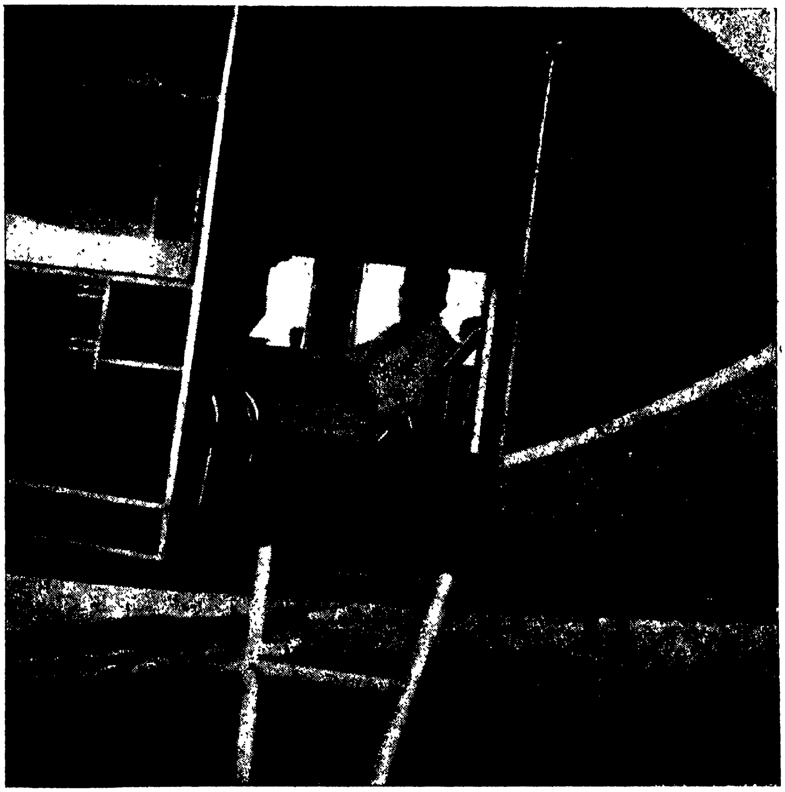
এই বিষয়ে বাংলা ভাষার বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনো পুস্তক রচিত হয় নি, এই খানিই প্রথম। কিন্তু শুধুই সেই জন্যে যে বইখানি প্রশংসনীয় তা নয়, অন্যান্য দিক থেকেও বইখানি উৎকৃষ্ট। Socialism বা সমাজতন্ত্রবাদ আন্দোলনের মোটা কথাগুলি সমস্তই অতি প্রাঞ্জল এবং সুললিত ভাষায় বিবৃত করা হ'য়েছে। অবশ্য মোটামুটি কথাগুলিই গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। খুঁটিনাটির মধ্যে যান্ নি,—যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। যে উদ্দেশ্যে বইখানি রচিত তা সফল হ'য়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। কলেজের পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা এ বইখানি পড়ে প্রভূত উপকার পাবেন। আমরা এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান জগতের চিন্তাধারার নানা দিক অবলম্বন করে এই ধরণের অথবা এর চেয়ে গভীর-তর ভাবে গবেষণা করে বাংলা ভাষায় আরো পুস্তক রচিত হ'বে। শ্রীযুক্ত গোপাললাল সান্যাল মহাশয় এই বইখানি রচনা করে বাঙালী সুধীবৃন্দের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

নানা কথা

রবীন্দ্রনাথ ও মুস্‌লিম-জগৎ

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্ণ তিনটার সময় ডচ্ এয়ার-মেলে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কলিকাতায় এসে পৌছেচেন। পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকৃতে পারে যে বিগত ২৯শে চৈত্র সোমবার ডচ্ এয়ার-মেলেই তিনি রওনা হ'য়ে গিয়েছিলেন। খুব বেশি দিন তিনি দেশ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু এই ক' দিনই আমাদের কাছে ত সুদীর্ঘ মনে হ'য়েছে বটেই, কবিরও মনে হ'য়েছে তিনি যেন সুদীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফিরলেন। এরোপ্লেন থেকে অবতরণ করেই তিনি রৌদ্রোজ্জল মাঠের উপর তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—এখানে কি সম্প্রতি বৃষ্টি হ'য়েছিল? তাঁর অনুমানের সমর্থন সূচক উত্তর পেয়েই তিনি বল্লেন,—বেশি দিন ত দেশ-ছাড়া হই নি,—কিন্তু মনে হ'চ্চে যেন অনেকদিন পরে দেশে ফিরছি। কবির এই অনুভূতি শুধুই যে তাঁর গভীর দেশ-প্রীতির সূচনা করে তা' নয়; তাঁর প্রবাসের সেই অবসরবিহীন দিনগুলিকে তিনি নানা কর্ম্মে এমনই ভরাট্ করে রেখেছিলেন, যে মাত্র দু' মাসকাল স্ফীত হ'য়ে দু' বছর প্রতিপন্ন হওয়াটাও কিছু



রবীন্দ্রনাথের ডচ্ এয়ার-মেলে পারস্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

অস্বাভাবিক নয়। এর উপর যখন মনে করি যে কবির বয়স একাত্তর পার হ'য়ে গিয়েছে তখন বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে পড়ে।

গত ষোলো বছর যাবৎ পৃথিবীর নানা দেশ মাঝে মাঝে পরিভ্রমণ করে তাঁর মিলন ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে রবীন্দ্রনাথ জগতের যে প্রভূত কল্যাণ-সাধন করছেন, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক তা' স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখ্‌বে। আশা করা যাক্‌, তাঁর এবারকার এই মুস্‌লিম জগৎ পরিভ্রমণে ভারতবর্ষের ঘরোয়া বিবাদের যুগের অবসানের সূচনা হোলো। তিনি সর্ব্বত্রই যে সমাদর ও অভ্যর্থনা লাভ করেছেন, তাতে মনে হয় ভারতবর্ষের প্রতি এসিয়ার অন্যান্য মুস্‌লিম দেশের একটা গভীর প্রীতি আছে। এই প্রীতি কবির অন্তরকে স্পর্শ করেছিল,—তাই তিনি বাগ্‌দাদ্‌ ম্যুনিসিপালিটির অভিনন্দনের উত্তরে একজায়গায় বলেছিলেন,—আজ তোমাদের কাছে এই আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছি,—এস আমরা পরস্পর মিলিত হ'য়ে বর্ত্তমান মানুষের অন্তর থেকে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও রাষ্ট্রীয় শঠতার বিষ সমূলে উৎপাটন করে ফেলি। তোমাদের ইতিহাসের গৌরবের যুগে আরব-সভ্যতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের অর্দ্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল; এবং আজও ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসীদের আশ্রয় করে আমার দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে আরব-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত আছে। আজ আরব-সাগর পার হ'য়ে আসুক তোমাদের বাণী একটা বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে; তোমাদের পুরোহিতেরা আসুক তাদের বিশ্বাসের আলো নিয়ে; জাতিভেদ সম্প্রদায়-ভেদ ও ধর্ম্মভেদ সমস্তই প্রেমের মধ্যে অতিক্রম করে সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের পতাকাতলে তারা মিলিয়ে দিক। মানুষের মধ্যে যা' কিছু পবিত্র ও শাশ্বত তারই নামে আজ আমি তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা জানাচ্ছি, তোমাদের মহানুভব ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতার নামে আজ আমি তোমাদের অনুরোধ করছি,—মানুষে মানুষে সখ্যের আদর্শ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার নির্ব্বিবাদে সহ্য করার আদর্শ, সহযোগিতার উপর সভ্য-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাতৃ-ভাবের আদর্শ আজ তোমরা সকলের সম্মুখে প্রচার কর। আমাদের ধর্ম্ম-সমূহ আজ হিংস্র ভ্রাতৃ-হত্যার বর্ব্বরতায় কলুষিত; তারই বিষে ভারতের জাতীয় চেতনা জর্জ্জরিত, স্বাধীনতার দিকে ভারতের অভিযান আজ বাধাপ্রাপ্ত। তোমাদের কবিদের, তোমাদের চিন্তা-বীরদের বাণী আজ ভারতবর্ষের চিত্তে স্থৈর্য্য সম্পাদন করুক,—ইত্যাদি।

কবির প্রাণের এই আকাঙ্খা যোগ্যপাত্রেই নিবেদন করা হ'য়েছিল,—তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমস্ত মুস্‌লিম-জগতের অধিবাসীদের কবির প্রতি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদনের ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা থেকে। সেই জন্যই কবি পারস্যদেশে অতি অল্পকাল অবস্থানের মধ্যেই প্রাণের মধ্যে একটা স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করতে পেরেছিলেন। পারস্য মজলিসের (Persian Parliament) সদস্য জনাব্‌ দষ্টিকে কবি বলেছিলেন, "আমার এখানকার দিন ফুরিয়ে এল,—বেশিদিন এখানে আসি-ও নি, তবুও আমার মনে হ'চ্চে না যে আমি এখানে বিদেশী। আপনাদের ভাষা আমি জানি না, তবুও কেমন করে আপনাদের এত কাছে এসেছি, আপনাদের কাছে নিজেকে এমন ভাবে ব্যক্ত করতে পারছি,—আপনাদের বন্ধুত্বের নিবিড়তা প্রাণের মধ্যে অনুভব করতে পারছি,—তা ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। আপনাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে বেশি পার্থক্য নেই; প্রকৃতি এবং প্রাণের সাধারণ অন্তর্দৃষ্টি,—আমাদের উভয়েরই অনেকটা এক"। একথার সমর্থন করে জনাব্‌ দষ্টি উত্তর করেছিলেন, "বুসাইরে আপনি যে আমাকে বলেছিলেন যে আপনি প্রাচীন ভারতকে আবিষ্কার করার জন্য পারস্যে এসেছিলেন সে-কথাটা খুবই সত্য। পারস্যের অন্তরতম যে প্রাণ সে ত প্রাচীন ভারতেরই; ইতিহাসের ধারা বেয়ে সুদূর প্রাচীন যুগে চলে গেলে দেখা যাবে যে একদিন ভারতের ও পারস্যের কাল্‌চার একই ছিল। এখনো পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে একটা আন্তরিক যোগ আছে; তাই এখানে আপনার মনে হ'চ্চে আপনি যেন দেশেই আছেন"।

বস্তুত শুধুই পারস্য ও ভারতের মধ্যে নয়, সমস্ত এসিয়ার মধ্যে যে একটা কৃষ্টিগত ঐক্য আছে, সেইটে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার দিন এসেছে,—এই বাণীই কবি ইরাণ

দেশকে দিয়ে এসেছেন। য়ুরোপ আজ এত বড়ো, তার কারণ য়ুরোপের অন্তর্গত সমস্ত দেশই আপন আপন ভাষা সাহিত্য শিল্প ও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ভিতর দিয়ে সমগ্র য়ুরোপেরই সাধারণ কৃষ্টির ইমারাতে ইঁটের পর ইঁট গেথে চলেছে। এশিয়ার অন্তর্গত দেশ-সমূহের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের সুবন্দোবস্ত এখনো হয় নি, তাই নিখিল-এশিয়ার অন্তর্নিহিত ঐক্যটির নিবিড় উপলব্ধির সুযোগ আমরা পাচ্চি না। অথচ আজ য়ুরোপ ও এসিয়া পরস্পরের এত নিকট সংস্পর্শে এসে পড়েছে যে এসিয়া যদি আজ তার অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন দেশগুলিকে একটা ভাবগত ঐক্যের মধ্যে সম্মিলিত করে জেগে উঠ্‌তে না পারে,—তবে তার ফল ভালো হ'বে না, য়ুরোপের পক্ষেও নয়, এসিয়ার পক্ষে ত নয়ই। এজন্যই জনাব দষ্টি যখন বলেছিলেন যে তিনি চান পারস্যদেশ ষোল আনা আমেরিকন্ কাল্‌চার আত্মসাৎ করুক তখন কবি প্রতিবাদ করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। জনাব্ দষ্টি বলেছিলেন, যে বিদেশী প্রভাবকে ভয় করবার কিছু নেই,—কেন-না আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন কিছুতেই হতে পারে না। অতএব পারস্যদেশ যদি ষোল আনা আমেরিকান্ কাল্‌চার আত্মসাৎ করতে পারে তবে পারস্যবাসী অন্তরে পারস্যবাসীই থেকে যাবে অথচ আমেরিকান্ জীবনযাত্রা-প্রণালীর সুখ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবে। বলা বাহুল্য কবি এ-কথায় সায় দিতে পারেন নি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রা-প্রণালী যে সর্ব্ববিষয়েই উৎকৃষ্ট সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে, তা' নিয়ে এখনো বহু পরীক্ষা চল্‌ছে। সে দেশে যন্ত্রের শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের আত্মা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ছে। য়ুরোপে যাকে বলা যায় পুরাদমে আধুনিক জীবন-যাত্রা তা' কেবল মানুষের শারীরিক প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত; মস্ত মস্ত হাওয়া-গাড়ী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদের রোজ রোজ নূতন নূতন ব্যয়সাধ্য ফ্যাসানের আমদানী,—এই সব নিয়েই যদি অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাক্‌তে হয়,—তবে মানুষে মানুষে মিলিত হ'বার সময় কই? আত্মোপলব্ধির অবসর কোথায়? যা' কিছু

জীবনটাকে মহৎ ও গরীয়ান্ করে তোলে তার চর্চ্চা করার অবকাশ কোথায় ? অথচ য়ুরোপের কাছ থেকে আমরা সত্যই যে জিনিসটা চাই, অর্থাৎ বিজ্ঞানের দান, তা য়ুরোপের কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করলেও সেটা য়ুরোপের একার সম্পত্তি নয়, সেটা সার্ব্বজনীন। আসল কথা,—অনুকরণ জিনিষটাই মন্দ ; কেন-না বাইরের নশ্বর বস্তুগুলোকেই আমরা অনুকরণ করতে পারি, অন্তরের সত্যকে নয় ; তাই কবি এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—"If any nation or a people have been successful in giving shape to ideals which are of perennial value what we have to learn from them is their capacity to absorb and establish these ideals, we must not merely copy the results that others have produced. *That is my point*—I am not against absorbing truths which are of universal value,—as a matter of fact, it is our human birthright to claim such truths as our own —but I am against borrowing ready-made models or emphasizing upon the need of imitating isolated external facts which are peculiar to a particular race or a nation" বস্তুতঃ যা' কিছু শাশ্বত সত্য,—তা' সর্ব্বকালের সর্ব্বজাতিরই সম্পত্তি। সত্যের এই সার্ব্বজনীনতা অন্তরের মধ্যে অনুভব করা চাই,—সেইখানে অসংখ্য পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষে মানুষে মিল্‌তে পারে ; কিন্তু এক জাতি তার জাতীয় বিশিষ্টতা অনুসারে সেই সত্যের যে বাহ্যিক রূপ দিয়েছে, অন্যজাতির পক্ষে সেই রূপের অন্ধ অনুকরণ করাটা মৃত্যুর পথ, কল্যাণের না ; প্রত্যেক জাতিকে তার জাতীয় বিশিষ্টতা অনুসারে নূতন নূতন অধিকৃত জ্ঞানের আলোকে জীবনের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে এবং সাহিত্যের মধ্যে, শিল্পের মধ্যে, সাধারণ [illegible]-যাত্রার মধ্যে সেই সত্যের রূপ ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'বে—[illegible] হ'ল জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির নিয়ম। তাই [illegible] দেশেই জাতীয় শিক্ষার এমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার যার মধ্যে আপনাকে জান্‌বার ও আত্ম-প্রকাশ করবার এবং অন্যকে জান্‌বার এবং অন্যের সঙ্গে মিলিত হ'বার সমান অবসর থাকে। পারস্যদেশে অধ্যাপকদের কবি তাই বলেছিলেন,—"My dream is to offer to our students a continental background of mind a background in which have been co-ordinated the experiences of ages, the intellectual and spiritual experiments made in Asia for long generations"। উত্তরে অধ্যাপকেরা বলেছিলেন। "you appear, Sir, as a prophet and spokesman of Asia's great dreams ; through you, we are beginning to realise the nature of the work which we educationists have before us. Though we get your message through the unsatisfying medium of translation, your speech brings it very near to our soul,"

* * *

সুখের বিষয় কবির পারস্য-ভ্রমণের ডায়েরী কবি নিজেই রেখেছেন,—তা' শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'বে। ইতিমধ্যে উপরে-যে বিবরণগুলি প্রকাশ করলাম, তা' 'লিবার্টি'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর চিঠিগুলি থেকে আমরা পেয়েছি। কবির পারস্য-ভ্রমণের এই যথা-সম্ভব বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করার জন্য 'লিবার্টি'র কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এগুলি পড়ে আমাদের দেশের নেতারা,—যাঁরা আজও তুচ্ছ সাম্প্রদায়িকতার লড়াইয়ে মেতে আছেন,—তাঁদের যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটু লজ্জা হয়, তাহলে 'লিবার্টি'র কর্ত্তৃপক্ষের এই আয়োজন সার্থক হ'বে।

ভাবতেও বেদনা বোধ হয় ও লজ্জা লাগে,—যে-দেশের কবি তাঁর আজীবন সাধনা দ্বারা বিশ্ব-জীবনের মূলমন্ত্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার সুর থেকে ছিন্ন করে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর সহযোগিতার সুরে বেঁধে দিলেন যে-দেশের কবির আহ্বানে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক সাড়া দিল, সেই দেশেরই কবির গানে সেই দেশেরই লোক এখনো জাগ্‌ল না! তারা এখনো দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত ; ব্যবস্থাপক সভার আসন নিয়ে ও রাজ-সরকারের চাক্‌রী নিয়ে মারামারি! কর্ত্তৃত্বের শক্তি অর্জন করার দিকে দৃষ্টি নেই,—কর্ত্তৃত্বের মুকুট মাথায় পরার জন্যই লালায়িত। আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভি

সম্প্রদায়ের নেতারা জিতে পারেন না, তার কারণ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিটাই তাঁদের ঝাপ্‌সা ও সঙ্কীর্ণ। ... শিক্ষার অভিমানে ও অহঙ্কারে তাঁরা উন্মত্ত। ... শুনতে বিশ্রী হো'ক তবুও একথা কবুল না করে উপায় নেই, যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমরা যা' শিক্ষালাভ করেছি, তা হচ্ছে তোতাপাখীর শিক্ষা; মোহ, অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে উঠ্‌বার জন্য জীবনের যে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন, তার কোনো ব্যবস্থা সে-শিক্ষার আয়োজনে নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যই বা আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ক'জন আগাগোড়া পড়েছেন?

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বাঙ্গালাদেশের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল সহসা সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত হ'য়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হ'য়েছিল চুয়াত্তর। মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি কোনো সাময়িক পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই রাত্রে তিনি যে ঘুমিয়েছিলেন,—পরদিন সে ঘুম আর ভাঙে নি, বেলা দেড়টার সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিপিনবাবুর মত নির্ভীক, উদার-চেতা চিন্তা-বীর এবং কর্ম্মবীর শুধু আমাদের দেশে কেন, যে-কোন দেশেই বিরল। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল যেমন অগাধ, লিখ্‌বার ভঙ্গীও ছিল তেমনি সরস, বল্‌বার ভঙ্গীও ছিল তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। আপনার সহজ অধিকারে তিনি বাংলার জাতীয় জীবনে যে স্থানটি অধিকার করে নিয়েছিলেন,—সে-স্থানটি আজ শূন্য মনে করতেও ব্যথা লাগে। বঙ্গ-বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে-বিপুল শক্তি বাংলার তরুণ মনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল স্বর্গীয় বিপিনপাল ছিলেন সেই শক্তির একটি প্রধান উৎস। শুধুই স্বদেশে নয়, বিদেশেও বিপিনবাবু দেশের জন্য যে-কাজ করেছিলেন, তার জন্য দেশ তাঁর কাছে চির-ঋণী থাক্‌বে। বিলাতে ভারত-বর্ষকে স্বরাজ-দেওয়ার সপক্ষে যে জন-মত আজ গড়ে উঠেছে,—তার গোড়াপত্তন করেছিলেন বিপিন বাবু।



স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র

শৈশব থেকেই বিপিনবাবু তাঁর নির্ভীক-চিত্তের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের জন্য তাঁর পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'লেন, তবুও তাঁর ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করলেন না। ফলে অর্থাভাবে তাঁর কলেজে অধ্যয়ন করা হ'ল না; কিন্তু বাণীর মন্দিরে আপনার শক্তিতে তিনি অবাধে প্রবেশ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে পড়ে তিনি স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছিলেন যখন, তখন কারাবাস আজকালকার মত এত প্রচলিত হয় নি।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও চিন্তার-সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় লাভ করতে হ'লে বিপিনবাবুর লেখা বইগুলি পড়া একান্ত দরকার।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুট্

ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে কলা ও শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করবার উদ্দেশে কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুটের কর্তৃপক্ষরা আগামী জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে তৃতীয় বার্ষিক কলা ও শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। প্রদর্শনীতে ছাত্রছাত্রী ভিন্ন অন্যান্য শিল্পীর দ্রব্যও প্রদর্শনের জন্য সাদরে গ্রহণ করা হ'বে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হ'চ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় কোনো প্রবেশিকা-মূল্য লাগবে না, এবং চল্লিশখানি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক ছাত্র-ছাত্রীগণকে দেওয়া হ'বে। তা ছাড়া প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিল্প-দ্রব্যাদি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীগণকে প্রবন্ধ লিখ্‌তেও আহ্বান করা হ'বে এবং তিনটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য তিনটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হ'বে।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

আমরা শুনে সুখী হ'লাম, "ওমারখৈয়ামে"র কবি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ শীঘ্রই ছ' মাসের ছুটি নিয়ে বিলাত যাচ্ছেন। কান্তিবাবুর শরীরটা গত কয়েকমাস যাবৎ ভালো যাচ্ছিল না, আশা করি এই বায়ু-পরিবর্ত্তনে তিনি একেবারে নিরাময় হ'য়ে ফিরে আসবেন। আপাততঃ তিনি 'মেঘদূতে'র ছন্দ-অনুবাদে নিযুক্ত আছেন,—এই সংখ্যায় উত্তর মেঘের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদের নমুনা আমরা প্রকাশ করলাম। তাঁর প্রবাসের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে তিনি 'বিচিত্রা'র পাঠকপাঠিকাদের জন্য সুদীর্ঘ চিঠি প্রেরণ করবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর বিদেশযাত্রা নিরাপদ ও আরামের হোক,—এই আমরা কামনা করি।

আমাদের গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন

এই আষাঢ় সংখ্যায় আমাদের পঞ্চম বর্ষ শেষ হ'ল। আগামী ১লা শ্রাবণ আমাদের ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'বে। আশা করি আমাদের গ্রাহকবর্গ এ বছরেও গ্রাহক থেকে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

'বিচিত্রা'র দিন দিন বৃদ্ধি হ'চ্ছে,—এই আশ্বাস-বাণী গত বছরের মধ্যে অনেক পাঠক-পাঠিকা আমাদের জানিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যদিও তার সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আশানুরূপ উন্নতি আমরা গত বছরেও করতে পারি নি, তবুও কৃতজ্ঞচিত্তে আমাদের বন্ধুদের আশ্বাস-বাণী আমরা গ্রহণ করেছি,—কেননা 'বিচিত্রা'র কোনো উন্নতি গত বৎসরে হয় নি,—এ কথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা, কয়েকটি সরস নূতন ধরণের কবিতা, সারগর্ভ প্রবন্ধ ইত্যাদি আমরা গত বৎসর 'বিচিত্রা'র পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিয়েছি। শরৎচন্দ্রকে 'শ্রীকান্তে'র চতুর্থপর্ব্ব লিখতে প্ররোচিত করায় বাংলার কথা-সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা হ'য়েছে। আমাদের চিত্রশালায় নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে বাংলার আধুনিক চিত্রশিল্পের ধারার একটা পরিচয় দিতে আমরা চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া অনেক সারগর্ভ সমালোচনা, গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী এবং সরল কথা-সাহিত্যও গত বৎসর বিচিত্রার পাতা অলঙ্কৃত করেছে। কয়েকজন শক্তিশালী নূতন লেখকও গত বৎসর 'বিচিত্রা'য় আবির্ভূত হয়েছেন,—তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

উৎকৃষ্ট সাহিত্য বিতরণ করে শিক্ষিত পরিণত মনের পরিতৃপ্তি-সাধন, শিক্ষানবিশ অপরিণত মনের শিক্ষায় সহায়তা করা, জাতীয় সাহিত্যের বৃদ্ধি ও প্রচারের সুযোগ সৃজন,—মোটামুটি এই হ'ল 'বিচিত্রা'র আদর্শ। আমরা জানি আমরা এখনো এ আদর্শ থেকে অনেক দূরে। ভগবান সহায় হ'লে আগামী বর্ষে কিছুদূর অগ্রসর হ'তে পারি আশা হয়েছে। পাঠকপাঠিকাদের সহযোগিতা ও [illegible] আমাদের সফলতা নির্ভর করে।